বুদ্ধদেব গুহ

নানা রসের নটি উপন্যাস

বুদ্ধদেব গুহ

নানা রসের ৯টি উপন্যাস
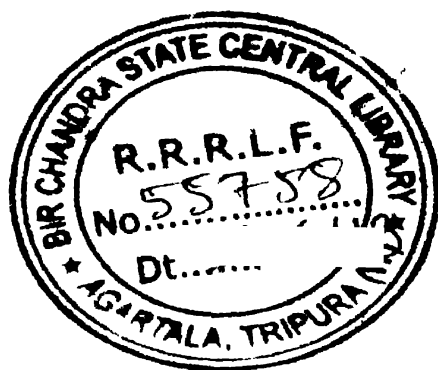
দীপ প্রকাশন
১৪বি বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

Buddhadeb Guha
NANA RASER 9TI UPANYAS

ISBN 81-85800-52-9

প্রথম দীপ সংস্করণ : বইমেলা ১৯৬২ ◆ প্রচ্ছদ : সৌরীশ
প্রকাশক : শংকর মণ্ডল
দীপ প্রকাশন, ২০৯এ বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৬
বর্ণসংস্থাপন : আই. ই. আর. ই. ২০৯এ বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৬
মুদ্রক : এ বি সি প্রিন্টার্স, কলকাতা-৭০০ ০০৯

দাম : ৪০০ টাকা

ভূমিকা

নবরত্ন পাথরের মালা কিনেছিলাম একটি ঋষিকেশ-এ। এই নটি উপন্যাসও আরেকটি নবরত্ন হার।

কোনো উপন্যাসই অন্য উপন্যাসের মতো নয়। প্রত্যেকটিই আলাদা আলাদা রত্ন—কোনোটির সঙ্গেই কোনোটির মিল নেই। আশা করি পাঠক পাঠিকাদের কাছে এই সংকলনটি সমাদৃত হবে। হলে, অত্যন্ত আহ্লাদ হবে।

সূচিপত্র

প্রত্যানীত

জগন্নাথ ভট্টাচার্য

প্রীতিভাজনেষু

তামা নদীটা যেখানে গঙ্গাধর নদীর বুকে এসে পড়েছে, আর ফাল্গুনের শুখা তাকে দয়িতের সঙ্গে মিলতে না দিয়ে একটি দহ মতন সৃষ্টি করে তাকে বিরহ যাতনাতে ক্লিষ্ট করেছে, ঠিক সেইখানেই দাঁড়িয়েছিল দীপ। তামা নদীর বিরহর জ্বালাই যেন রাশ রাশ মাদার ফুল হয়ে নদীপারের পাতা-ঝরা হরজাই বনে ফুটে রয়েছে। এখন থাকবে কিছুদিন। মাঝে মাঝে বাঁশবন। গোরু চরেছে একরামুদ্দিন মিঞার। গোয়ালে ফেরার সময় হল তাদের।

একটা একলা গো-বক তার খয়েরি-রঙা ডানা মেলে কী এক অব্যক্ত যন্ত্রণার কথা প্রকাশ করতে না পেরে গঁক-গঁক-গঁক শব্দ করে মোনো-সিলেবল-এ তার বুকের কষ্টটা তামা নদীর বুকের কষ্টের সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছে।

ধু ধু চর ফেলা এবং একটি মস্ত বাঁক নেওয়া গঙ্গাধর নদীর পারের মস্ত বটগাছের তলায় বসে রাখাল-বাগাল গোয়ালপাড়িয়া গান গাইছে। গান গাইছে তার প্রেমিকার কথা মনে করে, গলা ছেড়ে।

কে জানে।

দীপের মতন তার কোনো প্রেমিকা আদৌ আছে কি না। এই সন্ধেই হয়তো তার প্রেমিকা। প্রতি দিন-রাতের অনেকই মুহূর্ত থাকে যখন প্রত্যেক একলা নারী এবং পুরুষের মনই বিবাগী হয়ে যায়। এই বৈরাগ্য কিন্তু দূরে যাবার জন্যে নয়, কারও কাছে আসারই জন্যে! বুকের কাছে, খুবই কাছে।

সে গান গাইছে তো গাইছেই। বড়ই লম্বা গান। তবে ছাওয়ালের গলাখানা ফাস-কেলাস। কিন্তু এ গান শুনে মন যেন গঙ্গাধরের চরেরই মতন বিবাগী হয়ে ওঠে। রাখাল গাইলে, সে জায়গা ছেড়ে পা আর নড়ে না কারোই।

"প্রেম জানে না রসিক কালাচান্দ
কালা ঝুরিয়া থাকে মন
আর কতদিনে হব বন্ধু দরিশন, বন্ধুরে।

অ বন্ধুরে তোমার বাড়ি আমার বাড়ি
যাওয়া আইসা অনেক দেরি
যাব কি রব কি সগায় করে মানা
হাটিয়া গেইতে নদীর পানি
খাপলাং কী খুপলুং
কী খালাউ খালাউ করে রে
হায় হায় পরাণের বন্ধুরে।

অ বন্ধুরে তোমার আশায় বসিয়া আছং
বটবৃক্ষের তলে।

ভাদর মাসিয়া দেওরার ঝরি
টিপ্পিস কি টাপ্পাস
কি ঝম ঝমেয়া পড়ে রে
হায় হায় পরাণের বন্ধুরে।

অ বন্ধুরে একলা ঘরে শুইয়া থাকং
পালঙ্গের উপরে
মন মোর উরাং বহিরার করে
কট ঘুরিতে মরার পালং
কেরবেত কী কুবরুত
কি কাবাও কাবাও করে রে
হায় হায় পরাণের বন্ধুরে।।”

গান শেষ হলে দীপও পা বাড়াল বাড়ির দিকে। সে যে কেন এমন উদ্দেশ্যহীনভাবে নদীপারে এসেছিল এই ফাল্গুনের রুখু-লাগা বিকেলে, তা ও নিজেও জানে না। সেও যদি রাখালের মতন গান গেয়ে নিজের কথা আকাশকে, বাতাসকে, নদীকে বলে মনের ভার একটু হালকা করতে পারত।

সন্ধে হয়ে আসছে। গঙ্গাধর নদীর উপরের আকাশে গেরুয়া রঙ লেগেছে। বৈষ্ণব-গেরুয়া। একঝাঁক পরিযায়ী হাঁস ডিঙ্গডিঙ্গার মরনাই চা-বাগানের দিক থেকে উড়ে আসছে দুলতে দুলতে মালার মতন। হয়তো তারা গুমা রেঞ্জের গভীরের কোনো জলাভূমি থেকে আসছে। ঠিক জানে না দীপ। তারা চর-ফেলা আঁকাবাঁকা নদীর বিধুর আঁচলের বুক তাদের ডানার সপাসপ শব্দে চমকে দিয়ে শিমুল বনের দিকে উড়ে গেল।

মাদারের বনে ফুল এসেছে। তিব্বতি লামাদের বসনের রঙের মতন লাল ফুল ভরে গেছে গাছে গাছে। এই মাদারের ফুলেরাও একধরনের আকাশমণি বা সূর্যমুখী। এরা এদের মুখ আদৌ আনত করে না পৃথিবীর দিকে। ঋজু, আকাশমুখো হয়ে, আদ্যিকালের প্রতিষ্ঠান মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে হেলায় যেন অপ্রমাণ করে এরা।

ভালো লাগে দীপের।

নদীপারের হরজাই বনে একটা হাওয়া ওঠে। তার পায়ে পায়ে, নূপুরের মতনই, কিন্তু তাতে ঝুনুঝুনু নয়, ঝুরুঝুরু শব্দ ওঠে একটা। নারীর চুলের মতন বিস্রস্ত হয়ে যায় ঘন-বুনোটের বন।

পরমুহূর্তেই হাওয়াটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চাপা স্বগতোক্তি করেই কোনো ভিখিরি বুড়ির মতনই মরে যায়। গাছেরা টানটান হয়ে দাঁড়ায়, যেন অ্যাটেনশানেই; কোনো অদৃশ্য সেনানায়কের নির্দেশের অপেক্ষায়।

একটু পরেই অন্ধকার হয়ে যাবে। আজ ঈদ। শুক্লপক্ষ। একুশে ফেব্রুয়ারি। এখনই না উঠলে অন্ধকারে বাড়ি পৌঁছতে অসুবিধে হবে। ভাবল দীপ।

এমনিতে কোনো অসুবিধে নেই। কিন্তু গরম পড়ছে। সাপখোপ-এর ভয় আছে। যদিও দীপ মিত্রর জীবনের দাম বিশেষ নেই, অন্যের কাছে বা তার নিজের কাছেও, তবু হয়তো নিছক অভ্যেসবশেই মাঝে মাঝে বড় বাঁচতে ইচ্ছে করে। এই বাঁচার ইচ্ছেটা, ওর মতন সর্বার্থে এক অপদার্থের পক্ষে বড়ই হাস্যকর যে, তা ও জানে। কিন্তু বাঁচার ইচ্ছা যতই হাস্যকর হোক না কেন, সব মানুষই এই দুর্মর রোগে ভোগে।

দীপ, নানা কারণে ঘেন্না করে নিজেকে, আবার ভালোওবাসে। যদিও জানে যে, এই ঘৃণাটা করা উচিত সমাজকে, সমাজব্যবস্থাকে, যারা এবং যে-ব্যবস্থা ওর মতন নির্বিরোধী, টগবগে,

উচ্চাশাসম্পন্ন একজন যুবকের মনের মধ্যে এমন অস্থিরতা এবং অবসাদ এনেছে। কিন্তু এই সমাজ, এই ব্যবস্থাটা তো কোনো মানুষ বা প্রাণী নয়, এমনকি একটা গাছও নয় যে, ও ইচ্ছে করলেই ওর একক চেষ্টাতে কেটে ফেলবে কুড়ুল দিয়ে।

তামাহাটে ওদের বাড়ির দিকে আসতে আসতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাতে শিক্ষিত না হলেও উচ্চশিক্ষিত এবং চিন্তাভাবনাতে অত্যাধুনিক দীপ ভাবছিল যে ওর বাবার কথা শুনে, চাষবাস করলেই হয়তো ভালো করত। জমিজমা ওদের নেহাত কম নেই। তাছাড়া, এখানের অনেকেই তো, পাটের ব্যবসা উঠে যাওয়ার পরে চাষবাস নিয়েই সংসার চালিয়ে নেন। সচ্ছল না হলেও অভাবও নেই কোনো তাদের।

কেন যে ও গৌরীপুরে পড়াশুনো করতে গেল! আর কেনই যে সাহিত্য পড়তে গেল! কেন যে মাদারকে এমন করে ভালোবাসল! সমস্ত জীবনটাই দীপের ভুলে ভরা। মাদারের গর্বের রঙ ঐ মাদার ফুলেরই মতন। ও জানে যে কোনোদিনও পাবে না মাদারকে। তবু....

ভুল, ভুল, সবই ভুল!

নদীপারের তিনকড়ি মিত্র হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল-এর পাশের পায়ে-হাঁটা পথ বেয়ে তামাহাটের মোড়ে এসে পৌঁছে দোকানঘরগুলোর আলোতে চোখ যেন আরোই ধেঁধে গেল।

এমন সময়ে অন্ধকারে প্রায় মাটি ফুঁড়ে উঠে হামিদ ওর হাত ধরে বলল, কী রে! তোর হইছেটা কী ক' ত? আলি না ক্যান রে? আম্মা তর লাইগ্যা বইস্যা আছে। চল চল।

লজ্জিত হল দীপ। সত্যিই তো! হামিদের আম্মা ফতিমা বিবি, দীপ-এর মাসিমাকে তো ও নিজেই বলেছিল। মাসিমা ওকে ঈদের দিনে লংক্লথের পায়জামা-পাঞ্জাবিও দেন প্রতি বছর। ওর লজ্জা করে। বদলে কিছুই তো ও দিতে পারে না! এবারেও সেই আন্তরিক দাওয়াতের কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি। অথচ কী যে হয়ে যায় দীপের আজকাল। মাদারের বিরক্ত মুখটার কথা বারবারই মনে পড়ে যায়।

হামিদ বলল, তগো বাড়ি গিয়া মাসিমাকে জিগাইলাম। তা তিনি ত কইবার পারলেন না তুই কোন চুলায় গ্যাছস। তবে আমি ঠিকই বুঝছিলাম কোথায় গ্যাছস।

কোথায়? আর কী করে? বুঝলি কী করে?

মাদার বনে। মাদারের ফুল ফুটছে, যা না! ঈরে! ঈনসাল্লা। এরশাদ। এরশাদ। চাইরধারে চোখ চাওন যায় নারে হালা। আহা! মন কয়, যেন জন্নাত নাইম্যা আইছে নিচোত।

কোন জন্নাত? তোদের স্বর্গের, মানে, জন্নাতের আবার অনেক রকম হয়তো।

হয়ইতো!

বলেই বলল, জন্নাতুল ফিরদৌস, জন্নাতুল মোয়াল্লা, জন্নাতুল নাঈম, জন্নাতুল মাবা।

বলেই বলল, আরও আছে। বোধ করি, আম্মী কইবার পারে সবগুলানের নাম। তবে মাদারের মতন জন্নাত আর নাই। যাই ক' তুই দীপ। ভাব ভাব মাদারের ফুল।

দীপের মনটা ভালো নেই। ভালো থাকে না আজকাল। অন্যসময় হলে প্রতিবাদ করত হয়তো। হয়তো ঝগড়াও হয়ে যেত। কিন্তু এখন উচ্চবাচ্য করল না। তাছাড়া আজকে ঈদের দিন। ভালোবাসার দিন। ঝগড়ার নয়।

প্রতিবাদী হতেও যতটুকু জোরের, মনোবলের এবং উদ্যোগের প্রয়োজন হয় তা জড়ো করার মতন জোর এই বসন্তকে পথ-দেখানো সন্ধেতে দীপ নিজের মধ্যে জড়ো করে উঠতে পারল না। তাছাড়া, হামিদ তার বন্ধুই শুধু নয়, তার হিতার্থীও। ডিঙ্গডিঙ্গার মাদার নাম্নী মেয়েটিকে যে দীপ ভালোবেসে ফেলেছে তা হামিদ বিলক্ষণই জানে। যদিও দীপের সেই বিফল ভালোবাসাতে হামিদ

কোনো মদতও দেয় না আবার তার সক্রিয় বিরোধিতাও করে না। দীপের মনে হয়, হামিদের স্বভাবটা যেন অনেকটা তামাহাটের এই গঙ্গাধর নদীরই মতন। নিজের মনেই সে বয়ে চলে। তার দু'পারের কোনো ঘটনার ঘনঘটাই তাকে ছোঁয় না। আলোড়িত করে না। অথচ হামিদের মধ্যে নদীরই মতন একটা অঘটন-ঘটন-পটিয়সী ক্ষমতা আছে।

হামিদের পূর্বপুরুষেরা চরুয়া ছিল। এই অঞ্চলের মানুষেরা যাদের বলেন, ভাটিয়া মুসলমান। তাই ওর রক্তে প্রচণ্ড রাগ যেমন আছে, রক্তের মধ্যে চরফেলা নদীর খামখেয়ালিপনাবাহী জলও বোধহয় কিছু মিশে আছে। কখন যে হামিদ কোন দিকে বাঁক নেয়, কোথায় চর ফেলে আর কোথায় পাড় ভাঙে, তা সে নিজেও জানে না। সে-কারণেই হামিদ ওর বন্ধু হলেও, ওর হিতার্থী হলেও, দীপ ওকে সমীহ করে চলে। সম্ভবত ভয়ও পায়। যদিও সেই ভয়ের কথা কখনও মুখে বা চোখে প্রকাশ করে না বা করেনি হামিদের কাছে।

হামিদের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দীপ বলল, তুই আউগাইয়া যা। আমি হাত-মুখ ধুইয়া আর মা'রে একবার কয়্যাই আসতাছি।

ক্যান? আমাগো বাড়ি কি ইন্দারা নাই নাহি? না একখান গামছাও নাই তর হাত মুখ পোছনের লইগ্যা?

না রে। হে কথা নয়। মা'রে কইয়াই আসুমানে। দেখিস। দৌড়াইয়া যাম্যু আর আম্যু। দেইখ্যা লইস। জানিসই ত! মায়ে আমার নাই-চিন্তার রানি!

তা ত আইবই। ছোট্ট পোলা যে তুই! আমাগো আট ভাইয়ের মধ্যে কারে কুমিরে লইল আর কারে বাঘে খাইল হে লইয়া আমার আম্মার কুনোই মাথাব্যথা নাই।

হ। তাই ত! নিমকহারাম আছস তুই বড়। মাসিমা সর্বদাই হামিদ হামিদ করেন আমি দেখি নাই য্যান। থো তোর মিথ্যাকাহন।

দীপ আর কথা না বাড়িয়ে বলল, যা তুই আউগাইয়া যা। আমি যাম্যু আর আম্যু।

হামিদ এবারে এগিয়ে গেল। শুক্লপক্ষের সন্ধ্যায় ডিঙ্গডিঙ্গার পথে যেন মুছে গেল সে অকস্মাৎ।

হাটের পাশ দিয়ে গিয়ে দীপ গদিঘরের পাশের চ্যাগারের ছোট দরজা দিয়ে ঘুরে গদিঘরের পাশ দিয়ে ভিতর-বাড়িতে ঢুকল।

সন্ধের পরে পরেই এই ফাল্গুনে গাছগাছালিরা কেমন যেন গন্ধ ছাড়ে একটা তাদের গা-মাথা, হাত-পা, পাতা-পুতা থেকে। একটা মিশ্র গন্ধ। সকলে সে গন্ধ পায় কি-না তা দীপ বলতে পারবে না। কিন্তু সে পায়। যেমন পায়, মাদারের গা থেকে, বগলতলি থেকে। ও একটা গন্ধগোকুল। গন্ধময় ওর জগৎ, শব্দময়ও বটে। আর বর্ণময় তো অবশ্যই!

কামরাঙা গাছটা মস্ত বড় হয়ে গেছে। জলপাই গাছটাও। কৃষ্ণপক্ষের রাতেই যেন তাদের এই কিশোরী শরীরের বাড়ের মতন বাড়টা তারকাখচিত আকাশের পটভূমিতে বেশি করে চোখে পড়ে। কেন, জানে না দীপ।

নীহার শিবমন্দিরের মধ্যে মূর্তির সামনে বসেছিলেন। সামনে গৌরীপুরের কাছের আশারিকান্দি থেকে ফরমাশ দিয়ে বানানো মস্ত পিদিমদানে রেড়ির তেলের পিদিম জ্বলছে বারোটি। শীর্ণ কিন্তু জ্যোতির্ময়ী কটি উজ্জ্বল দীপশিখারই মতন দেখাচ্ছে দীপের মা নীহারকে।

মাকে আড়াল থেকে দেখতে ভারী ভালোবাসে দীপ কিন্তু মা ঠিকই বুঝে ফেলেন যে দীপ তাঁকে দেখছে।

কে জানে! হয়তো সব নারীরাই বোঝেন।

কিন্তু যখন পুজোতে বসেন নীহার তখন তাঁর কোনোই বাহ্যজ্ঞান থাকে না।

অনেকক্ষণ ধরে দীপ পিদিমদানের বারো পিদিম-এর উজ্জ্বল আলোর পটভূমিতে তার বৃদ্ধা মায়ের নিষ্কম্প শিল্যুটটি দেখল। বাইরে এমন উথাল-পাথাল হাওয়া অথচ আশ্চর্য, এই ছোট্ট শিবমন্দিরের অভ্যন্তরে হাওয়ার রেশমাত্র নেই।

হঠাৎ নীহার মুখ না ঘুরিয়েই বললেন, দীপ এলি?

হ্যাঁ, মা।

কোথায় থাকিস যে সারাদিন! চানু এসেছিল। চখা নাকি আসছে কলকাতা থেকে। আগামীকাল নাকি ধুবড়িতে প্রথম বইমেলা হবে। তাই উদ্বোধন করতে আসছে চখা অন্য আরেকজন লেখকের সঙ্গে।

অন্য লেখক কে?

তা জানি না। আমাদের জেনে লাভই বা কী! তবে চানু বলছিল যে দু-তিন জনের আসার কথা আছে।

আসছে কোথা থেকে? ধুবড়ি?

আরে না না। কলকাতা থেকে আসছে প্লেনে। বাগডোগরা এয়ারপোর্ট থেকে তুলে নিয়ে মেলা কর্তৃপক্ষই ওকে তামাহাটেই পৌঁছে দেবেন। তারপর আগামীকাল আবার বিকেলে এসে নিয়ে যাবেন ধুবড়ি। বইমেলা তো ধুবড়িতেই! এই নাকি প্রথম হচ্ছে বইমেলা ধুবড়িতে। শুধু বাংলা বইয়েরই মেলা নয় রে, বাংলা, অসমিয়া এবং ইংরেজি বইও থাকবে। তবে আমার মনে হয়, মেলার নাম দেওয়া উচিত ছিল গ্রন্থমেলা। অসমিয়া ভাষাতে "বই" বলে তো কোনো শব্দ নেই।

ভালো। ধুবড়িতে যে কত শিক্ষিত বাঙালি ও অহমিয়ারা থাকেন, তাঁদের খোঁজ আর কে রাখেন। কলকাতার খবরের কাগজগুলো তো মাঝে মাঝে ব্রহ্মপুত্রে বন্যার খবর ছেপেই ধন্য করে ধুবড়ি শহরকে। আর কী!

তা ঠিক। কাগজগুলোর এমনই রকম। যেন ধুবড়ি বলে কোনো জায়গার অস্তিত্বই নেই।

তারপরেই কথা ঘুরিয়ে বলল, চখাদা সত্যিই এখানে আসবেন? বল কি মা? কতদিন পরে আসবেন?

তা প্রায় চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর হবে। তোর জন্মের বছর পনেরো আগে শেষ এসেছিল। তখন কড়ি ছিল এখানে। ঝন্টু আর বাপ্পুও এসেছিল কুচবিহারের হস্টেল থেকে ছুটিতে। তখন তোর বাবা তো বটেই জ্যাঠাবাবুও বেঁচে। যাই হোক, এখন চখার নামডাক হয়েছে। চখা চক্রবর্তী বললেই চোখা-চোখা মানুষও এক ডাকে চেনে। সে যে অতীতকে ভুলে যায়নি, তার এই প্রাচীন পিসিমার কাছে এক রাতের জন্যে হলেও যে, তামাহাটে সে আসছে, এটাই আনন্দের কথা।

তা আসছেনই যদি তো এত দেরি করে খবর পাঠালেন কেন?

তারপর নীহার বললেন, চখার নাকি আসার ঠিক ছিল না। ব্যাঙ্গালোর না ম্যাড্রাস কোথায় যেন গেছিল। শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলেই খবর দিতে এত দেরি হল।

তোমাকে খবর দিল কে?

চানু।

চানুদাকেই বা এ খবর দিল কে? মিথ্যে খবর নয় তো?

মিথ্যে খবর দিয়ে কার লাভ? তোর যত উদ্ভট চিন্তা। উদ্যোক্তারা ধুবড়িতে রাজাদের ছাতিয়ানতলার বাড়িতে ফোনে খবর দিয়েছেন। রাজাই ধুবড়ি থেকে এখানে মুংগিলালের কাছে ফোন করে দিয়েছিল। চখা বলেই দিয়েছে যে, বাগডোগরাতে নেমে সে তামাহাটেই আসবে। ফোন যখন আসে, চানু তখন সেখানেই বসে গল্প করছিল। দাতুও ছিল। ওরা দুজনে দৌড়ে খবর দিতে এসেছিল। একজনকে পাঠালাম ঘোষের দোকান থেকে গরম রসগোল্লা আনতে, যদি পায়, চখা খুব ভালোবাসত।

চখাদা যখন শেষবারে এসেছিল তখনও কি ঘোষের দোকান ছিল?

থাকবে না কেন? গদাই ঘোষের বাবা নিমাই ঘোষ তখন বসত দোকানে। সেও তো ফওত হয়ে গেছে তোর জন্মেরও আগে। বড় ভালো রাবড়ি বানাত নিমাই ঘোষ। আর রসমালাইও। ফকিরাগ্রাম, গোঁসাইগঞ্জ, বক্সির হাট, পাগলা হাট হয়ে মটরঝার, কচুগাঁও থেকেও মানুষে সেই সব কিনতে আসত। রাবড়ি খাওয়ার যম ছিল তোর জ্যাঠাবাবুর বন্ধু রতুবাবু।

মানে, পচার দাদু?

হ্যাঁরে। উনি খুব বড় শিকারিও ছিলেন। টি মডেল ফোর্ড গাড়ি ছিল তাঁর একটা। তোরা সে সব গাড়ি চোখে দেখিসনি। পথেও চলত, মাঠেও চলত। উনি তো হিরো ছিলেন এই অঞ্চলের। আর ছিল আবু ছাত্তার।

আবু ছাত্তারের কথা শুনেছি। শুধু বাঘই মারেনি এন্তার, একদিনে এগারো জন মানুষও মেরেছিল নাকি?

হ্যাঁ। তা মেরেছিল। ফাঁসি হয়ে গেছে মানুষটার। বদরাগী ছিল ঠিকই কিন্তু মানুষ ভালো ছিল। ভালোমানুষদের রাগই প্রকাশ পায়। যারা রাগ প্রকাশ করে না, তাদের থেকে দূরে থাকবি।

ঘোষের দোকানে কাকে পাঠিয়েছ?

কথা ঘুরিয়ে বলল দীপ।

নীহার বললেন, দাতুকে।

নীহারের আজকাল এরকমই হয়েছে। এক কথা বারবার বলেন। স্মৃতিশক্তিও চলে গেছে। বয়সও তো প্রায় আশি হল। তারপর পাঁচ বছরের ব্যবধানে দুই পুত্র বিয়োগে তাঁর মাথাটা সম্ভবত কাজই করে না আর।

আর চানুদাকে?

ডিম জোগাড় করে আনতে। আজ ঈদের দিন। মিঞাদের দোকানপাট সবই তো বন্ধ। তাদের বাড়িতেও কি আর কিছু আছে! চানু বলল, ওদের বাড়ির এক হাঁসির নাকি ডিম পাড়ার কথা আজ। দেখুক যদি থাকে চখার কপালে ডিম খাওয়া।

হেসে ফেলল দীপ সে কথা শুনে। বলল, বাবাঃ! কবে তাদের বাড়ির কোন্ হাঁসি ডিম পাড়বে সে খবরও রাখে নাকি চানুদা?

তারপরই বলল, শুধুই ডিমের ঝোল খাওয়াবে মা? চখাদাকে?

না রে? ফেনাভাত খাওয়াব। চখা তামাহাটের ফেনাভাতের খুব ভক্ত ছিল। ফেনাভাত, মধ্যে সিম, বাঁধাকপি আর পালংশাক সেদ্ধ। এবং হাঁসের ডিম সেদ্ধ। সঙ্গে কাঁচা পেঁয়াজ, কাঁচা লংকা।

হাঁসের ডিম-এ ক্লোরোস্টাল বাড়ে। বাত হয়।

দীপ বলল।

ছাড়তো! হোক গিয়ে। একদিন খেলে হার্ট-অ্যাটাক হবে না। তোর বাবা নেই, জ্যাঠা নেই, জেঠিমা নেই, যাঁরা সবচেয়ে বেশি আদর করতেন তারাই নেই, আমি অন্তত যেটুকু পারি করব তো! তাছাড়া ছেলেটা থাকবে তো মোটে চব্বিশ ঘণ্টারও কম!

দীপ মনে মনে বলল, ছেলেটাই বটে! বাঙালির মা-মাসি-পিসির চোখে ঘাটের মড়াও ছেলেমানুষ।

নীহার পুজোর আসন থেকে উঠে, আসনটি ভাঁজ করে তুলে রেখে মন্দিরের দরজা বন্ধ করে বাইরে আসতে আসতেই চানুদা আর দাতু দুজনেই এসে হাজির। চানুদার এক হাতে সার্ফ-এর বাক্সে ডিম আর অন্য হাতে একটা পাথরের বাটি। আর দাতুর হাতে রসগোল্লার হাঁড়ি।

বাটিতে কী আনলি?

নীহার বললেন।

আজ চুমকির জন্মদিন ছিল। পায়েস রান্না হইছিল বেশি কইর‍্যা। বৌদি কইলো, পাথরবাটিতে জমানোই আছে, লইয়া যা চখার লইগ্যা। ও খুবই ভালো পাইত মায়ের হাতের পায়েস খাইতে। মা ত নাই! তার আর কি করণ যাইব? আমি যে মনে রাখছি ও কী ভালো পাইত না পাইত সে কথা জাইন্যাও ত চখাদার ভালো লাগব অনে।

কোন ঘরে শুতে দিই ওকে? কলকাতাইয়া বাবু। ওদের তো আবার অ্যাটাচ্‌ড্‌ বাথ ছাড়া শোওয়ার অভ্যেস নেই। আমার ঘরেই ওকে থাকতে দেব। তাছাড়া কমোডতো ঐ......

স্বগতোক্তি করলেন নীহার।

আর তুমি?

দীপ বলল। অবাক হয়ে।

এক রাত তোর সঙ্গেই শুয়ে যাব।

আর রাতে বাথরুম পেলে?

মধ্যের দরজাটা খুলে রাখলেই হবে'খন। নয়তো বাথরুমের উঠোনের দিকের দরজাটা খুলে রাখতে বলব ওকে। প্রয়োজন হলে উঠোন দিয়েই যাব।

বলেই বললেন, তুই যা দীপ। বাপোই আর বউকে খবর দে গিয়ে। আর মণিকাটা কোথায় গেল? নিশ্চয়ই টি.ভি.-র সামনে বসে আছে। ডাকতো ওকে। ঘর-বাড়ি সাফ-সুতরো করতে হবে। আমার ভাইপো আসছে এত যুগ পরে। কেউ-কেটা ভাইপো।

দীপ জিজ্ঞেস করল চানুকে, বাগডোগরা থেকে তামাহাটে এসে পৌঁছতে কতক্ষণ সময় লাগবে? ধুবড়ি হয়ে আসবে কি?

না। তা কেন! সোজা এসে ঢুকে পড়বে বাঁয়ে। তারপর পাগলা হাট, কুমারগঞ্জ হয়ে আসবে।

শিলিগুড়ি আর জলপাইগুড়ি পেরোতেই তো লেগে যাবে অনেক সময়।

চানু বলল কেন? থোড়াই আসবে সে শহরের মধ্যে দিয়ে। সেভক রোড ধরে বেরিয়ে এসে বাইপাস দিয়ে এসে তিস্তা ব্রিজ পেরিয়ে হাইওয়ে ধরে নেবে। এন.জি.পি.-তেও ঢুকবে না।

তাই? তবু ক'টা নাগাদ এসে পৌঁছবে?

তামাহাটের কূপমণ্ডুক দীপ বোকার মতন বলল।

ভাবছিল ও যে, ওর জগৎটা বড়ই ছোট। ওর দৌড় এদিকে ডিঙ্গাডিঙ্গা আর অন্যদিকে কুমারগঞ্জ-গৌরীপুর হয়ে ধুবড়ি। ব্যসস।

চানুদা বলল, তা ঠিক বলা যায় না। এখন তো শুনতে পাই ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স ছাড়াও অন্য প্রাইভেট-এর ফ্লাইটও আসে বাগডোগরাতে। প্লেন যদি লেট না করে তাহলে এখান থেকে ঘণ্টা পাঁচেক লাগার কথা। তার মানে, আটটা নাগাদ পৌঁছবে হয়তো।

নীহার যেন হঠাৎই উত্তেজিত হয়ে উঠে বললেন, সময় একেবারেই নেই। মণিকা! এই মণিকা, মণিকা! কোথায় যে যায় মেয়েটা!

মণিকাকে ডাকতে ডাকতে ভিতর-বাড়িতে গেলেন তিনি।

চানুদা আর দাতু বলল, আমরাও যাই এখন। গিয়া আটটা নাগাদ আবার আসুমানে। বলিস কাকিমারে। সকলকেই খবরটা দিতে ত লাগে। কী কইস? চখাদা এত বছর পরে আসতাছে তামাহাটে। ওয়েলকাম করুন লাগে ত!

দীপ বলল, আমি তো তাঁকে দেখেছি মাত্র একবার। পুঁচকির বিয়েতে যখন কলকাতায় গেছিলাম তখন। এসে পড়লে তো চিনতেই পারব না।

চেনবার দরকারটাই বা কী? তামাহাটে কি আমাগো বা তগো বাড়িত্ গন্ডা গন্ডা গাড়িওয়ালা অতিথি আসতাছে রোজ রোজ? গাড়ি আইস্যা থামলেই বুঝবি যে চখা আইল।

চখাদার তো লম্বা-চওড়া চেহারা। শুনেছি ইদানীং মোটাও হয়েছে খুব। মাথার চুলও পাতলা হয়ে গেছে।

মনে আছে এখনও, মাঝে মাঝেই বাঁ হাত দিয়ে মাথার চুল আঁচড়াইবার বাতিক ছিল। এখনও আছে কি নাই কে কইতে পারে?

মোটা হয়েছে কেন?

মোটা হইব না ত কী? মায়ে মোটা ছিলেন, বাবাও মোটা, মোটারই ধাত অগো। জল খাইয়া থাকলেও মোটা হইয়া যাইব। গড়ন বইল্যা কথা।

দীপ বলল না কিন্তু কথাটা মুখে এসে গেছিল। ও শুনেছে লোকমুখে যে, শুধু জলই নয়, লাল জলও নাকি খায় চখাদা প্রায়ই।

তারপর বলল, এদিকে বলছ চুলই নেই, তার আঁচড়াবেটা আর কী?

আরে যাদের চুল থাকে না তারাই দেহিস সব সময়েই পকেটে একখান চিরুনি লইয়া ঘোরতাছে।

ওরা হেসে উঠল।

দাতু বলল, সত্যি বলছি। কিন্তু কেন ঘোরে, তা বলতে পারব না।

তারপর দাতু আর চানুদা চলে গেল যার যার বাড়ি।

এমন সময়ে দীপের মনে পড়ল হামিদের কথা। বাড়ির ভিতরে দৌড়ে গিয়ে বলল, যাঃ! একদম ভুলে গেছিলাম মা। ফতিমা মাসির বাড়ি আজ ঈদের নেমন্তন্ন ছিল যে! পায়জামা-পাঞ্জাবি নিয়ে, বিরিয়ানি নিয়ে মাসি বসে আছে। হামিদ পাকড়াও করেছিল হাটের মোড়ে। তাকে কথা দিয়ে এসেছি, না গেলে খুবই খারাপ হবে।

দাওয়াতই যদি ছিল তবে ঈদের নমাজের পরেই গেলি না কেন? ঈদগা থেকে ওরা আসার পরপরই? ফতিমা তো তোকে এই প্রথমবার দাওয়াত খাওয়াচ্ছে না? এটা কী ধরনের অসভ্যতা? এমনটা কোনো শিক্ষিত মানুষের কাছে আশা করার নয়। এখন কী করবি? এদিকে চখাও কত দূর থেকে আসছে আমাদের সঙ্গে মাত্র ক'টি ঘণ্টা কাটাবে বলে আর তুই ঠিক এখনই চলে যাবি? বাগডোগরাতে কখন প্লেন নামবে তা তো আমরা জানি না। ও তো আগেও চলে আসতে পারে! তুই ফিরে আসার আগেই যদি সে এসে পৌঁছে যায়? কী লজ্জার কথা হবে। এখন ওর পিসির বাড়ি বলতে তো তুই আর আমি। অন্যেরা তো কেউই নেই এখানে। তোর দাদারা তো একজন রায়গঞ্জে, একজন ধানবাদ আর হাজারিবাগের ঘেটো টাঁড়ের মধ্যে মাকুর মতন যাওয়া-আসা করছে আর অন্যেরা কলকাতাতে। আগে দোল-দুর্গোৎসবে একসঙ্গে হত সবাই। এখন আর কে এই নিম্ন আসামের গোয়ালপাড়ার ধ্যাড়ধেড়ে তামাহাটে আসে! ডিশ অ্যান্টেনা নেই, কেব্‌ল টি.ভি. নেই, বার নেই, এয়ার-কন্ডিশনড সেলুন নেই, সিনেমা হলও নেই, এখানে শহুরেরা কীসের জন্যে আসতে যাবে? মোটে আসেই না কেউ, তার থাকা! এই কারণেই আমার ভীষণই আনন্দ হচ্ছে চখা আসছে বলে। দ্যাখ ছেলেটার কত ভালোবাসা আছে আজও তামাহাট-গৌরীপুর-ধুবড়ির জন্যে।

বলেই বললেন অতখানি রাস্তা। ভালোয় ভালোয় এসে পৌঁছকই আগে।

ছেলেটা ছেলেটা কোরো না তো মা। আজ বাদে কাল চিতায় উঠবে। এই বাঙালি মা-পিসিদের কাছে বুড়োরাও চিরদিন খোকা আর খোকন হয়েই থাকে। সাধে কি জাতের এই হাল!

এমন সময় বাইরে একটা গাড়ি এসে দাঁড়ানোর শব্দ হল। তামাহাটের পথে বাস-ট্রাকের যাতায়াত আছে মাঝে-মধ্যে কিন্তু গাড়ি দিনে হয়তো চার-পাঁচটি ডিঙ্গডিঙ্গার দিকে যায় এবং ধুবড়ির দিকেও।

তুমি ভেতরে যাও মা। আমি দেখছি।

দীপ বাইরে বেরিয়েই দেখে একটা মস্ত গাড়ি। সাদা-রঙা। ঠিক এমন গাড়ি আগে দেখেনি কখনও।

গাড়ির সামনের বাঁ দিকের দরজা খুলে নামল দীপের ছোড়দা, ঝন্টু।

তুমি! চখাদা নাকি আসবে আজই। একটু আগেই চানুদা খবর দিয়েছে এসে মাকে। ধুবড়ি থেকে রাজাদা মুংগিলালের গদিতে ফোন করেছিল।

জানি, ঝন্টু বলল। আমিও তো তাই এই সময়েই এলাম। নইলে, পরের সপ্তাহে আসতাম।

ততক্ষণে ছোটবৌদি আর ছোটবৌদির দাদা-বৌদিও নামলেন। ছোড়দার ড্রাইভার-কাম-কম্বাইন্ড হ্যান্ড পাণ্ডেও নামল ড্রাইভিং সিট থেকে। ভিতর থেকে নীহারের সঙ্গে মণিকাও গদিঘরে এলেন।

কুশল জিজ্ঞাসাবাদ করে নীহার বললেন বাঁচালি ঝন্টু, তুই এসে পড়ে। কী টেনশনে যে ছিলাম।

ঝন্টু বলল, টেনশন-এর কী আছে? চখাদা তো আর বাইরের লোক নয়।

এটা কী গাড়ি নিলি? মারুতি ভ্যানটা নেই?

সেটাও আছে মা তোমার আশীর্বাদে। এটা টাটা মোবিল।

বাঃ! ভারী সুন্দর তো গাড়িটা।

চখাদা বইমেলা উদ্বোধন করতে আসছে ধুবড়িতে, তুমি যাবে তো? তাইতো নতুন বড় গাড়ি নিয়ে এলাম যাতে তোমার কোনো কষ্ট না হয়।

তাই? তা ভালো। তবে বড়লোক না হয়ে বড় মানুষ হও, এই আশীর্বাদ করি। চিরদিন তাই চেয়েছি।

দীপ বলল, ছোড়দা এসে গেছে, আমি হাত-মুখটা ধুয়েই একটু ঘুরে আসি হামিদদের বাড়ি থেকে। তোমার টর্চটা নিয়ে যাচ্ছি মা।

বলেই ছুটে ভিতর-বাড়িতে গেল।

২

এটা কী নদী পার হলাম?

চখা টাইয়ের নটটা একটু ঢিলে করে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, যে ছেলেটি তাকে নিয়ে এসেছিল বাগডোগরা থেকে, তাকে।

কে জানে!

নদীর নাম জান না?

কী হইব জাইন্যা?

চখা চুপ করেই রইল।

ভাবছিল, এই আমাদের বিশেষত্ব। এখানে শিক্ষিত মানুষদের কাছেও কোনো গাছ শুধুমাত্রই গাছই। কোনো পাখিও শুধু পাখি। নদী, নদী। জন্মাবধি গাছ, পাখি, নদীর প্রতিবেশী হওয়া সত্ত্বেও এদের কারোকেই জানার একটুকু আগ্রহ নেই অধিকাংশ মানুষেরই।

ভাবলেও খারাপ লাগে ওর।

পাইলট, অর্থাৎ ড্রাইভার খুব জোরে গাড়ি চালাচ্ছিল। কোনো মদের কোম্পানির ফ্রি-গিফ্‌ট দেওয়া একটা গল্ফ-ক্যাপ মাথায় চড়িয়ে। ভাড়ার গাড়ি। গাড়ির মালিকও গাড়ির সামনের সিটে বসেছিল।

কতক্ষণ লাগবে তামাহাটে পৌঁছতে?

চখা আবার প্রশ্ন করল।

দেখা যাউক। রাস্তা এতই খারাপ যে কহনযোগ্য নয়।

কিছুক্ষণ পরেই একটি পেট্রল পাম্প-এ পাইলট গাড়িটাকে ঢোকাল। পাইলট বলেই সম্বোধন করছিল চখা তাকে। তাতে সেও খুশি হচ্ছিল। তাকে নিতে-আসা ছেলেটিও নামল। তার নাম প্রান্তিক। তারপর পেট্রল যখন নেওয়া হচ্ছে তখন ফিরে এসে জানালা দিয়ে মুখ ঢুকিয়ে লজ্জামাখা হাসি হেসে বলল, একশত টাকার একখান নোট হইব কি? টাকা কম পইড়্যা গেছে গিয়া।

চখা বলল, হবে।

টাকাটা নিতে নিতে ভদ্র ও অপ্রস্তুত ছেলেটি আরও লজ্জিত হয়ে বলল, খারাপ পাইলেন না ত?

না না। খারাপ পাইব ক্যান? ওরকম তো হতেই পারে। নিজে গাড়ি না চালালে বা নিয়মিত যাওয়া-আসা না করলে কত তেলে কত কিমি যাবে, কত ধানে কত চাল—এরই মতন, জানা থাকবে কী করে! এই নাও।

বলে, টাকাটা বের করে দিল পার্স থেকে।

একটু পরেই সন্ধে হয়ে যাবে। ঠান্ডা নেই কিন্তু হাওয়ার ছুঁচোলো মুখে ঠান্ডার তির আছে। ফাল্গুনের উত্তরবঙ্গ। উত্তরবঙ্গের আর নিম্ন আসামের প্রকৃতি, ঘরবাড়ি, এমনকি কথ্য ভাষাতেও বিশেষ তফাত নেই। পথের দু-পাশেই চষা খেত। মাঝে মাঝে পাট লেগেছে, সর্ষে, শিমুল গাছে ফুল এসেছে গোলাপি ও লাল, বৈষ্ণব ও শাক্তদের পোশাকের রঙের মতন। মাদার গাছে আর অশোক গাছেও ফুল এসেছে বৌদ্ধ ও তিব্বতি লামাদের পোশাকের রঙের। হিন্দিতে এইসব লালকেই মিলিয়ে মিশিয়ে বলে 'ভগুয়া'। অর্থাৎ গেরুয়া। রাগ-রাগিণীর রঙ বিচারে ভাগুয়া চার রকমের হয় : বৈষ্ণব, শাক্ত, বৌদ্ধবাদী ও তিব্বতি লামার পোশাকের রঙ। বেগম আখতার সম্বন্ধে ঋতা গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি লেখা পড়ে এই তত্ত্ব সম্বন্ধে সাম্প্রতিক অতীতে সচেতন হয়েছে চখা।

ভাবছিল চখা যে, চোখে আমরা কত কীই দেখি, কিন্তু ঠাহর করা আর দেখা, দেখার মতন দেখাতে কতই না তফাত। গেরুয়ার এই শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে ও অবশ্যই অবহিত ছিল অবচেতন মনে কিন্তু সচেতন আদৌ ছিল না। দেখার চোখের এই তফাতটুকুতেই একজন মানুষের, বিশেষ করে লেখকের সঙ্গে অন্য মানুষ বা লেখকের পার্থক্য।

তেল নিয়ে গাড়ি স্টার্ট করার পরেই পাইলট একটা মস্ত হাই তুলল।

চখা বলল, ব্যাপারটা কী পাইলট? সিগারেট খাও নাকি? খেলে খাও। আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। তুমি ঘুমিয়ে পড়লে তো আমারই চিরঘুম হয়ে যাবে।

পাইলট সে-কথার উত্তর না দিয়ে বলল, ক্ষুধা লাগছে বড়।

তাই?

অবাক হয়ে বলল চখা।

তারপর বলল, খিদে পেয়েছে তো কিছু খেয়ে নাও।

সকাল ত্ ছ'টার সময় বারাইছিলাম দুগা মুড়ি আর চা খাওনের পর। আপনার প্লেন আইব তিনটায়, ওদিকে এয়ারপোর্টে গাড়ি লইয়া আইস্যা পৌছাইছিলাম প্রায় দুইটায়। খামু কখনে? আর খামুই বা কুথায়?

কেন? এয়ারপোর্টেই তো রেস্তরাঁ ছিল।

কয়েন কী স্যার? সিখানে কি আমাগো মতন মাইনষে খাইবার পারে নাকি? দাম শুইন্যাই ত হার্ট-ফেইল হবার লাগে।

তাহলে, দাঁড়াও এখন, কোথাও ধাবা-টাবাতে। না খেলে, এত পথ গাড়ি চালাবে কী করে? সকলেই অভুক্ত আছ? চমৎকার! টাকাও নেই বুঝি?

থাউক। খাওনের দরকার নাই। অনেকই দেরি হইয়া যাইবনে আপনের।

হলে হবে। দাঁড়াও কোথাও।

ড্রাইভার ও মালিক মুখচাওয়াচাওয়ি করল। চখাকে নিতে-আসা ছেলেটি, যার নাম প্রান্তিক, চাপা হাসি হাসল। তারপর বলল, আপনের দেরি হইয়া গ্যালে শ্যাষে আমাগো গালাইয়েন না য্যান।

চখা হাসল কথা শুনে।

তারপর হেসেই বলল, না, না, গালাইম্যু না তোমাগো। নারে বাবা, না! আমি কিছুই বলব না। তোমাদের সারাদিন অভুক্ত রাখিয়ে কী মহাপাতক হব?

গাড়িটা ধাবাতে দাঁড় করিয়ে চখা ওদের তিনজনকে ভালো করে খাওয়াল। নিজে প্লেনে লাঞ্চ করেছিল বলে চা ছাড়া আর কিছুই খেল না। পাইলটের জন্য সিগারেটও কিনল এক প্যাকেট। চার্মস ছাড়া আর কিছুই ছিল না সেই ধু-ধু প্রান্তরের মাঝের ধাবা-সংলগ্ন দোকানে।

খাওয়াদাওয়া শেষ হতে হতে অন্ধকার হয়ে গেল প্রায়। একঝাঁক কমোন ইগ্রেট গেরুয়া আকাশের পটভূমিতে উড়ে যাচ্ছিল ঘনসন্নিবিষ্ট বাঁশঝাড়ের উপর দিয়ে।

কলকাতা কী যে দরিদ্র! একটা বাঁশঝাড় পর্যন্ত নেই সেখানে। ফাগুন-চৈত্রের হাওয়ায় পর্ণমোচী বনে পাতা-খসার মিষ্টি মুচমুচে আওয়াজটুকু পর্যন্ত শোনা যায় না। হাওয়া সেখানে জমাদারের মতন ঝাঁট দিয়ে নিয়ে যায় না গা-শিরশির করা শব্দে সেই পাতার রাশকে।

কলকাতা ছেড়ে বাইরে এলেই কলকাতার বহুতল বাড়িময় ইট-কংক্রিট আর পিচ-এর কদর্যতা যেন বেশি করে প্রতিভাত হয় ওর কাছে। কলকাতার প্রশ্বাসে বিষ। আওয়াজে কানের সমস্ত কোমল পর্দাগুলি ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। মনে হয় চখা বোধহয় আর কোনোদিন কড়িমা বা কোমল রেখাবের মাধুর্যে মুগ্ধ হতে পারবে না। বাড়ির পাশের মারোয়াড়িদের বহু কোটি টাকা খরচ করে তৈরি মন্দিরে ঘ্যাসঘেসে গলায় গগননিনাদী ভজন হয় রোজ সন্ধেতে অ্যাম্পলিফায়ারে। শুনতেই হয়। বাধ্যতামূলকভাবে ভোর চারটেতে বিজাতীয় ভাষাতে 'অ্যাম্পলিফায়ারে' শোনা ঘুমভাঙানো আজানের আওয়াজেরই মতন। খালি গলাতে শোনা ভজন অথবা আজান দুই-ই কিন্তু সুন্দর।

তার বাড়ির পাশের মন্দিরের পণ্ডিত পুরোহিতদের গলাতেও তেমন লালিত্য বলতে কিছুমাত্রই নেই। মাঝে মাঝেই একথা ভেবে মনে মনে হাসে চখা যে, দেবী লক্ষ্মী এবং দেবতা গণেশ দু-হাত উপুড় করে মারোয়াড়িদের সবকিছুই ঢেলে দিয়েছেন বটে সরস্বতীও হয়তো কিছু দিয়েছেন তাদের কারও কারোকে কিন্তু তাদের গলাতে সুর একটুও তো দেননি। যুগ-যুগান্তর ধরে শেয়ার বাজারে চাল-ডাল আলুপটলের দরদাম করে করে তাদের গলাগুলি বোধহয় চিরতরে চিরেই গেছে। দু-হাতে তাদের সবকিছু অঢেল দেওয়া সত্ত্বেও ন্যূনতম সুরজ্ঞান থেকে বঞ্চিত করেছেন মা সরস্বতী, লক্ষ্মী এবং গণেশের পর্যাপ্ত ও বেহিসাবি দানের সঙ্গে সমতা রাখতেই বোধহয়।

পাইলট, প্রান্তিক এবং গাড়ির মালিক খাওয়াদাওয়া করার পর যখন গাড়ি ছাড়ল আবার, তখন প্রায় অন্ধকার হয়ে গেছিল। ধাবার হাতাতে যে মস্ত সজনেগাছটা থেকে ফিনফিনে 'ক্ষুদে' 'ক্ষুদে' পাতা ঝরছিল ফাগুনের শেষ বিকেলের হাওয়াতে বসন্তের আগমনী গানের বাণী বহন করে, সেই পাতাগুলোকে এখন দেখা যাবে না। হেড-লাইটের আলো সামনে যতদূর যায় তাতে ক্ষতবিক্ষত পিচ রাস্তার আর নিচের পথ পাশের পাটকিলে-রঙা ধুলোর ডাঙা আর ড্যাশবোর্ডের নানা মিটারের লাল-সবুজ আলোগুলো ছাড়া পৃথিবী সম্পূর্ণই মসীলিপ্ত।

কলকাতা থেকে গরম স্যুট পরে এসে এতক্ষণ অস্তিত্ব বোধ করছিল কিন্তু এখন আরামই বোধ

করছে। পায়জামা-পাঞ্জাবি পরেই আসত কিন্তু মনু বলল, উত্তরবঙ্গে এখন দারুণ ঠান্ডা, তার কোন এক ছাত্রী নাকি শিলিগুড়ি থেকে ফোন করেছিল। কিন্তু বাগডোগরাতে নেমেই বুঝতে পেরেছিল যে মনুর ছাত্রীর সাবধানবাণী মিথ্যে BOMBSCARE-এর মতনই একটি HOAX। কিন্তু তখন কী আর করা যাবে। কোট-টাই না-হয় খুলে ফেলতে পারত কিন্তু পেন্টুলুন তো আর খুলতে পারত না।

এখন চুপচাপ। বাইরে এবং গাড়ির ভিতরেও। স্প্রিং-এর সংকোচন-প্রসারণ ক্ষমতা বলতে গাড়িটার পেছনের সিটের স্প্রিং-এর কিছুমাত্রই নেই। চখার মনে হচ্ছে শালকাঠের তক্তার ওপরে বসেই চলেছে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে। রাস্তা যতই খারাপতরো হচ্ছে ততই ঘনঘন বিনা-নোটিসের HUMP আসছে আর মনে হচ্ছে তার টেইল-বোন গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল।

তবে এইসব অসুবিধে, সামনের মোড়ে গিয়ে পাইলট কোন পথ ধরবে, কোন দিকে গেলে পথ অপেক্ষাকৃত ভালো পাবে এবং দূরত্বও কম হবে, এইসব আলোচনাতে যখন ওর সহযাত্রীরা ব্যস্ত তখন চখা বহুযুগ আগে শেষবার যাওয়া ধুবড়ি-তামাহাটের স্মৃতিতে বিভোর হয়ে গেল।

অতীতের স্মৃতিমাত্রই মধুর। তিক্ততা যদি কিছুমাত্র থেকেও থাকে, সময়, বনমধ্যের ঝরনাতলায় ঝুড়িতে করে রেখে-দেওয়া বনফুল, খাম-আলুর তিক্ততারই মতন তা অবলীলায় ধুয়ে দিয়ে যায়। সময়ের মতন দুঃখহারী এবং তিক্ততাহারী উপাদান আর কিছুই নেই। কিছু মানুষ অবশ্য সংসারে চিরদিনই থাকেন যাঁরা তিক্ততাকে জিইয়ে রাখতে ভালোবাসেন, কোনো সৌন্দর্যের, কোনো মাধুর্যের সঙ্গেই তাঁদের সহবাস নেই। সেইসব মন্দভাগ্য নষ্ট মানুষদের কথা স্বতন্ত্র।

অনেকই বছর আগে ব্রহ্মপুত্রের তীরের যে ধুবড়ি শহরকে দেখেছিল, এতদিনে তার বোধহয় আমূল বদল হয়ে গেছে। ভাবছিল চখা। নেতা-ধোপানির ঘাট, ম্যাচ-ফ্যাক্টরি, উইমকো কোম্পানির, স্টিমারঘাট, ছাতিয়ানতলাতে তার পিসেমশাই-এর দাদা পূর্ণ পিসেমশাই-এর নদীপারের বাড়ি। পিসেমশাই-এর দাদাদের মধ্যে একমাত্র পূর্ণ পিসেমশাই-এর গায়ের রঙই ছিল ফর্সা। ঝন্টুরা সবাই ওঁকে ডাকত ধলাকাকা বলে। তাঁর দাদা সুরেন মিত্র। তাঁদের একজনের আট মেয়ে এক ছেলে, অন্য জনের আট ছেলে এক মেয়ে। তখনকার দিনে অধিকাংশ মধ্যবিত্ত পরিবারেই আট-দশ সন্তান স্বাভাবিক ছিল।

তামাহাট থেকে ধুবড়ি যেতে গৌরীপুর পড়ত পথে। কুমারগঞ্জ। কুমারগঞ্জের প্রায় উলটোদিকে আলোকঝারি, রাঙামাটি পাহাড়, পর্বতজুয়ার।

আলোকঝারি নামটি উচ্চারিত হলেই যেন মনের চোখের সামনে অদেখা ঝরনার এক চিত্রগল্প ফুটে উঠত। আলোকঝারি পাহাড়ে প্রতি বছরই সাতই বোশেখে সাতবোশেখির মেলা বসত। এই নিম্ন আসামের বৈশাখ মাসের বন-পাহাড়ের রূপের কথা ভাবলে চখা এখনও আচ্ছন্ন বোধ করে। পর্ণমোচী গাছেদের পত্রশূন্য ডালে ডালে বসন্তের শিমুলগাছের ফুলের মতন সোনালি লাল মুরগি ফুটে থাকত। কালো প্রস্তরাকীর্ণ পাহাড়ি ঝরনার শুকনো সাদা বুকে কবুতর বলি দিয়ে ডিঙ্গডিঙ্গার মরনাই চা-বাগানের সাঁওতাল কুলি-কামিনেরা বনদেওতাকে পুজো দিত। গোঁসাইগঞ্জ, ফকিরাগাঁও, মটরঝাড়, গোলোকগঞ্জ, গৌরীপুর, বক্সির হাট, ডিঙ্গডিঙ্গা এবং তামাহাট থেকে তো অবশ্যই, মেয়ে-পুরুষ গোরুর গাড়িতে করে পাহাড়ি পথ বেয়ে এই জঙ্গলের গভীরের মেলাতে আসতেন। পেছন পেছন আসত সাদা কালো বাদামি গৃহপালিত কুকুরেরা।

মেলা ভাঙতে ভাঙতে রাত নামত। প্রজাপতি উড়ত নানা-রঙা। ঝাঁকে ঝাঁকে। কোনো কিশোরীর গায়ে বসলে অন্যরা চেঁচিয়ে উঠত, 'এবার তর বিয়া হইব রে।'

বিয়ে ব্যাপারটা যে কী তা না জেনেই উত্তেজনা আর লজ্জাতে সেই কিশোরীর গাল আর কান লাল হয়ে যেত।

শুক্লপক্ষের ফুটফুটে জ্যোৎস্না মাড়িয়ে, চাকায় চাকায়, পায়ে পায়ে আমাদের এই বড় সুন্দর দেশের মিষ্টি-গন্ধ উড়িয়ে বলদেরা গাড়িগুলো টেনে ফিরে যেত যার যার গন্তব্য। ঐ ডাইনি জ্যোৎস্নায় যেন ছাইওয়ালা গাড়িগুলো ভেসে ভেসে চলত। বলদদের পাগুলো যেন শূন্যেই পড়ত মনে হত।

মরনাই চা-বাগানের ম্যানেজারের, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের, ইঞ্জিনিয়ারের স্ত্রী ও মেয়েরা চাঁদের বনে 'আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে' কোরাসে গাইতে গাইতে হেলা-দোলা গোরুর গাড়ির ছইয়ের নিচে পোয়ালের উপরে শতরঞ্চি বিছোনো নরম গদিতে বসে বাড়ি ফিরতেন। গোরুর গাড়ির মাথার উপরে ধরধবে সাদা লক্ষ্মী প্যাঁচা ঘুরে ঘুরে উড়তে উড়তে কিছু পথ গিয়ে চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে-ওঠা পর্ণমোচী বনের গভীরে অদৃশ্য হয়ে যেত।

মেয়েরা কলকল করে উঠত, 'দেখেছি।'

কেউ বলতে, 'ইসস্, আমি দেখতে পেলাম না যে!'

এইসব ভাবতে ভাবতে ঘোর লেগে গেছিল চখার। কত যে ছবির পরে ছবি, একের পর এক মনের পর্দাতে ফুটে উঠেই আবার মিলিয়ে যাচ্ছিল।

গৌরীপুরের বড়ুয়া রাজারা ছিলেন বিখ্যাত। প্রমথেশ বড়ুয়া সেই পরিবারের। তাঁর ছোট ভাই প্রকৃতীশচন্দ্র বড়ুয়া, ডাকনাম লালজী, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ হাতি-বিশেষজ্ঞদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। শোনপুরের মেলাতে যেবারে উনি যেতেন, লালজীকে না দেখিয়ে কেউই হাতি কিনতেন না। হাতির মুখ-চোখ, দাঁত, পায়ের নখ, শুঁড়, লেজ দেখে, আগেকার দিনের শাশুড়ি ঠাকরুণরা যেমন করে পুত্রবধূ নির্বাচন করতেন, প্রায় সেই প্রক্রিয়াতেই হাতি নির্বাচন করে দিতেন চেনা-জানা হাতির খরিদ্দারদের।

সকলেই তাঁকে বলতেন "রাজা" অথবা "বাবা"। যৌবনে অত্যন্ত ভালো শিকারিও ছিলেন তিনি। পরবর্তী জীবনে শিকার আর করতেন না। খেদা করে হাতি ধরতেন। শেষ জীবনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুরোধে তিস্তা উপত্যকায়, ডুয়ার্সের বিভিন্ন জায়গাতে ক্যাম্প করে থাকতেন তাঁর নিজের শিক্ষিত মস্ত এক 'গণেশ' এবং এক কুনকি নিয়ে। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগে গোরুমারার অভয়ারণ্যের কাছের মূর্তী নদীর বিট-অফিসারের বাংলোতে তাঁর সঙ্গে শেষবার দেখা হয়েছিল চখার। ভারী জিন্দা-দিল, রসিক এবং মন-মৌজী মানুষ ছিলেন তিনি। চোদ্দোটি ভাষা জানতেন।

বড়ুয়া পরিবারের SUMMER PALACE ছিল মাটিয়াবাগ। গৌরীপুরেই। একটি টিলার উপরে। মাটিয়াবাগ প্যালেসেরই সামনে প্রমথেশ এবং লালজীর প্রিয় হাতি প্রতাপ সিং-এর কবর আছে। ANTHRAX রোগে মারা গেছিল প্রতাপ সিং। আগের প্রজন্মের যেসব মানুষ প্রমথেশ বড়ুয়ার 'মুক্তি' ছবিটি দেখেছিলেন, তাঁরা জানেন প্রমথেশ বড়ুয়া, অমর মল্লিক, কাননবালা, পঙ্কজকুমার মল্লিক ছিলেন সেই ছবিতে। কাননদেবী ও পঙ্কজবাবুর গানও ছিল—"দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা পরা ঐ ছায়া।" তখন নায়ক-নায়িকারা নিজেরাই গাইতেন। তাঁরা সেই ছবিতে জং বাহাদুর হাতিকেও অবশ্যই দেখে থাকবেন। ঐ পাহাড়ের মতন হাতিটিই প্রতাপ সিং।

গৌরীপুরে চৈত্র-সংক্রান্তির দিনে রাণু-বৌদির হাতে বানানো কাঁচা আমপোড়া শরবত খেয়েছিল চখা, কাগজি-লেবু গাছের পাতা ও পোড়া শুকনো লংকা দেওয়া। আহা। সেই স্বাদ যেন মুখে লেগে আছে। অথচ রাণু-বৌদি যে কার স্ত্রী, তাঁদের বাড়িটা যে গৌরীপুরের ঠিক কোথায় ছিল এবং কার সঙ্গে যে গেছিল সেখানে ও, সে-কথাটাই আজ আর মনে নেই। কিন্তু চমৎকার ফিগারের কুচকুচে কালো অসাধারণ দুটি চোখসম্পন্ন কাল-কেঁউটের মতন এক বিনুনি করা একটি সাদা ব্লাউজের সঙ্গে সাদা-কালো খড়কে ডুরে শাড়ি-পরা, এবং গলাতে মটর-মালা পরা রাণু-বৌদিকে চখা আজও এক হাজার নারীর মধ্যে থেকে খুঁজে বের করতে পারবে। সুযোগ পেলে।

হাতঘড়িটা দেশলাই জ্বেলে দেখে প্রান্তিক স্বগতোক্তি করল, তামাহাটে পৌঁছাইতে পৌঁছাইতে নয়টা বাজব অনে।

কইস কী তুই!

গাড়ির মালিক বললেন।

তার আগেই পৌঁছাইয়া যামুনে।

তর মাথাডা গ্যাছে এক্কেরে। এখনও ত কুচবিহারই আস্যে নাই।

তাই ত! আমি ঘুমাইয়া পড়ছিলাম। খাওয়াডা একটু বেশি হইয়া গেছিল শ্যাষ বেলায়।

তারপরই বলল, তবে আর কি। কমপক্ষে এগারোটা বাজব।

ঘোর ভেঙে, সুন্দর স্বপ্ন-রাজ্য ছেড়ে চখা বলল, বলেন কী ? আমার আশি বছরের বৃদ্ধা পিসিমা অপেক্ষা করে থাকবেন আমার জন্যে। আরও অনেকেই। এগারোটা তো গ্রাম-গঞ্জে অনেকই রাত।

হে ত ঠিকই কথা।

তবে?

কী করন যাইব কয়েন। আপনে ট্রেনে আইলে সকালে নিউ কুচবিহারে নাইম্যা ভাত খাওনের আগেই তামাহাট পৌঁছাইয়া যাইতে পারতেন।

হ। তরে কইছে!

পাইলট বলল।

ক্যান?

কুন গ্যারান্টিডা আছে টেরেনের? কাইলই ত আট ঘণ্টা ল্যাট আসছে।

আট ঘণ্টা! কইস কী তুই! ওরে ফফাদার!

ঠিকই কইতাছি।

চখা বলল, কী প্রান্তিক? পথের বাঁ দিকে যে শ'য়ে শ'য়ে ট্রাক দাঁড়ানো লাইন করে। ব্যাপারটা কী?

বর্ডার না! বাংলাদ্যাশে যাইব ঐসব ট্রাকগুলান। তাই খাড়াইয়া আছে। শ'য়ে শ'য়ে কী কন স্যার, হাজারেরও বেশি হইব।

তাহলে এদিক দিয়ে এলে কেন?

রাস্তাডা ভালো। হেইর লইগ্যা। অন্য রাস্তাত্ গ্যালে আপনার পিছনের হাড্ডিগুলান একখানও আস্ত থাকনের কথা আছিল না।

চখা বিরক্ত গলাতে বলল, যেন এই রাস্তাতে এসেও আস্ত আছে! একে সরু রাস্তা; তায় একটা পাশ তো ট্রাকের লাইনেই ভর্তি, বাকি পথ দিয়ে কি আপ-ডাউনের ট্রাক-বাস চলতে পারে?

সে আর কী হইব। আমাগো আসামের কথাডা ভাবে কেডায়? উলফাদের মতন আমাগোও একটা দল করন লাগব। অনুনয়, বিনয়, কোর্ট-কাছারি কইর‌্যা, ভোট দিয়া কিসস্যুই হইল না। হে মাও ডে জং-এ কইছিল না? সমস্ত শক্তির উৎসই হইতাছে বন্দুকের নল। ঠিকোই কথা!

চখা মুখে চুপ করে থাকলেও মনে মনে ভাবল যে, কথাটা বোধহয় ঠিকই। কোনো ব্যাপারেই আর কিছুতেই কিছু হবার নয়। দেশের সামনে বড়ই দুর্দিন।

তারপর নিজের হাতঘড়ির রেডিয়াম-দেওয়া কাঁটার দিকে চেয়ে ভাবল, এখন মোটে সাতটা। বাগডোগরা থেকে চার ঘণ্টা হল বেরিয়েছে। আরও চার ঘণ্টা।

আবারও চোখ বন্ধ করে চখা বহুবছর পেছনে ফিরে গেল।

গঞ্জের নাম তামাহাট তামা নদীরই জন্যে। নদীটা হেজে-মজে গেছে অনেক দিন হল। এসে

পড়েছে গঙ্গাধরে। গঙ্গাধর নদী আসলে সংকোশ। ভুটানের হিমালয় থেকে বেরিয়েছে। ভুটান, আসাম আর পশ্চিমবঙ্গের সীমানাতে যমদুয়ার বলে একটা জায়গা আছে। চখা গেছিলও সেখানে একবার পিসেমশাই আর রতু জেঠুর সঙ্গে রতু জেঠুর টি মডেল ফোর্ড গাড়ি চড়ে। কী নিশ্ছিদ্র বন! কী সব শাল গাছ! পাঁচ-সাত জন প্রমাণ সাইজের মানুষও বেড় দিতে পারবে না তাদের গুঁড়ির—দুহাত প্রসারিত করেও। এমনই মোটা গুঁড়ি। প্রথম শাখাই বেরিয়েছে পাঁচ-ছ'হাত বা আরও উপর থেকে। দোতলা কাঠের বাংলো ছিল বনবিভাগের। উত্তর বাংলা ও আসামের বন-বাংলোই দোতলা। হাতিরই কারণে।

যমদুয়ার-এর বন-বাংলোর সামনে দিয়ে বয়ে গেছে সংকোশ নদী। মানাস অভয়ারণ্যর মানাস নদীর মতন অত বড় আর সুন্দর না হলেও সংকোশ রূপসী অবশ্যই। আর কোন জানোয়ার ছিল না সেখানে! হাতি, বাঘ, বুনো মোষ, চিতা, হরিণ, কতরকমের পাখি। 'ঘরেয়া' নামের একরকমের মাছ পাওয়া যেত এই নদীতে। নাকি শুধুমাত্র এই নদীতেই! ছোট মাছ। মানে, খুব বড় হলে সোয়া কেজি মতন। কালো রঙ। কিন্তু কী তেল তাতে! অমন স্বাদু মাছ বড় একটা খায়নি চখা। ধুবড়িতে ব্রহ্মপুত্রের চিতল আর মহাশোলও খেয়েছে। কী পেটি! আধ হাত চওড়া। আর মুইঠ্যাও।

ভুটান থেকে তখন শীতকালে কমলালেবু আসত ঝুড়ি ঝুড়ি। তখন তো সর্বত্রই পথ আর যানবাহন মানুষের অগ্রগতির নামে তার শান্তিকে এমন বিঘ্নিত করেনি। কমলালেবু ঝুড়িতে করে নিয়ে আসত ভুটানি মেয়েরা। তারপর গোরুর গাড়িতে করে আসত তামাহাটে। তামাহাটে কী না পাওয়া যেত তখন!

গঙ্গাধর নদী গিয়ে পড়েছে বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জে। সেখানে অন্য নাম হয়েছে কিনা বলতে পারব না। সিরাজগঞ্জ থেকে দেশভাগের আগে বড় বড় মহাজনি নৌকা করে পাট আসত। পাটের জন্যেই তামাহাটের রমরমা ছিল। প্রায় প্রত্যেক বাড়ির বার-বাড়িতে একটি করে গদিঘর, তার পেছনে গুদামঘর, তারও পরে নিভৃতিতে ভিতর-বাড়ি। অর্থাৎ অন্দরমহল। পাট কাচা হয়ে গেলে পাট গাঁট বেঁধে তোলা থাকত গদিঘরে। ব্লন্ড, ব্রুনেট, কতরকমের মেমসাহেবদের চুলের মতন সেইসব পাটের রঙ ছিল। মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ বেরোত। গুদামঘরের পাশ দিয়ে যাতায়াতের সময়ে ঐ গন্ধ নাকে আসতই।

অনেক উদবেড়াল ছিল গঙ্গাধর নদীতে। কড়িদা আর আবু ছাত্তারের সঙ্গে চখা শিকারে যেত চখা চক্রবর্তী, পূর্ণ জেঠার বন্দুক নিয়ে? আর সারা দুপুর উদবেড়ালদের খেলা দেখত। নদীর পাড়-এর অনেক উপর থেকে জলে ঝাঁপ দিত তারা তাদের পাড়ের বালির মধ্যের বাসা থেকে। তারপর কখনও মুখে মাছ নিয়ে, কখনও-বা খালি মুখে আশ্চর্য ক্ষিপ্রতাতে জল ছেড়ে ভিজে, মসৃণ চকচকে শরীর নিয়ে উঠে যেত তাদের ঘরের দিকে খাড়া পাড় বেয়ে।

সোনালি চখা-চখী ডাকত গম্ভীর স্বরে লম্বা গলা তুলে কোঁয়াক কোঁয়াক করে নিস্তব্ধ দুপুরে। জলের উপরে তাদের ডাক দৌড়ে যেত অনেকদূর। বালির সঙ্গে হাওয়া খেলা করত সহস্র হাতে। বালুবেলাতে শিশুরা যেমন খেলে। বালির উপরে কত কী গড়ে তুলতে সেই সৃজনশীল এবং খামখেয়ালি হাওয়া। পরমুহূর্তে ভেঙেও ফেলত। কত আঁকিবুকি, ডিজাইন বালির উপরে। শুশুক ভেসে উঠত নৌকার পাশে হুসস করে। জলের ফোয়ারা তুলে শ্বাস নিয়ে আবার ডুবে যেত। নানা-রঙা মাছরাঙারা যেন কী সর্বনাশ হল তাদের, এমন করে বুকে চমক-তোলা ডাক ডেকে জলের সাদা, বালির সাদা, রোদের হলুদ এবং তাদের রঙ্গিবিরঙ্গি কর্বুর ডানাতে রঙ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে একাকার করে দিত। মাঝিরা দাঁড় ফেলত আর দাঁড় ওঠাত। ছপছপ শব্দ হত বিলম্বিত লয়ে। একই ছন্দে। ক্যাঁচোর-ক্যাঁচোর শব্দের পরেই একবার ঘটাং করে শব্দ হত। ঠোকাঠুকি হত নৌকার সঙ্গে দাঁড়ের কাঠের। বুড়ো মাঝি দু-হাতে হুঁকো ধরে বসে থাকত হাল পা দিয়ে ধরে। নৌকা চলত কোনো বিশেষ গন্তব্যহীন জলপথে, শীতের মিষ্টি দুপুরে।

কী নিস্তরঙ্গ, শ্লথগতি, লোভ আর জাগতিক উচ্চাশাহীন ছিল সেইসব দিন। মানুষ বড়লোক ছিল না, কিন্তু সুখী ছিল। কত সামান্যতেই যে পরম সুখে হেসে-খেলে একটি জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়, তখন তা জানত গ্রাম-গঞ্জের মানুষ, তামাহাটের, ডিঙ্গডিঙ্গার, কুমারগঞ্জের, পাগলাহাটের, গৌরীপুরের এবং ধুবড়িরও। সত্যিই জানত।

টি.ভি. ছিল না, লাগাতার বিজ্ঞাপন সব মানুষেরই মনে হাজারো মিথ্যা প্রয়োজনের বোধ জন্মে দিয়ে তার মনের শান্তি এমন করে পুরোপুরি নষ্ট করেনি। আত্মীয় বা প্রতিবেশীর ভালোতে তখন মানুষ খুশি হত, মানুষের মধ্যে ন্যায়-অন্যায় ভালো-মন্দর বোধ ছিল। ঈশ্বর নামক কোনো এক আপাত-অলীক শক্তির অস্তিত্ব তাদের প্রত্যেককেই সততা এবং ন্যায়ের পথে চালিত করত।

কে জানে! অনেকগুলো বছর পরে তামাহাটে, ডিঙ্গডিঙ্গায়, কুমারগঞ্জে, গৌরীপুরে অথবা ধুবড়িতে গিয়ে কী দেখবে চখা?

ধুবড়ির বইমেলা উদ্বোধন করতে এসে ও কি ভুল করল?

ভাবছিল ও।

৩

ঘুম ভাঙল হাঁসা-হাঁসির প্যাঁকপ্যাঁকানিতে। কানের কাছে যেন তাদের নিশ্বাসও শুনতে পেল চখা। কত যুগ পরে।

মনে পড়ে গেল, সে নিজে যখন শিশু ছিল এবং রংপুরের পাঠশালাতে পড়ত, সেই সব দিনে ঘরের টিনের দেওয়ালের ফুটো-ফাটা দিয়ে সকালের আলোর রেশ আসামাত্রই চখা ঘরের দরজা খুলে দৌড়ে গিয়ে হাঁসেদের ঘরের দরজা খুলে দিত। তারপর চোখ-মুখ না ধুয়েই হাঁসেদের পেছন পেছন হরিসভার পুকুর অবধি দৌড়ে যেত।

হাঁসেদের মতন সমস্ত শরীরে আন্দোলন তুলে কোনো পাখি বা প্রাণীই চলে না। তাদের দুই পা, পেট, পিঠ, বুক, গলা, ঠোঁট সবই যেন ওদের হেলতে-দুলতে দৌড়ে যাওয়াতে পুরোপুরি শামিল হয়ে যায়।

হরিসভার পুকুরপাড়ে পৌঁছে ওরা যখন এক এক করে উড়ে গিয়ে পুকুরের মধ্যে ঝপাং ঝপাং করে পড়ত চারদিকে জল-উপছিয়ে দিয়ে, তখন ভারী মজা পেত চখা। জলের গন্ধ, পুকুরের চারপাশ থেকে ঝুঁকে পড়ে পুকুরে মুখ-দেখা নানান গাছ-গাছালির গায়ের প্রভাতি গন্ধ, শিশিরের গন্ধ, শামুক আর টাকা-কেন্নোর গায়ের গন্ধ, ঘাসফুলের গন্ধ, হাঁসেদের গায়ের আঁশটে গন্ধর সঙ্গে মাখামাখি হয়ে যেত তখন। মুগ্ধ চোখে, মুগ্ধ কানে এবং মুগ্ধ নাকে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকত চখা হাঁসেদের দিকে চেয়ে।

হাঁসেরা মাটির উপরে দৌড়ে যাওয়ার সময়ে তাদের দৌড়ের রকম এক আর তারা যখন জলে চলে তখন একেবারেই অন্য। হিরে যেমন করে কাচ কাটে, হাঁসও তেমন করে জলের নিস্তরঙ্গ কাচ কেটে দু-টুকরো করে। তাদের দু-পাশে দুটি ঢেউ উঠে ক্রমশই ছড়িয়ে যেতে থাকে পেছনে আর তারা নিষ্কম্প শরীরে গ্রীবা তুলে যেন মন্ত্রবলে অবহেলে এগিয়ে যায় জলের মধ্যে। তাদের শরীর দেখে বোঝা পর্যন্ত যায় না যে, তাদের পা দুটি জলের নিচে আন্দোলিত হচ্ছে। তাদের সাঁতার কেটে এগিয়ে যাওয়া দেখে ছেলেবেলা থেকে 'অবলীলায়' শব্দটির মানে প্রাঞ্জল হয়েছে চখার কাছে।

পিসিমা ঘরে এলেন।

বললেন, এলি কখন কাল? আমি তো ঘুমিয়েই পড়েছিলাম।

ভালোই করেছিলেন। এগারোটাতে।

রাতে খেলি কী?

কিছুই খাইনি। ঝন্টু আর কসমিক এবং ঝন্টুর শালা শক্তি আর শালাজ দেবীও অনেক সাধাসাধি করেছিল। কিন্তু অত রাতে কিছু খেতে ইচ্ছে করেনি।

পিসিমাকে আর বলল না যে, কুচবিহার শহরে একবার থেমেছিল পথে পাঁচ মিনিটের জন্যে। চখার প্রথম যৌবনের প্রিয়পাত্রী শেলী যে শহরে থাকে। যাকে সে শেষবার দেখেছিল অনেকই বছর আগে এবং যাকে এ-জীবনে আর কখনও দেখতে চায় না। দেখতে এইজন্যেই চায় না যে, মনের চোখে ও মস্তিষ্কের মধ্যে গন্ধরাজ আর রঙ্গনের ঝড়ের সামনে দাঁড়িয়ে-থাকা বারো বছরের ছিপছিপে, কালো, লজ্জারাঙা শেলীর স্থিরচিত্রটি অস্থির হয়ে যাবে যে শুধু তাই নয়, ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। টুকরো হয়ে গেলে আজকের কোনো অ্যারলডাইট দিয়েই সেই ছবিকে যে আর জোড়া দেওয়া যাবে না। তাই।

অনেক কষ্ট থাকে, যা গভীর আনন্দর উৎস হয়ে আজীবন কোনো মানুষের বুকের মধ্যে ম্যাগনোলিয়া গ্রান্ডিফ্লোরার ঝাড় হয়ে ফুটে থাকে।

না। কুচবিহার শহরে থেমেছিল কিছু খাবার জন্যে নয়। দীর্ঘ যাত্রার শারীরিক ক্লান্তি, অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষাজনিত এবং তামাহাটে অনেকই বছর পরে প্রত্যাগমনের উত্তেজনাতে অস্থির হয়ে একটি রয়্যাল-চ্যালেঞ্জের বোতল কিনে মিনারেল ওয়াটারের বোতলে মিশিয়ে খেতে খেতে এসেছিল পথে, নিজেকে উজ্জীবিত করার জন্যে। সঙ্গীদেরও দিয়েছিল। স্বার্থপর নয় সে। তাছাড়া এক যাত্রায় পৃথক ফলে বিশ্বাসও করেনি কোনোদিন।

রাতে বেশ ঠান্ডা ছিল। লেপ গায়ে শুয়ে বেশ আরামই লেগেছিল।

দু-কাপ চা খাওয়ার পরে বিছানাতে শুয়ে একটু আলসেমি করল।

শুনতে পেল, পাকঘরের বারান্দাতে কলকণ্ঠের কনফারেন্স বসেছে, কী দিয়ে এবং কেমন করে চখার এত বছর পরে তামাহাটে আসাটাকে খাওয়ার মাধ্যমে স্মরণীয় করে রাখা যায়?

পিসিমা বললেন, ফেনাভাত খাবি তো?

চখার মনে পড়ে গেল রংপুরে তো ব্রেকফাস্ট বলতে ফেনাভাতই বোঝাত। নিজেদের খেতের চালের সুগন্ধি ভাত। নানা তরকারি সেদ্ধ দিয়ে আর হাঁসের ডিম সেদ্ধ। কলকাতাতে চাইলেও ফেনাভাত এখন পাই কোথায়? কলকাতা তো এখন অ্যামেরিকা হয়ে গেছে। ব্রেকফাস্ট মানেই সিরিয়ালস আর ফ্যাট-ফ্রি স্কিমড-মিল্ক। সেই সিরিয়ালস-এর মধ্যে আবার মুড়ি-চিঁড়ে পড়ে না। দুর্মূল্য প্যাক-এ বিদেশি কোলাবরেশানে তৈরি হওয়া নামী-দামি কোম্পানির সিরিয়ালস। গরম দুধে খই কী মুড়ি বা চিঁড়ে-কলা দিয়ে মেখে খাওয়ার গভীর দিশি আনন্দ থেকে অধুনা কলকাতার ইংরেজ-তাড়ানোর পরে সাহেব-হওয়া বাঙালিরা পুরোপুরিই বঞ্চিত হয়েছে।

চখা বলল, তাই খাব। ফেনাভাত।

তারপর চান করে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিল। বাথরুমে বালতি করে গরম জল দিয়েছিল ঝন্টুর ভার্সেটাইল বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ড্রাইভার পান্ডে।

চখা তামাহাটে আসবে আসবে বলে ভয় দেখাচ্ছিল বহুবছর হল, তাই ঝন্টু বছর পাঁচেক আগেই একটি বাথরুমে কমোড লাগিয়েছিল। যদিও কোনো প্রয়োজন ছিল না তার।

অনেক সাহেব-সুবোর সঙ্গে অদ্যাবধি মিশেও চখা এখনও আদৌ সাহেব হয়ে উঠতে পারেনি। কলকাতার প্রচুর পাতি-বাঙালিদের সাহেব হয়ে ওঠার চেষ্টাতে নিরন্তর প্রাণপণ দাঁত-কড়মড়

প্রতিযোগিতাতে লিপ্ত দেখে নিজে সাহেব হওয়ার বিন্দুমাত্র বাসনাই আর পোষণ করে না ও। কারণ ও জানে, পাতিহাঁসেরা পাতিহাঁসই থাকে। কখনোই রাজহাঁস হয়ে ওঠে না তারা।

সকলে রোদে পাশাপাশি বসে বাড়ির গোরুর গাওয়া-ঘি দিয়ে পালংশাক, সিম ও আলুসেদ্ধ দেওয়া ফেনাভাত, গোটা চারেক হাঁসের ডিম সেদ্ধ দিয়ে জম্পেস করে সকালের খাওয়া সারার পরে ঝন্টু বলল, চলো চখাদা, কোথায় যাবে? বিকেলে তো আবার ধুবড়ি থেকে বর নিতে আসবেন ওঁরা। সাতটার সময়ে।

ওঁরা মানে?

'সবুজের আসরের' উদ্যোক্তারা—যাঁরা প্রথম বইমেলা করছেন। তুমি তো তাঁদেরই নিমন্ত্রণে আর খরচে এসেছ। না কি?

আর কাকে কাকে বলেছেন ওঁরা? মানে, কবি-সাহিত্যিক?

চখা জিজ্ঞেস করল।

ঝন্টু বলল, শুনেছিলাম অমিয়ভূষণ মজুমদারকে বলেছিলেন। তবে তিনি নাকি শারীরিক কারণে আসতে পারছেন না। নিমাই ভট্টাচার্যকেও নাকি বলেছেন।

তুই, জানলি কী করে?

ধুবড়ির ছাতিয়ানতলার বাড়িতে ফোন করেছিলাম। আমার জ্যাঠতুতো ভাই রাজার স্ত্রী রুবী বলল।

করে কী রাজা?

স্টেট ব্যাঙ্কে কাজ করে।

বাবাঃ। রাজারও বউ। কত ছোট ছিল।

তা কী হবে। রাজারই যদি রানি না থাকে তো, থাকবে কার?

ঝন্টু বলল।

তা ঠিক।

চখা বলল।

চখা তারপরে বলল, এইরকম স্ট্র্যাটেজিক ভুল কেউ করে। ধুবড়ির "সবুজের আসরের" কর্তাদের যদি বুদ্ধি থাকত তবে আমার আর নিমাইদার মতন ফালতু লেখককে ওঁরা নেমন্তন্ন করতেন না।

'ফালতু' বলছ কেন?

বড় কাগজে যাঁরা চাকরি না করেন বা যাঁরা তাঁদের পেটোয়া নন, সেই সব লেখক, গায়ক শিল্পী, খেলোয়াড় সকলেই তো ফালতু।

তাই কি হয় নাকি?

এমন সময় দাতু, চানু আর চোগা এসে হাজির। দাতু বলল, মায়ে পাঠাইয়া দিল, আমাগো বাসায় চলো আগে।

চল। নিশ্চয়ই যাব।

চখা বলল।

দাতু, বৈদ্যকাকুর ছেলে। বৈদ্য দত্ত। মাতৃপিতৃহীন স্বল্পবিত্ত সদাহাস্যময় পুরুষ ছিলেন। পরোপকারী, দাবিদাওয়াহীন। শত অপমানেও নিরুত্তর। এক আশ্চর্য চরিত্র ছিলেন তিনি। কুচকুচে কালো গায়ের রঙ। বড় বড় লাল চোখ। অথচ নেশা-ভাং করতেন না। কাটা-কাটা চোখ-মুখ।

সেই চখা-প্রিয় বৈদ্যকাকুর সঙ্গেই বিয়ে হল রংপুরের রাজপিসির বা অনু বোস-এর। দেশভাগের বছরই। রংপুরে হল বিয়ে। আর বিয়ের পরদিনই রংপুর থেকে তামাহাটে এসে বর কনের ফুলশয্যা হল। গোলাপের পাপড়ি ছড়িয়ে দিয়েছিল ছবিদিরা ফুল-লতাপাতা-তোলা রেশমি বেডশিটের উপরে।
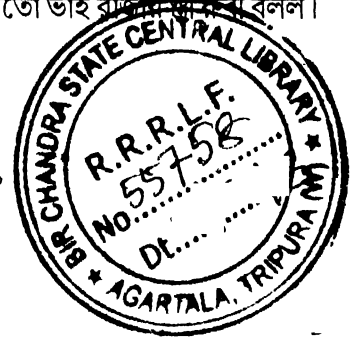
পরিষ্কার মনে আছে চখার। রাঙাপিসির মতন সরল ভালোমানুষ প্যাঁচঘোঁচহীন গ্রাম্য মেয়েও তখনকার দিনে কমই ছিল।

আজ বৈদ্যকাকু নেই। অনেকেই নেই, যাঁরা তখন ছিলেন। মনে মনে নিজেকে অভিসম্পাত দিচ্ছিলেন চখা এত বছর পরে তামাহাটে আসাতে। কোনো জায়গাতেই এত বছর পরে আর কখনোই ফিরে যেতে নেই বোধহয়।

একবার ওর মনে হল, এসে আদৌ ভালো করেনি এখানে এবং মনে হল ধুবড়িতে গিয়েও বোধহয় ঠিক এমনই মনে হবে।

পায়ে হেঁটেই গেল দাতুর সঙ্গে বৈদ্যকাকুর বাড়িতে।

রাঙাপিসির চুল পেকে গেছে, দাঁত পড়ে গেছে। যে জমিতে একটিমাত্র ঘর ছিল আর একটু দূরে রান্নাঘর, সেইখানেই অনেক ঘর হয়েছে। মাঝে উঠোন। পাশেই হাস্কিং মেশিন চলছে। তার পুপ পুপ পুপ পুপ শব্দ উঠছে গভীর রাতের খাপু পাখির ডাকের মতন অবিরাম। দাতুর বড়দিদি বুড়ুর বিয়ে হয়েছিল ধুবড়িতে। তার সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল চখার কলকাতাতেই, ঢাকুরিয়ার বিভাপিসির ছেলের বিয়েতে।

তোর বর কোথায়?

একাই সেই বিয়ের রাতে বুড়ুকে জিজ্ঞেস করাতে বুড়ু দার্শনিকের মতন বলেছিল, "ওমা! তুমি শোন নাই নাকি। সে তো কবেই পটল তুলছে।"

বাক্যটি মনে গেঁথেছিল। কুড়ির কোঠার কোনো মেয়ে স্বামীবিয়োগ যে সে এমন ফিলসফিকালি নিতে পারে, তা জেনে বুড়ুর প্রতি একধরনের শ্রদ্ধা জন্মে গেছিল চখার।

চখা ভাবছিল যে, প্রত্যেক মানুষের জন্মের মুহূর্তের মধ্যেই তার মৃত্যুও অবিসংবাদী হয়ে নিহিত থাকে। আমরা শুধু জানি না সেই মূহূর্ত কখন আসবে। অথচ সেই বিদায়ক্ষণ নিয়ে চখার মতন সাধারণ মানুষদের কম নাটুকেপনা নেই। সেই ক্ষণকে বিলম্বিত করার লজ্জাকর চেষ্টারও কোনো বিরাম নেই। চখার মতন মানুষের এবং অতি সাধারণ সব পশু-পাখি কীটপতঙ্গেরই মতন বেশিদিন বাঁচার ইচ্ছার এই লজ্জাকর মানসিকতা ওকে সত্যিই পীড়িত করে। জন্মেরই মতন সহজে মৃত্যুকে নিতে যে পারে না কেন মানুষে, সেকথা ভেবে আশ্চর্য হয় ও।

দাতুর বৌ কলকাতার মেয়ে। এখানে এই গণ্ডগ্রামে থাকতে চায় না। দাতু, হাতে চামড়ার একটা ছোট্ট ব্যাগ নিয়ে ঘুরে ঠিকাদাবি করে এখানে-ওখানে। দাতুর পরের ভাই, তার নাম ভুলে গেছে চখা, কুড়ির কোঠাতে থাকতেই বেশি পরিমাণে দিশি মদ খেয়ে সুন্দরী বৌকে বিধবা করে পরপারে চলে গেছে।

বৌটিকে ভালো লাগল চখার।

রাঙাপিসি বললেন, আরে মাইনষে খায়, খা, একটু মাইপ্যা-জুইপ্যা খা। তা নয়। বৌটারে ভাসাইয়া থুইয়া গেল।

বৌ ডানাকাটা পরি নয় কিন্তু এক বিষাদমলিন সৌন্দর্য আছে তার। তাছাড়া, যৌবনে সব মানুষই সুন্দর। যৌবন চলে গেছে, এই দুঃখময় সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করে দুঃখ পেতে হয়।

চোখ দিয়ে কথা বলে সে মেয়ে। মুখে নীরব।

উঠোনের মস্ত কাঁঠালি চাঁপা গাছের নিচে তার হলুদ-কালো ডুরে শাড়ি-পরা চেহারাটি অনেকদিন চখার মনের চোখে ধরা থাকবে। সেই বৌটি প্রাইমারি স্কুলে পড়ায়। তার একটিই ছেলে। ভালো শিক্ষা দিয়েছে মনে হল ছেলেটিকে। সভ্য-ভব্য। বিধবা মায়ের ভবিষ্যৎ।

কিন্তু এই বয়সের সুন্দরী বিধবা যে কেন আবারও বিয়ে করে, যে জীবন তার কোনোরকম দোষ

ব্যতিরেকেই উৎপাটিত হয়েছে, তাকে নতুন করে অন্য কোনো মাটিতে রোপণ করে নতুন করে বাঁচবে না তা চখা বুঝতে পারে না। অবশ্য সেই ইচ্ছা যদি তার থাকে।

এদেশে আজও অনেকই বিদ্যাসাগরের প্রয়োজন আছে।

মনে হল চখার।

আরও এক ছেলে আছে রাঙাপিসির। সেও ঠিকাদারি করে। তারই হাস্কিং মেশিন। তাকে দেখে মনে হয় ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট। এ যুগের উপযুক্ত। তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হল না। হয়তো বাড়িতে ছিল না।

প্রত্যেক মানুষের জীবনেই তার চরিত্রে পরিণতি আসার পরে রক্তের আত্মীয়তার থেকে আত্মার আত্মীয়তাই বড় হয়ে ওঠে। এর চেয়ে বড় সত্য আর নেই। যার মানসিক উন্নতির উচ্চতা যত বেশি, সেই অনুপাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিত এবং সমমনস্ক মানুষেরা ছাড়া তার অন্যান্য রক্তের আত্মীয়রা যতই দিন যায়, ততই দূরে সরে যেতে থাকে। এর চেয়ে বড় দুঃখময় সত্য মানুষের জীবনে হয়তো সত্যিই বেশি নেই। যারা তথাকথিত "পর" তারাই দেখা যায় ধীরে ধীরে "আপন" হয়ে ওঠে আর আপনেরাই পর।

ঝন্টু বলল, এবারে যাবে নাকি বরবাধায়?

বরবাধার জঙ্গলে?

হ্যাঁ।

চল।

কিন্তু যাওয়ার আগে স্কুলে একটু ঘুরে যেতে হবে।

স্কুলে?

হ্যাঁ।

কেন?

তারপর সেই প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষা না করেই চখা বলল, বাচ্চুদের আর চানুদের বাড়ি একবার গেলে হত না?

বাচ্চুরা তো ধুবড়িতেই থাকে।

ওর বৌ? পাগু? সেই যে গান গাইত না একটা? "যেন কার অভিশাপ লেগেছে মোর জীবনে।"

গানটার কথা আজও মনে আছে তোমার?

চখা বলল, আছে রে আছে। কিছু গান, কিছু কথা, মনের জমি যখন নরম থাকে তখন তাতে চেপে বসে যায়। সারাজীবন বসে থাকে।

ঝন্টু বলল, ওরা সকলেই ধুবড়িতেই থাকে। ওদের মেয়ে টুলটুলও থাকে। মেয়েটা সুন্দরী হয়েছে। সাজেও সুন্দর। টুলটুল খুব ভালো নাচে। সুন্দর ফিগার। ওদের এক কন্যা। জামাইও নানারকম বাজনা বাজায়। অর্কেস্ট্রা কনডাক্ট করে। ভালো ছেলে—স্বাস্থ্যবানও। দুজনের মধ্যে খুব ভাব-ভালোবাসা। দারুণ হ্যাপিলি ম্যারেড ওরা।

বাবাঃ! তুই তো অনেক বুঝিস আজকাল!

চখা বলল।

ঝন্টু বলল, বুঝি ঠিক না। তবে দাম্পত্যর রকম কি আর বাইরে থেকে বোঝা যায় বল? একের চোখে অন্যের দাম্পত্য হচ্ছে চিড়িয়াখানার খাঁচার মধ্যে শুয়ে-থাকা বাঘ। খাঁচার বাইরে বেরুলে তার কী রূপ সে শুধু SPOUSE-ই জানে একমাত্র।

ঝন্টু আরও বলল, দেখা হবে ওদের সকলেরই সঙ্গে ধুবড়ি গেলে। আর চানু মিঠু তো আসবেই

দুপুরবেলাতে তোমার সঙ্গে দেখা করতে। আরও কত জনে আসবে। দেখো, ভেঙে পড়বে তামাহাট।

তাই? তবে তো চিন্তার কথা হল।

কেন?

আমি যে ইতিমধ্যেই আধভাঙা হয়ে গেছি। বাগডোগরা থেকে আসার পথেই আমার মেরুদণ্ড গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে। পরীক্ষা করালে কী যে বলবেন ডাক্তারেরা কে বলতে পারে।

ঝন্টু বলল, কলকাতার ডাক্তারদের কথা ছাড়ো। তাদের অধিকাংশরই উচিত ছিল নরকঙ্কালের ব্যবসা করে বড়লোক হওয়া। অধিকাংশই টাকা ছাড়া কিছুই বোঝে না। আমার পতু মামাকে কী করে মারল তারা!

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, নকশালদের আসার সময় আবার। ওঁরা শক্তের ভক্ত, নরমের যম। গুলি করে মারা দরকার ওঁদের অনেককেই। এমনই বিবেকহীন অর্থগৃধ্নু হয়ে গেছেন অধিকাংশ ডাক্তারই।

কথাটা মিথ্যে বলিসনি। তবে ব্যতিক্রম এখনও আছে। ভাগ্যিস।

সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। এবারে চলো চখাদা। দুপুরে খেয়ে একটু জিরোবে তো? রাতে তো ঘুম হয়নি নতুন জায়গাতে!

তা ঘুমোব। তবে জায়গা তো নতুন নয়। কিন্তু বহু পরিচিত জায়গাতেও বহুদিন পরে এলে তা নতুন মনে হয় বইকি। দূর দেশে থাকার পর ফিরে এসে নিজের বৌকেও নতুন বলে মনে হয়। আর তামাহাটিকে তো নতুন মনে হবেই।

তারপরে চখা বলল, নদীর ধারেও একবার নিয়ে যাবি না? কাল আসবার সময়ে গঙ্গাধর নদীর কথাই ভাবতে ভাবতে আসছিলাম চোখ বুজে। সব কি খুব বদলে গেছে? আগের মতন কি কিছুই নেই?

চলো যাই। নিজের চোখেই দেখবে।

বাড়িতে ছোট শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করার পর থেকে ঝন্টু প্রতি বছরই শিবরাত্রির সময়ে নাকি আসে তামাহাটে। সে ধানবাদেই থাকুক, কী ঘেটোটাঁড়ে, কী কলকাতার বরাহনগরে। পিসিমা থাকাকালীন অবশ্যই আসবে। পরের কথা শুধু ভবিষ্যৎই জানে! শহরে যে একবার সেঁধিয়েছে সে আর গ্রামে ফিরতেই চায় না। অথচ কেন যে, তা ভেবেই পায় না চখা।

নদীর পারে যেতে নৃপেন্দ্রমোহন মিত্র প্রাইমারি স্কুল এবং তিনকড়ি মিত্র হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলও পড়বে। স্কুলের মাস্টারমশাইরা ঈদের ছুটি থাকা সত্ত্বেও তুমি এসেছ শুনে স্কুলে অপেক্ষা করছেন তোমারই জন্যে স্কুল খুলে।

ঝন্টু বলল।

তাই?

হ্যাঁ।

দুটি স্কুলেই গেল ওরা। গাড়িতেই গেল। চখার পিসিমা প্রায় পঞ্চাশ বিঘা জমি দান করেছেন এই দুই স্কুলের জন্যে। খেলার মাঠও। তবে গঙ্গাধর প্রতি বছরেই খেলার মাঠকে খাবলে খাবলে খেয়ে যাচ্ছে অনেকখানি করে। নদী যদি গতি না বদলায় তবে বছর পঁচিশের মধ্যে সেকেন্ডারি স্কুলটি নদীর গর্ভে চলে যাবে।

হেডমাস্টারমশাই-এর ঘরে বসে নদী দেখতে পাচ্ছিল চখা। তবে নদীকে চেনা যায় না। এদিকেই চর ফেলেছে। বিস্তীর্ণ। এতদিন পরে এলে কোনো নদী বা নারীকে চিনতে না পারাটাই যে স্বাভাবিক সেকথা অবশ্য বোঝে চখা। অনেকই দিন পরে কোনো প্রিয় নদী অথবা নারীর কাছে যদি না এসে

পারা যায়, তবে না আসাই ভালো। দুজনের পক্ষেই ভালো। সময়, সময়ে সময়ে আনন্দ যেমন দেয়, সময়ে সময়ে দুঃখও কম দেয় না।

রত্নু জেঠুর ছোট ছেলের স্ত্রী সেকেন্ডারি স্কুলের শিক্ষিকা। সে আবার কবিও। কবি অবশ্য আজ হয়নি। যখন ক্লাস নাইনে পড়ে, তখনই ১৯৭৫-এ তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। নাম নীলিমা। আগে সাহা ছিল এখন বিশ্বাস হয়েছে। তারপরে প্রেম করে বিয়ে। এবং তার পরে সাধারণত যা হয়, কবিতার ভরা নদীতে ভাঁটা পড়ে। তবে নীলিমার স্রোত এখনও আছে। তবে কোন দিকে চর ফেলেছে আর কোন দিকে ভাঁটা, এখনই বলা মুশকিল। তার বয়সও তো বেশি না। তিরতির করে জল বয় এখনও সেই কাব্যি-নদীতে। ভারী উচ্ছল মেয়ে নীলিমা। তার একখানি বই, "বাস্তবের দর্পণ" দিল চখাকে মতামতের জন্যে। এবং লিখিত মতামতের জন্যে।

বিপদে পড়ল চখা। প্রথমত ও কবি নয় বলে। দ্বিতীয়ত প্রতিদিন অপরিচিত এত কবি ও লেখক তাঁদের বই পাঠিয়ে মতামত চান যে, সময় করে ওঠা সত্যিই অসম্ভব। আরও বিপদ যে, ও মিথ্যাচারী নয়।

নীলিমা যেদিন নামী কবি হবে সেদিন এই কথা নিজেও বুঝবে। তাছাড়া, চখা চক্রবর্তী যেহেতু কবি নয়, কবিতা সম্বন্ধে মত সে দেবেই বা কেমন করে! নীলিমা মতামত চাইল বারংবার তার বইটি দিয়ে, চখার কাছ থেকে।

একটু ভেবে, চখা তাকে কবি দিব্যেন্দু পালিতের ঠিকানা দিয়ে দিল এবং তাঁর মতামতের জন্যে কাব্যসংকলনটির একটি কপিও পাঠিয়ে দিতে বলল কলকাতাতে। তিনি যদি তাঁর মূল্যবান মতামত দেন তাহলে এই তরুণী কবি বিশেষ উপকৃত হবে। সে এই কথা লিখতে বলল চিঠিতে।

তিনি কি খুব বড় কবি?

আমি নিজে তো কবি নই। কী করে বলি বল? তবে বড় কবিদের সঙ্গেই ওর ওঠা-বসা। তাছাড়া দিব্যেন্দু পালিতের কবিতার বই যখন আনন্দ পাবলিশার্স ও দে'জ পাবলিশিং থেকে বেরোয় তখন তিনি যে মস্ত কবি, সে-বিষয়ে কারোই কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয়।

উনি যদি উত্তর না দেন?

ন্যায্য প্রশ্ন করল নীলিমা।

না-দেওয়াটাই স্বাভাবিক। বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিকেরা প্রতি দিনে এত চিঠি ও বই পান যে, তাঁদের সকলেরই চিঠির উত্তর বা বইয়ের সম্বন্ধে মতামত দিতে হলে তাঁদের নিজেদের আর কোনো কাজই করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। বিখ্যাতরাই জানেন একমাত্র তাঁদের সমস্যার কথা, অপারগতার কথা এবং দুঃখের কথা। তবে অমন ব্যস্ততার মধ্যেও কেউ কেউ দেনও উত্তর মাঝে মাঝে। সব চিঠির না হলেও কিছু চিঠির উত্তর অত্যন্ত কষ্ট করেও দেন।

দিব্যেন্দু পালিত তো শুধু কবি নন, তিনি তো গদ্যকারও।

প্রাণেশ বলল। চানুর বন্ধু।

অবশ্যই। এবং শুধু গদ্যকারই নন, তাঁর ছোট গল্প বিখ্যাত পত্রিকাতে আমরা প্রথম পড়েছি, যখন কলেজে পড়ি, তখন।

বাবাঃ! এত তো জানতাম না। ওঁর বয়স কত হবে? পঁচাত্তর?

নীলিমা বলল।

হেসে ফেলল চখা।

বলল, দিব্যেন্দু নিজে বলেন পঞ্চাশ। আমার মনে হয় আরও কম। দিব্যেন্দু পালিতও আনন্দবাজারের মস্ত অফিসার। উনি কাজ করেননি এমন খবরের কাগজ ও বিজ্ঞাপন কোম্পানি

কলকাতায় খুব বেশি নেই। খুব ভাবনা-চিন্তাও করেন। রীতিমতো চিন্তাবিদ্ বিদগ্ধ মানুষ। তাঁর হাঁটা-চলা, কথা বলা, দাঁড়ানো সবকিছুর মধ্যেই এই বৈদগ্ধ্য ফুটে ওঠে। নিজের ভাষা সম্বন্ধে অত্যন্তই সচেতন। উনি আর কারও মতনই লেখেন না বাংলা। ওঁর বাংলা সম্পূর্ণ নিজস্ব।

তাই?

শ্রদ্ধামিশ্রিত বিস্ময়ের সঙ্গে বলল নীলিমা।

তারপরই বলল, চিন্তা যে করেন তা তাঁর টাক দেখলেই বোঝা যায়। মাথায় একটিও চুল নেই।

চিন্তাবিদদের মধ্যে অধিকাংশরাই টেকো হন। রবীন্দ্রনাথ, আইনস্টাইন, সত্যেন বোস আর শরৎবাবুরা যদিও একসেপশান।

হেডমাস্টারমশাই বললেন।

চানুর বন্ধু প্রাণেশ বলল, সে কলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছে ক'দিনের জন্যে, ছিঃ ছিঃ, কার সঙ্গে কার তুলনা মাস্টারমশাই! দিব্যেন্দু পালিতের নামের সঙ্গে শরৎবাবুর নাম একসঙ্গে উচ্চারণ করলেন। ভাগলপুরে থাকতেন বলেই কি দুজনে সমান হলেন! আপনি আর কারও সামনে একথা বলবেন না মাস্টারমশাই! দিব্যেন্দু একজন জ্যোতিরিন্দু ইনটেলেকচুয়াল। লেখা নিয়ে উনি কত পরীক্ষানিরীক্ষা করেন সবসময়ে। ভাষা সম্বন্ধে কত সচেতন উনি। তুলনামূলক সাহিত্যের এম.এ.। বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্তদের মতো দিকপালদের কাছে বাংলা এবং পৃথিবীর সাহিত্য পড়েছেন। ওঁর সঙ্গে ডিগ্রিহীন শরৎ চ্যাটার্জির তুলনা যিনি করেন তিনি আকাট আনকালচারড! একটি স্কুলের হেডমাস্টার হয়ে আপনি এ কথা কী করে বললেন? ছিঃ! শরৎবাবু আবার কোনো লেখক নাকি? ছ্যা! ছ্যা! আর শরৎবাবু তো মেয়েদের লেখক। ওঁর লেখা তো সেন্টিমেন্টাল। ট্র্যাশ।

ঝন্টু এবারে হাঁফ ধরে যাওয়াতে বলল, এ সবকিছুই কিন্তু আমার মাথার ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। আমি মিস্ত্রি মানুষ। এবারে ওঠো চখাদা। সব বিষয়ই কি সকলের হজম হয়। তুমি এর পরের বারে হাতে সময় নিয়ে এসো। তখন এইসব আলোচনা কোরো প্রাণেশের সঙ্গে, মাস্টারমশায়দের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। এবারে ক্ষ্যামা দাও। সকালের ফেনাভাতেই আমার হজম হয়ে গেল।

আমি তো কিছুই বলিনি। আলোচনা তো করছিলেন হেডমাস্টারমশাই আর প্রাণেশ। আমিও কি লেখক নাকি! এসব আলোচনা করার এক্তিয়ারই নেই আমার। আমি ভালো করেই জানি আমার বিদ্যা-বুদ্ধির দৌড়।

নীলিমা ওদের উঠতে দেখে বলল, আচ্ছা চখাদা, দিব্যেন্দু পালিত কি বুদ্ধদেবের ভাই?

কোন্ বুদ্ধদেব? সরোদিয়া বুদ্ধদেব-এর কথা বলছ কি? এখন তো বঙ্গভূমে বুদ্ধদেবের ছড়াছড়ি। মন্ত্রী, দাশগুপ্ত-স্কোয়ার, গঙ্গোপাধ্যায়, আরও কত।

চানু বলল, না, না, ফিল্ম ডিরেক্টর। সরোদিয়া বুদ্ধদেববাবুর মাথা চুলে তো চিরুনি চালালে চিরুনি ভেঙে যাবে। শুনছ না? হচ্ছে টাকের কথা! উইথ রেফারেন্স টু দ্যা কনটেক্সট কথা বল।

বলেই, হো হো করে হেসে ওঠে বলল, বলেছ ঠিক। তবে, দুজনের—দিব্যেন্দু পালিত এবং বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের চেহারার মধ্যে আশ্চর্য মিল আছে। তবে বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, দিব্যেন্দু পালিতের মতন মোটা ফ্রেমের চশমা পরেন না আর বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর টাকটি দিব্যেন্দুবাবুর টাকের মতন অত চকচকেও নয়।

ইংরেজির মাস্টারমশায় তাঁর নিজের টাকে হাত বুলিয়ে বললেন, টাক চকচকে কী করে করা যায় বলুন তো? আমার টাকটা বড়োই ম্যাড়ম্যাড়ে।

চানুর সবজান্তা বন্ধু প্রাণেশ বলল, 'MIN' নামের একটি Polish পাওয়া যায়। সপ্তাহে দু দিন লাগিয়ে শ্যাময় লেদার দিয়ে ঘষবেন, দেখবেন টাক একেবারে ঝিকমিক করবে।

আর দাড়ি চকচকে করতে হলে কী করতে হয়? মানে, জেল্লা আনতে?

ইতিহাসের মাস্টারমশায় বললেন।

দাড়ি চকচকে করতে হলে কী করতে হয়?

আবারও প্রশ্ন হল।

স্কুলের সামনের বাগানের মধ্যে বিচরণরত একটি স্মার্ট এবং ইন্টেলিজেন্ট দাড়িওয়ালা পাঁঠার দিকে চেয়ে এবং নিজের দাড়িতে আদরে হাত বুলিয়ে এবারে প্রশ্ন করলেন, ভূগোলের সুগোল শিক্ষক।

চানু বলল, দাড়ি চকচকে করার মতন সোজা কাজ আর কিছুই নেই।

কীরকম?

সপ্তাহে তিন দিন বৈদ্যনাথের চ্যবনপ্রাশ লাগাতে হবে মাত্র এক চামচ করে, সঙ্গে চার ফোঁটা রেড়ির তেল।

বোগাস।

রতু জেঠুর ছোট ছেলে বাবলা বলল এবারে।

চখা লক্ষ্য করল দীপ আগাগোড়া চুপ করেই রইল। ও শুধু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চখাকে দেখে যাচ্ছে। চখা যেন চিড়িয়াখানাতে নতুন-আসা কোনো দুষ্প্রাপ্য জন্তু।

ঝন্টু দাঁড়িয়ে উঠে ঈষৎ বিরক্ত গলাতে বলল, চখাদা, তোমাকে নিতে কিন্তু ওঁরা সাতটার আগেই ধুবড়ি থেকে এসে হাজির হবেন। এদিকে সাড়ে এগারোটা বেজে গেল। বরবাধা থেকে ফিরতে ফিরতে দেড়টা-দুটো হয়েই যাবে। তারপর খাবে-দাবে। অনেকে আসবে তোমার সঙ্গে দেখা করতেও। কাল তাঁরা রাত দশটা অবধি অপেক্ষা করে চলে গেছেন। তুমি তো এলেই রাত সোয়া এগারোটা বাজিয়ে। তার উপর মরনাই চাবাগানেও তো যাবে একবার ব্যানার্জি সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। কি যাবে না?

ভেবেছিলাম।

তো চলো। আর দেরি করলে আমার টেনশান হয়ে যাচ্ছে। বর নিতে এসে কি তাঁরা বসে থাকবেন?

বর নিতে এলে কী হবে? নীতবর ছাড়া তো বর যাবে না! তুই পারফ্যুমটারফ্যুম এনেছিস তো? ঘেমো গন্ধ নীতবরকে নিয়ে আমি বিয়ে করতে যাব না কিন্তু।

দীপ, চানু, প্রাণেশ এবং স্কুলের সব মাস্টারমশাইয়েরাই হেসে উঠলেন একসঙ্গে চখার কথা শুনে।

ঝন্টুর সাদা টাটা মোবিল গাড়িটা সেকেন্ডারি স্কুল এবং প্রাইমারি স্কুল পেরিয়ে তামাহাট-এর হাট-এর সামনে এসে ডিঙ্গডিঙ্গার দিকে রওয়ানা হল।

চখা, পান্ডে ড্রাইভারের পাশের সিটে বসেছিল সামনে। এই পথ দিয়ে কতবার কত জায়গাতে যাবার স্মৃতি শীতে গ্রীষ্মে বর্ষাতে যে আছে, তা মনে পড়ে গেল। চখার বাবা, রতুজ্যাঠা, বৈদ্যকাকু, বাবার আরবান ইনফ্যানট্রির বন্ধু অজিত কাকু, হাওড়ার অজিত সিং, বাগচীবাবু, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বাগচী, তাঁর ছেলে গামাবাবু, অহীন চৌধুরী, ধুবড়ির আবু ছাত্তার, মোটাসোটা কাসেম মিঞা, বাপ্পু, আরও কত মানুষের স্মৃতি!

মনটা বিধুর হয়ে এল নানা কথা ভাবতে ভাবতে।

ঝন্টু বলল, কী হল? কথা বলছ না যে, শরীর খারাপ লাগছে না কি?

নাঃ। ভাবছি।

তারপর বলল, এটা কী জায়গা?

নুয়াহাট বা নুয়াবাজার বলতে পারো। ডিঙ্গডিঙ্গার আগে এই নতুন জায়গার পত্তন হয়েছে। আস্তে

আস্তে মানুষে ভরে যাবে সারা পৃথিবী। গাছ থাকবে না, পাখি থাকবে না, মাঠ থাকবে না, বন থাকবে না। ভাবলেও খারাপ লাগে।

যা বলেছিস। তারপর বলল, বুঝলি, সেদিন কলকাতার বইমেলাতে দে'জ পাবলিশিং-এর স্টলের সামনে বসে অটোগ্রাফ দিচ্ছি পাঠক-পাঠিকাদের কেনা বইতে, এমন সময়ে এক সুন্দরী ভদ্রমহিলা সঙ্গে একটি অল্পবয়সি সুন্দরী যুবতীকে নিয়ে এসে "আলোকঝারি"-র একটি কপি সই করতে দিয়ে অল্পবয়সি মেয়েটিকে দেখিয়ে বললেন, এ হচ্ছে ডিঙ্গডিঙ্গার মেয়ে, কলকাতার বউ।

চখা সেই বইয়ের উপরে লিখে দিল 'ডিঙ্গডিঙ্গার মেয়েকে'। তারপরে সই করে দিল। মেয়েটির নামও লিখেছিল জিজ্ঞেস করে, কিন্তু শ'য়ে শ'য়ে নাম সই করতে হয়েছিল বইমেলায় অটোগ্রাফ দেবার সময়ে, তাই নামটি মনে করতে পারল না। তবুও ঝন্টু, চানু, দীপ ইত্যাদিদেরও বলল সে-কথা।

চানু বলল, বরবাধাতে চলেন আগে। ফেরার সময়ে মরনাইতে ঢুইক্যা দেখা যাব'খন, ডিঙ্গডিঙ্গার সে কোন্ মাইয়া।

মরনাই চা-বাগানটা তো মস্ত বড় হয়ে গেছে!

স্বগতোক্তি করল চখা।

হ্যাঁ। পথের দু পাশেই ছড়িয়ে গেছে। মিশনের বাগান তো!

এই বাগানের ডিরেকটরস বাংলো বা গেস্ট হাউস নেই? এখানে এসে ক'দিন নিরিবিলিতে লেখালেখি করা যেত।

হ্যাঁ। থাকবে না কেন? তবে চা-বাগানেই যদি থাকবে তো বাগডোগরা বা নিউ কুচবিহার থেকে এত ঝক্কি করে এত দূরে আসতে যাবে কোন্ দুঃখে। ডুয়ার্স এবং আপার-আসামে এবং দার্জিলিং-এর পাহাড়েও তোমাকে কত লোকে আদর করে ডেকে নেবে একবার জানতে পারলে।

চখা বলল, তবু মরনাই, মরনাই-ই। মরনাই, ডিঙ্গডিঙ্গা, বরবাধা এসব নামগুলি আমাকে বড়ই নস্টালজিক করে তোলে রে। যাঁদের সঙ্গে এসব জায়গায় এসেছি, ঘুরেছি, একসময়ে শিকারও করেছি কচুগাঁও ডিভিশানে, শিকার তখন ছিলও প্রচুর এবং আইন মেনেই করেছি, সেই সব মানুষদের একজনও তো আর নেই আজ। মন বড় ভারাক্রান্ত লাগে তাঁদের কথা মনে হলে। কত হাসি, গল্প, মজা, গান!

তারপর বলল, ইসস। ভাবাই যায় না। ডিঙ্গডিঙ্গা কত বড় জায়গা হয়ে গেছে রে! আগে যখন ডিঙ্গডিঙ্গার হাটে আসতাম তখন কত ছোট্ট হাট লাগত এখানে।

এখন তো সব নামেই হাট। সপ্তাহে রোজই বাজার বসে বলতে গেলে। তবু হাটও বসে।

গুমা রেঞ্জের বরবাধার বাংলোর সামনে এসে যখন পৌঁছনো গেল, ছোট নদীটা পেরিয়েই পথ ডানদিকে মোড় নিয়েছে, ডানে বনবিভাগের বাংলো। রেঞ্জারের। সঙ্গে আরও কয়েকটি ছোট ছোট ঘর দেখল। নতুন হয়েছে কি? আগে ছিল কি না মনে করতে পারল না। হয়তো অফিসই হবে।

চখার মনে পড়ে গেল আগল-খোলা শ্রাবণের এক দিনে এই বরবাধারই রেঞ্জারের বাংলোতে একটি দুপুর কাটিয়ে গেছিল। ঝন্টুর জ্যাঠতুতো দিদি আর দিদির স্বামী শচীন জামাইবাবু তখন রেঞ্জার ছিলেন এখানকার। খাওয়া-দাওয়া, গান। মনে আছে চখার সমবয়সি এবং ওর চেয়ে বয়সে বড় অনেক মহিলারা ছিলেন। হয়তো ইতু, বেবি, ভারতীদি, আবিদি, আরও কেউ কেউ। কেয়া আর কদমের গন্ধে ম' ম' করছিল দুপুর। বেতবন ছিল ঐ ছোট নদীটির ধারে ধারে। ঘন। সাপের আড্ডা ছিল বেতবনে। স্কুলের ছাত্র চখাকে যেতে মানা করেছিলেন জঙ্গলে একা একা শচীন জামাইবাবু। বলেছিলেন চিতা আর বড় বাঘ অনেক আছে। সাপের তো কথাই নেই।

তারও অনেকদিন পরে এক রাত ছিল এই বাংলোতেই এসে আবু ছাত্তারের সঙ্গে। তখন সে

কলেজের ছাত্র। জোড়া চিতাবাঘ মেরেছিল ওরা সপসপে চাঁদভেজা শ্রাবণের চকচকে সেই উদলা, উজলা রাতে।

কিন্তু জঙ্গল দেখে মন খারাপ হয়ে গেল চখার। কেটে সব সাফ করে দিয়েছে। বাংলোর কাছে রাস্তার ধারে কিছু জায়গাতে "ফিফটিন-টুয়েন্টি ডিপ" আছে, শালের জঙ্গল। তার ওপাশেই ফাঁকা।

চানু বলল, আরও আগে গেলে আরও ফাঁকা।

চখা বলল, আরও আগে যাবার আর ইচ্ছে নেই। না এলেই ভালো করতাম। যখন স্কুলে পড়তাম তখন দিনের বেলাতেও এই পথ দিয়ে বন্দুক হাতে হাঁটতে গা ছমছম করত।

তারপরে স্বগতোক্তিরই মতন বলল, যমদুয়ারে যাওয়ার বড়ই ইচ্ছা ছিল রে ঝন্টু। যাওয়া কি যায় না, থাকা যায় না এক রাত?

মানাস অভয়ারণ্য দেখতে গিয়ে এক শুক্লা চতুর্দশীর রাতে বড়পেটা রোডে মানাস ব্যাঘ্র-প্রকল্পের অধিকর্তা সঞ্জয় দেবরায় সাহেবের বাংলোতে বসে সংকোশ নদী আর যমদুয়ারের প্রশংসা করে তাঁর ভীষণই বিরাগভাজন হয়ে গেছিল চখা। মানাস ছিল দেবরায় সাহেবের দেবভূমি। মা-বাবা, অনূঢ়া কন্যা, স্ত্রী সবই। যে-কোনো দেশই অমন একজন কনসার্ভেটর এবং ফিল্ড-ডিরেক্টরকে নিয়ে অবশ্যই চিরদিন গর্ব করতে পারে। রাজ্য হিসেবে আসাম তো অবশ্যই পারে। ভারতের নানা রাজ্যের অনেকই টাইগার-প্রজেক্টের ফিল্ড-ডিরেক্টরকে দেখেছে চখা, প্রত্যেকেরই নাম করতে চায় না কিন্তু তাঁদের মধ্যে দু-একজন পয়লা-নম্বরী চোর। বনের রক্ষক হয়েও ভক্ষক। এই ধরনের আমলাদের গুলি করে মারা উচিত উনিশশো বাহাত্তরের পরেও যাঁরা বন্যপ্রাণী ও পাখি শিকার করেন, সর্বার্থেই অশিক্ষিত সেই সব চোরা-শিকারিদেরই সঙ্গে। কিন্তু মারছেটা কে? সর্ষের মধ্যেই যে ভূত ঢুকে গেছে। ভারতের সব বনই এখন তামিলনাড়ু আর মাইসোরের ভীরাপ্পানদের খপ্পরে। রাজ্যভেদে তাদের নাম আলাদা এই যা। প্রকৃতিই যে আমাদের মা, অন্য মা, অরণ্যই যে আমাদের শেষ আশ্রয়, প্রশ্বাস নেবার শেষ জায়গা, একজোড়া করে বন্যপ্রাণী ও পাখিরাও যে একজন মানুষ ও মানুষীর শেষের প্রহরে বাইবেলে বর্ণিত সেই DELUGE-এর পরে NUHA'S ARC-এ সঙ্গী হবে, একথা কী করে যে অর্থগৃধ্নু অদূরদৃষ্টিসম্পন্ন ন্যক্কারজনক ঘৃণ্য দেশবাসীদের এক বড় অংশই ভুলে যান, তা ভাবলেও চখার কপালের দুপাশের শিরাতে রক্ত ঝুনুক-ঝুনুক করে। মনে হয়, স্ট্রোক হয়ে যাবে।

গাড়ি ঘুরিয়ে নিতে বল এবারে ঝন্টু।

চখা বলল।

তারপরে নিজেই ড্রাইভারকে বলল, ব্যাক করো পাণ্ডে, জায়গা দেখে। আর জঙ্গল দেখার সাধ নেই। ইস্‌স্‌।

চানু বলল, আপনারে লইয়া যাইতাম যমদুয়ারে কিন্তু তাগো বড় ঘাঁটি হইছে যে এখন স্যা যাগা। সংকোশ নদী পারাইলেই ত ভুটান। তাই পুলিশেও কিছু কইরবার না পারে। টেররিস্টদের স্বর্গ-রাজ্য। আপনারে মাইর‍্যা ফ্যালাইলে আমাগো মুখগুলান কি দেখান যাইব কারও কাছেই? থুথু দিবে না মানষে?

চখা বলল, আমিও তো বিদ্রোহী। তারা আমাকে মারবেই বা কেন? সব বিদ্রোহী, সব টেররিস্টদের প্রতিই আমার সমর্থন আছে। উরুগুয়ের টুপামারো সন্ত্রাসবাদীদের ম্যানিফেস্টোতে পড়েছিলাম যে, তারা বিশ্বাস করে, "If the country does not belong to everyone, it will belong to no one." যে-দেশে গণতন্ত্র কেতাবি, আইন প্রহসন, ন্যায়বিচার এখনও স্বপ্নেরই বস্তু, সে-দেশে সম্ভবত টেররিজিমই একমাত্র পথ অন্যায়ের প্রতিকার করার।

তোমরা যাই বলো আর তাই বলো, আমি আমার সমস্ত শিক্ষা, ভাবনা-চিন্তা এবং দায়িত্বজ্ঞান

সত্ত্বেও এই কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি। আর আইনও তো শুধু বড়লোকেরই জন্যে। গরিবের কোন কাজে লাগে এই আইন?

চখার উত্তেজনা কমিয়ে দিয়ে কথা ঘোরাবার জন্যে দীপ বলল, চলুন, ফিরে যাই। মরনাই চা-বাগানে যাবেন তো চখাদা?

চল, যেখানে নিয়ে যাবি যাব।

উত্তেজনা প্রশমিত করে বলল চখা।

মরনাই চা-বাগানের চা রাখে ধুবড়ির টাউন স্টোরস। খাঁটি চা।

রায়েদের টাউন স্টোরস? শচীন রায়, কানু রায়, আরও ভাইয়েরা ছিলেন না? শচীনবাবুর বাবা ছিলেন দূরদর্শী মানুষ।

দীপ বলল তুমি জানলে কেমন করে?

বলিস কিরে? তোদের জন্মের অনেকই আগে থেকে আমি ওঁদের চিনি। টাউন স্টোরস-এর শচীনবাবু আর আমার বাবার সঙ্গে ধুবড়ির নেতাধোপানির ঘাট থেকে ছইওয়ালা নৌকো করে বর্ষার দামাল ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে শালমাড়া হয়ে ফুলবাড়ির আগে প্লাবিত নদীর মধ্যেই শরবনে ভরা একটি ডোবা-চরে রাত কাটিয়ে পরদিন জিঞ্জিরাম নদীতে গিয়ে পৌঁছেছিলাম একবার। চার-পাঁচ দিন নৌকোতেই ছিলাম জিঞ্জিরাম নদীতে। একদিকে গারো হিলস—অন্যদিকে গোয়ালপাড়া। রাভাদের গ্রাম ছিল। রাভাতলা। আর কী বৃষ্টি, কী বৃষ্টি! ঐ সময়েই জিঞ্জিরাম-এর মস্ত মস্ত দহতে বিরাট কুমিরের আখড়া বসে।

আখড়া মানে?

দীপ বলল।

কুস্তি শেখে নাকি?

হয়তো শেখে। মাগ্গর, ঘড়িয়াল, ক্রক্রোডাইল। আর কত রকমের কুমির। ঘটওয়ালা কুমির বলে ওখানকার একধরনের কুমিরকে। ছাত্তার অন্তত বলত। তারা নাকি এতই বড় যে মাথার উপরের চামড়া কুঞ্চিত হয়ে ঘটের মতন হয়ে যায়। প্রতি গ্রাম থেকেই মানুষ নেয় কুমিরেরা। মানুষখেকো কুমির।

আমরা "রাভাতলা" নামের এক গ্রামে নেমে শুনেছিলাম আগের রাতে এক চাষার যুবতী বৌকে কুমিরে নিয়ে যাবার মর্মন্তুদ কাহিনি। মেয়েরাই বেশি যায় কুমিরের পেটে।

একটু চুপ করে থেকে বলল, আহা, কীসব ছায়াচ্ছন্ন সরু নদীপথ! দু পাশে বাঁশের মাচা বানানো ছিল সেই সরু, দ্রুত ধাবমান নদীর ঘাটে ঘাটে, জলে না নামলেও যাতে চলে যায়। যখন একান্তই চলে না তখনই কুমিরের ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকে সকলে। লম্বা লম্বা নলি-বাঁশের ছিপ হাতে করে তামা-রঙা রাঙা যুবকেরা ছায়াতে দু পাশ থেকে ঝুঁকে-পড়া বনের প্রায়ান্ধকার শ্রাবণী দুপুরে বসে মাছ ধরছিল। এখনও যেন চোখে ভাসে। আর আমাদের নৌকার দাঁড় পড়ছিল ছপ্‌ছপ্। ধীরে ধীরে। আর আমি বসেছিলাম নৌকোর ছইয়ের মাথার উপরে, গলাতে সান-গ্লাস আর কাঁধে রাইফেল ঝুলিয়ে। রাতের অন্ধকার নেমে এলে ভাঙনি মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেয়ে শুয়ে নৌকোর ছইয়ের উপরে অঝোরধারে বৃষ্টির শব্দ আর গারো পাহাড় থেকে আসা দামাল হাওয়ার দাপাদাপির আওয়াজ শুনতে শুনতে বাবার পাশে ঘুম।

আবিষ্ট গলাতে ওদের বলছিল চখা।

তখন আমি কলেজের ফার্স্ট-ইয়ারের ছাত্র। আমার বাবার গায়ের গন্ধ এখনও যেন নাকে ভাসে। গন্ধটি কটু নয়, আবার মিষ্টিও নয়। একটা নিউট্রাল গন্ধ। ODOURLESS-ই বলা চলে। কিন্তু

তবু ছিল ODOUR। তার বাবার কোলঘেঁষে সারারাত বৃষ্টি-ঝরা শ্রাবণ-রাতে কুমিরে-ভরা সরু কিন্তু প্রচণ্ড গভীর জিঞ্জিরাম নদীর বুকে তীরের গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে-রাখা ছোট্ট ছই-নৌকোতে যেসব ছেলে রাত না কাটিয়েছে, তারা হয়তো কোনোদিনও জানবে না যে, বাবার গায়ের গন্ধও, মায়ের গায়ের গন্ধরই মতন প্রত্যেক সন্তানেরই প্রিয়।

চানু বলল, পান্ডেজী, মরনাই-এ ঢোকো ডানদিকে। ডিঙ্গডিঙ্গার কোন সুন্দরী মেয়ে অটোগ্রাফ নিল চখাদার কলকাতার বইমেলাতে, তার খোঁজ করা যাক একটু!

ওরা বাগানের অফিসের সামনে ঢুকে গাড়ি ঘুরিয়ে, গাড়িতেই বসল। চানু গেল খবর করতে। একটু পরে ফিরে এসে বলল, ম্যানেজার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, ইঞ্জিনিয়র কেউ-ই নাই, এহনে লাঞ্চ আওয়ার। বাড়ি যাইবেন কি?

দূর। খাবার সময়ে মানুষকে বিরক্ত করব না।

তবে অফিস থিক্যাই খোঁজ নিয়া আসতাছি। আপনে বসেন।

ফিরে এসে চানু বলল, যা ভাবছিলাম তাই-ই। মাইয়ার নাম গোলাপ। গোলাপের মতনই সুন্দরী। ওর বাবারেও আমি চিনি। ওরা বাগানে থাকে না। ওদের বাড়ি এই ডিঙ্গডিঙ্গাতেই। ফেরার সময়ে যামুঅনে অগো বাসায়। কিন্তু স্যা ত বিয়া হইয়া চইল্যা গেছে কলকাতা!

ঝন্টু বলল, মেয়ে গেছে তো কি হয়েছে—মা-বাবা তো আছেন। তাঁদেরও সারপ্রাইজ দেওয়া হবে। ডিঙ্গডিঙ্গাতে এসেও "ডিঙ্গিডিঙ্গার মেয়ের" বাড়িতে না যাওয়াটা ভালো দেখায় না। সে এবং তার শাশুড়ি যখন চখাদার ভক্ত।

মরনাই বাগান পেরিয়ে ডিঙ্গডিঙ্গাতে এসে সামনে নানারঙা গোলাপ বাগানওয়ালা সুন্দর একটি বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থামাতে বলল চানু, পান্ডে ড্রাইভারকে। তারপর ভিতরে গেল। পরক্ষণেই ভিতর থেকে একজন সুন্দরী প্রৌঢ়া মহিলা এবং তাঁর সুন্দর ছেলে বাইরে এসে আপ্যায়ন করলেন।

চখারা সকলেই গেল ভিতরে। কী যে খুশি হলেন মহিলা ও তাঁর পুত্র; তা বলার নয়! বললেন, মেয়ের বিয়ে হয়েছে অল্প ক'দিন আগে। ওর সুন্দরী শাশুড়িই নিশ্চয়ই ওকে নিয়ে বইমেলাতে গেছিলেন। আপনার অনেক লেখাতে ডিঙ্গডিঙ্গার উল্লেখ আছে, সে কারণেই উনি নিশ্চয়ই আমার মেয়েকে ডিঙ্গডিঙ্গার মেয়ে এবং কলকাতার বৌ বলে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন।

তারপরে বললেন, মেয়ে আমার আসছে সাত দিন পরেই। আপনি স্বয়ং এসেছিলেন শুনলেই কী যে করবে জানি না। আপনার এই বইটিতে সই করে দিয়ে, আজকের তারিখও দিয়ে যান দয়া করে। নইলে ও হয়তো বিশ্বাস করবে না যে আপনি এসেছিলেন!

বলে, চখার লেখা একটি বই নিয়ে এলেন ভিতর থেকে।

মিষ্টি না খাইয়ে ছাড়লেন না মহিলা। ওঁরা খ্রিস্টান সম্ভবত। মিশনের দীক্ষিত। ওঁর স্বামী নামকরা ঠিকাদার ছিলেন এই অঞ্চলের। "গোলাপের বাবা" এই তো যথেষ্ট পরিচয়, নাম নাই বা মনে থাকল! চানু বলল।

চখা গোলাপদের বাড়ি থেকে বেরোতে বেরোতে ভাবছিল, দু কলম লিখে কীই বা এমন করেছে যে, এত মানুষের এত ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা এবং স্নেহ পেল এ জীবনে।

৪

ধুবড়ির "সবুজের আসর" থেকে এক ভদ্রলোক, হীরেন পাল, নিতে এসে গেলেন সাতটার

জায়গাতে পাঁচটার সময়েই। সঙ্গে ইতু, পূর্ণজেঠুর মেয়ে। জীপ নিয়ে এসেছিলেন ওঁরা পথ খারাপ বলে।

ছেলেবেলাতে যখন আসত চখা, ধুবড়িতে, তখন ইতুর বয়স হবে আট-দশ বা একটু বেশি। ব্রহ্মপুত্রের পাড়ের STAND-এ হাঁটতে নিয়ে যেত ইতু চখাকে। অস্পষ্ট মনে আছে। ওর ভালো নাম রীতা। বিয়ে করেনি। ওর ছোট বোন মানাও বিয়ে করেনি। বেশ আছে নদীপারের হু হু-হাওয়া, চর-পড়া গাঢ় সবুজের আস্তরণের ঘেরের কলুষহীন ধুবড়িতে। ইতু কাজ করে স্টেট ট্রান্সপোর্ট-এ আর অবসর সময়ে অভিনয়ও করে। বড় রাস্তাগুলোতে যদি-বা ট্রাক বাস বা গাড়ি চলাচল কিছু আছে, ছাতিয়ানতলার গলি একেবারেই নিস্তরঙ্গ।

নিতে তো ওঁরা এসেছেন কিন্তু বরবাধা থেকে ফিরে দুপুরের খাওয়া খেয়ে ওঠার পরই তামাহাট যেন ভেঙে পড়েছে পিসিমার বাড়ির উঠোনে। কে যে আসেনি! দাতুর ছোট, চলে-যাওয়া ভাই বাবুর বিধবা স্ত্রী তাপসী তার ছেলেকে সাজিয়ে-গুজিয়ে নিয়ে এসেছে। ছেলেটি ভালো হবে। চখার মন বলল, তার মধ্যে ভালোত্বর সব লক্ষণ পরিস্ফুট। বড় হবে জীবনে। আশীর্বাদ করল মনে মনে। ভানু, চানুর স্ত্রী মিঠু। বিনয়, বিনয়ের সুন্দরী শিশুকন্যা, বিনয়ের বাবা। তিনি এখন মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। রতু জেঠুর ছোট ছেলে বাবলা এবং তার কবি-স্ত্রী নীলিমা। কুট্টিদা, সুরেন জেঠুর মেজ ছেলে।

রাঙাপিসিও এসেছিলেন এবং আরও কত চেনা ও আধচেনা মানুষ। ঝন্টুর স্ত্রী কসমিক, শালা শক্তি এবং আর তার স্ত্রী দেবী তো ছিলই মজুদ।

পিসিমা রুদ্রাক্ষর গাছটা ছেঁটে ফেলার পরই বেলুদা মারা যান। তাই নিয়ে অনেক অনুশোচনা করলেন।

ভাবছিল চখা, কত রকমের সংস্কার থাকে মানুষের!

হাঁসের বাড়ি ফিরে এল, সার দিয়ে, প্যাঁক-প্যাঁক করে হেলতে-দুলতে। তক্ষক ডেকে উঠল লটকা গাছে। জলপাই গাছের ডালে দিনশেষের আলো এসে পড়েছে। লালাবাবু বেলা যায়। যেতে হবে এবারে।

ধুবড়ির বইমেলার তরফের হীরেনবাবুও ভিতর-বাড়িতে এসে ঢুকলেন ইতুর সঙ্গে। বরকে আরও বেশিক্ষণ ছেড়ে রাখার পক্ষপাতী তিনি নন। গোরুদের গোয়ালে ফেরার সময় হল, বরের সংসারে জুতবার। সংসারও তো এক খোঁয়াড়। কী বর আর কী বউ-এর!

পিসিমাকে প্রণাম করে উঠল চখা। অন্ধকার হয়ে গেছে। গদিঘরের সামনে ততক্ষণে ভিড় জমে গেছে। বাদল মিত্তিরের শালার ছেলে লেখক হয়েছে, তাকে নিয়ে এসেছে সসম্মানে ধুবড়ি থেকে মানুষে, এ যেন তামাহাটের এক বিশেষ সম্মান। পরিচিত-অপরিচিত কত মানুষই যে দাঁড়িয়ে আছেন চখাকে বিদায় দেবার জন্যে!

কে বলতে পারে! এই হয়তো তামাহাট থেকে চিরবিদায়। বহু বছর পরে এসেছে। আর কি এ-জন্মে আসা হবে? জীবন যে বড়ই ছোট। কতখানি যে ছোট, তা জীবনের বেলা পড়ে এলেই শুধু বোঝা যায়। টগবগে যৌবনে পথের শেষে পৌঁছনোর কথা এবং সেই গন্তব্যর অনুভূতি সম্বন্ধে কোনো ধারণা করাও অসম্ভব।

ঝন্টু চলল চখার সঙ্গে, নীতবর হয়ে। আসলে, চখার দেখভাল করারই জন্যে। জীপের পেছনে হীরেনবাবু, ঝন্টু এবং সেকেন্ডারি স্কুলের হেডমাস্টারমশাই। তিনি পথে নেমে যাবেন গৌরীপুরে। তারপর বাস ধরে যাবেন গুয়াহাটি। দাতু একশো বিশ জর্দা দিয়ে পান খাওয়াল চখাকে জিপ ছাড়বার আগে। শেষ দান।

এই কি গো শেষ দান?

সকলের দিকে হাত তুলে চখা জিপের সামনের বাঁদিকের সিট-এ বসল। ওর পাশে ইতু বসেছে। শিশুকালের অথবা ছেলেবেলার মতন। আশ্চর্য! তখন কত কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি বসা যেত সহজেই। কোনোই সংকোচ ছিল না। শিশুমাত্রই দেবশিশু। এখন আর তেমন করে বসা যায় না। সময় বড়ই বেরসিক। সে বড়োই দূরত্ব রচনা করে দেয় একে অন্যের মধ্যে, বিশেষ করে নারী ও পুরুষের মধ্যে। আড়ষ্ট হয়ে বসেছে ইতু। চখাও যতদিন পারে বাঁ দিক ঘেঁষে বসেছে।

চখা বাঁ হাতটি অস্ফুটে তুলে বলল, যাই।

ভিড়ের মধ্যে থেকে কে যেন বলে উঠলেন, কোনো গুরুজনই হবেন, মুখ দেখতে পেল না তাঁর, বললেন, যাওয়া নাই, আইস্যো। আবার আইস্যো য্যান শিগগির। আমাগো ভুইল্যা যাইয়ো না চখা।

চখা সেই কথার পিঠে কিছু বলতে গেল। কিন্তু তার গলার কাছে কী যেন দলা পাকিয়ে উঠল। বলা হল না কিছু। বলা গেল না।

জিপটা ছেড়ে দিল একটা ঝাঁকুনি তুলে, হেডলাইট জ্বেলে।

চখা ভাবছিল, কে জানে! আবার কোনোদিনও আসা হবে কি না। না-হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। যদি হয়ও, তবে কি আর পিসিমা, রাঙাপিসি, কুট্টিদা এবং আরও অনেকে এমনই থাকবেন? তাঁরা সকলেই তো আর নিজের চেয়েও বয়সে অনেকই বড়। ফিরে যাওয়ার বেলাতে যে আগে পরে নেই কোনো। সব হিসেবপত্র শুধু আসার সন তারিখ দিয়েই হয়। তবুও সকলেই তো লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েই আছেন। কখন যে কার ডাক পড়বে নদীপারে, শোর উঠবে, "বল হরি, হরি বোল," কে বলতে পারে! দুলতে দুলতে চলে যাবে অন্যদের কাঁধে। অবুঝ, শক্ত হয়ে-যাওয়া মাথাটা একবার এপাশ, আরেকবার ওপাশ করবে। খই ছড়াতে ছড়াতে যাবে সামনে চানু, বাবলা, দীপ আর খোল কর্ত্তাল বাজিয়ে, গাইতে গাইতে যাবে আগে আগে কুমারগঞ্জের কেষ্ট, "নে মা আমায় কোলে তুলে, আমি যে তোর খারাপ ছেলে।"

৫

ধুবড়ি শহরের সার্কিট-হাউসটি ভারী সুন্দর। একেবারে ব্রহ্মপুত্রর উপরেই। নদীর পাশে বসে নদীর দৃশ্য দেখার একটা জায়গা আছে। মনোরম।

সার্কিট-হাউস অবশ্য গুয়াহাটি শহরেরও খুব ভালো। সেটি ব্রহ্মপুত্রের একেবারে উপরে। চখা, নামেরই কারণে জলের পাখি বলেই কি না বলতে পারে না, তবে নদীমাত্রই বড় ভক্ত সে।

এখন কাকভোর। চখা একা বসেছিল নদীর দিকে চেয়ে। এখন দেখলে ব্রহ্মপুত্রের ভয়াবহতা কিছুই বোঝা যায় না। তার ভয়াল রূপ দেখতে হয় ভাদ্র-আশ্বিনে। ভরা শ্রাবণেও।

রবীন্দ্রনাথ চমৎকার করে বলেছিলেন, নদীর সাগরে গিয়ে থামার প্রকৃত মানে। বলেছিলেন যে, থামা মানেই ফুরিয়ে যাওয়া নয়। সেই থামা মানে নিজেকে নবীকৃত করা বা ঐরকমই কিছু।

তিব্বতের চেমায়ুং-জং হিমবাহ থেকে ব্রহ্মপুত্রর জন্ম। তারপর তিব্বতের ভিতর দিয়ে সতেরোশো কিমি প্রবাহিত হয়ে এসেছে সে। তখন অবশ্য তার নাম, ব্রহ্মপুত্র নয়, সাংপো। ভারতে এসে ঢুকেছে সাংপো প্রথম অরুণাচল প্রদেশে। সেখানে তার নাম হয়েছে ডিহাং। সদিয়ার কাছে সে হঠাৎ নেমে এসেছে হিমগিরি ছেড়ে সমতল থেকে মাত্র দেড়শো ফিট মতন উচ্চতাতে। সেখানেই ডিবাং আর

লুহিত এই দুটি নদীও এসে সাংপোর সঙ্গে মিলিত হয়েছে আর তখনই তার নতুন নাম হয়েছে ব্রহ্মপুত্র।

গঙ্গা যেমন গিরিরাজের কন্যা, ব্রহ্মপুত্রও কি ব্রহ্মার পুত্র? জানে না চখা। কলকাতায় ফিরে, দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞেস করবে।

যে দেশে পাখিরা শুধুই পাখি, গাছেরা শুধুই গাছ সেখানে নদীরাও শুধুই নদী। তাই জানার ইচ্ছা যাঁদের আছে তাঁরাই জানেন যে, এই পৃথিবীতে কোনো বিষয়েই জানার কোনো শেষ নেই। শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে পৃথকীকরণের উপায় তাঁদের দেরাজের মধ্যে গোল করে পাকিয়ে-রাখা কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট নয়, তাঁদের জিগীষারই তারতম্য।

আসামের পূর্ব ভাগ দিয়ে বিষধর সাপের চাল-এর মতন এঁকেবেঁকে একের পর এক দ্বীপের সৃষ্টি করে একদিকে পাড় ভাঙতে ভাঙতে, অন্যদিকে চর ফেলতে ফেলতে বয়ে গেছে ব্রহ্মপুত্র শত শত মাইল। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় "নদী-দ্বীপ" গজিয়ে উঠেছে ব্রহ্মপুত্রেরই বুকে। ডিব্রুগড়ের কাছে। যেখানে ব্রহ্মপুত্র প্রায় সাড়ে ষোলো কিমি চওড়া। সেই দ্বীপের নাম "মাজুলি", তার আয়তনও প্রায় সাড়ে নশো বর্গ কিমি। তারও পর গুয়াহাটির কাছে এসে আরেক নতুন দ্বীপ গড়েছে সে। তার নাম 'ময়ূর' দ্বীপ বা PEACOCK Island.

উত্তর-দক্ষিণ দুদিক থেকেই অনেকগুলি উপনদী এসে মিশেছে এই ব্রহ্মপুত্রে। উত্তর থেকে এসেছে যারা তাদের মধ্যে সুবনসিরি, কামেং বা জিয়া ভরলি (সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ-এর একটি বিখ্যাত উপন্যাসের নাম এই নদীর নামে), মানস এবং সংকোশ।

মানস ও সংকোশ হিমালয়ের বরফাবৃত অঞ্চল থেকে নেমে আসার কারণে সারা বছরই তাদের জল হিমশীতল। "যমদুয়ারে" শিকারে গিয়ে ভুটানের মহারাজা এবং চখার সঙ্গী-সাথী সাহেব-সুবোরা নদীর বালির নিচে বিয়ারের বোতল পুঁতে রেখে দিতেন রেফ্রিজারেটরের বদলে। এই মানাসের অববাহিকাতেই মানাস টাইগার প্রজেক্ট। আর সংকোশের পারে চখা চক্রবর্তীর প্রিয় যমদুয়ারের বন।

দক্ষিণ থেকে ব্রহ্মপুত্রে এসে মিশেছে বুড়িডিহিং, ধানসিঁড়ি, কোপিলি আর কালাং। আরও কিছু উপনদী আছে যাদের প্রত্যেকেরই উৎস ভুটান ও সিকিমের বরফাচ্ছাদিত নানা পর্বতে। এই সবকটি উপনদীই পশ্চিমবঙ্গ পেরিয়ে বাংলাদেশে সেঁধিয়েছে। তারা হল তিস্তা, জলঢাকা, তোর্সা, কালজিনি এবং রায়ডাক।

এতসব কথা মনে এল এলোমেলো। একা থাকলেই ওর ভাবনাগুলো কিলবিল করে। আসলে একা থাকলেও ও কখনোই একা থাকে না তো! কত পুরুষ ও নারী, কত গাছ-গাছালি পাখ-পাখালি তাকে সর্বক্ষণই ঘিরে থাকে যে, তা বলার নয়। তাদের চোখে দেখা যায় না কিন্তু চখা অনুক্ষণ তাদের অস্তিত্ব অনুভব করে। মাঝে মাঝে তার মনে হয় সেইজন্যেই যে, তার ব্যক্তিত্বটা কোনো একক ব্যক্তির নয়, সে সর্বজনীন। সর্বজনীন বললেও হয়তো সব বলা হয় না, বিশ্বজনীন বলাই হয়তো ভালো। সারা পৃথিবীর সঙ্গে তার মনে মনে ঘর করা। এই ঘর করার রকম অন্য কারোকে বলা যায় না, বোঝানোও যায় না।

আজ কাকভোরে উঠে যে নদীপারের এই বসবার জায়গাতে এসে বসেছে তার কারণ আছে।

ঝন্টু চখারই ঘরে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। এখনও ঠান্ডার আমেজ আছে বেশ এখানে। সকাল-সন্ধেও ভারী মনোরম। শেষ রাতে নিজের পাশে কোনো উষ্ণ শরীরের তরুণী আছে ভেবে সুখস্বপ্ন দেখতে না দেখতেই ঝন্টুর সরব উপস্থিতি সেই সুগন্ধি স্বপ্নে গোবর-ছড়া দিয়ে দেয়। অসহ্য ঘোঁৎ-ঘোঁৎ শব্দে নাক ডাকে।

ঝন্টু বলে, চখা নিজেও নাকি নাক ডাকে।

হবে। কে আর কবে নিজের নাক ডাকা শুনেছে আধ-ঘুমন্ত অবস্থার ফুরুৎ-ফুরুৎ শব্দ ছাড়া?

তার পাশের ঘরে আছেন নিমাইদা। প্রাক্তন সাংবাদিক ও বর্তমানে শুধুই সাহিত্যিক নিমাই ভট্টাচার্য এবং তাঁর স্ত্রী দীপ্তি বৌদি। নিমাইদা বৌদির এখনও বহুত প্রেম আছে। আশ্লেষে শুয়ে আছেন তাঁরা।

নিমাইদার সুন্দর চেহারাটি, চখার ধারণা, মিস্টার ব্রহ্মা নিজের হাতে এবং অনেক সময় নিয়েই গড়েছিলেন, নইলে কোনো মানুষের চেহারা "নিখুতি" মিষ্টির মতন এমন মিষ্টি হওয়া সম্ভব ছিল না। ধবধবে ফর্সা রঙ, উজ্জ্বল ত্বক, পঁয়ষট্টি বছর বয়সেও পনেরো বছরের তরুণের মতন ছটফটে সহাস্য স্বভাব। এমনটি বড় দেখেনি চখা।

কলকাতাতে ওঁর সঙ্গে অতি সামান্যই দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে, পয়লা বৈশাখে বইপাড়াতে, কলকাতা বইমেলাতেও, কিন্তু সে পরিচয় এক, আর কলকাতার বাইরে এসে দিনরাতের আঠারো ঘণ্টা একসঙ্গে থাকা আরেক।

মিস্টার ব্রহ্মা ছোট্টখাট্ট নিমাইদাকে শুধু যত্ন করে যে গড়েছেন তাই নয়, এই ধরাধামে পাঠাবার সময়ে নিজে হাতে তাঁর চুলটি পর্যন্ত আঁচড়ে পাঠিয়েছেন। এক মাথা, "ব্রুনেট" মেমেদের মতন ঘন চুল পরিপাটি করে আঁচড়ে দিয়েছেন এমনই করে যে, জীবনে কোনোদিনও চিরুনির প্রয়োজন পড়েনি নিমাইদার। ঝড়ে অথবা বসন্তের হাওয়াতে অথবা রণে অথবা রমণেও নিমাইদার মাথার একটি চুলও এদিক-ওদিক হয় বলে চখার মনে হয় না। অমন একখানা "CUSTOM-BUILT" চেহারা যদি ঈশ্বর চখাকে দিতেন তবে চখা চক্রবর্তী একটি শতরঞ্চি বিছিয়ে হাওড়া স্টেশানের প্লাটফর্মে বসে ভিক্ষে চাইলেও তার দিন চমৎকার গুজরান হয়ে যেত। ঈশ্বর বড়ই একচোখা। যাকে দেন, তাকে ছপ্পর ফুঁড়েই দেন, আর যাঁকে দেন না, চখা চক্রবর্তীর মতন 'কানা ছেলে পদ্মলোচন' নাম নিয়েই তাকে খুশি থাকতে হয় সারাজীবন।

পরিকল্পনামতো "সবুজের আসর" আয়োজিত গোয়ালপাড়ার এই ধুবড়ি শহরের প্রথম বইমেলার উদ্বোধন হয়ে গেছে। নিমাইদাই করেছেন। সঙ্গে পোঁ ধরেছিল চখাও। আজ অসমিয়া সাহিত্যের উপরে সেমিনার আছে বিকেলে। আগামীকাল ইংরেজি সাহিত্যের উপরে। আর তার পরদিন বাংলা সাহিত্যের উপরে। যে কারণে, নিমাইদা এবং চখাকে ঐ সংস্থার কর্মীরা এবং স্থানীয় বাঙালিরা কলকাতা থেকে অনেক খরচ করে আনিয়েছেন।

নিমাইদা আগে এদিকে আসেননি কিন্তু চখা এসেছে। তামাহাটের, গৌরীপুরের, ধুবড়ির আত্মীয়রাই তাকে বারেবারে এই অঞ্চলে নিয়ে এসেছেন। এবারে "সবুজের আসর" বইমেলার উদ্যোক্তারা আবার ফিরিয়ে আনলেন তাকে। ওঁরা আবারও না আনলে হয়তো চখার আসাই হত না আর। তাই এই প্রত্যানয়ন তার কাছে এক গভীর অর্থবাহী। বড়ই সুখের।

খরচটা বড় কথা নয়। তার চেয়েও অনেক বেশি ভালোবাসা খরচ করেছেন ওঁরা ওঁদের দুজনের উপরে। আন্তরিকতা শব্দটির তাৎপর্যই কলকাতার মানুষেরা ভুলে গেছেন হয়তো। সেখানে পরিবেশ দূষণের জন্যে নিশ্বাস নিতেও যেমন কষ্ট, নানারকম অপ্রয়োজনীয় গগনবিদারী আওয়াজে (যেমন লাল বাতি জ্বালানো ভি.আই.পি.দের গাড়ির সাইরেন!) যেমন কথা বলা বা শোনাও কষ্ট, কারোকে একটু ভালোবাসাও যেমন কষ্ট, মন এবং শরীর দুইয়ের ভালোবাসাই, তেমনই আন্তরিক হওয়াটাও বোধহয় অসাধ্য। অন্তরই যেখানে নিরন্তর চৈত্রের হাওয়ার নদীচরের ঝুরো বালিরই মতন ঝুরঝুর করে উড়ে যাচ্ছে, সেখানে আন্তরিক হয়ই বা মানুষে কেমন করে!

ধুবড়ি-গৌরীপুর-তামাহাটের সবচেয়ে বড় আনন্দ এখানে ভি.আই.পি. বা লাল আলো জ্বালানো বেশি গাড়ির ভিড় নেই। পিঁ-পিঁ-পাঁ-পাঁ আওয়াজ করে শূন্য-কুম্ভের মতন, শয়ে শয়ে নিরীহ শান্তিকামী

খেটে-খাওয়া মানুষের পিলে চমকে দিয়ে নিরন্তর "অকাম কইরবার লইগ্যা" তাঁদের যাওয়া-আসা নাই। মানুষের দাম দিনে দিনে যতই কমছে, ভেরি ইমপর্ট্যান্ট পার্সন-এর সংখ্যা ততই বাড়ছে। বাঁশবন যত বড়, শেয়ালরাজাদের সংখ্যাও তত বেশি। আগে পুলিশের গাড়ি, পেছনে পুলিশের গাড়ি, তারও আগে ভটভটিয়া ভটভট-করা সাইরেন বাজানো সার্জেন্ট। মধ্যেখানে লাল-আলো জ্বালানো গাড়ি।

চখা মনে মনে ঘেন্নাতে বলে, আরে খোকা। তোদের মারছেটা কে? নিজের জীবিকার্জনের ক্লান্তিতে সবাই এতই ক্লান্ত যে, সময় থাকলে কিছু ছারপোকা, তেলাপোকা, বা মশা-মাছি মারারই চেষ্টা করত তারা। কিন্তু তোরা "কে র‍্যা"? তোদের নিয়ে মাথাটাই বা ঘামায় কে? আর তোরা তো ভোটদাতাদের চাকর, তাদের সেবাদাস। ভাব দেখলে মনে হয় তোরাই বুঝি রাজা-রানি। হাসি পায়। তোরা কি জানিস সাধারণে কোন চোখে দেখে তোদের মতো ভি.আই.পি.দের? ভি.আই.পি হলেও হতে পারতেন গুণীরা। তোদের কোন গুণটা আছে যে, সদাই সাধারণ মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখিস? তোদের সব দলের রঙই তো সাধারণের জানা হয়ে গেছে। তবুও কোন লজ্জায়, নির্লজ্জ অকারণ উচ্চমন্যতার দুর্মর কর্বুর রোগে ভুগে তোরা দিনে-রাতে শ্যামের বাঁশি বাজাতে বাজাতে যাস অপদার্থ, আত্মসম্মানজ্ঞানহীনেরা?

চখার ইচ্ছে করে ঐসব ভি.আই.পি.দের (কোন শালা ভি.আই.পি. নয় আজকাল? হাঃ।) গাড়ির লাল বাতিগুলো খুলে নিয়ে সেই ভি.আই.পি.দের প্রত্যেকের পেছনে লাগিয়ে দেয়। জোনাকি করে দেয় সব শালা ঘুষখোরদের। রক্তচোষাদের। তারপর দেখুক নিজের নিজের পশ্চাৎদেশের আলোতে নিজেরা নিজেদের!

"লজ্জা" শব্দটা কি দেশ থেকে উধাওই হয়ে গেল?

হঠাৎ চটকা ভাঙল চখার, কারও গলার আওয়াজে।

কতক্ষণ?

ফিঙে বলল।

চখা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল ফিঙের দিকে। বলল, তুমি!

অভাবনীয় মিথ্যে বলবে না, বাগডোগরাতে প্লেন থেকে নামার পর থেকেই ফিঙের কথা যে তার মনে আসেনি তা নয়। কিন্তু হৃদয় খুঁড়ে কে আর বেদনা জাগাতে চায়? শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতারই মতন তার মন বলতে চেয়েছিল, "তোমায় আমি ভোগ করেছি তোমায় বিনাই"।

গৌরীপুরে সামান্য সময় কলেজে পড়ার স্মৃতি তাকে বড় মেদুর করে তুলেছিল। বড় বড় গাছের সারির মধ্যে দিয়ে সোজা চলে যাওয়া পথ, নদীর গন্ধ, ফিঙের সঙ্গ। যা হারিয়ে গেছে তা গেছেই। হারানো জিনিসের প্রতি ওর কোনো মোহ নেই। হারানো জিনিস মূর্খরাই ফিরে চায়। তা সে জাগতিক কোনো বস্তুই হোক কী স্মৃতি, অথবা ভালোবাসাও। তবে এটা স্থিরই করেছিল যে ও এসে ফিঙের খোঁজ করবে না নিজে। গৌরীপুর থেকে গুয়াহাটি, তারপর গুয়াহাটি থেকে ধুবড়িতে যে এসে থিতু হয়েছে ফিঙে, সে খবর কলকাতাতে বসেই পেয়েছিল এক পরিচিতর চিঠিতে। গৌরীপুরের বিল্টু। তার একসময়ের জিগরি দোস্ত।

ফিঙের স্বামী এখনও থকেন গুয়াহাটিতেই কিন্তু ফিঙে নাকি ধুবড়িতেই থাকে। সুন্দর বাড়ি করেছে নাকি অনেকখানি জমি কিনে। ফুলের বাগান। ওর স্বামীও যে এই সময়ে ধুবড়িতেই আছেন ছুটিতে তাও লিখেছিল বিল্টু। ফিঙের খবর জানত সবাই কিন্তু গা করেনি চখা। ঐ একই কারণে। সেলাই-করা ক্ষত পুরনো হলেও সেই ক্ষতস্থানে আঘাত লাগলে ব্যথা লাগেই। এমনিতেই বেঁচে থাকতে অনেকই কষ্ট। কষ্ট আর বাড়িয়ে কী হবে?

ভালো করে তাকাল চখা ফিঙের দিকে। বিশ্বাস হচ্ছিল না ওর।

সবে সূর্য উঠছে। ফিঙের ছায়া পড়েছে মাটিতে লুটিয়ে। সাদা, নরম, প্রভাতি আলো যেন ফিঙের কালো রূপের কাছে হার মেনে ভুলুণ্ঠিত রয়েছে লজ্জাতে।

চখা দেখছিল যে, ফিঙে দাঁড়িয়ে আছে। কাছেই আছে। অথচ কত দূরে। কতগুলো বছর কেটে গেছে মাঝে। কত্তগুলো। অথচ ফিঙে ঠিক তেমনই আছে। গৌরীপুরের প্রমথেশ বড়ুয়া কলেজ থেকে বই-খাতা দু হাতে বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে, ভীতা হরিণীর মতন দুদিকে দু বিনুনি ঝুলিয়ে যেমন করে বাড়ি ফিরত, ঠিক তেমনই। আশ্চর্য! ঠিক তেমনই। বছরগুলো নিজেরাই বুড়ি হয়ে গেছে যেন, ফিঙেকে ছুঁতে না পেরে।

চখা অস্ফুটে বলল, বসো। পাশে বসো।

পাশে থাকলে দেখা যায় না একে অন্যকে। এখানেই ঠিক আছে। তোমাকে দেখি।

আমাকে?

লজ্জিত, অপদস্থ, চখা বলল।

তারপর বলল, আমাকে কি দেখবে? আমি কি আর দেখার মতন আছি?

দেখে তো, যে দেখে, তার চোখই। যাকে দেখে, সে দ্রষ্টব্য কি না, তা সে নিজে কতটুকু জানে। নড়ো না চখাদা। তুমি তেমনই ছটফটে আছো। তোমাকে দেখতে দাও ভালো করে।

চখার সেই আবেশের মধ্যেও হাসি পেয়ে গেল ফিঙের কথা শুনে।

হাসছ যে? আমাকে দেখে কি তোমার হাসি পাচ্ছে?

ফিঙে আহত গলাতে বলল।

না। তোমাকে দেখে নয়। একটা গল্প মনে পড়ে গেল আমাকে "ছটফটে" বলাতে।

কী গল্প?

বলেই, সেই ছেলেবেলায়, জলপাই গাছটার তলাতে মুনিষদের কেটে ফেলে রেখে যাওয়া বুনো তেঁতুলের কাটা গুঁড়ির উপরে যেমন করে ওরা বসত পাশাপাশি, তেমন করেই বসল ফিঙে।

আবার ফিঙে বলল, বলো।

একজন পেটুক ছিল। সে এক বিয়েবাড়িতে গিয়ে এমন খাওয়াই খেয়েছে যে আর হেঁটে ফিরতে পারে না বাড়িতে। দুই বন্ধুর কাঁধে হাত রেখে কোনোক্রমে সে ফিরছিল বাড়ির দিকে, এমন সময়ে পাড়ার মোড়ের পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে-থাকা ছোঁড়ারা বলল, "আরে এ ভগলু, বেগাড় পইসা খনা মিলা ত ইতনাহি খা লি, যো চলনে ভি নেহি শকতা?"

কোথাকার গল্প?

ফিঙে বলল।

গিরিডির। আমার মামাবাড়ির। ছোটমামার মুখে শোনা।

তারপর?

তারপর ভগলু দু বন্ধুর কাঁধে ভর দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "আরে ম্যায় ক্যা খায়া, খায়া তো জুগনু। উ দেখো! উ চৌপাইমে সওয়ার হো কর আ রহা হ্যায়।"

এ গল্পর মানে?

ফিঙে বলল।

মানে, আমার পাশের ঘরে নিমাইদা আছেন। তাঁকে দেখলে "ছটফটে" কাকে বলে, তা তুমি বুঝবে। প্রতি মুহূর্ত শরীরের প্রতিটি মাংসপেশী ছটফট করছে। সত্যি! নিমাইদার সঙ্গে দুটি দিন না কাটালে 'প্রাণশক্তি' ব্যাপারটা যে কী, সে সম্বন্ধে কোনো ধারণাই হত না।

সত্যি?

সত্যি!

সুন্দর চেহারা।

কার?

নিমাইবাবুর।

তুমি দেখলে কখন? তুমি কি বইমেলা উদ্বোধনের সময়ে এসেছিলে? কই? দেখিনি তো!

না। আসিনি। আমার বাড়ির বারান্দা থেকে শোভাযাত্রাতে দেখেছিলাম ওঁকে। উনিই যে নিমাই ভট্টাচার্য তা জানতাম না। তোমার বর্ণনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে বলে এখন জানলাম।

ও।

ছটফটানি অনেক রকম হয়। আমিও ছটফটে। কিন্তু সেই ছটফটানি বাইরে থেকে দেখা যায় না।

সেটা কীরকম?

সেটা ভিতরের ছটফটানি। গভীর নদী যখন তার তলের পাহাড় ও ধারালো পাথরে নিয়ত রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত হতে হতে বয়ে যায়, তখনও বাইরে থেকে দেখে মনে হয় তার কোনো কষ্ট নেই। ব্যথা নেই। শান্ত, প্রায় স্থির দেখায় তাকে। অথচ যার চোখ আছে, সে তার ভিতরের কষ্টটা দেখতে পায়।

বাবা! তুমি দেখি দার্শনিকের মতন কথা বলছ। দার্শনিকের সঙ্গে বিয়ে হলেও যে দার্শনিক হয়ে ওঠে মানুষে তা তো জানা ছিল না! শুনেছিলাম, তোমার স্বামী দার্শনিক।

হাসল, ফিঙে।

বলল, সব মেয়ের স্বামীই দার্শনিক। কিন্তু তাঁরা জানেনও না যে, তাঁদেরই নিজস্বার্থময় "দর্শনে" প্রভাবিত হয়ে প্রত্যেক স্ত্রীও একদিন দার্শনিক হয়ে যান। তবে তুমি অবশ্য নির্বোধই। চিরদিনের। তোমার চোখ নেই। মন নেই। তাই আমাকে দেখেও দেখোনি, জেনেও জানোনি। অবশ্য এখন মনে হয় যে, বুদ্ধিমান পুরুষকে ভালোবাসার চেয়ে মেয়েদের পক্ষে নির্বোধ পুরুষকে ভালোবাসা অনেক নিরাপদ। যদি তোমার চোখই থাকত তবে তোমার ঐ দুটি ড্যাবা-ড্যাবা চোখের দূরদৃষ্টির সামনে দিয়ে সেই "দার্শনিক" আমাকে "ড্যাং ড্যাং" করে বিয়ে করে নিয়ে যেতে পারত না।

চখা বলল, আমাদের সময়ে ঐরকম ড্যাং ড্যাং করেই অন্যমানুষের সঙ্গে প্রেমিকাদের বিয়ে হত। সকলেরই। যাদের ভালোবেসেছি আমরা, তাদের সঙ্গে আমাদের প্রজন্মের কম মানুষেরই বিয়ে হয়েছে। আজকাল যেমন উলটোটাই নিয়ম। সে কারণেই হয়তো ভালোবাসা সম্বন্ধে আমাদের এখনও এত রোম্যান্টিসিজম বেঁচে আছে।

ফিঙে চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ।

তারপরে বলল, তাই?

তাই তো! কিন্তু এখন ভাবি, ভাগ্যিস তেমন হত তখন। ভালোবাসাটা আলাদা ব্যাপার। চিরদিনই। ভালোবাসাটা যে বিয়েতে পৌঁছে ফুল-ফলন্ত হয়ে উঠবেই, এমন কোনো ধরা-বাঁধা নিয়ম তো নেই। বরং আমি বলব, তোমাকে একটু দেখতে পেয়েই যেরকম খুশিতে আমার মন ভরে উঠত, তেমন খুশি, তুমি আমার বিবাহিত স্ত্রী হয়ে এসে ঘর করলে হয়তো কখনোই হতে পারতাম না। এটা কোনো দোষ বা গুণের ব্যাপার নয় ফিঙে। এটা ঘটনা। এটাই সত্যি। আমরা স্বীকার করি আর নাই করি। বিবাহিত জীবন মানেই টাকা-পয়সা, ছেলে-মেয়ে-সংসার, অভ্যেস, পরশ্রীকাতরতা, নিজেদের এবং অন্যের। সেই আবর্তে পড়ে ভালোবাসার লাশ-কাটা ঘরের লাশ-এরই মতন অবস্থা হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই।

ওসব কথা থাক।

তুমি তো জানতে যে আমার গুয়াহাটিতেই বিয়ে হয়েছে। বিয়ের পরে গৌরীপুর থেকে সেখানেই গেছিলাম। আমি যে ধুবড়িতে থাকি এখন, তা তুমি জানলে কী করে?

ফিঙে শুধোল।

জেনেছিলাম বলেই তো গণেশ সেনের সই-করা "সবুজের আসরের" নেমন্তন্ন পেয়েই একবাক্যে আসব বলে রাজি হয়ে গেলাম। নইলে সচরাচর আমি কোথাওই যাই না।

কেন? যাও না কেন?

প্রথমত, আমি এখনও "সাহিত্যিক" হয়ে উঠতে পারিনি, সেইজন্যে। দ্বিতীয়ত, আমার মনে হয়, সাহিত্যিকের যথার্থ স্থান তাঁর লেখার টেবল-এ। তিনি নিজে অন্য জীবন যাপন করতে অবশ্যই পারেন ব্যক্তি হিসেবে। কিন্তু সাহিত্যিক হিসেবে নিজেকে সব সময়ে লুকিয়ে রাখাই বোধহয় ভালো।

কেন?

বিমল মামা, মানে বিমল মিত্র এই কথাই বলতেন। বলতেন, একজন সাহিত্যিক নায়কও নন, খেলোয়াড়ও নন। তাঁর স্থান আলোজ্বলা মঞ্চে নয়। দূরদর্শনের পর্দাতেও নয়। তাঁর সঙ্গে পাঠক-পাঠিকার যোগসূত্র থাকা উচিত শুধুমাত্র তাঁর লেখারই মাধ্যমে। পাঠক-পাঠিকারও সাহিত্যিককে চোখে না দেখাই ভালো। সাহিত্যিকেরও উচিত পাঠক-পাঠিকার কাছে না-যাওয়া।

তাই? বিমল মিত্র তাই বলতেন বুঝি?

হ্যাঁ।

তুমি যদি জানতেই আমি এখানে আছি তাহলে আসামাত্রই যোগাযোগ করলে না কেন?

বাঃ। ভালোই বলছ তো! তুমি যদি আমাকে না চিনতে চাইতে! তোমার বর, তোমার ঘর, তোমার ছেলেমেয়ে সম্বন্ধে তো কিছুই জানতাম না আমি। এখনও জানি না। তামাহাট, গৌরীপুর, ধুবড়ির পাট কি আমার আজকে চুকেছে! সেসব কতদিনের কথা! আমি জানতাম যে, আমি যে আসছি, সে খবরটা তোমার কানে ঠিকই পৌঁছবে।

কী করে সে কথা জানতে?

আমি তো আর সেই সব দিনের পরিচয়হীন চখা চক্রবর্তী আজ নেই। আমার আসা-যাওয়ার আগে আগেই ফুলগন্ধর মতন খবর ওড়ে। জানতাম, আমি এলে তুমি খবর পাবেই। শুধু ধুবড়িতে আসার খবরই নয়, আমার মৃত্যুসংবাদও পাবে কাগজে, রেডিয়োতে, টিভিতে। যে দুঃখ তুমি দিয়েছিলে একদিন, তার শোধ আমি এমনি করেই তুলব।

তুমি যেমন নির্বোধ ছিলে তখন, এখনও ঠিক তেমন নির্বোধই আছো। তোমার লেখা বই কোন নির্বোধেরা পড়ে যে তোমাকে বিখ্যাত করল, তা ঈশ্বরই জানেন!

হাসল চখা। কিন্তু শব্দ হল না কোনোও।

বলল, তুমি হয়তো জানো না যে, বোধের নানারকম স্তর থাকে। বুদ্ধিমান এবং নির্বোধদেরও। আমার স্তরের নির্বোধেরাই হয়তো আমার লেখা পড়েন।

তারপরে বলল, আজ ঝগড়া করবে বলেই কি কাল সার্কিট-হাউসে ফোন করেছিলে? তুমি কি জানো যে তোমার সঙ্গে এখন এখানে আমার দেখা হওয়ার কত বাধা? সেদিনের কনসার্ভেটিভ গৌরীপুরের সেই কলেজ-ছাত্রীর সঙ্গে দেখা করাও হয়তো আজকে তোমার সঙ্গে দেখা করার চেয়ে অনেকই সহজ ছিল।

কেন?

এই জন্যে যে এখন আমার পায়ে বেড়ি। বড় ভারী সেই বেড়ি।

কীসের বেড়ি?

খ্যাতির।

খ্যাতির বেড়ি এতই ভারী?

বড় ভীষণই ভারী, ফিঙে।

তারপরই বলল, বেলা বাড়ছে। এক্ষুনি বডিগার্ডই বলো আর নীতবরই বলো, আমার কাজিন ঝণ্টুবাবু আমার খোঁজে আসবে।

তামাহাটের?

হ্যাঁ। তাছাড়া, নিমাইদা আর দীপ্তি বৌদিও আসতে পারেন। তাঁরা সকালের চা খাওয়ার পরই এদিকে আসেন রোজই বেড়াতে।

হাসল ফিঙে।

বলল, এলে হবেটা কী? আমাদের দেখলেই বা কী হবে?

হয়তো হবে না কিছুই। তুমি আমার এক সময়ের প্রেমিকা না হলে হয়তো এই ভয়টাই জাগত না মনে। তাছাড়া আমার আর কী হবে। তার চেয়ে তোমার স্বামীকে বিকেলে বইমেলাতে আসতে বলো না। তাঁর সঙ্গে তোমাদের বাড়িতেই না হয় যাব ছাতিয়ানতলাতে। যে ঘর আমার হতে পারত সেই ঘরেই দেখব তোমাকে। তোমার স্বামীর সঙ্গে আলাপ হবে, ছেলেমেয়ের সঙ্গেও।

তারপরে বলল, তোমার ছেলেমেয়ে কী? ফিঙে?

আমার স্বামী বা ছেলেমেয়ের খোঁজে তোমার দরকার কী? আমি কি কেউই নই?

আশ্চর্য তো! তুমি ঠিক সেইরকমই আছো।

কীরকম?

অবুঝ।

তুমিও হুবহু সেইরকমই আছো।

সেটা কীরকম?

বুঝদার, হুঁশিয়ার।

চখা হেসে বলল, তোমার সঙ্গে কথায় পারব না। পারিনি কোনোদিনও।

লেখাতেও পারবে না। আমি যদি কলম ধরতাম তবে তোমার মতন অলকাপলকা লেখকেরা হাওয়ার মুখে কুটোর মতন ভেসে যেতে।

তারপর বলল, শোনো, আমি এখন যাচ্ছি। আমি আবারও আসব পরশু এখানেই। রাত আটটার সময়ে। নৌকো ঠিক করে রাখব। চাঁদের রাতে আমরা যেমন গঙ্গাধর নদীর বুকে ভেসে বেড়াতাম নৌকোতে নৌকোতে, বালুচরে চখাচখী হতাম, মনে আছে? তেমনই আজ রাতেও ভাসব ব্রহ্মপুত্রে, খেলব। আঃ!

আরে! আজ কী করে হবে! আজ যে আমার নেমন্তন্ন রাতে। শুধু আজই কেন? যে ক'দিন আছি রোজই নেমন্তন্ন। নিমাইদা-বৌদিকেই আসলে করেছেন নেমন্তন্ন ওঁরা। সঙ্গে আমাকেও হয়তো চক্ষুলজ্জাতেই।

যেয়ো নেমন্তন্নে, তবে কটা চুমু খেয়ে ও খাইয়ে একটু দেরি করেই যেয়ো না হয়।

তারপরই বলল, আচ্ছা! এবারে যেতে হবে। আমি সন্ধের পরে পরেই আসব কিন্তু।

পাগলামি কোরো না। হবে না আমার আসা ফিঙে। তখন তো বইমেলাতেই থাকব। আজকে অসমিয়া সাহিত্যর উপরে আলোচনা হবে। কনক শর্মা সাহেব, জেলার ডি.সি. ছিলেন সাত দিন আগেও, গৌরীপুরের অসমিয়া সাহিত্যিক শীলভদ্র সাহেব, এঁরা সবাই বক্তৃতা দেবেন। প্রদীপ আচার্য, যদিও ইংরেজির অধ্যাপক গুয়াহাটির কটন কলেজের, তবু তিনিও আজ মঞ্চে উপস্থিত থাকবেন। যাব বলে তাঁদের কথাও দিয়েছি। না গেলে, অসভ্যতা হবে।

সেখানে কিছুক্ষণ থেকে চলে আসতে পারবে না? আমার ডাকে সাড়া না-দেওয়াটাই কি তোমার সভ্যতার একমাত্র নিদর্শন?

জানি না। যদি না পারি?

না পারলে, পেরো না। তবু আমি এখানে আসবই সাতটার সময়ে। ঠিক সাতটা। আটটা অবধি দেখব। রিকশা দাঁড় করিয়ে রাখব। নৌকোও। যদি না আসতে পারো তো কী আর হবে? ফিরে যাব।

চখা আন্তরিক গলাতে বলল, বলল যে, সত্যিই চেষ্টা করব আমি। সত্যি! তুমি এত বছরেও একটুও বদলাওনি। তেমনই দুর্বোধ্যই আছো।

বদলেছি। অবশ্যই বদলেছি। সেই বদলটা তোমার চোখ দেখতে পায়নি। আমরা মেয়েরা, নদীরই মতন। কত যে চর ফেলেছি, পাড় ভেঙেছি, দ্বীপ গড়েছি এ ক'বছরে, তাঁর খোঁজ তুমি পাবে কী করে! তোমার যা নেবার তা তো তুমি স্বার্থপর নির্বোধ পুরুষ নিয়ে খুশি থেকেছ। তুমি ভেবেছিলে, আমার সর্বস্ব পেয়েছ। অথচ যে প্রাপ্তিকে তুমি সবচেয়ে দামি বলে ভেবেছিলে তার দাম আমার কাছে কানাকড়িও ছিল না। আমার সর্বস্ব যদি কেউ কোনোদিন পায়ও তবে তার সর্বনাশ হবে।

চখা বলল, বলছ, তোমার 'সর্বস্ব' পাওয়ার আর নিজেকে সর্বস্বান্ত করাতে তফাত বিশেষ নেই।

সাধে কী আর তোমাকে নির্বোধ বলতাম, না আজকেও বলছি?

বলেই ফিঙে বলল, যাইহোক, আশা করছি, যত অসুবিধেই থাক, ঘণ্টাখানেকের জন্যে অন্তত আসতে পারবে।

তোমার বাড়িতে আমাকে নিয়ে যাবে না? আজ দুপুরেও যেতে পারি, যদি বলো।

না।

তবে তো সার্কিট-হাউসেই তুমি আমার ঘরে আসতে পারো। ঝন্টুকে কোনো বাহানা করে কোথাও না হয় পাঠিয়ে দেব। মানে, ঘরে একাই থাকব আমি।

না। নদীতেও তো আমি একাই থাকব। দুজন একা যোগ করলেই যে দোকা হয় তাও কি জানো না? অত কথার দরকার নেই। নদীতেই যাব। আসতে পারলে এসো, না আসতে পারলেও কিছু বলার নেই। আমার ঘর...

এই অবধি বলেই, ফিঙে চুপ করে গেল।

তারপর চলে যাওয়ার আগে বলল, আমার ঘর যে নেই এমন নয়। ঘর বলতে সাধারণে যা বোঝায়, আমার ঘরে তার সবই আছে। স্বামী আছেন, পুত্র আছে, ফ্রিজ, টিভি, সোফা-সেট, সমস্যা, দৈনন্দিনতা, অভ্যেসের নিগড়, সবই। সেই থোড়-বড়ি-খাড়া খাড়া-বড়ি-থোড়। আছে সবই কিন্তু আমি একাই।

চখা চুপ করে ফিঙের মুখের দিকে চেয়ে রইল। আশ্চর্য! মুখের চামড়া আজও তেমনই টানটান আছে, সজীব, মসৃণ। একটি স্লিভলেস ব্লাউজ পরেছে। হালকা খয়েরি। আর খয়েরি কালো ডুরে শাড়ি। চুল উড়ছে ফুলের মতন, ভুলের মতন ফিঙের, ব্রহ্মপুত্রর উপর দিয়ে বয়ে-আসা প্রভাতি হাওয়াতে। ওর বোধহয় গরম বেশি। চখা তসরের একটি চাদর গায়ে দিয়ে বেরিয়েছিল অথচ ফিঙে স্লিভলেস-ব্লাউজ পরে রয়েছে। বগলের কাছে ছায়ার মতন একটু কালোর আভাস। সেই ছায়া তার শরীরের রহস্য যেন আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। মনের রহস্য তো আছেই!

ফিঙে বলল, আমরা সকলেই একা। আমার স্বামীও একা। তুমিও একা। আমার ঘর থাকলেও সেই ঘরে তোমাকে আদৌ মানাবে না চখাদা। তোমার মধ্যে আমি আমার আকাশকে দেখেছিলাম একদিন। আকাশ কি কখনও ঘরে আসে? চখা-চখীরা থাকে নদীতেই। চিরদিন। অথবা হ্রদে। অথবা

নদীচরে। উদাত্ত আদিগন্ত আকাশের নিচে। তুমি কি ভুলে গেছ যে তুমি আমাকে চখী বলে ডাকতে?

তারপর শেষ কথা বলল, এসো। এসো। নদীটাই, নদীর চরটাই আমার বারান্দা। তোমাকে ঘরে না নিয়ে গিয়ে বারান্দাতেই খেলব তোমার সঙ্গে।

যাবার সময়ে, এমনই এক চাউনিতে চাইল ফিঙে চখার দিকে যে, ওর মনে হল ও যেন ফিঙের গভীর ভালোবাসাতে চান করে উঠল।

সত্যি! এই মেয়েরা বিধাতার এক আশ্চর্য সৃষ্টি। ভাবল চখা। সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মেয়েরা জানলই না তাদের কী ছিল? তারা মস্ত বোকা বলেই পুরুষের মতন নির্গুণ, ঈশ্বরের আশীর্বাদ-অধন্য ইতর জানোয়ারদের সমান হবার জন্যে প্রাণপণ লড়াইতে শামিল হল।

এ ভারী লজ্জার কথা।

তারপর পিছু ডাকল ফিঙেকে ও।

ফিঙে তার মরালীর মতন গ্রীবা বেঁকিয়ে, ভুরু তুলে নিচু গলাতে বলল, কী?

বলতে ভুলে গেছিলাম। ঠিক তোমারই মতন একজনের সঙ্গে আলাপ হল গত সন্ধেতে বইমেলাতে।

ফিঙের মুখে ঈর্ষা এবং বিদ্রূপ ফুটে উঠল।

বলল, আমারই মতন? হাঃ! আমার মতন এই পৃথিবীতে দ্বিতীয় কেউই নেই। তোমার ছোটখাট ফর্সা নিমাইদারই মতন ব্রহ্মাও একটিই মাত্র চিকনকালো ফিঙেকে তৈরি করেছিলেন তাঁর ভাঁড়ারে যত কিছু ভালো উপাদান ছিল তার সবটুকু দিয়ে।

তারপরই বলল, উপাদান না বলে, উপচার বলাই ভালো। স্বয়ং ব্রহ্মারও পুজোপাঠ করতে হয়েছিল আমাকে বানাতে। আমার মতন দ্বিতীয় কেউ থাকতেই পারে না।

সে-কথার জবাব না দিয়ে চখা বলল, সত্যি বলছি। হুবহু তুমি। ঠিক যেমনটি ছিলে কলেজে পড়ার সময়ে। মেয়েটির নাম জবা। কী ভাবল সে, কে জানে! অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়েছিলাম তার দিকে। কী সুন্দর যে তার চোখ দুটি! কী সুন্দর ভুরু! আর কালো তো নয়, যেন জগতের আলো। রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত বহু জন্ম আগে ওকে দেখেই লিখেছিলেন:

> "কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি,
> কালো তারে বলে অন্য লোক।
> দেখেছিলাম ময়নাপাড়ার মাঠে,
> কালো মেয়ের কালো হরিণ চোখ।"

থমকে দাঁড়াল ফিঙে।

বলল, সে মেয়ে থাকে কোথায়?

এখন কলকাতাতে। বিয়ে হয়ে গেছে যে। ধুবড়িরই মেয়ে।

কোন বাড়ির মেয়ে?

গণেশ সেনের দাদার মেয়ে।

কোন গণেশ সেন?

আরে 'সবুজের আসরে'র গণেশ সেন, যাঁরা বইমেলার উদ্যোক্তা।

আমি চিনি না।

চখা বলল, বিশ্বাস করবে না, অবিকল সেই গৌরীপুরী তোমারই মতন। হুবহু তুমি! সে যেন INCARNATED তুমি!

হতে পারে সে জবা। তবে বারোমেসে জবা নয় সে। কখনোই নয়। আমার নাম ফিঙে। আমি চিরকালীন। এবং আমি একমাত্র। আমার কোনো DOUBLE নেই।

তারপর বলল, রাতে এখানেই এসো চখাদা, প্লিজ। এবারে কিন্তু আমি সত্যি সত্যিই চললাম।

শোনো ফিঙে।

তোমার স্বামীর নাম কী? নামটি বলে যাও।

চখা বলল।

একমুহূর্ত চুপ করে রইল ফিঙে।

তারপরে বলল, রাতে স্বামীর নাম? আমার স্বামীর নাম, স্বামী।

বলেই, চলে গেল এবারে সত্যিই দূরে দাঁড় করিয়ে-রাখা রিক্‌শার দিকে।

চখা ভাবছিল, এ এক আশ্চর্য দেশ। এখানে নদীর নাম নদী।

গাছের নাম গাছ।

পাখির নাম পাখি।

আর স্বামীর নামও স্বামী!

শুধুই স্বামী।

ফিঙে চলে গেলে চখার ঘরে বসেই চখা ও ঝন্টু নিমাইদা ও দীপ্তি বৌদির সঙ্গে প্রাতঃরাশ সারল।

নিমাইদাকে যতই দেখছে ততই অবাক হচ্ছে চখা। সত্যিই জীবনীশক্তির সংজ্ঞা যেন মানুষটি। অনুক্ষণ চৈত্র-দুপুরের চড়াই পাখিটির মতনই ছটফট করছেন। পরিবেশে, প্রতিবেশে অনবরত আনন্দর ধুলো ওড়াচ্ছেন। এমন জীবন্ত মানুষের সঙ্গ পাওয়াও ভাগ্যের। খুবই ভাগ্যবতী দীপ্তি বৌদি।

ব্রেকফাস্ট সবে শেষ হয়েছে, এমন সময়ে বন্ধ দরজার বাইরে কাদের যেন পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। সবসময়েই কেউ না কেউ আসছেনই। ঝন্টু, চখার পাহারাদারিতে আছে অবশ্য। গম্ভীর গলাতে, ভারিক্কি চেহারাতে আগন্তুকদের ভালোমতন ভয় পাইয়ে দিয়ে বলছে, "অটোগ্রাফ এখানে উনি দেবেন না, বিকেলে বইমেলাতে আসবেন।"

গতকাল এই যান্ত্রিক প্রক্রিয়াতেই অধ্যাপক প্রদীপ আচার্যকেও স্বাক্ষর-শিকারি ভেবে ও হাঁকিয়ে দিচ্ছিল। ভেতর থেকে নাম শুনতে পেয়ে চখা নিজেই দৌড়ে এসেছিল তাঁকে ভেতরে ডেকে নিতে। তারপর অনেক গল্প করেছিল। শুধু ইংরেজি সাহিত্যে অসাধারণ দখল আছে বলেই নয়, প্রদীপ যে চখা চক্রবর্তীর মতন অপাঙ্‌ক্তেয়, অ-আঁতেল লেখকের বাংলাতে-লেখা প্রত্যেকটি প্রণিধানযোগ্য বইও পড়ে ফেলেছেন, একথা জেনে অত্যন্তই অভিভূত হয়েছিল ও।

আমাদের প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে যেমন ওড়িশা ও আসাম, বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে যতখানি উৎসাহ ও আগ্রহ, তার সিকি ভাগও বাঙালিদের মধ্যে দেখতে পায় না, তাঁদের সাহিত্য অথবা সংগীত সম্বন্ধেও। এই কূপমণ্ডূকতা এবং অকারণ উচ্চমান্যতা চখাকে আন্তরিকভাবে লজ্জিত করে। সম্মান বা শ্রদ্ধা দিলে তবেই তো তা ফেরত পাওয়া যায়।

ঝন্টু দরজা খুলতেই সমীর দাশগুপ্ত এবং মিসেস নিয়োগী ঢুকে এলেন।

বললেন, দেখুন, কাকে এনেছি।

কাকে?

বলেই উল্লাসে লাফিয়ে উঠল চখা, সোফা থেকে। উত্তেজিত হয়ে বলল, বিল্টু! তুই!

গৌরীপুরের বিল্টু হাসতে হাসতে বলল, তুই ত এলায় ডাঙ্গর হইছ। চখা চক্কোবত্তি যার নাম। চিনবার পারস কি আমারে?

বাজে কথা বলিস না। এখন বল, তুই আছিস কেমন? করিস কী? তোকে চিনব না? কারও পক্ষেই কী বিল্টু কলিতাকে ভোলা সম্ভব, একবার আলাপ হবার পরে?

তারপর সমীরবাবুদের দিকে চেয়ে বলল, আপনারা কী বলেন?

ঠিক, ঠিক।

সকলেই একবাক্যে বললেন।

করুম আর কী? যা কাম আমার আছিল তাই করি।

বিল্টু বলল।

কী কাজ?

নাই-কাম।

হাসল চখা। মনে পড়ে গেল তিস্তার চ্যাংমারীর চরে যখন রিক্ল্যামেশানের কাজ চলছিল তখন দুর্গাকাকুর সঙ্গে হাতির পিঠে চড়ে বনশুয়োরের তালাশে যেতে যেতে শোনা কথোপকথন। একজন চাষি, নতুন উদ্ধার-করা নতুন জমিতে কী যেন বুনছিল। দুর্গাকাকু তাকে বললেন, কী করেন হে বাহে?

সেই চাষি একবার নিস্পৃহভাবে মুখ ঘুরিয়ে দেখল।

রাজা-রাজড়ার বাহন হাতির মতন জানোয়ারের পিঠে সওয়ার-হাওয়া, রাইফেল-বন্দুক হাতে গণ্যমান্য তাদের প্রতিও তার বিন্দুমাত্র মনোযোগ ছিল না। সে আরও বেশি নিস্পৃহভাবে বলল, না-করি-কোনো। অর্থাৎ কিছুই করছি না এবং করার ইচ্ছেও নেই, এমনই এক ভাব আর কী!

'নাই-কাম' করি বলে, বিল্টুও আসলে বলতে চাইছে, না-করি-কোনো!

গান-টান গাইছিস না আজকাল?

চখা শুধোল বিল্টুকে।

কামের মধ্যে হেইটাই করি একমাত্র।

তারপরই বলল, হ। ভালো কথা মনে পড়াইছস।

কী?

তর প্রতিমাদি দেখা করনের লইগ্যা ডাকছেন। আমারে কয়্যা দিছেন।

এখন প্রতিমাদি কি গৌরীপুরেই আছেন?

হ। বয়স ত হইতেছে আস্তে আস্তে।

বিয়ে করেননি?

করেছেন। প্রমথেশ বড়ুয়া কলেজের প্রফেসর পান্ডে সাহেবরে। এহনে তাঁর নাম হয়্যা গিছে প্রতিমা বড়ুয়া পান্ডে।

নিমাইদা জিজ্ঞেস করলেন, এই প্রতিমাদি কে?

প্রতিমা বড়ুয়া। লালজী, মানে, প্রকৃতীশ বড়ুয়ার মেয়ে আর প্রমথেশ বড়ুয়ার ভাইঝি। নাম শোনোনি ওঁর? গোয়ালপাড়িয়া গানে উনি ভারত বিখ্যাত। পদ্মশ্রী, সংগীত-নাটক অ্যাকাডেমির আওয়ার্ড সবই পেয়েছেন। মাহুতের গান, হাতির গান, আরও কতরকমের গান গেয়ে নিম্ন আসামের এই গোয়ালপাড়া জেলাকে বিখ্যাত করে দিয়েছেন। পার্বতী বড়ুয়ার নামও নিশ্চয়ই পড়েছেন কাগজে। লালজীর মৃত্যুর পরে উনিই তো এখন ডুয়ার্সের জঙ্গলের মধ্যের নানা জনপদে অত্যাচার-করা জংলি হাতির দলকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুরোধে। আগে যে দায়িত্ব, তাঁর বাবা লালজীর উপরেই অনেকদিন ন্যস্ত ছিল।

বাবাঃ! তুমি এত জানলে কী করে?

নিমাইদা অবাক হয়ে বললেন চখাকে।

জানব না? গৌরীপুর ধুবড়ি তামাহাটে যে একসময়ে বেশ কিছুদিন কাটিয়েছি নিমাইদা। তাছাড়া, পরবর্তী জীবনেও গৌরীপুরের রাজন্য এই বড়ুয়া পরিবারের অনেকের সঙ্গেই আমার যোগাযোগ ছিল।

তারপর বিল্টুর দিকে ফিরে বলল, প্রতিমাদি কি প্যালেসেই আছেন?

মাটিয়াবাগেই আছেন এহনে।

মাটিয়াবাগটা কী ব্যাপার হে চখা? কোনো জায়গার নাম যে তা তো বুঝছি। কিন্তু হাজারিবাগের ভায়রাভাই নাকি?

হাওড়া জেলার মানুষ নিমাইদা চখা অ্যান্ড কোম্পানির আক্রমণে উদ্‌ভ্রান্ত দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ে শুধোলেন।

মাটিয়াবাগ হচ্ছে গৌরীপুরের বড়ুয়া রাজাদের 'সামার প্যালেস'। ঐ প্যালেসেরই সামনে, ডান পাশে, প্রতাপ সিং-এর কবর আছে।

কে প্রতাপ সিং? ওদের পূর্বপুরুষ কেউ?

হেসে ফেললেন সকলেই নিমাইদার কথা শুনে?

চখা বলল, প্রতাপ সিং লালজীর বড় প্রিয় হাতি ছিল। অত বড় হাতি বড় একটা দেখা যেত না তখনকার দিনেও ভারতে।

অ্যানথ্রাক্স রোগে পরে মারা যায় প্রতাপ সিং। প্রমথেশ এবং প্রকৃতীশ দুজনেরই অত্যন্ত প্রিয় ছিল সেই হাতি।

সমীরবাবু বললেন, শোনো না একখান গান চখাদারে।

বিল্টু কলিতা বলল, শুনাইলে শুধু এক খান ক্যান শুনাম্? অনেক গানই শুনাম্। তবে ঘরে বইস্যা কি আমাগো গোয়ালপাড়িয়া গান গাইতে বা শুনাইতে ভালো পাওন পাওয়া যায়। চখা, তুই-ই ক?

চখা বলল, গা না। খারাপ পাওনের কী আছে?

তারপরই চখার দিকে ফিরে গলা নামিয়ে বলল, তর গৌরীপুরী চখী ত এহনে ধুবড়িতেই আছে। জানস কি তা?

অন্যরা একটু উৎসুক হয়ে চাইলেন কিন্তু অত্যুৎসাহী অসৌজন্য এড়ানোর জন্যে আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না।

চখা চোখ দিয়ে বিল্টুকে প্রসঙ্গান্তরে যেতে বলল, মুখে কিছু না বলে।

মুখে বলল, এখন একটি গান তো শোনা। তারপরে সমীরবাবু এবং মিসেস নিয়োগীও শোনাবেন। যে রাতে ধুবড়িতে এসে পৌঁছলাম সার্কিট হাউসে, তামাহাট থেকে, সেই রাতেও ওঁরা এসেছিলেন। গানও গেয়েছিলেন।

নিমাইদা বললেন, আমি কিন্তু আজ গাইতে পারব না।

বিল্টু রসিকতা না বুঝেই বলল, কেন?

কারণ, আমার গলা আজ ভালো নেই।

ও।

সকলেই মেনে নিলেন।

সমীর দাশগুপ্ত আর মিসেস নিয়োগীই একমাত্র বুঝলেন রসিকতাটা, নিমাইদা নিজে, আর চখা ছাড়া।

বিল্টু কোনো ভনিতা না করেই ধরে দিল:

"দেহের কপাট খুলে দেখিলে হয়
দেহের আয়না খুলে দেখিলে হয়
মনের মানুষ কোথায় পাওয়া যায়।।
যেমন আন্ধার ঘরে
সাপ সোন্দাঁইলে
সারা রাইতে মন সাপের ভয়
মনের মানুষ কোথায় পাওয়া যায়।।
যেমন শিঙি মাছে
কাঁটা দিলে মন
সর্ব অঙ্গ জ্বইলে যায়
মনের মানুষ কোথায় পাওয়া যায়।।"

বাঃ বাঃ করে তারিফ করে উঠলেন নিমাইদা।

সাধুবাদ দিলেন সকলেই।

কিন্তু চখা ভাবছিল যে, বিল্টু ঠিকই বলেছিল। এইসব গোয়ালপাড়িয়া গান ঘরে বসে গাইবারও নয়, শোনবারও নয়।

এমন সময় হীরেন পাল আর গণেশ সেনও হাতে মিষ্টি পান আর একশো বিশ বাবা জর্দার কৌটো নিয়ে ঢুকলেন। নিমাইদা মিষ্টি পান খান। চখা আর ঝন্টুও জর্দা পান খেল।

বিল্টু বলল, গুয়া পান আনেন নাই আমার লইগ্যা বুঝি?

আরে। আইন্যা দিতাছি। যামু আর আমু।

বলেই, হীরেনবাবু নদীপারের রাস্তার মোড়ের পানের দোকানে ছুটলেন।

গুয়াটা কী জিনিস?

দীপ্তি বৌদি বললেন।

ঝন্টু বলল, আরে "গুয়াহাটি" শুনেছেন আর "গুয়া" শোনেননি? গুয়া, মানে সুপুরি। আগে যখন প্লেন নামত গৌহাটির বড়ঝর এয়ারপোর্টে তখন দীর্ঘ পথ আসতে হত গৌহাটি পৌঁছাতে। সেই পথের দুপাশেই সুপুরির সারি ছিল ঘন পথ বেয়ে। ইংরেজরা গুয়াহাটিকে বলত গহাটি। ব্যাটারদের জিভ ভারী তো! তার থেকেই বাংলাতে গৌহাটি। আসলে সুপুরির হাট ছিল ওখানে মস্ত বড়, তা থেকেই নাম গুয়াহাটি।

চখা বলল, সেই গানটা গা তো রে বিল্টু। সেই, ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে...

আরে ও সমীরদা, এট্টু চাও ত খাওয়াইবেন না কি? আমি না হয় চখা চক্কোবত্তির মতন ফ্যামাস নাই হইলাম। গান কি শুকনা গলায় হয় নাহি?

সঙ্গে সঙ্গে গণেশবাবুও বাইরে গিয়ে বাবুর্চিখানাতে চায়ের কথা বলতে গেলেন। এক দু পটের কম্মো তো নয়।

এমন সময়ে রাজা, রুবী আর ইতু এসে ঢুকল ঘরে।

চখা বলল, এসো এসো। ঠিক সময়েই এসেছ।

তারপর সকলের সঙ্গে ওদের আলাপ করাতে যেতেই সমীরবাবু বললেন, আরে মায়ের সঙ্গে মাসির আলাপ করিয়ে আর কী হবে? ধুবড়ি গৌরীপুর তো আর আপনাদের কলকাতা নয় স্যার? ছোট জায়গা। দিল এ নয়, আয়তনে। আমরা সকলেই সকলকে চিনি।

মিসেস নিয়োগী বললেন, ইতু তো নাটকও করে নিয়মিত।
সবুজের আসরে?
তাও করে। আর আমাদের অন্য ক্লাবও আছে।
চখা বলল, বিয়ে-থা করেনি ইতু, কিছু তো নিয়ে থাকবে একটা।
নিমাইদা বললেন, নাটক জীবনে না করে মঞ্চে করছি ভালো। কী বল ইতু?
ইতু হাসল।
এবারে ধর তুই বিল্টু। শোনো তোমরা বিল্টুর গান।
চখা বলল।
সমীরবাবু বললেন রুবী কিন্তু আলিপুরদুয়ারের মেয়ে।
তাই? কালকে আলিপুরদুয়ার থেকে একজন আসবেন আমার কাছে। অ্যাডভোকেট এবং জুনিয়ার পাবলিক প্রসিকুটর তপন সেন। চেনো না কি?
চখা বলল।
তপন সেন? আমাদের তপনদা নয় তো? বলেই তার স্বামী রাজার দিকে তাকাল।
রাজা বলল, বিয়ের আগে তোমার তো কত দাদাই ছিল। তপনদাটি কে, তা আমি কী করে জানব?
রুবী লজ্জিত হয়ে বলল, এত অসভ্য না!
সকলেই হেসে উঠলেন রাজার কথাতে।
রুবী বলল, তপনদা আমার দিদির ক্লাসফ্রেন্ড।
নিমাইদা বললেন, যাকগে আনসিন কোশ্চেন তপন সেনকে তাহলে তুমি জিজ্ঞেস করতে পারো। এক্সপ্লানেশান দিলে, তোমার দিদিই দেবেন।
এবার শুরু কর বিল্টু।
চখা বলল।
হ্যাঁ।
বিল্টু দুবার গলাখাঁকারি দিয়ে শুরু করল। তার আগে বলল, বগার গান শোননের আউগ্যা অন্য একটা শোন। রসের গান।
তারপরেই মিসেস নিয়োগীর দিকে ফিরে বলল, নন্দাদি, খারাপ পাইয়েন না য্যান আবার।
মিসেস নিয়োগী লজ্জিত হয়ে হেসে বললেন, আপনারে ত চিনিই আমরা হক্কলেই। খারাপ পাওনের আছেটা কী? গান তো আর আপনে বান্ধেন নাই। খারাপ পাওনের কিছুই নাই। গায়েন আপনি।
না, তা না হয়। এ গুলান আবার ফ্যামাস মানষি ত! তাই আগেভাগে কয়্যা থুলাম আর কী!
বিল্টু গান শুরু না করে চখাকে বলল, নন্দাদি কিন্তু খাব ভালো শুঁটকি মাছ রান্ধেন তা কি জানস? লইট্যা, চিংড়ি, শীতল শুঁটকি। খাওয়ান নাই তরে?
পরক্ষণেই মিসেস নিয়োগীর দিকে ফিরে বলল, ছিঃ ছিঃ নন্দাদি।
উনি বললেন, এঁদের সময় কোথায়? প্রতি রাতেই ত হাউস-ফুল। অ্যাডভান্স-বুকিং হইয়া গ্যাছে গিয়া। এক প্রহরও খালি নাই। উনাগো খাওয়াইতে পারেন ত ভাগ্যের কথা।
আমি কিন্তু ঐসব বিজাতীয় শুঁটকি-মুঁটকি খাই না। চখাও যে খায়, তা তো জানা ছিল না!
নিমাইদা বললেন।
তাই?
বিল্টু কলিতা বলল।

তারপরেই ধরে দিল গান। একেবারে তারাতে। বিল্টু যখনই গায়, তখনই তারাতে!

"ভাগিনারে, তোর স্বভাব ভালো নয়
ভাগিনা গেইল্‌ মাছ মারিতে
মামি গেইল্‌ তার খলাই ধরিতে
কাদো জলে মাছ না পায়্যা
ভাগিনা, কাদো ছিটায় মামির গায়।
হায়! হায়! ভাগিনারে!
তোর স্বভাব ভালো নয়।"

সমীরবাবু বললেন, এবার থামো বিল্টু মহারাজ। অন্তরাটা আর নাই গাইলে। যে গানটি চখাদা রিকোয়েস্ট করলেন, সেটাই বরং গাও।

ক্যান? খারাপ পাইলেন কি আপনেরা? না খারাপ গাইলাম মুই?

হে কথা কেউই কয় নাই। ভ্যারাইটির কথা হইতাছে। নানারকম গান ত আছে আমাগো, না কি?

হীরেনবাবু বললেন।

হীরেনবাবু কবিও। তাঁর একটি কবিতা সংকলন 'উত্তরণ' চখা এবং নিমাইদাকে দিয়েছেনও উনি।

"আজ ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে
ফান্দ বসাইছে ফান্দি ভাইয়া রে
পুটি মাছ দিয়া
পুটি মাছের লোভে বগা
পরে উধাও দিয়া রে॥

ফান্দাতে পড়িয়া বগা করে টানাটুনা
আহা রে কুমকুরা সুতা
হইল লোহার গুণারে..."

গাইল বিল্টু।

তারপর?

নিমাইদা শুধোলেন।

তারপর আর গামু না। অগো "ভ্যারাইটি" দেখাইতাছি।

সকলেই বিল্টুর ঐ কথাতে হেসে উঠলেন।

সমীরদা, তুমি এবার একখান গান শুনাও দেহি চখাদারে।

বিল্টু বলল।

সমীরবাবু বললেন, আমার গলাটা আজ ভালো নেই।

নিমাইদা বললেন, আজ অবধি কোনো গায়ক-গায়িকার গলা যে ভালো আছে এমন কথা তো শুনিনি।

সকলেই সে-কথাতেও হেসে উঠলেন।

সমীরবাবু দুবার গলা খাঁকরেই ধরে দিলেন:

"হুটুক্‌কারা আসিলেন বাড়ি সুট করিয়া কং
দাদা আসছে নিয়া যাবার নাইয়োর যাবার চাং।

মাদাদিনে আসছে দাদা যদি বা না যাং
গোসা হয়্যা যাবেন দাদা (কথাটা) এমন কইরা কং।
মনটা মোর একবার আগায়, পাচবারে ভাটায়
হোলোক-পোলক মন মোর যাবার না চায়।"

চখা বলল, এই গানটা নিখিলেশ পুরকাইত মশায়ের লেখা "গোয়ালপাড়িয়া ভাষা ও লোকসাহিত্য" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে দেখেছিলাম। তাই না?

তা ত দ্যাখবাই। আমাগো গৌরমোহন রায়ও একখান গ্রন্থ লিখছেন "কাষ্ঠের দোতারা করে রাও"। তাতেও মেলাই গোয়ালপাড়িয়া গান পাবাঅনে।

নিমাইদা বললেন, "ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে" এই গানটি, শুনেছি, লিখেছিলেন জিতেন মৈত্র নামক কুচবিহারের এক ভদ্রলোক আর সুর দিয়েছিলেন আব্বাসউদ্দিন সাহেব।

তারপর বললেন, উত্তরবঙ্গীয় ভাষা আর গোয়ালপাড়িয়া ভাষা কি এক?

না, এক নয়। কিন্তু খুবই কাছাকাছি বলা যায়। গোয়ালপাড়িয়া ভাষার সঙ্গে অধুনা বাংলাদেশের রংপুর জেলার ভাষারও খুব মিল আছে।

সমীরবাবু বললেন।

তারপর বললেন, আব্বাসউদ্দিন সাহেবের গলাতে এই গান শোনার সৌভাগ্য আমার হয়নি। কিন্তু প্রকৃত সত্য কী, তা যোগ্য জনেদের কাছ থেকে জেনে আপনাকে জানাতে পারি। কলকাতাতে লিখব নিমাইদা আপনাকে।

হ্যাঁ। একটু জানাবেন তো স্যার।

অতি-বিনয়ী নিমাই ভট্টাচার্য বললেন।

এমন সময়ে চা এসে গেল।

চখা বলল, আগে পান খেয়ে ফেলেছি। এখন আমি আর চা খাব না। তুই আরেকটা গান শোনা বিল্টু। কবে আবার দেখা হবে কে বলতে পারে!

হইলেই হয়। তুই-ই ত দেখি ডুমুরের ফুল হইছস।

গা, গা। বড় কথা বলিস তুই।

চখা ওকে দাবিয়ে দিয়ে বলল।

বিল্টু চা-টা খেয়েই গান ধরল:

"অ মোর নদী রে
অ মোর গঙ্গাধর নদী।।
কোন্ বা দোষে বৈরী রে আমি
আজি ভাঙিয়া নিলু তুই সুখের বাড়ি
এলা রেয়াই পরার বাড়িত্ থাকিবে।
এহেনো মোর সোনার মাটি
ভাঙিয়া নিলু নদী কূলকিনারী
করিলু নদী পথের ভিখারী রে।।
তোর গঙ্গাধরের পাগলারে মতি
ভাঙিয়া নিলু খেতের মাটি
আরো ভাঙিলু তুই নয়া পীরিতেরে।।
ও মোর নদী রে....।।"

ঝন্টু বলল, এগুলো কী গান? আমি নিজে গোয়ালপাড়িয়া হয়েও তো এসব গান শুনিনি কখনও।

চখা বলল, তুই তো ঐ গৌরবেই গোয়ালপাড়িয়া। ছেলেবেলাতে পড়লি কুচবিহারে, তারপরে গেলি কলকাতায়। আর তার ওপর গত তিরিশ বছর তো বিহারিই হয়ে গেছিস। লালুপ্রসাদ যাদবের চেলা।

তা যা বলেছ।

কবুল করল ঝন্টু।

চখা বলল, বিল্টু, সমীরবাবু এবং অন্য সকলকেই, খুব ইচ্ছা করে যে, এখানে এসে বেশ কিছুদিন থাকি। গোয়ালপাড়ার মানুষ, নদী, চর, পাহাড়, জঙ্গল, গান এইসব নিয়ে বড় এবং সিরিয়াস কিছু লিখি। কিন্তু সময় কি আর হবে?

বিল্টু বলল, ছিরিয়াছ লিখতে চাইলে কুনো আপত্তি নাই কিন্তু ফেরোছাস লিখিস না য্যান ভাইডি।

সকলেই হেসে উঠল ওর কথায়।

ঝন্টু বলল, বেশি সিরিয়াস হলে তো আবার আমাদের মাথার উপর দিয়ে চলে যাবে। দেখো, যেন তা না হয়।

অত বিদ্যাবুদ্ধিই আমার নেই। আমি লিখলে সকলে যাতে বুঝতে পাবে তেমন করেই লিখব। পণ্ডিত পাঠকদের জন্যে পণ্ডিত লেখকেরা তো আছেনই! আমি সাধারণের লেখক। যাদের হাতে-পায়ে ধুলো, গায়ে ঘামের গন্ধ, আমার স্বদেশের মাটিতে যাদের শিকড় ছড়ানো।

তারপর বলল, সকলকেই উদ্দেশ্য করে, আপনারা তো এই গোয়ালপাড়িয়া গান সম্বন্ধে অনেকই জানেন। আমাদের কিছু বলুন না, শুনি!

বিল্টু বলল, গানের কি শ্যাষ আছে নাহি? ভাওয়াইয়ারই মইধ্যে পড়ে ঐ গানখান।

ঐ "ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দেরে" অথবা ধর,

> "গৌরীপুরের শহরে হাউয়াই ছাড়িছে
> মোর কামবক্‌তির দুখের কথা নাই কং বাপ মাওকে।
> কী আবাগীর মনে কয় দেখি আইসং যায়্যারে।"

ঝন্টু বলল, "কামবক্‌তি" শব্দটা উর্দু কামবক্ত থেকে এসেছে কি?

অবশ্যই। ভাষা এক দারুণ মজার জিনিস। ভাষাবিদ হতে পারার মতো আনন্দ আর নেই। দুসস। জীবনটা এতই ছোট যে কিছুই হওয়া হল না জীবনে। অন্নচিন্তা চমৎকারা। তাই করেই জীবন গেল।

সমীরবাবু বললেন।

নিমাইদা বললেন, কথাটা ঠিকই বলেছেন সমীরবাবু। প্রাণীমাত্রকেই বেঁচে থাকতে হলে খাওয়ার চিন্তা করতেই হয়। বাঘ হরিণ ধরে, সাপে ব্যাঙ, আমরা রোজগার করি জীবনধারণের জন্যে। করতে হয়। কিন্তু এই সবই জীবিকা। জীবন নয়। জীবনকে যদি জীবিকার নখ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে না পারেন তাহলে সবই বৃথা। জীবিকা আর জীবনের তফাত বোঝে শুধুমাত্র মানুষেই। আমরা যে বিধাতার সৃষ্ট সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। জানোয়ারদের সঙ্গে আমাদের তফাত তো থাকবেই। মানে, থাকা উচিত অন্তত।

বলেই বলল, আরও কী কী গান আছে? বলুন না একটু আমাদের।

এবারে সমীরবাবু বললেন, চট্‌কার কথা তো বিল্টু বললই।

একটা নমুনা দেখা না বিল্টু চট্‌কার?

চখা বলল বিল্টুকে।

বিল্টু সঙ্গে সঙ্গে ধরে দিল :

> "ও বন্ধু রে তোমার আশায় বসিয়া আছং বটবৃক্ষের তলে
> মন মোর উরাং পারাং করে—"

মনে পড়ে গেল চখার যে, তামাহাটের গঙ্গাধরের আর তামা নদীর সঙ্গমে সেদিন সূর্যাস্তবেলাতে ভগুয়া আকাশের পটভূমিতে গাছতলাতে বসে ছেলেটি সেই গানটিই গাইছিল। নাকি অন্য গান?

এছাড়াও নানা গান আছে। যেমন চাঁচর, ভাসান, দেহতত্ত্বের গান, খেদা করে বা ফাঁদে বুনো হাতি ধরার পরে সেই হাতিদের শিক্ষার গান, কুশান গান।

কুশান গানের আবার চারটি ভাগ আছে। বন্দনা, সরস্বতীর আরাধনা, মূলের আরাধনা ও মূল পালা। কুশান গান আসলে রামায়ণ গান।

মিসেস নিয়োগী বললেন, কৃত্তিবাস, এ-অঞ্চলে অত্যন্ত পূজ্য কবি। কারণ অসমিয়া কবি মাধব কন্দলীর রামায়ণ প্রথমে ছাপা হয় ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে। ততদিনে কৃত্তিবাসী রামায়ণ শিকড় পেয়ে গেছিল এখানে।

আর কী কী গান আছে?

ধুবড়ি জেলাতে সর্পদেবী মনসার গানও জনপ্রিয়। এদিকে নারায়ণদেব ও উত্তরবঙ্গে জগজ্জীবন ঘোষালের পুঁথি অনুসরণে মনসার গান গাওয়া হয়ে থাকে।

হীরেনবাবু বললেন।

সমীরবাবু বললেন, আরও আছে। গোরুদের দেবতা গোন্নাথের কাহিনি নিয়ে গোন্নাথের পাঁচালি। বাঁশের দেবতা মদনকামকে নিয়েও, মানে তাঁর পুজোর জন্যেও অনেক গানও আছে। তাকে বলে "মদনকামের গান"। বাঘেদের দেবতা সোনারায়ের গানও আছে। বাঘের উপদ্রব থেকে বাঁচার জন্যে এই গানের উদ্ভব পৌষ মাসের প্রথম দিক থেকে ফুলের সাজি হাতে নিয়ে বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে ঘুরে এই গান গাওয়া হয়।

ঝন্টু বলল, এখনও?

হায়! হায়! এখন কোথায় বাঘ?

আমার বাবা একটা চিতাবাঘ মেরেছিলেন আমাদের গদিঘরের পাশের মুরগির খাঁচারই মধ্যে। মুরগি ধরতে ঢুকেছিল রাতে। ছোট চিতা। আর এখন তপস্যা করতে হয় বাঘ দেখতে।

মিসেস নিয়োগী বললেন, ধুবড়ি অঞ্চলে একটিমাত্র লোকগীত "নমলকাতি"র কথা জানি। কার্তিক দেবতার পুজো করা হয় এই গানে।

কার্তিক পুজো তো কলকাতার সব খারাপ পাড়াতেই হয় বলে জানি। মানে, সোনাগাছি, হাড়কাটা গলি।

নিমাইদা বললেন।

বিল্টু বলল, আইপনাগো কইলকাতার কথা ছাড়ান দ্যান দেহি। জায়গাডাই খারাপ। তাই তার নজরডাই খারাপ।

সমীরবাবু বললেন, নমলকাতি অবশ্য মেয়েদেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। দেবতা হিসেবে কার্তিক তো সর্বত্রই মেয়েদেরই উপাস্য। কথাই তো আছে "কার্তিকের মতন বর"। তবে একজন মাত্র পুরুষ এই গানে অংশগ্রহণ করে। সে হল ঢাকি। কিন্তু সেও বাড়ির বাইরে থেকেই বাজায়। এই নমলকাতি পুজো শুরু হয় কার্তিক সংক্রান্তিতে। আর চলে অগ্রহায়ণ সংক্রান্তি পর্যন্ত। তাই এই পুজোকে অকালে কার্তিকপুজো বলা হয়ে থাকে। এ নাটকের পাঁচটি ভাগ। মানে, নাটকে পাঁচটি দৃশ্য।

কী কী? চখা জিজ্ঞেস করল।

কাতিসজ্জন, কাতিকামান, কাতিঘামান, নাচপর্ব এবং সবশেষে আগনেওয়া। আগনেওয়াতে আবার চাষবাসের পুরো প্রক্রিয়াটাই অভিনয় করে দেখানো হয়। তবে এই নাটকে "গীদালী" মহিলাদের ভূমিকাই সবচেয়ে বড়ো। "নাচনি" মহিলারাও থাকেন যদিও।

গীদালী মানে?

নিমাইদা জিজ্ঞেস করলেন।

গীদালী মানে, গায়িকা।

তাই? বাঃ। গীতালী মানেও কি গায়িকা? কি ঝন্টু?

ভালো লোককেই জিজ্ঞেস করেছেন।

ঝন্টু বলল, লজ্জিত হয়ে।

তারপর ওঁদের জিজ্ঞেস করল যে, গোয়ালপাড়িয়া গান সম্বন্ধে বিশদভাবে কে বলতে পারেন?

অনেকেই পারেন। গৌরীপুরের প্রতিমা বড়ুয়া পান্ডে তো পারেনই। তাছাড়া আরও অনেকেই আছেন। ভূপেন হাজারিকার সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পারেন কলকাতায়। উনি না থাকলে প্রতিমা বড়ুয়া আজ এত পরিচিতি পেতেন না। গ্রেট মানুষ আমাদের ভূপেনদা।

সমীরবাবু বললেন, ধুবড়ি বা গৌরীপুর মিউজিক কলেজ অথবা "সবুজের আসরের" সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পারেন। তাঁরাও হদিশ দিতে পারেন গুণীজনদের।

ঝন্টু বলল, ধুবড়ি বইমেলার উদ্যোক্তা তো তাঁরাই?

হ্যাঁ।

ঠিকানা তো জানি না।

আমরাই তো ঠিকানা। তবু লিখে নিন।

বললেন সমীরবাবু।

বলুন।

"সবুজের আসর", নেতাজী সুভাষ রোড, ধুবড়ি, আসাম। পিনকোড ৭৮৩৩০১।

থ্যাঙ্ক উ।

বলল, ঝন্টু।

বিল্টু বলল, মুই এখনই চইল্যা যাম্যু গৌরীপুরে। তুই আইবি ত? কবে আইবি তাই ক? প্রতিমাদি কিন্তু বারংবার কয়্যা দিছে।

যাব।

কবে?

পড়শু যাম্যু কয়্যা দিস। সকালে যাম্যু।

আমার বাড়িত্ খাইতে আইব কিন্তু! মহামায়ার মন্দিরে যাবি না? আর আশারিকান্দি?

আশারিকান্দিটা কী জিনিস?

দীপ্তি বৌদি এতক্ষণ পরে কথা বললেন।

জিনিস নয় বৌদি। একটি গ্রাম। গৌরীপুরের কাছেই। দেশভাগের সময়ে পাবনা জেলা থেকে এসেছিলেন পাল পরিবার। পোড়ামাটির নানা জিনিস বানান তাঁরা। দেশ-বিদেশের মানুষের কাছে পৌঁছয়।

মিসেস নিয়োগী বললেন চখাকে, বাঃ। আপনি তো আমাদের ভাষা বেশ ভালোই বলেন।

আমি তো গড়িয়াহাটের মোড়ে হেলিকপটার থেকে পড়ে সাহিত্যিক হইনি মেমসাহেব। আমি বাঙাল। আমি উদ্বাস্তু। অতি সাধারণ আমি। এই মিষ্টি গন্ধ মাটি, এই একূল-ওকূল দেখা-না-যাওয়া নদী, ঘুঘু, কবুতর এবং চখা-চখীর ডাক, হাঁসেদের প্যাঁকপ্যাঁকানি, নদীর বিস্তীর্ণ উদাসী চর, দগদগে ঘা-এর মতন ভাঙা পাড়, পাট-পচানোর আর গুয়ার গন্ধ, পাটকাচার শব্দ, মাদারের আর ভেরেন্ডার

ফুলের ভাগুয়া রঙ, গোরুর গাড়ির ক্যাঁচোর-কোঁচোরের রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধ, শব্দের মধ্যেই আমি বড় হয়ে উঠেছি। ঈশ্বর করুন যেন, যে বাংলাদেশে বড় হয়েছি, রংপুর, বরিশাল, ধুবড়ি, গৌরীপুর, তামাহাট, যেখানে আমার ছেলেবেলার অনেকখানি কেটেছে, আমি যেন চিরদিন এদেরই থাকি।

নিমাইদা বললেন, ব্রাভো!

বক্তৃতার মতন শোনাল কি?

চখা বলল, লজ্জিত গলায়।

তা একটু শোনাল বইকি। কিন্তু খারাপ লাগল না।

স্বদেশ, স্বভূমি, স্বদেশের মানুষের প্রসঙ্গ উঠলেই আমার গলার কাছে কী যেন দলা পাকিয়ে ওঠে নিমাইদা। গলার স্বর বুজে আসে। এ এক দুরারোগ্য রোগ।

চখা বলল।

নিমাইদা বললেন, এই রোগ, তোমার যেন কোনোদিনও নিরাময় না হয় চখা। এই প্রার্থনা করি।

আজ বইমেলাতে বাংলা সাহিত্যর অধিবেশন ছিল।

ধুবড়ির মতন ছোট শহরে, যেখানে কলকাতা বা গুয়াহাটি থেকে যেতে হলে বাস বা জলপথ ছাড়া সরাসরি পৌঁছনোর উপায় নেই, সেখানে এত মানুষে যে বাংলা এবং অসমিয়া সাহিত্য ও গ্রন্থ সম্বন্ধে উৎসাহী আছেন, এই কথা ভাবলেও অবাক হতে হয়। ট্রেনে গিয়ে পৌঁছনো যে যায় না তা নয়। তবে, অনেকই ঘুরে। সরাসরি পৌঁছনো যায় না মানে প্রধান রেলপথে হয় নিউ কুচবিহার হয়ে আসতে হয়, নয় মটরঝার অথবা গোঁসাইগাঁও বঙ্গাইগাঁও বা গোলোকগঞ্জ হয়ে। নিউ কুচবিহার থেকে দ্রুতগামী ট্রেন পাওয়া যায় কলকাতা বা গুয়াহাটির। দ্রুতগামী হলে কী হয়, দিনে গড়ে ছ থেকে আট ঘণ্টা লেট থাকে সেই সব গাড়ি। যাঁরা উড়োজাহাজে আসতে চান তাঁরা বাগডোগরা বা গুয়াহাটিতে পৌঁছে সেখান থেকে আসতে পারেন। চখার তো গাড়িতেই আটঘণ্টা লেগেছিল তামাহাটে পৌঁছতে। শুনেছে, চালক ভুল পথে আসাতেই অত সময় লেগেছিল। ঘণ্টা পাঁচেক নাকি লাগে।

আগে ধুবড়ির কাছে রূপসীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আমেরিকানদের তৈরি করা এয়ারস্ট্রিপ ছিল। তা এখন জঙ্গল হয়ে পড়ে আছে। ল্যানটানার জঙ্গল আগেও ছিল। চিতাবাঘের আস্তানা ছিল। সুখের কথা এই যে, এখন সেখানে একটা অভয়ারণ্য গড়ে উঠেছে। কুচবিহারে আগে বায়ুদূতের ছোট প্লেন যেত। বহুদিন হল তাও বন্ধ আছে।

সাহিত্যিক নিমাই ভট্টাচার্য আজকের অধিবেশনে চমৎকার বক্তৃতা দিলেন। তিনি আগে সাংবাদিক ছিলেন। সাংবাদিক ও রাজনীতিক এবং অবশ্যই অধ্যাপকেরাও স্বভাবতই খুব ভালো বক্তা হন। আর চখা চক্রবর্তী মোটে কথাই বলতে পারে না। সে যদি কথাই বলতে পারত ভালো, তবে লেখক না হয়ে হয়তো সুবক্তা হবার সাধনাই করত।

"সবুজের আসর" পরিচালিত ধুবড়ি ও গৌরীপুর মিউজিক কলেজের ছেলেমেয়েরাও অত্যন্ত ভালো অনুষ্ঠান করেছিলেন।

বইমেলাতে গান-বাজনার অনুষ্ঠান থাকা আদৌ বাঞ্ছনীয় কী নয় সেই তর্কে না গিয়েও, ও বলবে যে, ওর মনে হয়েছিল যে তাতে কোনো দোষ আদৌ ঘটেনি। যে জায়গাতে কখনোই বইমেলা হয়নি আগে সেখানে বইমেলা সম্বন্ধে আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলার জন্যে এমন অনুষ্ঠানের অবশ্যই প্রয়োজন আছে বইকি। এই বইমেলা বাঙালি ও অহমিয়াদের মধ্যে গান গাওয়ার, গান শোনার,

বই পড়ার, বই ভালোবাসার ও বই নিজেরা কিনে উপহার দেওয়ার অভ্যেসকে দৃঢ়মূল যখন করবে, একদিন তা করবেই, সেদিন আর অন্য অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নাও হতে পারে। তখন শুধুমাত্র সাহিত্য, ভাষা এবং সেইসব সম্পর্কিত বিষয়ের উপরেই তর্ক, সেমিনার, একক বক্তৃতা ইত্যাদির আয়োজন তাঁরা করতে পারেন।

অধিবেশনের পরে মেলাপ্রাঙ্গণেই ছিল ও। নিমাইদারাও ছিলেন। ছিলেন উদ্যোক্তারাও।

চখা যা বলেছিল ফিঙেকে, তাই সত্যি হল। মেলাতে নিজের বক্তব্য শেষ করে, উদ্যোক্তাদের বিশেষ অনুরোধে দুখানি গানও গাইতে হয়েছিল ওকে।

অগণ্য পাঠক-পাঠিকাদের স্বাক্ষর দেওয়া ও বহুদিন আগে শেষ দেখা হওয়া অসংখ্য পরিচিতদের সঙ্গে কথা বলা শেষ করে যখন ঘড়ির দিকে তাকাবার সময় হল তার, তখন ঘড়িতে সাড়ে আটটা বেজে গেছিল। সার্কিট-হাউসের সামনের নদীপারে আর যাওয়া হল না। তাছাড়া, সে এখন এমনই পরিবেষ্টিত যে এই পরিবেশে এবং প্রতিবেশে এখন ফিঙের কথা ভাবার সময়ও নেই।

বেচারি ফিঙে!

সে নিশ্চয়ই এক ঘন্টা বসে থেকে চলে গেছে। কিন্তু চখা নিরুপায়। সে যে যেতে নাও পারতে পারে সে কথা তো আগেই জানিয়ে দিয়েছিল।

৬

আজ রাঙাপিসির বড় মেয়ে বুড়ু তাকে রাতে খাওয়ার নেমন্তন্ন করেছিল। নিমাইদা-বৌদিকেও করেছিল। বলেছিল, "ছ্যাপ ছ্যাপ" খাওয়াবে।

সেটা কী বস্তু? জানতে চাওয়াতে চখাকে বলেছিল "নেপালি বিরিয়ানি"। দই দিয়ে রাঁধতে হয়। দাতু নাকি ওকে শিখিয়েছে। ওর বড় জা নাকি খুব ভালো শীতল শুঁটকিও রাঁধেন। তিনিও চখার জন্যে শুঁটকি মাছ রান্না করবেন। বুড়ু এও বলেছিল, "দাদা, শুনছি, তুমি কলম খুব ভালোবাসো। তোমার জন্যে একখান কলম কিইন্যা থুইছি। নিমাইবাবুর জন্যেও।"

শুনে অভিভূত হয়েছিল চখা।

মানুষের অর্থের সঙ্গে মনের প্রসারতার কোনো সাযুজ্যই ছিল না কোনোদিন। অল্প বয়সে স্বামীহারা বুড়ু প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষিকা। কতই বা মাইনে পায় সে! একই মেয়ে ওর। এবারে নাকি হায়ার-সেকেন্ডারি পরীক্ষা দেবে। যৌথ-পরিবারে থাকে বলে, শ্বশুরের ভিটে ছিল বলে, দিন চলে যায় সাধারণভাবে। অথচ সেই মেয়েরই মন কত বড়! যে-দাদা, তাকে দেওয়ার মতন কিছুই দেয়নি কোনোদিনও, যার সঙ্গে জীবনে দেখাই হয়েছে কয়েকবার মাত্র সেই দাদারই জন্যে কত খরচ করছে। কত যত্ন সব ভালোবাসার পদ রেঁধে খাওয়াচ্ছে।

টাকার পরিমাপ তাও করা যায়, মানে উপহারের অর্থমূল্য, কিন্তু ভালোবাসার পরিমাপ তো করা যায় না! কোনোদিনও নয়। ভালোবাসা, সে প্রেমিকের প্রতিই হোক, কী দাদার প্রতিই, যে ভালোবাসে আর যে সেই ভালোবাসা পায়, তাদের দুজনের অন্তরে যে এক গভীর সুখানুভূতির সৃষ্টি করে, তার গভীরতা মাপার মতো যন্ত্র এই রাক্ষুসে বিজ্ঞানের অত্যাচারের দিনেও আবিষ্কৃত যে হয়নি, এইটাই সান্ত্বনার কথা। ঈশ্বর করুন, সেই যন্ত্র যেন কোনোদিনও আবিষ্কৃত না হয়।

গতকাল রাতে নেমন্তন্ন ছিল শিবাজীদের বাড়িতে। ধুবড়ির টাউন স্টোর্স-এর শিবাজী রায়। তার স্ত্রী গৌরী এবং খুড়তুতো ভাইদের স্ত্রীরা সকলে মিলে অনেক যত্ন করে খাইয়েছিল।

তাদের লোন অফিস লেনের বাড়িতে শিবাজীর মায়ের আদেশ ফেলতে পারেনি চখা। আরও আগের দিন নেমন্তন্ন ছিল ইতু-মানা-রাজা-রুবীদের বাড়ি। ছাতিয়ানতলাতে। দারুণ খিচুড়ি রেঁধেছিল মানা, চখারই অনুরোধে। রাজা-রুবী অন্য অনেক কিছু খাইয়েছিল। ইতু সান্নিধ্য দিয়েছিল। চশমা-পরা স্টেট-ট্রান্সপোর্টে কাজ করা, ইতুর দিকে চেয়ে চখার ফ্রকপরা যে কিশোরীটি কিশোর চখাকে নদীপারের পথ দিয়ে হাত ধরে হাঁটতে নিয়ে যেত, তার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল।

বইমেলার উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান রমাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য মশায় সংস্কৃতর অধ্যাপক ছিলেন। অত্যন্তই পণ্ডিত ব্যক্তি। চখা, বইমেলা উদ্বোধনের দিন সকালে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়া মাত্রই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিল। তবে তাঁর পাণ্ডিত্যের গভীরতা বুঝতে পারল শুধু তখনই যখন চখা সভাতে নিমাইচরণ মিত্রর লেখা একটি ব্রহ্মসঙ্গীত গাইবার সময়ে উল্লেখ করেছিল যে ঐ গানটি উপনিষদের একটি শ্লোক-নির্ভর। গান গাওয়ার পরেই যখন সে রামপ্রসন্নবাবুর পাশে গিয়ে বসল মঞ্চের উপরে তখন উনি ফিসফিস করে বললেন, শ্লোকটি কি "অপানিপাদো জবনো গ্রহীতা...?"

চখা অবাক হয়ে গেল তার পাণ্ডিত্যে। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ-এ আছে ঐ সংস্কৃত শ্লোকটি। কলকাতাতে অসংখ্যবার এই গানটা গেয়েছে ও বিভিন্ন জায়গাতে কিন্তু আজ পর্যন্ত উপনিষদের এই শ্লোকটির কথা সেখানে কেউই উল্লেখ করেননি।

কলকাতার অনেক কূপমণ্ডূকই মনে করে থাকেন, যে যত বিদ্বান, বুদ্ধিমান, পণ্ডিত সকলেই বুঝি একমাত্র কলকাতাতেই বাস করেন। পশ্চিমবঙ্গের, বিহারের, উড়িষ্যার এবং আসামের রাজধানীর কথা তো ছেড়েই দিলাম, ছোট ছোট মফস্‌সল শহরেও এমন এমন পণ্ডিতেরা বাস করেন, সব বিষয়েই পণ্ডিত, যাঁরা কলকাতার উচ্চমন্য এবং পণ্ডিতম্মন্যদের কানে ধরে শেখাতে পারেন। শিক্ষার প্রধান দান যে বিনয়, সেই বিনয়ই কলকাতা-ভিত্তিক সাহিত্যিক-কবি-সাংবাদিক-অধ্যাপক-গবেষকদের অধিকাংশেরই নেই।

অগ্রজ রামপ্রসন্নবাবুর মতন মানুষদের সঙ্গে পরিচিত হওয়াটাও পরম সৌভাগ্যের কথা।

আরও একজন অধ্যাপকের সঙ্গে এখানে এসে পরিচিত হল ও, তাঁর নাম দেবাশিস ভট্টাচার্যি। বয়সে অবশ্য তাঁকে তরুণই বলা চলে। তিনি গৌরীপুরের প্রথমেশ লাহিড়ী, বিশ্ববিদ্যালয়ের পল-সায়েন্স বিভাগের মুখ্য। তাঁর পাণ্ডিত্যের গভীরতা বোঝার সুযোগ হয়নি চখার বটে কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব, চেহারা ও কথাবার্তাতে মুগ্ধ হয়েছে ও।

নিমাইদা ও দীপ্তি বৌদি এখন ফিরবেন না। আসামের গভর্নর নাকি নিমাইদার বন্ধু। গুয়াহাটি যাবেন নিমাইদা। বৌদি নাকি কামাক্ষ্যা দেখেননি। তাই তাঁকে কামাক্ষ্যা দেখাবেন।

কাল সকালে চলে যেতে হবে ধুবড়ি থেকে। আবার এ জীবনে কখনও আসা হবে কিনা জানা নেই। ছ' ছটি দিন, যেন স্বপ্নের মতনই কেটে গেল। কত অসমবয়সি নারী-পুরুষের ভালোবাসা, স্নেহ, শ্রদ্ধা, প্রশংসা পেল। সেসব পাবার যোগ্যতা চখার থাক আর নাই থাক।

বড়ই আবিষ্ট হয়ে আছে।

বুড়ুদের বাড়িতে সর্ষে দেওয়া প্রকাণ্ড বড়ো বড়ো টুকরোর আড় মাছের ঝাল, প্রায় পাঁচ ইঞ্চি লম্বা কাজরি মাছের চচ্চড়ি, মুরগির মাংস, গরম ভাত দিয়ে শীতল শুঁটকি এবং 'ছ্যাপ ছ্যাপ' খেয়ে যখন চখা, ঝন্টু, নিমাইদা বৌদি বেরুল তখন রাত প্রায় সাড়ে দশটা এগারোটা হবে। ছোট শহরের পক্ষে গভীর রাত। কদিন আগেই ঈদ গেছে। শুক্লপক্ষ। চাঁদের আলো কিছুটা আছে।

বুড়ুর ভাসুর চখাদের অনেকটা পথ এগিয়ে দিয়ে গেলেন, যদিও সার্কিট-হাউস থেকে ওঁদের বাড়ি অত্যন্তই কাছে।

অন্ধকারে, নদী থেকে আসা হু হু হাওয়ার মধ্যে বড় বড় কিন্তু ছাড়া-ছাড়া গাছে ছাওয়া পথ বেয়ে সার্কিট-হাউসের দিকে হেঁটে আসতে আসতে ভাবছিল ও যে, এখানেই বাকি জীবনটুকু থেকে গেলেই বেশ হত। হাজার হাজার গাড়ি, বাস, ট্রাকের কর্ণ-বিদারী শব্দ, ডিজেল ও পেট্রলের ধোঁয়াতে অন্ধকার, লোভে আর ঈর্ষাতে আর পরশ্রীকাতরতাতে জরজর নতুন রঙের পোঁচ লাগানো বহুতল বাড়ির অসুস্থ কলকাতাতে থাকতে আর ভালো লাগে না। এখানে বাহন বলতে রাখবে সাইকেল রিকশা। তাই বা কেন? সাইকেলই তো চমৎকার। ক্রিং ক্রিং করে বেল বাজিয়ে "চড়িতেছি সাইকেল দেখিতে কি পাও না?" বলতে বলতে সারা পাড়া-বেপাড়াতে চক্কর মেরে বেড়ানো যেত। একটি ছোট্ট ভাড়া বাড়ি, শহরের কিনারে, অথবা অনেক জমি নিয়ে নিজের বাড়ি, যেখানে এখনও বাঁশঝাড় আছে, রঙ্গনের ডালে মৌটুসি পাখি কিসকিস করে, হাঁস পোষা যায়, গ্রীষ্মের দুপুরে পেঁয়াজখসিরঙা শাড়ির উড়ন্ত আঁচলের মতন শব্দ করে যেখানে বাঁশবনের গা থেকে ফিকে হলুদরঙা খোলস বাতাসে খসে খসে উড়ে পড়ে, ঝোড়ো হাওয়াতে কটকটি ব্যাঙের মতন বাঁশবনের বুকের কষ্ট ফুটে বেরোয়, যেখানে এখনও মাদার আর ভেরেন্ডার ফুল ফোটে, বসন্তে ও শীতে বেতবন দেখা যায়, বর্ষাতে মাকাল ফল আর মাতাল করা লালে জগৎ আলো করে ফুটে থাকে আজও ওই কলুষিত পৃথিবীতে, তেমনই কোনো কোণে যদি কাটিয়ে দিতে পারত অনামা, অচেনা, খ্যাতিহীন একজন সাধারণ অতি সাধারণ, মানুষের অসামান্য, অকৃত্রিম, অসাধারণ দুর্মূল্য মুর্শিদাবাদী বালাপোষেরই মতন, সর্বাঙ্গে মুড়ে তাহলে কী ভালোই না হত! কী ভালো!

কিন্তু তা হবার নয়।

কবি শ্যামল ঘোষ এবং তাঁর এক বন্ধু চখাকে নিউ কুচবিহার অবধি নিয়ে গিয়ে ট্রেনে তুলে দেবেন—কামরূপ এক্সপ্রেসে। আগের স্টপেজ নিউ আলিপুরদুয়ার। যেখান থেকে চখার অন্ধ ভক্ত তপন সেন, অ্যাডভোকেট, এসেছিলেন ধুবড়ির বইমেলাতে শুধুমাত্র চখার সঙ্গেই দেখা করতে। একদিন থেকেই তিনি ফিরে গেছিলেন। উঠেছিলেন, ধুবড়ির 'মহামায়া' হোটেলে।

কতরকম মনোমুগ্ধকর পাগলই থাকেন এই বিচিত্র পৃথিবীতে।

আর কালকে যে স্টেশন থেকে সে ট্রেনে উঠবে, সেই নিউ কুচবিহারের কাছেই কুচবিহার শহর। শেলী যেখানে থাকে। চখা সেই শহরে ঢুকবে না ইচ্ছে করেই।

কৈশোরের স্বপ্ন প্রজাপতিরই মতন সুন্দর। সত্যিই তো শেলী এক স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়! কোনো স্বপ্নের গায়েই আঙুল ছোঁয়াতে নেই। কাঁচপোকার গায়ের রঙেরই মতন সেই সব স্বপ্ন মসৃণ, উজ্জ্বল। সেই সব স্বপ্নকে তার স্মৃতিতে ঠিক তেমন করেই বাঁচিয়ে রাখতে চায় চখা। যেদিন তার চোখ চিতার আগুনে গলে যাবে সেদিন সেই সুন্দর স্বপ্নও গলে যাবে, নিঃশেষে। বাকি থাকবে না কিছুমাত্রই।

ঝন্টু শুয়ে পড়েছে।

নিমাইদা ও বৌদিও ঘরে গেলেন।

চখা দরজা ভেজিয়ে রেখে বাইরে এল। নদীপারে।

আজ শুক্লা ষষ্ঠী। চাঁদ এখন সবে উঠছে। ফালি চাঁদ। আদিগন্ত সেই আশ্চর্য অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে কারও আদরের অস্ফুট আলতো চুমুর ছোঁয়াতে জেগে ওঠার মতন নদীচর যেন জেগে উঠছে। খুবই আস্তে আস্তে। জঙ্গলের মধ্যে অন্ধকারে অস্পষ্ট বাঘকে যেমন ঘোলাটে-সাদাটে দেখায়, ব্রহ্মপুত্রের জল ও বিস্তীর্ণ চরকেও তেমনই দেখাচ্ছিল। তার রূপ আস্তে আস্তে আরও ধবল কোমল হচ্ছে। ক্রমশ।

হাওয়া বইছে জোরে। চুল উড়ছে চখার। পায়জামা-পাঞ্জাবি উড়ছে পতপত শব্দ করে। ধুবড়ি শহর এখন ঘুমিয়ে আছে। ঘুমিয়ে আছে গঙ্গাধর আর গঙ্গাধরের কোলে গৌরীপুর, কুমারগঞ্জ আর তামাহাট।

নদীর দিকে চেয়ে কেমন গা-ছমছম করে উঠল চখার।

এই অবস্থা, মোহময় এবং রহস্যময় রাতে কত দূর থেকে বয়ে-আসা এবং কতদূরে বয়ে-যাওয়া ব্রহ্মপুত্র নদী, নদীর বিস্তীর্ণ দুধলি চর, যেন কত কী বলেছিল চখাকে, ফিসফিস করে।

কে? ফিঙে?

কী বললে?

তুমি এসেছিলে?

মিথ্যে কথা।

সত্যি!

সত্যি?

তুমি খুব খারাপ।

কে যেন ফিসফিস করে বলল।

ফিঙেই কি?

হয়তো ফিঙেই।

হয়তো।

কী?

আমি খারাপ। মার্জনা করে দিয়ো। একটা সময়ে আমার চোখে তুমিও খুব খারাপ ছিলে। আজ, তোমার চোখে আমি।

আবার অপার নিস্তব্ধতা।

এই রাতে, কারোকেই, কিছুকেই দেখা যায় না। নড়ে-চড়েও না কিছু। সব নদীই সব নারীরই মতন রহস্যময়। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চখার দু চোখ ঝাপসা হয়ে এল।

বেচারি ফিঙে। বেচারি চখা!

আকাশে অগণ্য তারারা মিটমিট করছে। কারা যেন তার অলক্ষ্যে চেয়ে আছেন নদীর দিক থেকে তার দিকে। নাকি নক্ষত্রলোক থেকে? পিসেমশাই, পূর্ণ জেঠু, কড়িদা, বাপ্পু, বড়দাদা, বৈদ্যকাকু, মানিকদা, ভানুদা-বৌদি, ভারতীদি।

শচীন জামাইবাবু যেন বলছেন, তুমি এসেছিলে! এঁরা তোমাকে আবার ফিরিয়ে এনেছেন বলে বড়ই খুশি হয়েছি আমরা। ভালো থেকো। ভালো থেকো।

চেক-চেক লুঙি পরা আবু ছাত্তার আর কাসেম মিঞা আর তামাহাটের কাছে বাগডোরা গ্রামের টাট্টু ঘোড়াতে চেপে তামাহাটে হাটবারে হাট করতে আসা মুনসের সর্দারও যেন একইসঙ্গে বলে উঠলেন, আইছেন এদ্দিক পরে তা হইলে। আমাগো তো ভুইল্যাই গেছিলেন গিয়া। সালাম! সালাম!

কথা না বলে চখা বলল, আইলেকুম আসসালাম।

কাসেম মিঞার গলাতে একটি কালো আর হলুদ চেক-চেক মাফলার নদীর হাওয়াতে উড়ছে। শীত-গ্রীষ্ম সর্ব ঋতুতে যে মাফলার ছিল তার সঙ্গী, সেই মাফলার। মুনসের সর্দারের মাথার সেই খয়েরি রঙা টুপি। হাওয়াতে সেই টুপির লেজ নড়ছে।

একটু পরেই পেছন থেকে কে যেন ডাকল, কী করছ এখানে?

মুখ ফিরিয়ে চখা দেখল, ঝন্টু। চখার বডিগার্ড। এবং নীতবর।

বলল, অনেক রাত হল। চলো শোবে। কাল সকালে তো বহু মানুষে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এবং বিদায় দিতে আসবেন।

চখা অস্ফুটে বলল, হুঁ।

তারপর বলল, চল যাই।

সার্কিট-হাউসের দিকে ফিরে আসতে আসতে চখা ভাবছিল, যেন দ্বিরাগমনে আসারই মতন সে এঁদের নিমন্ত্রণে, এত মানুষের চাহিদাতে তার প্রিয় এবং পুরনো ধুবড়ি-গৌরীপুর-তামাহাটে ফিরে এসেছিল বহুদিন পরে।

ফিরে আসাটা বড়োই আনন্দের। এত মানুষের হৃদয়ের উত্তাপের কাছে থাকা বড়োই সুখের। কিন্তু সেই উষ্ণতা থেকে শীতার্ত পৃথিবীতে একা একা ফিরে যাওয়াটা সুখের নয়। আদৌ নয়।

চখা জানে যে, কাল সকালে অনেকে মিলে তাকে ধুবড়ি সার্কিট-হাউসের হাতা থেকে যখন নিউ-কুচবিহার স্টেশনের দিকে রওয়ানা করিয়ে দেবেন গাড়িতে, তখন ওর গলার কাছে দলা পাকিয়ে উঠবে একটা। অনামা সেই বোধ।

তার নীতবরও এবারে তার সঙ্গে যাবে না ফেরার সময়ে।

ঝন্টু বলবে, আচ্ছা চখাদা! ভালোমতো যেয়ো তাহলে।

বিচ্ছিরি কলকাতার দিকে রওয়ানা দেবে প্রত্যানীত, নদীপারের এই শান্তির রাজ্য ছেড়ে।

একা একা।

ফিঙে তার ঘর এবং স্বামী-পুত্রকে ছেড়ে কাল সকালে যদি আসতে পারত, ভাবে চখা, তবে লোকভয় ত্যাগ করে ওকে সঙ্গে যেতে বলত নিউ কুচবিহার স্টেশন অবধি। সঙ্গে অবশ্য শ্যামলেরাও থাকত। থাকলে থাকত।

মুখে মেয়েরা অনেক কিছুই বলে। ওসব কথারই কথা। ফিঙে সেই রাতেও আদৌ আসেনি। জানে চখা। যে বোধ ফিঙের মনে একটুও বেঁচে নেই, সেই বোধ আছে যে, এমনই ভাব সেদিন সকালে দেখিয়ে গেল।

মেয়েরা যখনই নোঙর ফেলে, তখনই টেনে-টুনে খুব ভালো করে দেখে নেয়, হঠাৎ ঝড়ে বা জোয়ারে সে নোঙর যেন হেঁটে না যায়। বুঝদার হুঁশিয়ার তারাই। মূর্খ পুরুষেরা কোনোদিনও নয়।

আজ চখা বিখ্যাত হয়েছে বলে কী আপশোস হচ্ছে ফিঙের?

কে জানে!

নদীদের বোঝে, এমন ক্ষমতা কি চখার মতন সামান্য পাখির আছে?

একদিন যাকে পাগলের মতন ভালোবেসেছিল এবং মিথ্যে বলবে না, সেই ভালোবাসা হয়তো ফেরতও পেয়েছিল, তার পাশে, বহুবছর পরে দু'ঘণ্টার পথ ঘন হয়ে গাড়িতে বসে যাওয়াও তো কম সুখের নয়!

কিন্তু আসবে না ফিঙে। ও জানে যে আসবে না। "একা" চখার "দোকা" হওয়া হবে না, স্বল্পক্ষণের জন্যেও।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার কথা আবারও মনে পড়বে চখার পথে যেতে যেতে।

"তোমাকে আমি ভোগ করেছি তোমায় বিনাই।"

দ্রুত ছুটে যাবে গাড়ি। হু হু করে হাওয়া আছড়ে পড়বে ওর গায়ে মাথায়। নির্মল হাওয়া। দূর থেকে দূরতর হতে থাকবে সেই দেশ,

যেখানে পাখির নাম পাখি,
নদীর নাম নদী,
গাছের নাম গাছ
এবং স্বামীর নাম স্বামী।

["ফিঙে" চরিত্রটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক।

যদি ঐ নামে ধুবড়ি বা গৌরীপুর শহরে কোনো মহিলা থেকে থাকেন তবে তিনি নিজগুণে লেখককে মার্জনা করবেন।

সেই অঘটনের মিল, নিতান্তই দুর্ঘটনা-প্রসূত বলেই জানতে হবে।]

তটিনী ও আকাতরু

জগন্নাথ ভট্টাচার্য

প্রীতিভাজনেষু

ইটা কী জানোয়ার? বাপ রে! বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচির মতো ব্যাপার দ্যাখতাছি।

আকা বলল।

খাঁচার কাছে বনবিভাগের যে ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি বললেন, এই হচ্ছে ক্লাউডেড লেপার্ড। এদের লেজ শরীরের থেকেও লম্বা হয়।

তাই?

তটিনী কিছু না বলে, সানগ্লাসটা খুলে, ডানদিকের ডাঁটিটা নিচের দিকে দাঁতে কামড়ে ধরে সেদিকে চেয়ে রইল।

সে খাঁচার পাশে অন্য খাঁচায় একটি মাদি শম্বর। ছোট। দু-তিনটি হরিণ। একটা বেশ ঝড় চিতাবাঘ। এদের কেউ বাচ্চাবেলায় ধরা পড়ে কেউ বড় হবার পরে। ক্লাউডেড লেপার্ডটা নাকি এক বুড়িকে আহত করেছিল।

বনবিভাগের সেই ভদ্রলোক বললেন।

তারপর বললেন, লেজ সবচেয়ে বেশি লম্বা হয় অবশ্য স্নো-লেপার্ড-এর।

কোথায় পাওয়া যায় স্নো-লেপার্ড?

তটিনী জিজ্ঞেস করল।

বরফ-ঘেরা পর্বতে। নামেই তো আবাসের ঠিকানা।

অবনী বলল।

অবনী মিত্তির আলিপুরদুয়ারের নন্দাদেবী ফাউন্ডেশানের সদস্য। পর্বতারোহী। পাহাড়ে চড়েন। বন, বন্যপ্রাণী, ফুল, পাখি, প্রজাপতি ভালোবাসে. তার উপর সংস্কৃতি এবং নাটক এবং সংগীতমনস্ক। তাই ওই বিনিপয়সার গাইডের কাজ করছিল ওদের। পেশাতে স্কুলমাস্টার। পেশাটা শখ। এমনিতে বাড়ির অবস্থা বেশ সচ্ছল।

এসেছে ওরা ভাড়া গাড়িতেই। অবনীর সঙ্গে ওর বন্ধু আকাতরুও জুটে গেছে। তটিনী রায় ও মৃদুল দাশ এখানে তিনদিন রেস্ট নিয়ে ধুবড়িতে যাবে। সেখানেও বায়না আছে পরপর চারদিন। যাত্রার নাম 'হলুদ গোলাপ'। একটি কুড়িয়ে-পাওয়া কানীন বালিকাকে নিয়ে উত্তাল মেলোড্রামা।

যাত্রাতে আজকাল অনেকই পয়সা। কিন্তু মাঝে মাঝেই বিদ্রোহ করতে ইচ্ছে হয়। পয়সাই জীবনের সব নয়। তটিনী একথা জানে।

জলপাইগুড়ি জেলার বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের রাজাভাতখাওয়ার ওয়াইল্ড লাইফ ইনফরমেশান সেন্টার থেকে বাংলোতে ফেরার সময়ে পথের উপরে 'Rescue Centre' করেছেন বক্সা টাইগার প্রজেক্টের কর্তৃপক্ষ, তারই খোঁজে তারা বেরিয়েছিল।

ফাল্গুনের শেষ। পারুল গাছে ফুল এসেছে সিঁদুরে লাল। অশোক গাছেও। এখানে মাদার গাছ নেই। নিম্ন আসামের গোয়ালপাড়া বা ধুবড়ির দিকে মাদারের স্নিগ্ধ লালে চোখে ঘোর লাগে। গরম পড়ে গেছে। খুব একচোট ঝড়-বৃষ্টি হয়ে যাওয়াতে আজ আবহাওয়াটা বেশ নরম।

ইনফরমেশান সেন্টারে ঢুকেছিল ওরা মেইন গেট দিয়ে। ড্রাইভার নগেনকে বলে দিয়েছিল গাড়ি

নিয়ে বাংলোতে ফিরে যেতে বড় রাস্তা দিয়েই। আকার সঙ্গে ওরা Rescue Centre-টি দেখে বনবিভাগের নানা কর্মচারীদের দুদিকে ঘরের মাঝের মাটির পথ বেয়ে, পোস্ট অফিস হয়ে, স্টেশনের কিছুদুর দিয়ে লাইন পেরিয়ে একটি বড় বাঁশঝাড় ডান দিকে রেখে বাংলোতে পৌঁছে খাওয়াদাওয়া করে আজই চলে যাবে জয়ন্তী। জয়ন্তীর বন-বাংলোতেই থাকবে।

আলিপুরদুয়ারে পর পর চার রাত, 'হলুদ গোলাপ' যাত্রাপালা করে তটিনী রীতিমতো ক্লান্ত। কাল রাতেই প্রথম ঘুমিয়েছে ভালো করে। আজ সকাল থেকেই বেশ তাজা লাগছে ওর নিজেকে।

তটিনী একটা খড়কে-ডুরে তাঁতের শাড়ি পরেছে। খয়েরি জমির উপরে কালো ডোরা। কালো পাড়। দীর্ঘ বেণীতে দু-তিনটি রুপোর কাঁটা। তাতে চুটকি লাগানো। গলাতে অ্যানোডাইজড স্টিল-এর একটি পুরোনো দিনের ডিজাইনের বিছে-হার। বাঁ হাতে রুপোর হালকা মকরবালা। ডান হাতে টাইমেক্স-এর কালো ব্রান্ডের কালো ডায়ালের ঘড়ি। ডায়ালে রেডিয়াম আছে। কাল রাতে যখন আলো নিভিয়ে ওরা সকলে রাজাভাতখাওয়ার বাংলোর বারান্দাতে বসেছিল, তখনই চোখে পড়েছিল আকার। তটিনীর দুপায়ে রুপোর পায়জোর। দু পায়ের মধ্যমাতে রুপোর চুটকি। তার গায়ের রঙটি ফিঙের মতন কালো কিন্তু মেক-আপ নিলে খুবই ফর্সা। যখন যাত্রা করে না তখন মেক-আপ নেয় না তটিনী। কিন্তু কাটা কাটা নাক চিবুক। ছোট্ট কপাল। দীঘল দুটি কালো চোখ। কাজল পরেছে গাঢ় করে। মনে হচ্ছে চোখ তো নয়, যেন একজোড়া ফিঙে। পলকে পলকে স্পন্দিত হচ্ছে। আলো প্রতিসারিত হচ্ছে উজ্জ্বল কালো দুটি চোখের মণি থেকে।

ওর মুখে এবং চোখের দৃষ্টিতে ভারী এক শান্তশ্রী আছে, বৃষ্টির পরে মুথা-ঘাসে ভরা গাঢ় সবুজ মাঠের মতন।

তটিনীর শরীরের কাছে এলেই ওর গা থেকে দারুণ এক গন্ধ পায় আকা। গায়ে কী সেন্ট মাখে সে, কে জানে! কখনও তার বুকের আঁচল হঠাৎ খসে গেলে অথবা ইচ্ছে করেই সে কখনও খসিয়ে দিলে, যেমন একটু আগেই দিয়েছিল, ফলসা-রঙা সুডৌল মতন স্তনসন্ধি, যেন পৃথিবীর সব আলো-আঁধারি রহস্যের খনি হয়ে ওঠে। সেদিকে চোখ পড়তেই পারুল আর অশোকের লালে লাল হওয়া বৈশাখের নীল আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে আকার মাথা ঘুরতে থাকে বনবন করে। বমি বমি পায়।

কালকে এখানে আসার পর থেকে নয়, তার চারদিন আগে থেকেই, মানে, যেদিন থেকে যাত্রাদলটি এসেছিল আলিপুরদুয়ারে, আকার খাওয়াদাওয়া সবই গেছে।

ফি-বছর ম্যালেরিয়া হয়, বার দুই ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া হয়েছিল। জনডিস, কালাজ্বর, কী হয়নি ওর! কিন্তু এমন অসুখে সে জীবনে পড়েনি আগে। বুকের মধ্যে ভারী একটা কষ্ট। আবার, ভারী একটা আনন্দও। মাঝে মাঝেই হু হু করে উঠেছে আকার বুকের মধ্যেটা। খিদে-তৃষ্ণা চলে গেছে পুরোপুরি। তার উপরে তটিনী যখন ওর মুখটি তুলে, তার চোখের মধ্যে নিজের দু চোখ টায়ে টায়ে রেখে তাকায়, এমনই করে, যাতে চাউনি একটুও উপছে পড়ে না যায়, তখন আকার মনে হয়, ও আর বাঁচবেই না। রোদটা হঠাৎই ঠান্ডা মেরে যায়। জগৎসংসার সব মিথ্যা বলে মনে হয়। কিছুই ভালো লাগে না আকার।

কে জানে!

এই অসুখের নাম কী?

পায়ে পায়ে ওরা যখন রেললাইনের কাছে পৌঁছে গেছে, হঠাৎই চোখে পড়ল ডান দিকে পোস্ট অফিস। পোস্ট অফিস দেখেই বোধহয় তটিনীর খাম কেনার কথা মনে পড়ল।

বলল, একটা চিঠি লিখতে হবে।

চলুন, ভেতরে যাই সকলে। নাকি আকাই গিয়ে নিয়ে আসবে?

না না। চলুন সকলে মিলে যাই। কাজ কী এখানে আমাদের!

তা নেই। কিন্তু ওদিকে মৃদুলবাবু, আপনার হিরো তো বাংলোর দোতলার বারান্দাতে একা বসে কাপের পর কাপ চা খেয়ে শিডনি শিলডন পড়ে পড়ে হেদিয়ে গেলেন। দেরি হলে ভারী রাগ করবেন।

অবনী বলল।

রাগ করলে তো আমারই উপরে করবেন।

তটিনী বলল।

তটিনী হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, মোটে তো সাড়ে এগারোটা। আশ্চর্য! মনে হচ্ছে কতক্ষণ হল যেন বেরিয়েছি। দেড়টা দুটোর আগে কোনোদিন খাই দুপুরে? আর রাতে তো কথাই নেই। যাত্রা যেদিন থাকে সেদিন তো মেক-আপ টেক-আপ তুলে খেতে করতে সেই একটা-ডেড়টাই হয়।

আপনার হিরোও কি ঐ সময়েই খান রোজ? বেড়াতে বেরিয়ে?

মৃদুল আমার হিরো নন, 'হলুদ গোলাপ' যাত্রার নায়িকা শুক্লার প্রেমিক, বসন্ত। আমার নাম তো তটিনী। মঞ্চ থেকে নেমে আসার পর মৃদুলবাবু শুক্লার কেউই নন। তটিনীর তো ননই! জীবনে আমার কোনো নায়ক নেই। তাছাড়া উনি বেড়াতে বেড়িয়ে কখন খান তাও আমার জানা নেই কারণ আমি আর উনি একসঙ্গে কোথাওই যাইনি বেড়াতে এর আগে। 'হলুদ গোলাপ'-এর আগে আর কোনো পালাও করিনি ওঁর সঙ্গে।

হাউ স্যাড।

অবনী বলল।

কেন? স্যাড কেন?

পোস্ট অফিসে ঢুকতে ঢুকতে তটিনী বলল।

না। আপনার মতন মহিলারও জীবনে কোনো নায়ক নেই-ই কথাটা।

তটিনী অবনীর দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, দর্শকদের বা উদ্যোক্তাদের কিন্তু উচিত নটনটীদের মঞ্চের ভূমিকাতেই নিজেদের ঔৎসুক্য সীমিত রাখার। ব্যক্তিগত জীবনটাতে উঁকিঝুঁকি না মারাই ভালো নয় কি?

অবনী বলল, বিলক্ষণ। কিন্তু সংসারে যা ঘটে তার কতটুকুই বা ভালো বলুন? যাঁরা পাদপ্রদীপের আলোতে থাকেন তাঁদের ফুলের মালা আর প্রণামের সঙ্গে এই সব অত্যাচার একটু-আধটু সহ্য তো করে নিতেই হয়।

তারপর বলল, আপনার মতন মেয়েরও যদি নায়ক না থাকে, তবে থাকবে কার?

নেই মানে, আছে নিশ্চয়ই। এই পৃথিবীরই কোনো কোণে। কিন্তু তার সঙ্গে দেখা হয়নি আমার।

তটিনী বলল।

আকার বুকটা ভেঙে গেল।

আকাকেই পরমুহূর্তে তটিনী বলল, কী বলেন আকাবাবু?

তারপরই বলল, আপনার মতো স্মার্ট সুন্দর ইয়াং পুরুষের নাম আকা কে রাখল বলুন তো?

আমার বড়মায়ে রাখছিল।

সরল, ভালোমানুষ হায়ার সেকেন্ডারি পাশ DIE HARD বাঙাল আকা বলল।

বড়মা মানে?

বড়মা বোঝলেন না? বড়মা মানে, আপনারা যারে কন জ্যাঠাইমা, তাই।

ও।

খাম আছে?

পোস্ট অফিসের ভিতর ঢুকে অবনী জিজ্ঞেস করল।

এক ভদ্রলোক, একাই কাউন্টারের পেছনে কাঠের ছোট টেবিলের সামনে ততোধিক ছোট একটি চেয়ারে বসে একগাদা কাগজের উপরে মান্ধাতার আমলের একটি হাতওয়ালা লোহার স্ট্যাম্প দিয়ে বড় স্ট্যাম্প প্যাডের কালিতে জোরে ঠাপ্পা মেরে তারপরে আরও জোরে স্ট্যাম্প করছিলেন, সেই কাগজগুলিতে।

ওদের দেখেই ভদ্রলোক উঠে এলেন।

বললেন নমস্কার।

অত্যন্ত উত্তেজিত এবং কিঞ্চিৎ দ্বিধাগ্রস্ত গলাতে বললেন, আপনি তটিনী দেবী নন?

হঃ। এতক্ষণ লাগে নাকি চিনতে?

আকা বলল ওঁকে, তাচ্ছিল্যের সঙ্গে।

তা নয়, মঞ্চে তো সাজপোশাক আলাদা থাকে, মেক-আপ টেক-আপ থাকে। তাই।

আপনি 'হলুদ গোলাপ' যাত্রা দেখলেন কোথায়? আলিপুরদুয়ারে?

ভদ্রলোক লম্বা, একটু গোলগাল চেহারা, মুখে তিন-চারদিন না-কামানো খোঁচা-খোঁচা কাঁচা-পাকা দাড়ি, একটি নীল-রঙা হাফ-শার্ট, খাকি প্যান্টের উপরে পরা, একটি উইলসন বলপেন গোঁজা শার্টের বাঁ দিকের বুক-পকেটে। পোস্টাপিসের দেওয়ালে রামকৃষ্ণদেবের একটি ছবি এবং ঠিক তার উলটোদিকেই মুর্শিদাবাদের মৃণালিনী বিড়ি কোম্পানির একটি ক্যালেন্ডার।

মাস্টারবাবু তটিনীকে বললেন, আজ্ঞে না ম্যাডাম। আমি দেখেছি আপনাকে হ্যামিলটনগঞ্জে। যখন আপনাদের 'মনমোহন অপেরা' গেছিল গতবছর তখন। আমার ফেমিলি তো সেইখানেই থাকে। ছুটিতে সেখানে গেছিলাম গতবছরের আগের বছরে পুজোর সময়ে।

একবছর আগে দেখেও মনে রেখেছেন আমাকে! কী পালা যে নিয়ে গেছিলাম আমরা সেবারে হ্যামিলটনগঞ্জে তা তো আমার নিজেরই মনে নেই!

'ভানুমতী'।

তাই তো। তা আমাকে মনে রেখেছেন, আশ্চর্য!

আকা বলল, আপনারে একবার দ্যাখলে কি কারও পক্ষেই ভোলা সম্ভব?

মাস্টারবাবু বললেন, তা ঠিক।

আকা বলল, আপনের নাম কী মাস্টারমশয়?

আমার নাম শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু। অরিজিনালি আমি আপনাদের কলকাতার বালিগঞ্জেরই মানুষ মশাই। আমার ছেলেবেলা কেটেছে সেখানেই।

তারপর, পাছে রাজাভাতখাওয়া পোস্টমাস্টার যে কলকাতার বালিগঞ্জেরই বাসিন্দা একথা কলকাতার কেউ অবিশ্বাস করেন তাই যেন বললেন, রায়বাহাদুর নগেন বোস-এর নাম শুনেছেন কি?

অবনী না শুনেও বলল, হ্যাঁ।

তিনিই হচ্ছেন গিয়ে আমার সাক্ষাৎ ন'ঠাকুর্দা। দাদু জ্যাঠতুতো ভাই যদিও।

অবনী বলল, ও, তাই বুঝি!

একটু চা খাবেন না?

দেবেনবাবু শুধোলেন।

চা?

তটিনী অবাক হয়ে গেল।

স্ট্যাম্প আছে, এক টাকার? অথবা খাম?

নাঃ।

খুবই লজ্জিত হয়ে বললেন উনি।

স্টক ফুরিয়ে গেছে, তবে আসার কথা আছে দিন সাতেকের মধ্যে। পোস্টকার্ড আর ইনল্যান্ড নিতে পারেন।

খাম বা স্ট্যাম্প নাই-বা থাকল, চা তো আছে।

অবনী বলল।

শুনেই মাস্টারমশাই হাঁক দিলেন, এই মান্তু! চা আন তাড়াতাড়ি। ওঁদের সকলকে দে। আমাদের আজ কী সৌভাগ্য। স্ট্যাম্প না থাকল তো কী হল। তটিনী দেবী এবং এতসব গণ্যমান্য মানুষ এসেছেন আমার পোস্ট অফিসে।

অবনী বলল, এটা তো আপনার বাড়ি নয়, অফিস। আপনি কেন আতিথেয়তা করবেন?

কেন করব না তাই বলুন! আপনাদের মতন মানুষদের পায়ের ধুলো কি রোজ রোজ পড়বে এই জঙ্গুলে রাজাভাতখাওয়ার ছোট্ট পোস্ট অফিসে!

জায়গাটার নাম রাজাভাতখাওয়া হল কেন বলুন তো?

তটিনী বলল।

শুনেছি, বহুদিন আগে কুচবিহারের রাজা ভুটানের রাজাকে এখানে ভাত খাইয়েছিলেন।

মাস্টারমশাই বললেন।

কেন? জামাই তিনি? না শ্বশুর?

আকা বলল, আউজ্ঞা তা নয়। যুদ্ধ লাগছিলত দুই রাজার মইধ্যে। যুদ্ধে যখন সন্ধি হইল গিয়া তখনে হেই দুই রাজা একলগ্যে বইস্যা ইখানে ভাত খাইছিলেন। তাই ই জাগার নাম রাজাভাতখাওয়া।

তারপরেই তটিনীকে বলল, আপনে দ্যাখেন নাই যে, ইনফরমেশন সেন্টারের দেওয়ালে একখান ফাস ক্লাস রঙিন ছবি আঁকাইছেন কলকাতার থনে আর্টিস্ট আইন্যা, বিস্ট সাহেব?

বিস্ট সাহেব কে?

তটিনী আবার প্রশ্ন করল।

বিস্ট সাহেব হইলেন গিয়া বক্স-টাইগার প্রজেক্টর। তাঁর রাইজ্যেই ঘুরতাছেন আপনেরা আর তাঁরই নাম জানেন না! অবনীদাটা থার্ড ক্লাস। কইবা ত ওনাদেরকে।

এমন সময় বাইরে থেকে পায়জামার উপরে খাকি শার্ট-পরা এক মাঝারি উচ্চতার ভদ্রলোক একটি ভাঁজ-করা খাম-এর মধ্যে কিছু কাগজপত্র বগলে নিয়ে ঢুকলেন। মুখে পান। জর্দার গন্ধ বেরুচ্ছে।

দেবেনবাবু বললেন, এই যে রেবতী, ঠিক সময়েই এসেছ। ইনিই হলেন সেই তটিনী দেবী। 'ভানুমতী' পালার কথা বলেছিলাম না তোমাকে? গত বছরের আগের বছর পুজোর সময়ে হ্যামিলটনগঞ্জে গেছিলেন ওঁরাই। আর এ বছর এই সময় আলিপুরদুয়ারে এসেছিলেন।

ওঁকে চিনুম না দাদা! আপনার মুখে ত হেই নামই কৃষ্ণনাম আছিল বহুদিন।

নবাগন্তুক বললেন।

অবনী কারেক্ট করে বলল, রাধানাম বলুন। জেন্ডার ভুল করছেন কেন?

সকলেই সেই কথাতে হেসে উঠলেন এবং উঠল।

এই সময়টা কি যাত্রার পক্ষে উপযুক্ত? প্রায় রোজই তো ঝড়-বৃষ্টি হয়।

দেবেনবাবু বললেন।

আকা বলল, ইনি হইতেছেন সাক্ষাৎ জগদম্বা। ম্যাঘ, বিদ্যুৎ সর্বক্ষণ ওঁর শাসনেই থাহে। এমনিই কইতাছি না। চারদিন মানে, চার রাইত পরপর হইল যাত্রা, তাও সার্কিট হাউসের সামনের মাঠে। কুনোরকম উপদ্রবই ত হয় নাই। না ঝড়, না বাতাস, না জল!

ও, আলাপ করিয়ে দিতে ভুলে গেছিলাম। ইনি হলেন রেবতীভূষণ ভৌমিক। পোস্টম্যান।

পোস্টমাস্টার দেবেনবাবু বললেন, নবাগন্তুককে দেখিয়ে।

রেবতীবাবু দু হাত তুলে নমস্কার করলেন।

করেই আকার দিকে চেয়ে বললেন, আপনারে য্যান চিনা-চিনা লাগে! আপনের বাড়িও কি সলসলাবাড়িতে?

না। আমার বাড়ি হইল গিয়া আলিপুরদুয়ারে। আর এই অঞ্চলে আসল-যাওন তো লাইগ্যাই আছে। তাছাড়া, আমরা পেরতি বচ্ছরই জয়ন্তী ছাড়াইয়া ভুটান পাহাড়ে মাউন্টেইনারিং-এর ক্যাম্প করি না! ছুটো-ছুটো ছাওয়াল-মাইয়াদেরও তো লইয়া আসি আলিপুরদুয়ার থিক্যা। দ্যাখছেন নিশ্চয়ই!

পোস্টম্যান রেবতীবাবু এবারে একটু ভেবে বললেন, বুঝেছি, বুঝেছি। আপনে আলিপুরদুয়ারের তপনবাবুর লগে আসেন ত!

হ। ঠিকোই ধরছেন।

পোস্টমাস্টার জিজ্ঞেস করলেন, কোন তপনবাবু?

আরে, আলিপুরদুয়ারের অ্যাসিস্ট্যান্ট পাবলিক প্রসিক্যুটার।

অ। বুঝেছি। টাক মাথা তো।

আউজ্ঞা। এক্কেরে টাক না, কিছু চুল এহনও আছে। তবে পিছনে।

অবনী জিজ্ঞেস করল, আপনার বাড়ি কোথায় রেবতীবাবু?

মানে, দ্যাশ কই ছিল, তাই জিগান ত?

হ। বাড়ি মানে তো দ্যাশ! ঐ হইল আর কী!

দ্যাশ তো আছিল মাইমানসিংহ। এহনে থাহি সলসলাবাড়িতে। উদ্বাস্তু। বোঝেনই তো!

হ। হ। বুঝেছি। আমরাও ত তাই-ই। মানে উদ্বাস্তুর পোলা আর কী! না-বোঝনের আছেটা কী?

মাস্টারমশয়ের বাড়ি তো বললেন হ্যামিলটনগঞ্জ। আলিপুরদুয়ার থেকে যেতে পথে কী একটা জায়গা পড়ে না, কী যেন নাম?

তটিনী বলল।

পড়ে তো! আটিয়াবাড়ি। গারোপাড়া ভাতখাওয়া টি এস্টেট হয়ে কালচিনি হয়ে ডিমা নদী পেরিয়ে যেতে হয়।

মাস্টারমশাই যেন বলতে বলতে স্মৃতিমেদুর হয়ে উঠলেন।

মুখ-চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল তটিনীর। বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ আটিয়াবাড়ি। মনে আছে, আমরা বাস দাঁড় করিয়ে চা আর শিঙাড়া খেয়েছিলাম সেখানে।

তটিনী বলল, স্মৃতিচারণ করে।

আপনি আগে কোথায় ছিলেন মাস্টারমশাই?

এখানে আসার আগে?

হ্যাঁ।

অবনী জিজ্ঞেস করল।

আজ্ঞে, আগে ছিলাম পানাতে।

পানা? সেটা কোথায়?

তটিনী জিজ্ঞেস করল।

একেবারে ভুটানের বর্ডারে। ভুটান দেখা যায় সেখান থেকে। বাসরা আর পানা এই দুই নদীই বেরিয়েছে ভুটান থেকে। ওঃ। নাইনটি-টুতে সে কী বন্যা! বন্যায়...

ওঁকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে অবনী বলল, চা তো খাওয়া হল, আপনাদের সঙ্গে আলাপ হয়ে খুব ভালো লাগল। এবারে আমরা এগোই। কী বলেন মাস্টারমশাই? রোদ চড়া হয়ে যাবে।

তটিনী বলল, হ্যাঁ।

মাস্টারমশাই হাঁক দিলেন, মান্তু। ছাতাটা নিয়ে মেমসাহেবের মাথার উপরে ধরে পৌঁছে দিয়ে আয় বাংলো অবধি।

তটিনী বলল, আপনি কি পাগল হলেন? কিচ্ছু লাগবে না। চলি তাহলে। আচ্ছা, খুব ভালো লাগল। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আপনাদের।

তারপরই বলল, এই মান্তুকে আমি দশটা টাকা বকশিস দিতে পারি কি চা খাওয়াবার জন্যে?

দশ টাকা! সে কি! অত টাকা দেবেন কেন?

আমার কাছে দশ টাকার দাম নেই, তাছাড়া চেঞ্জও নেই। কিন্তু আপনি অনুমতি দিলেই দিতে পারি। অনুমতি দিলে খুবই খুশি হই।

দিন। যখন বলছেন।

মাস্টারমশাই দেবেন্দ্রনাথ বসু বললেন।

পোস্টম্যান রেবতীবাবু বললেন, আজ সকালে কার মুখ দেইখ্যা উঠছিলি রে ছুঁড়ি?

মান্তু নামক মেয়েটি নির্বিকার নিরুত্তাপ মুখ মাটির দিকে নামিয়ে চুপ করে রইল।

আমরা এবারে যাই।

অবনী বলল।

ইনল্যান্ড, খাম কিছুই নিলেন না তো চিঠি লিখবেন কী করে?

মাস্টারমশাই বললেন।

তটিনী ঘুরে দাঁড়িয়ে, একটি পুরুষ-হনন হাসি হেসে বলল, চৈত্র দিনের ঝরা পাতায়।

অবনী বলল, ব্রাভো! ব্রাভো! এই নইলে আপনি নায়িকা। আপনি বর্ন-হিরোইন। সাধে কি গেটেদা বলেন যে তটিনীর কারোরই ডিরেকশানের দরকার নেই। ও হচ্ছে ন্যাচারাল অ্যাক্ট্রেস।

দু হাত তুলে ওঁদের নমস্কার করে তটিনী বাইরে বেরোল। পেছনে পেছনে অন্যরা।

অবনী বলল, যাঁরা চিঠি বিলি করেন, মানে, এই পোস্টম্যানেরা কত বড় কাজ করেন, তাই না? এঁরাও তো আমাদেরই মতন মানুষ। এঁদেরও আমাদের মতন সুখ-দুঃখ থাকে, সংসার থাকে, ছেলেমেয়ে থাকে, এঁরা নিছকই আমাদের দুঃখ বা আনন্দের ডেলিভারি-মেশিন নন। তাই না? জীবনে আজ এই প্রথম প্রত্যেক পোস্টম্যানের মধ্যে যে আমাদেরই মতন একজন মানুষও থাকেন, তাঁকেই আবিষ্কার করলাম।

তটিনী বলল, হুঁ।

আকা বলল, ক্যান? আমার জন্যে নয়? আজ না-হয় আমি স্যা চাকরি ছইড়্যা দিছি, একদিন ত চিঠি বিলিও করছি, ঘরে ঘরে ঘুইর‍্যা।

করেছেন। না?

তটিনী বলল।

করি আর নাই? কত মানুষের কত খবর লইয়া লাড়াচারা করছি! হাঃ! স্যা আছিল একদিন।

তটিনীর আসলে মনে পড়ে গেছিল ওর নিজের ছেলেবেলার কথা। ওর বাবা মেদিনীপুরের এক অখ্যাত সাব-ডিভিশানের এক অখ্যাত দুর্গম গ্রামের একটি পোস্ট অফিসের পোস্টমাস্টার-কাম-পোস্টম্যান ছিলেন। সে তার বাবার বিনি-মাইনের ঝিই ছিল মাত্র। অতি মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের বিনিময়ে সে তার মাতাল বাবার সব প্রয়োজন মেটাত। রান্নাবান্না করত, সেবা-শুশ্রূষা। একেবারে শিশুকালে মা-হারানো তার বাবার সঙ্গে কোনোরকম আত্মিক যোগ ছিল না। অনেক মেয়েরই থাকে না। ওর বয়স যখন ওই দশ-এগারো বছরের মাস্তুরই মতন ছিল, সেই সময়েই গ্রামের মহাজন শ্রীমন্ত জানা মেদিনীপুর শহরে ভালো কাজ দেবে, সুখে রাখবে, এই লোভ দেখিয়ে মাতাল বাবাকে মোটা টাকা দিয়ে মা-মরা তটিনীকে তার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে গেছিল। তারপরের সেই সব গ্লানি আর ক্লেদ-ভরা দিনগুলির কথা মনে পড়ে যাওয়াতেই ওর মন ভারী হয়ে এল।

মাস্তু দাঁড়িয়েছিল দরজার একপাশে মাস্টারমশাই আর পোস্টম্যানবাবুর থেকে তফাতে, অপরাধীর মতন। তটিনী পেছন ফিরে চেয়ে একবার দেখল মাস্তুকে পূর্ণ দৃষ্টিতে।

তারপর হাত তুলল। বা-ই-ই করার মতন করে। কিন্তু মুখে কিছুই না বলে মনে মনে বলল, আসি। যেন, বিদায় নিল। ওই মাস্তুর কাছ থেকে যেমন, ওর ছেলেবেলার নিজের কাছ থেকেও তেমনই।

হঠাৎই ঘুরে দাঁড়ানো তটিনীর মরালীর মতন গ্রীবা দেখে আকা আবারও কষ্ট পেল। চৈতি হাওয়াতে।

আন্দোলিত কয়েকটি এলোমেলো অলকচূর্ণ সেই তন্বী সুঠাম গ্রীবার সৌন্দর্য হঠাৎই আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল।

পোস্ট অফিসের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে পেছন ফিরে অবনী দেখল, দরজাতে দাঁড়িয়ে থাকা দেবেনবাবুর খাকি ফুল-প্যান্টের তিনটি বোতামই খোলা। হয়তো ওরা যাবার ঠিক আগেই বাথরুম থেকে এসেছিলেন। ভুল হয়ে গেছিল লাগাতে। ভুলোমনের পুরুষমাত্রকেই এমন নানা এমবারাসমেন্টের মধ্যে পড়তে হয়। একজন পুরুষ হিসেবে দেবেনবাবুর সমব্যথী হল অবনী।

ভাবছিল, পুরুষও যদি পুরুষকে ফেলে দেয়, বিনা দোষে, তবে সে বেচারারা এই পুরুষ-নিগ্রহর যুগে যায় কোথায়?

আকাও ভাবছিল, মস্ত ভুল হয়েছিল তার তটিনীর সঙ্গে এবারে এই বক্সার জঙ্গলে আসা, ল্যাংবোটের মতন, খিদমতগারের মতন। আর বাঁচা হবে না! মরবে সে এবারে। একেবারেই মরবে।

দূরে ভুটান পাহাড়ের মেঘের মতো নীলচে শরীর দেখা যাচ্ছে ঘন জঙ্গলের মাথা ছাড়িয়ে। আস্তে একটা হাওয়া বইছে। হাওয়ার চেয়েও আস্তে আলতো পায়ে হাঁটতে হাঁটতে তটিনী ভাবছিল, তার সমস্ত জীবনটাই ভুল। যৌবন আর কতবছর থাকবে? এবার থিতু হওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে একটা। তবে, জীবনে নিজের চেষ্টাতে, নিজের চাঁদমুখের জোরে ঈশ্বরের অশেষ আশীর্বাদে সে অনেকই দূর চলে এসেছে। এই এতখানি পথ আসাটা তার কাছে একদিন সত্যিই অভাবনীয় ছিল। কী করে মোটামুটি ইংরেজি বাংলা শিখেছিল, যিনি তার মধ্যে সাহিত্য-বোধ জাগিয়ে তুলেছিলেন, সুরুচি, সেই চালকলের মালিক নারীদেহ-বিলাসী মোটা কুৎসিত মানুষটার কাছে ও শুধু এই কারণেই আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবে।

প্রত্যেক মানুষেরই মধ্যে ভালো-মন্দ থাকেই। যদিও শুধুই ভালো, শুধুই মন্দ মানুষ দেখেনি যে জীবনে ও তাও নয়। একথা ঠিক যে, সাহিত্যই তাকে তার আজকের যতটুকু প্রাপ্তি তার পারায় সবটুকুই দিয়েছে। বাংলা গল্প উপন্যাস পড়ে সে নিজেকে গড়ে-পিটে নিয়েছে। তার সেই প্রথম

বাবু প্রাণধন খাঁ পয়সাওয়ালা হলেও শিক্ষিত ছিলেন।

বাবু বলতেন, মুনিয়া রে! Literature makes a person. সাহিত্য পড়। তার চেয়ে বড় শিক্ষা আর নেই।

শরীর-ভাঙিয়ে খাওয়ার মধ্যে লজ্জার কিছু দেখেনি ও। কিন্তু নিদারুণ অসহায়তা অবশ্যই দেখেছে। সেই জীবিকা যে অতি স্বল্পমেয়াদি তাও ও জেনেছে। এবং জেনে, শরীরের চেয়ে মনের উপরে, গুণের উপরে, ক্রমশই অনেকই বেশি নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে।

সে একাই জানে, শুধু সে একাই, এই দীর্ঘ, দুর্গম, বন্ধুর পথের দু পাশে কী ছিল?

লোভ কিন্তু আদৌ বেশি নেই ওর। ও একজন সাদা-সিদে, ভালোমানুষ, কম বুদ্ধিসম্পন্ন সচ্চরিত্র পুরুষ চায়, যার সঙ্গে ঘর বেঁধে ও বাকি জীবনটা কাটাতে পারে। একটি কোলজোড়া ছেলে। তারপরে একটি মেয়ে। ব্যস্‌স্‌।

আর কিছু চাইবার নেই ওর জীবনের থেকে। চারবার অ্যাবর্শান করতে হয়েছে ওকে। প্রথমবার চোদ্দ বছর বয়সে, শেষবার সাতাশ বছর বয়সে। সহবাস আর দাম্পত্যর মধ্যে তফাত যে কী তা ও বোঝে। তার সঞ্চয়ের সুদ থেকে, আড়ম্বর করে নয়, সাদামাটাভাবে কেটে যাবে বাকি জীবন। গুমা-হাবড়াতে দশ কাঠা জমিও কিনে রেখেছে। এখন...

তবে পুরুষ দেখে ওর ঘেন্না ধরে গেছে পুরুষ জাতটারই ওপরে। শুয়োরের জাত এই পুরুষ।

হাঁটতে হাঁটতে তটিনী ভাবছিল, ওর পায়ে পায়ে মুগ্ধ, বাধ্য কুকুরের মতন হেঁটে-আসা আকা মানুষটি কিন্তু বেশ! ভালো নাম আকাতরু রায়। আজব নাম। মানুষটি একশো ভাগ খাঁটি মানুষ। আর তটিনী বুঝতে পেরেছে যে, তাকে মানুষটা পাগলের মতন ভালোবেসে ফেলেছে। একমাত্র নির্বুদ্ধি মানুষেরাই, সৎ, উদার, নিজ স্বার্থবোধহীন পুরুষেরাই এমন করে ভালোবাসতে পারে কোনো নারীকে, প্রথম দর্শনেই। তবে এখনও জানে না ও, এটা ভালোবাসা না মোহ না কাম! অনেক সময়েই এই তিনের মধ্যে তফাত করা ভারী কঠিন হয়ে ওঠে। অনেকবার দেখেছে ও। অধিকাংশ পুরুষেরাই স্বভাবে শুধু শুয়োরই নয়, গদর্ভও বটে। তাছাড়া, পুরুষের ভালোবাসা আর মুসলমানের মুরগি পোষা সমগোত্রীয় ব্যাপারই।

ঠিক সেই সময়েই পারুল গাছের মগডাল থেকে একটা কোকিল ডেকে উঠল খুব জোরে, কুহু-কুহু-কুহু করে।

তটিনীর বুকের মধ্যেটা চমকে উঠল।

আকা নাক তুলে উঁচু পারুল গাছটার মগডালে চোখ সরু করে আকুল হয়ে খুঁজতে লাগল। ওর চোখে রোদ পড়েছে। পাখিটা যে কোথায় তা কিছুতেই ও দেখতে পাচ্ছে না।

তটিনী ভাবছিল, বেচারা! বোকা মানসটা জানেই না যে, কোকিলটার বাসা মানুষটার নিজেরই বুকের মধ্যে।

২

যখন রাজাভাতখাওয়া বন-বাংলোতে এসে পৌঁছল ওরা তখন প্রায় বারোটা বাজে।

মৃদুলের সামনে টেবিলটার উপরের অ্যাশট্রেটা সিগারেটের টুকরোতে ভরে গেছে। সে কালকের THE STATESMAN-টা পাশের চেয়ারে সরিয়ে রেখে, উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বাবাঃ! হল তোমাদের ইনফরমেশন সেন্টার দেখা! এত ইনফরমেশন জড়ো করলে তা স্থানান্তরিত করতেও তো পুরো সপ্তাহ লাগবে।

তটিনী মৃদুলের উলটোদিকের চেয়ারে বসে বলল, সত্যি! কত কীই-না জানলাম, দেখলাম। গেলে পারতেন আপনিও?

থ্যাঙ্ক উ্যা। আমার নিজের মধ্যে এত ইনফরমেশন জমে আছে যা হজম করতে বহু যুগ লেগে যাবে। আমি আমাতেই টইটম্বুর।

সত্যি। আপনি ভারী ভালো কথা বলেন কিন্তু মৃদুলবাবু। আপনি নিজেই একটা কিছু লিখুন না!

কী?

নাটক, শ্রুতি নাটক, নয়তো যাত্রা।

লিখলেই হত। মাঝে মাঝে শুধু যাত্রার ডায়ালগই নয়, সিনেমার ডায়ালগও এমন বোকা-বোকা, অপার অশিক্ষিতর মতন শোনায়, নিজে লিখতে ইচ্ছে যে হয় না, তা নয়। প্রায়ই মনে হয়, রেগেমেগে খাতা-কলম নিয়ে বসে যাই।

তারপর?

তারপর আর কী! লিখতে কোনো কিছু যে পারি এই ভাবনাটাকে ফোঁড়ার মতন লালন করতে খুব ভালো লাগে আমার। ইচ্ছে করলেই, মানে, যে জিনিস আমার করতলগত, তা করে ফেললেই পুরো মজাটাই মাটি হয়ে যায় বলে মনে হয়।

অবনী বলল, তাছাড়া, একেবারে ঝুলও তো হতে পারে! সেই ভয়টাও থাকে।

মৃদুল হেসে বলল, তাও বটে!

জানেন, আকাতরু গাছ দেখলাম আমরা।

আকাতরু? গাছের নাম আকাতরু?

তাহলে আর বলছি কী? লালি, দুধে লালি, চাঁপ, চিকরাসি, গামহার, কাট্টুস, উদাল, ঝিমুনি আর খয়ের। খয়ের গাছও দেখলাম তো!

অবনী বলল।

না, না। সেসব গাছের নাম তো আমরা জানিই! কিন্তু যেসব গাছ এখানেই প্রথম দেখলাম সেগুলোর কথা শুনি। ভারী আশ্চর্য সব নাম তো! তা আকাতরু গাছ দেখতে কেমন?

বলেই ডান হাতের তর্জনী নির্দেশ করে বলল, আচ্ছা, এই গাছটা কী গাছ। এই যে আমাদের বাংলোর গেট এর ডান পাশে?

আকা বলল, ইটারেই তো কয় গামার। বা, গামারি।

অবনী বলল, আমাদের এখানে বলে গামার বা গামারি কিন্তু বিহারে এবং মধ্যপ্রদেশে বলে গামহার। জানিস আকা?

তাই?

ইয়েস।

তা আকাতরু গাছ কেমন তা তো বললেন না?

মৃদুল শুধোল আকাকে।

জাম গাছ দ্যাখছেন।

জাম গাছ? না তো। গাছ দেখিনি তবে খেয়েছি। কালোজাম। গোলাপজাম।

শ্যামবাজারের মৃদুল আকাশ থেকে পড়ল।

হায়! হায়! জাম গাছও দ্যাখেন নাই?

না।

খাইলে কী হয়? আকাতরু জাম গাছেরই মতো মস্ত গাছ—পাতাগুলান কিন্তু ঠিক পাকুড় গাছের পাতার মতন। পাকুড় গাছ দ্যাখছেন তো?

পাকুড় গাছ? নাঃ।

খাইছে। এ তো মহা সাহেবেরে লইয়া পড়লাম দ্যাখতাছি।

তারপর বলল, মস্ত বড় বড় গাছ হয় আকাতরু। সাদারঙা আমের বোলের মতন ফুল ফোটে, মার্চ-এপ্রিল মাসে আকাতরু গাছে।

এখনই তো মার্চ মাস।

তয় দেখবেন। চোখ খুইল্যা থাককেন য্যান?

ইংরেজি, মানে বটানিকাল নাম জানেন নাকি? আকাতরুর?

মৃদুল সংকোচভরে আকাকে আবার জিজ্ঞেস করল।

আমি জানুম কোথনে? তবে কল্যাণ দাস সাহেবে আর ভগবান দাস সাহেবে এই বাংলোতেই বইস্যা কয়দিন আগে কথা কইত্যাছিল, আমি শুইন্যা লইছি। খালি শুইন্যাই লই নাই, টুইক্যাও থুইছি। তা না হলে আমারই ব্রেন তো। হঃ। এক্কেরেই বেগ-বেগা!

বেগ-বেগাটা আবার কী বস্তু?

মানে, আমার ব্রেনে যা কিছুই ঢোকে তা বেগে ঢুইক্যাই আবার তৎক্ষণাৎ বেগে বাইরাইয়া যায়, বোঝলেন কি না!

কী? মানে, বটানিকাল নামটা কী?

HEYNEE TRIJUGA.

হেইল হিটলার-এর মতন শোনাল যে!

অবনী বলল।

সে এক ইংরেজ সাহেব আছিল B.Rox. স্যায় নাম থুইয়া গ্যাছে গিযা ওই গাছের।

তিনি কোথায়? সেই রক্স সাহেব?

কেডা জানে তা। কবে মইর‍্যা ভূত হইয়া গ্যাছে গিয়া।

কল্যাণ দাসটা কে?

বাবাঃ। তিনি ত হইলেন গিয়া অ্যাডিশানাল ডি.এফ.ও। এ.ডি.এফ. কইলে আবার মহা চইট্যা যান গিয়া। তিনিই ত সব। ডিরেক্টরে রোজ আসেন থোরী।

অ্যাডিশানাল ডি.এফ.ও.-ও তো এ.ডি.এফ.ও.-ই।

তা ঠিক। কিন্তু অ্যাসিস্ট্যান্ট ডি.এফ.ও. ও এ.ডি.এফ ও। তাই পুরাডা না কইলে তাঁর মানহানি হয়।

তাই?

আসলে কী আর হয়? তিনি ভুল কইর‍্যা ভাবেন, যে হয়।

আর ভগবান দাস সাহেব?

তিনি শিলিগুড়ির থনে আইছিলেন। সিলভিকালচাবের এ.ডি.এফ.ও।

ও।

তারপরই বলল, এইসব কথা থাউক। এহনে কয়েন, এঁচড় কি খাইবেন? ফাসকেলাস এঁচড় হইছে বাবুর্চিখানার পিছনের গাছে।

এঁচড় তো অমৃত।

মৃদুল বলল।

গাছপাঁঠা।

অবনী বলল।

তাহলে কই যাইয়া নর্বুরে।

নর্বুটা কে?

আরে? তারেই চিনলেন না? এই বাংলোর চৌকিদার-কাম-কুক-কাম-কেয়ারটেকার। হোয়াট নট? তার পুরা নাম হইতাছে নর্বু তামাং।

এত সব কথা আকা বলছিল বটে মৃদুল আর অবনীর সঙ্গে কিন্তু তার সমস্ত বাক্যাড়ম্বরের লক্ষ্য ছিল তটিনী।

কী যে হবে আকার, আকা জানে না।

তটিনী, ডান পায়ের বুড়ো আঙুলটি চটির মধ্যে ঘষতে ঘষতে বলল, আপনার নাম যে আকা, সে কি আকাতরু থেকেই?

তটিনী তাকে উদ্দেশ্য করে কথা বলতেই ছাই-চাপা আগুন যেমন ফুঁ দিলেই দপ করে জ্বলে ওঠে, আকা তেমনি করে জ্বলে উঠল।

বলল, হ। বড়মায়ে তো তাই কইতেন। মস্ত গাছ তো। ভাবছিলেন আমিও মস্ত হইব বুঝি মানুষের মইধ্যে, আকাতরুরই মতন।

হয়েছেনই তো।

মৃদুল বলল।

হঃ। স্যা তো চেহারায়। মানুষ আর হইতে পারলাম কই। বনমানুষই রইয়্যা গ্যালাম।

তটিনীর হাসি পাওয়ার কথা ছিল আকার এই কথাতে। কিন্তু অন্যদের মুখ স্মিত হাসিতে ভরে উঠলেও তটিনী হাসল না।

একটু চুপ করে থেকে ও বলল, আপনারা সবাই কখন খাবেন?

তুমি যখন খাবে। তুমিই একমাত্র মহিলা দলে। তোমার ইচ্ছেতেই সব হবে।

মৃদুল বলল।

বাঃ তা কেন! একদিকে পুরুষের সমান বলে দাবি করব আর অন্যদিকে নেকুপুষুমুনু হয়ে সব সুযোগ নেব, তেমন মহিলা আমি নই। না, বলুন না?

অবনী বলল, কী রে আকা? যা না নিচে একবার। নর্বু তামাং না কী নাম বললি, তাকে একবার জিজ্ঞেস করে আয় ক'টা নাগাদ তৈরি হয়ে যাবে লাঞ্চ। আর এঁচড়ের লোভ যখন জাগিয়েই দিলি আমাদের মনে, তখন দেখিস যেন...

আরে কুনোই চিন্তা নাই তর। এঁচড়টা আমিই রাঁধুম।

তবেই সেরেছে। মুখে দেওয়া যাবে না।

তারপর তটিনীর দিকে ফিরে বলল, যা ঝাল আর তেল দেবে আকা!

তারপর বলল, তোর গুণপনা দেখাবার আরও অনেক জায়গা পাবি, জয়ন্তী, সান্ত্রাবাড়ি, বক্সাদুয়ার, ভুটানঘাট। অদ্যই তো আর শেষ রজনি নয়। কিন্তু যেখানে বাবুর্চি আছে সেখানে তোর হাতের রান্না খেতে আদৌ রাজি নই আমি।

ঠিক আছে।

আকা বলল।

আকা সিঁড়িতে ধপ ধপ শব্দ করে নিচে নেমে গেলে, মৃদুল স্বগতোক্তির মতন বলল ভেরি গুড সোল। আপনার বন্ধু মানুষটি একটি ওরিজিনাল। ভারী ভালো। ওঁর কোনো প্রোটোটাইপ এই ধরাধামে খুঁজে বের করা যাবে বলে মনে হয় না।

তারপরেই বলল, করেন কী ভদ্রলোক। মানে অকুপেশান কী?

পরোপকার।

যাঃ। সত্যি বলুন না।

সত্যিই পরোপকার। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ায়। অথচ বড়লোক যে, তাও আদৌ নয়। একটা বই-এর আর স্টেশনারির দোকান আছে আলিপুরদুয়ার বাজারে কিন্তু সেখানে সে দিনের মধ্যে দুঘণ্টা থাকে কিনা সন্দেহ। বাকি সময়টা সত্যিই দশের উপকার করে বেড়ায়। স্বার্থগন্ধহীন উপকার। আলিপুরদুয়ার এবং আশেপাশে ও হয়তো আজ অবধি শ'খানেক মড়া পুড়িয়েছে, পনেরোটি মেধাবী কিন্তু গরিব ছেলেকে পড়াশুনা শিখিয়ে পায়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, জনা কুড়ি দুঃস্থা মেয়ের ভালো বিয়ে দিয়েছে। একমাত্র মিডওয়াইফ-এর কাজটাই করতে পারে না অথবা করতে দেওয়া হয় না সহজবোধ্য কারণে। তা নইলে, ওর মতন সেবাশুশ্রূষা হয়তো সদরের হাসপাতালের কম ট্রেইনড নার্সই জানে!

কুড়িটি মেয়ের বিয়ে দিলেন আর নিজের বিয়ে?

তটিনী জিজ্ঞেস করল।

ওই তো! করল কোথায় আর!

কেন? বিয়ে করেন না কেন?

কেন?

বলে, হেসে ফেলে অবনী।

হাসছেন কেন?

তটিনী বলল।

অবনী বলল, সময় তো যায়নি।

তারপরে বলল, আকা রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা আউড়ে ডান হাতটা হাওয়ায় নেড়ে নেড়ে বলে, "মোর তরে যদি কেউ প্রতীক্ষিয়া থাকে/সেই ধন্য করবে আমাকে।"

তারপরেই বলে, হে বন্ধু "আয়"।

বাক্যটা তো "হে বন্ধু বিদায়"।

তা তো জানাই। কিন্তু ও বলে, হে বন্ধু আয়।

তারপর বলল, বাঙাল তো আমিও। কিন্তু ওর মতন হোল-হার্টেড হোলসাম বাঙাল পাওয়া ভার।

এই কথাতে ওরা সমস্বরে হেসে উঠল।

রিফিউজি হয়ে এসেছিলেন ওর বাবা-মা ফরিদপুর থেকে। আমার বাবার কাছে গল্প শুনেছি। আমরা পূর্ববঙ্গীয় হলেও আলিপুরদুয়ারে দেশভাগের আগে থেকেই থিতু হয়েছি। আমার বাবা ভারী ভালোবাসতেন আকাকে। বলতেন Gem of a Boy. যখন আসেন তখন ও ছিল কিশোরী বয়সের মায়ের স্বপ্নে আর পুতুল খেলাতে। উনিশশো বাষট্টিতে ওর জন্ম। বড় দাদারা সব অবস্থাপন্ন। কিন্তু আলাদা হয়ে গেছে। একজন গোয়ালপাড়ার গৌরীপুরের প্রফেসর। অন্যজন ধুবড়ির বড় কন্ট্রাক্টর। শুধু ওই ছোট থেকে গেল। ওর বৃদ্ধা মার সব দায়িত্ব ওরই। পরোপকার করে আর মায়ের যত্ন করে। মানুষ না-হওয়া আকাই মানুষের ভূমিকা পালন করে গেল। শুধু করলই না, ও আদর্শ মানুষের দৃষ্টান্তস্বরূপ।

বড় ভায়েরা দেখেন না? মাকে?

ওই উপর উপর।

পড়াশোনা?

আকা স্কুল ফাইন্যালের পরে আর পড়েনি বটে কিন্তু প্রচুর পড়াশোনা ওর। বন-জঙ্গল খুব ভালোবাসে। আলিপুরদুয়ারের "নন্দাদেবী ফাউন্ডেশান" আর "ঋজুদা ফ্যান ক্লাব"-এর সক্রিয় সদস্য। প্রতি শীতে ভুটানের সীমান্তের পাহাড়ে বাচ্চাদের দল নিয়ে যায়। ও যেহেতু অজাতশত্রু, ওর দোকানের বিক্রি খুবই ভালো। ওর সাহায্যকারী যে ছেলেটি দোকান দেখে, সে বই আর স্টেশনারি জিনিস বিক্রি করেই হিমসিম খেয়ে যায়। তাছাড়া প্রায় পঞ্চাশটি পরিবারের মাসের সব স্টেশনারি যায় ওরই দোকান থেকে। গৃহিণীরা লিস্ট করে পাঠিয়ে দেন। সাইকেল-ভ্যানে করে ও বাড়ি বাড়ি আরেকটি ছেলেকে দিয়ে তা সাপ্লাই করে ধারে। মাস শেষ হলে টাকা দেন ওর পাতানো বৌদি, মাসিমা, পিসিমা, বোনেরা, দিদিরা।

আকা গর্ব করে বলে, দ্যাখ অবনী, ক্রেডিটে কারবার করি বটে, কিন্তু এক পয়সাও মার যায়নি আজ অবধি।

আমি বলি, তা যাবে কেন? তুই তো প্রায় কস্ট প্রাইসেই দিস সবকিছু, সকলই। প্রফিট আর কতটুকুই রাখিস? সস্তাতে হয়, তাই সকলেই নেন।

তাতে কী বলেন উনি?

তটিনী বলল।

বলবে আবার কী? জিভ কেটে বলে, ছিঃ ছিঃ। যা বাজার। প্রত্যেকের সংসার চালানোই যে এক বিষম ব্যাপার। বেশি প্রফিট করে কী করব? আর আমার সংসার তো শুধু আমার এবং আমার মায়ের। আমাদের প্রয়োজনটাই বা কতটুকু। কিন্তু ওর ব্যবসার যা ভল্যুম, তাতে ও ন্যায্য প্রফিট রাখলে এতদিনে গাড়ি কিনতে পারত, দোতলা পাকা বাড়িও করে ফেলতে পারত সহজেই। তার উপরে খয়রাতিও তো কিছু কম নয়। সাইকেল চড়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘোরা কিন্তু সবসময়েই পরিষ্কার পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে ঘুরে বেড়ায় যখন, তখন মনে হয় দেবদূত এল সাদা পক্ষীরাজে চড়ে। এ যুগে ওর মতন চরিত্র সত্যিই দেখা যায় না।

বাঃ।

তটিনী বলল, স্বগতোক্তির মতন।

তারপর বলল, এরকম চরিত্র থিয়েটারেই দেখা যায়, বাস্তবেও যে আছেন তা জানা ছিল না।

কী যে বল তটিনী! যাত্রা থিয়েটারে সিনেমাতে এখন ভালো বলতে কোন চরিত্রই বা দেখতে পাও? একটাও কি পাও? সমাজের, জীবনের যত কাদা তাই নিয়েই তো আমাদের মাখামাখি।

সত্যি!

অবনী বলল।

কাদা মাখতে বা তাতে ডুব দিতেও দোষ নেই। যদি কখনও সেই পঙ্কে পঙ্কজও ফুটত দু-একটি!

মৃদুল বলল।

ঠিক!

তটিনী বলল।

এমন সময়ে সিঁড়িতে আবার ধপ ধপ শব্দ হল। ঋজু, কালো, প্রায় ছ'ফিট লম্বা আকা উঠে এল দোতলার বারান্দাতে নিচ থেকে।

ওর পায়ের শব্দ শুনেই ওর সম্বন্ধে আলোচনা বন্ধ করে দিয়েছিল ওরা।

কী বুঝলি?

অবনী বলল।

কী? আকা বলল।

আরে তোর নর্বু তামাং কী বলল?

নর্বু বলল, দেড়টার সময়ে টেবিলে খাবার লাগিয়ে আমাদের খবর দেবে।

মেনু কী?

অবনী বলল।

হেঁটে বেশ খিদে হয়েছে, না? কিন্তু যা ঘেমে গেছি। আমার কিন্তু চান করতে হবে।

তটিনী বলল।

তাছাড়া ফ্রেশ, আন-পল্যুটেড পরিবেশ। তার একটা এফেক্ট নেই। আমার কিন্তু বেশ ভালো লেগেছে এই আলিপুরদুয়ার আর দুধ-ভাত-খাওয়া।

মৃদুল বলল।

তটিনী হেসে উঠল জোরে। বলল, দুধ-ভাত-খাওয়া নয়, রাজা-ভাত-খাওয়া। ভুটানের রাজা আর কুচবিহারের রাজার মধ্যে জোর যুদ্ধ লেগেছিল। কিন্তু সেই যুদ্ধশান্তি হয়েছিল এখানেই। আর দুই রাজাই একসঙ্গে তাঁবুতে বসে ভাত খেয়েছিলেন বলেই জায়গার নাম হয়ে গেছে রাজাভাতখাওয়া। কুচবিহার তো কাছেই, ভুটানও তাই।

অবনী বলল মৃদুলকে, আপনি তো নড়লেনই না বারান্দা ছেড়ে। গেলে, দেখতে পেতেন ওয়াইল্ড লাইফ ইনফরমেশন সেন্টারের একটি দেওয়ালে চমৎকার রঙিন ছবি মানে, মানে ফ্রেসকোর আঁকিয়েছেন বিস্ত সাহেব।

বিস্ত সাহেব কে।

উনি ছিলেন বক্সা টাইগার প্রজেক্টের ফিল্ড ডিরেক্টার। এখন চলে গেছেন কনসার্ভেটর (হিলস) হয়ে দার্জিলিং-এ। ওঁর সময়েই এই ইনফরমেশান সেন্টারটি তৈরি হয়েছে। বিস্ত সাহেব এবং "ঋজুদা ফ্যান ক্লাবের" তপন সেন ইত্যাদিদেরও খুব ইচ্ছে ছিল কলকাতা থেকে "জঙ্গলের লেখক" বুদ্ধদেব গুহকে এনে ওই সেন্টারটির উদ্বোধন করানোর কিন্তু তিনি কাজে বম্বে চলে যাওয়াতে এবং উদ্বোধনের তারিখ আগেই স্থিরীকৃত হয়ে যাওয়াতে বর্ষীয়ান ও শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক, উত্তরবঙ্গেরই বাসিন্দা অমিয়ভূষণ মজুমদারকে সসম্মানে এনে তাঁকে দিয়েই ওটি উদ্বোধন করানো হয়।

অবনী বলল।

তাই?

হ্যাঁ।

তা বুদ্ধদেব গুহ জংলি লেখক না জঙ্গলের লেখক?

তা জানি না। একবার কাগজে পড়েছিলাম মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য জঙ্গলের লেখক বলে অভিহিত করেছেন ওঁকে।

জংলিও বলতে পারতেন।

ছাড়ুন তো! বুদ্ধদেব গুহ এমন কেউ নন যে তাঁকে নিয়ে সকালটা নষ্ট করতে হবে।

আপনি কি কোনো লেখা পড়েছেন ওঁর?

আকা বলল।

না। সাহিত্যিক বিচারে বই যে পড়তেই হবে তার কি মানে আছে? উনি বুর্জোয়া এবং বুর্জোয়াদের লেখক এইটুকু জানলেই যথেষ্ট।

আঁতেল মৃদুল দুশো পার্সেন্ট আত্মপ্রত্যয় এবং যুক্তির সঙ্গে বলল।

আকা বলল, বিস্ত সাহেব মানুষটা ফাস কেলাস। বাড়ি দেরাদুনে কিন্তু বাংলা কন এক্কেরে বাঙালির মতো, আর বই-ও যা পড়েন। কী আর কম্যু! বিশেষ কইর‍্যা বন-জঙ্গলের বই-এর, যারে কয় "পুকা" উনি তাই।

পুকাটা কী বস্তু?

মৃদুল বলল।

অবনী হেসে উঠে বলল, পোকা।

তাতে ওরা সকলেই হেসে উঠল।

মেনুটা কী তা তো বলবি।

ছিম্পল-এরই উপর করতাছে। যেমন কয়্যা দিছি।

তা-ও। কী কী বল না?

অবনী বলল।

এই হলুদ পোলাউ, যারে কয় বাঙালি পোলাউ, একটু মিষ্টি মিষ্টি, শিলবিলাতি আলু ভাজা, নারকোল, ছুটো-ছুটো চৌকো-চৌকো কইর‍্যা কাইট্যা তা ডালের মধ্যে ফ্যালাইয়া ছোলার ডাল। বকফুল ভাজা। তেকাটা মাছের ঝাল। বোরোলি মাছের ঝোল। কচি পাঠার মাংস। পুদিনা পাতা, ধইন্যা আর কারিপাতা একসঙ্গে কইর‍্যা বাটতে কইছি, চাটনি হইব। আর তটিনী দেবীর লইগ্যা পুস্ত বাটা। সঙ্গে হাঁসের ডিম সিদ্ধ।

মৃদুল ঠাট্টা করে বলল, মাত্র এই? আর কিছুই বললেন না রাঁধতে?

নাঃ। কইলামই তো! ছিম্পল-এর উপরেই কয়্যা দিছি। রাতে জয়ন্তীতে ভাল কইর‍্যা হইব'খন। সেই বাংলার চৌকিদার অজয় ছেত্রী, নর্বুর চাইয়া বয়সেও বড় আর ইক্সপিরিয়েন্সডও বটে। ফাস কেলাস ডিনার খাওয়াইম্যু আজ।

বলেই, তটিনীর দিকে ফিরে বলল, আর আপনে দই খাইতে ভালোবাসেন, তাই আপনার লইগ্যা আনছি বাণেশ্বরের দই।

কোথায় পেলি!

অবনী বলল, অবাক হয়ে।

আরে! লোক পাঠাইয়াছিলাম যে কুচবিহারে। বাণেশ্বর। ম্যাডাম খাইতে ভালোবাসেন।

আপনাকে কে বলল?

তটিনী বলল।

কী?

যে আমি দই খেতে ভালোবাসি?

তটিনী আবার বলল।

আমি জানি। আপনেরা যখন ছার্কিট-হাউসে কাল রাতে ডিনার খাইতেছিলেন তখন তো আমিই আড়ালে থাইক্যা সব খাবার-দাবার এক এক কইর‍্যা পাঠাইতেছিলাম আপনাগো। নাইলে বাবুর্চি বাণেশ্বরের দই পাইত কোত্থনে?

মৃদুল বলল, তার আগে এগুলো কী জিনিস একবার ব্যাখ্যা করে বলুন।

কী জিনিস?

ওই যে বললেন, শিলবিলাতি আলু, তেকাটা মাছের ঝাল, আর বোরোলি মাছের ঝোল? হাঙর তিমিও খাওয়াবেন না তো?

মৃদুল কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল।

অবনী বলল, এই সবই ইখানকার স্থানীয়। তেকাটা মাছ বা বোরোলি মাছ ডিমা, নোনাই কালজানি, রায়ডাক ইত্যাদি নদীতে হয়। ছোট মাছ, কিন্তু দারুণ স্বাদ। আর শিলবিলাতি আলুও এই অঞ্চলের স্পেশ্যালিটি, হয়ও শুধু বছরের এই সময়টাতেই।

বিশেষত্ব কী?

অবনী বলল, খুব ছোট ছোট হয় আলুগুলো। আঁশফলের চেয়েও ছোট। একেবারে নিটোল গোল। খেতেও ভারী ভালো।

বাঃ।

আপনাদের এইসব অঞ্চলে কত যে অবাক-করা সব ভালো লাগার জিনিস আছে।

শুধুই ভালো লাগার! ভালোবাসার নেই?

তটিনী চুপ করে রইল।

আকা মনে মনে বলল, হায়রে! চোখে কেবল শিলবিলাতি আলু আর বাণেশ্বরের দই-ই পড়ল, চোখের সামনে এই যে মস্ত এই আকাতরু, প্রায় মহীরুহরই মতন, তাকেই চোখে পড়ল না।

তটিনী বলল, খেতে যখন দেরিই আছে অনেক, তখন আমি আরেকবার চানটা করেই ফেলি।

অবনী বলল, সে কী! সকালে তো করলেন।

সে তো কাকচান। আপনারা সব তৈরি হয়ে তাড়া লাগালেন। ঘুম থেকেও দেরি করে উঠেছিলাম। কী সুন্দর ঠান্ডা ছিল রাতে! আমার তো দুটো কম্বল লেগেছিল। কে বলবে মার্চের শেষ। কলকাতাতে তো পাখা চলছে সরস্বতী পুজোর পর থেকেই।

কিন্তু মজা দেখেছ? রোদ উঠলেই চারদিক গরম হয়ে গেল।

মৃদুল বলল।

তা ঠিক।

তটিনী বলল।

এখানে থেকে গেলে হত বাকি জীবন।

মৃদুল বলল।

আপনি!

বলে, হাসল তটিনী।

কেন? আমি নই কেন?

বাবাঃ, আপনার কলেজ স্ট্রিট কফি হাউস, শনিবারের রেস-এর মাঠ, রবিবারের দুপুরে লেক-ক্লাবের ভডকা-সেশান, আড্ডা। আপনি তো ইনটেলেকচুয়াল! আপনি কি...এসব কথারই কথা। আর...

আর কী?

আর তো আমার জানা নেই। যতটুকু জানি, তাই বললাম। আপনি থোড়াই থাকতে পারবেন এমন জায়গাতে। আর কলকাতায় প্রতি মুহূর্তের প্রতিযোগিতা। পিকলু ব্যানার্জী বা বুলু চৌধুরি যেন জনপ্রিয়তাতে, যশে, বুদ্ধিজীবীদের জগতের নানাপ্রকার ক্ষমতার ক্রিয়াবিক্রিয়াতে আপনাকে ছাড়িয়ে না যায় তাও তো' দেখতে হবে। সব সময়েই পায়ের পাতার উপরে ভর দিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকতে হবে যে। এই যে অভ্যেস আপনার। সকাল থেকে সন্ধে এই তো একমাত্র একসারসাইজ। আপনি পারবেন এই শান্ত ঘটনাবিহীন জায়গাতে থাকতে? কোন কাগজ আপনার কোন ভূমিকা সম্বন্ধে কী লিখল তা না জানলে রাতে আপনার ঘুমই হবে না। তাছাড়া, যাতে ভালো লেখা হয় সে জন্যেও তো কলকাঠি নাড়তে হবে, অঢেল মদ খাওয়াতে হবে। মদই তো আপনার তরল অস্ত্র। কত শত্রুকে নিধন করলেন আপনি আজ অবধি তা দিয়ে।

মৃদুলের চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে এল। বলল, তাই? তুমি আজকাল অনেক বুঝছ তো তটিনী! এসব কি অনিমেষের শেখানো কথা?

ভুল মৃদুলবাবু। আমি কারও তোতা নই। কারও শেখানো কথাই আমি বলি না। আমি যেখানে

পৌঁছেছি সেখানে অনেক উঁচুনিচু পথ নিজ পায়ে হেঁটে এসেই পৌঁছেছি। কেউই আমাকে সাহায্য করেনি।

মৃদুল বিদ্রুপের গলাতে বলল, তোমার তো তুমিই আছ। একশোতে একশো নম্বর তো সেখানেই। আমার তো...

অবনী কথা ঘুরিয়ে বলল, মৃদুলবাবুর কথা জানি না। তবে অনেকেই টেনশানকে, স্ট্রেসকে, গালাগালি করেন বটে কিন্তু স্ট্রেস এবং টেনশান ছাড়া কি আধুনিক কোনো মানুষ আদৌ বাঁচতে পারে? টেনশানই তো টানটান করে রাখে মানুষকে, আধুনিক মানুষের জীবনকে। একথা অবশ্যই ঠিক যে, প্রতিযোগিতা না থাকলে, সব সময়েই দৌড় না থাকলে, হেরে যাবার, সর্বক্ষণই পিছিয়ে পড়ার আতঙ্ক না থাকলে, মানুষ কি আদৌ এগোতে পারত? জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই? অমনভাবে বাঁচলে স্থিতপ্রজ্ঞ, সর্বজ্ঞ, নাদুসর্বস্ব বুদ্ধদেব হয়ে যেত।

তুমি কোন বুদ্ধদেবের কথা বলছ?

বুদ্ধদেব আর ক'জন আছেন? যিনি বোধিলাভ করেছিলেন তিনিই তো একমাত্র বুদ্ধ। আদি এবং এক নম্বর।

আজকাল বুদ্ধদেব বললে এক নম্বর বুদ্ধদেবের কথা কারোই মনে পড়ে না। দু নম্বর বুদ্ধদেবেই দেশ ছেয়ে গেছে, সরোদিয়া, চিত্র-পরিচালক, মন্ত্রী, লেখক, এমনকি পাঁঠার কারবারিও।

পাঁঠার ব্যবসাদারের নামও আছে বুদ্ধদেব?

আছে বইকি। আমাদের আলিপুরদুয়ারে বুদ্ধ মজুমদার নেই?

হ। হ। আছে জলপাইগুড়ির ফ্যামাস রাইটার সমরেশ মজুমদারের কী য্যান ডিসট্যান্ট রিলেশান হয়।

আকা বলল।

আরে আসলে হয়তো হয় না কিছুই! কোনো মানুষের একটু নাম টাম হলেই, গুড়ের ব্যবসায়ী, পাঁঠার ব্যবসায়ী সকলেই তার "আত্মীয়" এবং "গ্রেট ফেন্ড" বলে দাবি করে। অথচ জলপাইগুড়ির মানুষ সমরেশ মজুমদার হয়তো এই আত্মীয়র কথা জীবনেও শোনেননি।

যাক্ গে। আপনারা দু নম্বর বুদ্ধদেবদের নিয়ে থাকুন। আমি চানে যাই গানে যাই-এর মতন?

মানে?

ও, অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো-এর এফ.এম. চ্যানেলের প্রোগ্রাম শোনেন না বুঝি? "ভোরাই", "আলাপন", "আজ রাতে"?

না তো!

সে কী! আজকাল তো সেটাই ক্রেজ।

তাই? শুনতে হবে তো।

শুনলে, তবেই জানতেন। "গানে যাওয়া" বা "চানে যাওয়া"র যে কত্ত রকম হয়!

মানে?

সেখানে অনেকেই ন্যাকা পুরুষ ও মহিলার গলা শুনবে, যাদের জন্যে হয়তো শিগগিরি বাংলা ভাষাটিই বিনা কারণে বিকৃত হয়ে যাবে। ন্যাকা মহিলা তাও সহ্য হয়, ন্যাকা পুরুষ দেখলে আমার গা বমি-বমি করে। এঁদের মধ্যে অনেকেই প্রত্যেক শব্দের শেষ অক্ষরটিকে নিয়ে রাবারের বেলুনের মতন টানাটানি করে, টেনে লম্বা করে ফুলিয়ে যাচ্ছেতাই করে দিচ্ছেন। দীর্ঘদিন এমন চললে তাদেরই মতন শ্রোতাদেরও অনবধানে বিকৃত হয়ে যাবে।

অবনী বলল, কত দিকের কত বিকৃতি আর রোধ করবেন আপনি মৃদুলবাবু? বিকৃতিই তো এখন জীবনের সমার্থক হয়ে গেছে।

মৃদুল একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তা ঠিক।

তারপরই বলল, একটা ইন্টারেস্টিং খবর দেখেছেন অবনীবাবু?

কোথায়?

THE STATESMAN-এ।

নাঃ। আমি কোনো খবরের কাগজ পড়ি না।

কেন?

অকারণ সময় নষ্ট হয় বলে, তাই। টিভি-ও দেখি না। শুনে হয়তো অবাক হবেন আপনি, আজকালকার খবরের কাগজের ইন্ডাস্ট্রি, পুরোপুরিই বিবেক এবং কর্তব্যজ্ঞানরহিত। দেশ ও দশের প্রকৃত ভালো নিয়ে তাদের বিন্দুমাত্রই মাথাব্যথা নেই। পাটের অথবা গুড়ের অথবা নরকঙ্কালের ব্যবসা ছেড়ে তাঁরা দয়া করে খবরের কাগজ যে কেন করতে এলেন ভেবে পাই না। পয়সা ছাড়া তাঁরা আর কিছুই বোঝেন না।

আর যা বোঝেন, তা হল বাঁদরকে শিব বানানো আর শিবকে বাঁদর।

যাত্রার বিজ্ঞাপন দেখতে, পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন দেখতে যাঁরা কাগজ পড়েন তাঁরা পড়ুন। আমার বিন্দুমাত্রও দরকার নেই।

চেয়ার পেছনে সরিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তটিনী বলল, অবনীবাবু, আপনি মানুষটি কিন্তু ওরিজিনাল। দশজনের মতো নন।

মানে, প্রোটোটাইপ নন আর কী!

মৃদুল বলল।

অনেক ভাবনা-চিন্তা করেন, বাছবিচারও। খুবই ভালো।

বাছবিচার না করলে আপনাকে এবং অবশ্য মৃদুলবাবুকেও খুঁজে-পেতে আমাদেব আলিপুরদুয়ারে নিয়ে আসব কেন কলকাতা থেকে। যাত্রার কোম্পানি অথবা নটনটীর কি অভাব ছিল?

হ। এটা তুই ঠিকই কইছস।

আমি তাহলে যাই। আপনারা তো সকলেই সকালেই চান সেরে নিয়েছেন। আবারও করবেন না কেউই নিশ্চয়ই।

না। যাও তটিনী। তুমি তটিনী! কোথায় তুমি অন্যকে চান করাবে না নিজে চললে চান করতে।

উত্তর না দিয়ে তটিনী ওর ঘবে গিয়ে দুয়ার দিল ভিতর থেকে। চানঘরটি বেডরুমের সঙ্গে লাগোয়া। সকালেই চানঘরটা খুবই পছন্দ হয়েছে ওর। ঘেমেও গেছে খুবই। খুব ভালো করে চান করবে। চানঘর পছন্দ না হলে চান করতে ইচ্ছেও হয় না ওর। গান গাইতেও নয়।

৩

এই একটা জায়গা, যেখানে প্রত্যেক মানুষই, কী স্ত্রী, কী পুরুষ, স্বচ্ছন্দ, সৎ, অশুভ এবং ঢিলেঢালা। এই চানঘর। এখানে কারোই কোনো মুখোশ থাকে না। যে মুখখানি মাকে দেখানো যায়, মুখোশহীন মুখ, তা আর দেখানো যায় শুধুমাত্র চানঘরের আয়নাকেই।

একে একে জামা-কাপড় সব খুলে ফেলল তটিনী। তারপর দাঁড়াল আয়নার সামনে। তার প্রিয় শরীরের ছায়া ফেলে। ও কালো হলে কী হয়, ওর ফিগারটা যে এত সুন্দর তা শুধু নিজেকে পুরোপুরি নিরাবরণ করলেই ও বুঝতে পারে। আর বুঝতে পারে পুরুষমানুষের চোখের আয়নাতে। কিন্তু পুরুষদের চোখের আয়নাতে যে শুধুই স্তুতি থাকে না, এই মুশকিল।

নিবাবরণ কিন্তু ও নিরাভরণ নয়। দু কানে দুটি রুবির দুল। মস্ত বড় জুয়েলার গেঁদু সেন দিয়েছে ওকে। ম্যাচ করা রুবির হারও আছে। দুহাতে রুবির বালা। শুধু দুলজোড়াই নিয়ে এসেছে। অভিনয়ের সময়ে তো ইমিটেশান জুয়েলারিই পরতে হয়। সব সুদ্ধু লাখ তিনেক টাকা দাম হবে কম করে পুরো সেটটির।

গেঁদুবাবু বলেন, আহা! তোমার ফিঙের মতো কালো শরীরে এই রুবির বেদানাদানার গয়নাগুলো যে কী জেল্লাই দিয়েছে! যেন পলাশ ফুটেছে কালো গাছ আলো করে।

কিন্তু মুখে কাব্যি করলে কী হয়! মানুষটা বড়ই জংলি। কোন পুরুষ যে আসলে কোন প্রজাতির তা বোঝা যায় যখন সে নগ্ন হয়ে বিছানাতে ওঠে শুধুমাত্র তখনই। কচুবনের শুয়োরের মতন ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে গেঁদুবাবু তার শরীরে। নরম, নিভৃত, আর্দ্র শরীরী মাটি ছিটকোয় শক্ত খুরের আঘাতে আঘাতে। শুয়োরেরই মতন গেঁদু তার দাঁত দিয়ে তটিনীর নবনী-শরীর যেন চিরে চিরে দেয়।

শরীরী আদরও একটা মস্ত বড় আর্ট। পনেরো বছর বয়স থেকে অনেক পুরুষকে আদর করে আর অনেক পুরুষের আদর খেয়ে এই ভর তিরিশে পৌঁছে এসবের পুঙ্খানুপুঙ্খ জেনেছে তটিনী।

চালকলের মালিক, সেই মোটা, বেঁটে, কালো, মুখে বসন্তের দাগওয়ালা পানখাওয়া বাবুটি, যিনি তার বাবার চেয়েও বড় ছিলেন বয়সে, ধুতি আর পাঞ্জাবি পরতেন, সেই মানুষটিই কিন্তু তাকে যা কিছু শেখাবার সব শিখিয়েছিলেন। সব শরীরী ইতিবৃত্ত। মনেরই মতন, শরীরের মধ্যেও কম জটিলতা নেই। নারী-বিলাসী ছিলেন কিন্তু ভিতরে বড় নরম, বুঝদার। কী সুন্দর করে কথা কইতেন তিনি, হাতে ধরে শিখিয়েছিলেন কী করলে ওঁর নিজের ভালোলাগা বাড়বে আর কী করলে তটিনীরও। পুরুষের আর নারীর শরীরের আলোছায়ার অলিগলিতে, খানা-কন্দরে, পাহাড়চুড়োয়, উপত্যকায় যে কত অগণ্য সুইচ আছে, যেখানে আঙুল ছোঁয়ালেই এক একটি পাঁচশো পাওয়ারের বাল্‌ব দপ দপ করে জ্বলে ওঠে, কত কঠিন হিমবাহ অবলীলায় গলে যেতে থাকে নারী শরীরের অভ্যন্তরে, তা উনি না শেখালে তটিনী কি কখনও জানত? মাস্টার রেখে গান ও নাচও তো প্রথমে উনিই শেখান তাকে। উনিই নামও রাখেন 'তটিনী'। ওর আসল নাম তো ছিল মান্তুই। ডাকনাম যদিও। ভালো নাম ছিল ফুল্ললোচনী। ওই নামেরই জন্যে পোস্ট অফিসে ফাই-ফরমাস খাটা মান্তুকে দেখেই ফ্ল্যাশব্যাকে ওর পুরনো দিনে ফিরে গেছিল তটিনী। কিন্তু সে-নামে পরবর্তী জীবনে কেউই ডাকেনি ওকে। মা-মরা, মাতাল বাবার পরম অবহেলার মেয়েকে বাবা এবং অন্য সকলেও যে মান্তু বলেই ডাকত।

ওই প্রাণ খাঁ-ই মাস্তুর, থুড়ি, তটিনীর প্রকৃত শিক্ষাদাতা বাবা ছিলেন। যদিও সেই মানুষটার সঙ্গে তার শরীরী সম্পর্কও ছিল। সে তাঁর রাখস্তি ছিল কিন্তু একটি দিনও জোর করেননি তার উপরে প্রাণবাবু। না শরীরের উপরে, না মনের উপরে।

তটিনীর শোবার ঘরে ছাগলের দুধ খেয়ে এবং চরকা কেটে অথবা অক্সোনিয়ান ইংরেজিতে বক্তৃতা করে ভারত স্বাধীন করা গান্ধিজির বা জবাহারলাল নেহরুর কোনো ফটো নেই। একটি মা-কালীর আর অন্যটি প্রাণ খাঁর। গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবি আর চুনোট ধুতি পরা। পাঞ্জাবিতে হিরের বোতাম। রিমলেস চশমা। তাতে হালকা গোলাপি আভা। হাতের কবজিতে রোলেক্স ঘড়ি, সোনার। বুক ভরা কাঁচা পাকা চুল। পাকানো ছুঁচলো গোঁফ। মাথাতে ব্যাকব্রাশ-করা চুল। ব্রাইলক্রিমে চকচকে।

সেই এক বহিরঙ্গ মূর্তি। আর তার কুৎসিত নিরাবরণ মূর্তিটার কথা ভাবলে আজও গা ঘিন ঘিন করে। অধিকাংশ সময়েই চোখ দুটি বন্ধই করে রাখত তটিনী। প্রাণ খাঁ বলতেন, থাক থাক। চোখ বন্ধই থাক। শরীরের ও চোখ ছাড়াও অন্য হাজারো চোখ আছে। তোর সব চোখ আমি একে একে খুলতে শেখাব দেখিস। সব মেয়েই অক্টোপাশ।

শিখিয়েওছিলেন।

পরে পরে চোখ খুলে থাকলেও কুরূপ মানুষটাকে দেখতেই পেত না। সেই অপার অন্ধকারেই মানুষটার শরীর অগণ্য ফুল ফোটাত ওর শরীরে। কখনও কিছু হুলও ফোটাত। গান গাইত তটিনীর শরীরে।

বুঁ-উ-উ-উ-উ শব্দ করে একটা বোলতা নগ্না তটিনীকে চমকে দিয়ে উড়ে এল। মনে হল, যেন ওর বুকেই কামড়াবে।

চিৎকার করে উঠেছিল ও একটু হলেই। করলে, সিন ক্রিয়েটেড হত। বাইরের দরজাতে ধাক্কা পড়ত। ওর শান্তি বিঘ্নিত হত।

বোলতাটা পরমুহূর্তেই ঘুরে অন্য দিকে চলে গেল। ভাগ্যিস!

তটিনী নজর করে দেখল, কমোডটা যেদিকে তার পাশেরই কাঠের দেওয়ালে একটা ফুটো। জানালার পর্দার উপর দিয়ে দেখল, একটি মস্ত কাঁঠাল গাছ, অসংখ্য এঁচড় এসেছে সে গাছে আর সেই গাছেই একটি মস্ত মধুর চাক। এই গাছ থেকেই বোধহয় আকাতরুবাবু এঁচড়ের বন্দোবস্ত করবেন। চানঘরের মধ্যে ওই ফুটো দিয়ে তারা ঢোকে আর বেরোয়। সকালে লক্ষ্য করেনি যে, পেছনের দেওয়ালে লাইন দিয়ে বোলতা পিল পিল করছে।

ও সাবধানে ডানদিকের জানলাটা খুলে দিল হাঁটু গেড়ে বসে। মেয়েদের এই অসুবিধে। ছেলেদের ঊর্ধ্বাঙ্গে কোনো লজ্জাস্থান নেই। সে পুরুষ হলে দাঁড়িয়েই জানালাটা খুলতে পারত। জানলার পর্দার আড়ালে তার নিম্নাঙ্গ।

জানালাটা খুলতেই দেখল পাশ দিয়ে একটি পাহাড়ি ঝোরা বয়ে গেছে পাথরে পাথরে লাফিয়ে লাফিয়ে। আর অন্য পারে, রাজাভাতখাওয়ার ডরমেটরিটা যেদিকে, তার পিছন দিকে একটি দোতলা বাংলো। অনেকগুলি নেপালি পরিবার অথবা একটি যৌথ পরিবার সেখানে থাকে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খেলছে। তাদের চিকন চিৎকারে এই নির্জনের বিলম্বিত সকাল চমকে চমকে উঠছে। লাল-নীল-হলুদ নানা রঙের ব্লাউজ আর শাড়ি পরা নেপালি মেয়েরা কেউ চুল আঁচড়াচ্ছে। কেউ চুল আঁচড়ে দিচ্ছে কারও। কেউ-বা রঙিন উলের লাছি নিয়ে বসে সোয়েটার বা গরম ব্লাউজ বুনছে আর সকলেই নিচু স্বরে নিজেদের মধ্যে গল্প করছে।

বাংলোটার পেছনে একটা মস্ত বড় গাছ। কী গাছ, কে জানে? আকাতরু কি?

আকাতরু! গাছের নাম আকাতরু। আশ্চর্য মানুষের নাম আকাতরু। গাছটা কী গাছ আকাবাবু এখানে থাকলে হয়তো বলতে পারতেন। ভাবনাটা ভেবেই ওর শরীর শিউরে উঠল। ভয়ে কি?

না ঠিক ভয়ে নয়, এক মিশ্র অনুভূতিতে।

ওই জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে তটিনীর মন বড় উদাস হয়ে গেল। উদাস হয়ে গেল নানা মিশ্র কারণে। প্রাণবাবুর একটা কটেজ ছিল কালিম্পং-এ। গরমের সময়ে তটিনীকে নিয়ে প্রতিবছরই তিনি দিন পনেরোর জন্য যেতেন সেখানে। সেই কটেজটিতে প্রাণবাবুর শোবার ঘরের লাগোয়া যে চানঘরটি ছিল সেই চানঘরের জানলা দিয়ে এইরকম একটি জোরা আর নেপালিদের বাড়ি দেখা যেত।

প্রাণবাবু প্রতিদিন ওকে নিজে হাতে রান্না করে খাওয়াতেন। রান্না শেখাতেন। কালিম্পং-এর সেই কটেজে সময় পেতেন তো অনেকেই। কলকাতাতে তো বড়জোর ঘণ্টাখানেক থাকতে পারতেন। খাওয়াদাওয়া, গান শোনা, বই পড়া, তারপর বিকেলে তটিনীকে নিজে হাতে সাজিয়ে-গুজিয়ে নিয়ে কালিম্পং-এর হেলিপ্যাডের দিকে হাঁটতে বেরোতেন প্রত্যেক দিন।

যদি কেউ দেখে ফেলে?

ভয়ে ভয়ে, তটিনী বলত, প্রথম প্রথম।

দেখলেই বা। আমি তো কারও মেয়ে-বৌ ভাগিয়ে আনিনি। তোকে তো আমি ফুটিয়েছি কুঁড়িরই মতন। প্রাণ খাঁ বাঘ। তাকে পেছন থেকে, আড়াল থেকে অনেকেই ফেউ অনেক কিছু বলবে হয়তো কিন্তু সামনে এসে দাঁড়াবার সাহস কারোরই নেই।

কলকাতায় পুরোদস্তুর বাঙালি প্রাণবাবু কালিম্পং-এ গেলেই সাহেব হয়ে যেতেন। থ্রী-পিস স্যুট পরতেন, বাড়িতে গরম ড্রেসিং গাউন, মুখে পাইপ, দুপুরে গর্ডর্নস জিন আর রাতে হালকা সবুজ চারকোণা বোতলের ANCESTOR স্কচ হুইস্কি খেতেন। তটিনীকে ভডকা আর টোম্যাটো জুস দিয়ে "ব্লাডি মেরি" বানিয়ে দিতেন যত্ন করে নিজে হাতে। ডিনারের পরে যখন দুজনে শীতের মধ্যে লেপের তলায় যেতেন তখন স্বর্গ নামত পৃথিবীতে। মানুষটা জীবনকে কী করে ভালোবাসতে হয়, টাকা কী করে খরচা করতে হয়, তা জানতেন।

খেতে এবং খাওয়াতে খুব ভালোবাসতেন মানুষটা। খাদ্য, পানীয়, শরীর এবং মন এই চার নিয়েই ছিল তাঁর জীবন। জীবন যে ভোগ করারই জিনিস, হা-হুতাশ করে বেদনা-বিলাস নিয়ে কাটিয়ে, হামাগুড়ি দিয়ে চিতাতে গিয়ে ওঠার জন্য নয়, তা প্রাণবাবু বিশ্বাস করতেন এবং সকলকে বিশ্বাস করতে বলতেনও।

নামহীন, যশহীন ছোট্ট পরিধির মধ্যে তৃপ্ত সদা হাসিখুশি মানুষটি মারাও গেলেন অমনি হঠাৎই। যেমনটি চেয়েছিলেন। কাজ করতে করতেই।

তাঁর চালকলের বিরাট বিরাট বয়লারগুলো আর চাল সেদ্ধ করার ভ্যাটগুলোর সামনেই একদিন সকালে জলখাবার খাওয়ার পরে হার্ট ফেল করে পড়ে মারা গেলেন। তটিনী, কলের একজন কর্মচারীর মুখেই শুনেছিল।

প্রাণবাবু ওকে বলেছিলেন, দ্যাখ তটিনী, তোর আমার সম্পর্ক কিন্তু শুধুমাত্র জীবনেরই। মরণের পরে আমার আর কোনোই দাবি রইবে না তোর উপরে। আমি মরে গেলে তুই আমার কেউ নোস। তুই তখন যা খুশি করিস। পাছে তোকে কেউ অপমান করে বা বঞ্চিত করে তাই আমার জীবদ্দশাতেই তো তোকে সবকিছু করে দিয়ে গেলাম। মরে গেলে তোর জীবনে আমি শুধু একটা ফটোই হয়ে যাব। তাই এই ফটোটা তোকে দিয়ে গেলাম। তোকে নাচ-গান, অভিনয়, পড়াশোনা শিখিয়ে দিয়ে গেলাম তটিনী। সুখেই তোর দিন চলে যাবে। তোর ঘরের জোড়া খাটে শুয়ে যখন তুই অন্য পুরুষের সঙ্গে সোহাগ করবি, তাকে ভালোবাসবি, তখন আমার এই ফটোটা ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রাখিস। নইলে তোর আনন্দে হয়তো কাঁটা বিঁধবে। আমারও হয়তো খারাপ লাগবে। মরার পরে কি সে বোধ বেঁচে থাকবে? কে জানে!

গায়ে সাবান মাখতে মাখতে ভাবছিল তটিনী, কত গভীরভাবে ভাবতেন প্রাণবাবু ওর কথা, ওর ভবিষ্যতের কথা। অমন করে বোধহয় খুব কম স্বামীও ভাবেন তাঁদের স্ত্রীদের জন্যে।

তাকে প্রাণবাবু তাঁর বিবাহিত স্ত্রীর সমান মর্যাদাই দিয়েছিলেন।

তটিনীর খুবই ঔৎসুক্য ছিল প্রাণবাবুর স্ত্রী কেমন তা জানতে। একদিন প্রাণবাবু নিজেই স্বগতোক্তির মতন বলেছিলেন, জানিস তটিনী, আমার গিন্নী ভারী ভালো মানুষ। রূপও তার অঢেল। গুণের শেষ নেই। আমাকে খুব ভালোওবাসে।

তবে? আপনি আমাকে...

ওসব তুই বুঝবি না। একেকজন মেয়ে একেকরকম; ভগবান পুরুষকে অমনি অতৃপ্ত করেই গড়েছেন। ক্ষতিই বা কী? আমি তো তাকে কোনোদিক দিয়েই ঠকাইনি। সত্যিই তো ভালোবাসি। তোকেও ঠকাইনি।

তবু...

তটিনী বলেছিল।

ও তুই বুঝবি না। তোর নিজের যখন একের বেশি নাগর হবে, সেদিন হয়তো বুঝবি। হয়তো নাও বুঝতে পারিস। মেয়েরা অন্যরকম। এ সবই ভগবানের লীলাখেলা। আমাদের বোঝাবুঝির বাইরে।

তটিনীও অবশ্য কোনোদিনও অসতী হয়নি। যতদিন প্রাণবাবু তাকে রেখেছিলেন ততদিনে শত প্রলোভনেও সে নিজেকে উড়িয়ে দেয়নি অন্যদিকে।

একবার প্রাণবাবুর বড় জামাই ওর কাছে এসেছিল, এক বর্ষার দুপুরে, প্রচুর মদ গিলে, বেহেড মাতাল হয়ে। একটি চকোলেট-রঙা ব্যুইক গাড়ি চড়ে। শুনেছিল, সেটা প্রাণবাবুরই দেওয়া। নাদুসনুদুস। নানারকম বীজ-এর মস্ত বড় ব্যবসাদার জামাই।

ফ্রিজ থেকে রসগোল্লা বের করে আর লেমন স্কোয়াশ দিয়ে শরবত করে খাইয়ে তটিনী বলেছিল, শুনুন জামাইবাবু, বাড়ির উলটোদিকের রক-এ কিন্তু একজন গুণ্ডা সবসময়েই বসে থাকে। তার কোমরে রিভলবার বাঁধা। আপনার শ্বশুরমশায়ের নির্দেশে। চোখের ইশারা করলেই আপনাকে খতম করে দেবে। কখনও আর এমুখো হবেন না। আপনার শ্বশুরমশাই-এর চরিত্রর নরম দিকটা দেখেছেন আপনি, কঠিন দিক দেখেননি। আপনার ভালোর জন্যই একথা বলছি। মানুষটার মধ্যে অনেকগুলো মানুষ আছে।

কতক্ষণ যে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে এমন আবোল-তাবোল ভাবছিল তা বলার নয়।

অটোম্যাটিক গিজারে গরম জল ছিলই। অনেকক্ষণ ধরে ভালো করে চান করে তোয়ালে দিয়ে সারা শরীর মুছতে মুছতে আবার ও ওর শরীরের দিকে তাকাল।

শরীর, সব শরীরই ভারী সুন্দর। এবং ভারী নোংরাও। গাছের পাতারা এলোমেলো হাওয়াতে যখন আন্দোলিত হয়, যখন উলটে যায়, যখন তাদের পেটের দিকটা দেখা যায়, তখন পিঠের রং যাই হোক না কেন। মানুষের শরীরেও যেখানে রোদ পড়ে না, তলপেট, উরু, জঘন, বুক, মেয়েদের নাভির উপর থেকে বুকের নিচ অবধি পেটের অনাবৃত অংশটুকু ছাড়া তার 'ফিঙের' মতন কালো শরীরকেও পাতিকাকের গলারই মতন মসৃণ, ছাই-রঙা দেখায়। সে রূপ, ফর্সা যারা, তাদের চেয়েও ভালো। যারা দেখেছে তারাই জানে।

পাতাদের ভিতরদিকের রং যে অন্যরকম হয় তা কি জানে আকাতরুও?

এই লম্বা-চওড়া, পেটা, রোদ জলে তামাটে হওয়া শরীরের শিশুর মতন মনের এই যুবক তটিনীর মনে ভারী একটি শিহরন তুলেছে। খরগোশ বা ছাগলছানাকে নিয়ে খেলতে যেমন ভালো লাগে, আকাতরুর সঙ্গও যেন তার মনকে তেমনই নিষ্পাপ, স্বর্গীয় ভালোলাগায় ভরিয়ে দিয়েছে। দিচ্ছে।

শরীরও যেন মেঘলা আকাশ হয়ে গেছে। পরতের পর পরত মেঘের আড়ালে যেন গুরুগুরু ধ্বনি শুনতে পাচ্ছে। হয়তো বৃষ্টি নামবে, তবে কখন? কোথায়? কবে? তা ও জানে না। নাও নামতে পারে। কিন্তু নামতে যে পারে, এই ভাবনাটুকুর মধ্যেও ভারী শিহরন আছে একটি।

আকাতরুর দৃষ্টিতে কোনো পাপ নেই। কিন্তু মৃদুলের দৃষ্টিতে আছে। অবনীর দৃষ্টিতে পাপও নেই, পুণ্যও নেই।

মৃদুলের চোখ তো নেই, যেন এক্স-রে মেশিন। ওর সামনে গেলেই তটিনীর মনে হয় যে, ও বিবস্ত্র হয়ে গেল। অধিকাংশ পুরুষই ওইরকম। তারা মেয়েদের শরীর ছাড়া অন্য কিছুই দেখে না। মেয়েরাও যে সমান সমান মানুষ, বুদ্ধিতে, শিক্ষাতে, রুচিতে, তাদের মনও পুরুষের মনের চেয়ে কোনোদিক দিয়ে, কোনো অংশেই যে কম নয়, এই সরল সত্যটি অধিকাংশ পুরুষই বোঝে না। পুরুষেরা প্রেম বোঝে না, কাম বোঝে। এমনকি, আশ্চর্য, তারা মোহ পর্যন্ত বোঝে না।

সেই কারণেই এই সোজা, সরল, উদার, ভালো, কাঠ-বাঙাল আকাতরুকে এত ভালো লেগেছে

তটিনীর। আর আকাতরুও প্রাণে বাঁচলে হয়! তার যে কী অবস্থা তা তটিনী ভালো করেই বুঝতে পারছে এবং পারছে বলেই, তার কষ্টটাকে আরও গভীর করে তুলে নিজের আনন্দকে দীপ্যমান করছে।

এও কি একধরনের স্যাডিজম?

কে জানে! মনস্তাত্ত্বিকেরাই বলতে পারবেন।

ভাবল, তটিনী।

মৃদুলের মতন শিক্ষিত পুরুষেরা আপাদমস্তক ভণ্ড, মিথ্যাচারী, পাজি। মৃদুল বিয়ে করেছে প্রমাকে। লিটন থিয়েটারের একটি দলে অভিনয় করে প্রমা। যেমন দেখতে মিষ্টি তেমনই ভালো মেয়ে। তটিনীর মতন নয়। ভালো ঘরের। সচ্চরিত্র। মৃদুলের চেয়ে বয়সে অনেকই ছোট। প্রায় শিশুবধই করেছে বলতে গেলে। প্রমা, মৃদুলের কণ্ঠস্বর, তার বুদ্ধি, তার ইংরেজি উচ্চারণ নিয়ে দারুণ গর্বিত। আবৃত্তিও ভালো করে মৃদুল। আজকাল যেমন অনেক আবৃত্তিকারেরাই জুটি বেঁধে নানা জায়গাতে আবৃত্তি, পাঠ, শ্রুতি-নাটক, এসবে প্রায় রোজই অংশ নেন এবং কিছু উপরি রোজগারও করেন, ওরা দুজনেও তা করতে শুরু করেছে। নাটক করে মিডিয়ার নজর যেটুকু কাড়া যায়, এই সব করে কাড়া যায় তার চেয়ে অনেকই বেশি, পৌনঃপুনিক প্রচারও হয়, এইসব যদি মিডিয়ার সুনজরে থাকে।

কিন্তু প্রমা জানে না যে, মৃদুলের শিক্ষা আর সব গুণ সত্ত্বেও সে একজন বাজে স্বামী। অসৎ। নীতিহীন। সে প্রমাকে ভালোওবাসে না। এক পার্টির একজন মাঝারি শ্রেণীর নেতা প্রমার মামা হন বলেই হয়তো প্রমাকে বিয়ে করেছে ও। সেই নেতা এবারের নির্বাচনে হেরে গেলেই 'প্রমাকে' ছেড়ে দিতে পারে মৃদুল। তার নিজের কেরিয়ারের জন্যে সে সবকিছুই করতে পারে।

কাব্য-সাহিত্য-সংগীত-আবৃত্তির জগতের এইসব মানুষের চেহারার ভণ্ড বদমাশদের তটিনীর মতন ভালো কেউই চেনেনি হয়তো। এই প্রেক্ষিতে তার প্রথম "বাবু" চালকলের মালিক প্রাণবাবু আর আকাতরু তার চোখে দুই আলাদা মেরুর মানুষ হয়েও অনেকেই শ্রেয়, এইসব এঁটো-কুড়োনো, পাত-চাটা, শুধুমাত্র পচাগলা বাতিল মাংস ছিঁড়ে-খাওয়া শকুনদের চেয়ে। এদের কণ্ঠস্বর কৃত্রিম, উচ্চারণ বিকৃত, এরা চরম অসৎ।

'সৎ' শব্দটায় শুধু অর্থনৈতিক সততাই বোঝায় না। যদিও এই হা-ভাতেদের দেশে অর্থনীতিই সবচেয়ে মান্য বিষয়। শুধু অর্থনৈতিক সততাই নয়, কোনো রকমের সততাই নেই এদের। অথচ এদের সঙ্গেই তটিনীর ওঠা-বসা। এই সব আঁতেলদের চেয়ে প্রাণবাবু, গেঁদুবাবুরা অনেকই ভালো। তাঁরা ভণ্ড নন অন্তত। অনেক দিয়ে, সোজাসুজি বদলে কিছু চান। তাঁরা ব্যবসাদার। তাঁদের বাণিজ্যের রকমটা তবু বোঝা যায়। এরা সত্যিই চিজ এক একটি। অথচ পেশাদার যাত্রা করার বা নাটক করার কারণে মৃদুল-এর মতন মানুষদের সঙ্গেই তটিনীর দিনরাতের অধিকাংশ সময় কাটাতে হয়। যাত্রাতে যে আজকাল অনেকই পয়সা। এই বছরে ওর চুক্তি পাঁচ লাখের। পঁচিশ চেক-এ দেবে প্রডুসার। আর চার লাখ পঁচাত্তর ক্যাশ-এ। প্রডুসার সরকারি ঠিকাদার। যাদের বানানো রাজপথ প্রথম বর্ষাতেই ধুয়ে যায় তাদের পক্ষে চেক-এ বেশি দেওয়া মুশকিল তো। তটিনীদেরও সুবিধে। মিথ্যে বলবে না। সরকারকে ট্যাক্স দেবেই বা কেন? কী দেয় সরকার বদলে? চোখরাঙানি ছাড়া?

৪

খেতে করতে সেই তিনটেই হয়েছিল। তবে খাওয়াদাওয়ার পরে বিশ্রাম আর নেওয়া হয়নি। রাজাভাতখাওয়া থেকে জয়ন্তীর পথ অবশ্য খুব একটা বেশি নয়। কল্যাণ দাস, অ্যাডিশনাল ডি.এফ.ও.

ওয়্যারলেস টেলিফোনে খবর পাঠিয়েছিলেন যেন ওয়াচ-টাওয়ারটা ঘুরিয়ে নিয়ে যায় ওদের। কল্যাণ দাস-এর হেডকোয়ার্টার্স আলিপুরদুয়ারে। জিপ নিয়ে প্রায় রোজই তাঁকে আসতে হয় নানা জায়গাতে। সান্ত্রাবাড়ি, ভুটানঘাট, কোনোদিন সাংহাই রোডের মধ্যে দিয়ে বন দেখতে যেতে হয় কলকাতা থেকে ওপরওয়ালারা এলে অথবা ফিল্ড-ডিরেক্টর নিজে এলে। কখনও বা হাতির দলের গতিবিধির উপর নজর রাখার জন্যে তাদের দলের কোনো হাতিকে রেডিয়ো-অ্যাকটিভ কলার পরানোর জন্যে ঘুমপাড়ানি গুলি ছুঁড়ে বেহুঁশ করে তারপর সেই কলার পরানো হয়। তখন অবশ্য কলকাতা থেকে সুব্রত পালচৌধুরী আসেন। টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট। তাছাড়া, অবনী বলেছিলেন, কল্যাণ দাসের উপরওয়ালাও তো কম নয়। এখন কনসার্ভেটরের তো ছড়াছড়ি। ওয়াইল্ড লাইভ-এর কনসার্ভেটর শ্রী অতনু রাহা। সিলভিকালচারের কনসার্ভেটর সুব্রত পালিত। তাঁদের উপরে আছেন চিফ কনসার্ভেটর। তবে ওঁদের নাকি খুবই দুঃখ যে ফরেস্ট সেক্রেটারি কল্যাণ বিশ্বাস একবারও বক্সা টাইগার প্রজেক্টে আসেননি। এলে, এখানের সকলেই খুব খুশি হতেন, নিজেদের অভাব অভিযোগের কথা বলতে পারতেন।

তটিনী গাড়ির সামনে বসেছে একা ড্রাইভারের পাশে। মারুতি ভ্যান একটি, লাল রঙা। পেছনে ওরা তিনজন। আকাতরু, অবনী আর মৃদুল। মৃদুল ঘন ঘন সিগারেট খায় বলে জানলার পাশে বসেছে।

এখন ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলেছে গাড়িটা। আলোছায়ার শতরঞ্জি বিছানো আছে পথে। দুপাশে মাথা উঁচু সব প্রাচীন মহীরুহ।

অবনী বলল, কি রে আকা! ঘুমিয়ে পড়লি না কি? তোকে বললাম, অত খাস না! তুই ঘুমিয়ে পড়লে তটিনী দেবী আর মৃদুলবাবুকে এই সব গাছগাছালি চেনাবে কে? তুই মানুষ নোস, বনমানুষ। সেই জন্যেই তো তোকে সঙ্গে আনা।

তটিনী বাঁ হাতটা খোলা জানালার উপরে রেখে বসেছিল। মাথায় পনিটাইল করেছে। লো-কাট একটা হালকা বাদামি রঙা ব্লাউজ। খাড়ের কাছে সাদা লেস-এর কাজ। তাতে যেন তটিনীর গ্রীবাকে মরালীর গ্রীবার মতন দেখাচ্ছিল।

তটিনী মুখটা পেছনে ঘুরিয়ে অবনীর কথার প্রতিবাদ করে বলল, উনি ভালোমানুষ বলে আপনার ওর পেছনে অমন করে লাগাটা উচিত নয় অবনীবাবু।

অবনী বলল, বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে। বনে এসেছি বলেই তো বনমানুষকে এত ইম্পর্ট্যান্স দিচ্ছি। কিছুদিন আগে আমার চেয়েও বড় বনমানুষ এখানে এসেছিলেন। সব ঘুরে ফিরে দেখে গেলেন। বলেছেন ফিরে গিয়ে এখানকার কথা লিখবেন।

কে?

লেখকদের মধ্যে তো লেজবিশিষ্ট একজনই আছেন। বনমানুষ।

ও। বুঝেছি।

তটিনী বলল।

তাঁকে আমিও দেখেছি। 'নন্দাদেবী ফাউন্ডেশান'-এ এসেছিলেন। চেহারা দেখলে মনে হয় না কোনোদিন বনে-জঙ্গলে ঘুরেছিলেন বলে।

তটিনী বলল, বয়স হলে তারপর শহরে দিনের পর দিন থাকলে মানুষেব চেহারা তো বদলে যেতেই পারে। তা বলে তাঁর অতীতটাতো আর মুছে ফেলা যায় না। বাহ্যিক চেহারাটা কিছুরই পরিচায়ক না মানুষের। না বিদ্যা-বুদ্ধির, না অভিজ্ঞতার, না মানসিকতার।

সেটা ঠিক।

মৃদুল বলল। তোমাকে দেখলেও কি বোঝা যায় যে তুমি কাছিম!

কেন? কাছিম কেন?

দেখলে মনে হয় গন্ধরাজ ফুল। শিশুও যেন সে ফুলের পাপড়ি ছিঁড়তে পারে। কিন্তু তোমার ভিতরটা কাছিমের পিঠের মতো শক্ত।

তা হবে। আপনার চোখ তো নয়, এক্স-রে মেশিন। আপনি বলেই যা অন্যে দেখতে পায় না তা আপনি পারেন সহজেই।

এই ফ্যাকল্টিটা ডেভালাপ করতে হয়েছে অনেক যত্ন করে তটিনী। কোনোকিছুই সহজে পাওয়া যায় না। চাওয়া যতই তীব্র হোক না কেন?

যাক। সার কথাটা বুঝেছেন যে এইটাই আনন্দের। এই সরল সত্যটাই বোঝে না অধিকাংশ মানুষ।

সামনে ওটা কী?

আকা বলল, ওইটারেই ত টাওয়ার কয়।

কীসের টাওয়ার?

ওয়াচ টাওয়ার। ওরই উপরে বইস্যা ত মান্যিগণ্যিরা জানোয়ার দেখে। মানে, যারে কয় 'ওয়াচ' করে। তাই তো নাম, ওয়াচ-টাওয়ার।

তাই?

আউজ্ঞা।

সামনে ওই ন্যাড়া জায়গাটা কী? ডানদিকে? এখানে কি মান্যিগণ্যি মানুষেরা কুস্তি লড়েন? দেখতে কুস্তির আখড়ার মতন।

আকাতরু হেসে উঠল।

তটিনী লক্ষ্য করল যে আকাতরুর হাসির মধ্যেও সত্যিই একটা বন্য ব্যাপার আছে। তার হাসিতেও যেন ডিমা নোনাই জয়ন্তী রায়ডাক এই সব নদীর আর চিকরাসি আর গামারি আর লালি গাছের আর বোরোলি আর তেকাটা মাছের গন্ধ লেগে আছে। আকাতরু এই আকাতরু—বনে না জন্মালে যেন ওর জীবন বৃথা হত। কলকাতার মেকী আর ভণ্ড আর তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের প্রেক্ষিতে ও যেন সত্যিই এক প্রতিবাদ। আকাতরু সঙ্গে না থাকলে এই বক্সার বনে তটিনীর আসাই বৃথা হত।

আকাতরু বলল, এরে কয় নুনী।

নুনী! মানে?

অবনী বলল, ইংরেজিতে একেই বলে SALT LICK.

সেটা কী বস্তু?

মৃদুল বলল।

ন্যাচারাল সল্ট-লিক থাকে সব বনেরই ভিতরে। মাটিতে বা পাথরে নুন থাকে। সেই নুন চাটতে আসে তৃণভোজী সব জানোয়ার। আর তাদের পেছনে পেছনে আসে মাংসাশীরা। তবে এটি ন্যাচারাল নয়। বন-বিভাগ বস্তা বস্তা নুন ফেলে রাখেন। নইলে মান্যিগণ্যিরা জানোয়ার দেখবেন কী করে।

অবনী বলল।

আই সি।

মৃদুল বলল।

আমার কিন্তু ভালো লাগে না। এই নুনীতে যেসব জানোয়ার নুন চাটতে আসে নির্ভয়ে, এই টাওয়ার ওখানে আছে জেনেও তাদের মধ্যে বন্যতা থাকে না। আর চেয়ে আমি মানুষটা বেশি বন্য।

তা ঠিক। কাজিরাঙ্গার গন্ডার, বান্ধবগড়ের বাঘ যেমন দেখতে লাগে আর কী। এমনকি আফ্রিকার সেরেঙ্গেটি বা গেরোংগোরোর সিংহ বা চিতা। মনে হয় চিড়িয়াখানার জানোয়ার দেখছি।

মৃদুল বলল।

আপনি কি আফ্রিকাতে গেছেন না কি?

মৃদুল বলল, আজকাল পৃথিবী দেখতে বেরোয় গাধারা। সমস্ত পৃথিবীটাই তো স্যাটেলাইট আর টিভির নানা চ্যানেলের দৌলতে মানুষের বসার বা শোওয়ার ঘরের মধ্যে ঢুকে এসেছে। আমি যাব কোন দুঃখে। পাশে হুইস্কির বোতল, বরফ আর সিগারেট নিয়ে সোফাতে বসে মোড়ার উপরে পা তুলে দিয়ে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াই!

আর প্রমা? প্রমা তখন কী করে?

তটিনী বলল।

মেয়েদের যা করা উচিত। আমার জন্যে ভালোমন্দ রান্না করে।

বাঃ।

বাঃ। কেন? এতে বাঃ-এর কী আছে? আমি একজন নাট্যকার, অভিনেতা যাত্রা করলেও ওয়ান অফ দ্য লিডিং স্টেজ অ্যাকটর, আমিই রোজগারটা করি। আমি আমার কর্তব্য করলে সে তার কর্তব্য করবে না।

প্রমাও তো অভিনয় করে। ভালো গান গায়। আবৃত্তিও করে।

তটিনী বলল।

ছাড়োতো! সে সব তো আমারই কালেকশানস-এর জন্যে।

তটিনী আহত হল। মৃদুলের এই স্বার্থপর আত্মম্ভরী রূপের সঙ্গে পরিচয় ছিল না তটিনীর। হেসে ও যেন নিজেই লজ্জিত হল। ভারী কষ্ট হল প্রমার জন্যে।

মৃদুল বলল, আসলে প্রমা খুব হোমলি। স্বামীকে নিজে হাতে ভালো-মন্দ রান্না করে খাওয়াতে খুব ভালোবাসে।

সময় পায় কী করে! বেশিরভাগ দিনই তো আপনারা দুজনে একই সঙ্গে বাড়ি ফেরেন!

সময় করে নেয় প্রমা। আমার জন্যে সময় করে। সব পুরুষের ক্যারিসমা তো সমান নয়। কিছু পুরুষ থাকে তারা প্রত্যেক মেয়ের কাছেই জাস্ট ইরেজিস্টিবল্।

তটিনী মুখে কিছু বলল না। মনে মনে বলল, ভাবছ তাই! কজন মেয়েকে দেখেছ? কী যে ভাবে নিজেকে! আর

তারপরই বলল, ও মাঃ! কি লাল লাল বলের মতন? ওই মানুষেরা ওগুলো কুড়িয়ে জড়ো করছে কেন? নিয়ে যাব কটা ঘর সাজাবার জন্যে?

টাওয়ারের সামনে থেমে-থাকা গাড়ির দরজা খুলে আকাতরু নামতে নামতে বলল, ঘর তো সাজায় মানুষে এ দিয়ে। তারপর বনবিভাগও জমিয়ে রাখে বীজের জন্যে।

দেখে মনে হয়, যেন মাকাল ফল। তাই না? ছোট মাকাল ফল।

মৃদুল বলল।

মাকাল ফল দেখেছেন আপনি?

তটিনী বলল।

দেখব না!

আপনি তো গ্রামে থাকতেন না। আমি না হয় গ্রামের মেয়ে।

চিনি। চিনি। আমি সব চিনি।

সর্বজ্ঞর মতন বলল মৃদুল।

তটিনী মনে মনে বলল, মাকাল তো মাকাল চিনবেই। গায়ের রঙ একগাদা ফর্সা হলেই এদেশে

মানুষ সুন্দর বলে গণ্য হয়। এই পদ্ধতিতে মিত্তির সাহেবের পিগরিতে সুইজারল্যান্ড থেকে ইমপোর্ট করা সাদা শুয়োরগুলোও সুন্দর।

তারপর, আকাতরুকে প্রশ্ন করল, ওগুলো কোন গাছের ফল?

দুধে লালি। লইবেন তো কয়টা, না কি?

নেব।

সোৎসাহে বলল তটিনী।

দুধে লালির ফল সংগ্রহ করার পরে তটিনী বলল, যেখানে যাচ্ছি সেখানে গিয়ে একটু ধুয়ে নিতে হবে। কোথায় যেন যাচ্ছি আমরা?

জয়ন্তী। অবনী বলল।

তারপর, বলল, আকা তুই কিন্তু ফাঁকি মারছিস। ওই সব গাছগাছালি তো অন্য বেশি জমিতে হয় না, সব গাছগুলো চেনা মৃদুলবাবু আর তটিনী দেবীকে। চুপ করেই যদি বসে থাকবি তো এলি কেন?

উত্তরে আকাতরু চুপ করেই রইল। কী আর বলবে। কেন যে এল সে ওই জানে। আকাতরুর সেই গানটি মনে পড়ে গেল। ইন্দ্রনীল সেন সেদিন গেয়ে গেলেন আলিপুরদুয়ারে।

"কী সুর বাজে আমার প্রাণে
আমিই জানি, মনই জানে।
কিসের লাগি সদাই জাগি, কাহার কাছে কী ধন মাগি
তাকাই কেন পথের পানে।।
আমি জানি, মনই জানে।"

এটা কার গান কে জানে। অতুলপ্রসাদের কি? নাঃ। ওর গলাতে যদি ভগবান একটু সুর দিতেন তবে ও অবশ্যই গান শিখত। তটিনী যে কী সুন্দর গান গায়। যখন স্টেজে উঠে ও সেজেগুজে গান গায় তখন মনে হয় আকাতরুর যে, ওর গলাতে চুমু খায়! একটা গান আছে 'হলুদ গোলাপ'-এ। কার লেখা গান অতশত ও জানে না আকা, কিন্তু গানের কথা আর তটিনীর গলা মিলে যেন ওর প্রাণে রাভাদের ছোঁড়া বর্শারই মতন গেঁথে গেছে সেই গানটি।

" প্রাণ তুমি প্রেম সিন্ধু হয়ে, বিন্দুদানে কৃপণ হলে
ওগো পিপাসিত জনে, উপায় কি দেহ বলে...।

দানাদার টপ্পার দানাগুলি যেন একটি হিরের মতন ঝকমক করে।

গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। ওরা চলেছে জয়ন্তীর দিকে।

এটা কী গাছ?

এবারে মৃদুল বলল।

কোনটা?

লম্বা আকা ঘাড় হেঁট করে মুখ বাড়িয়ে দেখবার চেষ্টা করে বলল, কোন গাছটা?

ওই যে। ওই সামনের ওই মোড়ের বাঁদিকে যে গাছটি আছে, সেটি।

ও ওইটারে ইখানে আমরা কই মেড়া গাছ।

কী গাছ?

তটিনী জিজ্ঞেস করল।

কইলাম না। মেড়া গাছ।

কী নাম রে বাবাঃ। এ কোন লিঙ্গ? পুরুষ তো।

অবনী বলল, মেড়া যখন তখন নিশ্চয়ই পুরুষ। "দুর্বলে সবলা নারী সসাঃ প্রাণঘাতিকাঃ"।

মৃদুল আর তটিনী খুব জোরে হেসে উঠল।

তটিনী বলল, আপনি খুব রসিক আছেন মশাই। যাই বলুন আর তাই বলুন।

অবনী বলল, আকা আমার চেয়েও বেশি রসিক। তবে ওর জার্মান ভাষাটা বোধহয় আপনাদের বিশেষ রপ্ত হচ্ছে না। ল্যাঙ্গোয়েজ ব্যারিয়ারে আটকে যাচ্ছেন।

তটিনী বলল, এই জন্যেই আমার মনে হয় পৃথিবীর সব মানুষদেরই বোধগম্য হয় এমন একটা INSTRUMENTAL ভাষা উদ্ভাবন করা উচিত। ভাষার বাধা না থাকলে মানুষে কত সহজে সারা পৃথিবীর কাছে পৌঁছতে পারত। পণ্ডিত রবিশঙ্কর, আলি আকবর খাঁ সাহেব, আমজাদ আলি খাঁ সাহেব বা নিখিল ব্যানার্জি বা বুধাদিত্য মুখার্জী যত সহজে সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে পৌঁছেছেন তত সহজে কি আবদুল করিম খাঁ সাহেব বা ওস্তাদ বড়ে গুলাম আলি খাঁ সাহেব, সিদ্ধেশ্বরী দেবী অথবা কিশোরী আমনকার কখনও পৌঁছতে পারবেন?

অবনী বলল, পারবেন অবশ্যই তবে হৃদয়ের সঙ্গে বোধ ও অনুভূতির মাধ্যমে যতখানি পৌঁছানো যায় ততখানিই পৌঁছাবেন। তার বেশি নয়।

আকা বলল, ওই দেখেন। ওইটা হইল গিয়া সিঁদুরে গাছ। বড় গাছ তাত দেখতাই আছেন। ওই গাছের ডাল পুড়াইয়া যে কাঠকয়লা হয় তা গুঁড়া কইর‍্যা গান-পাউডার হয়। গারো রাভা মেচিয়া নেপালি ডুবকা হক্কলেই, যাদের কাছে বে-পাশী গাদা বন্দুক আছে, তারা বারুদ বানায়।

গাদা বন্দুক কী জিনিস?

তটিনী বলল।

হেইডাই ত ওরিজিনাল বন্দুক। গান পাউডারের নলের মধ্যে ঠুইস্যা দিয়া সামনে সিসা বা লোহার বল বা খুচড়া টুকরা-টাকরা ভইর‍্যা দিয়া 'BALL' আর 'SHOTS' হয়। তারপরে না সব একে একে অন্য বন্দুক রাইফেল সব আইছে। কর্ডাইট, হ্যামারলেস, চোক, ইজেক্টর, রিপিটর। আর বন্দুকই বা কত, সিংহল-ব্যারেল, ডাবল-ব্যারেল, ওভার-আন্ডার, প্যারাডক্স, লেখা জোকা আছে না কি!

আপনি এত জানলেন কী করে?

ওর বড়মামা ছিলেন খুব নামকরা শিকারি জলপাইগুড়ির। চা-বাগানের সব সাহেবরাই বন্ধু ছিলেন। চা-বাগান ছিল মামার। তারই শাগরেদি করে শিখেছে আর কী। আমাদের আকা কিন্তু গোটা চারেক চিতা মেরেছে। হরিণ, কুমির, ঘড়িয়াল, পাখি, এসবের তো গোনাগুনতি নেই।

ছিঃ। কী নিষ্ঠুর আপনি! কী করে মারেন অমন সব প্রাণী আর পাখিদের।

আকা বলল, যখন মারছি, তখনই মেলাই ছিল। আর শিকারি হিসাবেই মারছি। BUTCHER হিসাবে নয়। আমাগো ছুটোবেলায় আইনকানুন ছিল দ্যাশে। এমন পূর্ণ স্বাধীনতা তো ছিল না তখন।

বলেই, মনে মনে বলল, হায়রে সুন্দরী। বন্দুকে আওয়াজ হয় বইল্যা বন্দুকের মার বোঝন যায় আর তুমি যে আমারে এক এক চাউনি দিয়াই প্রতিক্ষণে মারতাছ তার বেলা? শালার ভগবানের কুনোই বিচার নাই।

ওইগুলো কী গাছ?

মৃদুলবাবু একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন।

ও তো আমলকী।

অবনী বলল, এ গাছ আমিও চিনি। একেবারে বন হয়ে রয়েছে যে।

আকাতরু বলল, চিতল হরিণে আমলকী খাইতে খুব ভালোবাসে। আর কোটরা বা বার্কিং ডিয়ারে খুবই ভালো বাইস্যা খায় শিমুলের ফুল।

ওই সিঁদুরে গাছের বটানিক্যাল নাম জানিস?

অবনী শুধালো আকাতরুকে।

জানি।

কী?

MALLOTUS PHILIPINENSIS. মুয়্যের সাহেব নাম দিছিল।

তিনি আবার কিনি?

তা আমিই কী ছাই জানি।

এটি কি ফিলিপাইনস-এর গাছ?

সম্ভবত তাই। নাম শুইন্যা তো তাই মনে হয়।

আপনি এত জানলেন কী করে? আকাতরুবাবু?

মৃদুল বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল।

জানবার ইচ্ছা হইল তাই। আমাগোর মধ্যে অধিকাংশরই কুনো ইনকুইজিটিভনেসই নাই? আপনে যদি ফরেস্ট ডিপার্টের সাহেবদেরও জিগান, ইটা কী গাছ মশয়? তয় উত্তর পাইবেন : গাছ। যদি জিগান, ইটা কী পাখি মশয়? তবেও উত্তর পাইবেন: পাখি। তবে এই অঞ্চলে ময়নাবাড়ি বিট-এর বিট অফিসার আছেন সুভাষ রায়। সেই ভদ্রলোক জঙ্গল এক্কেরে গুইল্যা খাইছেন। অত বটানিক্যাল নাম টাম জানেন না, ইংরাজি বা ল্যাটিন, কিন্তু দিশি নাম জানেন হক্কলের।

অবনী বলল, ময়নাবাড়ি বিট কোন ফরেস্ট রেঞ্জ-এর আন্ডারে?

নর্থ রায়ডাক রেঞ্জ। ওই রেঞ্জের রেঞ্জার সুধীর বিশ্বাসও ভালো মানুষ। নতুন আইছেন। তবে জঙ্গলের 'পুকা' হইলেন গিয়া সুভাষবাবু।

মৃদুল বলল, 'পুকা-ফুকা দিয়ে আমি কী করব। যখন জয়ন্তী থেকে ভুটানঘাটে যাব তখন আপনার ওই সুভাষবাবু বা রেঞ্জার সাহেব কি ভুটানি হুইস্কি খাওয়াতে পারবেন? "ভুটান মিস্ট" বলে একটা হুইস্কির নাম শুনেছিলাম আলিপুরদুয়ারে।'

অবনী বলল, সর্বনাশ। সে তো স্মাগল্‌ড জিনিস।

হ্যাঁ।

মৃদুল বলল।

তারপর বলল, ভুটান থেকে সস্তা এক বোতল "ভুটান মিস্ট" জোগাড় করলেই জেলে যেতে হবে হয়তো আমাকে। কিন্তু ভারতে স্মাগল্‌ড জিনিসতো কিছুই আসে না। কলকাতার খিদিরপুর, মেট্রো সিনেমার পাশের গলি, পুরো চৌরঙ্গী এলাকা, শিলিগুড়ির বাজার, নকশালবাড়ির কাছের ধুলাবাড়ি বাজার, এ সমস্ত জায়গাতেও কোনো স্মাগলড জিনিস বিক্রি হয় না। কলকাতার নিউমার্কেট, এয়ারকন্ডিশান্‌ড মার্কেট, নিউ দিল্লির পালিকা বাজার, বম্বের 'হিরা-পান্না', স্মাগল্‌ড জিনিস কি কোথাওই পাওয়া যায়? আমাদের দেশের পুলিশ আর কাস্টমস ডিপার্টমেন্ট যখন সততার গল্প ফাঁদে তখন তাদের বলতে ইচ্ছে হয় যে, আর কোনো গুণ যদি নাই থাকে তো চক্ষুলজ্জাটা তাদের অন্তত থাকা উচিত। 'বজ্র আঁটনি ফস্কা গেরো।'

আপনি বেশি সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছেন মৃদুলবাবু।

মৃদুল, দুশ্চরিত্র হলেও, ভন্ড হলেও মনে হয় মানুষটা অসৎ নয়।

সে বলল, 'সিরিয়াস' একটা ইংরেজি শব্দ। তাতে কোনো ম্যাগনেচুয়ড নেই। তাই, আমি সিরিয়াস হতে পারি কিন্তু বেশি বা কম সিরিয়াস হবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

যাকগে।

অবনী বলল।

অবনী ভাবছিল, মৃদুলবাবুর গলার স্বরটি ভারী ভালো। কলকাতার এফএম-এ প্রোগ্রাম যাঁরা কনডাক্ট করেন তাঁদের গলার স্বরের মতন। কিন্তু গলার স্বরের ভালত্ব আর বক্তব্যের ভালত্ব বোধহয় সমার্থক নয়।

তটিনী বলল, আমাকেও কলকাতাতে একজন বলেছিল, 'ভুটান মিস্ট' বলে একটা হুইস্কি ভুটান থেকে আসে। সেটা নাকি চমৎকার।

তুমি কি আজকাল হুইস্কির সমঝদার হয়েছ নাকি তটিনী?

যে পরিবেশে থাকি তাতে এতদিনে যে পাঁড় মাতাল হয়ে যাইনি তাই তো যথেষ্ট। আমি মাঝে মাঝে একটু-আধটু খাই না যে তা নয়, তবে শুধুই সাধুসঙ্গে খাই।

আমি কি সাধু নই?

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে প্রশ্ন নিজেকেই করবেন। আমি তো জজসাহেব নই, আপনার আয়নাও নই। আমার মতামতের দামই বা কী?

মৃদুল বলল, যাই হোক অবনীবাবু, তটিনী যখন খোঁজ দিলই তখন 'ভুটানি কুয়াশা' একটু জোগাড় করুন। আপনাকে দিয়ে হবে না মনে হচ্ছে। পারলে ওই আকাতরুবাবুই পারবেন। দাম আমি দিয়ে দেব।

আকাতরু চুপ করে থাকল। সে মদ খায়ও না, কেউ খাক তা পছন্দও করে না। তটিনী যে মাঝে মাঝে খায় এই কথাটা তাকে ব্যথিত করেছে।

সুভাষচন্দ্র রায়, ময়নাবাড়ি বিট-এর বিট অফিসারের কথা যখন উঠলই তখন বলি প্রমীলার কথাও।

আকাতরু বলল।

প্রমীলাটি কে? তার রক্ষিতা নাকি? নাকি অনূঢ়া কন্যা?

মৃদুল বলল।

ছিঃ। ছিঃ।

বলল অবনী।

'যাদৃশী ভাবনা যস্য'। কী করা যাবে। মৃদুলবাবুর ভাবনার জগৎটা হয়তো ছোট।

তটিনী বলল।

হয়তো তাই। রক্ষিতাদের বৃহৎ জগৎ সম্বন্ধে তোমার যতখানি জ্ঞান আমার তো ততখানি নয়।

মৃদুল বলল।

আকাতরু বলল, ভদ্রলোক সংসারী। ওখানে একা থাকেন। ফ্যামিলি অন্যত্র থাকেন। তারপর একটু উত্তেজিত হয়ে বলল, এইরকম বাজে ইয়ার্কি ভালো নয়।

যাক সে কথা। এখন বলুন, প্রমীলা কে?

প্রমীলা বনবিভাগের পোষা হাতি। ময়নাবাড়ি বিট-য়েই থাকে। নানা কাজে লাগে। মাদি হাতি।

প্রমীলা যে মরদও হয় তা তো আগে জানতাম না। তবে প্রমীলাদের মধ্যেও মরদের স্বভাব থাকে যদিও অনেকেরই।

মৃদুল বলল।

খোঁচাটা যে তটিনীরই প্রতি তা তটিনী যেমন বুঝল, অন্যরাও বুঝল।

তটিনী বলল, তা ঠিক। আবার উলটোটাও দেখা যায় অনেক সময়ে।

কী বললে?

মৃদুল বলল।

খ্যাতিতে পুরুষসিংহ, আসলে নখদন্তহীন, ম্যাদামারা।

মৃদুল চুপ করে গেল।

আকাতরু শুনছিল সব আর তার কপালের শিরা দুটি দপ্‌দপ্ করছিল। ওর বন্ধু ডাক্তার মৃগেন বলে যে, ওর ব্লাড-প্রেশার হাই হয়ে গেছে। ওষুধ খাওয়া দরকার। সবরকম উত্তেজনা বর্জন করাও উচিত। কিন্তু কী করবে। তারই সামনে কেউ তটিনীকে ঠুকবে আর তার ব্লাড-প্রেশার ঠিক থাকবে তা তো হবার কথা নয়।

এটা কী গাছ?

তটিনী বলল, আকাতরুকে।

ওইটা হলুদ। সফ্‌ট উড। কাঠের রঙও হয়। কাঁঠাল কাঠ দেখেছেন কখনও?

হ্যাঁ। গ্রামে কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি দেখেছি। আমাদের বাড়িতেও ছিল। সস্তার কাঠ।

ঠিকোই কইছেন! হলুদও তাই।

এবারে আপনি পর পর গাছগুলো চিনিয়ে দিন তো আমাকে। এই 'হলুদ গোলাপ' যাত্রা নিয়ে এসে তো অনেককিছুই ভুলতে বসলাম। কিছু শিখেও যাই এখান থেকে।

বেশ। কইতাছি। শোনেন আপনে।

মৃদুল বলল, মনেই ছিল না। আমাদের সঙ্গে ফ্লাস্কে তো কফি আছে। এই নিবিড় নিশ্ছিদ্র জঙ্গলে একটু কফি খেয়ে অ্যাডভেঞ্চার করলে হত না কি? না কি রাতের বেলা হবে।

রাতের বেলা হাতির লাথি খেতে কে আসবে এখানে? উত্তরবঙ্গের হাতিরা ডেঞ্জারাস এবং আনপ্রেডিটেবল। হ্যাবিট্যাট নষ্ট হয়ে গেছে।

অবনী বলল।

হাতির হ্যাবিট্যাট নষ্ট হয়েছে বলে প্রায়ই নানা কাগজে বন্যপ্রাণী দরদি আর পণ্ডিতদের আর্টিকেল দেখি। অথচ মানুষের হ্যাবিট্যাট যে কবেই পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে সে কথা আর কে বলে। মানুষের নিজের প্রতিই তার কোনো দরদ নেই। ভারী আশ্চর্যের কথা।

মৃদুল বলল।

তা যা বলেছেন। মানুষই এখন সবচেয়ে ইমপর্ট্যান্ট প্রাণী পণ্ডিতদের কাছে।

অবনী বলল।

আকাতরু বলল, রবিঠাকুরে ঠিকোই কইছিলেন। যারা সবকিছুই পণ্ড করে তারাই হইল গিয়া পণ্ডিত।

মানুষের মধ্যে আবার পুরুষ মানুষই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি নেগলেগটেড। কবে যে এই প্রজাতির পুংলিঙ্গ পুরোপুরি extinct হয়ে যাবে তা কে বলতে পারে। তাদের জন্যে কাঁদবার কেউই নেই। আর তাদের জন্যে কেঁদে পুরুষের দু চোখ দিয়ে ধারা বইছে অবিরত।

দ্যাখেন ম্যাডাম, ওইটা কী গাছ কন দেহি?

আমাকে ম্যাডাম বলবেন না।

ত! কী কম্যু? মানে, কী বইল্যা ডাকুম?

নাম ধরেই ডাকবেন। আমি কি আপনার পিসিমা, না শাশুড়ি?

নাম ধইর‍্যা ডাকুম?

হ্যাঁ।

আকাতরুর সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎতরঙ্গ বয়ে গেল। ভালো করেই বুঝতে পারল যে এক একবার 'তটিনী' বলবে আর তার শরীর মনের ব্যাটারি একটু একটু করে ডিসচার্জ হতে থাকবে। ডায়নামোটা

যে চারদিন আগে তটিনীর সঙ্গে প্রথমবার দর্শনেই গেছে। আকাতরুর রবিঠাকুরের সেই গানটা মনে পড়ে গেল।

"বিনা প্রয়োজনের ডাকে ডাকব তোমার নাম,
সেই ডাকে মোর শুধু শুধুই পুরবে মনস্কাম।
শিশু যেমন মাকে নামের নেশায় ডাকে,
বলতে পারে এই সুখেতেই মায়ের নাম সে বলে
তোমারি নাম বলব নানা ছলে।"

মনে মনে বলল, তটিনী! তটিনী!

অন্যমনস্ক হয়ে গেছিল আকাতরু।

কী হল আকাতরু, গাছ চেনাচ্ছেন না যে! জয়ন্তীতে পৌঁছে গেলে কি আর এত গাছ পাব? সে জায়গাটা কেমন?

দারুণ জায়গা।

অবনী বলল। কত গাছ চাই? সব গাছই পাবেন।

তারপর বলল, মনে হবে, যেন নদীর মধ্যেই রয়েছেন। চানঘরে যখন চান করবেন, যদি জানালা খুলে রাখেন, তা রাখতে কোনো বাধাও নেই, কারণ বাংলোটা অনেকই উঁচু আর দিনের বেলাতে তো বাইরে থেকে কিছু দেখা যাবে না, তাহলে মনে হবে যেন নদীতেই চান করছেন। নদীর ওপারে ভুটানের দিকে পাহাড়। আকাশ প্রায় ঢেকে দিয়েছে। বাঁদিকে দূরে বাঁক নিয়ে একটি দ্বীপের সৃষ্টি করে হারিয়ে গেছে।

আহা! আর বলবেন না। নিজের চোখে দেখব।

নদী যেখানে বাঁক নিয়ে চোখের আড়ালে চলে যায় মনে হয় না কি যে নদীর সব রহস্য সেখানেই আছে? সব ফুল, সব পাখি, তার গায়ের গন্ধ...

তটিনী বলল।

আকাতরু বলল, আপনের কথাগুলানও য্যান যাত্রার ডায়ালগেরই মতন মিষ্টি। কী কইর‍্যা যে অমন কথা কন আপনে, আপনেই জানেন।

তটিনী হেসে উঠল।

তটিনী হাসলে আকাতরুর বুকটা ভালোলাগায় কেঁদে ওঠে। ভালোবাসা যে ঠিক এইরকম বেদনাদায়ক কোনো হাড্ডি পিলপিলানো অসুখ, যে সম্বন্ধে তার কোনো ধারণাই ছিল না। বড় কষ্ট। এ কেমন আনন্দ যার মধ্যে এমন কষ্ট থাকে?

ভাবছিল আকাতরু।

ওই গাছটার নাম আকাশপ্রদীপ।

বাঃ। কী সুন্দর গাছ। আর আরও সুন্দর নাম।

হ্যাঁ। গাছটা অস্ট্রেলিয়ান।

তাই?

হ্যাঁ।

বটানিকাল নাম কি জানেন নাকি?

বটানিকাল নাম অ্যাকাসিয়া মানগিয়াম।

তটিনী বলল, রাঁচীতে একবার নাটক নিয়ে গেছিলাম। ওঁরা বেতলাতে নিয়ে গেছিলেন, পালামৌ ন্যাশানাল পার্ক-এ। বেতলার সবচেয়ে পুরনো বনবাংলোর কম্পাউন্ডে একটি অস্ট্রেলিয়ান ফুল গাছ দেখেছিলাম। দেখিয়েছিলেন, ডি.এফ.ও. কাজমি সাহেব আর গেম-ওয়ার্ডেন সঙ্গম লাহিড়ী। ভারী

সুন্দর তবে গাছটা আকাশমণির মতন বড় নয়। মানে, আমি যখন দেখেছিলাম তখন বড় রাধাচূড়ার অথবা স্থলপদ্মর মতন ছিল। ফুলগুলো কাগজের ফুলের মতন দেখতে।

নাম কী? মনে আছে?

অবনী বলল।

দাঁড়ান। দাঁড়ান। মনে করি। নামটাও ভারী সুন্দর। ফুল হয় মার্চ-এপ্রিলে। কাগজের ফুলের মতন। সাদা ফুল! হ্যাঁ মনে পড়েছে। গ্লিনিসিডিয়া সুপার্বা।

বাবাঃ। এ কোথায় এসে পড়লাম রে বাবা। কখন যে আমার পিতৃদেবের বটানিকাল নাম জিজ্ঞেস করে বসবেন আপনারা মশাই সেই ভয়ে আছি এখন। জঙ্গলে বেড়াতে এসে এমন বিপদে পড়ব আগে জানলে আসতাম না। কোথায় একটু নির্জনে তাস খেলব, মাল খাব শান্তিতে, তা নয় এ কী বিপদ রে বাবা!

অবনী ও আকাতরু এমনকি ভাড়াগাড়ির ড্রাইভার মদন পর্যন্ত হেসে উঠল মৃদুলের কথাতে। কিন্তু তটিনী হাসল না।

সে বলল, আশ্চর্য। অথচ আমাদের মধ্যে আপনিই সবচেয়ে বেশি শিক্ষিত। ক্যালকাটা উ্যনিভার্সিটির এম.এ.।

বাংলায় এম.এ. পাসের সঙ্গে বাঁশ অথবা ঘেঁটুফুল চেনার কী সম্পর্ক?

আমরা কেউইতো এম.এ. পাস নই। আমি তো কলেজেই যাইনি। অবনীবাবু ও আকাবাবুর কথা জানি না। কিন্তু জানার ইচ্ছার সঙ্গে ডিগ্রির তো কিছুমাত্র সম্পর্ক আছে বলে বুঝতে পারি না। যদিও থাকা উচিত ছিল কথাতেই বলে 'The purpose of a University is to bring the horse near the water and to make it thirsty'. জ্ঞানের আসল স্পৃহা তো বিশ্ববিদ্যালয়ের পাকানো কাগজটি হাতে পাবার পরেই জাগবার কথা। তাই নয় কি? সব মানুষের সব ডিগ্রিই তো পাকানো কাগজ মাত্র। শিক্ষা তো মানুষ তার কথাবার্তা, তার ব্যবহারেই, তার চলায়-বলায়, তার জ্ঞান-পিপাসার মধ্যেই বয়ে বেড়ায়। প্রকৃত শিক্ষাতে আর ডিগ্রিতে কোনোদিনই কোনো মিল ছিল না।

তুমি বলতে চাইছ সাযুজ্য? শব্দটা সাযুজ্যই কি?

হ্যাঁ। আমি তো ভালো বাংলা জানি না।

তটিনী বলল।

ইংরেজি আর ফ্রেঞ্চটা বুঝি বাংলার চেয়েও ভালো জানো?

মৃদুল বলল।

তটিনী অপমানিত হয়ে বলল, আমি যাত্রাদলের অশিক্ষিতা নায়িকা—বাংলাটাই ভালো করে জানি না আর ওসব তো। তাছাড়া আমি তো মৃদুলবাবু আপনার এবং অনেক তাবড় তাবড় বুদ্ধিজীবীদের মতন হেলিকপ্টার থেকে গড়িয়াহাটের মোড়ে পড়িনি। মেদিনীপুরের গ্রাম থেকে অতি সাধারণ প্রায় লজ্জাকর অতীত থেকে এতখানি ধুলো-ময়লা মাড়িয়ে হেঁটে এসেছি অনেক কষ্ট করে।

জানি। ধুলো-ময়লা মাড়ায় অনেকেই কিন্তু মন্দিরে ঢোকার আগে যে জুতো পরে তা মাড়িয়ে এল, তা খুলে রাখে বাইরে। শোবার ঘরে বা মন্দিরে জুতো পায়ে ঢোকার দরকারই বা কী? আমি তো তোমার অতীত সম্বন্ধে কিছু জানি। একেবারেই জানি তা তো নয়।

মৃদুল বলল।

কী জানেন?

তোমার অতীতের সব কথা জানি না। কিছু অবশ্যই জানি। তোমার বর্তমানটাও কি খুব একটা গৌরবের?

তটিনী দাঁত চেপে বলল, তাই বা বলি কী করে। আপনি যখন স্টেজে আমার নায়ক, বর্তমানটাও যে গর্ব করার মতন কিছু তাই বা বলি কী করে! আমার মতন অনেকেই আছেন যাঁরা সমস্ত জীবনেই গর্বিত হবার মতন কিছু করতে পারেন না। কী করা যাবে। তাদের সবকিছুকেই মানিয়ে নিতে হয়।

আকাতরু মনে মনে খুব রেগে গেল মৃদুলের উপরে। মানুষটা একটা বাজে মানুষ। এবং শ্রদ্ধা বাড়ল তটিনীর উপরে।

তটিনী বলল, এই সমাজে যে মেয়ে একা থাকে, একা কাজ করে, যার সংসার নেই সে সবসময়েই খারাপ, সমালোচনার পাত্রী। আর পুরুষ মাত্রই দেবতা, সে একাই থাকুক কী সংসারীই হোক।

তুমি কি ধোওয়া-তুলসী পাতার কথা বলছ? তুমি...

আমি তুলসী পাতার পবিত্রতা কোথায় পাব? তুলসীই নই! তার ধোওয়া আর অধোওয়া!

অবনী প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে বলল, কী রে আকা, গাছ চেনবার কী হল?

গাছ চিনাইতে যাইয়াই ত এমন বিপত্তি। দেখতাছি যে, মানুষ চিনোনের চাইয়া গাছ চিনোন অনেকই সোজা।

মৃদুল বুঝল কথাটা আকাতরু তাকে উদ্দেশ্য করেই বলেছে। কিন্তু এই ষাঁড়ের মতন মানুষটাকে না ঘাঁটানোই মনস্থ করল। মৃদুলকে সে জঙ্গলে ছুঁড়েও ফেলে দিতে পারে। আর বাঙালের রাগ বলে কথা!

ওটা কী পাখি?

তটিনী হঠাৎ বলল, বাঁ দিকের জঙ্গলের মধ্যে ঝুঁটিওয়ালা একটা বাদামি আর সাদা পাখিকে দেখিয়ে।

অবনী বলল, ওটা হুপী।

আর ওইগুলো?

ওগুলো ছাতারে। ইংরেজি নাম BABBLER। সবসময় মানুষের মতনই কলকলিয়ে কথা বলে।

অবনী বলল।

BABBLER? না THRASHER?

আকাতরু বলল।

THRASHER বুঝি? তা হবে।

মানুষই কি সবচেয়ে বেশি কথা বলে? সব প্রাণীদের মধ্যে?

তটিনী শুধোল।

নট্ আনলাইকলি।

অবনী বলল।

৫

জয়ন্তীতে পৌঁছে তটিনী অভিভূত হয়ে গেছিল একেবারে। তবে ভয়ও যে পায়নি তাও নয়। সন্ধেবেলা গা ধোবার সময়ে হঠাৎ জানালার কাচে একটা বড় অথচ দৈর্ঘ্যে কম সরীসৃপের ছায়া দেখে ভয়ে প্রায় চিৎকার করে উঠেছিল। ঘরে ঢুকে জামাকাপড় পরে বাইরে বেরিয়েই আকাতরুকে বলেছিল, ভীষণই ভয় পেয়ে গেছিলাম। বাথরুমে, খাবার ঘর দিয়ে গিয়ে দেখুন কী একটা জিনিস বাথরুমের জানালার কাচের বাইরে সেঁটে আছে। ভয়ে হার্টফেলই করে গেছিলাম বলতে গেলে।

আকাতরু দেখে এসে হাসল, বলল, জিনিসটা কি তা আপনি চিনেন তবে এতবড় হয়তো আগে দেখেন নাই কুখনও।

কী?

তটিনী বলল।

তক্ষক।

তক্ষক? সে তো অনেকই দেখেছি পেপে গাছে, অন্যান্য গাছে। ঠিক! ঠিক! ঠিক! করে ডাকে।

ওগুলো ছোট প্রজাতির। তারপরেই বলল, একটু চুপ কইর‍্যা থাহেন। শুনতে পাইবেন আনে ওদের ডাক। নদীর ওপরে থিক্যা ডাকলে এপার থিক্যা শুনতে পাইবেন। ডাকবআনে টাকটু-উ-উ! টাকটু-উ-উ কইর‍্যা। ডাকোনের আগে আবার একটু গলা খাঁকড়াইয়া লয়। বড় বড় উচ্চাঙ্গ সংগীতের পণ্ডিতেরা বোধহয় মইর‍্যা তক্ষক হন।

ওদের ইংরেজি নাম কী?

GECKO। অন্য নাম Tucktoo। ওই টাকটু-উ-উ বলে ডাকে বলেই।

হাসল তটিনী।

আকাতরু যেন অবশ হয়ে গেছে। চান-করে-ওঠা তটিনীর গায়ের সাবান আর পারফুমের গন্ধ, বনের গন্ধ, নদীর গন্ধ, ওই চাঁদনি রাতের গন্ধ সব মিলেমিশে আকাতরুর জীবনের সব স্বপ্ন যেন সত্যি হয়ে মর্ত্যে নেমে এসেছে। আর ওপারের পাহাড় থেকে গেকো ডাকছে টাকটু-উ-উ আর এপার থেকে দোসর সাড়া দিচ্ছে টাকটু-উ। পাহাড়ের কণ্ঠার কাছে দাবানল জ্বলছে। আগুনটা সোনালি চিতার মতন একবার এদিক আরেকবার ওদিক করে নিচে নামার চেষ্টা করছে যেন। আগুনের মালা গড়ে উঠছে ধীরে ধীরে। গাঁথছে কেউ। এখনও অসম্পূর্ণ আছে। মালা গাঁথা শেষ হয়নি। তটিনী অবাক বিস্ময়ে চেয়ে আছে সেদিকে।

আকাতরুর কথা শেষ হতে না হতেই জয়ন্তীর বন বাংলোর ছাদের নিচে ফলস-শিলিং-এর মধ্যে থেকেই একটা ডেকে উঠল টাকটু-উ-উ বলে আর অন্য একটা সাড়া দিল নদীর ওপার থেকে। নদীটা বাংলোর সামনে অনেকই চওড়া—চাঁদের আলোয় শঙ্খের মতন রঙে আর ওপারের কালো রোমশ কাছিম-পেঠা আকাশ-ছোঁওয়া পাহাড়ের পটভূমিতে আরও যেন সুন্দর দেখাচ্ছে। বাংলোর সামনে ঠিক নদীর উপরেই একটা বসার জায়গা। বাঁধানো। হাতার মধ্যে কয়েকটি শাল গাছ।

শাল ইখানের স্বাভাবিক গাছ নয়। বনবিভাগই লাগাইছেন।

আকাতরু বলল।

ওরা দুজনেই ছিল একা। মৃদুল অবনীকে নিয়ে গাড়ি নিয়ে রেঞ্জার বিমান বিশ্বাসের বাড়িতে গেছে আলাপ করতে। আসলে বোধহয় ভুটানি হুইস্কি কী করে পাওয়া যায় তারই তত্ত্বতালাস করতে।

আকাতরু বলল, বিশ্বাস সাহেবের মিসেস খুবই সুন্দরী।

তাই? আপনার সঙ্গে আলাপ আছে?

আমি একটা ফালতু লোক। আমার সঙ্গে আলাপ কারই বা আছে। আপনেই দয়া কইর‍্যা আমারে এত ইজ্জৎ দিয়া কথা কন। নইলে আমার কী আছে? না বিদ্যা, না বুদ্ধি, না টাকা, না রূপ। আমি ত একটা মাকনার চায়্যাও অধম।

মাকনা কী?

ওঃ তাও জানেন না? মাকনা হইল গিয়া পুরুষ হাতি কিন্তু যার দাঁতি নাই। তার আর দাম কী?

তবে দাম কোন হাতির?

দাঁতালের আর গণেশের। গণেশের আবার পূজাও করে অনেকে।

গণেশটা কী বস্তু?

ওঃ। যে পুরুষ হাতির এক দাঁত তারে কয় গণেশ।

তাই?

হঃ।

আপনি কত্ত জানেন। সত্যি!

হঃ। আপনার পায়ের নখেরও যগ্যি যদি হইতে পারতাম।

কী যে বলেন। আপনি মানুষটা খুব ভালো। আপনাকে আমার খুব ভালো লেগেছে আকাবাবু।

আকাতরুর হৃৎপিণ্ডটা বন্ধ হয়ে গেল যেন। ওর বুকের মধ্যে আকাশ বাতাস নদী পাহাড় চাঁদনি রাত সব যেন একসঙ্গে গান গেয়ে উঠল। জন্মের পর থেকে সে এত খুশি কোনোদিন হয়নি। ওর ইচ্ছে করল তটিনীর পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে ওর পায়ের পাতাতে চুমু খায় নিচু হয়ে।

কিন্তু কিছুই করতে পারল না।

শুধু মুখে বলল, আপনে কী যে কন। আপনারে আমার হৃদয়টা একখান লাল বারোমাইস্যা জবার মতন নিজে হাতে ছিঁইড়্যা দিতে পারি। কিন্তু আপনের তাতে কী প্রয়োজন।

তটিনী চুপ করে আকাতরুর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

পুরুষ মানুষ সে অনেকই দেখেছে। অনেক পুরুষের সঙ্গে সে শুয়েছে। পুরুষ জাতটা সম্বন্ধে একমাত্র প্রাণধন খাঁ ছাড়া তার মনে শ্রদ্ধার কোনো আসন নেই। কিন্তু আকাতরুর মতন নিষ্পাপ, শিশুর মতন সরল, পবিত্র পুরুষ সে আগে দেখেনি কখনও। বড়ই আবিষ্ট হয়ে গেছে তটিনী। ওর মনে হচ্ছে নিজেই নষ্ট করে দেওয়া ওর কোনো ভ্রূণ যেন জীবন্ত হয়ে ওর প্রেমিক হয়ে আকাতরুর মাধ্যমে ওর কাছে এসেছে। ভ্রূণও প্রাণ। ভ্রূণহত্যাও পাপ। মেরি স্টোপস ক্লিনিকের অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান লেডি ডাক্তার তাকে বলেছিল। কে জানে! হয়তো তাই!

আকাতরু বলল, আমি ম্যামসাহেবেবে দেখিও নাই কুনোদিন। তবে শুনছি যে, সুন্দরী। সুন্দরী বইল্যাই ত কারোরেই দেখান না ওয়াইফরে বিশ্বাস সাহেব। না দেখানোই ভালো।

কেন?

তটিনী বলল।

মৃদুলবাবুর মতন মানুষদের ত এক্কেরেই বাইরে বাইরেই রাখন উচিত। অবনী যে কোন আক্কেলে তারে লইয়া গেল সিখানে কে জানে! মৃদুলবাবু হাইলি এডুকিটেড হইতে পারেন, পার্টিও দারুণ করেন কিন্তু মানুষডা ইক্কেরে থার্ড ক্লাস। আপনের সাথে এমন কইর‍্যা কথা কইতাছিল না, আমার মনে হইতাছিল দিই গলাডা টিইপ্যা ইক্কেরে শেষ কইর‍্যা।

তটিনী আতঙ্কিত গলায় বলল, না, না। অমন করতে যাবেন না। ওঁরা মানীগুণী লোক। এস.ডি.ও., এস.ডি.পি.ও এস.পি., ডি.এম সকলেই ওঁদের একনামে চেনে। আপনিই সারাজীবন জেল খেটে মরবেন। আপনার কি ধারণা যে হাজার হাজার মানুষ আমাদের দেশের শয়ে শয়ে জেলে পচে মরছে, ঘানি ঘুরোচ্ছে, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে গেছে তারা সকলেই দোষী। বদমাইশ, চোর, ডাকাত, খুনে, রেপিস্টদের মধ্যে অধিকাংশই বাইরে আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের দপ্তর পড়েননি আপনি? "আইন সে তো তামাশামাত্র। বড়লোকেরাই পয়সা খরচ করিয়া সে তামাশা দেখিতে পারে।" ডেপুটি বঙ্কিম এ কথা বলেছিলেন পরাধীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে। আজ বঙ্কিম এই পূর্ণ-স্বাধীন ভারতবর্ষে বেঁচে থাকলে কী বলতেন তা কে জানে। জানেন আকাতরু। বড় লজ্জা হয় ভাবলে। না, না আপনি ওরকম কিছু করার কথা ভাববেন না। কখনও না।

তটিনী ভাবছিল, এ জীবনে অনেকই ছদ্ম-ভালোবাসা পেয়েছে অসংখ্য পুরুষের। কিন্তু আকাতরুর

মতন কোনো একশো ভাগ সৎ, একশো ভাগ পবিত্র, একশো ভাগ নারীসঙ্গর অভিজ্ঞতাহীন পুরুষ তাকে এমন শুদ্ধ, সুন্দর ভালোবাসা বাসেনি। তার উপরে জয়ন্তীর এই পরিবেশ। মাথার উপরে একজোড়া কাঠগোলাপের গাছ। বিস্তৃত চওড়া নদীরেখা। চাঁদের আলোতে মোহময়, রহস্যাবৃত। দূরের বাঁকে হারিয়ে গেছে নদী, বিপরীতের কাছিম-পেঠা আকাশ-ছোঁওয়া পাহাড়। তার কণ্ঠার কাছে দাবানলের আলোর মালা। লাল। রাতের বাঘের চোখের মতন লাল। ও ভাবল যে এমন পরিবেশে, এমন শুদ্ধ পবিত্র একজন মানুষের অস্ফুট প্রার্থনা, অশুচি, বহুভোগ্যা তটিনী মঞ্জুর করে নিজেই ধন্য হবে।

পরক্ষণেই হাসি পেল তটিনীর।

ভাবল, এই মহীরুহর মতন পুরুষটা এতটাই ছেলেমানুষ যে, সে যদি তাকে এই মুহূর্তে বলে যে তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নেই, তবে এই নিষ্পাপ অনভিজ্ঞ শিশুটি হয়তো তার পায়ের একপাটি চটি, তটিনীর সাদা-রঙা স্পিৎজ কুকুর জিম-এরই মতন, তুলে নিয়ে দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে। তার চাহিদা যে কী, একজন পূর্ণযুবতী নারী তাকে যে কী দিতে পারি, সে সম্বন্ধেও তার হয়তো কোনোই স্পষ্ট ধারণা নেই। এই দেবশিশুর ভালোবাসা যে কোথায় রাখবে, কী করে তার দাম দেবে, ভেবেই পেল না তটিনী।

পরমুহূর্তেই ভাবল, একমাত্র আকাতরুর মতন অকলুষিত, নিষ্পাপ, গ্রাম্য প্রবল পুরুষ আর তার জার্মান স্পিৎজ জিম-এর মতন মদ্দা কুকুরই একজন নারীকে প্রকৃত নিঃস্বার্থ ভালোবাসা দিতে পারে। নইলে, তটিনীর দেখা পুরুষ প্রজাতির অধিকাংশই শুয়োর। শুয়োর যে, তা তো সমারসেট মম বহুদিন আগেই তাঁর "RAIN" গল্পেই বলে গেছেন। "All men are pigs".

আকাতরু বলল, আমি আজ আত্মহত্যা করুম।

আত্মহত্যা?

চমকে উঠে আতঙ্কিত গলাতে বলল তটিনী।

তারপর বলল, কেন?

সে আপনে বোঝবেন না।

আমার কোনো অপরাধ হয়েছে কি?

হ্যাঁ। হইছেই ত!

কী?

আপনে আমারে মানুষের মর্যাদা দিছেন।

এটা কি অপরাধ?

হ! হ! হ! আপনের আগে আমারে সবাই Exploit-ই করছে। আমারে কেউই মানুষ বইল্যা ভাবে নাই।

কেন? আপনার বন্ধু অবনী? তিনি তো আপনাকে ভালোবাসেন খুব।

আমি মাইয়াদের কথা কইতাছি।

ও। তটিনী বলল।

তারপর স্তম্ভিত, দুঃখিত হয়ে তটিনী বলল, আপনি আমার পাশে এসে বসুন তো একটু।

আকাতরু পাশে না বসে তটিনীর পায়ের কাছে বসল।

তটিনী আকাতরুর মাথার কেয়াবনের মতন ঠাসবুনোন এবং ফিঙের মতন কালো চুলগুলো নিজের ডান হাতে নেড়ে চেড়ে এলোমেলো করে দিয়ে ওর মাথার তালুতে একটা চুমু খেল। যে ঠোঁট দিয়ে সে অনেক অসৎ, দুষ্ট, অপবিত্র পুরুষের সর্বাঙ্গে চুমু খেয়েছে, সেই ঠোঁট দিয়ে।

তটিনীর মনে হল আকাতরুর মাথাটাকেই অপবিত্র করে দিল যেন সে।

আকাতরু আনন্দে শিউরে উঠল। আর তটিনী লজ্জায়।

এমন সময়ে জয়ন্তীর বন-বাংলোর হাতাতে একটা অ্যাম্বাসাডর গাড়ি এসে ঢুকল। একজন নেমে গেটটা খুলল। গাড়িটা হেডলাইট জ্বেলে গেটের ওপাশে দাঁড়িয়ে রইল। আলোর বন্যাতে জঙ্গল পাহাড় আর নদীর অনুষঙ্গের জ্যোৎস্না রাতের মোহময়তা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। তার উপরে গাড়ির এঞ্জিনের আওয়াজ। গাড়িটার সাইলেন্সার পাইপটা ফুটো হয়ে গেছে। তাতে এঞ্জিনের আওয়াজের সঙ্গে গাঁক গাঁক আওয়াজ যোগ হয়েছে। হেডলাইট জ্বালা থাকায় ওদের দুজনের চোখ ধেঁধে গেছিল। দেখতে পাচ্ছিল না কিছুই। গাড়িটা ভেতরে ঢুকে ওদের কাছে চলে এল। যে লোকটি গাড়ি থেকে নেমে গেট খুলেছিল সে রোগা মতো। চেহারাটা বড়লোকের মোসাহেবের মতন। গাড়ি থেকে চারজন লোক নামল। সেই প্রথম লোকটিকে নিয়ে। ড্রাইভার গাড়িতেই বসে রইল।

কে যেন বলল, এই তো পাখি এখানে।

আকাতরু চিনতে পারল একজনকে। চানু রায়। আলিপুরদুয়ারের কুখ্যাত বড়লোক। নামী মাতাল। নানারকম ব্যবসা তার। লোকে বলে জঙ্গলের চোরাই কাঠেরও ব্যবসা আছে। শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ির কাঠ-চেরাই কল-এ সরাসরি ট্রাক-ট্রাক কাঠ চালান যায়। বনবিভাগের কোনো কোনো আমলার সঙ্গেও তার আঁতাত আছে বলে মনে হয়, নইলে অত কাঠ বের করে কী করে! মানুষটাকে দু চোখে দেখতে পারে না আকাতরু। তবে বড়লোক এবং ক্ষমতাবান বলে এড়িয়ে চলে।

চানু রায় এগিয়ে এসে বলল, অবনী নেই?

আকাতরু বলল, না। রেঞ্জার সাহেবের কাছে বাংলোয় গেছেন গিয়া।

তাই?

তারপরই বলল, নমস্কার তটিনী দেবী। আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল।

আমার সঙ্গে?

তটিনী উঠে দাঁড়িয়ে বলল।

তারপর বলল, আপনাকে তো আমি চিনি না।

কে আর কাকে চেনে বলুন? চিনতে আর কতক্ষণ লাগে? যদি চেনার ইচ্ছা থাকে। চা-বাগানে আজ আমরা একটু আমোদ-আহ্লাদের ব্যবস্থা করেছি। আপনাকে তাই নিতে এলাম। যদি গান করেন একটু। রাতে গেস্ট-হাউসেই থাকার বন্দোবস্তও করা হয়েছে। আপনার কোনো অসুবিধে হবে না। আর সম্মানী দেব আমরা দশ হাজার। কাল সকাল আটটার মধ্যে এখানে ফেরত দিয়ে যাব আবার।

দশ হাজার?

টাকার অঙ্কটা শুনে আকার মাথা ঘুরে গেল।

তটিনী বলল, আপনার বোধহয় মাথা খারাপ হয়েছে। চিনি না শুনি না আপনি কীভাবে এমন প্রস্তাব করেন? তা ছাড়া আমি এদিকে বেড়াতে এসেছি। মৃদুলবাবুও এসেছেন।

কে মৃদুলবাবু?

হলুদ গোলাপ-এর নায়ক, মৃদুল দাস।

অ। তাতে কী? ওঁর তো আপত্তি নেই কোনো।

উনিও যাবেন? মানে যাবেন বলে বলেছেন আপনাকে?

না, না উনি গিয়ে কী করবেন। ওঁর সঙ্গে আমার আলিপুরদুয়ারেই কথা হয়েছে। বলেছিলেন দশ হাজার অফার করলেই আপনি রাজি হয়ে যাবেন।

তটিনী প্রচণ্ড রেগে গেল।

বলল, আমি তো মৃদুলবাবুর স্ত্রীও নই, বোনও নই। আমার উপরে তাঁর কোন অধিকার যে উনি আমার সম্বন্ধে বে-এক্তিয়ারে এমন কথা বলেন?

তা তো আমি জানি না তটিনী দেবী।

অবনীবাবুও কি আপনাকে কিছু বলেছিলেন এ ব্যাপারে?

তটিনী বলল।

না। অবনী তো লোকাল ছেলে। সে কী করে আপনার সম্পর্কে আমার সঙ্গে কথা বলবে।

তারপর আকাতরুর দিকে ফিরে, চানু রায় বলল, আপনিও তো লোকাল। কলেজ পাড়াতে বাড়ি নয় আপনার?

হ।

আকা বলল।

আপনি এখানে কী করছেন?

আমি ওঁর বডিগার্ড।

চানু রায় হো হো করে হেসে উঠল।

বলল, বডিগার্ড! ব্ল্যাক-ক্যাট কমান্ডো। বাবাঃ। তটিনী দেবী যে সঙ্গে বডিগার্ড নিয়ে ঘোরেন তা তো জানা ছিল না। সঙ্গে কি সেল্ফ-লোডিং রাইফেল টাইফেল আছে না কি? এ. কে. ফর্টি সেভেন? চাইনিজ?

আকা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কোমরে হাত রেখে বলল, না। সে সব তো থাকে স্মাগলারদেরই। যারা কাঠ বা সোনার বিস্কিট-এর স্মাগলিং করে নানা ব্যবসার ছুতার আড়ালে। আমার হাত দুইখানই যথেষ্ট।

চানু রায় খোঁচাটা নীরবে হজম করল।

তারপর বলল, বাবাঃ আপনি অনেকই খবর রাখেন দেখছি।

আপনার সম্বন্ধে রাখি না তবে স্মাগলারদের মোডাস-অপারেন্ডির খবর কিছু কিছু রাখি। ডি.আই.জি. সাহেবের লগেও আলাপ আছে। একসঙ্গে ফুটবল খ্যালতাম আমরা।

চানু রায়ের মুখটা কালো হয়ে গেল। বলল, চক্রবর্তী সাহেব?

হ।

খুব অনেস্ট অফিসার।

হ। একশৃঙ্গ গন্ডার আর অনেস্ট পুলিশ অফিসার ত কেরমেই একেবারে দুষ্পাপ্য হইয়া উঠতাছে।

তাহলে আপনি যাবেন না আমাদের সঙ্গে তটিনী দেবী? আমি ফালতু লোক নই। আমার নাম চানু রায়। বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খায় এখানে আমার নামে। আপনার বডিগার্ডকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন। অবনী এবং এই ভদ্রলোকও মানে, আপনার বডিগার্ডও আমাকে চেনেন। আপনার নামটা যেন কী?

আকাতরু রায়।

তাই বলুন। তা নইলে দুধে লালির সঙ্গে এত ভাব।

মুখ সামলাইয়া কথা কইয়েন য্যান চানু বাবু। আপনের নামে বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল ক্যান খায় তা আমি জানি। কিন্তু ইখানে গোরুর কারবার নাই। খালিই বাঘ।

তাই?

হ। তাই।

তাহলে আপনি যাবেনই না তটিনী দেবী?

কী করে বলেন আপনি যাওয়ার কথা ভেবে পাই না আমি।

এমন সময়ে ওদের মারুতি ভ্যানটা ফিরে এল। মৃদুল আর অবনী নামল।

এই যে অবনী!

অবনী চানু রায়কে দেখে অবাক হয়ে গেল।

বলল, আপনি চানুবাবু? এখানে।

অবাক হলেন নাকি? যেখানে মধু সেখানেই মৌমাছি। আমি যে কখন কোথায় থাকি, বিশেষ করে উইক-এন্ডে তা কি আমি নিজেই জানি?

মৃদুল তাড়াতাড়ি পকেট থেকে সিগারেট-এর প্যাকেট বের করে সিগারেট ধরাল। দেখে মনে হল সে যেন বেশ নার্ভাস।

চানু রায় বলল, এই যে হিরো। কেসটা কী হল? আমি এদিকে বাগানে সব বন্দোবস্ত করে ফেলেছি। ইয়ার দোস্তরা সব বসে আছে। আর একি শুনি মন্থরার মুখে? পিপিং থেকে আমার এক শাগরেদ আপনার জন্যে ভুটান মিস্ট হুইস্কিও জোগাড় করেছে।

পিপিং? সে তো চায়নাতে।

মৃদুল, বলার মতন কিছু খুঁজে পেয়ে, স্বস্তি পেয়ে যেন বলল।

দূর মশাই। পিপিং কি চায়নার কেনা নাকি। ভুটানেও পিপিং আছে। ভুটানঘাট থেকে এগিয়ে গেলেই পিপিং। ভুটানের গিরিখাদ থেকে বেরিয়ে ওয়াঙ্চু নদী যেখানে এসে রায়ডাক হয়ে সমতলে ছড়িয়ে গেছে।

তাই?

মৃদুল বলল।

সে কথার উত্তর না দিয়ে চানু রায় বলল, এখন কী হবে মৃদুলবাবু?

কীসের কী?

আপনার হিরোইন যদি আমাদের সঙ্গে না যায় তবে তো আপনাকেই আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। ফাসখাওয়া অথবা জয়ন্তী নদীর শুকনো বুকের উপরে কাল সকালে যদি আপনার উলঙ্গ ডেডবডি পাওয়া যায় তবে আমাকে দোষ দেবেন কি?

মৃদুল বলল, কী হল কী? আপনি এসব কী বলছেন?

কী বলছি তা বুঝতে পারছেন না?

অবনী তাড়াতাড়ি মাঝে পড়ে বলল, চানুদা আপনি একটু ওদিকে চলুন তো! ব্যাপারটা কী বুঝি।

ব্যাপার বোঝার জন্য ওদিকে যাবার দরকার কি অবনী? তোমাদের হিরো আমার কাছ থেকে পরশু শোয়ের শেষে পাঁচশো টাকার নতুন নোট নিয়েছেন দশখানি। দালালি। তোমাদের হিরোইনকে এক রাতের জন্যে ঠিক করে দেবেন বলে। রেট নাকি দশ। বলেই পাঞ্জাবির ডান পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা খাম বের করল। বলল, এতে কুড়িখানি বড় পাত্তি আছে। একেবারে টাকশালের গন্ধমাখা। এমন নেশাধরানো গন্ধ কোনো মেয়েছেলের শরীরেও নেই।

সাবধান। আপনেরে আমি সাবধান কইর‍্যা দিতাছি।

বলেই আকা চানু রায়ের দিকে এগিয়ে গেল।

সেই মোসাহেব গাড়ির দিকে ফিরে গিয়ে হাতে করে কী একটা নিয়ে ফিরে এল। তটিনীর মনে হল রিভলভার টিভলবার হবে হয়তো।

তটিনী আকার হাত ধরল পেছন থেকে এসে।

চানু রায় বলল, এই পালাটার নাম কী অবনী?

কোন পালা?

এই এখন আকাতরু রায় আর তটিনী দেবী যে পালাটি চালু করলেন।

মোসাহেব প্যাকেটটা মৃদুলের হাতে দিয়ে বলল, ভুটান মিস্ট-এর বোতলটা। যেমন কথা ছিল।

চানু রায় বলল, কথা আর কিছু নেই। ফেরত নিয়ে যা গদাই বোতলটা। শালা বেইমানকে আর হুইস্কি খাওয়াতে হবে না।

গোলমাল শুনে ভিতর থেকে বাংলোর চৌকিদার অজয় ছেত্রী বাবুর্চিখানা থেকে দৌড়ে এল ফিনফিনে জাল লাগানো স্প্রিং-এর দরজা ঠেলে। বলল, কী হইছে স্যার? রেঞ্জার সাহেবরে কি খবর দিমু?

বলেই বলল, নমস্কার চানুবাবু।

চানুবাবু একটি লাল পঞ্চাশ টাকার নোট বের করে অজয়কে দিয়ে বললেন ভালো খবর তো সব অজয়।

হ্যাঁ স্যার।

নোটটা নিয়ে সেলাম করে অবস্থাটা যে মনোরম নয় তা আন্দাজ করেই অজয় ভিতরে চলে গেল। যাওয়ার আগে একবার দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, আপনেরা কেউ কি জল খাইবেন স্যার?

না অজয়। জল খাব না। তবে এক গ্লাস আমাকে দিতে পারো। মাথায় দেব। মাথা গরম হয়ে গেছে।

এরপরই চানু রায় সেই গদাই নামক মোসাহেবকে বলল, গদাই, মালটা ফেরত নিয়ে নে হিরোর কাছ থেকে। হিরো। কালচার্ড মানুষ। কথায় কথায় ইংরেজি ফোটায়। কবিতার আবৃত্তিকার। রোজ খবরের কাগজে নাম বেরোয়, প্রশংসা বেরোয় এই সব মানুষদের। ছবি বেরোয়। ছিঃ। কাগজ রাখাই বন্ধ করে দেব। শুধু যাত্রার বিজ্ঞাপন আর এই সব হিরোদের হিরোসিমা।

ওই প্রচণ্ড অস্বস্তিকর অবস্থাতেও হাসি পেল অবনীর চানু রায়ের সেন্স অফ হিউমার লক্ষ্য করে।

গদাই বলল, মৃদুলকে, টাকাটা ছাড়ুন হিরো। যাত্রা করে ত অনেকই টাকা পান তার উপরেও মেয়ের দালালি করে রোজগার কি না করলেই নয়? তাও যদি মাল কন্ট্রোলে থাকত।

মৃদুলের মুখ ছাই-এর মতন সাদা হয়ে গেছিল।

বলল, নিয়ে আসছি। স্যুটকেস-এ আছে।

যেতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ে একবার আকাতরুর দিকে তাকাল ও। দেখল আকাতরু সত্যিই বাঘের মতন লাল চোখ করে তাকিয়ে আছে মৃদুলের দিকে। অবনী, তটিনী, এমনকি চানু রায়ও বুঝতে পারল যে চানু রায় অ্যান্ড কোং চলে গেলেই আকাতরু মৃদুলকে আজ মেরেই ফেলবে।

মৃদুল বলল, চানুবাবু, আপনারা যেখানে যাচ্ছেন আজ রাতটা আমাকেও সেখানে নিয়ে যাবেন? তারপর আপনাদের সঙ্গেই ফিরে যাব আলিপুরদুয়ারে।

তারপর?

চানু রায় বলল। তারপর কী করবেন?

কলকাতায় যাব।

অবনী বলল, এখান থেকে জলপাইগুড়ি যাবার কথা যে আপনাদের। তাঁরা তো নিতে আসবেন পরশু। আপনাদের পুরো ইউনিটও কাল রাতেই বাস ভর্তি করে ফিরে আসবেন কুচবিহার থেকে যে।

আমি যাব না জলপাইগুড়ি।

মেরে তক্তা করে দেবে। হাবু ঘোষকে তো চেনেন না।

সে ভেবে দেখব। আজকে নিয়ে যাবেন আমাকে?

ভিখিরির মতন ভিক্ষা চাইল মৃদুল চানু রায়ের কাছে।

চানু রায় বলল, চলুন। হিরো বলে ব্যাপার। গেলেই দেখবেন চানু রায় এক তটিনীর ভরসাতে বাঁচে না। ডিমা, নোনাই, কালজানি, জয়ন্তী, রায়ডাক নদীর দেশে অভাব নেই কোনো। কলকাতার হিরোইন না হলেও চলে যাবে। আমাদের মোদেশিয়া, নেপালি, ডুবকা, টোটো, রাভা, মেচিয়া, বাঙালিদের মধ্যে কি সুন্দরী নেই না কি? তারা নাচ গান জানে না?

থার্ড ক্লাস যত্ত।

বলেই, দু হাত জড়ো করে তটিনীর কাছে ক্ষমা চাইল চানু রায়। বলল, তটিনী দেবী, বুঝতেই পারছেন, দোষটা আমার নয়। আমি যে খারাপ তা সকলেই যেমন জানে, তেমন আমি নিজেও জানি। সপ্তাহে ছ দিন হাজার ঝামেলাতে কাটে। বউ, পূজা-আচ্চা আর তার হা-ভাতে বাপের বাড়ির কল্যাণেই লেগে থাকে।

আর সে গুষ্ঠি তো নয়, রাবণের গুষ্ঠি। আমার নিজের প্রয়োজনে আমি বরবাদ হইনি। হয়েছি ওই হারামজাদা গুষ্ঠির জন্যে। আমার উপরে বিয়ের পরদিন থেকে তারা বডি ফেলে দিয়েছে। শ্বশুরবাড়ি মানুষের কত আদর-যত্ন-সম্মানের-ভালোবাসার বাড়ি। আমার আজ ঘেন্না ছাড়া তাদের প্রতি কিছুমাত্রও নেই! এইটুকুই আমার আনন্দ ম্যাডাম।

এক একজন মানুষ একেকরকম করে খুশি হয়। তার খুশি অন্যকে দুখী না করলেই হল। আমি খারাপ হতে পারি কিন্তু আমি ভণ্ড নই আপনার হিরোর মতন। এই সব মানুষকেই সমাজ শিক্ষিত বলে মানে। দূরদর্শনে এদের মুখই দেখতে হয় আমাদের প্রতি সপ্তাহে একবার করে। এরাই নানা পুরস্কার পায়, পুরস্কার পাইয়ে দেয় অন্যকে। এই বঙ্গভূমের এই কালচার্ড খচ্চরদের মতন এমন হাড় হারামজাদা খচ্চর আর বোধহয় হয় না।

এমন সময় মৃদুল বেরিয়ে এল হাতে ব্যাগ নিয়ে। তটিনীর মুখের দিকে তাকাল না। তাকাতে পারল না। আকাতরুর মুখের দিকেও নয়। অবনীর দিকে একটি চোরা চাউনি দিয়ে বলল, চললাম।

চানু রায় তটিনীকে আবারও নমস্কার করে বলল, ক্ষমা কি পেলাম?

তটিনী বলল, সত্যিই তো! দোষ তো আপনার নয়।

চানু রায় আকাতরুকে বলল, আচ্ছা ব্ল্যাক ক্যাট। চললাম। ভায়া—মেজাজটা বড় গরম। আসলে মানুষটা তুমি বড় সোজা। যে জগৎটাকে মৃদুল সেন আর চানু রায়েরা কন্ট্রোল করছে সেই জগতে সটান সোজা আকাতরু গাছ হয়ে যদি কেউ বাঁচতে চায় তবে তার মরার দিনই এগিয়ে আসবে। দেখেশুনে পথ চলো ভাই। আগে তো নিজের প্রাণটা। নেহরুদের তিন জেনারেশান দেশটার যে অবস্থা করে রেখে গেছে এখানে মানুষের মতন বাঁচার চেষ্টা করার মতন মূর্খামি আর নেই। হয় কুকুর-বিড়ালের মতন বাঁচো নয় সাপের মতন বাঁচো। Like snakes in the grass। এই বক্সাতে বিস্ট সাহেব বাঘ বাঁচাবার, বাঘ বাড়াবার চেষ্টা করলে হবে কী, বাঘ-ফাঘ-এর দিন শেষ হয়ে গেছে এই দেশে। খল, ধূর্ত শেয়াল হও, সুখে থাকবে। বেঁচে থাকবে।

গাড়ির দরজা খুলে উঠতে উঠতে বলল, আকাতরুভাই তোমাকে এই আমার ফ্রেন্ডলি অ্যাডভাইস। আমাদের বাড়িও আগে আলিপুরদুয়ারের কলেজ পাড়াতেই ছিল। তুমি আমার পুরনো পাড়ার লোক বলেই এত কথা বললাম। চলি। গুড নাইট।

৬

গাড়িটা হেডলাইট জ্বেলে চলে যেতেই আবার চাঁদের আলো স্পষ্ট হল। নদীর সাদা বালি আর পাথরের বুকের উপরে কী একটা পাখি ভুতুড়ে ডাক ডেকে ফিরছে চমকে চমকে। সেই ডাক তটিনীর বুকের ভিতরটা পর্যন্ত চমকে দিচ্ছে। পাখিটা বলছে, ডিড ড্যু ডু ইট? ডিড ড্যু ডু ইট? ডিড ড্যু ডু ইট?

পাহাড়ের উপরে দাবানল আরও ছড়িয়ে গেছে। আলোর মালা ফুটে উঠেছে। কার গলাতে উঠবে সে মালা কে জানে!

উঠবে হয়তো কোনো অনাঘ্রাত সতী কুমারীর গলাতে। উলু দেওয়া হবে, শাঁখ বাজবে, আতর-জল ছড়াবে আর লাল গোলাপ দেবে ছোট মেয়েরা। কবিতা ছাপা হবে দিদার, দাদুর। ঠাকুর্দা, ঠাম্মার। বর আসবে টোপর মাথায় দিয়ে ফুল সাজানো গাড়িতে।

নদীর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে তটিনীর দুটি চোখ জলে ভরে এল।

অবনী বলল, আমি চান করে শুয়ে পড়ছি রে আকা। আমার একদম খিদে নেই। তুই কিন্তু তটিনী দেবীকে দেখাশোনা করিস। উনি আমাদের অতিথি। আলিপুরদুয়ারের সকলেরই অতিথি। অনেক অপমান অসম্মান করেছি ওঁকে আমরা। তোর উপরে ভার দিলাম যদি ক্ষততে সামান্য প্রলেপও দিতে পারিস।

আকাতরু অথবা তটিনী কেউই অবনীর কথার কোনো উত্তর দিল না। কিছু কিছু কথা থাকে, যে সব কথার উত্তর হয় না। কিছু কিছু মুহূর্ত থাকে, যখন কোনো কথা না বললেই সব বলা হয়।

নদীর ওপারের পাহাড় থেকে গেকো ডাকল টাকটু-উ-উ। এপার থেকে তার দোসর সাড়া দিল টাকটু-উ-উ। তক্ষক যে তক্ষক, তারও প্রেমিক আছে। স্বার্থহীন, সৎ, ভালো প্রেমিক। অবশ্য তক্ষকের প্রেমিকাও ভালো। সে নিশ্চয়ই সতী।

আকাতরু বলল, ফিরা্যা যাই আমি আলিপুরদুয়ারে। ওই মৃদুল দাসের মুখের জিয়োগ্রাফি আমি যদি না পালটাইয়া দিই ত আমার বাবা-মায়ের বড়-মায়ের দেওয়া নামডাই আমি বদলাইয়া ফেলাইম্যু। দেইখ্যেন আনে!

তটিনীর দু-চোখের জল গড়িয়েই যেতে লাগল দু গাল বেয়ে। গাল থেকে বুক বেয়ে এসে ব্লাউজ ভিজিয়ে দিল।

তটিনী বলল, দোষ তো ওদের কারোই নয়।

ক্যান? নয় ক্যান?

আমিই যে খারাপ, খারাপ, খারাপ।

আমারে ভগবান যদি স্বয়ং আইস্যা এই কথা কয় তবুও আমি বিশ্বাস করুম না। আপনে খারাপ হইতেই পারেন না। পিরথিবীর যা-কিছু ভালো সেই সব ভালোর প্রতিনিধি আপনে।

হাতের ইশারায় ডাকল তটিনী আকাতরুকে কাছে। তারপর তার সামনে সিমেন্ট-বাঁধানো বসার জায়গাতে বসতে বলল।

আকাতরু তার সামনে গিয়ে বসল। তটিনী তার নিজের হাত দুটি দিয়ে সারল্য, ভালত্ব আর পবিত্রতার প্রতিমূর্তি আকাতরুর দুটি গাল স্পর্শ করল, বড় আদরে, বড় যতনে।

আকাতরু কাছে আসাতে বুঝতে পারল যে তটিনী কাঁদছে অনেকক্ষণ হল।

আকাতরু বলল. ম্যাডাম, আপনের দুই পায়ে পড়ি। আমার সামনে আপনে কাইন্দেন না, কোনোওদিনও কাইন্দেন না। আমার পরানডা ভাইঙ্গা যায়। প্লিজ! প্লিজ! প্লিজ! ম্যাডাম। বিশ্বাস করেন। আপনে আমারে বিশ্বাস...

দুধলি রাত আর তারা ভরা আকাশ আর দাবানলের মালা আর রাতের নদীর বুকে চমকে চমকে ডেকে বেড়ানো ডিড-উ্য-ডু-ইট পাখিটাই শুধু জানল আকাতরুর বুকের মধ্যে কী হচ্ছে।

এবং হয়তো তটিনীও জানল।

সারা রাতই প্রায় জেগে কাটাল তটিনী। এমন সুন্দর স্বপ্নের পরিবেশে এর আগে কোনো রাত কাটায়নি ও। মিষ্টি মিষ্টি ঠান্ডা। এক চাদরের মতন। ছমছমে জ্যোৎস্নার রাত। চওড়া নদীর সাদা বুকে জ্যোৎস্না পড়ে নদীটাই আকাশ বা আকাশটাই নদী তা যেন বোঝা যাচ্ছিল না। জয়ন্তী বন-বাংলোর উলটোদিকে, নদীর ওপারের পাহাড়ের মাথাতে আগুনের মালাটা মাঝরাতে নিভে এসেছিল। তটিনীরই মতো মালা পরাবার কোনো মনের মানুষ জোটেনি হয়তো সেই পাহাড়ের। চাঁদনি রাতে পাহাড়টাকে আরও রহস্যময় দেখাচ্ছিল। যা-কিছুই, যে জনই একা, তাই রহস্যময়। তা নারীই হোক কী পাহাড়, কী পুরুষ। তারা দুঃখীও। সেই দুঃখের স্বরূপ শুধু তারাই জানে। যে-কোনো অবিবাহিত পুরুষ অথবা নারীকে ভালো করে লক্ষ্য করলেই এই কথার সত্য বোঝা যায়। লক্ষ্য, পাহাড় অথবা নদীকেও করা যায় কিন্তু প্রশ্ন করা যায় শুধুমাত্র মানুষকেই। নিজেদের দুঃখের কথা মানুষ যেমন প্রকাশ করতে পারে, অন্য প্রাণীরা অথবা নদী বা পাহাড় তা পারে না।

সারা রাত কত কী পাখি ও প্রাণী ডাকল চারধারের বন থেকে, নদীর বুক থেকে, পাহাড় থেকে। কোনটা যে কার ডাক তা তটিনী জানে না। আকাতরু তার পাশে থাকলে বলতে পারত। তার পাশে, শুধু তার মনকে ভালোবেসে আজ অবধি একজনও থাকেনি। কী জীবনে, কী খাটে। পুরুষগুলো বড় বোকা। মেয়েদের শরীরে এসেই তাদের সব চাওয়া থেমে যায়। শরীরের কবরেই মন লীন হয়। ভালোবাসা কাকে যে বলে তা খুব কম পুরুষই জানে। পুরুষেরা অধিকাংশই ওই চানু রায় বা মৃদুলদেরই মতন পরম মূর্খ। তাই নিজেদের বুদ্ধিমান ভাবে। পুরুষমাত্রই ওভারকনফিডেন্ট নিজেদের সম্বন্ধে। বিধাতা প্রত্যেক নারীকেই তারা অন্যরকম বলেই তাদের এক সহজাত বুদ্ধি দিয়েছে তাদের বর্ম হিসেবে। সে বর্ম সাদা চোখে দেখা যায় না।

জয়ন্তী নদীব চওড়া বুক ধরে, ঠিক আড়াআড়ি নয়, কোনাকুনি চলেছে ওদের জিপ। সাদা শুকনো পাথরময় নদীরেখা ধরে উথাল-পাথাল হতে হতে চলেছে ওরা। তবে বালি উড়ছে না। রাতের শিশিরে এখনও বালিতে আর্দ্রতা আছে।

একজোড়া পাখি বাংলোর হাতার মধ্যে অথবা হাতার সীমানার বাইরে, জয়ন্তী নদীর ধারের একটি গাছে শেষ রাত থেকে মহা শোরগোল তুলেছিল। ভোরে উঠে বাইরে এসে আকাতরুর সঙ্গে দেখা হতেই জিগ্যেস করেছিল তটিনী সেই গাছ ও পাখিদের দেখিয়ে। আকাতরু বলেছিল পাখিগুলোর নাম র‍্যাকেট টেইলড ড্রঙ্গো। ফিঙে একধরনের। তবে মহা মারকুট্টে নাকি। ওদের ভয় পায় ওদের চেয়ে আয়তনে বড় অনেক পাখিই। যেখানেই থাকুক ওরা এমনি করেই সকলের ঘুম ভাঙায়। ভোরের ময়ূর-মুরগি জাগারও অনেক আগে ওরা জাগে। আর গাছেদের নাম, ডিকরাসি।

এবারে জয়ন্তী নদী ছেড়ে ও পাড়ে উঠল জিপ। সকালে জয়ন্তী বনবাংলোর চৌকিদার অজয় ছেত্রী জবরদস্ত নাস্তা করিয়ে দিয়েছিল। জয়ন্তী গ্রামে রসগোল্লাটা নাকি গৃহশিল্প। দুধ প্রচুর এবং সস্তা বলে এখানের বাড়ি বাড়ি রসগোল্লা বানিয়ে রাজাভাতখাওয়া এবং আলিপুরদুয়ারে চালান দিয়ে দু পয়সা রোজগার করে নেয় স্থানীয় মানুষেরা।

অবনী বলছিল ওদের।

নদীটা পেরোবার পথেই একটি দোতলা কাঠের বাড়ি বাঁ পাশে। ওটি একটি লাইমস্টোন কোয়ারির বাড়ি। বন্যা দয়া করে গ্রাস করতে করতেও করেনি। ছেড়ে গেছে।

তটিনী বলল, এসব অঞ্চলে অনেক খনিজ জিনিস পাওয়া যায়। না? মানে ধাতু?

যায়ই তো। পাহাড়ের গায়ে গায়ে যে সাদা সাদা দাগ দেখছেন, চাঁদনি রাতে যেসব জায়গাকে

মনে হয় বরফাবৃত, সেই সব জায়গাতে হয় ধস নেমেছিল কখনও, নয় খোঁড়াখুঁড়ি করে নানা ধাতব আকর বের করা হয়েছিল একসময়।

কী কী ধাতব আকর পাওয়া যায় এখানে?

অনেক কিছু।

তবু।

ডলোমাইট, লাইমস্টোন, ক্যালসেরাস টুফা, কপার ওর, কয়লা, আয়রন ওর, ক্লে ইত্যাদি। এই সব ধাতব আকরের জন্যেই তো পুরো বক্সা বনাঞ্চলই বিপদগ্রস্ত। পাহাড়ে পাহাড়ে খোঁড়াখুঁড়ি চললে, ট্রাকের পর ট্রাক চললে, বনের পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাবে না। একোলজিকাল ব্যালান্স নষ্ট হয়ে যাবে তো।

তাই?

তাই তো!

বাবাঃ! আপনি কত জানেন।

তটিনী বলল।

অবনী লজ্জিত হয়ে বলল, আমি তো এই অঞ্চলেই জীবন কাটালাম। এসব জানি একটু-আধটু তবে গাছ পাখি ফুলের কথা আকা জানে আমার চেয়ে অনেক বেশি। এসব আমরা জানলে কী হবে? আমরা কি আপনার মতন অভিনয় জানি না গান গাইতে জানি?

অভিনয় আর আমি কতটুকু জানি!

তা ঠিক।

অবনী বলল।

তারপর বলল, অভিনয়ে মৃদুলবাবু আপনাকে অনেক গোল দিয়ে দেবেন।

আকা বলল, সক্কালবেলা! তুই আর অন্য কোনো মানুষের নাম পাইলি না? ওই লোকটার নামও উচ্চারণ করিস যদি আর একবার।

সত্যি তো। কিন্তু মানুষটা গেল কোথায়?

তটিনী বলল।

যেখানেই যাক। থাকা-খাওয়ার অসুবিধে হবে না চানু রায়ের হেপাজতে যখন আছে। চানু রায় মানুষটা যেমন খারাপ, আবার ভালোও।

তুই অরে ভালো কইতাছিস?

আকা ধমকে বলল।

ভালোই তো। যে খারাপ মানুষকে খারাপ বলে চেনা যায়, যে নিজেও স্বীকার করে যে, সে খারাপ তাকে নিয়ে ভয় নেই। কিন্তু মৃদুলবাবুদের মতন আঁতেল যাঁরা, যাঁদের আমরা দূরদর্শনে দেখি প্রায়ই, দেখি খবরের কাগজের পাতায়, ধুমসো চেহারা আর থুম্বো মুখের, যাঁরা মদ খেয়ে আর দলবাজি করে বঙ্গভূমের তাবৎ সাংস্কৃতিক সাহিত্যিক সাংগীতিক পরিবেশের স্বনিয়োজিত রক্ষক, তাঁদের নিয়েই বিপদ। এই জানোয়ারগুলোর মাত্র দুটো পা থাকাতেই এরা এ জন্মে বেঁচে গেল।

কদ্দিন বাঁইচা থাকব। আমি হালারে হালুয়া বানাইয়া ছাড়ুম। আর্ট-কেলচার করণ চিরজীবনের মতো বন্ধ কইর‍্যা দিমু।

আঃ। ছাড় না।

অবনী বলল।

তারপর বলল, তোর এই এক দোষ আকা। তোর হাতে কি এই পৃথিবীর ভার দিয়েছেন ভগবান? তুই কি ডন কীয়টে? যে পৃথিবীর যে প্রান্তে যা অন্যায় হচ্ছে তারই প্রতিবিধান করার দায় নিয়ে

এখানে এসেছিস। শান্ত হ। তোর নিজের জীবনের শান্তি বাহ্যিক কারণে নষ্ট করে লাভ কী?

সেই ত হইল গিয়া কথা। পরের অশান্তি যে একদিন নিজের হইয়া উঠব এ কথা বোঝে কোন ব্যাটায়। আমাগো স্বভাবও হইল গিয়া ওই রকম। নিজের পায়ে জুতার চাপ না পড়ন পর্যন্ত আমাগো হুঁশই আসে না। ইটাই ট্রাজেডি।

আবারও নদী!

স্বগতোক্তি করল তটিনী।

তটিনী আজ সকালে একটা ছাইরঙা তাঁতের শাড়ি পরেছে। কালোরঙা ব্লাউজ। চোখে কাজল দিয়েছে গাঢ় করে। কালো টিপ পরেছে কপালে। সাদারঙা ঝুঠো মুক্তোর মালা আর বালা পরেছে গলাতে আর ডান হাতে। শ্যাম্পু করেছে না শিকাকাই বুঝতে পারছে না আকাতরু কিন্তু সদ্যস্নাতা তটিনীকে ঝাঁকতে ঝাঁকতে যাওয়া জিপের মধ্যে খুবই কাছ থেকে দেখতে পেয়ে খুশিতে সে মরে যাচ্ছে। কী গন্ধ মেখেছে তটিনী কে জানে। বিলিতি সেন্ট-টেন্ট-এর নাম তো ও জানে না। জানতে চায়ও না। তটিনীর কোনো পারফ্যুমের দরকারই নেই। তার গায়ের নিজস্ব গন্ধটা যদি একবার পেতে পারত আকাতরু তবে তাতেই ভালো লাগাতে অজ্ঞান হয়ে যেত। তটিনীর মতন মেয়েরা যে কেন নিজের গায়ের গন্ধ আকাতরুর মতন হতভাগ্য পুরুষদের পেতে দেয় না। তটিনী যেন কোনো ফুল! কাছে থাকাতেই আমোদিত হচ্ছে আকা।

আবারও বলল তটিনী, আবারও নদী!

অবনী বলল। হুঁ।

কী যেন ভাবছিল সে।

তারপর বলল, একটা নয়। তিন তিনটে নদী পেরিয়ে যেতে হয়, জয়ন্তী থেকে ভুটানঘাটে যেতে হলে। জয়ন্তী, ফাসখাওয়া আর চুণিয়া ঝোড়া। এখন সহজে যেসব নদীর বুকের উপর দিয়ে জিপ পেরিয়ে যাচ্ছে বর্ষাতে সেই সব নদীর চেহারা যদি দেখতে পারতেন তাহলে বুঝতেন এরা কীরকম।

কীরকম মানে?

মানে, প্রলয়ংকরী। মানে, আপনার যেমন রূপ এই সকালে। কত পুরুষই যে ঐরাবতের মতন ভেসে যাবে না জেনেই।

শব্দ না করে মুখ টিপে হাসল তটিনী একটু।

প্রশংসাতে খুশি ভগবানও হন। আর তটিনী তো কোন ছার।

বেশ ভালো লাগছিল ওর। বহু বছর এমন ভালো লাগেনি। পুরুষের মুগ্ধ-দৃষ্টিতে ভালো লাগে সব মেয়েরই। কিন্তু সেই মুগ্ধতা একধরনের বন্যতা আকাতরুর মতন বন্য কোনো পুরুষের জংলি চোখের দিকে চেয়ে!

একটি গান শোনান না।

অবনী বলল।

পাগল! এই লাফানো-ঝাঁপানো জিপে বসে! সে তো পপ মিউজিক হয়ে যাবে। গান থাক। তার চেয়ে আপনি বলুন তো কী কী নদী আছে আপনাদের এই বক্সা অঞ্চলে।

নদীর অভাব কী? কত্ত নদী।

স্বগতোক্তি করল ভিতরে জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি নিয়ে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টায় ব্যাপৃত আকাতরু। ও ভাবছিল, ও যদি অবনীর মতন কলকাত্তাইয়া ভাষাতে কথা বলতে পারত। তবে ও তটিনীকে সবই বলত। পশ্চিমবঙ্গবাসী সংস্কৃতিসম্পন্ন তটিনী আকাতরুর ভাষার ধাক্কাতে যেন চমকে চমকে ওঠে। কিন্তু আকাতরুর পুববাংলার ভাষাতে যা প্রাণ, যা দম, যা ফুর্তি তা কি চিবিয়ে চিবিয়ে বলা পশ্চিমবঙ্গীয় ভাষাতে আছে!

অবনী বলল, পানা, ডিমা, বালা, ফাসখাওয়া, রায়ডাক আর সংকোশ।

আর একটু ডিটেইলস-এ বলুন ওই সব নদীদের সম্বন্ধে কি আর কিছুই বলার নেই?

আছে বইকি। বলছি। একটু পরে কিন্তু আমরা একটা চা-বাগানের মধ্যে দিয়ে যাব। তার নাম তুরতুরি।

তুরতুরি? বাঃ কী সুন্দর নাম!

হ্যাঁ। এই বক্সা অঞ্চলে তুরতুরি ছাড়াও আরও অনেক চা-বাগান আছে। যেমন রায়ডাক, ঢালাঝোড়া, কোহিনুর, নিউল্যান্ডস, সংকোশ, কুমারগ্রাম, রায়মাটাঙ্গ, চিঞ্চুলা, গাঙ্গুটিয়া, মাজেরডাবরি, আচাপাড়া।

আকাতরু বলল, ভাটপাড়া, চুয়াপাড়া, রাধারানি, ডিমা, কানখাওয়ায় দোষ করল কী? আর...

আর থাম এবারে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন না? ভালো, বেশি হয়ে গেলে আর ভালো থাকে না। কম বলেই তা ভালো। চা-এর সেলসম্যান আমি থোরিই। ওইঁতেই হবে।

তা যা কইছস।

কলকাতার তটিনী হাসি হাসি মুখে আলিপুরদুয়ারের এই দুজন মানুষের সঙ্গ খুবই উপভোগ করছিল। এই সারল্য, কলকাতার কোনো মানুষেরই মধ্যে পাওয়ার নয়। কলকাতাতে সারল্যর মতন পাপ আর দুটি নেই। অপরাধও নয়। বক্র আর কুটিলদের শহর ওই কলকাতা।

এবারে নদীর কথা বলুন।

তটিনী বলল।

তারপর ভাবল, কী চমৎকার কাটছে আজকের সকালটা। আকাশে মেঘ করে এসেছে। বোধহয় বৃষ্টি হবে। উদলা আকাশের নিচে বসন্তে বাদলা বাতাস বইছে। "আজ সকালবেলার বাদল আঁধারে/ আজ বনের বীণায় কী সুর বাঁধা রে।"

বনে না এলে, প্রকৃতির মধ্যে একাত্ম না হতে পারলে রবীন্দ্রনাথের গানকে বোধহয় হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। বাণীর মানেই না বোঝা গেলে গান যে গান হয়ে ওঠে না। কলকাতার লাল রায়, নীল সেন, বাসন্তী রায়, বেগুনী দাশগুপ্ত, সর্বজ্ঞ গুহঠাকুরতাদের মতন ঝাঁক ঝাঁক রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীদের এই কথাটা যদি বোঝানো যেত।

অবনী সিগরেটটা হাত বাড়িয়ে পথে ফেলে বলল, পানা নদীর জন্ম ভুটানে। এই পানা নদী বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পর পশ্চিমের সীমানা নির্ধারণ করে বয়ে গেছে। ডিমার উৎসও ভুটান পাহাড়েই। ভুটান পাহাড় থেকে নেমে এসে পানা আলাইকরি নদীর সঙ্গে মিশেছে। তারপর বয়ে গেছে আলিপুরদুয়ারের মধ্যে দিয়ে। আর ডিমা নদীর সঙ্গে গাঙ্গুটিয়া এবং রায়মাটাঙ্গ নদী এসে মেশাব পর এই একত্রিত তিন নদীর নাম হয়েছে কালজানি।

আর বালার কথা কইলি না?

আকাতরু বলল, ইন্টারাপ্ট করে।

বলছিতো। তুই-ই বল না তাহলে। আমি বললে কথার মধ্যে এত কথা বললে বলতে পারব না।

হ। হ। আমি আর কথা কম্যু না। তুইই ক। তটিনী দেবী কি আর কখনও আইবেন এই আমাগো ধ্যাড়ধেড়ে গোবিন্দপুরে? তাই ভালো কইর‍্যা সব বুঝইয়া দে উনারে।

বক্সা পাহাড় থেকে নেমে এসেছে বালা নদী। থেলচাঙ্গ আর কালকূট নদী এসে মিশেছে বালাতে। বালা গিয়েও পড়েছে সেই কালজানি নদীতেই।

তাই?

হ্যাঁ।

আর যে জয়ন্তী পেরিয়ে এলেন, তা বেরিয়েছে ভুটানের সীমান্তের জয়ন্তী পাহাড় থেকে। ফাসখাওয়া আর হাতিপোতা ফরেস্ট ব্লক-এর সীমানা চিহ্নিত করে বয়ে গেছে জয়ন্তী।

আর ফাসখাওয়া?

অন্য নদীগুলোর কথা এখন থাক। একটু জল খাই। বলেই প্লাস্টিকের পার্লপেট-এর জলের বোতল খুলে, ড্রাইভারকে বলল, একটু থামো তো ভাই। জল খেয়ে নি।

অবনীর জল খাওয়া হলে তটিনী বলল, আপনি এত সব জানলেন কী করে?

অবনী হাসল, আমার বড়দা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টেই কাজ করতেন। বাবার মৃত্যুর পরে এই দাদাই আমাদের মানুষ করেন। সেই সময়ে এই সমস্ত অঞ্চলে আমার থাকবার সুযোগ হয়েছিল।

তাই বলুন। আচ্ছা, আমরা যে ভুটানঘাট বাংলোতে থাকব, সেখান থেকে ভুটান কত দূর?

কাছেই। তাই তো নাম ভুটানঘাট। বাংলোর সামনে দিয়ে বয়ে গেছে রায়ডাক নদী। আশ্চর্য সুন্দর তার রূপ। একেকরকম রূপ একেক ঋতুতে। এই রায়ডাক নদীও এসেছে ভুটান থেকে। পিপিং-এ নিয়ে যাব আপনাকে। ভুটানের সেই পিপিং-এ পৌঁছে ওয়াঞ্চু নদী সমতলে পড়েছে। ভারতে। পড়েই চওড়া হয়ে গেছে। পিপিং অবধি পর্বতের পর পর্বতের মধ্যের গিরিখাত দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এসেছে ওয়াঞ্চু। ভুটানঘাট-এর সামনে দিয়ে বয়ে গিয়ে নর্থ রায়ডাক, সেন্ট্রাল, রায়ডাক, মারাকাটা এবং নারাখালি ফরেস্ট ব্লক-এর মধ্যে দিয়ে বয়ে গেছে রায়ডাক নদী। এই নদীর বিশেষত্ব হচ্ছে যে সমতলে এসে সে গত একশো বছরে বহুবার গতিপথ বদলেছে। একঘেয়েমি বোধহয় রায়ডাক-এর একেবারেই পছন্দ নয়। আমাদের কারই বা ইচ্ছে করে একই পথ বেয়ে আজীবন চলতে। কিন্তু নদী তো নদীই। আমরা নদী হলে আমরাও আমাদের গতিপথ বারবার বদলে ফেলে নিজেদের নবীকৃত করতাম। উনিশশো পাঁচ, উনিশশো তিরিশ, উনিশশো তেত্রিশ, উনিশশো পঞ্চাশ এবং সবশেষ উনিশশো আটষট্টিতে গতিপথ বদলেছে রায়ডাক। এই গতি পরিবর্তনের পাগলামির খেসারত দিতে হয়েছে মারাত্মকারে বনকে। সেন্ট্রাল রায়ডাক আর মারাকাটা ব্লক একেবারে তছনছ হয়ে গেছিল। আটষট্টির পরে রায়ডাক-এর পুরনো খাত-এর উপরে একটা 'সসেজ' বোল্ডার-বাঁধ বেঁধে দেওয়া হয়। তারপর থেকে বর্ষাতে সেন্ট্রাল রায়ডাক আর মারাকাটার তেমন ক্ষতি হয়নি।

এমন সময় আকাতরু হঠাৎ বলে উঠল, থামা ত তোর নদীর ইতিহাস।

বলেই বলল, তটিনীকে উদ্দেশ্য করে, অ্যাই দ্যাখেন, আমরা এহনে চুর্নঝোড়াও পার হইয়া আইলাম। ফাসখাওয়া ত আগেই পারাইছি। বো বোঝবেন ক্যামনে? রিভার রিসার্চ ইনস্টিট্যুটের অফিসারের মতন যা বকবকান বকবকাইতাছে পোলায় তার আর কী কম্যু! তুরতুরি বাগানে ঢুকুম আমরা একটু পরই। তারপর ময়নাবাড়ি বিটে পৌঁছামু। মাইমেনসিঙ্গা সুভাষবাবু আছেন বিট অফিসার। শুটকি মাছ খাইবেন না কি ম্যাডাম?

শুঁটকি মাছ?

চোখ কপালে তুলে বলল তটিনী।

তারপর বলল, আপনি শুটকি মাছ খান? ঈসস্। আপনি বাঙাল যে তা জানতাম, এমন পচা বাঙাল তা তো জানতাম না!

হঃ।

অপমানটাকে ঝেড়ে ফেলে আকাতরু বলল। শুঁটকি মাছের ট্যাস্ট যে একবার পাইছে, স্যা মানুষের অবস্থা মাংসর সোয়াদ পাওনের পর মানুষখেকো বাঘের মতন হইয়া যায় আর কী। বোঝলেন কি না!

তারপর বলল, জলে না নাইম্যাই সাঁতার শেখন কি যায়? আপনেই কয়েন।

আকাতরুর উদ্ভট উপমাতে হাসি পেল তটিনীর। সাধে কী আর বাঙালদের বাঙাল বলে পশ্চিমবঙ্গের পুরনো বাসিন্দারা! ঠিকই বলে।

ও হেসে বলল, আমার সাঁতার শিখে কাজ নেই। ভুটানঘাট আর কতদূর?

এই ত তুরতুরি বাগানের এলাকা প্রায় পেরিয়ে এলাম। বাঁদিকে সামনে একটু দাঁড়াতে হবে। সুভাষদার সঙ্গে দেখা করে যেতে হবে।

অবনী বলল।

একটু পরই গাড়িটা দাঁড়াল বাঁদিকে।

বিট অফিস এটা।

অবনী বলল।

সেটা কী আবার?

ফরেস্ট-এর নানা ভাগ থাকে। তেমন থাকে আমলাদেরও। এক একটি ফরেস্ট ডিভিশান-এর বড়সাহেব হচ্ছেন ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার। মানে ডি.এফ.ও.। তাঁর নিচে থাকেন কয়েকজন রেঞ্জার। এক একটি রেঞ্জ-এর ভারপ্রাপ্ত অফিসার। এক একটা রেঞ্জ আবার কয়েকটা বিট-এ ভাগ করা থাকে। প্রত্যেকটি বিট-এর জন্যে থাকেন একেকজন বিট অফিসার। এক একজন বিট অফিসারের নিচে থাকেন কয়েকজন ফরেস্ট গার্ড। এবারে বুঝলেন।

হ্যাঁ। তাহলে এ.ডি.এফ.ও-টা কী জিনিস?

এ.ডি.এফ.ও. দুরকম হয়। অ্যাসিস্ট্যান্ট ডি.এফ.ও. বা সিনিয়র রেঞ্জার। আর অ্যাডিশানাল ডি.এফ.ও.। আজকাল সারা দেশেই সরকারি চাকুরেদের মধ্যে গাজোয়ারি উপরে ওঠার এক প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। কী কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে, কী রাজ্য সরকারের। উপরওয়ালার খেতাবটি ব্যবহার করার বড়ই লোভ দেখা যায়। যেমন উপরওয়ালাদের দেখা যায় গাড়িতে লাল বাতি জ্বালিয়ে পদমর্যাদা বেড়েছে এমন ভাবা। এদিকে তাঁদের মধ্যে অনেকেই জানেন না যে, সাধারণ মানুষের মনোভাব বিচার করলে তাঁদের গাড়ির মাথাতে লাল বাতি না জ্বালতে দিয়ে তাঁদের প্রত্যেকের পেছনে একটা করে লাল বাতি জ্বেলে দেওয়া উচিত। তাই অ্যাডিশানাল ডি.এফ.ও-দের ভুলক্রমে এ.ডি.এফ.ও. বললেই তাঁরা হামলে পড়ে কল্যাণবাবুর মতন বলেন "অ্যাডিশানাল বলুন, অ্যাডিশানাল।"

একজন পান-খাওয়া রোগা-সোগা ভদ্রলোক বিট অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন।

অবনী বলল, সুভাষদা, এই যে তটিনী দেবী। আলিপুরদুয়ারে এসেছিলেন যাত্রার জন্যে।

আসেন আসেন। নামেন একটু। পায়ের ধুলা দিয়ে ধন্য করেন আমাগো চা খাইয়া যান এককাপ।

মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট হল সকালের জলখাবার খেয়ে বেরিয়েছি। আজ থাক মানে, এখন থাক। ফেরার পথে হবে'খন।

তটিনী বলল, বিনয়ের সঙ্গে।

অবনী ও আকাতরু গাড়ি থেকে নামল। অবনী বলল, পাঁচ মিনিট একটু সুভাষদার সঙ্গে কথা সেরে আসছি ম্যাডাম।

ঠিক আছে।

তটিনী বলল।

তটিনীর মন বলল, ওঁরা নিশ্চয়ই চানু রায় আর মৃদুলবাবু সম্বন্ধে কথা বলতে গেলেন। গত রাতের ঘটনাটার কথা মনে হতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল তটিনীর। মৃদুলকে ও পছন্দ কোনোদিনও করেনি। কিন্তু অপছন্দ করা আর ঘৃণা করার মধ্যে বিস্তর ব্যবধান আছে। কলকাতার পরিবেশ যেমন প্রতিদিন দূষিত থেকে দূষিততর হয়ে যাচ্ছে, দূষিত হচ্ছে প্রতিবেশও। এই সব মানুষদের সঙ্গেই দিন কাটাতে হয়। ভাবলেই বুকের মধ্যে একটা কষ্ট অনুভব করে। পুরুষগুলো কি সবাই এমন বজ্জাত? কে জানে! তা নয় বোধহয়। আকাতরুরাও তো আছে। মেয়েদের মধ্যেও বজ্জাত কম নেই। সে নিজেও তো বজ্জাতই। তাকে ভালো কে বলবে।

গাড়ির পেছনের সিটে বসে সামনে তাকালো। কাঁচা, কোরা রঙের ধূলিধূসরিত পথটি সোজা

চলে গেছে গাছগাছালির মধ্যে দিয়ে। বাগানের প্রান্ত এলাকা। বাগানের মধ্যে যে বড় বড় গাছগুলো লাগানো হয়, কী নাম কে জানে! আকাতরু জানবে। সেই গাছগুলো ছাড়া অন্য গাছ নেই। বাঁদিকে গভীর জঙ্গল দেখা যাচ্ছে।

উপরে চেয়ে দেখল, চমৎকার নীল আকাশ। ঝকমক করছে রোদ। রোদের কুচি উড়ছে যেন হাওয়ার সঙ্গে। বিট অফিসে যাওয়ার পথের বাঁদিকে পথপাশে একটা ছোট্ট ডোবা মতন। তার কিনারে কলমী শাক ফুটেছে। অজস্র। চার-পাঁচটি পাতিহাঁস ভেসে বেড়াচ্ছে প্যাঁ-এ-ক প্যাঁ-এ-ক শব্দ করে। সামনের মাটির বাড়ির দাওয়াতে একটা তিন-চার বছরের ছেলে, যার নিম্নাঙ্গ নগ্ন কিন্তু উর্ধ্বাঙ্গে একটি নীলরঙা বুকছেঁড়া হাফ-শার্ট, কোঁচড়ে মুড়ি রেখে নিবিষ্টমনে একটি একটি করে মুড়ি তুলে, তা সে গুনে গুনে খাচ্ছে। কোথাও কোনো তাড়াহুড়ো নেই। অবকাশই অবকাশ। দুটি ছাগল নিয়ে এক বুড়ি হেঁটে চলেছে পথ বেয়ে। কে জানে কোথায় চলেছে। আজ বোধহয় হাট আছে এই ময়নাবাড়িতে। দু-একজনকে ধামাতে করে আনাজপাতি নিয়ে যেতেও দেখল। কারোরই কোনো তাড়া নেই। না হাঁসেদের,.না ছেলেটির, না বুড়ির, না অন্য কারোর। ভারী ভালো লাগছিল তটিনীর। ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেল ওর। পুকুরপাড়ে মধুচুষি ফুলের ঝোপের মধ্যে বসে থাকত ছোট্ট মেয়ে তটিনী এমনই নিস্তব্ধ দুপুরে। ফড়িং উড়ত। মরা নদীর সোঁতার পাশের সজনে গাছের ডালে নীলকণ্ঠ পাখি উড়ে এসে বসত। হরেকৃষ্ণ দলুই-এর বাড়ি থেকে তার নব্বুই বছরের বুড়ি মা বাতের ব্যথায় কঁকিয়ে কাঁদত। নিস্তব্ধ ঘুঘুডাকা দুপুরে চিলের কান্নার সঙ্গে সেই কান্না মিশে যেত। তটিনীর সমস্ত ছেলেবেলাটা ফ্রেমে-বাঁধানো কোনো ছবিরই মতন তার মনের চোখে একঝলক ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল। খুবই গরিব ছিল ওরা। কিন্তু আজকে কলকাতার ফ্ল্যাট, মারুতি গাড়ি, চাকর-ঝি, ফ্রিজ, ভিসিআর, টিভি, বেডরুমে এয়ার কন্ডিশনার, বসবার ঘরে সোফাসেট, কার্পেট এসব কোনো কিছুর মূল্যেই ছেলেবেলার সেই আশ্চর্য দিনগুলিকে কেনা যাবে না। যা গেছে, তা গেছে চিরদিনেরই মতন।

অবনীবাবুরা ফিরে এল। ড্রাইভারও। বোধহয় সিগারেট খাচ্ছিল গাড়ির পেছনে গিয়ে। সুভাষবাবু গাড়ি অবধি এসে বিদায় জানালেন। দুটি গন্ধরাজ লেবু দিলেন তটিনীর হাতে। বললেন, আমার বাগানের। ওখানে লেবু পাওয়া যায় না। তাই দিলাম। ভুটানঘাট বাংলোর চৌকিদার মানবাহাদুর খুব ভালো মসুর ডাল রাঁধে। মসুর ডালের সঙ্গে খাইবেন ভাত দিয়া।

তটিনী মুখে ধন্যবাদ না দিয়ে, হাসল একটু। ধন্যবাদ বা "থ্যাঙ্ক ঊ্য" সব জায়গাতে বলা যায় না। বলা উচিতও নয়। গাছ থেকে ছিঁড়ে আনা পাতাসুদ্ধু দুটি গন্ধরাজ লেবুও যে এক মস্ত উপহার হতে পারে একথা কলকাতাতে বসে ভাবা পর্যন্ত যায় না।

গাড়ি ছেড়ে দিল। একটু এগিয়ে গিয়েই গাড়িটা বাঁ দিকে মোড় নিল। পথে একটি চেকনাকা ছিল বনবিভাগের। সেটি পেরিয়ে, নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল গাড়ি।

হাতি। হাতি। ওই যে।

বলে, চেঁচিয়ে উঠল তটিনী।

আকাতরু হাসল। বলল, না।

হাতি না?

হাতি হইব না ক্যান। হাতি নিশ্চয়ই।

তবে?

হাতি দেখে উত্তেজিত গলাতে বলল তটিনী, ছোট্ট মেয়ের মতো।

হাতি নিশ্চয়ই। কিন্তু জংলা হাতি না।

তবে? জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে, আর জংলা হাতি নয় কেমন?

আপনেও ত জঙ্গলেই আইছেন। তাই বইল্যা আপনেও কি জঙ্গলি? কী যে কন!

অবনী আকার কথাতে হেসে ফেলল।

আকা আবার বলল, ওই হাতিটা মাইয়া হাতি।

মানে? হস্তিনী?

হ! হেইটার নাম হইল গিয়া প্রমীলা।

তাই?

হ! ফরেস্ট ডিপার্টের হাতি। অনেকদিন আগে চান করণের সময়ে পায়ের ছিকলখান খুইল্যা দিছিল ওর মাহুতে। জঙ্গলের মধ্যের ঝোড়াতে চান করতাছিল প্রমীলা। হেই সময়েই সে পেরথমবার জঙ্গলে পলাইয়া যায়।

তার এক প্রেমিক আছে।

অবনী বলল।

তারপর বলল, একই প্রেমিক। প্রকাণ্ড দাঁতাল। অল্প কদিন আগেই একবার রাতের বেলা পালিয়ে গেছিল। বারবার পালায় জঙ্গলে কিন্তু প্রেমিক বদলায় না। খুব ভালোবাসা দুজনের।

তটিনী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তাই?

হ। হাতিটা সুভাষদারই সম্পত্তি কইতে পারেন। ময়নাবাড়ির বিটের এই সম্পত্তি।

কী করেন সুভাষবাবু হাতি দিয়ে?

তটিনী বলল।

কী করেন না তাই কন?

আকাতরু বলল।

ডুয়ার্স আর আসামের জঙ্গলে হাতি, ওড়িশার জঙ্গলে মোষ, উত্তরপ্রদেশের ড্রাই ইলাকায় উট কত কাজেই যে লাগে তা কহনের নয়।

তাই?

বলল তটিনী।

৮

মসুর ডাল, কাঁচালংকা কালোজিরে ফোড়ন দিয়ে রাঁধা, কড়কড়ে করে আলু ভাজা, এঁচড়ের তরকারি, খুব বড় বড় পিস করে কাটা তেলওয়ালা পাকা রুইয়ের ঝোল, ভেটকি মাছের কাঁটা চচ্চড়ি দিয়ে দুপুরের খাওয়া সেরে ঘুম লাগিয়েছিল তটিনী। এত ঘুম যে কোথায় কী করে জমে ছিল তা তটিনী ভেবেই পাচ্ছে না। শরীর এবং মনও যেন ছেড়ে দিয়েছে একেবারে। এলিয়ে দিয়েছে। 'আনওয়াইজিং প্রসেস' শুরু হয়েছিল রাজাভাতখাওয়াতেই। তা গতিজাড্য পেয়েছিল জয়ন্তীতে এসে। আর ভুটানঘাটে এসে সেই চড়াই যেন শেষ হল আপাতত।

ভারী সুন্দর বাংলোটি ভুটানঘাটের। কাঠের দোতলা বাংলো। চওড়া বারান্দা ও বসবার ঘর আছে দোতলাতে। একতলাতেও বারান্দা আছে। বাংলোর কিছুটা দূর দিয়েই ওপারের ভুটানের উত্তুঙ্গ পাহাড়শ্রেণীর পা ছুঁয়ে আর গভীর বনরাজির মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে রায়ডাক নদী। ঝরঝর শব্দ করে। কাছেই বোধহয় জলের মধ্যে একাধিক প্রপাত আছে। একই ডেসিবেল-এ জোরে জল পড়ার শব্দ। হয়েই যাচ্ছে অবিরাম। শব্দটি হয়তো একই থাকবে কিন্তু রাতের বেলা যখন বন-বাংলো সংলগ্ন পরিবেশ অনেক বেশি শান্ত হবে, বনবাণীও নিথর হবে তখন এই শব্দকেই নিশ্চয়ই আরও অনেক জোর বলে মনে হবে।

নদীতে যাওয়ার পথ করা আছে একটা। নদীর কাছেই পাম্প-হাউস। আর আছে একটি বানানো "নুনী"। SALT LICK। রাজাভাতখাওয়া-জয়ন্তী রোডের উপরের টাওয়ারের কাছে যেমন আছে, সাংহাই রোডের মোড়ে, এখানেও বস্তা বস্তা নুন ফেলে রেখেছেন বনবিভাগ বাংলোর কাছেই। সেখানে ভরদুপুরেও চিতল হরিণেরা নুন চাটতে এসেছে। গভীর হরজাই জঙ্গলের মধ্যে সেই নুনী। রায়ডাক নদী, নদীর ওপাড়ের ভুটানের আকাশছোঁয়া পাহাড় এবং তারও উপরে নির্মেঘ কলুষহীন সুনীল আকাশ মিলেমিশে মনে হচ্ছে একটি ফ্রেমে-বাঁধানো ছবি।

আকাতরু আর অবনীবাবু বলেছিলেন বিকেলে নদীতে বেড়াতে নিয়ে যাবেন বাংলোর সামনের পথ দিয়ে হাঁটিয়ে। তারপর নদীর বিস্তীর্ণ বালি আর নুড়িময় বুক ধরে হেঁটে ফিরে আসবে বাংলোতে।

ঘুম থেকে উঠে ও দোতলার বাংলোতে বারান্দার ডান কোণে চেয়ার পেতে নদীর দিকে চেয়ে বসেছিল। ওরা দুজনে নিচের ঘরে উঠেছেন একই সঙ্গে। ওঁরাও বারান্দাতে বসে কথা বলছিলেন। মনে হচ্ছিল যেন ওর পাশে বসেই কথা বলছেন ওঁরা। এমন নিস্তব্ধ পুরো অঞ্চল। বাংলোর পেছন দিকে বাবুর্চিখানা। কে যেন বালতি নামাল সিমেন্ট-বাঁধানো চবুতরাতে। তাতেই কত শব্দ হল। তবে হাওয়া আছে জোর। নদীর উপর দিয়ে বয়ে আসছে সে হাওয়া। বেশ ঠান্ডা হাওয়া। এখনই শীত শীত করছে। রাতে কম্বল গায়ে দিয়ে শুতে হবে সব দরজা-জানালা বন্ধ করে।

কথা আছে বিকেল চারটেতে চা নিয়ে আসবে চৌকিদার মানবাহাদুরের হেল্পার। তারপর ওরা হেঁটে বেরোবে যাতে দিনের আলো থাকতে থাকতে বাংলোতে ফিরে আসতে পারে। এই সব অঞ্চলের জঙ্গল এমনই নিশ্ছিদ্র যে ভিতরে চোখ যায় না। দুপাশ থেকে জঙ্গল ঝুঁকে পড়েছে পথের উপরে। ভয় করে দেখে। তাছাড়া এই সব জঙ্গলে বাঘ তো আছেই, কিন্তু বাঘের থেকে যত না ভয় তার চেয়ে অনেকই বেশি ভয় সাপের এবং হাতির।

নিচ থেকে অবনীবাবু বললেন, লুঙ্গি-টুঙ্গি ছেড়ে তৈরি হয়ে নে আকা। সাড়ে তিনটে বেজে গেছে। চারটেতে চা খেয়ে না বেরোলে আলো থাকতে থাকতে ফিরে আসা যাবে না।

হ।

আকা বলল।

তারপর বলল, আমার কিছুই ভালো লাগতাছে না রে অবু।

বুঝেছি।

কী বুঝছস? আমি এহনে কী করুম তাই ক!

মরেছিস তুই। আমি কিছুই করতে বলি না।

তার মানেডা কী? তুই আমার বন্ধু কি বন্ধু না?

বন্ধু বলেই তো বলছি। সারাটা জীবন তুই উলটোপালটা কাজ করে এলি। কলেজপাড়ার নমিতা তোকে এত ভালোবাসে। পালটি ঘর। কত গুণের মেয়ে। এত করে বললাম তোকে। মাসিমারও ভীষণই পছন্দ অথচ তোর...

হঃ। কার সঙ্গে কার তুলনা!

তটিনীকে নিয়ে তুই কী করতে চাস?

সকলেই যা করে। বাড়ির বউ। তুই নলিনীকে নিয়ে যা করছস। সকলেই যা করে।

তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

তটিনী কত ঘাটের জল খাওয়া মেয়ে সে সম্বন্ধে তোর কোনো ধারণা আছে?

আস্তে কথা ক। শুইন্যা ফেলাইলে বেচারি মনে দুঃখ পাইবনে।

দুঃখ পাবার তো কিছু নেই। তটিনী কি নিজে জানে না এ কথা! তাছাড়া আমি তো তাকে শোনবার বা আঘাত দেবার জন্য এ কথা বলছি না। বলছি, তোরই ভালোর জন্যে। ওর ঘর তো

দোতলার বাঁদিকে। এই দিকের কথা শুনতে পাবে না। তাছাড়া সে তো এখনও ঘুমাচ্ছে। মানবাহাদুরকে বলা আছে চারটের সময়ে চা নিয়ে গিয়ে দরজাতে ধাক্কা দেবে।

তবু। তুই আস্তে আস্তে কথা ক।

অবনী আকাতরুর কথার কোনো উত্তর দিল না।

আকা বলল, কথা কইস না ক্যান?

কোনো কথা নেই আমার। তোর মাথাটা গেছে।

হয়তো। অবশ্য আমি কি আর বুঝি না যে আমার কুনোই যুগ্যতা নাই তারে পাওনের। আমার ভালোবাসাই হইব আমার সব যুগ্যতা। আমি বাকি জীবন তার চাকর হইয়া থাকুম।

তোকে সে চাকর রাখলে তো! যাদের সকাল বিকেল চাকর পাল্টানো অভ্যেস তাদের তোর মতো গোঁয়ার-গোবিন্দ বাঙাল চাকরের প্রয়োজন নেই। তাদের প্রয়োজন টাকার। তোর ভালোবাসাতে তাদের কোনো প্রয়োজন নেই। বারো বছর বয়স থেকে তারা ভালোবাসা টেনে-ছিঁড়ে ভালোবাসার উপরে বিরক্ত হয়ে গেছে। পুরুষের ভালোবাসা আর মুসলমানের মুরগিপোষা যে একই গোত্রীয় তা তারা ভালো করেই জানে। ভালোবাসার কথা বললে, তারা হাসবে।

হাসব? কইস কি রে? এমন বুকা মাইয়াও আছে না কি এই পৃথিবীতে যে ভালোবাসা বুঝে না। বিশেষ কইর‍্যা যে কুখনো পেরকৃত ভালোবাসা কারে কয় তাই জানে নাই।

অবনী হেসে উঠল আকাতরুর কথাতে।

হাসলি ক্যান? ইডিয়ট?

হাসলাম এই জন্যে যে, তোর পেরকৃত ভালোবাসা তটিনীর চোখে বিকৃত ভালোবাসা বলে ঠকবে। ও যাত্রার নায়িকা। তুই ওর সঙ্গে যাত্রার ডায়ালগ দিয়ে পারবি? তুই একটা ছাগল।

মুখ সামলাইয়া কথা কইস য্যান।

না হলে কী করবি?

তোর মাথা ফাটাইয়া দিমু।

হ্যাঁ। জানিস তো ওই গুণ্ডাগিরি। তুই এটা ঘটোৎকচ। তোর মতন একটা গ্রস, দুর্গন্ধ বাঙালকে কলকাতার তটিনীর ভালো লাগবে কেন তার একটা কারণ আমাকে দেখাতে পারিস? জাস্ট একটা?

ক্যান পারুম না। আমার মতন শুদ্ধ ভালোবাসা অরে অর জীবনে আর কেউই বাসে নাই যে এইটাই হইল গিয়া যথেষ্ট কারণ। ও মাইয়ার মগজ বইল্যা কিছু যদি থাইক্যা থাকে ত সে নিশ্চয়ই বুঝবো আনে। সে তোর মতন ছাগল না কি?

অবনী বলল, ঘটোৎকচ!

তারপরই বলল, তোর যা ইচ্ছে হয় তাই কর। তোর এলেম থাকে তুই ভালোবাস, তুই তার সঙ্গে শুয়ে পড়, বিয়ে কর, যা খুশি তাই কর। কিন্তু সবই করতে হবে নিজের এলেমে। আমার বিন্দুমাত্র সাহায্য তুমি পাবে না তা বলে দিলাম। জীইয়ে রাখা কইমাছের মতন নমিতাকে আমি আর মাসিমা জিইয়ে রেখেছি তোর জন্যে। তুই জানিস কত ভালো সম্বন্ধ এসেছিল মেয়েটার, আমরা সে সব সাবোটাজ করেছি দিনের পর দিন। তুই হলি গিয়ে ধাঙ্গড় বস্তির শুয়োর। ময়লা খাওয়াই তোর অদৃষ্ট। ফলমূল তোর ভোগে লাগবে কেন?

আকাতরু কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল। তারপর বলল, ঠিক আছে। আজ চা খাওনের পর তর আর যাইতে হইব না। আমি একাই তটিনীরে লইয়া যামু নদীতে।

মাথা খারাপ। তোর এখন যা অবস্থা। তোর সঙ্গে একা তটিনীকে ছেড়ে দেবার মতন দায়িত্বজ্ঞানহীন আমি নই। আমার নিজের দায়িত্বে তাকে এই জঙ্গলে এনেছিলাম। তাও মৃদুলবাবু সঙ্গে থাকলে আমার দায়িত্ব অনেক কম থাকত। কাল রাতে উনি চলে যাওয়াতে আমার দায়িত্ব বেড়ে গেছে

অনেক। অমন কাঁচা কাজ আমার দ্বারা হবে না। তুই যদি স্বাভাবিক থাকতিস তাহলেও অন্য কথা ছিল। তুই তো এখন ক্ষ্যাপা কুকুর। কামড়াবি না আঁচড়াবি ওকে একা পেলে তা ঈশ্বরই জানেন!

আকাতরু আহত হয়ে চুপ করে গেল।

একটু পরে বলল, অরে পিপিং-এ লইয়া যাবি না?

যাব। কাল সকালে।

হুঁ।

পিপিং-এ গিয়ে কীই বা দেখবে।

ক্যান? ওয়াঞ্চু নদী কেমন কইর‍্যা ভুটানের দুই পাহাড়ের চিপা থিক্যা বারাইয়া হঠাৎ ছড়াইয়া গেছে সমতলে তা কী দেখার নয় না কী? তর চক্ষু কখনও আছিল যে তুই দেখতে পাইবি। হঃ।

তাও শীতকাল হলে হত। ভুটান থেকে কমলালেবু এসে পিপিং-এর হাটে কমলালেবু পাহাড় জমত তখন। এই ন্যাড়া পিপিং দেখে কী হবে?

স্যা তর বোঝনের কাম নাই। যার চক্ষু আছে স্যা ন্যাড়া মাথাতেও চুল দেইখ্যা লয়। অ্যারে কয় ইমাজিনেশান। বুঝলি কিনা মাস্টের। ইম্যাজিনেশান! তুই ইসবের কী বোঝস?

৯

চা খাওয়ার পর ওরা তিনজনে বেরিয়ে পড়ল।

গাড়ি নেবেন না?

তটিনী বলল।

নিতে পারেন। ড্রাইভার তো বসেই আছে। কিন্তু হেঁটে গেলে পথটাকে অনেক ভালো করে দেখতে পেতেন। তাছাড়া, আকার মতন গাইড তো আর রোজ রোজ পাবেন না। সে তো এখানে প্রতিটি গাছ, ফুল, লতা, পাতা সবই চেনে। চিনতে চিনতে পথ চলতে পারবেন।

হাতি বা বাঘ যদি বেরিয়ে পড়ে!

বাঘ বেরোবে না। এখানের বাঘেরা সব অসূর্যম্পশ্যা। যদিও নাম "টাইগার প্রজেক্ট", কেউই এ অঞ্চলে বাঘ দেখতে পান না। বাঘেরা শহুরে কবি-সাহিত্যিক-গায়ক-বাদকদের মতন 'এগবিশিনাস্টি' প্রাণী নয়। অন্তর্মুখিনতা শব্দটার মানে যে কি তা বাঘদের দেখে শিখতে হয়। "আমাকে দেখো", "আমাকে দেখো" এই সস্তা শ্লোগান নেই তাদের। তবে বাঘ যে আছে, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। আর হাতি যদি বেরোয় তবেও ভয়ের কিছু নেই। আমার বন্ধু আকাতরু নিজেই সাক্ষাৎ গণপতি। চেহারা দেখে কি আপনার ওকে হাতি নয় বলে মনে হয়। হাতি বটে, তবে মাকনা। দাঁত নেই।

তারপর একটু চুপ করে থেকে অবনী বলল, আকাতরুর নিজের ধড়ে প্রাণ থাকতে আপনার বিন্দুমাত্র ক্ষতি কোনো মানুষ কী জানোয়ারই করতে যে পারবে না তা কি গত রাতে বোঝেননি?

তটিনী আকার দিকে মুখ তুলে হাসল একফালি। অমন সুন্দর বৈশাখী বিকেলে অমন ফুল-ফলন্ত বনে, অমন সুন্দর অথচ বিবাগী নদীতটে, অমন মৌনী, আকাশচুম্বী পাহাড়শ্রেণীর পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না তটিনীর। ও ভাবছিল, মানুষ বড় বেশি কথা বলে।

অবনীর মন বলল, গেল। গেল। ছেলেটার সর্বনাশের যা বাকি ছিল তা সম্পূর্ণ হল। এমন মার সে সইবে কী করে যখন অভিজ্ঞ অবনীর বুকের মধ্যেটাও তটিনীর মরা আলোর মতো সুন্দর, আশ্চর্য সেই হাসির ছোঁয়া লেগে ধড়াস ধড়াস করতে লেগেছে?

সকালে পরা শাড়ি-জামা ছেড়ে একটি চাঁপারঙা সিল্কের শাড়ি পরেছে তটিনী। লাল ব্লাউজ।

কে দেখবে, কে জানে।

মেয়েরা বোধহয় কারোকে দেখাবার জন্যে সাজগোজ যতটা করে তার চেয়ে বেশি করে, নিজেদের মধ্যে নিজেকে স্বীকৃত করার যে জন্মগত তাগিদ আছে, সেই তাগিদেই। নইলে এই পাণ্ডববর্জিত জায়গাতে ঘন ঘন পোশাক বদলাবার কী আছে! অবনী আর আকাতরু তো মানুষের মধ্যেই গণ্য নয়।

হাতে পরেছে প্লাস্টিকের লালরঙা চুড়ি অনেকগুলো করে। দু হাতেই। লাল প্লাস্টিকের দুল। কাজলও পরেছে। ওই চোখে কাজল লাগালে যে দু চোখের কণীনিকার পটভূমিতে চোখ দুটির মণিতে, আঁখিপল্লবে, উড়ে যাওয়া কালো পাখির ডানার মতন ভুরুতে অতলান্ত হয়ে ওঠে সে কথা কি তটিনী নিজে জানে! হয়তো জানে। জানে বলেই হয়তো ইচ্ছে করে বধ্যভূমিতে আকর্ষণ করে বোকা পুরুষদের।

এটা কী বাঁশ?

তটিনী বলল, আঙুল তুলে দেখিয়ে।

বলল, এর আগে কোথাওই দেখিনি তো!

"আগে কখনও" দেখেননি এমন জিনিস এই "পুরনো" পৃথিবীর আনাচে কানাচে পাবেন। মৃদুলবাবুর মতন যাঁরা বলেন যে, এই পৃথিবীটা বড়ই পুরনো হয়ে গেছে তাঁরা বোধহয় কখনোই দু চোখ মেলে এই সুন্দর পৃথিবীর দিকে একবারও তাকানইনি!

ওই বাঁশের নাম মাকলা বাঁশ।

আকা বলল।

বাঁশ অনেকরকম হয় বুঝি?

হয় না ত কী?

তটিনীর আকার কথা শুনে মজা লাগল খুব। সবসময়েই যে ধমকে ধমকে কথা বলে। যেন কোনো অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে অনুক্ষণ লড়াই করছে সে।

আর কী কী বাঁশ হয় এই সব অঞ্চলে?

মাকলা ছাড়াও হয় দাওয়া বাঁশ, লাঠি বাঁশ, তামা অথবা ছোয়া বাঁশ।

লাঠি বাঁশ দিয়ে কি লাঠি হয়?

হয় তো।

বাঃ। আমাকে জোগাড় করে দেবেন তো একটা। বেশি মোটাও নয়, বেশি সরুও নয়।

কাকে মারবেন লাঠি দিয়ে?

অবনী হেসে বলল।

কত লোক আছে মারার। চোর-ছ্যাঁচোড়ের তো অভাব নেই। তাছাড়া মাঝে মাঝে নিজেকে মারার কথাও মনে হয়। নিজের মধ্যেও তো খারাপত্ব কম নেই!

বাঃ! সুন্দর বলেছেন।

অবনী বলল।

তারপর বলল, আপনি এমন কথা বলেন তটিনী দেবী যে মনে হয় সবসময়েই যাত্রার ডায়ালগ বলছেন। তবে এ ডায়ালগ কোনো গ্রাম্য যাত্রা নয়, যেন ভীষণ সফিস্টিকেটেড কোনো অডিয়েন্সের জন্যে বিশেষভাবে পরিকল্পিত কোনো সফিস্টিকেটেড যাত্রা।

হঠাৎ আকা বলল আঙুল তুলে, ওই দ্যাখেন। লজ্জাবতী লতা।

কই? কই?

ওই যে। চান? আগে দ্যাখেন নাই কুখনো?

নাঃ।

ওইগুলির ইংরাজি নাম হইল গিয়া মিমোসা পুডিকা।

বাবাঃ। আপনার কি বটানি ছিল না কি? কলেজে?

আকা উত্তর দিল না।

একটু চুপ করে থেকে বলল, আমি ল্যাখ্যাপড়া তেমন শিখি নাই। মাঝে মাঝে মনে হয়, না শিখ্যা দুষ করি নাই কুনো। শিখলে হয়তো মৃদুলবাবু হইয়া যাইতাম।

তটিনী চুপ করে থাকল।

অবনী বলল, থাক, ওই অপ্রিয় প্রসঙ্গ থাক।

মানুষটা কোথায় চলে গেল বলুন তো? ওই চানুবাবুরা তাকে মেরেটেরে ফেলবে না তো। হয়তো শুকনো নদীর বেড-এ কোথাও ডেডবডি ফেলে রাখল।

তারপরই বলল, আচ্ছা, বৈশাখের একেবারে গোড়াতেই এখানের সব নদীর এমন শুকনো অবস্থা কেন? অন্য সব জায়গাতে তো বৈশাখের শেষে অথবা জ্যৈষ্ঠ মাসেই নদী শুকোয় দেখেছি।

তারপরে একটু থেমে বলল, অবশ্য আমি আর কত জায়গাতেই বা গেছি!

অবনী বলল, ঠিকই বলেছেন। কিন্তু এসব তো ভাববার অঞ্চল।

ভাববার মানে?

এইসব অঞ্চলের এই বিশেষত্ব। হিমালয়ের পাদদেশে দুরকমের জঙ্গল দেখা যায়। ভাববার আব তেরাই। ভাববার জঙ্গলের বিশেষত্ব হচ্ছে এই অঞ্চলের নদীগুলো পাহাড় থেকে সমতলে নেমে কিছুদূর যাবার পরই ডুবসাঁতার দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

আকা বলল মানে অন্তঃসলিলা হইয়া যায় আর কী!

অবনী বলল, সেই কারণেই এখানকার সব গাছগাছালির শিকড় মাটির নিচে অনেকদূর অবধি নেমে যায় জলের সন্ধানে। এই শিকড়গুলোর নাম ট্যাপ রুটস।

নদীগুলো কি আর মাথা তোলে না?

তোলে বইকি। বেশ কিছুদূর ডুবসাঁতারে গিয়ে মাথা তোলে। ওই কারণেই ভাববার অঞ্চলে নানা গাছগাছালি দেখা যায়, যা অন্যান্য অঞ্চলে দেখা যায় না।

একবার সুন্দরবনে গেছিলাম। সেখানে দেখেছিলাম গাছেদের শিকড়গুলো সব দাঁত বের করে থাকে ভাঁটার সময়ে।

তাই তো। সেই শিকড়ের নাম এরিয়্যাল রুটস। তারা দিনের মধ্যে দুবার মাথা উঁচিয়ে বারো ঘণ্টা না থাকতে পারলে তো পচেই যেত।

অবনী বলল।

সত্যি! প্রকৃতির মধ্যে কত যে রহস্য। আমার জঙ্গলে আসতে ভারী ভালো লাগে। ভালো লাগে বলেই তো আলিপুরদুয়ারে যাত্রা শেষ হতেই আপনাদের জ্বালিয়ে দিয়ে এখানে এলাম।

আকাতরু বলল, আমরা দাহ্য পদার্থ না। আমরা নিজেরা যদি নিজেদের ইচ্ছাতে না জ্বলি তবে অন্যার সাধ্য কী আমাগো জ্বালায়! কী বল অবনী?

ঠিক।

অবনী বলল।

ওরা পাটকিলেরঙা ধুলোর পথ বেয়ে হাঁটতে হাঁটতে নদীর কাছে পৌঁছে গেল। বাঁদিকে পথ চলে গেছে পিপিং-এ।

নদী এখানে অনেকটাই চওড়া। পথের দিকে বিস্তীর্ণ চর। তার উপরে নুড়ি বিছানো। পথের ধুলোতে ট্রাকের চাকার দাগ দেখল। তটিনী বলল, বাঃ কী সুন্দর! কিন্তু ট্রাক এখানে কী করতে আসে?

কী করতে আর? নুড়ি-পাথর বয়ে নিয়ে যায়।

ঈসস্‌। নদীর বুক যে ফাঁকা হয়ে যাবে।

তটিনী চিন্তাগ্রস্ত হয়ে বলল।

নদীর বুক নারীর বুক নয়। অত সহজে তা শূন্য হয় না। যা হারায় নদী, তা পরের বছরই পুরিয়ে নেয়। রবীন্দ্রনাথের সেই গানটার মতন।

কী গান?

তটিনী শুধোল।

"আমারে তুমি অশেষ করেছ এমনি লীলা তব
ফুরায়ে দিয়ে আবার ভরেছ জীবন নব নব।"

অবনী বলল।

বাঃ।

তটিনী স্বগতোক্তি করল।

এমন সময়ে হঠাৎই কী মনে পড়াতে অবনী বলল, আমার একবার বাংলোতে ফিরে যেতে হবে।

ক্যান?

আকাতরু শুধোল।

রাতে কী রান্না হবে তাই বলে আসতে ভুলে গেছি মানবাহাদুরকে। তাছাড়া আগামীকাল একটা পাঁঠা কিনতে বলেছিলাম। সে জন্যে আজই টাকা দিয়ে কারোকে পাঠাতে হবে ময়নাগুড়িতে সুভাষদার কাছে। রেঞ্জার সাহেবের জিপ আসবে কী যেন কাজে একটু পরেই। ড্রাইভারের হাতে টাকাটা পাঠাতে হবে। নইলে সকালে পাঁঠা কিনে তা কেটেকুটে ভুটানঘাটে পাঠাতে পারবেন না সুভাষদা। সাইকেল নিয়ে লোক আসবে ময়নাগুড়ি থেকে রোদ চড়া হবার আগে আগে।

কাল সকালে পাঠাবার বন্দোবস্ত করলে হত না? আমাদের ড্রাইভারও তো পৌঁছে দিয়ে আসতে পারে।

তটিনী বলল।

তা হবে না। আমরা কাল চা খেয়েই চলে যাব পিপিং।

পিপিং শুদামুদা যাইয়া কী অইব? এখন তো কমলার সময় নয়। কমলার সময়ে পিপিং-এ যখন কমলার পাহাড় লাগে তখন যাইলেই না মজা!

আকাতরু বলল।

সবসময়ই মজা। ওয়াঞ্চু নদী হ্যাঙ্গিং ব্রিজ-এর নিচ দিয়ে বয়ে এসে যখন সমতলে ছড়িয়ে গেল তখনকার দৃশ্যই আলাদা।

ঋষিকেশ-এর গঙ্গার মতন?

হ্যাঁ। প্রায় সেরকমই।

বলেই বলল, না। আর সময় নষ্ট করলে অন্ধকার হয়ে যাবে। অন্ধকারে এই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাওয়া সেফ হবে না। সঙ্গে টর্চ পর্যন্ত নেই একটা। কিন্তু তোরাই বা ফিরবি কী করে? তোদের সঙ্গেও তো টর্চ নেই।

আমরা নদীর বুকে বুকে ফিরব ত, জলের উপর আলো থাকে অনেকক্ষণ। তর যদি যাইতেই হয় ত আর দেরি কইর‍্যা কাম নাই। চইল্যাই যা তুই।

হ্যাঁ। তাই যাই।

অবনী বলল।

তারপর বলল, আপনাদের জন্যে চায়ের জল বসিয়ে, পেঁয়াজি বেসনে ডুবিয়ে রাখতে বলব,

যাতে গিয়ে পৌঁছলেই গরম গরম পেঁয়াজির সঙ্গে চা খেতে পারেন। আমি চলি। তোরা সাবধানে আসিস আকা এই সময় নদীতে সব জানোয়ার জল খেতে যাবে। নজর রেখে চলিস। বাংলোর কাছে অনেকখানি জায়গাতে পৌঁছতে পৌঁছতে তো সন্ধে হয়ে যাবে। নাঃ। আমরা বড্ড দেরি করে বেরোলাম বাংলো থেকে। কী করবি? আমার সঙ্গেই ফিরে যাবি?

আকাতরুর মুখটি যেন শুকিয়ে গেল।

তটিনী বলল, এমন এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হতে চাই না আমি। ভুটান পাহাড়ের পায়ের কাছ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর পাশে পাশে এই আশ্চর্য সুন্দর নুড়িময় নদীরেখা ধরে হেঁটে যাওয়ার সুযোগ কি জীবনে আর আসবে! আপনি যান অবনীবাবু। এমন জায়গাতে এসে এমন অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হতে চাই না আমি।

বেশ। তবে আমি যাই।

বলে, অবনী বড় বড় পা ফেলে যে পথে এসেছিল সেই পথেই ফিরে গেল।

অবনী ঘন বনের মধ্যের পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যেতেই আকা বলল, আসেন। আমরা আউগ্যাইয়া যাই।

চলুন।

তটিনী বলল, স্বপ্নাদিষ্টর মতন।

পায়ে পায়ে ওরা দুজনে বালি পেরিয়ে নদীর নুড়িময় বুকে এসে দাঁড়াল। রায়ডাক নদীটা একটু এগিয়েই সুন্দর একটা বাঁক নিয়ে মিলিয়ে গেছে বনের মধ্যে। পিপিং-এর দিকে গেছে নদী। ওরা আরও কিছুটা গিয়ে জলের পাশে দাঁড়াল। তারপরই সেই সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে গিয়ে বোবা হয়ে গেল তটিনী। ঠিক এইরকম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যর সামনে এর আগে কখনোই দাঁড়ায়নি সে।

বেলা পড়ে এসেছে। হালকা কমলারঙা আলোয় হাসছে যেন সাদা নুড়িময় তটভূমি, দ্রুতবেগে ধাবমানা নদী, পেছনের গভীর জঙ্গলাবৃত উঁচু পাহাড়শ্রেণী, ভুটান হিমালয়ের। আর ওদের পেছনেও গভীর জঙ্গল, হরজাই গাছের। গভীর বললেও সব বলা হয় না। বলতে হয় নিশ্ছিদ্র। কোথাও কোনো শব্দ নেই, শুধু জলের শব্দ আর জলের উপরে হাওয়ার শব্দ ছাড়া। পিপিং-এর দিক থেকে হাওয়াতে সাদা সাদা কী যেন উড়ে আসছে আলতো হয়ে। তারপর নদীর জলে এসে পড়ছে। তারপর নদী তাদের ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দ্রুতবেগে। নদীতে, ভাঁটিতে দু-তিনটি ছোট্ট প্রপাত এই এক কোমর বা এক মানুষ মতন হবে। তাতেই প্রচণ্ড শব্দ উঠছে। কাছে গেলে, ভালো করে দেখা যাবে। শব্দও নিশ্চয়ই আরও অনেক জোর হবে।

মন্ত্রমুগ্ধের মতন দাঁড়িয়ে রইল তটিনী সেই ভুটান-কন্যা ত্রস্ত তটিনীর দিকে চেয়ে। তার নিজের শরীরে মনেও এমন আগলখোলা বিবসনা হয়ে দৌড়ে যাবার এক তাগিদ অনুভব করল যেন ও। তার পাশেই দাঁড়িয়ে শালপ্রাংশু এক আদিম পুরুষ। ভান-ভণ্ডামিহীন, তথাকথিত শিক্ষাহীন, খাঁটি, ভণ্ডামিহীন একজন মানুষ। "আদম"-এর মতন আদিম। সেই মানুষটা তাকে ভালোবাসে। খুবই ভালোবাসে। জানে তটিনী। তার আদম-এর পাশে দাঁড়িয়ে তারও "ঈভ" হয়ে যেতে ইচ্ছে করছিল। আদম আর ঈভ-এর মতন নগ্ন হয়ে এই সমুখের বয়ে যাওয়া নৃত্যরতা আদিম তটিনীর মতন বিরাট এবং পাহাড়ের মতন সকল, মহীরুহর মতন নীরব আকাতরুকে সমর্পণ করে দেয় নিজেকে। সে নিজে প্রকৃতি বলেই পুরুষের মধ্যে, যথার্থ পুরুষের মধ্যে লীন হয়ে যেতে, এই পরম লগ্নে, এই গোধূলি লগনে ভারী ইচ্ছা করল ওর।

শব্দটি বোধ হয় ইচ্ছে নয়। তার চেয়েও তীব্রতর, তীব্রতম কিছু। একেই কি কাম বলে? কে জানে! ঋতুমতী হবার পর থেকে পুরুষের কাম-এর শিকার হয়েছে ও ঠিকই কিন্তু নিজের ভিতরের কাম-এর উপস্থিতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণই অনবহিত ছিল এতগুলো বছর। অন্য দশজন মেয়ের মতন সেও

শালীন, সভ্য এবং চাপা ছিল তার শরীরী অভিব্যক্তিতে। তার ভিতরে এই অনুভূতিও যে এমন তীব্রভাবে উপস্থিত ছিল তা এই মুহূর্তের আগে ও জানেনি।

আকাতরু কোনো আদিম আদিবাসী শিমুলের মতন তার পাশে দাঁড়িয়েছিল। না, বহমান রায়ডাকের দিকে চেয়ে নয়। বহমানা ভুটান-দুহিতার দিকে চেয়ে নয়, অনড় দাঁড়িয়ে থাকা, কনে-দেখা আলোর মধ্যে চাঁপারঙা শাড়ি আর লালরঙা ব্লাউজ-পরা তটিনীর দিকে, সেই আশ্চর্য অবিশ্বাস্য সুন্দর পটভূমিতে। কম-কথা-বলা আকাতরু যেন না বলে বলছিল, চলেন। জামাকাপড় সব খুইল্যা ফ্যালাইয়া আমরা দুজনে এই নদীতে চান করি। এখানে আমাগো দ্যাখনের কেউই নাই। আকাশ আর বাতাস আর পাহাড় আর জঙ্গল আর নদী ছাড়া আমাদের দেখার মতন কোনো নোংরা চোখই নাই। আইস্যেন! আহস্যেন!

তটিনীও চুপ করেই ছিল। যেমন আকাতরুও। কিন্তু মুখে চুপ করে থাকলে কী হয়! প্রত্যেক মানুষই সারা জীবনে মুখ দিয়ে আর কটি কথা বলে! যত কথা, তার অধিকাংশই তো বলে চোখ দিয়ে নয়তো মনে মনে। এই সরল সত্যটি বোঝেন কজনে?

অনেকক্ষণ পরে তটিনী বলল, এগুলো কী?

কোন গুলান?

ওই যে উড়ে আসছে হাওয়ায় ভেসে, সাদা প্রজাপতির মতন? জলে গিয়ে পড়ে ভেসে যাচ্ছে। ওগুলো কি প্রজাপতি?

না। তবে ওইরকমই। ওগুলান শিমুল তুলা। বীজ ফাইট্যা বাহির হইয়াই হাওয়ায় ভাইস্যা আসতেছে।

বাঃ।

বলে উঠল তটিনী।

শিমুল তুলোর লেপ তোষক বালিশ সে ব্যবহার করেছে কিন্তু কখনও বীজ-ফাটা তুলো দেখেনি। কী সুন্দর! ওর ইচ্ছে করল ও নিজের ভিতরের বীজ থেকে ফুটে, ফেটে বেরিয়ে এমন হাওয়াতে ভেসে ভেসে কোনো দ্রুতধাবমনা নদীতে আছড়ে পড়ে ভেসে যায়, নদী যেদিকে নিয়ে যায় সেই দিকে।

ইচ্ছে করল। ইচ্ছেই। জীবনে কত কীই তো ইচ্ছে করল এ পর্যন্ত কিন্তু কটি ইচ্ছেই বা পূরিত হল? হবে? পরক্ষণেই ভাবল, ওর একারই এমন দুঃখ নয়, হয়তো সব মানুষেরই এমনই মনে হয়। এক মানুষের বুকের কষ্ট অন্য মানুষে বোঝে কই? কজন বোঝে?

আকাতরুর চোখের দিকে তাকিয়ে তটিনী বুঝতে পারল ওর বুকের মধ্যে কী হচ্ছে এখন, কী বলতে চাইছে ও তটিনীকে। কিন্তু ও তো কথার কারিগর নয়। কথা দিয়ে যে চতুরেরা কথার মালা গাঁথে, আকাতরু তো সেই মৃদুলদের মতন কথাসার মানুষ নয়। সে যে খাঁটি। সে যে সরল। তার দুঃখের কথা সে নিজমুখে প্রকাশ করতে পারবে না কোনোদিনই। কিন্তু তটিনী বুঝেছে তার কথা।

কিন্তু বুঝলে কী হবে? যা কিছুই জীবনে চাওয়া যায় তাই কি পাওয়া যায়? যা চাওয়া যায় তার কতটুকু পাওয়া যায়? ওরা গুহাবাসী মানুষ হলে, ভাল্লুক-ভাল্লুকী হলে আকাতরু যা চায় তা দিয়ে এই পাহাড়েবই কোনো গুহাতে বা প্রস্তরাশ্রয়ে আদিম অনাবৃত মানুষের মতন বাকি জীবন কাটিয়ে দিতে পারত। কিন্তু অনাবৃত মানুষ তার শরীরকে পরতে পরতে অন্তর্বাস-এ আর নানা পোশাকে আবৃত করার সঙ্গে সঙ্গে তার আগলমুক্ত মনকেও যে আগল-তোলা ঘরে ঢুকিয়েছে। তার শরীরের পোশাকের ভারের চেয়ে তার মনের ভূষণের ভার কিছু কম নয়। আধুনিক মানুষ বা মানুষী যেমন এই উন্মুক্ত জায়গাতে সহজে তার শরীরকে অনাবৃত করতে পারে না, তেমনই পারে না তার মনকে নিবাবরণ করতে কোথাওই। সভ্যতা, এই লক্ষ লক্ষ বছরের অভ্যেস তাকে শরীরে মনে বড়ই ভারী করে তুলেছে, যাত্রাদলের নায়ক-নায়িকাদের মতন অনেক রাংতা আর জরি আর গর্জন তেল-এর

ভারে সে ন্যুব্জ হয়ে গেছে শরীরে মনে। আলোয় ফেরা, সারল্যে ফেরা তার পক্ষে ভারী কঠিন। আকাকে তার এই জন্যে এত ভালো লেগেছে। সে এই আধুনিক মানসিকতার মানুষদের থেকে এখনও বহু দূরে আছে। আকাশ, মাটি, নদী, পাহাড়ের খুবই কাছাকাছি। যত কাছাকাছি বহু শত মাইল পেছনে হেঁটেও তটিনী পৌঁছতে পারবে না।

আকাতরু হঠাৎ তটিনীর স্বপ্নভঙ্গ করে তার নিথর ভাবনার জাল ছিঁড়ে দিয়ে বলল, চলেন। আউগ্যাই গিয়া। অন্ধকার হইলে ত অনেকই বিপদ।

তটিনী অস্ফুটে বলল, হুঁ।

মনে মনে বলল, এখনই বা বিপদ কম কী? মানুষের নিজের কাছ থেকে যত বিপদ, তত বিপদ কোনোদিনও অন্যের কাছ থেকে আশঙ্কার ছিল না।

এটা কী?

একটু এগিয়েই তটিনী বলল বালির দিকে তাকিয়ে। আকাতরু ঝুঁকে পড়ে দেখল এক সেকেন্ড। তারপর বলল, চলেন। ইটা কিছু না। বাঘ জল খাইয়া ফিইর‍্যা গেছে জঙ্গলে।

বাঘ! তবু কিছু না?

অবাক হল তটিনী।

বলল, কতক্ষণ আগে গেছে?

দু-তিন দিন আগের দাগ। ছাঁচ ভাইঙ্গা গেছে গিয়া।

বাঘ না বাঘিনি?

খাড়ান এক সেকেন্ড।

তারপর ভালো করে দেখে বলল, বাঘিনি। আমাগো পেছনের জঙ্গল থিক্যাই আইছিল আবার সিখানেই ফিরত গ্যাছে গিয়া। সামনের পাহাড়টা যেমন খাড়া উঠছে, কোনো জানোয়ার তেমন বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া খামোখা উটায় উঠব নামব বইল্যা মনে হয় না।

আলো ক্রমশই কমে আসছে এবং খুবই তাড়াতাড়ি। এমন সময়ে ওদের বাঁ পাশ থেকে, পাহাড়ের গা থেকে হাতির বৃংহণ ভেসে এল। চমকে উঠল ভয়ে, তটিনী।

আকাতরু বলল, ও কিছু না। জলে নামব ওরা।

একজোড়া মস্ত বড় সাদা-কালো হাঁস উড়ে আসছিল সামনে থেকে। পিপিং-এর দিকে উড়ে যাচ্ছে ওরা।

এত বড় আর এত সুন্দর কী হাঁস এগুলো। তটিনী শুধোল, চোখ দিয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত সোনালি বিধুর আলোতে ওদের মসৃণ ছন্দোবদ্ধ ডানার কাঁপন দেখা যায়, ততক্ষণ তা দেখে।

এগুলান সাধারণ হাঁস না যে। এগুলান হইল গিয়া ভারী দুইষ্প্রাপ্য হাঁস। উড-ডাক। এই হাঁস রাতের বেলা ত বটেই, দিনের বেলাতেও ইচ্ছা হইলে গাছে চইড়া বইস্যা থাকে। সচরাচর জলের পাখি জঙ্গলের মধ্যের গাছে বসে না, এক পানকৌড়ি-মানকৌড়ি ছাড়া। তাও সি সব পাখিও জলের আনাচ-কানাচেই থাকে। আপনার ভাগ্য ভালো যে, উড-ডাক-এর দর্শন পাইল্যেন।

পাখিরা অদৃশ্য হলে ওরা আবার পা বাড়াল। আর ক'পা গিয়েই আবার বালির দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল তটিনী।

বলল, এটা কীসের পায়ের ছাপ?

কোনটা? অ। ইটা? ইটা চিতাবাঘের। ওই জল খাইতে আইছিল। ওঃ। এ ব্যাটা মিনিট পনেরো আগেই ফিরছে জল খাইয়া। দ্যাখতাছেন না বালি এখনও ভিজা।

বলেই, আকাতরু নদীর বুকে হাঁটু গেড়ে বসে হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখল দাগটাকে, বোঝার জন্যে যে, কতখানি আগে গেছে সে চিতাবাঘ। এবারে ওরা সেই প্রপাত দু'টার কাছে চলে এসেছে। এত

যে আওয়াজ তা দূর থেকে বোঝা যাচ্ছিল না। হাওয়াটাও যেন সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে আরও জোর হয়েছে। অন্ধকারও হয়ে আসছে দ্রুত। ভুটানঘাটের বাংলো তো এখনও অনেক দূরে। এই নদীর প্রপাতের পাশে দাঁড়িয়ে তড়িতাহত হওয়ারই মতন প্রকৃতিহত হয়ে গেল তটিনী। এত মুগ্ধ সে কোনো কিছু দেখেই এর আগে হয়নি আর ওর জীবনে।

আকাতরু ওর চার হাত দূরে দাঁড়িয়ে ওকে কী যেন বলল। বারেবারে বলল। প্রপাতের আওয়াজ আর হাওয়ার বেগ উড়িয়ে নিল সেই কথাকে। শুনতে পেল না তটিনী।

আকাতরু আবারও বলল, এবার দৃশ্যত গলা তুলে। কিন্তু দৃশ্যতই। কানে তার কথা সেবারেও শোনা গেল না।

তটিনীর মনে হল আকাতরুর কথাগুলোও বীজ-ফাটা শিমুল তুলোরই মতন উড়ে গিয়ে নদীতে পড়ে ভেসে গেল। আর তাদের ফেরানো যাবে না।

তটিনী পা দুটি শক্ত করে নুড়ি আর বালির মধ্যে পুঁতে দিয়ে গলা তুলে চেঁচিয়ে বলল, যা বলার তা কাছে এসে বলুন।

হাওয়া ওর চুলগুলো ওর বুকের আঁচল, ওর শাড়ির পায়ের দিকে উথাল-পাথাল করছিল। ওর বুকের মধ্যেও প্রপাত ঝরছিল।

তটিনী বলল, কাছে আসুন। কাছে এসো। আরও কাছে। আমার আকাতরু, প্রাচীন, আদিম, অকৃত্রিম আকাতরু। তুমি কী চাও তা আমি জানি। বারেবারে চেয়ে নিজেকে ছোট করার দরকার নেই। তুমি আমাকে চিরদিনের করে পাবে না। পাওয়া সম্ভব নয় বলে। এই নির্জনতা, এই সৌন্দর্য যে আমার জন্যে নয়। চড়া মেক-আপ নিয়ে অনেক হাজার ওয়াটের আলো মুখে নিয়ে মঞ্চে দাঁড়িয়ে হাজার পুরুষের মনোরঞ্জনই যে আমার জীবন। সেই উচ্চরবের তীব্র আলোর জীবন যে আমার ধমনীতে মিশে গেছে আকা। সেই জীবনে তুমি সম্পূর্ণই বেমানান হবে। এই উড-ডাক হাঁসেদেরই মতন। বন্যেরা বনেই সুন্দর। তোমাকে যা দিতে পারব না তা চেয়ে নিজেকে ছোট কোরো না। যা দিতে পারি, তা দিতে কার্পণ্য করব না। নাও নাও, তুমি আমাকে নাও। এই নদীচরে এই নির্জনে, ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে। তোমরা পুরুষেরা, যা মেয়েদের সবচেয়ে দামি বলে মনে করো তাই তোমাকে দেব আজ। তোমরা সকলেই এ বাবদে সমান। কী মৃদুলবাবু, কী চানু রায় আর কী তুমি। আমাদের কাছে কীসের দাম সবচেয়ে বেশি তা তোমরা কেউই বুঝলে না কোনোদিনও। বুঝবেও না।

তারপর মনে মনে বলল, হয়তো বোঝে, বুঝবে কেউ কেউ। বুঝবে কেউ। সে যতদিন না আসে আমাকে অপেক্ষা করতেই হবে তার জন্যে আকাতরু। যা পেলে তুমি খুশি হও, তাই নাও। এই বালিশয্যায়, আকাশের তারাদের দিকে চেয়ে, নদীর গান শুনতে শুনতে তুমি আমাকে নিঃশেষে পাও যে "নিঃশেষে" তোমাদের বিশ্বাস। সেই মিথ্যে বিশ্বাসের কথা মনে করে আমি বড় বড় নিশ্বাস নেবো। নাও আকা, তুমি নাও, আমাকে চেটেপুটে খাও। এই একটি সন্ধের জন্যে, একটিবারের জন্যে আমি তোমার। কিন্তু এরপর অন্য দশজন মানুষেরই মতন একবার বিস্কুট খেতে দিয়ে লোভী-করে-তোলা নেড়ি কুত্তার মতন আমার পিছনে পিছনে ঘুরো না। তুমি অন্যরকম হয়ো আকাতরু। তুমি তুমিই। তুমি আকাতরু। মহীরুহ। তুমি ঝোপঝাড় বিচুটি হয়ো না।

আমাদের মতো লজ্জাবতীরা চিরদিনই আকাতরুদের দিকেই চেয়ে থেকে জীবন কাটিয়েছে। তাদের জীবনে পাক আর নাই পাক।

এসো, আকাতরু, এসো। আমাকে গ্রহণ করো। এই নদীতীরে, আমার এই অপবিত্র শরীরকে তুমি মন্দিরের মতো পবিত্র করে দাও। দাও, দাও তোমার অকলুষ পরশে।

পরিযায়ী

কল্যাণীয়েষু

তপনকুমার দাস-কে

ঐশিকা! ঐশিকা! ঐশিকা!

নামটা নিজের মনেই বারবার উচ্চারণ করেছিল।

ভারী আশ্চর্য নাম যা হোক। তাকে লেখা কাকির চিঠির কথা যেদিন প্রথম জানল কর্বুর তখন থেকেই একটা চাপা উত্তেজনায় ভুগছে ও। ব্যানার্জিসাহেবরা সকলে থাকবেন যদিও ঠাকুরানি পাহাড়ের উপরের গেস্ট-হাউসে, তবু সেদিন থেকেই গৈরিকা বা ঐশিকা নাম দুটিকে ব্রাহ্মণ না হয়েও যে মনে মনে গায়ত্রী অথবা পেতনি তাড়ানো মন্ত্রর মতোই কেন জপছে তা ঠিক বলতে পারবে না। কিন্তু জপছে। ঐশিকা! কী আশ্চর্য নাম রে বাবা। কোনওদিনও অমন নাম শোনেনি।

তার নিজের নামটা নিয়েও অবশ্য অনেকেই তাকে ঠাট্টা করে এসেছে সেই স্কুলের দিন থেকেই। বাঙালি সহপাঠীরা কেউ কেউ বলেছে, 'কর্পূর'। অবাঙালিরা বলেছে 'গড়বুর', অর্থাৎ 'গড়বর-এর ছোট ভাই' গোছের ব্যাপার আর কী!

আসলে এখানে বাংলা ভাষা ভালো করে জানা মানুষের বড়ই অভাব। তাই কর্বুর শব্দটার মানে যে বহুরঙা একটি ব্যাপার তা জানেই না কেউ। শিশুকাল থেকেই চরিত্রে সে নাকি 'চিত্রবিচিত্র' তাই ঠাকুর্দারই ইচ্ছেতে স্কুলে ভর্তি করানোর সময়ে বাবা তার নাম রাখেন 'কর্বুর'।

ওড়িশা-বিহারের সীমান্তবর্তী এই লোহা আর ম্যাঙ্গানিজ আকরের নীল-লাল নদী বওয়া এলাকাতে শুদ্ধ বাংলার চর্চা কম মানুষেই করেন। শুদ্ধ বাংলার চর্চা অবশ্য আজকাল কলকাতার সাহেব-হয়ে-যাওয়া ইংরেজি মাধ্যমে লেখাপড়া-করা বাঙালিরাও করেন না। 'বাঙালিয়ানা' বলতে এখানে একমাত্র আনন্দবাজার রাখা। যদিও আনন্দবাজার নিজেই আর এখন তেমন বাঙালি নেই।

তবে ওরা প্রবাসী হলেও সেনদের 'টাটিঝারিয়া' বাংলোতে বাংলার চর্চা এখনও আছে খুবই। নানা দৈনিকপত্র ছাড়াও নানা লিটল-ম্যাগাজিনও নিয়মিত আসে।

এখন দাদু বা ঠাকুমা কেউই আর জীবিত নেই কিন্তু তাঁদের মতামত সেন-বাড়িতে এখনও সমান মান্য এবং সম্মানের।

ব্যবসাতে ইতিমধ্যেই খুবই সুনাম হয়েছে কর্বুরের। ছেলেমানুষ হওয়া সত্ত্বেও। দাদু গত হয়েছেন ছ'বছর হল। উত্তরাধিকারসূত্রে বাবা দাদুর ইজিচেয়ারটা পেয়েছেন। কর্বুর পেয়েছে দাদুর মঁ ব্লাঁ মাস্টারপিস পেনটি। হেড অফ দ্য ফ্যামিলি হিসেবে বাবা ওই ইজিচেয়ারে বসেই সকালে হেঁটে এসে তিন কাপ চা খেয়ে, প্রায় বেলা দশটা অবধি ডাঁই করা খবরের কাগজ ও পত্র-পত্রিকা পড়েন। সকালে চা আর দুটি ক্রিম-ক্র্যাকার বিস্কিট ছাড়া বাবা আর কিছুই খান না। ব্রেকফাস্টও খান না। কর্বুরের মনে হয় খবর খেয়েই বাবার পেট ভরে যায়।

কাকু, দাদুর জীবদ্দশাতেই দাদুর চোখের মণি জিপ গাড়িটাকে চেয়ে নিয়েছিল। গারাজ ভর্তি নতুন নতুন গাড়ি থাকা সত্ত্বেও আমেরিকান ডিসপোজাল থেকে কেনা, একেবারেই লজঝড়ে হয়ে যাওয়া জিপটার প্রতি দাদুর যে কী অসীম মমতা ছিল তা যাঁরা তাঁকে চিনতেন তাঁরাই জানতেন। তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিল দাদুর পার্সোনাল ড্রাইভার। সিরাজুদ্দিন। দাদুর উইলে তিনি লিখে গিয়েছেন যে সিরাজ যতদিন বাঁচবে ততদিনই সে মাইনে পাবে। কাজ করতে ইচ্ছে করলে কাজে আসবে, ইচ্ছে

না করলে বা শরীরে না কুলোলে আসবে না। জিপটা নিয়েছিলেন যখন দাদু, তখনই প্রথম ম্যাঙ্গানিজ মাইনটা নেন ধুতরাতে। জিপটা আজও যে কী করে চলে, সেটা একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। স্টিয়ারিংটা পুরো তিন-পাক ফল্‌স।

জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে খুবই ভালোবাসতেন দাদু। যতদিন শিকার আইনি ছিল, উনিশশো বাহাত্তর অবধি, ততদিন অবধি পারমিট নিয়ে শিকারও করেছেন। ওদের বড়বিলের বাড়ির বাইরের বারান্দা আর বিরাট বসবার ঘর দেখলে এখনও বাঘ, ভাল্লুক, বাইসন-এর মাউন্ট-করা মাথা, হাতির পা-এর মোড়া, নানারকম হরিণের চামড়াতে প্রায়-মিউজিয়ম বলেই মনে হয় নবাগন্তুক মানুষের কাছে।

কাকুও বাবারই মতো এঞ্জিনিয়ার। তবে মাইনিং এঞ্জিনিয়ার নন। যা কিছুই চলে না, তার সবকিছুকেই চালু রাখাটা প্রফেসানাল চ্যালেঞ্জ হিসাবেই নিয়েছে কাকু। এখন কাকু, কাকি আর তাঁদের একমাত্র সন্তান সাত বছরের কিরিকে নিয়ে জামশেদপুরের নীলডিতে থাকেন। ব্যানার্জিসাহেবই হচ্ছেন কাকুর বস্‌। যদিও কর্বুরদের পরিবারে তৈলমর্দনটা উচ্চশ্রেণির আর্ট হিসেবে পরিবারের কোনও সদস্যই গ্রহণ করেননি, তবু খাতিরদারী তো একটু করতে হয়ই, যখন ওঁরা আসছেনই।

কাকুর একটা সাদা-রঙা ফিয়াট সিয়েনা আছে। জিপটা কাকু শুধু এখানে এলেই ব্যবহার করে। নইলে, বিশ্রামেই থাকে অন্যসময়ে। তবে এবারে যেহেতু তাঁর বড় সাহেব আসছেন, কর্বুরকে চিঠিতে জানিয়েছেন কাকু, জিপটাকে পঞ্চমীর দিনের মধ্যে 'চলেবল' কন্ডিশনে আনতে। যদিও বড়বিলে বড়জামদার বার্ড কোম্পানি ও মিত্র এস. কে. কোম্পানির নতুন আর্মাডা ও মারুতি জিপসি থাকবে বড়সাহেবের চড়ার জন্যে, তবুও তাঁর জঙ্গল-পাগল মেয়েরা সারাণ্ডাতে যখন যাবে তখন ওই হুডখোলা, সামনের কাচ বনেটের উপরে শুইয়ে দেয়া পুরুষালি জিপ-এ চড়ে 'রিয়্যাল-রাফিং' করে তারা আনন্দ পাবে। তারা নাকি ইতিমধ্যেই কাকুর মুখে জিপ-এর গল্প শুনে রীতিমতো উত্তেজিত। কাকুর তাই ইচ্ছা যে, জিপটিতে কর্বুর যেন সন্ধিপুজো করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে। এবং তারপর জ্যান্ত দেবীরা এলে, গজ-এ বা নৌকোতে করে তাঁদের না নিয়ে গিয়ে, যেন ওই জিপে করেই নিয়ে যায় অকুস্থলে।

গৈরিকা বড়, ঐশিকা ছোট। তবে পিঠোপিঠি। ব্যানার্জিসাহেবের স্ত্রী মারা গিয়েছিলেন, যখন মেয়েদের বয়স ছিল খুবই কম। বহুদিন বিদেশে থাকা ক্ষৌণিশ ব্যানার্জি নিজে নাকি যেমন সুদর্শন তাঁর স্ত্রীও নাকি তেমনই সুন্দরী ছিলেন। মেয়েদুটিও তাই ডানাকাটা পরি হয়েছে। উনি দুই মেয়েকে, বলতে গেলে 'সিংগল্‌ প্যারেন্ট'-এর মতো মানুষ করে তুলেছেন। মেয়েদের জন্যে জীবনের অনেক সহজ সুখ, অনেক সস্তা আনন্দ বর্জন করেছেন। নিজেকে অনেকভাবে বঞ্চিত করেছেন। তবে উনি নাকি বলেন, মেয়েদের কাছাকাছি থাকতে পেরে তিনি যে আনন্দ পেয়েছেন সেই আনন্দ তাঁকে অন্য কোনও কিছুই দিতে পারত না। এতদিন বাবা হয়েও উনি এত বছর মেয়েদের মা হবার আনন্দকে জেনেছিলেন, এখন মেয়েরা দূরে চলে যাবে বলে মেয়েদের 'বিদাইয়ার' কষ্টটাও যেন মায়েরই মতো বুঝতে আরম্ভ করেছেন।

'কিরি' নামটি কাকুই দিয়েছে। দাদু দেননি। 'হো' ভাষাতে 'কিরি' মানে পোকা। 'কিরিবুরু' মানে পোকাদের জঙ্গল। যেমন 'মেঘাতিবুরু' মানে জমাট বাঁধা মেঘেদের মতো জঙ্গল। তা যাই হোক, কাকু, বুরু থেকে কিরি কেটে নিয়ে ছেলের নাম দিয়েছে কিরি।

ভদ্রলোকের মতো একটা নাম তো দিতে পারত ছোটকা। কোথায় কিশা আর কর্বুর আর কোথায় কিরি। 'ওর চেয়ে হারাকিরি দিলেই তো হত।'

দাদু বলেছিলেন।

দাদু তখন প্রচণ্ডরকম বেঁচে। মৃত্যুর আগের মুহূর্ত অবধিও দাদু প্রচণ্ডরকম জীবিত ছিলেন।

কাকু দুঃখ পেয়েছিল ছেলের নাম সম্বন্ধে দাদুর প্রতিক্রিয়ার কথা শুনে। কিন্তু মুখে কিছু বলেনি।

কর্বুরদের পরিবার দৃঢ়বদ্ধ, ঘন-সন্নিবিষ্ট, মেঘাতিবুরুরই মতো। তথাকথিত আধুনিকতার কোনওরকম বারফাট্টাই তাদের নিরন্ধ্র পারিবারিক বেষ্টনীকে টলাতে পারবে না মনে হয় আরও অনেকদিন। এখন পরের প্রজন্মের বউ-জামাইরা এসে যদি এতদিনের ঐতিহ্যকে নষ্ট করে দেয় তো সে অন্য কথা। সেইজন্যেই জামাই ও বউ নির্বাচনে এই পরিবার অত্যন্ত সাবধানি।

দিদি কিশার বিয়েতে সকলেই খুব খুশি। অত্যন্ত শিক্ষিত, উদার, বনেদি অথচ সর্বার্থে আধুনিক পরিবারেই বিয়েও হয়েছে কিশার। জামাই বিলাবল এবং তাদের পরিবারের প্রত্যেককেই এ-পরিবারের সকলেরই খুব পছন্দ।

২

প্রতি বছরই পুজোর পরে একটি নাটক মঞ্চস্থ করেন বড়বিল-বড়জামদার বাঙালিরা মিলে। এবারে কথা ছিল 'মহড়া' নাটকটি মঞ্চস্থ করবেন। নাটক হিসেবে যদিও সেটি লেখা নয়। ওই নামের একটি উপন্যাসেরই নাট্যরূপ দিয়ে মঞ্চস্থ করছেন ওঁরা। তবে মূল উপন্যাসের মধ্যেই নাটকটি প্রায় নাটকের ফর্মেই আছে। উপন্যাসে এমন আছে যে, 'মাণ্ডুর রূপমতী' নাটকটি মঞ্চস্থ করা গেল না, কারণ, যে ছেলেটির নায়কের ভূমিকাতে অভিনয় করার কথা, তার বাবা নাটক শুরু হওয়ার আধঘণ্টা আগে হার্ট-অ্যাটাকে মারা গেলেন।

ঔপন্যাসিক আসলে ওই নাটকের মাধ্যমে বলতে চেয়েছিলেন যে, আমাদের প্রত্যেকের জীবনই অনেকগুলি মহড়ারই সমষ্টিমাত্র। আসলে আমাদের জীবনের খুব কম মহড়াই অবশেষে সফল হয়ে, নাটকরূপে মঞ্চস্থ হতে পারে। এই আমাদের জীবনের ট্র্যাজেডি। 'মহড়া' উপন্যাসটি কলকাতা থেকে কিনে এনেছিল নাট্যামোদী একজন দে'জ পাবলিশিং বা সাহিত্যম্-এর বই। সঠিক মনে নেই। ওদের প্রত্যেককেই জটাদা একটি করে জেরক্স-করা স্ক্রিপ্ট ধরিয়ে দিয়েছেন।

সকলের পীড়াপীড়িতে এবারে কর্বুর রাজি হয়ে গিয়েছিল নায়কের ভূমিকাতে অভিনয় করতে। কারণ, উপন্যাসটির বক্তব্য ও উপস্থাপনা তার মনে খুবই ধরেছিল। তক্ষ রায়-এর ভূমিকাতে স্থানীয়দের মধ্যে বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী এবং অভিনেতা জটা রায় অভিনয় করবেন ঠিক হয়েছে। উনি নাটকটি পরিচালনাও করবেন এবারে। অন্যান্যবারের সামাজিক সব নাটক পচাদা পরিচালনা করেন।

যেদিন মহড়া প্রথম শুরু হল ঠিক সেদিনই কাকির চিঠি এসেছিল ঐশিকা অ্যান্ড কোম্পানির আগমন-বার্তা জানিয়ে। কর্বুর বলেছিল জটা রায়কে, জটাদা, আমাকে বাদ দিতে হবে। তাতে পুজো কমিটির প্রত্যেকেই বেঁকে বসেছিল। আলাদা আলাদা ডেপুটেশন গিয়েছিল বাবার এবং মায়ের কাছে পুরুষ এবং মহিলাদের। তারপর তাঁদেরই সকলের সনির্বন্ধ অনুরোধে বাবার ব্যক্তিগত চিঠি নিয়ে ফট্‌কা গেল বড়বিল থেকে ভোরের বাসে টাটাতে। কাকুর উত্তরও নিয়ে এল সন্ধের বাসে। দাবি মঞ্জুর হয়েছে। কাকু নাকি বলেছে যে, ব্যানার্জি সাহেব ও তার মেয়েরা নাকি খুব খুশিই হয়েছেন। সারান্ডার পাঁচদিন থেকে একটি দিন কমিয়ে সন্ধেবেলা পুজোমণ্ডপে 'মহড়া' নাটকটি দেখে পরদিন ভোরেই জঙ্গলে যাবেন ওঁরা কর্বুরের সঙ্গে। এইরকমই ঠিক আছে।

অভিনয় কখনও করেনি কর্বুর। কী জীবনে, কী মঞ্চে। অভিনয় করা যে এত কঠিন সে সম্বন্ধে কোনও ধারণাও ছিল না। নবাব বাজবাহাদুরের চরিত্রে অভিনয় করছে সে। আর রূপমতীর ভূমিকাতে অভিনয় করছে বড়জামদার একজন এঞ্জিনিয়ারের রূপবতী গুণবতী কন্যা শিখী।

মহড়া আরম্ভ হয়ে গেছে গতকাল থেকেই। এই মহড়ারই জন্যে বড়বিল-এই রাতে থাকতে হচ্ছে কর্বুরের। ভোর পাঁচটাতে উঠে ভোগতা মুন্ডার বানিয়ে দেওয়া এক কাপ চা খেয়ে ষাট কিমি জঙ্গলে এবড়ো-খেবড়ো পথে গাড়ি চালিয়ে খাদানে যায়। বিকেলে পৌনে চারটে নাগাদ বেরিয়ে পড়ে খাদান থেকে। বাড়ি ফিরে চানটান করে সাতটাতে যায় মহড়াতে। ফিরতে ফিরতে এগারোটা সাড়ে এগারোটা। মা, না খেয়ে বসে থাকেন। ও মহড়া থেকে ফিরলে মা-ছেলেতে গল্প করতে করতে বসে একসঙ্গে খান।

মাঝে মাঝে ব্যানার্জি সাহেবের মেয়ে গৈরিকা-ঐশিকার কথা ওঠান মা। মাঝে মাঝেই বড়জামদার শিখীর কথাও ওঠে। শিখীর বাবা নিজে গাড়ি করে শিখীকে নিয়ে যেতে আসেন। আসবার সময়ে বড়জামদার গোয়েল সাহেবের ছেলের গাড়ি করেই আসে শিখী। রাজ গোয়েলও অভিনয় করছে সেনাপতি একরাম খাঁ-এর ভূমিকাতে। গোয়েলসাহেব সেইল-এর বড় ঠিকাদার। চার পুরুষ বিহারে থেকে থেকে এবং বাঙালি অফিসারদের খিদমদগারি করে করে ওরা "ব্যাংলো বিহারি" হয়ে গেছে। হিন্দি বলে বিহারিদের মতন। বাংলাও বলে বাঙালিদেরই মতন।

কর্বুর ঠিক বুঝতে পারে না যে ওর মা, ইদানীং অদেখা ঐশিকা আর শিখীর কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আনেন কেন। বুঝতে যে একেবারেই পারে না তা নয়। একটু একটু পারে। কিন্তু ভাব দেখায় যে, পারে না। আজকাল সে তো অভিনয় করতে একটু একটু শিখছেই। তবে ওর মা একটা কথা ছেলেবেলাতে প্রায়ই বলতেন ওকে, উলটোপালটা কথা বললে, 'কবু, তুই আমাকে পেটে ধরেছিস না আমি তোকে পেটে ধরেছি? আমি তোকে যতখানি বুঝি, তুই কি আমাকে তার ছিটেফোঁটাও বুঝতে পারবি কোনদিনও?'

কেন জানে না, আজকাল আর বলেন না মা ওই বাক্যটি। ছেলে-মায়ের মধ্যেও ধীরে ধীরে ছেলের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু ব্যবধান গড়ে ওঠেই। ছেলের বিয়ে হলে হয়তো সেই ব্যবধান আরও বাড়ে। অনেক কিছু কর্বুর যেমন জানে, আবার অনেক কিছু জানেও না।

আজ রাতে ফিরে স্ক্রিপটা নিয়ে বসল আবার ও। নাটক করতে গিয়ে, নতুন করে বুঝতে পারছে যে, এই কম্প্যুটার-এর যুগেও স্মৃতিশক্তিকে একেবারে নস্যাৎ করাটা ঠিক নয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে স্মৃতিশক্তির খুব প্রয়োজন আছে।

নাটকটার মধ্যে বেশ গভীরতা আছে। ডায়ালগ-এর মধ্যে দিয়ে নায়ক-নায়িকা যা বলছেন একে অন্যকে, সেই কথোপকথন একটা অন্য মাত্রা পাচ্ছে। তাদের যা বক্তব্য, তা যেন শুধুমাত্র নাটকের অন্য এক চরিত্রর জন্যই নয়, যে সব দর্শকের গভীরতা আছে তাঁদের মধ্যে অনেকেই সেই সব চরিত্রের মধ্যে নিজেদেরই দেখতে পাবেন হয়তো। আইডেন্টিফায়েড হবেন।

আজ বারবারই ভুল করছিল কর্বুর তার পাঠ বলতে গিয়ে। শিখী মুখ টিপে হেসেছিল একবার।

জটাদা বলেছিলেন, কর্বুর, ভুলে যেয়ো না, তুমিই আমার নায়ক। তুমি ঝোলালে পুরো নাটকটাই ঝুলে যাবে।

শিখী বলেছিল, কর্বুরদা, কো-অ্যাক্টরের উপরে অন্যের অভিনয়ের মান নির্ভর করে। তোমার অভিনয়টা যদি ভালো হয় তবে আমার অভিনয় আপসেই ভালো হবে। এবং vice versa.

জটাদা বলেছিলেন, পার্ট মুখস্থ করাটা প্রাইমারি ব্যাপার, তারপরে অভিনয়ের অন্য সবদিক। পার্টই যদি মুখস্থ না করো কর্বুর সাহেব, তবে আমরা যে ডুবে যাব।

লজ্জা পেয়েছিল খুবই কর্বুর। সেই কারণেই স্ক্রিপটা নিয়ে বসা। ও ঠিক করেছে, কাল রিহার্সালের সময়ে টেপ করে নেবে পুরোটা, তারপর খাদান-এ যেতে আসতে গাড়িতে ক্যাসেটটা বারবার বাজিয়ে ভুল-ক্রটি শুধরে নেবে। মুখস্থও করে নেবে নিজের পার্ট। ধরা-ছাড়াও ভালো করে লক্ষ করবে।

আজই কিছুটা অংশ অন্তত নিজেই পড়ে, অন্যদের পার্টসুদ্ধ টেপ করে নেবে ঠিক করল। যেখানে যেখানে ভুল হচ্ছে বারেবার। কাজটা এগিয়ে থাকবে অন্তত কিছুটা।

শ্যামলের বেগুন-ভাতে ভাই আর মানিকের চিচিঙ্গার মতো দেখতে মেয়েলি গলার দাদা প্রম্পটার। দু-দিকের উইংস-এর আড়াল থেকে দুজনে প্রম্পট করছে। একজনের গলা ফেন-ভাতের মতো ভ্যাতভ্যাতে, কিন্তু ভারী। অন্যজনের গলা আবার এমনই চিঁচিঁ করে যে রিহার্সাল যেখানে হয় সেই প্রাচীন দুর্গাবাড়ির কার্নিসে-বসা পায়রাগুলো পর্যন্ত ভয় পেয়ে ডানা ধড়ধড়িয়ে উড়ে যায়।

জটাদা সিগারেটটা দূরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলেছিলেন, বি রেডি! অল ক্যারেকটারস। প্রথম দৃশ্য তৃতীয় অঙ্ক। স্টেজ-এ নবাব বাজবাহাদুর এবং রূপমতী। লোকেশান: মাণ্ডুর দুর্গর পশ্চিমপ্রান্তের 'রূপমতী মেহাল'। রেডি? নাউ স্টার্ট।

হাতঘড়িটা, পাঞ্জাবির আস্তিনটা একবার তুলে এক ঝলক দেখে নিয়েই বলেছিলেন জটাদা।

কল্পনাতে দেখা মাণ্ডুর দুর্গের পশ্চিমপ্রান্তের রূপমতী মেহাল-এর এক সকালবেলা। যেন চোখে দেখতে পাচ্ছিল কর্বুর। নর্মদার দিকে চেয়ে-থাকা, চান-করে ওঠা সুকেশা, সুগন্ধী গায়িকা, 'রূপমতী মেহাল'-এর চাঁদোয়ার নীচে বসে আছেন।

রূপমতী বললেন—সুলতান। কিছুদিন থেকেই আপনাকে বড় ছটফট করতে দেখছি। আমার গান কি আর ভালো লাগে না আপনার?

বাজবাহাদুর—সে জন্যে নয়, সে জন্যে নয়। গানও যেদিন ভালো লাগবে না রূপমতী, বিশেষ করে তোমার গান, সেদিন বাঁচা আর মরাতে তফাত থাকবে কি কোনও?

রূপমতী—তবে? সুলতান সবসময় কোন চিন্তা আপনাকে এমন অন্যমনস্ক করে রাখে আজকাল?

এমন সময়ে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শোনা যাবে। অশ্বারোহীদের আসবার আওয়াজ। দূর থেকে। রূপমতী মেহালের দিকে।

বাজবাহাদুর ওইদিকে চেয়ে হঠাৎই কথা থামিয়ে দেবেন। রূপমতী ওই দূরাগত অশ্বারোহীদের দিকে যেন চেয়ে থাকবেন কিছুক্ষণ। এখনও দূরে আছে অনেকেই। সুলতানের ডাকহরকরা, ভালো করে লক্ষ করে, যেন তাদের ধ্বজা দেখেই বুঝলেন। বুঝেই, অন্যমনস্ক হয়ে যাবেন রূপমতী।

রূপমতী-মেহালের নীচে অমলতাস গাছেরা ফুলের স্তবকে স্তবকে ভরে গেছে। সামান্য প্রভাতি হাওয়ায় একটু একটু দুলছে সেই স্তবকগুলি।

রূপমতী—কি সুন্দর। না? জাঁহাপনা?

বাজবাহাদুর—কী?

রূপমতী—এই ফুলগুলি। এই সকাল, নিমারের আদিগন্ত এই উপত্যকা, দূরের নর্মদাদেবী, পুণ্যতোয়া, উত্তরবাহিনী। অথচ আপনার সময়ই নেই এসব দেখবার। এমনকি গানও শোনবার।

একজন অশ্বারোহী দুড়দাড় করে সরু সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে এল। অন্যরা দাঁড়িয়ে রইল। কুর্নিশ করল সবাই বাজবাহাদুরকে। হ্রেষারব এবং অস্থির ঘোড়াদের পা ঠোকার আওয়াজে মন্থর প্রভাতি হাওয়া অবিন্যস্ত হয়ে উঠল। অশ্বারোহী এসে পাকানো এবং হলুদ রেশমি সুতোয় বাঁধা বার্তা তুলে দিল সুলতানের হাতে, মাথা ঝুঁকিয়ে। বলল—

হোশাঙ্গাবাদ থেকে সেনাপতি লড্ডন খাঁ পাঠিয়েছেন।

বাজবাহাদুর বার্তাটি খুলে পড়লেন। ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হল তাঁর। বললেন, সেনাপতি একরাম খাঁকে দেখা করতে বলো আমার সঙ্গে বড়া মসজিদে। এক্ষুনি। আমি যাচ্ছি।

(অশ্বারোহী চলে গেল আবারও দুড়দাড় করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে।)

রূপমতী—কী খবর সুলতান? খারাপ কিছু?

বাজবাহাদুর—খবর খুবই খারাপ। দিল্লি থেকে মুঘল সম্রাট আকবর, সেনাপতি আধম্ খাঁকে পাঠিয়েছেন মাঁলোয়া দখল করার জন্যে। তাঁর বিরাট বাহিনী এগিয়ে আসছে ক্রমশই। লড্ডন খাঁ খবর পাঠিয়েছেন হোশাঙ্গাবাদ থেকে যে সারাংগপুরে আধম্ খাঁকে রুখতে না পারলে মাণ্ডু বাঁচানো যাবে না কোনওক্রমেই। তাকে তো 'ধার' পেরিয়ে মাণ্ডুতে উঠে আসতে দেওয়া যায় না।

একটু চুপ করে থেকে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, হেস্তনেস্ত যা হবার তা ধার-এর সমতলেই হোক। আমার মাণ্ডু আর আমার রূপমতীর গায়ে যেন আঁচড়টিও না লাগে।

রূপমতী—সর্বনাশ। বড়ই খারাপ খবর এ সুলতান। আধম্ খাঁর বাহিনী যে বিরাট। সম্রাট আকবর তো ছেলেখেলা করার জন্যে সেনাবাহিনী পাঠান না! আপনি যদি হেরে যান তাহলে কী হবে আমার?

বাজবাহাদুর—হারার কথা বোলো না আমাকে রূপমতী। বোলো না, হারার কথা। বোলো না, হারার কথা।

যা বলতে চাইছিলাম তা থেকে অনেকই সরে এলাম আমি রূপমতী। যেমন, জীবনে যা করতে চেয়েছিলাম, তা থেকেও। সময় হাতে বেশি নেই। আমাকে বলতে দাও। আমি চেয়েছিলাম এমনই এক সুলতান হতে, এই সুন্দর মাণ্ডুর ব্যতিক্রমী সুলতান, যিনি কোনও রাজ্য জয় করবেন না কোনও অন্য রাজার। জয় করবেন সংগীত জগতের সমস্ত রাজ্য, জাগির জানবেন সেই আশ্চর্য জগতের ঝংকৃত অলিগলিকে, আবিষ্কার করবেন নারী ও পুরুষের প্রেমকে নতুনতর, শান্ত স্নিগ্ধ আলোয়। কী বলো তুমি? এও কি এক ধরনের রাজত্ব নয়? সাম্রাজ্য নয়? এই সাম্রাজ্যের গভীরে যাওয়ার চেষ্টাও কি রাজকার্য নয়? রাজকার্য মানে কি শুধুই মৃত্যুদণ্ড? কারাগার? যুদ্ধ? রক্তপাত? নারী ও শিশুর ক্রন্দন?

রূপমতী—আপনি কি যুদ্ধে আপনার নিজের সহোদরকে হত্যা করেননি নবাব?

বাজবাহাদুর—আঃ। যুদ্ধ আমি করেছিলাম, সে তো প্রাথমিক যুদ্ধই, ক্ষমতাতে আসীন হবারই যুদ্ধ সে। যা নইলে, আমি সুলতান হতাম না মাঁলোয়ার, মাণ্ডুর।

রূপমতী—(হেসে) সুলতানদের জীবনে "প্রাথমিক" যুদ্ধ বলে কোনও কথা নেই। যুদ্ধই তাঁদের জীবনের বড় সঙ্গী।

আজ কী সুন্দর দেখাচ্ছে সবকিছু। না? জাঁহাপনা? আপনাকেও। চারদিকের এই প্রভাতি, প্রকৃতিকে। আঃ। কত ফুল। কত পাখি চারদিকে। জৌনপুরীতে গান ধরব একটা? এই গম্ভীর রাগ এই মুহূর্তে আমার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। ধরি? সুলতান?

বাজবাহাদুর—না। আমি মসজিদে যাব। সেনাপতি একরাম্ খাঁ অপেক্ষা করছেন সেখানে আমার জন্যে। চলি আমি, রূপমতী। সন্ধেবেলায় জেহাজ-মেহালে বরং দেখা হবে। আজ গভীর রাতে মালকোষ শুনব তোমার গলায়। জানি না, আর কতদিন শুনতে পাব তোমার গান! এ পৃথিবীতে গান, প্রেম সবই সুকৃতির জিনিস, উপচে-পড়া ধন এসব। ক'জনে এর কদর জানে বলো?"

রিহার্সাল দিয়ে বাড়ি ফিরতেই মা বললেন, নে ধর, তোর কাকির চিঠিটা পড়। আজই এল। পড়ে আমাকে ফেরত দিস।

কর্বুর একটু অবাক হল। ওঁরা যে আসবেন তা তো কাকি অনেক আগেই জানিয়েছে মাকে। আবার এ চিঠি পড়ার কী দরকার।

নীলডি

জামশেদপুর

শ্রদ্ধাভাজনীয়াসু দিদি,

অনেকদিন আপনার চিঠি পাই না। বড়বিল-এর বাড়ির ফোন কি ঠিক হবে না? যে পরিমাণ খোঁড়াখুঁড়ি টেলিফোন ডিপার্টমেন্ট করে চলেছে গত দুমাস হল তাতে জায়গামতো খুঁড়লে, যেমন সুবর্ণরেখায় বা স্যেশেলস আইল্যান্ডস-এ, সাত রাজার বা সাত জলদস্যুর গুপ্তধনের সন্ধানও তারা পেতে পারত। কবুকে বলুন যে ওদের ধমক-ধামক দিক। নইলে অন্তত বক্তৃতাই দিক। আমাদের দেশে তো এখন বক্তৃতা দিয়েই জন্মনিয়ন্ত্রণ থেকে ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা পর্যন্ত হচ্ছে। আর কর্বুর বক্তৃতাতেও যদি তাড়াতাড়ি গর্তগুলো না বোজায় তবে কবুকে বলুন আজকের দিনের সব যুক্তির বড় যুক্তি, সব বাগ্মিতার বড় বাগ্মিতা, 'নোটের বান্ডিল' ছুড়ে মারতে।

কুরুবকের বড় সাহেব তাঁর দুই কন্যাকে নিয়ে যে যাবেন শুধু সে কথাই আগে জানিয়েছি আপনাকে। এবারে একটু বিস্তার করে বলি। এতদিন কিরির পরীক্ষা নিয়ে খুবই ব্যস্ত ছিলাম। বড় করে লেখার অবকাশ ছিল না। কুরুবকের বস ব্যানার্জিসাহেবের সঙ্গে আপনি ও দাদা যখন এখানে এসেছিলেন তখন আলাপিতও হয়েছেন। তিনি তাঁর দুই কন্যা গৈরিকা ও ঐশিকাকে নিয়ে পুজোর সময় সারান্ডার জঙ্গল দেখতে যাবেন। আমাদের কর্বুর বাবু তো সারান্ডার পোকা। বড়বিল-এ ওঁরা ঠাকুরানি পাহাড়ের উপরে বার্ড কোম্পানির অতিথিশালাতেই থাকবেন। আমি আর আপনার দেওর কর্বুর কথা ওঁদের এতই বলছি ও বলেছি যে, বলতে গেলে ওঁরা মিস্টার কর্বুর সেন-এর ভরসাতেই আহ্লাদ করে সারান্ডা দেখতে যাচ্ছেন। আপনারা তো ব্যানার্জিসাহেবকেই দেখেছেন শুধু মেয়েদের দেখেননি। তাই এই বিস্তার।

সেনসাহেবের মেয়েরা কেউই টাটানগরে থাকে না। গৈরিকা আহমেদাবাদের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ডিজাইনস থেকে পাশ করেছে সবে। তার বিয়েও ঠিক হয়ে গেছে। বিয়ের পর দুজনে মিলে মাস দুই পরে স্টেটস-এ চলে যাবে। ঐশিকা দিল্লির জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া ইউনির্ভাসিটি থেকে 'ম্যাসকম' করে এসেছে। একটি বিদেশি টিভি কোম্পানিতে ইন্টারভিউ দিয়েছে। শুনতে পাচ্ছি, যে চাকরিটি হয়ে যাবে। হয়ে গেলে, হয়তো দিল্লি অথবা বম্বেতে পোস্টিং হবে। তাই ব্যানার্জি সাহেব মেয়েরা চলে যাবার আগে ক'টা দিন সব কাজকর্ম ছেড়ে তাদের সঙ্গে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে চান।

আর কী লিখব। আশা করি দাদার ব্লাডসুগার আর বাড়েনি। আপনার হাঁটুর ব্যথা কি কমল?

কিরি ভালো আছে। পড়াশুনোতে একেবারেই মন নেই। কবু পড়াশোনাতে এত ভালো হওয়া সত্ত্বেও ওকে পারিবারিক স্বার্থে ব্যবসাতে ঢুকতে হল। এখন মনে হয়, ওকে, ও যা পড়তে চায়, তাই পড়তে দিয়ে কিরিকেই সেখানে ঢুকিয়ে দেওয়া ভালো ছিল। এই ব্যবসা এমন কিছু কঠিন নয়, যে কবুর মতো ব্রিলিয়ান্ট ছেলে এতে আনন্দ পাবে। তবে কিরির বড় হতে যে অনেকই দেরি।

দিদি! আপনাকে এইবারে চুপি চুপি আসল কথাটা বলি। গৈরিকার বিয়ে তো ঠিক হয়েই গেছে। আমার ও আপনার দেওরের খুবই ইচ্ছে যে ঐশিকার মতো একটি সর্বগুণসম্পন্ন মিষ্টি মেয়ে আমাদের পরিবারের বউ হয়ে আসুক। ওরা সকলে মিলে যে বড়বিল-এ যাচ্ছে তাতে আমরা খুবই উত্তেজিত। আপনি ও দাদা ওদের সকলের সঙ্গে ভালো করে মিশতে পারবেন। কবুও বেশ কদিন কাছ থেকে ঐশিকাকে দেখতে পারবে। ঐশিকা এবং তার পরিবারও আপনাদের সকলকে কাছ থেকে দেখার প্রচুর সুযোগ পাবে। কুরুবককে, উনি তো বটেই, মেয়েরাও খুবই পছন্দ করে।

আপনাকে কী বলব দিদি। পুজোর এখনও দেড়-দুমাস দেরি আছে কিন্তু এখন থেকেই আমি রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে রয়েছি। যদি আমার এই আশা পূর্ণ হয় তাহলে আনন্দ রাখার আর জায়গা থাকবে না। আমার একটুও সন্দেহ নেই যে আপনার ও দাদার ঐশিকাকে ভীষণই ভালো লাগবে।

অমন বউ এলে আমাদের পরিবারের মুখোজ্জ্বল হবে। কবুও খুব সুখী হবে। সম্ভবত।

ভালো থাকবেন। ফোনটা ঠিক হলেই আমাকে একটা ফোন করবেন। তারপর যেমন আগে করতাম, এক রাতে আমি, আরেক রাতে আপনি অবশ্যই কথা বলব। কিরিরও তার জ্যাঠা-জেঠিমার আর কবুদাদার গলা দিনান্তে একবার শুনতে না পেলে ঘুম আসে না।

একটা কথা বলে এই চিঠি শেষ করছি। চুপি চুপি বলি যে, ঐশিকাকে আপনাদের কিরিবাবুর খুবই পছন্দ। ওই প্রথম আমার মাথাতে কথাটা ঢোকায়। গত শনিবার গৈরিকার জন্মদিনে ও-ও গিয়েছিল আমাদের সঙ্গে ব্যানার্জিসাহেবের বাংলোতে। খাওয়াদাওয়া, গানবাজনার পর অনেক রাতে ফিরে শুতে যাবার আগে আমরা বসার ঘরে বসে যখন টিভিতে ডিসকভারি চ্যানেল দেখছিলাম তখন হঠাৎ ও এসে বলে গেল, 'মা! কবুদাদার সঙ্গে ঐশিকা দিদ্দির বিয়ে দিয়ে দাও না। দারুণ হবে। ভাবী হো তো ঐসী।'

সেই রাত থেকে আমরা কিরির কথাটিই ভাবছি। বারবার।

আহা! সত্যিই যদি কিরির মুখের কথাটা ফলে যায় তবে আমার আনন্দ রাখার আর জায়গা থাকবে না।

আমরা গাড়িতে মহাষষ্ঠীর দিন গিয়ে পৌঁছব।

ইতি

স্নেহধন্যা পদ্মা

রুক্মিণী সেন
টাটিঝারিয়া,
চড়ুই চড়াই
বড়বিল, ওড়িশা।

চিঠিটা বার দু-তিন পড়ল কর্বুর। ওর মনের মধ্যে কিছু উত্তেজনা, কিছু ভয়, কিছু আশা, ভালো লাগা ঝিলিক মেরে গেল। কর্বুর ভাবছিল, একা এলেই তো পারতেন। মা বা কাকি বা দিদি হলে অন্য কথা ছিল। একে অনাত্মীয়া, তার উপরে তরুণীদের ঠিক 'হ্যান্ডল' করতে জানে না কর্বুর। এয়ারপোর্টের কনভেয়ার বেল্ট-এ কার্ডবোর্ডের বাক্স আসে না? লেখা থাকে, FRAGILE! HANDLE WITH CARE'. মেয়েদের তেমনই কাচের বাসন বলেই মনে হয় কর্বুরের। ভেঙে গেলেই, হাতে-পায়ে কাচ ফুটে গিয়ে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটতে পারে।

চিঠি প্রসঙ্গে কর্বুর ভাবছিল, আজকাল ফোন, ফ্যাক্স ও ই-মেইল-এর দৌলতে পৃথিবী এখন রীতিমতো দৌলতাবাদ হয়ে গেছে। চিঠি লেখে খুব কম মানুষই। অথচ চিঠির কোনও বিকল্প সত্যিই কি কিছু আছে? বড় বড় মনীষীরা তাঁদের মন-খোলা চিঠির মধ্যে দিয়ে, তাঁদের দীর্ঘ এবং ব্যতিক্রমী ইচ্ছাপত্রর মধ্যে দিয়ে পরবর্তী সময়ের মানুষদের যতখানি দীক্ষিত ও শিক্ষিত করে গেছেন তা কি ফোন ফ্যাক্স বা ই-মেইল কোনওদিনও করতে পারবে?

'ইনফরমেশানই' সব নয়। স্মৃতিই মানুষের একমাত্র গুণ নয়। গুণ তো নয়ই বরং কর্বুরের মনে হয়, স্মৃতি এক ধরনের দোষই। স্মৃতি যার অত্যন্তই প্রখর তার কল্পনাশক্তিই নষ্ট হয়ে যায়, তার বিচার-বুদ্ধি-শ্রুতি নষ্ট হয়ে যায়, তার মনুষ্যত্বও অবশেষে বিঘ্নিত হয়। Robot মানুষের বিকল্প হতে পারে অনেক ব্যাপারে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে মানুষকে 'পূর্ণ-মানুষ' আখ্যা দিয়েছিলেন, সে-মানুষই সব মানুষেরই আদর্শ বলে গণ্য হওয়া উচিত। সেই 'পূর্ণ-মানুষ' কোনওদিনও Robot হয়ে উঠতে পারে না। পারবে না। কর্বুরের মনে হয়, মানুষ নিজের মধ্যে অহমিকা এবং অন্ধত্বর কারণে বিজ্ঞানের

দাস হয়ে ওঠাতে মনুষ্যত্বের যে ক্ষতি হচ্ছে তা পরে তারা বুঝতে পারবে। কিন্তু যখন পারবে, তখন খুবই দেরি হয়ে যাবে। মানুষ পরম মূর্খ বলেই নিজের সঙ্গেই প্রতিযোগিতাতে নেমেছে আজ। কিন্তু এসব কথা বললে অন্যে কর্বুরকে পাগল ভাববে, পাগল বলবে।

ফ্যাক্স বা ই-মেইল এবং ইন্টারনেট থাকুক, শুধুমাত্র বাণিজ্যের জন্যে, শিল্পের জন্যে, আধুনিক 'সফল' মানুষের টাকা, আরও টাকা আয়ের জন্যে, তার ব্যবসার, পেশার, শিল্পের সাম্রাজ্যের সীমা আরও বিস্তৃত করার জন্যে। কিন্তু ব্যক্তি-মানুষের সম্পর্কে চিঠি যদি আর না থাকে, আধুনিক মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষের সম্পর্ক অচিরেই ব্যবসার ও শিল্পের অংশীদার, খরিদ্দার অথবা প্রতিযোগীরই হয়ে উঠবে। স্বার্থহীন কোনও সম্পর্ক, প্রেম বা সহমর্মিতার, সমবেদনার কোনও সম্পর্ক আর বোধহয় থাকবে না এই কেজো-পৃথিবীতে। সে বড় দুর্দৈব হবে।

ঐশিকাদের ট্যুরের একটি আইটিনিরারি দিয়ে মা বলেছিলেন কর্বুরকে, সারান্ডার প্ল্যানিং ওঁরা তোর উপরেই ছেড়ে দিয়েছেন।

সারান্ডাতে ক'দিন?

তিনরাত চারদিন!

একগাদা মেয়ে-ফেয়ে নিয়ে কেউ জঙ্গলে যায়?

কেন? মেয়েরা কি মানুষ নয়? তুই এত নারীবিদ্বেষী কবে থেকে হলি?

হলাম আবার কি? ছিলামই তো চিরদিন।

তাই? বোঝা তো যায়নি।

কাকির চিঠিটা মা বারবারই পড়ছিলেন আর বলেছিলেন, সত্যি! খুব ভালো চিঠি লেখে রে পদ্মা। মনে হয়, যেন সামনে বসে কথা বলছে।

কর্বুর খাবার টেবিলে মাকে ফেরত দিল চিঠিটা!

পড়লি ভালো করে?

হুঁ।

কী বলিস?

আশ্চর্য তো তুমি। চিনি না জানি না, কে বা কারা আসছেন। তা আসছেন আসুন না। এতে বলাবলির কী আছে। সত্যি। তোমরা এমন করো না!

রুক্মিণী একটু নিষ্প্রভ হয়ে গেলেন।

৩

কর্বুর ওর নতুন সাদা ইন্ডিকাটা নিয়ে ঠাকুরানি পাহাড়ে গিয়েছিল। গেস্ট-হাউসটা পাহাড়ের উপরে। সবচেয়ে ভালো ঘর দুটোই বুক করে রেখেছিল ও আগে থেকেই। গেস্ট-হাউসের কেয়ার-টেকারের সঙ্গেও কথাবার্তা বলে এল। তিনি বললেন, 'কোম্পানির হেড অফিস থেকেও ফোন এসেছিল। ব্যানার্জি সাহেবের দেখভাল ভালো না হলে আমার চাকরিই চলে যাবে।'

আজ মহালয়া। পুজো তো এসেই গেল। আকাশে বাতাসে পুজো পুজো গন্ধ লেগেছে। শিউলি গাছের নীচে 'কমলা-বোঁটা সাদা-ফুলের অবিন্যস্ত আল্পনা পড়েছে। বড়জামদা আর বড়বিলের মাঝামাঝি অনেকখানি জায়গা নিয়ে গর্জন সেন-এর অর্থাৎ কর্বুরের দাদুর বানানো একতলা বিরাট বাংলোটির মধ্যে গাছ-গাছালি, জগিং করার অথবা হাঁটার পথ, লিলিপুল, তাতে জাপানিজ

গার্ডেন—শান্তিনিকেতনের উত্তরায়ণের লিলিপুল-এর মতো, সবই আছে। বাংলোর ভিতরে, কিন্তু অন্যপ্রান্তে একটি বড় গেস্টকটেজ আছে তাতে দুটি শোবার ঘর এবং মাঝে ডাইনিং-কাম-লিভিং রুম, সামনের পুবমুখী চওড়া বারান্দা। অ্যাটাচড বাথ। তাতে গিজার, কমোড তো আছেই এবং বিদেও আছে, মেয়েদের সুবিধার জন্যে।

কর্বুর ভাবছিল, ওঁরা এসে এইখানে থাকলে দেখাশোনা করার সুবিধে হত। কাকু নাকি বলেওছিলেন ব্যানার্জিসাহেবকে কিন্তু উনি নাকি 'গা' করেননি। কেন করেননি, কে জানে। হয়তো ভেবেছিলেন, অধঃস্তন অফিসারদের কাছে ব্যক্তিগত ঋণ হয়ে যাবে, নয়তো ভেবেছিলেন, সেখানে থাকাটা তাঁর নিজের এবং তাঁর নানা আরামে অভ্যস্ত মেয়েদের পক্ষে যথেষ্ট আরামদায়ক হবে না হয়তো।

যাই হোক, ওঁদের যা খুশি তাই করুন। কর্বুরের কিছু করার নেই এ-ব্যাপারে।

বাংলো থেকে বেরিয়ে যে পথটি অনেক দূরের প্রধান সড়কে পড়েছে সেই লাল মাটির ঢেউ-খেলানো পথটাকে, বর্ষার জল পেয়ে চড়চড় করে বেড়ে-ওঠা কচি-কলাপাতা রঙা শালের চারা গাছ, সবুজ-রঙা ঝাঁটিজঙ্গল এসে যেন দু পাশ থেকে গলা টিপে ধরেছে। দু পাশের বড় গাছের ডালপালা আর ফুলপাতা মাথার উপরে সবুজ-রঙা চাঁদোয়ার সৃষ্টি করেছে। তাতে দিনের বেলাতে সোনা-রঙা রোদের ঝালর ঝোলে। এবং হাওয়ায় দোলে। শরতের রোদ তখন বুটি-কাটা গালচে পাতে, সোনা-সবুজ রঙা, সেই পথে। আর চাঁদনি রাতে সেই চাঁদোয়ারই হাজারও ঝরোকা খুলে যায়। সেই চাঁদোয়ার রং তখন হয়ে যায় রুপোলি। আর তা দিয়ে রূপসী রুপোচুর আলো চুঁইয়ে পড়ে ঘরখার মতো।

ওদের বাংলোর বাগানের মধ্যে শারদীয়া গাছ-গাছালির মিশ্র গন্ধের মধ্যে বারামাস্যা চাঁপা আর ম্যাগনোলিয়া গ্রান্ডিফ্লোরার গন্ধ থম মেরে থাকে। আমলকীর ডালেদের থেকে পাতা ঝরতে থাকে। জলপাই গাছের গাঢ় সবুজ পাতাগুলোতে তখন জেল্লা লাগে। দাদুর শখ করে লাগানো রাবার গাছগুলোর পাতাগুলো কালচে-সবুজ দেখায়। রাবার গাছে অনেক জল লাগে। তাদের জন্যেই আজ থেকে ষাট বছর আগে দাদু ইংল্যান্ড থেকে Sprinkler আমদানি করেছিলেন। তবে গ্রীষ্মকালে বাগানের অনেক জায়গাতেই Sprinkler ব্যবহার করা হয়। এই শরতে প্রত্যেকটি গাছ এক বিশেষ সুগন্ধে সুগন্ধি হয়। বর্ষণক্লান্ত প্রকৃতি পাখিদের গলার জুয়ারি খুলে দিয়ে ঠোঁটে মধু ঢেলে দেয়।

দাদুর খুবই গোলাপের শখ ছিল। বাবা আর কাকুর সিজন-ফ্লাওয়ার আর গোলাপের চেয়ে পছন্দ বেশি স্বয়ম্ভর নানা দিশি-বিদেশি গাছের। ওদের বাগানে কদম থেকে রাধাচূড়া, আতা থেকে চালতা কোনও গাছেরই অভাব নেই। মস্তবড় বটল-ব্রাশ থেকে আফ্রিকান টিউলিপ, আকাশমণি থেকে অগ্নিশিখা, অমলতাস থেকে বাসন্তী সব গাছই আছে। প্রায় দশ বিঘা জায়গা নিয়ে বাংলোটা। দাদু গর্জন সেন বাংলোর নাম রেখেছিলেন 'টাটিঝারিয়া'।

গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডের বগোদর থেকে হাজারিবাগ শহরে যেতে পথে পড়ে 'টাটিঝারিয়া'। দাদুর খুব প্রিয় জায়গা ছিল ওই টাটিঝারিয়া। মস্ত বড় একটা রয়্যাল টাইগারও মারেন দাদু সেখানে এক শীতের সকালে। টাটিঝারিয়ার বাংলোতেই দশদিন। সেই জায়গার নামেই বাংলোর নাম দেন। নামটি বড়ই কাব্যিক।

কর্বুর, বলতে গেলে এই বাংলোর হাতার মধ্যেই বড় হয়েছে। এখনও যখন খাদানে না থাকে, তখন এই বাড়ির মধ্যেই সময় কাটে কর্বুরের। বন্ধু-বান্ধব, আড্ডা যাকে বলে, তা কখনোই ছিল না। নিজের চেয়ে উৎকৃষ্ট মানুষের সংস্পর্শ ওর ভালো লাগে। নইলে উৎকৃষ্ট মানুষদের সঙ্গে সময় কাটায় লাইব্রেরিতে, গান শুনে। অবসর সময়ে বাগানের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ায়। এই বাগানই শিশুকাল থেকে ওর মধ্যে প্রকৃতির প্রতি এক গভীর ভালোবাসা জাগিয়ে তুলেছে। ছুটি-ছাটা পেলেই

ও সারান্ডার বনে বনেও ঘুরে বেড়ায়। বলতে গেলে, এই-ই প্রধান শখ ওর। শখ বলা ঠিক হবে না। বলতে হয়, নেশা।

টালির ছাদ-দেওয়া চারদিক খোলা একটি তিনকোণা ঘর বানিয়েছে বাগানের এক নিরিবিলি কোণে। সিমেন্টের গোল টেবিল ও বেঞ্চ আছে তার নীচে। সেখানে বসেই গান শোনে কর্বুর। কখনও ছবি আঁকে। ডায়েরি লেখে। কখনও কিছু লেখালেখিও করে। তবে নিজেই লেখে, নিজেই পড়ে। ও একা থেকেই আনন্দ পায় খুব। তার লেখা কবিতা বা গদ্য বা তার গাওয়া গান গাছেরা শোনে, ফুলেরা শোনে আর শোনে পাখিরা।

এতেই খুশি কর্বুর। খাদানে ওকে যেমন সব জাগতিক কাজ করতে হয় তার সম্পূর্ণ বিপরীত জগতে বাস করে, ও যখন খাদানে থাকে না। ওর কোনওরকম সুখের জন্যে অন্য কারওকেই প্রয়োজন যে পড়ে না এ কথাটা জেনে ও একধরনের শ্লাঘা বোধ করে। সেই শ্লাঘাকে ও ন্যায্য বলেই মনে করে। অন্তর্মুখী বলে ও নিজেকে নিয়ে গর্বিত এই সহজ বহির্মুখিতার দিনে। তবে সেই গর্ব প্রচ্ছন্ন থাকে ওর নিজেরই মধ্যে। বাইরে তার কোনওই প্রকাশ নেই। কেজো জগতে ওর যে ব্যক্তিত্ব সেই ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ওর অবসরের জগতের ব্যক্তিত্বর কোনওই মিল নেই। ঈশ্বরের কাছে তাই ও প্রার্থনা করে, সুখেরই মতো, ওর দুখের দিনেও যেন ওর অন্য কারওকেই প্রয়োজন না হয়। ঈশ্বরের দেওয়া হাজারও সুখের ভার যদি সে বইতে পেরে থাকে এতগুলো বছর অনায়াসে কোনও জ্যোতিষী নির্দেশিত কোনও মাদুলি বা আংটি না পরেই, তাহলে সে তাঁর দেওয়া দুখের ভারও সইতে পারবে।

তার কাকি পদ্মা তারই সমবয়সি। কাকু চাকরিতে জয়েন করে টাটাতে থাকলেও কাকি এখানেই থাকতেন। উইক এন্ডে কাকু আসতেন গাড়ি চালিয়ে। সুন্দরী বলতে যা বোঝায় চলিতার্থে, কাকি তা ঠিক নয়। কিন্তু তার মনটি ভারী সুন্দর। তার শরীরের বাঁধুনিটিও। চোখ চিবুকও কাটা কাটা। কিন্তু নাকটি একটু চাপা। সেই খুঁতের ক্ষতিপূরণ করে দিয়েছেন ঈশ্বর তার চোখ দুটিতে। কাকির চোখের দিকে চাইলে চোখ ফেরানো যায় না। যেদিন কাকি চোখে কাজল দিত সেদিন আড়কাঠি হয়ে যেত চোখ দুটি। কর্বুরের দুটি চোখকে সেই চোখ-জোড়া কোনও অদৃশ্য আঠাতে জুড়ে দিত। খড়কে-ডুরে তাঁতের শাড়িতে অথবা কটকি শাড়িতে অথবা কখনও কখনও প্যাস্টেল শেড-এর বেগমবাহারে বা মধ্যপ্রদেশের হোস্‌সা সিল্কে এই বাগানে প্রজাপতির মতো মনে হত কাকিকে।

পদ্মা যখন এই বাড়িতে প্রথম আসে তখন কর্বুরের বয়স বাইশ আর পদ্মার বয়স পঁচিশ। পঁচিশ বছরের বিবাহিত নারী অভিজ্ঞতাতে বাইশ বছরের কলেজ-ছাত্র কর্বুরের চেয়ে অনেকই এগিয়ে ছিল। 'পদ্মা কাকিমা' না বলে কর্বুর তাকে কিছুদিন পর থেকেই ডাকত শুধুই কাকি বলে। তাতে কারোই আপত্তি ছিল না। একমাত্র পদ্মার ছাড়া। পদ্মা বলত, কাকি মানে তো মেয়ে কাক। আমি কি এতই কুৎসিত?

বলতে গেলে, প্রোষিতভর্তিকা, নিঃসন্তান অল্পবয়সি পদ্মার একমাত্র সঙ্গী ছিল কর্বুরই। ও বড় হয়ে ওঠার পরে কাকির সান্নিধ্য ওর শরীরের মধ্যে নানারকম উদ্বেগ জাগাত। এক অস্বস্তিকর ভালো লাগাতে বিবশ হয়ে পড়ত কর্বুর। তাই, ওর মতো করে ভালো যেমন বাসত কাকিকে, তেমন এক ধরনের ভয়ও জাগত বুকের মধ্যে। কাকির মধ্যে এমন কিছু ছিল যে, অঙ্গুলিহেলনে সে এই প্রায় সমবয়সি কর্বুরকে তার দাস করে তুলতে পারত। কাকির কোনও অনুরোধ, কোনওরকম আজ্ঞাই তাকে মুখে বলতে হত না। তার চোখের ভাষাই যথেষ্ট ছিল সেই সব ভয়ঙ্কর অথচ শালীন খেলার দিনে। কাকি তখন ভীষণই একা। ক্রিরি তখনও আসেনি। একটা সময়ে কাকি, কাকুর উপরে সব ভরসা ত্যাগ করেছিল। অথচ দোষটা পরোক্ষে দেওয়া হত কাকিকেই সে কথা বুঝতে পারত কর্বুর। কাকি ছিল তার একমাত্র খেলার সাথি, তার কবিতা ও গানের একমাত্র শ্রোতা। তার নির্জনতার

একমাত্র সাক্ষী। কাকি জামশেদপুরে চলে যাবার পর থেকে বাড়িতে মন বসে না কর্বুরের। খাদানেই থাকে অধিকাংশ সময়। যখন পারে, তখন সারাস্তার কোনও বাংলোতে চলে যায়।

মা-বাবা অখুশি হন কিন্তু তাঁদের 'মুডি' ছেলেকে কিছু বলেন না মুখে।

বিয়ের পাঁচ বছর পরে কলকাতার ডাক্তার ঘনশ্যাম কুণ্ডুর হাতযশে পদ্মা কনসিভ করে। ছ বছরের মাথাতে কিরি জন্মায়। এই ছ বছরে পদ্মা ও কর্বুর দুজনেই অনেক বড়ও বুঝি হয়েছে নিজেদের যার যার মতো করে। তবে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বুঝির মধ্যেও কিছু অবুঝপনা তো থাকেই। সেই অবুঝপনাকে গলা টিপে যারাই মারতে জানে, মারতে পারে, তারাই শুধু জানে তাদের কষ্টের কথা। কর্বুর ও পদ্মা জেনেছিল তাদের নিজের নিজের মতো করে সেই কষ্টকে। ঘি আর আগুন কাছাকাছি থাকলে এবং বিশেষ করে প্রকৃতির মধ্যে থাকলে, যে-কোনও মুহূর্তেই আগুন ছড়িয়ে যেতেই পারে। বাইরের নয়, ভেতরের সেই আগুনকে নিবোনোর জন্য কষ্ট যেমন আছে, এক গভীর ব্যথাজাত আনন্দও আছে। সেই কষ্ট ও আনন্দর কথা, সেই কষ্ট ও আনন্দ যারা জীবনে কখনও পেয়েছে, শুধু তারাই জানে।

৪

গতকাল দশেরা গেছে। আজ 'মাণ্ডুর রূপমতী' মঞ্চস্থ হবে। ব্যানার্জি সাহেবেরা সকলে এসে গেছেন দুপুরে। রাতে সকলেই নাটক দেখতেও আসবেন। কাকিও রয়ে গেছে নাটক দেখার জন্য।

কর্বুরের বাবা বলেছিলেন, ব্যানার্জি সাহেবরা যখন আসবেন আমি আর তোর মা-ই যাব ওঁদের রিসিভ করতে। আর পদ্মা তো যাবেই বলেছে। তুই যা করছিস তাই ভালো করে কর। জীবনে এই প্রথম নাটক করছিস, সকলে যেন দেখে 'ধন্য ধন্য' করে। জীবনে যা কিছুই করবি, কোনও কিছুই খারাপ করে করিস না। এমন জেদ করবি যে, জীবনের কোনও ক্ষেত্রেই যেন তোকে কেউ হারাতে না পারে। 'এক নম্বর' হওয়ার সাধনাই পৌরুষের সাধনা।

মা বলেছিলেন, 'কেন? সাধনা কি শুধু পুরুষদেরই একচেটে না কি? "পুরুষের" নয়, "মানুষের" বলো।'

ঠিকই বলেছ তুমি। দিনকাল পালটে গেছে। আমরা এখনও এই পৃথিবীকে পুরুষ-প্রধান পুরুষ-শাসিত বলেই মনে করি। সেটা ভুল।

কর্বুর আর পদ্মা টাটিঝারিয়ার বাইরের গেট-এ দাঁড়িয়ে কাকুকে 'টা-টা' করে দিয়ে ফিরে আসছিল। কাকি আর কিরি নাটক দেখে তারপরই যাবে। সিরাজ চাচা পৌঁছে দিয়ে আসবে।

কাকি বলল, তোমাকে কিন্তু সত্যিই নবাবের মতোই দেখাবে। স্টেজ রিহার্সালেই যা দেখাচ্ছিল।

নবাবের পোশাক পরলেই তো নবাব হওয়া যায়। বাহাদুরির কী?

কর্বুর বলল।

ঠিক তা নয়। পোশাক, কারোকে নবাবের ভড়ংটুকুই দিতে পারে মাত্র, নবাবি আছে তোমার চেহারায়, চলাফেরায়, গলার স্বরে, চোখের দৃষ্টিতে।

আমাকে ফিউড্যাল বলছ?

তারপরই বলল, বড়াজামদার শিখীকে কীরকম দেখাবে?

ওর মধ্যে আভিজাত্য বলে কোনও ব্যাপারই নেই। তোমার পাশে ওকে বাঁদির মতো দেখাবে। ঝুটো হিরে-মুক্তো পরলেই কি আর বাঁদি রানি হয়ে যায়।

আমার তো বেশ লাগে শিখীকে। স্মার্ট, বুদ্ধিমতী, ব্যক্তিত্বময়ী, হাসিখুশি।

হুঁ। ঐশিকাকে তো দেখোনি। তাই শিখীর প্রশংসা করছ। তুমি একটি ভ্যাবাগঙ্গারাম। ক'জন মেয়ে তুমি দেখেছ জীবনে?

তা সত্যি। সেই শরীর মন জাগার পর থেকে প্রথম যৌবন মা ছাড়া, মেয়ে বলতে তো শুধু তোমাকেই দেখেছি। তুমি আসার আগেই তো দিদির বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। তুমি এমন করেই আমার সমস্তখানি মন জুড়ে ছিলে যে অন্য কারোকে দেখবার বা জানবার সুযোগ যে পাইনি তাই শুধু নয়, দেখবার বা জানবার কোনও তাগিদও হয়তো বোধ করিনি।

দোষটা তাহলে আমারই বলছ?

দোষের কথা তো বলিনি কাকি। এ তো তোমার গুণই। "চারুলতার" মতো তুমিও যে আমার সখী ছিলে। জীবনের যা কিছু সুন্দর দিক সব তো আমি তোমার মধ্যেই দেখেছি। তোমার কাছ থেকেই শিখেছি, মানে তোমারই সান্নিধ্যে। আমার কিন্তু মনে হয় যে তোমাকে কাছে পেয়েছিলাম দীর্ঘ ছ বছর, কিরি আসার আগে পর্যন্ত, তাই অন্য কোনও মেয়েকেই আমার এ-জীবনে আর ভালো লাগবে না। মেয়েদের কেমন যে হওয়া উচিত তারই 'রোল-মডেল' হয়ে উঠেছ তুমি আমার কাছে।

লাগবে, লাগবে। ঐশিকাকে ভালো লাগবেই। কত কিছু স্বপ্ন দেখেছি আমি। হয়তো দাদা আর দিদিও দেখছেন। তোমার কাকু তো তার নিজের বয়সটা একটু কম হলে ঐশিকাকে নিজেই বিয়ে করে ফেলতেন, ভাব দেখলে এমনই মনে হয়।

ভালোই বলেছ। আগেকার দিনে স্ত্রী গত হওয়া অনেক বাবা ছেলেদের জন্যে পাত্রী দেখতে গিয়ে মেয়ে তেমন পছন্দ হলে যেমন নিজেরাই বিয়ে করে ফেলতেন তেমনই আর কী!

ওরা লতাপাতা ডালপালার চাঁদোয়ার নীচে নীচে পাখির ডাক, ফুলের গন্ধ, শরতের রোদের গন্ধের মধ্যে বুঁদ হয়ে সবুজাভ-সোনালি পথ বেয়ে বাংলোর দিকে ফিরে আসছিল গেট থেকে। "টাটিঝারিয়ার" গেট থেকে বাংলোটি প্রায় আড়াইশো মিটার মতো।

কর্বুর বলল, আচ্ছা কাকি, আমার সুখ নিয়ে তুমি এত ভাব কেন বলো তো?

কর্বুরের মুখের দিকে মুখ ঘুরিয়ে একটুক্ষণ চুপ করে থেকে রক্তিম মুখে পদ্মা বলল, ভাবব না? আমি যে তোমার মায়েরই মতন, কবু, আমি যে তোমার কাকিমা।

তা তো বটেই। সম্পর্কেই ওই কাকিমা। আমার চেয়ে কী এমন বড়। তোমার সঙ্গে তো আমার বিয়েও হতে পারত তুমি আমার কাকিমা না হলে।

আরও অনেক কথাই মনে এসেছিল কর্বুরের, সেসব বলল না। গান, সাহিত্য এই সবের সাঁকো পেরিয়ে নারীর মধ্যে যে চিরলীন রহস্য জমা রয়েছে অনন্তকাল ধরে তারই হদিশ পেয়েছিল কর্বুর পদ্মার মাধ্যমে।

সেকথা অবান্তর। ঘটনা হচ্ছে এই যে আমি তোমার কাকিমা। তোমার গুরুজন। মনে নেই? দিদি বিয়ের পর প্রথম বছর বিজয়ার দিনে আর নববর্ষে তোমাকে আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করিয়েছিলেন। তারপরে অবশ্য আমিই দিইনি তোমাকে প্রণাম করতে।

প্রণামের কত রকম হয়, কাকি। পা ছুঁলেও অনেক সময় প্রণাম হয়ে ওঠে না, আবার কারোকে চুমু খেলেও তো তা প্রণামই হয়ে ওঠে।

পদ্মা চুপ করে রইল।

বলল, জানি। তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক তো চুমুরও ছিল না, প্রণামেরও নয়।

তারপর বলল, বলো কবু, ছ'ছটা ভারী বিপজ্জনক বছর আমরা কাটিয়ে গেছি এখানে—কিরি আসার আগে অবধি। তাই না?

তাই। আমরা দুজনেই যে ভদ্র, সভ্য, সম্ভ্রান্ত পরিবারের তার প্রমাণ কিন্তু আমরা দিয়েছি।

তা দিয়েছি। কিন্তু সেই অলিখিত সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্যে কষ্টও তো কম পাইনি দুজনেই আমরা। বলো তুমি?

পদ্মা বলল।

চমকে উঠে কবু বলল,

তা ঠিক! তবে মাঝে মাঝে কী মনে হয় জানো?

কী?

সেই কষ্টটাই হয়তো আনন্দ ছিল।

একটু চুপ করে থেকে পদ্মা বলল, ঠিক তাই। জীবনে যা-কিছুই গভীর আনন্দের তার বেশির ভাগই সম্ভবত কষ্টই। কষ্টটাই যে আনন্দ তা বুঝতে অনেকই সময় লাগে। ত্যাগ বা বঞ্চনার মধ্যে দিয়ে যে গভীর এক শুচিস্নিগ্ধ আনন্দ আসে তা সম্ভবত সহজ এবং সাধারণ শারীরিক প্রাপ্তির মধ্যে দিয়ে আসে না কোনওদিনই।

কী জানি! জানি না। তবে আমার একটা ভয় হয় কাকি যে, যদি কখনও বিয়ে করি, কোনও মেয়েকেই আমি তোমার আসনে বসাতে পারব না।

একী অলুক্ষণে কথা। ছিঃ, ওরকম বলতে নেই। দিদি এবং দাদা আর তোমার কাকু একথা শুনতে পেলে কী ভাববেন বলো তো আমাকে? তাছাড়া, আমি তো তোমাকে দুখী করতে চাইনি কোনওদিনই, সুখী করতেই চেয়েছিলাম। ওরকম করে বলো না। আমার পক্ষে নিজেকে ক্ষমা করা সম্ভব হবে না তাহলে কোনওদিনও। তাছাড়া, বিয়ে করলেই জানবে যে, নারী পুরুষের সম্পর্কে শুধু মনই নয়, শরীরটাও অনেকখানি। দাম্পত্যের সঙ্গে নিছক মনের প্রেমে তফাত আছে অনেকই। তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। You have to live life to know life. সব জিনিস বই পড়ে বা উপদেশ পেয়েই শেখা যায় না।

বাংলোতে পৌঁছে ওরা দুজনে বারান্দাতে এসে বসল। কর্বুরের বাবা এবং মা, কাকু আর কিরি রওয়ানা হয়ে যাবার পরেই বিজয়া সারতে বেরিয়ে গেছেন। একটি নতুন ফিয়াট উনো এসেছে, বাসন্তী রঙা। বাবার ওই গাড়িটা খুব পছন্দ। নিজেই চালিয়ে গেছেন। বাবার ড্রাইভার বানোয়ারী আজ আসবে না। দশেরার দিন রাতে প্রচুর সিদ্ধি খেয়েছে আর ঢোল বাজিয়ে নেচেছে। আজ নেশা কাটতে সময় লাগবে। যদি আসেও হয়তো সন্ধের দিকে আসবে।

পদ্মা বলল, দশটা বাজে। তুমি যাও চান করে নিয়ে বিশ্রাম করো। আমি কিচেনে যাচ্ছি। আজ তাড়াতাড়ি খেয়ে উঠে একটা ঘুম লাগাও। তারপর গরম জলে চান করে বেরোবে। ক'টাতে পৌঁছাতে হবে?

চারটেতে। মেক-আপ-এ যে অনেকেই সময় নেবে।

তা তো নেবেই। নবাব হওয়া কি সোজা কথা!

যাওয়ার আগে গরম জলে দুটো ডিসপিরিন ফেলে গার্গল কোরো আর আমার কাছ থেকে কাবাব-চিনির রুপোর কৌটোটা নিয়ে যেয়ো। গালে ক'টি ফেলে রাখবে, দেখবে, গলা বাঘের মতো বলছে।

কত বড় কৌটো?

ছোট কৌটো। নস্যির কৌটো। বেঁটে কাকার ছিল। উপরটাতে ট্রান্সপারেন্ট প্লাস্টিক লাগানো। ভিতরটা দেখা যায়। আমার একটা পেতলের কৌটো ছিল। বেঁটে কাকা সেটা নস্যির জন্যে নিয়ে তাঁর রুপোর কৌটোটা কাবাব-চিনি রাখার জন্যে দিয়ে দেন। তোমার নবাবি জোব্বার পকেটে থাকবে।

স্টেজেও তুমি জোব্বা থেকে বের করে খেতে পারবে। কৌটোটা আমি SILVO দিয়ে পালিশ করে দিচ্ছি। এসব জিনিস তো নবাবদেরই মানায়।

সে হবে'খন।

তুমি যাও। বিশ্রাম করো। আমি ওদিকে যাই।

উঠে দাঁড়িয়েই, পদ্মা বলল, কাল ভোরে কখন বেরোবে জঙ্গলে?

ব্রেকফাস্ট করে বেরোব। ওঁদের বলেছি, সাড়ে আটটার মধ্যে তৈরি হয়ে থাকতে।

প্রথমে কোথায় যাবে?

কুমডি।

ইস্স। যেখানে আমরা বাংলোর পাশে হাতি দেখেছিলাম?

হ্যাঁ।

আমারও খুব যেতে ইচ্ছে করছে। তোমার সঙ্গে জঙ্গলে যাওয়ার মজাই আলাদা। কত গাছ চেনো তুমি, কত পাখি, কত ফুল।

চলো না তুমি।

তা হয় না।

কেন?

আমরা সকলেই চাই তুমি আর ঐশিকা দুজনে দুজনকে কাছ থেকে জানো।

তাহলে কাবাবমে হাড্ডি করে গৈরিকাকেও সঙ্গে দিচ্ছ কেন?

হেসে উঠল পদ্মা।

তারপর বলল, রিলিফ-এর জন্যে। একটানা একসঙ্গে থাকলে রোমিওরও জুলিয়েটকে খারাপ লাগাতে পারত।

তাই? আর ঐশিকার বাবা?

ব্যানার্জিসাহেবও দারুণ কোম্পানি। কোনওরকম হ্যাঙ্গ-আপস নেই ভদ্রলোকের। তাঁর স্ত্রী সত্যিই ভাগ্যবতী ছিলেন।

তাই নাকি? তবে লোকে যে বলে, যার স্ত্রী মরে, সেই ভাগ্যবান।

তারা সব বাজে লোক।

চলো না তুমিও। খুব মজা হবে। আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচব। আমার নার্ভাস লাগছে।

নার্ভাস হওয়ার পাত্রই তো তুমি। বাজে কথা বোলো না।

চলো চলো।

জানো না। কিরিটা একা থাকবে। স্কুলও তো খুলে যাবে কাল থেকে। তোমাদের রওয়ানা করিয়ে দিয়ে আমিও চলে যাব টাটা। ছানা-পোনা' যতদিন ছিল না, দিন অন্যরকম ছিল।

বলেই বলল, নাঃ। আর গল্প নয়। এবার আমি যাচ্ছি। আজ বারোটার মধ্যে খেয়ে নেবে। আজ মুন্নাদেবী কী রাঁধছে গিয়ে দেখি।

৫

ব্যানার্জিসাহেবের ওপেল অ্যাস্ট্রা, ছাই-রঙা। ড্রাইভারের নাম বিহারি। জিপটা চালাবে কর্বুরই নিজে। সঙ্গে রহমতকে নিয়েছে। বিচিত্রবীর্য লোক। একাধারে ড্রাইভার, ক্লিনার, বাবুর্চি এবং বডি-গার্ড।

ওড়িয়া আর হিন্দি দুইয়েতেই সমান দখল। তাছাড়া ব্যক্তিত্বও আছে। জঙ্গলের মধ্যের বনবাংলার চৌকিদারেরা আর আজকাল আগের মতো নেই। তাদের দিয়ে ঠিকমতো কাজ করিয়ে নেওয়া বাহাদুরির কাজ। রহমত ভালো নার্সও। একবার মনোহরপুরে শিকারে গিয়ে জ্বরে, বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিল কর্বুর। রহমত শুধু সেবাই করেনি, বহাল তবিয়ৎ-এ বড়বিলে ফিরিয়েও নিয়ে এসেছিল।

ব্যানার্জিসাহেব বললেন, কর্বুরকে, তুমিও এ গাড়িতেই এসো। জিপ তোমার ড্রাইভার চালিয়ে নিয়ে আসুক। এখন তো জিপের দরকার নেই। আপত্তি আছে?

তা নেই।

কর্বুর বলল, আমি সামনে বসি?

না। ব্যানার্জিসাহেব বললেন, পাইপের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে।

তারপর বললেন, আমি মোটা মানুষ, সামনেই কম্ফার্টেবল ফিল করি। তুমি ওদের সঙ্গে পেছনেই বোসো না বরং।

বেশ।

গৈরিকা বলল, আপনাকে স্যান্ডউইচ করি?

মানে?

মানে, আমরা দুজনে দুদিকে বসি জানালার পাশে। দেখতে দেখতে যেতে পারব তা হলে। আপত্তি আছে?

কর্বুর মনে মনে বলল, এমন আলগা ভদ্রতার মানে কী? বাবা আর মেয়েতে যা নিজেদের ইচ্ছে তাতো করছেনই। মাঝে মাঝে একটা করে 'আপত্তি আছে?' প্রশ্ন করার কী দরকার?

শুধু বলল, যেমন আপনাদের খুশি।

পদ্মা এবং কর্বুরের মা-বাবাও এসেছিলেন ওদের সকলকে সি-অফ্‌ফ্ করতে ঠাকুরানি পাহাড়ের ওপরে।

রহমত-এর জিপে মুরগির ঝুড়ি, আনাজের বস্তা, চাল, ডাল, তেল, নুন, লংকা এবং যাবতীয় মশলা। একটি পাঁচ-ছ কেজির পাঁঠা। সাদা রঙা। চা, কফি, বিস্কিট, চিজ "KNOR"-এর স্যুপ প্যাকেট, নুডলস ইত্যাদি জিপের পেছনে বোঝাই করা।

কর্বুর বলল, আমি বরং গাড়িটা চালাই। আপনাদের ড্রাইভার আমাদের ড্রাইভারের সঙ্গে আসুক। ওকেও একা আসতে হবে না আর এ-গাড়িতেও ওরা দুজনে পেছনে হাত-পা ছড়িয়ে যেতে পারবেন।

ব্যানার্জিসাহেব বললেন, সেটা মন্দ হবে না।

পেছন থেকে ঐশিকা বলে উঠল, গাড়ির পিছনের সিটটা তো বিছানা নয়, যে হাত-পা ছড়িয়ে যেতেই হবে। তবে আপনার যদি আমাদের সঙ্গে পেছনে বসতে আপত্তি থাকে, সেকথা বললেই তো হয়।

এবারে কর্বুরেরও মনে হল যে, কিছু বলা দরকার। বড়ই খলবল করছে দু বোন। পায়ের নীচে ঘাস গজাতে দেওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

শৈশবে মাতৃহীন মেয়েদের যত ভালো করে ব্যানার্জিসাহেব মানুষ করেছেন বলে শুনেছিল কর্বুর ওর কাকির কাছে, আসলে তেমন ভালো করে মানুষ হয়তো করতে পারেননি উনি। মেয়ে দুটি বেশ অভব্য আছে। এবং প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশিই সপ্রতিভ। আদরে আদরে একেবারেই গোবর হয়েছে।

কর্বুর হেসে বলল, আমি এই পাড়াগাঁ বড়বিল-এ থাকি বলেই ভাববেন না যে মেয়েদের সঙ্গে মিশতে কোনওরকম আড়ষ্টতা আছে আমার। আপনারা যা ভাবছেন, তা ভুল।

বলতে বলতেই জিপের দিকে গিয়ে রহমতচাচাকে যা বলার বলে, ওঁদের ড্রাইভার বিহারিকে জিপের সামনের সিট-এ বসিয়ে দিয়ে নিজে এসে ওপেল-এর ড্রাইভিং সিট-এ বসল।

বসেই, এঞ্জিন স্টার্ট করল।

ঐশিকা বলল, আড়ষ্টতা যে নেই, তা তো কাল নাটক করার সময়েই দেখলাম।

কর্বুর বলল, নাটক তো জীবন নয়। দুটো আলাদা ব্যাপার।

ব্যানার্জিসাহেব বললেন, সফিস্টিকেটেড গাড়ি, চালাতে অসুবিধে হবে না তো তোমার?

কর্বুর অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিয়ে গাড়ি সামনে গড়িয়ে দিয়ে বলল, চালাই তো। আমাদের আছে একটা। সাদা রঙের।

ওপেল আস্ট্রা?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি যখন স্কুলে পড়ি তখন দাদুর একটা ওপেল "কাপিটান"ও ছিল। ওপেল আস্ট্রার চেয়ে অনেকই বড়। লেফট হ্যান্ড ড্রাইভ। আমি ওতেই গাড়ি চালানো শিখেছিলাম এই রহমতচাচারই কাছে।

ব্যানার্জিসাহেব বললেন, আই সি।

হয়তো ভাবছিলেন, কুরুবক সেন যেমন নরম-সরল-বিনয়ী-ভদ্র তার ভাইপো কর্বুর ঠিক সেরকম নয়।

তোমার বাবা মা কাকিমা তো দেখলাম একটা টাটা সাফারিতে এসেছিলেন। আরও গাড়ি আছে নাকি তোমাদের?

একটা ইন্ডিকা আছে আমার। গত সপ্তাহেই পেয়েছি। কাকার তো ফিয়টি সিয়েনা আছে। নিশ্চয়ই জামশেদপুরে দেখেছেন। মারুতি এস্টিম-এ রহমতচাচা মায়ের ও কাকিমার ডিউটি করে, দিদিরও, যখন আসে দিদি। তাছাড়া বাজার দোকান করার জন্যে একটা মারুতি ভ্যানও আছে। পেছনের সিটটা খুলে ফেলা হয়েছে। বাজার বইবার সুবিধার জন্যে। তাছাড়া একটা ফিয়াট-উনোও নিয়েছেন বাবা।

বাঃ। আগেকার দিনের রাজারাজড়াদের ঘোড়ার শখ ছিল, একসময়ে, তোমাদের দেখছি গাড়ির শখ।

তা জিপটার কথা বললেন না? ওটা বুঝি ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না?

গৈরিকা বলল।

ওটাকে কি ঠিক গাড়ি বলা চলে?

তবে ওটা কী?

ঐশিকা বলল, পেছন থেকে।

ওটা পক্ষীরাজ।

কর্বুর বলল।

সকলে হেসে উঠলেন একই সঙ্গে।

গাড়ির মধ্যের আবহাওয়ার গুমোটটা এয়ারকন্ডিশনার চালানো থাকা সত্ত্বেও ঠিক কাটছিল না এতক্ষণ। এবার মনে হল যেন কাটতে শুরু হল।

হঠাৎ ঐশিকা বলল, কাল রাতে আপনাকে কিন্তু সত্যিই নবাব-নবাবই দেখাচ্ছিল। নাটকে।

তাই? থ্যাঙ্ক য়্যু। নাটকের নবাব।

তারপর বলল, মেক-আপম্যানের বাহাদুরি আর ভাড়া-করা পোশাকের দৌলতে অনেক বান্দাও সহজেই চেহারাতে নবাব বনতে পারে, কিন্তু ডিমেন্যুর-এও নবাব বনা বোধ হয় অত সহজ নয়।

আপনার চেহারা এবং ডিমেন্যুর দুইয়েতেই নবাব-নবাব লাগছিল।

এবারে গৈরিকা বলল।

কর্বুর আবারও বলল, থ্যাঙ্ক উ্য।

তারপর বলল, আমি তো নবাবই। অন্যরকমের নবাব।

কোথাকার নবাব?

সারান্ডার জঙ্গলের নবাব। কারও-কোয়েল-কয়নার উপত্যকার এই LAND OF SEVEN HUNDRED HILLS-এর নবাব আমি। শালমহুয়ার জঙ্গলের নবাব।

কোয়েল নদীর নাম তো শুনেছি কিন্তু কারও বা কয়নার নাম তো শুনিনি। ওই সব নামেও নদী আছে বুঝি? জানতাম না তো!

এই বিপুলা পৃথিবীর কতটুকুই বা আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব? আমি এখানে থাকি বলেই হয়তো জানি।

তা কেন? ডিসকভারি চ্যানেল বা ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফিক চ্যানেল দেখলে তো ঘরে বসেই অনেকই জানা যায়। বিপুলা পৃথিবীর সর্বত্রই যে নিজের পায়ে হেঁটে ঘুরতেই হবে তার কী মানে?

ব্যানার্জিসাহেব বললেন।

তা হতে পারে। কিন্তু নিজের পায়ে না ঘুরলে আবার কোনও জায়গাই তেমন করে দেখাও হয় না। মানে, যাকে বলে, "To have a feel of the place." সেই অনুভূতিটা হয় না আদৌ টিভি দেখে—.।

সেটা অবশ্য ঠিকই।

ব্যানার্জিসাহেব কর্বুরের কথায় সায় দিলেন।

মেয়েদের কেমন লাগছে তা বলতে পারবেন না, ব্যানার্জিসাহেব গত রাতে বাজবাহাদুর-এর চরিত্রে কর্বুরের অভিনয় দেখে এবং আজ এইটুকু সময়ের মধ্যেই তাকে যতটুকু দেখেছেন তাতেই ছেলেটিকে ভালো লাগতে আরম্ভ করেছে ওঁর। নিজের ছেলেবেলার কথাই মনে পড়ে যাচ্ছে যেন। নো ডাউট, দিস ইয়াং ম্যান ইজ কোয়াইট আ Guy! আসলে, নিজেকে মানুষে যত ভালোবাসে তত তো আর কারোকেই বাসতে পারে না। কারও সঙ্গে নিজের মিল খুঁজে পেলেই তাকে ভালো লেগে যায়।

মনে মনে বললেন, উনি।

গৈরিকা বলল, 'মহড়া' নাটকটির কিন্তু বেশ ডেপ্‌থ আছে। নাটকের মধ্যেও নাটক ছিল একটা। থিমটা খুবই প্র্যাকটিকাল।

কোয়াইট আনইউজুয়ালও।

ঐশিকা বলল।

সত্যিই তো আমাদের সকলের জীবনই এক একটি মহড়া। ক'জনের জীবনে জীবনের নাটক শেষ পর্যন্ত মঞ্চস্থ হয়? রিহার্সালই তো সার। আইডিয়াটা সত্যি খুবই অরিজিন্যাল। সন্দেহ নেই।

ওই ভদ্রমহিলা কে?

ঐশিকা জিগ্যেস করল।

কোন ভদ্রমহিলা?

যিনি রূপমতীর ভূমিকাতে অভিনয় করলেন? গানও তো বেশ ভালোই গান মহিলা দেখলাম।

দেখলাম কী? শুনলাম বল।

গৈরিকা বলল।

ওই হল।

মহিলা ঠিক নন। বয়সে আপনাদেরই মতো হবে শিখী। ওর নাম শিখী রায়। ক্লাসিক্যাল গান শেখে বড়জামদার হেরম্ববাবুর কাছে। হেরম্ব চ্যাটার্জি। আগ্রা ঘরানার গাইয়ে। বিজয় কিচলু রবি কিচলুদের গুরুভাই। কুমারপ্রসাদ মুখার্জিরও।

কই? হেরম্ব চাটুজ্যের নাম তো কখনও শুনিনি। গানও শুনিনি কখনও।

শোনবার তো কোনও কারণ নেই। হেরম্ব জ্যাঠারা তো "they also ran"-এর দলেই পড়েন। বাণিজ্যিক সাফল্যের মুকুট তো তাঁদের মাথায় ওঠেনি। দিল্লি, বম্বে, কলকাতাতেও থাকেন না। তাই তাঁদের আপনারা চিনবেন কী করে!

তাছাড়া এসব প্রাগৈতিহাসিক গানও শোনেন নাকি আপনারা? আপনারা তো সম্ভবত নচিকেতা, সুমন, লোপামুদ্রাদের আধুনিক গানই শোনেন বাংলা গান আদৌ শুনলে। ইন্ডিয়ান ক্লাসিকাল মিউজিক তো এখন কাকুর এই জিপগাড়িরই মতো অ্যান্টিক ব্যাপার হয়ে গেছে।

আপনি বড় বেশি SURMISE করে নেন মশায়। আপনি একটু বেশি ওভার কনফিডেন্টও। আধুনিকতার উপর আপনার রাগ আছে মনে হয়।

আধুনিকতার উপরে রাগ নেই। যে মানুষ আধুনিক নন তিনি অশিক্ষিত। তবে আধুনিকতা আর ছদ্ম-আধুনিকতার মধ্যে তফাত তো আছেই! থাকবেও চিরদিন।

আপনি বুঝি ইন্ডিয়ান ক্লাসিকাল গানের খুব ভক্ত। ওয়েল। বাহার আর বসন্ত এই দুই রাগের মধ্যে তফাত কী তা বলতে পারবেন?

আজ্ঞে না। আমি জলবসন্ত আর আসল বসন্তর মধ্যের ফারাকটা জানি।

তারপর বলল, ওইসব গান শুনলেও আপনারা কোনও কোটিপতির বাড়িতে বা রবীন্দ্রসদনে বা কলামন্দিরে বা সংগীত রিসার্চ আকাদেমিতে শোনেন। হেরম্ব চাটুজ্যেদের খোঁজ আপনারা রাখেন না। কোনওদিন রাখবেনও না। ক্লাসিকাল ইন্ডিয়ান মিউজিক আপনাদের কাছে জামদানি শাল, জড়োয়ার গয়না, এম. এফ. হুসেইনের ছবিরই মতো, নিছকই STATUS SYMBOL.

গৈরিকা বলল, আপনি তো মহা ঝগড়ুটে লোক মশায়। আমার মা একটা কথা বলতেন, "বাতাসের গলায় দড়ি দিয়ে ঝগড়া করা।" আপনাকে দেখে মায়ের সেই কথাটা মনে পড়ছে।

হেরম্ববাবু প্রসঙ্গে আপনি আগ্রা ঘরানার কথা বলছিলেন না?

আপনি আবার এসব ঘরানা-টরানার কথাও জানেন নাকি?

খুব বেশি ঘরানা তো নেই। তাছাড়া কুমারপ্রসাদ মুখার্জির "কুদরত রঙ্গি-বিরঙ্গী" বইটি কেউ পড়ে ফেললেই তো মোটামুটি জেনে ফেলতে পারেন।

তারপর বলল গৈরিকা, সেটি আবার কী বই?

সেটি ভারতীয় মার্গ সংগীত এবং গাইয়েদের নিয়ে লেখা একটি অসাধারণ বই। না পড়ে থাকলে, অবশ্যই পড়বেন। আনন্দ পাবলিশার্স-এর বই। তাছাড়া, রসবোধ কাকে বলে তা বুঝতে পারবেন বইটি পড়ে।

কোন কুমারপ্রসাদ? ধূর্জটিপ্রসাদের একমাত্র পুত্র যিনি?

ব্যানার্জিসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন।

হ্যাঁ।

আরে তাকে তো আমি চিনতাম। কোল-ইন্ডিয়াতে ছিলেন না?

ছিলেনই তো। আমার বাবাও সেই সুবাদে চেনেন।

পড়তে হবে তো।

তারপর কর্বুর বলল, অমিয়নাথ সান্যালের "স্মৃতির অতলে" বইটি পড়েছেন?

না তো।

ইউ হ্যাভ মিসড সামথিং ইন ইওর লাইফ। জিজ্ঞাসার বই, মানে প্রকাশক। অবশ্যই পড়বেন সে বইটিও।

আজকাল বেশি জানার তো প্রয়োজন নেই। বইয়ের ব্লার্ব, সিডি বা এল.পি-তে গায়ক-গায়িকার যে পরিচিতি থাকে, সেই পরিচিতিটুকু পড়ে নিলেই তো পণ্ডিতি করা যায়। ঠেকাচ্ছেটা কে? আসল পণ্ডিতেরা আমাদের মতো এই রকম নকল পণ্ডিতদের দাপটে লজ্জাতে আজকাল ঘরেই থাকেন কুলুপ এঁটে। ইকনমিস্ট গ্রেশাম সাহেবের সেই MAXIM এখন জীবনের সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়ে গেছে। শুধুমাত্র অর্থনীতিতেই নয়।

কী? মানে কোন MAXIM?

"BAD MONEY DRIVES AWAY GOOD MONEY."

যা বলেছ ভাই। কার-রে-ক্ট?

ব্যানার্জিসাহেব বললেন।

পরক্ষণেই ভাবলেন, কর্বুর যদি ভবিষ্যতে তাঁর জামাই হয়, তাহলেও কি তাকে ভাই বলেই সম্বোধন করবেন? সত্যি। নিজেকে নিয়ে চলে না। যদি....

তারপরই বললেন কর্বুরকে, তোমার কি কোনও ডাকনাম নেই বাবা? কর্বুর, কর্বুর করে বারবার ডাকতে যে আমার ডেঞ্চার খুলে যাচ্ছে।

কর্বুর হেসে বলল, বাড়িতে সকলে আমাকে কবু বলেই ডাকেন।

দ্যাটস মাচ বেটার।

কর্বুর মানে কী? কোনও দিশি শব্দ?

গৈরিক জিজ্ঞেস করল।

শব্দটা বাংলাই। কিন্তু শিক্ষিত, উচ্চবিত্ত বাঙালিরা তো আজকাল বাংলা জানাটাকে লজ্জাকর ব্যাপার বলেই মনে করেন। তাঁরা অনেক শব্দরই বাংলা জানেন না অথচ ইংরেজি অথবা ফ্রেঞ্চ প্রতিশব্দ জানেন।

আপনি বাপিরই মতো বড় জ্ঞান দেন মশায়! মানেটা বলুনই না। তাছাড়া বাপি ঝগড়ুটে নন, আপনি এক নম্বর ঝগড়ুটে।

ঐশিকা বলল।

কর্বুর মানে বহুবর্ণ। মানে বুঝলেন। মাল্টি-কালারড। চিত্র-বিচিত্র।

বাবা! নামটা কে রেখেছিলেন আপনার? খুবই থটফুল মানুষ তো উনি।

আমার দাদু। হি ওয়াজ আ গ্রেট ম্যান।

এদের খুনসুটির হাত থেকে বাঁচার জন্যে ব্যানার্জিসাহেব বললেন, কবু, আমরা প্রথমে কোথায় যাচ্ছি?

কুমডিতে। আজকে সারাদিন কুমডিতেই থাকব। রাতেও। তারপর কাল ব্রেকফাস্ট করে থলকোবাদে যাব। তারপর...

তারপরের কথা আগে বলবেন না প্লিজ। আমরা একটু সাসপেন্স-য়েই থাকতে ভালোবাসি।

সেটা মন্দ বলিসনি। আমি প্রথমবার যখন States-এ যাই তখন পথে দেড়শো মাইল সামনে বৃষ্টি হচ্ছে কি হচ্ছে না, ট্রাফিক জ্যাম আছে কি নেই. অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে কি হয়নি, সবই টিভি স্ক্রিন-এ ফুটে উঠতে দেখে বড় বিরক্তি ধরেছিল। আমাদের দেশে যখন গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে আমরা পুরনো দিনে গাড়িতে বেরোতাম, তখন ভূমিকম্প হবে না বন্যা, বজ্রপাত না শিলাবৃষ্টি, সে সম্বন্ধে

কিছুমাত্রই না জেনে মহানন্দে যেতাম। অজ্ঞতারও এক বিশেষ আনন্দ আছে। বেশি জানলে সেই নির্মল আনন্দ মাটি হয়।

ঐশিকা বলল, এই ইন্টারনেট ই-মেইল-এর যুগে সাসপেন্স জিনিসটাই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে জীবন থেকে। সবাই সবজান্তা। কারোরই অজানা কিছুই নেই। ভবিষ্যৎ-এ কুয়াশা নেই, ঝকঝকে রোদ্দুর। জীবনে কোনও রহস্য নেই। না, আমরা কিন্তু একটু প্রাচীনপন্থী। একটু কম জেনেই আমরা খুশি থাকি।

বেশ। এ তো আনন্দেরই কথা।

কর্বুর বলল।

আপনার নাটকটা কিন্তু আমাকে রীতিমতো হন্ট করছে।

ঐশিকা বলল।

হন্ট করাটা তো ভালো নয়। Haunt শব্দের মানেটা তো বিশেষ সুবিধের নয়। ভেবেছিলাম, বাংলাটা ভালো করে শেখেননি, তাই কথায় কথায় ইংরেজি ফুটোচ্ছেন। যখন ইংরেজি শিখেছেন তখন ইংরেজিটাও তো ভালো করে শেখেননি মনে হচ্ছে।

একটু অপ্রতিভ না হয়ে ঐশিকা বলল, ভুলটা ধরেছেন আপনি ঠিকই। অনেক শব্দ ব্যবহার করতে করতে আমরা তার আসল মানেটাই ভুলে যাই। রাইট ইউ আর!

কর্বুর অবাক হল একটু। যাকে বলে প্লেজেন্টলি সারপ্রাইজড। ঝগড়া লাগার বা অপমানিত হবার যখন যথেষ্টই কারণ ছিল তখন নিজের ভুল একবাক্যে স্বীকার করে নিল ঐশিকা। এটা একটা মস্ত গুণ বলতে হবে।

তক্ষ রায়ের চরিত্রটা, মানে গতরাতের নাটকে, কিন্তু অসাধারণ। বিশেষ করে তাঁর INTRO-SPECTION, যেখানে উনি স্বগতোক্তি করছেন, বলছেন, "রূপমতীর বয়স হবে না কোনওদিনই। তক্ষ একদিন বৃদ্ধ হবে, লোলচর্ম, গলিত, নখদন্ত কিন্তু রূপমতী রয়ে যাবেন তেমনই রূপমতী। তেমনই রইবে তাঁর গর্বিত গজগমনের পদক্ষেপ, তাঁর ব্রীড়াভঙ্গি। তাঁর গানের গলা। বয়স ছুঁতে পারবে না তাঁর কিছুকেই।"

গৈরিকা বলল।

ক্লাসিক হয়ে যাবেন রূপমতী, চিরকাহিনী হয়ে থাকবেন, ন্যুট হামসুন-এর উপন্যাসে 'গ্রোথ অফ দ্যা সয়েল'-এর মতো, বিভূতিবাবুর 'আরণ্যকের' মতো।

ঐশিকা বলল।

বাবাঃ। আপনি আরণ্যকও পড়েছেন নাকি? বিভূতিভূষণের কী ভাগ্য!

ইয়েস স্যার।

সারান্ডা বিভূতিভূষণের খুব প্রিয় জায়গা ছিল। বিশেষ করে মনোহরপুর।

আমরা যাব না?

যাওয়ার কথা তো আছে। তা বিভূতিভূষণের আর কোনও বই পড়েছেন?

আর একটা পড়েছিলাম। একটি ভারী মিষ্টি প্রেমের উপন্যাস, নাম 'দুই বাড়ি'।

বলেই বলল, আপনি পড়েছেন?

না তো।

ওই সব বই স্কুলে থাকতেই পড়েছিলাম। তারপর পড়াশুনার যা চাপ পড়ল, বাংলার চর্চা আর রাখতে পারলাম কই?

রাখা উচিত ছিল। কর্বুর বলল।

জ্ঞান দেবেন না তো মশাই। আমরা মেয়েরা রান্নাঘরে গলদঘর্ম হয়ে সারাদিন আপনাদের জন্যে রান্না করব, দুপুরে যখন আপনারা 'আপিস'-এ গিয়ে রাজা-উজির মারবেন, দরজাতে লাল আলো জ্বেলে আড্ডা মারবেন আর আপনার প্রাইভেট সেক্রেটারি বলবেন, 'হি ইজ ইন আ কনফারেন্স' তখন আমরা শরৎবাবুর উপন্যাস পড়ব বিছানাতে শুয়ে, বাংলা গান শুনব, উত্তমকুমারের ছবি দেখব টিভিতে, বাঙালি সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখব, আর আপনাদের গুরুজনেরা, "সাহেব" আপনাদের জন্যে পাত্রী দেখতে এসে বেশ বাঙালিয়ানাতে সম্পৃক্ত "মিষ্টি" মেয়ে পছন্দ করে যাবেন। না, চিরদিনই তো তা হতে পারে না। এখন আমরাই "আপিস" করব, উপার্জন করব, বাইরের জগৎ সামলাব আর পুরুষেরাই আলু-পোস্ত আর তেল-কই রান্না করে রাখবে আমাদের জন্যে। দুপুরে সুনীল গাঙ্গুলি, দিব্যেন্দু পালিত অথবা শংকরের বাংলা উপন্যাস পড়বে। আমরা ভীষণই টায়ার্ড হয়ে বাড়ি ফেরার আগে ঘরে এয়ারকন্ডিশনার চালিয়ে রাখবে, চানঘরে গিজার চালিয়ে রাখবে, বাড়ি পৌঁছলে সেজেগুজে পাবফ্যুম মেখে, আমাদের হাসি মুখে চা করে দেবে, নাইটি গোছ করে রাখবে বাথরুমে। এক্কেবারে সুইটি-পাঈ নেকুপুষুমুনু আদর্শ স্বামী হবে সব। ঘোরতর বাঙালি। ফুলেল তেল মাখবে। মাথায় আমাদের জন্যে।

গৈরিকা বলল, ঠিক বলেছিস তুই। ওয়াক্সিং করবে, হেয়ার রিমুভার ইউজ করবে।

ঐশিকা বলল, দিন পালটাচ্ছে স্যার। বহু হাজার বছরের অব্যেস-টব্যেস সব পালটাতে হবে এবার পুরুষদের। স্বামী এবং স্ত্রী ভূমিকার অদলবদল হবে।

গৈরিকা বলল, 'কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও?'

যারা না শুনতে পায় তারা বদ্ধ কালা। কালের রথের চাকাতে চাপা পড়ে মরা ছাড়া তাদের গতি নেই।

ঐশিকা বলল।

কর্বুর বলল, আমার তো মনে হয়, আর দশ-পনেরো বছরের মধ্যে বিয়ে ব্যাপারটাই অ্যাজ অ্যান ইনস্টিট্যুশান আর থাকবেই না, সচ্ছল, উচ্চশিক্ষিত সমাজে। আপনারা মিছেই আকাশ-কুসুম স্বপ্ন দেখছেন। আমরা পুরুষেরা, আপনাদের, আমাদের অমনভাবে হিউমিলিয়েট করার সুযোগই দেব না আর সম্ভবত।

কেন একথা বলছ তুমি কবু? বিয়ে উঠে যাবে কেন? সেটা মন্দ হবে না?

ব্যানার্জিসাহেব বললেন।

বলছি স্যার...

স্যার-স্যার আবার কী...

না, আপনি কাকুর বস্‌স।

বস্‌স তো কাকুর অফিসে। তাছাড়া আমি তো তোমার বস্‌স নই। বরং তুমিই আমার বস্‌স এখন। তোমার গার্জিয়ানশিপেই তো জঙ্গলে যাচ্ছি। তুমি আমাকে আমার ডাকনামেই ডেকো। 'ঘোঁৎলা' বলে।

না। সেটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। বাধো-বাধোও ঠেকবে। আমি বরং আপনাকে ব্যানার্জিসাহেব বলেই ডাকব।

ব্যানার্জিকাকুও বলতে পারো।

ব্যানার্জিসাহেবই ভালো।

তো এখন বলো, কেন তোমার এরকম মনে হয়?

আমার একার মনে হয় না। এও কালেরই যাত্রার ধ্বনি। অদৃষ্টের লিখন। ভবিতব্যং ভবেতব্য।

মানুষ বড়ই স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছে, বড়ই আত্মকেন্দ্রিক। তার স্বাতন্ত্র্যবোধ এমনই এক পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষিত সচ্ছল সমাজে, মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জোয়ার আসার পরে, পুরুষ ও নারীর রুচি এতই বেশি সূক্ষ্ম অথবা স্থূল হয়ে যাচ্ছে, যদিও ভিন্ন ভিন্ন রকম, তাতে এক ছাদের নীচে দুজন মানুষের বাস করাই মুশকিল হবে। এই 'প্রগতি'র গতি রোধ করা না গেলে একটা সময় আসবেই যখন মানুষে আর live together-ও করবে না। মেলামেশা হবে, শারীরিক সম্পর্কও থাকবে কিন্তু স্ত্রী ও পুরুষে থাকবে আলাদা আলাদা ছাদের নীচে।

গাড়ির মধ্যে নিস্তব্ধতা নেমে এল।

ব্যানার্জিসাহেব বললেন, গম্ভীর গলায়, তোমার তাই মনে হয়?

আজ্ঞে।

বাপি, তোমার গলার স্বর শুনে মনে হচ্ছে, "শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর" ভেবে তুমি মুষড়ে পড়ছ। তোমার কোনও ভয় নেই। তোমার মেয়েরা তোমার না-থাকা ছেলেদের চেয়েও অনেক ভালো করে দেখবে তোমাকে। তাছাড়া তুমি তো আমাদের বাবা-ই শুধু নও, তুমি যে আমাদের মা-ও।

এর জন্যে কি মেয়েদের শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতাই দায়ী বলে আপনি মনে করেন স্যার?

ঐশিকা ফৌজদারি আদালতের উকিলের মতো প্রশ্ন করল কর্বুরকে।

না, তা নয়। দায়ী আমি কোনও পক্ষকেই করছি না। দায়ী যদি কারোকে করতে হয় তবে এই সময়কেই করতে হয়। আমরা আগের প্রজন্মের তুলনাতে অনেকই বেশি অধৈর্য হয়ে গেছি। যা-কিছুই পাওয়ার, তা আমরা এখুনি চাই। Right now! কোনও কিছুরই জন্যেই অপেক্ষা করার সময় নেই আমাদের। জীবনের সব ক্ষেত্র থেকেই ধৈর্য ব্যাপারটাই উবে যাচ্ছে। Most Volatile of all Qualities.

বাপিদের সময়ে জীবন এত তো টেনশান-এরও ছিল না। দাম্পত্যজীবন শুরুও হত অনেক তাড়াতাড়ি। পুরুষ রোজগার করত, বাইরেটা সামলাত, আর মেয়েরা আনন্দে সংসার করত, ছেলেমেয়ে মানুষ করত। পুরুষ ও নারীর ভূমিকাটা কমপ্লিমেনটারি ছিল। আজকের মতো এমন কমপিটিটিভ ছিল না। বাইরেও প্রতিযোগিতা, ঘরের মধ্যেও প্রতিযোগিতা। সবসময়েই এখন দুজনেই দুজনের প্রতিযোগী। হারতে কেউই রাজি নয়। "হাম কিসিসে কম নেহি" মানসিকতা ছিল না। মানিয়ে নেওয়াটা ছেলেবেলা থেকেই মায়েরা শেখাতেন মেয়েদের। মানিয়ে নেওয়ার মধ্যে কোনওরকম হীনম্মন্যতাও ছিল না। এখন তেমন আর হয় না, তাই সুখী হওয়াটাই ভারী কঠিন হয়ে গেছে।

ঐশিকা বলল দুঃখ দুঃখ গলায়।

ব্যানার্জিসাহেব বললেন, সুখ যে কী, সুখ যে কাকে বলে, তা তো ভুলেই গেছিস তোরা। হয়তো কখনও জানতেও চাসনি। এখন মানুষের জীবনে আরাম আর সুখ এক হয়ে গেছে। সিনোমিনাস। ছেলেবেলায় বার্ট্রান্ড রাসেল-এর বই পড়েছিলাম, তাতে উনি লিখেছিলেন, "উই ড্যু নট স্ট্রাগল ফর এগজিস্টেন্স, উই স্ট্রাগল টু আউটশাইন আওয়ার নেবারস।" আরও চাই, আরও আরও। প্রতিবেশীর যা আছে, তার চেয়ে আমার বেশি চাই। তোমাদের চারখানা গাড়ি আছে তো আমার সুখী হবার জন্যে অন্তত পাঁচখানা গাড়ি চাই-ই-চাই। মানুষের পয়েন্ট অফ ভিউই সব গোলমাল হয়ে গেছে। সব কিছু জড়িয়ে মড়িয়ে HOTCH POTCH হয়ে গেছে।

একটু চুপ করে থেকে বললেন, রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতা ছিল না? একটা? "যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।"

ঠিক।

কর্বুর বলল।

তারপর বলল, এই ইউনাইটেড স্টেটস দেশটাই জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে সারা পৃথিবীর পরিবেশটাকেই

দূষিত করে দিল। এইডস-এর চেয়েও মারাত্মক এই রোগ। শব্দ দূষণ, বায়ু দূষণ এসব এই মানসিকতার দূষণের সঙ্গে তুলনীয়ই নয়। মানুষ যদি নিজেকেই নষ্ট করে ফেলে তাহলে তার টাকাপয়সা, বাড়ি-গাড়ি, নির্মল পরিবেশ দিয়ে হবেটা কী?

ঠিকই বলেছ তুমি কবু।

ব্যানার্জিসাহেব বললেন।

তারপর দুই মেয়েকে একটু ভর্ৎসনার সুরেই বললেন, অনেক তত্ত্বকথা হয়েছে। এবারে একটু চুপ করে দু পাশের দৃশ্য দেখো।

পথের পাশের গাছগুলো দেখিয়ে গৈরিকা কর্বুরকে জিজ্ঞেস করল, এই গাছগুলো কি সবই শাল?

অধিকাংশই। সারান্ডার শালবন তো বিখ্যাত।

সাহেবরা কি সত্যিই পাহাড়গুলো একেক করে গুনেছিল যে সারান্ডাকে বলা হয় "ল্যান্ড অফ সেভেন হান্ড্রেড হিলস"?

ঐশিকা জিজ্ঞেস করল।

শুনেছি তো তাই।

ব্যানার্জিসাহেব বললেন, গোঁজামিল ব্যাপারটা তো ওদের চরিত্রানুগ ছিল না। ওদের অনেক গুণও ছিল কিন্তু আমরা দোষগুলোকেই বড় করে দেখেছিলাম। ওরা চলে যাবার পরে এখন ওদের গুণগুলো দীপ্তি পাচ্ছে।

তা হবে। আমরা তো আর সেই প্রজন্মের সাহেবদের দেখিনি।

ঐশিকা বলল।

৬

কুমডি বাংলোটা ছোট। বনবাংলোর তুলনাতে একটু চাপা। কিন্তু সুন্দর। তবে বনবাংলোর যা সবচেয়ে বড় আকর্ষণ, চওড়া বারান্দা তা এই বাংলোতে নেই। কেন নেই, তা জানে না কর্বুর।

বাংলোর সামনে থেকেই পথ ঢালু হয়ে নেমে গেছে নদীতে। সেই নদীর ওপর বাঁধ বাঁধা হয়েছে একটা। ছেলেবেলাতে যখন আসত তখন বাঁধ ছিল না। ওই পথই চলে গেছে থলকোবাদ।

কুমডিতে পৌঁছতে পৌঁছতে দুপুর গড়িয়ে গিয়েছিল। ভালো মন্দ খেতে খেতে আরও দেরি। শুধু বনভ্রমীই তো নন ওঁরা, বনভ্রমণ কাম চড়ুইভাতি করতেই এসেছেন। এঁদের কাছে ব্যাখ্যা করে বলে লাভ নেই যে বনভ্রমণ আর বনভোজন এক নয়। বললে, ভাববেন 'জ্ঞান দিচ্ছে'। এমনিতে তো "জ্ঞানদাতা" উপাধি পেয়েই গেছে।

খাওয়াদাওয়ার পরে ব্যানার্জিসাহেব শুয়েছেন। তিনটি ভডকা খেয়েছিলেন গন্ধরাজ লেবু দিয়ে। তারপর সুগন্ধি ভাত, বেগুনভাজা, ভাজা মুগের ডাল, নারকোল-কুচি দেওয়া, পাহাড়ি নদীর পাড়হেন মাছ ভাজা, মুচমুচে, বড়বিল থেকে আনা কচি-পাঁঠার মাংস, হাতুহাতুর দোকানের রাবড়ি।

ঘুম, কর্বুরেরও পেয়েছিল। কারণ, খেতে বসে দুই কন্যা তো শুধু গন্ধ শুঁকেই উঠে গেলেন, ফিগার-কনশাস এমনই। জমিয়ে খেলেন ব্যানার্জিসাহেব আর কর্বুরই। তাছাড়া গতরাতের নাটকের পর আলাপ-আলোচনাতে এবং বাড়ি ফিরেও খাবার টেবিলে বসে বাবা, মা আর কাকির সঙ্গে গল্প করতে করতে খেতে অনেকই দেরি হয়েছিল।

কাল সারারাত যেন এক ঘোরের মধ্যে ছিল। রূপমতী-রূপী শিখীর প্রসাধিত আলো-পড়া মুখটি

রাতে বার বার ঘুরে ফিরে এসেছে। সে কাল একটা পারফিউম মেখেছিল তার নাম নাকি 'রেড ডোর'। 'রেড ডোর'-এর সুগন্ধে ম ম করছিল শিখী। প্রত্যেক মেয়ের মধ্যেই অনেকজন মেয়ে থাকে বোধহয়। একেক সময়ে একেক জন বাইরে আসে। সেই বিভিন্নরূপী বিভিন্ন সত্তার কোন জনের হাতে যে কোনও পুরুষ কখন অনবধানে বধ হবে তা একমাত্র বিধাতাই জানেন। পুরুষমাত্রেরই যা দুর্বলতা, তাই নারীমাত্ররই বল। একটু দেখা, একটু ছোঁয়া, একটু বিলোল চাউনি, একটু হাসি, একটু অভিমান দিয়ে যে-কোনও নারী অবহেলে যে-কোনও পুরুষকে বধ করতে পারে। এ বিধাতারই চক্রান্ত। পুরুষকে ভঙ্গুর করে তিনিই গড়েছেন। আসলে FRAGILE মেয়েরা নয়, পুরুষেরাই।

শিখীকে কাকির কেন অত অপছন্দ বোঝে না কর্বুর। কর্বুরের তো খারাপ লাগে না মেয়েটিকে। তা ছাড়া তাদের শিকড়ও এ অঞ্চলেই পোঁতা। এই প্রাকৃতিক পরিবেশে লোহা আকরের নীল আর ম্যাঙ্গানিজ আকরের লালের গুঁড়ো এবং নদীর বুকের সোনার গুঁড়ো নিয়ে খেলা করেছে ছেলেবেলাতে। শাল, মহুয়ার ছায়াতে ঘুরেছে। সারহুল উৎসবে হো-মুন্ডাদের সঙ্গে নেচেছে। ছোট্ট কিন্তু নিরুপদ্রব শান্ত এক জগতের নির্মোকের মধ্যে মানুষ হয়েছে। দিল্লি আহমেদাবাদে পড়তে যায়নি। বড় চাকরিও করবে না। ঘরোয়া বউ হবে। স্বাবলম্বনের নেশাতে মেতে অজানিতে উদ্ধত হয়ে উঠবে না। সে হয়তো খুশি হবে পরনির্ভরতাতেই। তার স্বামীর স্ত্রী, "হাউসওয়াইফ" বলে পরিচয় দিতে সে লজ্জিত হবে না। কর্বুরের সন্তানের মা হবে। কর্বুরের পছন্দসই রান্না করবে ছুটির দিনে। কর্বুরও তার হাউসওয়াইফ স্ত্রীর সবরকম সুখবিধান করবে। দুজনে একসঙ্গে কবিতা পড়বে, রবীন্দ্রসংগীত গাইবে, আলুচাট এবং ঘুঘনি খাবে। দুজনেই দুজনের ওপর প্রচণ্ড নির্ভরশীল হবে। নির্ভরতা তো শুধু আর্থিকই হয় না, কত ব্যাপারেই মানুষ পরনির্ভর হয়।

আগেকার দিনে স্বামীরা রোজগার করত আর স্ত্রীরা ঘর সামলাত। দুজনের সুস্থ ও খুশি দাম্পত্যজীবন, অবসর, হাসিগল্পের সময়, ছেলেমেয়েদের নিজেদের পছন্দমতো মানুষ করে তোলাতেই তাদের সব আনন্দ-আহ্লাদ ছিল। সন্তানদের মানুষ করার শিক্ষা নিয়েই ভাবতেন তাঁরা, তাদের নিছক টাকা রোজগারের মেশিন করে তোলাই একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। অর্থ আর সুখ যে সমার্থক নয়, এই সব কথা আজকালকার কম ছেলেমেয়ে এবং তাদের মা-বাবারাই বোঝেন। কর্বুরের মনে হয়, বিয়ের পরে সুখী আমাদের হতেই হবে, দুজনের দুজনকে মেনে নিতেই হবে, To burn the bridges behind অ্যাটিচ্যুড নিয়েই দম্পতিকে এগোতে হবে বিয়েকে সফল করার জন্যে। তাহলেই কথায় কথায় ছাড়াছাড়ি-বিচ্ছেদ হবে না। বিধাতা আর কোন্ মানুষকে সর্বগুণসম্পন্ন করে গড়েছেন। একজনের মধ্যে অন্য জন যা চায় তার সব সে কখনোই পাবে না, এটা মেনে নিয়েই অস্বস্তিটুকুকে মানিয়ে নিতে হবে। কিন্তু গৈরিকা ঐশিকারা এতই উচ্চশিক্ষিত এবং উপার্জনক্ষম, তাদের কি অত ধৈর্য থাকবে মানিয়ে নেওয়ার? "হাম কিসিসে কম নেহি" দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চললে সম্পর্কটা চিরদিনই প্রতিযোগিতারই থাকবে, পরিপূরক হয়ে ওঠা হবে না কখনোই একে অন্যের এক জীবনে।

গৈরিকা শুয়েছে বাবার পাশে। বাবাকে ছেড়ে কিছুদিন পরেই চলে যাবে বলেই হয়তো বাবার একটু বেশি কাছে থাকতে চায় সে। কে যে কী করে, কেন করে, তাতো সে নিজে ছাড়া অন্যে কেউই বোঝে না।

কর্বুর, বাংলোর গেট থেকে একটু দূরে মহুয়া গাছের নীচে একটা ইজিচেয়ার চৌকিদারকে দিয়ে আনিয়ে নিয়ে তাতে বসে আছে। তার কোলে রামচন্দ্র গুহার লেখা SAVAGING THE CIVILIZED বইটি খোলা আছে। ভেরিয়ার অ্যালউইনের উপরে লেখা বই। শিখীই বইটি দিয়েছে কর্বুরকে। মহড়া চলাকালীন।

এ কদিন, মানে, যতদিন মহড়া চলেছিল 'মহড়া' নাটকের, ততদিন যেন একটা নেশার মধ্যেই

ছিল ও। নাটক মঞ্চস্থ হয়ে যাওয়ার পরে দুর্গাবাড়ির মণ্ডপ খোলার সঙ্গে সঙ্গে সবই কেমন ফাঁকা-ফাঁকা। গোরু চরবে বাইরে, দুর্গাবাড়ির ভিতরে চড়ুইদের সভা, মাঝে মাঝে দাঁড়কাক অঙ্কের মাস্টারমশাইয়ের মতো এসে চড়ুইদের তাড়া দিয়ে যাবে। তেমনই হচ্ছে আজ নিশ্চয়ই।

চোখদুটো খোলা বইয়ের পাতাতে নিবদ্ধ ছিল কিন্তু বইয়ের পাতা সে দেখছিল না। দেখছিল, একটি কাঠবেড়ালি শরতের দুপুরের নরম রোদে কোথা থেকে কী একটা ফল নিয়ে এসে তাকে কবজা করার চেষ্টা করছে। রোদ আর ছায়ার ঝিলিমিলি চলছে নদীর জলে, ঘাসে পাতায়। বর্ষার পরে জল পেয়ে মহুয়া গাছের শাখাতে-উপশাখাতে পাতাগুলো সতেজ সবুজ হয়েছে। চোখ বইয়ের উপরে পড়ছিল মাঝে মাঝে কিন্তু মন তার ঘাসফড়িং-এর মতো সেই আলোছায়ার শতরঞ্জির উপরে এক্কা-দোক্কা খেলছিল। একা-একা।

হঠাৎই চমকে উঠল, 'কী করছেন?' শুনে।

দেখল, ঐশিকা।

কখন যে গেট খুলে এতটা হেঁটে এসেছে, শব্দ পায়নি। শীত বা গ্রীষ্ম হলে শুকনো পাতার মচমচানি শুনতে পেত।

ওকে দেখেই দাঁড়িয়ে উঠল কর্বুর।

বলল, বসুন।

ঐশিকা হাসল।

রহস্যময়ী হাসি।

সেই প্রথমবার ভালো করে লক্ষ করল কর্বুর ঐশিকাকে। খাবার টেবিলে ও পাশে বসেছিল। যে পাশে থাকে, তাকে ঠিকমতো দেখা যায় না। খাওয়ার টেবিলে অথবা জীবনেও। একে অন্যের মুখোমুখি হতে হয়। এই সত্যটা হঠাৎ হৃদয়ঙ্গম করল ও।

কী বই এটা?

SAVAGING THE CIVILIZED.

কার লেখা?

রামচন্দ্র গুহা।

প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে ঐশিকা বলল, আপনি খাবেন?

কী?

হজমি।

না।

একটা না হয় আমার অনুরোধে খেলেনই।

দিন। আপনারা দু বোন তো দুপুরে খেলেন তো না, যেন শুঁকলেন। ওই খাবার হজম করার জন্যেই হজমি খেতে হচ্ছে?

হজম করার জন্যে নয়।

তবে খাচ্ছেন কেন?

অব্যেশ।

ইচ্ছে করে 'স'-কে 'শ'র মতো উচ্চারণ করল।

ঐশিকা বলল, ইজিচেয়ারে না বসেই।

বলল, আপনি না বসলে, এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে তো আমায় চলেই যেতে হয়। নাটক করে করে নাটুকে হয়ে গেছেন।

তারপরই বলল, আচ্ছা আমি না হয় ইজিচেয়ারের হাতলটার উপরেই বসছি। যা লম্বা হাতল। ভেঙে যাবে না তো?

ভাঙবে না। তবে হাতল না বলে পাতোল বলাই ভালো। সাহেবরা শিকার করে এসে ক্লান্ত হয়ে এই হাতলটা লম্বা করে দিয়ে পা তুলে দিয়ে আরাম করত।

পা তুলে দিলে আরাম হয় বুঝি?

হয় না? ব্লাড সার্কুলেশন রিভার্সড হয় তো। আরাম হতেই হবে। যেদিন থেকে হাঁটতে শিখি আমরা সেদিন থেকেই তো মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ক্রমাগত রক্তকে টানছে নীচের দিকে। পা তুলে থাকলে হৃদয় আরাম পায়।

জিভ দিয়ে হজমিটাকে মুখের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে করতে ঐশিকা হঠাৎ টাক করে জিভ দিয়ে একটা শব্দ করল। আশ্চর্য! কাঠবেড়ালিটা এতক্ষণ ওদের কথাতে ভয় পাইনি একটুও। ওই টাক শব্দতেই ভয় পেয়ে দৌড়ে চলে গিয়ে একটা আমলকী গাছে উঠে গেল।

কী সুন্দর। না?

ঐশিকা সেদিকে তাকিয়ে বলল।

ঐশিকা একটু পরে বলল, সত্যি। আপনি কত জানেন। এমন জ্ঞানী পুরুষমানুষ আগে কখনও দেখিনি। এতদিন ভাবতাম, আমার বাপিই একমাত্র জ্ঞানী।

আপনার বাপি কি পুরুষমানুষ নন?

বাপি পুরুষমানুষ ছিলেন নিশ্চয়ই আমার মায়ের কাছে। আমার কাছে তিনিই শুধুই বাপি। উভলিঙ্গ। বাবাও বটে মাও বটে।

তারপর বইটা তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করতেই দেখতে পেল যে শিখী দিয়েছে বইটা কর্বুরকে।

শিখী কে?

মাণ্ডুর রূপমতীর ভূমিকাতে যে মেয়েটি অভিনয় করেছিল। বললাম না। আসার সময়ে!

ওঃ। শি ইজ ভেরি গুড। দেখতেও যেমন সুন্দরী অভিনয়ও তেমনই ভালো করেন।

আমার তো ধারণা মেয়ে মাত্রই ভালো অভিনেত্রী।

তাই?

হুঁ।

কেন মনে হয়?

মনে হয়।

বোকা বোকা হল কথাটা। আপনার মতো বুদ্ধিমানের মুখে মানাল না।

আমি বুদ্ধিমান সে কথা আপনাকে কে বলল?

বলেছেন অনেকেহ।

কে বলুন না?

তাদের মধ্যে একজন পদ্মাদি।

কাকির মতটা মত বলে ধর্তব্য নয়।

আমি অন্যের মতে সায় দিই না কখনও। নিজের মতেই চলি।

তাহলে বলছেন কেন?

বলছি, নিজের মতটাও তাই বলছে বলে।

কেন?

আপনার মুখই বলে যে আপনি বুদ্ধিমান, আপনার চোখ, আপনার কথাবার্তা। কী পুরুষের কী

নারীর, বুদ্ধির প্রসাধনের মতো কোনও প্রসাধনই আর নেই। বুদ্ধিই আপনার মুখটিকে প্রসাধিত করেছে।

আপনারও।

তাই? ভাগ্যিস বললেন।

আপনি তো দেখছি খুব ওভার-কনফিডেন্ট নিজের সম্বন্ধে।

নিজেদের ওপর কনফিডেন্স-এর অভাবেই তো মেয়েরা এত হাজার বছর ধরে আপনাদের তাঁবেদারি সয়েছে, এখনও সইছে ইসলামিক সব রাষ্ট্রে, তাই কনফিডেন্সটা মেয়েদের পক্ষে অত্যন্তই জরুরি।

ঐশিকা একবার ইজিচেয়ারের ডান হাতলে আরেকবার বাম হাতলে বসছিল।

আপনি তো ভারী চঞ্চল। মনে হয়ে কিন্ডার-গার্টেনের ছাত্রী।

তাই? ভালোই তো। যতদিন ছোট থাকা যায়। বড় আর বুড়োর মধ্যে বিশেষ তফাত আছে কি? আজ যে বড়, কাল সে বুড়ো।

উত্তর না দিয়ে তাকিয়েছিল কর্বুর ঐশিকার দিকে।

বাঙালির তুলনায় বেশ লম্বা সে। একটা সাদা-কালো ডুরে তাঁতের শাড়ি পরেছে। সাদা ব্লাউজ। শ্যাম্পু করা প্রায় হাঁটুসমান চুল মেলে দিয়েছে পিঠের পরে। কালো টিপ পরেছে একটা। অ্যানোডাইজ করা লোহার একটা মটর মালা গলাতে। ওইরকমই বড় বড় দানার বালা বাঁ হাতে। ডান হাতে কালো ব্যান্ডের সাদা ডায়ালের হাতঘড়ি। দারুণ একটা খুশবু উড়ছে। তা ঐশিকার চুল থেকে, না মুখ থেকে, না কানের লতি থেকে, না স্তনসন্ধি থেকে বুঝতে পারছে না কর্বুর। কিন্তু খুশবুটা উড়ছে বিলক্ষণ।

শিখীর পারফ্যুমের কথা মনে হল কর্বুরের। RED DOOR। কিন্তু এই গন্ধটা আরও অনেক গাঢ়, প্রায় ঐন্দ্রজালিক।

কী পারফ্যুম মাখেন আপনি?

আমি ভারতীয় নারী। আতর মাখি। জীবনে বিদেশি পারফ্যুম মাখিনি।

সত্যি?

এটা আতরের গন্ধ? কী নাম এই আতরের?

ভালো লেগেছে আপনার?

হুঁ।

এর নাম ফিরদৌস। ভালো লাগলেই ভালো। পৃথিবীর সব গন্ধই তো পরপ্রত্যাশী।

অনেক রকম হয় বুঝি আতর?

নিশ্চয়ই। এক এক ঋতুতে একেক আতর মাখতে হয়। তবে নিজের নিজের রুচি মতোই মাখতে হয়। যেমন আপ রুচিসে খানা, পর রুচিসে পিন্না তেমনই প্রেমিক বা প্রেমিকা যে গন্ধ ভালোবাসে সেই সুগন্ধিতে সুরভিত হওয়াই রেওয়াজ।

যখন প্রেমিক বা প্রেমিকার মন জানা থাকে না?

হেসে ফেলে ঐশিকা বলল, তখন আপ রুচিসে। যেমন, আমি মেখেছি।

কর্বুর লক্ষ করল যে হাসলে, ঐশিকাকে আরও অনেক বেশি সুন্দরী লাগে।

কী কী আতর হয়?

জিজ্ঞেস করল কর্বুর।

কত্ত রকম। গরমে থস্‌স্‌। হিম্বা, গুলাব, শীতে অম্বর, মুশ্‌ক, বসন্তে রাত-কি রানি, জুঁই আরও কত রকম আছে।

[illegible]

আতরওয়ালা আসে জৌনপুর থেকে বছরে একবার। দিল্লি, বম্বে, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, ভোপাল, হায়দ্রাবাদ, ইলাহাবাদ নানা জায়গাতেই পাওয়া যায়। যে শহরেই একটি করে চাঁদনি-চওক আছে সেই শহরেই জানবেন আতরের দোকানও আছে অনেক। এটা তো মুসলমানি সংস্কৃতি। আসলে খাওয়াদাওয়া, গানবাজনা, শিল্প-টিল্প, সুরভি-টুরভির চর্চা মুসলমানেরাই হিন্দুদের চেয়ে অনেকই বেশি করেছে। রাজা-মহারাজাদের চেয়ে নবাব-বাদশাদের দাপটতো প্রবলতর ছিল দিল্লির দরবারে।

বলেই বলল, বাঃ। দারুণ লিখেছে তো আপনার শিখী?

কী?

অবাক হয়ে বলল কর্বুর।

কর্বুরদা, "কী করে কলঙ্কে যদি সে আমারে ভালোবাসে"—শিখী।

কই? তাই লিখেছে বুঝি? দেখি।

অবাক এবং একটু লজ্জিত হয়ে বলল কর্বুর।

দেখুন।

বলে, বইটা এগিয়ে দিল কর্বুরের দিকে।

তারপরেই বলল, বেচারি শিখী। যাকে এমন ট্যানজেন্ট-এ প্রেম নিবেদন করল সেই জানল না। হতভাগিনী আর কাকে বলে।

কর্বুর রেগে গেল।

বলল, প্রেম নিবেদন করবে কেন? নিশ্চয়ই কারও কবিতা কোট করেছে।

তাতো নিশ্চয়ই। নিজ মুখে যে কথা বলতে সংকোচ হয় সে কথা পরের গাওয়া গান বা লেখা কবিতা দিয়েই বলে এসেছে চিরদিনই মানুষ একে অন্যকে। তবে কবিতা নয়, ওটি একটি গান। এবং অবশ্যই প্রেমের গান। আপনিই তো বললেন...

তারপর একটু থেমে ভেবে বলল, আপনিই বললেন কি? না, পদ্মাদি? যে শিখী আগ্রা ঘরানার হেরম্ব চ্যাটার্জির কাছে উচ্চাঙ্গ সংগীত শেখে।

বলেই বলল, কিন্তু ওই গানটি তো উচ্চাঙ্গ সংগীত নয়।

তবে? নিম্নাঙ্গ-সংগীত?

কর্বুর বলল।

খুব জোরে হেসে উঠল ঐশিকা। ওর উচ্চকিত হাসি শুনে কাঠবেড়ালিটা আমলকী গাছ থেকে *নেমে এসে কিছুটা দৌড়ে গিয়ে একটা কেলাউন্দার ঝোপের মধ্যে ঢুকে গেল।*

এইজন্যেই বিজ্ঞজনেরা বলেন যে কখনও রেগে উঠতে নেই। তবে যাই হোক, রাগের মাথায় বলে ফেলা আপনার কথাটা এবারে চালু করে দেব। নিম্নাঙ্গ সংগীত। দারুণ।

ঐশিকা বলল।

তারপর বলল, ওই গানটা শোনায়নি আপনাকে শিখী কখনও?

না তো।

শুনবেন? আমি জানি। শিখীর তরফে [illegible] ...নাতে পারলে রাগ করবে হয়তো।

কেন? রাগ করবে কেন?

[illegible] তার তূণের তির কি [illegible]

[illegible] পনি বড়ই ফেনিয়ে [illegible]

[illegible]

কী করব। নিস্তরঙ্গ জলে ঢেউ তুলতে হলে কিছু তো একটা করতে হয়ই।

কর্বুর বুঝতে পারছিল যে ভিতরে ভিতরে সে বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। ঐশিকা সত্যিই সুন্দরী। এতখানি সুন্দরী যে, তা আশ্চর্য! আগে একটুও বুঝতে পারেনি। তাছাড়া সুন্দরীই শুধু নয়, প্রচণ্ড রসবোধসম্পন্ন এবং রীতিমতো বুদ্ধিমতীও। দুষ্টুও আছে বেশ। কর্বুরের কলেজের বন্ধু বিনোদানন্দন পান্ডে মেয়েদের মধ্যে যে গুণটিকে 'নামকিন' বলত সেই গুণটিও তার মধ্যে যেন অধিক পরিমাণেই বিদ্যমান। সত্যি কথা বলতে কী, ঐশিকা যে কেন কাকিকে এমন করে বশ করেছে এখন তা বুঝতে পারছে একটু একটু। এতদিন বেশি মেয়ের সঙ্গে মেশেনি যে কর্বুর, তা ঠিকই, মেয়েদের সম্বন্ধে তেমন কোনও বিশেষ আকর্ষণ বা ঔৎসুক্যও ছিল না। কাকিই ছিল তার ধারণা, মেয়েদের সম্বন্ধে। ঐশিকা যেন প্রথম বর্ষার ঝরনার বান-এর মতো সেই সব ধ্যান-ধারণা ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তার পায়ের নীচের মাটি ক্রমশ সরে যাচ্ছে। সবচেয়ে ভাবনার কথা, এ পর্যন্ত অন্য কারোকেই দেখে বা কারও সঙ্গেই মিশে এমন শারীরিক আকর্ষণ বোধ করেনি আগে। ভিতরে ভিতরে ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে, নিজের সম্বন্ধে বেশ উচ্চধারণাসম্পন্ন কর্বুর সেন।

কর্বুর চুপ করেই ছিল।

শরতের দুপুর। প্রকৃতির মধ্যে বিকেল গড়িয়ে যাচ্ছে, বুনো হাঁস যেমন অবলীলায় নদীর বালি ছেড়ে জলে নামে এতটুকু ঢেউ না তুলে, তেমন করে। একটা কপারস্মিথ পাখি ডাকছে নদীর এপার থেকে। স্যাকরার মতো ঠুকঠাক করছে। আর ওপার থেকে তার দোসর সাড়া দিচ্ছে। আর একটু বেলা পড়ে এলেই র‍্যাকেট-টেইলড ড্রঙ্গো তাদের ধাতবগলার তীক্ষ্ণ ডাক ডাকতে শুরু করবে। দিনশেষে নদীর ওপরে চমকে চমকে ডেকে বেড়াবে ওয়াটেলড ল্যাপউইঙ্গ।

সেইসময়ে হঠাৎই একঝাঁক বুনো হাঁস নদীর বাঁধের জলে উড়ে এসে বসল।

ওগুলো কী পাখি?

ঐশিকা শুধোল।

জলের পাখি। বুনো হাঁস।

নাম কী?

কটন টিল।

কোথায় ছিল?

কে জানে?

প্রতিবছর শরতের গোড়া থেকেই ওরা পৃথিবীর সব শীতার্ত দেশ থেকে উড়ে আসতে আরম্ভ করে আমাদের দেশে।

কেন আসে?

একটু উষ্ণতার জন্যে।

তাই? হাঁসেরাও মানুষদেরই মতো তাহলে।

ওই নামের একটি উপন্যাস আছে। পড়েছেন কি? ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জের পটভূমিতে লেখা। আমার খুব প্রিয় উপন্যাস।

কর্বুর সামনে বসে-থাকা ঐশিকার চোখে চেয়ে বলল।

তাই? কিন্তু পড়িনি।

তারপরই কথা ঘুরিয়ে ঐশিকা বলল, স্যার বইটা পড়ে ফেলুন।

স্যার কেন? আমি কি মাস্টারমশাই?

না সেজন্যে নয়। আমি যে টিভি কোম্পানিতে জয়েন করছি একমাস বাদে, সেখানকার নিয়ম

রপ্ত করছি। আমার মালকিন বলে দিয়েছেন, যাকেই ইন্টারভ্যু করতে যাবে তিনি গোরু-ছাগল হোন কী প্রচণ্ড প্রতিভাধর, সকলকেই "স্যার" বলে সম্বোধন করবে। অথবা "ম্যাডাম"। আর সবসময়েই পুরুষদের একটা বিশেষ দূরত্বে রাখার চেষ্টা করবে। পুরুষেরা হনুমানের জাত। দড়ি ঢিলে দিলেই ঘাড়ে এসে উঠবে। বিশেষ করে কবি-সাহিত্যিকেরা। খুব সাবধানে হ্যান্ডল করবে তাদের।

তার সঙ্গে আমার কী?

না। বললামই তো, স্যার বলাটা প্র্যাকটিস করছি আর কী।

তারপর বলল, ওই হাঁসেরা কোন কোন দেশ থেকে আসে?

কত দেশ। সাইবেরিয়া, রাশিয়া, বেলো-রাশিয়া, নর্ডিক-কান্ট্রিজ। প্রতিবছরই আসে আবার গরম পড়বার আগে আগেই ফিরে যায়। সব পরিযায়ী পাখি এরা।

পরিযায়ী মানে কী?

মানে?

মানে কী?

ও। ইংরেজি প্রতিশব্দ না বললে তো আজকালকার উচ্চশিক্ষিত বাঙালিরা মানে বোঝেন না অনেক বাংলা শব্দেরই। কী বিপদের কথা।

ওঃ। আপনি বাপিকেও হার মানাবেন দেখছি সার্মোনাইজিং-এ।

কর্বুর বলল, মাইগ্রেটরি। Migratory। বানান করে বলল তার পরে।

কী কী হাঁস আসে?

বললাম না, কত হাঁস। গার্গনি, পিনটেইল, ম্যালার্ড, পোচার্ড, পিংক-হেডেড পোচার্ড, গিজ, শোভেলার, বাহমিনি ডাকস্, যাকে সংস্কৃতে বলে চক্রবাক আর বাংলাতে চখাচখি আরও কত পাখি।

আপনি পাখি সম্বন্ধে যত জানেন গোরু-ছাগলদের সম্বন্ধেও কি ততই জানেন?

কর্বুর সাবধান হয়ে গেল।

বলল, হঠাৎ এই প্রশ্ন।

না, এমনিই জিজ্ঞেস করলাম। পরক্ষণেই বলল, কিন্তু এখানে জল কোথায়?

এই সাতশো পাহাড়ের দেশে জলের আকাল তো আছেই, এই সব জলের পাখি, জলা জায়গাতেই আসে, নানা হ্রদ-এ, ঝিল-এ, বিলে-বাদায়। ড্যাঙার পাখিও আছে অনেক, পরিযায়ী, মানে মাইগ্রেটরি। সারান্ডায় কোয়েল, কারও, কয়না ছাড়া নদী নেই। আর সেও সব পাহাড়ি নদী। জলের পাখি এখানে বেশি আসবে কেন?

উষ্ণ হয়ে গেলেই তারা আবার ফিরে যায়?

হ্যাঁ তাই। শুধু পাখিই কেন? মানুষও তো একটু উষ্ণতার জন্যেই ঘুরে মরে সারাজীবন।

তা ঠিক। কিন্তু আমি আবার এমন মানুষও দেখেছি, বিশেষ করে পুরুষ মানুষ, তারা তপ্ত খোলাতে হর্স-চেস্টনাট-এর বীজের মতো ভাজা হওয়ার পরও তাদের শীত কাটে না।

কর্বুর ঐশিকার দেওয়া বাম্পারটা খেলবে ঠিক করল। বলল, প্রয়োজনের তুলনাতে এবং বয়সের তুলনাতে আপনার অভিজ্ঞতা একটু বেশি হয়ে গেছে। আপনার সারল্য চলে গেছে। আপনি টোটালি কনফিউজড হয়ে গেছেন। ব্যানার্জিসাহেব আপনাকে আদরে একেবারে গোবর করেছেন।

অসার অথবা অসাড় যারা, তাদের তো ফুল-ফোটাবার জন্যে গোবরের সারই লাগে। কি? লাগে না?

কর্বুর চুপ করে থাকল।

কী জ্যাঠামশায়ের মতো হাতোল ইজিচেয়ারে বসে আছেন আপনি। চলুন না নদীর দিকে একটু বেড়িয়ে আসি। চৌকিদার তো বলছিল, অন্ধকার হলেই গেট থেকে বেরুনো মানা।

রাতে, জিপে করে বেরোব আপনাদের নিয়ে। সঙ্গে স্পটলাইট নিয়ে এসেছি। অনেক কিছু জানোয়ার দেখতে পাবেন।

তাই? কিন্তু সে তো রাতে। আর্টিফিসিয়াল আলোতে। দিনের বেলায় দেখার মতো আনন্দ তো হবে না।

তা হবে না। কিন্তু আপনি যতই সুন্দরী হোন না কেন, জানোয়ারদের তো আপনার প্রতি কোনও ইন্টারেস্ট নেই। আপনাকে দেখতে বা দেখা দিতে তারা আড়াল ছেড়ে বেরোবে কি? তাছাড়া এই সব অঞ্চলে হাতি অনেক। এবং ভাল্লুকও। এরা আনপ্রেডিকটেবল। প্রতি বছরই অনেক মানুষ মারা যায় এখানে তো বটেই, কিরিবুরু, গুয়া, মেঘাতিবুরু, নোয়ামুণ্ডির খাদান এলাকার আশেপাশে।

ধ্যুৎ। আপনি একটি রিয়্যাল জ্যাঠামশাই। ভয়েই মরলেন। আমি একাই যাচ্ছি।

এখানে চুপ করে বসুন। বনের মধ্যে কতরকম শব্দ, গন্ধ, শুনুন, অনুভব করুন। জানেন কি? দেখা দুরকম হয়। এক, নিজে দৌড়ে বেরিয়ে দেখা আর দুই...।

বাংলোর গেট থেকে গৈরিকা চেঁচিয়ে বলল—ওই। তুই ওখানে। আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি। আচ্ছা-মানুষ তো তুই।

তুইও আয় না দিদি।

গলা তুলে বলল, ঐশিকা।

তারপর বলল, তারপর?

তারপর কী?

ওই যে বলছিলেন, দুরকম দেখার কথা। দ্বিতীয় রকম দেখার কথা তো বললেন না।

ও হ্যাঁ।

নিজে বসে থেকেই যা কিছু দেখার, শোনার, গন্ধ নেবার, সে সবকেই ধীরে ধীরে নিজের কাছে উঠে আসতে দিতে হয়, শীতের রাতে কুয়াশা যেমন নীচের খাদ থেকে ধীরে ধীরে ওপরে উঠে আসে তেমনি করেই প্রকৃতিও তার সব রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ নিয়ে আলতো পায়ে এসে আপনার কাছে ধরা দেবে, নিঃশর্তে।

ঐশিকা হাততালি দিয়ে উঠল।

চমকে উঠল কর্বুর।

গৈরিকা কিছুটা এগিয়ে এসেছিল, বলল, কী হল?

কী হল না, তাই বলো। আরে ইনি তো পোয়েট। যা একখানা বর্ণনা দিলেন না। দ্বিতীয় রকম দেখার।

কী বলছিস কী?

গৈরিকা আরও এগিয়ে এসে কর্বুরকে বলল, হাই!

হাই!

বলল, কর্বুর।

বাবাঃ আপনিও দেখি আমেরিকান হয়ে গেলেন। দিদি না হয় আমেরিকা যাবে বলে যাকে তাকে হাই! হাই! বলে প্র্যাকটিস করছে।

চাকরি করবেন বলে আপনিও যেমন যাকে তাকে স্যার বলে যাচ্ছেন।

কর্বুর বলল।

ঐশিকা হেসে বলল, আহা। উপায় কী আছে? ভালো চাকরি। দারুণ স্যালারি দেয়। চাকরিটা রাখতে হবে তো। তাই স্যার বলা প্র্যাকটিস করছি। দোষ হয়েছে কি?

কীরে ওই! তুই এখনও আপনি-আজ্ঞে করে যাচ্ছিস? ব্যাপার তো ভালো মনে হচ্ছে না।

কী করা যাবে। উনি যে স্যার।

ঐশিকা বলল।

কর্বুর বলল, দূরে রাখাই ভালো আপনি আজ্ঞে করে। পুরুষমাত্র তো হনুমানের জাত।

ও কথা তুই ওঁকেও বলেছিস।

কথাটা আমার নয়, আমার মালকিনের।

সত্যি ওই, তুই ইনকরিজিবল্। তুই এসেই. ওঁর সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়েছিস?

খুবই ঝগড়াটি বুঝি উনি?

কর্বুর, গৈরিকার দিকে চেয়ে বলল।

সে আর বলতে। সেই ছেলেবেলা থেকেই।

মেয়েবেলা বল দিদি।

ওই হল।

লক্ষণসমূহ দেখে তো মনে হচ্ছে মেয়েবেলা শেষ হয়নি এখনও।

কর্বুর বলল।

ঐশিকা বলল, এখনই শেষ হবে কী? সারাজীবন ধরে চলবে আমার মেয়েবেলা। আমি কোনওদিন বুড়ি হব না।

বলেই, গৈরিকাকে বলল, দিদি, তুই আমাকে বলছিস। আমার কী দোষ বল? আমি ওঁকে এদিক ওদিক খুঁজে দেখি, আমাদের ছায়া পাছে মাড়াতে হয়, তাই উনি বাংলো থেকে এতদূরে এই পেল্লায় গাছের নীচে হাতোল-দেওয়া ইজিচেয়ারে বসে কোলের উপরে একটা বই রেখে উদাস হয়ে চেয়ে আছেন দূরে। ছবিটা ভালো লাগল। নানারকম পাখি ডাকছে। কাঠবিড়ালি দৌড়াদৌড়ি করছে, সুগন্ধ থমথম করছে চারদিকে, তারই মধ্যে স্যার এত উদাস কেন তাই দেখতে এসে কারণটা আবিষ্কার করলাম।

কী কারণ?

গৈরিকা একই সঙ্গে ঐশিকা আর কর্বুরের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল।

কারণটি ওই বইয়ের মধ্যে আছে। শিখী, ওরফে মাণ্ডুর রূপমতী স্যারকে লিখেছেন: কর্বুরদা, "কী করে কলঙ্কে যদি সে আমারে ভালোবাসে।"

তাতে তোর কী হয়েছে?

দিদিগিরি ফলিয়ে গৈরিকা দেড় বছরের ছোটবোনকে বলল।

আমার কিছুই হয়নি। কিন্তু হতে তো পারত।

এমন হেঁয়ালি কথা আমার ভালো লাগে না। আপনার লাগে?

উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই বলল, কর্বুর কারও নাম হয়। বলব বলছিস? আমিও স্যার?

বলছিই তো।

যদি বেঞ্চে দাঁড় করিয়ে দেন।

দেন তো দেবেন। যদির কথা নদীতে ফ্যাল। আমি তাহলে স্যারের মনের অবস্থাটা বর্ণনা করার জন্যে রবে ঠাক্রের একটা গানই গেয়ে ফেলি।

রবে ঠাক্রেটা আবার কী ব্যাপার?

মহারাষ্ট্রের বাল ঠাক্রে আর আমাদের রবে ঠাক্রে। দুই জাতের আইডেন্টিফিকেশন মার্ক। বলেই, গান ধরে দিল ঐশিকা।

"হেলাফেলা সারাবেলা একি খেলা আপন মনে।
এই বাতাসে ফুলের বাসে-মুখখানি কার পড়ে মনে॥
আঁখির কাছে বেড়ায় ভাসি কে জানে গো কাহার হাসি।
দুটি ফোঁটা নয়নসলিল রেখে যায় এই নয়নকোণে॥
কোন ছায়াতে কোন উদাসী দূরে বাজায় অলস বাঁশি,
মনে হয় কার মনের বেদন ভেসে বেড়ায় বাঁশির গানে।
সারা দিন গাঁথি গান কারে চাহে, গাহে প্রাণ—
তরুতলে ছায়ার মতন বসে আছি ফুলবনে॥"

গান শেষ হলে তিনজনেই অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল।

গান, যদি তেমন ভালো গাওয়া হয়, তবে তার অভিঘাত চুমুর মতন বা থাপ্পড়ের মতনও হতে পারে। শ্রোতাকে তা স্তব্ধ করে দেয় একেবারে।

নিস্তব্ধতা খানখান করে ভেঙে দিয়ে কী একটা পাখি পাগলের মতো ডেকে উঠল। পেছনের জঙ্গল থেকে।

দুই কন্যাই চমকে উঠল সেই ডাকে।

কী পাখি ওটা?

হুপী।

কর্বুর বলল।

বাঃবাঃ। ভয় পেয়ে গেছিলাম।

গৈরিকা বলল।

সত্যি। আপনি কত কী জানেন স্যার। আপনাকে যত দেখছি ততই অবাক হচ্ছি।

ঐশিকা বলল।

আমিও তাই। একই সঙ্গে এত রূপ। আপনার গান শুনতে শুনতে ভাবছিলাম যে, যে মেয়ে এত ভালো, মানে এইরকম ভাবের সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীত গাইতে পারে, সে এমন ইংরেজি-নবিশ হয় কী করে! পরিযায়ীর মানে, যাকে Migratory বলে বোঝাতে হয়।

হয়। হয়। আসলে জানতি পারেন না। একজন মানুষের মধ্যে অনেকজন মানুষ থাকে। আপনি পৃথু ঘোষকে চেনেন না?

বাবাঃ। আপনি আবার "মাধুকরী"ও পড়েছেন দেখছি। বাংলা সাহিত্যও পড়েন?

হ্যাঁ স্যার। পৃথু ঘোষ বলেনি কি ওয়াল্ট হুইটম্যানকে উদ্ধৃত করে?

কী?

"Do I contradict myself?
Very well then...I contradict myself
I am large...I contain multitudes."

৭

রাতে ওরা খেতে বসেছিল।

পাহাড়ি জঙ্গলের মধ্যে হুড-খোলা জিপে, সামনে উইন্ডস্ক্রিনের কাচ বনেটের উপরে নামিয়ে দিয়ে গেলে এপ্রিল মাসেও শীত লাগে। আর এখন তো অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহ। জঙ্গলে তো

বটেই এমন উদলা-উদোম জিপেও তো ওরা অভ্যস্ত নয়। তাই হাড়-মজ্জার মধ্যেও শীত ঢুকে গেছে। হি-হি করছে ওরা শীতে। মনে হচ্ছে, ব্যানার্জিসাহেবের কন্যাদের রাফিংয়ের শখ বোধহয় এক রাতেই উবে যাবে! তবে কর্বুর তৈরি হয়েই গিয়েছিল। ব্যানার্জিসাহেবকেও সকন্যা তৈরি হয়েই আসতে বলেছিল কাকুর মাধ্যমে। তবুও তাঁরা একটি করে হালকা শাল নিয়ে এসেছেন শুধু। তারই অর্ধেক মাথায় জড়িয়ে আর বাকি অর্ধেক ঊর্ধ্বাঙ্গে পাক মেরে তাঁরা কোনওক্রমে প্রাণ বাঁচিয়েছেন।

নয়নতারা-মেয়েদের পাছে সর্দি লাগে, তাই ফিরে এসেই গরম জলে একটি করে ভিএসওপি কনিয়াক গিলিয়ে দিয়েছেন তাদের। নিজেও পাতিয়ালা পেগ ঢেলে খেয়েছেন। জবরদস্ত পুরুষমানুষ।

মদ খেলেই কেউ জবরদস্ত পুরুষমানুষ হন না। তবে কিছু কিছু পুরুষ আছেন যাঁরা অন্যের উপরে কোনও জবরদস্তি করেন না বলেই সহজেই বোঝা যায় যে, তাঁরা জবরদস্ত। ব্যানার্জিসাহেব নিজে কোনওই গরম জামা নিয়ে আসেননি। গলায় একটি সিল্কের স্কার্ফ। ফেডেড জিনসের টপ এবং ট্রাউজার তাঁর পরনে ছিল। মাথার আধখানাই টাক তাই মাথার উপরে সাদা রঙা টুপি ছিল। তাও গলফ-খেলার টুপি—। গরম টুপি নয়। জিপে ওঠার আগে অবশ্য একটি ডাবল স্কচ মেরে গিয়েছিলেন। হাসতে হাসতে বলেছিলেন, "ভূত আমার পুত, পেতনি আমার ঝি, হুইস্কি-সোডা পেটে আছে শীত করবে কী?" জন হেইগই ওঁর প্রিয় স্কচ। থাকবেন তিন রাত কিন্তু পাছে অতিথ-বিতিথ আসে এবং কর্বুর বেশি খায়, তাই অ্যাজ আ মিজার অফ্য অ্যাবাডান্ট প্রিকশান, আধ কেস অর্থাৎ ছ'বোতল হুইস্কিই নিয়ে এসেছেন।

কর্বুর ওসব খায় না শুনে তিনি হতাশ হয়েছেন। বলেছেন, তুমি কী গো ছেলে! ইফ উই ডোন্ট ড্রিঙ্ক দেন হোয়াটস দ্যা পয়েন্ট ইন লিভিং?

কর্বুর হেসে বলেছিল, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ। আই হ্যাভ আ লট অফ আদার বিজনস ফর লিভিং।

দ্যাটস ভেরি গুড। তুমি অপছন্দ করো না তো, যাঁরা খান তাঁদের?

বারেঃ, তা কেন করব? যে যাঁর নিজস্ব মতে চলবেন।

উনি বলেছিলেন, ফাইন। তুমি তো দেখছি সিগারেটও খাও না। কোনও নেশা নেই? বুড়ো বয়েসে তো তুমি রক্ষিতা রাখবে দেখছি। যৌবনের বেশিভালোরা প্রৌঢ়ত্বে এসে বেশি-খারাপ হয়।

কী হচ্ছে বাপি। তুমিও ওঁর লোকাল গার্ডিয়ান না উনি তোমার সমবয়সি? তোমাকে নিয়ে সত্যিই চলে না। তুমি সত্যিই ইনকরিজিব্‌ল।

সরি সরি। আই অ্যাপলোজাইজ। তুমি কিছু মনে করলে না তো ভায়া?

না, না। হেসে বলল কর্বুর।

ভাবল, পোটেনসিয়াল জামাইকে কেউ ভাই বলে এমন শোনেনি কখনও আগে।

তখনও কন্যারা ভীষণই উত্তেজিত ছিল। তাদের বাবাও কম নন। রহমত চাচা আর চৌকিদার মিলে রান্না করেছে। ওরা সকলে খাবার টেবিলে এসে বসল খাবার ঘরে। মুচমুচে করে আটা ও ময়দা মেশানো পরোটা, ঝাল-ঝাল আলুর তরকারি, মেটে-চচ্চড়ি, মধ্যে টিনের আনারস দেওয়া, শুখা-শুখা বেগুন ভাজা এবং শেষে ফ্রুটপুডিং।

মেনুটা অবশ্যই কর্বুরই ঠিক করেছে। বাজারও করিয়েছিল। ওই-ই। মেয়েদের জন্যে পেপসির বোতল এনেছে বড় বড়।

ব্যানার্জিসাহেব বললেন, পাঁঠার মাংস তো অনেকই আছে। কাল আমি দুপুরে তোমাদের হাঙ্গারিয়ান গুলাশ রেঁধে খাওয়াব।

বেশ।

ঐশিকার শীত যেন তখনও কাটেনি। ওকে শীতে কষ্ট পেতে দেখে কর্বুরের শরীরে এক ভীষণ

অস্বস্তি হচ্ছিল। কোনও যুবতী শীতে কষ্ট পাচ্ছে আর কোনও যুবক তা দেখেও তাকে উষ্ণ করে তোলার চেষ্টা করছে না, এই অবস্থাটা সেই পুরুষের পক্ষে বড়ই কষ্টকর। ওর ইচ্ছে করছিল ঐশিকাকে বুকের মধ্যে খুব জোরে জড়িয়ে ধরে, খুব করে চুমু খেয়ে দিয়ে তার দু'হাতের পাতা নিজের দু'হাতের পাতা দিয়ে ঘষে-ঘষে তাকে উষ্ণ করে তোলে। এমন যে কখনও হতে পারে, তা আগে জানেনি কখনও। কর্বুর তার জাগতিকার্থে অসামাজিক, অতি-পরিশীলিত, সুরুচিসম্পন্ন, বিদগ্ধ সত্তাকে নিয়ে অত্যন্তই গর্বিত ছিল এতগুলো বছর। কাকির ঘনিষ্ঠ সঙ্গে, তাদের "টাটিঝারিয়ার" নির্জন পরিবেশে মাঝে মাঝে শরীরের মধ্যে একরকম ছটফটানি যে বোধ করেনি তা নয়, গরমের দুপুরে ধুলোবালির মধ্যে পুরুষ চড়াইয়ের ছটফটানির মতো, কিন্তু সেই আর্তি এমন তীব্র কোনওদিনই ছিল না।

পরিবেশই কি এ জন্যে দায়ী? হয়তো তাই। এই শারদ-রাতের শিশির ভেজা পাহাড়বেষ্টিত বনে, ঝিঁঝিদের একটানা ঝিঁ-ঝিঁ শব্দের মধ্যে বন থেকে ওঠা এক নিবাত নিষ্কম্প নিষিদ্ধ মিশ্র গন্ধের প্রতিবেশে ওরও শরীর বলে যে একটি যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার আছে, যে ব্যাপারটিকে সে আবাল্য, অজানিতে অনবধানে বয়ে বেড়িয়েছে তার মঞ্জরিতে সুগন্ধি মনেরই সঙ্গে, সে কথা আজ এই ভরা-যৌবনের আতরগন্ধী শীতার্ত দূতীকে দেখে সে যেন হঠাৎ করেই বুঝতে পেরেছে। এবং পেয়ে অপ্রতিভ এবং লজ্জিতও হয়েছে।

পৃথু ঘোষ হয়তো ঠিক বলেছিল, একজন মানুষের মধ্যে অনেকই মানুষ থাকে। তার ভিতরের কোন মানুষটি যে কখন কোন পরিবেশে এবং প্রতিবেশে হঠাৎ তার মগ্ন সত্তার বাইরে বেরিয়ে এসে অন্য মানুষটিকে হকচকিয়ে দেয়, তা পূর্ব মুহূর্তেও জানা থাকে না। মানুষ হয়ে জন্মানো এক মস্ত ব্যাপার। সব মানুষই কি তাদের মনের মধ্যে এবং শরীরের মধ্যেরও এইসব মনুষ্যজনোচিত ক্রিয়া-বিক্রিয়া, ঘাত-প্রতিঘাত, ভয় ও বিস্ময়কে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে পারে? না কি, জানোয়ারেরই মতো ভক্ষণ-শয়ন-রমণের বৃত্তর মধ্যে জীবন কাটিয়েই চলে যায়, "মানুষ" হয়ে জন্মাবার ও বেঁচে থাকার আশ্চর্য সব পরস্পর-বিরোধী অনুভূতির শরিক না হয়েই?

কে জানে! সব প্রশ্নর উত্তর তো কর্বুরের কাছে নেই। সব প্রশ্নেরই উত্তর যার জানা আছে, সেই রবীন্দ্রনাথ বা ঐশিকার ভাষায়, "রবে ঠাক্‌রের" গান অটো-রিভার্স কম্প্যাক্ট ডিস্কেরই মতো কে যেন বাজিয়ে দিল তার বুকের মধ্যে। "আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না, ফুরাবে না/সেই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা/কত জনম মরণেতে তোমারি এই চরণেতে/আপনাকে যে দেব তবু বাড়বে দেনা/আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না।"

তখনও ওরা খাবার টেবিলেই বসে। চৌকিদার এসে তার বহুদিনের পরিচিত কর্বুরকে বলল, কবু দাদা, আপনারা যখন ঘুমিয়ে থাকবেন তখন যদি সেই হাতিটা আসে বাংলোর পাশে, তখন ঘুম ভাঙিয়ে দেব কি?

আমার ঘুম ভাঙিয়ো না। তবে মেমসাহেবকে ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ো। হাতি তো দেখতে পাননি ওঁরা। রাতের বেলা না দেখতে পেয়ে ভালোই হয়েছে। রাতে তাই হাতি এসে এঁদের দেখা দিয়ে গেলেই আমাদের মান থাকবে।

দেখি দাদা। কালও তো এসেছিল। ব্যাটা রোজ এক কাঁদি করে কলা বা অন্য যা কিছু পায় সাবড়ে দিয়ে যায় শুঁড়ে করে। নিতান্ত কলা-হারাম না হলে আজকেও এসে আমাদের ইজ্জত তো বাঁচানো উচিত।

ব্যানার্জিসাহেব জিজ্ঞেস করলেন, কথাটা কী বলল চৌকিদার?

কলা-হারাম। কর্বুর বলল।

ওরা সকলে হেসে উঠলেন।

ব্যানার্জিসাহেব বললেন, সেন্স অফ হিউমার আছে।

আচ্ছা ওই যে কাঠ কয়লার আগুনের মতো লালচোখা পাখিগুলো জিপের চাকারি নীচে পড়ে, গেল গেল করতে করতেও, জিপ তাদের চাপা দেওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে পথ থেকে প্রায় জিপের বনেট ফুঁড়ে সোজা উঠে ডান বা বাঁ পাশের দুদিকে উড়ে যাচ্ছিল সেই কিম্ভূতুড়ে পাখিগুলোর নাম কী? ভারী সুন্দর লাগে কিন্তু ওদের লাল চোখগুলো।

গৈরিকা প্রশ্ন করল।

হ্যাঁ তা লাগে। ওদের নাম নাইটজার। যদি বড় বাঘের সঙ্গে আমাদের দেখা হত তবে দেখতেন চোখ কতখানি ভূতুড়ে হতে পারে। অনেকই বড় বড় চোখ, তবে ঠিক নাইটজারের চোখের মতোই লাল। আর যখন মাথা ঘোরায় বাঘ, সেই আলো যেন কোনও অদৃশ্য পুরুষ এসে অন্ধকার দিয়ে মুছিয়ে দেন। নিভিয়ে দেন না কিন্তু। মুছিয়ে দেন। নিজের চোখে না দেখলে ঠিক বুঝতে পারবেন না।

যে প্রকাণ্ড সাপটা আস্তে আস্তে পথ পেরোচ্ছিল তার তো কোনও ফণা ছিল না। ওটা কী সাপ?

ঐশিকা বলল।

তারপর বলল, মুখে যে কলুপ এঁটে থাকার অর্ডার দিয়েছিলেন তাই তখন তো কিছুই জিজ্ঞেস করতে পারিনি।

সব সাপের তো ফণা থাকে না। যাদের থাকে, তারাও মানুষদের মধ্যে যাঁরা পণ্ডিত, তাঁদের পাণ্ডিত্যের ফণার মতো সবসময়ই তো ফণা উঁচিয়ে থাকে না। তবে যে সাপটিকে আজ আমরা দেখলাম তাদের ফণা থাকেই না। সাপটা পাইথন। বাংলায় যার নাম অজগর।

"অ-য় অজগর আসছে তেড়ে।" সেই অজগর?

গৈরিকা বলল।

হ্যাঁ।

একটা পাখি যে ডাকল হার্ট-ফেইল করিয়ে দিয়ে দুরগুম্-দুরগুম্-দুরগুম্ শব্দ করে নদীর ধারের ঘন বনের মধ্যে থেকে, সেটা কী হে?

সেটা তো পেঁচা।

পেঁচা? পেঁচা হতেই পারে না।

ঐশিকা বলল।

তারপর বলল, পেঁচার ডাক তো আমাদের জামশেদপুরের নীলডিতেও শুনতে পাওয়া যায়। যায় না বাপি?

তা যায়।

পেঁচা ডাকে কিঁচি-কিঁচি-কিঁচর-কিঁচি কিঁচর। ঘুরে ঘুরে উড়ে ঝগড়া করে। আমাদের ওখানে কখনও কখনও লক্ষ্মী-পেঁচাও আসে। দুধ সাদা। যাঁদের বাড়ি আসে, তাঁরা খুব খুশি হন। না?

কর্বুর বলল, তা ঠিক। কিন্তু যে পেঁচার ডাক শুনলেন আজ বনের গভীর থেকে সে অলক্ষ্মী পেঁচা। ওইসব শহর-গ্রামের পেঁচাদের চেয়ে অনেকই বড় হয় দেখতে তারা। ওই পেঁচার নামই কাল-পেঁচা। গভীর জঙ্গলের মধ্যে নিশুতি রাতে তারা যখন ডাকে তখন শুধু আপনাদের বুক কেন, অনেক সাহসীর বুকই দুরদুর করে ওঠে।

আমরা কী ভীরু?

সাহস আর ভয় ব্যাপারটা আপেক্ষিক।

ঐশিকা বলল, 'বুরু' মানে কী? সব নামের পেছনেই দেখছি একটা করে বুরু যোগ হয়।

কর্বুর হেসে বলল, বুরু মানে পাহাড়। কেউ কেউ আবার বলেন জঙ্গল। আমি ঠিক বলতে পারব না। কাকু যেমন কিরিবুরু থেকে "বুরু" বাদ দিয়েই শুধুই "কিরি" নাম রেখেছে ছেলের। গুয়াতে যে লোহার খাদান আছে ওগুলো স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া হওয়ার আগে সব ইন্ডিয়ান আয়রন অ্যান্ড স্টিলেরই, মানে ইসকোর ছিল। স্যার বীরেন মুখার্জির বাবা স্যার রাজেন মুখার্জির পত্তন করা। লোহা, ম্যাঙ্গানিজ এসবই সরফেস-মাইন্‌স। অথবা 'ওপেন-কাস্ট'ও বলে। কয়লা তামা বা অভ্রর খাদানের মতো মাটির নীচে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে তা তুলে আনতে হয় না। ধরুন "বনম্‌" মানে উই টিপি। যে পাহাড়ে অনেক উইটিপি তার নাম বনম্‌-বুরু। হঞ্জর মানে হচ্ছে কুঁজ। যে পাহাড়ের উপরে কুঁজের মতো একটি পাথর ঝুলে আছে তার নাম হয়ে গেল হঞ্জর-বুরু। যে পাহাড়ে বনদেবতা বা মারাং থাকেন তার নাম মারাংবুরু। আমগাছকে মুন্ডা ভাষায় বলে উল্‌ম। যে পাহাড়ে অনেক উইটিপি আর আমগাছও আছে তার নাম বনম্‌-উলি-বুরু। বঙ্গসন্তানেরা সন্ধি করে তার নাম করে দিয়েছিলেন হয়তো বনমালিবুরু। এইসব ব্যাপার আর কী!

এই সারান্ডার বনে বুঝি অনেক রকম আকর, মানে মিনারাল ওর্‌স পাওয়া যায়?

গৈরিকা শুধোল।

হ্যাঁ যায়ই তো। বিহারের সিংভূম খুবই বড়লোক এ বাবদে। এইসব পাহাড়ের মৃত্তিকা-ত্বকে প্রচুর লাল-নীল-হলুদ রঙা গুঁড়োর মতো আয়রন অক্সাইড আছে। আকরিক লোহাও আছে। গুয়া, নোয়ামুণ্ডি, বাদামপাহাড় এইসব অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে লোহার আকর আর আয়রন অক্সাইড। ম্যাঙ্গানিজ আছে জামদা থেকে রাউরকেল্লার পথে কিছুটা গিয়ে বাঁদিকে জঙ্গলের বুক ফুঁড়ে চলে গেলে, ভুত্‌রা মাইন্‌স-এ। আছে, আমাদের ধুতরা মাইন্‌স-এ। তাছাড়াও আরও অনেক খাদান আছে। ভুত্‌রা মাইন্‌স, ওড়িশা ম্যাঙ্গানিজ কোম্পানির খাদান। সেখানে কুড়ারি নদী বয়ে গেছে ছায়াচ্ছন্ন গিরিখাতের মাঝে মাঝে।

'মহলশুখার চিঠি' বলে একটি বই পড়েছিলাম, তাতে মহলশুখা আর ভুত্‌রা মাইন্‌সের কথা আছে।

ঐশিকা বলল।

প্রকাশক কে?

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

তারপর বলল, এদিকের নদী-নালাতে সোনাও পাওয়া যায়। মেয়েরা পাহাড়ের বুকে কোনও কোনও নির্জন জায়গায়, যেখানে নদী বয়ে যায় নিভৃতে, সেখানে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে সোনার চিকচিকে গুঁড়ো ছেঁকে তোলে।

কেন? সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে কেন?

নিশ্চয়ই কোনও প্রথা আছে আদিবাসীদের। শুধু মেয়েরাই সেই সোনার গুঁড়ো ছেঁকে তোলে। পুরুষদের সেখানে যাওয়া মানা।

ব্যানার্জিসাহেব বললেন, জায়গাটা জানো না কি? চলো, ভায়া, তুমি-আমি চলে যাই।

ঐশিকা চোখ বড় বড় করে বলল, বাব্বা! বিহেভ ইওরসেল্‌ফ?

এদিকে মুন্ডা, হো ছাড়া আর কোনও উপজাতি আছে?

কোলেরাও আছে। বীরহোড়। কোলেরা গুয়ার কাছে একটি পাহাড়ের কোলে থাকে, তাই তাকে বলে কোল-টুংরি। লোহা খাদানের লাল হলুদ মাটি এনে ওরা মাটির ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে ফুল, পাতা, নানা পশুপাখি, মেয়ে-মরদের সুন্দর সুন্দর সব ছবি আঁকে।

সত্যি। আমাদের এই ট্রাইবাল-আর্টের কোনও তুলনা নেই।

গৈরিকা বলল।

লোহা, সোনা, ম্যাঙ্গানিজ ছাড়াও আছে সিসে, তামা, রুপো। এখানের নদীর মতো সুন্দর বহু-বর্ণা নদীও পৃথিবীর খুব কম জায়গাতেই দেখতে পাওয়া যায়। দেখাব আপনাদের। দেখে গাইতে ইচ্ছে করবে, "সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।"

একদিক দিয়ে এঁকেবেঁকে ঘন বনের মধ্যে দিয়ে ছিপছিপে লাল নদী এসে অন্য দিক থেকে আসা নীল নদীর সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। কোথাও বা হলুদ নদী মিলেছে সবুজ নদীর সঙ্গে। সে দৃশ্য দেখার মতো।

তারপর ও বলল, বড়বিলে বড়জামদাতে নানা ইনসপেকশন কোম্পানির অফিস আছে। যেমন মিত্র. এস. কে. প্রাইভেট লিমিটেড, ব্রিগস কোম্পানি ইত্যাদি ইত্যাদি। এঁরা ল্যাবরেটরিতে বিভিন্ন ধাতুর আকর পরীক্ষা করে করে কোন আকরে কত শতাংশ আছে সেই ধাতু এবং তাদের অন্য গুণাগুণ কী, এইসবই যাচাই করে সার্টিফিকেট দেন। ওই সার্টিফিকেটকে মেনেই রপ্তানি ও আমদানিকারকরা ব্যবসা করেন।

একসময় ওদের খাওয়া শেষ হল।

ব্যানার্জিসাহেব বললেন, এই জঙ্গলে এমন পুডিং, ভাবা যায় না।

গৈরিক বলল, সত্যি। কিন্তু এবারে কি শয়নে পদ্মনাভ?

বাংলোর পাশে ভিউ পয়েন্টে গরমের রাত হলে গিয়ে বসতে পারতাম।

তার চেয়ে কাল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উঠে জঙ্গলে কিছুদূর হেঁটে বেড়ালে খুব ভালো লাগবে।

ঐশিকা বলল।

শরৎকালের সৌন্দর্য যে কী তা গ্রামের সৌন্দর্য যাঁরা জানেন তাঁরা জানেন, কিন্তু এই জঙ্গলের সৌন্দর্য একেবারেই অন্যরকম। অন্ধকার রাতের রূপও কিন্তু অন্যরকম। তা পুরুষের রূপ। আর চাঁদনি রাতের রূপ, নারীর রূপ।

বাবাঃ তুমি তো দেখছি কবি হে কবু।

ব্যানার্জিসাহেব বললেন।

আমরা তার প্রমাণ আগেই পেয়েছি।

ঐশিকা বলল।

কবু বলল, একটা কাজ করলে মন্দ হয় না।

ব্যানার্জিসাহেব বললেন, কী?

কাল ভোরে উঠে, এককাপ করে চা খেয়ে টৌয়েবু ফলস-এ যাওয়া যেতে পারে। সঙ্গে করে গ্যাসের ছোট উনুন আর ব্রেকফাস্টের রসদ ওখানে নিয়ে গেলে ওখানে বসেই ব্রেকফাস্টও খাওয়া যেতে পারে। তারপর বাংলোতে ফিরে অথবা না-ফিরেও থলকোবাদ যাওয়া যেতে পারে। থলকোবাদ, টৌয়েবু থেকে কাছেই।

ব্যানার্জিসাহেব বললেন, সেটা মন্দ হয় না।

তারপর বললেন, তোমরা তিনজনে যাও সকালে। ট্রান্সপোর্ট তো দুটি আছেই। আমি তোমাদের জন্যে সব বন্দোবস্ত করে মালপত্র নিয়ে গিয়ে পৌঁছব সেখানে। কী যেন নাম বললে ফল্‌সটার? গোয়েবু?

না টৌয়েবু।

হ্যাঁ। হ্যাঁ টৌয়েবু। জিনিসপত্রও সব গুছিয়ে নেব। চানটানও সেরে নেব। যাতে ওখান থেকেই থলকোবাদ চলে যেতে পারি। তোমরা না হয় থলকোবাদে গিয়েই চান কোরো।

কেন?

এনজয় ইওরসেল্‌ভস।

আমরা টোয়েবুতেও তো চান করতে পারি।

গৈরিকা বলল।

তাও পারো। অ্যাজ ইউ লাইক ইট।

ঠিক আছে। এ কী অফিস যাওয়া! যা মনে হবে, মানে সকালে উঠে যা করতে ভালো লাগবে তাই-ই করা যাবে। ছুটিতে এসেও এত আগে থাকতে সব ঠিক-ঠাক, এমন টাইট ক্যেজুল আমার ভালো লাগে না।

গৈরিকা বলল।

কর্বুর লক্ষ করল যে, Schedule-এর আমেরিকান উচ্চারণ করল গৈরিকা, ক্যেজুল। এই আমেরিকানরাই এতদিনের পৃথিবীব্যাপী ঐতিহ্যমণ্ডিত ইংরেজি ভাষাটিকে কী বিকৃতই না করে দিল। যাঁদের ঐতিহ্য থাকে না, অতীত থাকে না, নিজস্ব ভাষা থাকে না, তারাই গাজোয়ারি করে নিজেদের ঐতিহ্য তৈরি করতে চায়।

চেয়ার পেছনে ঠেলে উঠতে ঐশিকা বলল, আমার গা এখনও ছমছম করছে। রাতের জঙ্গলের মধ্যেই মনে হয় কত জীবজন্তু সব বুঝি গা-ঢাকা দিয়ে বসে রইল। দেখা হল না।

কর্বুর বলল, তাইতো হয়। যতটুকু অদেখা থাকে, যতটুকু অন্ধকার, ততটুকু রহস্যে মোড়া থাকে। সেখানে কী আছে? তা জানার জন্যে মন আনচান করে। যেটুকু সহজে দেখা যায়, বা যা আলোকিত, তাতো সহজে দেখাই যায়।

ঠিক তাই।

কর্বুর বলল।

তাহলে গুডনাইট।

গুডনাইট তো বটে কিন্তু আমাদের খুবই খারাপ লাগবে।

কর্বুর বলল, কেন?

না। আপনি এই বসার ঘরের সোফাতে, আর আমরা ঘরে।

সোফাতে কেন? পাতোলা চেয়ারে আরামে ঘুমোব কম্বল মুড়ি দিয়ে। আপনাদের পাহারাও দেওয়া হবে। আমি তো দারোয়ানি করতেই এসেছি।

যদি কোনও জানোয়ার বা সরীসৃপ অথবা চোর আসে তারাও সবাই ওই ড্রইংরুম দিয়েই ঢুকবে বলছেন!

ঐশিকার কথাতে সবাই হেসে উঠলেন একসঙ্গে।

ঘুমোবই যে, তারই বা কি মানে আছে? আমি তো জেগেও থাকতে পারি! আপনারাও জেগে থাকলে পারতেন। রাতের জঙ্গল থেকে কতরকম আওয়াজ ভেসে আসবে। শুনতেন বসে বসে। চোখ যখন দেখতে পায় না তখন কানই চোখ হয়ে যায়। আওয়াজ শুনেই বোঝা যায়, কোন জানোয়ার, কত দূরে, কী করছে বা সে কী দেখে ডাকছে?

গৈরিকা বলল, থাক। আমার ঘুম পাচ্ছে। জঙ্গলের সবই একদিনে শিখে ফেলতে গেলে একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। হজম হবে না। আমি চললাম শুতে। আপনাকে বালিশ দিয়েছে কি?

আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমোতে যান। কোনও চিন্তা নেই।

কর্বুর বলল।

যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে ঐশিকা বলল, আপনি কীরকম লোক স্যার যে অন্য কারও সঙ্গে

শুতে পারেন না? বাপির সঙ্গেও পারবেন না? তাহলে বিয়ে যখন করবেন তখন কী করবেন?

আলাদা ঘরে শোব। বিয়ে করলেই যে একই বিছানাতে এক মশারির তলাতে অন্যজনকে জাপটে-সাপটে প্রতিরাতে শুতেই হবে তার কী মানে আছে জানি না আমি। আমি তো আমাদের ধুতরা খাদানের কাছে একটি জঙ্গলময় টিলা দেখেছি। তাতে মনোরম দুটি ছোট সেল্‌ফ-কনটেইনড কটেজ বানাব। একটাতে আমি থাকব, অন্যটাতে বউ। মধ্যে একটা চাঁপা-রঙা টাইলের পথ থাকবে যোগসূত্র হিসেবে। তার দুপাশে থাকবে পারিজাত আর স্থলপদ্মর গাছ। মিঞা-বিবির আলাদা আলাদা বাবুর্চি থাকবে। আলাদা খাস বেয়ারা। এবং আয়া। একদিন আমার বাড়ি বউকে নেমন্তন্ন করব, আরেকদিন সে করবে আমাকে নিমন্ত্রণ।

আপনার ঘরে আতরদানি থাকবে তো?

কোনও যবন-কন্যাকে বিয়ে করলে, তাও থাকবে।

সেটি তো হবে না। যবন-কন্যাকে বিয়ে করতে হলে তো আপনাকেও যবন হতে হবে। ধর্মান্তরিত না হলে তো বিয়ে হবে না। আপনার নাম হয়তো কর্বুর সেন থেকে হয়ে যাবে জনাব মুর্গমসল্লম খাঁ।

কর্বুর হেসে বলল, এটা যা বলেছেন! পৃথিবীতে আর কোনও ধর্মই বোধহয় এমন জবরদস্তি করে না অন্যের উপরে।

সেই জন্যেই আপনার ওই লাইনে না-যাওয়াটাই সেফ হবে।

তা ঠিক। নিজের মা-বাবার ধর্ম বিসর্জন দিয়ে বিয়ে করতে যাব কোন দুঃখে। দেশে স্বধর্মের মেয়ের কি অভাব পড়েছে?

সে কথা ঠিক। দেশে সবকিছুর আকাল থাকলেও অনূঢ়া কন্যাদের গোনা-গুনতি নেই। কী সম্মানই না দিলেন আমাদের। আমরা যেন গোরু-ছাগল। ভাবছেন তাই?

তারপর বলল, আপনি স্যার তাহলে আপনার সেই না-বাগানো বউদের স্বপ্নে বুঁদ হয়ে জেগে থাকুন, আমরা ঘুমোই গিয়ে। কলা-হারাম হাতিটা যদি আসে, আপনি সঙ্গে না থাকলে কিন্তু আমরা সাহস করে দেখতে যেতে পারব না।

আমিই কি আপনাদের সাহস?

হ্যাঁ স্যার। তবে শুধুমাত্র কোনও কোনও ব্যাপারে।

ঐশিকা বলল।

বলেই, দুষ্টুমি-ভরা হাসি হেসে, ঘরে গিয়ে দুয়ার দিল। কর্বুরের মনে হল, ও যেন কর্বুরের মুখের উপরই দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিল! না-বন্ধ করলে, কর্বুর কি ওদের ঘরে যেত?

ভারী অসম্মানজনক ব্যাপার-স্যাপার!

কর্বুর ভাবল যে, সে অনবধানেই বড় তাড়াতাড়ি একটু বেশি মাখো-মাখো হয়ে যাচ্ছে। মেয়েটা ডেঞ্জারাস। যদিও সব মেয়েই ডেঞ্জারাস। আরও প্রশ্রয় দিলেই মাথায় চড়ে বসবে। মা-কাকি-কাকুর পছন্দ হলেই যে কর্বুরের ঐশিকাকে বিয়ে করতেই হবে তার কি মানে আছে! ঐশিকাও মনে হয়, তার সুন্দর তর্জনী আর বুড়ো আঙুলে টোকা মেরে আজ অবধি অনেক ছেলেকেই টাকা-কেন্নোর মতো ছুড়ে ছুড়ে ফেলেছে। কর্বুর নিজের ছোট্ট জগতেই সুখী ছিল। তার পক্ষে বড়জামদার শিখীই ভালো। ঘরোয়া মেয়ে। ঐশিকা তাকে পছন্দ করলেও তাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবে সারাজীবন। তেমন অবস্থার কথা ভাবলেও আতঙ্ক হয়। অমন বোকামি কর্বুর করবেই না।

“কাল-হারাম” হাতিটা আসেনি কাল রাতে।

পুবের আকাশ ফর্সা হতেই রহমত চাচার কাছ থেকে চেয়ে দু কাপ চা খেয়ে হাত-মুখ ধুয়ে কর্বুর বেরিয়ে পড়ল। সাহেব আর মিসি-বাবারা নিশ্চয়ই দেরি করে উঠবেন। ওঠা মাত্র যাতে গরম জল পান হাত-মুখ ধোওয়ার জন্যে এবং গরম চা-ও পান তার বন্দোবস্ত ঠিকঠাক করেই ও বেরুল দূরবিনটা গলায় ঝুলিয়ে। একসময়ে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই আসত সারান্ডাতে। আজকাল কাজে-কর্মে এমনভাবে জড়িয়ে যাচ্ছে যে, সময়ই পায় না। তার ওপর পুজোর দু-মাস আগে থেকে তো নাটকের মহড়া নিয়েই ছিল এ বছরে।

“মহড়া” উপন্যাসটির লেখক হয়তো ঠিকই বলেছেন। আমাদের অধিকাংশ মানুষের জীবনটাই এক-একটা মহড়াই। মহড়া দিতে দিতেই জীবন শেষ। জীবনের নাটক খুব কম মানুষই মঞ্চস্থ করতে পারেন। এই দুর্বুদ্ধিজীবীতে গিস-গিস করা দিনে, প্রকৃত বুদ্ধিজীবী তক্ষ রায়ের চরিত্রটা এঁকেছেন লেখক অসাধারণ। কুদর্শন তক্ষ রায়ের প্রেমে পড়ে গেছে কর্বুর।

মহড়া দিতে দিতেই শিখীকে কাছ থেকে জেনেছে কর্বুর। ভারী ভালো মেয়ে। নরম, লাজুক, ভালো গান গায় এবং দারুণ ভুনিখিচুড়ি আর কড়াইশুঁটির চপ রান্না করতে পারে। একেবারে তার চলে যাওয়া ঠাকুমারই মতো। জামশেদপুরের ঐশিকার সঙ্গে বড়জামদার শিখীর অবশ্য তুলনাই চলে না। ঐশিকার ক্লাস অন্য। ও জন্মেছেই কোনও মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির সি. ই. ও অ্যান্ড এম. ডি.-র স্ত্রী হওয়ার জন্যে। বড়বিল-এর “টাটিঝারিয়া” আর ধুতরা খাদানের পাহাড়ের কটেজে ও আঁটবে না। ওর পটভূমির সঙ্গে শিখীর পটভূমির অনেকই তফাত আছে। ভবিষ্যতের তো আছেই। বিয়ের জন্য মা-বাবা-কাকু-কাকি অনবরত জোর দিচ্ছেন। নানা সেন্টিমেন্টাল কথাবার্তা বলছেন। তবে এ ব্যাপারে বলতে হয়, ওঁদের আক্কেলের অভাব আছে। কী করে ওঁরা ভাবতে পারলেন যে, ঐশিকার মতো মেয়ের এই বড়বিল-এর খাদান মালিক কর্বুরকে ভালো লাগবে। কর্বুর কোনও দিক দিয়েই ওর যোগ্য নয়।

যদিও বিয়ের বয়স তার হয়েছে কিন্তু বিয়ে করলেই তো স্বপ্ন শেষ হয়ে গেল সব। এলিজিবিল, সচ্ছল ব্যাচেলার হিসেবে যেখানেই যায় সেখানেই যে একটা আলাদা খাতির! সে সব আর থাকবে না। তার বাজারদরের জন্যেই নয়, কার না ভালো লাগে সমাজে তার চাহিদা যেন অব্যাহত থাকে তা দেখতে। বিয়ে-টিয়ে নিয়ে বিশেষ ভাবেওনি। নানা ভাবনা নিয়ে তাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। বাবা-মা তাঁদের ছেলের ঘরের নাতি দেখতে অহেতুক উৎসুক হলেই যে তাকে বিয়ে করতে হবে এক্ষুনি এবং জনক হতেই হবে এ কেমন কথা! আসলে সব মানুষই স্বার্থপর। সন্তানেরা যেমন, তেমন অনেক ক্ষেত্রে বাবা-মায়েরাও। নিজেদের ইচ্ছাপূরণের কথাই ভাবেন শুধু তাঁরা। অন্যের কথা ভাবেন না আদৌ।

কিছুটা গিয়েই ও আবার ফিরল। ভাবল, বাঁধের দিকে গিয়ে দেখে, কাল শেষ দুপুরে যে কটন-টিল-এর ঝাঁকটা এখানে নামল এসে, সংখ্যায় তারা কত?

কুমেডি বাংলোটা পেরিয়ে গেল। সেখানে ঘুম-ভাঙা কারোকেই দেখল না। ভালোই হল, ভাবল ও। তাও একা থাকা যাবে কিছুক্ষণ। জঙ্গলে এসে একা না থাকতে পারলে আসার কোনও মানেই হয় না।

বাঁধের পাশে পৌঁছে আশ্চর্য হল কর্বুর। একটি হাঁসও নেই। তারা হয়তো সকালের আলো-ফোটার আগেই চলে গেছে, না কি কালই বিকেলে গেছে, কে জানে। চারদিক শিশিরে ভিজে আছে। কোথাওই বসার জায়গা নেই। বাঁধের ওপারের জঙ্গল থেকে নানা পাখির মিশ্র স্বর ভেসে আসছে। এমন

সময়ে ধনেশ ডাকল একটা। কুমডির আশেপাশে আগে ধনেশ দেখেনি কখনও। ও ঝুলিয়ে-রাখা দূরবিনটা তুলে নিয়ে সেদিকে খুঁজতে লাগল পাখিটাকে। ধনেশ উঁচু গাছের উপরের দিকের ডালে বসে থাকতে ভালোবাসে। চুপ করে থাকা ওদের কুষ্ঠিতে নেই। সব সময়েই হ্যাঁক হঁক্ক হঁক্ক করছে। নাক্সভোমিকা গাছে বসতে ভালোবাসে ওরা। ওই গাছের ফলও খেতে ভালোবাসে। ওড়িশাতে ওই গাছগুলোকে বলে কুচিলা। আর কুচিল খায় বলেই ওদের নাম সেখানে কুচিলা খাঁই।

দূরবিনটা নামাতে যাবে এমন সময়ে কে যেন পাশ থেকে হাত বাড়িয়ে সেটা নিতে চাইল। মুখে বলল, পাখি রইল বাঁদিকে আর স্যার দেখছেন ডানদিকে।

তাই?

কর্বুর খুশি ঐশিকাকে দেখে।

বলল, কখন ওঠা হল রাজকুমারীর?

কী যে বলেন স্যার। আমি হলাম বাঁদি। রাজকুমার কেন যে, না বলে কয়ে বেরিয়ে এলেন তা বুঝলাম না। আপনি না আমাদের লোকাল গার্জেন!

ঐশিকা ব্যানার্জির লোকাল গার্জেনি করি এত বড় ধৃষ্টতা কি আমার হতে পারে!

কী পাখি ওটা? বিচ্ছিরি ডাক কিন্তু যাই-ই বলুন।

ওদের বাংলা নাম বড়কি ধনেশ। ইংরেজিতে বলে, দ্যা গ্রেটার ইন্ডিয়ান হর্ন বিল। ওড়িয়া নাম, কুচিলা খাঁই।

ছোটও হয় বুঝি?

হয় বইকি। সেগুলো অনেকই ছোট হয়। ওড়িশাতে সেগুলোকে বলে ভালিয়া-খাঁই।

কেন?

ভালিয়া বলে একরকমের ফল হয়। ওরা সেই ফল খেতে ভালোবাসে বলে।

তাহলে কি বাপিকে আমরা গুলাশ খাঁই বলে ডাকতে পারি।

গুলাশ মানে?

আরে বাপি কাল বলল না, আজ মটন দিয়ে হাঙ্গারিয়ান গুলাশ রান্না করবে থলকোবাদে গিয়ে।

কর্বুর হেসে বলল।

বলল, ব্যানার্জিসাহেব খুব খাদ্যরসিক আছেন। তাই না?

শুধুই খাদ্যরসিক কেন, পানীয়-রসিক, জীবন-রসিক। আমার বাপি একজন এপিকিউরিয়ান। বাট হি ইজ আ গ্রেট গাই। আই অ্যাডোর হিম!

বলেই বলল, পাখিগুলোকে কাছ থেকে দেখব বলে এলাম, আর তারা গেল কোথায়? আমাকে বোধহয় পছন্দ হয়নি। কখন গেল? আমাকে আসতে দেখেই!

আমিও তো ওদের দেখতেই এসেছিলাম। এসে দেখছি, চলে গেছে। কোনও বড় জলাতে গিয়ে বসেছে হয়তো।

মাইগ্রেটরি।

স্বগতোক্তি করল ঐশিকা।

তারপরই বলল, বাংলাটা যেন কী বলেছিলেন?

পরিযায়ী।

রাইট। পরিযান থেকে পরিযায়ী?

আমি কি অত জানি! আমি তো ধানবাদের মাইনিং এঞ্জিনিয়ার। পাথর চিনি, আকর চিনি। আটারলি বেরসিক।

তাই নাকি? কে বলে? আপনি আটারলি-বাটারলি-রসিক।

তারপর আবারও নিজের মনেই বলল, পরিযায়ী। পরিযায়ী। পরিযায়ী।

পরক্ষণেই হঠাৎ চমকে উঠে বলল, ওটা কী পাখি ডাকল? মেটালিক সাউন্ড। মেটালিকের বাংলা কী?

মেটাল হচ্ছে ধাতু। মেটালিক হচ্ছে ধাতব।

সত্যি! আই শুড বি অ্যাশেমড অফ মাইসেল্‌ফ।

বলেই বলল, আপনি আমাকে বাংলা পড়াবেন?

'বাংলা পড়ানো' শব্দ দুটি ধানবাদ মাইনিং স্কুলের গোপেন সামন্ত অন্য অর্থে ব্যবহার করত। কর্বুরের হাসি পেয়ে গেল। ঐশিকার মুখে শব্দদুটি শুনে। কিন্তু হাসল না।

বলল, ওই পাখিটার নাম র‍্যাকেট-টেইলড ড্রঙ্গো। ফিঙে জাতীয় পাখি।

পাখিটা যে গাছে বসে আছে সেটা কী গাছ?

গামহার।

বাঃ, সুন্দর নাম তো।

পাশের গাছটা কী গাছ?

ওটা বিজা। বাংলাতে বলে পিয়াশাল।

আর ওগুলো।

ওগুলো সব শাল। সারান্ডা তো শালের জন্যেই বিখ্যাত।

কোথায় একটু বসা যায় বলুন তো। সব জায়গাই তো এখনও ভিজে।

নাই বা বসলেন।

ওই ঝোপগুলো কীসের ঝোপ? কমলা কমলা ছোট ছোট ফুল ফুটেছে। বিচ্ছিরি গন্ধ কিন্তু ঝাড়গুলোতে এবং ফুলগুলোতেও।

হ্যাঁ, তা ঠিক। ওগুলোর নাম LANTANA, হিন্দিতে বলে পুটুস। গাড়োয়াল পাহাড়ে এদেরই বলে লালটায়েন। জিম করবেট এবং অন্যান্য সাহেবদের মুখে LANTANA শুনে থাকবে স্থানীয় মানুষরা, তারই অপভ্রংশ লালটায়েন।

ফুলের বা গাছেরই মতো পাখির নামও কি প্রদেশ ভেদে আলাদা আলাদা হয়ে যায়?

যাবে না? আমাদের এই ভারতবর্ষ কত বড় দেশ। কত ভাষাভাষী, কত রাজ্য, কিন্তু সব মিলিয়ে আমরা একই। এই বিরাটত্ব এবং মিলনই তো ভারতীয়ত্ব। "বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান।"

আবার সাতসকালে জ্ঞান দিতে শুরু করলেন স্যার? বাপি তো আছেই। তার ওপরে আপনি। কিন্তু আপনার যা বয়েস তাতে তো আপনার অজ্ঞানাবস্থাই থাকা উচিত এখনও। এত জ্ঞান, আসে কোত্থেকে বলুন তো স্যার?

জ্ঞান কি আর হেলিকপ্টার থেকে পড়ে ম্যাডাম? জ্ঞান পড়াশুনো এবং অভিজ্ঞতা দিয়ে অর্জন করতে হয়। অনেকই সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।

আপনার মধ্যে যতখানি জায়গা আছে তা জ্ঞানে ভর্তি হয়ে গেলে কী হবে? আপনি কি বেলুনের মতো ফেটে যাবেন? না, কলসির জলের মতো সে জ্ঞান উপচে পড়ে যাবে। পথে-প্রান্তরে পড়ে নষ্ট হবে?

জানি না। কালকে যে গানটা শোনাবেন বললেন, সেটা শোনান না।

কোনটা?

ওই যে SAVAGING THE CIVILIZED বইটির মধ্যে যে গানটি লেখা ছিল সেটা।

ছিঃ। আপনি তো ভারী নিষ্ঠুর। একজন ভালোবেসে একটা গানের কলি-লিখে প্রেম নিবেদন করল, আর সেই গান আপনি অন্যের মুখে শুনতে চাইছেন? তার মুখেই শুনবেন। গান তো রূপমতী চমৎকার গায়। এবার থেকে শিখীকে রূপমতী বলেই ডাকবেন।

সে আমি বুঝব।

সামান্য বিরক্তির গলাতে বলল, কর্বুর।

না তো কি আমি বুঝব। আপনার পাঁঠা আপনি ল্যাজে কাটবেন না মাথায়, তাতে আমার কী?

বড় বাজে কথা বলেন আপনি। বেচারি আপনার কী ক্ষতি করেছে যে তার পেছনে লেগেছেন।

ওমা! আমি ক্ষতি করতে যাব কেন? আমি তো তার অ্যাডমায়রার হয়ে গেছি, যেমনি হয়েছি আপনারও।

এত অ্যাডমিরেশানের বন্যা কেন?

কী করব স্যার। অব্যেশ।

আবার 'স'-কে ইচ্ছে করে 'শ' বলল ঐশিকা।

আপনার বাপি আদরে আদরে আপনাকে এক্কেবারে গোবর করেছেন।

আমাকে গোবর করেছেন। জানি তো! এক কথা আর কতবার বলবেন স্যার। তার চেয়ে এইটা শুনুন। ভৈরবীতে বাঁধা।

একটু চুপ করে থেকে বলল, নিধুবাবুর নাম শুনেছেন? না শুনে থাকলে, রূপমতীকে জিজ্ঞেস করবেন, বলে দেবে। সে অবশ্যই শুনেছে। আপনাকে দেওয়া বইটিতে "কী করে কলঙ্কে যদি" গানটা লিখেছেন যিনি। তাঁরই লেখা গান।

আমি জানি।

কী জানেন?

নিধুবাবুর নাম। রামনিধি গুপ্ত তো!

সত্যি! আপনাকে যতই দেখছি স্যার ততই অবাক হচ্ছি।

কেন?

সামান্য বিরক্তির গলাতে বলল, কর্বুর।

আপনি কী যে জানেন না! মানে কোন বিষয়ে আপনার জ্ঞান নেই? আপনি তো সব্যসাচী।

তার মানে? আমি সবজান্তা বলছেন?

সবজান্তা শব্দটা প্রশংসাসূচক নয়। বরং বলা যাক আপনি সর্বজ্ঞ।

গানটা গাইবেন কি?

গাইছি। বলেই, ঐশিকা ধরে দিল : "প্রণয় পরম রত্ন, যত্ন করে রেখো তারে/বিচ্ছেদ তস্করে আসি, যেন কোনও রূপে নাহি হরে/অনেক প্রতিবাদী তার হারালে আর পাওয়া ভার/কখন যে সে হয় কার, কে বা বলিতে পারে/প্রণয় পরম রত্ন, যত্ন করে রেখো তারে।"

অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকল কর্বুর। নিধুবাবুর এটি একটি বিখ্যাত গান। ভৈরবীতে বাঁধা। শরতের সকালবেলার রোদ, শিশিরভেজা সুগন্ধি গাছপালার গন্ধের মধ্যে কারও নদীর পাশে দাঁড়িয়ে গাওয়া সেই ভৈরবীর সুর যেন এই বনভূমির সকালের সব রন্ধ্র ভরে দিল।

এই গানটি কর্বুর শিখীর গলাতেও শুনেছিল। কিন্তু শিখীর গলা ঐশিকার গলার সঙ্গে আদৌ তুলনীয় নয়। ঐশিকার গলা তো নয়, যেন কোকিল কথা বলছে। সুরে একেবারে ভরপুর। কলকাতার আনন্দবাজারের প. ব. র ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, "সুরঋদ্ধ"। তার উপরে গানের ভাব, গানের বাণীর প্রতিটি শব্দ যেন প্রাণ পেল ঐশিকার গায়কীরই জন্যে।

কর্বুরকে চুপ করে থাকতে দেখে ঐশিকা বলল, নিজে থেকেই জোর করে গান শোনালাম স্যার, ভদ্রতা করেও তো মানুষে কিছু একটা বলে বানিয়ে বানিয়েও। তাও বললেন না। আচ্ছা, বিয়ে করতে আসা জামাইকে দেখে, সে যতই হতকুচ্ছিৎ হোক না কেন, অথবা কারও গান শুনে, সে গায়িকা যতই খারাপ গান করুক না কেন, আজ অবধি কেউই কি কখনও খারাপ বলেছে? আপনি কী নিষ্ঠুর মানুষ স্যার।

তুমি তো গান গাইলেই পারতে।

কর্বুর, ঐশিকার ছদ্ম-বিনয় ছেঁটে দিয়ে বিস্ময়াভিভূত গলায় বলল।

"তুমি" বলে ফেলেই লজ্জিত হল কর্বুর। বলল, সরি, মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। তবে গুণপনাতে বড় হলেও বয়সে তো আমার চেয়ে ছোটই আপনি!

চোখ বড় বড় করে ভর্ৎসনার স্বরে ঐশিকা বলল, খুবই অন্যায় হয়েছে। গুণপনাতে গুরুজনকে তুমি বলে কেউ কখনও? তাছাড়া, আমার বয়স কত তা আপনি জানলেন কী করে!

তারপরই বলল, আচ্ছা স্যার! আপনি এতক্ষণ "আপনি" চালিয়ে গেলেন কী করে? অসীম আপনার ক্ষমতা। ঐশী ক্ষমতা। আপনি ইচ্ছে করলে লালুপ্রসাদ যাদব হতে পারতেন। আমার তো দমবন্ধ হয়ে আসছিল প্রথম থেকেই। আপনি সত্যিই প্রি-হিস্টরিক।

এসব কথা থাক। তুমি এমন গান গাও, তো গানকেই প্রফেশন কেন করলে না?

কোনও কিছুকেই "প্রফেশন" করা কি অত সোজা আজকাল স্যার? দলে না ভিড়তে পারলে, গোরু-ছাগলের মতো যূথবদ্ধ হয়ে গায়ে-গা ঘষতে না পারলে, আজকাল কিছুই হয় না। প্রকৃত গুণীরা এখন তাঁদের অভিমান নিয়ে বাড়িতেই বসে থাকেন আর ভূষণ্ডীর মাঠের ভূত-পেতনিরা চারধারে হুলা-হুলা, হনু-হনু নৃত্য করে বেড়ায়। দলে-বলে যারা আছে, তারাই আজকাল 'সব পেয়েছির দেশে'র বাসিন্দা। রসে-বশে দিন কাটায়।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, ক্লাসিকাল গানের কথা হয়তো আলাদা। অন্য অধিকাংশ গানেরই এখন "জনগণায়ন" হয়ে গেছে। গণতান্ত্রিক শিল্পী সংঘর মাধ্যমেই আপনাকে পা ফেলতে হবে, নইলেই পদস্খলন। নিজেকে অত নীচে টেনে নামাতে রুচিতে বাধে। তেমন শিক্ষাও তো পাইনি। তাই অনেকরকম কষ্ট করেও, বাপিকে একা ফেলে রেখেও দু বোনে বাইরে বাইরে পড়াশুনো করেছি। আজকাল স্বাবলম্বী না হলে তো চলে না। আমার মনে হয়, মহারাজকে বিয়ে করলেও সে মেয়ের স্বাবলম্বী হয়েই করা উচিত। ভালোবাসাটা, আদরটা, উপরি পাওনা। কিন্তু নিজের খাওয়া-পরাটার বন্দোবস্ত, নিজের স্বেচ্ছার্জিত রোজগারেই করা উচিত। মানে, তেমন প্রয়োজনে যেন করা যায়, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া উচিত।

"গৃহবধূ" হয়ে থাকা বলছ কোনও শিক্ষিত মেয়ের পক্ষেই আজকাল সম্ভব নয়?

সম্ভব নয় কেন? আমার বা আমার দিদির চেয়েও অনেক বেশি শিক্ষিত লক্ষ লক্ষ মেয়ে কি গৃহবধূ হয়ে নেই? অবশ্যই আছে। এবং তারা সুখেই আছে। হয়তো অনেক সম্মানেও আছে। কিন্তু আমরা বড় ভয় পাই। আপনারা পুরুষেরা যে অনেক বছর আমাদের খেলনার মতো ব্যবহার করেছেন। পরাশ্রয়ী স্বর্ণলতাকে আঁকশি বাড়ালেই পেড়ে ফেলা যায়। সে নিজে তো গাছ নয়, লতা নয়, তার নিজের তো কোনও শিকড় নেই। নিরাপত্তার বোধটা বড় বেশি বিঘ্নিত হয় তাতে। সেটা কোনও দম্পতির সুস্থ দাম্পত্যর পক্ষেও প্রার্থনার নয়।

বাঃ। তুমি তো বাংলাটাও ভালো ভালো শব্দ দিয়ে গেঁথে বলতে পারো।

পারি না কিছুই। তবে পারা উচিত ছিল। আমাদের বাপি, আমাদের যা শেখাতে চেয়েছিল তার পাঁচ ভাগও শেখা হয়নি আমাদের। বাপিই শিশুকাল থেকে শিখিয়েছিল যে, যাই করো না কেন

জীবনে, এক নম্বর হওয়ার সাধনা করো। দুনম্বর হয়ে বাঁচা আর না-বাঁচাতে কোনও তফাত নেই। বাপি বলত, মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।

আশ্চর্য। আমার বাবাও ঠিক এই কথাই বলেন।

এমন সময়ে গৈরিকা আর ব্যানার্জিসাহেবকেও আসতে দেখা গেল। সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে শুয়েছিলেন উনি। তারই উপরে ফেডেড জিনসের টপটা চাপিয়ে নিয়েছেন। আধ-টেকো মাথাতে টুপি। ভদ্রলোক একেবারে ওরিজিনাল মানুষ। কোনও বাহ্যিক ভড়ং নেই, যদিও থাকলে মানিয়ে যেতে পারত। গৈরিকার গায়ে হালকা খয়েরি রঙা শাল। ওঁরা নীচে নামলেন না। কিছুটা এসেই দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন ব্যানার্জিসাহেব, ওগো কবু? গোয়েবু ফলস-এ যাওয়ার কী হল?

ঐশিকা বলল, 'গোয়েবু' না বাপি 'টোয়েবু।'

সেটা মন্দ বলিসনি।

গৈরিকা গলা তুলে দুর থেকেই বলল, কী রে ওই। তোর শীতটিত করছে না। শালটাও নিয়ে এলি না!

ঐশিকা ফিসফিস করে বলল, কর্বুরকে. আপনাকে কী অপমান। এরকম উষ্ণ পুরুষের কাছে থাকলে কি কোনও মেয়ের শীত লাগা উচিত? আপনিই বলুন?

আমাকেই বা আপনি করে বলা কেন?

গৈরিকা আবার চেঁচিয়ে বলল, আপনার কলা-খেকো হাতি তো আপনাকে ডিসওবলাইজ করল মশাই। উঠে আসুন। হাতি তো দেখাতে পারলেন না কিন্তু প্রোগ্রাম তো ঠিক করতে হবে।

তাই তো দেখছি। চেঁচিয়ে বলল কর্বুর।

ওঁরা বেশ দূরেই ছিলেন।

ভালো শুনতে না পেয়ে কর্বুর বলল, মানে?

মানে, ডিসওবলাইজ করল।

কে?

কে আবার?

হাতি।

ঐশিকাকে বলল, চলো। যাওয়া যাক।

দিদিটা সারাজীবন আমার সঙ্গে শত্রুতা করে গেল।

কেন একথা বলছ?

বলব না? আমরা যে একটু একা গল্প করছি তা সহ্য হল না।

ঐশিকার মুখে ওই বাক্যটি শুনে এক অনাবিল আনন্দে কর্বুরের মন ভরে গেল। প্রাপ্তিটার রকম না জেনেই খুশিতে ডগমগ হল।

তোমাকে আমি "ওই" বলেই ডাকব, গৈরিকার মতনই।

"ওই যাঃ"-ও বলতে পারতেন।

ঐশিকার রসবোধে নতুন করে নিশ্চিন্ত হল কর্বুর।

উপরে উঠতেই ব্যানার্জিসাহেব বললেন, ব্রেকফাস্টে কী খাবে ভাই কবু? আমি ভাবছি, অরেঞ্জ জ্যুস। তারপর কষে প্যাঁজ আর কাঁচালংকা দিয়ে ডাবল-ডিম-এর ওমলেট, সঙ্গে বেকন ভাজা, উইথ মাস্টার্ড। নিয়ে এসেছি তো আমরা সঙ্গে করে। ঠান্ডাতে খারাপ হবে না। রুটিও তো তুমি এনেছ। তবে আর কী! ক্রিসপ টোস্ট, উইথ অরেঞ্জ মার্মালেড। আর কিছু কি তুমি সাজেস্ট করছ? বড়জামদার দোকানের কড়া পাকের সন্দেশও আছে। এতেই চলে যাবে? কী বলছ তুমি?

বাপি, আমরা কি এখানে খেতেই এসেছি?

সেটা মন্দ বলিসনি। তবে খেতেও তো এসেছি এবং খাওয়াতেও। ছেলেটাকে তোরা তো দেখাশোনাই করছিস না। তা আমার তো কিছু করতে হয়।

ছেলেটা কি কিন্ডারগার্টেনের ছাত্র বাপি?

গৈরিকা বলল।

সকলে জোরে একসঙ্গে হেসে উঠল সেই কথায়। সকালের শিশির ভেজা বনপথে আর শরতের জঙ্গলে সেই হাসির অনুরণন উঠল। কতকগুলো ব্যাবলার উচ্চকিত হাসিতে ভয় পেয়ে ছিঃ। ছিঃ। ছিঃ। করতে করতে দল বেঁধে উড়ে চলে গেল। ডানদিক থেকে বাঁদিকের জঙ্গলে।

ঐশিকা বলল, কর্বুরকে। আচ্ছা, পাখিগুলো কি ব্রাহ্ম?

কর্বুর অবাক হয়ে বলল কেন?

না। আমরা দাঁত দেখিয়ে মুখ হাঁ করে হেসেছি বলে হয়তো বিরক্তিতে ছিঃ ছিঃ করতে করতে চলে গেল।

গৈরিকা বলল, ভালো হচ্ছে না কিন্তু ওই।

ওই যাঃ।

বলল, ঐশিকা।

তারপর গৈরিকাকে শুনিয়েই বলল, মিস্টার ব্রহ্মকৃপা দাস ব্রাহ্ম।

তিনি কে?

দিদির হবু স্বামী। হবুই বা বলি কেন, বলি গবু। রেজিস্ট্রি তো হয়েই গেছে।

ওরা দুজনে হেঁটে পথে উঠে ব্যানার্জিসাহেবের সঙ্গে বাংলোতে পৌঁছাল। গৈরিকা এল পেছন পেছন। ঐশিকার উপরে একটু বিরক্ত হয়েছে বলে মনে হল। সম্ভবত আনন্দের আতিশয্যে ঐশিকা একটু বাড়াবাড়িও করে ফেলেছিল। পরে দুবোনে বুঝে নেবে'খন।

ভাবল, কর্বুর।

ব্যানার্জিসাহেব বললেন, খাওয়া, কদিন জঙ্গল দেখা সবই মিলিয়ে-মিশিয়ে করতে হবে তো! প্রত্যেক ক্রিয়া-কর্মকে ওয়াটারটাইট কম্পার্টমেন্টে বন্ধ করে রাখলে কী করে হবে! এটার সঙ্গে ওটা, ওটার সঙ্গে সেটা, তবে না মজা!

বলেই বললেন, তুমি কী বলো ভায়া কবু?

একদমই ঠিক বলেছেন আপনি!

দেখেছিস! দ্যাখ তোরা। তোরা তোদের বাড়াবাড়িতে আনন্দটাকেও কর্তব্য করে তুলিস। এইখানেই আমার আপত্তি। নিয়মানুবর্তিতা খুব বড় গুণ। কিন্তু আমেরিকান প্যাকেজ ট্যুরে বেড়াতে-আসা ট্যুওরিস্টরা যেমন বেড়ানো কাকে বলে তার কিছুমাত্রই জানে না, তোরাও তা জানিস না। আরে নিয়ম ভাঙাটাই তো হচ্ছে ছুটির মূলমন্ত্র। এই সরল সত্যটা বোঝে ক'জনে?

বাঃ। ভারী চমৎকার করে বললেন কিন্তু আপনি। আমার মনের কথাটি বলেছেন। ডায়েরিতে লিখে রাখব!

৯

ওরা চানটান সেরে ব্রেকফাস্ট করেই বেরিয়েছিল কুমডি থেকে। টোয়েবু ফল্‌স্ থলকোবাদ থেকে পাঁচ কিমি। আর থলকোবাদ কুমডি থেকে চল্লিশ কিমি। থলকোবাদ থেকে সিমলিপালেও যাওয়া যায়। হাটগামারিয়া তেতাল্লিশ কিমি থলকোবাদ থেকে।

ওরা মানে, ওরাই। রহমত এবং বিহারি জিপটা নিয়ে সোজা চলে যাবে থলকোবাদে। গিয়ে রান্নাবান্নার বন্দোবস্ত করবে।

থলকোবাদ বাংলোতে কুমডির চেয়েও বেশি অরণ্যপ্রেমী আসেন কারণ থলকোবাদ-এর টাওয়ারটি ভালো। বাংলোটিও পাহাড় চুড়োয়। তবে বন্যপ্রাণী দেখতে হলে সবচেয়ে সুবিধা প্রখর গ্রীষ্মে আসা। কষ্ট খুবই হয় তখন। অসুস্থ হয়ে পড়ার আশঙ্কাও থাকে কিন্তু তখন পর্ণমোচী বনের অধিকাংশ পাতা ঝরে যাওয়ায় নজর চলে বহুদূর অবধি। আর বন্যপ্রাণীরা যেখানে জল থাকে তার আশেপাশেই থাকে তখন। জলপান করার জন্যে যেমন, তেমন গরমের হাত থেকে বাঁচার জন্যে জলে গা-ডুবিয়ে থাকার জন্যেও। বর্ষার পর থেকে জঙ্গলের মধ্যে অনেক জায়গাতেই প্রায় জল থাকে, তাই প্রাণীরাও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে।

সাড়ে এগারোটা বাজে, এমন সময়ে ওরা গিয়ে পৌঁছল।

এই আপনার টোয়েবু ফল্‌স?

গৈরিকা বলল, ফল্‌স-এর সামনে দাঁড়িয়ে।

কেন? পছন্দ হল না।

নাঃ। ফল্‌স দিলেন।

গৈরিকা হেসে বলল।

এই দেখার জন্যে না এলেও হত। তার চেয়ে বনের মধ্যে কোথাও দাঁড়িয়ে বা বসে আপনার জ্ঞান অথবা গান শোনা যেত। তাতে আমাদের জ্ঞান বাড়ত। প্রাণ স্নিগ্ধ হত।

গৈরিকা বলল, সত্যি! আপনার গান তো শোনাই হল না। শোনান এক্ষুনি।

লাঞ্চ-এর আগে হাতে অনেকই সময় আছে। এখন কবু যা দেখাতে নিয়ে এল তোদের আদর করে, তাই দ্যাখ। গান বরং পরে শুনিস।

বলেই বললেন, যাই বল কবু, ভদকা খাওয়ার এমন জায়গা আর হয় না। ওই—যা তো মা, গাড়ি থেকে ভদকার আর জলের বোতলটা নিয়ে আয়।

আমিই এনে দিচ্ছি। কবু বলল।

ব্যানার্জিসাহেব বললেন, সেটা মন্দ নয়।

ফার্স্ট ক্লাস। তোমার মতো যদি জামাই থাকত একটা আমার। সব দুঃখহরণ করতে পারত।

কবু ওঁর ভদকা আর জলের বোতল এবং গ্লাস নিয়ে এল। বিহারি সবই বেতের বাক্সে প্যাক করে দিয়েছে।

বা-ব্বা! ব্রহ্মকৃপা পেয়েছ, তাতেও তোমার দুঃখহরণ হচ্ছে না!

ঐশিকা বলল, রাগ দেখিয়ে।

ব্যানার্জিসাহেব বললেন, শুধু ব্রহ্মকৃপাতে কি আমার মতো পাপী তরবে রে মা। যিশুখ্রিস্ট, মা কালী সকলেরই কৃপাই আমার দরকার। তাই তো এখন মা কালীর সেবায় লাগব।

মানে?

মানে ভদকা খাব।

পৃথিবীর কোন কোন জলপ্রপাত দেখেছ তুমি কবু? স্টেটস আর কানাডার সীমান্তে নায়াগ্রা জলপ্রপাত দেখেছ?

কর্বুর বলল, আমি কখনও দেশের বাইরেই যাইনি। একবার শুধু বাংলাদেশে গেছিলাম। যদিও বাংলাদেশকে বিদেশ বলা যায় অবশ্য। আমার নিজের দেশই এত বড় ও এত সুন্দর যে আগে স্বদেশই ভালো করে দেখি। তারপরে বিদেশে যাব।

এটা তুমি ঠিক বললে না, হরিশরণ।

কী বলছ বাবা কাকে? উনি তো কর্বুর।

ইয়েস। ইয়েস। ভুল হয়ে গেছে। স্মিরনফ ভদকাটা বড্ড কড়া। শ্বশুরের নামও ভুলিয়ে দেয়। সরি, হরিশরণ, আই মিন কর্বুর। তারপর বললেন, ট্রাভেলিং ইজ এডুকেশন। নিজের দেশকে ভালোবাসতে হলে, নিজের দেশের কীভাবে উপকার করা যায়, তা জানতে হলে বিদেশ অবশ্যই দেখা দরকার। না দেখলে, তুলনা করবে কী করে। বিদেশ না দেখলে নিজের দেশকেই পৃথিবী বলে ভুল করাও অসম্ভব নয়। সেই জন্যেই প্রত্যেক শিক্ষিত মানুষের পক্ষেই বিদেশ দেখাটা খুব জরুরি।

যাব কখনও। সময় হয়নি। তাগিদও হয়নি।

যেয়ো এখন। তাড়া কীসের? অঢেল সময় পড়ে আছে। তুমি তো ছেলেমানুষ!

হ্যাঁ। কিন্ডারগার্টেনের ছাত্র।

ঐশিকা বলল এবার।

কর্বুর তাকাল খুনসুটি করা ঐশিকার দিকে। মুখে কিছুই বলল না।

ঝরনার ঝরঝরানি শব্দ, হাওয়া-লাগা, গাছপালার ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে এসে পড়া শরতের সোনালি রোদের ঝিলিমিলির মধ্যে পনিটেইল করা ঐশিকাকে দারুণ দেখাচ্ছিল। কারও চুলের মধ্যে এতখানি যৌনতা থাকতে পারে তা আগে কখনও জানেনি কর্বুর। তার উপর আতরের গন্ধ। ঝরনার স্রোতে ঝরাপাতা হয়ে খুশিতে ভেসে যেতে ইচ্ছে করছিল ওর।

গৈরিকা বলল, কুমডি দেখলাম, তারপর থলকোবাদে যাব। আর কোন কোন বনবাংলো আছে সারান্ডাতে?

এমন সময় ঐশিকা আঙুল দিয়ে একটি ঝোপের দিকে দেখিয়ে কর্বুরকে বলল, ওগুলো কী ফুল স্যার?

কোনগুলো? ওগুলো তো....

না, না। ওগুলো নয়, বাঁদিকে, আরও বাঁদিকে দেখুন। আমার আঙুল দেখুন।

আজকে ঐশিকা মরচে-রঙা জিনস পরেছে, গায়ে মরচে-রঙা শাল। মরচে-রঙা স্পোর্টস গেঞ্জির উপরে। চুলটাকে পনি-টেইল করেছে। ভাগ্যিস আজও চুল ছেড়ে দেয়নি। কাল সারারাত কর্বুর ঐশিকার চুলের মধ্যে, চুলের গন্ধে হাবুডুবু খেয়েছে। ঘুমোতে পারেনি একটুও।

আর গৈরিকা হালকা নীলরঙা শাড়ি পরেছে, নীল-রঙা শাল। দু বোনের মধ্যে ঐশিকাই বেশি সুন্দরী। দুজন সুস্নাতা যুবতীর শরীরের সাবানের, পারফিউমের আর আতরের গন্ধে ঝরঝরিয়ে পড়া জলের পাশের প্রজাতির আর কাচপোকা-ওড়া এই উজ্জ্বল সকাল সুগন্ধে যেন উদ্বেল হয়ে উঠেছে।

কর্বুর বলল, ওঃ। ওই ফুলগুলো। ওগুলোর নাম হেল।

ওঃ হেল।

গৈরিকা বলল, কপট বিরক্তি ঝরিয়ে।

এখানে কি হেভেনও আছে নাকি?

না। হেভেন নেই। শুধুই হেল।

তারপর বলল, নামটা বোধহয় মিথ্যে নয়, কারণ ওই গাছের ফল বেটে পাহাড়ি নদীতে আদিবাসীরা যখন দেয়, তখন নদীর সব মাছ মরে গিয়ে ভেসে ওঠে। তখন তাদের ধরতে ভারী সুবিধে হয় আদিবাসীদের। এই ফলগুলো বিষ। খেলে, মানুষও মরে যেতে পারে।

বিষক্রিয়ায় যে মাছ মরে, তা খেয়ে মানুষের কিছু হয় না?

না, হয় না। কেন হয় না, বলতে পারব না।

আমি তোমার পাশের এই পাথরে একটু বসি হরিহরণ? পাইপটা একটু জম্পেস করে ধরাই। আমার তো বেশ দারুন লাগছে জায়গাটা। এই জলপ্রপাত, এই রোদ, এই মিষ্টি শীত, এই রাশান ভদকা, আর তুমি এই হরিশরণ। দারুণ। আমি কিন্তু তোমাকে হরিশরণ বলেই ডাকব।

তারপর মেয়েদের দিকে চেয়ে বললেন, তোদের বুঝি ভালো লাগছে না?

পুষ্পবনে পুষ্প নাহিরে, পুষ্প আছে অন্তরে।

কর্বুর বলল।

দেখেছ বাপি। যত ফুল সব উনি তোমারই মধ্যে খুঁজে পেলেন।

গৈরিকা বলল।

তা কী করা যাবে! ও নিজে গুণী তাই অন্য গুণীকে সহজে চিনল। তোদের মতো তো নয়।

তা বলুন না বন-বাংলোর নামগুলো এবারে।

গৈরিকা আবার বলল।

বলছি। তার আগে বলব, এর পরের বার এলে গুয়াতে ক'দিন থেকে যাবেন। কিরিবুরু থেকে নীচের সারান্ডা ভারী সুন্দর দেখায়। কিরিবুরুও সুন্দর জায়গা। সেখানে এবং মেঘাতিবুরুতে তো ভালো আরামপ্রদ গেস্ট হাউসও আছে। থলকোবাদের কাছ থেকে কারও নদী গিয়ে কোয়েলে মিশেছে। তবে এই কোয়েলে আর পালামৌর কোয়েলে অনেক তফাত। পালামৌর কোয়েল অনেকই বেশি সুন্দর।

গেস্ট হাউস কাদের?

বোকারো স্টিল-এর। গেস্ট হাউসের কাছেই ভিউ পয়েন্ট আছে। সেখানে থেকে ইচ্ছে করলে সারান্ডার সাতশো পাহাড়কে আলাদা করে গোনা যায়, যদি কারও ধৈর্য থাকে।

আরও বনবাংলোর কথা বলুন। কোথায় কোথায় আছে?

সারান্ডা ফরেস্ট ডিভিশনে তিনটি রেঞ্জ আছে। কিরিবুরু, কয়না আর সামটা রেঞ্জ। এই কিরিবুরু রেঞ্জ-এর অধীনে পড়ে কুমডি, বরাইবুরু আর করমপদা। কয়না রেঞ্জ-এর অধীনে পড়ে পোঙ্গা, ছোটনাগরা, অনুকুয়া, সালাই আর মনোহরপুর। এই মনোহরপুর ছিল বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রিয় জায়গা। বনবিভাগের একজন আমলার সঙ্গে ওঁর বন্ধুত্ব হয়েছিল। তিনিই তাঁকে সারান্ডার অনেক জায়গা ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেন।

বিভূতিভূষণ তো সাধারণ মানুষ ছিলেন না আমাদের মতো যে, ওমলেট উইথ বেকন মাস্টার্ড দিয়ে খাওয়ার জন্যেই জঙ্গলে আসতেন। তিনি ছিলেন সাধক।

ব্যানার্জিসাহেব বললেন।

তা ঠিক।

কর্বুর বলল।

এই গাছটি কী গাছ ভায়া?

কোন গাছ?

আরে আমি যার নীচে শিলাসনে বসে ভদকা খাচ্ছি আর পাইপ ফিল করছি।

ও। এটা তো কদম গাছ।

ঐশিকা বলল, হোয়াট আ পিটি, বাপি! যদি বা জীবনের অনেক পথ হেঁটে কদমতলে এসে পৌঁছলে তাও রাধার বদলে কর্বুর সেন।

সকলেই ঐশিকার কথাতে একসঙ্গে হেসে উঠলেন। সেই হাসির দমকে ঝরনার জল যেন আরও জোর পেয়ে এগিয়ে গেল।

অন্য বাংলোগুলোর কথাতো বললেন না? বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা ওঠাতে সব কিছু গোলমাল হয়ে গেল।

হ্যাঁ। বলছি। সামটা রেঞ্জ-এর অধীনে আছে সেরাইকেলা, তিরিলপোসি, আর থলকোবাদ। থলকোবাদে তো আমরা যাচ্ছিই।

এই রেঞ্জ ব্যাপারটা কী বলুন তো স্যার?

ঐশিকা বলল।

বন বিভাগের হায়ারার্কি জানলে পরে, বুঝতে সুবিধা হবে। সবচেয়ে উপরে বনমন্ত্রী, বনমন্ত্রীর পরে ফরেস্ট সেক্রেটারি, তাঁর নীচে প্রিন্সিপ্যাল চিফ কনসার্ভেটর অফ ফরেস্টস, সংক্ষেপে পি.সি.এফ. এবং তাঁর অধীনে আবার চিফ কনসার্ভেটর। সি.এফ. তাঁর অধীনে আবার একাধিক কনসার্ভেটর।

একাধিক কেন?

মানে, নানা বিভাগের একজন করে চিফ। ওয়াইল্ড লাইফ, সিলিভি কালচার, ফরেস্টস, গেম-পার্ক, প্ল্যানিং ইত্যাদি ইত্যাদি। তাছাড়া অঞ্চল হিসেবেও আছে। যেমন, নর্থ বিহার, সাউথ বিহার ইত্যাদি ইত্যাদি। একেকজন চিফ কনসার্ভেটর-এর অধীনে থাকেন একাধিক কনসার্ভেটর। একজন কনসার্ভেটরের অধীনে থাকেন কয়েকজন ডি.এফ.ও. অর্থাৎ ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার। আবার একেকজন ডি.এফ.ও. 'র অধীনে থাকেন কয়েকজন রেঞ্জার, এক-একটি রেঞ্জ-এর দায়িত্বে।

আর রেঞ্জারের নীচে কেউ থাকেন না?

থাকেন বইকি! রেঞ্জারের নীচে ফরেস্টার। একাধিকই থাকেন। তাঁদের নীচে ফরেস্ট গার্ড।

বাবা। এ দেখি বন্যপ্রাণীর চেয়েও সংখ্যাতে আমলা বেশি।

গৈরিকা বলল।

হ্যাঁ। সেইরকমই ব্যাপার।

হেসে বলল, কর্বুর।

এখানে এক রকমের ফুল ফোটে তাদের নাম হুঁতিতি।

কী বললেন? তাই? অদ্ভুত নাম তো!

হ্যাঁ। শুধু নামেই নয়, চরিত্রেও অদ্ভুত। আট বছর বাদে বাদে ফোটে। পৃথিবীর খুব কম প্রাণী অথবা উদ্ভিদের গর্ভাবস্থা এত দীর্ঘ। যদি বা থেকেও থাকে, তবে তা আমার অজানা। আমি আর কতটুকুই বা জানি।

বাবাঃ। গলা তো শুকিয়ে গেল আপনার। কফি খাবেন নাকি? এনেছি তো ফ্লাস্কে করে।

ব্যানার্জিসাহেব বললেন, দে-দে। এনেছিস তো দিচ্ছিস না কেন?

আপনার টোব্যাকোর গন্ধটা ভারী সুন্দর।

কর্বুর বলল, ব্যানার্জিসাহেবকে।

গোল্ডব্লক। ইংলিশ টোব্যাকো। আমার বন্ধু রনাল্ড রায়ান পাঠায় কানাডা থেকে, এর তার হাতে, নিয়মিত। ভেরি সুইট এবং সুইট স্মেলিং টোব্যাকো।

ইচ্ছে আছে থলকোবাদে আজকের দিনটা আর রাতটা থেকে আপনাদের নিয়ে সালাই যাব। একটি নির্জন মালভূমির একেবারে উপরে দু-কামরা আর একটি আউট হাউসের বাংলো। মালভূমিতে রাতে জিপ নিয়ে ঘুরলে, আশাকরি অনেক জানোয়ার দেখাতে পারব।

তা তো পারবে। এখন লাঞ্চের মেনুটা কী তা বলো তো দেখি।

পৌঁছতে তো দেরি হবে। তাই বলছি পাতলা করে মুসুর ডালের খিচুড়ির সঙ্গে কড়কড়ে করে আলুভাজা আর বেগুনি।

বাঃ। ফাস ক্লাস। ভদকার সঙ্গে যা জমবে না।

কী কী জানোয়ার দেখতে পাব আমরা?

ঐশিকা শুধোল।

হাতি তো এখানে যত্রতত্রই দেখা যায়। কাল রাতে হাতিটা এল না কেন জানি না। তবে একটা হাতিতে ইন্টারেস্টেড নই। একটা হাতি মানেই ঝামেলার ব্যাপার। লেপার্ড ওয়াইল্ড ডগস বা ভারতীয় ঢোল। দেখা যায়।

কুকুরের নাম ঢোল?

ঐশিকা জিজ্ঞেস করল।

তাদের দলের সর্দারের কী নাম?

এবারে গৈরিকা জিজ্ঞেস করল।

ঢোলগোবিন্দ।

কর্বুর বলল।

তারপর বলল, হ্যাঁ। বুনো-কুকুরেরই নাম। লাল লাল দেখতে। দলে থাকে। দিশি কুকুরের চেয়ে বড় হয়। আবার অ্যালশেসিয়ানদের চেয়ে ছোট হয়। এরা পনেরো মিনিটের মধ্যে বড় শম্বরকে শেষ করে কঙ্কালটি রেখে যাবে। এরা যে জঙ্গলে ঢোকে, সেই জঙ্গল থেকে বাঘও ভয়ে পালায়।

তাই?

হ্যাঁ।

আর মানুষদের?

ভরসার কথা এই যে, আজ অবধি মানুষদের কখনও আক্রমণ করেনি। যেদিন মানুষের ভয় এদের ভেঙে যাবে, সেদিন থেকে বনচারী মানুষের বড়ই বিপদ।

তারপর বলল, এত অল্প সময়ের জন্যে এলে কি বন দেখা যায়? কুমডির কাছেই বীরহোড়দের একটি বস্তি আছে। সেখানে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল আপনাদের। এখনও আদিম আছে তারা। চাষবাস করে না। বনের ফলমূল কান্দা-গেঠি খেয়ে থাকে। মহুয়ার ফুল, ফল। শালেরও। উইপোকাকে ওরা বলে বানর-ডুমরি, ওদের ভাষাতে। উইপোকা খায় ওরা, মহুল ফুলও, ভাল্লুকের সঙ্গে লড়াই করে। ভাল্লুকেরও তো ওসব খুবই প্রিয় খাদ্য। মহুয়ার মদকে ওরা বলে 'আরকি'। আর হাঁড়িয়া বা পচাইকে বলে 'ভিয়েন'।

শুনেছি, মহুয়া 'ডক্টরড' করে খেলে দারুণ হয়। তবে তোমার সঙ্গে এসব নিয়ে আলোচনা করে লাভ কী? কুরুবককে বলব ভাইপো দেখে এলাম বটে তোমার। সেই সে যুগে ছিল যুধিষ্ঠির আর এ যুগে কর্বুর। মাঝে ধূ-ধূ সমুদ্দুর। যদি বা কিছু থাকতেও পারত কর্বুর তা কর্পূর করে হাওয়া করে দিয়েছে।

'হাওয়া-করা' আবার কী কথা বাপি?

গৈরিকা বলল।

আরে, আমি মিস্ত্রি মানুষ। আমি ওইরকমভাবেই কথা বলি। আমি কি আর তোদের মতো সংস্কৃতিসম্পন্ন?

কর্বুরও তো মিস্ত্রিই। ইঞ্জিনিয়ার যদি মিস্ত্রি হন।

গৈরিকা বলল।

কর্বুরের সঙ্গে আমার তুলনা। সে তো লাখে এক। এমন একটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, সে যে মোদের কর্বুর গো, কবুবাবু তুমি।

কর্বুর হেসে ফেলল।

আচ্ছা, সালাই কতদূর? থলকোবাদ থেকে।

ঐশিকা প্রশ্ন করল এবারে।

চল্লিশ কিমি মতো হবে। তবে জঙ্গলের পথ তো। সময় লাগে যেতে।

তাহলে........বলেই, ভদ্‌কার গ্লাস 'বটমস-আপ' করলেন।

ব্যানার্জিসাহেবের কথা শেষ হওয়ার আগেই উৎকর্ণ হয়ে কী যেন শুনল কর্বুর এক মুহূর্ত। তারপরই স্বগতোক্তি করল, একটা মোটর সাইকেল আসছে।

ডাকাত-টাকাত নয় তো?

গৈরিকা বলল উদ্বিগ্ন গলায়।

রেজিস্ট্রিটা হয়ে যাওয়ার পর থেকেই ওর বাঁচার শখটা হঠাৎই তীব্র হয়েছে যেন। বুঝতে পারে গৈরিকা। আর নিজে যখন বোঝে, তখন অন্যেরাও বোঝে নিশ্চয়ই।

ঐশিকা বলল, তাতে কী হয়েছে? আমাদের লোকাল গার্জিয়ানের কোমরে যন্ত্রও আছে।

কী করে জানলে তুমি?

জিজ্ঞেস করল কর্বুর, ঐশিকাকে।

'তুমি' শুনে ব্যানার্জিসাহেব খুশি হলেন এবং খুশি যে হয়েছেন তা দেখবার জন্যে পুরিত গ্লাসটাতে বড় চুমুক লাগালেন একটা।

তুমি যখন ড্রাইভিং-সিট থেকে নামছিলে তখন দেখে নিয়েছি।

সে কথার উত্তর না দিয়ে কর্বুর বলল, তাই? তোমার চোখ তো খুব ভালো।

সে বিষয়ে কি আপনার কোনও সন্দেহ আছে?

আমার নিজের গাড়িতে ড্রাইভিং সিট-এর পাশে দরজার সঙ্গেই লাগানো হোলস্টার আছে। সেখানেই পিস্তলটা থাকে, যখনই গাড়ি নিয়ে ঘোরাফেরা করি। তবে আজকালকার ডাকাতরা তো পিস্তল ব্যবহার করে না, তারা তো চাইনিজ এ. কে. ফর্টিসেভেন, ইজরায়েলি উজি, রাশিয়ান কালানিশভ অটোম্যাটিক ওয়েপনস ব্যবহার করে।

দেখতে দেখতে ভট্‌ভট্‌ শব্দটা জোর হতে লাগল।

কর্বুর স্বগতোক্তি করল, সাইলেন্সরটা ফাটা আছে, তাই আওয়াজ এত জোর হচ্ছে।

নিস্তব্ধ শারদ সকালের গভীর বনের মধ্যে সেই ফাটা-সাইলেন্সার লাগানো মোটর সাইকেলের শব্দ চতুর্দিকে ঝরনার মতো অনুরণিত হচ্ছিল।

তারপরই কর্বুর উঠে দাঁড়াল। আবারও স্বগতোক্তি করল, ফট্‌কা নয়তো!

ফচ্‌কা?

ঐশিকা জিজ্ঞেস করল।

সে কীরকম ডাকাত যে, নাম তার ফচ্‌কা?

গৈরিকা বলল, তাছাড়া আমাদের কাছে আছেটা কী যে, ডাকাতি করতে আসবে?

ওরা কজন আছে তাতো জানি না। আপনারা দুই বোনেই তো যথেষ্ট। আর কীসের দরকার তাদের!

বলেই বলল, ডাকাতের নাম ফচ্‌কা নয়। ভালো মানুষের নামও ফচকা নয়। আমাদের বড়বিলের অফিসের এরান্ড বয়ের নাম হচ্ছে ফট্‌কা। সর্বঘটে কাঁটালি কলা। তার মোটর সাইকেলের সাইলেন্সরটা দশমীর দিনই ফেটেছে যে, তা আমি জানি। সেইজন্যই ভাবলাম....,

দেখতে দেখতে শব্দটা কাছে এসে গেল এবং দেখা গেল একজন গাঁট্টা-গোট্টা বাঁটুল চালাচ্ছে

মোটর সাইকেল আর আরেকজন রোগা-প্যাংলা লম্বা পিছনে বসে। তার হাতে একটা তেল-পাকানো মোটা লাঠি।

নমস্তে ছোটবাবু।

চালক বলল, বাইকটা লাগাতে লাগাতে।

ক্যারে ফট্‌কা! বাত ক্যা?

উদ্বিগ্ন গলাতে পাথর থেকে উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, কর্বুর।

ফ্যাক্স আয়া। বড়বাবু বলিন কি আভ্‌ভি লেতে যা না।

কাঁহাসে আয়া? কলকাত্তাসে?

নেহি বাবু। টাট্টাসে।

বলে, সে পকেট থেকে ফ্যাক্স মেসেজটা বের করতে করতে এগিয়ে আসতে লাগল।

টোটালি আনকনসার্নড ব্যানার্জিসাহেব ফট্‌কার সঙ্গীকে বললেন, লাঠি কাহে লেতে আয়া?

সে কাঁচুমাচু মুখ করে ওড়িয়াতে বলল, হাতি মারিবাকু পাঁই।

বলে কি এ ছোকরা! লাঠি দিয়ে হাতি মারবে কি?

রাস্তামে মিলাথা হুজৌর। এহি লাঠি দিখকেই তো ডরকে-মারে ভাগা জোর সে।

ফট্‌কা বলল।

মিলা তা? হাথি? কাঁহা মিলা থা?

কুমডি বাংলো কি বগলহিমে।

কর্বুর ফটকার সঙ্গীর দিকে চেয়ে বলল, উও হ্যায় কৌন?

জামদা সে উসকো উঠাকে লায়া হ্যায় বাবু। পান-দুকানি কি ভাতিজা। জঙ্গলমে একেলা আনেমে ডর লাগল থু।

ক্যা নাম হ্যায় তুমহারা?

নমস্কার আইগাঁ। ম নাম্ব ক্রপাসিন্ধু।

তম ঘর কউটি?

পানপোষ আইগাঁ।

ফট্‌কার হাত থেকে ফ্যাক্সটা নিয়েই পড়ল কর্বুর মনে মনে। ব্যানার্জিসাহেবের নামেই ফ্যাক্স। জামশেদপুর থেকে তাঁর সেক্রেটারি এম. এস. মানসুখানি পাঠিয়েছে। "ইওর ফাদার-ইন-ল এক্সপায়ার্ড লাস্ট নাইট। প্লিজ প্রসিড টু ক্যালকাটা। বডি বিইং কেপ্ট ইন মর্চুরারি। উইল বি ক্রিমেটেড ওনলি আফটার ইওর অ্যারাইভাল। সলিসিটর্স ওলসো ডেজায়ার্স সো। হ্যাড ওলসো স্পোকন ট্যু মিস্টার কে. সেন।

তারপরে পি. এস.—প্লিজ টেক উওর ডটার্স অ্যালউ কনডোলেন্সেস—মীনা।

কী ব্যাপার?

ব্যানার্জিসাহেব বললেন।

কর্বুরের কাছ থেকে উত্তর না পেয়ে উনি বললেন, নির্ঘাৎ সে বুড়ো টেঁসেছে। সারাটা জীবন আমাকে জ্বালিয়ে গেল মানুষটা। দেড় বছর পর চারটে দিনের জন্য এসেছি....! সত্যি!

গৈরিকা আর ঐশিকা একসঙ্গে বলে উঠল, কে? দাদু?

মনে তো হচ্ছে, তাই। কর্বুর ফ্যাক্স মেসেজটা ওঁকে দিল।

উনি ফ্যাক্সটা জোরে জোরে পড়লেন।

তারপর বললেন কর্বুরকে, তুমি তোমার ফট্‌কাকে বলো যে আমাকে এক ঝট্‌কাতে থলকোবাদে

পৌঁছে দেবে মোটর সাইকেলের পেছনে বসিয়ে। তুমি, বুড়োর অগাধ সম্পত্তি যারা পাবে, তাদের কলকাতাতে পাঠাবার বন্দোবস্ত করো।

বুঝলাম না। আপনি যাবেন না?

কর্বুর বলল।

নো। নেভার। যে—শ্বশুর জীবনে জামাইকে জামাই-ষষ্ঠী পর্যন্ত খাওয়ালেন না একদিন, তাঁর মৃত্যু তো আমার কাছে আনন্দের ঘটনা। আমি থলকোবাদেই যাব। আই উইল ড্রাউন মাই সরো দেয়ার। বুলকু চাটুজ্যের মুখে তোমরা গিয়ে আগুন দাও গে যাও। আমার স্ত্রীই চলে গেছেন কবে। তার আবার ফাদার-ইন-ল। ওয়ান পাইস ফাদার-মাদার ছিল হে কবু। চক্ষুচর্মহীন।

ঐশিকা বলল, কী হচ্ছে বাবা! এঁরা কি বুঝবেন যে, এটা তোমার ঠাট্টা!

ঠাট্টা! তোমরাও ঠাট্টা ভাবলে না কি?

তারপর বললেন, কর্বুর আমার পুত্রসম। কিছুই মনে করবে না। আর, ফট্কা আর কৃপাসিন্ধু তো বাংলাই বোঝে না। ভারী বয়ে গেল। তোরা কোটি কোটি টাকা পাবি। তোরা যা।

তারপর বললেন,

ওরে ওই, কী বুঝলি?

কী?

তোর দিদির বর ব্রহ্মকৃপার কপালটা তো দারুণ রে। এ তো জ্যাকপট পাওয়ার কপাল। বিয়ের রেজিস্ট্রি হল কী সঙ্গে সঙ্গে অমর বুড়ো পটল তুলল! আমার তো ভয় ছিল আরও বছর বিশেক চালিয়ে যাবে স্ট্রেইট-ব্যাটে ব্লক করে করে।

তারপর বললেন, এই যে বাবা কর্বুর। একটা ফ্যাক্স মেসেজ লিখে দিচ্ছি, আমার জামাই বাবাজীবন ব্রহ্মকৃপাকে কনগ্রাচুলেট করে। পাঠাবার বন্দোবস্ত অবশ্যই কোরো।

১০

আগামীকাল লক্ষ্মীপুজো। আজই সকালে কর্বুরের কাকু কুরুবক, কাকি এবং কিরি পৌঁছেছে। বাগানের মধ্যে ঠাকুর-দালান। দুর্গাপুজোর আগে থাকতেই ঝকঝক তকতক হয়েছে। পেতল তামার সব জিনিস পালিশ করার জন্যে বাইরে থেকে এনে লোক লাগানো হয়েছে। বারান্দার কার্নিশে লাগানো আংটা থেকে ঝোলানো রড—আয়রনের ফ্রেম থেকে অর্কিড ও সিজন ফ্লাওয়ার ঝোলানো হয়েছে। পিদিমদানিতে রেড়ির তেল আর সলতে পড়েছে। শ্যান্ডেলিয়ার-এর সব কটি বাল্‌ব পরীক্ষা করে দেখে, খারাপ বাল্‌ব বদল করা হয়েছে।

বাড়িতে দুর্গাপুজোই হয় না। অন্য সব পুজোই হয় যথা—লক্ষ্মীপুজো, কালীপুজো, সরস্বতী-পুজো, বিশ্বকর্মা পুজো হয় খাদানে খুব জাঁকজমক করে।

কালকে বড়বিল বড়জামদা থেকে অনেকেই আসবেন। জামশেদপুর থেকেও কাকার ঘনিষ্ঠরা আসবেন অনেকে। তাঁরা গেস্ট-কটেজ-এ থাকবেন। এবারে পুজো অক্টোবরের মাঝামাঝি পড়েছিল। তাই গরম একেবারেই নেই। এবারে লক্ষ্মীপুজো রবিবারে পড়েছে তাই আজ শনিবার বলে কাকুরা সকালেই এসে পড়তে পেরেছে, অন্যান্য বছর লক্ষ্মীপুজোর আগের দিন রাতে আসে।

শিখীও এসেছে বড়জামদা থেকে। জটাদা, পচাদা, গোয়েল সবাই আসবে কাল। লক্ষ্মীপুজোর ভোগ হয় "টাটিঝারিয়াতে" ভুনিখিচুড়ি, বাদাম, কিশমিশ, কড়াইশুঁটি দেওয়া, আর কড়াইশুঁটির চপ।

আলু ও বেগুন ভাজা। যাঁরা ভাত খান না রাতে, তাঁদের জন্যে লুচি এবং ধোঁকা এবং ছানার তরকারি। মিষ্টি দু তিনরকম তো থাকেই।

আজকের মতো কাজকর্ম সব সামলে নিয়েছেন মা-কাকিমারা কাজের লোকজনের সাহায্যে। প্রসাদের জোগাড় করতে হবে সকাল থেকে। বড়বিলের বড়জামদার অনেকে আসবেন, মেয়েরা। অপাদিও আসবেন। আজও এসেছেন অপাদি। সর্বগুণসম্পন্না মহিলা। স্বামী হারা হয়েছেন গতবছর। মা-কাকিমার বন্ধু বিশেষ। এখন ওরা কর্বুরের লাইব্রেরি ঘরের সামনের বারান্দাতে বসে আছে। মা, বাবা, কাকু, কাকি, অপাদি, শিখী, কবু। কিরি, ফটকার সঙ্গে ব্যাডমিন্টন খেলছে বাংলোর সামনের দিকে লনে, আলো জ্বেলে। এদিকের আলো সব নিভোনো। কাল কোজাগরী পূর্ণিমা। শুক্লা চতুর্দশীর চাঁদের আলোতে চরাচর ভেসে যাচ্ছে। আকাশময় তারারা উজ্জ্বল হয়েছে। এ বছর খুব বৃষ্টি হওয়াতে শরতের রূপ অনবদ্য হয়েছে। বাগান থেকে নানা ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মা, কাকিমা, অপাদি ও শিখীর মাখা সুগন্ধ। মা-কাকিমার পাউডার বা সাবান বা পারফ্যুমের গন্ধ চেনে কর্বুর। চেনে না অনাত্মীয়াদের সুগন্ধ। যেমন গৈরিকা, ঐশিকা, শিখী বা অপাদির। মেয়েরা চান করে উঠে পাট ভাঙা শাড়ি পরলে তাঁদের কাছে গেলেই ভালো লাগায় মরে যায় কর্বুর সেই ছেলেবেলা থেকেই।

চাঁদের আলোতে দেখলে চেনা মানুষকেও অচেনা মনে হয়। যেমন অন্ধকারেও হয়। অসুন্দরকেও চাঁদের আলোতে সুন্দর বলে মনে হয়, অগায়ককে গায়ক বলে। মান্টি কাকা. করুণা জ্যাঠাও এসেছেন জেঠিমা ও কাকিমাদের নিয়ে।

বাবা বললেন, একটা গান শোনা তো কবু। অনেকদিন তোর গান শুনি না।

মা বললেন, কবু তো গাইবেই কিন্তু অপাকে তো পাওয়া যায় না। অপার গানই আগে শুনি। সেই লক্ষ্মী বন্দনার গানটা শোনাওতো অপা।

অপাদির অন্য দশজন মহিলার মতো গানের ব্যাপারে কোনও ন্যাকামি নেই। বলামাত্রই গান করেন উনি। অপাদি ধরে দিলেন, "এসো সোনার বরণ রানি গো, এসো শঙ্খকমল করে/এসো মা লক্ষ্মী, বসো মা লক্ষ্মী, থাকো মা লক্ষ্মী ঘরে।"

বড় ভালো গানটি। গান শেষ হতে না হতেই কোথা থেকে একটি লক্ষ্মীপেঁচা এসে বসল তো বসল বড় স্থলপদ্ম গাছটারই উপর। একটা চাপা গুঞ্জন উঠল সমবেত পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে। কিছুক্ষণ থেকে, পেঁচাটা উড়ে গেল।

করুণা-জ্যাঠা বললেন, কত ষড়যন্ত্র করে আমার বাড়ির বাগানে একবারও একে আনতে পারলাম না আর দ্যাখ গপা-আর কুরু তোদের বাগানেই সে উড়ে এল। দেবতারাও যদি "তেলা মাথাতে তেল দেন" তাহলে আমরা যাই কোথায়? আরও ধনাগম হবে অচিরে। অতি উত্তম।

সকলেই হেসে উঠলেন।

কবু চুপ করে রইল। কাকি একবার চাইল কবুর দিকে, অন্যদিকে চেয়ে থেকেও বুঝতে পারল কবু।

করুণা জেঠিমা বললেন, শিখী, তুই একটা নিধুবাবুর গান শোনা।

গলাটা আজ ভালো নেই।

বলল, শিখী।

মা বললেন, জানি তো। তবু গা, দিদি বলছেন।

শিখী ধরল, "কী করে কলঙ্কে যদি সে আমারে ভালোবাসে/আমি যাতনা বাঁধা সদা সে পড়িল সেই ফাঁসে।"

কবু গান শুনতে শুনতে কুমডিতে চলে গেল মনে মনে। ঐশিকাকে দেখতে পেল কল্পনাতে তার সামনে বসে ওই গানটিই গাইছে। তফাতটা তখনই বুঝেছিল। তবে তফাতটা যে এতখানি তা এখন বুঝল। ঐশিকার ক্লাসই আলাদা! সামাজিক পারিবারিক পটভূমি তো একজন মানুষের জীবনে অনেকখানি। তা সকলে স্বীকার করুন আর নাই করুন। তারপরে যাকে বলে SCHOOLING, তার উপরেও অনেকখানি নির্ভর করে। ঐশিকা গানও গায় শিখীর চেয়ে অনেকই ভালো। তাছাড়া, যে-কথাটা সে কারোকেই বলতে পারেনি কিন্তু নিজে একদিন অনুক্ষণ অনুভব করেছে তা হল, ঐশিকার কাছে গেলেই ও যেমন শারীরিক আকর্ষণ অনুভব করেছে, তেমন মহড়া দিতে দিতে শিখীর এত কাছে গত দেড়মাস ধরে থেকেও করেনি। ঠিক এইরকম শারীরিক অনুভূতি ওর জীবনে অন্য কোনও নারীর সম্বন্ধেই হয়নি।

গান শেষ হলে, সকলে নানা কথা বলছিলেন। কর্বুরের কানে কিছুই যাচ্ছিল না। ও দু-চোখের সামনে ঐশিকার খোলা চুলের সুগন্ধি মেঘ, ওর কানে তার বুদ্ধিদীপ্ত, সরস কথোপকথন, ওর নাকে সেই ফিরদৌস আতরের গন্ধ।

বুলকু চাটুজ্যে অর্থাৎ ঐশিকাদের দাদু, মায়ের বাবা কী করতেন জানে না কর্বুর। সত্যিই তিনি কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি এক এক নাতনির জন্যে রেখে গেছেন কি না তাও জানে না, জানতে চায়ও না। তবে ঐশিকা গৈরিকার বাবা ব্যানার্জিসাহেব একজন গ্রেট লোক সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই। কথায় কথায় তাঁর "সেটা মন্দ হয় না" বাক্যবন্ধটি ভোলবার নয়। মানুষটা, ছুটিতে এসে নিজেকে কী করে আনওয়াইন্ড করতে হয়, তা জানেন। আর মেয়েরা যদি রসবোধ পেয়ে থাকে, তো বাবার কাছ থেকেই পেয়েছে।

চলে যাওয়ার পর ওদের আর কোনও খবর পাইনি। কারোকে জিজ্ঞেস করতেও লজ্জা করেছে। ও তো খাদান থেকে ফিরেছে মাত্র ঘণ্টাখানেক আগে। কাকু-কাকির সঙ্গে কথা হওয়ার তেমন সুযোগও হয়নি।

করুণা জ্যাঠা হঠাৎ বললেন, আরে বুলকু চাটুজ্যে চলে গেল। জানো গপা।

বাবা বললেন, কে বুলকু চাটুজ্যে?

আরে বি কে চ্যাটার্জি। কলিয়ারি কিং ছিলেন। তাছাড়া, মস্ত বড় স্টিভেডর। কত শত কোটি টাকার মালিক তা ঈশ্বরই জানেন। কিন্তু সকালে তার নাম করলেই হাঁড়ি ফাটে এমনই বদনাম ছিল তার।

বাবা হয়তো চিনতেন।

কবুর বাবা বললেন।

গর্জন কাকা তো অবশ্যই চিনতেন। মিত্র এস কে'র এস কে মিত্র, কোডারমার, ক্রিশ্চান মাইকা কোম্পানির রামকুমার আগরওয়ালা আর তার ভাইয়েরাও ভালো করে চিনতেন। তবে, মানুষটা অনেস্ট ওয়েতে পয়সা করেছিল। করলে কী হয়, ওয়ান-পাইস-ফাদার-মাদার। সারা জীবন সবাইকে টাইট করে দিতে দিতে কখন যে প্যাঁচই কেটে যায় তাতো বোঝা যায় না। তাকে টাইট দিয়েছিল তার একমাত্র মেয়ের জামাই।

তারপরেই কী মনে পড়াতে বললেন, কুরুবক কোথায়? তুমি চেনো না? শোনোনি বুলকু চাটুজ্যের কথা?

না তো!

কর্বুর সব শুনেও চুপ করেছিল।

জেঠু বললেন, টাটাতে তোমার যে বস গো, সেই তো বুলকু চ্যাটার্জির জামাই।

ব্যানার্জিসাহেব! না না, তাঁর স্ত্রী তো কবেই চলে গেছেন!

হ্যাঁ। সে তো জানিই। মেয়ে দুটিকেও হিরের টুকরো করে তুলেছে, বুলকু চাটুজ্যের কোনওরকম কথাই না শুনে। সে চেয়েছিল দুই সুন্দরী নাতনির জন্যে দুটি ঘরজামাই নিয়ে আসে। দুটিকেই আঠারো-উনিশেই বিয়ে দিতে চেয়েছিল। যা রেখে যাবেন তা তো চারপুরুষ বসে খেলেও পাঁচ পুরুষের জন্যেও থাকবে কিছু। কিন্তু ঘোঁৎলা বাঁড়ুজ্যে অন্য চরিত্রের মানুষ। সে তার শ্বশুরমশাইয়ের কোনও প্রভাবই মেয়েদের ওপরে পড়তে দেয়নি। তবে যাওয়া-আসা ছিল। বুড়োর চোখের মণি ছিল ওই দুই নাতনি। নাতনিরাও দাদুকে ভালোই বাসত কিন্তু তাদের আপব্রিঙ্গিং নিজে হাতে করেছে ঘোঁৎলা বাড়ুজ্যের মতো চরিত্র আমি বেশি দেখিনি।

কর্বুর জিজ্ঞেস করল। ক্ষৌণিশ ব্যানার্জির ডাকনাম বুঝি ঘোঁৎলা?

তা নইলে আর বলচি কার কথা। ডাঁটিয়াল।

তাঁর প্রয়োজনই বা কি? তাঁর "টেক হোম পে" কত জানেন করুণাদা? রুসি মোদীর সঙ্গে বনত না। সে চলে যাওয়াতে এখন ব্যানার্জিসাহেবকে আটকাবার কেউই নেই। তাঁর পয়সাই কে খায় তার ঠিক নেই! মেয়ে দুটিও তো হাইলি কোয়ালিফায়েড। তারাও বাবার পয়সা প্রত্যাশা করে না।

তোমাদের কোনোই ধারণা নেই কুরু, বুলকু চ্যাটার্জি কী পরিমাণ ধনী।

মন্টিকাকা প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে বললেন, ব্যাপারটা জমেছে ভালোই। লক্ষ্মীপুজোর রাতে লক্ষ্মীপেঁচা আর ধন-দৌলতের আলোচনাই তো সঠিক বিষয় আলোচনার। এদিকে চা-ও তো এসে গেল। কবুর গান কি আজ শোনা হবে না?

মন্টিকাকার একটি কন্যা আছে, নিবেদিতা, সে মোটেই সুবিধার নয়। সুবিধের নয় মানে—চেহারা, ছবি ভালোই কিন্তু একেবারে পুলিশ সার্জেন্ট। কবুর উপরে মন্টিকাকার যে নজর আছে, তা সে অনেকদিনই আঁচ করেছে। তবে সুখের বিষয় এই যে, মা মন্টিকাকিমাকে একেবারে পছন্দ করেন না। সেইটিই কর্বুরের রক্ষাকবচ।

কর্বুর বলল, আজ সকাল থেকেই আমার গলাতে ভীষণ ব্যথা। তাছাড়া ইন্ডিকার এ.সি.-টা এত এফেক্টিভ, আগে বুঝতে পারিনি, গলা একেবারে ধরে গেছে। ধরে রয়েছে।

তাহলে আর কী? চা খেয়ে আমরা একে একে উঠি। কালকে বাড়ির পুজো সেরে এখানে আসব খিচুড়ি খেতে।

নিশ্চয়ই আসবেন।

কর্বুরের মা বললেন, শর্বাণী আর মেয়েকেও নিয়ে আসবেন।

নিশ্চয়ই আনব।

মন্টিকাকা বললেন।

একে একে সবাই-ই উঠলেন। কর্বুরও উঠে সকলকে "টাটিঝারিয়ার" গেট অবধি পৌঁছে দিল। কর্বুরের বাবা ছেলেবেলা থেকেই শিখিয়েছেন এটি। উনি বলতেন, কেউ কারও বাড়িতে খেতে আসেন না। একটু আদর-যত্ন, আসুন-বসুন, একটু আপ্যায়নের জন্যেই আসেন। প্রত্যেককে বাইরের গেট অবধি পৌঁছে দেবে।

কর্বুর শিখীকে বলল, তুমি যাবে কিসে? কাকাবাবু নিতে আসবেন?

না। আমি অটোতে চলে যাব।

রাতের বেলা অটোতে যাবে কি? চলো আমিই ছেড়ে দিয়ে আসছি।

পাশে দাঁড়ানো কাকি বলল, তোমার সঙ্গে আমার দরকার আছে কবু। তোমার কাকাকে বলো, নয়তো একজন ড্রাইভারকে বলো না। সবাই তো গুলতানি করছে সারভেন্টস কোয়ার্টারে।

এমন সময় একটা লাল রঙা মারুতি এসে দাঁড়াল গেট-এ।

কর্বুর বলল, আরে রহমত খাঁ। তোমার হাতে বাজবাহাদুরের রূপমতীকে এই রাতের বেলা ছেড়ে দেওয়া কি নিরাপদ হবে? আকাশে এমন চাঁদ, বাতাসে এমন গন্ধ।

সেই জন্যেই তো হবে কবু দাদা।

গোয়েল বলল।

তব ঠিক হ্যায়। সামহালকে লে যানা রূপমতীকো।

বিলকুল। আপ বে-ফিক্কর রহিয়ে।

আচ্ছা শিখী, আবার এসো। তোমার দেওয়া বইটা পড়েছি। খুব ভালো বই। আর আজ তো গানটি শুনলামই। কী আর বলব! ধন্যবাদ দিয়ে তোমাকে ছোট করব না।

চলি কবুদা। একদিন সময় করে এসো না আমাদের বাড়িতে। গানবাজনা হবে।

শিখী বলল।

আমাকেও বলবে তো?

গোয়েল বলল।

তোমাকে না বললে আমি যাবই না।

কর্বুর বলল।

শিখী কিছু না বলে, কর্বুরের খুলে দেওয়া দরজা দিয়ে সামনের বাঁদিকের সিট-এ গিয়ে বসল।

চলে দাদা।

হ্যাঁ। সামহালকে যা না।

সবাই চলে যাওয়ার পরে কর্বুর আর তার কাকি ফিরে আসছিল। ভারী ভালো লাগছে এখন। সেই চন্দ্রাতাপের নীচে এখন চাঁদের আলো আর ছায়ার সাদা কালো বুটি-কাটা গালচে পাতা। একটি পিউ কাঁহা বাংলোর পেছনের চন্দ্রালোকিত প্রান্তরে পাগলের মতো ডাকতে ডাকতে চলে গেল।

কর্বুর জিজ্ঞেস করল, ওদের দাদুর কাজ কি হয়ে গেছে?

হ্যাঁ কবেই তো হয়ে গেছে।

ফিরে এসেছে ওরা জামসেদপুরে?

হ্যাঁ। ফিরে, ঐশিকা তো চলেও গেছে দিল্লিতে। সত্যি! ওদের দাদু আর মরার সময় পেলেন না!

দিল্লিতে কোনও টিভি কোম্পানিতে জয়েন করতে। ছ'মাস ট্রেনিং-এ থাকবে তারপর ভারতবর্ষের কোনও বড় শহরে পোস্টিং হবে। মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি। ভারতবর্ষের বাইরেও পাঠাতে পারে।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল কবুর। লক্ষ করল পদ্মা।

আর গৈরিকা? সে কবে যাচ্ছে স্টেটস-এ?

ঠিক জানি না। সম্ভবত সামনের মাসে।

ওঁরা কী বলবেন?

কী সম্বন্ধে?

আমার খিদমদগারিতে সন্তুষ্ট তো! কাকার মানহানি হয়নি তো?

বাবাঃ। মানহানি কি? কাকার প্রমোশনই হয়ে যাবে হয়তো। ব্যানার্জিসাহেব তো তোমার প্রশংসাতে পঞ্চমুখ। বারে বারে বলছেন "জেম অফ আ বয়", গৈরিকাও যে কত প্রশংসা করল।

আর অন্যজন?

তাঁর মনই ঠিক বুঝতে পারলাম না। তিনি তাঁর বাবার কথা আর দিদির কথা শুনে গেলেন। তোমার সম্বন্ধে অবশ্য বলেছেন শুধুমাত্র একটিই বাক্য।

সেটা কী?

বলেছেন, "আ ভেরি নাইস পার্সন"।

লিখে দিতে বললে না কেন কাকি? ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখতাম সার্টিফিকেটটি।

একটু রাগ-রাগ গলাতে বলল কর্বুর?

বাংলোর কাছে যখন পৌঁছেছে প্রায় ওরা, তখন বুকের ভেতর থেকে একটি খাম বার করে কাকি বলল, তিনি দিল্লি যাওয়ার আগে এই চিঠিটা দিয়ে গেছেন তোমাকে দিতে।

খাম জুড়ে সেলোটেপ লাগিয়ে তার উপরে আবার সই করেছেন যাতে কেউ খুলে না পড়তে পারে।

কে খুলে পড়ত?

আমিই পড়তে পারতাম। যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর। আমিই আলাপ করালাম, এখন আমিই পর হয়ে গেলাম!

চিঠিটা তুমিই রাখো। তুমি পড়ে, আমাকে দেবে মন করলে দিয়ো।

কী লিখেছে আগে দেখো। চিঠিটা তো বড় নয়। প্রেমপত্র হলে বড় হত। তবে আতর মাখা হাত বুলিয়েছে খামের উপরে। আঃ কী সুন্দর গন্ধ। এত পাতলা চিঠি। মনে হয় ভদ্রতার চিঠিই হবে। ওদের ভদ্রতার তো কোনও তুলনা নেই।

হ্যাঁ।

বিশেষ করে ব্যানার্জিসাহেবের। হি উজ আ ফারস্ট রেট জেন্টলম্যান। কলকাতা থেকেই লিখেছিলেন আমাকে।

আমি যাই! চান করব। কাকি।

কর্বুর বলল।

শোনো, খেতে আসতে দেরি কোরো না। কাল খুব সকালে উঠতে হবে আমার আর দিদির। অনেকই কাজ। পুজোর দিন।

তারপর বলল, দরজা বন্ধ করে, ধূপকাঠি জ্বালিয়ে তারপর চিঠিটা খুলে বিছানাতে শুয়ে শুয়ে পড়ো। ইস্স। ঐশিকাটা একটা থার্ডক্লাস মেয়ে। আরেকটু বড় চিঠি লিখতে পারল না!

কর্বুর বারান্দাতে উঠে তার ঘরের দিকে যেতে যেতে মনে মনে বলল, চিঠির ওজন আর চিঠির ভার তো এক কথা নয়। কী লিখেছে সে, দেখাই যাবে।

ঘরে গিয়ে চিঠিটাকে লেখার টেবিলের উপরে রেখে ঘরের দরজা বন্ধ করে সে বাথরুমে গেল।

অনেক অনেকদিন পরে ঈষদুষ্ণ জলে শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে চান করতে করতে, সাবান মাখতে মাখতে সে গুনগুনিয়ে গান গাইতে লাগল—"কী করে কলঙ্কে যদি সে আমারে ভালোবাসে।" তারপর আয়নার সামনে নিরাবরণ নিজেকে ভালো করে দেখল বহুদিন পর। নিজেকে দেখে ওর নিজেকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করল। মুখটা আয়নাতে অচেনা মনে হল। কে যেন উত্তেজনা মেশা লজ্জার আবির মাখিয়ে দিয়েছে তার মুখে। এ মুখকে সে আগে জানেনি। এ এক প্রেমিকের মুখ।

পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে, চুল আঁচড়ে, ব্রাইলক্রিম মেখে, ওডিকোলন গালে ঘাড়ে বুকে লাগিয়ে সত্যি সত্যিই বিছানাতে এসে শুয়ে, বুকের নীচে বালিশ দিয়ে চিঠিটা খুলল। হালকা নীল রঙা প্যাডে বাঁদিকের উপরে ইংরেজিতে ছাপা OISHIKA BANERJEE... ঠিকানা নেই, ফোন নাম্বার নেই। তবে ডানদিকে তারিখ আছে, আর স্থান আছে। নীলডি, জামশেদপুর, বিহার।

স্যার

আমি ভালো চিঠি লিখতে পারি না। বাংলাতে তো পারিই না, যদিও সেটা গর্বের কথা নয়।

এইটুকু বলার জন্যেই এই চিঠি যে, কবু, তোমাকে আমার খুব ভালো লেগেছে। সত্যি কথা বলতে কি, এত ভালো, এর আগে, আর কারোকেই লাগেনি।

পরিযায়ী পাখিরই মতো হয়তো একবছর পরে আবার উড়ে যাব তোমার কাছে। আমার বাঁ পায়ের মধ্যমাতে একটা রুপোর চুট্‌কি পরিয়ে দেওয়া তোমার উচিত ছিল। অনেক পাখির মধ্যে আমাকে যদি তখন চিনতে না পারো!

তোমার সঙ্গে আমার অনেকই কথা ছিল। দাদু চলে গিয়েই সব গুবলেট হয়ে গেল। আর বাপি আরেকজন ডিসটার্বিং এলিমেন্ট। অথচ বাপিই যে আমাদের সব।

আমার দিল্লির ঠিকানা, ফোন নাম্বার, ফ্যাক্স নাম্বার সব দিলাম। আমার চিঠিটা যে পেয়েছ সেটুকুই শুধু জানাবে FAX করে। তারপরে চিঠি লিখবে। চিঠির আজও কোনও বিকল্প নেই স্যার। এই ফ্যাক্স আর ই-মেইল-এর দিনেও।

যদি আসতে পারো, তো কবে আসবে, কোথায় উঠবে তা রেসিডেন্স-এ ফোন করে জানাবে। আমাকে রোজই সকাল আটটার মধ্যে করলে পাবে।

তোমার সঙ্গে এত কথা আছে যে, তা ফোনে বা একটা মাত্র চিঠিতে বলা যাবে না। অথচ কথাকটি খুবই জরুরি। বেশিদিন অপেক্ষা করা যাবে না।

আমার সঙ্গে তোমারও যদি কোনো কথা না থাকে, তাহলে এসো না।

আসছ কি আসছ না, জানিয়ো। দিওয়ালির সময়ে এলে সময় দিতে পারব। ছুটি থাকবে দু-দিন। এলে খুশি হব।

ভালো থেকো

TAKE CARE!

REGARDS—

ইতি—পরিযায়ী, ওই যাঃ।

শ্রীকর্বুর সেন
টাটিঝারিয়া,
চড়ুই-চড়াই,
বড়বিল, ওড়িশা

১১

রাতে খাবার টেবলে ওরা সকলে খেতে বসেছিল। গর্জনবাবু ওরফে গপা, কর্বুরের বাবা, খেয়ে নিয়েছেন আগেই। মা আর কাকু পাশাপাশি বসেছেন। কর্বুর আর কাকি, অন্যদিকে, পাশাপাশি।

ডালের বাটিটা নিজের দিকে টেনে কবু বলল, মা, আজ দিল্লি থেকে একটা জরুরি ফ্যাক্স এসেছে। আমাকে কালীপুজোর আগে একবার দিল্লি যেতে হবে। বুঝেছ।

ওমা! তাই?

হ্যাঁ।

কী কাজে যাবি? কুরুবক জিজ্ঞেস করল।

এক্সপোর্ট প্রোমোশান কাউন্সিল-এর এম. ডি. ডেকেছেন। আমাদের কোম্পানিই হয়তো অ্যাওয়ার্ডটা পেতে পারে এবারে। গুজব শুনছিলাম। ঠিক নেই অবশ্য।

বাঃ। তাই না কি? সবই ভালো খবর। এবারে লক্ষ্মীপুজো তো একেবারে জমে গেল দেখছি।

পদ্মা কর্বুরের মুখের দিকে চাইল একবার। তারপর কর্বুরকে সার্ভিংস্পুন দিয়ে ডাল ঢেলে দিতে দিতে বলল, খবর যখন শুভ, তখন দেরি না করাই ভালো। শুভস্য শীঘ্রম্।

বলেই, টেবলের নীচে বাঁ হাতটা নামিয়ে কর্বুরের উরুতে খুব জোর চিমটি কাটল একটা পদ্মা।

উঃ।

বলে উঠল কর্বুর।

মা বললেন, কী হল?

লংকা! লংকা!

বলল, কর্বুর।

সত্যি! এতবার বলি এদের, ডালে শুকনো লংকা না দিতে কথা কি শুনবে এরা! মিষ্টি কিছু খা একটা। সন্দেশ খাবি?

সন্দেশের চেয়েও মিষ্টি তোমার কাছে কিছুই কি নেই দিদি?

কী যে হেঁয়ালি হেঁয়ালি কথা বলিস তুই আজকাল পদ্মা, বুঝি না কিছুই।

বুঝবে দিদি, বুঝবে। আমি সবই বুঝিয়ে দেব।

কুরুবক চকিতে একবার পদ্মার মুখে তাকাল।

এক নিঃশব্দ হাসিতে তার মুখ ভরে উঠল।

কর্বুরের কাকি পদ্মা বলল, অ্যাওয়ার্ডটা কোম্পানি পেলে তো ভালোই। আমাদের কবুও একটা অ্যাওয়ার্ড পাবে, ইনডিভিজুয়াল পারফরমেন্সের জন্যে।

কবুর মা বললেন, তাই নাকি? ওঁকে বলব তো কথাটা কাল ভোরেই।

কবু কথা না বলে, মুখ নামিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে খেতে লাগল, এমনইভাবে, যেন জীবনে মুগের ডাল খায়নি কখনোই।

[এই উপন্যাসের সব চরিত্রই কাল্পনিক। উপন্যাসে উল্লিখিত কোনও চরিত্রের সঙ্গে বাস্তবের কোনও চরিত্রর কোনও মিল পরিলক্ষিত হলে তা সম্পূর্ণই দুর্ঘটনাপ্রসূত বলেই জানতে হবে।]

—লেখক

বাবলি

কল্যাণীয়েষু

বামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-কে

ইম্ফলে এ সময়ে আনারসটা খুব সস্তা হয়।

অভী দুপুরে বাড়িতে খেতে এসেছিল। খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। খাওয়ার পর বারান্দায় বসে আনারস খাচ্ছিল, এমন সময় ফোনটা বাজল। কুলো সিং ওর মণিপুরি বেয়ারা-কাম-কুক্-কাম লোকাল গার্জিয়ান ফোনটা ধরেই উত্তেজিত গলায় বলল, বড়া মেমসাবকা ফোন।

ফোনটা ধরতেই কমিশনারের স্ত্রী বললেন, অভী বলছ?

—হ্যা।

শোনো, তোমার দাদা বলছিলেন, তোমার নাকি কোহিমা ও ডিমাপুর যেতে হবে অফিসের কাজে পরশু দিন। পরশু দিন না গিয়ে তুমি আগামীকাল ভোরে বেরোতে পারবে? তোমার গাড়ির কন্ডিশান ভালো আছে তো?

—গাড়ি? আমার তো অফিসের জিপেই যাবার কথা।

--হ্যাঁ। তা তো জানি। কিন্তু একটা বিপদ হয়েছে। আমার দিদির মেয়ে বাবলি, তুমি তো দেখেছ আমাদের বাড়িতে; ওর পরের সোমবার দিল্লিতে জয়েনিং ডেট্, এদিকে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স-এর পাইলটরা নাকি সব স্ট্রাইক করেছেন. এইমাত্র রেডিয়োতে শুনলাম। তাই তোমার দাদার সঙ্গে কথা বলে তোমাকে ফোন করছি। তুমি কি কাল বেরিয়ে ওকে পরশু কি তার পরের দিন ডিমাপুরে পৌঁছে দিতে পারবে?

অভী বলল, ডিমাপুর থেকে ট্রেনে কলকাতা যেতে তো অনেকদিন লাগবে বউদি।

—ন, না, ও পথে, চা-বাগানে নেমে যাবে। ওখানে আমার দাদা ম্যানেজার। কোম্পানির প্লেনে ওকে কলকাতা পৌঁছে দেবেন উনি। সেখান থেকে প্লেনে দিল্লি চলে যাবে ও। পারবে?

অভী ফোন ধরে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

এ প্রশ্নের কোনো মানে হয় না। ও তাঁকে দাদাই বলুক, আর যাই বলুক, যিনি অফিসের বড় সাহেব, যিনি ওর কন্‌ফিডেন্‌শিয়াল রিপোর্ট লেখেন, তাঁর স্ত্রী যতই মিষ্টি করে জিজ্ঞেস করুন না কেন, এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর হচ্ছে, হ্যাঁ। সে ব্যক্তিগত অসুবিধা থাক আর না-ই থাক। অবশ্য ওর এখানে একার সংসারে অসুবিধার কিছুই নেই। অতএব গলায় উৎসাহ এনে ও বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, পারব না কেন? বেশি উৎসাহ যাতে প্রকাশ না পায় সে বিষয়েও সাবধান হল, কারণ তা না হলে উনি ভাবতে পারেন ওঁর বোনঝির ত্রাতা হতে ও অত্যন্ত উৎসুক।

—পারবে?

—হ্যাঁ।

—তাহলে ফোনটা একটু ধরো, তোমার দাদা কথা বলবেন।

ঘোষ সায়েব ভারী গলায় বললেন, চৌধুরী, তাহলে তুমি লাঞ্চের পর অফিসে এসে কাজকর্ম যা আছে গুছিয়ে নাও, আর ট্যুর প্রোগ্রামটা আজই আমায় পাঠিয়ে দাও। অ্যাপ্রুভ করে দেব। আর ইতিমধ্যে তোমার বউদিকে বলেছি, উনি চা-বাগানে ট্রাঙ্ক-কল বুক করে দিন। বাবলি অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসে জয়েন করছে, শুনেছ তো? ও বেচারির জয়েনিং দিল্লিতে। না গেলেই নয়।

অভী বলল, না, না, আমার কোনোই অসুবিধা নেই। তাছাড়া যেতে তো হতোই। আমি গাড়িটাকে চেক্-আপের জন্য গ্যারেজে দিয়েই অফিসে আসছি।

—আচ্ছা। বলে ঘোষসাহেব ফোন রেখে দিলেন।

২

অন্ধকার থাকতে কুলো সিং চা এনে অভীর ঘুম ভাঙাল। রাতে বেশ বৃষ্টি হয়েছিল। এ সময়টা প্রতি রাতেই বৃষ্টি হয় ইম্ফলে। চাদর জড়িয়ে শুতে হয় রাতে। বেশ একটা হিমেল আমেজ।

চান-টান করে তৈরি হয়ে নিল ও। ফাইলপত্র কুলো সব গাড়িতে তুলে দিল। কাল বিকেলেই তেল-টেল ভরে গাড়ি ঠিকঠাক করে রেখেছিল। টায়ারগুলোর অবস্থা ভালো নয়।

পথে পটাং করে ফেটে না যায়। দশ বছরের পুরোনো সেকেন্ডহ্যান্ড গাড়ি সস্তায় পেয়ে কিনেছিল। একজন অল্পবয়সি ব্যাচেলারের পক্ষে এ গাড়ি যথেষ্ট ভালো। অন্তত খারাপ মনে হয়নি কখনও।

কিন্তু গাড়ি যখন কেনে, তখন একবারও ভাবেনি যে একজন যুবতী মেয়েকে নিয়ে নাগা-হিল্সের মধ্য দিয়ে এতখানি ,পথ এ গাড়িতে যেতে হবে। ভেবেই বেশ নার্ভাস লাগতে লাগল ওর।

বড় সাহেবের গাড়ি নিয়েই যেতে পারত। কিন্তু তার গাড়ির এঞ্জিন নামানো হয়েছে কালই সকালে। জিপে করে ঝড়ে-জলে এতখানি রাস্তা এই পাহাড়ে, মেয়েদের পক্ষে যাওয়া সত্যিই অসুবিধে।

বড় সাহেবের বাড়ির গেটে ঢুকে পড়ল অভী। তখনও সূর্য ওঠেনি। তবে চারপাশ আলো হয়েছে। ঝিরঝির করে হাওয়া দিচ্ছে দেবদারু গাছের পাতায় পাতায়। ওরা সকলে বারান্দাতেই বসেছিলেন। চা খাচ্ছিলেন।

বাবলিকে (যার ভালো নাম দময়ন্তী) অভী একদিন মাত্র দেখেছিল। বড় সাহেবের ছোট ছেলের জন্মদিনে। অনেকের মধ্যে দেখা। হাত জোড় করে নমস্কার করেছিল।

চেহারা এমন নয় যে চোখে পড়ে। বেশ একটু মোটার দিকে, মুখচোখও যে ভীষণ সুন্দর তা নয়। তবে সব মিলিয়ে বেশ মিষ্টি। অন্যান্য অবাঙালি অতিথিদের সঙ্গে অনর্গল এবং সপ্রতিভ ইংরেজিতে কথা বললেও অভীকে বাংলায় বলেছিল, আপনার কথা অনেক শুনেছি। মাসিমা-মেসোমশায়ের কাছে। এই ভিড়ে আলাপ হয় না। পরে একদিন আসবেন। গল্প করা যাবে, কেমন?

বড় সাহেবের এমন সর্বগুণসম্পন্না মোটা এবং মোটামুটি মিষ্টি শালির মেয়ের সঙ্গে বেশি গল্প করে চাকরির সর্বনাশ করে এমন মূর্খ রোমান্টিক অভী কখনোই ছিল না। তাই ওর চেয়ে বেশি আলাপ হয়নি সেদিন।

পোর্টিকোতে গাড়ি ঢুকতেই ওরা সকলে উঠে দাঁড়ালেন। গাড়ির বুট খুলে দিল অভী। স্যুটকেসটা ওঠানো হল। সঙ্গে বিছানাটিছানা নেই। আসবার সময় প্লেনে এসেছিলেন। তাই বিছানা আনেননি।

ঘোষসাহেব বললেন, কোহিমার লাইন খারাপ। ফোনে পাইনি। সকালেও চেষ্টা করব। আশা করি এম.এল.এ'স হস্টেলে জায়গা পেয়ে যাবে তোমরা রাত কাটাবার মতো। তাই আর বিছানাপত্রর লটবহর দিলাম না।

মিসেস্ ঘোষ বললেন, অভী দেখো বাবা, সাবধানে নিয়ে যেয়ো। মা-মরা মেয়ে।

তারপর বাবলির দিকে ফিরে বলেন, দেখিস তুই আবার পথে ঝগড়া করিস না; যা ঝগড়াটে মেয়ে তুই।

যাকে একথা বলা হল, সে জবাব দিল না। ওদের প্রণাম করে বাবলি নিজেই সামনের দরজা খুলে বসল।

অভী দরজা বন্ধ করে ঘুরে এসে স্টিয়ারিং-এ বসল। তারপর বাড়ির গেট ছাড়িয়ে ওরা খোলা রাস্তায় এসে পড়ল।

বর্ষার ভোরের মণিপুরের যা নয়ন-ভোলানো দৃশ্য এমন একটা বড় দেখা যায় না। হুহু করে হাওয়া লাগছে চোখে-মুখে। অভী আড়চোখে দেখতে পাচ্ছে ওর সঙ্গিনীর চুল এলোমেলো হচ্ছে। গাল ও কপালময় অনেক ওড়াউড়ি করছে। কিন্তু সে তন্ময় হয়ে পথের দিকে চেয়ে আছে। ওর চোখ দেখে মনে হচ্ছিল পথকে ও নিশ্চয়ই ভালোবাসে।

দেখতে দেখতে ইম্ফল শহর পিছনে ফেলে কান্‌কোপ্‌কির দিকে এগিয়ে চলল।

এ পথে অভীকে কোহিমা অবধি প্রায়ই যাওয়া-আসা করতে হয়। আগে বৈরী নাগারা প্রায়ই অতর্কিতে আক্রমণ করত।

অবশ্য ও আসার পর কোনোদিনও দেখেনি, তখন নাকি বাস ও গাড়ির কনভয় যেত একসঙ্গে সামনে ও পেছনে অনেক আর্মি ট্রাকের এসকর্ট নিয়ে। এখন সেসবও উঠে গেছে।

তবে নানা জায়গায় ভীষণরকম চেকিং হয়। বিশেষ করে নাগাল্যান্ডে ঢোকার মুখে খুজ্‌মাতে। এবং বেরোবার সময়ও।

এ পথের দু-দিকে যা দৃশ্য তা কাশ্মীরের উপত্যকার দৃশ্যকেও ম্লান করে দেয়। আর বর্ষাকালের তো তুলনা নেই। যেদিকে চোখ যায় সবুজ, শুধু সবুজ।

মালভূমি থেকে ধীরে ধীরে উঁচু হয়ে ওঠা প্রাচীন অথচ প্রসন্ন সব পাহাড়।

ইম্ফল থেকে বেশ কয়েক মাইল চলে এসেছে ওরা।

ইতিমধ্যে অভীর সঙ্গিনী কেবল একটিমাত্র কথা বলেছেন, 'আমার জন্যে আপনার মিছিমিছি এত কষ্ট করতে হল।'

জবাবে অভী বলেছিল, কষ্ট যে হলই, এখনও সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হইনি।

কষ্ট হলে নিশ্চয়ই জানতে পাবেন।

উত্তর শুনে অবাক মুখ করে অভীর দিকে চেয়ে, মুখ নামিয়ে সঙ্গিনী চুপচাপ হয়ে গেছিলেন। তারপর আর কোনো কথা হয়নি।

পাহাড়ি পথে একটা বাঁক ঘুরতেই ওপাশ থেকে একটা জিপ এমনভাবে এল যে একটু হলে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেত।

অভী কোনোক্রমে সামলে নিয়ে জানালা দিয়ে মুখ বার করে অপস্রিয়মাণ জিপের ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে বলল, শালা।

বলেই, লজ্জা পেয়ে বাবলির দিকে চেয়ে বলল, সরি, ভেরি সরি। একা একা গাড়ি চালাই তো। সঙ্গে ভদ্রমহিলা কেউ থাকেন না। অভ্যেস খারাপ হয়ে গেছে।

বাবলি চোখ তুলে একবার অভীর দিকে তাকাল। তারপর একটা বড় নিশ্বাস ফেলল, ও, ও, খুব ভয় পেয়ে গেছিল। তারপর বলল, আমার খুব চা তেষ্টা পেয়েছে।

অভী হাসল। বলল, আমারও; চলুন, সামনেই কান্‌কোপ্‌কি। সেখানে গরম চা ও সিঙাড়া খাব।

বাবলির মুখে এবার কথা ফুটল। বলল, এখনও আমরা মণিপুরে আছি না নাগাল্যান্ডে পৌঁছে গেছি?

অভী বলল, নাগাল্যান্ড এখন কোথায়! পৌঁছতে দেরি আছে। কোহিমা পৌঁছতে পৌঁছতে তো বিকেল হয়ে যাবে।

—পথে কী কী জায়গা পড়বে?

—এইরে। আমি কি আর মুখস্থ করে রেখেছি। দাঁড়ান মনে করে দেখি—।

তারপরই বলল, মোটামুটি মনে আছে। এই ধরুন কান্‌কোপ্‌কির পর কারোং—তারপর মারাম। মারামের পর তাদূবী। তাদূবীর পর মাও। মাওতে এসে আমরা নাগাল্যান্ডে ঢুকব। মাও-এর পর খুজ্‌মা। খুজ্‌মার পর জাখ্‌মা। জাখ্‌মাতে এ অঞ্চলের আর্মি হেড্‌ কোয়ার্টার্স। জাখ্‌মার পর কোহিমা।

বাবলি বলল, নাগাল্যান্ডের সব জায়গার নামই কি মা দিয়ে? —কেন?

একহাতে স্টিয়ারিং ধরে অন্য হাত নাড়িয়ে অভী বলল, কেন তা জানি না। হয়তো ওরা খুব মা ভক্ত বলে।

—বাবলি অভীর বলার ধরন দেখে হেসে ফেলল।

দেখতে দেখতে কান্‌কোপ্‌কিতে এসে গেল ওরা। চায়ের দোকানের সামনে গাড়ি থামিয়ে অভী গিয়ে বাবলির দরজা খুলল। বাবলি নামল।

দোকানটা অনেক উপরে পাহাড়ের গায়ে। তারপর অভীর সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে বাবলি চায়ের দোকানটায় পৌঁছাল।

এখানে বেশ ঠান্ডা। ইম্ফলেও বেশ ঠান্ডাই এখন।

তবে এদিকে ঠান্ডাটা বেশি। একটা হাওয়া দিয়েছে কনকনে। দোকানের বেঞ্চে বসতে বসতে অভী বলল, কোহিমাতে বেশ ঠান্ডা হবে।

মনে হচ্ছে, বলল বাবলি, বলে চাদরটা ভালো করে টেনেটুনে বসল।

সিঙাড়া ও চা খেতে খেতে বাবলি হঠাৎ বলল, আমার সিঙাড়া খাওয়া উচিত নয়। না?

অভী অবাক হয়ে বলল, কেন?

না, আমাকে সকলে বলে স্লিমিং করা উচিত।

অভী বলল। না না, আপনি তো মোটা নন।

বাবলি চায়ের প্লেটটা নামাল। নামিয়ে বলল, নই, না? আমার জাস্ট স্বাস্থ্য ভালো তাই না? তারপর চা দিয়ে সিঙাড়া গিলে ফেলে বলল, বিনা কারণে মিথ্যা কথা বলেন কেন?

অভী রীতিমতো অপ্রতিভ হয়ে পড়ল। এমন যুবতী সে জীবনে দেখেনি যে নিজেকে মোটা বলে প্রচার করে আনন্দ পায়। জবাবে কিছু বলল না ও।

এমন সময় একটা বাস এসে কান্‌কোপ্‌কির পুলিশ স্টেশনের সামনে দাঁড়াল।

বাস থেকে পায়জামা-পাঞ্জাবি ও শাল জড়ানো এক বাঙালি ভদ্রলোক নামলেন। বয়স বেশি না।

ভদ্রলোককে দেখেই অভী উঠে দাঁড়াল।

চেঁচিয়ে বলল, আরে রাজীববাবু যে, কোথায় চললেন?

ভদ্রলোক দূর থেকেই চেঁচিয়ে বললেন, কোহিমা। আপনি?

—আমিও তাই। অল রোডস লিড টু রোম।

বাবলি জিজ্ঞেস করল, ভদ্রলোক কে বলুন তো? কোথায় যেন দেখেছি দেখেছি মনে হচ্ছে।

অভী বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে বলল, একে নিশ্চয়ই দেখেছেন। কলকাতাতেই থাকেন। ইনি ইয়াং জেনারেশানের একজন বেশ নামকরা সাহিত্যিক। এর নাম রাজীবলোচন। এর বিখ্যাত উপন্যাস "আশ্চর্য পতন"। পড়েননি?

বাবলি উত্তরে কিছু বলল না। কিছুক্ষণ পর নিচের দিকে চেয়ে খুব আতঙ্কিত গলায় বলল, ওমা, ঐ দেখুন আপনার রাজীবলোচন ফুল্ললোচনে এদিকেই আসছেন। আপনি নিশ্চয়ই ওঁকে বলবেন, চলুন না, একসঙ্গে গাড়িতেই যাই। বাসে কেন কষ্ট করে যাবেন? তাই না?

অভী হাসল, বলল, হয়তো বলব। আমি নিজে না বললেও উনিই হয়তো বলবেন, ঐজন্যই বোধহয় উঠে আসছেন।

বাবলি ফিস্‌ফিস্‌ করে আদেশের সুরে বলল, 'না' করে দেবেন।

—কেন? অবাক হয়ে অভী শুধাল। একজন তরুণ সাহিত্যিকের সঙ্গে এতখানি পথ যাবেন। আপনার ভালো লাগবে না?

—না, আমি সাহিত্যিকদের মোটেই পছন্দ করি না।

—কেন? অভী অবাক হয়ে শুধালো।

—পরে বলব। বাবলি বলল।

ইতিমধ্যে রাজীবলোচন সিঁড়ি বেয়ে ওদের কাছে এসে পৌঁছলেন। তারপর সোজা অভীর কাছে এসে বললেন—

এখানে কাঁচালংকা পাওয়া যাবে?

কাঁচালংকা?

হ্যাঁ। নিচের দোকানে মিষ্টি খেয়ে মুখ একেবারে মরে গেছে।

দোকানি একটা কালো-কালো পুরুষ্ট তেল কুচকুচে কাঁচালংকা এনে দিল। রাজীবলোচন কাঁচালংকাটা নিয়ে, লোকে যেমন করে গন্ধরাজফুলের বোঁটা ধরে ধরে গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে পথ হাঁটেন, তেমন করে আঙুলে ধরে চিবোতে চিবোতে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলেন।

সিঁড়ির আধাআধি নামতে না নামতেই হঠাৎ একটা আলোড়নের শব্দ শোনা গেল। এবং হাতে কাঁচালংকা ধরা অবস্থাতেই দোকানদারের খোঁটায়-বাঁধা সাদা পাঁঠার গলার দড়িতে হোঁচট খেয়ে অবোধ পাঁঠাটার সঙ্গে, গায়ের শালের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে রাজীবলোচন ও পাঁঠা (বাবলি তার নাম জানে না) দুজনেই সিঁড়িতে পড়ে হুড়োহুড়ি করতে লাগলেন।

অভী দৌড়ে গিয়ে রাজীবলোচনকে তুলে ধরে বাসের কাছে পৌঁছে দিয়ে এল।

তারপর ফিরে এসে বাবলিকে বলল, এবার নেমে আসুন, চলুন যাওয়া যাক।

বাবলি আস্তে আস্তে নেমে এল, পাঁঠাটার পাশ দিয়ে আসার সময় বাঁ হাত দিয়ে পাঁঠাটার গায়ে একটু আদর করে নিল।

অভী স্টার্ট করল গাড়ি।

গাড়িটা দাঁড়িয়ে থাকা বাসটাকে অতিক্রম করে যেতেই বাবলি বলল, "আশ্চর্যপতন"।

অভী প্রথমে বুঝতে পারল না, পরক্ষণেই হোহো করে হেসে উঠল, অনেকক্ষণ ধরে হাসল, বলল, না, আপনি তো সাংঘাতিক মেয়ে।

বাবলি উত্তর না দিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইল।

হাসি থামলে অভী বলল, আপনি সাহিত্যিকদের পছন্দ করেন না কেন?

—এমনিই। ব্যক্তিগত কারণে।

—ওঃ! মানে আমাকে নিশ্চয়ই বলা যায় না।

এবার বাবলি মুখ ঘুরিয়ে বলল, নাঃ, তেমন নয়; তেমন ব্যক্তিগত নয়, মানে আমার, আমার ওদের সকলের ওপর দারুণ অভিমান আছে। রাগও বলতে পারেন।

—কেন? কেন?

—ওরা জার্নালিজম করেন, যা দেখেন তারই ছবি আঁকেন। ওরা নতুন কিছু সৃষ্টি করেন না। আজকালকার এই আপনাদের তরুণ লেখকরা, ওদের কারোরই কোনো গভীর বিশ্বাস নেই—ওদের কেবল এক-একটি ক্ষণস্থায়ী ভঙ্গি আছে, জুলপির পরিবর্তনশীল দৈর্ঘ্যের মতো, তাই এদের সম্পর্কে কোনো ইন্টারেস্ট নেই।

অভী বলল, বাবা, আপনি যেমন বাংলা বলছেন, ভয় হচ্ছে আপনিও লেখেন-টেখেন।

বাবলি বলল, লিখি না, তবে হয়তো লিখব কোনোদিন।

—কী নিয়ে লিখবেন?

—ঢোলা প্যান্টপরা ঢিলে-ঢালা উপর-চালাকিতে বিশ্বাস করে না এমন ছেলেদের নিয়ে। যাদের নিয়ে কেউ লেখে না। ওরকম রিয়্যাল স্মার্ট ছেলেদের নিয়ে লিখব।

বাবলি যখন এসব কথা বলছিল, তখন অভী আড়চোখে অ্যাক্সিলেটারের ওপর চাপিয়ে রাখা পায়ের দিকে চেয়ে নিচের প্যান্টের ঘেরটা দেখে নিল। মাঝামাঝি। আশ্বস্ত হল।

অভী গাড়িটাকে আস্তে করল। একটা সিগারেট ধরাল।

ওরা কারোং পেরিয়ে গেল। পথের পাশে হাট। নাগারা পাহাড় থেকে হরিণ আর শুয়োর মেরে এনে হাটে বসেছে, গাছতলায় পাতা পেতে হরিণ আর শুয়োরের মাংস নিয়ে।

লম্বা লম্বা বাঁশের পাইপ খাচ্ছে। বলিরেখাভরা তামাটে কপালে হাত বোলাচ্ছে।

নাগা ছেলেমেয়েদের পায়ের দিকে চেয়ে থাকতে হয়, কী সুন্দর তামাটে শক্ত সুঠাম পা ওদের। পায়ের যতটুকু দেখা যায়, শুধু বারবার দেখতে ইচ্ছে করে।

—আপনি কিন্তু আসল কথাটা এড়িয়ে গেলেন। অভী বলল। ব্যক্তিগত কারণটা বললেন না। কেন সাহিত্যিকদের অপছন্দ করেন?

—বলতে পারি, যদি আপনি দশজনকে বলে না বেড়ান।

—আমার দশজন নেইই-তো বলব কাকে?

—অপছন্দ করি, এই কারণে যে কোনো সাহিত্যিকই আমার মতো মোটাসোটা মেয়েদের নায়িকা করে কখনো কোনো গল্প লেখেননি। ওঁদের ভাবটা এমন, যে যত বুদ্ধি আর মেধা সব যেন ফিগার-সর্বস্ব সুন্দরী মেয়েদেরই একচেটে। এতেই মনে হয়, যাদের নিয়ে এঁরা লেখেন, বা যা নিয়ে লেখেন তা তাঁরা নিজেরা দেখেননি বা জানেন না।

এবার অভী হাসল। বলল, আপনার একটা অবসেশান্ আছে আপনার মোটাত্ব সম্বন্ধে। আসলে কিন্তু আপনি তেমন মোটা নন। আপনি দেখতে অসুন্দরীও নন।

বাবলি মুখ ঘুরিয়ে বলল, আপনি কি আমার কাছে কিছু চান? এত তোষামোদ করছেন কেন? এই বলে বাবলি অনেকক্ষণ অভীর দিকে চেয়ে থাকল।

অভীও মুখ ঘুরিয়ে বাবলির দিকে তাকাল।

অভীর হঠাৎ মনে হল, হঠাৎ-ই মনে হল যে, এই মোটা-সোটা বেশি কথা বলা মেয়েটির মতো বুদ্ধিদীপ্ত ও মিষ্টি মুখ ও দেখেনি আর আগে। অথবা এমন মনোযোগ সহকারেও এর আগে আর কারও মুখে তাকায়নি।

বাবলিও হয়তো উত্তরের প্রত্যাশা করল না।

অভী পথের দিকে চেয়ে গাড়ি চালাতে লাগল। বাবলি জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইল।

অনেকক্ষণ, বহুক্ষণ, দুজনের কেউই কোনো কথা বলল না। একেবারে চুপ করে রইল। ক্লান্তিতে নয়, বিরক্তিতে নয়, সেই হিম হিম পার্বতী আবহাওয়ার প্রসন্ন পরজ ভোরে নিছক এক অর্থহীন ভালোলাগায় দুজনে নিঃশব্দে বুঁদ হয়ে রইল।

দেখতে দেখতে ওরা মাও-এ পৌঁছল। এখানে মণিপুরের সীমানা শেষ। নাগাল্যান্ড আরম্ভ। ঠান্ডা আস্তে আস্তে বাড়ছে। রোদ উঠছে। কিন্তু রোদে দাঁড়ালে ভালো লাগে।

খুজ্‌মা পৌঁছতেই গম্ভীর দর্শন নাগা গার্ডরা তন্ন তন্ন করে গাড়ি তল্লাশি করল। ড্যাশ বোর্ডে রাখা বাবলির ক্যামেরাটা আর একটু হলে ওরা বাজেয়াপ্ত করেই ফেলেছিল। অনেক করে তাদের বুঝিয়ে সেটা ফেরত পাওয়া গেল। নাগা গার্ডগুলোর মুখের দিকে চেয়ে মনে হয় জন্ম থেকে এরা

কখনো হাসেনি। বাবলি ওদের তল্লাশির পদ্ধতি দেখে বেশ ঘাবড়ে গেল। ওর মুখ-চোখে ভয়ের ছায়া পড়ল।

খুজমা থেকে বেরিয়ে কোহিমার আগে অবধি পথের বাঁদিকে ইন্ডিয়ান আর্মির ক্যাম্প। প্রচুর জোয়ান আছে এ অঞ্চলে। পথে একজন অফিসারের জিপ গেলে আগে পিছনে দুটি করে আর্মি ট্রাকের এসকর্ট। কখন যে কোথা থেকে কে 'কড়াক্ পিঙ' করে দেবে কে জানে?

ওরা কেউই আশা করেনি যে এত সকাল সকাল ওরা কোহিমা পৌঁছে যাবে। কোহিমার কাছাকাছি আসতেই বাবলি উঃ আঃ করে নানারকম অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে লাগল। এখনও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের চিহ্নস্বরূপ জাপানি ট্যাঙ্ক পড়ে আছে পথের পাশে মূকচিহ্ন গায়ে নিয়ে।

অভী বলল, চলুন, এমএলএস হস্টেলে মুখ হাত ধুয়ে নিয়ে আমরা সিমেট্রিতে আসব। কোহিমার কবরখানা দেখবার মতো, কত অল্পবয়সি ছেলে যে এখানে চিরদিনের মতো শুয়ে আছে তা বলার নয়। আর প্রত্যেকের কবরের উপরে পাথরে কী যেসব লাইন লেখা তা না দেখলে বিশ্বাস হবে না। পড়তে পড়তে চোখ ভিজে ওঠে।

বাবলি বলল, আপনি লোকটা বড় পেসিমিস্ট।

কবরখানা কোনো সুস্থ লোকে দেখে নাকি? যতই সুন্দর হোক না কেন তা, শেষের দিনে তো কবরখানা সকলেরই দেখতে হবে। আমি ওর মধ্যে নেই। তার চেয়ে হাত-মুখ ধুয়ে চলুন কোথাও টিপিকাল নাগা খানা খাই। আমার খিদে পেয়ে গেছে। আমার ভীষণ তাড়াতাড়ি খিদে পায়। সেই কখন চারটে সিঙাড়া খেয়েছি। আপনার পাল্লায় পড়ে দেখছি আমার সযত্নে লালিত মোটাসোটা শরীরটা খারাপ হয়ে যাবে।

নাগাল্যান্ড অ্যাসেমব্লীর উলটোদিকে এম এল এ'স হস্টেলে গাড়ি রেখে ওরা হাত-মুখ ধুয়ে নিল, অভী বাইরে এসে রোদে দাঁড়িয়ে আরাম করে একটা সিগারেট খেলো। ততক্ষণে বাবলি শাড়ি পালটে নিল।

বাবলি যখন নতুন শাড়িতে বাইরে বেরোল (বেগুনি আর গোলাপি জংলা কাজের একটা টেরিকট শাড়ি পরেছিল) তখন রোদের মধ্যে হঠাৎ ওকে নতুন কোনো মেয়ে বলে মনে হল অভীর।

যেন ওর সঙ্গে এতখানি পথ ও গাডিতে আসেনি। একটা বেগুনি খদ্দরের স্টোল জড়িয়েছিল বাবলি—মধ্যে কাচের চুমকি বসানো। বাইরে এসেই বাগানের একটি বেগুনি ফুল ছিঁড়ে নিয়ে খোঁপায় গুঁজলো ও আর সঙ্গে সঙ্গে হাঁ হাঁ করে মালি দৌড়ে এল। বলল, কা কিয়া?

বাবলি ষণ্ডা-গুণ্ডা নাগা মালির দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে শর্মিলা ঠাকুরের মতো হাসল। হাসলে, বাবলির গালে টোল পড়ে।

তারপরে বলল, যো কিয়া; সো কিয়া।

মালি বলল আবার, হায় হায়, কা কিয়া।

তারপর বাবলি ওর খোঁপায় হাত ছুঁইয়ে মালিকে দেখিয়ে বাংলায় বলল, তোমার ফুলের এর চেয়ে বেশি ইজ্জত আর কী হতে পারত? দ্যাখো না, কেমন মানিয়েছে।

মালিক মেমসাহেবের কাণ্ড দেখে হতবাক, এমন মেয়েছেলে সে এর আগে দেখেনি বলেই তার কপাল কুঁচকানো দেখে মনে হল। অভীও দেখেনি।

বাবলি অভীর কাছে এসে বলল, চলুন এবার; খিদেয় পেট চুঁই চুঁই করছে।

অভী বলল, আপনি একটি পাগলি। রিয়েল পাগলি।

বাবলি ওর দিকে একবার তাকাল, আঙুল দিয়ে ফুলটা ঠিক আছে কিনা দেখে নিল, তারপর অভীর পাশে হেঁটে চলল।

বাবলি বলল, কোনো ভালো জায়গায় যেতে চাই না। বুঝেছেন স্যার? আমি একেবারে আসল নাগা খাবার খেতে চাই।

—বাজারের মধ্যে যাবেন? ওসব জায়গায় সাধারণত ভদ্রলোকের মেয়েরা যেতে ভয় পান, যাওয়া উচিতও নয়।

—বাবলি বলল, আমি ভদ্রলোকের মেয়ে আপনাকে কে বলল? তাছাড়া আমি যথেষ্ট বড় হয়েছি। কী করা উচিত না উচিত আমি বুঝি। মেসোমশায়ের এক্তিয়ার ছেড়ে এসে আর এক পিসেমশায়ের খপ্পরে পড়লাম দেখছি।

যে জায়গাটায় ওরা পৌঁছলো, সেটা সত্যিই নোংরা, দোকানটাও নোংরা। অদ্ভুত পোশাকে অদ্ভুত দর্শন সব নাগারা বড় বড় দা নিয়ে ঘোরাফেরা করছে।

অভী বলল, ব্যাঙ খাবেন? না সাপ খাবেন?

কথাটা অভী ভয় পাওয়াবার জন্যই বলল।

বাবলি উত্তরে খুব উৎসাহের সঙ্গে বলল, ব্যাঙ আগে খেয়েছি; সাপ খাব, কেমন?

অভী একেবারে নিভে গেল।

অভীর কপাল ভালো, সাপ অথবা ব্যাঙ কিছুই পাওয়া গেল না।

শুয়োরের ডালনা দিয়ে ওরা ভাত খেল, প্রচণ্ড ঝাল। খেতে খেতে দুজনের চোখ দিয়েই জল বেরোতে লাগল—দুজনেই জিভ দিয়ে ফুঃ ফুঃ আওয়াজ করতে লাগল।

খাওয়া-দাওয়ার পর বাবলি বলল, চলুন আমরা বেরিয়ে পড়ি ডিমাপুরের দিকে। এই পচা হস্টেলে থাকব না। কেমন স্যাঁতসেঁতে ঘরগুলো—সব সময় মেঝের কার্পেট থেকে তেলাপোকার গন্ধ বেরোচ্ছে। পৌঁছানো যাবে না ডিমাপুরে আজ?

অভী বলল, এক্ষুনি বেরিয়ে পড়তে পারলে পৌঁছানো যাবে। তবে খুব রিস্‌কি হবে।

যদি কোনো কারণে গাড়ি খারাপ হয়ে যায় তো সারা রাত পথেই কাটাতে হবে। পথের একপাশে ডিফু নদী, অন্যদিকে খাড়া পাহাড়, সারা রাস্তাই গভীর জঙ্গল।

—দারুণ হবে, বাবলি বলল—ভাবতেই আমার ভালো লাগছে।

অভী অবাক হয়ে বলল, আপনি আশ্চর্য লোক তো...।

—আশ্চর্য কেন? অ্যাডভেঞ্চার আপনার ভালো লাগে না?

—তার মানে? আপনি কি চান যে গাড়িটা খারাপ হয়ে যাক রাস্তায়?

বাবলি অধৈর্য গলায় বলল, আহা, কী মুশকিল। আমি কেন বলব? আমার ইচ্ছায় কি আর কিছু হবে? গাড়ির যা ইচ্ছা তাই-ই হবে।

—আমার কিন্তু ইচ্ছা নয় যে, এমন ঝুঁকি নিয়ে এ রাস্তায় এইরকম গাড়ি নিয়ে আমরা যাই।

বাবলি বলল, সকাল থেকেই আমার সন্দেহ হচ্ছে আপনি পুরুষ মানুষ কিনা।

অভীর গলায় রাগ ঝরে পড়ল। বলল, প্রমাণ দিতে পারতাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় সবাইকে সব প্রমাণ দেওয়া যায় না।

এবার বাবলি লজ্জা পেয়ে গেল, বলল, আপনি বেশ অসভ্য। মেয়েদের সঙ্গে এভাবে কথা বলে?

অভী বলল, ছেলেদের সঙ্গেও কি কোনো ভদ্রমহিলা এভাবে কথা বলে?

বাবলি না দমে বলল, আমি তো বলেছি, আমি ভদ্রমহিলা নই। আমি একজন মেয়ে, জাস্ট একজন মেয়ে।

—তা হলে কী ঠিক হল? যাওয়া হবে?

—চলুন। ডিমাপুরে থাকার কী ব্যবস্থা হবে? দুটো ঘর পাওয়া যাবে তো? না আপনার সঙ্গে একঘরে থাকতে হবে?

বাবলি বলল।

অভী ওর প্রশ্নের দ্বিতীয়াংশকে উপেক্ষা করে বলল, ওখানে সুন্দর বাংলো আছে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের। একজন বাবুর্চি আছে, লম্বা সাদা দাড়িওয়ালা বদরপুরী মুসলমান। দারুণ রাঁধে। নাম রসিদ আলি। ঘরগুলোও ভালো। আশাকরি অসুবিধা হবে না। একটা ঘর পাওয়া গেলে আপনি ঘরে শোবেন—আমি বারান্দায় শোব। ওখানে তো আর এই পাহাড়ের মতো ঠান্ডা নয়।

বাবলি বলল, চলুন তাহলে তাড়াতাড়ি। আর দেরি করা ঠিক হবে না। আমার ভাবতেই ভালো লাগছে। রাতে রসিদ আলির হাতের রান্না খাব। এখানে সাপই খাওয়াতে পারলেন না আপনি। কোহিমাতে এলাম, সাপ খেলাম না; আপনি কোনো কর্মের নয়।

৩

ওরা যখন কোহিমা থেকে ডিমাপুরের দিকে বেরোল তখন প্রায় দুটো বাজে।

কোহিমা থেকে গড়ানো রাস্তা নেমে গেছে এঁকেবেঁকে। মাইল কয়েক আসার পরই রাস্তাটা ডিফু নদীর পাশে পাশে চলতে লাগল। এসব অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়ায় জঙ্গল এমন ঘন হয় যে তা না দেখলে ঠিক বোঝা যায় না। নদীটা পাহাড়ের উপর দিয়েই বয়ে চলেছে বলে চওড়া নয় মোটেই। সরু, গভীর এবং প্রচণ্ড বেগে ধাবমানা। দুপাশে নিশ্ছিদ্র জঙ্গল ঝুঁকে রয়েছে।

যখন ওরা কোহিমা ছাড়ে তখন বেশ রোদ ছিল। একটা পাহাড় নামতেই সূর্যটা পাহাড়ের আড়ালে চলে গেল।

এখন শুধু গাড়ির ইঞ্জিনের লো-গিয়ারের শব্দ এবং নদীর একটানা ঝর্‌ঝর্‌। বাবলি নীরবতা ভঙ্গ করে বলল, কী মশাই? কথা বলছেন না কেন?

—ভাবছি। সব সময় কি কথা বলতে ভালো লাগে।

—কী ভাবছেন?

—ভাবনা এখনও দানা বাঁধেনি। মানে, বলার মতো ভাবনা নয়।

—বাবাঃ হাসালেন। আপনার মতো দানাদার ভাবনার কথা তো কখনো শুনিনি।

—আসলে আমি খুব টেন্স হয়ে আছি—যতক্ষণ না ডিমাপুর পৌঁছই। পথে কোনোরকমে গাড়ি খারাপ হলে যে কী হবে এই ভাবনাটা ভীষণ নার্ভাস করে রেখেছে আমাকে।

—বাবলি তাচ্ছিল্যের গলায় বলল, আপনি একটুতেই নার্ভাস। মশলা খাবেন?

—নাঃ। অভী উদাসীন গলায় বলল।

—না খেলেন। আমি একাই খাচ্ছি। বলে বাবলি ওর হ্যান্ড ব্যাগ খুলে মশলা বের করে একমুঠো মশলা খেল।

এমন সময় হঠাৎ অভীর গাড়ি একটা বাঁকের মুখে অদ্ভুত কোঁ-কোঁ-কোঁ একটা আওয়াজ করে উঠল।

মোটা লোককে ঘুমের মধ্যে বোবায় ধরলে তারা যেমন আওয়াজ করেন। তেমন আওয়াজ।

বাবলি খিলখিল করে হেসে উঠল। বলল, ও কি? ও কি?—কীসের আওয়াজ?

বলতে বলতেই গাড়িটা বন্ধ হয়ে গেল।

অভীর মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বলল, দেখলেন তো, বললাম আপনাকে—আপনি শুনলেন না, জেদ করলেন।

বাবলি উত্তর দিল না। যেন কিছুই হয়নি এমনভাবে দরজা খুলে বাইরে নেমে দু'হাত আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, দা-রুণ। সত্যি জায়গাটা দারুণ। আপনার বাহাদুরি আছে। গাড়িটা যদি বা খারাপ করলেন, তাও এমন একটা দারুণ জায়গায়।

অভী উত্তর না দিয়ে বনেট খুলে বনেটের নিচে মুখ ঢুকিয়ে এটা ওটা নিয়ে টানাটানি করতে লাগল।

বাবলি নদীর পাশে একটা পাথরের উপর বসে বসে নদীর মধ্যে ছোট ছোট পাথর ছুঁড়তে লাগল। তারপর হঠাৎ বলে উঠল, আচ্ছা এই নদীতে মাছ আছে?

অভী উত্তর না দিয়ে বলল, এ.সি. পাম্পের গণ্ডগোল হয়েছে। তেল আসছে না বোধহয়। বলে বনেটের মধ্যে থেকে মাথা বের করে বাবলির দিকে তাকাল।

বাবলি একটা ছোট পাথর লোফালুফি করতে করতে বলল, বোধহয় তেল আসছে না। কিন্তু জোঁক নিশ্চয়ই আসছে।

—মানে? বলে অভী ভুরু তুলল।

বাবলি নিরুদ্বেগ শান্ত গলায় বলল, আপনার জুতো বেয়ে দুটো আমার মতো মোটা জোঁক আপনার প্যান্টের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

—কোথায়? কোথায়? বলে অভী লাফাতে লাগল।

তারপর হাঁটু অবধি প্যান্ট গুটিয়ে জোঁক দুটোকে বের করে মাড়িয়ে দিল।

বাবলি বলল, গাড়ির কিছু বোঝেন? গাড়ি কেন খারাপ হয়?

অভী বলল, কিছু বুঝি না বলেই তো বিকেলে কোহিমা থেকে নামতে চাই না।

বাবলি বলল, গাড়ি চালান, গাড়ির মন বোঝেন না।

—আপনি কিছুর বা কারুরই মন বোঝেন না।

গাড়ির পেছনে গিয়ে গুনে গুনে বারোটা লাথি মারুন আর বলুন আব্যাকাডাব্রা। প্রত্যেকবার লাথি মারার সঙ্গে সঙ্গে বলুন আব্রাকাডাব্রা, দেখবেন গাড়ি ঠিক হয়ে গেছে।

গাড়ি কী করলে ভালো হতে পারে তা জানা ছিল না অভীর। তাই অগত্যা আস্তে আস্তে গাড়ির পেছনে গেল। একবার ওর মনে হল বাবলি ঠাট্টা করছে না তো?

তারপরই ভাবল এ তো ঠাট্টা করার সময় নয়। অতএব ও লাথি মারল গাড়ির বাম্পারে, মুখে বলল, আব্রাকাডাব্রা।

বাবলি বলল, সত্যি আশ্চর্য আপনি। লাথি মারছেন না যেন মনে হচ্ছে আদর করছেন। জোরে মারুন, খুব জোরে।

অভী জোরে জোরে লাথি মারতে লাগল, আর বলতে লাগল আব্রাকাডাব্রা। আর বাবলি গুনতে লাগল,—এক, দুই, তিন, চার...

বারোটা লাথি মারার পর, বাবলি এবার বলল, বনেট বন্ধ করুন। চলুন যাওয়া যাক।

অভী ভাবল ও ঠাট্টা করছে। বাবলি আবার বলল, কী? দাঁড়িয়ে দেখছেন কী? চলুন।

বনেট বন্ধ করে অভী এসে স্টিয়ারিং-এ বসল। বাবলি বাঁদিকের দরজা বন্ধ করল। চাবি ঘোরাতেই গাড়ি দিব্যি স্টার্ট নিল এবং তর তর কর করে চলতে লাগল।

বাবলি, যেন কিছুই হয়নি, এমনিভাবে বাইরে চেয়ে রইল জানালা দিয়ে।

সেই নাগা পাহাড়, ডিফু নদীর ঝরঝরানি শব্দের মধ্যে আসন্ন রাতে অভীর গা ছমছম করতে

লাগল। ওর মনে হল ও কোনো ডাইনির কবলে পড়েছে। গাড়ি চালাতে চালাতে একবার আড়চোখে ও বাবলির দিকে তাকাল। দেখল, বাবলি নিজের মনে মশলা চিবোচ্ছে।

অনেকক্ষণ পর অভী বলল, আচ্ছা, আব্রাকাডাব্রা মানে কী?

বাবলি বলল, ওটা একটা গুপ্তিমন্ত্র। ম্যাজিশিয়ানরা ম্যাজিক দেখাবার আগে বলেন। তাদের কাছ থেকে শুনেছি।

—আপনি এসব মন্ত্রে-তন্ত্রে বিশ্বাস করেন? অভী বলল।

—বাবলি মুখ না ঘুরিয়েই বলল, দেখলেনই তো করি।

প্রয়োজন পড়লে সব কিছুতেই বিশ্বাস করি। তারপরই বলল, কী নাম বললেন যেন? রসিদ আলি? সাদা দাড়ি। ইস্, কখন যে পৌছব না।

একটু পরেই দিনের আলো মুছে যাবে। ঐ উৎরাইয়ের রাস্তায় অভী যত জোরে পারে গাড়ি চালাচ্ছে। অন্ধকার হবার আগে সমতলে নেমে ডিফু নদী পেরিয়ে ডিফু শহরকে ডানে রেখে জোরে চলে যাবে ডিমাপুরের দিকে। কিন্তু সন্ধে হতে আর দেরি নেই। এখানে আবার গাড়ির কিছু হলে আর উপায় নেই। বৈরী নাগা ছাড়াও জংলি জানোয়ারের ভয় আছে। এখানে নেই এমন জানোয়ার ভারতবর্ষে নেই।

বাবলি ওর হ্যান্ডব্যাগ থেকে চিরুনি বের করে গাড়ির আয়নাটা ওর দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে চুল আঁচড়াতে লাগল।

ওকে যত দেখছে ততই অবাক হচ্ছে অভী। বাবলির হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে ও অভীকে বছর দশেক হল চেনে।

বাবলি চুল আঁচড়ানো শেষ করে সবে চিরুনিটা ব্যাগে ঢুকিয়েছে, এমন সময় গাড়িটা আবার সেরকম কোঁ-কোঁ-কোঁ-কোঁ আওয়াজ করে একটু গড়িয়ে গিয়ে থেমে গেল।

অভী কোনো কথা না বলে বাবলির মুখের দিকে চাইল।

বাবলি বলল, ডিমাপুর কত দূর?

—প্রায় কুড়ি মাইল।

ওয়ান্ডারফুল। চলুন, গাড়িটাকে ঠেলে পথের বাঁদিকে সরিয়ে রাখি। আলো থাকতে থাকতে রাত কাটানোর মতো একটা আস্তানা খুঁজতে হয়।

অভী অবাক হয়ে বলল, কেন আব্রাকাডাব্রা।

বাবলি হোহো করে হেসে উঠল।

বলল, একবার লটারি জিতেছি বলে কি বারবার?

হাসির মতো অবস্থা ছিল না তখন অভীর। গাড়িটা ঠেলতে হল না। ব্রেক থেকে পা ওঠাতেই আপনিই গড়িয়ে গেল। বাঁদিকে একেবারে রাস্তা ঘেঁষে গাড়িটা রেখে, বাইরে চারদিকে ভালো করে দেখল। কোথাও জনমানবের চিহ্ন বা বাড়িঘর কিছুই দেখা গেল না। বেশ কিছুক্ষণ আগে একটা গাড়ি ওদের ক্রশ করে কোহিমার দিকে গেছিল। তারপর কোনো গাড়িও চোখে পড়েনি।

ওরা দুজনে এদিক-ওদিকে হাঁটল। এদিকে আলো নেভার আর দেরি নেই। সঙ্গে একটা টর্চ পর্যন্ত নেই। বাবলির উপর খুব রাগ হচ্ছিল অভীর এবং বারবার বড় সাহেবের মুখটা ভেসে উঠছিল চোখের সামনে। বড় সাহেব চিবিয়ে চিবিয়ে বলছেন, "ইরেসপন্সিবল, বড্ড ইরেসপন্সিবল্ তুমি অভী।"

হঠাৎ বাবলি চেঁচিয়ে উঠল, পাওয়া গেছে। খুব উল্লাসের সঙ্গে বলল, পাওয়া গেছে। ওর উল্লাস শুনে মনে হল, জঙ্গলের মধ্যে বুঝি বা কোনো ফাইভ-স্টার হোটেলই পাওয়া গেল।

এগিয়ে পাহাড়ের দিকে কিছুটা উঠে অভী দেখল একটা কুঁড়েঘর। একচালা ঘর। ঘরের দুদিক

বন্ধ, দুদিক খোলা। সামনে কেটে রাখা অনেক কাঠ স্তূপীকৃত করে রাখা আছে। ঘরের মধ্যে একটা বাঁশের তৈরি মাচা। মালিকের শোওয়ার জন্যে বোধহয়।

এক কোণায় একটি মাটির হাঁড়ি। আগুনে পুড়ে কালো হয়ে গেছে। কতকগুলো বাঁশের খোল ঝুলছে বৃষ্টির জল ভরে রাখার জন্যে। মাচাটা এক কোমর উঁচু। একজন লোক স্বচ্ছন্দে শুতে পারে। বাবলির জন্যে একটা বন্দোবস্ত হলেই হল। এদিক-ওদিকে চেয়ে অভী নিজের মনেই বলল, মালিক ফিরবেন কি না রাতে, তা কে জানে।

বাবলি বলল, মালিক ফিরবে না। অন্তত আজ রাতে ফিরবেন না।

—কী করে বুঝলেন?

—বাঃ, কোনান্ ডয়েল পড়েননি? হাঁড়ির গায়ে রাজ্যের মাকড়সার জাল। বাইরের কাঠগুলোও প্রায় মাসখানেক আগে কাটা হয়েছে। এ তো কমনসেন্স্। বাইরে আগুন জ্বালাবার কোনোরকম চিহ্ন নেই। অতএব বোঝা যাচ্ছে, মালিক এ জায়গাতে কখনো কখনো এলেও রাতে থাকেন না।

অভী বলল, আপনি মাচায় বসুন। আমি গাড়ি থেকে জিনিসগুলো নিয়ে আসি।

অভী গাড়ি থেকে কম্বলটি, বাবলির ব্যাগ এবং ওর ব্রিফকেসটা নামিয়ে নিল। আরেকবার চেষ্টা করল স্টার্ট নেওয়ার। গাড়ি কোনো কথা বলল না। ঠিক করল, এ-পথে যদি কোনো ট্রাক বা গাড়ি যায়, তাতে করে ডিমাপুরে ওদের অফিসে খবর পাঠাবে যাতে ভোরে ভোরে ট্যাক্সি নিয়ে তারা আসে। এই রাতে মিস্ত্রি জোগাড় করে ট্যাক্সি জোগাড় করে এ-পথে এতদূর আসার কোনো সম্ভাবনাই নেই।

অভী নিজের থেকে চেঁচিয়ে বলল, কোনো গাড়ির আওয়াজ শুনলেই আপনি ঘরের ভিতরে ঢুকে যাবেন। এভাবে অসহায় অবস্থায় আমরা আছি জানলে রাতে কোনো সময় বিপদ হতে পারে। আপনাকে নিয়েই সবচেয়ে বিপদ।

বাবলি অভীর দিকে চেয়ে চুপ করে থাকল একটু। তারপর বলল, তাই বুঝি?

দেখতে দেখতে ঝুপ করে অন্ধকার নেমে এল। কিন্তু তখন পুরো অন্ধকার নয়। চারধার থেকে ঝিঁ ঝিঁ ডাকতে লাগল। কী একটা বড় চতুষ্পদ জানোয়ার উপরের পাহাড়ে আওয়াজ করে ঘুরে বেড়াতে লাগল। মিথুংও হতে পারে।

বাবলি বলল, দাঁড়িয়ে থাকলে কি আর পথের গাড়ি আপনার কাছে উড়ে আসবে? গাড়ি এলে তো আধমাইল দূর থেকে আওয়াজই পাবেন।

—আসুন, লেট্স্ সেলিব্রেট। কফি খাওয়া যাক।

এই বলে অভীর লাইটারটা চেয়ে খড়কুটো জোগাড় করে একটা পাথরের আড়ালে আগুন জ্বালাবার বন্দোবস্ত করে, ওর ব্যাগ খুলে দুটি এনামেলের গ্লাস ও নেসকাফের টিন বের করল। বিস্কিটের প্যাকেটাও বের করল।

তারপর আগুন জ্বেলে বাঁশের খোলে জমে থাকা পরিষ্কার বৃষ্টির জল গেলাসে ঢেলে জল গরম করে কফি বানাল।

অভীকে দিল এবং নিজেও নিল।

বলল, দারুণ হয়েছে, তাই না?

ওরা যেখানে বসে কফি খাচ্ছিল, সেখান থেকে ডানদিকটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল অনেকদূর অবধি।

চারদিকে আবছা অন্ধকার, ঝিঁঝির ডাক, নদীর শব্দ, নানারকম পোকার কটর কটর কুটুর কুটুর শব্দ—এ সমস্ত কিছু ছাপিয়ে ডিফু নদীর শব্দ।

কেমন ভয় ভয় করছিল অভীর। ইম্ফলে অনেকদিন আছে যদিও, তবুও এরকমভাবে নাগা হিল্‌সের ভিতরে একজন মেয়ের দায়িত্ব নিয়ে রাত কাটাতে হবে, কখনো ভাবেনি।

বাবলি অস্ফুটে বলল, সত্যি! আপনাকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেব জানি না।

অভী লজ্জিত হল। বলল, ঠাট্টা করছেন? কী করব বলুন, আপনি জোর করলেন, নইলে আমি তো এইরকম গাড়ি নিয়ে ঝুঁকি নিতে চাইনি।

বাবলি বলল, না, না, ঠাট্টা নয়। বিশ্বাস করুন, ছোটবেলা থেকে কত রাত কত জায়গায় কাটিয়েছি, কিন্তু এ রাতের কথা, মানে, এ রাত যদি কাটে, তবে চিরদিন মনে থাকবে।

আমার না, ছোটবেলা থেকেই এরকম জীবন ভারী ভালো লাগে। বিদেশি ছবিতে দেখি, ওদেশের মেয়েরা ইচ্ছে করলে যা খুশি তাই করতে পারে। অথচ আমরা? এই তো আপনার মুখের দিকে চাওয়াই যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে, আমি সিন্ধবাদের মতো আপনার পিঠে চড়ে রয়েছি। আমার জন্য আপনার কী ভীষণ চিন্তা। অবলা মহিলা না ভেবে নিছক একজন, অন্য একজন মানুষ বলে আমাদের মেয়েদের কবে যে আপনারা ভাবতে শিখবেন জানি না। আপনাদের এরকম ব্যবহারে মাঝে মাঝে সত্যিই অপমান বোধ হয়।

অভী বলল, আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না। আপনি আমার কেউ নন, সম্পূর্ণ অপরিচিতার মতোই। আপনার কিছু একটা হলে আমার দায়িত্ব কতখানি আপনি বুঝতে পারছেন না।

—আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে এই রাতের কথা আপনার মনে হয়তো থাকবে। আপনি সবাইকে বলবেন, ওঃ, কী বিপদেই না পড়েছিলাম এক রাতে। আমি আর আমার এক বন্ধু নাগা হিল্‌সে।

অভী কথা বলল না। চুপ করে অন্ধকারে বাবলির মুখের দিকে চেয়ে রইল।

একটু পরে অভী বলল, একটু আগুন করি। আপনার মুখ দেখা যাচ্ছে না অন্ধকারে।

বাবলি অন্ধকারের মধ্যে হাসল। বলল, আমার মুখ কি দেখার মতো?

অভী জবাব দিল না কথার।

খড়কুটো এনে কুঁড়ের বাইরে পথের উলটোদিকে আগুন করল অভী একটা।

আগুনের আলোয় ঐ পরিবেশে বাঁশের মাচায় বেগুনি আর গোলাপি টেরিকট শাড়ি পরা বাবলিকে দারুণ দেখাচ্ছিল।

অনেক, অনেকক্ষণ পর অভীর বেশ ভালো লাগতে লাগল। অভী বলল, আপনার নিশ্চয়ই খুব খিদে পেয়েছে? কী খাবেন? রাতে?

বাবলি একটুক্ষণ ঠোঁট কামড়ালো, বেশি কিছু খাব না। রসিদ আলিকে বলুন বিরিয়ানি পোলাউ করতে, মাংস যেন একটু আন্ডারডান থাকে। সঙ্গে মুরগির টিক-কাবাব এবং রাইতা।

অভী বলল, ব্যস্‌-স্‌! আর কিছুই না!

—নাঃ, আজ আর কিছুই খাব না।

বলেই বাবলি হাসতে লাগল।

অভীও যোগ দিল সেই হাসিতে। অনেকক্ষণের গুমোট টেন্‌সন কেটে গেল অভীর মন থেকে।

এমন সময় কোহিমার দিক থেকে একটা গাড়ি আসার আওয়াজ শোনা গেল।

অভী লাফিয়ে উঠল। বলল, আপনি চুপ করে ওখানে বসুন। পথ থেকে আপনাকে যেন দেখা না যায়। কথা বলবেন না কোনো। কেমন? বলেই অভী তরতরিয়ে নেমে গেল পথের দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যে আলোর বন্যা বইয়ে একটা জিপকে আসতে দেখা গেল বাঁকের মুখে। অভী হাত দেখাল। জিপটা থামা মাত্র জিপের মধ্যের অন্ধকার থেকে কে যেন বলল, 'হ্যান্ডস্‌-আপ্‌'।

অভী হাত তুলল। একজন একটা রিভলবার ওর দিকে ধরল। ওরা নাগাল্যান্ড পুলিশের লোক।

ডিমাপুরে পৌঁছে অভীদের অফিসে একটা ফোন করে দিতে বলল ওদের, যদি পারে। অভীদের কোম্পানির নাম শুনে বলল, খবর দিয়ে দেবে। তবে আজ রাতে কোনো হেল্‌প্ আসতে পারবে না। ট্যাক্সিও না। আজ রাতে আর্মি কনভয় আসবে ডিমাপুর থেকে কোহিমা। সিভিলিয়ান ট্রাফিক বন্ধ। ওরা বলল, গাড়িতেই থাকবেন। কাল অফিসের লোক এলে গাড়ি নিয়েই একেবারে ডিমাপুর পৌঁছবেন।

ওরা গুড-নাইট করে চলে গেল।

একটু গিয়ে আবার ব্যাক করে এসে বলল, এ জায়গাটাতে হাতির বড় উপদ্রব। সাবধানে থাকবেন।

ওরা চলে গেলে অভী তরতরিয়ে উপরে উঠে এল। কুঁড়েতে পৌঁছে দেখল বাবলি নেই। অভীর বুকের স্পন্দন থেমে গেল। বাবলিকে খুঁজতে কোন্‌দিকে যাবে, ভাবতে ভাবতেই অন্ধকার থেকে বাবলি এসে কুঁড়েতে ঢুকল।

অভী বলল, এমন ভয় পাইয়ে দেন না। বিরক্তির সঙ্গে বলল, কী করতে গেছিলেন একা একা জঙ্গলে, অন্ধকারে? বাঘ আছে, হাতি আছে। কোনো মানে হয়!

বাঁশের খোল থেকে জল ঢেলে মুখ-চোখ-হাত-পা ধুতে ধুতে বাবলি বলল, যা করতে গেছিলাম, তা সবাই একা একাই করে।

অভী লজ্জা পেল। বলল, ওঃ, সরি।

এখন ঠান্ডাটা আগের থেকে অনেক বেশি হয়েছে। ডিফু নদী থেকে ধোঁয়া উঠছে। ফ্রিজ খুললে যেমন ঠান্ডা ধোঁয়া ওঠে তেমনি।

অভী বলল, বিস্কুট-টিস্কুট খেয়ে আপনি শুয়ে পড়ুন।

—আর আপনি?

—আমি আগুনের পাশে বসে পাহারা দেব। হাতি আছে, বাঘ আছে, বৈরী নাগারা আছে।

বাবলি বলল, এটা আপনার কাছে রাখুন!

—কী!

হাতের চুড়ি থেকে খুলে বাবলি একটি সেফ্‌টিপিন দিল অভীকে। বলল, হাতি এলে হাতির কান চুলকে দিতে পারেন।

অভী বলল, বাবা আপনি পারেনও! আপনার কি ভয়ডর বলে কিছু নেই, সত্যি আপনার মতো দস্যি মেয়ে আমি দেখিনি।

বাবলি জবাব না দিয়ে বলল, আগুনটা একটু জোর করুন। ঠান্ডায় বসা যাচ্ছে না। কম্বল তো একটা। আপনি কী গায়ে দেবেন?

আমি তো আগুনের পাশেই বসে থাকব। অভী বলল।

আগুনটা জোর করে দিল অভী। বাইরের গাদা থেকে অনেকগুলো কাঠ বয়ে এনে কুঁড়ের সামনে রাখল। আগুনে আরেকবার এনামেলের গেলাসে কফি বানাল বাবলি। তারপর কুটুর কুটুর করে বিস্কুটের প্যাকেটটি শেষ করল দুজনে মিলে।

কফি খাওয়ার পর, অভী ব্রিফকেসটা মাচার মাথার কাছে রেখে দিয়ে বলল, এই হল বালিশ। এবার শুয়ে পড়ুন। কম্বলটা চারিদিকে ভালো করে গুঁজে নিন। পোকামাকড় আসতে পারে।

—ঈ-রে—যেন আমার মা এসেছেন। বলল বাবলি।

—নিশ্চয়ই, আপনার মা এখানে থাকলে এসব কি বলতেন না?

বাবলি অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল, হয়তো বলতেন, জানি না। জানেন, আমি আমার মাকে কখনো দেখিনি। ছবিতে দেখেছি। আমি জন্মাবার সময়ই আমার মা মারা যান। এরকম

সব রাতে, যখন খুব ইচ্ছে করে কাছে কেউ থাকুক, কেউ আদরে সোহাগে আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরুক, তখন মায়ের কথা খুব মনে পড়ে।

অভী চুপ করে রইল।

অনেকক্ষণ পর বলল, কী হল? শুয়ে পড়ুন।

—হ্যাঁ শুচ্ছি।

ধীরে ধীরে রাত বাড়তে লাগল। ঠান্ডাটাও বাড়তে লাগল। কোহিমার দিকে থেকে একটা হাওয়া আসতে লাগল হুহু করে। সন্ধের সময় যে চতুষ্পদ জানোয়ারটার আওয়াজ শোনা গেছিল, সেটা তেমনি ঘোরাফেরা করতে লাগল অন্ধকারে। নক্ষত্রখচিত উজ্জ্বল আকাশ নিচের অন্ধকারকে আরও ভারী করে তুলল। আগুনটা জোর করে দিয়ে অভী কুঁড়ের বাঁশের খোটায় হেলান দিয়ে বসে রইল।

বাবলি মাচায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করতে লাগল। মাচাটায় ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ উঠতে লাগল। বলল, ঘুম আসছে না।

তারপর রাতের কোনো এক সময়ে বাবলি ঘুমিয়ে পড়ল।

অভী সামনে দু'পা ছড়িয়ে দিয়ে বসেছিল। ওরও মাঝে মাঝে ঢুলুনি আসছিল। মাঝে মাঝে উঠে আগুনে নতুন কাঠ গুঁজে দিয়ে আসছিল।

মাঝরাতে একফালি চাঁদ উঠেছিল আকাশে।

তারপর ঢুলুনির মাঝে মাঝে অভী দেখছিল যে আকাশ মেঘে মেঘে ঢেকে গেল। তারপর কখন যে ও বাঁশে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল মনে নেই ওর।

হঠাৎ অভীর ঘুম ভেঙে গেল ঠান্ডা জলেব ছিটেয়।

চোখ মেলে দেখল। আকাশে একটিও তারা নেই।

বৃষ্টিতে আগুন নিভে গেছে। ওর গায়েও বৃষ্টির ছিটে লাগছে। ওর ভীষণ শীত করতে লাগল। আধো ঘুমে ওর হঠাৎ বাবলির কথা মনে হল। মুখ ঘুরিয়ে দেখল বাবলি মাচার উপরে উঠে বসেছে।

অন্ধকারে বাবলি বলল। আগুনটা নিভে গেল কেন?

—বৃষ্টি পড়ছে বাইরে।

—খুব শীত, না? খুব শীত করছে আপনার?

—হ্যাঁ।

—আপনি এখানে আসুন।

—ওখানে দুজনের জায়গা হবে না।

—হবে, আপনি শিগ্‌গির করে আসুন, নইলে ভালো হবে না। আপনি কি বলুন তো? এত কষ্ট পাচ্ছেন, তবু আমার কাছে আসতে এত লজ্জা এত সংকোচ!

অভী উঠে এসে কাঁপতে কাঁপতে মাচার পাশে এসে বসল।

বাবলি বলল, আপনি আমার কাছে আসুন।

অভী বসেই রইল।

বাবলি ওর কাছে সরে গিয়ে ওকে দু'হাতে কাছে টেনে নিল। বলল, কম্বলটা দিয়ে আপনি আমাদের দুজনকে ঢেকে রাখুন। আমি আপনাকে জড়িয়ে থাকছি। দেখবেন শীত এখুনি পালাবে। লজ্জা করছেন কেন, আমাকে আপনিও জড়িয়ে থাকুন।

কিছুক্ষণ পর আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় ওরা দুজনে পাশাপাশি শুয়ে পড়ল। বাইরে বৃষ্টি-ভেজা পাহাড়ি হাওয়া হুহু করে গাছপালায় বইতে লাগল। বাবলির শরীরের উষ্ণতায়, ওর বুকের সুগন্ধে, অভী

শিউরে শিউরে উঠতে লাগল। ওই অবস্থাতেই কখন যে ওরা ঘুমিয়ে পড়েছিল ওরা দুজনেই জানে না।

ডিমাপুর থেকে ট্যাক্সি করে দুজন লোক এসেছিল অফিসের। মেকানিকও এসেছিল। গাড়ি ঠিক করে ওখান থেকে বেরোতে বেরোতে সকাল ন'টা হল।

সকালে উঠে বাঁশের খোলের টাটকা জলে মুখ ধুয়ে শাড়ি-টাড়ি ঠিকঠাক করে নিয়ে বাবলি অভীর পাশে এসে বসল।

গাড়িটা স্টার্ট করে অভী বলল, জায়গাটা দেখে রাখুন। জায়গাটার কথা মনে থাকবে? এই রাতের কথা?

গাড়িটা ডিফু নদীর পাশে পাশে আবার গড়িয়ে চলল।

বাবলি খোঁপা থেকে গতকালের বাসি ফুলটা নিয়ে নদীতে ছুঁড়ে দিল।

মাইল দশেক যেতে না যেতেই ওরা পাহাড় থেকে সমতলে নেমে এল। এখন আর দুধারে জঙ্গল নেই। সোজা রাস্তাটা চলে গেছে ডিমাপুরের দিকে।

বাবলি বলল, বেশ কাটল সময়টা আমাদের। কালকের রাতটা, আমার ট্রেন তো বিকেলে, না?

অভী বলল, হ্যাঁ।

বাবলি বলল, আপনি কী করবেন আমি চলে যাবার পর?

অভী হাসল, বলল, তাই ভাবছিলাম। গত তিরিশ ঘণ্টায় আমি আমার নিজের ইচ্ছেয় কিছুই করিনি। আপনি যা যা বলেছিলেন তাই করেছিলাম। এখন কী করব, তাই ভাবছি।

বাবলি বলল, বেশি ভাববেন না। আপনি বড় বেশি ভাবেন।

অভী বলল, তবু মাঝে মাঝে ভাবতে হয়।

তারপর অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বাবলি বলল, চিঠি লিখলে কি জবাব দেবেন? না দেবেন না?

—দেব। অভী বলল।

—জবাব দেবেন, কিন্তু জবাবে আবার প্রেম-ট্রেম নিবেদন করে বসবেন না। আপনাকে আমার বড় ভয় করে।

—আপনাকেও আমার খুব ভয় করে। অভী বলল।

—আমার কিন্তু আপনাকে খুব ভালো লেগেছে। বাবলি বলল।

তারপর বলল, আমি চাই, সত্যিই চাই, এ ভালো লাগাটা যেন বজায় থাকে। জানি না হয়তো আপনাকে আমার কিছু বলার ছিল। কিন্তু বলা হয় না। এই ঘর ছাড়া, এইরকম বৃষ্টির শীতের রাত ছাড়া সে কথা আর বলা যাবে না, ভাবলে অবাক লাগে। কতগুলো কথা থাকে, হয়তো প্রত্যেকের জীবনেই থাকে; সেগুলো বিশেষ জায়গা ও বিশেষ মুহূর্তে বলতে না পারলে বলাই হয়ে ওঠে না। সারা জীবন বয়েই বেড়াতে হয়।

তারপর অনেকক্ষণ ওরা চুপ করে থাকল।

অভী বলল, ঐ যে ডিমাপুরের বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে।

বাবলি বলল, সত্যি? আহা রশিদ আলি—বদরপুরি রশিদ আলি। তোমাকে আমি বড় ভালোবাসি। তুমি আমাদের কী খাওয়াবে গো?

তারপরেই হঠাৎ বলল, শুনুন.ভালো ছেলে, আমাদের যাত্রা শেষ হয়ে এল, আবার দেখা হবে কি না জানি না। আমি যেমন করে কালকের বাসি ফুলটা ছুঁড়ে ফেললাম, আপনিও আমার বাসি

স্মৃতিটাকে তেমনি করেই ছুঁড়ে ফেলে দেবেন, কোনো স্মৃতি-ফিতি নিয়ে বাঁচার কিছু মানে নেই। কেবলমাত্র ভবিষ্যতের জন্যই বাঁচবেন। বুঝলেন?

হুঁ, অভী বলল।

কিছুই বোঝেননি, চোখ নাচিয়ে বাবলি বলল।

ইম্ফল থেকে কোহিমা হয়ে ডিমাপুরে যখন ওরা সত্যিই এসে পৌঁছলো তখন সকাল ন'টা।

ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের বাংলোটা নিরিবিলি, তবে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের বাংলো যতখানি নিরিবিলি হওয়া উচিত ততটা নয়। ডিমাপুর শহরেরই এক প্রান্তে।

বাবলি গাড়ি থেকে নেমেই বলল, সত্যি! বেশ বাংলোটা। কিন্তু রশিদ আলি কোথায়?

বলতে বলতে বাংলোর পেছন দিকের রান্নাঘর ছোট্ট খাওয়ার ঘর পেরিয়ে সাদা দাড়ি নিয়ে রশিদ আলি এসে হাজির হল।

ওকে দেখেই বাবলি বলল, অভী, আপনি মালপত্র নামানোর বন্দোবস্ত করুন। আমি রশিদ আলির সঙ্গে লাঞ্চে কী কী খাওয়া যায় তার বন্দোবস্ত করছি গিয়ে।

তারপরই একটু থেমে বলল, আপনি মুরগি খান তো। না, পিসিমার বারণ আছে?

অভী হাসল। বলল, আমার কোনো পিসিমা নেই।

বাবলি বলল, মাসিমা তো আছেন?

অভী হাসল। বলল, না, মাসিমাও নেই। কিন্তু আমার মাসি-পিসিকে নিয়ে পড়া কেন?

বাবলিকে গতকাল সকালে-পরা শাড়ি-জামাতে রাতে নাগাপাহাড়ের বিপদের মধ্যে রাত কাটানোর পর এবং গাড়ি খারাপ হওয়ার টেনশান ইত্যাদিতে খুবই ক্লান্ত ও শ্রান্ত দেখাবে ভেবেছিল অভী, কিন্তু বাবলির এই ক্লান্তিহীন সপ্রতিভ প্রগল্‌ভতাতে এখন সত্যিই ও অবাক হয়ে যাচ্ছে। অভীর অল্পবয়সি জীবনে বাবলি নিশ্চয়ই এক অভিজ্ঞতা। মণিপুরের লক্‌টাক্ লেক প্রথমবার দেখে যেমন মনে হয়েছিল, নাগাপাহাড়ে মিথুং দেখে প্রথমবার যেমন আশ্চর্য হয়েছিল, বাবলিকে কাছ থেকে দেখে ও তেমনই আশ্চর্য হয়েছিল। বাবলি সম্বন্ধে কোনোরকম বিশেষণ ও ওর সীমিত বাংলা জ্ঞানে খুঁজে পাচ্ছে না। খোঁজবার চেষ্টাও করল না আর।

বাবলি একমুহূর্ত অভীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর হঠাৎ বলল, আপনাকে দেখার পর থেকেই আমার রবিঠাকুরের একটি চরিত্রর কথা মনে হচ্ছে।

অভী গাড়ির বুট খুলে, মাল নামাতে নামাতে ক্যাজুয়ালি, যেন ওর এসব পাগলের প্রলাপে বিন্দুমাত্র ইন্টারেস্ট নেই; এমন গলায় কি? কোন্ চরিত্র?

বাবলি দুষ্টুমির হাসি হাসল। বলল, রেবতীকে খুব মনে হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের 'তিন-সঙ্গী'র ল্যাবরেটরি গল্পের রেবতীর কথা। তার পিসিমার আদরের 'রেবু'র কথা।

অভী মনে মনে বিরক্ত হল।

কী ভাবে মেয়েটা? না হয় ইন্ডিয়ান রেভেনিউ সার্ভিসে ঢুকছেই, না হয় পড়াশোনাতে ভালোই, তা বলে অভীকে ও ভেবেছে কী? নেহাত ওর ওপরওয়ালার শালির মেয়ে বলে, বাবলি নিজেই কি ওর বস্ হয়ে গেছে নাকি? তাছাড়া, বাবলি না জানতে পারে তা, কিন্তু বাবলির মাসি-মেসো জানে, অভীও কোনো দিক দিয়ে হেয় করার পাত্র নয়। বাবলির চেয়েও সে সব দিক দিয়ে ভালো।

মনে মনে অভী ভাবল, এতখানি বাড়াবাড়িটা কুশিক্ষা। বাড়িতে বোধহয় কেউ শেখায়নি ছোটবেলায় কতখানি মানায়, কতখানি মানায় না। মা-মরা মেয়ে তো। বকে গেছে অল্পবয়সে। তাছাড়া মেয়েরা ইন্দিরা গান্ধীর রাজত্বে নিজেদের কী যেন মনে করছে একেবারে। যেন উড়তে চাইছে সকলেই ডানা মেলে। গতকাল আই-এ-এস কী আই আর এস পাস করলেই বুঝি ভাবছে, আমি কী হনু।

অভী গাড়ির বুটটা বন্ধ করতে করতে বলল, আমি যদি রেবতী হই, তবে আপনি কী? আপনি কে? আমার ওপর কীসের অধিকার আপনার?

বাবলি সপ্রতিভতার সঙ্গে বলল, আমি কেউ না, কেউ না। কোনো অধিকার নেই।

কিন্তু কথা শেষ হতে না হতে ও যেন হঠাৎ এই এত ঠাট্টা, এত মজা, এত পরিহাসের কুয়াশার মধ্যে ওর ভেতরে কে ছিল, যে-ছিল তাকে দেখতে পেল।

ফরেস্টের কাঠের বাংলোর সুন্দর রং করা অস্তিত্বে, চারধারের শাল-সেগুন গাছের পরিবেশে, বর্ষাদিনের ঝিলমিল করা রোদে, নানান পাখির ডাকে এই ডিমাপুরের আশ্চর্য সকালে কী যেন কী ঘটে গেল।

বাবলির এবং অভীরও মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা আটশো আশি ভোল্টের আলোর মেইন-স্যুইচ নেভানো ছিল। এই সকালে এই কাঠের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে, ঠাট্টা করতে থাকা, হাসতে-থাকা, অন্যকে নিয়ে তামাশা করতে থাকা বাবলির বুকের মধ্যে যেন কী একটা জ্বলে উঠল, চোখের ওপর এমন একটা ছায়া নেমে এল, যেন তার নিজের মধ্যে সে-ছায়ার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বাবলি নিজেও বুঝি কখনও সচেতন ছিল না।

অভী দেখল, বাবলির মুখটা হঠাৎ এক আশ্চর্য আনন্দে ক্যামেরার ফ্ল্যাশ-লাইটের মতো একঝলকে জ্বলে উঠে, দপ্ করে পরক্ষণেই নিভে যায়।

অভী চোখ নামিয়ে নিয়ে গাড়ির পিছনের সিটে এক আকাশ আলোর নিচে দাঁড়িয়েও যেন ফেলে রাখা কম্বলটা দেখতে পাচ্ছিল না। এমন করে খুঁজতে লাগল। বাবলিও বড়বড় গাছগাছালির ফাঁকে ফাঁকে দৃশ্যমান রোদ ঝলমল নির্মেঘ আকাশে চেয়ে কী যেন খুঁজতে লাগল। যেন আকাশেই তার প্রার্থিত বস্তু আছে; ছিল।

একটু আগে যেটা ঠাট্টা ছিল, সেটা আর কোনোক্রমেই ঠাট্টা রইল না। ওরা দুজনেই একই সঙ্গে, অদ্ভুত আবিষ্ট এক সিনক্রোনাইজেশানের মধ্যে বুঝতে পারল যে দুজনের মধ্যে এমন কিছু একটা হয়ে গেল, এই মুহূর্তে হয়ে গেছে; যা হবে বলে তাদের দুজনের কারোই জানা ছিল না।

সম্পূর্ণ আত্মসচেতন ও আত্মবিশ্বাসী বাবলির মুখটা কালো হয়ে গেল। বিদুষী, গর্বিতা, সপ্রতিভ, দুদিন বাদে ইনকামট্যাক্স অফিসার হতে যাওয়া বাবলির সব গর্ব, সব সপ্রতিভতা মাটিতে মিশে গেল। ভালোবাসা, কারও প্রতি কারও সত্যিকারের ভালোবাসা যে কত তীব্র দুঃখময় অনুভূতি এ-কথার আভাস যেন বিদ্যুচ্চমকের মতো বাবলির বুকে বাজল। জীবনে প্রথমবার।

বাবলি অভীর কথার উত্তর না দিয়ে আর কোনো কথা না বলে রশিদ আলির পেছন পেছন রান্নাঘরের দিকে গেল।

অভী একে একে মালগুলো নামাল চৌকিদারকে ডেকে। ওপরের ঘরে বাবলির মালগুলো তুলে দিল। নিজেরগুলো, নিচের দিকে বাঁদিকের ঘরে। তারপর গাড়িটাকে বাইরের একটা বড় সেগুন গাছের নিচে পার্ক করিয়ে রেখে ঘরের মধ্যে এসে ইজিচেয়ারে বসে একটা সিগারেট ধরাল। কাল সেই ভোরে দাড়ি কামিয়েছিল। তারপর দাড়িও কামায়নি, জামাকাপড়ও ছাড়েনি। চেহারার অবস্থা হয়েছে চণ্ডালের মতো।

একা একা ইজিচেয়ারে বসে আঙুলে সিগারেটটা নাড়তে-চাড়তে জানালা দিয়ে বাইরে দূরে উদ্দেশ্যহীনভাবে চেয়ে থেকে অভী নিজের মনকে বোঝবার চেষ্টা করতে লাগল। অভীর খুব ভালো লাগতে লাগল, আবার কেমন দুঃখও লাগতে লাগল। এমন আশ্চর্য অনুভূতির শরিক আর হয়নি ও আগে।

এমন সময় পর্দার আড়ালে দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে, বাবলি নরম নরম গলায় বলল, আসব?

—আসুন, আসুন—বলে অভী উঠে দাঁড়াল।

মনে মনে ও অবাক হল। যে মেয়ে কাল রাতের অন্ধকারে সমস্ত সংস্কারমুক্ততায় নিজেই অভীকে শীতের যন্ত্রণা থেকে বাঁচাতে সেই কাঠুরের ঘরে তাকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে শুয়ে ছিল সেই-ই আজ সকালের আলোয় তার ঘরে আসতে অনুমতি চাইছে।

বাবলি ঘরে ঢুকে চোখ নামিয়ে বলল, আমার ঘর কোন্‌টা? কোথায় থাকব আমি?

বাবলির মুখটা চোরের মতো দেখাচ্ছিল। বাবলি যেন কী চুরি করে নিয়েছে অভীর। সেই অপরাধে ও চোরের মতো, অপরাধীর মতো মুখ করে চোখ নামিয়ে রইল। তবে ও-ও কি কিছু চুরি করেছে বাবলির?

অভী চেয়ার ছেড়ে উঠল, বলল, চলুন ওপরে আপনার ঘর। ঐ ঘরটাই সবচেয়ে ভালো ঘর।

তারপর কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠে অভী বাবলিকে ওর ঘরে পৌঁছে দিল।

বলল, বারান্দাটা চমৎকার, তাই না?

তারপর বলল, ভালো করে চান করুন, দেখবেন ভালো লাগছে। আমিও তৈরি হয়ে নিচ্ছি। তারপর একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট খাব কেমন? আপনার হয়ে গেলে নিচে চলে আসবেন।

বাবলি মাথা নোয়াল। তারপর অভী সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে ঘরের দরজা বন্ধ করল।

চান-টান করে একটা হলুদ-কালো ডুরে তাঁতের শাড়ি জামা পরে গলায় কালো পুঁতির মালা ঝুলিয়ে যখন বাবলি নিচে নেমে এল, তখন বাবলিকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল।

ব্রেকফাস্ট খাওয়ার সময় দুজনের কেউই বিশেষ কথা বলল না। একজন অন্যকে টোস্ট এগিয়ে দিল অন্যজনের প্লেটের কর্নফ্লেক্সে দুধ ঢেলে দিল। কাঁটা-চামচের টুং-টাং শব্দ হচ্ছিল শুধু খাওয়ার ঘরে। একটা মিষ্টি ঝিরঝিরে হাওয়ায় পর্দাটা ওড়াউড়ি করছিল। ওরা কেউই কোনো কথা বলছিল না। গতকাল ও পরশু যে উচ্ছ্বসিত কল্‌কল্‌ করা মেয়েটির সঙ্গে অভী কাটিয়ে ছিল, সেই মেয়েটি কোন্‌ মন্ত্রজ্ঞর মন্ত্রবলে যেন বিবশ হয়ে গেল। অভীর চোখে সেই মোটামুটি মোটাসোটা সাধারণ মেয়েটি যেন কী এক অসাধারণত্বের দাবি নিয়ে এসে দাঁড়াল।

ব্রেকফাস্ট খাবার পর বাবলি যত্ন করে কফি বানাল। তারপরে দুজনেই কফি হাতে করে বারান্দার চেয়ারে এসে বসল।

সেগুন গাছগুলোর ছায়া বাংলোর ঘন সবুজ ঘাস-গজানো হাতায় লম্বালম্বিভাবে পড়েছিল। কতকগুলো শালিক এসে কিচির-মিচির করে নিজেদের মধ্যে কীসব বলাবলি করছিল। নিজেদের মধ্যে মান অভিমান ঝগড়া করে নিজেরাই তার নিষ্পত্তি করে আবার উড়ে যাচ্ছিল; ফিরে বসছিল।

কাঁচা রাস্তা দিয়ে প্যাঁক-প্যাঁক আওয়াজ করে হর্ন বাজিয়ে চেনের ক্যাঁচর-কোঁচর আওয়াজ তুলে সাইকেল রিকশা যাচ্ছিল মাঝে মাঝে। পথ-চলতি নাগা ও অসমিয়াদের টুকরো-টাকরা কথাবার্তা ভেসে আসছিল এবং আবার হাওয়ায় ভেসে চলে যাচ্ছিল।

অনেক অনেকক্ষণ ওরা চুপচাপ বসে রইল। দুজনে দুদিকে তাকিয়ে। ওরা দুজনে দুজনের নিজস্ব ভাবনায় বুঁদ হয়েছিল। যখন মনে মনে অনেক কথা শেষ হয়ে গেছে অথবা মনে মনে অনেক কথা শুরু হবে, সেই মধ্যবর্তী একফালি নামহীন সময়টুকুতে ওরা দুজনেই থমকে দাঁড়িয়েছিল।

অনেকক্ষণ পর অভী বলল, আপনার ট্রেন কটায়?

বাবলি যেন ঘুম ভেঙে বলল, বিকেলে, ঠিক সময় জানি না, একবার খবর নিতে হবে স্টেশন থেকে। তারপরই বলল, আপনি আমাকে তুলে দিয়ে আসবেন না?

অভী বলল, আপনার কী মনে হয়?

বাবলি হাসল। বলল, মনে হয় তুলে দিয়ে আসবেন।

তারপরই বলল, আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম এ দুদিন বলুন?

অভী একটু চুপ করে থেকে বলল, জানি না।

এখনও অভী বুঝতে পারছিল না। যে-অনুভূতির মধ্যে এখন এই মুহূর্তে ও আছে, তাকে কষ্ট বলে কি না জানে না ও। তাকে কী বলে ও সত্যিই জানে না।

তারপরই বলল, আপনারও তো খুব কষ্ট হল তাই না? আমি কেবল ভাবছি, গত রাত্রে কোনো একটা দুর্ঘটনা ঘটলে, কোনো বিদ্রোহী নাগা বা হাতির উপদ্রবে পড়লে আপনার মাসিমা মেসোমশায়ের কাছে কী করে মুখ দেখাতাম? ভাবতে ভয় লাগছে। ইম্ফলে ফিরে গিয়ে ওদের কী যে বলব, বুঝতে পারছি না।

বাবলি হাসল। বলল, আমার মাসিমা-মেসোমশায় আমাকে চেনেন। আমার দস্যিপনা জানেন। দোষ হলে আমারই হত। আপনাকে কেউ দোষী করত না।

অভী বলল, অন্য কেউ না করলেও, আমি করতাম।

বাবলি অবাক চোখে তাকাল অভীর দিকে।

তারপর মুখ নিচু করে বলল, কেন? আমি আপনার বসের আত্মীয়া বৈ তো আর কিছুই নই, আমার জন্যে আপনার এত অপরাধ বা দুশ্চিন্তা কেন! পরের জন্যে এত ভাবা ঠিক নয়; এতখানি কনসার্নড হওয়া ঠিক নয়।

—নয় বুঝি? অভী বলল।

বলে মুখ তুলে বাবলির দিকে তাকাল।

তারপর বলল, কী জানি? হয়তো নয়।

তারপর এলোমেলো হাওয়ায়, রশিদ আলির সাদা লম্বা দাড়ি যেমন এলোমেলো হয়ে গেল, তেমন হল বাবলির আঁচল, অভীর চুল। তারপর দেখতে দেখতে কী করে যে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল, ওরা দুজনের কেউ তা বুঝতে পারল না।

অভীর একবার বেরোবার কথা ছিল ফাইল নিয়ে অফিসের দিকে—কিন্তু অভী বেরোল না। ঠিক করল কাল ব্রেকফাস্ট করে সকাল সকাল বেরিয়ে একেবারে সব কাজ শেষ করে রাতে ফিরবে বাংলোয়। তার পরদিন ভোর চারটায় বেরিয়ে পড়বে ইম্ফলের দিকে কোহিমা হয়ে।

দেখতে দেখতে ট্রেনের সময় হয়ে গেল।

বাবলির মালপত্র নামিয়ে আনা হল নিচে।

অভী বলল, কিছু ফেলে যাচ্ছেন না তো? ঘরটা আর একবার দেখে আসুন। ফেলে গেলে, এখানে কিছু হারিয়ে গেলে, আর কিন্তু পাওয়া যাবে না।

বাবলি একবার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে গেল। দুপা উঠে নেমে এল।

বলল, না কিছু ফেলে যাইনি, কিছুই হারিয়ে যাবে না এ বাংলোর ঘরে। যদি কিছু হারিয়ে থাকি, তা হারিয়েই গেছে। তা কখনও আর পাওয়া যাবে না।

অভী অন্যমনস্ক ছিল। কথাটা ভালো করে শোনেনি। বলল, সত্যিই কিছু হারিয়ে গেছে না কি?

বাবলি হাসল। বিকেলের আলোয় হাসিটা কেমন কান্নার মতো দেখাল। বলল, না। যা হারিয়ে গেছে তা ফিরে পাওয়ার নয়।

ট্রেন ছাড়বার সময় হয়ে এল। ডিমাপুর স্টেশনে ট্রেনটা দাঁড়িয়ে ছিল। তখন অন্ধকার হয়ে গেছিল। অভী কম্পার্টমেন্টের ভেতরেই ছিল। বাবলি বলল, এবার আপনি নেমে দাঁড়ান।

অভী নেমে এসে কম্পার্টমেন্টের সামনে প্ল্যাটফর্মের ওপরে বাবলির সামনে দাঁড়াল।

বাবলি খুব সপ্রতিভ দেখাবার চেষ্টায় সচেষ্ট ছিল। দেখাচ্ছিল যে, সে মেয়ে হলেও ইমোশনাল

মেয়ে নয়। আফটার অল ও রেভিনিউ সার্ভিসের মেয়ে। ওরা অত নরম হতে পারে না। পার্ট ওয়ান পরীক্ষা দেওয়া কচি মেয়ের মতো অত আবেগ ওকে মানায় না। তবু এত সচেতন হওয়া সত্ত্বেও বাবলি ইচ্ছা করে অভীর মুখ থেকে মুখ সরিয়ে প্ল্যাটফর্মের ওপর লক্ষ্যহীনভাবে চেয়ে রইল।

অভী কিন্তু বাবলির মুখের দিকেই তাকিয়ে ছিল। ও কেন জানে না, প্রবলভাবে চেষ্টা করেও ওর চোখদুটো বাবলির মুখ থেকে সরাতে পারল না।

এমন সময় সিগন্যাল হলুদ হল। বাঁশি বাজল গার্ডসাহেবের? 'কু' দিয়ে উঠল এঞ্জিন। অভীর বুকের মধ্যেও যেন কী একটা স্বর আর্তনাদের মতো বেজে উঠল।

জানালার শিকের ভেতর দিয়ে বাবলি ওর রিস্টওয়াচ পরা ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল। বলল, চললাম।

কী হয়ে গেল অভী জানে না। ও বাবলির হাতটা নিজের হাতে ধরল। একজন নারীর কোমল হাত একজন পুরুষের শক্ত সবল হাতে মুহূর্তের আশ্রয় পেল।

অভী বাবলির হাতে একটু চাপ দিল। তারপর হাতটা ছেড়ে দিয়ে, চোখ তুলে বলল, আবার আসবেন ইম্ফলে বেড়াতে। আপনাকে অনেক কিছু দেখাব। অনেক কিছু দেখার ছিল, জানার ছিল, এত অল্পসময় থাকলেন যে, কিছুই হল না।

ট্রেনটা ছেড়ে দিল। অভী কিছুটা অবধি জানালার পাশে পাশে হেঁটে এল যতক্ষণ না ট্রেনের গতিটা দ্রুত হয়।

বাবলি জানালার শিকের সঙ্গে মুখ লাগিয়ে বলল, আপনি দিল্লি আসবেন। আপনাকে সবকিছু ঘুরিয়ে দেখাব। আমার ভালো লাগবে। অনেক দেখার আছে। আসবেন?

ট্রেনের গতি ততক্ষণে দ্রুত হয়ে গেছে। বাবলির চোখ থেকে প্ল্যাটফর্মের বাতিগুলো, লোকজনের মুখগুলো দ্রুত মুছে যাচ্ছে। প্ল্যাটফর্ম থেকে মৌচাকে ঢিল-খাওয়া মরিয়া মৌমাছিদের ডানার মতো একটা গুঞ্জরন উঠছে। উত্তরে অভী কী বলল, শোনা হল না বাবলির, কথাটা শোনা গেল না।

ট্রেনটা আলো ছাড়িয়ে অন্ধকারের মধ্যে পৌঁছে গেল।

এখন আর আলো নেই কোনো, আলো থাকবে না।

বাবলির বন্ধ-করা চোখে একজন সরল সাদাসিধে, আন্তরিকতাভরা ভালোমানুষের অন্ধকারে-মুছে-যাওয়া মুখটি অনেকক্ষণ জেগে রইল।

বাবলি বুঝতে পারল না কতক্ষণ কতদিন এই মুখটা তার চোখে থাকবে। তার যা স্বভাব, তাতে যদি দু ঘণ্টাও তা থাকে, তাহলেও অবাক হওয়ার কথা নিঃসন্দেহে। ওর মনে কিছু লেগে থাকে না। ওর মনের প্রকৃতিটা আশ্চর্য! ও তা জানে। তা জেনে ও গর্বিত।

কিছুক্ষণ পর বাবলি বাথরুমে গিয়ে চোখে মুখে জল দিয়ে এল।

জানালার পাশে ফিরে এসে বসাতে জোর ঠান্ডা হাওয়া লাগতে লাগল তার চোখেমুখে। বাবলির বেশ প্রকৃতিস্থ মনে হতে লাগল নিজেকে। এতক্ষণে মনে হল, ওর মনকে ও সম্পূর্ণ নিজের আয়ত্তে এনেছে। নিজের মনেই, শূন্য কূপেতে বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে হেসে উঠল বাবলি।

বাবলি নিজের মনে বলল, বাবাঃ, সর্বনাশ হতে বসেছিল আমার! রিয়্যালি সিলি ব্যাপার। একটু হলে প্রেমে পড়ে গেছিলাম আর কী!

বাবলির মনে হল, যে ভদ্রলোক বলেছিলেন যে 'আউট অব সাইট, আউট অব মাইন্ড' তিনি কী দারুণ বুদ্ধিমান। বুদ্ধিমান ছেলেদের বুদ্ধিমত্তাকে ও ভালোবাসে, ভালোবাসতে পারে বাবলি। কিন্তু ওরকম বোকাবোকা ছেলেকে ভালোবাসা বাবলির পক্ষে সম্ভব নয়।

অভী শুধুমাত্র বোকা নয়, ক্যাবলাও, নইলে কোহিমা থেকে ডিমাপুর আসার পথে যখন গাড়ি

খারাপ হল, তখন বাবলির রসিকতা বুঝতে না পেরে গাড়ির পেছনে ম্যাজিশিয়ানদের মতো আব্রাকাডাব্রা বলতে বলতে লাথি মারতে পারে কখনও? কোনো বুদ্ধিমান ছেলে পারে?

বাবলি চটি দুটো থেকে পা আলগা করে সিটের ওপর দু পা জোড়া করে আরাম করে বসে আবার বলল, বাবাঃ খুব বেঁচে গেছি এ যাত্রা। পুরো ব্যাপারটা ভাবলেও হাসি পাচ্ছে এখন। অত সোজা নয়।

অন্ধকার থাকতে অভী বেরিয়ে পড়েছিল ডিমাপুর থেকে। তাড়াতাড়ি না বেরোলে ইম্ফল পৌঁছনো যাবে না। খুজ্‌মাতে নাগাল্যান্ডের বর্ডার দিনে দিনে পেরোতে না পারলে মুশকিল। বিদ্রোহী নাগাদের দৌরাত্ম্য আজকাল কমে গেছে বটে, কিন্তু কিছু বলা যায় না।

দেখতে দেখতে ডিমাপুরের সীমানা ছাড়িয়ে ডিফু শহরকে বাঁদিকে রেখে ও ডিফু নদীর পাশে-পাশে-চলা পাহাড়ি নদীর ধারে এসে পড়ল।

তখন সবে ভোর হচ্ছে। ঝরঝর করে বয়ে চলেছে বর্ষার ঘোলা জলে ভরা ডিফু নদী পাহাড়ের বুক কেটে। এপাশে রাস্তা, ওপাশে ঘন গভীর জঙ্গল। নানারকম বাঁশ ঝোপ, জংলি কলাগাছের ঝাড়, বেত বন, আরও কত কী গাছগাছালি। নদীটা এখানে খুব সামান্যই চওড়া হয়ে গেছে সমতলে পড়ে। নদীর দু'পাশে কুমারী গাছগাছালি এমন চন্দ্রাতপের সৃষ্টি করেছে যে, ভরদুপুরেও আলো পড়ে না নদীতে। নদীর গায়ে-লাগা সবুজ লতাপাতায় তাই যেন কেমন একটা হলুদ ছোপ লেগেছে। লাল জলের গর্জন, ফিকে হলুদ আর গাঢ় সবুজে ভরা বন, আর তার পাশে চড়াইয়ে-ওঠা ডিমাপুর-কোহিমা রোড। দারুণ।

একটু পরেই, প্রায় মিনিট পনেরো-কুড়ি গাড়ি চালিয়ে আসার পর অভী সেই জায়গাটায় পৌঁছলো। যেখানে ও বাবলির সঙ্গে রাত কাটিয়েছিল।

অভীর তাড়া ছিল। পথে দাঁড়াবার কথা ছিল না। তবু কী যেন হল ওর, ও গাড়িটাকে বাঁ ধার ঘেঁষে দাঁড় করাল। তারপর পাকদণ্ডী বেয়ে উঠে সেই নাগাকাঠুরের কাঠের ঘরে গিয়ে পৌঁছল। ঘরটার মধ্যে কিছুক্ষণ একা দাঁড়িয়ে থাকল অভী।

ওরা যেখানে কাঠ এনে আগুন করেছিল, যেখানে বসে কফি বানিয়েছিল বাবলি, সেই পোড়া কাঠগুলো ঠিক তেমনি আছে। বাঁশের চোঙটা আবার বৃষ্টির জলে ভরে গেছে। ওখানে, চতুর্দিকের মাথা-উঁচু নাগা পাহাড় আর দূরের নদীর ঝরঝরানি শব্দের মধ্যে দাঁড়িয়ে হঠাৎ যেন অভী বাবলির অস্তিত্ব অনুভব করল। ওর মনে হল, এখুনি বুঝি সেই বেগনে-রাঙা জংলা-কাজের টেরিকট শাড়ি পরা বাবলি ওর সঙ্গে নতুন কোনো রসিকতা করে ওকে অপ্রতিভ করে দেবে। বাঁশের মাচাটাকে আজ সকালে অবিশ্বাস্যরকম ছোট্ট দেখাল। এর ওপর শেষ রাতে বাবলি যখন ওকে ডেকে নিয়েছিল, তখন কী করে যে ওরা দুজনে এ মাচায় এঁটেছিল তা ভেবেও ওর আশ্চর্য লাগতে লাগল। লোকে কী একটা কথা বলে না? ভাব থাকলে তেঁতুলপাতাতেও দুজনের ঠাঁই হয়। অভী ভাবল, কথাটা বোকা বোকা। নাকি অভীই বোকা হয়ে গেছে?

আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট শেষ করে অভী আবার গাড়িতে গিয়ে বসল। তারপর গাড়ি স্টার্ট করে এগিয়ে চলল কোহিমার দিকে।

সামনে অনেক পথ বাকি। নাগাল্যান্ডের মধ্যে কোহিমা, জাখ্‌মা, খুজ্‌মা হয়ে মাও। তারপর কান্‌কোপ্‌কি হয়ে অনেক অনেক দূরে মণিপুরের মধ্যে ইম্ফল।

অভী এর আগে প্রেম ভালোবাসা ইত্যাদি ফালতু জোলো কথা অনেক নাটক-নভেলে পড়েছে।

পড়তে পড়তে হাসি পেয়েছে। যারা এসব পানসে প্রেমের গল্প লেখে এবং যারা তা পড়ে, তাদের নির্বুদ্ধিতা সম্বন্ধে তার মনে কখনও কোনো সংশয় ছিল না। এই বিংশ শতাব্দীতে প্রেম নামক কোনো বস্তু আছে বলে ও সত্যি সত্যি কখনও বিশ্বাস করেনি। কিন্তু গতকাল থেকে ও যেন কেমন ঘোরের মধ্যে আছে। ওর কি করোনারি অ্যাটাক্ হবে? নইলে এমন ঘুম-ঘুম ঘোর-ঘোর লাগছে কেন সব সময়? পথের সব জংলি ফুল, সব পাখিকে, সকালের রোদ্দুরকে ওর হঠাৎ এত ভালো লেগে যাচ্ছে কেন? এতদিন চোখ-খোলা থাকলেও যা কখনও চোখে পড়েনি, সেইসব তুচ্ছাতিতুচ্ছ সামান্য-সামান্য জিনিস আজ সকালে হঠাৎ এমন অসামান্যতায় আবিষ্কৃত হচ্ছে কেন? দারুণ একটা ভালোলাগা এমন ভালো না-লাগাতেও কেন ও এমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে বারবার?

অভী জানে না কেন? অভীর তিরিশ বছরের জীবনে এরকম বোধ, এরকম অনুভূতি ওর এই-ই প্রথম। বুদ্ধিমান অভী, ব্রিলিয়ান্ট অভী জীবনে এই-ই প্রথম বোকা হয়ে গেছে।

বাবলি ডিমাপুর থেকে ট্রেনে চড়ে ভোরের দিকে এক সাহেবি চা-বাগানে নেমে পড়েছিল। সে বাগানের ম্যানেজার ওর আত্মীয়। সেখান থেকে চা-বাগানের ছোট্ট প্লেনে দমদম এসেছে আজই দুপুরে। এয়ারপোর্ট থেকে আর যায়নি শহরে কারণ সন্ধের ফ্লাইটে দিল্লির টিকিট পেয়ে গিয়েছিল ও একটা। ভালোই হল। জয়েনিং ডেটের দুদিন আগেই পৌঁছে যাবে ও।

দমদম এয়ারপোর্টের ডোমেস্টিক লাউঞ্জে বসেছিল বাবলি। হাতমুখ ধুয়ে নিয়ে রেস্টুরেন্টে গিয়ে দুপুরের খাওয়া সেরে নিয়েছিল। তারপর সোফায় গা-এলিয়ে বসে একটা পত্রিকা দেখছিল। এখন প্রায় তিন ঘণ্টা সময় কাটাতে হবে এখানে। তারপর ফ্লাইট অ্যানাউন্সড হলে চেকিংয়ে যেতে হবে। এই এক ঝামেলা হয়েছে আজকাল। হাই-জ্যাকিংয়ের জন্য প্রতিটি এয়ারপোর্টের এ বিপত্তি।

কিছুক্ষণ পর ও উঠে গিয়ে টেলিফোন বুথ থেকে ফোন করল অরু মাসিকে।

বাবা কলকাতায় ছিলেন না। ট্যুরে গিয়েছিলেন। ও জানত। বাড়ির চাকরকে ফোন করে বাবার খবর নিল বাবলি।

তারপর ফোন করল দু'-একজন বন্ধুবান্ধবকে। ফোন করে ও যেখানে বসেছিল সেখানে ফিরে আসছে এমন সময় হল ঝুমার সঙ্গে দেখা। লালরঙা মেকআপ বক্স হাতে নিয়ে হনহনিয়ে কোথায় চলেছে যেন।

বাবলি নিচু গলায় ডাকল, এই ঝুমা।

ঝুমা ফিরে দাঁড়াল। কানের ঝুমকো দুলে উঠল। ওকে দেখতে পেয়েই অবাক আনন্দে চোখ বড় বড় করে বলল, ওমা, বাবলি, তুই! তারপরই বলল, তুই এখানেই থাক। আমি এখুনি আসছি।

ঝুমা এখন এয়ার-হোস্টেস। দিল্লির বিখ্যাত মেয়ে কলেজ মিরান্ডা হাউসে ওরা একসঙ্গে পড়ত।

ঝুমার বাবা দিল্লির নামকরা ব্যবসাদার। ঝুমার আর কোনো ভাইবোন নেই। ও বাবার একমাত্র মেয়ে। ঝুমার বাবা বলেছিলেন বিজনেস ম্যানেজমেন্ট পড়তে। কিন্তু ঝুমা কেন যে এয়ার-হোস্টেস হতে গেল, তা ওই জানে। ঝুমার চেহারাটা হিংসা করার মতো। যেমন লম্বা, তেমন মুখশ্রী, তেমনি ফিগার। দিল্লির কত বাঙালি ও অবাঙালি ছেলে যে ঝুমার জন্যে পাগল, তা বাবলি জানে। ও শুধু দেখতেই যে ভালো, তা নয়। পড়াশোনাতে এবং স্পোর্টসেও ভালো ছিল। ঝুমা বলতে গেলে বাবলিদের আইডল ছিল। ও সহজে কমপিটিটিভ পরীক্ষায় বসতে পারত এবং বসলে বলা যায় না, ফরেন সার্ভিসেও হয়তো সিলেকটেড হত। কিন্তু তা না করে, ও জেদ করে এয়ার-হোস্টেস হল পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে। পাগলি মেয়ে একটা।

দেখতে দেখতে ঝুমা ফিরে এল। ফিরে এসে ওর পাশে বসল। বসেই বলল, অ্যাই বাবলি, তুই কি মুটিয়েছিস রে?

বাবলি হাসল। বলল, আমি কবেই বা সুন্দরী ছিলাম। তোর মতো ফিগার থাকলে তো হয়েই যেত। কী কী হত তাইই ভাবি।

ঝুমা বলল, না রে, ওরকম করে বলিস না। আমি এখন দারুণ মনঃকষ্টে আছি।

বাবলি হাসতে হাসতে বলল, কীরকম?

ঝুমা বলল, অবস্থা খুব খারাপ। একজনের জন্যে পাগল হয়ে রয়েছি। তারপর বলল, চল, চা খাই। চা খেতে খেতে বলব।

বাবলি বলল, একটু আগে তো লাঞ্চ করলাম।

ঝুমা হাত ধরে টানল। বলল, চল না। ভাত হজম হয়ে যাবে।

বাবলি বুঝল, ঝুমার হাত এড়ানো সহজ নয়। বলল, চল।

ওরা দুজন রেস্টুরেন্টে এসে ঢুকতেই বারের দিকে থেকে দুজন ইয়াং হ্যান্ডসাম পাইলট হাত তুলে ঝুমাকে উইশ করল। ঝুমা বাঁ হাত ওপরে তুলে একসঙ্গে বারকয়েক নাড়িয়ে দুজনের অভিবাদনই একসঙ্গে গ্রহণ করল।

বাবলি বসতে বসতে বলল, বাবাঃ, তোর কত অ্যাডমায়রার রে?

ঝুমা তাচ্ছিল্যের গলায় বলল, দূর দূর, এদের বেশিরভাগকেই আমার জানা। যে যার নিজের তালে ঘুরছে। কোনোরকমে নাইট হল্টে বাইরে আমায় মওকামতো পেলে শুয়ে পড়ার তাল। বুঝলি না। পুরুষ জাতটা শুয়োরের মতো। কোনো রসকষ নেই জাতটার। ওরা খালি ঐ একটা জিনিস বোঝে।

ঝুমার কান লাল হয়ে গেল। বলল, এই আস্তে বল, কী হচ্ছে? শুনতে পেলে?

ঝুমা বলল, আহা, বুড়ো খোকারা যেন কিছু জানে না? আমি যেন মিথ্যে কথা বলছি। একসঙ্গে কাজ করতে হয়, তাই হাত নাড়লাম, তাই ভালো ব্যবহার করি। এ ছাড়া কী?

বাবলি কথা ঘোরাল। বলল, তারপর তোর মনঃকষ্টের কারণটা বল?

বাবলির মুখ-চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, দাঁড়া দাঁড়া, বলছি। চায়ের অর্ডারটা দিয়ে নিই আগে। বলেই বেয়ারাকে ডেকে চায়ের অর্ডার দিল। তারপর নিজের মনেই বলল, আমার আজকে ম্যাড্রাস ফ্লাইট। সে এক ঝকমারি। সমুদ্রের ওপরের ফ্লাইট হলে লাইফ বেল্ট আর অকসিজেন মাস্কের ব্যবহার দেখাতে হবে প্যাসেঞ্জারদের। ডেমনস্ট্রেশানে তো তাঁদের ভারী ইন্টারেস্ট—সব ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে থাকবে বুকের দিকে, পেটের দিকে, যখন দু হাত ওপরে তুলে ডেমনস্ট্রেট করব।

বাবলি খিলখিল করে হাসল। বলল, তুই ভীষণ খারাপ হয়ে গেছিস। বাবা কেউ যদি তোর অমন ফিগার একটু চোখের দেখা দেখে আনন্দ পায়, তাতে তোর কী? তোকে তো আর খেয়ে ফেলছে না।

ঝুমা বলল, খেয়ে ফেলা এর চেয়ে ভালো ছিল। তুই জানিস না, কেমন সুড়সুড়ি লাগে। অন্য কেউ আমার দিকে অসভ্যর মতো তাকালেই আমার সুড়সুড়ি লাগে। পেছন থেকে তাকালেও আমি বুঝতে পারি।

বাবলি আবার হাসল। বলল, পারিসও বাবা তুই।

পরক্ষণেই ঝুমা খুব গম্ভীর হয়ে গেল।

বললো, আমার ম্যাড্রাস, দিল্লি, বোম্বের ফ্লাইট ভালো লাগে না। আমি ইম্ফলের ফ্লাইট চাই।

বাবলি অবাক হয়ে তাকাল ঝুমার দিকে। বলল, হঠাৎ ইম্ফলের ওপর এত প্রীতি? জানিস, আমি ইম্ফল থেকেই আসছি?

ঝুমা লাফিয়ে উঠল। বলল, ওমা, সত্যি। ইশ, তোর কি মজা রে? তুই কি ওখানের কাউকে

চিনিস? আমার সঙ্গে ইম্ফলের একজন লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে হবে। পারবি? তোর কে থাকেন সেখানে বল না?

বাবলি অবাক চোখে হাসল। বলল, আমার মেসোমশায় থাকেন ওখানে। কিন্তু যার সঙ্গে আলাপ করবি, সে কে? মণিপুরি কোনো ভদ্রলোক না কি?

ঝুমা হড়বড় করে বলল, না রে না, বাঙালি। আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে কিন্তু আলাপ হয়নি। মানে আলাপও হয়েছে, কিন্তু সে নিছকই হ্যালোর আলাপ। কিন্তু কী বলব তোকে, আমি দেখেই, শুধু কথা শুনেই খুব বিপদে পড়ে গেছি। আলাপ হলে জানি না কী করব? হয়তো ভালো লাগায় মরেই যাব।

এই অবধি বলেই ঝুমা থামল। পরক্ষণেই ঝুমা বলল, ছবি দেখবি? হিংসা করিস না যেন। বলেই ওর হ্যান্ডব্যাগটা থেকে খামে মোড়া একটা ছবি বের করল।

বাবলি বলল, তোর সঙ্গে আলাপই হল না, আর তুই ছবি কোথায় পেলি?

ঝুমা চোখ নামিয়ে বলল, কলকাতায় এসেছিল সে, আমার পিসতুতো দাদা-বউদির সঙ্গে রোজ সাঁতার কাটতে আসত সুইমিং ক্লাবে। ওখানেই সাঁতার কাটতে গিয়ে দেখা। আমার সঙ্গে জাস্ট ফর্মাল ইনট্রোডাকশান হয়েছে। মাত্র দুদিন ছিল এখানে। কী কাজে যেন এসেছিল। আমার দাদা তো তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ—বলে, বহুদিন এত ব্রিলিয়ান্ট ছেলে চোখে পড়েনি। তাছাড়া ভালো ক্রিকেট খেলে, ভালো ইংরিজি গান গায়; ভালো নাচে। আরও জানিস? কবিতা লেখে?

বাবলি বিরক্তির গলায় বলল, যত ট্র্যাশ। এ যেন রূপকথার রাজপুত্র—কোনও দোষই নেই। এমন হতে পারে না। সবকিছুই এমন বাড়াবাড়ি ভালো বিশ্বাস হয় না। তারপর একটু থেমে বলল, আর দেখতে কেমন? তোর যা নাক-উঁচু, তোর পছন্দ হওয়া তো সোজা কথা নয়। রমেশ মালহোত্রার মতো হ্যান্ডসাম ছেলেকে তুই আত্মহত্যা করিয়ে মারলি; তোর কপালে দুঃখ আছে।

ঝুমা চায়ের কাপে চিনি নাড়তে নাড়তে বলল, দুঃখ নেই, দুঃখ নেই। আমার কপালে এখন দারুণ সুখ। তুই দেখিস। একবার ইম্ফল যাই-ই না। অপারেশনাল ম্যানেজারকে ধরে পড়ে ফ্লাইটটা একবার ম্যানেজ করতে পারলেই, ব্যস-স্। তা নাহলে ছুটি নিয়ে নেব। দরকার হলে চাকরিই ছেড়ে দেব। ইম্ফলে যাবার জন্যে আমি সব করতে পারি। স—ব সব।

তারপরই একটু থেমে বলল, ঝুমা রায় কোনো পুরুষকে চাইলে, সত্যি সত্যিই পেতে চাইলে—সে পুরুষের সাধ্য কি যে তাকে প্রত্যাখ্যান করে?

ঝুমার রূপকথার সেই নায়কের ছবি দেখার কোনো ঔৎসুক্য ছিল না বাবলির। কিন্তু পাছে বন্ধু মনে দুঃখ পায়, তাই আস্তে আস্তে খাম থেকে ছবিটা বের করল বাবলি।

ছবিটা খাম থেকে সম্পূর্ণ বাইরে আসতেই বাবলির হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে গেল। বাবলি দেখল, অভী। কালো-রঙা সুইমিং ট্যাঙ্ক পরে সুইমিং পুলের পাশে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বাবলির হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে গেল দুটি কারণে।

প্রথমত ছবিটি অভীর বলে। দ্বিতীয়ত সুইমিং ট্যাঙ্ক-পরা অভীর পুরুষালি শরীরের চমৎকার গড়ন দেখে। বাবলি অভীর গুণ সম্বন্ধে এত কথা জানত না। আরও জানত না, কখনও জানেনি যে ঢোলা প্যান্ট পরা সাদা-সিধে ক্যাবলা মানুষটার ঝুলঝুলে পোশাকের আড়ালে এরকম একটা শরীর থাকতে পারে। এমন সুগঠিত পা, বুক, এমন কোমর। কোনো পুরুষ মানুষের শারীরিক সৌন্দর্য যে এমন করে ওর মনকে নাড়া দিতে পারে বাবলি তা আগে জানত না। ভাবত, সৌন্দর্য ও সৌন্দর্যর পুজো পাওয়া বুঝি মেয়েদেরই একচেটে।

বাবলি অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। ও কথা বলছিল না।

ঝুমা ওর দিকে তাকিয়ে খুব খুশি খুশি গলায় বলল, কী রে? কী হল?

বাবলি খুব সপ্রতিভতার ভান করে বলল, ভাবছি।

কী ভাবছিস? ঝুমা উদ্গ্রীব হয়ে বলল।

বাবলি বলল, এই একটা সাধারণ চেহারার ছবির মধ্যে তোর মতো মেয়ে কী দেখল এমন ভালোলাগার মতো? পুরুষদের মধ্যে অনেকে যেমন আছে, যারা মেয়েদের শরীর ছাড়া কিছুই বোঝে না, তেমন মেয়েদের মধ্যেও কিছু কিছু তেমনি আছে বইকি! তবে তুই যে কারও সুইমিং ট্যাঙ্ক পরা ছবি বুকে করে বেড়াবি, তা আমি ভাবতেও পারিনি।

ঝুমা এ কথায় দুঃখিত হল।

তারপর বলল, বিশ্বাস কর, এছাড়া আর কোনো ছবি পাওয়ার উপায় ছিল না আমার। তাছাড়া, বিশ্বাস কর, শরীর ব্যাপারটা জাস্ট ইনসিডেন্টাল। কোনো লেখাপড়া জানা মানুষ কি শুধুই অন্য একটা শরীর দেখে ভালোবাসতে পারে কাউকে? হ্যাঁ হয়তো তার সঙ্গে শুতে চাইতে পারে, সেটা নেহাতই শরীরের কামনা। একাধিকবার শুতেও পারে হয়তো; কিন্তু শোওয়া আর ভালোবাসা কি এক? তুই-ই বল।

বাবলি বলল, জানি না। তোর মতো আমি অত জানি না। তবে যাই-ই বলিস আমি তো মানুষটা কেমন জানি না। তবে ছবিতে শুধু চেহারাটাই দেখা যায়, আর তো কিছুই বোঝা যায় না। চেহারাও তোর যোগ্য নয়। রমেশ মালহোত্রা তোর জন্য স্লিপিং পিল খেল, আর তুই এই লোকের জন্য পাগল! ভাবা যায় না। তোকে বুঝতে পারি না।

ঝুমা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল।

বললো, তোকে হয়তো না বললেই ভালো করতাম। হয়তো ছবিটাও তোকে দেখানো উচিত হয়নি আমার। মিরান্ডা হাউসের দিনগুলোর পর অনেকগুলো বছর কেটে গেছে—অনেক বিভিন্ন ঘটনা ঘটেছে তোর ও আমার জীবনে—আমরা বান্ধবী থাকলেও সেই ফার্স্ট ইয়ারের প্রিয় সখী যে আমরা নই, আর তা আমি বুঝতে পারিনি।

এই অবধি বলে ঝুমা বলল, দ্যাখ বাবলি, তুই কখনও আমাকে পুরোপুরি বুঝেছিলি বলে আমার মনে হয় না। তোর বরাবরই হয়তো ধারণা ছিল যে, যেহেতু আমি হাসিখুশি ও চঞ্চল, সুতরাং গভীরতা বলতে আমার মধ্যে কিছুই নেই। তোর এই ভাবনাটা ভুল কী ঠিক তা জানি না। তবে এটা ঠিক যে তুই মিরান্ডা হাউসে যে ঝুমাকে জানতিস, এই ঝুমা সে নয়। সে অনেক বদলে গেছে। তুইও হয়তো অনেক বদলে গেছিস। আজ হয়তো চেষ্টা করেও আমরা একে অন্যকে বুঝতে পারব না।

একটু চুপ করে থেকে ঝুমা আবার বলল, যাক অন্য কথা বল। কী কথা থেকে কী কথায় এসে যাচ্ছিস তুই। এতদিন পরে দেখা হল আর—! তুই কি দিল্লিতেই জয়েন করছিস নাকি?

বাবলি অবাক হয়ে বলল, তোকে কে বলল? তোর বয়ফ্রেন্ড কি তোকে ইম্ফল থেকে জানিয়েছে নাকি আমার সম্বন্ধে?

ঝুমা বিরক্ত হল। বলল, তুই কীরকম গ্রাম্য হয়ে গেছিস? তুই এত জেলাস কেন আমার বয়ফ্রেন্ড সম্বন্ধে? তাও বুঝতাম, তুই যদি বা চিনতিস তাকে। এবং সে যদি সত্যিই আমার বয়ফ্রেন্ড হত।

বাবলি কথা বলল না।

ঝুমা বলল, গত সপ্তাহে ইন্দিরা চাওলা দিল্লি থেকে চিঠি লিখেছিল, তার চিঠিতে সব খবর জানলাম।

বাবলি বলল, চল ওঠা যাক। বলে চায়ের দাম দিতে গেল।

ঝুমা বলল, আমিই দিই। আমিই তো তোকে ডাকলাম।

বাবলি বলল, দে।

বাবলি যেখানে বসেছিল সেখানে এসে বসল। ঝুমা বলল, আমার এখন রিপোর্ট করতে হবে। চলি রে বাবলি। আবার দেখা হবে।

ঝুমা চলে যেতে না যেতেই বাবলির শরীরটা খুব খারাপ লাগতে লাগল। অভীর ছবিটা চোখের ওপর বারবার ভাসছিল। ভাসছিল আর বাবলি ভেতরে ভেতরে শরীরে কী মনে জানে না, কোথায় কী এক দারুণ অস্বস্তি বোধ করছিল। বাবলির তখন খুব ইচ্ছা করছিল যে, ঝুমার কাছ থেকে ছবিটা কেড়ে নেয়। খুব ইচ্ছা করছিল।

ও বসে বসে ভাবছিল, লাউঞ্জের আলোর মধ্যে, ক্ষণে ক্ষণে মাইক্রোফোনের অ্যানাউন্সমেন্টের মধ্যে নানান লোকের নানান কথার মধ্যে বসে বসে বাবলি ভাবছিল, ইচ্ছে তো কত কিছুই করে। জীবনে কটা ইচ্ছেই বা সফল করা যায়? সফল হয়?

সন্ধে হতে দেরি ছিল। এইমাত্র অভী খুজ্‌মার চেকপোস্ট পেরিয়ে এসেছে। কোহিমাতে সামান্য কাজ ছিল। সেই কাজ সারতে এবং খেতে দেরি হয়ে গিয়েছিল একটু।

মেঘের ফাঁকে ফাঁকে সূর্যের লাল আভা দেখা যাচ্ছে। বাঁদিকের পাহাড় ঝরনা-ঘেরা ঘন সবুজ বর্ষণস্নিগ্ধ উপত্যকায় রোদের সোনার আঙুল এসে ছুঁয়েছে।

শীত-শীত লাগছে। অভী বাঁদিকের কাচটা তুলে দিল। কোটের বোতামটা আটকে নিল। তারপর স্টিয়ারিং ধরে বসে এই বিষণ্ণ অথচ আশ্চর্যসুন্দর অপরাহ্ণের মতো এক বিষণ্ণ ও শান্ত ভাবনা বুকের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে করতে ও গাড়ি চালাতে লাগল।

বোয়িং প্লেনটা টারম্যাকের ওপরে দাঁড়িয়েছিল।

দিল্লির ফ্লাইট।

দমদমের আকাশে বেলা পড়ে এসেছিল।

বাবলি স্টারবোর্ড সাইডে একেবারে সামনে জানালার পাশের এক সিটে বসেছিল। বেলা-শেষের ম্লান আলো এয়ারপোর্টের সীমানার পাশের নারকেল গাছের মাথায় কলাগাছের পাতায় লাল টালির ঘরে আলতো করে লেগেছিল। জেট এঞ্জিনগুলো স্টার্ট করাই ছিল। মাটিতে দাঁড়ানো ক্রু। বুড়ো আঙুল তুলে দেখাল। প্লেনটা চলতে শুরু করল। আস্তে আস্তে ট্যাক্সিইং করে মেইন স্ট্রিপের দিকে এগোতে লাগল প্লেনটা। তারপর যশোর রোডের দিকে চলে গিয়ে ফিরে দাঁড়াল।

ভেতরে লাল আলোটা জ্বলছিল সিটবেল্ট্ বাঁধার সঙ্কেত জানিয়ে, রবিশঙ্করের সেতার বাজছিল। এয়ার-হোস্টেস তাড়াতাড়িতে লজেন্স টফি মৌরি এবং তুলো নিয়ে সবশেষে বাবলির কাছে এল। এখন এঞ্জিন দুটো ফুল থ্রটল-এ দিয়ে দিয়েছেন ক্যাপ্টেন। এখুনি টেক-অফ-এর জন্য এগোবে প্লেন।

হঠাৎ এয়ার-হোস্টেসের মুখে চোখ পড়ায় বাবলির ভুরু কুঁচকে উঠল। পৃথিবীর কোনো এয়ার-হোস্টেসকেই বাবলির এখন অনেকদিন যে সহ্য হবে না, একথাটা বাবলি বোধহয় বুঝতে পারেনি। বুঝতে পেরে অস্বস্তি লাগল।

প্লেনটা দেখতে দেখতে মাটি ছেড়ে আকাশে উঠল। ল্যান্ডিং হুইল দুটো আস্তে আস্তে এসে প্লেনের তলপেটে ঢুকে গেল। প্লেনটা একটু উঠে গিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল পশ্চিমে। তারপর সোজা মেঘ ফুঁড়ে উঠতে লাগল।

ইম্ফলের স্মৃতি, নাগাল্যান্ড মণিপুর ডিমাপুরের সব স্মৃতি নিচের সন্ধের বাতিজ্বলা কলকাতা

শহরের লক্ষ লক্ষ কম্পমান উজ্জ্বল বিন্দু এক শরীরে লীন হয়ে, এক আশ্চর্য, আনন্দময় দেয়ালি হয়ে নিচে ছড়িয়ে রইল।

বাবলি সিট-বেল্‌টা খুলতে খুলতে নিচে তাকিয়ে নিজেকে বলল, ও এখনও যথেষ্ট বড় হয়নি। এখনও বেশ ছেলেমানুষ রয়ে গেছে। নিজেকে একটু শাসন করতে হবে।

৪

দিল্লি এয়ারপোর্টের ওপরে যখন প্লেনটা এল তখন আটটা বাজতে দশ।

দেখতে দেখতে প্লেনটা নামতে লাগল। ল্যান্ডিং লাইট দুটো আলোর বন্যা বইয়ে জ্বলে উঠল অন্ধকারে। নিচের টারম্যাকের দু পাশে সারবন্দি রঙিন বাতিগুলো ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসতে লাগল। তারপর সামনের চাকা দুটো মাটি পেল—লাফিয়ে উঠল প্লেনটা। পিছনের চাকাও মাটিতে নামল।

এমন হয় না কখনও বড় একটা। ও পাইলট বোধহয় ঝুমার মতো কোনো এয়ার-হোস্টেসের কথা ভাবছিল।

ব্যাড ল্যান্ডিং—অ্যাবসলুট্‌লি ব্যাড ল্যান্ডিং।

এমন চমৎকার আবহাওয়ার এরকম ল্যান্ডিং হওয়ার কথা নয়। প্লেনটা যখন থেমে দাঁড়াল ডোমেস্টিক লাউঞ্জের সামনে—সিঁড়ি এসে লাগল—যখন প্লেনের দরজা খোলা হল তখনই বাবলি বুঝল বাইরে বৃষ্টি না হলেও ঝড়ের মতো হাওয়া বইছে। গরম হাওয়া। এখুনি ঝড়বৃষ্টি হবে।

দিল্লি এয়ারপোর্টের লবি-করিডর—এসব দেখলে নতুন লোকের তাক লেগে যাবার কথা। ফায়ারব্রিকস-এর দেওয়াল চতুর্দিক ঝকঝক তকতক করছে। এখানে এসে নামলেই মন ভালো লাগে। তাছাড়া, বাবলি দিল্লির মেয়ে বলেও।

কাকা-কাকিমা নিতে এসেছিলেন বাবলিকে।

ওর স্যুটকেসটা এখনও পেতে দেরি। এখানে অবশ্য কনভেয়র বেল্টে করে ঘুরে ঘুরে যায় মালপত্রগুলো। দমদমের মতো নয়—তাই অত বেশি সময় লাগে না।

তবু কাকা-কাকিমার সঙ্গে কফি খেতে গেল বাবলি।

কাকা রসিক লোক—বাবার মতো। কাকিমা রাশভারী গম্ভীর। বাবলি জানে কাকিমা বাবলিকে পছন্দ করেন না। কিন্তু কী করা যাবে? এ পৃথিবীতে সকলের কি পছন্দ হয় সকলকে?

কাকা বললেন—আমার এক বন্ধু আছেন এখানে ইনকামট্যাক্সের কমিশনার। তুই তার কাছে এ দুদিন গিয়ে একটু তালিম-টালিম নিয়ে নে।

বাবলি হাসল। বলল, আহা! আমরা এতদিন মুসৌরিতে নাগপুরে কী করলাম তাহলে?

কাকা হাসলেন। বললেন—কী করলি তা তো আমি জানি। আর যাই-ই করিস কাজ শিখিসনি মোটেই।

বাবলি কপট রাগের সঙ্গে বলল—তোমার অ্যাসেসমেন্ট করলেই বুঝবে কাজ শিখেছি কিনা। তখন ছেড়ে দে ছেড়ে দে বলে তুমি কাঁদতে বসবে।

কাকা হাসলেন। বললেন—এটাই তো তোদের ভুলধারণা। ভালো কাজ শেখা মানেই বুঝি লোকের ওপর অত্যাচার করা? যে ভালো কাজ জানে, সে সবসময় ফেয়ার অ্যাসেসমেন্ট করে। তার অ্যাসেসমেন্ট কখনও আপিলে যায় না এবং আপিলে গেলেও তা সবসময় কনফার্মড হয়। এমনভাবে কাজ করবি যেন কাজে সুনাম হয়। দাদার মুখ রাখিস। বুঝলি বাবি।

কাকিমা বিরক্তির গলায় বললেন—কাজের কথা তো পরেও বলা যাবে। এয়ারপোর্টেই যদি সব কাজের কথা বলে শেষ করবে তাহলে আমাকে আনা কেন?

কাকা লজ্জা পেয়ে বললেন, সরি! সরি! বল বাবলি। ইম্ফল কেমন দেখলি?

বাবলি বলল—দারুণ। আর শুধুই ইম্ফল? নাগাল্যান্ড গিয়েছিলাম—জানো?

কাকা অবাক হলেন। বললেন—কই? যাওয়ার কথা ছিল না কি?

—না। কথা ছিল না। ওয়েদারের জন্য ইম্ফলের ফ্লাইট পর পর চার-পাঁচ দিন ক্যানসেল হল। তারপর এয়ার ইন্ডিয়ার পাইলটদের স্ট্রাইক। পরে অবশ্য স্ট্রাইক ভেঙে গেল। নইলে আর এলাম কী করে? রিস্‌ক না নিয়ে মেসোমশাই একজন এসকর্ট ঠিক করে আমাকে মন্টিমামার বাগানে পৌঁছে দেবার বন্দোবস্ত করেছিলেন। ইম্ফল থেকে কোহিমা—তারপর ডিমাপুর। ডিমাপুর থেকে বাগান অবধি ট্রেন—তারপরে দমদমে মন্টিমামাদের কোম্পানির প্লেনে বাগান থেকে।

কাকা কফির কাপটা নামিয়ে রাখতে রাখতে বললেন—বুঝলাম! কিন্তু এসকর্টটি কে? কোনো নাগা সন্ন্যাসী নাকি?

—অ্যাই অসভ্য! বলে বাবলি বকল কাকাকে।

কাকিমা বললে, তোর কাকুর বরাবরই কথাবার্তা ওরকম। কার সঙ্গে কী বলবে তার কোনো বাছবিচার নেই।

কাকা বললেন—কথাটা ঘুরে যাচ্ছে। বললি না তো বাবলি এসকর্টটি কে?

বাবলি বলল, আরে না। নাগা-ফাগা নয়। একেবারে সাদামাটা একজন ক্যাবলা-ট্যাবলা বাঙালি ভদ্রলোক—মেসোমশাইয়ের অফিসেই আছেন।

কাকা ঘুরে বসে বললেন—দাঁড়া দাঁড়া আমার বন্ধু বাণীরূপের ভাই আছে ওখানে—অভীরূপ। অভী—সে নয়তো? তোর মেসোমশাইয়ের অফিসেই আছে।

বাবলি এবার বেশ ঘাবড়ে গেল। নার্ভাস-নার্ভাস লাগল ওর।

ঐ ক্যাবলা লোকটাকে সকলেই এক নামে চিনে ফেলবে তা কি ও ভেবেছিল?

বাবলি ঢোঁক গিলে বলল—সে ভদ্রলোকের নামও তো অভী। জানি না তোমার বন্ধুর ভাই নাকি? পৃথিবীতে তো সব জায়গায় তোমার একজন করে বন্ধু আর তার ভাইদের রেখেছ। আমি কি করে জানব? কী একটা নাম? অভী। তা কি দুজনের হতে পারে না?

কাকু এবার উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

বললেন—তোর এসকর্ট যদি সেই-ই হয় তাহলে তোর অনেক জন্মের তপস্যার ফল রে বাবলি—বুঁচি। বহুদিন ওরকম ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র কেউ বেরোয়নি তা জানিস? লন্ডনের স্কুল অব ইকনমিক্স থেকে?

বাবলির একবার মনে হল মাথা ঘুরে পড়ে যাবে ও।

প্রতিবাদ করে ও বলল—এ তাহলে অন্য কোনো অভী হবে। এ বিলেত-ফিলেত যায়নি। একেবারে ক্যাবলা গণেশ গো কাকু। এ সে হতেই পারে না। তাছাড়া, লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স থেকে পাশ করা ছেলে ইম্ফলে পচতে যাবে কেন?

কিন্তু কাকা ছাড়বার পাত্র নন।

ইতিমধ্যে মাল এসে পৌঁছনোর খবর অ্যানাউন্সড হয়েছে।

ওরা সকলে উঠে সেদিকে এগোল।

কাকু আবার বললেন—কেমন দেখতে বলতো?

বাবলি বলল—ভীষণ আনইমপ্রেসিভ চেহারা। তারপর বলল, এরকম এরকম দেখতে।

সব শুনে কাকা বললেন—করেছিস কী? অভীকে দিয়ে গাড়ি চালিয়ে তুই ত্যাণ্ডাই-ম্যাণ্ডাই করে বেড়িয়েছিস? ওর পা-ধোয়া জল নিয়ে এলি না কেন এক ঘড়া। সকাল-বিকেল খেলে তোর মগজ খুলত। অভীকে আমি ছোটবেলা থেকে চিনি। ওর সবচেয়ে বড় গুণ যে ও একেবারে আন অ্যাসুমিং, ওকে দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। কোনো এয়ার-ফেয়ার নেই নিজের সম্বন্ধে। একেবারে খাঁটি ছেলে। তুই জানিস না, ও কত বড় গর্ব আমাদের। যাক, তোর এই অ্যাচিভমেন্টটা তোর আই আর এস-এ সাকসেসফুল হওয়ার অ্যাচিভমেন্টের চেয়েও বড়।

কোন অ্যাচিভমেন্ট?

বিস্ময়ে শুধোল বাবলি।

এই অভীর সঙ্গে ত্যাণ্ডাই-ম্যাণ্ডাই করার অ্যাচিভমেন্ট।

কাকিমা এতক্ষণে কাকার কথায় মজা পেয়েছেন। উনি হাসছিলেন।

বললেন—অভীকে আমিও চিনি। তুই যা মেয়ে তাকেও ছাড়িসনি বোধহয়—নাকানি-চোবানি খাইয়েছিস নিশ্চয়ই।

বাবলি একেবারে চুপসে গিয়েছিল। বলল—আরে না না। আমি কি সকলের সঙ্গে ইয়ার্কি মারতে পারি নাকি? তারপর চিনি না জানি না। কী যে বলো তুমি কাকিমা।

কাকিমা বললেন—কী জানি! তোকে কিছুই বিশ্বাস নেই।

মালপত্র কালেক্ট করে এয়ারপোর্ট থেকে ওরা যখন বেরোল তখন বাইরে জোর বৃষ্টি হয়ে আবহাওয়া বেশ ঠান্ডা হয়ে গেছে। দিল্লি এয়ারপোর্টের সামনেটাতেই ভীষণ জল জমে। ঐ জায়গাটা সাবধানে পেরিয়ে কাকা গাড়ির স্পিড বাড়ালেন।

হু হু করে হাওয়া আসছিল—ঠান্ডা। বাবলি সামনের সিটে কাকার পাশে বসেছিল। কাকিমা পিছনে বসেছিলেন।

কাকা-কাকিমা কীসব টুকরো-টাকরা কথা বলছিলেন। বাবলির কানে যাচ্ছিল না। বাবলি মনে মনে অনেক দূরে চলে গিয়েছিল।

বাবলির মনের চোখে ভেসে উঠছিল সেই নাগা পাহাড়ের কাঠুরের ঘর। সেই ভয়; সেই ঠান্ডা। সেই সবকিছু মনে পড়ে যাচ্ছিল আর চোখের সামনে ভেসে উঠছিল কাঠের আগুনের সামনে বসে থাকা, একটি ছেলেমানুষ, সরল, আন্তরিক; দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন চিন্তিত মুখ। বাইরের অন্ধকারে পাশ-ফেরানো-মাথা-ভরা এলোমেলো চুলে-ভরা একটি শিশুসুলভ মুখ।

পুরোনো দিল্লির ভাঙা দুর্গ-টুর্গ তোরণ-টোরণগুলোর মধ্যে অন্ধকারে ভিজে-হাওয়াটা শিস্ তুলছিল। বাবলির বুকের মধ্যেও কীসের যেন শিস্ উঠছিল।

বাবলি জানে না, বাবলি কী করবে? কী ওর করা উচিত? ভয়ে, আনন্দে, অনুশোচনায় বাবলির গলা শুকিয়ে আসতে লাগল।

হঠাৎ কাকিমা বললেন, কাল সকালে একবার কালীবাড়ি যাব ভাবছি। তুই যাবি বাবলি? না। তুই তো আবার মেমসাহেব।

বাবলি ভগবান-টগবান মানে না। বাবলি বরাবরই বলে, ট্র্যাশ। এমনকি এ পর্যন্ত কোনো পরীক্ষা দেওয়ার সময়ও কোনো ঠাকুর দেবতার ছবিকেও প্রণাম করে যায়নি বাবলি।

কিন্তু বাবলি বলল, বেশ তো কাকিমা। যাব তোমার সঙ্গে। পরশুদিন নতুন জীবন আরম্ভ হবে—নতুন চাকরি। একবার না হয় তোমার সঙ্গে যাবই—তোমার যখন এতই ইচ্ছা।

কাকা স্টিয়ারিং ধরে হেডলাইট জ্বালানো পথে সামনে চেয়েছিলেন। বাবলির এই কথায় হঠাৎ চকিতে মুখ ঘুরিয়ে বাবলির দিকে তাকালেন।

তাকিয়েই আবার রাস্তার দিকে মুখ করলেন।

বাবলি বলল, কী কাকু, কী হল?

কাকা একটা মোড় নিতে নিতে বললেন, কিছু হয়নি, কিন্তু হতে পারে!

কাকিমা চোখে রাতে ভালো দেখতে পান না—কোনোদিনই না—বললেন, কী গো? রাস্তায় কোনো গোলমালের কথা বলছ?

কাকা হেসে উঠলেন হো হো করে।

বললেন, গোলমাল! তবে রাস্তায় নয়, একেবারে ঘরের মধ্যেই মনে হচ্ছে। কেস খুব গড়বড়।

বাবলি যেন কিছু বুঝতে পারেনি এমনভাবে বলল, কাকুমণি তুমি কখন যে কী বলো, আর কী ভেবে কী বলো, তুমিই জানো। তোমার এই হেঁয়ালি-হেঁয়ালি কথা থামাও তো। তাড়াতাড়ি বাড়ি চলো। আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে।

কাকা আবার হাসলেন। বললেন, খিদে আমারও পেয়েছে। বলেই সুর করে নাকি নাকি গলায় বললেন, হাঁউ-মাউ-খাঁউ, চেনা মানুষের গন্ধ-পাঁউ।

বাড়ি পৌঁছে সোজা নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করল বাবলি।

কাকিমাকে বলল, কাকিমা সেই ভোরবেলা চা-বাগানে চান করে বেরিয়েছি। ঘেন্না করছে। ভালো করে চান করব। চান করে তারপরে খেতে বসব। তুমি কিষাণ সিংকে খাওয়ার ঠিকঠাক করতে বলো।

ঘরে ঢুকেই বাবলি আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে ধিক্কার দিল বাবলি। আয়নায় ওর পাশে ও ঝুমার চেহারাটা কল্পনা করে নিল। কল্পনায় ওর পাশে ঝুমাকে দেখে ও লজ্জায় মরে গেল। ছিঃ ছিঃ, কি বিচ্ছিরি ফিগার বাবলির। আর মুখশ্রীই বা কি। তাকানো যায় না। ঈ-শ-শ!

এই প্রথম, প্রথমবার জীবনে, সে নিজে সুন্দরী বলে যা বোঝায় তা নয় বলে, তার ফিগার ভালো নয় বলে বাবলি আক্ষেপ করল। আজ এই মুহূর্তে ও জানতে পারল, মেয়েদের আর যে গুণই থাক, চিত্রাঙ্গদা হলে, মেয়েলি মেয়েসুলভ সৌন্দর্যর অধিকারী না হলে, অর্জুনরা, কোনো অর্জুনই তাদের মুখে নারীকে আবিষ্কার করতে পারে না।

এই-ই প্রথম জীবনে প্রথমবার বাবলি হেরে যাবার, ফেল করার ভয় পেল। এ পরীক্ষায় যে ওর কখনও বসতে হবে, তা ও বুঝতে পারেনি। স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। ও কি জানত যে, পৃথিবীর সমস্ত মেয়েকেই এই মেয়েলি পরীক্ষায় কোনো-না-কোনো সময় বসতেই হয়।

অভীর অনেক রাত হয়ে গেল ইম্ফলে। পৌঁছতে পৌঁছতে।

অত রাতে ও আর বাবলির মেসোমশাইয়ের বাড়িতে গেল না। ডিমাপুর থেকে বেরিয়েছিল সকাল চারটেতে, এখন প্রায় রাত এগারোটা বাজে। এই ছোট্ট শহরে রাত এগারোটা অনেক রাত।

বাড়ি ফিরে গাড়ি গ্যারাজ করে, ও বাড়ি ঢুকেই সোজা টেলিফোনের কাছে গেল। তারপর কী মনে করে, দেরাজ খুলে গেলাসে একটা বড় হুইস্কি ঢেলে, জল নিয়ে, একটা বড় চুমুক লাগিয়ে, এসে ফোন তুলল।

ফোনটা অন্য প্রান্তে বাজছিল।

কুরর্-কুরর্—কুরর্ করে। কোনো প্রোষিতভর্তৃকার কাছে স্বামীর খবর বয়ে নিয়ে আসা কোনো রূপকথার পাখির মতো ফোনটা ডাকছিল।

অনেকক্ষণ পরে বাবলির মাসি ফোন তুললেন, কী যেন চিবোচ্ছিলেন উনি। বললেন, হ্যালো!

আমি অভী বলছি।

মশলা চিবোতে চিবোতেই বউদি বললেন, অভী। বাবা বাঁচালে। এত চিন্তায় ছিলাম না আমরা। তোমরা নাকি পথে গাড়ি খারাপ হয়ে নাগাপাহাড়ে ছিলে এক রাত? কী ডেঞ্জারাস ব্যাপার।

অভী অবাক হল। বলল, এ খবর ইতিমধ্যেই এখানে পৌঁছল কী করে?

তোমার দাদা যে আজ সকালে আটটার সময় ডিমাপুরে ট্রাঙ্ককল করেছিলেন। ঐ দস্যিমেয়েই নিশ্চয় জোর করে তোমাকে সেদিনই যেতে বলেছিল ডিমাপুর? নইলে তোমাকে তো তোমার দাদা বারবার বলে দিয়েছিলেন কোহিমায় নাইট স্পেন্ড করতে। কী যে করো না তোমরা? তোমরা দুজনেই সাফিসিয়েন্টলি গ্রোনআপ। তোমাদের কাছ থেকে আরও একটু গুড সেন্স আশা করেছিলাম।

এমন সময় ফোনের পাশ থেকে বড়সাহেবের গলায় স্বর শোনা গেল।

—আমায় দাও।

অমনি বউদি বললেন, নাও, তোমার দাদার সঙ্গে কথা বলো।

বড়সাহেব ফোনটা হাতে নিয়েই বললেন, অভী, তুমি নিশ্চয়ই খুব টায়ার্ড। পোর ইয়োরসেলফ আ স্টিফ ড্রিঙ্ক, হ্যাভ আ নাইস হট বাথ, ভালো করে খাওয়া-দাওয়া করো। অ্যান্ড দেন গো টু বেড।

তারপর একটু থেমে বললেন, কাল অফিসে কথা হবে। গুড নাইট।

অভী জানে বড়সাহেব কাল অফিসে কী কথা বলবেন তাকে।

ফাঁকা ঘরে পাইপটা ধরিয়ে উনি বলবেন, কনগ্রাচুলেশনস। উ্য আর এ ফাস্ট ওয়ার্কার।

অভী বাজি ফেলতে পারে এ বিষয়ে।

সোফায় বসে পড়ে হুইস্কির গেলাসে আরেকটা বড় চুমুক দিয়ে অভী ভাবল এইজন্যই এত উন্নতি হয়েছে ভদ্রলোকের। এই সময় ঐ ভদ্রমহিলার হাত থেকে অভীকে উনি না বাঁচালে ঠায় এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর প্রলাপ শুনতে হত। সত্যি, মেয়েরা টেলিফোনে বিনা কারণে এত বেশি কথা কেন যে বলে, তা কি কেউ জানে? এর কি কোনো ওষুধ নেই?

হুইস্কিটা শেষ করে উঠে গিয়ে অভী গরম জলের শাওয়ারের নিচে দাঁড়াল। হিম হিম বর্ষার রাতে। ইম্ফলে।

দিল্লিতে চান শেষ করল বাবলি। বাবলির গা দিয়ে সাবানের গন্ধ বেরোচ্ছিল। বেডরুমের দরজা বন্ধই ছিল। পেলমেটের নিচে পর্দাও। বাবলি কিছু-না-পরে এসে আয়নার সামনে দাঁড়াল। ভালো করে পাউডার মাখল সারা গায়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। তারপর ভিতরের জামা প্যান্টি, সায়া পরা হয়ে গেলে একটা হালকা সাদা-কালো ফুল-ফুল ছাপা শাড়ি পরল বাবলি।

কেন জানে না। বাবলির খুব ভালো লাগছিল। উড়তে ইচ্ছা করছিল বাবলির পাখির মতো।

৫

গতকাল অফিসে জয়েন করেছে বাবলি।

দিল্লির মথুরা রোডে সেন্ট্রাল রেভিন্যু বিল্ডিংসয়ে বাবলির অফিস।

লম্বা করিডরের দুপাশে সারি সারি ঘর। বাবলির ঘরের সামনে ছোট বোর্ড ঝুলছে বার্নিশ করা। তার ওপরে সাদায় লেখা—মিস বি সেন, আই আর এস।

সেদিন তিন-চারটে হিয়ারিং ছিল।

বেশ নার্ভাস লাগছিল বাবলির। কথা খুব কম বলছে। ব্যালান্সশিট ও প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট দেখে দেখে যা যা ডিটেইলসয়ের দরকার নিয়েছে। ধারের জন্য কনফার্মেশন লেটারস ব্যাঙ্কের ওভারড্রাফট-এর লিমিটের চিঠি। গ্রস মুনাফার স্টেটমেন্ট। সানড্রি ডেটরস, সানড্রি ক্রেডিটরস-এর লিস্ট পারচেজ ও সেলের লিস্ট—পঁচিশ হাজার টাকার উপর। ইত্যাদি ইত্যাদি।

উকিলদের মুখ দেখে বাবলি পরিষ্কার বুঝতে পারছে যে, তাদের মুখে একজন আকাট রংরুটের সামনে যে তারা বসে আছেন এ ভাব পরিস্ফুট।

বাবলি মনে মনে হেসেছে। বলেছে, কিছুদিন যাক। ও কাজ পিক-আপ করে নেবে। ওর আশপাশের ঘরে অনেক প্রমোটি অফিসার আছেন, বয়সে বড়। ভালো কাজ জানেন। ও আই আর এস ডাইরেক্ট রিক্রুট—তাই ওদের অনেকের চেয়ে ও সিনিয়র, কারণ ও ক্লাস-ওয়ান হয়েই জয়েন করেছে। ও জানে ডিপার্টমেন্টে বেশ একটা মনোমালিন্য আছে এ ব্যাপারে। কিন্তু সেটা ওর দোষ নয়—নিয়মের দোষ।

মাঝে মাঝে ওর মনে হয়েছে যে এইরকম প্রকারভেদ করাটা অন্যায়। তাই প্রত্যেক সিনিয়র অথচ ক্লাস-টু অফিসারের সঙ্গে যথেষ্ট সম্মানের সঙ্গে ব্যবহার করেছে ও। ও জানে, কাজ শিখতে হলে এঁদের সাহায্য ওর দরকার হবে।

ওর অফিসের যিনি বড়বাবু, বয়স্ক একজন টাকমাথা ভদ্রলোক—হরিয়ানার ভদ্রলোক। তাঁকে দেখে, কথাবার্তা শুনে বাবলির মনে হয়েছে যে তিনি বাবলিকে নিয়ে খুব খুশি। কার্যত তিনিই এখন থেকে অফিসার—কারণ এই অল্পবয়সি বাঙালি মেয়েটি এখনও কাজ কিছুই জানে না। তিনি যা ইচ্ছে করবেন তাই বাবলিকে দিয়ে সই করিয়ে নেবেন। বাবলি তাই প্রথম থেকেই সাবধানে আছে কিছু না-বুঝে না-জেনে সই করবে না।

আজ সকালেই একটা রিফান্ড অর্ডার সই করাতে এনেছিলেন উনি। চল্লিশ হাজার টাকার। বাবলি ভাবল, এত বড় রিফান্ড অর্ডার সই করবার জন্য এত সকালে ভদ্রলোকের এত তাড়াহুড়ো কেন? বাবলি বলল, পরে হবে। ফাইল টাইল দেখে নেব একবার।

বড়বাবু বললেন, কমিশনার বলেছেন রিফান্ড ফেলে রাখা চলবে না।

বাবলি বলল, তা হোক।

বাবলি জানত না যে চাকরির দ্বিতীয় দিনেই একরকম নাজেহাল হবে।

একটু পরে ইন্সপেকটিং অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার তাকে ডেকে পাঠালেন। ভদ্রলোক গুজরাটি, ভীতু ভীতু চেহারা। একরকমের চেহারা হয় না, যাদের দেখলেই মনে হয় চাকরি রাখতেই বেচারারা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন; জীবনের অন্য কোনো দিকে কোনো বিষয়ে আর কোনো ঔৎসুক্য অবশিষ্ট নেই। সেরকম।

ভদ্রলোকের মেজাজ রুক্ষ। বোধহয় স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা নেই অথবা কোষ্ঠকাঠিন্যে ভোগেন।

উনি বললেন, আপনি কীসের জন্য রিফান্ড ভাউচার সই করেননি? কমিশনারের কাছে অ্যাসেসির উকিল কমপ্লেন করেছেন। আপনি কি মনে করেন আপনি নিজের টাকা দিচ্ছেন অ্যাসেসিকে?

বাবলি আমতা আমতা করল।

বলল, তা নয়। আমি ফাইলটা দেখে নিয়ে দিতে চাই—একটু সময় লাগবে স্যার।

উনি বললেন, আমি বলছি ম্যাডাম এখুনি দিয়ে দিন।

বাবলি বলল, তাহলে আপনি লিখিত অর্ডার দিন স্যার।

ভদ্রলোক অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন। বললেন, আপনার সাহস তো কম নয়। কাল জয়েন করেই

তো অনেক কথা শিখেছেন। অত কথায় কাজ নেই। এখুনি দিতে বলছি, দিন। লিখিত অর্ডার পাবেন না।

বাবলি বলল, তা হলে সময় লাগবে। ফাইল না দেখে আমি দেব না।

ভদ্রলোক এবার চুপ করে গেলেন।

বললেন, আপনি যেতে পারেন।

বাবলি ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই বুঝল কাজটা ভালো করেনি। কারণ ইনিই বাবলির কনফিডেনশিয়াল রিপোর্ট লিখবেন, যার ওপর ওর উন্নতি নির্ভর করবে। কিন্তু বাবলি মনে মনে বলল, যা হবে, তা হবে। নিজে লিখে দেবেন না, খালি টেলিফোনে আর মুখে মুখে ছড়ি ঘোরাবেন—তাতে হবে না। রিফান্ড অর্ডার সই করবে বাবলি, পরে কোনো গোলমাল হলে এ-জি অডিট ধরবে তাকে—। ঝামেলা হলে বাবলিরই হবে। ওঁদের কী?

বাবলির সহকর্মীরা সকলেই বলছিলেন যে অফিসারদের কাজ করার ইচ্ছা প্রায় সবই নষ্ট হয়ে গেছে গুচ্ছের রিপোর্ট-রিটার্নের ঝামেলায় আর এই অডিটের মাতব্বরিতে। বেশিরভাগ রিটার্নই ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলা যায়। তা সরকারের পয়সা। নষ্ট হয় অফিসারদের আত্মবিশ্বাস, করদাতাদের বিশ্বাস সরকারের ওপর। এ সময়ে আসল কাজ করলে অনেক কাজ করা যেত।

বাবলি মনে মনে ভাবে, (যেমন সমস্ত তরুণ অনভিজ্ঞ লোকই নির্দ্বিধায় ভাবে যে) সে নিজের হাতে হাল ধরলে, যখন ও উঁচু পদে যাবে তখন এসব অব্যবস্থা ঠিক করে দেবে।

কিন্তু দুদিনেই বাবলি বুঝতে পারছে যে সরকারি চাকরিতে নিজের কর্মদক্ষতা, নিজের স্বাধীনতা, নিজের মতামত নিয়ে টেঁকা যায় না। একটা বিরাট মেশিনের, যে মেশিনের কোনো কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতা নেই, কিছু উৎপাদনের ক্ষমতা নেই, তার একটা ছোট্ট অনামা যন্ত্র হিসেবে তাকে সারাজীবন এখানে সেঁটে থাকতে হবে। মাসান্তে কিছু টাকার জন্য।

দুদিনেই বাবলির ঘেন্না হয়ে গেছে এই চাকরির ওপর।

এখন ওর এই-ই জীবন। অফিস করে। বাড়ি আসে। বাড়ি ফিরে ভালো করে গা-ধোয়, তারপর কাকা-কাকিমার সঙ্গে জমিয়ে বসে চা খায়। তারপর নিজের ঘরে অথবা দোতলায় বারান্দায় বসে থাকে আলো নিভিয়ে।

দিল্লিতে এই জুন-জুলাই মাসটাই সবচেয়ে খারাপ। এমন ভ্যাপসা গরম পড়ে যে সে বলার নয়। অবশ্য বৃষ্টি হলেই খুব প্লেজেন্ট।

ওদের বাড়ি হাউজ-খাস এনক্লেভে। বারান্দায় বসে দূরের ফাঁকা জমি, পোড়ো-বাড়ি চোখে পড়ে। ও যখন ছোট ছিল, তখন এতসব বাড়ি হয়ে যায়নি চতুর্দিকে। বিকেলে রুক্ষ মাটি আর পাথুরে জমিতে গজিয়ে-ওঠা নানান গাছ গাছগাছালির আড়াল থেকে তিতিরের ডাকা শোনা যেত—যখন সন্ধে হয়ে আসত। বেশ নিরিবিলি ছিল তখন এই অঞ্চলটা।

মনে পড়ে যায়, ও যখনই একা থাকে তখনই মনে পড়ে যায় অভীর কথা। বারান্দায় অন্ধকারে বসে প্রায়ই অভীর কথা ভাবে বাবলি। বেশ খারাপ আছে অভী। এতদিন হয়ে গেল একটা চিঠি লিখতে পারল না ওকে। ওযে লিখতে পারত না, তা নয়। কিন্তু ওর লজ্জা লজ্জা করে। লজ্জা করাটা মেয়েদের ধর্ম। মেয়েদের স্বভাব। লজ্জা ভাঙাটা পুরুষদের কর্তব্য। তা-ই প্রথম চিঠি অন্তত অভীই লিখতে পারত। পত্রালাপের সূত্রপাত ঘটলে তারপর বাবলি কিপ্‌আপ করত।

কে জানে? ঝুমা দেবী ইতিমধ্যেই তার কুহকজাল ছড়িয়েছেন কিনা অভীর ওপর। ওসব মেয়ে সব পারে। ওদের কাজই এই। ভালো ভালো ছেলের মাথা খাওয়া। বাঘিনীর মতো এক এক করে মাথা খেয়ে ওরা নম্বর গোনে। গতযৌবনা হয়ে গিয়ে বারান্দার মোড়ায় বসে পায়ের ওপর পা তুলে

যৌবনে ওরা কতজনের মাথা চিবিয়ে খেয়েছিল, কতজনকে পাগল করেছিল, কতজন ওদের জন্য আত্মহত্যা করেছিল, কতজনের ঘর ভেঙেছিল ওরা তার হিসাব করে।

বাবলি জানে না ওরা কী চায়? বোধ হয় ওদের পুরুষ ভোলানোর ক্ষমতা বারংবার প্রয়োগ না করলে ভোঁতা হয়ে যায়; মরচে পড়ে যায়। তাই বোধহয় ওরা কোনোসময় নিশ্চেষ্ট থাকতে পারে না।

গতকাল বাবলি ইন্দিরা চাওলাকে ফোন করেছিল। ও দিল্লি ইউনিভার্সিটিতে ইতিহাস পড়াচ্ছে। ইন্দিরার সঙ্গে ঝুমার যোগাযোগ আছে। ইন্দিরাই বলছিল যে, ঝুমা ইম্ফল যাবে বেড়াতে। সামনের মাসে গিয়ে নাকি পনেরো দিন থাকবে। জায়গাটা নাকি চমৎকার লাগে ওর।

বাবলি কী করবে জানে না। ও কি অভীকে সত্যিই ভালোবেসে ফেলেছে? ভালোবাসা মানে কী ? কারও জন্য মন খারাপ হওয়া? কাউকে বারবার মনে পড়া? কারও সঙ্গে নিজের মতের মিল হওয়া, নিজের রুচির মিল, শখের মিল হওয়া? জানে না, বাবলি তা জানে না।

তবে বাবলি এ কথা বোঝে, ঝুমার সঙ্গে দমদম এয়ারপোর্টে দেখা না হলে, কাকা অভীর এত প্রশংসা না করলে, অভীর প্রতি তার যে দুর্বলতা জন্মেছিল সেটা ও ভুলে যেতে পারত। অভীকে ছেড়ে এসে আউট-অফ-সাইট, আউট-অফ মাইন্ডে বিশ্বাস করবে ভেবেছিল। কিন্তু সে বিশ্বাস আর রইল না। চোখের বাইরে সে থাকতে পারে কিন্তু মনের বাইরে সে নেই; মনের মধ্যে সব সময়ই ঘোরে ফেরে।

ভিতর থেকে খাওয়ার ডাক এল। বাবলি খাওয়ার ঘরে গিয়ে যে চেয়ারে ও রোজ বসে, সে চেয়ার টেনে বসল।

কাকা পায়জামা পাঞ্জাবি পরে এলেন চানটান করে। গল্পগুজব করতে করতে খাওয়া শেষ হলে কাকিমাকে কাকা বললেন, আমার সিগারেটের একটা প্যাকেট বের করে আনো তো ড্রয়ার থেকে, শোওয়ার ঘরের।

কাকিমা উঠে যেতেই কাকা চোখ বড় বড় করে বললেন, কী খাওয়াবি বল্?

বাবলি অবাক হল। বলল কেন? কীসের জন্য?

কাকা বললেন, অভী আসছে তিন দিনের জন্য দিল্লিতে। দিল্লি ইউনিভার্সিটির একটা সেমিনারে। অগাস্টের প্রথম সপ্তাহে। এখনও দু মাস।

তারপরই বললেন, কী বুঝলি।

বাবলি মুখের ভাব একইরকম রেখে বলল, আসছে তো আসছে তোমার বন্ধুর ভাই আসছে তাতে তুমি উল্লসিত হও। আমার তাতে কী?

কাকা, কপট বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, সে কি রে, তোর কোচোয়ান আসছে, তোর বডিগার্ড —তোর এত দেখাশোনা করল আর তুই নেমন্তন্ন করবি না।

বাবলি বলল, তুমিই তো আমার গার্জেন। নেমন্তন্ন করলে তুমিই করবে।

কাকা বললেন, আমিই গার্জেন। তাহলে বেশ। এ কথাটা ভবিষ্যতে মনে করে রেখো। গার্জেনের পারমিশন ছাড়া এক পা এদিক-ওদিক করেছ তো পা ভেঙে দেব।

বাবলি আনন্দে, লজ্জায় সব কিছু মিলিয়ে হেসে উঠল। বলল, হ্যাঁ, পা ভাঙতে দিচ্ছি তোমাকে।

পরদিন বাবলির কাছেও চিঠি এল বাবলির মাসির, ইম্ফল থেকে।

উনি লিখেছেন :

বাবলি,

অভী দিল্লি যাচ্ছে। তিনদিন থাকবে। ওকে একদিন ভালো করে নেমন্তন্ন করে খাওয়াস। তোর

জন্য এত কিছু করেছে ও। তুই তো কম জ্বালাসনি। ওর সঙ্গে নিমেষ (কাকার নাম) আর বাণীর (কাকিমার নাম) জন্য দুটো মণিপুরি খেস্ পাঠাচ্ছি। ওদের বলিস, মাঝে মাঝে চিঠি দিস না কেন? তোর যে কী স্বভাব বুঝি না। যখন কাছে থাকিস, তখন তো সব সময় গলায় ঝুলে থাকিস। মনে হয় আমায় না দেখলে একদিনও বুঝি বাঁচবি না। আর চোখের আড়াল হলে মনে করার উপায় থাকে না যে একসময় মাসি বলে কাউকে চিনতিস!

—ইতি রূপু মাসি।

বাবলি চিঠি পড়ে মনে মনে লজ্জিত হল। সত্যিই ওর বড় দোষ। চিঠি লিখতে যেন জ্বর আসে গায়ে।

অগাস্টের প্রথম সপ্তাহ। দু মাস বাকি আছে এখনও।

বাবলি একটা দারুণ কাজ করল। কাকাকে ধরে কাকার এক বন্ধুর মাধ্যমে (যিনি দিল্লি জিমখানা ক্লাবের মেম্বার) জিমখানা ক্লাবে টেনিস খেলার বন্দোবস্ত করে ফেলল, তাঁর গেস্ট হিসাবে।

কাকা খুশি হলেন। কাকিমা খুশি হলেন না। বললেন, যখন খেলাধুলার বয়স ছিল, তখন ঘরে বসে বই পড়েছিস, এখন বুড়ো বয়সে হাত-পা ভাঙার দরকাব কী?

যে, যাই-ই বলুক, বাবলির স্বভাব নয় নিজের অমতে চলা কী অন্যান্য কারোরই মতামত গ্রাহ্য করা। তাই সে ছুটির দিনে অনেকক্ষণ এবং উইকডেজ-এ সকালে রোজ এক ঘণ্টা করে টেনিসখেলা শুরু করে দিল। মার্কারের সঙ্গে খেলত। বেশ লাগত। সকালের রোদে দৌড়াদৌড়ি করে খেলতে—হার্ড-কোর্টের মোরামের গন্ধ, টেনিস বলের গন্ধ, হাওয়াতে বেড়ার ধারের লতানো ফুলের ভেসে আসা সব গন্ধ এসব মিলে ভারী ভালো লাগতে লাগল বাবলির। দুঃখ হল, এতদিন কোনো খেলাধুলা করেনি বলে।

এক মাস পরেই নিজের ঘরে নিজেকে অনাবৃত করে দেখল, বাবলির চেহারায় সূর্যের আশীর্বাদ লেগেছে। কলারবোনের কাছে, দু বুকের ওপর দিকটা—ঘাড়, গলা সব রোদে পুড়ে বাদামি হয়ে গেছে। বাদামি হয়ে গেছে পায়ের নিচে পায়ের যে অংশটুকু অনাবৃত থাকে।

বাবলির সমস্ত শরীরে মনে একটা নতুন পুলক লেগেছে। শুধু বসে থাকতে বা দাঁড়িয়ে থাকতে বা শুয়ে থাকতেই যে এত আনন্দ, যারা কখনও খেলাধুলা করেনি, তারা বোধহয় কখনও জানেনি।

বাবলির ওজন কমে গেছে এক কেজি দু সপ্তাহেই। খেলার সঙ্গে সঙ্গে ডায়াটকন্ট্রোলও করেছে ও। পুরো দু মাস খেলার পর মার্কার গ্যারান্টি দিয়েছে পাঁচ কেজি কমে যাবে।

মুখে বেশি মাংস থাকলে মানুষের মুখের অভিব্যক্তি নষ্ট হয়ে যায়।

আশ্চর্য! বাবলি এতদিন এসব নজর করে দেখেনি।

রোজ সকালে ক্লাবে খেলে, তারপর ক্লাবেই চান করে জামাকাপড় পরে বাবলি যখন ওখান থেকেই সোজা অফিস যেত, তখন দারুণ ফ্রেশ লাগত বাবলির। চন্‌চন্ করে খিদে পেত। সমস্ত শরীর হালকা হালকা মনে হত।

অফিসে পৌঁছে সকাল-সকাল ক্যান্টিন থেকে টোস্ট আর ডিম আনিয়ে খেত। লাঞ্চে বাড়ি থেকে কাকিমা কিষান সিংকে দিয়ে খাবার পাঠাতেন। হট্ কেসে করে।

বাবলির দিনগুলো এমনি করে হইহই করে হেসেখেলে কাজ করে কী করে যে কেটে যাচ্ছিল তা বাবলি জানে না।

বাবলি এখন কিছুই জানে না। জানতে চায় না। বাবলির সমস্ত মন এখন উন্মুখ হয়ে চেয়ে আছে ক্যালেন্ডারের দিকে। অগাস্টের তিন তারিখটা ও সবুজ পেনসিল দিয়ে রাঙিয়ে রেখেছে ওর অফিসের ডায়েরিতে।

তিন তারিখে অভী আসবে। চার এবং পাঁচ তারিখে বাবলি ক্যাজুয়াল লিভের দরখাস্ত দিয়ে রেখেছে। বাবলি জানে না কেন, বাবলির মন বলছে যে, ঐ দুদিন ওর ছুটি নেওয়ার প্রয়োজন হবে। আর তখন যদি না পায়, তাই আগে থেকেই বাবলি ছুটি চেয়ে রাখছে।

বাবলি এখন অগাস্টের তিনটি দিনের প্রতীক্ষায় বেঁচে আছে। অনিমেষে সেই দিকেই চেয়ে আছে।

বাবলি ভাবে, বাবলিটা, সেই ডোন্টকেয়ার বেপরোয়া, স্বনির্ভর বাবলিটা কেমন বোকা বোকা হয়ে গেছে। নিজের আনন্দ, নিজের সুখ, নিজের সমস্ত অস্তিত্বর জন্য মনে মনে কেমন অসহায়ের মতো অন্য একজন দূরের লোকের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে তাকে। একজন ক্যাবলা-লোকের ওপর : এমন স্মার্ট বাবলির।

৬

দেখতে দেখতে অগাস্টের তিন তারিখটা সত্যিই একদিন এসে গেল।

সময়ের যে পাখা আছে। সময় যখন ওড়ে, উড়তে চায়, তখন সবুজ দিনগুলোকে মুখে করে কোনো হলুদ পাখির মতো সময় উড়ে যায়।

বাবলি প্রথমে ঠিক করেছিল কাকুর গাড়িটা নিয়ে নিউ-দিল্লি স্টেশনে যাবে অভীকে রিসিভ্ করতে। তারপরে ভাবল হয়তো সেটা বাড়াবাড়ি হবে। বাড়াবাড়ি হলেও বাবলি তবু যেত, যদি না কাকুর বন্ধু এবং তাঁর স্ত্রী স্টেশনে যেতেন। অবশ্য তাঁরা তো যাবেনই। অভী তো তাঁদেরই আপনজন, ও তো বাবলির কেউ না। কেউ হয়তো হবেও না। এসব অনেক কিছু ভেবে শেষ পর্যন্ত স্টেশনে না গিয়ে রোজকার রুটিন মতো ক্লাবে গেল বাবলি, তারপর অফিসে।

আজ ও আরও বেশিক্ষণ খেলল। ব্যাকহ্যান্ড ও ফোরহ্যান্ড স্ট্রোকগুলো যত ভালো করে পারে, যতখানি সুয়িং করে পারে নিল। খামোখা সারা কোর্টময় ও শৃঙ্গাররতা হরিণীর মতো ছুটোছুটি করে বেড়াল। ও যেন এই একদিনের খেলায়ই সুন্দরী হয়ে যাবে, ওর শরীরের যেখানে যেখানে এখনও যতটুকু বাড়তি মেদ আছে সেটুকু যেন একদিনেই ও ঝরিয়ে ফেলবে এমন ভাবতে লাগল।

অফিস থেকে বাড়ি ফিরতেই কাকিমা বললেন, অভী ফোন করেছিল। আজ এবং কাল ও খুব ব্যস্ত থাকবে, আসতে পারবে না। পরশুদিন রাতে ও খেতে আসবে এখানে। পরদিনই ইম্ফল চলে যাবে, সকালের প্লেনে। তুই কেমন আছিস জিজ্ঞেস করল। ও সন্ধেবেলায় দিল্লি য়ুনিভার্সিটির এক প্রফেসরের বাড়িতে থাকবে তোকে সেখানে ফোন করতে বলেছে।

বাবলি মুখে বলল, কে এখন ফোন করবে? আমি এখন চানটান করব, চা খাব, তারপর ফোন করার কথা ভাবা যাবে। অত ব্যস্ত লোক যখন, তখন দয়া করে ফোনও না করলেই পারতেন।

কাকিমা হাসলেন। বললেন, তুই কি হাওয়ার সঙ্গেও ঝগড়া করবি নাকি?

বাবলি বলল, ফোন নম্বরটা কোথায় লিখে রেখেছ?

কাকিমা বললেন, টেলিফোনের সামনেই রাখা আছে, প্যাডে।

বাবলি বলল, থাক্ দেখা যাবে, ফোন করব কিনা।

আসলে বাবলির তক্ষুনি ইচ্ছা করছিল ফোন করতে। কিন্তু ফোনটা বসার ঘরে এবং কাকিমা বসার ঘরে বসেই বই পড়ছেন। ভালো করে কথা বলা যাবে না কাকিমা থাকলে।

বাবলি ভাবল, একটু পরে নিরিবিলি দেখে ও ফোনটা করবে।

বাবলি চান করতে ঢুকল বাথরুমে।

শাওয়ারের নিচে গিয়ে দাঁড়ানোর পরই কাকিমা দরজা ধাক্কালেন। বললেন, অভী আবার ফোন করছে। তোকে চাইছে।

বাবলির সমস্ত শরীর আনন্দে থরথরিয়ে কেঁপে উঠল।

মুখে বিন্দুমাত্র উৎসাহ না দেখিয়ে বলল, বলো যে আমি চান করছি, আমার বেরোতে দেরি হবে।

কাকিমা কী একটা বিরক্তিসূচক কথা বললেন বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে, বোঝা গেল না। তারপর চলে গেলেন।

বাবলির সমস্ত মন গুনগুনিয়ে উঠল। বাবলি গান জানে না। জানলে ও খুশি হত। ওর মনে অনেক সুর আছে ও গান খুব ভালোবাসে, কিন্তু ভগবান ওর গলায় সুর দেননি। বাবলি সারা শরীরে সাবানের ফেনার বুদ্বুদ তুলে মনে মনে নিরুচ্চারে গান গাইতে লাগল।

চান করে বেরিয়ে জামাকাপড় সবে পরেছে, টেলিফোনটা আবার বাজল।

কাকিমা বোধহয় রান্নাঘরে গিয়েছিলেন, কী বাথরুমে গিয়েছিলেন, হয়তো ওঁদের ঘরে। বাবলি দৌড়ে গিয়ে ফোনটা ধরল।

হ্যালো। ওপাশ থেকে অভীর গলা শোনা গেল।

বাবলি যন্ত্রচালিতের মতো ওদের বাড়ির নম্বরটা বলল।

অভী লাজুক লাজুক গলায় বলল, বাবলির সঙ্গে কথা বলতে পারি?

বাবলি হাসি চেপে বলল, আপনার নাম জানতে পারি?

অভী বলল, আমার নাম অভী।

ও। বাবলি বলল। তারপর বলল, ভেবেছিলাম আমার গলার স্বরটা চিনবেন। আমি কিন্তু আপনারটা চিনেছিলাম।

অভী হাসল। বলল, আমিও চিনেছিলাম, তবে আপনার মেজাজ-টেজাজ কেমন আছে জানবার জন্য প্রথমেই বলিনি যে আপনাকে চিনেছি।

বাবলির যেমন স্বভাব, ও হঠাৎ চটে উঠে বলল, কেন? আমার মেজাজটা কী দেখলেন আপনি? আর এতই মেজাজি লোক যদি আমি, তো আমাকে এতবার ফোন করা কেন?

অভী আবার হাসল। বলল, বাঃ রে, কর্তব্য নেই বুঝি? আপনি হলেন গিয়ে আমার বসের শালির মেয়ে। আপনার খোঁজ নেওয়া আমার কর্তব্য নয়? আপনার জন্য আনারসের আচার পাঠিয়েছেন আপনার মাসিমা—আর খেস্‌স্‌। এখন কি আপনি বাড়ি থাকবেন?

বাবলি বলল, আমি বাড়ি থাকব, কিন্তু শুনলাম তো আপনার আজ এবং কাল ফুরসতই নেই। পরশুদিনের আগে এখানে আসা নাকি আপনার পক্ষে সম্ভব নয়।

সেরকম বলেছিলাম, কিন্তু প্রায় ঝগড়া করেই এখান থেকে নেমন্তন্ন না খেয়ে চলে যাচ্ছি। অনেক মিথ্যা কথা বলতে হল আপনার জন্য।

আমার জন্য আপনাকে তো আমি মিথ্যা বলতে বলিনি। আমার কথা ভেবে তো আপনার এত মাস ঘুম হয়নি। বেশ কথা শিখেছেন কিন্তু আপনি। এতখানি পথ আমাকে নিয়ে এলেন ইম্ফল থেকে ডিমাপুরে, তখন তো জানা যায়নি যে এত কথা বলতে পারেন এবং এত গুছিয়ে?

অভী একটু চুপ করে থাকল।

তারপর বলল, তা ঠিক। ওখানে জানা যায়নি। ওখানে আপনি থাকতে থাকতে কিছুই জানা যায়নি। যা কিছু জানার, যা কিছু বোঝার, সব আপনি চলে আসার পর জানা গেছে; বোঝা গেছে। তাছাড়া মিথ্যা কথাটা হয়তো শুধুই আপনার জন্য বলিনি।

তবে? কার জন্য বলেছিলেন?

অভী অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল।

তারপর বলল, আমার জন্যও। হয়তো শুধু আমারই জন্যে। আজ সকালে এখানে এসে অবধি আপনাকে ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছিল। কেন হঠাৎ এই তীব্রতা আমার ইচ্ছার তা নিজেই জানি না। ভারী জানতে ইচ্ছে ছিল কেমন আছেন? বদলে গেছেন কিনা?

পরক্ষণেই আবার অভী বলল, আপনার ইচ্ছা করেনি?

বাবলি বলল, কী ইচ্ছা?

না, কোনো ইচ্ছা। কোনোরকম ইচ্ছা।

বাবলি আবার বলল, না। আমার কিছু ইচ্ছা করেনি। তবে আপনার যদি কোনো ইচ্ছা থাকে, তা পূরণ করার কথা কন্‌সিডার করতে পারি।

অভী হাসল। বলল, বাবাঃ, আপনি বেশ দাম্ভিক আছেন! কী ভাবেন বলুন তো আপনি নিজেকে? আমি কি একেবারেই ফেল্‌না! আমার কি কোনো পরিচয়ই নেই? আমাকে এরা এখানে বক্তৃতা দিতে নেমন্তন্ন করে এনেছে, তা জানেন?

জানি। তাতে আমার কি? আমার কাছে আপনি কী, একমাত্র সেটাই আমার জানবার। অন্য লোকে আপনাকে কী করল, না করল, কীভাবে জানল, তা জানতে আমি উৎসুক নই। আপনার কোনোরকম বক্তৃতা শুনতেই আমি রাজি নই।

তারপরই বলল, ফোনেই কথা বলবেন, না আসবেন?

অভী লজ্জিত হল। বলল, আসছি, আসছি। কিন্তু ডিরেকশনটা একটু দিন।

বাবলি কীভাবে ওদের বাড়ি আসতে হবে তা বলে দিল।

অভী ফোন ছাড়তে ছাড়তে বলল, আধ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছাচ্ছি। সিঁড়িতে লালরঙা কার্পেট পেতে রাখুন।

বাবলি হাসল, বলল আচ্ছা।

অভী বলল, ফোন ছাড়ুন।

বাবলি বলল, না। আপনি আগে ছাড়ুন।

অভী কট্ করে রিসিভারটা নামিয়ে রেখে দিল।

বাবলি ফোন ছেড়ে অন্ধকার বারান্দায় এসে বসল।

বাবলির নিজেকে খুব দুর্বল, অসহায় বলে মনে হচ্ছিল। আনন্দ যে মানুষকে এত বিব্রত করতে পারে, তা ও জানত না। কারও সঙ্গে ফোনে একটু কথা বলার মধ্যে যে এত বিবশ-করা ভালোলাগা থাকতে পারে, তাও ও জানত না।

বাবলি বারান্দায় বসে থাকতে থাকতেই কাকার গাড়ি ঢোকার শব্দ পেল বাবলি। সিঁড়িতে কাকার পায়ের শব্দটা অন্যদিনের তুলনায় একটু অন্যরকম মনে হল। কাকা যেন খুব তাড়াতাড়ি উঠছেন।

বাবলি বারান্দা থেকে তাড়াতাড়ি ভিতরে এল।

কাকাকে খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। কাকা বললেন, বাবি, তোর কাকিমা কোথায় রে?

ঘরে। কেন কাকা? কী হয়েছে?

না। আমাদের অফিসের বিমানবাবুর হঠাৎ সেরিব্রাল থ্রম্বসিস অ্যাটাক হয়েছে। ডক্টর সেনের নার্সিং হোমে পৌঁছে দিয়ে এলাম একটু আগে। অন্যরা নার্সিং হোমেই আছেন। আমাকে ভার দিয়েছে, তোর কাকিমাকে নিয়ে বিমানবাবুর স্ত্রীকে সঙ্গে করে নার্সিং হোমে যাবার।

এই অবধি বলেই কাকু এই যে, কোথায় গেলে, শুনছ বলতে বলতে দৌড়ে শোবার ঘরে ঢুকলেন।

মিনিট দু-তিনের মধ্যে কাকা-কাকিমা বেরিয়ে গেলেন।

কাকিমা বেরোবার সময় বলে গেলেন, কিষাণ সিংকে বলে রাখিস মুরগি, পুরো মুরগিটাই রাঁধতে, আর আমাদের খাবার রান্নাঘরে রেখে শুয়ে পড়তে। আমি গরম করে নেব। তুই খেয়ে শুয়ে পড়িস, বুঝলি, যদি আমাদের দেরি হয়।

কাকা-কাকিমা বেরিয়ে যেতে বাবলির মনে খুব আনন্দ হল। একটা নীচ স্বার্থপর আনন্দ।

কাকার অফিসের বিমানবাবুকে বাবলি চেনে। ভদ্রলোক আশা করি ভালো হয়ে উঠবেন। ভদ্রলোকের ভালো হয়ে উঠতেই হবে, কারণ বাবলির প্রতি তিনি যে কনসিডারেশন দেখিয়েছেন তার তুলনা নেই। ঠিক যে সময় অভী আসবে তার একটু আগে কাকা-কাকিমাকে বাড়ি থেকে চলে যেতে হল তো তাঁর অসুস্থতার জন্যে—বাবলিকে একা থাকার একা একা অভীর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ দিয়ে।

বাবলি ঠিক করল বিমানবাবুর জন্যে খুব প্রার্থনা করবে ভগবানের কাছে।

কাকা-কাকিমা চলে যাবার পর বাবলি আর বারান্দায় বসে থাকতে পারল না। ও একটা বাঁধ্‌নি প্রিন্টের ছাপা শাড়ি পরে ছিল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখল। যদিও এ ক'দিন টেনিস খেলে ও যথেষ্ট রোগা হয়েছে, তবুও এই ছাপা শাড়িতে ওর ফিগারটা যথেষ্ট ভালো দেখাচ্ছে না। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ও নিজেকে নিয়ে নিজের ফিগার নিয়ে বিব্রত হতে হতে নিজেকে কারও চোখে, কারও সামনে সুন্দর করে তুলে ধরবার এই চিরন্তনী মেয়েলি প্রচেষ্টায় নিজে খুব লজ্জিত হল। ওর এতদিন ধারণা ছিল যে, ও অন্যদের মতো নয়। তাহলে কি কোনো-কোনো ব্যাপারে, জীবনের কোনো-কোনো ক্ষেত্রে সব মেয়েরাই একরকম?

অত ভাবার সময় নেই এখন বাবলির। তাড়াতাড়ি শাড়ি-সায়া সব খুলে ফেলে একটা নীলরঙের সায়া একটা হালকা নীলরঙা সিল্কের শাড়ি বের করল। নীল ব্লাউজ। সিল্কের শাড়ি গায়ের সঙ্গে লেপ্টে থাকে। রোগা দেখায় যারা মোটার দিকে; তাদের। তাড়াতাড়ি করে শাড়ি পরে ফেলে নীলরঙা মাড্রাসি সিঁদুরের একটা টিপ পরে নিল ও। গায়ে একটু 'ইন্টিমেট' স্প্রে করে নিল।

শাড়ি পরা শেষ হতে না হতেই কলিং বেলটা বাজল।

বাবলি দৌড়ে নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে। নিচে পৌঁছে দরজা খুলল।

অভী দাঁড়িয়ে ছিল দরজায়। একটা ছাই-ছাই রঙা টেরিকটের বিজনেস-স্যুট পরে।

বাড়ির বাইরের আলোয় অভীকে খুব লম্বা বলে মনে হচ্ছিল, যত লম্বা ও, তার চেয়েও অনেক বেশি। বাবলির মাথাটা ওর বুকের কাছে ছিল।

অভী সিঁড়িতে লাল কার্পেট পেতে রাখতে বলেছিল। কিন্তু তার বদলে বাবলি ওকে এক সুগন্ধি ফিকে নীল অভ্যর্থনা দিল।

অভীর অবাক চোখে ও বাবলিকে চিনতে পারছিল না। সেই একটু মোটার দিকে মিষ্টিমুখের মেয়েটি যেন লক্‌লকে সাপের মতো হয়ে গেছে। রংটা কালো হয়েছে আগের থেকে—কালো নয়, বাদামি। আর চোখে-মুখে, সমস্ত শরীরে কী দারুণ এক চিকন আভা লেগেছে।

অভী হাসছিল। কথা বলছিল না।

বাবলিও হাসছিল। বলল, কী? অত হাসার কী হয়েছে?

অভী বলল, না। এখন তো দেখছি বাংলা সাহিত্যের নায়িকা হতে কোনো বাধা নেই আপনার।

মানে? ভুরু তুলে বাবলি জিজ্ঞেস করল।

অভী হেসে বলল এর মধ্যেই ভুলে গেলেন? আপনি বলেছিলেন বাঙালি লেখকদের ওপর আপনার ভীষণ রাগ, কারণ নায়িকামাত্রেরই ফিগার ভালো হয়, দারুণ সুন্দরী হয়। এখন কিন্তু কোনো

নিন্দুকও আপনার ফিগার ভালো নয়, একথা বলবে না।

বাবলি বলল, কী? এখানেই দাঁড়িয়ে থাকা হবে? না ভিতরে যাওয়া হবে। আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনিই যেন কোনো সাহিত্যিক; কী কবি। মানে আগে ছিলেন না; এখন হয়ে গেছেন।

অভী বাবলির পাশে পাশে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বলল, মনে মনে সকলেই কবি। কারও কবিত্ব মনেই থাকে, আর কারও বা কাগজে। তফাত কী?

আমি জানি না। তারপর বলল, এরকম দুদিনের হ্যারিকেন ট্যুরে আসার কী মানে হয়? আপনার জন্যে আমি দুদিন ছুটি নিয়েছিলাম, আপনি জানেন? আমার দু-দুটো দিনের ক্যাজুয়াল লিভ নষ্ট করলেন তো আপনি?

অভী অবাক হয়ে তাকাল।

তারপর ব্যথিত চোখ তুলে বলল, স্যরি, সত্যিই তো। ভেরি স্যরি। তবে কিছুই কি নষ্ট হয় বলে আপনি বিশ্বাস করেন? আমি কিন্তু করি না। কিছুই নষ্ট হয় না। সবই প্রাপ্তির ঘরে জমা পড়ে; জমা থাকে। কি? থাকে না?

আমি অত জানি না।

বাবলি বলল অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে।

বসবার ঘরে গিয়ে বসল ওরা।

বাবলি বলল, কী খাবেন বলুন?

অভী বলল, কিচ্ছু না। আপনার কি ধারণা কিছু খাওয়ার জন্যেই অন্য লোকের কাছে মিথ্যা কথা বলে আমি দৌড়ে এলাম এখানে?

বাবলি মুখ তুলে বলল, তবে? কেন এলেন? শুধুই কর্তব্য করতে?

বাবলির উজ্জ্বল কালো চোখ দুটি তীক্ষ্ণ নাক, উঁচু হয়ে থাকা কণ্ঠার হাড় দুটো, রোদ-লাগা বুক, বুকের পেলব ভাঁজটি সমস্ত একঝলকে অভীর চোখে ভেসে উঠল। অভী চোখ নামিয়ে নিল।

বলল, না। আসতে ভালো লাগল। তাই এলাম। শুধু একজনের সামনে অনেকক্ষণ—অনেক—অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকব বলে চলে এলাম।

তারপর বলল, এসে অন্যায় করেছি?

বাবলি মুখ নামিয়ে নিল। কথা বলল না।

দুজনেই কথা বলল না। দেওয়ালের মিউজিক্যাল ঘড়িটা টুং টাং আওয়াজ করে সাতটা বাজাল।

বাবলি বলল, সত্যি সত্যিই কিছু খাবেন না?

না। অভী বলল।

তারপর বলল, ভাবতেই ভালো লাগছে, আপনি ছোটবেলা থেকে এ বাড়িতে বড় হয়েছেন, খেলেছেন, দুষ্টুমি করেছেন, স্লেটপেন্সিলে অঙ্ক করেছেন—তারপর...।

তারপর কী? বাবলি চোখ তুলে বলল।

তারপর একদিন ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পরেছেন, তারপর এই হঠাৎ আজকের সন্ধ্যেয় এমন আশ্চর্য রহস্যময় একজন মেয়ে হয়ে আমার সামনে বসে আছেন। ভাবতেই দারুণ লাগছে।

বলেই, উঠে দাঁড়াল অভী। বলল, চলুন, আপনার ঘর দেখব।

বাবলি খুব খুশি হল। লজ্জাও পেল। আজ অবধি অন্য কেউ, অন্য কোনো পুরুষ, অভীর মতো পুরুষ বাবলি সম্বন্ধে এত উৎসাহ দেখায়নি।

ঘরে ঢুকেই বাবলি বলল, এই যে আমার মা-বাবার বিয়ের ছবি। মাকে আমি কখনও দেখিনি। ফোটোতে ছাড়া।

অভী অনেকক্ষণ মনোযোগ সহকারে ছবিটি দেখল।

তারপর বলল, আপনার মুখ ঠিক আপনার মায়ের মতো।

বাবলি হাসল। বলল, হ্যাঁ, বাবা তাই বলেন।

পরক্ষণেই অভী থমকে দাঁড়াল অন্যদিকের দেওয়ালে তাকিয়ে।

আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, ঐটি কার ছবি? কে?

বাবলি লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে গেল।

দেওয়ালে খুব বড় করে এনলার্জ করা বাবলির চার বছর বয়সের একটা ছবি। ন্যাড়া-মাথা, ফোকলা-দাঁত; ইজের আর নিমা পরে হাসছে।

এ ছবিটা যে এতদিন, এত বছর দেওয়ালের এ কোণায় টাঙানো ছিল, এতদিন এ-ঘরে থাকা সত্ত্বেও যে ছবিটাকে বাবলি কখনও আবিষ্কার করেনি, আজ অভীর চোখ দিয়ে তাকে, সেই ছোট্ট ন্যাড়ামুণ্ডি বাবলিকে হঠাৎ আবিষ্কার করে ও নিজেই ভীষণ লজ্জিত হল।

অভী খুব জোরে হেসে উঠল।

বলল, হাউ সুইট। কী দারুণ সুস্টুনি-মুস্টুনি ছিলেন আপনি ছোটবেলায়। রীতিমতো কাড্‌লি। আদর করে দিতে ইচ্ছে করছে।

বাবলির কানের লতি দুটি লজ্জায় লাল হয়ে গেল।

ও মুখ নামিয়ে নিল।

এ ঘরে অভীকে নিয়ে আসার জন্যে নিজেকে মনে মনে ধিক্কার দিল।

অভী ওর দিকে চেয়ে বলল, কী হল? আপনি এখনও দারুণ কাড্‌লি। এখনও নিশ্চয়ই অনেকেরই আপনাকে আদর করতে ইচ্ছে করে।

ঠিক এমন সময় কিষাণ সিং ওর নোংরা দুর্গন্ধ পায়জামা আর গেঞ্জিটা পরে একটা ছাল-ছাড়ানো মুরগির গলা ধরে ঝুলিয়ে নিয়ে বাবলির ঘরে ঢুকল। তারপর অভীর প্রতি বিন্দুমাত্র ইন্টারেস্ট না দেখিয়ে বাবলিকে শুধোলো, পুরো বানায়গা?

রাগে বাবলির গা জ্বলে গেল।

কিষাণ সিংয়ের এত জামাকাপড় আছে কিন্তু সেসব বাইরে বেরোবার জন্যে। রান্না করার সময় ও মরে গেলেও পরিষ্কার জামা পরবে না।

বাবলি তাড়াতাড়ি বিরক্তির সঙ্গে বলল, হ্যাঁ। আভি যাও।

কিষেণ সিং চলে যেতেই, অভী বলল, আপনি এত আপসেট হয়ে পড়লেন কেন? নোংরা জামাকাপড় নাহলে রান্নার স্বাদ ভালো হয় না। দিল্লির মেয়ে, আর জানেন না যে, যে-ফুচকাওয়ালা বা ভেলপুরিওয়ালার দাদ নেই, নোংরা গামছা নেই, তার কাছে কেউ যায় না, কেউ খায় না?

বাবলি মুখ সিঁটকালো। বলল, ঈ-স-স-স। আপনি ভীষণ খারাপ।

তারপর ওরা দুজনেই বারান্দায় এল।

অভী বলল, এখানে বসতে পারি? ভীষণ প্লেজেন্ট বারান্দাটা। দারুণ দৃশ্য কিন্তু না? এখান থেকে?

বাবলি বলল, হ্যাঁ। তারপর অভী বেতের চেয়ার টেনে বসবার পর বাবলি শুধোলো, বাতি জ্বালিয়ে দেব?

অভী বলল, না। থাক্, অন্ধকারই ভালো লাগছে।

রাস্তার লাইটপোস্টে লাগানো মার্কারি ভেপার ল্যাম্পটা থেকে একটা ফিকে নীলচেবেগুনে আলো এসে বারান্দায় পড়েছিল।

অভী বাইরের দিকে চেয়েছিল।

দূরে গাছপালা আর পোড়া পুরোনো দুর্গটুর্গগুলো ধ্বংসাবশেষগুলো আধো-অন্ধকারে মাথা উঁচিয়েছিল।

বাবলিও বাইরেই চেয়েছিল।

মাঝে মাঝে দুজনে দুজনের দিকে মুখ ফেরাচ্ছিল, তারপর চোখাচোখি হতেই দুজনেই মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছিল। কেন যে, তা ওরা কেউ জানে না।

কেউই কোনো কথা বলছিল না এই মুহূর্তে, অথচ একটু আগেই দুজনেই কত প্রগল্‌ভ আলোচনা করেছিল, বলেছিল কত অর্থহীন ছেলেমানুষি কথা। এখন ওরা দুজনেই বোবা হয়ে বসেছিল।

ওরা কতকক্ষণ ওভাবে বসেছিল বাবলির মনে নেই।

অনেকক্ষণ পর অভী বলল, কী করবেন ঠিক করেছেন?

কীসের? বাবলি বলল।

জীবনের। চাকরিতে তো ঢুকলেন। এরপর কী প্ল্যান আপনার? কিছু কি ঠিক করেছেন?

বাবলি বলল, কিছুই ঠিক করিনি। চাকরিটাও যে করব, এমনও মনস্থির করিনি।

অভী অবাক হল। বলল, সে কি? আই-আর-এস হলেন, ট্রেনিং নিলেন, জয়েন করলেন আর চাকরি করবেন না কেন?

বলিনি তো করব না। বলেছি, করবোই যে, এমন এখনও ঠিক নেই।

তারপরই বলল, উইমেন্স লিব্ সম্বন্ধে আপনার কী মতামত? আপনি কি মনে করেন মেয়েরা স্বাবলম্বী হলে, নিজেরা আয় করলেই তাদের পক্ষে স্বাধীন থাকা সম্ভব? তাদের নিজেদের ইচ্ছামতন চলফেরা করা সম্ভব?

অভী অবাক হল। বলল, এ তো আপনার নিজস্ব মতামতের ব্যাপার। কোনো পুরুষের মতামতের ওপর কোনো মেয়ে তার স্বাধীনতার প্রকৃতি নিশ্চয়ই ঠিক করে না। তবে, উপার্জনের সঙ্গে কিছু স্বাধীনতা তো থাকেই। এ কথা অস্বীকার করার উপায় দেখি না।

বাবলি বলল, জানি না। আমি হয়তো সেকেলে। অথবা অন্যভাবে বললে বলতে হয়, আমি হয়তো ফুল অব কনট্রাডিকশানস। আমার কিন্তু মনে হয় যে, মেয়েদের স্বাধীনতাটা পার্কে অথবা রাস্তায় লড়াই করে বা মাসান্তে কিছু টাকা রোজগার করে পাওয়ার নয়। কারণ সে ব্যাপারটা একটা সমষ্টিগত পাওয়া। কিন্তু জীবনে সমষ্টির দাম কতটুকু? বুঝতাম, মেয়েরা যদি বিয়ে না করত, অন্য অনেক দেশের মেয়েদের মতো জাস্ট লিভ-টুগেদার করত। আজ এর সঙ্গে, কাল ওর সঙ্গে—তারপর এমনি করে সঙ্গীর পর সঙ্গীর সঙ্গে—তাহলেও বুঝতাম। যারা সে জীবনে বিশ্বাস করে, আমি তাদের দলে নেই। আমি ছোটবেলা থেকেই ঘরের স্বপ্ন দেখেছিলাম। সুন্দর একটি থাকার জায়গা এমন একজন স্বামী, যে সবদিক দিয়ে আমার চেয়ে ভালো, সবদিক দিয়ে বড়, যাকে আমার সম্মান করতে একটুও দ্বিধা থাকবে না।

অভী বলে উঠেছিল, আর ছেলেমেয়ে?

বাবলিও সপ্রতিভতার সঙ্গে বলেছিল কমপক্ষে তিনটি ছেলেমেয়ে। ঘর ভর্তি কাজ। স্বামীর কাজ, বাচ্চাদের কাজ, এই নিয়েই আমি খুশি থাকব। এবং আমার স্বামীও আমার মধ্যে নিশ্চয়ই সম্মান করার মতো কিছু দেখবেন। আশা করি দেখবেন। তাহলেই আমি যে স্বাধীনতায় বিশ্বাসী, সে-স্বাধীনতা পাব বলে আমি মনে করি।

অভী অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল।

বাবলি হেসে বলল, কি আমার লম্বা বক্তৃতা শুনে কি আপনি ঘুমিয়ে পড়লেন?

অভী বলল, ঘুমিয়ে পড়িনি। ভাবছি। আপনি তাহলে আপনার মনোমতো ঘরের জন্যে মনোমতো

স্বামীর জন্যে এমন চাকরিটাও ছাড়তে রাজি? আশ্চর্য! আজকাল এমন দেখা যায় না, শোনা যায় না বড়।

বাবলি হাসল। বলল, হ্যাঁ। ভারত সরকারের চাকরি চেয়ে আমি আমার স্বামীর চাকরি করা অনেক ভালো বলে মনে করি। তারপরই বলল, আঁদ্রে মোরোয়ার লেখা একটা বই আছে, 'দ্য আর্ট অব লিভিং'। পড়েছেন!

অভী বলল, না।

যেখানে এক জায়গায় উনি বলছেন যে, ম্যাগনিচুড কোনো ব্যাপারই নয়। যে-কোনো পারফেক্ট জিনিসই পারফেক্ট। একজন গৃহিণী তার গৃহিণীপনায়, তার ভালোবাসায় তার সহনশীলতায় তার বুদ্ধিতে যদি তার ছোট্ট সংসারকে সুষ্ঠুভাবে চালিত করতে পারে, তবে তার কৃতিত্বের মধ্যে আর যে জননেতা কোনো বিরাট দেশের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ কৃতিত্বের সঙ্গে এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন, তার মধ্যে কৃতিত্বের মাত্রার কোনো তারতম্য নেই। দেশ চালানোর মতো ছোট্ট সংসার সুন্দরভাবে চালানোও একই রকম কৃতিত্ব। আমি সেই কৃতিত্বকে অনেক বড় বলে মনে করি। তবে জানি না, মনোমতো ঘর, মনোমতো স্বামী পাব কিনা। মনোমতো স্বামী না পেলে বিয়ে করাও হবে না, চাকরি ছাড়ার কথাও ওঠে না।

অভী হাসল। বলল, আপনার যোগ্য ছেলে কি ভারতবর্ষে আছে?

বাবলি হাসল। বলল, ঠাট্টা করছেন বুঝি?

অভী গম্ভীর গলায় বলল, ঠাট্টা করছি বলে মনে হল বুঝি আপনার?

বাবলি বলল, তা-ই-ই তো। আমি কি, আমার যোগ্যতা কতটুকু আমার রূপগুণেব বাহার কতখানি, তা আমার নিজের তো অজানা নেই। আমি অত্যন্ত সাধারণ।

অভী বলল, নাঃ। আপনি তো রীতিমতো ফ্যাসাদে ফেললেন। আপনার সঙ্গে আপনার যোগ্য কোনো ছেলের আলাপ করিয়ে দেওয়াটা দেখছি কর্তব্যে দাঁড়িয়ে গেল এখন। তারপরই একটু থেমে বলল, আলাপ করবেন? আমার এক বন্ধুর সঙ্গে? সে এখন দিল্লিতেই পোস্টেড। সে আপনার যোগ্য হলেও হতে পারে। আমার চেয়ে সে একশো গুণ ভালো, সব দিক দিয়ে। বলুন তো আলাপ করিয়ে দিই?

বাবলির খুব অপমানিত লাগল ওর নিজেকে। ছিঃ ছিঃ ও কী নির্লজ্জের মতো অভীর কাছে নিজেকে নিবেদন করল, আর অভী চালাকের মতো কথাটা এড়িয়ে গেল। ওর সঙ্গে আলাপ করাতে চাইল অন্য কারও?

বাবলি অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল।

তারপর কেটে কেটে বলল, না। ধন্যবাদ। আমার জন্যে আপনার এত কষ্ট স্বীকার করতে হবে না। আমি নাবালিকা নই। আমার স্বামী নির্বাচনের ব্যাপারে আপনার সহায়তা না হলেও চলবে।

অভী চমকে মুখ তুলে তাকাল। তারপর লজ্জিত গলায় বলল, আই অ্যাম সরি: আমি কথাটা কিন্তু সিরিয়াসলি বলেছিলাম। আন্তরিকভাবেই। আপনাকে কোনোভাবে আঘাত করতে চাইনি।

বাবলি হেসে ব্যাপারটা লঘু করে দিয়ে বলল, আঘাত আমার এত সহজ লাগে না। ছোটবেলায় মা-হারানো মেয়ে। ছোটবেলা থেকে অনেক আঘাতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

কিছুক্ষণ পর, অভী কোনো কথা বলছে না দেখে বাবলি কথা অন্যদিকে ঘুরোবার জন্যে বলল, তাহলে পরশু রাতে খেতে আসছেন তো? কী কী খেতে ভালোবাসেন আপনি? এখানে তো ডিমাপুরের রশিদ আলি নেই। তবে, যদি বলেন কী খেতে ভালোবাসেন তাহলে আমি নিজে রান্না করব। অফিস তো ভুল করে ছুটিই নিয়ে ফেলেছি। যখন ছুটি নিই, তখন বুঝতে পারিনি যে আমার আপনার

জন্যে যতখানি ভাবনা, আপনার তা নেই আমার জন্যে। ব্যাপারটা ছেলেমানুষি হয়ে গেছে। যাই-ই হোক অন্তত সারাদিন রান্না করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা যাবে। এখন বলুন দয়া করে, কী খেতে ভালোবাসেন?

অভী একদৃষ্টে অনেকক্ষণ বাবলির মুখের দিকে চেয়ে রইল। আস্তে আস্তে একটা আল্‌তো হাসি ওর মুখময় ছড়িয়ে পড়ল। বিস্ময়ের হাসি। যে হাসি ওর পক্ষে লুকানো সম্ভব ছিল না।

তারপর বলল, ভালো করে শুনুন কী কী খেতে ভালোবাসি। নারকোল দিয়ে মুগের ডাল, ঝিঙে-পোস্ত, তেল-কই ধনেপাতা দিয়ে, আর আর আর—তারপর ভেবে বলল, আনারসের চাট্‌নি।

বাবলি বলল, ব্যস্‌স্‌। আর কিছুই ভালোবাসেন না?

অভী বলল, ভালো অনেক কিছু বাসি। কিন্তু এই-ই যদি খাওয়ান তা হলেই ভীষণ খুশি হব। আসল ব্যাপারটা কী জানেন? চিরদিন বাইরে বাইরে একা একা থাকা, চাকর-বাকরের দয়ায় খাওয়া-পরা। আসলে যা ভালোবাসি, তা হচ্ছে খাওয়ার সময় কেউ সামনে বসে থাকুক, আমার সঙ্গে বসে খাক—তারপরে গল্প করতে করতে খাই—একজন কেউ থাকুক যে এটা-ওটা এগিয়ে দিতে পারে—নুনটা, সস্‌টা—ব্যসস এতেই খুশি। আপনি আমার খাওয়ার সময় আমার সামনে বসে থাকবেন তো?

বাবলির বুকের মধ্যে কী যেন কী একটা ব্যথা মোচড় দিয়ে উঠল। বাবলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলল, নিশ্চয়ই বসব। তারপর বলল, ইম্ফলে আপনার খাওয়া-দাওয়ার খুব অযত্ন হয়, না?

অভী বলল, না না অযত্ন হবে কেন। আমার কাছে যে ছেলেটি আছে, সে চমৎকার। খুব আদর-যত্ন করে। তবু কোথায় যেন কী একটা বাকি থাকে। কী যেন নেই, কী যেন নেই মনে হয়। আপনাকে ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না।

বাবলি বলল, না বললেও বুঝতে পারি।

অভী বলল, ইম্ফলে আর একবার চলে আসুন আপনি। সেবার এত অল্পদিন থাকলেন যে কিছুই তো দেখা হয়নি আপনার। তারপর আপনার সঙ্গে আলাপ হল একেবারে চলে আসার সময়—এসকর্ট হিসাবে। এবারে এলে বন্ধুত্বর দাবিতে আপনাকে যা যা দেখাবার আছে সব ঘুরিয়ে দেখাব। আমার বাংলোয় নিয়ে যাব। আসবেন?

বাবলি ক্যাজুয়ালি বলল, পুজোর সময় কি কলকাতা যাবেন?

অভী বলল, নাঃ। কলকাতা গিয়ে কী হবে? এবারেই মায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। মা তো এখন থেকে দিদি-জামাইবাবুর সঙ্গেই থাকবেন বম্বেতে। আর কলকাতার আকর্ষণ যে বন্ধুরা—তারা তো সকলেই সারা পৃথিবীতে এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গেছে। কলকাতার এখন আর কোনোই আকর্ষণ নেই আমার কাছে। ইম্ফলেই থাকব।

কী করবেন ছুটিতে একা একা? বাবলি শুধোলো।

খাব, একটু লেখাপড়া করব নিজের শখের। টেনিস খেলব। আর ঘুমোব।

হঠাৎ বাবলি বলল, আমি যদি পুজোর সময় যাই?

অভী আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠল। বলল, আসবেন? আসুন না। তাহলে তো গ্র্যান্ড হয়। আমারও ছুটি থাকবে। আপনাকে সবসময় কম্পানি দিতে পারব।

বাবলি বলল, কিন্তু পুজোর সময় মাসিমা-মেসোমশায় বোধহয় কলকাতা আসবেন। আমি তাহলে কোথায় থাকব? ভালো হোটেল আছে ইম্ফলে?

আছে, আছে। অভী বলল। হোটেল-দ্য-অভী। আমার হোটেলে থাকবেন। ফাইভ-স্টার হোটেল নয়। থাকতে কষ্ট হবে আপনার—কিন্তু শোওয়ার ঘর, অ্যাটাচ বাথ এবং অন্যান্য সমস্ত সুবিধা পাবেন, প্লাস ট্যুরিস্ট গাইড পর্যন্ত। আসবেন তো?

তারপর বলল, আমি ভাবতেই পারছি না যে, আপনি সত্যি সত্যিই আসবেন। পুজোর তো বেশি দেরিও নেই। আর মাস দেড়েক। আমি তা হলে ফিরে গিয়েই আমার গাড়িটা একেবারে ঠিকঠাক করে ফেলব। খুব মজা হবে। প্লিজ আসুন।

বাবলি বলল, কথা দিতে পারছি না, তবে চেষ্টা করব। খুব চেষ্টা করব।

একটু পর বাবলি বলল, একটা কথা বলব আপনাকে?

আচ্ছা, ডিমাপুরের রাস্তায় আপনি যখন আপনার গাড়ির পিছনে আব্রাকাডাব্রা বলে আমার কথামতন লাথি মেরেছিলেন তখন সত্যিই কি আপনি ভেবেছিলেন যে ঐ মন্ত্রে গাড়ি চলবে? আপনি কি ওসবে বিশ্বাস করেন?

অভী হোহো করে হেসে উঠল।

বলল, ভালোই হল আপনিই একথা তুললেন বলে। দেখুন আপনি ইম্ফল থেকে বেরোনোর পর থেকেই আপনার কথাবার্তায় বুঝেছিলাম যে আপনি ভীষণ বুদ্ধিমতী। এও বুঝেছিলাম যে আপনার এই বুদ্ধিমত্তার জন্যে স্বাভাবিক কারণে আপনি গর্বিত। আমাকে বোকা বানিয়েও আপনি এক রকমের নিষ্ঠুর আনন্দ পাচ্ছিলেন। একথা যখন বুঝেই ছিলাম, তখন কেন আর আপনার আনন্দ থেকে আপনাকে বিনা কারণে বঞ্চিত করি আমি? তা-ই যা যা বলেছিলেন, যখনই বলেছিলেন তা-ই-ই করে আপনাকে খুশিমনে রাখার চেষ্টা করেছিলাম। অন্যায় করেছিলাম কি?

বাবলির মুখটা ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেল।

বাবলি হাঁসির মতো শিস্ তুলে বলল, ঈ-স-স আপনি কী খারাপ? আপনি জেনে শুনে অমন বোকা সেজে ছিলেন? কী ডেঞ্জারাস লোক আপনি বাবা?

হঠাৎ ঘড়ি দেখল অভী। বলল, ওরে বাবাঃ অনেক রাত হয়ে গেল—আমার বউদি হাতে মাথা কাটবেন আমার। এবার কিন্তু উঠি, কেমন?

বাবলি বলল, যা ইচ্ছে।

অভী উঠতে উঠতে বলল, আমার যা ইচ্ছে। আপনার কোনো ইচ্ছে নেই?

বাবলি বলল, না। ইচ্ছাপূরণ না হলে সে ইচ্ছা থেকেই বা লাভ কী?

অভী ঘাড় বেঁকিয়ে তাকাল বাবলির দিকে। এক আশ্চর্য ভালোলাগা ও কৌতুকমেশানো হাসিতে ওর মুখ আবার ভরে উঠল। হঠাৎ অভী ডান হাতটা বাড়িয়ে বাবলির ডান হাতের পাতাটা ধরে ফেলল। তারপর বাবলির হাতটা ওর মুখের কাছে তুলে নিয়ে ওর ঠোঁট ছোঁওয়ালো বাবলির হাতে। বলল, কেন জানি না আপনাকে আমার খুব ভালো লেগে গেছে।

তারপরই হঠাৎ বলল, আমাকে ক্ষমা করবেন।

বাবলি মুখ নামিয়ে ছিল। বাবলির কানের লতি আনন্দে ভালোলাগায় লাল ও গরম হয়ে উঠেছিল।

বাবলি মুখ নামিয়েই রইল।

অভী ক্ষমা চাওয়ার গলায় বলল, আপনি রাগ করলেন?

না। বাবলি বলল।

অভী বাবলির একেবারে সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর ওর চোখের গভীরে কী যেন খোঁজার চেষ্টা করতে লাগল। পরক্ষণেই অভী নিচু হয়ে বাবলির চোখের পাতায় চুমু খেল।

বাবলি একমুহূর্ত অভীর বুকের ওপর মুখটা নুইয়ে রাখল। পরমুহূর্তে ও ছিটকে সরে এল। ওর মনে হল ওর সারা শরীরে কী এক আগুন জ্বলে উঠেছে। দাউদাউ করে জ্বলছে। যে আগুনের নাম জানে না ও।

বাবলি জানল না সেই মুহূর্তে যে এই আগুন আর কখনও নিভবে না। তুষের আগুনের মতো

নিঃশব্দে ধিকিধিকি করে জ্বলবে। বাবলির শরীরের সমস্ত অণুপরমাণুতে। বাবলির মনের মলিকিউলে।

৭

কাকা-কাকিমার ফিরতে সত্যিই দেরি হচ্ছিল। তবু কাল অফিস নেই বলে বাবলি সাড়ে এগারোটা অবধি দেখল। তারপর খেতে বসল। একা একা।

খাওয়ার পর কিষাণ সিংকে দিয়ে কাকা-কাকিমার খাবার-টাবার ঠিক করে রাখিয়ে, জলের জাগ, গেলাস, প্লেট, চামচ ইত্যাদি সব সাজিয়ে ও ঘরে গেল।

ঘরের দরজা সব বন্ধ করেছে এমন সময় টেলিফোনটা বাজল।

বাবলি উঠে গিয়ে টেলিফোনটা ধরল।

কাকার ফোন। কাকার গলা খুব ভারী শোনাল। কাকা শুধু দুটো কথা বললেন। বিমানবাবু মারা গেলেন রে বাবলি। আমাদের আসতে একটু দেরি হবে। তুই শুয়ে পড়িস। আজ আর খাব না আমরা।

মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল।

বিমানবাবু ও তাঁর মোটাসোটা হাসিখুশি স্ত্রীকে দু-একদিন দেখেছে বাবলি ওদের বাড়িতে। বিমানবাবু খুব দরাজ হাসি হাসতেন। হঠাৎ কার যে কী হয়। মানুষের জীবনের কিছুই ঠিক নেই।

বাবলি তখনও ঘরে ঢোকেনি, বসবার ঘরে একটা জানালা খোলা ছিল, কিষাণ সিং বুঝি বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলেন। বাবলি জানালাটাকে বন্ধ করছে এমন সময় ফোনটা আবার বাজল। বাবলি ওয়াল-ক্লকে চেয়ে দেখল, সাড়ে এগারোটা বাজে রাত।

ফোনে একবার খারাপ খবর এলে পরেরবার ফোন বাজলে ফোন ধরতে ইচ্ছে করে না। কারুরই করে না। বুকের মধ্যে দুরদুর করে। তখন অন্য কেউ হাতের কাছে থাকলে তাকেই ফোন ধরতে বলত ও। কিন্তু কেউই নেই এখন। বাবলি ভীরু পায়ে এগিয়ে গিয়ে ভয়ে ভয়ে রিসিভারটা তুলল। তারপর যেন কোনো খারাপ খবর আর ও শুনতে রাজি নয়, এমনভাবে প্রতিবাদের গলায়, বিরক্তির গলায় বলল, হ্যালো।

ওদিক থেকে কাঁপা ভয়ার্ত গলায় কে যেন বলল, হ্যালো। আপনি কে?

বাবলি ভয় পেল। কোনো বাজে লোক নয়তো? হয়তো জেনে গেছে, বাবলি একা আছে বাড়িতে।

সেই রাতের রহস্যময় চাপা দ্বিধাগ্রস্ত স্বর আবার বলল, বাবলি আছেন?

বাবলি রুক্ষ গলায় বলল, আপনি কে?

আবার সেই স্বর বলল, আপনি বাবলি?

হঠাৎ, একবারে হঠাৎ, যেভাবে হঠাৎ কোনো ইলেকট্রিক ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলে যায়, তেমন করে সেই ভয়টা বাবলিকে ছেড়ে চলে গেল। তার বদলে একটা আলো-জ্বলা খুশির ট্রেন বাবলির মনের প্ল্যাটফর্মে এসে ঢুকল।

বাবলি একটু থেমে বলল, আপনি কে? অভী?

—হ্যাঁ, আমি। রাগ করলেন। ঘুমিয়ে পড়েছিলেন আপনি?

—না। বাবলি বলল। তারপরেই বলল, আপনি কী করছিলেন?

—শুয়ে ছিলাম।

—ঘুমোননি কেন এত রাত পর্যন্ত?

—ঘুম আসছিল না। কিছুতেই ঘুম আসছিল না।

বাবলি হাসল। বলল, আমি কি আপনার ঘুমের ওষুধ? আমি কি স্লিপিং পিল্?

লজ্জিত গলায় ওপাশ থেকে অভী বলল, জানি না।

বাবলি বলল, অমন চোরের মতো গলায় কথা বলছেন কেন?

অভী আরও লজ্জা পেল। বলল, সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে। দাদা-বউদির ঘরের পাশেই ফোনটা। শুনতে পেলে?

—শুনতে পেলে কী? বাবলি হেসে শুধোলো।

বাবলির জীবনে বাবলি এই-ই প্রথম জানল ওর কতখানি দাম, কত ইম্পর্টান্ট ও অন্য একজনের চোখে। জেনে ভালো লাগল যে, সে ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসি হয়ে আরেকজনের চোখে গিয়ে উড়ে না বসলে একজনের ঘুম আসে না।

অভী বলল, নাঃ, রাত বারোটার সময়! তা-ই।

বাবলি বলল, তাহলে ঘুমিয়ে পড়ুন।

অভী একটু চুপ করে থাকল। তারপর বলল, কাল দেখা করতে চাই। কাল কখন অফিস ছুটি আপনার?

—বললাম না ছুটি নিয়েছি অফিস।

ধমকের সুরে বাবলি বলল।

বাবলির একথা ভেবে ভালো লাগল যে, তার এতদিনে একজন ধমক দেওয়ার লোক হল। সে মুখ নিচু করে ভালোলাগার সঙ্গে তার ধমক শুনবে।

অভী বলল, য়ুনিভার্সিটিতে আমার কাজ চারটের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। আপনি সাড়ে চারটেয় আসুন।

—কোথায়? বাবলি বলল।

কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজের রেস্তোরাঁয়। আমি থাকব। কনট সার্কাসে।

বাবলি বলল, আসব।

অভী বলল, ছাড়ি?

বাবলি বলল, ঘুমিয়ে পড়ুন লক্ষ্মীছেলের মতো। কেমন?

অভী হাসল। বলল, লক্ষ্মীমেয়ের মতো আপনিও।

বাবলি হাসল। বলল, তা-ই।

—ছাড়ুন। অভী বলল।

—না। আপনি আগে ছাড়ুন।

অভী ফোন ছেড়ে দিল।

তারপর বাবলিও ছাড়ল।

ড্রেসিং টেবলের সামনে অনেকক্ষণ বসে রইল বাবলি। শাড়িটাড়ি ছেড়ে হালকা সুতির নাইটিটা পরল। মুখে ক্রিম লাগাল। ঘাড়ে, গলায়, বুকে এবং সমস্ত শরীরে পাউডার মাখল। গলার কাছে ফ্রিল-দেওয়া ও লেস বসানো হালকা গোলাপি রঙা নাইটিটাতে ও নিজেকে খুব সুন্দরী দেখে। আয়নার সামনে বসে ও আয়নাকে উদ্দেশ্য করে বলল, একদিন শুধু তুমিই আমাকে এই রুদ্ধ ঘরের মধ্যে নাইটিতে দেখেছ। দিন আসছে, যেদিন তুমি ছাড়াও আর একজন আমাকে দেখবে। সেদিন তোমার সামনে বসে একা একা এমন করে তোমার সঙ্গে কথা বলার অবসর আমার হবে না। বুঝেছ আয়না? তখন একজনের দুটি মুগ্ধ চোখের সামনে আমায় বসে থাকতে হবে—অনেকক্ষণ অনর্গলি আগল

দেওয়া ঘরে বসে আমার কথা বলতে হবে তার সঙ্গে। সেদিন তুমি কি হিংসা করবে তাকে? সেই অন্যজনকে? কি আয়না। করবে হিংসা?

বিছানায় গিয়ে শুলো বটে। কিন্তু ঘুম এল না বাবলির। কিছুতেই ঘুম এল না। অভীর ঘুম না-আসা রোগটা টেলিফোনের তার বেয়ে এসে বাবলিকে কোনো অদৃশ্য ভাইরাস ইনফেকশনের মতো পেয়ে বসল।

এপাশ ওপাশ করল। পাখাটাকে আরও জোর করল। বারান্দার দিকের জানালা খুলে দিল। এক সময় নাইটিটাও খুলে ফেলল। শুধু প্যান্টি পরে শুয়ে রইল। তবুও ঘুম এল না বাবলির। বাবলির সব ঘুম কে যেন চুরি করে নিয়ে গেছে। বাবলির সমস্ত হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও।

পরদিন দুপুরের খাওয়ার পর বাবলি শুয়েছিল। কাকিমাও ঘুমোচ্ছিলেন নিজের ঘরে—সারারাত ঘুমোননি কাকিমা। বাবলি যখন শেষ রাতে ঘুমিয়েছিল ভোর হওয়ার আগে আগে ঠিক তখনই কাকা-কাকিমা বাড়ি ফিরেছিলেন। বাবলি জানতে পারেনি। কাকিমার মুখে সেই এক কথা। বিমানবাবুর স্ত্রীর বিলাপ। ছেলেমেয়েদের কান্নাকাটির কথা।

বাবলির ভালো লাগছিল না ওসব কথা শুনতে। ও মনে মনে যখন এক দারুণ আনন্দময় অবস্থার মধ্যে অবস্থান করছিল সেইসময় কারও করুণ দুঃখের কাহিনী, তার শোকাবহতা; এসব কিছুই বাবলি শুনতে রাজি ছিল না। তাছাড়া আশ্চর্য! বাবলি নিজেও ভেবে অবাক হল যে, কাকিমার এই মন খারাপ, বিমানবাবুর মৃত্যুর এই শোক তার মনকে একেবারে স্পর্শমাত্র করল না। সেই মুহূর্তে ওর বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল যে পৃথিবীতে মৃত্যু আছে, শোক আছে, কাউকে হারাবার বিয়োগব্যথা আছে। ওর সমস্ত মনে আনন্দ, সমস্ত রকম আনন্দর যোগফল তখন ওর পায়ের রূপোর পায়জোরের মতো চলতে ফিরতে ঝুমঝুম করে বাজছিল।

ঘণ্টা দুয়েক ঘুমিয়ে উঠে বাবলি বাথরুম থেকে ঘুরে এল মুখ-টুখ ধুয়ে। ভালো করে চুলটা বাঁধল। আজ চান করার সময় শ্যাম্পু করেছিল ও। চুল বাঁধল, আইব্রো পেনসিল বোলাল ভুরুতে—তারপর সাদা জমির ওপর কালো ছাপার কাজের একটা অর্গান্ডি শাড়ি বের করল আলমারি থেকে। সঙ্গে কালো সিল্কের ব্লাউজ, কালো ব্রেসিয়ার, ছাইরঙা সায়া। কালো পাথরের একটা তিব্বতি মালা বের করল ড্রয়ার থেকে। তারপর কালো একটা হ্যান্ডব্যাগ নিয়ে ঠিক পৌনে চারটার সময় বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে।

দিল্লিতে এ সময়টা ভীষণ গরম পড়ে। বাসের জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই ঘেমে উঠল বাবলি। ট্যাকসিই নিত একটা, কিন্তু ট্যাকসি স্ট্যান্ডে ট্যাকসি ছিল না।

কনট সার্কাসে যখন গিয়ে ও নামল, তখন চারটে বেজে কুড়ি। বাসে একেবারে ঘেমে নেয়ে উঠেছিল বাবলি। ভীষণ রাগ হচ্ছিল ওর। কটেজ ইন্ডাস্ট্রির রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসে একটা কোকা-কোলার অর্ডার দিল বাবলি। পাখার নিচের টেবিল বেছে নিয়ে বসল ও। ও কামনা করছিল যে, অভী একটু দেরি করে আসুক। ওর ঘামটা ততক্ষণে শুকিয়ে যাক। ও চায় না যে, অভী এসে ওকে এমন ভূতের মতো দেখুক।

কোকা-কোলাটা খাওয়ার পর দেখল ঘড়িতে প্রায় সাড়ে চারটে বাজে। ততক্ষণে ওর ঘাম শুকিয়ে গেছে। তবুও একবার উঠে গিয়ে কটেজ ইন্ডাস্ট্রির এম্পোরিয়ামের ভেতর ঢুকে লেডিজ রুমে গিয়ে ভুরুটা ঠিক করে নিল। ঠোঁটটা গরম হাওয়ায় শুকিয়ে গিয়েছিল। পাতলা করে ভেসলিন বুলিয়ে নিল একটু। তারপর রেস্তোরাঁতে ফিরে এল। তখনও অভী আসেনি।

অভী এল চারটে চল্লিশে। একটা সাদা রঙের ট্রাউজার আর তার ওপরে খয়েরি-রঙা ফ্রেড-পেরি গেঞ্জি পরে অভী রেস্তোরাঁর মুখে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিকে চেয়ে বাবলিকে খোঁজার চেষ্টা করছিল।

ওর গেঞ্জির বোতামগুলো সব খোলা ছিল। কপালে চুল লেপ্টে ছিল ঘামে। লম্বা সুগঠিত শরীরের অভীকে অনেক অনেক সুন্দর স্মার্ট পাঞ্জাবি ছেলেদের পটভূমিতেও স্ট্রাইকিংলি হ্যান্ডসাম দেখাচ্ছিল। বাবলি অবাক হল ভেবে যে,—ইম্ফল থেকে ডিমাপুর আসার পথে অভীর এই পুরুষালি সৌন্দর্য কেন একবারও ওর চোখে পড়েনি? কে জানে? ভাবল বাবলি, ওর চোখ দুটোই হয়তো এখন বদলে গেছে। অভী হয়তো আগের মতোই আছে।

বাবলি উঠে দাঁড়াল, উঠে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ল অভীকে।

অভী হাসল। হেসে কাছে এল। তারপর চেয়ার টেনে বাবলির সামনে বসে পড়েই বলল, এ জায়গাটা বেশ স্টাফি—যদিও সামনেটা খোলা। চলুন কিছু খেয়ে, বাইরে বেরিয়ে পড়ি।

বাবলি বলল, যা বলবেন।

তারপর বলল, আমারও এ জায়গাটা ভালো লাগে না। সব সময় লোক গিজ্‌গিজ করে—কনুইয়ে কনুইয়ে ঠেকে যায়।

অভী বলল, কী খাবেন বলুন?

বাবলি বলল, আমি খাওয়াব কিন্তু।

একটু থেমে বাবলি বলল, দহি-কচুরি খাব আমি। আপনি?

অভী বলল, আমি কিছুই খাব না। শুধু চা।

—না, তাহলে হবে না। আপনারও কিছু খেতে হবে।

অভী ওর বলার ধরন দেখে হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে বলল, আপনি এখনও বাচ্চা মেয়ে আছেন। বলে ফেলুন, না খেলে খেলব না।

বাবলি লজ্জা পেল। বলল, আ হাঃ, আমি মোটেই বাচ্চা নেই। বলুন কী খাবেন?

অভী বলল, তাহলে একটা দোসা খাব। প্লেন দোসা।

বাবলি বেয়ারাকে ডেকে খাবার অর্ডার দিল। তারপর অভীর দিকে ফিরে বলল, কী? শেষ পর্যন্ত ঘুম হয়েছিল?

অভী লজ্জা পেল। রাতে কেন সে এমন ছেলেমানুষি করেছিল, তা ভেবেই ওর লজ্জা লাগছে। ও বলল, না। বউদি পোলাও-মাংস রান্না করেছিলেন; তাই বোধহয় খেয়ে পেট গরম হয়ে থাকবে।

বাবলিও কথা ঘুরিয়ে বলল, এখন ভালো আছেন?

অভী বলল, হ্যাঁ। ভালো। আপনাকে দেখেই হয়ে গেলাম।

বাবলি কপট রাগ দেখিয়ে বলল, ইস্‌-স্‌, বানিয়ে বানিয়ে বলতে হবে না।

খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে বিল মিটিয়ে ওরা যখন জনপথ ধরে হেঁটে যেতে লাগল পাশাপাশি, তখন রোদের তেজ একটু কমেছে। কিন্তু সন্ধ্যা হতে তখনও অনেক দেরি। সাতটার আগে দিল্লিতে সন্ধে হয় না গরমের দিনে। পথঘাট সব তেতে রয়েছে। একটা গরম ঝাঁঝ উঠছে চতুর্দিক থেকে।

ওরা ধীরে ধীরে তিব্বতি রিফিউজিদের দোকানগুলোর সামনে দিয়ে যাচ্ছিল।

হঠাৎ বাবলি বলল, দাঁড়ান, আপনাকে দুটো কাফ-লিংকস্‌ কিনে দিই।

অভী আপত্তি করল না।

বাবলি বেছে বেছে একজোড়া কাফ-লিংকস্‌ কিনে দিল।

ওরা ইম্পিরিয়াল হোটেল ছাড়িয়ে, ওয়েস্টার্ন কোর্ট ছাড়িয়ে জনপথ হোটেলের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল।

অভী হঠাৎ বলল, কাউকে কিছু দিতে আপনি খুব ভালোবাসেন, না?

বাবলি মুখ ঘুরিয়ে অভীর দিকে তাকাল।

বলল, সকলকে না। কাউকে-কাউকে।

পরেই বলল, আপনি ভালোবাসেন না দিতে?

অভী বলল, মাকে, দিদিকে, দাদা-বউদিকে দিতে ভালো লাগে। বন্ধুদেরও। তবে বাইরের লোককে কখনও কিছু দিইনি।

'বাইরের লোক' কথাটা বাবলির কানে লাগল। একটু গম্ভীর হয়ে বলল, হ্যাঁ, বাইরের লোকদের কিছু দেবেন না। মিছিমিছি অপচয় করবেন কেন?

অভী হাসল। বলল, কথাটা আপনি বুঝলেন না। আমি বলতে চেয়েছিলাম যে, দেবার মতো কোনো সম্পর্ক মা-দিদি-দাদা-বউদি ছাড়া এখনও কোনো মানুষের সঙ্গে তেমনভাবে পাতানো হয়নি। হবে হয়তো। হয়তো শিগ্‌গিরই হবে।

বলেই, বাবলির মুখের দিকে তাকাল।

কেন জানে না, দিল্লি জায়গাটা অভীর দারুণ লাগে। শুধু খারাপ লাগে এক কারণে যে পুরো ভারতবর্ষের, বিশেষ করে কলকাতার দারিদ্র্য, নোংরা, ভিড়, অসুবিধা, কষ্ট এসব দেখে এসে দিল্লি যে ভারতবর্ষেরই রাজধানী, একথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। কনট সার্কাসের রঙিন ফোয়ারার খরচে অনেক হাসপাতাল, অনেক বেশি প্রয়োজনীয় জিনিস বানানো যেত হয়তো। তাই এই অসাম্যটা বড় চোখে লাগে।

এছাড়া দিল্লির কোনো খুঁত নেই। বিশেষভাবে নতুন দিল্লির চওড়া চওড়া পথঘাট, চমৎকার আবহাওয়া। হাঁটতে, বেড়াতে খুব ভালো লাগে অভীর এখানে।

ওরা কোটার মহারাজার বাড়িটা বাঁদিকে রেখে এম পি-দের বাংলোগুলো ডানদিকে রেখে হাঁটতে লাগল। বড় বড় গাছ ছায়া ফেলেছে পথে। গাড়ি, সাইকেল সব ছুটে চলেছে অফিস ছুটির পর। ওরা দুজনে নানারকম কথা বলতে বলতে হেঁটে চলেছে তো হেঁটে চলেইছে। যেসব কথার মানে নেই কোনো। মিরান্ডা হাউসের গল্প। এ গল্প, সে গল্প। অফিসের গল্প।

অভী কথা বেশি বলছে না। শুনছে বেশি। বাবলিই বক্‌বক্ করছে।

ওরা একটা পথ পেরোবে, এমন সময় একটা টোয়োটা গাড়ি, সাদা-রঙা, দাঁড়িয়ে পড়ল ওদের দেখে, পথের বাঁপাশে থামল। অভী দেখল, স্টিয়ারিং-এ বসা, একটি পাঞ্জাবি মেয়ে হাত নাড়িয়ে বাবলিকে ডাকছে।

বাবলি হাত নাড়িয়ে ওকে হাত দিয়ে এগিয়ে যেতে ইশারা করে বলল, থ্যাংক য়্যু অনীতা, থ্যাংক য়্যু। উই আর এনজয়িং দ্য ওয়াক। থ্যাংক য়্যু ভেরি মাচ।

অভী শুধালো না কিছু।

একটু পরে বাবলি নিজেই বলল, আমার বন্ধু অনীতা সাবারওয়াল। আমার সঙ্গে মিরান্ডা হাউসে পড়ত। এখানে বাটিকের দোকান করেছে একটা। খুব ভালো ব্যবসা। ওর স্বামীর কীসব কারখানা-টারখানা আছে ফরিদাবাদে। ভদ্রলোক এঞ্জিনিয়র।

অভী বলল, তাই বুঝি?

অনীতার কথা উঠতেই বাবলি হঠাৎ বলল, আচ্ছা আপনি ঝুমাকে চেনেন? ঝুমা সেন। এয়ার হোস্টেস। ওকে একবার দেখলে ভোলবার কথা নয়। দারুণ সুন্দরী।

বলেই, একঝলক দেখে নিল অভীর চোখে।

অভীর মুখে কোনো ভাবান্তর হল না।

হল না দেখে, বাবলি খুশি হল।

অভী বলল, নাম তো মনে নেই। একজন এয়ার হোস্টেসের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, বাঙালি;

কলকাতায় ক্লাবে সাঁতার কাটতে গিয়ে। হ্যাঁ, এখন মনে পড়ছে, বেশ ভালোই দেখতে। তবে মনে করে রাখার মতো কিছু বলে তো মনে হয়নি।

তারপর বলল, আসলে শুধুই চেহারাটা বোধহয় কোনো ব্যাপার নয়। আমার চোখে বোধহয় খুব সুন্দরী হলেই কাউকে অ্যাট্রাকটিভ ঠেকে না। হয়তো এই আমার দোষ, কিংবা গুণ; জানি না।

বাবলি বলল, ঝুমাও আমাদের সঙ্গে পড়ত। এবার আসবার সময় দমদম এয়ারপোর্টে দেখা হল ওর সঙ্গে। ও কিন্তু আপনার সম্বন্ধে না—বলেই, চোখ বড় বড় করে ভুরু নাচিয়ে বলল, যাকে বলে একেবারে—কী বলব—হেড ওভার হিল্‌স। আপনার স্যুইমিং কস্ট্যুম পরা ছবি হ্যান্ডব্যাগে করে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঝুমা। এ খবর কি আপনি রাখেন?

কথাটা বলে ফেলেই বাবলি বুঝতে পারল যে ভুল করেছে ও। বাবলি ভাবল, অভী বাবলির চোখে একটা অপ্রত্যাশিত ঈর্ষার আগুন নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবে।

নিজেকে অভিশাপ দিতে লাগল বাবলি কথাটা মুখ ফুটে বলার জন্যে।

অভী একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আশ্চর্য।

তারপর বলল, ইটস্ ভেরি কাইন্ড অফ হার। তবে, আমার সঙ্গে ও'র আলাপ নিতান্তই ফর্ম্যাল আলাপ।

বাবলি কথাটার মোড় ফেরবার জন্যে বলল, ও আমার সঙ্গে পড়ত তো, তা-ই।

অভী ইন্‌ডিফারেন্ট গলায় যেন অনেক দূর থেকে বলছে, এমনভাবে বলল, আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধু?

বাবলি সতর্ক হয়ে গেল। কী জবাব দেবে ভেবে পেল না।

বলল, যখন একসঙ্গে কলেজে পড়তাম, তখন ঘনিষ্ঠতা নিশ্চয়ই ছিল। এখন অবশ্য দেখাসাক্ষাৎ নেই।

অভী হঠাৎ বলল, উনি কি ইম্ফলের ফ্লাইটে যান কখনও?

বাবলি মিথ্যা কথা বলল। বলল, জানি না।

বাবলির গলাটা এমন শোনাল যে, ও যে শুধু জানে না, তা-ই নয়, জানতে চায়ও না।

অভী বলল, আমি যেদিন ইম্ফল থেকে আসি, তার আগের দিন অফিসে একজন এয়ার হোস্টেস আই এ সি-র অফিস থেকে ফোন করেছিলেন। আমি অফিসে ছিলাম না তখন, আমার টেবলে মেসেজটা লেখা ছিল। তখন মনে হয়েছিল, অপারেটর ভুল মেসেজ নিয়েছে। কারণ আমি মোটেই স্যুইমিং ক্লাবে দেখা আপনার বান্ধবী যে ইম্ফলে এসেছেন, এ ব্যাপারটা কানেক্ট করতে পারিনি তখন। এখন তো মনে হচ্ছে, মিস সেন তাহলে উনিই হবেন হয়তো।

বাবলির খুব রাগ হল মনে মনে। ঝুমার এই গায়ে-পড়া জোর করে ভালোবাসা স্বভাব দেখে ঘেন্নাও হল। কিন্তু দোষটা বাবলির। কেন এই প্রসঙ্গ ও তুলতে গেল?

পরক্ষণেই অভী বলল, অত্যন্ত স্বল্পপরিচিত একজন ভদ্রলোককে এমনভাবে ফোন করে দেখা করতে বলাটা বেশ ব্যাড টেস্ট কি বলুন? তবে আমার মনে হয়, উনি নিশ্চয়ই আমার পিসতুতো দাদার কাছ থেকে কোনো জিনিস নিয়ে এসেছিলেন—অথবা কোনো খবর দেওয়ার ছিল—নইলে কেনই বা ফোন করবেন? কোনো কাজ না থাকলে কি কেউ এমনভাবে ফোন করতে পারেন?

বাবলি বলে উঠল, মেসেজ দেওয়ার থাকলে তো ফোনেই দিতে পারত। পারত না?

অভী যেন একথাটা জানত না, এমনভাবে বলল, ও হ্যাঁ। তা-ই-ই তো। এ কথাটা মনে হওয়া উচিত ছিল আমার।

এরপরই অভী যেন কীরকম গম্ভীর হয়ে গেল।

বাবলির মনে হতে লাগল, ঝুমার প্রসঙ্গ উঠতেই অভীর এই পরিবর্তন। তবে কি ঝুমা ইতিমধ্যে

অভীর সঙ্গে দেখাও করেছে? বাবলি যে ঝুমাকে ঈর্ষা করে এ কথাটা যে অভীর কাছে গোপন রইল না এটা বুঝতে পেরেই বাবলির ভীষণ খারাপ লাগতে লাগল। অভীর সঙ্গ ওর আর একটুও ভালো লাগছিল না যেন। ওর মনে হতে লাগল, ও যেন পালাতে পারলে বাঁচে।

একটু পরে বাবলি বলল, এবার কিন্তু আমাকে বাড়ি যেতে হবে।

বাবলি ভেবেছিল, অভী বলবে, সে কি? এত তাড়াতাড়ি কীসের?

কিন্তু অভী বলল, হ্যাঁ, আমারও কাজ আছে। তারপর নেমন্তন্ন আছে।

বাবলি চুপ করে রইল। বাবলির খুব রাগ হচ্ছিল। নিজের ওপর তো বটেই। অভীর ওপরও। এতই যদি কাজ তাহলে রাত বারোটার সময় ফোন করে দেখা করতে বলা কেন? সত্যি সত্যিই ক্যাবলা লোকটা।

বাবলি ভাবল, এর সম্বন্ধে এ ক'দিনে মনে মনে যে সুন্দর ধারণাটা গড়ে উঠেছিল, তা বুঝি ভুল। ওর মনের ধারণাটা বুঝি ভুল। অভী নিতান্তই সাধারণ ছেলে। ঝুমার চেহারা দেখেই ঝুমা ওর প্রতি ইন্টারেস্টেড শুনেই বাবলির প্রতি সমস্ত ইন্টারেস্ট চলে গেছে। বাবলি মনে মনে রায় দিল যে, এসব বাজে ছেলে বাবলির যোগ্য নয়।

অভী একটা ট্যাক্সি ধরেছিল। বাবলিকে আবার কনট সার্কাসেই নামিয়ে দিল। ওখান থেকে বাস, স্কুটার, ট্যাক্সি, সবই পাওয়া সোজা।

বাবলি ট্যাক্সি থেকে নেমে, খুব জোরে দরজাটা বন্ধ করল। প্রায় অভীর কানে তালা লাগিয়ে।

অভী চমকে মুখ-তুলে তাকাল বাবলির দিকে।

তারপর জানালা দিয়ে মুখ বের করে বাবলিকে বলল, এ্যাই! রাগ করলেন? সত্যিই কাজ আছে? বিশ্বাস করুন। আমি মেয়েদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে জানি না। একটু বেরসিক আছি। কোনো দোষ হয়ে থাকলে ক্ষমা করবেন।

বাবলি হাসবার চেষ্টা করল। বোধহয় হাসলও। হাত নাড়ল।

অভী আবার বলল, কাল সন্ধে লাগতে না লাগতেই আপনাদের বাড়ি পৌঁছব। কী কী খেতে ভালোবাসি মনে আছে তো? না আবার বলব?

পেছনে অনেক গাড়ি ছিল। এতক্ষণ ট্র্যাফিক লাইটটা লাল ছিল। কখন যে হলুদ হয়ে সবুজ হয়ে গিয়েছিল, খেয়াল ছিল না অভীর। পেছন থেকে প্রাইভেট গাড়ি, ট্যাক্সি ও ভটভটিয়ার এঞ্জিনের যুগপৎ আর্তনাদে এবং দাড়িওয়ালা এবং দাড়ি-ছাড়া পাঞ্জাবিদের শাঁখের আওয়াজের মতো সুখকর সম্বোধনে ট্যাক্সিটাকে আর দাঁড় করিয়ে রাখা গেল না।

বাবলি উত্তরে কী বলল, শোনা হল না অভীর।

অভীর মনে হল, এতগুলো গাড়ির এক্‌জস্ট পাইপের চোখ জ্বালা-করা ধোঁয়ার মধ্যে বাবলি বুঝি হারিয়ে গেল।

বাবলি এক গমগমে গর্বময় প্রত্যাশায় ভর করে আজ বিকেলে কনট সার্কাসে এসে বাস থেকে নেমেছিল।

একটা ট্যাক্সিতে ও যখন উঠে বসল, তখন ও আশাভঙ্গতার গ্লানিতে, অপমানের ঘামে জবজবে হয়ে গেছিল।

ঘামে জবজবে হয়ে, একবুক অভিমান নিয়ে ও ট্যাক্সির পেছনের সিটের সঙ্গে গা এলিয়ে বসে রইল।

ট্যাক্সিটা হু-হু করে হাউজ-খাস এনক্লেভের পথে ছুটে চলল।

তখনও গরম রুক্ষ রাজস্থানি হাওয়া এসে থাপ্পড় মারতে লাগল ওর চোখেমুখে। ওর বুকের

ভেতর পর্যন্ত এক অকারণ অবুঝ জ্বালায় জ্বলতে লাগল। বাবলি ঠিক করল, বাড়ি গিয়ে অনেক—অনেকক্ষণ ধরে ও চান করবে।

৮

সত্যি সত্যিই সন্ধে লাগতে না লাগতেই অভী এসে পৌঁছেছিল ওদের বাড়িতে।

কাকা তখনও আসেনি। কাকিমা বাড়ি ছিলেন।

সারা সকাল ও দুপুর ধরে কাকিমাকে সাহায্য করেছে বাবলি। ভিনিগারে স্যালাড ভিজিয়ে রেখেছে, চপের পুর বানিয়েছে, ফ্রায়েড রাইসের বন্দোবস্ত করেছে। আসল আসল পদ কাকিমা নিজেই রেঁধেছিল। বাবলি শুধু আনারসের চাটনিটা রেঁধেছিল।

কাকার কথামতন বিয়ার আনিয়ে ফ্রিজে রেখে দিয়েছিল। ফিশফিঙ্গার সব ঠিকঠাক করে রেখেছিল, কাকা এলেই গরম গরম ভেজে দেবে ওদের—যাতে বিয়ারের সঙ্গে খেতে পারেন ওঁরা।

চারটে বেজে যেতেই কাকিমা বলেছিলেন, তুই এবার হাউসকোট ছেড়ে গা-টা ধুয়ে নে বাবলি। অভী যদি তাড়াতাড়ি সত্যিই আসে, তাহলে ওর সঙ্গে কথা বলবে কে? আমার সবকিছু করে চান-টান সেরে আসতে দেরি হবে অনেক।

বাবলি বলেছিল, দাঁড়াও কাকিমা, স্যালাডটা সাজাই। তারপর বসবার ঘরে, খাওয়ার টেবলে ফুল সাজাতে হবে না বুঝি?

খুব ভালো করে ফুল সাজিয়েছিল সব ঘরে বাবলি। দিল্লির এক জাপানি ভদ্রমহিলার 'ইকেবোনা' স্কুলে কিছুদিন ক্লাস করেছিল ও। অনেক কিছু শিখেছিল, কী করে কোন্ পাতার সঙ্গে কী ফুল কেমনভাবে সাজাতে হয়। আজ যেমন যত্ন করে মেঝেতে হাঁটুমুড়ে বসে ফুল সাজাতে বসল বাবলি, তেমন যত্ন ভরে কখনও সাজিয়েছে বলে ওর মনে পড়ল না।

কাকিমা শেষে ধমক লাগালেন। বললেন, কি রে? তুই চান করতে যাবি কি যাবি না?

চান করে উঠে খুব সাধারণ অথচ খুব সুন্দর করে সাজল বাবলি। একটা সাদা খোল লাল পাড়ে টাঙ্গাইল শাড়ি পরল ও! সঙ্গে লাল-রঙা ব্লাউজ। চুড়ো করে খোঁপা বাঁধল মধ্যে ফলস-খোঁপা ভরে। আলমারি খুলে রুবির দুল পরল, রুবির মালা এটা। চুলে হেয়ার-স্প্রে লাগাল। গায়ে হালকা করে ইন্টিমেট। তারপর লাল গোলাপ গুঁজল একটা চুলে, কানের পেছনে। চোখে কাজল লাগাল। লাল টিপ পরল একটা সিঁদুরের; কপালে।

সাজা শেষ হলে, আয়নার সামনে এসে দাঁড়িয়ে সিন্ডারেলার মতো আয়নাকে শুধোলো, বলো তো আয়না, কে বেশি সুন্দরী? ঝুমা না বাবলি? বলো না আয়না?

আয়নার কাছ থেকে কোনো জবাব পাবে না জানত বাবলি। কিন্তু আয়নার সামনে মুখ উঁচু করে দাঁড়িয়ে, নিজের দিকে নিজের সুস্নাতা, সুসজ্জিতা, সুগন্ধি শরীরের দিকে তাকিয়ে বাবলির খুব পছন্দ হল নিজেকে। দাঁতে দাঁত চাপল বাবলি। বলল, ঝুমা—তুই জানিস না। তুই জানিস না। তোকে আমি হারিয়ে দেব। তোকে আমি বলে বলে হ্যান্ডস্-ডাউন হারাব।

অভী যখন এল, তখন বাবলির প্রসাধন শেষ হয়ে গেছে। তবুও ও ইচ্ছা করে নিজে দরজা খুলতে গেল না বেলের আওয়াজ শুনে। কিষাণ সিং গিয়ে দরজা খুলে বসাল অভীকে, বসবার ঘরে।

মিনিট পাঁচেক পরে, যেন জানেই না অভী কখন এসেছে, এমনভাবে বাবলি বসবার ঘরে ঢুকে অবাক হওয়ার ভান করে বলল, ওমা! কখন এলেন?

অভী কথা বলল না। একদৃষ্টে বাবলির দিকে চেয়ে রইল।

অনেকক্ষণ—অনেকক্ষণ চেয়ে রইল।

বাবলির সেই সন্ধেবেলার শান্ত, স্নিগ্ধ উজ্জ্বল চোখ দুটি ওর দু'চোখ ভরে রইল। অভীর হঠাৎ মনে হল, এইরকম কোনো শান্ত স্নিগ্ধ দৃশ্য বুঝি ও আগে কখনও দেখেনি। ওর মনে হল এইজন্যেই বিবাহিত পুরুষেরা বুঝি অফিসের পর বাড়ি ফেরার জন্যে এত পাগলের মতো করে। তারপর সকলের জন্যেই কি এমন দৃশ্য অপেক্ষা করে থাকে? জানে না অভী। যদি থাকেই, তাহলে বলতে হয় বুদ্ধিমান লোকমাত্রেরই বিয়ে করা দরকার।

বাবলি পর্দার কোণায় দাঁড়িয়েছিল স্থাণুর মতো।

অনেকক্ষণ কেটে গেল। তবুও যখন অভী কথা বলল না, বাবলি হাসল। বলল, কী দেখছেন এমন করে? আমি কি সাদা বাঘ?

অভী বলল, না। এমনিই দেখছি। আপনাকে ভালো দেখাচ্ছে। এই গরম হাওয়ায় চোখে জ্বালা ধরে গিয়েছিল ট্যাকসিতে আসতে আসতে। চোখ জুড়িয়ে গেল আপনাকে দেখে।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, আপনি কি সকলের জন্যেই এমন সুন্দর করে সাজেন?

বাবলি রেগে গেল। বলল, সকলের জন্যে মানে? আপনার কি ধারণা রোজই আমি এমন করে সেজে থাকি নতুন নতুন অতিথির জন্যে?

তারপর বলল, আমাকে এমন অসম্মানজনক কথা বলার অধিকার আপনাকে কে দিল? আমি তো দিইনি।

অভী প্রথমে অবাক হল। তারপর হেসে ফেলল।

বলল, নাঃ আপনি বড় ঝগড়াটে। আমার মা একটা কথা বলতেন আমার এক কাকিমা সম্বন্ধে। বলতেন ও বাতাসের সঙ্গে ঝগড়া করে। কথাটার মানে বুঝতাম না। আপনাকে দেখে এতদিনে বুঝলাম, বাতাসের সঙ্গে ঝগড়া করা কাকে বলে।

বাবলির মুখ অভিমানে গোলাপি হয়ে গিয়েছিল।

অভী কথা ঘোরাবার জন্যে বসবার ঘরের কোণার কটেজপিয়ানোটা দেখিয়ে বলল, আপনি বাজান? পিয়ানো?

বাজাতাম। কাটা জবাব দিল বাবলি।

বলেই, উলটোদিকের সোফায় বসে পড়ল।

অভী বলল, পিয়ানো শুনতে আমার দারুণ লাগে। ডো-রে-মী-ফা সো-লা টি-ডো।

বাবলি ঠাট্টা করার গলায় বলল, সাউন্ড অব মিউজিক দেখেছিলেন বুঝি? নইলে সা-রে-গা-মা-র ইংরেজি নাম শুনে এত শিহরন হবে কেন।

অভী অপ্রতিভ হয়ে বলল, আপনি লোককে খুব অপদস্থ করতে পারেন। ইচ্ছে করে অপদস্থ করেন যখন-তখন। এমন করে খুব আনন্দ পান আপনি, না?

তারপরই বলল, বাজান না বাবা এত করে বলছি।

বাবলি বলল, থাক, অত পিয়ানো শুনে কাজ নেই।

একটু পরে বলল, কী খাবেন বলুন? কাকা আপনার জন্যে বিয়ার আনিয়ে রাখতে বলেছিলেন। ফ্রিজে আছে—। আনি? খান ততক্ষণে, কাকা না আসা পর্যন্ত।

অভী বলল, বাঃ নিমেষদার খুব দূরদৃষ্টি আছে তো। দিল্লির এই গরমে বিয়ার খাওয়া মন্দ না। তবে কিছু মনে করবেন না, আমি খাব না। আমার পৈটিক গোলযোগটা এখনও আছে।

বাবলি বলল, শুধু পৈটিক নয়, মনে হয় মানসিক গোলযোগও আছে।

ইতিমধ্যে কাকা এলেন।

এসেই বলল, কি হে? কখন এলে?

—এই একটু আগে—বলে অভী উঠে দাঁড়াল।

কাকা বললেন, রাজীব আর সোমা এল না? ওদের এত করে বললাম।

অভী ওকালতি করল। বলল, ওয়েস্ট জার্মানির অ্যাম্‌বাসাডরের বাড়ি ওদের একটা নেমন্তন্ন আছে, না গেলেই নয়।

কাকা টাই খুলতে খুলতে বললেন, তাহলে আর কী করবে? বাবলির অ্যামবাসাডর কি ওয়েস্ট-জার্মানির অ্যামবাসাডরকে টেক্কা দিতে পারে?

বাবলি আবার রেগে উঠে বলল, বাবলির অ্যাম্‌বাসাডর মানে?

কাকা হেসে বললেন, বাবলির প্রতিভূ, আবার কী? আমি, আমি, অন্য কেউ নয়।

বলেই বালির দিকে চেয়ে বললেন, তুই অত চটে যাচ্ছিস্ কেন?

বাবলি বলল, না। আমার এরকম রসিকতা ভালো লাগে না।

কাকা অভীর দিকে চেয়ে চোখ নাচিয়ে বললেন, ভেবেছিলাম রাজীবের ভাইটা ভদ্র সভ্য। একা ঘরে বসে আমার অবলা ভাইঝিকে কী বলেছ হে ছোকরা, যে ভাইঝি আমার এমন চটিতং হয়ে আছেন? ওয়ার্থলেস্ তুমি। আমার মতোই ওয়ার্থলেস। কী করে মেয়েদের প্লিজ করে কথাবার্তা বলতে হয় তুমি কিছুই জানো না। শেখোনি কিছুই।

তারপর সোফায় বসে পড়ে বললেন, বুঝলে অভী, আজ বাবলির মেজাজ গরম হওয়ার কারণ আছে। সকালবেলাতেই এক বুড়ো পাঞ্জাবি ভদ্রলোক অনেক মিঠাই মণ্ডা ফল-টল নিয়ে হাজির বাড়িতে। জানা গেল বাবলির অ্যাসেসি—তাঁর ইনকামট্যাকসের কেস বাবলির কাছে। বাবলির কাছেই শুনলাম, বাবলি নাকি কীসব গোলমাল-টোলমাল ধরে ফেলেছে ব্যালান্স সিটে।

ভদ্রলোক বাড়ি আসাতে বাবলি তো চটে লাল। ভদ্রলোককে অপমান করে তাড়িয়ে দিল বাড়ি থেকে। বুড়োর চোখে প্রায় জল এসে গেল। বুড়ো বারবার বললেন, যে তোমার কাছে কোনো ফেভার চাইতে আসিনি আমি। আমার এক মেয়ে ছিল, হুবহু তোমার মতো দেখতে। তা-ই তোমাকে দেখেই আমার বড় মায়া পড়ে গেছে। আমাকে এমন করে তাড়িয়ে দিয়ো না।

কিন্তু বুঝলে ভায়া, একে অফিসার তার উপর কড়া অফিসার—ইন্দিরা গান্ধীর দিল্লিতে এমন মেয়েদের দৌরাত্ম্যের কথা তো সে বুড়ো জানে না। সে অন্ধ অপত্য স্নেহে ভর করে বাড়িতে এসেছিল। অ্যাসেসিরা কেউ-ই যে মানুষ নয়, তারা যে সকলেই সন্দেহ করার, ভয় করার, অবিশ্বাস করার লোক এ কথাটা বাবলি বোধহয় ইতিমধ্যেই বুঝে ফেলেছে।

অভী বলল বাবলিকে, বাবলির দিকে চেয়ে, সত্যিই তাড়িয়ে দিলেন?

কাকা বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ—তাড়িয়ে দিল—সমস্ত মিষ্টি ফল-টল সমেত। আমার আবার মিষ্টি খুব ফেভারিট।

অভী বলল, এতক্ষণে বুঝলাম, উনি এত রেগে রয়েছেন কেন?

কাকা বললেন, বোঝোনি। কিছুই বোঝোনি। ও আসলে রাগল বুড়ো চলে যাওয়ার পরে।

আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম যে, বুড়োর ব্যালান্স-সিটে গোলমালটা কীসের? তখন বাবলি যা বলল তাতে বুঝলাম যে বাবলি ছেলেদের মন-টন যতটা বোঝে অ্যাকাউন্ট্যান্সিটা ততটা বোঝে না। ভদ্রলোককে ও মিছিমিছি অপমান করল। আমার কাছে এ কথা শোনামাত্র ও সেই যে রাগল, তারপর থেকে রাগের পারা আর নিচে নামেনি।

বাবলি রেগে উঠে দাঁড়াল এবার।

বলল, কাকা ভালো হচ্ছে না। একজন আউটসাইডারের সামনে আমার অফিসসংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করা আমার মোটেই পছন্দ নয়—বলেই, বাবলি রেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কাকা কোটটা তুলে নিয়ে অভীর দিকে চোখ ফিরিয়ে দুষ্টুমির হাসি হেসে বললেন, কেমন বুঝলে হে?

তারপর টাইটা খুলে ফেলে বললেন, বাগ মানানো খুব শক্ত। আরে সমস্ত মজাটা তো সেইখানেই। তবে আমার ভাইঝির মতো মেয়ে হয় না—আ জেম্ অফ আ গার্ল। সবদিক দিয়ে।

তারপর ফিসফিস করে বললেন, আমি ঘাস খাই না তোর দাদার মতো। তোর পছন্দ ভালো। লেগে থাক্। আরে তেজি ঘোড়াকে বাগ বানানোর মজাই আলাদা—দু চার বার চাঁট্‌টি খাবি, চাঁদি ফেটে যাবে—তাতে কী? মরদের বাচ্চা হবি তো তেজি ঘোড়ায় চাপবি। তুইও কি তোর দাদার মতো ভালো-মানুষ নাকি? তুইও কি দা র‍্যাম্ব? মেয়েদের কথায় উঠবি বসবি?

অভী কিছু জবাব দেবার, বা ভালো করে বোঝবার আগেই কাকা উঠে দাঁড়িয়ে কোট কাঁধে ঝুলিয়ে বাবলির ঘরের দিকে গেলেন।

অভী শুনতে পেল, বাবলিকে উনি বললেন, ওরে বাইরের লোক ঘরে বসে আছে। সে তো আর ভেতরের ঘরে আসতে পারবে না। যা যা, তুই-ই যা। নেমন্তন্ন করে লোকে অতিথির সঙ্গে এমন ব্যবহার করে?

তারপরই কাকা জোরে জোরে রবীন্দ্রনাথে গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে নিজের ঘরের দিকে গেলে—'ওরা পরকে আপন করে, আপনারে পর।'

একা ঘরে বসে দাদার বন্ধু নিমেষদাকে দেখে-শুনে অভী হেসে উঠল। বেজায় রসিক আর সরল তো ভদ্রলোক। সত্যিই দাদার সঙ্গে কোনো মিলই নেই।

বাবলি একটু পরে ফিরে এল ঘরে বাচ্চা মেয়ের মতো মুখ ফুলিয়ে। ঝুপ করে বসে পড়ল সোফায়।

অভীর ওকে দেখে আশ্চর্য লাগছিল। ও যে গম্ভীর বুদ্ধিমতী, ম্যাচিওরড মেয়েটিকে জানত তার সঙ্গে এ বাবলির কোনোই মিল নেই।

বাবলি মুখ ফিরিয়ে বসে ছিল।

অভী বলল, আপনাকে এমনিতেই সুন্দর দেখায়, রাগলে যে এত সুন্দর দেখায় তা জানতে পেতাম না আজ আপনার বাড়ি না এলে।

তারপর বলল, একটা কথা বলব?

বাবলি মুখ তুলে বললে, কী?

—মেয়েদের সেন্স অব হিউমার কম। আমি কিন্তু ভেবেছিলাম আপনি তার ব্যতিক্রম। আপনার দারুণ সেন্স অব হিউমার আছে বলেই আমার ধারণা ছিল। আপনিও যে অন্য মেয়েদের মতো, তা আমার জানা ছিল না।

বাবলি বলল, অন্য কথা বলুন।

—কী কথা?

ইতিমধ্যে কাকিমা ঘরে এসে ঢুকলেন।

অভী দাঁড়িয়ে উঠে বলল, কেমন আছেন বউদি?

কাকিমা জবাব না দিয়ে বাবলিকে ভর্ৎসনার গলায় বললেন, তুই কি রে বাবলি? এতক্ষণ ওকে বসিয়ে রেখেছিস, বিয়ার-টিয়ার কিছু দিসনি?

বাবলি ঠাট্টার গলায় বলল, পৈটিক গোলযোগ।

অভী বলে উঠল, না না বউদি, খাবো। আপনি বললে খাব। বউদি তক্ষুনি বেরিয়ে গিয়ে কিষাণ সিং-এর সঙ্গে ফিরে এলেন, ট্রে-তে ঠান্ডা বিয়ারের বোতল বিয়ার মাগ বসিয়ে, সঙ্গে ফিশ-ফিঙ্গার নিয়ে প্লেটে।

তারপর সেগুলো নামিয়ে রেখেই আবার চলে গেলেন বোধহয় দাদাকে জামাকাপড় দিতে।

বাবলির ঠোঁটের কোণায় হাসি ফুটে উঠল। ও ভাবল, কাকিমা বিয়ারটা নিজেই আনতে পারতেন কিন্তু মেয়েরা নিজেরা পানপাত্র ও সুরা নিয়ে এলে বুঝি সাকি সাকি মনে হয়।

বাবলির হাসিটা অভীর চোখে পড়ে থাকবে। অভী শুধোলো, আপনি হাসছেন কেন?

—এমনিই। বাবলি বলল, এমনি হাসছি।

বলেই উঠে এসে অভীকে বিয়ারের বোতল খুলে বিয়ার ঢেলে দিল।

বলল, খান।

তারপর বলল, আমার কথায় খাওয়া গেল না, কাকিমা বলতেই খাওয়া হল। বেশ বেশ।

অভী হাসল। বলল, আপনি খাবেন একটু, শ্যান্ডি?

বাবলি ঠোঁট বেঁকাল।

বললো, আমার ওসব মেমসাহেবি ভালো লাগে না।

অভী এ কথায় মনে মনে খুশি হল।

পরমুহূর্তেই ভাবল, এখনও ও নিজে বেশ পুরাতনপন্থী ও স্বার্থপর আছে। নিজেরা সব কিছু করে, করতে পারে, কিন্তু মেয়েরা সেই জিনিস করলে চোখে লাগে; অপছন্দ হয়। হয়তো ও গোঁড়া, হয়তো ও পুরাতনপন্থী কোনো বিশেষ ব্যাপারে—কিন্তু তবুও অভীর খুব ভালো লাগল জেনে যে, বাবলি ড্রিংক করে না।

বাবলি বলল, যেন ওর মনের কথা বুঝতে পেরেই, আপনি যদি বিয়ে করেন, তাহলে আপনার স্ত্রীর ড্রিংক-করা আপনি পছন্দ করবেন?

অভী কী ভাবল একটু। তারপর বলল, বোধ হয় না।

বাবলি বলল, জানতাম। সব ছেলেরাই এরকম।

—মানে? বলে অভী চোখ তুলে তাকাল।

বাবলি বলল, সব ছেলেরাই পরস্ত্রীর ড্রিংক করাটা পছন্দ করে, নিজের স্ত্রীরা ড্রিংক করুক এটা কোনো আধুনিক ছেলেরই পছন্দ নয়।

অভী নিজেকে ডিফেন্ড করার চেষ্টা করল না। চুপ করে রইল।

হঠাৎ বাবলি কথা ঘোরাবার জন্যে বলল, তাহলে কাল চলে যাচ্ছেন? সকালের ফ্লাইটে?

—না। বিকেলের ফ্লাইটে। যাবেন এয়ারপোর্টে?

—না। বাবলি বলল, গিয়ে কী হবে? আরও কত লোক তো যাবে।

অভী বলল, কত লোক নয়। দাদা-বউদি ও আমার দু-একজন বন্ধুবান্ধব। আপনি যদি বলেন, তাহলে তাদের সকলকে যেতে মানা করে দিতে পারি। তাহলে কি আপনি খুশি হবেন?

—আমি তো তা বলিনি।

—তাহলে কী? আপনি যদি এতই একা একা থাকা ভালোবাসেন তাহলে আসুন ইম্ফলে। সেখানে আপনাকে সবসময় কম্পানি দেব। আমি ছাড়া আপনার কাছে আর কেউই থাকবে না। আপনি আমাকে জানার, কাছ থেকে দেখার সুযোগ পাবেন।

তারপরই গলা নামিয়ে প্রায় ফিসফিস করে বলল, পরীক্ষায় তো আমি ফেলও করতে পারি? পরীক্ষা আপনার নেওয়া উচিত।

বাবলি হাসল।

আলো-ভরা বসবার ঘরে লেমন-ইয়েলো ফোম-লেদারের সোফায় বসে-থাকা বাবলিকে সত্যিই ভীষণ সুন্দর দেখাচ্ছিল।

বাবলি বলল, আর আমি? আমারও পরীক্ষায় বসতে হবে তো।

অভী মুখ তুলল। বলল, হয়তো আপনি পরীক্ষায় না বসেই পাশ করে গেছেন।

বাবলি বলল, না। তা কেন হবে? সেটা ঠিক নয়। কোনো সময়েই কোনো অনুযোগ যেন না থাকে। কোনো ভুল বোঝাবুঝি যেন না থাকে। আমি পরীক্ষায় বসতে চাই। আপনারই মতো।

অভী বিয়ার মাগে এক চুমুক দিয়ে বলল, বেশ তো। তা-ই-ই হবে। দুজন পরীক্ষার্থী এবং দুজনই পেপার-সেটার। পরীক্ষাটা কেমন হবে তা-ই ভাবছি। কোনোরকম নেপোটিজম্ হবে না তো?

বাবলি হেসে ফেলল। বলল, জানি না।

তারপর কাকা এলেন চান করে পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে। এসেই বিয়ারের গেলাসে এক বড় চুমুক লাগিয়েই বললেন, আয় বাবলি আমরা দুজনে সেই গানটা গাই।

অভী বলল, অবাক গলায় বাবলির দিকে তাকিয়ে, আপনি গানও গান নাকি?

বাবলি লজ্জা পেল। মাথা নাড়াল। বলল, না না।

তারপর কাকার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, কী হচ্ছে কাকু? তুমি এসেই আবার গণ্ডগোল শুরু করলে?

কাকা গম্ভীর হবার ভান করে বললেন, হ্যাঁ এখন তো আমিই যত গণ্ডগোলের গোড়া। আমাকে এখন সমূলে উৎপাটন করার সময় হয়েছে তোমার। কাকার দিন ফুরিয়েছে।

বাবলি কথা ঘোরাবার জন্যে বলল, তুমি আর কাকিমা অভী থাকতে থাকতে এবার ঘুরে এসো না ইম্ফল?

কাকা বললেন, কেন, আমার বন্ধুর ছোট ভাইয়ের ঘাড়ে কেন উঠব তোর মেসো-মাসির অমন শক্ত ঘাড় থাকতে? উঠলে, ওদের কাছেই উঠব। যা কিপ্টে তোর মেসো। যাব তো ভেবেছি কতবার, একবারও কি নেমন্তন্ন করল?

বাবলি বলল, কীই-ই-ই খারাপ তুমি কাকু। কতবার মাসি ও মেসো লিখেছে তোমাকে। তুমি ভীষণ খারাপ লোক।

কাকা আরেক ঢোঁক বিয়ার গিলে বললেন, এখন সব খারাপ লাগবে। কাকাকে ভালোলাগার দিন ফুরিয়ে গেছে। কী বল্ বাবলি।

একটু পর কাকিমা এসে বসলেন।

অভীকে বললেন, যখন খেতে ইচ্ছে করবে, তার পনেরো মিনিট আগে বলবে অভী, আমি আর বাবলি সব ঠিকঠাক করব, কেমন?

অভী বলল, আচ্ছা।

তারপর অনেক গল্পগুজব হল। ইম্ফলের গল্প, কোহিমার গল্প। কোহিমা থেকে ডিমাপুর যাওয়ার পথে ওদের সেই নাগা কাঠুরের কুঁড়েতে রাত কাটাবার গল্প।

গল্পে গল্পে অনেক রাত হল। একসময় কাকিমা উঠে গেলেন। বাবলিও গেল কাকিমাকে সাহায্য করতে।

তারপর খেতে বসল ওরা সকলে।

খেতে বসে অভী বলল, বাঃ ফুল কে সাজিয়েছে বউদি? ভীষণ সুন্দর সাজানো হয়েছে কিন্তু! আপনি?

বউদি বললেন, আমি নই, বাবলি।

বাবলি! অভী ভাবল।

বাবলি মনে মনে খুশি হল। ও ভালো ফুল সাজায়, একথা ও জানে। সে জানায় কোনো নতুনত্ব নেই। কিন্তু পুরুষদের, বেশিরভাগ পুরুষদের চোখেই এসব পড়ে না। তাদের বেশিরভাগই জানে না, কী করে মেয়েদের এবং মেয়েদের নিজস্ব মেয়েলি গুণ স্বীকার করতে হয়। বাবলির ভেবে ভালো লাগল যে, অভী অন্য দশজন ছেলের মতো নয়।

গল্পগুজব করতে করতে ওরা সকলে একসঙ্গে বসে খেল।

খাওয়া শেষ হতে হতে প্রায় এগারোটা বাজল।

অভী খাওয়া শেষ করে উঠেই বলল, এবার কিন্তু আমাকে উঠতে হবে। তারপর কাকার দিকে ফিরে বলল, নিমেষদা, ফোনে আমাকে একটা ট্যাক্সি ডেকে দেবেন?

কাকা ধমকে উঠে বললেন, তোমার কি ব্যাপার বলো তা? তুমি কি আমার চাকরিটা খাবে? বাড়িতে গাড়ি থাকতে তোমাকে যদি এখন ট্যাক্সি করে যেতে দিই, তাহলে বাবলি কি আমাকে আস্ত রাখবে?

তারপরই কাকা গাড়ির চাবিটা দিয়ে বাবলিকে বললেন, এবার যা, অতিথির সঙ্গে অনেক খারাপ ব্যবহার করেছিস, এখন তার পাপ স্খালন করতে যা; অভীকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আয়।

বাবলি বলল, আমি কেন? তুমিই যাও।

কাকা বললেন, ও তো প্রায় খায়নি কিছুই। কিন্তু আমি? আড়াই বোতল বিয়ার, তার ওপর গাণ্ডে-পিণ্ডে খাওয়া—আমি এখন কোথাও নড়ছি না—বলেই চারধার দেখে নিয়ে যখন দেখলেন কাকিমা রান্নাঘরে, তখন নির্ভয়ে বললেন, আমি এখন আমার বউকে জড়িয়ে ধরে ঘুমোবো বাবা। তোমাদের যেখানে যাবার যাও।

বাবলি গ্যারেজ থেকে যখন কাকার সাদা-রঙা ফিয়াট গাড়িটা বের করল, তখন এগারোটা বেজে পনেরো।

বাবলি বেশ জোরে গাড়ি চালাচ্ছিল। দিল্লিতে রাত এগারোটা অনেক রাত। দিল্লি কলকাতার মতো নয়। এখানে সকলেই সকাল-সকাল খেয়ে শুয়ে পড়ে। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গা এত দূর যে, বড় কেউ একটা রাতে বেরোয় না। হুহু করে হাওয়া লাগছিল চোখে মুখে। বিয়ার এবং খাওয়া-দাওয়ার পর অভীর ঘুম ঘুম পাচ্ছিল।

কোন্ পথ দিয়ে বাবলি যাচ্ছিল, অভী জানে না। পথটার দু'ধারে বড় বড় গাছ। সুন্দর দেখাচ্ছে রাস্তাটা। মার্কারি ভেপার ল্যাম্পগুলোতে ভীষণ মোহময়, স্বপ্নময় লাগছে।

হঠাৎ অভী বলল, গাড়িটা থামান তো বাঁদিকে।

বাবলি বলল, কেন? কী হবে?

অভী যেন আদেশের সুরে বলল, থামাতে বলছি, থামান।

বাবলি এই স্বরে অভ্যস্ত ছিল না। অভী যে ওকে আদেশ করতে পারে, বাবলি ভাবতে পারেনি। কিন্তু বাবলির খুব ভালো লাগল। বাবলিকে ছোটবেলা থেকে কেউ কখনও আদেশ করেনি। কারও আদেশ মানার মধ্যে যে এত আনন্দ তা ওর জানা ছিল না। ও যে কারও আদেশ বিনা প্রতিবাদে মানতে পারে, এ কথাও ও নিজে জানত না।

বাবলি গাড়িটা থামাল বাঁদিক ঘেঁষে। গাড়ি থামিয়ে বলল, থামিয়েছি।

অভী বলল, গাড়ি বন্ধ করে দাও।

বাবলির হঠাৎ মনে হল, অভীর কী হল? নেশা হয়নি তো? বাবলিকে বিনা ভূমিকায় এমন তুমি করে সম্বোধন করছে কেন ও?

কথা না বলে বাবলি বলল, করেছি, বন্ধ করেছি।

অভী কোনো কথা না বলে বাবলির দিকে সরে এল। সরে এসে, দুহাতে বাবলির মুখটা ধরে ওর চোখে চুমু খেল।

বাবলি বাধা দিল না, মানা করল না, বাবলির সমস্ত শরীর এক আশ্চর্য আবেশে অবশ হয়ে এল।

বাবলি অস্ফুটে বলল, উঁ-উ-উ-উ...।

অভী তারপর দুহাত দিয়ে বাবলিকে জড়িয়ে ধরল। জড়িয়ে ধরে, বাবলির ঠোঁটটাকে নিজের ঠোঁটের মধ্যে নিয়ে একেবারে শুষে নিল। শুষে নিতে লাগল।

বাবলির হাত আলগা হয়ে এল স্টিয়ারিং থেকে। কখন ও যে তা করল ও তা জানে না, বাবলির অজান্তে বাবলির হাত দুটি অভীর গলা জড়িয়ে ধরল। বাবলি তা সজ্ঞানে করল না। বাবলির মস্তিষ্কর কোষে কোনো অজ্ঞাত আদেশ বাজল নীরব স্বরে। বাবলি তার দুটি লতানো হাতে, তার নরম শরীরের সব সুগন্ধ সব স্নিগ্ধতা সব নম্রতা এই প্রথম, জীবনে এই প্রথম একজন পুরুষের সবল কঠিন বুকে সঁপে দিয়ে, নিজের ঠোঁটের সব স্বাদ, মিষ্টত্ব একজন পুরুষের সিগারেটের গন্ধেভরা রুক্ষ ঠোঁটে সমর্পণ করে নিজে ধন্য হল।

কতক্ষণ ওরা ওভাবে ছিল ওরা জানে না।

দূর থেকে, পেছন দিক দিয়ে একটা গাড়ি আসছিল।

তার হেডলাইটের আলোর বৃত্তদুটি বাবলির গাড়ির আয়নার মধ্যে দুটি ছোট বিন্দু থেকে ধীরে ধীরে বড় হতে লাগল।

পেছনের গাড়ির আলোটা দ্রুত বড় হচ্ছিল, দ্রুত কাছে এগিয়ে আসছিল। এবারে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছিল।

অভী বাবলির বুকের ভাঁজে মুখ রেখে বিড়বিড় করে বলল, ইম্ফলে আসবে তো?

বাবলি যেন ঘুমের মধ্যে ঘোরের মধ্যেই বলল, আসব আসব। তুমি দেখো; ঠিক আসব।

তারপর ওরা সরে গেল।

বাবলি গাড়ি স্টার্ট করল।

এমন সময় পেছনের গাড়িটা ওদের ওভাবটেক করেই ওদের একেবারে সামনে ব্রেক কষে দাঁড়াল।

হঠাৎ ওরা অবাক হয়ে দেখল, বাবলির কাকা এবং অভীর নিমেষদা ট্যাক্সি থেকে নামলেন। তারপর পান চিবোতে চিবোতে ওদের গাড়ির দিকে এগিয়ে এলেন। তারপর ঝুঁকে পড়ে অভীর দিকের জানালা দিয়ে মুখ ঢুকিয়ে অভীর কাঁধে চাপড় মেরে বললেন, শাবাশ ছোকরা, তুমি তো রীতিমতো ফাস্ট ওয়ার্কার হে!

তারপরই বাবলিকে বললেন, এতদিনে তুই গাড়ি চালাতে শিখেছিস। খুব খুশি হলাম।

অভী গাড়ির দরজাটা খুলে দিতে যাচ্ছিল পেছনের।

নিমেষদা বললেন, পাগল! আমি কি অমন বেরসিক? তোমাদের কাকিমা বললেন দিল্লিতে মেয়েরা আজকাল খুব আনসেফ্—তুমি ট্যাক্সি নিয়ে যাও, ফেরার সময় বাবলির সঙ্গে ফিরো—একা একা এত রাতে ওর এতখানি পথ আসা ঠিক হবে না।

বুঝলি বাবলি, তোর কাকিমা বুঝতে পারেনি যে বিপদ ছিল যাওয়ার পথেই; ফেরার পথে না।

অভী আবার বলল, নিমেষদা আসুন না; উঠে আসুন।

কাকা বললেন, আমি আগে পাইলটিং করে যাচ্ছি। তোমাদের বাড়ির নিচের পানের দোকানে মুস্কিপাতি জর্দা দিয়ে দুটো মঘাই পান খাব। তোমরা আস্তে আস্তে এসো। তাড়া নেই। টেক্ ইওর

ওন টাইম। দ্য নাইট ইজ ভেরি ইয়াং।

ট্যাক্সিটা এগিয়ে যেতেই বাবলি চাপা হাসি হাসল।

বলল, কাকুটা এত অসভ্য না!

বাবলি কথা শেষ করতে পারল না, বাবলির মুখ বন্ধ করে দিল অভী চুমু খেয়ে।

বাবলি আনন্দে, নতুন অস্বস্তিতে ছটফট করে উঠল। বলল, আর না। এখন আর না। প্লিজ, এখন আর না অভী; এখন আর না।

অভী ওকে ছেড়ে দিয়ে বলল, বলো, ইম্ফলে আসবে তো?

বাবলি অভীর বুকে মুখ রেখে বলল, আসব, আসব। তুমি দেখো, ঠিক আসব। আসি কিনা দেখো!

৯

বাবলির ভাবতেই ভালো লাগছিল। কত মাস পরে দেখতে পাবে অভীকে। প্রেসারাইজড্ প্লেনের ভিতরে বসে শুনতে পাওয়া মৃদু গুন্‌গুনানির মতো ওর মনও গুন্‌গুন্ করছিল।

আগে সবাই বলত কৈরাঙ্গী। কৈরাঙ্গী এয়ারস্ট্রিপ। কংক্রিটের ছিল না। তখন একফালি সবুজ মাঠ শুধু।

কিন্তু এখন যেখানে প্লেন নামে ইম্ফলে, সেখানে এয়ারপোর্ট, নাম তুলিহাল।

নাগা পাহাড়ের মাথার উপর দিয়ে অনেকক্ষণ ফকার-ফ্রেন্ডশিপ প্লেনটা উড়ে আসে শিলচর থেকে। তারপরই, হঠাৎ, স্বপ্নের শাংগ্রিলার মতো—দুটো উঁচু পাহাড়ের মাঝের ফাঁক ফুঁড়ে প্লেনটা চিলের মতো ছায়া ফেলে ইম্ফল উপত্যকার উপর।

সবুজ, সবুজ, চারিদিকে, যতদূর দেখা যায় শুধু হলুদ, আর সবুজ। পাকা ধানের হলুদ, কাঁচা ধানের সবুজ। ইম্ফল উপত্যকাকে অনেকে বলেন "গ্রানারি অফ্ গড।"

উপর থেকে দেখা যাচ্ছিল, এয়ারপোর্টের পাশে গাড়ি, জিপ, ট্রাক সব দাঁড়িয়েছিল।

প্লেনটা নামছিল। পেটের তলার চাপা-দুটো একটা ঝাঁকি দিয়ে আগেই নেমে পড়েছিল নিচে। ধীরে ধীরে নিজের বাড়ি, গাড়ি, জমি সব কাছে চলে এল—ধ্বসস্-ধ্বসস্ করে প্রথমে সামনের চাকাটা তারপর পিছনের চাকা-দুটো মাটি ছুঁল। তারপর ট্যাক্সিংই করে এসে প্লেনটা স্থির হয়ে দাঁড়াল টারম্যাকের উপর। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় বেড়ার কাছে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনদের নিতে আসা ও বিদায় দিতে-আসা লোকজনের দিকে তাকাল বাবলি।

ও ভেবেছিল, সকলের মাথা ছাড়িয়ে ও অভীর মাথা দেখতে পাবে। হ্যান্ডসাম, ভালো, স্মার্ট; সত্যিই স্মার্ট, অভীকে। বাবলির একান্ত অভীকে।

কিন্তু কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে ও যখন প্যাসেঞ্জারস্ লাউঞ্জে এসে ঢুকল, তখনও অভীর দেখা পেল না।

শুধু অবাকই নয়। রীতিমতো ক্ষুব্ধ হল বাবলি।

আসার তারিখ জানিয়ে শেষ চিঠি লিখেছিল ও। তার উত্তরে মস্ত বড় চিঠি পেয়েও ছিল অভীর কাছ থেকে। টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিল তিনদিন আগে অভীকে এয়ারপোর্টে আসতে বলে। তা সত্ত্বেও এয়ারপোর্টে ওকে নিতে না-আসার কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পেল না ও।

অভীর অসুখ-বিসুখ করেনি ত?

এ-কথা ভেবেই ওর মনটা দ্রবীভূত হয়ে গেল। ভাবল, আহা বেচারা! বিদেশ-বিভুঁই জায়গা; একেবারে একা থাকে। হয়তো জ্বরের ঘোরে বেহুঁশই হয়ে আছে। অভীর অসুখের কথা মনে হওয়ায়—দুঃখের সঙ্গে একরকম ভালো লাগাতেও ওর মন ছেয়ে এল। অভীকে ও অনেক যত্ন করবে, সেবা করবে, ওর কপালে ওডিকোলানের পটি দেবে, থার্মোমিটার দিয়ে জ্বর দেখবে, নিয়ম করে ওষুধ ও পথ্য খাওয়াবে—দরকার হলে সারারাত জেগে বসে থাকবে ওর মাথার কাছে। এমনকি, বাবলি কল্পনায় অভীর ঘরও যেন দেখতে পেল, যে-ঘর ও কখনও দেখেনি। অভীর ঘর, ঘরের আসবাবপত্র, অভীর শয্যাশায়ী চেহারা সবই যেন ওর চোখের সামনে ফুটে উঠল।

মনে মনে অভীকে ক্ষমা করে দিল বাবলি।

কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তা হল, যাবে কী করে অভীর বাড়িতে? বাড়ি তো চেনে না। তারপর নিজেই মুশকিল আসান করল এই ভেবে যে, মেসোমশায়ের অফিসের দারোয়ান বা কেয়ার-টেকারের কাছ থেকে ঠিকানাটা জোগাড় করে নেবে।

প্যাসেঞ্জার-লাউঞ্জে বেশ অনেকক্ষণ বসে থাকার পর মালপত্র এল প্লেন থেকে। ওর স্যুটকেসটাও এসে পৌঁছল, কিন্তু তখনও অভী এল না। অভীর আসার আর কোনোই সম্ভাবনা নেই। একথা বোঝাল ও নিজেকে।

এয়ারপোর্টে ট্যাক্সি দেখতে পেল না। ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের বাসেই যাবে ঠিক করল।

ট্যাগ মিলিয়ে স্যুটকেস্‌টা বের করে যখন বাসে তোলবার বন্দোবস্ত করছে, এমন সময় দূর থেকে একটা ঘন বাদামি-রঙা গাড়িকে আসতে দেখল এয়ারপোর্টের দিকে প্রচণ্ড বেগে।

গতবারে এখানে এসে যাদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল বাবলি, তাদের মধ্যে কারোই এ-রঙের গাড়ি নেই।

অতএব গাড়িটার দিকে না-চেয়েই চিন্তান্বিত মুখে বাবলি বাসে উঠে পড়ল।

গাড়িটা ততক্ষণে এসে গেছে।

গাড়িটা থামতেই, বাঁদিকের দরজা খুলে ঝুমা দৌড়ে নামল—নেমেই দৌড়ে এসে এদিক-ওদিক কাকে যেন খুঁজতে লাগল।

ঝুমা এপাশে-ওপাশে তাকিয়ে তারপর এয়ার-হোস্টেসদের মধ্যেই একজনকে দেখতে পেয়ে হাত নাড়ল, বলল, হাই!

ঝুমা এয়ার-হোস্টেসের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগল।

বাসের জানালায় বসে বাবলির মনে হল ঝুমা তার বন্ধু এয়ার-হোস্টেসকে বাবলির মতো কেউ এসেছে কিনা সে কথা জিজ্ঞেস করছে।

ইতিমধ্যে অভীও নেমে এসেছে গাড়ি থেকে।

একটা নেভি-ব্লু কর্ডুরয়ের প্লেয়ার পরেছে অভী, তার উপরে সাদা কলারওয়ালা গেঞ্জি। গায়ে নেভি-ব্লু ব্লেজার। ব্লেজারের পিতলের বোতামগুলো, অভীর সান-গ্লাসের কাচ ও অভীর হাসতে থাকা দাঁত, রোদ ঝিক্‌মিক্‌ করছে।

বাবলি এই ঝক্‌ঝকে পুজো-পুজো রোদভরা সকালেও গায়ে-জলপড়া বেড়ালনির মতো মিইয়ে গেল।

প্রথমেই ওর মনে হল যে, রিটার্ন-ফ্লাইটে একটা সিট পেলেই ও এখুনি দমদম হয়ে দিল্লি ফিরে যায়। কিন্তু কী করবে ও বুঝতে পারল না।

যেদিকে ঝুমা ও অভী ছিল, তার বিপরীত দিকে ও চেয়ে রইল, যাতে ওদের চোখে না পড়ে ও। ওরা ওকে দেখতে না-পেয়ে ফিরে গেলে, একটা দিন কোনো হোটেলে কাটিয়ে ও কালই আবার

দিল্লি ফিরে যাবে। আর যদি অভীরা ফিরে চলে যায় এখুনি, তবে তো আজই যাবে। নিশ্চয়ই যাবে।

অন্যদিকে চেয়ে, শক্ত করে গ্রীবা ঘুরিয়ে বসেছিল বাবলি।

এমন সময় একেবারে ওর কানের কাছে ঝুমার গলা পেল ও।

ঝুমা বলল, অ্যাই বাবলি!

ঝুমার গলার সুরে অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। সহজ বন্ধুত্বের উদার সুরই ছিল তাতে। ঝুমা বাবলির কাঁধে হাত রেখে ওর কানের কাছে মুখ নামিয়ে এনে বলল, চল্ শিগ্গির্। তোর জন্যে দাঁড়িয়ে আছে।

বাবলি ধরা পড়ে গেছিল। তখন না-নেমে উপায় ছিল না। নইলে লোকজনের সামনে যাত্রা করতে হত।

বাস থেকে নামতেই অভী হাত-জোড় করে নমস্কার করে বলল, স্বাগতম্। আমি হোটেল-দ্য-অভীর ম্যানেজার। আপনাকে নিতে এসেছি। আই উইশ ট্যু আ ভেরি হ্যাপি হলিডে।

বাবলি ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক করল।

একটা দুঃখ ও আনন্দ মেশা হাসিতে বাবলির ঠোঁট ভরে গেল। অনেকদিন পর অভীকে দেখে ভারী ভালো লাগল বাবলির।

অভী বাবলির স্যুটকেসটা তুলতে তুলতে বলল, বাবাঃ, এত ভারী কেন? সোনা-টোনা আনলেন নাকি স্মাগল্ করে?

বাবলি অনেক কষ্টে স্বাভাবিক হল। স্বাভাবিক করল নিজেকে। ঝুমার সামনে নিজেকে ছোট করতে রাজি ছিল না ও।

বলল, সোনা নয়, তবে অনেক পাটালি গুড় আছে। কাকিমা দিয়ে দিয়েছেন আপনার জন্যে। কলকাতা থেকে দিল্লিতে আনিয়ে—দিল্লি থেকে ইম্ফলে পাঠিয়েছেন আপনারই জন্যে শুধু।

ঝুমা অভীকে বলল, তুমি বুঝি খুব পাটালি গুড়ের ভক্ত অভীদা?

'তুমি' কথাটা বাবলির কানে ধক্ করে লাগল।

বাবলি বুঝল, এই পুজোটা মিছিমিছি নষ্ট করল ও। দিব্যি দিল্লির কালীবাড়ির পুজোতে মজা করা যেত। দিল্লির বাঙালিদের কাছে পুজো একটা খুব বড় ব্যাপার। কলকাতার বাঙালিদের চেয়েও হয়তো বড়। পুজো একটা সম্মিলনী—সত্যিকারের রি-ইউনিয়ন। কতলোকের সঙ্গে মেলামেশা হত। কত বান্ধবী ও বন্ধুও। তা না, সব ছেড়ে ও এই পচা ইম্ফলে মরতে এল বাবলি। রাক্ষুসীটা এতদিনে অভীর মাথাটা চিবিয়ে খেয়েছে। কী করে এরই মধ্যে ঝুমার সঙ্গে অভীর এতখানি অন্তরঙ্গতা হল, বাবলি বুঝতে পারল না। কিন্তু অভী ঘুণাক্ষরেও এই অন্তরঙ্গতার কথা জানায়নি বাবলিকে। এতেই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে এই অন্তরঙ্গতা অভীও গোপন রাখতে চেয়েছিল।

বাবলির কানে কানে ঝুমা বলল, কনগ্রাচুলেশানস্।

তারপর বলল, তুই যে এতবড় চালাক আর মিথ্যাবাদী তা আমি জানতাম না। যাই-ই হোক। দমদমে সেদিন যা বলেছিলাম, তা ভুলে যাস্। আমি এয়ার-হোস্টেস। দিনের মধ্যে অনেকবার মুখের মেক-আপ ধুতে হয় আমাদের। আমার সেই ভুল-করে, ভুল লোককে ভালোবাসার ভুল ধুয়ে ফেলতে সময় লাগেনি। আমি তোর কম্পিটিটর নই। তুই আমাকে ভুল বুঝিস না।

তারপর হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল, তোকে আমার এইটুকুই বলার ছিল। অভীদা তোর সম্বন্ধে সবকিছু বলেছে আমাকে। তবে, তুই যদি আমাকে বলতিস যে তুই চিনিস অভীদাকে তাহলে হয়তো আমি আমার নিজের কাছে এতবড় একটা প্রবলেম হতাম না। তোর কাছেও হয়তো ছোট হতাম না।

অভী এসে দরজা খুলে স্টিয়ারিংয়ে বসল। দুম্ করে দরজা বন্ধ করল।

ঝুমা সঙ্গে সঙ্গে অন্য লোক হয়ে গিয়ে বলল, বাবাঃ, আনন্দের চোট্‌টা দরজার উপরে কেন?

অভী হেসে ফেলল। কিন্তু জবাব দিল না।

পথে বাবলি বিশেষ কথা বলছিল না। যা বলার ঝুমাই বলছিল। নিজে হাসছিল, ওদের হাসাচ্ছিল। পেছনের সিটে বসে দু'হাত বাবলি ও অভীর প্রায় দু'কাঁধের উপরে রেখে, সমানে বক্‌বক্ করছিল।

কথা খুব ভালো বলে ঝুমা। ঝুমার মতো ভালো কথা বলতে পারে এমন কাউকে বাবলি অন্তত জানে না।

হঠাৎ অভী বলল ঝুমাকে, এখন তো তোমার বান্ধবী এসে গেছে, এবারে তো আর তোমার আমার বাড়িতে থাকতে আপত্তি নেই। তবে চলো, তোমার হোটেল ঘুরে যাই। স্যুটকেসটা তুলে নিয়ে যাই একেবারে।

বাবলির গা রাগে জ্বালা করতে লাগল।

ও এখানে এসেছিল অনেক আশা নিয়ে। অভীর সঙ্গে একা থাকবে, গাড়ি করে দুজনে ঘুরবে অনেক জায়গায়। ঝুমার সঙ্গে এবং ঝুমার খপ্পরে যে তাকে থাকতে হবে এ তার জানা ছিল না।

বাবলির নীরবতা দেখে, ঝুমা বলল, নাঃ নাঃ, আমি হোটেলেই থাকব। সব গুছিয়ে-টুছিয়ে বসেছি, আবার ঝামেলা করা কেন? তাছাড়া আর ক'দিনই বা থাকব?

অভী অবাক হল। একবার চকিতে বাবলির মুখের দিকে তাকিয়েও নিল ও। তারপর বলল, সে কি? তুমি না বলেছিলে, ছুটি নিয়েছ—এখানেই কাটাবে পুজোটা।

বলেছিলাম।

হেসে বলল ঝুমা।

তারপর বলল, ছুটি নিলে বুঝি ছুটি ক্যানসেল করা যায় না?

অভী বলল, বাবলি কী বলছে?

বাবলি বলল, আমি আবার কী বলব? ঝুমা সঙ্গে থাকলে তো মজাই হত, কিন্তু ওর বোধহয় মজা হবে না আমার সঙ্গে থাকলে। ওকে জোর করা কি ঠিক হবে?

ঝুমা আবারও হাসল।

হেসেই বলল, যা বলেছিস বাবলি। ঠিক হবে না।

বাবলি মনে মনে খুব রেগে গেল। ঝুমাটা চিরদিনই এমন, ও এত সপ্রতিভ যে সবসময়ই বাবলি ওর কাছে এলেই হীনমন্য বোধ করেছে। কোনোদিক দিয়েই বাবলি ঝুমার যোগ্য যে নয় সে কথা বাবলি জানে বলেই, ঝুমাকে ও কখনোই তেমন সহ্য করতে পারেনি। আজ যখন ঝুমা তাব জীবনের একটা অন্যতম প্রধান প্রাপ্তির পথে দাবিদার হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন ঝুমাকে সহ্য করা ওর পক্ষে সত্যিই মুশকিল।

ঝুমার হোটেলের সামনে গাড়ি থামিয়ে অনেক পীড়াপীড়ি করল অভী ওদের সঙ্গে যেতে। কিন্তু ঝুমা তেমনি হেসে হেসেই নেমে গেল।

বাবলি চুপ করে ছিল।

ঝুমা যাওয়ার সময়, চলি রে বাবলি, বলে চলে গেল দৌড়ে।

মাঝপথে হোটেলের বারান্দায় ফিরে দাঁড়িয়ে হাত তুলে বলল, হ্যাভ আ নাইস্ টাইম।

বাবলি একটা সংক্ষিপ্ত, থ্যাঙ্ক উ্য! বলল উত্তরে।

অভী চেঁচিয়ে বলল, দুপুরে খাওয়ার পর আসছি কিন্তু। দুটোর সময়! লক্‌টাক্ লেকে যাব। রেডি হয়ে থাকবে।

বাদবাকি পথটা কোনো কথাই বলল না অভী বাবলির সঙ্গে।

ওর বাড়ির কাছাকাছি এসে অভী বলল, আমার মনে হয় ঝুমাকে নিয়ে আমাদের মধ্যে খুব বড় ভুল বোঝাবুঝি হয়ে যাচ্ছে। ঝুমার কথা তুমি আমাকে দিল্লিতে বলেছিলে। এখানে ফিরে আসার পর ও প্রত্যেকবারই এখানে এলে আমাকে ফোন করত। মাঝে একবার দুদিন থেকে গেছিলও ছুটি নিয়ে। ও আমার বন্ধুর বোন! তাই ওকে আমি তুমি বলি। ও প্রথমদিন থেকেই আমাকে 'অভীদা' 'তুমি' বলে ডাকে। খুব প্রাণ আছে ওর মধ্যে। আমি ওকে পছন্দ করি। কিন্তু সেই পছন্দ করার সঙ্গে তোমাকে পছন্দ করার তফাত আছে অনেক।

ওকে আমি প্রথম দিনই তোমার কথা বলি। তোমার পরিচয় শুনেই ও বলেছিল যে, তুমি ওর ছোটবেলার বন্ধু। তুমি পুজোর ছুটি কাটাতে এখানে আসছ শুনে ও বলল, আমি বাবলি আসার একদিন আগেই আসব। ওকে চমকে দেব। খুব মজা হবে। তাহলে পুজোটা আমিও এখানে কাটাব।

গাড়িটা ওর কম্পাউন্ডে ঢোকাতে ঢোকাতে অভী বলল, সত্যি বলছি যে, এই ইনোসেন্ট ব্যাপারটাকে যে তুমি এত সিরিয়াস্‌লি নেবে তা আমি ভাবতে পারিনি। ও যখন এসে পড়েছে, বলতে গেলে আমারই নিমন্ত্রণে, তখন ওকে হোটেলে থাকতে দেওয়া বা এখান থেকে চলে যেতে বলা কি ঠিক হবে আমার পক্ষে? এখানের হোটেল একা মেয়েদের থাকার পক্ষে নিরাপদও নয়। তাছাড়া, ও তো আমার এবং তোমার সম্পর্কটার কথা ভালোভাবেই জানে। আমি তো ভেবেছিলাম, তোমার বন্ধুকে এখানে পেয়ে তুমি খুশিই হবে। অথচ...।

গাড়ি থেকে নামতে নামতে বাবলি বলল, আপনার পক্ষে কোনটা ঠিক, কোনটা বেঠিক তা আপনিই স্থির করবেন। এতে আমার মতামতের অবকাশটা কোথায়?

অভী অবাক হল। বলল, ওঃ। যাক্‌গে।

ওরা গাড়ি থেকে নেমে বারান্দার বেতের চেয়ারে বসল।

কুলো সিং চা এনে দিল।

বাবলি চা ঢালতে ঢালতে প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে বলল, চা খেয়ে চান করব। আমার ঘর কোনটা?

তারপর বলল, আপনার বাড়িটা ঘুরে দেখি। ব্যাচেলররা খুব নোংরা হয়ে থাকেন বলে শুনেছি। কিন্তু বাইরে থেকে দেখে তো আপনার বাড়িকে নোংরা বলে মনে হচ্ছে না।

অভী বলল, ইন্‌স্‌পেক্ট করে তারপরই সার্টিফিকেট দিয়ো। তুমি কি স্যানিটারি ইন্‌সপেক্টর?

বাবলি হাসল। তারপর বলল, এখানে আমাদের কী প্রোগ্রাম?

অভী বলল, পাঁচদিনের ট্যুরে যতখানি ভালো প্রোগ্রাম করা যায় তা-ই করেছি।

আজ দুপুরের খাওয়ার পর লক্‌টাক্‌ লেকে যাব। লক্‌টাকের বাংলোয় রাত কাটাব। কাল সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে ফিরে আসব ইম্ফলে। দুপুরে রেস্ট করে বিকেলে তোমাকে কবরখানা দেখাতে নিয়ে যাব। এখানের কবরখানার এপিটাফ্‌গুলোতে যে-সব লেখা আছে, তা পড়লে চোখে জল পড়বে।

বাবলি বলল, চোখ দিয়ে জল পড়ার যথেষ্ট কারণ জীবনে এমনিতেই অনেক আছে। আমি কবরখানা মোটেই দেখতে রাজি নই। আপনি এত কবরখানার ভক্ত কেন বলতে পারেন? কোহিমাতে গিয়েও তো প্রথমেই কবরখানায় নিয়ে গেছিলেন।

তাহলে যাব না। অভী বলল।

—তারপর? বাবলি শুধোল।

তারপর কবরখানা না দেখতে চাইলে—এমনিই এদিক-ওদিক ড্রাইভে যাব। রাতে পুং-চোলোম্‌ আর থৈবী-খাম্বার নাচের প্রোগ্রাম। আশা করি ভালো লাগবে তোমার।

তাব পরদিন খুব ভোরে বেরিয়ে পড়ব। বর্মার সীমান্তের দিকে।

—কতদূর ইম্ফল থেকে? বাবলি শুধোল।

—অনেক দূর। সারাদিনের না হলেও প্রায় পুরো একবেলার ড্রাইভ। প্যালেলে ভারতীয় সেনাবাহিনীর চেকপোস্ট পার হয়ে যেতে হবে 'মোরে'তে। 'মোরে' ভারতে শেষ গ্রাম। পথে পড়বে, টেংনোপাল। খুব উঁচু পাহাড়। প্রায় কার্সিয়াং-এর মতো উঁচু। সবসময় কুয়াশা-ঘেরা থাকে। সারা রাস্তাটাই পাহাড়ের আর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে।

—আমরা রাতে কোথায় থাকব?

বাবলি শুধোল খুশি খুশি গলায়।

অভী বলল, 'মোরে'র বাংলোতে। সুন্দর বাংলো আছে দুটো। ছোট বাংলোটাই বেশি সুন্দর। কিন্তু বড় বাংলোটা না হলে আমার তোমার ও ঝুমার থাকার অসুবিধে হবে।

বাবলির ভুরু দুটো কুঁচকে উঠল।

কথা বলল না কোনো।

অভী নিজেই বলে চলল, মোরেতে তো থাকব রাতে—কিন্তু তার আগে তোমাকে বার্মাতেও ঘুরিয়ে আনব। মোরের ওপাশে বার্মিজ গ্রাম "তামু"। নো-ম্যান্‌স্ ল্যান্ড পেরিয়ে। সেখানে প্যাগোডা আছে—দেখাব। হাটে "খাউ-সুয়ে" খাওয়াব—বার্মিজ নুডলস্। দারুণ খেতে। বার্মিজ ছাতা, তানাখা, লুঙ্গি এসব কিনতে পারো ইচ্ছা করলে।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, চলোই না। দেখবে কী ভালো লাগে। সারাদিন টো-টো করে তারপর রাতে এসে বাংলোয় থাকব। রাতে তোমাদের কী কী খাওয়াব তার মেনু পর্যন্ত ঠিক করে আগে থাকতে পাঠিয়ে দিয়েছি আমি। কোনো কষ্টই হবে না তোমাদের।

—বুঝতেই পারছি। সংক্ষিপ্তভাবে ঠাট্টার গলায় বলল বাবলি। তারপরই বলল—তুলিহালে নেমে অবধি বুঝতে পারছি যে, হবে না।

বলেই বাবলি অপ্রস্তুত অভীর মুখে তাকিয়ে হাসল, ওকে আশ্বাস দেবার জন্যে।

তারপর বলল, এবার উঠুন মশায়। আমার ঘর দেখান। চান করব।

বাবলি চান করার কথা বলতেই অভীর সারা শরীর শিরশির করে উঠল।

বাবলিকে চিঠি লিখতে লিখতে, বাবলির লেখা চিঠি পড়তে পড়তে অভীর ইচ্ছে করেছে অনেকরকম। ভবিষ্যতের কথা অনেকভাবে ভেবেছে অভী। যেমন করে এর আগে আর কখনও ভাবেনি। এমন করে যে ভাবা যায়, সে-কথা পর্যন্ত আগে কখনও জানত না অভী।

ও অনেকবার ভেবেছে যে, বাবলিকে ও একদিন নিজে হাতে, কোনো সুগন্ধি সাবানে অনেক ফেনা তুলে চান করাবে।

তাই এই চান-করার কথা উঠতেই সে-কথাটা মনে পড়ে গেছিল অভীর।

ঘর দেখে, ও ঘর-সাজানো দেখে বিলক্ষণ খুশি হল বাবলি। সুন্দর একটা রুচির ছাপ আছে ঘরময়। পাপোশ থেকে বেড্‌কভারে—দেওয়ালের ছবি থেকে টেবিলের ম্যাটস্-এ।

বাবলির ঘর প্রদক্ষিণ শেষ হলেই, অভী দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে দরজার দিকে পেছন করে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে দু'হাত মেলে ধরল বাবলির দিকে।

বলল, দৌড়ে এসো। আমার বুকে দৌড়ে এসো। আমি অনেকদিন স্বপ্ন দেখেছি যে তুমি দৌড়ে আমার বুকে আসছ।

বাবলি হাসল। দুষ্টু হাসি।

এতক্ষণে বোধহয় ওর মনের আকাশ থেকে ঝুমার ভাবনার নেশা কেটেছে।

বাবলি বলল, কী করে দৌড়ে আসতে হয় আমি জানি না। আমি অনেক কিছুই জানি না।

অভী রোম্যান্টিক গলায় বলল, আমিও কি জানি নাকি? কাব্য করে বলতে বলতে পারি, বোধহয় শ্রাবণের বৃষ্টির মতো। এসো, দৌড়ে এসো; ঝম্‌ঝম্‌ করে এসে আমাকে ঝুপঝপিয়ে তোমার ভালোবাসায় ভিজিয়ে দাও।

বাবলি তবুও দৌড়ে এল না। ধীর, নিশ্চিন্ত, আত্মবিশ্বাস-ভরা পদক্ষেপে ভেসে এল অভীর দিকে, তারপর মুখ রাখল অভীর বুকে।

অভী ওর সিঁথিতে, ও চোখে, ওর চিবুকে ওর বুকে অনেক অশান্ত, অবাধ্য চুমু খেল অনেকক্ষণ ধরে।

বাবলি ফিসফিস করে বলল, তুমি আমাকে ভালোবাস সত্যি?

অভী থমকে দাঁড়াল।

অবাক হয়ে বলল, মিথ্যা?

তারপর বলল, হঠাৎ এ সন্দেহ? এতদিন পরে? এতকিছুর পরে?

বাবলি আবারও বলল, আমাকেই বাসো? একা আমাকে?

অভী বাবলিকে দুহাতে ওর বুকের মধ্যে পিষে ফেলে বলল, হিংসুটি। মেয়ে মাত্রই হিংসুটি!

তারপর বলল, বাসি, বাসি, বাসি। তোমাকে, একা তোমাকেই ভালোবাসি।

আর কাউকে না ত? একটুও না? বাবলি ভুরু তুলে বলল।

অভী ওর ঠোঁট বন্ধ করে দিল চুমুর শিলমোহরে।

খেতে বসে অভী একবার ঝুমার প্রসঙ্গ তুলেছিল।

বলেছিল, এ কাজটা কিন্তু ভালো হল না। বেচারি ঝুমাকে কিন্তু আমি বলে রেখেছিলাম যে তুমি এলেই ওকে বাড়িতে আনব হোটেল থেকে। তুমি ওর বন্ধু জানতাম। কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে সদ্ভাব নেই এ-কথা জানতাম না।

বাবলি, ছুরি দিয়ে ফল কাটতে কাটতে বলল, ও আমার বন্ধু এবং কীরকম বন্ধু সে কথা পরে বলব কখনও, যদি শুনতে চাও, তার আগে তুমি বলো, ঝুমা তোমার কীরকম বন্ধু?

—মানে? অবাক হয়ে অভী শুধোল।

—মানে বুঝতে পারলে না? বাবলি বলল।

—না। প্রাঞ্জল করে বলো।

অভী গম্ভীর গলায় বলল।

—মানে, তোমার ও ঝুমার বন্ধুত্বর গভীরতা কতখানি? তুমি ঝুমা সম্বন্ধে কতটুকু জানো?

—বেশি জানি না। জানতে চাইওনি। তোমার বন্ধু এ জানাটাই তো আমার কাছে অনেকখানি ছিল। তোমার শত্রু যে, সেকথা আগে জানলে আরও বেশি জানার চেষ্টা করতাম।

বাবলি বলল, তুমি আমাকে ঝুমার সম্বন্ধে লেখোনি তো আগে, একবারও জানাওনি যে ওকে তুমি এমনভাবে নেমন্তন্ন করে এনেছ এখানে। তা জানলে আমি এখানে আসতাম না।

এবার অভীর স্বর আর তরল রইল না।

অভী বলল, দ্যাখো বাবলি, তুমি বোধহয় বাড়াবাড়ি করছ।

বাবলি বলল, না। আমি বাড়াবাড়ি করছি না।

—তাহলে তুমি কি চাও যে ঝুমাকে আমি চলে যেতে বলি ইম্ফল থেকে!

—তুমি বলবে কেন? ওর আত্মসম্মান থাকলে ও নিজেই চলে যাবে। কিন্তু আমি জানি যে, ওর আত্মসম্মান নেই। ওকে না তাড়ালে, ও যাবে না।

অভী অসহায়ের ভঙ্গিতে চেয়ারে গা-এলিয়ে দিয়ে বলল, তাহলে এ-কথা ওকে এক্ষুনি বলা দরকার। তুমি রেস্ট করো, আমি ওর হোটেলে যাচ্ছি।

না। তুমি যাবে না। বাবলি বলল।

অভী একটু বিরক্ত হল বলে মনে হল।

বলল, দ্যাখো বাবলি, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড মি! তোমার সঙ্গে ঝুমার কী কারণে ঝগড়া তা আমি জানি না, কীসের তোমাদের শত্রুতা তাও জানি না। কিন্তু তার জন্যে আমি কেন নিজেকে ওর কাছে ছোট করতে যাব? ও তো আমার সঙ্গে কোনো খারাপ ব্যবহার করেনি। এবং এ-কথাও সত্যি যে, ও যতবার এর মধ্যে ইম্ফলে এসেছে গেছে সে সময়ে তোমার সম্বন্ধে অনেক কথা হয়েছে আমাদের কিন্তু ও বরাবর তোমার প্রশংসাই করেছে। তোমাকে ভালোই বলেছে, আমাকে বলেছে আমি খুব লাকি যে তোমার মতো মেয়ের ভালোবাসা পেয়েছি। অথচ তুমি আসতে-না-আসতেই ওর সঙ্গে যে ব্যবহার করছ, ওর সম্বন্ধে যা-যা বলছ তা কিন্তু একেবারে অন্যরকম! আমি যদি পুরোপুরি মেনেও নি যে, তুমি যা বলছ তার সবই ঠিক; তবুও ওর সঙ্গে আমার খারাপ ব্যবহার করাটা কি ভদ্রতার হবে?

বাবলি একরোখা গলায় বলল, আমি অত জানি না। আমি যা বলছি তা তোমাকে করতে হবে। তোমার এখন ওখানে যাওয়া চলবে না। গেলে দুজনে একসঙ্গেই যাব। যখন যাবে বলেছ। তখন, ওকে তুলতে। তার আগে নয়!

অভী চেয়ার ছেড়ে উঠে, একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল,

—কী জানি? আমি তোমাকে বুঝতে পারছি না।

—পারবে। আজ না পারলেও, একদিন পারবে।

বাবলি বলল।

তারপর অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে, ফল কেটে রেখে অথচ না-খেয়ে বাবলি চেয়ার ছেড়ে উঠে বারান্দায় গিয়ে বসল।

অভীর বাংলোর সামনেই বড় রাস্তা। ব্রিটিশ আমলে লাগানো বড় বড় মহীরুহ পথের দুপাশে। কেসিয়া ভ্যারাইটির রেইনট্রি—। পথটাকে ছায়াচ্ছন্ন করে রেখেছে সব সময়। মাঝে মাঝে গাড়ি যাচ্ছে দু-একটা। জিপ ও ট্রাক যাচ্ছে সেনাবাহিনীর। কতকগুলো দাঁড়কাক কাঠের গেটের উপরে বসে কর্কশ গলায় ডাকছে কা-কা করে।

অভী বারান্দায় এসে চেয়ার টেনে বসল।

ওর মুখ দেখে মনে হল যে অভী খুব অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ হয়েছে। বাবলির সঙ্গে ওর সম্পর্কটা এতখানি পুরোনো নয় যে অকপটে ঝগড়া করতে পারে, আবার এমন নতুনও নয় যে ফর্মালিটি করে নিজের মনের ভাব বুকের গভীরে নিশ্বাস চাপা দিয়ে রাখে। কী যে করা উচিত; বুঝতে পারছিল না অভী।

হঠাৎ বাবলি চাপা-গলায় বাঁকা চোখে চেয়ে বলল, ঝুমাকে তোমার সুন্দরী বলে মনে হয় না?

অভী অবাক হল। অবাক হয়ে অনেকক্ষণ বাবলির চোখে তাকাল।

তারপর বলল, নিশ্চয়ই।

—ঝুমার ব্যবহার ভালো লাগে না?

—খু-উ-ব। অভী আবার বলল। অন্যদিকে তাকিয়ে।

—সব মিলিয়ে ওকে তোমার ভালো লাগেনি?

—হ্যাঁ। তাও লেগেছে। ভালো লেগেছে বইকি!

—তাহলে আর সত্যি কথাটা আমার কাছে লুকোনো কেন? তুমি ঝুমাকে নিয়ে এখানে এসো। আমি ঝুমার হোটেলে যাচ্ছি। কাল সকালের ফ্লাইটে আমি চলে যাব।

অভী উত্তেজিত হয়ে উঠল বলে মনে হল ওর চোখ দেখে।

তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, দ্যাখো, ভালো লাগলেই যে সব-ভালো লাগা এইরকম হবে তার কোনো মানে নেই। আমার সঙ্গে ঝুমার যে-সম্পর্ক, সে সম্পর্কের সঙ্গে তোমার আমার সম্পর্কের কোনোই মিল নেই। এ দুই সম্পর্ক একেবারেই আলাদা আলাদা। কাউকে ভালো লাগলেই ভালোবাসতে হবে, বা বিয়ে করতে হবে তার কোনো মানে নেই। তাছাড়া, ঝুমার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে তোমার সঙ্গে আলাপ হওয়ার অনেক পরে। তোমার বান্ধবী বলেই সে আলাপ হয়তো ঘনিষ্ঠ হয়েছে। তুমি যে পুরো ব্যাপারটার এমন কদর্থ করবে, আমি তা ভাবতেও পারিনি।

বাবলি রেগে উঠে প্রায় কেঁদে ফেলল।

বলল, তুমি জানো, ঝুমা তার ব্যাগে তোমার সুইমিং-ট্রাঙ্ক পরা ছবি নিয়ে ঘুরে বেড়ায় কতদিন হল? তুমি জানো কি যে, ও কত ছেলের মাথা চিবিয়ে খেয়েছে? কত ছেলে আত্মহত্যা করেছে ওর জন্যে? ওর মুখশ্রী আর ওর অভিনয় দিয়ে ও কত ঘর ভেঙেছে?

তারপর একটু চুপ করে থেকে হতাশ গলায় বলল, তুমি ওর সম্বন্ধে কিছুই জানো না। তুমি জানো না ও কত নীচ, ইতর; কত কুচক্রী। ও আমার কতবড় সর্বনাশ করার জন্য এখানে এসেছে।

অভী চেয়ারে সোজা হয়ে বসল। বলল, দারুণ ইন্টারেস্টিং সব ব্যাপার। ঝুমা যে এত গুণী মেয়ে আমি জানতাম তো! নিজেকে, নিজের গুণাবলিকে লুকিয়ে রাখার আশ্চর্য ক্ষমতা যে ও রাখে, তা আমাকে স্বীকার করতেই হবে। রিয়্যালি ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং। আমি ভাবতাম, আমার জীবনে তুমিই সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং মেয়ে। কিন্তু ঝুমা যে তোমার চেয়ে আরও অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং—তা আমার জানা ছিল না। ইট্স্ স্ট্রেঞ্জ—রিয়্যালি স্ট্রেঞ্জ!

—তার মানে? বাবলি বলল।

অভী বলল, মানে নেই। সব কথার মানে হয় না।

১০

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর একটু জিরিয়ে নিয়ে যখন অভী আর বাবলি ঝুমার হোটেলে এল, তখন ম্যানেজার বললেন যে, ঝুমা খুব জরুরি কাজে নাকি বেরিয়ে গেছে। একটা চিঠি দিয়ে গেছে ওঁর কাছে।

ম্যানেজার অভীর হাতে চিঠিটা দিলেন, কিন্তু বাবলি চিঠিটা ছোঁ মেরে অভীর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে খুলল।

অভী অবাক-হওয়া মুখে তাকাল আড়চোখে বাবলির দিকে।

বাবলি চিঠিটা নিজে একবার মনে মনে পড়ল।

তারপর জোরে জোরে অভীকে পড়ে শোনাল।

মণিপুর হোটেল

অভীদা,

এক বিশেষ ব্যক্তিগত কাজে একটু বেরোতে হচ্ছে আমায়। তোমাদের সঙ্গে লক্টাকে যাওয়া হবে না। তোমরা লক্টাক্ থেকে ফিরে এলে আশাকরি কাল সকালে তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে।

কিছু মনে করো না। হ্যাভ্ আ নাইস্ টাইম। ইতি—

ঝুমা

পুনশ্চ : বাবলি, তোকে আলাদা করে লিখলাম না। আশাকরি বুঝবি।

অভী ভালো করে চিঠিটার মানে হৃদয়ঙ্গম করার আগেই বাবলি বলল, ছিঁড়ে ফেলব?
অভী চমকে উঠল।
অন্যমনস্ক ছিল ও।
বলল, যা খুশি।
বাবলি বিনা-বাক্যব্যয়ে চিঠিটা কুচি-কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে বলল, চলো, এবার তোমার লক্‌টাক্ না কোথায়? ঝুমা যখন যাবেই না তখন আর কী করা যাবে?
অভী স্বগতোক্তির মতো বলল, চলো।
বলেই, হোটেলের অন্য পাশের গেট দিয়ে গাড়ি বের করল।
অনেকক্ষণ অভী কোনো কথা বলেনি।
বাবলি বলল, এমন রামগরুড়ের ছানা হয়ে থাকবেন বলেই কি আমাকে নেমন্তন্ন করে ডেকে এনেছিলেন?
অভী হাসল।
তারপর বলল, তোমার এই সম্বোধনের কায়দাটা বেশ। কথার ভার অনুযায়ী কখনও "তুমি" কখনও "আপনি"। এই গুরুচণ্ডালি ব্যাপারটা আমার পছন্দ নয়।
বাবলিও হাসল।
বলল, বেশ। এবার থেকে চণ্ডালের ভাষাই ব্যবহৃত হবে।
গাড়ি চলছিল হুহু করে। উপত্যকাটার চারিদিকে মাথা উঁচু পাহাড়। মিজো পাহাড়, নাগা পাহাড়। শরতের রোদ লুটিয়ে আছে পাকাধানের খেতে। বাতাসে ফসলের গন্ধ, রোদে অভদ্র কুচির ঔজ্জ্বল্য—মিষ্টি মিষ্টি ঠান্ডা।
অভীর পাশে, গায়ের পাতলা চাদরটা টেনে-টুনে জড়িয়ে বসে, বাঁ-হাতটা জানালায় রেখে বাবলি অনেক কিছু ভাবতে ভাবতে চলেছে।
যে-স্বপ্ন কৈশোরে পা দেওয়ার পর থেকে সব মেয়েই দেখে, বাবলির জীবনের সেই স্বপ্ন সত্যি হওয়ার ঝিম্ ধরা আনন্দে বুঁদ হয়ে বসে আছে।
কত মাইল পথ ওরা এসেছে জানে না বাবলি।
সারা পথ, মাঝে-মাঝেই বাবলি আদুরে কাকাতুয়ার মতো কিছু একটা বলে উঠেছে, অভী হুঁ-হাঁ করে জবাব দিয়েছে। স্টিয়ারিং-এ বসা অবস্থায় রাস্তার দিকে নজর রেখে বরাবর।
হঠাৎ বাবলি বলল, আমি একটু গাড়ি চালাব। কী সুন্দর রাস্তা।
অভী নিরুত্তাপ গলায় বলল, বেশ তো!
বলেই, পথের বাঁ-দিকে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দরজা খুলে বাবলির জায়গায় এল বাঁ-দিকে।
বাবলি গিয়ে স্টিয়ারিং-এ বসল।
আসলে অভীর মনের মধ্যে তখন অনেক কিছু ভাঙচুর হচ্ছিল।
অভী ভাবছিল, প্রত্যেক মানুষের মনই বুঝি ল্যাবোরেটরির ক্রুসিবল-এর মতো। তাতে নানা মনজ রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটে—কত কিছু মিশ্র অনুভূতি—তার মধ্যে কত কিছু সত্য প্রমাণিত হয়, কত মিথ্যা অপ্রমাণিত হয়।
অভী ভাবছিল, মানুষের মনের মতো দুর্জ্ঞেয় জিনিস পৃথিবীতে বুঝি আর কিছুই নেই।
আজ সকালে এয়ারপোর্টে যাবার আগে পর্যন্ত ও জানত, বিশ্বাস করত, যে ভালোবাসার প্রকৃতি বুঝি একই রকম। তার চেহারা সরলরেখারই মতো। নিজের মনের এক গোপন কেন্দ্র থেকে অন্যমনের কেন্দ্রে সে রেখা সোজাই বুঝি পৌঁছয়। এপথে যে এত চড়াই-উৎরাই, বাধা-বিপত্তি ও কখনও জানত না।

ঝুমাকে তার ভালো লাগত। সেই ভালোলাগায় কোনোমাত্র খুঁত ছিল না। কিন্তু সে ভালো লাগা একটা ওয়াটার-টাইট ভালোলাগাই ছিল। তার মধ্যে ভালোবাসার কোনোরকম আর্দ্রতাই চুঁইয়ে আসেনি। কিন্তু আজ সকাল থেকে বাবলির এই আশ্চর্য ব্যবহার, বিশেষ করে ঝুমার প্রতি, এবং কিছুটা অভীর প্রতিও; ঝুমা সম্বন্ধে অভীকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করেছে। বাবলি সম্বন্ধেও।

ঝুমাকে ও একজন সুন্দরী, দারুণ স্মার্ট, চমৎকার কন্‌ভারসেশানিস্ট্ সঙ্গিনী হিসেবেই চেয়েছে। একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর দারুণ বোন হিসেবে। ঝুমার দিক থেকেও দাদার বন্ধুসুলভ যে ব্যবহার ও পেয়েছে তাতে একবারের জন্যেও ওর মনে সন্দেহ হয়নি যে ঝুমার মনে তার জন্যে বন্ধুত্ব ছাড়া অন্য কোনো অনুভূতি আছে, অথবা থাকতে পারে। কিন্তু ঝুমার বাবলির হাতে এইরকম করে দুঃখ পাওয়া দেখে অভীর বারবার ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গেছে। ও যখন স্কুলে পড়ে তখন ও একটা সুন্দর ছটফটে সাদা পায়রাকে ধরেছিল ছাদের আল্‌সে থেকে—তারপর রাতে নিজের শোবার ঘরের মেঝেতে ঝুড়ি চাপা দিয়ে রেখে দিয়েছিল সোহাগ করে। সকালে ঘুম থেকে উঠে দ্যাখে তারই আদরের বেড়ালটা সেই পায়রাটার ছিন্ন-ভিন্ন রক্তাক্ত পালক ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট রাখেনি। অভী না-পেরেছে তার সুন্দর ভালোলাগার পায়রাটাকে বাঁচাতে, না-পেরেছে তার আদরের বেড়ালাকে লাঠি পেটা করতে। কিন্তু মনে মনে সে তার পোষা বেড়ালটার প্রতি এক দারুণ স্তব্ধ অভিমানে নিরুপায় নীরবতার মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে থেকেছে।

আজকে বহু বহু বছর পরে অভীর মনে সেই ছোটবেলার ভাবনাভরা নিরুপায় অভিমান আবার যেন বুকময় ফিরে এসেছে। ও কী করবে; কী ওর করা উচিত অভী কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না।

সামনে লক্‌টাক্ লেকের জল দেখা যাচ্ছে। বেলা পড়ে এসেছে। শেষ সূর্যের সোনা আলো ঝিকমিক করছে জলে। লেকের ওপারে নাগা পাহাড়ের পুঞ্জীভূত অবয়ব এক অতিকায় রোমশ প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর মতো আকাশে মাথা-ছোঁওয়ানো উঁচু পিঠে রোদ পোয়াচ্ছে যেন। মিজো পাহাড়গুলোকেও দল-বাঁধা ডাইনোসরের পিঠ বলে মনে হচ্ছে।

অভী ওদিকে চেয়ে অন্যমনস্ক হয়ে গেল আবার।

ও ভাবছিল, প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ হলে জীবনটা অনেক ঝামেলা বিবর্জিত হত। সারাদিন পশুচর্ম গায়ে জড়িয়ে পাথরের মুগুর হাতে ঘুরে-ফিরে সন্ধ্যাবেলায় গুহায় ফিরে একটু কাঁচা মাংস ঝল্‌সে খেয়ে নারী-শরীর নামক এক জৈবিক আচারের রসাস্বাদন করে কী সরল সোজা সুখে জীবনটা কাটাতে পারত। যত দিন গেছে, মানুষ যত সভ্য হয়েছে, তার বুকের মধ্যের বায়বীয় সত্তার মন নামক ইনট্যানজিবল্ ব্যাপারটা দিনে দিনে ক্রমশই জটিল হয়ে উঠেছে। আজকের দিনের অভীর মতো শিক্ষিত মার্জিত মানুষ তাঁর পারিপার্শ্বিকের অনেক কিছু জেনে ফেলেও চাঁদে পদক্ষেপ করেও, নিজের থেকে দূরে, আরও দূরেই শুধু সরে গেছে। বাইরের পৃথিবীকে আপন করেছে, কাছে টেনেছে; কিন্তু ধীরে ধীরে নিজের বুকের মধ্যের পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হতে খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন যোগাযোগহীন দুস্তর ব্যবধানের বিন্দু বিন্দু দ্বীপের মতো হয়ে উঠেছে অনবধানে। এখন মানুষ লক্ষযোজন দূরের কথা মুহূর্তে শুনতে পায় নিজের ইচ্ছায় চাবি টিপে; পায় না শুধু নিজের বুকের শব্দ শুনতে; তাকে বুঝতে।

হঠাৎ বাবলি বলল, ঐ পিলারটা কীসের?

স্বপ্নোত্থিতের মতো অভী বলল, ঐটাই তো নেতাজি মেমোরিয়াল। আই-এন-এ-ফৌজের সঙ্গে এইখানে ব্রিটিশ সেনাদের যুদ্ধ হয়েছিল। সামনে যে ছোট্ট বাড়িটা দেখছ, ওটার মধ্যে নথিপত্র রাখা আছে। চলো দেখবে।

বাবলি গাড়িটা থামিয়ে, গাড়ি থেকে নামল।

বাঁদিকে একটা টিনের চালাঘর। ডানদিকে পাকা ইমারত। চালাঘরটার মরচে-পড়া টিনের ছাদ মেশিনগানের ও স্টেনগানের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে রয়েছে।

অভী বলল, দেখছ? গুলির দাগ। এখনও স্পষ্ট।

ওরা আই-এন-এ মেমোরিয়াল দেখে যখন বেরুল তখন সন্ধে হবো হবো।

কিছুদূর গাড়ি চালিয়েই ওরা লক্‌টাক্ লেকের উপরের ছবির মতো সুন্দর বাংলোয় এসে পৌঁছল।

উঃ, কী দারুণ!

বাবলি স্বগতোক্তি করল।

বলল, গতবার মেসোমশাই এখানে যে কেন নিয়ে আসেননি, জানি না।

অভী বলল, কী জানি?

বাবলি বলল, অনেকক্ষণ থেকে আপনার মুড অফ্‌ফ্ দেখছি। আমার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে না করলে, বলবেন না।

অভী হাসল। বলল, বাঃ, তা কেন? কী যে বলো?

বাবলিরও নিজেকে অভিশাপ দিতে ইচ্ছে করছিল। ও যে এই ইম্ফলে এসে কী মুশকিলেই পড়ল, তা বলার নয়।

অভী বলল, বাংলোটা সত্যিই সুন্দর। এখানে তোমাকে নিয়ে আসব অনেকদিন থেকে তা ঠিক করে রেখেছিলাম। আজ সত্যিই আসা হল। তোমার যে ভালো লেগেছে, তাতেই আমি খুশি।

বাবলি বলল, জলের মধ্যে মধ্যে ঐ যে আলোগুলো জ্বলছে ওগুলো কীসের আলো?

অভী বাংলোর বারান্দায় ফিরে দাঁড়িয়ে লেকের দিকে তাকাল।

তখন পাহাড় পেরিয়ে শেষ বেলার ম্লান লালিমা আধো অন্ধকারে বিস্তৃত সিসে-রঙা গালচের মতো লক্‌টাক্ হ্রদের উপর ছড়িয়ে পড়েছে।

ও একটু চুপ করে থেকে বলল, এগুলো দারুণ ব্যাপার। হ্রদের মধ্যে কচুরিপানার মতো একরকমের পানা হয়। সেই পানাগুলো ছোট ছোট ভাসমান দ্বীপের মতো ভেসে বেড়ায়, হ্রদের বুকে। এই পানার দ্বীপে পাতার ঘর বাঁধে জেলেরা, মাছ ধরে, আফ্রিকান ক্যানোর মতো ছোট ছোট নৌকায়—মাছ জমা করে দ্বীপের উপর—তার উপরেই রাঁধে বাড়ে ভেসে ভেসে, ঐখানেই খায়-দায়। ক্লান্ত হলে ঘুমোয়।

তারপর থেমে বলল, একটু চুপ করে থাকো, একটা অদ্ভুত শব্দ শুনতে পাবে।

বাবলি চুপ করে রইল।

সত্যি শুনতে পেল অদ্ভুত একটা গম্ভীর আওয়াজ ভেসে আসছে হ্রদের মধ্যে থেকে, বাংলোর চতুর্দিক থেকে। শব্দটা অনেকটা ডুং ডুং-ডিং ডিং মতো। কিন্তু ধাতব শব্দ নয়। শব্দটা ভোঁতা। এবং একটা শব্দ নয়, অনেকগুলো শব্দ। সবদিক থেকে আসছে। ভোঁতা বলে, এবং জলের গা বেয়ে আসছে বলে খুব ভারী বলে মনে হচ্ছে শব্দগুলোকে। আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই ডুং-ডিং শব্দ বাবলির মনে কী এক অনামা-অজানা-অনিশ্চিত ভয়ের সঞ্চার করল।

বাবলি অভীর বাহুর কাছে ঘন হয়ে এসে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে শুধোল, এ কীসের শব্দ?

অভী হেসে উঠল।

অনেক, অনেকক্ষণ ধরে হাসল অভী। বাবলি ভাবল। অনেকক্ষণের গুমোট কাটল। এই বাংলোর দেওয়ালে-দেওয়ালে অভীর হাসিটা যেন অনেক লোকের হাসি হয়ে গম্‌গম্ করে উঠল ঘরময়।

অভী বলল, জেলেরা তাদের মাছ-ধরা নৌকোর উপরে বৈঠা দিয়ে আওয়াজ করছে। যাতে মাছেরা দৌড়োদৌড়ি করে। মাছেরা ভয় পেয়ে দৌড়োদৌড়ি করলে তারা সহজে জেলেদের পেতে-রাখা জালে গিয়ে পড়বে।

বাবলি তখনও আচ্ছন্ন হয়ে ছিল।

অস্ফুটে বলল, কী অদ্ভুত শব্দ!

অভী হ্রদের বুকে হাওয়ায় কাঁপা ভৌতিক আলোগুলোর দিকে চেয়ে বলল, আমি পৃথিবীর অনেক দেশ ঘুরেছি, এমন অদ্ভুত শব্দ কখনও শুনিনি।

বাবলি বলল, আমি তোমার মতো দেশ ঘুরিনি কিন্তু এমন শব্দ আমিও কখনও শুনিনি। শব্দটা ভীষণ ভয়ের। শিরদাঁড়া ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।

অভী বলল, আমার পাশে দাঁড়িয়েও? সেটা আমার পক্ষে ইন্‌সাল্‌টিং।

বাবলি আদুরে গলায় বলল, উঁ ম্ ম্ ম্-ম্।

ডাকবাংলোর বসার ঘরে অন্ধকার নেমে এসেছিল।

বাবলি বলল, আলোটা জ্বেলে দাও না। আমার বড় ভয় করছে।

অভী আলো জ্বালতে গেল। কট্ করে শব্দ হল সুইচের। বলল, লোড শেডিং।

ও মা! তবে কী হবে?

ভয়ার্ত গলায় বলল বাবলি।

বাবলির কথা শেষ হতে না হতে চৌকিদার একটা বড় কেরোসিনের সেজ-বাতি নিয়ে ঘরে ঢুকল। তার দু'হাতে-ধরা বাতির আলোয় দেওয়ালে তার ছায়া পড়েছিল। লোকটার ছায়াটা কদাকার, ভয়াবহ। লোকটাও।

আলোটা টেবলের উপর নামিয়ে রাখার পর ঘরের অন্ধকার যেন অনেক বেড়ে গেল। আলোটা চৌকিদারের মুখে পড়ল। এরকম একটা মুখ এর আগে কখনও দেখেনি বাবলি। মুখটা বড় নিষ্ঠুর কিন্তু নৈর্ব্যক্তিক। তবু মুখটা কীরকম যে, তা বাবলি প্রথমে বুঝে উঠতে পারল না। মানে, ব্যাখ্যা করতে পারল না।

তারপরই বাবলির মনে হল, যেন বুঝতে পেরেছে। লোকটার মুখে এমন একটা ভাব আছে যে মনে হয় লোকটার সঙ্গে কোনোরকম কম্যুনিকেশানই সম্ভব নয়। লোকটা এই পানার দ্বীপের মতো। একটা দ্বীপ। বিচ্ছিন্ন। তার চারধারে যোগাযোগহীনতার জল।

লোকটা কথা বলল অভীকে উদ্দেশ্য করে।

কী ভাষায় বলল, বাবলি বুঝল না।

লোকটার মুখে কথা বলার সময় কোনোরকম অভিব্যক্তি ফুটে উঠল না।

অভী জবাবে অজানা ভাষায় কীসব বলল।

লোকটা নমস্কার করল না। হাসল না।

বাবলির মনে হল, লোকটা ভীষণ দুর্বিনয়ী ভূতুড়ে। হয়তো এইরকম ডুং-ডিং আওয়াজ শুনে শুনে হ্রদের জলের উপর রাতের পর রাত একা একা ভৌতিক আলো জ্বলা দেখে দেখে লোকটাও বোধহয় এরকম অস্বাভাবিক হয়ে গেছে।

অভী বলল, তোমার একটু অসুবিধে হবে একে নিয়ে, এ মিজো। মিজো ছাড়া অন্য কোনো ভাষা জানে না ও। তোমার যা কিছু দরকার আমায় বোলো।

হতাশ গলায় বাবলি বলল, বেশ!

অভী বলল, চান করবে তো?

বাবলি বলল, করতে পারি, যদি জল গরম থাকে।

জল গরম করে দেবে। লোক তো আছে।

তা আছে। বাবলি বলল, কিন্তু তাকে তো আমার ভাষা বোঝাতে পারব না।

আমাকে তো পারবে। অভী সপ্রতিভভাবে উত্তর দিল।

বাবলি উত্তর দিল না। অভীর দিকে চেয়ে রইল।

অভী ঘরের বাইরে গেল। বোধহয় লোকটাকে ডাকতে।

বাবলির একা ঘরে ঐ ভূতুড়ে পরিবেশে বসে বড় গা-ছমছম করতে লাগল। বাইরে হ্রদের উপরে সেই আওয়াজগুলো ধীরে ধীরে যেন জোর হতে লাগল। নৌকোগুলোর অন্ধকারতর ছায়া অন্ধকার জলের উপর প্রাগৈতিহাসিক কোনো জলচর জীবের মতো ভেসে বেড়াচ্ছিল। ভাসমান ভূতুড়ে দ্বীপগুলো মধ্যে-মধ্যে কতকগুলো জ্বলে-ওঠা নিভে যাওয়া আলোর দিকে তাকিয়ে বাবলির মনে হল ও যেন শার্লক হোম্‌সের কোনো নবতম অ্যাডভেঞ্চারের পটভূমিতে এসে পৌঁছেছে।

অভী আসতে দেরি করছে।

বাবলি ওর মনটাকে ঐ জলজ ভয়াবহ আবহাওয়া থেকে তুলে এনে সাহসের তোয়ালে দিয়ে মুছে নিল। তারপর খুশি খুশি চোখ তুলে নিজের মনের দিকে চেয়ে আদুরে নীরবতায় শুধোল, তোমার চান করা-না-করা নিয়ে অভীর এত মাথাব্যথা কেন? অভী কি আজ তোমাকে শারীরিকভাবে চায়।

এ কথাটা ভাবতেই বাবলির কানের লতিতে, গালে, বুকের মধ্যে রক্ত যেন দাপাদাপি করে উঠল। বাবলির সমস্ত বাবলি ছলাৎ ছলাৎ করে চল্‌কে উঠল মনের গভীর গোপন অন্তঃপুরে।

শরীরের শরিক এর আগে কেউ হয়নি বাবলির।

ও উচ্চমধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। বিয়ের আগে শারীরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে ওর স্বাভাবিক সংস্কারজাত কিছু মানা ছিল। আসলে এ বিষয় নিয়ে এর আগে ও বিশেষ ভাবেনি। বিয়ের আগে একথা ভাবার অবকাশ যে ঘটবে, সে কথাও ভাবেনি। তবে বাবলি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা। বিয়ের আগে শরীরের ভাগীদার কেউ হলেই যে তার চারিত্রিক পতন হল একথা ও কখনও মানেনি। কারণ চরিত্রের ব্যাখ্যা তার কাছে যা, তার সঙ্গে বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের চরিত্রের ব্যাখ্যা মেলে না। কারও সঙ্গে স্বেচ্ছায়, স্বাধিকারে ও আনন্দে শরীরের আনন্দ ভাগ করে নিলেই যে নৈতিক অধঃপতন ঘটে তা বাবলি আরও অনেকানেক আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা মেয়ের মতই মেনে নিতে রাজি নয়। এও ও ভাবে না, বা বলে না যে, বিবাহ-পূর্ব শাবীরিক সংসর্গের মধ্যে কোনো বাহাদুরি বা আধুনিকতা আছে। জীবনে যা সহজ, স্বাভাবিক আন্তরিকতা ও রুচিশীলতার মধ্যে দিয়ে পাওয়া যায় বা দেওয়া যায় তার কিছুমাত্র পেতে বা দিতে কখনও বাবলির দ্বিধা ও দৈন্য ছিল না। অভীকে তার ভালো লেগেছে। শুধু যে ভালো লেগেছে তাই-ই নয়, অভীকে সে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে চলেছে অতি শিগগিরি। তাই আজ এই আশ্চর্য ভৌতিক পরিবেশে অভী তার পুরুষসুলভ অবুঝপনায় যদি বাবলির কাছে কিছু অগ্রিম চায় তাহলে তা না দেওয়াটা অসমীচীন হবে বলে মনে হল বাবলির। জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই হুন্ডি কেটে দেনাপাওনা নথিভুক্ত করতে হবে যে, এমন কথা নেই। হৃদয়ের ক্ষেত্রে তো কখনোই নয়। এ-বাবদে অনেক দাদন দিতে হয়, অনেককে; অনেকবার। অনেক অগ্রিম দেয় ঋণ ধুলোয় ফেলাও যায়। আবার অনেক জমাও পড়ে প্রাপ্তির ঘরে, সে জমার কোনো ব্যাখ্যা নেই। তার ছোট্ট জীবনে বর্তমানটাকেই বড় দায়ী বলে মনে করে এসেছে বাবলি। বর্তমানকে আঙুরের মতো নিঙ্‌ড়ে বাঁচতে চেয়েছে ও—ভবিষ্যৎ বা অতীতের জন্যে কণামাত্র হিসেব না করেই।

সত্যি কথা বলতে কী, অনেক মাস আগে নাগাপাহাড়ের উপরে কোহিমা-ডিমাপুরের পথে সেই কাঠুরের ঘরের হঠাৎ-রাতে অভী বাবলির কাছে সংশয়হীনতার সঙ্গে প্রমাণ করেছে যে, সে শুধু শিক্ষিত পুরুষই নয়; সে অভিজাতও। তার মধ্যে আপস্টার্ট্ হ্যাংলামি একটুও নেই। অন্য মেয়েরা পুরুষের মধ্যে কোন্ গুণকে সবচেয়ে বড় গুণ বলে মনে করে তা জানে না বাবলি, জানতে চায় না। কিন্তু ওর কাছে যে পুরুষের চরিত্রে ঔদার্য ও সহানুভূতি না থাকে তাকে কোনোমতেই ভালো লাগানো যায় না। সে রাতে অভীকে ও আহ্বান জানিয়েছিল—একজন শীতার্ত, সভ্য, বিব্রত, লজ্জিত

সুন্দর পুরুষকে। কিন্তু অভী বোধহয় রক্ষক হয়ে ভক্ষকের ভূমিকা আদপে পছন্দ করেনি। সে রাতে অভীর চরিত্রের একটা বিশেষ দরজা বাবলির কাছে খুলে গেছিল—যে দরজা ও বহু পুরুষের মধ্যেই দেখবে বলে আশা করে না; করেনি।

ওর ভাবনার জাল ছিঁড়ে দিয়ে অভী ঘরে ঢুকল। বলল, জল গরম হচ্ছে। চলো, তোমার ঘর দেখবে চলো।

বাবলি উঠল। কিন্তু 'তোমার ঘর' কথাটাতে বেশ আশ্চর্য হল। এখানেও কি অভী আলাদা ঘরে শুতে চায় নাকি? এক ঘরে শোওয়াব মধ্যে দোষ কি? পাশাপাশি খাটে শুয়ে গল্পও তো করা যেতে পারে? তাছাড়া এই ভূতুড়ে পরিবেশে, এই নির্জনতার মধ্যে ও একা ঘরে শুতেই পারবে না। ভয়েই মরে যাবে।

কিন্তু একথা অভীকে বলবে কী করে? ও যে অভীর সঙ্গে এক ঘরে শুতে চায়—সম্পূর্ণই নিরাপত্তার কারণে হলেও একথা মেয়ে হয়ে ওর পক্ষে কি করে বলা সম্ভব? ও মনে মনে আশা করেছিল যে, এইবার অন্তত অভী তাকে লজ্জা থেকে বাঁচাবে। আলাদা ঘরে শুয়ে নিজেকে কি ও চরিত্রবান বলে প্রমাণিত করতে চায়? এখনও কি ও মিড্‌ল ক্লাস মরালিটি কাটিয়ে উঠতে পারল না? একে একধরনের হীনমন্যতা বা বাহাদুরিপ্রবণতা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। ভালো সাজার ও ভালো ছেলে বলে নাম কেনার একি অর্থহীন মূর্খ প্রয়াস? অভীর আত্মবিশ্বাস কি এতই কম? যা তারই একান্ত, যাতে তার সহজ অধিকার তা সে হাত বাড়িয়ে নেবে না কেন? যেসব পুরুষের মুখে শিশুর মতো খাবার তুলে দিতে হয় তাদের বাবলি প্রাপ্তবয়স্ক বলে মনে করে না। কেড়ে-কুড়ে ফেলে-ছড়ে খাওয়ার মধ্যে একটা দামাল অগোছালো ভাব আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেটাই পুরুষের স্বভাব। পুরুষ পুরুষোচিত না হলে ভালো লাগে না। অভীর এই দ্বিধার কথা ভেবে—অবাক হল বাবলি।

ঘরটা ভালো। সবই ভালো। কিন্তু...। ভীষণ ভয় করবে বাবলির।

ঘরে ঢুকে লণ্ঠনটা তুলে ধরে ভালো করে ঘরটা বাবলিকে দেখাল অভী। মুখে বলল, পছন্দ?

বাবলি উত্তর দিল না।

অভী কিছুক্ষণ বাবলির অপ্রতিভ মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ বলল, কি? ভয় করবে বুঝি?

বাবলি হেসে ফেলল। লজ্জা, আনন্দ, স্বস্তি সব মিলিয়ে দারুণ এক আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল বাবলির মুখ। ভারী সুন্দর দেখাল বাবলিকে।

বাবলি অভীর বাহুতে বাহু ছুঁইয়ে ঘন হয়ে এল অভীর কাছে। হাসল একটু।

বুদ্ধিমান অভী সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল বাবলি কী বলতে চায়।

ও বলল, কোনো ভয় নেই—বলেই নিজের বুকে আঙুল ছুঁইয়ে বলল, দারোয়ান পাহারা দেবে।

বাবলি হাসল। বলল শুধুই পাহারা তো?

অভী বলল, শুধুই পাহারা।

তারপর একটু ভেবে বলল, কিন্তু আমি ভাবছি, আমার লোভকে কে পাহারা দেবে?

অসভ্য! বাবলি বলল। বলেই, মুখ ফিরিয়ে নিল।

বাবলি চান করে নিয়েছে গরম জলে। চান করে উঠে একটা লেমন-ইয়োলো ভয়েলের শাড়ি পরেছে। সঙ্গে ঐ রঙের ছোট হাতার প্লেট-মুড়ে সেলাই করা লো-কাটের ব্লাউজ। অভী চান করতে গেছে। ও সোফায় বসে আছে। আলোটা হঠাৎ জ্বলে উঠল। খুশি হল ও।

খাট দুটো আলাদা আলাদা নয়। একেবারে জোড়া-লাগানো। সেদিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল বাবলি। তারপরই ওর তলপেটে ভয়, আনন্দ, উত্তেজনা সব মিলিয়ে এক অভূতপূর্ব অনুভূতি হামাগুড়ি

দিয়ে বেড়াতে লাগল। ওর একবার মনে হল এখানে না এলেই বোধহয় ভালো হত। আরেকবার মনে হল যে, ভাগ্যিস এসেছে!

অভী পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে বাথরুম থেকে বেরুল। বেরিয়েই বলল, ফাইন্। এবার তো চাটা দিয়ে যাওয়ার কথা। লোকটা কী করছে বলতো? আলোও এসে গেছে।

বাবলি ঠোঁট উলটে বলল, আমি কী করে বলব?

অভীই বলল, ঐ যে, পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

লোকটা ট্রে-সুদ্ধ চায়ের পট নামিয়ে রেখে গেল। নামিয়ে রেখেই একবার চকিতে তাকাল বাবলির দিকে। বাবলির কেমন গা-ছম্ছম্ করে উঠল। সেই ছম্ছমানি ঝেড়ে ফেলে ও চা তৈরি করতে লাগল।

অভী বলল, চিনি ক চামচ জানো তো?

বাবলি হাসল, বলল জানি।

অভী কপট কৌতূহলের সঙ্গে বলল, তুমি কি সবই জানো আমার সম্বন্ধে? কি আমার পছন্দ, কি অপছন্দ?

বাবলি চায়ের পেয়ালা অভীর হাতে তুলে দিতে দিতে বলল, সব জানি না; কিছু কিছু জানি।

চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে অভী বলল, রাতে বেশ গরম হবে বলে মনে হচ্ছে। আমি কিন্তু মশারি টাঙিয়ে শুতে পারি না—আর পাখাও ফুলস্পিডে না চালিয়ে শুতে পারি না। মেঘলা করেছে আকাশে, তাই এত গরম।

বাবলি উত্তর দিল না।

অভী একবারও জিগ্গেস করল না যে, মশারি না টাঙিয়ে শুয়ে বা পাখা অন্ করে চালালে বাবলির কোনো অসুবিধা হবে কি না; হয় কি না।

অভীর বাবলি সম্বন্ধে এই স্বাভাবিক ও প্রাসঙ্গিক ঔৎসুক্যর অভাব বাবলিকে শুধু অবাকই নয়, একটু দুঃখিতও করল।

চা খেতে খেতে ও ভাবছিল যে, ও কোনোদিনও মশারি না টাঙিয়ে শুতে পারেনি। যত গরমই হোক না কেন। ঘরের কোনায় একটি মশাও যদি একবারের জন্যেও পিন্ন্ করে ওঠে তাহলেই নিছক টেন্শনে ও মশা কামড়াতে পারে এই ভয়েই ওর সারারাত ঘুম হয় না। পাখা 'অন'-এ চালালে তো ওর নিশ্বাসই বন্ধ হয়ে যায়। তাছাড়া ছোটবেলায় মা মারা যাবার পর থেকে বাবলি চিরদিনই একা ঘরে শুয়ে অভ্যস্ত। অন্য কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তির সুবিধা অসুবিধার সঙ্গে মানিয়ে চলা তার কখনও প্রয়োজন হয়নি। জীবনে এই প্রথম। এই সন্ধেবেলা ওর হঠাৎ মনে হল যে, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বিবাহিত মানুষকে স্ত্রী বা স্বামীর কতরকম সুবিধা-অসুবিধাই না মানিয়ে নিয়ে চলতে হয়। চা-এর কাপ নামিয়ে রেখেই বাবলির হঠাৎই মনে হল যে, বিয়ে ব্যাপারটা বেশ কঠিন—বিয়ে মানেই হানিমুন নয়, গাড়ি চালানো স্বামীর পাশে বসে হু-হু হাওয়ায় বেড়িয়ে বেড়ানো নয়। এর মধ্যে যে এতসব সহজ অথচ জটিল জোড়-মেলানোর ব্যাপার আছে তা বাবলির জানা ছিল না। মনে মনে ওর কাকিমার প্রতি, ওর পরিচিত বিবাহিতা বান্ধবী ও আত্মীয়াদের প্রতি সম্মান বেড়ে গেল ওর সেই মুহূর্তে। ও ভাবল, আশ্চর্য। ওসব কথা কেউ ওকে বলেওনি, ওরও কখনও মনে হয়নি। সামান্য মশারি ও পাখা যে ব্যক্তিস্বাধীনতার পথে এতবড় প্রতিবন্ধক হয়ে উঠতে পারে কী করে, তা বাবলি ওর সমস্ত মেধা দিয়ে বুঝতে পারল না।

এটা সেটা নানা গল্প করতে লাগল ওরা দুজনে।

চা খাওয়ার পর, চৌকিদার চায়ের বাসন নিয়ে গেলে অভী উঠে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে পিছন থেকে এসে বাবলির গ্রীবায় আলতো করে চুমু খেল।

বাবলি শিউরে উঠল ভালো লাগায়। মনে মনে বলল, পারফেক্ট। ছোটবেলা থেকে যত ইংরেজি ছবি দেখেছে, গ্রেগরি পেক্ থেকে ওমার শরীফ তারা তাদের সমস্ত নায়িকাকে—সে লিজ টেলরই হোক আর অড্রে হেপবার্নই হোক ঠিক এইভাবেই চুমু খেয়েছে। এমন রোমান্টিক পুরুষালি কায়দায় সুন্দর আদরই ও আশা করেছিল অভীর কাছ থেকে। বড় ভালো লাগল বাবলির। ও মুখ নামিয়ে নিল ভালো লাগায়।

অভী বলল, পাহারাদারটা এখন থেকেই চুরি করতে শুরু করেছে—এই সন্ধেবেলাতে—রাত বাড়লে কী যে করবে তা কিন্তু সে নিজেও জানে না।

বাবলি মুখ ঘুরিয়ে বলল, তুমি ভীষণ অসভ্য।

অভী দরজাটা খুলে দিতে দিতে বলল, তোমার যা ইচ্ছা, যতটুকু ইচ্ছা আমাকে বোলো।

বাবলি জবাব দেয়নি। চুপ করে থেকে ভেবেছে যে, ও কোনোদিনও বাড়ির রান্নার ঠাকুরের কাছ থেকেও কিছু চেয়ে খায়নি। ও বড় অভিমানিনী। ওর নিজের ইচ্ছার বা অনিচ্ছার কথা কখনও মুখ ফুটে কাউকে বলেনি। বলবেও না কখনও। অভী যদি ওকে বুঝতে না পারে? কী ও চায় আর কী চায় না তা জানতে না পারলে বাবলির সমস্তটুকু বাবলিকে অভী কখনও বুঝবে না; পারেও না। কাছে থেকেও অভী তাহলে চিরদিন দূরেরই থেকে যাবে। যতটুকু অভী পাবে, তা বাবলির টুক্‌রো-টাক্‌রা।

বাবলির বড় ভয় হল; অভী কি তাকে তেমন করে বুঝতে পারবে? যদি না পারে?

ওরা কথা থামালেই বাইরের ডুং-ডিং শব্দটা সমস্ত পরিবেশকে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল।

বাবলি তাই আদুরে গলায় বলল, গল্প করো, তুমি কত কী জানো, কত দেশ ঘুরেছ, গল্প করো না বাবা।

অভী বলল, গল্প করতে ভালো লাগছে না। এই সময় এই মুহূর্তটুকুকে দারুণ ভালো লাগছে। কিন্তু...।

কিন্তু কী? বাবলি শুধোল।

ঝুমার জন্যে মনটা খারাপ লাগছে। বড় ছোট লাগছে নিজেকে। একটু থেমে বলল, তোমার লাগছে না?

বাবলি মুখ নামিয়ে নিল। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল।

তারপর বলল, আমি তো ছোটই। তোমার মতো মহৎ তো নই—আমার নতুন করে ছোট লাগার কোনো কারণ নেই।

অভী উত্তর দিল না।

বাবলি বলল, চুপ করে কেন? কিছু বলো।

বাবলির ভিতরটা, শরীরের ভিতর, মনের ভিতর এতক্ষণ, মানে, চান করে ওঠার পর থেকে এই আসন্ন অভিসারের রাতের জন্যে উন্মুখ হয়েছিল। ওর অন্তরে শরীরের যে এত ফুটে-ওঠার অপেক্ষায় অপেক্ষমাণ দারুণ সুগন্ধি সব কুঁড়ি ছিল ও নিজেও কখনও জানেনি। একটু আগেই বাবলি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে জানে বলে বিশ্বাস করত। কিন্তু ও এখন এই মুহূর্তে জানছে যে, নিজেকে ও কখনোই সম্পূর্ণভাবে জানেনি, জানত না। কেউই কি তা জানে? জীবন যত এগোয়, যতই দিন যায়, পরতে পরতে জানাগুলো খুলতেই থাকে, খাঁচে-খোঁচে। পাড়েতে আঁচলাতে কত বিস্ময়, কত আশ্চর্য সব আবিষ্কার যে লুকিয়ে থাকে—আতরের মিষ্টি গন্ধের সঙ্গে, ন্যাপথলিনের উগ্র গন্ধের সঙ্গে তা বাবলি কখনও জানেনি। হিরের মতো মনের এক এক কোণে অন্য মনের এক এক কোণ থেকে আলো পড়লেই কত যে আলো ঝল্‌মলিয়ে ওঠে তা যতক্ষণ না তা ওঠে ততক্ষণ জানাও যায় না।

বাবলি ভাবছিল যে, একটু আগেও ও অন্য বাবলি ছিল। সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। ভালোবাসা, ভালো লাগার উত্তেজনায় আকুল কোনো পাপড়ি মেলা ফুলের মতো। অথচ অভীর এই একটা কথায় ওর ভিতরের শরীর মনের গোপন পাপড়িগুলি কার অদৃশ্য অঙ্গুলিহেলনে যেন গুটিয়ে গেল, এমনভাবে গুটিয়ে গেল যে ওর মনে হল তাদের বোধহয় অনেকদিন আর চেষ্টা করেও খোলা যাবে না!

শরীর মনের কুলুপের চাবি হারিয়ে গেছে।

বাবলি শাড়ির আঁচলটা ভালো করে বুকের সামনে টেনে নিয়ে বসল, গ্রীবা ঢেকে। অভীকে যে আদর করতে অনুমতি দিয়েছিল তার জন্যে মনে মনে ধিক্কার দিল নিজেকে। ইম্ফলে আসার জন্য, ভুল লোককে ভুল করে ভালোবাসার জন্যে নিজেকে তিরস্কার করল মনে মনে।

হঠাৎ কথা ঘুরিয়ে অভী বলল, তুমি কবিতা ভালোবাস?

মানে? বাবলি নৈর্ব্যক্তিক গলায় শুধোল অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে।

কবিতা ভালোবাস কিনা জিজ্ঞেস করছি!

অভী সহজ গলায় আবারও বলল।

—হঠাৎ কবিতার কথা? 'আশ্চর্য পতন'-এর মতো কবিতার কথা বলছ?

অভী হেসে ফেলল। বলল, না। তারপর বলল, রবার্ট ফ্রস্ট আমায় প্রিয় কবি। এই মুহূর্তে ফ্রস্ট-এর একটি কবিতা মনে পড়ছে খুব।

বাবলি বলল, ফ্রস্ট আমি বিশেষ পড়িনি। তবে জওহরলাল নেহরুর দৌলতে ওঁর একটি কবিতা প্রায় সকলেই জানেন। কবিতাটির নাম মনে নেই—কিন্তু ঐ যেসব লাইন আছে না—প্রমিসেস্ টু কীপ ইত্যাদি।

অভী বলল, কবিতাটির নাম :

Stopping by Wood on a Snowy Evening কিন্তু এখন আমার অন্য একটি কবিতার কথা মনে পড়ছে ভীষণ।

কী কবিতা? বাবলি শুধোল।

The Road not taken! অভী বলল।

কী কবিতাটা—শুনি?

অভী আবৃত্তি করল—

> Two roads diverged in a yellow wood,
> And sorry I could not travel both
> And be one traveller, long I stood
> And looked down one as far as I could
> To where it bent in the undergrowth;
> Then took the other, as just as fair,
> And having perhaps the better claim,
> Because....

এই অবধি বলতেই বাবলি ঝাঁঝিয়ে উঠল। এমনভাবে এর আগে ও অভীর সঙ্গে কখনও কথা বলেনি।

অভীর মনে এতদিন পরে এতকিছুর পরেও যে ওর সম্বন্ধে এখনও এত দ্বিধা আছে এ কথাটা বুঝতে পেরেও অপমানিত বোধ করল।

বলল, এর পরের অংশ শোনবার ধৈর্য আমার নেই। সব কাজের পেছনেই কারণ একটা থাকে। কবির কারণ আর তোমার কারণ নিশ্চয়ই এক নয়। কিন্তু তোমার কাছে তো আমি কারণ শুধোইনি। নিজেকে আমার কারণে ছোট করছ কেন? ঝুমার কারণে ছোট হয়ে, হীন বোধ করে তুমি যদি আনন্দিত হও সেইটেই আমার কাছে অনেক কারণ। কারণের বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন কী?

অভী হেসে উঠল, বলল, সবকিছুই তুমি বড় তাড়াতাড়ি পার্সোনাল করে ফেল। কবিতাটির শেষটা শোন। ভালো লাগবে। শোনো :

I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence :
Two roods diverged in a wood, and I–
I took the one less travelled by,
And that has made all the defference.

বাবলি একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ডিফারেন্সও বুঝলাম, কিন্তু ফর good or for worse?

সে তো জানা যাবে ভালোই। তার আগে কি জানা যাবে?

বাবলি একটু পর আপন মনে হেসে উঠল।

অভী বলল, হাসছ কেন?

আমারও একটা কবিতা মনে পড়ল। হঠাৎ।

কী কবিতা? কার কবিতা? অভী শুধোলো।

বাবলি বলল—বহুদিনের কবিতা—হুইটম্যানের—লিভস্ অব গ্রাস্-এর Song of myself-এর কটা লাইন।

কোন্ লাইন? উৎসুক গলায় অভী শুধোল।

বাবলি জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকার তারাভরা রাতের আকাশে চেয়ে ভারী বেহিসেবি গলায় আবৃত্তি করল লাইন কটি :

"There was never any more inception than there is now,
Nor any more youth or age than there is now;
And will never be any more perfection than there is now,
Not any more heaven or hell than there is now."

লাইন কটি আবৃত্তি করতে করতে নিজের গলার আবেগ ও গভীরতায় বাবলি নিজেই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। আবৃত্তির মধ্যে মধ্যেই ওর মনে হল জীবনে একটা বিশেষ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। ওর হঠাৎই মনে হল, আসলে কেউ কারও কাছে হারে না; কাউকে হারায়ও না। হার যেটা আসল হার; সেটা নিজের কাছেরই হার। বাবলি ভগবান নামক অদৃষ্ট, নিরাকার, কোনো বিশেষ ক্ষমতাবান পুরুষ অথবা নারীর উদ্দেশে—যার অস্তিত্বে তার তেমন বিশ্বাস অথবা অবিশ্বাস কিছুই ছিল না—কৃতজ্ঞতা জানাল এ কারণে যে, সে নিজের কাছে কখনও হারেনি—নিজের বুকের মধ্যে হার স্বীকার সে কখনও করেনি—এ মুহূর্তেও করবে না।

ওর মনের মধ্যে ভাবনাটা দানা বাঁধতে না বাঁধতে অভী বলে উঠল, হুইটম্যানও আমার খুব প্রিয় কবি—

What will be will be well–for what is is well,
To take interest is well, and no: tc take interest shall be well.

মাঝপথে অভীকে থামিয়ে দিয়ে বাবলি বলল, বাঃ কী চমৎকার! কোন্ কবিতা এটা?

অভী অবাক হয়ে বলল, কেন Leaves of Grass-এর আছে—To think of time.

বাবলি সহজ হল এতক্ষণে। নিজের মনের গুমোট কাটিয়ে উঠে হাসল। বলল, তুমি বুঝি দেশি কবিদের কবিতা একেবারেই পড়ো না?

অভী কথাটার খোঁচা এড়িয়ে গিয়ে বলল, পড়তে কোনো আপত্তি নেই। তবে ইংরেজি কবিতাই বেশি পড়েছি। এটা দোষ বলে যেমন মানতে রাজি নই; গুণ বলেও দাবি করি না।

বাবলি উত্তর দিল না কোনো।

ওর কেবলই মনে হচ্ছিল যে গতবার ইম্ফলে এসে এবং ইম্ফল ডিমাপুর যাওয়া অবধি সমস্তক্ষণ বাবলিই ওদের দুজনের আকাশে সূর্যের মতো দেদীপ্যমান ছিল। আপারহ্যান্ড ওরই ছিল। অভীকে

তখন একজন ভালো কিন্তু বোকা-বোকা হীনমন্যতায়-ভোগা ছেলে বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু তারপর ওর বিষয়ে সবকিছু জেনে, অভীর সঙ্গে মিশে, তাকে নিজের হৃদয় প্রায় কিছুমাত্র বাকি-না-রেখেই সমর্পণ করে, এবং ইম্ফলে এসে ঝুমাকে দেখার পর থেকে অভীই এখন এই ছোট্ট আকাশে ঝক্‌মক্ করছে। ওকে এত বেশি বুদ্ধিদীপ্ত, এত বেশি আত্মবিশ্বাসী, ও এতই উচ্চমন্যতায় ঘেরা বলে মনে হচ্ছে যে, ওকে বুঝি আর আগের মতো ভালো লাগছে না। মেয়েরা যাকে ভালোবাসে, রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন; সেই ভালোবাসার জন্য মেয়েদের চোখে চিরদিনই ছেলেমানুষ। এবারে বাবলি লক্ষ্য করছে যে অভীর মধ্যের সেই ছেলেমানুষি নির্ভরশীল সত্তাটি যেন বিনা নোটিশে ক্লাশ পালিয়ে কোথাও চলে গেছে। এমনকি প্রক্সি দেওয়ার জন্যেও তার ভিতরে অন্য কোনো দ্বিতীয় সত্তাকে উপস্থিত রেখে যায়নি।

বাবলি মনে মনে অভীকে বলল, যখন তুমি নির্দ্বিধায়, নিঃশর্তে আমাকে চেয়েছিলে একমাত্র আমাকেই; তখন আমি সাড়া দিয়েছিলাম। আজ যখন তোমার মনে আমার সম্বন্ধে দ্বিধা এসেছে, তুমি আমার পাশে বসে, আমাকে আদর করতে করতে ঝুমার কথা ভাবছ তখন আমারও সেই নিঃশর্ত ভালোবাসা আমি ফিরিয়ে নেব। তুমি যত বড়ই হও না কেন, যত মেয়েই তোমাকে চাক না কেন, তুমি আমাকে প্রথমে হারিয়ে দিয়ে পরে দয়া করে জিতিয়ে দেবে এমন দান আমি চাই না। বাবলি চায়নি কখনও এমন দান। তুমি আমায় সম্পূর্ণ চেনো না অভী।

অভী ভাবছিল; বাবলির মনটা এর চেয়ে অনেক বড় ও উদার হওয়া উচিত ছিল। ভাবছিল, সব ছেলেরাই বোধহয় মনের দিক দিয়ে মেয়েদের চেয়ে স্বভাবত উদার হয়। ব্যতিক্রম হয়তো আছে কিন্তু এইটেই সাধারণ নিয়ম।

ঝুমার প্রতি যে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করা হয়েছে, করা হল এবং বাবলির এই খারাপ ব্যবহারের দায়িত্ব যে অভীতেও বহুলাংশে বর্তাল এ কথা অভী অস্বীকার করতে পারে না। ইম্ফলের মতো ছোট্ট জায়গায় যেখানে ঝুমার কোনো বন্ধুবান্ধব নেই, ভালো সিনেমা নেই, হোটেলের আশে-পাশে কোনো একা-মেয়ের পক্ষে হেঁটে বেড়াবার উপায় পর্যন্ত নেই; সেখানে এখন ও কী করছে, কীভাবে সময় কাটাচ্ছে অভী তা ভেবে পেল না।

অভী কিছুতেই বাবলির দিকে প্রসন্নতার সঙ্গে তাকাতে পারছিল না। বাবলিকে ওর বড় নীচ বলে মনে হচ্ছিল। সত্যি কথা বলতে কী ঝুমার সম্বন্ধে ওর মনে অন্য কোনো রকম অনুভূতি ছিল না—কিন্তু বাবলি আসার পর থেকে—বাবলি ঝুমার সঙ্গে অত্যন্ত নিষ্প্রয়োজনীভাবে খারাপ ব্যবহার করায়—ঝুমাকেও ও এক নতুন আলোয় দেখতে আরম্ভ করেছে। সহানুভূতি, সমবেদনা, অনুকম্পা সমস্ত মিলিয়ে এক দারুণ অনুভূতি। এর মানেও কি ভালোবাসা? অভী জানে না। কিন্তু ওর মনে বাবলির জন্যে যে উঁচু আসন ছিল সেই আসন থেকে বাবলি নিজেই ধুলোয় নেমে এসেছে তার অস্বস্তিভরা দীনতায়। এবং ঝুমা অভীর প্রতি তার অনাসক্তি ও বান্ধবীর প্রতি সৌজন্য এমন সংযমের সঙ্গে প্রকাশ করেছে যে, সে অনায়াসে উঠে এসেছে অনেক উঁচু আসনে, নিজের কোনোরকম চেষ্টা ছাড়াই।

মুরগির ঝোলটা চৌকিদার ভালোই রেঁধেছিল।

মুগের ডাল, কড়কড়ে করে আলুভাজা, মুরগির ঝোল আর ভাত। সময় ওদের দুজনের বুকে বড় ভারী হয়ে ছিল। অভী নানা গল্প করছিল, মানে করার চেষ্টা করছিল। বাবলিকে হাসাচ্ছিল, ঝুমার কথা মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করছিল; কিন্তু যতই চেষ্টা করছিল ততই অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল।

খাওয়া-দাওয়ার পর অভী বলল, চলো, একটু পায়চারি করি বাইরে।

বাবলি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল। যা ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার। চাঁদনি রাত হলে কথা ছিল।

তবে? কী করা হবে এখন? অভী শুধোলো।

বাবলি আবারও কাটা কাটা কথায় বলল, আমি ঘুমোব। আমার খুব ঘুম পেয়েছে।

এত তাড়াতাড়ি? অবাক গলায় বলল অভী।

তাছাড়া কী করার আছে এখানে? তুমিই বলো?

তা ঠিক। লজ্জিত গলায় অভী বলল। গলার স্বরে প্রকাশ পেল যে, বাবলিকে এই লক্‌টাক্ লেকে এনে কষ্ট দেওয়ার জন্যে ও দুঃখিত।

বাবলি বলল, এখানে মশলা-টশলা পাওয়া যাবে না, না? না হলে পান হলেও চলত—ফর্ আ চেঞ্জ।

অভী বলল পানের দোকান আছে নিচে—তবে এতক্ষণে বন্ধ হয়ে গেছে। তা ছাড়া এখানের পান তুমি খেতে পারবে না! মজা সুপুরি দিয়ে খায় ওরা—উৎকট গন্ধ। মশলাও নেই।

তারপর বলল, একটা সিগারেট খাও তার চেয়ে। মুখটা ভালো লাগবে।

বাবলি হাত বাড়িয়ে বলল, দাও।

অভী এগিয়ে এসে সিগারেটটা ধরিয়ে দিল বাবলিকে।

বসবার ঘর থেকে ওরা শোবার ঘরে এল।

এসেই বাবলি বলল, খাট দুটো এমন বিশ্রীভাবে জোড়া লাগানো। আলাদা করা যায় না?

অভী বাবলির চোখের দিকে চেয়েও চোখ নামিয়ে নিল।

তারপর বলল, দেখি।

চৌকিদারকে ডেকে সঙ্গে নিয়ে টানাটানি করেও খাট আলাদা করা গেল না। পায়াতে স্ক্রু মেরে জোড়া লাগানো ছিল খাট দুটো।

অসহায়ের মতো অভী তাকাল বাবলির দিকে একবার। তার পরই অভীর চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে এল। কী ভাবল অভী সেই-ই জানে।

অভী বলল, এক কাজ করো। তুমি একা খাটে শোও, আমি সোফাতে শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দেব, আমার অভ্যেস আছে। আসলে তুমিই তো ভয় পাচ্ছ। নইলে তো দুজনে দু ঘরে স্বচ্ছন্দে শোয়া যেত।

সেটাই মুশকিল। বাবলি বলল। তারপর বলল, তুমি-ই খাটে শোও—আমি সোফায় শুচ্ছি।

শক্ত গলায় অভী বলল, না। তা হয় না। তুমি অতিথি।

ক্ষণিকের অতিথি। বলেই মুখ ঘুরিয়ে নিল বাবলি।

অভী চোখ তুলে দেখল বাবলির চোখের কোণ যেন ভিজে উঠেছে। কিন্তু পরক্ষণেই দেখল যে, শুধু আর্দ্রতাই নয়, তাতে আগুনও আছে।

বাবলি সিগারেটটা শেষ করে অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে বলল, আমি শুয়ে পড়লাম। বড্ড ঘুম পেয়েছে।

যা-ইচ্ছা। অভী বলল, আমি তো জোর করে জাগিয়ে রাখতে পারি না তোমাকে।

বাবলি দেওয়ালের দিকে মুখ করে, অভীর দিকে পিছন ফিরে শুয়ে পড়ল। স্যুটকেশে নাইটি এনেছিল, বুকের মধ্যে করে তার সঙ্গে অনেক শখ, কল্পনা, ভালোলাগা স্বপ্ন এসবও এনেছিল। কিন্তু শাড়ি ছেড়ে নাইটি পরার অবকাশ বা ইচ্ছা যেমন হল না, বুকের মধ্যের সুন্দর সব স্বপ্নগুলোকেও নিশ্বাস চাপা দিয়েই রাখতে হল।

অভী সোফায় বসে আর একটা সিগারেট ধরাল। সিগারেটটা হাতে ধরে একদৃষ্টিতে বাবলির পিছন-ফেরা শায়ীন শরীরের দিকে চেয়ে রইল।

বাবলি কালো হলে কী হয়, ওর গায়ের চামড়ায় ভারী একটা মসৃণ উজ্জ্বলতা আছে। আলোতে, বাবলির কোমরের উপরের রাখা হাতটাকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল।

অভী ভাবছিল।

বাবলির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে বাবলির প্রতি এক ব্যাখ্যাহীন ঘৃণায় ওর মন ভরে উঠল। অভীর মনে হল ঝুমা শুধু বাবলির চেয়ে বহুগুণ বেশি সুন্দরীই নয় শারীরিকভাবে—ঝুমার আত্মিক সৌন্দর্যই অনেক বেশি। বাবলির মতো নীচু, ঈর্ষাকাতর মনের কাউকে স্ত্রী করার কথা ভাবতে পারে না অভী। এত কাছে থেকে, এই ঈর্ষাকাতর নোংরামির মধ্যে বাবলিকে হয়তো না দেখলেই ভালো হত। বাবলি সম্বন্ধে দুর্বলতাটা তবুও হয়তো বেঁচে থাকত ওর মনে।

ইচ্ছা করলে, এবং একটু অভিনয় করলে, আজ রাতে এই প্রসন্নতার মধ্যে একটি কুমারী শরীরের স্বাদ পেতে পারত অভী। এ পর্যন্ত অভী কোনো নারীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করেনি। এমনকি কোনো প্রাপ্তবয়স্কা নারীর শরীর অনাবৃত অবস্থায়ও দেখেনি। কিন্তু যেসব পুরুষ শরীরকে মন থেকে বিযুক্ত করে দেখে ও শরীরকে মৃতদেহের মতো করে পেতে চায় তাদের দলে পড়ে না অভী। মনের ভালোলাগা সঙ্গে না নিয়ে অন্য শরীরে যাওয়ার কথা ভাবতেই পারে না অভী। সে যে শরীরই হোক না কেন।

কিন্তু বাবলি বড় মোহময় ভঙ্গিমায় শুয়ে আছে। সুন্দর সুগঠিত পিঠ—টেনিস খেলে খেলে বাবলির চেহারাতে বড় মিষ্টি একটা বাঁধুনি এসেছে। কোমরটার কাছে উৎরাইয়ে ঢেউ খেলে গেছে। তারপরেই উঁচু হয়ে উঠেছে সুডৌল নিতম্বের চড়াই।

অভী সমস্ত শরীরে হঠাৎ বড় একটা জ্বালা অনুভব করল। এক অননুভূত অস্বস্তি। অভীর খুব ইচ্ছা হল বাবলির কাছে যায়—ওর পাশে শুয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে—ওর ছাই-ছাই কবুতরী বুকে মুখ ডুবিয়ে বলে, বাবলি আমাকে ক্ষমা করো—ঝুমার কথা আমি আর মুখেও আনব না। মনে তো নয়ই।

খুব দ্রুত অভী নিজের কাছে হেরে যেতে লাগল। দেখতে দেখতে সম্পূর্ণভাবে হেরে গেল নিজের কাছে।

সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে ছুঁড়ে ফেলে ও সোফা ছেড়ে উঠে ধীরে ধীরে বাবলির দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। তারপর খাটে উঠে বাবলির কাছে এল। ও জানত যে, বাবলি জেগে আছে; জেগে থাকবে। ও এও জানত যে, আজ সারারাত ওদের দুজনের কেউই ঘুমাতে পারবে না, যদিও সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন কারণে। অভী বাবলির বাহুতে, যেখানে ব্লাউজের হাতটা শেষ হয়েছে, সেখানে হাত রাখল।

বাবলি চোখ খুলে, মুখ ঘুরিয়ে চকিতে বলল, কী? কী চাও অভী?

বাবলির গলায় আনন্দ, স্বস্তি; জয়ের স্বর ঝরে পড়ল। তার সঙ্গে পরাজয়ের সুরও।

অভী হঠাৎ কী যেন দেখতে পেল বাবলির চোখে। যা একমাত্র মেয়েদের চোখেই লুকোনো থাকে।

সাপ দেখার মতো অভী সেই চোখ দেখে চম্‌কে উঠল।

পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল অভী। খাদের মধ্যে পড়ে যেতে যেতে বেঁচে গেল একটুর জন্যে।

অভী বলল, কিচ্ছু চাই না। তুমি কতখানি রাগ করেছ তাই দেখলাম।

তারপরই কথা ঘুরিয়ে বলল, জ্বরের মাত্রার মতো রাগের মাত্রা মাপার জন্যেও একটা মিটার-টিটার থাকলে ভালো হত। তাই না?

বাবলি হাসল না।

বলল, আমার কিন্তু সত্যিই ঘুম পেয়েছে। বিশ্বাস করো।

পাছে ও নিজের কাছে আবারও হেরে যায়, সেই ভয়ে বাবলির কাছ থেকে সরে এল অভী। বাবলিকে পাহারা দেওয়ার কথা ভুলে গিয়ে নিজের মধ্যের আদিম, পুরুষালি; নারী শরীরের প্রতি স্বাভাবিক লোভকে পাহারা দেওয়ার জন্যে ও ওর নিজের বুকের মধ্যের সমস্ত শুভ বোধগুলোকে

জাগিয়ে তুলল। ওর রুচি, ওর শিক্ষা, ওর অসাধারণত্বর গর্বকে জাগিয়ে তুলে প্রত্যেকের হাতে একটা করে সম্মানের তরোয়াল ধরিয়ে দিয়ে মনে মনে বলল, আমি একটু বেচাল হয়েছি তো অমনি আমাকে কেটে ফেলো তোমরা। বুঝেছ?

আরও একটা সিগারেট খেয়ে, পাখাটাকে অন্ করে দিয়ে, বড় বাতি নিবিয়ে দিয়ে ঘেরাটোপের মধ্যের টেবল-বাতিটা জ্বালিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল অভী সোফার উপর।

বাবলি কথা না বলে, পায়ের কাছে রাখা লাইঝাম্পিটাকে তুলে নিয়ে আপাদমস্তক মুড়ে শুয়ে পড়ল। অভীকে জোরে পাখা চালাবার জন্যে কোনোরকম অনুযোগ জানাল না। বাবলির দুচোখ দিয়ে অঝোরে জল ঝরতে লাগল। এত জল চোখের মধ্যে কোথায় লুকিয়েছিল বাবলি জানে না। কিন্তু এত কান্না বহুদিন ও কাঁদেনি।

পাখাটার শব্দ ছাপিয়ে বাইরের হ্রদ থেকে ডুং-ডিং—ডিং-ডিং শব্দগুলো গম্ভীর জলতরঙ্গর মতো বাজতে লাগল। বাবলির মস্তিষ্কের কোষে কোষে ছড়িয়ে গেল।

বাবলির ছোটবেলার কথা মনে হতে লাগল। মায়ের কথা। মায়ের মৃত্যুর কথা। বাবার কথা। ওর সমবয়সি মাসতুতো বোন পরমার বিয়ের কথা—গতবছরে। পরমার স্বামী সুজয় ছেলেটি বেশ—কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়র। বোম্বের কোন্ ফার্মে যেন কাজ করে। পরমা কি সুখী হয়েছে? বিবাহিত জীবনের সুখ কি বাইরে থেকে কাউকে দেখে বোঝা যায়? পরমা আর সুজয়কে খুব সুখী বলে মনে করত বাবলি। এবার ওরা দিল্লি ফিরলে ভালো করে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করবে। পরমার নাকি বাচ্চা হবে। বাচ্চা হওয়া মানেই কি ধরে নিতে হবে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক দারুণ সুখের? কত কি জানত না, বুঝত না, ভাবত না বাবলি। এই ইম্ফলের একটা দিন, ঝুমার মতো, অভীর মতো taken-for-granted ছেলের আশ্চর্য ব্যবহার কত কী শেখাল বাবলিকে। জীবনে কোনোকিছুই বোধ হয় taken-for-granted নয়। কোনো সম্পর্কই নয়। প্রতিটি সম্পর্ককেই তিল তিল করে গড়তে হয় বুঝি প্রতিদিন—এই গড়ার চেষ্টা না থাকলেই বুঝি তা ভেঙে পড়ে, ফিকে হয়ে যায়; বাবলি ভাবছিল। কিন্তু পুরুষ জাতটাই বড় বাজে। অভীকেও রোম্যান্টিক ভেবেছিল, ভালো ভেবেছিল, কিন্তু এখন দেখছে সব পুরুষই এক। এই সমারসেট মমের মিস স্যাডি টমসনের গল্পর মতো—ওরও বলতে ইচ্ছে করছে—পুরুষমাত্রই শুয়োর। বড় নোংরা, বড় আনরোম্যান্টিক শরীর সর্বস্ব ওরা। ঝুমার শরীরটাই দেখল অভী; আমার মনটা দেখতে পেল না।

ঘুম কারোরই হওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু শেষ রাতের দিকে অভীর ক্রমাগত পাশ ফেরা উশ্‌খুশ্ শব্দ, বাবলির চুড়ির রিনরিন সবই থেমে গেল। ওরা দুজনেই বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিল।

নাগাপাহাড়ের ঘন জঙ্গলের ভিতর মিথুংদের সবে ঘুম ভেঙেছিল। বড় বড় পাহাড়ি দাঁড়কাক কর্কশ গলায় ডাকাডাকি শুরু করেছিল। অভী চোখ খুলল।

চোখ খুলেই দেখতে পেল বাবলি অকাতরে ঘুমোচ্ছে। বড় করুণ দেখাচ্ছে বাবলিকে। লাইঝাম্পিটা সরে গেছে। ডান পায়ের হাঁটু অবধি দেখা যাচ্ছে বাবলির—শাড়ি সরে গেছে।

অভী উঠে বসল। উঠে বসে বাবলির খাটের পাশে এসে দাঁড়াল। বাবলির দুচোখের কোণে কান্নার দাগ—গাল বেয়ে জল পড়েছে—সমস্ত মিলেমিশে মা-মরা বাবলিকে বড় অসহায় বলে মনে হল অভীর। হঠাৎ, একেবারে হঠাৎই ওর বুকের মধ্যেটায় কী যেন মুচড়ে উঠল, গলার কাছে একরাশ অনামা কষ্ট দলা পাকিয়ে উঠল। অভী যেন সেই মুহূর্তেই প্রথম বুঝতে পারল যে, বড় আশা করে, বাবলি ওর কাছে এসেছিল। ওর ওপর বাবলি তার সমস্ত সমর্পণে বড় অসহায়ভাবে নির্ভর করেছিল। সেই নির্ভরতার, সেই আশ্বাসের কোনো দাম দেয়নি অভী।

অভী এই প্রথম ভোরে ভেবেই পেল না কী করে ও এত নিষ্ঠুর হল—কোন দুর্বুদ্ধিতে ভর করে এমন নিষ্পাপ সরল সহজ মেয়েটার সঙ্গে এমন কঠিন ব্যবহার করল কাল রাতে?

অভী ডাকল, বাবলি, অ্যাই বাবলি।

বাবলি সাড়া দিল না।

অভী খাটে উঠে ওর বুকের মধ্যে এমনভাবে ঘুমন্ত বাবলির আড়ষ্ট শরীরটাকে টেনে নিল যে, বাবলি ঘুমের মধ্যে চম্‌কে উঠল। চম্‌কে উঠে ওর চোখের সামনে অভীকে দেখে ওর সমস্ত শরীরে অভীকে অনুভব করে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

অভী বলল, কাঁদে না, লক্ষ্মী সোনা, আমি খুব খারাপ, ভীষণ খারাপ; আমাকে তুমি ক্ষমা করে দিয়ো।

বাবলি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলছিল, আমি খারাপ, আমি দেখতে ভালো না, তুমি তো সবই জানতে, সব জেনেশুনেও আমার সঙ্গে এমন করলে কেন? আমি তোমার কী করেছিলাম?

অভী চুমুতে চুমুতে বাবলির সব কান্না শুষে নিল। বলল, আর কখনও করব না; তুমি দেখো, আমি আর কখনও ভুল বুঝব না তোমাকে।

প্রথম ভোরে এক নতুন সুগন্ধি রাতের জন্ম হল। সেই রাত আবার কখন ভোর হবে তা ওরা জানে না। দুটি সুস্থ, শুচি, প্রেমবিহ্বল মানব-মানবী তাদের দুজনকে দুজনে এক আশ্চর্য আনন্দের মধ্যে আবিষ্কার করল। আমলকি বনে হরিণ-হরিণীর মতো তারা খেলে বেড়াতে লাগল। হারিয়ে যেতে লাগল, হারিয়ে দিতে লাগল, ধরা দিল নিজেকে, খুঁজে পেল অন্যাকে।

চৌকিদার বোধহয় অনেকবার ধাক্কাধাকি করেও শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে দুপুরের জন্যে যা-খুশি-তাই রান্না চাপিয়ে দিয়ে বাবুর্চিখানার সিঁড়িতে বসে হুঁকো খাচ্ছিল।

এমন সময় একটা ট্যাক্সি এসে ঢুকল ফটকের মধ্যে।

ঝুমা আর বাবলির কাকুমণি নামলে ট্যাক্সি থেকে। নেমে ভাড়া চুকিয়ে দিলেন।

কাকা বললেন, কই ঝুমা, ওরা কি গায়েব হয়ে গেল না কি?

ঝুমা হেসে বলল, গাড়ি তো রয়েছে গ্যারেজে—গায়েব হলেই হল? বোধহয় হাঁটতে-টাটতে বেরিয়েছে।

চৌকিদারের মুখে সাহেব মেমসাহেব ঘুম থেকেই ওঠেনি শুনে কাকা ঘড়ি দেখলেন। তারপর ঝুমাকে বললেন, আমার ঘড়িটা বোধহয় খারাপ হয়ে গেছে। ক'টা বেজেছে দ্যাখো তো ঝুমা।

পৌনে একটা।

তবে তো ঘড়ি ঠিকই আছে।

ঝুমা হাসল। বলল, ঘড়ির কী দোষ?

তা ঠিক। কাকা বললেন।

তারপর ভাবলেন, বিয়ের পর পর উনি নিজে কী করতেন টেবল ঘড়িটাকে উপুড় করে খাটের তলায় রেখে দিতেন।

পরক্ষণে ভাবলেন, কিন্তু এদের তো বিয়ে হয়নি। এরা যে দেশটাকে আমেরিকা করে ফেলল।

* * *

অভী চোখ মেলে বলল, অ্যাই! আরও ঘুমোবে?

বাইরে অনেক বেলা।

হোক! বাবলি বলল।

হোক। অভী বলল, বাবলির ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে।

এমন সময় দরজায় কে যেন দমাদ্দম করে ধাক্কা দিল।

বাবলি একলাফে উঠে জামাকাপড় পরতে লাগল। ভয়ে, উত্তেজনায় ও একেবারে চুপ্‌সে গেল।

অভী তাড়াতাড়ি করে পায়জামা পাঞ্জাবি পরে নিতে নিতে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, কার কী?

তুমি আজ বাদে কাল আমার স্ত্রী হবে। হবে কী? হয়ে তো গেছই।

অভী দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, কে?

ওপাশ থেকে জবাব এল, তোমার যম।

বাবলি চম্‌কে উঠল। কিন্তু গলাটা খুব চেনা চেনা মনে হলেও, চিনতে পারল না।

অভী দরজা খুলে একটা পাল্লা ফাঁক করল।

বাবলি সেই আধখোলা দরজা দিয়ে দেখল একটা লোমশ হাত এগিয়ে এসে অভীর হাত ধরল। তারপর হাত ধরেই অভীকে ঘর থেকে বাইরে নিয়ে গেল।

পরমুহূর্তে ঝুমা দরজা ঠেলে হইহই করে ঘরে ঢুকেই খিলখিল করে হাসতে হাসতে বলল, কী পাজিরে তুই বাবলি! এইজন্যেই আমাকে নিয়ে আসতে এত আপত্তি ছিল?

বাবলির মুখ কঠিন দেখাল।

বলল, তোর সঙ্গে কে? পুলিশ?

ঝুমা তখন হাসছিল।

বলল, পুলিশ নয়; শুনলি না, যম। আমি তোকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছি। শিগ্‌গীরি বাইরে আয়।

আমি এখনও মুখ ধুইনি! তৈরি হইনি। বাইরে যেতে পারব না এখন।

তা তো দেখতেই পাচ্ছি!

বলেই, ঝুমা আবার হাসল।

ঝুমা বলল, সব পরে হবে, এক্ষুনি বাইরে আয়।

ঝুমার সঙ্গে বসবার ঘরে ঢুকেই কাকুমণিকে দেখে বাবলি একদৌড়ে ভিতরে পালিয়ে এল।

কাকা ওখান থেকে হাঁক ছাড়লেন, ঝুমা, ধরে নিয়ে এসো তো এক নম্বর কাল্‌প্রিটকে।

ঝুমা আবার ধরে নিয়ে এল বাবলিকে।

কাকা বললেন, ভেবেছিস্ কী তোরা? এটা কী অ্যামেরিকা?

তারপর অভীর দিকে ফিরে বললেন, তুমি যে আমাকেও হার মানালে হে ছোকরা। তোমাকে তো ভারতরত্ন দিতে হয়। চলো এবার। বিয়ে করার মজা কত বুঝবে হাড়ে হাড়ে। ভদ্রলোকে বিয়ে করে? বিয়ে করার আর মেয়ে পেলে না? এমন বিচ্ছু মেয়েকে কেউ বিয়ে করে?

বাবলি ঝুমার দিকে তখনও কঠিনভাবে তাকাচ্ছিল।

হঠাৎই বাবলি কাকুমণির দিকে ফিরে বলল, কিন্তু তুমি এখানে? কী করে? ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারছি না।

কী করে আবার? তোমাদের ম্যাচমেকার—এই যে ঝুমা দেবী তিনিই সব অনর্থের মূল। আচ্ছা, এমন কথাও কেউ টেলিফোনে বলে? আমাকে কাল দুপুরে ট্র্যাঙ্ক-কলে বলল, বাবলি এসেই প্রচণ্ড জ্বরে পড়েছে, একশো পাঁচ জ্বর—কালকে সকালের ফ্লাইটেই চলে আসুন। তখনই আমার বোঝা উচিত ছিল যে, যে-মেয়ে সুস্থ অবস্থায় বাড়ি থেকে সকালে বেরুল—দুপুরের মধ্যে তার একশো পাঁচ জ্বর হওয়া সম্ভব নয়। জ্বর তো আর জেট প্লেন নয়।

তারপর ঝুমার দিকে চেয়ে বললেন, কিন্তু তুমি যা ভেবেছিলে ঝুমা; সব ভুল। এখন তো নিজের চোখেই দেখছ।

ঝুমা হাসছিল। ও মুখ নামিয়ে বলল, তাই-ই তো দেখছি। আসলে এসব হৃদয়-ট্রিদয়ের ব্যাপার, কাকা, আমি কিছুই বুঝি না।

চা খেতে খেতে কাকা বিস্তারিত বললেন। ঝুমা এয়ারপোর্টে আনতে গেছল কাকাকে। ঝুমার ধারণা হয়েছিল যে, অভী ও বাবলি যেমন অসিলেটিং টাইপ ও ছেলেমানুষ; তাতে ওদের সম্পর্কটা

ঝুমার এখানে থাকার কারণেই চিরদিনের মতো নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। কাকা না এলে একটা কেলেঙ্কারি হয়ে যেত। এবং সেই কেলেঙ্কারির জন্যে ঝুমাই দায়ী থাকত সারাজীবন।

কাকা বললেন, দেখলে তো ঝুমা, এসেই বরং কেলেঙ্কারিটা বাধালাম। থাক্‌গে—আমি তো কালই চলে যাচ্ছি—তুমিও তো আমার সঙ্গেই যাচ্ছ? তাইই না ঝুমা?

ঝুমা বলল, হ্যাঁ।

বাবলি ধরা-পড়া গলায় বলল, আমার একা ঘরে শুয়ে ভয় করল—তাই...।

কাকা বললেন, ফারস্ট্ ক্লাস্। ন্যাকামিতে তুই তোর কাকিমাকেও হার মানালি।

তারপর বললেন, ঝুমা পঞ্জিকাটা?

ঝুমা হ্যান্ডব্যাগ থেকে একটা পঞ্জিকা বের করল। তারপর ভালো করে দেখে বলল, মাঘ মাসের প্রথমেই যে দিন?

হ্যাঁ। হ্যাঁ। কত তারিখ? কাকা বললেন।

পাঁচ।

বেশ! ঐদিনই হবে। তবে আজ থেকে কতদিন হল?

প্রায় মাস দুয়েক। ঝুমা বলল।

কাকা অভীর দিকে ফিরে বললেন, আশা করি এই দুমাসের মধ্যে আবার কোনো বিঘ্ন-টিঘ্ন ঘটিয়ে বসবে না। লান্‌ডান স্কুল অব ইকনমিক্‌সে সবকিছু শেখায় না, বুঝেছ?

তারপরই বাবলির দিকে ফিরে বললেন, আমার নেকুপুষুমুনু আদুরে মেয়ে কী বলে?

বাবলির কান লাল হয়ে উঠল।

কাকা বললেন, ভয় নেই কোনো, এক আমি আর ঝুমাই জানলাম এসব কুকীর্তির কথা—ঘটক আর যে কন্যাসম্প্রদান করবে সে—কন্যার বাবা অথবা পাত্রের দাদার কানে এসব যাবে না এটুকু ভরসা আমার উপর করতে পারো।

কাকা চা-টা খেয়ে বললেন, জায়গাটা একটু সার্ভে করে আসি। তারপর সিগারেট ধরিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

* * *

অভী চান করতে গেছিল।

ঝুমা আর বাবলি বাংলোর বসার ঘরে বসেছিল।

ঝুমা হাসতে হাসতে বলল, কি রে বাবলি? এখনও কি রাগ করে থাকবি আমার উপর?

বাবলি মুখ তুলল। ঝুমার হাতটা নিজের হাতে নিল।

আনন্দে, কৃতজ্ঞতায় ওর চোখে জল এসে গেল।

বাবলি বলল, তুই আমাকে বড় ছোট করে দিলি ঝুমা। তোর সম্বন্ধে লোকে যা বলত, তাই শুনেছিলাম; বিশ্বাস করেছিলাম।

ঝুমা গম্ভীর গলায় বলল, লোকে তো কতকিছুই বলেরে! আমি বড়-টড় নই; ভালোও নই। যা রটে; তার কিছু তো বটে।

তারপর একটু থেমে বলল, আসলে কী জানিস, একজন মেয়ে হিসেবে কাউকে ভালোবেসে, কারও উপর মনেপ্রাণে নির্ভর করার পরও, সামান্য ভুল বোঝাবুঝির জন্যে যখন একটা জীবন নষ্ট হয়ে যেতে বসে, নষ্ট হয়ে যায়—তখন বড় লাগেরে। ভুল বোঝাবুঝির খেসারৎ আমি আমার জীবন দিয়ে দেখেছি। আমি জীবনে অনেক কিছু পেয়েছিলাম রে বাবলি—অনেক পুরুষের স্তুতি, ভালোবাসা। কিন্তু ভালোবাসা পাওয়া আর ভালোবাসা ধরে রাখা এক নয়। আমি অনেক পোড়-খাওয়া মানুষ। আমার জন্যে একজন আত্মহত্যা করেছিল। তুই জানিস্। সেও ভুল বোঝাবুঝি। আমার এখন সবই

সয়। আমার যা সয়; তোর তা কখনও সইত না। আমার যা সইবে—তোর পক্ষে তা কল্পনা করাও মুশকিল।

তারপর একটু থেমে বলল, আমি বড় কিছুই করিনি। তোর মধ্যে আমাকেই দেখতে পেয়ে হয়তো আমি নিজেকেই এমনি করে বাঁচাতে চেয়েছিলাম।

অভী চান করে এল।

বাবলি বলল, তুমি ঝুমার কাছে বোসো। আমি চান করতে যাই।

অভী এসে ঝুমার পাশে বসল।

ঝুমা খোলা দরজা দিয়ে বাইরে চেয়েছিল। দুপুরের রোদে লক্‌টাক্ হ্রদের জল রুপোর মতো চিক্‌চিক্ করছিল। নাগা ও মিজো পাহাড়শ্রেণীকে ধুঁয়ো ধুঁয়ো দেখাচ্ছিল।

অভী ডাকল, ঝুমা।

ঝুমা বলল, উঁ।

অভী ঝুমার হাতটা ওর নিজের হাতে টেনে নিয়ে বলল, ঝুমা শোনো।

ঝুমা যেন অনেক দূরে চলে গেছিল।

ঝুমা যেন অনেক দূর থেকেই বলল, অভীদা, বাবলিটা ভারী সরল মেয়ে; ভালো মেয়ে। ওকে চিরদিন ভালোবেসো।

অভী আবার বলল, ঝুমা একটা কথা শোনো।

ঝুমা মুখ না ফিরিয়েই বলল, আমাকে যদি তোমার কিছুমাত্র ভালো লেগে থাকে—তবে সেই ভালো লাগাটা আর আলাদা করে রেখো না। আমার জন্যে যাই-ই তোমার মনে থাকুক না কেন, যদি আদৌ কিছু থাকে, তবে সেটুকুকেও মিশিয়ে দিয়ো। বাবলির মধ্যেই থেকে যাব আমি তোমার কাছে চিরদিন।

এটুকু বলেই, অভীর দিকে মুখ ফিরিয়ে ঝুমা একটু হাসল, বলল, কথা দিচ্ছ তো অভীদা?

অভী আশ্চর্য চোখে ঝুমার মুখে চেয়ে থাকল।

ঝুমার মুখের সৌন্দর্যের গভীরে কোথায় যেন কোনো এক গভীরতর মানসিক সৌন্দর্যের উৎস ছিল। ওর সঙ্গে পরিচয় হবার পর থেকেই অভী তার আভাস পেয়েছে—কিন্তু আজ সকালে সেই সৌন্দর্যকে যেন পরম সত্যের মধ্য দিয়ে নিজের বুকের অন্তস্তলে উপলব্ধি করল।

অভী কোনো কথা বলল না।

অভীর দু'চোখের সামনে বসে থাকতে থাকতে ঝুমার মুখের হাসিটা বিকেলের পড়ন্ত রোদের মতো ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে এল। কিন্তু সে হাসি সম্পূর্ণ মুছে যাবার আগেই ঝুমা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, মুখে কিছুই না বলে।

তারপর অভীকেও আর কিছু বলার বা শোনার সুযোগ না দিয়ে, কাঁকর-ছড়ানো পথে কির্‌কির্ শব্দ তুলে গেট পেরিয়ে অভীর চোখের সামনে থেকে ফেড্-আউট করে গেল।

বাবলি মুখে সাবান দিয়েছিল। বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিতে দিতে চোখ পরিষ্কার হতেই ও বাথরুমের জানালা দিয়ে দেখতে পেল, ঝুমা বাংলোর গেটের পাশে একটা রাধাচূড়া গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে লক্‌টাক্ হ্রদের দিয়ে চেয়ে আছে।

হঠাৎ বাবলির মনে পড়ল যে, আজ মেয়েদের জীবনের সবচেয়ে বড় পরীক্ষাতেও ঝুমা বাবলিকে জিতিয়ে দিয়ে কত অবহেলায় বাবলিকে আবারও হারিয়েই দিল।

বাবলি বুঝতে পারল যে, এ হার স্বীকার না করে ওর উপায় নেই। বুঝতে পারল যে, জীবনে প্রত্যেক মানুষকেই এক বা একাধিক পরীক্ষায় হারতেই হয়।

অবেলায়

পিলানির

সোমা রায়-কে

রান্নাঘরে অরা ও বৃহস্পতি সকালের ব্রেকফাস্ট বানাতে ব্যস্ত। রান্না বৃহস্পতি করে। অরা নির্দেশ দিয়ে দেন। মেয়েটি বুদ্ধিমতী আছে। যা অরা শেখায় তাই শিখে নেয়। কড়াইশুটির চপ, তাঁর শাশুড়ির রেসিপির ভুনিখিচুড়ি, তাঁর মায়ের রেসিপির চাও মিয়েন, কষা মাংস, মোমো, পাটিসাপটা ও সবই শিখে নিয়েছে।

তৃষা আর চুমকির জন্যে চিজ-টোস্ট বানাবেন বলে চিজ গ্রেট করছিলেন অরা। দুজনেই তখনও ঘুমোচ্ছে। আজ রবিবার। কাল রাতে চুমকি দেরি হওয়াতে এখানেই থেকে গেছিল। চুমকিরা সল্টলেক-এ থাকে। অরাই চুমকির মাকে বলে দিয়েছেন ফোনে। অত রাতে ট্যাক্সি নিয়ে সল্টলেকে যাওয়াটা আজকাল নিরাপদ নয়।

এমন সময়ে ফোনটা বাজল।

অরা বললেন, আমার হাত জোড়া। ধরোতো গিয়ে ফোনটা বিস্পতি। আর কর্ডলেসটা নিয়ে এসো। তারপর মেয়েদের তোলো গিয়ে। আজকালকার ছেলেমেয়েদের রকমই অমন। রাত দুটোর আগে শুতে যাবে না, বই পড়বে, গান শুনবে, টিভি দেখবে, হিহি-হাহা করবে, তারপর ঘুমোবে।

অরারা অন্যভাবে মানুষ হয়েছেন। রাতে যদি কখনও শুতে দেরিও হয় ঠিক পাঁচটাতে ঘুম ভেঙে যায়। অবশ্য একদিক দিয়ে ভালো। সকালের দু'তিন ঘণ্টা সময়ই তাঁর নিজস্ব সময়। কিছু পড়বার, একটু গান গাইবার, কারোকে চিঠি লিখবার। তবে তিনি যাঁকে নিয়মিত লিখতেন সেই অগ্নিভ রায় এখন কলকাতাতেই চলে এসেছেন নাগপুর ছেড়ে। তাঁরও ভোরে ওঠার অভ্যেস। কোনো কোনোদিন অগ্নিভকে সকালের ফালিটুকুতে ফোনও করেন—অগ্নিভও করেন প্রায়ই। সারা দিনটা ভালো কাটে যেন, একে অন্যের সঙ্গে সকালে কথা বললে।

বিস্পতি কর্ডলেসটা এনে দিয়ে বলল, যাই, দিদিদের তুইলে দি আসি গে।

—ফোনটা কে করেছেন?

—ওই।

—ওই মানে কী হল?

—ওই অগ্নিবাবু।

—অগ্নি নয়, অগ্নিভ।

—ওই হলো গা। বুইজতে পাইরলেই তো হলো।

চিজ-এর স্ল্যাবটা রান্নাঘরের টেবিলে নামিয়ে রেখে অরা বললেন, বলছি।

কী করছ?

ও প্রান্ত থেকে অগ্নিভ বললেন।

—মেয়েদের ব্রেকফাস্ট বানাচ্ছি।

—আমার জন্যেও বানিয়ো। আমি আসছি আধঘণ্টার মধ্যে।

—আজকাল তো দেখছি ডুমুরের ফুল হয়েছ। টালিগঞ্জে বুঝি কোনো গার্লফ্রেন্ড হয়েছে নতুন?

—আজ্ঞে না। আমার ওল্ড ইজ গোল্ড। তাছাড়া, এই বুড়োর দিকে চাইছে আর কে?

চলে এসো। কাল চুমকি রাতে এখানে ছিল। তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিল।

—ফাইন। বুড়ো হয়েছি বলেই অল্পবয়সিদের সঙ্গে মিশতে ভালো লাগে। ওদের জগৎটাই আলাদা। যে জগতের মধ্যে আমরা ঢুকতে পারব না। আর তাই-ই হয়তো ওরকম মনে হয়। জীবনেও যদি মোটরগাড়ির মতো ব্যাক গিয়ার থাকত তবে বেশ হত।

বয়সে বুড়ো হলেই কি মানুষ বুড়ো হয়। চারধারে কত যুবক বুড়ো দেখি।

তা হয়তো ঠিক। মনের বয়স আমার পনোরোতেই আটকে আছে।

—ভয়তো সেজন্যেই।

—ভয়টা কীসের?

অরা একটু চুপ করে রইল। তারপরে বলল, সকালেই এমন কথার ফুলঝুরি ফোটাতে শুরু করলে।

—সকালে কি কেউ ফুলঝুরি ফোটায়? এখনতো ফুল ফোটানোর সময়। ঠিক আছে। আসছি আমি।

তারপর বললেন, আমাদের রাস্তার মোড়ের মিন্টুর দোকানে দারুণ অমৃতি বানায়। নিয়ে যাচ্ছি এক কেজি। তারপরই বললেন, অমৃতি ছাড়া কিছু আনব কি? দোকানটাতে ভালো হিঙের কচুরিও করে।

—না। একদম না। তৃষা এবং চুমকি ঘি-এর কোনো জিনিসই মুখে দেয় না।

—সত্যি! পৃথিবীটা কেমন বদলে গেল। চানটা করেই যাচ্ছি।

এসো। ছাড়ি এখন?

হ্যাঁ।

অরা অন্য দশজনের মতো ফোনের রিসিভার তুলে বলে না, হ্যালো বা ইয়েস। বলে, বলছি।

২

তৃষা আর চুমকি নাইটির উপরে ড্রেসিং গাউন পরে বসার ঘরে এল। তৃষা বলল, বিস্পতিদি, মা কোথায়?

তিনি তো আন্নাঘরে।

মা আবার রান্নাঘরে কী করতে গেলেন। দেখেছিস চুমকি। তোর জন্যেই স্পেশ্যাল কোনো আইটেম বানাচ্ছে হয়তো।

—ভারী খারাপ। আমি কি খেতে এসেছি? কোথায় মাসিমার সঙ্গে একটু গল্পটল্প করব, মাসিমার গান শুনব। তা না।

তৃষা বলল দাঁড়া, দেখে আসি। বলে, কিচেনের দিকে গেল। কিচেনে ঢুকে তৃষা বলল, ঘি-টি দিয়ে কিছু কোরো না মা। চুমকি মুখেও দেবে না।

হুঁ। তা ঘি তো আজকাল রাখিই না বাড়িতে বলতে গেলে। সামান্য থাকে, গাওয়া ঘি। খিচুড়ি বা ফেনা ভাতের সঙ্গে পাতে খাওয়ার জন্যে। সবকিছুই তো হোয়াইট অয়েলেই রান্না হয়।

এমন সময়ে চুমকির মোবাইলে কোনো মেসেজ এল। মেসেজটা দেখে খুশি হল চুমকি।

আমাদের ছেলিবেলায় শুধু কুকুরদেরই ঘি-সয়না জাইনতাম। আইজকালকার ছেইলে মেয়িদের বুইজতে পারি না।

বিস্পতি বলল, নিজের মনে।

তৃষা ফিরে এল বসার ঘরে।

মা তোর জন্যে চিজ টোস্ট আর সুজির হালুয়া করছেন। বেশ লবঙ্গ, তেজপাতা, ভালো করে ঘি-টি দিয়ে।

ঘি?

আতঙ্কিত চোখে বলল চুমকি।

ইয়েস। ঘি।

অরা বসবার ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, হালুয়াতে আর কি ঘি। তোর অগ্নি কাকা আসছেন অমৃতি নিয়ে। সঙ্গে হিঙের কচুরিও আনছিলেন। মানা করেছি।

চুমকি উত্তেজিত হয়ে বলল অগ্নি কাকা আসছেন। গ্রেট। এই রবিবারের সকালটা একেবারে জমে যাবে। কী বলিস তৃষা।

তৃষা বলল, সত্যি। অগ্নিকাকাকে পছন্দ করে না এমন কারোকে আমি দেখিনি, বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে। তবে উনি নিজে বলেন, ওঁর কোনো মিত্র নেই, সবই শত্রু।

—বাজে কথা।

অরা বলল।

তারপর বলল, মানুষটার শত্রু-মিত্র কারোকে নিয়েই কোনো মাথাব্যথা নেই। অমন উদাসীন মানুষ আমি তো আর দেখিনি।

অরা একটু চুপ করে থেকে চুমকিকে বলল, তবে তোমার মেসোমশায়, মানে তৃষার বাবা ঠাট্টা করেই বলতেন ও একটা মিচকে শয়তান। আ গ্রেট ইমপোসটর। তবে আমার নিজের কিন্তু তা কখনো মনে হয়নি। হরিহর আত্মা বলতে যা বোঝায় ওঁরা তাই ছিলেন দুজনে অথচ দুজনের মধ্যে মিলের চেয়ে অমিলই বেশি ছিল। উনি গান-বাজনা ভালোবাসতেন না তেমন. রেডিয়োতে ক্লাসিকাল গান হলে বলতেন, আরে বন্ধ করো, বন্ধ করো এই কুকুরের কান্না।

—কী বলছেন মাসিমা আপনি! এমন হতেই পারে না।

—চুমকি বলল, অবিশ্বাসের গলাতে।

—কেন পারবে না। ক্লাসিকাল গান ভালো না বাসলেই কি একজন মানুষ অমানুষ হয়ে যান? মানুষ নানা উপাদান দিয়ে তৈরি। অনেক কিছুকে বাদ দিয়ে এবং অনেক কিছু নিয়েই একজন মানুষ। সবাই-ই কি আর রবীন্দ্রনাথের "পূর্ণ মনুষ্যত্বর" স্বর্গে পৌঁছোতে পারেন? খণ্ড মানুষও অবশ্যই মানুষ। আমাদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষই তো খণ্ড মানুষ। পূর্ণ মনুষ্যত্বকে একটা আদর্শ হিসেবে সামনে রাখাটা ভালো কিন্তু তা অর্জন করা বড় কঠিন।

এমন সময়ে বসবার ঘরের কোণাতে রাখা ল্যান্ড লাইনটা বাজল।

অরা বললেন, দ্যাখ তো তৃষা, কে করল?

তৃষা ফোন তুলেই একগাল হেসে বলল, থ্যাঙ্ক উ্য হর্ষদ। থ্যাঙ্ক উ্য ভেরি মাচ। ইটস ভেরি নাইস অফ উ্য। ফুল পাঠিয়েছ? এখনও পাইনি। পাব নিশ্চয়ই। কী আর করব? কাল রাতে চুমকি এখানে ছিল। অনেক রাত অবধি গানটান হল। শি ওয়াজ ইন হার এলিমেন্টস।

—কে? অগ্নিভ কাকা? না উনি কাল আসেননি। আজ আসছেন একটু পরে আমাদের জন্যে অমৃতি নিয়ে।

তারপর একটু থেমে বলল, ভালো বলেছ তো।

মা কি জানেন?

জানিনা? জিজ্ঞেস করছি। তুমি মায়ের সঙ্গে কথা বলবে? দিচ্ছি।

—বলো হর্ষদ। অরা বললেন। তোমার সব খবর ভালো? শুনেছ তো এখন এখানে প্লেজেন্ট

ওয়েদার। কী বললে? ওখানেও প্লেজেন্ট ওয়েদার? তবে এ বছর বৃষ্টি তো তেমন হল না, শীতও পড়ল না। যা গরম পড়বে এর পর ভেবেই আতঙ্কিত হচ্ছি।

কোথায় যাচ্ছ ছুটিতে? মাথেরান-এ? যাও যাও ঘুরে এসো। তোমার মেসোমশাই বলতেন, পরের জন্মে বিয়ে করে মাথেরান-এ হানিমুন করতে আসব। সত্যি! দারুণই সুন্দর জায়গা। একা গেলে ভালো লাগবে? ও বন্ধুদের সঙ্গে যাচ্ছ। যাও, ঘুরে এসো। নাও তৃষার সঙ্গে কথা বলো। কলকাতাতে আসছ কবে? পুজোর সময়ে? ফাইন। মা-বাবা ভালোই আছেন তো? তৃষা তো গেছিল গত সপ্তাহেই।

তৃষা রিসিভারটা মায়ের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বলল, হর্ষদ উই উইল বিট ইট আপ হোয়েন উ্য কাম। কোথাও সকলে মিলে বেড়াতে যাব। কোনো জঙ্গলে-টঙ্গলে, মা অগ্নিভ কাকা সকলকে নিয়ে। মাসিমা মেসোমশাইও কি যাবেন?

বোধহয় নয়। মা-বাবার বস্টনে যাবার কথা আছে দিদি-জামাইবাবুর কাছে।

তুমি একা থাকবে?

একা কেন? নন্দন তো থাকবে। কলকাতাতে এলে ওই তো আমার গার্জেন হয়।

তারপর তৃষা বলল, ওক্কে। বাঈ। থ্যাঙ্কস আ লট হর্ষদ। ফোনে শব্দ করে একটা চুমু খেল তৃষাকে হর্ষদ। বলল, তুমি আমাকে একটা খাও!

তৃষা গলা নামিয়ে আদুরে গলাতে বলল, না-আ-আ। মা পাশে দাঁড়িয়ে আছেন।

বলেই, ফোন ছেড়ে দিল। বলল, পরে ফোন করব মোবাইলে।

ফোন ছাড়তেই অরা বলল, কী বলছিলরে হর্ষদ?

কী আবার বলবে। এক নম্বরের পাজি ছেলে।

বলছিল কী বল না?

বলছিল ফোনে চুমু দাও।

অরা এবং চুমকি হেসে উঠলেন ও উঠল।

অরা বললেন, আই অ্যাডোর হর্ষদ। একটা দারুণ প্রাণবন্ত ছেলে। তা তোর মা কি এতই ব্যাকডেটেড যে তুই ফোনে শব্দ করে একটা চুমু খেলে রাগ করত।

তারপর বললেন, তোদের এই দোষ, জানিস তো?

কী?

তোরা ভাবিস যে আমরা জন্ম থেকেই বয়স্ক। আমাদের যেন কৈশোর বা যৌবন ছিল না। তোদের অনুভূতি যেন আমাদের ছিল না। তোদের যেন আমরা বুঝতে পারি না একেবারেই।

ওরকম করে বোলো না মা। তোমরা কি বয়ফ্রেন্ডদের ফোনে শব্দ করে চুমু খেতে?

না, তা অবশ্য খেতাম না। আমাদের সময়ে ভালোবাসায় গোপনতা ছিল তাই তার মাধুর্য ছিল বেশি। সবকিছুই সব অনুভূতিই আজকের মতো বাজারি হয়ে যায়নি।

প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে তৃষা বলল, আজকে ভ্যালেন্টাইনস ডে। জানো মা?

কে জানে বাবা। আমাদের ছেলেবেলায় তো এসব শুনি টুনিনি।

এই গ্লোবালাইজেশনের যুগে কত কিই যে ঘটছে!

এমন সময়ে রুরু ফেডেড জিনস এবং একটা গেঞ্জি পরে একেবারে চান-টান করে বসার ঘরে এল গাইতে গাইতে—"তোমার দেখা নাইরে তোমার দেখা নাই।"

চুমকি ওকে দেখে একটু ব্লাশ করল।

রুরু বলল তৃষাকে, বুঝলি দিদি, তোর বন্ধুটা আনসিভিলাইজড।

কোন বন্ধু?

আরে এই যে চুমকি বোস।

এই চুমকি তোর চেয়ে বয়সে বড়ো। সম্মান দিয়ে কথা বল।

পুরো সম্মান দিয়েই বলছি। বয়সে ছোটোবড়োতে কী আসে যায়? উইসডম হচ্ছে আসল। তাছাড়া, জানো না? আজকাল পশ্চিমি দেশে ট্রেন্ড এসেছে যে অধিকাংশ ছেলেরাই তাদের চেয়ে বয়সে বড়ো মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করছে, বিয়ে করছে।

তৃষা বলল, থাকিস তো মায়ের হোটেলে। কাজকর্ম কর, রোজগার-টোজগার কর, নিজের পায়ে দাঁড়া, তারপর তো বিয়ের স্বপ্ন।

—দ্যাখ দিদি, তোকে ওই সিউডো-ইনটেলেকচুয়াল হর্ষদদাটা একেবারে জাদু করে রেখেছে। প্রেমের সঙ্গে বিয়ের কী সম্পর্ক? প্রেমটা একটা এটার্নাল ব্যাপার আর বিয়েটা তাতে বাঁধন দেয়। তবে এই বিয়ে ব্যাপারটাই পৃথিবী থেকে উঠে যাবে একদিন। তোর বন্ধু একটা বেরসিক। পড়াশুনোতে ভালো হতে পারে। দেখতেও ভালো হতে পারে। দ্যাখ আজ ভ্যালেন্টাইনস ডে—সাতসকালে মোবাইলে মেসেজ পাঠালাম কিন্তু রেসপন্সই করল না।

—তৃষা চেপে ধরল চুমকিকে।

এ কী রে! সকালের মেসেজটার শব্দ পেয়েছিলাম। সেটা যে রুরুরই মেসেজ ভাবতেও পারিনি।

চুমকি বলল, বাচ্চা ছেলেরা কত দুষ্টুমিই না করে। তা বলে সবসময়েই কী কান মুলে দিতে হয়।

রুরু, অরাকে বলল, দেখেছ মা। তুমি দিদির এই বন্ধুকে ভালো মেয়ে বলতে পারো কিন্তু এমন হার্টলেস মেয়ের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।

সকলেই হো হো করে হেসে উঠলেন।

চুমকি বলল, সম্পর্ক ছিলটাই বা কবে যে আজ না থাকার কথা উঠছে?

—তাই? ঠিক আছে চুমকি। তুমি ভাবো তুমি অনেক জানো কিন্তু আসলে যে কিছুই জানো না তা পরে বুঝবে। আমার নাম রুরু। একদিন আমিই হব তোমার গুরু।

এবার চল আমরা একে একে চান করে নিই।

না। আগে ব্রেকফাস্ট খেয়ে নাও তারপর চানে যাবে। অগ্নি এই এসে পড়লেন বলে।

অরা বললেন।

তারপর গলা তুলে বললেন, বিস্পতি, পেঁপে আর আপেলগুলো কেটে ফেল ততক্ষণ। চিজ টোস্টগুলো আমি গিয়েই ভাজছি। তোমরা কেউ দুধ কর্নফ্লেকস খাবে কি? তাহলে বিস্পতিকে দুধ গরম করতে বলি।

রুরু বলল, আমি খাব। তবে ঠান্ডা দুধ দিয়ে।

তোমরা কেউ রিয়্যাল-এর ফ্রুট জ্যুস খাবে? পেয়ারা আর টোমাটো জ্যুস আছে।

চুমকি বলল, এতসব কি খাওয়া যায় মাসিমা? তারপর অগ্নি কাকা আবার অমৃতি আনছেন। তাও মাত্র এক কেজি।

রসিকতা করে বললেন অরা। তারপর বললেন অগ্নি হচ্ছেন তৃষার বাবার বিপরীত মেরুর মানুষ। তোদের বাবা হলে গুণে গুণে আটটা আনতেন চারজনের জন্যে। তবে খুব হিসেবি ছিলেন বলেই অসময়ে তোর বাবার মৃত্যুর পরে আমরা ভেসে যাইনি। সংসারে সব জিনিসেরই ভালো দিক মন্দ দিক থাকে।

রুরু বলল, বাবাকে আমার ভালো করে মনেই নেই। আমি তো তখন আড়াই বছরের ছিলাম, না মা?

হ্যাঁ। আর চুমকি ছিল পাঁচ বছরের। তোর বাবার মৃত্যুর খবর পেয়ে তোর অগ্নিকাকা দু-মাসের ছুটি নিয়ে নাগপুর থেকে এসে ঝড়ের মধ্যে হাল ধরেছিলেন।

চুমকি বলল, নাগপুরে অগ্নিকাকা কী কাজ করতেন?

উনি প্রথমদিকের এনভায়রনমেন্ট সায়ান্টিস্ট। উনি আর তোর বাবা একই সঙ্গে বস্টনে পড়াশুনো করেছিলেন। তোর বাবা পড়েছিলেন নিউক্লিয়ার ফিজিক্স নিয়ে আর উনি এনভায়রনমেন্ট নিয়ে।

নাগপুরে কোথায় পড়াতেন। চুমকি জিজ্ঞেস করল।

নিরিতে।

নিরিটা কী জিনিস?

রুরু বলল।

নিরি মানে ন্যাশানাল এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট। তোদের অগ্নিকাকা তখন ডিরেক্টর ছিলেন, পরে ম্যানেজিং ডিরেক্টর হন। বহুদিন এম.ডি. ছিলেন রিটায়ার করার দিন পর্যন্ত। নাগপুরেই সেটল করার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আমাদেরই কারণে কলকাতাতে এসে সেটল করলেন।

অগ্নিকাকা বিয়ে করেননি কেন মাসিমা?

তা কী করে বলব বলো মা। তিনি বলেন, সময় করতে পারেননি। তাছাড়া, বিয়ে করার মতো কেউ না কি আসেইনি তাঁর জীবনে।

কলকাতায় তো প্রায়ই আসতেন।

হ্যাঁ। আমরা এখানে চলে আসার পর। তার আগে খড়্গপুরে আসতেন। আই আই টি-র ফ্যাকাল্টি ক্যাম্পাসে আমাদের বাংলোতে তো জায়গার অভাব ছিল না। তবে সেখান থেকে কলকাতাতে চলে আসতেন প্রায়ই, গানের টানে। চণ্ডীদাস মাল ও দিলীপ মুখোপাধ্যায় মশায়দের কাছে পুরাতনী গানের তালিম নিতেন। রবীন্দ্রসংগীত শিখতেন সন্তোষ সেনগুপ্ত ও দেববব্রত বিশ্বাসের কাছেও, যতদিন ওঁরা ছিলেন। ওর কাছেই শুনেছি দিলীপ মুখোপাধ্যায় নাকি সাম্প্রতিক অতীতে গত হয়েছেন।

৩

ওরা ডাইনিং টেবিলে বসেছিল সকলে। অরার স্কুল শনি রবি ছুটি থাকে। তাই সোমবার সকালে মানডে মরনিং সিকনেস হলেও শনি রবি বেশ রিল্যাক্সড থাকেন। ছেলেমেয়েরা খাওয়া শুরু করেছে এমন সময় ডোর বেলটা বাজল। রুরু গিয়ে দরজা খুলল। প্রতিবেশী অপালা এলেন। ব্যারিস্টারের বউ।

এই যে অপালা মাসি, ভালো সময়েই এসেছ। আমরা ব্রেকফাস্ট করছি। এসো টেবিলে।

বলেই বলল, তোমার হাতে ওটা কী?

—ওটা একটা রজনিগন্ধার মালা।

—কার জন্যে?

—তোমার মায়ের ভ্যালেনটাইনের জন্যে। তিনি আজ নিশ্চয়ই আসবেন।

—আসবেন কী? এসে পড়লেন বলে।

অপালা খাওয়ার ঘরে ঢুকতেই তৃষা বলল, আমার মায়ের ভ্যালেনটাইন না তোমার ভ্যালেনটাইন অপালা মাসি?

—অপালা সুরসিকা। বললেন, ধরো, না হয় দুজনেরই।

—চুমকি বলল দুজন নারীর একই ভ্যালেনটাইন হয় কি না তা দেখতে হবে। ইন্টারনেটে ব্রাউজ কোরো তো রুরু ব্রেকফাস্টের পর।

—অরা বললেন, একটা বুড়ো মানুষকে নিয়ে তোরা কী ইয়ার্কি শুরু করলি। ভালো এবং বোকা মানুষটা শুনলে দুঃখ পাবেন।

—ভালো মানুষ অবশ্যই তবে বোকা মানুষ কখনোই নন। তাছাড়া, মানুষটার মধ্যে এমন একটা ক্যারিসমা আছে যে তরুণীরাও সহজেই প্রেমে পড়তে পারে। অত সহজে অগ্নিকাকাকে ডিসমিস করা সম্ভব নয়। করতে চাইলে, আমি প্রতিবাদ করব।

তৃষা কপট রাগের সঙ্গে বলল।

আমিও।

রুরু বলল।

অপালা বললেন, আমিও।

চুমকি বলল, আমি একাই বা বাদ যাই কেন?

এমন সময়ে ডোর বেল আবার বাজল।

এবারে বিস্পতি গিয়ে দরজা খুলল। আপ্যায়ন করে বলল, আসুন আসুন আগুনবাবু। আপনার লেইগেই সক্কলে টেবলে বইসে আচেন। তা আমৃতি এইনেচেন তো!

আনিনি আবার। সঙ্গে কিছু হিং-এর কচুরিও এনেছি। তুমিও খেয়ো বিস্পতি ভালো করে।

এঁজ্ঞে।

অগ্নিভ খাওয়ার ঘরে গিয়ে ঢুকতেই সকলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

আমি কি অসময়ে এলাম?

তৃষা বলল, তুমি যখনই আসবে তখনই সুসময়।

অরা চোখের ইশারাতে অপালাকে বললেন, কই অপা তোমার প্রেমের দানটা দাও এবারে।

অগ্নিভ একটু হকচকিয়ে গেলেন।

অরা বলল, অপালা কেমন মডার্ন দেখেছ। আজ ভ্যালেনটাইনস ডে তাই তোমার জন্যে রজনিগন্ধার মালা নিয়ে এসেছে।

বলতেই, কলাপাতার মোড়ক খুলে অপালা অরাকে দিয়ে বললেন, নে তৃষা, এটা পরিয়ে দে ওকে।

তৃষা দুষ্টুমি করে বলল, মাথা খারাপ। তোমার ভ্যালেনটাইনকে আমি মালা পরাব কোন দুঃখে? আমার বুঝি ভ্যালেনটাইন নেই?

এ কথাতে সকলেই হেসে উঠলেন।

অপালা মালা খুলে অরাকে ডাকলেন, বললেন আয় অরা, আমরা দুজনেই পরাই।

অরা হেসে বলল, পৃথিবীর ইতিহাসে দুজনে মিলে একজনকে মালা পরানোর কোনো নজির আছে বলে আমি জানিনা। কিন্তু আমার স্বামী না হয় বহুদিন পরলোকে, তোর ঘরের ডাকসাইটে ব্যারিস্টার ঘোষসাহেব জানতে পেলে কুরুক্ষেত্র বাধাবেন না তো?

অপালা হেসে বললেন, আমার ঘরের পতিদেবতাটি রসকষহীন হলেও এসব ব্যাপারে অত্যন্তই উদার। আমার ভ্যালেনটাইনের উপরে তার বিরূপ হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। বরং উনি বেঁচে যাবেন।

উনি কী করছেন?

কী আবার করবেন? সকাল থেকেই মক্কেল-বিক্কেল নিয়ে কনফারেন্সে বসেছেন। চলবে বেলা

একটা অবধি। তারপর খেয়েদেয়ে জমিয়ে ঘুম। দুপুরে ঘুমোয় অবশ্য শনি-রবিবারেই। যেদিন কোর্ট থাকে সেদিন কোর্ট থেকে ফিরে ঘুমোয়। তারপর রাত আটটা থেকে আবার কনফারেন্স চলে রাত একটা অবধি।

তুই যে কেন ছেড়ে দিস না হাইকোর্টের ব্যারিস্টারকে তা তুই-ই জানিস।

ছাড়তে পারলে তো ভালোই হত, কিন্তু পারলাম কই? অভ্যেস হয়ে গেছে। দাম্পত্যটা একটা অভ্যেস। এ অভ্যেস কাটানো ভারী শক্ত।

তারপর বললেন, মানুষটার অনেক দোষ থাকতে পারে তবে একটা মস্ত গুণ এই যে তাঁর নিজের সব খামতি সম্বন্ধে উনি পুরোপুরি সচেতন। মানুষটার মধ্যে রোম্যান্টিসিজম্-এর 'র'ও নেই। সেজন্যে তাঁর মনে কোনো অপরাধবোধও নেই। আমার কোনো স্বাধীনতাতেই তিনি হস্তক্ষেপও করেন না। সফল উকিল-ব্যারিস্টারেরা বোধহয় সকলেই এরকম।

অগ্নিভ বললেন, বাঃ। ঘরে ঘরে এমন স্বামী হোক।

তারপরই কলাপাতা মোড়া মালাটি অপালার গলাতেই পরিয়ে দিয়ে গেয়ে উঠলেন :

> "গাছে ফুল শোভা যেমন, হয় কি তেমন গাঁথলে মালা
> গলায় দিলে ক্ষণিক মজা, তারপরেতেই হেলা ফেলা।
> কোথা সে সৌরভ সুখ কোথা সে প্রফুল্ল মুখ
> দুই অধরে রসভরে ভ্রমরে করে না খেলা।
> গাঁথলে মালা...................

সকলেই হইহই করে উঠলেন ও উঠল।

রুরু বলল, অগ্নিকাকা তুমি একটার পর একটা প্রেমের গান গেয়ে যাও। আজ যে ভ্যালেনটাইনস ডে।

আমার রোজই ভ্যালেনটাইনস ডে।

তারপরই রুরুকে বললেন, বাংলা ব্যান্ডের সেই গানটা তুই গা না।

কোন ব্যান্ড?

আহ্, নাম টাম সব ভুলে যাই আজকাল। অনিন্দ্যর ব্যান্ড রে।

ওঃ। 'গান ভালোবেসে গান'।

রাইট উ্য আর।

অরা বললেন, চিজ টোস্টগুলো, অমৃতি এবং হিং-এর কচুরি সব যে ঠান্ডা হয়ে গেল। আগে সকলে খেয়ে নাও। তারপর গান হবে।

তারপর স্বগতোক্তির মতো বললেন, হিং-এর কচুরির সঙ্গে গাঢ় ছোলার ডাল বা ঝলঝলে আলুর তরকারি দেয় না তোমার দোকানে?

—আমার দোকান হলে অবশ্যই দিত। কতদিন বলছি তোমাকে যে চলো আমরা একটা দোকান দিই—সে দোকানে ক্ষীরের পাটিসাপটা, তোমার শাশুড়ির রেসিপির কড়াইশুটির চপ আর ঘুঘনি বিক্রি করব শুধু। তাতেই বাড়ি গাড়ি হয়ে যাবে।

—কথা পরে, আগে বসে পড়ো। কে কে চা খাবে আর কে কে কফি?

—তৃষা বলল, মা, আমি ড্রিঙ্কিং চকোলেট। ঠিক আছে?

—ঠিক আছে।

বলেই বললেন, অগ্নিভর আর অপালার দিকে চেয়ে, আজকালকার ছেলেমেয়েদের সময়ের বড়ই দাম। ঠিককে বলে ঠি, ইকনমিকসকে ইকো, দিল্লি স্কুল অফ ইকনমিকসকে ডি. স্কুল, ফ্লেক্সিবল্-

কে ফ্লেক্সি এই সব।

তৃষা বলল, সময় কোথা সময় নষ্ট করবার মা। তোমাদের সময়ে তোমাদের হাতে অঢেল সময় ছিল।

আমাদের সময়কার সময় ছিল শান্ত, মধুর, আমরা সময় নিয়ে কী করতে হয় তা জানতাম। আর তোরা সব ছটফট করা চড়াই পাখি, ডানার ঝাপটাতে সবসময়েই ধুলো ওড়াচ্ছিস।

আর তোমরা?

আমাদের ছিল শান্ত গ্রীষ্ম দুপুরের ঘুঘুর ডাকের মতো সময়। তার মাধুর্য ইন্টারনেটে বসে আঙুল চালিয়ে তোরা কী করে বুঝবি।

অপালা বললেন, বুঝলে তৃষা, তোমরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি জানো তবে এত জ্ঞানের প্রয়োজন সত্যিই ছিল কি ছিল না তা একদিন তোমাদের বুঝতে হবে। জীবনকে মধুর করতে এত জ্ঞান বোধহয় বাধা হয়ে দাঁড়াবে তোমাদের কাছে। নিজেরাই এ কথা বুঝতে পারবে একদিন।

রুরু গেয়ে উঠল : কে সারা সারা, হোয়াটেভার উইল বি, উইল বি।

তৃষার মোবাইল বেজে উঠল।

সেটটার দিকে তাকিয়ে বোতাম টিপে বলল, হর্ষদ? আবার কী হল? না ফুলতো আসেনি এখনও। পাঠিয়েছ যখন, আসবে নিশ্চয়ই। আমরা এখন ব্রেকফাস্ট করছি জমিয়ে, অগ্নিকাকা, অপালা মাসি সব এসেছেন, চুমকি তো রাতে ছিলই। রুরু আর কোথায় যাবে? এখনও তো ডানা গজায়নি ওর। আমি তোমাকে পরে ফোন করছি। বাঈ-ঈ।

৪

ব্রেকফাস্ট খাওয়ার পরে ওরা সকলে বসার ঘরে এসে বসেছে। সকলের অনুরোধে অগ্নিভ গান ধরেছেন।

"প্রণয় পরম রত্ন, যত্ন করে রেখো তারে
বিচ্ছেদ তস্করে আসি যেন কোনোরূপে নাহি হরে।
অনেক প্রতিবাদী তার হারালে আর পাওয়া ভার।
কখন যে সে হয় কার কে বা বলিতে পারে।"

অপালা বললেন, এটা কার গান?

নিধুবাবুর, আবার কার? রামনিধি গুপ্ত। যিনি বাংলা টপ্পার জনক। নিধুবাবু অত্যন্ত বড়ো মাপের কবিও ছিলেন। ওর গানে যেমন পানিং তেমন কম রচয়িতার গানেই দেখা যায়। শব্দ চয়ন ও উদ্ভাবনও তেমনই। যেমন "অপ্রণয়" এই শব্দটি।

অরা বললেন একটি গানে "বাসনাকুসুম" শব্দটি পেয়েছিলাম। ওটিও কি নিধুবাবুর?

না বোধহয়। ইফফাত আরা খান-এর গলাতে, তখন উনি দেওয়ান ছিলেন না, এই শব্দটি, একটি গানে পেয়েছিলাম। "বাসনাকুসুম হৃদয়ে যা ছিল সকলি ফেলেছি তুলিয়া" বা ওইরকম কিছু।

চুমকি বলল, ভ্যালেনটাইনস ডে-তে আরও কিছু প্রেমের গান হোক অগ্নিকাকা। তারপর অরা মাসি রবীন্দ্রসংগীত বা অতুলপ্রসাদ গাইবেন।

আজ আমার গলাটা ভালো নেই। তোমরা কেউ আমার গলাতে তিনটে চুমু খাও তো। ঠিক হয়ে যাবে।

অগ্নিভ বলল।

কার চুমু খাবেন?

চুমুতো সকলেরই খেতে ইচ্ছে করে। যে খাবে খাও।

তবে আমিই খাচ্ছি।

চুমকি বলল।

একে বলে চুমু-থেরাপি। সব রোগের চিকিৎসা করা যায় এই থেরাপিতে। বুঝেছ।

এত আপনি শিখলেন কোথায়?

অপালা বলল।

এই! এক জীবনে কম কিছু তো করলাম না। অরাদের দেশ হাজারিবাগে আমার এক মুসলমান গুরু ছিলেন। বাওয়ার্চিকে বাওয়ার্চি, হেকিমকে হেকিম, ঈত্বরওয়ালাকে ঈত্বরওয়ালা, তাঁর কাছ থেকেই এই সব বিদ্যা শিখেছি। আমি আর আশিস যখন হাজারিবাগে তোর মাকে দেখতে যাই, মানে আমি আর তোর বাবা, কাকাবাবু মেয়ে পছন্দ করার পরে তখন আশিসের সঙ্গেও তাঁর আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম। হাজারিবাগ তো আমার পুরানো ঠেক। খুব মজা হয়েছিল সেবারে। আমরা কানহারি পাহাড়ের মাথার উপরের বনবাংলোতে ছিলাম।

তৃষা বলল, চলুন না অগ্নিকাকা আমাদের সকলকে নিয়ে একবার হাজারিবাগে। মামাবাড়ি তো আর নেই। দিদিমা তো আগেই চলে গেছিলেন, দাদুর মৃত্যুর পরে তো বাড়ি বিক্রিই হয়ে গেছে। বড়োমামা স্টেটস-এ চলে গেলেন পাকাপাকি, বাড়ি দেখাশোনারও কেউই ছিল না। মামার কাছে শুনেছি, কানহারি হিল রোড-এ ছিল সেই বাড়ি।

মা তো এখনও নস্টালজিক। লাল মাটি, শালবন, কানহারি, সীতাগড়া আর সিলওয়ার পাহাড় ঘেরা হাজারিবাগ-এর কথা উঠলেই মায়ের চোখ এখনও ছলছল করে ওঠে।

চলো একবার। সকলে মিলে যাওয়া যাবে। রাজডেরোয়া ন্যাশনাল পার্ক-এর উলটোদিকে শালপর্ণী বলে একটা দোতলা রেস্ট হাউস বানিয়েছে বনবিভাগ। কাছেই ঝরনাও আছে একটা। চড়ুইভাতি করার আইডিয়াল জায়গা। তবে তোরা সকলেই যা ব্যস্ত। তোদের সকলকে একসঙ্গে একইসময়ে পাওয়াই তো অসম্ভব। আমি তো রিটায়ার্ড বুড়ো, আমার তো অঢেল সময় হাতে। গেলেই হল।

চুমকি বলল, বড় বেশি কথা হচ্ছে। গান শুরু করো অগ্নিকাকা।

চুমুটা খা আগে। বললাম না গলা খারাপ।

চুমকি উঠে এসে নীচু হয়ে অগ্নিভর গলাতে গুনে গুনে এক, দুই, তিন করে তিনটি চুমু খেল।

অগ্নি একবার গলাখাকারি দিয়ে বলল, বাঃ ওষুধে কাজ হল বেশ। বলেই শুরু করলেন,

"সে কেনরে করে অপ্রণয়? তার উচিত নয়।
ওগো তারি সনে কভু বিচ্ছেদ নয়।
কখন কি বলেছি মানে
আমার আজ কি তা আছে মনে
ওগো তাই বলে কি মানে মানে
অভিমানে রইতে হয়?
সে কেনরে করে অপ্রণয়?
সখী গো বোলো তারে, বোলো গিয়ে বুঝাইয়ে
ওগো পীরিতি করিতে গেলে সুখ দুখ সইতে হয়।
সে কেনরে করে অপ্রণয়,
তার উচিত নয়।"

সকলে হইহই করে বাহবা দিল।

অগ্নি বললেন, আজ আর নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন না, ভালো জিনিস অল্প বলিয়াই ভালো।

তৃষা বলল, এবারে অপালা মাসি তুমি একটা গান গাও।

মাথা খারাপ। এই গানের পরে! তার চেয়ে চল সকলে মিলে কোরাস গাই একটা।

কোন গান গাইব অরা? তবে কোরাস নয়, তুই একাই গা।

তা হবে না। তোরও গলা দিতে হবে।

ধরতো তুই।

অপালা গান ধরল,

"খেলা যখন ছিল তোমার সনে তখন কে তুমি তা কে জানত,/ছিল না ভয় ছিল না লাজ মনে, জীবন বয়ে যেত অশান্ত......."

৫

অরার স্কুলে এখন ওকেই হেডমিস্ট্রেসের কাজ করতে হয় যদিও ডেজিগনেশান সিনিয়র টিচার। হেডমিস্ট্রেস রিটায়ার করার পর সেই পদের স্যাংশান আসেনি হায়ার সেকেন্ডারি বোর্ড থেকে।

এবারে গরমটা বোধহয় তাড়াতাড়িই পড়বে। পড়ানো ছাড়াও অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাজও কম থাকে না। স্কুলের পরে বড় ক্লান্ত লাগে। একটা গাড়ি থাকলে বেশ হত কিন্তু ভালোভাবে বাঁচতে আজকাল যা খরচ তাতে অরার পক্ষে গাড়ি কেনা সম্ভব নয়। গাড়ি কেনাটা আজকাল অতি সহজ কিন্তু ড্রাইভারের মাইনে, রানিং কস্ট এসবে অনেকই টাকার দরকার। ওর স্কুলের দুজন টিচার গাড়ি কিনেও কিছুদিন পরে অনেক টাকা গচ্চা দিয়ে গাড়ি বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছে।

বাইরে বেরিয়ে দেখলেন, মিনির জন্যে লম্বা লাইন। একটা ট্যাক্সি নেবেন কিনা তা নিয়ে দোনামোনা করছিলেন। তৃষা বেশ ভালো কাজ করে, একটি অ্যাড এজেন্সিতে। খুব সুনামও করেছে। মাইনেও ভালোই পায়। রুরু এখনও ছাত্র। তবে প্রাইভেট ট্যুইশান করে। আশিস বলতেন, ছেলেমেয়েরা হচ্ছে টুয়েন্টি ওয়ান ইয়ারর্স গেস্টস। ওদের সাধ্যমতো প্যাম্পার করতে হবে। তবে আজকালকার সন্তানেরা একুশে পায়ে দাঁড়ায় না। তবু যতদিন কাছে থাকে ততদিনই সুখ।

ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে নাকটা মুছলেন। ওঁর নাক ভীষণ ঘামে। এমন সময়ে ওর পাশে একটি সান্ট্রো গাড়ি এসে দাঁড়াল। হালকা নীল রঙা গাড়ি। আজকাল যা দিনকাল! অচেনা লোক গাড়ি নিয়ে পাশে এসে দাঁড়ালে ভয় করে। অরার বয়স পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই কিন্তু দেখলে মনে হয় পঁয়তাল্লিশ। আয়নার সামনে দাঁড়ালে বা চান করার সময়ও নিজেকে তেমন সুন্দরী বলে মনে হয় না। অন্য সব মেয়ের শরীরে যা-কিছু গর্ব করার থাকে তাঁর শরীরেও তাই-ই আছে। কিন্তু পুরুষের চোখ তাঁকে সুন্দরীই দেখে। সুন্দরী মাত্রই কিশোরী বয়স থেকে নানা বিপদের মধ্যে দিয়ে বড়ো হয়ে ওঠেন। এই সব বিপদের কথা শুধুমাত্র মেয়েরাই জানে। কখনো অপালাকে বলেননি, একদিন তার মহাদেব স্বামী ঘোষ সাহেবও একা বাড়িতে অরাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। প্রেমহীন শরীরে কখনো আকর্ষণ বোধ করেননি অরা। এক ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিলেন ঘোষ সাহেবকে। তারপর থেকে অবশ্য আর কখনো দুঃসাহস দেখাননি। দুশ্চরিত্র পুরুষ মাত্রই ভীরু হয়। এমনই বিশ্বাস হয়েছে অরার জীবনের মধ্য গগনে পৌঁছে।

উঠে এসো অরা।

স্টিয়ারিং-এ বসা অগ্নিভ বললেন।

এ কী। গাড়ি কবে কিনলে?

আজই ডেলিভারি পেয়েছি।

বাঁদিকের দরজাটা ঠেলে খুলে দিলেন অগ্নিভ।

সামনের সিটে বসতে বসতে অরা বললেন, গাড়ি কেনার কী দরকার ছিল? কী এমন দরকার তোমার গাড়ির?

আমি কী আমার জন্যে কিনেছি?

গাড়ি ফার্স্ট গিয়ারে দিয়ে বললেন অগ্নিভ।

তবে কার জন্যে কিনেছ?

তোমার জন্যে।

আনন্দে ও গর্বে অরার মুখটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

বলল, বাজে কথা বলার জায়গা পাও না।

সত্যিই বলছি। তোমাদের বাড়িতে তো একটা গারাজও আছে।

তোমার কাছেই থাকবে গাড়ি। তুমিই ব্যবহার করবে। খড়্গাপুরে তো গাড়ি চালাতে তুমি। এ.এ.ই.আই বা কোনো মোটর ট্রেনিং স্কুলে কদিন তালিম নিলেই তুমি আবার চালাতে পারবে।

খড়্গাপুরে আলাদা ব্যাপার ছিল। তবে শুনতে পাই এখন সেখানেও খুব ভিড়। কিন্তু আজকের কলকাতাতে গাড়ি চালানো আমার কম্মো নয়। তাছাড়া, আমার ব্লাড প্রেশারও যে হাই। গাড়ি চালাতে গেলে তা আরও বেড়ে যাবে।

চলো, আজ তোমাকে প্রেশার নেমে যাওয়ার ইনজেকশান দেব।

কোথায়?

অবাক হয়ে বললেন অরা।

আমার বাড়িতে।

কী যে হেঁয়ালি করো, বুঝি না।

বুঝবে। নিজের বাড়ির দিকে গাড়ি চালাতে চালাতে বললেন অগ্নিভ।

কোথায় চললে তুমি?

বললাম না, আমার বাড়িতে।

এখন হুট করে কি যাওয়া যায়? বাড়িতে বিস্পতি বসে থাকবে। রুরুটা ফিরবে কলেজ থেকে। আমার কি কোনো স্বাধীনতা আছে?

যে নিজেকে পরাধীন করে রাখতে চায়, তাও নিজের হাতেই শিকল পরিয়ে, তাকে স্বাধীন করতে পারে কোন শক্তি?

তুমি বোঝো না?

সব বুঝি।

চলো অরা। আজ আমি কোনো কথা শুনব না। অনেক বছর অপেক্ষা করেছি আমি। বড় কষ্ট হয় আমার। আমি এখনও যুবক আছি। তুমিও যুবতী। চলো, আজ আমরা পরীক্ষা দেব আর পরীক্ষা নেব।

ছিঃ ছিঃ। এ কী হল তোমার দু-যুগ পরে। তুমি তো এমন ছিলে না।

চিরদিনই এমনই ছিলাম। কখনো প্রকাশ করিনি। কত কষ্ট যে পেয়েছি। সব একা একা সয়েছি। এতে দোষের কী আছে?

আশিস যদি থাকত তবে পারতে এমন করতে? ও জানলে কী ভাবত, কী বলত?

অরা বলল।

ও নেই বলেই তো তোমাকে চাইছি আমি। তোমারও কি কষ্ট নেই অরা? পুরুষ মনে করে শরীরের কষ্ট বুঝি তাদেরই একার। মেয়েদের বুঝি কষ্ট নেই?

—নেই তা নয়। তবে মেয়েরা মেয়েবেলা থেকেই অনেক কষ্টকেই নীরবে মেনে নিতে শেখে। সবকিছুতেই পুরুষদের মতো অধৈর্য হয়ে ছটফট করে না।

—তুমি আমাকে অধৈর্য বলছ? পঁচিশ বছরের ধৈর্যটা কি ধর্তব্যের মধ্যে নয়?

—তুমি অবশ্য আমার শরীরটা দাবি করতেই পারো। গত পঁচিশ বছরে তুমি আমার এবং আমার ছেলেমেয়ের জন্যে যা করেছ তা অস্বীকার করার মতো অকৃতজ্ঞ আমি নই। কিন্তু.....

—কিন্তু কী?

—তোমাকে তো আমি আমার মন দিয়েছি পুরোপুরিই। একজন মেয়ের পক্ষে যতখানি, যেমন করে, দেওয়া যায় তেমন করেই। যাকে মেয়েরা মন দেয় তাকে শরীর দিতে তাদের কণামাত্রও আপত্তি থাকে না। তোমরা পুরুষেরা এরকমই। তোমরা মেয়েদের শরীরটাকে তাদের মনের চেয়ে দামি বলে মনে করো সবসময়েই। শরীর বর্জিত আমাদের এই যে অমলিন সম্পর্ক; এর মাধুর্য কি শরীরী সম্পর্ক হলে থাকবে?

তুমি শরৎবাবুর নায়িকার মতো কথা বলছ অরা। তুমি যে কত মহৎ আর আমি যে কত নীচ তাই বলবার চেষ্টা করছ।

অরার দু-চোখ জলে ভরে এল।

বলল, তুমিও যদি আমাকে ভুল বোঝো তাহলে আমি কোথায় যাই বলোতো? তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে? আমি মনে মনে এখনও তৈরি নই অগ্নি। তাছাড়া ব্যাপারটা এমন চটজলদি হয়? এমন একটা সুন্দর ব্যাপার, বিশেষ করে তোমার সঙ্গে আমার—এর জন্যে প্রস্তুতি লাগবে না? বিছানা ফুলে ছেয়ে দিতে হবে, ধূপ জ্বালাতে হবে সন্ধে থেকে, আতর গোলাপজলের বন্দোবস্ত করতে হবে। তুমি তো নিজেই আতরের স্পেশালিস্ট, রাশিদ খাঁ-এর "বাঁতো বাঁতো মে বিত গায়ী রাত"-এর ক্যাসেট চালাবে নীচু স্বরে। আমরা কি জন্তু জানোয়ার? শরীর সর্বস্ব? আমাদের শারীরিক ব্যাপারটা স্বর্গীয় হবে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অগ্নিভ বলল, তোমার পরম সুন্দর স্বর্গীয় ব্যাপারটি ঘটবার আগে আমি নিজেই স্বর্গে চলে যাব। গিয়ে, আশিসের সঙ্গে মন্দাকিনীর পাড়ে বসে পেশেন্স খেলব।

অরা মৃদু হেসে অগ্নির কাঁধে হাত ছুঁইয়ে বলল, লক্ষ্মী সোনা, আর একটু সময় দাও আমাকে।

গাড়িটা লাল আলোতে দাঁড়িয়েছিল। এমন সময় ফুটপাথে দাঁড়ানো রুরু চেঁচিয়ে উঠল মা-আ-আ।

এয়ারকন্ডিশান্ড গাড়ির মধ্যেও সেই ডাক পৌঁছোলো। অরা তাড়াতাড়ি অগ্নির কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে নিয়ে বাঁ হাত দিয়ে কাচ নামিয়ে বলল, কী রে!

এটা কার গাড়ি? তুমি কার সঙ্গে যাচ্ছ? কোথায়?

অগ্নি গলা তুলে বলল, উঠে আয় রুরু। তুই কোথায় এসেছিলি?

গাড়িতে উঠতে উঠতে রুরু বিস্ময়ের গলায় বলল অগ্নিভকে, একেবারে ব্রান্ড নিউ। কী দারুণ নতুন নতুন গন্ধ। কবে কিনলে? কীজন্যে কিনলে?

আজই কিনলাম। তোদের জন্যেই কিনলাম। গাড়ি চালানোটা শিখে নে। আঠারো বছর তো হয়ে গেছে তবে আর কী?

অরা বলল এটাই বাকি। নিজে রোজগার করে গাড়ি কিনে তারপর গাড়ি চালাবে।

বাঃ রে। আমার বন্ধুরা তাদের বাবার গাড়ি চালায় না বুঝি।

—অগ্নিকাকাতো তোর বাবা নন।

—বাবার মতো তো।

—বাবার মতো আর বাবায় তফাত থাকে।

অগ্নিভর চোয়ালটা শক্ত হয়ে এল।

কোথায় যাচ্ছ? অগ্নিকাকা? মাকে কোথায় পেলে?

তোর মাকে দেখলাম স্কুলের সামনে বাসের জন্য অপেক্ষা করছে। তাই নতুন গাড়িতে তুলে নিয়ে বললাম, আমার বাড়ি চলো। বিরিয়ানি আনিয়ে খেয়ে সেলিব্রেট করি।

—বাঃ রে। আমরা বুঝি বাদ? দিদি শুনলেও ফায়ার হয়ে যাবে।

—তাহলে আজ থাক। চল তোদের নামিয়েই দিয়ে আসি বাড়িতে।

—তাহলে পার্টিটা কবে হচ্ছে?

—তোরা যেদিন বলবি সেদিনই হবে। বাড়িতে বিরিয়ানি না খেয়ে, যদিও আমাদের পাড়ার নতুন বিরিয়ানির দোকানটা দারুণ বিরিয়ানি করে, চল সকলে মিলে একদিন মেইনল্যান্ড চায়নাতে খেয়ে আসি।

—ও বাবাঃ। সে তো ভীষণই দামি জায়গা।

তোরাও তো আমার কাছে খুবই দামি। সেদিন চুমকি আর তোর অপালা মাসিকেও নিয়ে যেতে হবে। ঘোষ সাহেব নিশ্চয়ই যেতে পারবেন না।

সব বড়ো ব্যারিস্টারদের সপ্তাহে একদিনই ছুটি। সেদিন কোনো কনফারেন্স রাখেন না ওঁরা কেউই।

কবে?

শুক্রবার সন্ধেতে।

অরা বলল।

তবে তাই হবে। কোনো এক শুক্রবার সন্ধেতেই করা যাবে। ভদ্রলোক আমার একটা বড় উপকার করেছিলেন। কিছুতেই ফিস নেননি। যদিও একবোতল স্কচ জোর করে দিয়েছিলাম। সেটা তো ওঁর ফিস-এর তুলনাতে কিছুই নয়। তাছাড়া অপালাও আমাকে খুব ভালোবাসে।

—আর মা বুঝি বাসে না?

রুরু বলল।

সে কথা তোর মা-ই জানে।

অগ্নিভ ওদের বাড়িতে নামিয়ে দিল।

অরা বলল, এক কাপ চা খেয়ে যাবে না?

তুমি তো জানো যে যখন তখন চা খাওয়ার হ্যাবিটটা আমি কালটিভেট করিনি অধিকাংশ বাঙালির মতো। তাছাড়া, সন্ধের পরে আমি চা-টা খাই না। আজ এই গাড়ি ডেলিভারি নিতে খুবই হ্যাপা গেছে। বাড়ি গিয়ে চান করে দুটো হুইস্কি খাব তারপর চন্দনবাবু দয়া করে যা রেঁধেছেন তাই খাব।

আমার এখানে হুইস্কি-টুইস্কি নেই। তবে খেয়ে যেতে পারো এখানে। আজ চাওমিয়েন আর ধোকার ডালনা করতে বলেছি বিস্পতিকে।

—রুরু বলল, স্ট্রেঞ্জ কম্বিনেশান।

—তারপর বলল, এ মাসের তিনটি টিউশান থেকে যে টাকা পাব তা দিয়ে তোমার জন্যে একটা কিছু কিনে রাখব বাড়িতে অগ্নিকাকা।

তুমি কি শুধু হুইস্কিই খাও? না রামও রাখব।

—অরা বলল, তোমার ডেঁপোমি করতে হবে না। অগ্নিকাকার নাম করে বাড়িতে ওসব রেখে এই বয়সেই নিজেই পাঁড় মাতাল হয়ে উঠবে হয়তো।

রুরু বলল, মা-আ-আ। আমাদের বন্ধুরা যে জলীয়ত বটেই, আরও কত কিছু খায় তা যদি তুমি জানতে। তোমার হিরের টুকরো ছেলেকে ওসব বোলো না।

গাড়ি থামিয়ে অগ্নি বলল, নাম এবারে।

তারপর বলল, আমার গাড়ির কী দরকার। তোদের গ্যারেজটা পরিষ্কার করে রাখিস রুরু। একজন ভালো ও বয়স্ক ড্রাইভার পেলে গাড়িটাকে তোদের বাড়িতেই রাখব। তোদের ও তোদের মায়ের সুবিধা হবে। দিনে দিনে যা অবস্থা হচ্ছে কলকাতা শহরের, বাসে মিনিবাসে যেতে তো কালঘাম ছুটে যায়। তোদের ফ্ল্যাটের গারাজটা তো খালিই পড়ে থাকে।

অরাও গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল।

অগ্নি ডান হাত স্টিয়ারিং-এ রেখে বাঁ হাত তুলে বলল, চললাম।

বিদায় সম্ভাষণটা অরাকে করল না রুরুকে। অরা ঠিক বুঝতে পারল না।

একটা মস্ত দীর্ঘশ্বাস পড়ল তার। গাড়ির ব্যাকলাইটের আলোটা অন্য গাড়ির ভিড়ে হারিয়ে না-যাওয়া অবধি ফুটপাথেই স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইল অরা।

—রুরু ডাকল, মা।

রুরুর ডাকে সম্বিৎ ফিরল অরার।

৬

ফ্ল্যাটে ঢুকেই অরা বিস্পতিকে ডেকে এক কাপ চা করে দিতে বলল, লিকার, চিনি ছাড়া, একটু লেবু আর বিটনুন দিয়ে।

রুরু বলল, তোমার না প্রেশার বেড়েছে বলছিলে মা কালকে? বিটনুন খাওয়া কি ভালো?

আমার ভালো খারাপ নিয়ে তোর মাথা ঘামাতে হবে না। নিজেরা পায়ে দাঁড়া, ভালো করে পড়াশুনো কর। তোর লিটল ম্যাগ আর বাংলো ব্যান্ডের হুজুগ একটু কমা। জীবনে সময়ের চেয়ে দামি আর কিছুই নেই। সময়ের জিনিস সময়ে না করলে পরে পস্তাতে হয়। যে সময় চলে যায়, তা আর ফিরে আসে না।

রুরু অরার কাছে এসে অরার হাতের সঙ্গে নিজের হাত জড়িয়ে বলল, তোমার কী হয়েছে মা? শরীর খারাপ?

হ্যাঁ। শরীরটা ভালো না। তাছাড়া স্কুলেও খুব ঝামেলা গেছে। এত নোংরা রাজনীতি স্কুলে, যে বলার নয়। সব ব্যাপারেই জনগণায়ন আর রাজনীতিকরণ দেশটার সর্বনাশ করে দিচ্ছে। ভবিষ্যতে এর কুফল যখন ফলবে তখন বড়ই দেরি হয়ে যাবে। এই ক্ষতি আর পূরণ হবে না কোনোমতেই। ওই মনীষা রায় মহিলা একেবারে পেইন ইন দ্যা নেক। তার উপরে কোথায় তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে চান করে একটু শুয়ে থাকব এক কাপ চা খেয়ে, না তোর অগ্নিকাকা স্কুলের সামনে পৌঁছে আমাকে নতুন গাড়িতে চড়িয়ে সেলিব্রেট করতে এল। সবসময়ে সকলের মন যে সেলিব্রেশনের জন্যে তৈরি থাকে না এ কথাটা যদি সবাই বুঝত।

উনি কী করে জানবেন যে তোমার শরীর খারাপ আর স্কুলে ঝঞ্ঝাট গেছে। উনি তো ভালোবেসেই নতুন গাড়ি নিয়ে তোমাকে চড়াবার জন্যে এসেছিলেন।

সবসময়ে সকলের ভালোবাসা সহ্য হয় না। আজও মাইনে হল না। ইনক্রিমেন্টের পরে চার মাসের ব্যাক পে বাকি রেখেছে। এদিকে নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। ব্যাঙ্কের সুদের হারও কমে গেছে। সঞ্চিত অর্থের রোজগারই যাদের প্রধান আশ্রয় তাদের কথা তারাই জানে। শুধু মাইনের টাকাতে তো চলে না।.........

—মা, আমি তোমাকে মাসে হাজার টাকা করে দেব।

—এখনও দরকার হবে না। তেমন প্রয়োজন হলে বলব। তোদের তো পকেট-মানি বলে কিছুই দিতে পারি না। নিজের সব খরচ তো তুই নিজেই চালিয়ে নিস। তাছাড়া তৃষা তো প্রতি মাসেই দেয়। না, না, তোর কিছু দিতে হবে না। আজ মাইনেটা হলে মেজাজ এমন বিগড়ে যেত না। কাল সকালেই তো দুধওয়ালা, কাগজওয়ালা সব এসে হামলা করবে। রেশনও তুলতে হবে। বাড়তি টাকা বলতে হাতে তো কিছুই থাকে না।

তারপর বলল, যাই হোক এ নিয়ে তোর চিন্তা করতে হবে না। কালও মাইনে না হলে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে নেব। তুই তোর পড়াশুনোর চিন্তা কর।

৭

বিস্পতি চা টা নিয়ে এলে চা খেয়ে, অরা চানে গেলেন। সব ঘরেই অ্যাটাচড বাথরুম আছে। নিজের ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দেবার আগে বললেন, আমি চান করে একটু বিশ্রাম করব। তৃষা ফিরলে তোদের যদি খিদে পায় তো তোরা খেয়ে নিতে পারিস। আমি পরে খাব। আর শরীর ভালো না লাগলে খেতে নাও পারি। ফোন এলে ধরিস। কেউ এলে দরজা খুলিস। কী-হোল দেখে নিয়ে দরজা খুলিস। দিনকাল ভালো নয়। গতকাল সন্ধেবেলাতেই তো স্বর্ণালী অ্যাপার্টমেন্টে মস্ত ডাকাতি হয়ে গেল। আমাদের বাড়িতে নেবার মতো তো কিছু নেই—তবু হাতঘড়ির জন্যে, টিভি-র জন্যেও ডাকাতি হয় আজকাল।

—পুলিশ তো কিছু করে না।

পুলিশ কী করবে। এত মানুষ। পুলিশের কী দোষ? পুলিশ ভগবান হলেও কিছু করতে পারত না। জনসংখ্যাই তো আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা।

—অথচ তা নিয়ে কোনো দলেরই মাথাব্যথা নেই এক ফোঁটা।

একথা বলে বিরক্তির সঙ্গে দরজা বন্ধ করে অরা ভিতরে গেল। ঘরে গিয়ে জামাকাপড় সব ছেড়ে একেবারে নিরাবরণ হয়ে ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে দাঁড়াল। বহুদিন পরে নিজেকে এমন মনোযোগ সহকারে দেখল। ভাবল, ওর কী এমন আছে যে অগ্নি আজ ওকে এমন পাগলের মতো পেতে চাইল। এত বছর ধরে ওর কাছ থেকে ঠাঁই-নাড়া হল না।

তারপর চানঘরে গিয়ে গরম-ঠান্ডা জল মিশিয়ে অনেকক্ষণ ধরে চান করল অরা খুব ভালো করে সাবান মেখে। শরীরের মধ্যেও একটা জ্বলন বোধ করছিল—অগ্নির উপরে রাগ যেমন হচ্ছিল তেমন তার জন্যে দুঃখও হচ্ছিল। বেচারা! তার পক্ষে এতদিন ধরে এতকিছু করার পরে একদিন অরাকে শরীরে চাওয়াটা তো অপরাধের নয়। সে দেবতা বলেই এতদিন চায়নি। দেবতাদেরও তো চাওয়া থাকে।

ছাড়া-জামাকাপড় বাথরুমের কোনাতে রাখা ডার্টি লিনেন বক্সে ফেলে শায়া ব্রা কিছুই না পরে শুধু নাইটিটা পরে বিছানাতে এসে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ল অরা।

ঘুম যখন ভাঙল তখন ঘড়িতে দেখল সাড়ে দশটা বাজে। দরজা খুলে রান্নাঘরে গিয়ে বিস্পতির কাছে শুনল যে তৃষা ও রুরু দুজনেই খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়েছে। কাল ওদের দুজনকেই নাকি সকাল সকাল বেরতে হবে।

অরা বললেন, তুমি খেয়ে শুয়ে পড় বিস্পতি। আমি কিছু খাব না।

—দুটো ধোকা খাও মা অন্তত।

—না গো। শরীরটা ভালো নেই। আমাকে ঘরে এক বোতল জল আর একটা গ্লাস দিয়ে যাও। কাল ওরা যদি সকালেই বেরোয় তাহলে খাবার কিছু আছে তো?

—সব আছে মা। রুটি, ডিম, দুধ, কর্নফ্লেক্স, চিঁড়ে, ফল, যা বলবে ওরা বানিয়ে দেব।

ঠিক আছে। আমার উঠতে একটু দেরি হলে ওদের ব্রেকফাস্ট বানিয়ে দিয়ো। না খেয়ে যেন বাড়ির বাইরে কেউ না বেরোয়। তবে ওরা বেরোবার আগেই আমি অবশ্যই উঠে পড়ব।

—ঠিক আছে মা।

বিস্পতি বলল।

ঘরে এসে, খাটের পাশে রাখা চেয়ারটাতে কিছুক্ষণ বসে রইল অরা। বিস্পতি খাওয়া-দাওয়ার পর ভল্যুমটা কমিয়ে বসার ঘরে টিভি দেখে রাতে সাড়ে বারোটা একটা অবধি। বাংলা সিরিয়াল। এই ওর রিক্রিয়েশান। তারপর, খাওয়ার ঘরের মেঝেতে পাখা চালিয়ে ওর বিছানা পেতে শুয়ে পড়ে চুল ছড়িয়ে। পাখার হাওয়াতে ওর চুলের নারকোল তেলের গন্ধ ওড়ে।

চেয়ারে বসে কিছুক্ষণ ভাবল অরা। আজকের ঘটনার অভিঘাত ওর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে। অগ্নির জন্যে যেমন কষ্ট হচ্ছে খুব ওর নিজের জন্যেও হচ্ছে। কী ন্যায় আর কী অন্যায় ভেবে ঠিক করতে পারছে না। সাত পাঁচ ভেবেও যখন কূলকিনারা পেল না তখন আলো নিবিয়ে শুয়েই পড়ল।

মাঝরাতে কতগুলো পথের কুকুরের চিৎকারে অরার ঘুম ভেঙে গেল। বিছানাতে উঠে বসে শূন্য দৃষ্টিতে পর্দা দেওয়া জানালার ফাঁক দিয়ে বাইরে চেয়ে রইল। পথের মার্কারি ভেপার ল্যাম্পের খয়েরি আলো এসে ওর ঘরকেও আলোকিত করে দেয়। পেলমেট-এর নীচের পর্দা একটু ফাঁক করা থাকে। তা দিয়েই আসে আলো।

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে লেখার টেবিলে এসে বসল অরা।

তারপর চিঠি লেখার প্যাড নিয়ে ব্যাগ থেকে কলমটা বের করে অগ্নিভকে চিঠি লিখতে বসল। চিঠিটা আরম্ভ করেই ওর মনে হল ওর মন শান্ত হয়ে আসছে ধীরে ধীরে। ওর খুব ইচ্ছা হল যে অগ্নিভকে একটা ফোন করে দেখে সেও এমনি জ্বলনে জ্বলছে কি-না—না কি বেশি হুইস্কি খেয়ে শান্তি পাবার জন্যে অঘোরে ঘুমুচ্ছে? কিন্তু ফোন তো বসার ঘরে। ওর নিজের মোবাইল ফোন নেই। ছেলেমেয়েরা নিজেরাই কিনেছে। অগ্নিভ অনেকবার বলেছে যে ওকে এটা উপহার দেবে। "কিন্তু কী দরকার? প্রয়োজন বাড়ালেই বাড়ে। প্রয়োজন বাড়ানোর কোনো শেষ নেই।" এই বলে অরা প্রতিবারেই "না" করে দিয়েছে।

আজ রাতে এই প্রথমবার মনে হল তার একটা মোবাইল ফোন থাকলে আজ তার ঘরে শুয়ে শুয়েই অগ্নির সঙ্গে কথা বলতে পারত। মনে মনে ঠিক করল ব্যাক পে'টা পেলেই নিজের জন্যে একটা ফোন কিনে নেবে। অল্প টাকার ক্যাশ কার্ডেই চলে যাবে ওর। কটাই বা করবে ফোন।

কলম হাতে অনেকক্ষণ বসে থাকার পরে আরম্ভ করেছিল চিঠি লেখা। কী সম্বোধন করবে ভেবে পেল না। আগে আগে লিখত অগ্নিভবাবু, তারপরে অগ্নিবাবু, তারও পরে মশাই, তারপরে বন্ধু। মাঝে অনেকদিন চিঠি লেখেনি, দরকার হয়নি অগ্নিভ কলকাতাতে চলে আসায়। অগ্নিভই লিখত

বেশি অরা সংক্ষেপে জবাব দিত। আজ প্রথম সম্বোধন করল 'প্রিয়বরেষু অগ্নি' বলে। তারপরেই দেখল তার কলম তরতর করে লিখে চলেছে। তার বুকের মধ্যে এই সম্বোধনটি যে কত দিন না-ফোঁটা ফুলকুঁড়ির মতো সুপ্ত ছিল তা ও নিজেও উপলব্ধি করেনি। আশিস চলে যাবার পরেও তার যে প্রিয়বরেষু বলে সম্বোধন করার মানুষ কেউ আছে, এইটে ভেবেই ওর মনে হঠাৎ শিহরন জাগল।

প্রিয়বরেষু অগ্নি,

এখন রাত কত জানি না। বিছানার পাশেই টেবিল ক্লক আছে। ইচ্ছে করলেই দেখা যায় কিন্তু ইচ্ছে করছে না। আমার জীবনে সময়ের কোনো ভূমিকা সম্ভবত আর নেই। গত সন্ধেতে তোমাকে দেখে, তোমার কথা শুনে আমার সব গোলমাল হয়ে গেছে।

জানি না, তুমিও জেগে আছো কি না। তোমার কথাতে আমার মনের উপরে যে অভিঘাত হয়েছে তেমনই তোমার মনের উপরেও নিশ্চয়ই হয়েছে আমার কথাতে। এ কথা মনে করেই আমি ভীষণই কষ্ট পাচ্ছি।

তোমাকে কী বলব জানি না। তোমরা পুরুষ। তোমরা যত সহজে তোমাদের মনের কথা অকপটে প্রকাশ করতে পারো আমরা তা পারি না। আমরা মেয়েরা অন্য ধাতুতে তৈরি। নারীবাদীরা যতই সোচ্চার হন না কেন, নারীরা কখনোই পুরুষের মতো হতে পারবে না। পুরুষের পোশাক পরলে বা আমার মেয়ে তৃষার মতো পুরুষদের সঙ্গে সমান দায়িত্ব নিয়ে কাজ করলে বা দেশবিদেশ চষে বেড়ালেও নারী আর পুরুষে তফাত থাকবেই। এটা বড়-ছোটর প্রশ্ন নয়। এটা গড়নের প্রশ্ন। আমাদের সম্পর্কটা পরিপূরণের, প্রতিযোগিতার নয়। নারীকে নইলে পুরুষের চলে না, নারীরও পুরুষকে নইলে চলে না। নারী, সে যতই স্বয়ম্ভর ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন হোক না কেন একজন মনের মতো পুরুষের কাছে সে নিজেকে সমর্পণ করতে পারলে, তার শরীর এবং মনকেও নিবেদন করতে পারলে, সার্থক হয়।

তুমি আমার কাছে যা চেয়েছিলে তা তুমি আশিস চলে যাওয়ার, কিছুদিন পরেই চাইতে পারতে। একবারের জন্যেও চাওনি যে, সে তোমারই মহত্ত্ব। এই দীর্ঘ সময়, তুমি শুধু আমারই নয়, আমার সন্তানদের জীবনেও যে ভূমিকা পালন করেছ তা অস্বীকার করার মতো নীচ আমি বা আমার ছেলেমেয়েরা কখনো হব বা হবে তা আমার মনে হয় না।

তুমি যে শুধু বন্ধুকৃত্যই করেছ তা নয়, আমার বুঝতে ভুল হয়নি যে তুমি আমাকে প্রথম দেখার দিন থেকেই ভালোওবেসেছ। তুমি জানো না যে, সে ভালোবাসা আমার প্রসাদি ফুল।

তোমাকে একটা কথা বলব অগ্নি। ভালোবাসার নানা রকম হয়। ভালোবাসার পাত্রপাত্রীরও নানা রকম হয়। তুমি ও আমি কেউই সাধারণ নই। আমাদের এই অসাধারণত্বর গর্বটা যেমন আমাদেরই, তার দুঃখটাও তেমনই আমাদেরই।

আজ বাড়ি ফিরে চান ঘরে নিরাবরণ হয়ে শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে সাবান মাখতে মাখতে আয়নাতে নিজেকে দেখতে দেখতে ভাবছিলাম যে কী আমার আছে যার জন্যে তোমাকে এত কষ্ট পেতে হবে বা আমি তোমাকে এত কষ্ট দেব? আমার কাছ থেকে তুমি যা চাও তা তো যে-কোনো মেয়েই এত দীর্ঘদিনের মধ্যে তোমাকে দিতে পারত। এখনও দিতে পারে। সেই সহজ সুখে নিজেকে সুখী না করে এতদিন ধরে আমার জন্যে এবং আমার সন্তানদেরও জন্যে নিজেকে এত কষ্ট কেন দিলে তুমি? তুমি তো এখনও একটা বিয়ে করতে পারো। আজকালকার দিনে উনষাট বছর কোনো বয়সই নয়।

আসলে কথাটা কী জানো? তুমি যে আমার কাছে শুধুমাত্র একজন প্রিয় পুরুষই নও,

আমার প্রিয়তমই নও, তুমি যে আমার দেবতা। তোমাকে যে কুলুঙ্গির ঠাকুর করেছি আমি। সেই আসন থেকে তোমাকে নামিয়ে বিছানাতে এনে আধঘণ্টার শারীরিক সুখ পেতে যে আমি কখনো চাইনি। তুমিও নিজেকে জিজ্ঞাসা করে দেখো যে তুমি আমার এবং আমার তিন ছেলেমেয়ের কাছ থেকে তোমার সব কৃতকর্মের প্রতিদানে যে নির্মল নৈবেদ্য পেয়েছ তার আনন্দর সঙ্গে আমাকে শরীরী আদর করার এলেবেলে কি কোনোভাবেই তুলনীয়?

তুমি জানো যে, আমার ছেলেবেলা কেটেছে হাজারিবাগে। আমরা ব্রাহ্ম। ব্রাহ্মসমাজ কম্পাউন্ডের মধ্যে আমাদের বাড়ি ছিল না বটে তবে আমার বাবা হাজারিবাগের ব্রাহ্মসমাজের একজন মাথা ছিলেন। তিনি বিয়ে ও স্মরণসভাতে আচার্যর ভূমিকাও পালন করতেন। অভ্র খাদানের মালিক ছিলেন তিনি। গিরিডির মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। পণ্ডিত ও দেশপ্রেমী। আমাদের বাড়িতে যে লাইব্রেরি ছিল তা তুমি আশিসের সঙ্গে আমাকে দেখতে যখন হাজারিবাগে এসেছিলে তখনই দেখেছ। সেই লাইব্রেরি ঘরে বসেই তোমরা দুজনে আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলেছিলে। পরেও একাধিকবার গেছ। তখন আমার বাড়ির অন্য কেউই সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। আমি অতি সাধারণ কিন্তু আমি আমিই। তুমি দেবতা। এ জন্মে যা দিতে পারলাম না সেই অপারগতার জন্যে তুমি আমাকে ক্ষমা করো। ক্ষমা না করতে পারলে আমার লজ্জা রাখার জায়গা থাকবে না। তুমি আমার জন্ম জন্মান্তরের প্রিয়—তুমি তোমার জায়গাতেই থাকবে চিরদিন। আমি এখনও মন স্থির করতে পারিনি। আশিসের স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলতেও পারিনি। তা বলে তোমাকে আমি আশিসের চেয়ে একটুও কম ভালোবাসিনি। অবশ্যই জেনো, একথা আমার অন্তরের কথা।

আমার ছেলেমেয়ে এবং তাদের বন্ধু-বান্ধবীদের দেখে বুঝি যে এই পৃথিবী বড়ই দ্রুত বদলে যাচ্ছে। কিন্তু আমাকে আশীর্বাদ করো তুমি, আমাকে জোর দাও, আমি যেন না বদলাই। তুমি যে-কোনো মেয়ের শরীরেই যেতে পারো। তাতে যদি তুমি আনন্দ পাও তাহলে আমি আনন্দিতই হব। এবং মনে কিছুই করব না।

আমি তোমাকে যা দিয়েছি, যা দিতে পারি, তাই নিয়েই এ জন্মে সুখী থেকো। যা দিতে পারি না তার দুঃখ এমনিতেই আমাকে মর্মে মর্মে দুখী করে রেখেছে। সেই দুঃখ আমাকে চেয়ে তুমি আর বাড়িয়োনা। এইটুকুই প্রার্থনা।

এই ইন্টারনেট আর মোবাইল ফোনের যুগে এরকম চিঠি কেউ লেখে না জানি। কিন্তু ইন্টারনেটে কি এরকম চিঠি কারোকে কখনোই লেখা যেত? তাই আমার মনে হয় যে ইন্টারনেট কাজের পক্ষে খুবই ভালো কিন্তু আমার তোমার মতো সম্পর্কে যারা বিশ্বাসী তাদের জন্যে নয়। আমরা অন্য যুগের অন্য মানব-মানবী, অন্য মূল্যবোধে বিশ্বাসী। আমরা হয়তো শিগগিরই বাতিল হয়ে যাব কিন্তু তবু ওরা ওরা, আমরা, আমরাই। এই গর্বটুকু নিয়েই যেন আমরা বাঁচতে পারি বাকি জীবন, এই আশীর্বাদ করো।

—ইতি—তোমার চিরদিনের অরা।

চিঠিটি লিখে, টিকিট লাগানো খাম বন্ধ করে, অগ্নিভর ঠিকানা লিখে নিজের হাত ব্যাগের মধ্যে রেখে, টেবিল লাইট নিভিয়ে অরা শুয়ে পড়ল। চিঠিটি লিখে ফেলতে পেরে ওর অশান্ত মন শান্ত হল।

সকালে তৃষা দরজাতে ধাক্কা দিল—মা, মা করে ডেকে। অরা ঘড়িতে তাকিয়ে দেখলেন সাড়ে সাতটা বেজে গেছে। পৌনে নটার মধ্যে বেরোতে হবে স্কুলে।

দরজা খুলতেই, তৃষা বলল, তুমি ভালো আছো তো? কাল রাতে কিছু খাওনি, এত বেলা অবধি

ঘুমিয়ে আছো, কী হয়েছে মা তোমার? ডাক্তার সেনকে কি ফোন করব?

না, না। কাল শরীরটা একটু খারাপ লাগছিল। সম্ভবত প্রেশারটা বেড়েছিল। ব্রেকফাস্টের পরে ওষুধ খেলেই ঠিক হয়ে যাবে।

ডাক্তার সেনকে ডাকি না, প্রেশারটা চেক করে যাবেন।

সে কথার উত্তর না দিয়ে অরা বললেন, তুই এরি মধ্যে তৈরি হয়ে গেছিস?

—কী করব? আজ নটাতে বম্বের বড়ো ক্লায়েন্ট আসবে। প্রেজেন্টেশান আছে। কিছু কাজ এখনও বাকি। ফিনিশিং টাচ দিতে হবে। আমি ব্রেকফাস্টও করে নিয়েছি। বেরোতে হবে এখুনি মা।

কী খেলি?

দুধ আর কর্নফ্লেক্স। ব্যাগে কলা আর আপেল নিয়ে নিয়েছি। অফিসে গিয়ে কাজ করতে করতে খাব।

তোর এই অ্যাড এজেন্সির কাজটা ছেড়ে দে। এ কী কাজ! রাত বারোটা একটা অবধি কাজ করতে হয় আবার সাত সকালে যাওয়া। দুপুরে কী খাস কে জানে। এমন করলে শরীর থাকবে?

কাজ করলে শরীর খারাপ হয় না মা। বরং কাজ না করলেই হয়।

তারপরই বলল, এই নাও দু-হাজার টাকা রাখো। কাল এ.টি.এম. থেকে তুলেছিলাম তিন হাজার। রুরু বলছিল তোমার মাইনে হয়নি কাল।

—টাকা লাগবে না তৃষা। তুই তো মাসে পাঁচ হাজার দিসই আমাকে। আমার মাইনেতেই তো কুলিয়ে যায়। তোর এত কষ্টের রোজগার। তোর কাছেই রাখ। তোরও তো ভবিষ্যৎ আছে। বিয়ে করবি, সংসার করবি, ছেলেমেয়ে হবে, ভবিষ্যৎ-এর কথা না ভাবলে চলবে কী করে। তোর বাবার সঞ্চয় থেকে সুদও তো পাই—ইনভেস্টমেন্টস-এর ডিভিডেন্ডস। তবে কোনো কোনো সময়ে একটু টানাটানি হয়। কিছুদিনের জন্যে। এই যা।

—দুধওয়ালা আর কাগজওয়ালাকে আমি টাকা দিয়ে দিয়েছি মা।

—তাই? রুরু বলেছিল বুঝি?

—হ্যাঁ।

—তোকে বলার কী ছিল?

কেন? আমি কি সংসারের কেউ নই?

তা কেন? তুই তো দিসই। পয়লা বৈশাখ আর পুজোর সময়েও দিস। তাছাড়া, আটকে গেলে তোর অগ্নিকাকার কাছ থেকে ধার চেয়ে নেব।

—অগ্নিকাকাকে আর কত জ্বালাতন করব মা আমরা? তাছাড়া, আমাদের যখন টেনে-টুনে চলেই যায়।

—টাকা তো নিই না এমনিতে। নিলে, ধার হিসেবেই নেব। তবে তার দরকার হবে না বোধহয়। আজ চেক পেলে ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে আজই টাকা তুলে নেব। তাছাড়া ব্যাঙ্কেও আছে কিছু। এ নিয়ে তোদের চিন্তা করতে হবে না।

তারপর বললেন, রুরু কোথায়?

সে অগ্নিকাকার বাড়িতে গেছে চান করে। অগ্নিকাকা ফোন করেছিলেন। সেখানেই খেয়ে ইউনিভার্সিটিতে যাবে।

কী হল আবার? সাত সকালে তোর অগ্নিকাকা শমন পাঠালেন।

কী সব কথা আছে নাকি রুরুর সঙ্গে।

ভালো লাগে না আমার।

কেন মা?

রুরুটার আত্মসম্মান জ্ঞান একটু কম আছে।

এ কথা বলছ কেন মা? অগ্নিকাকা কি আমাদের পর?

পর নয়তো কী? আর আপন হলেও তার কাছে থেকে আর কত রকমের উপকার নেওয়া যায়।

অগ্নিকাকা নাকি গাড়ি কিনেছেন?

হ্যাঁ। সেইজন্যেই তো ভাবনা। রুরুটা বড় হ্যাংলা হয়েছে। সে গাড়ি তারই ভোগে লাগবে হয়তো। তোর বাবার আত্মসম্মান জ্ঞান অত্যন্তই তীব্র ছিল। রুরুটা একেবারেই তার বাবার মতো হয়নি।

অগ্নিকাকাও তো আমাদের বাবারই মতো।

বিরক্তিমাখা মুখ তুলে অরা বলল, তুইও দেখি রুরুর মতো কথা বলছিস। তাঁর সঙ্গে কি আমার স্ত্রীর সম্পর্ক? একটা মানুষ নিজ স্বার্থপরায়ণ নয় বলেই কি আমরা চিরদিনই তাঁর উপর অত্যাচার করেই যাব?

তৃষা জবাব দিল না কোনো।

বলল, টাকাটা রাখো। না লাগলে পরে আমাকে না হয় ফেরত দিয়ো। তোমার হাত একদম খালি।

বললাম না, ভবিষ্যতের কথা ভাব।

তৃষা হেসে বলল, আমাদের বর্তমানটাই ভবিষ্যৎ মা। আমরা "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পীবেৎ"-এর যুগের ছেলেমেয়ে। আমাদের কাছে বর্তমানটাই সব।

টাকাটা তুই-ই রাখ। বললাম না যে, আমার দরকার নেই। মাইনে না পেলেও ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নেব।

৮

অগ্নিভর বন্ধু ব্রতীন আর নরেশ ওকে নিয়ে আইনক্স-এ সিনেমা দেখতে গেছিল। তারপর সেখান থেকে ক্যালকাটা ক্লাবে গিয়ে একটু হুইস্কি খেয়ে চাইনিজ খেয়ে ওরাই ওদের গাড়িতে করে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেল। কলকাতাতে ওর বেশি বন্ধুবান্ধব নেই। নাগপুর, রায়পুরে এবং বম্বেতে অনেক বন্ধুবান্ধব আছে। এই বয়সে আর নতুন বন্ধু পাতানোর ইচ্ছেও করে না। মাঝে মাঝে ওদেরই কারও গেস্ট হয়ে ক্যালকাটা সাউথ ক্লাবে বা টলি ক্লাবে টেনিস খেলে উইক-এন্ডে। ব্রতীন বিবাহিত তবে নরেশ ব্যাচেলার। যেদিন ব্রতীন বলছিল নরেশ আর অগ্নিভকে "A Bachelor is the souvenir of some woman who had found someone better than him at the last moment. ব্রতীন বিবাহিত হলেও তার বাড়িতে বিশেষ নিয়ে যায় না কারোকেই। তার স্ত্রী খুব বড়োলোকের মেয়ে। তার উপর দু-তিনটি শখের N.G.O-র সঙ্গে যুক্ত আছে। হাই-সোসাইটির মহিলা। তাঁর উদ্ধত হাবভাব, ইংরেজিতে কথা বলা ইত্যাদি পছন্দ করে না অগ্নি। অগ্নি, অরা, তার ছেলেমেয়ে এবং তাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের নিয়েই খুশি ছিল এবং থাকে। ওর ধারণা অগণ্য মানুষের সঙ্গে ভাসা ভাসা সম্পর্কর চাইতে অল্পকটি গভীর সম্পর্কর মধ্যেই একজন মানুষ সার্থক হয়।

তৃষার বিয়ে হলে গেলে ও কন্যা হারানোর শোক পাবে। রুরুকেও সে নিজের ছেলের মতোই দেখে এবং সবরকম প্রশ্রয় দেয়। রুরু কম্পারেটিভ লিটারেচারে এম এ করার পর স্কলারশিপের পরীক্ষাতে বসে স্টেটস বা কানাডাতে পড়বে এমন ইচ্ছে রাখে। কানাডার মনট্রিয়ালের ম্যাকগিল

ইউনিভার্সিটিতে যাবার ইচ্ছা খুব ওর। স্কলারশিপ না পেলেও অগ্নিভই ওকে পাঠাতে পারে কিন্তু সেটা রুরুর পক্ষে সম্মানজনক হবে না। বাবার পয়সায় যারা বিদেশে পড়তে যায় তাদের প্রতি রুরু এক গভীর বিদ্বেষ পোষণ করে। অগ্নিও তেমন ছেলেদের অনুকম্পার চোখেই দেখে। মাঝেমাঝেই রুরু তার বাংলা-ব্যান্ডের বন্ধুবান্ধব বা লিটল-ম্যাগ করা তরুণ কবির দলকে নিয়ে অগ্নিকাকার বাড়িতে চলে আসে। একটু বিয়ার-টিয়ার খায়। গান ও কবিতার চর্চা হয়। অগ্নি ওদের সঙ্গ পছন্দ করে। নানা কারণে ও এই তরুণ প্রজন্মে বিশ্বাসী। ওদের সঙ্গে মিশে ওর বয়স কমে যায় বলেই ধারণা হয় অগ্নির। বন্ধুদের বলে, লিটল ম্যাগ-এর জন্যে বিজ্ঞাপন এবং বাংলা ব্যান্ডের জন্যে স্পনসরশিপ জোগাড় করে দেয়। এই দু'দলের গোটা কুড়ি ছেলে রুরুর বন্ধুত্বের খাতিরে তাকে অগ্নিকাকা বলে এবং নিঃসংকোচে নানা অত্যাচার করে। সেই সব অত্যাচার সইতে অগ্নির ভালোও লাগে। তার যা সঞ্চয় আছে তার জোরে এই সব তরুণদের নানাভাবে প্রশ্রয় দেওয়ার সামর্থ্য সে রাখে। কত স্বপ্নমাখা থাকে ওদের চোখে। মাঝে মাঝে দল বেঁধে ওরা নানা জায়গাতে বেরিয়েও পড়ে। অগ্নিকাকাকেও সঙ্গে নিতে চায় কিন্তু অগ্নি মুখ্যত অরারই কারণে যায় না। অরা একা থাকবে, কখন কী দরকার হয়, অসুখবিসুখ হয়, এই সব ভেবেই থেকে যায়। সকলে মিলে একবার পুনেতে গেছিল হর্ষদের সঙ্গে কটি দিন কাটাতে। হর্ষদের ছুটি ছিল সেই সময়ে। পুনে থেকে ওরা মহাবালেশ্বর এবং পঞ্চগণিতেও গেছিল। ভারী ভালো ছেলে হর্ষদ। অত্যন্ত বিত্তবান মা-বাবার একমাত্র সন্তান। গান ভালোবাসে, সাহিত্যও। নিজেও একসময় উচ্চাঙ্গ সংগীত শিখত। ভীমসেন জোশীজিতো পুনেতেই থাকেন। তাঁরই এক শিষ্যর কাছে তালিম নেয় ও এখনও। মাঝে মাঝে এর তার বাড়িতে ছোটোখাটো জলসাতে গানও গায়। নাগপুরের বেঙ্গলি সোসাইটির প্রদীপ গাঙ্গুলিকে বলে নাগপুরেও একবার ওর গানের বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল অগ্নিভ। তৃষার খুবই ভাগ্য যে অমন ছেলের সঙ্গে সে "স্টেডি" যাচ্ছে। তবে বিয়ের কথা দুজনের কেউই বলে না। কবে যে বিয়ে করবে তা ওরাই জানে। বিয়ে করলে, তৃষা নাকি চাকরি ছেড়ে দেবে। ও বলে, সন্তান পালন আর কেরিয়ার একসঙ্গে হয় না। ছেলেমেয়ে হলে তাদের কুকুর বেড়ালের বাচ্চার মতো চাকর বা আয়ার কাছে ফেলে রেখে কাজ করা তার একেবারেই পছন্দ নয়।

ওদের পৃথিবীটা আর সত্যিই নেই। সব স্বামী-স্ত্রীই আজকাল কাজ করে। স্বামীর যতই রোজগার থাক স্ত্রীরা হাউসওয়াইফ হয়ে আর থাকতে রাজি নয় কেউই। মেয়েদের এই নবলব্ধ স্বাধীনতার স্বাদ তারা পুরোপুরিই উপভোগ করে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কও বদলে গেছে একেবারে। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই এই নীরব বিপ্লব ঘটে গেল। ভাবলে অবাক লাগে। অগ্নিভরা আর অরারা ক্রমশই অন্য গ্রহের জীব বলে গণ্য হচ্ছে। যদিও তারা দুজনেই অত্যন্তই আধুনিক তাদের মানসিকতাতে।

বাড়ি ফিরে গরম জলে চান করে টিভি-টা একটু খুলল। আজকালকার বাংলা বা হিন্দি সিরিয়াল ওর দেখতে ভালো লাগে না। অদ্ভুত ভঙ্গির নাচ আর তার সঙ্গে উদ্ভট গান অত্যন্তই বিরক্তি ঘটায়। ন্যাশানাল জিয়োগ্রাফিক চ্যানেল, ডিসকভরি চ্যানেল দেখে। কখনো কখনো স্টার মুভিজ বা এইচ.বি.ও। সেখানেও শুধু মারপিট, গোলাগুলি। সারা পৃথিবীর মানুষের রুচিই কেমন বিকৃত হয়ে যাচ্ছে। আগেকার দিনের মূল্যবোধ-সম্পন্ন ক্লাসিক ছবি আর দেখতে পায় না বলে মন খারাপ লাগে। ক্যাসেট বা সি.ডি. এনে দেখা যায়, কুঁড়েমি লাগে। নরেশ এবং ব্রতীনই মাঝে মাঝে ওকে নিয়ে নন্দনে যায় ভালো ছবি দেখতে। ফিল্ম ফেস্টিভ্যালেও যায়। তখন সময় করতে পারলে অরাও যায়। অরা মাসে দুমাসে একবার ব্রতীন আর নরেশকে অগ্নিভর সঙ্গে অরাদের যোধপুরের ফ্ল্যাটে নেমন্তন্ন করে খাওয়ায়ও তবে ব্রতীনের হাই-ব্রাওড স্ত্রী কখনো যাননি। নরেশের তো বউই নেই—সে একাই যায়। নরেশের বিয়ে হয়েছিল কিন্তু বিয়ের চারমাসের মধ্যেই ডিভোর্স হয়ে যায় অনেক বছর আছে।

তারপর থেকে মেয়েদের ব্যাপারে ওর একটা ভীতি জন্মে গেছে।

দিনে যা চিঠিপত্র আসে তা একটি রুপোর ট্রেতে করে রুপোর পেপার কাটারের সঙ্গে বিছানার পাশে রেখে দেয় চন্দন। অগ্নিভর ম্যান-ফ্রাইডে। কুক-কাম-ভ্যালে-কাম-এভরিথিং। নরেশ আর ব্রতীনকে তো বলেইছে, চন্দনকেও বলেছে একটি বয়স্ক ও বিশ্বাসী ড্রাইভার দেখতে। অগ্নি গাড়ি কেনাতে ও যেমন খুশি সেই গাড়ি যে রুরুবাবুদের বাড়িতে থাকবে এই খবরে সে একটু অখুশিও। অগ্নির ফ্ল্যাটে কোনো গারাজও নেই। ফ্ল্যাট কেনার সময়ে গাড়ি কেনার কথা ভাবেনি। গাড়িটা আপাতত পাশের পেট্রোল পাম্পে থাকে রাতের বেলা, দিনের বেলা অ্যাপার্টমেন্টের সামনেই পার্ক করানো থাকে।

চিঠির ট্রেতে তাকিয়েই একটি মোটা খাম দেখতে পেল। অরার হাতের লেখা। নাগপুরে থাকতে সপ্তাহে অন্তত একটি করে চিঠি পেত। অরার হাতের লেখাতেই তার চরিত্রের সারল্য ও দার্ঢ্য পুরোপুরিই প্রকাশিত হয়। তাই অরার হাতের লেখা চিনতে তার কোনো অসুবিধাই হল না। পিঠে একটা বালিশ দিয়ে আধশোয়া হয়ে শুয়ে পেপার কাটার দিয়ে চিঠিটা খুলে পড়তে লাগল।

চিঠিটি দু'তিন বার করে পড়ল অগ্নি। তারপর ঠিক করল কাল সকালে উঠেই এর উত্তর দেবে।

চিঠিটি পেয়ে ওর মধ্যে এক চাপা উত্তেজনা হল। বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লেও ঘুম এল না। বারোটা নাগাদ উঠে পড়ে পাশের লেখাপড়ার ঘরের টেবিলে গিয়ে বসে রাইটিং প্যাড খুলে উত্তর দিতে বসল।

আনওয়ার শাহ রোড

কলকাতা/বৃহস্পতিবার

কল্যাণীয়াসু অরা,

তোমার চিঠি আজ পেলাম।

আমি তো বাংলার শিক্ষিকা নই তাই তোমার মতো ভালো চিঠি আমি লিখতে পারি না, পারব না। ইংরেজিটা আমি বাংলার চেয়ে ভালো লিখি। এ সত্যটি গর্বের নয়, লজ্জারই, তবে সত্য, সত্যই।

আমি অত্যন্তই লজ্জিত। সেদিন যে আমার কী হয়ে গেছিল আমি নিজেই জানি না। ঘামে তোমার দুই বগলতলির কাছে ব্লাউজ ভিজে ছিল। তোমার দু-নাকের পাটাতে ঘাম ছিল। এত বছর পরে যে বাসনা আমার মধ্যে সুপ্ত ছিল তা হঠাৎ বিস্ফোরিত হয়ে উঠেছিল। ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরিতে অগ্ন্যুৎপাত শুরু করেছিল। আমার এতদিনের সংযমের বাঁধ ভেঙে গেছিল। এই লজ্জা আমার রাখার জায়গা নেই।

আসলে, তোমার বিয়ের দিন সালংকারা সুসজ্জিতা তুমি যখন তোমাদের হাজারিবাগের বাড়ির সাদা মার্বেলের মস্ত হলঘর পেরিয়ে ঝাড়-লণ্ঠনের আলোর মধ্যে দিয়ে হেঁটে বাসরঘরের দিকে যাচ্ছিলে, সেই মুহূর্ত থেকেই তোমাকে আমি ভালোবেসে এসেছি। তোমাকে দেখে আমার বুকটা হু হু করে উঠেছিল। মনে হয়েছিল যা হবার তা হয়ে গেছে এ জন্মের মতো। মনে হয়েছিল, তুমি আমারই জন্যে এ পৃথিবীতে এসেছিলে। তোমার আর কোনো গন্তব্য নেই। তোমাকে নইলে আমার জীবন বৃথা। অথচ তখন তুমি আমার বন্ধুর বিবাহিত স্ত্রী।

আশিস তার আগে আমার বন্ধু ছিল ঠিকই কিন্তু শুধু তোমারই কারণে আমি তাকে আমার প্রিয়তম বন্ধু করেছিলাম।

তোমাকে যখন দেখতে গেছিলাম তখনও তোমাকে খুব ভালো লেগেছিল কিন্তু বিয়ের রাতে লাল বেনারসি পরা, জড়োয়াতে মোড়া তোমার রূপ আমাকে বিদ্ধ করেছিল। শুধুমাত্র রূপেই কেউ

অমন মন কাড়তে পারে না। তোমার হাঁটা, মানে ঋতি, তোমার কথা বলার ধরন, তোমার হাসি, তোমার পায়ের পাতার গড়ন থেকে হাতের আঙুলের গড়ন, তোমার চোখ, চিবুক, তোমার গ্রীবা, তোমার পাতলা দুটি ঠোঁট আমাকে কেন এমনভাবে আলোড়িত করেছিল তা বলতে পারব না।

সত্যিই বলছি যে তোমাদের বিয়ের পরে বেশ কিছুদিন আশিসকে আমার খুন করতে ইচ্ছে করত। ছেলেমানুষি ইচ্ছে। অথচ সেই আশিসই যখন অ্যাকসিডেন্টে মারা গেল তখন তোমার ও তোমার ছেলেমেয়েদের সব দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলাম। সেদিন আমি হৃদয়ে বুঝেছিলাম যে ভালোবাসার সব মহত্ত্ব ভালোবাসার জনকে সুখী দেখারই মধ্যে। নিজের বুকে তাকে টেনে নিয়ে পিষ্ট করার মধ্যে নয়। সেদিন, আমি আসলে যা তার চেয়ে অনেক বড়ো হয়ে গেছিলাম। কোনো মানুষই নিজের মহত্ত্ব অথবা নীচত্বর মাপটা প্রথম থেকেই জানে না, হঠাৎ কোনো অভিঘাতে তা বিদ্যুৎ চমকের মতো তার সামনে উদ্ভাসিত হয়।

আমি অতি সাধারণ একজন মানুষ। তুমিই আমাকে দেবত্ব দান করেছ। নিজের অজান্তেই তোমার সংস্পর্শে এসে আমি আমার নিজের চেয়ে অনেক বড়ো হয়ে গেছি। তোমার চাবুক খাওয়ার আমার দরকার ছিল।

আমাদের উপনিষদে আছে ঃ

"আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনম্ সামান্যমেতাৎ পশুভিঃ নরানাঃ
ধর্মহি তেষাম অধিকো বিশেযোঃ ধর্মেনাহীনা পশুভিসমানাঃ।"

মানে, আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন মানুষেরও আছে পশুরও আছে কিন্তু যে মানুষ ধর্মরহিত সে পশুরই সমান। এই ধর্ম কিন্তু হিন্দু মুসলমান লিগের ধর্ম নয় এই ধর্ম সকলের। এ ধর্ম মনুষ্যধর্ম।

আমার পশুত্ব তুমি ক্ষমা করো। আর যার সঙ্গে যাই করি না কেন তোমার সঙ্গে এ জীবনে মানুষের মতোই ব্যবহার করব। দেবতা না হয়েও দেবতা সেজে থাকার চেষ্টা করব, দেবত্বর মূল্য দিতে নিজেকে কোনোরকম কষ্ট দিতেই দ্বিধা করব না।

তবে আমার কঠিনতম পরীক্ষার দিন শেষ হয়ে গেছে। আমার দুঃখ রাত পেরিয়ে এসেছি। গত দু-যুগ মনে মনে তোমাকে চেয়ে যে কী নিদারুণ কষ্ট ভোগ করেছি তা আমিই জানি আর ঈশ্বরই জানেন। আর্নেস্ট হেমিংওয়ে বলতেন "A man can be destroyed but he cannot be defeated". আমি ধ্বংস হয়ে গেছি তোমাকে কামনা করে। কিন্তু হারিনি।

তবে একথা ঠিক যে সে রাতে হারার কাছাকাছি এসেছিলাম কিন্তু সাধারণ্যের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া থেকে সেদিন তুমিই আমাকে বাঁচিয়েছ। তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ।

'আমি নিশিদিন তোমায় ভালোবাসি তুমি অবসর মতো বাসিও।
আমি নিশিদিন হেথায় বসে আছি তুমি অবসর মতো আসিও।'

অনেকদিন হয়ে গেছে এই গানটা তোমার গলাতে শুনিনি। একদিন শুনিয়ো অরা।

—ইতি তোমার কুলুঙ্গির উপোসী দেবতা
অগ্নিভ

৯

সেদিন অরা স্কুলের পিকনিক-এ যাবে বলে বাড়ি থেকে সকাল আটটাতে বেরিয়েছিল। যাবে, বাদুর এক বাগানবাড়িতে। সকলে মিলে বাসে করে যাবে স্কুল থেকে নটার সময়ে। তৃষা অফিসের

কাজে বম্বে গেছে। সেখান থেকে উইকএন্ডে হর্ষদের কাছে যাবে পুনেতে। হর্ষদ পুনে ক্রিকেট ক্লাবে ঘর ঠিক করে রেখেছে ওর জন্যে।

স্কুলে যখন টিচাররা ও মেয়েরা বেরোবার তোড়জোর করছে এমন সময়ে মীনাক্ষীর হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক হল। ভূগোলের টিচার মীনাক্ষী বিবাহিতা। একটি আট বছরের ছেলে আছে। স্বামী সেলস ট্যাক্স অফিসার। ওর বয়স হবে তেতাল্লিশ মতো। খুব হাসিখুশি মেয়ে। তবে দিন তিন-চার হল খুবই মনমরা থাকত। পাপিয়া বলেছিল যে মীনাক্ষীদের পাড়ার কার কাছে শুনেছে যে তার স্বামী অফিসেরই একজন আপার ডিভিশন ক্লার্ক-এর সঙ্গে অ্যাফেয়ার চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ধরা পড়ে গেছেন চারদিন হল। ব্যাপারটা শুধু পাড়া প্রতিবেশীই নয়, অফিসের উপর মহল অবধি পৌঁছেছে। সেজন্যেই নাকি মীনাক্ষী অমন অফফ্-মুড-এ থাকত এই কদিন। সঙ্গে ওর ছেলেকেও এনেছিল পিকনিকে নিয়ে যাবে বলে। ওদের কো-এড স্কুল, কোনো অসুবিধে নেই।

অ্যাটাক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্স ডেকে ওকে এস.এস.কে.এম-এ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ডাক্তাররা বলেছেন : ব্রট ডেড। সেই মর্মে ডেথ সার্টিফিকেটও দিয়েছেন। ওর স্বামীকে অফিসে এবং ওর শ্বশুরবাড়িতেও খবর দেওয়া হয়েছে। এখনও ডেডবডি নিয়ে যেতে কেউই আসেনি। পিকনিক বাতিল করে ছেলেমেয়েদের বাড়ি চলে যেতে বলা হয়েছে। মীনাক্ষীর ছেলেটা পাগলের মতো করছে। নীচু ক্লাসের ছেলেমেয়েদের বাড়িতে ফোন করে দেওয়া হয়েছে যাতে বাড়ি থেকে কেউ এসে ওদের নিয়ে যান। টিচারেরা, যাঁরা পিকনিকে যাবেন বলে এসেছিলেন, তাঁরা সকলেই স্কুলেই রয়ে গেছেন। সকলেই মীনাক্ষীর গুণপনা নিয়ে আলোচনা করছেন। ভারী প্রাণবন্ত হাসিখুশি মেয়ে ছিল মীনাক্ষী। যাঁরা ওকে দেখতে পারতেন না এবং ওর সম্বন্ধে ঈর্ষাকাতর ছিলেন নানাকারণে, তাঁরাও এখন ওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। মৃত্যু এসে মৃত মানুষের সব দোষ মুছে দেয়।

মীনাক্ষীর বাড়ি থেকে স্বামী, তাঁর অফিসের সহকর্মীরা, আত্মীয়স্বজন সকলে এসে বডি নিয়ে যেতে যেতে প্রায় একটা বাজল। টিচাররা এবং উঁচু ক্লাসের ছেলেমেয়েরা একে একে ফিরে যেতে লাগলেন ও লাগল। একটা মিনি ধরে অরা যখন বাড়ি পৌঁছলো তখন আড়াইটে বাজল। মনটা বড়ই খারাপ হয়ে গেছে। ঠিক করলেন, বাড়ি গিয়ে বিস্পতিকে বলে এক কাপ চা খেয়েই শুয়ে পড়বেন। খিদে তো নেইই কিছু খাওয়ার প্রশ্নও ওঠে না মনের এই অবস্থাতে। হেমিংওয়ের For whom the Bells Tolls-এর মুখবন্ধে আছে।

"For whom the bell Tolls :
The bell tolls for Thee."

প্রত্যেক মৃত্যুর মধ্যেই অরা নিজের মৃত্যুকে উপলব্ধি করে।

ওর কাছে দরজার চাবি থাকে তবে বিস্পতি আর রুরু বাড়িতে আছে বলে আজ আর চাবি নিয়ে যায়নি। যখন বাড়ি ফেরার কথা ছিল তখন রুরু কোথাও বেরুলেও বিস্পতি থাকবেই।

ফ্ল্যাটে পৌঁছে বেল দিতেই বেলটা কয়েকবার বাজলেও দরজা কেউই খুলল না। অবাক হলেন অরা। বেশ কিছুক্ষণ পরে দরজা খুলল এসে রুরু। রুরুর মুখ চোখ কেমন অপ্রকৃতিস্থ দেখাল। উদ্বিগ্ন হল অরা। দরজাটা খুলে দিয়েই প্রায় দৌড়ে গিয়ে নিজের ঘরের দরজাটা বন্ধ করে অরার কাছে ফিরে এসে যেন হতাশ গলায় বলল, কী হল? তুমি পিকনিকে গেলে না?

না।

কেন? কী হল?

একজন অল্পবয়সি টিচারের হার্ট অ্যাটাক হয়েছে স্কুলেই।

কেমন আছেন?

নেই।

বলেই, অরা জিগগেস করল, বিস্পতি কোথায়? ঘুমোচ্ছে? তোর খাওয়া হয়ে গেছে?

হ্যাঁ তা হয়েছে।

বিস্পতিকে একটু ডেকে দে ত!

বিস্পতিদি খেয়ে সিনেমায় গেছে।

সিনেমাতে?

অবাক হয়ে বলল, অরা।

তারপর বলল তিনবছর কাজ করছে কোনোদিন তো সিনেমাতে যায়নি? কোন হল-এ গেল?

প্রিয়াতে।

প্রিয়া? সে তো অনেক দূরে। ওতো টিভির সিনেমা ছাড়া আর কোনো সিনেমা দেখে না। চিনে যেতে পারবে? টিকিটই বা কিনে দিল কে?

আমিই কিনে দিয়েছি গত রাতে ওকে। আমি বাসেও চড়িয়ে দিয়ে এসেছি। বুঝিয়ে দিয়েছি কী করে আসবে। ফোন নাম্বারও দিয়ে দিয়েছি। আসতে না পারলে ফোন করলে আমি গিয়ে নিয়ে আসব।

এমন সময়ে রুরুর ঘরের দরজা খুলে ভেতর থেকে চুমকি বেরিয়ে এল।

তুই? কখন এসেছিস?

অবাক হয়ে বলল, অরা। ও একটা ষড়যন্ত্রর গন্ধ পাচ্ছিল। বেশ তীব্র গন্ধ!

একটু আগে।

চুমকি বলল?

খেয়েছিস কিছু?

আমি খেয়ে এসেছি মাসিমা।

কী করছিলি তোরা?

বিরক্তির গলায় বলল অরা। তার ও তৃষার অনুপস্থিতিতে বিস্পতিকে সিনেমা দেখতে পাঠিয়ে ওরা দুজনে যুক্তি করেই ফাঁকা ফ্ল্যাটে যে কেন এসেছে তা বুঝতে দেরি হল না অরার। মীনাক্ষীর মৃত্যুতে এমনিতেই কেঁদেছিল স্কুলে এখন এই অঘটনে তার আবারও কান্না পেতে লাগল। ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছিল অরার।

অরা রুরুকে কিছু না বলে চুমকিকেই বলল, তুই রুরুর ঘরে কী করছিলি? বসার ঘরে টিভি না দেখে বা গানটান না শুনে?

চুমকি কেঁদে ফেলল হাতে মুখ ঢেকে। তারপর বলল, কিছু করিনি মাসিমা। তবে আপনি এই সময়ে ফিরে না এলে কী ঘটত জানি না।

কী হয়েছে, মানে তোরা কী করছিলি? আমাকে সত্যি কথা বল চুমকি। নইলে আমি তোর মাকে এখুনি ফোন করব।

অনেকদিন থেকে রুরু দেখতে চাইছিল।

কী দেখতে চাইছিল?

আমাকে।

—মানে? বুঝলাম না।

মানে, আঙ্গাপাঙ্গা আমাকে। বলেছিল, শুধু একবার দেখতে চায়। কোনোদিনও দেখেনি। কারোকেই দেখেনি।

আঙ্গাপাঙ্গা মানে?

অবাক হয়ে শুধোলেন অরা।

মানে, আমার Nakedness। ও না কি কখনো কোনো মেয়েকে Naked দেখেনি।

তুই কী করলি?

আমি কী করব? ওতো নিজেই আমাকে খাটে শুইয়ে জোর করে আমাকে আনড্রেস করে দেখল।

তারপর কী হল?

কিছুই হয়নি।

অরা Awestruck হয়ে গেল।

ঠিক সেই সময়েই আপনি বেল বাজালেন।

রুরুর কাছে কনট্রাসেপটিভও ছিল? কনডোম-টনডোম?

তা আমি জানি না মাসিমা। বোধহয় ছিল না। ও সত্যিই আমাকে কিন্তু শুধু দেখতেই চেয়েছিল। ও খুবই ভদ্র ছেলে।

তা তো বুঝতেই পারছি।

আর ওর কথাতেই তুমি ওকে দেখতে দিলে?

বহুদিন ধরে কাকুতি-মিনতি করছিল মাসিমা। বিশ্বাস করুন। তবে ওর মনে কোনো কু-মতলব ছিল না।

হ্যাঁ। তুমি পুরুষদের কতটুকু জানো?

তারপরে প্রায় অপ্রকৃতিস্থ গলাতে বলল, সংযমী হতে হয় মেয়েদেরই। তুমি তো ছোট মেয়ে নও চুমকি। কুড়ি বছর বয়স হয়ে গেছে। দেখতে চাইল বলেই রীতিমতো প্ল্যান করে ফাঁকা বাড়িতে মেয়েদের Modesty—যা সবচেয়ে মূল্যবান তাই তুমি বিকিয়ে দিতে এসেছিলে? তোমার মা জানলে তাঁরও তো হার্ট-অ্যাটাক হবে। আমারও হতে পারে।

—বিশ্বাস করুন মাসিমা। ও আমাকে শুধু আঙ্গাপাঙ্গাই দেখেছে। আর কিছুই করেনি।

উদ্ভট একটা ওয়ার্ড! আঙ্গাপাঙ্গা। কোন ভাষার শব্দ এটা?

কোনো ভাষার নয়। আমার মায়ের কাছেই শোনা। আমাদের ছোটবেলাতে মা চান করাবার সময়ে বলতেন, আঙ্গাপাঙ্গা হও, চান করাব তোমাকে।

অরার মুখে এসে গেছিল কথাটা। ও দৃঢ় গলায় চুমকিকে বলতে যাচ্ছিল, তুমি এ বাড়িতে আর কখনো আসবে না। কিন্তু বলতে গিয়েও বললেন না। দোষ তো চুমকির নয়, দোষ তো রুরুরই। উনিশ-কুড়ি বছরের ছেলেমেয়ে ওরা কি এখনও দেবশিশু? আঙ্গাপাঙ্গা দেখতে ও দেখাতে এমন তীব্র ইচ্ছা ওদের? শুধুই দেখতে?

কারোকেই কিছু না বলে অরা ঘরে গিয়ে শব্দ করে দরজা বন্ধ করলেন বিরক্তির তীব্রতম প্রকাশ ঘটিয়ে। তারপর দরজাটা খুলে চুমকিকে বললেন, তুমি রুরুকে আঙ্গাপাঙ্গা দেখোনি?

না মাসিমা।

কেন? তোমার ইচ্ছে করেনি?

না মাসিমা। আমাদের বাড়ির পাশের গলিতে রিক্সাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, কুলি এরা সব শুশু করে। আমি ছোটোবেলা থেকেই অনেক দেখেছি। আমার কোনো উৎসাহ ছিল না। বিচ্ছিরি দেখতে।

—কথা শুনে হাসবেন না কাঁদবেন বুঝতে না পেরে দুটো পাঁচ মিলিগ্রামের অ্যালজোলাম খেয়ে অরা জোরে পাখা চালিয়ে শুয়ে পড়লেন ল্যান্ড লাইনের এক্সটেনশান রিসিভারটাকে নামিয়ে রেখে।

শুয়ে পড়ার আগে রুরুকে বললেন, দরজার চাবি নিয়ে যাও, চুমকিকে বাড়ি পৌঁছে, প্রিয়া সিনেমার

সামনে দাঁড়িয়ে থেকো। বিস্পতি গ্রামের মেয়ে, হারিয়ে গেলে পুলিশ কেস হবে। তারপর বলল, আমার পরম সৌভাগ্য যে তুমি বিস্পতির আঙ্গাপাঙ্গা দেখতে চাওনি। পুলিশে বলে দিলে তোমার জেল হয়ে যেত। মুখে চুনকালি পড়ত আমার। আর শোনো, আমি নিজে এই ঘটনার কথা তোমার অগ্নিকাকাকে বলব না। কাল তুমি গিয়ে নিজে বলবে। তারপরে তিনি যা শাস্তি দেন তা দেবেন। বিস্পতিকে নিয়ে ফিরলে ওকে বোলো আমাকে আটটার সময়ে এক কাপ চা দিয়ে ঘুম থেকে তুলবে। চান করে আমি আবার ঘুমোব। রাতে খাব না কিছু। তৃষা পুনে থেকে ফোন করতে পারে। করলে বলবে যে, কাল কথা বলব।

অরা দরজাটা বন্ধ করল কিন্তু লক করল না। অরা শুয়ে শুয়ে ভাবছিল অগ্নিও হয়তো সেইদিন তাকে শুধু আঙ্গাপাঙ্গাই দেখতে চেয়েছিল।

এই পুরুষরা সত্যিই এক এক আশ্চর্য জাত। সত্যি! ব্যাপারটাকে ঠিক কী ভাবে নেওয়া যাবে, কতখানি প্রাধান্য একে দিতে হবে এ নিয়ে অগ্নির সঙ্গে পরে ঠান্ডা মাথাতে আলোচনা করা যাবে। ছেলেটা কি তার একেবারেই বয়ে গেল এই বয়সে! রুরু?

আঙ্গাপাঙ্গা!

শব্দটা মনে করেই আবার হাসি পেল অরার। তারপরই ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করল। একা ঘরে হেসেও ফেললেন একবার। যাই হোক, তার অসময়ে বাড়ি ফিরে আসাতে একটা মস্ত দুর্যোগ কেটে গেল তার জীবনের। ঈশ্বর যাই-ই করেন তাই মঙ্গলের জন্যে। মীনাক্ষীর অসময়ের মৃত্যুর শোকটাকে তার ব্যক্তিজীবনের এই কেটে যাওয়া দুর্যোগ যেন অনেকখানি লাঘব করে দিল।

১০

পুনের ক্রিকেট ক্লাবটা ছোটো কিন্তু ভারী সুন্দর। ক্যালকাটা ক্রিকেট অ্যান্ড ফুটবল ক্লাব-এর সঙ্গে অনেক মিল আছে। তবে সি.সি.এফ.সি ক্লাবে কোনো গেস্টরুমস নেই। পুনের ক্রিকেট ক্লাব-এ আছে।

তৃষা এর আগে কখনও পুনেতে আসেনি। এবারেও এসেছে মাত্র দু-দিন একরাত্রির জন্যে। হর্যদ ব্যাঙ্কের অফিসার। তার পক্ষেও ছুটি পাওয়া খুব মুশকিল। বলছিল, ছুটি ম্যানেজ করতে পারলে ওকে নিয়ে মহাবালেশ্বর এবং পঞ্চগণি ঘুরে আসত। তৃষা বম্বে থেকে ট্রেনেই এসেছে পুনেতে। যদি হাতে যথেষ্ট সময় থাকত তবে মাথেরান-এ স্টপ ওভার আসতে পারত। এখন পুনে থেকে কলকাতা থ্রু ট্রেইন হয়ে গেছে। সেই ট্রেনেই ফিরে যাবে আগামীকাল। কিন্তু বম্বে-কলকাতা প্লেনের টিকিটও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে ও। তবে এত শর্ট নোটিসে কনফার্মড সিট পাবে না হয়তো। তাছাড়া, তাকে মঙ্গলবার অফিসে যেতেই হবে।

সকালে হর্যদ ওকে গাড়ি ভাড়া করে শিবাজীর একটা দুর্গ দেখাতে নিয়ে গেছিল। গাড়ি, ও অফিস থেকেই পেতে পারত কিন্তু ট্রাভেলিং অ্যালাউন্স থেকে বেশ কিছু বাঁচিয়ে নেয়। যখন দরকার হয় তখন ট্রাভেল এজেন্সি থেকে গাড়ি নিয়ে নেয়। খাদাকভাসালার পাশ দিয়ে পথ। হ্রদ আছে ওখানে একটা। তৃষার এক মামা কমপিটিটিভ পরীক্ষা পাশ করে আর্মির কমিশানড অফিসার হবার জন্যে এই খাদাকভাসালার মিলিটারি আকাদেমিতে ট্রেনিং নিয়ে আর্মির কমিশানড অফিসার হয়েছিলেন। কাশ্মীরে সেই কাকা মারা গেছিলেন উগ্রপন্থীদের গুলিতে বছর পনেরো আগে। কাকা বিয়ে করেনি।

হর্যদ বলছিল, দুর্গর উপরে তৃষাকে নিয়ে কিছুটা চড়ে যে, ভাবতে পারো একজন মানুষ এক জীবনে এতগুলি দুর্গম দুর্গ বানিয়েছিলেন, আজ দাক্ষিণাত্য বিজয় করছেন, কাল দিল্লির দরবারে বন্দি

হয়ে যাচ্ছেন। আর এই ক্রিস-ক্রসিং করছেন জেট প্লেন-এ চড়ে নয়, স্রেফ ঘোড়ায় চড়ে। তখনকার দিনের মানুষদের শৌর্যবীর্যর কথা ভাবলেও নিজেদের লিলিপুট বলে মনে হয়। তাই নয়? তাঁরা যেসব অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতেন তা আমরা হয়তো তুলতেই পারব না। অন্য এক সময় ছিল সে সব।

দুর্গের নিচেই ভালো ক্যানটিন আছে। মারাঠি খাবার পাওয়া যায়। সেখানেই কাড়হি, বেসনের রুটি, পোহা (মানে চিঁড়ে) এসব দিয়ে গাছতলাতে বসে জমিয়ে লাঞ্চ করল ওরা দুজন। হর্ষদ অনেক ছবিও তুলল তৃষার। তৃষা বলল, ব্যাঙ্গালোরে আমার একটা চাকরির কথা হচ্ছে। যদি হয়, তাহলে ডিসেম্বর নাগাদ হবে। ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসেবে জয়েন করতে হবে।

হর্ষদ বলল, আরে! আগে বলবে তো। আমি তো এদিকে তোমারই জন্যে কলকাতায় ট্রান্সফার চাইছিলাম। তোমাকে যদি ব্যাঙ্গালোরেই আসতে হয় তবে আমিও ব্যাঙ্গালোর চাইব। তাহলে বিয়ের কথাটাও ভাবা যাবে। মা ইন্টারনেটে রোজই মনে করান।

মাসিমা আমাকেও বলেন মাঝে মাঝেই। গত সপ্তাহেও তো গেছিলাম। কলকাতাতে তোমাদের বাড়িতে।

—তুমি কী বল?

—আমি কনভিনিয়েন্টলি তোমার ঘাড়ে দোষ চাপাই। তৃষা বলল।

—আর আমিও তোমার ঘাড়ে। তবে ব্যাপারটাকে আর বেশিদিন ঠেকিয়ে রাখা যাবে না মনে হচ্ছে। আগে তো তিন-চার বছর হানিমুন করে নেব। তারপর ফ্যামিলির কথা ভাবা যাবে। আসলে তুমি তোমার মা-বাবাকে এবং আমি আমার ভাবী শ্বশুর-শাশুড়িকে যতই ভালোবাসি বা পছন্দ করি না কেন আজকাল সকলেই আলাদা থাকতে চায়। আলাদা কিচেন, অপার স্বাধীনতা, বন্ধুদের আসা-যাওয়া, পার্টি...। আসলে এখন কোনো আধুনিক দম্পতিই বাবা-মাকে নিয়ে জড়িয়ে-মড়িয়ে থাকতে চায় না।

আমাব কথা আলাদা। আমার ত শুধুই মা—আর মা যে আমাদের অনেক কষ্ট করে মানুষ করেছেন।

তোমার অগ্নিকাকা আছেন মাকে দেখার জন্যে। উনি ত আর একেবারে একা হয়ে যাবেন না।

তা হলেও। অগ্নিকাকা ত বাবার অভাব পূরণ করতে পারবেন না!

তারপর বলল, তিন-চার বছর হানিমুন করতে করতে ততদিনে তোমার মাইনেও নিশ্চয়ই অনেক বেড়ে যাবে। আমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে তখন ভালো মা হয়ে বাচ্চার দেখাশোনা করব।

—হর্ষদ বলল, সুইটি পাঈ। দ্যাটস লাইক আ গুড গার্ল! আমারও তাই-ই ইচ্ছে।

খাওয়া-দাওয়ার পরে একটা গাছতলাতে বসে হর্ষদ বলল, একটা গান শোনাও। কতদিন তোমার গান শুনিনা।

আমি কিই বা গান জানি। গান জানেন মা আর অগ্নিকাকা। সেদিন ভ্যালেন্টাইনস ডে-তে কত যে গান হল। মাকে আমাদের ছেলেবেলা থেকে অর্গান বাজিয়ে গান গাইতে শুনেছি। গানের আবহতেই বড় হয়ে উঠেছি আমরা। রবীন্দ্রসংগীত আর অতুলপ্রসাদের গানের আবহে। দিদিমাও খুবই ভালো ব্রহ্মসংগীত গাইতেন। অগ্নিকাকাও ভালো গান। কিন্তু পুরাতনী গান। নিধুবাবু, শ্রীধর কথক, দাশরথী রায়, গোপাল ওড়িয়া এঁদের গানও দারুণ গান। কী সব টপ্পারে বাবা। আমরা গাইতে গেলে দাঁত খুলে যাবে। আমাদের রুরুও কিন্তু বেশ ভালো গায়। তবে আজকাল বাংলা ব্যান্ডের গান নিয়েই বেশি মেতেছে।

এবারে গানটি গাও।

কী গান গাইব?

"তুমি আমায় ডেকেছিলে ছুটির নিমন্ত্রণে, এখন ছুটি ফুরিয়ে গেছে কখন অন্যমনে।"

বেশ। বলে, গানটি গাইল তৃষা।

—গান শেষ হলে হর্ষদ বলল, বাঃ। ভারী ভালো লাগল। আমরা যখন হানিমুনে যাব তখন কোন কোন গান শোনাবে আমাকে তার একটা লিস্ট বানিয়ে রেখো।

—কিছু না বলে, হাসল তৃষা।

তারপর বলল, গ্লোব নার্সারি ভ্যালেন্টাইনস ডে-তে ফুলগুলো কিন্তু ভারী সুন্দর দিয়েছিল। ইয়ালো রোজেস।

পুনেতে থাকাকালীন ওরা অন্য অনেক কিছুও করতে পারত কিন্তু করেনি। তৃষা সবসময়ই বলে, বাকি থাক কিছু। এখন থাক। সবকিছুই এখনই হয়ে গেলে ভবিষ্যতের স্বপ্নটাই মাঠে মারা যাবে। বিয়ে হোক। তারপরে সব হবে। তাড়া কীসের? সংযমী জীবনযাপনের মধ্যে যে গভীর আনন্দ তা আপাত-কষ্টেরও বটে। তবে যারা এই কষ্টটা স্বীকার করে নেয় স্বেচ্ছাতে তারাই ভবিষ্যতে গভীরতর আনন্দর শরিক হতে পারে।

১১

গাড়িটাকে অরাদের বাড়িতেই পাঠিয়ে দিয়েছে অগ্নিভ। রুরুকে ডেকে কয়েকদিন আগেই বলে দিয়েছিল। আন্ডার গ্রাউন্ড গারাজটা ধুয়েমুছে রাখতে। একজন ড্রাইভারও ঠিক করে ফেলেছে অগ্নি। সে সকালে আসে। তৃষার অফিস বন্দেল রোডে। তৃষাকে সেখানে নামিয়ে রুরুকে নিয়ে যাদবপুরে যায় ইউনিভার্সিটিতে। তারপর আবার চলে যায় তৃষার কাছে। তৃষার ঘুরে ঘুরে কাজ। অফিস থেকে মোটা ট্রান্সপোর্ট অ্যালাউন্স পায় তৃষা। তা থেকে অনেক বেঁচে যায়। তৃষা বলেছিল, অগ্নিকাকা, পেট্রোলের খরচ এবং সার্ভিসিং-টার্ভিসিং-এর খরচ আমিই দেব।

অগ্নি বলেছিল, একদম নয়। তোর বাবা থাকলে কি তোর কাছ থেকে ওসব নিত? একদম বাজে কথা বলবি না।

ওরা ভাইবোনেই বেশি ব্যবহার করে গাড়ি। অরা কিন্তু একদিনও গাড়ি ব্যবহার করে না। মিনিতেই স্কুলে যায় মিনিতেই ফিরে আসে।

এ নিয়ে অভিযোগ করেছিল অগ্নি কিন্তু অরা কান দেয়নি। বলেছিল, তোমার কাছে আর ঋণ বাড়াতে চাই না। এমনিতেই অনেকই ঋণী হয়ে আছি। বলেছিল যে, অভ্যেস খারাপ করতে চাই না। প্রয়োজন বাড়ালেই বাড়ে। আজকালকার ছেলেমেয়েদের দেখো না? তাদের কী যে প্রয়োজন নেই তাই ভেবে পাই না আমি। সবকিছুই তাদের চাই। ওয়েস্ট সাইড আর প্যান্টালুনে গিয়ে যে দামে ওরা জামাকাপড় কেনে তাতে আমার সারা বছরের শাড়ি হয়ে যায়। তৃষা হাজার পঁচিশ মতো মাইনে পায়। কিন্তু ওর এক-একটা সালোয়ার কামিজের যা দাম তা শুনলে মাথা ঘুরে যায়। মিথ্যে প্রয়োজনের ভারে ওরা একদিন চাপা পড়ে মারা যাবে। এখন বুঝছে না।

ঠিকই বলেছ তুমি। আর তেমনই হয়েছে আজকালকার ব্যাঙ্কগুলো। জোর করেই ধার দেবে। কত যে ফোন আসে। বলে দু লাখ টাকা দিচ্ছি, নিন না। কোনো সিকিওরিটি, ওয়ারান্টি কিছুই লাগবে না। নমিনাল ইন্টারেস্ট।

তারপর অরা বলল, আমার বাবা শিখিয়েছিলেন, থাকলে খাবে, না থাকলে না খেয়ে থাকবে কিন্তু ধার নেবে না কারও কাছ থেকে। এদের পুরো প্রজন্মটাই অধমর্ণর প্রজন্ম হয়ে গেল। নিত্য-

নতুন মোবাইল, সিডি প্লেয়ার, ডি ভি ডি প্লেয়ার, হ্যান্ডিক্যাম—কত্ত যে প্রয়োজন এদের। নীরব দর্শক হয়ে দেখে যাই। ওরা ওরা, আমরা আমরা। তুমি গাড়ি কিনেছ, তুমি অ্যাফোর্ড করতে পারো। আমি পারি না, তাই চড়ি না।

অগ্নি শুধু শনিবারে গাড়িটা নেয়। রবিবার ড্রাইভারের ছুটি। অন্য সবদিন গাড়ি ছেলেমেয়েদেরই কাছে থাকে।

এক শনিবার সকালে অগ্নির ফোন এল। শনিবার অরার স্কুল ছুটি থাকে। অগ্নি বলল, আজ এগারোটাতে গাড়িটা নিয়ে আমার কাছে এসো। কচুর শাক আর ইলিশমাছ আনিয়েছি। চন্দন এসব রাঁধতে পারে না। তুমি এসে রাঁধো। ইলিশমাছের মাথা দিয়ে কচুর শাক রাঁধবে, শর্ষে-ইলিশ, ইলিশমাছের মাথা দিয়ে টক। রাতের বেলা তৃষা রুরু আর অপালাকেও আসতে বলো। ওরাও খাবে, গানটান হবে। অনেকদিন জমায়েৎ হয় না। দুপুরে আমি আর তুমি একা খাব। একটু একা থাকব। গল্প করব। আসবে প্লিজ?

রাতে অপালাকে বলব আর ঘোষ সাহেবকে বলব না?

অরা একটু ভেবে বলল। সরি সরি খুব ভুল হয়ে গেছে। অবশ্যই বলবে। তুমি ফোন করে ওদের বললেই কি ভালো দেখাবে না? ঠিক আছে।

তারপর বলল, ঠিকই বলেছ। তাই-ই বলব।

একটু চুপ করে থেকে অরা বলল, রুরু তোমার কাছে গেছিল? কিছু কি বলেছে?

—হ্যাঁ। বলছিল বটে। তবে আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।

তবে খুবই রিপেট্যান্ট মনে হল। কোনো অন্যায় করেছে কি?

—অন্যায় অবশ্যই করেছে। খুব প্ল্যান করে করেছে। রীতিমতো ক্রিমিন্যালের মতো প্ল্যান করে। আমি গিয়ে বলব। ওকে তুমি একটু শাসন কোরো। ব্যাপারটা আমার পক্ষে একটু ডেলিকেট। তুমি বললেই ভালো হয়।

এসো। শুনব। আমি কি আজই অপালাকে বলব নিজে ফোন করে? শনিবার ঘোষ সাহেব, মানে ব্যারিস্টারদের তো অনেকই কাজ। অপালার স্বামীও কি আসতে পারবেন?

—শুক্রবার সন্ধেবেলা হলে হয়তো পারতেন।

অরা বলল। কোনো ব্যারিস্টারই শুক্রবার সন্ধেবেলা কাজ করেন না।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ। তুমি জানতে না।

—তাহলে শুক্রবারই করা যাবে। তবে সেদিন তুমি স্কুল থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আমার কাছে চলে এসো গাড়ি নিয়ে। সেদিন দয়া করে গাড়িটা নিয়েই স্কুলে গিয়ে আমাকে ধন্য কোরো।

—বাড়ি থেকে রান্না করে নিয়ে গেলে হয় না?

—তাহলে তোমাকে একটু একা পাওয়া হবে না। গল্পও করা হবে না। তোমার জন্যে তোমাকে ভালোবেসে এক জীবনে তো কম কষ্ট পেলাম না। আমাকে একটু আনন্দ দিতে তোমার এতই আপত্তি? আমি কবে মরে যাব কে বলতে পারে। এ মাসের ই সি জি ভালো বেরোয়নি। আমার বন্ধুবান্ধবেরাও তো টপাটপ মরে যাচ্ছে। তাছাড়া, ডিমেশনিয়া মতোও হয়েছে। কোথায় যে কী রাখি মনে থাকে না। মানুষের নাম মনে থাকে না। কারও সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করলে তাও মনে থাকে না আজকাল। কেউ নিমন্ত্রণ করলে একদিন আগে অথবা একদিন পরে গিয়ে পৌঁছোই সেখানে। ভয় করে। শেষে অ্যালঝাইমারে না দাঁড়ায়। আমি তোমাদের কারও কাছেই বোঝা হতে চাই না। অ্যালঝাইমার যদি সত্যিই হয় তবে আত্মহত্যা করে মরে যাব। অমন বাঁচা বাঁচব না।

—কিছু হবে না। তুমি যতদিন গান গাইতে পারবে ততদিন তোমার কিছুই হবে না। তোমার মতো মানুষের কি এত তাড়াতাড়ি যাওয়া চলে? এত মানুষকে তুমি আনন্দ দাও। তোমাকে ঈশ্বর ঠিক বাঁচিয়ে রাখবেন।

তাহলে অপালা আর ঘোষ সাহেবকেও আসতে বলছি শুক্রবারে। তুমি এলে দুপুরে ড্রাইভারকে পাঠিয়ে চাইনিজ আনিয়ে নেব। খাওয়া-দাওয়ার পরে তুমি ধীরেসুস্থে রান্না কোরো। বিকেলে একটু রাবড়ি নিয়ে আসতে বলব ড্রাইভারকে।

শর্মা থেকে?

না না শর্মা থেকে নয়, মে-ফেয়ার রোড-এর নেপালের দোকান থেকে।

রাবড়ি তুলে নিয়ে রুরুকে নিয়ে আসবে ড্রাইভার।

রুরুর জন্যে গাড়ি লাগবে না। তুমি বরং তৃষার অফিসে গাড়ি পাঠিয়ে দিয়ো। ওরই তো দেরি হয়।

আর চুমকিকে বলব না?

তোমার ইচ্ছে হলে বোলো।

তবে এই কথাই রইল। আমি নিজে সকালে বাজারে যাব। গড়িয়াহাট বাজারে সনাতনের দোকান থেকে বড়ো ইলিশ নিয়ে আসব আর কচুরশাক। আগের দিন সনাতনকে বলে রাখব। কত মাছ আনব? তিন কে.জি.? তিন কে.জি.? অত কে খাবে? আমরা কি রাক্ষস? যা মাছ ইতিমধ্যেই আনিয়েছ তার কী হবে? ও চন্দন যেমন করে পারে রাঁধবে। আমার বন্ধুদের ডেকে নেব। ওরা সেসবের সৎকার করবে। তুমি যেদিন রাঁধবে সেদিন হবে স্পেশ্যাল ট্রিট।

গড়িয়াহাট বাজারে তোমার গৌর-এর কী হল?

গৌর এখন খুব বড়ো হয়ে গেছে। আমার মতো ছোটোখাটো খদ্দেরকে ও পাত্তা দেয় না। তাই ওকে ছেড়েছি। তাছাড়া ওর লোকেরা দাম ও ওজনেও গোলমাল করে।

তিন কেজি মাছ আনবে কেন? নষ্ট হবে না?

থাকলে, ফ্রিজে থাকবে। পরদিনও খাব। আর বিস্পতির জন্যেও নিয়ে যাবে বাড়িতে সব রান্না। ও আমাকে কত কী রান্না করে খাওয়ায়।

—অরা চুপ করে থাকলেন।

চিতল মাছ আনব নাকি? খুব বড়ো পেটি পাওয়া যায় সনাতনের দোকানে।

ইচ্ছে করলে আনতে পারো, পেটি রাঁধতে আর অসুবিধে কী? মুইঠ্যা করতেই ঝামেলা।

তাহলে চিতলও আনব। কালোজিরো কাঁচালংকা ধনেপাতা দিয়ে রাঁধবে। তুমি কিন্তু বারোটা নাগাদ চলে এসো। গাড়ি নিয়েই স্কুলে যেয়ো। শুক্রবারে সাড়ে এগারোটার সময় ড্রাইভার যেন গাড়ি নিয়ে স্কুলে পৌঁছে যায় তা বলে দিয়ো।

তারপর বলল, ছাড়ছি। সঙ্গে চেঞ্জ নিয়ে এসো। রান্নার পরে চানটান করে ফ্রেশ হয়ে নিয়ে সুন্দর করে সাজতে হবে তো। আমি অবশ্য তোমাকে সবসময়েই সুন্দর দেখি। এবারে নববর্ষে, মানে পয়লা বৈশাখে তোমাকে একটা দারুণ সুন্দর শাড়ি দেব। একদিন শাড়িটা পরে আমাকে দেখিয়ো। আর একদিন না-পরে।

অরা অনেকক্ষণ টেলিফোনের অন্য প্রান্তে চুপ করে থাকল। তারপর বলল, তুমি বড় প্রগলভ হয়ে গেছ। আগে তো এমন ছিলে না।

—রুরুদের সঙ্গে মিশে মিশে আমিও নবযৌবনের দলের একজন হয়ে গেছি।

—আমার কিছু বলার নেই।

—অগ্নি বলল, রামকুমার বাবুর কাছে একটা গান শুনেছিলাম।

—কে রামকুমার বাবু?

—রামকুমার চট্টোপাধ্যায়।

—কী গান?

"একদিন তোমায় বুকের মাঝে ধরেছিলাম প্রাণ
তখন তোমার মন ছিলো না, তাই আমায় করলে অপমান।
এখন প্রেম নদীতে ভাঁটা যে গো নেই যৌবনের টান,
একদিন তোমার বুকের মাঝে ধরেছিলেম প্রাণ।"

—অরা গান শুনে বলল, কিছু আছেও তোমার স্টকে! ধন্যি তুমি।

১২

ফ্ল্যাটের বেলটা বাজতেই অগ্নি গিয়ে দরজা খুলল।

বলল, কী সৌভাগ্য আমার।

অরা একটা ফলসা রঙা শাড়ি পরেছিল তাঁতের, গাঢ় বেগুনি ব্লাউজের সঙ্গে। হাতে চামড়ার হালকা বেগুনি ব্যাগ।

তোমাকে জ্যাকারান্ডা বলে ডাকতে ইচ্ছে করছে।

যা খুশি বলে ডাকো। কিন্তু তার আগে একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস দাও।

চন্দন।

বলে, ডাকল অগ্নি।

চন্দন এলে বলল, মেমসাহেবকে গ্লাসে ম্যাঙ্গো-পান্না দে, বেশি করে বরফ দিয়ে।

ম্যাঙ্গো-পান্না? সেটা আবার কী জিনিস?

খাওনি কখনও? ভুটানে তৈরি হয়। খেয়ে দ্যাখো। আর তা না খেতে চাও তো রিয়্যালের ফ্রুট জ্যুসও খেতে পারো। টোম্যাটো অরেঞ্জ আর গুয়াভা আছে।

না, তোমার ম্যাঙ্গো পান্না খেয়েই একটু অ্যাডভেঞ্চার করি। রিয়াল-এর জ্যুস তো খাই-ই।

—সঙ্গে একটু ভদকা বা জিন মিশিয়ে দি?

না। একদম না। রান্না করতে হবে না? নেশা টেশা হয়ে গেলে মুশকিল হবে। এত মানুষে খাবেন।

আরে টেনশান কোরো না। আমার চন্দনও খারাপ রান্না করে না। তুমি শুধু একটু সুপারভাইজ করে ফিনিশিং টাচ দিয়ে দেবে, তাহলেই হবে। তোমার ড্রিঙ্কটা আমি নিজে বানিয়ে দিচ্ছি তার আগে কিচেনে যাও একবার, মাছগুলো ঠিক এনেছি কি না দেখে নাও।

চলো, বলে, অরা চন্দনের সঙ্গে কিচেনে গেল।

ফিরে এসে বলল, খুব ভালোই মাছ এনেছ। চন্দন তো ইলিশমাছগুলো কেমন গাদা পেটি আলাদা করে কেটেও ফেলেছে। বেশ মোটা মোটা পিস করেছে। আর চিতলের পেটিও বোধহয় মাছওয়ালাই কেটে দিয়েছে।

হ্যাঁ। গড়িয়াহাট বাজারের সনাতন।

খুব ভালো কেটেছে। পাতলাও নয় আবার খুব মোটাও নয়। আর পেটিগুলো সত্যিই খুব বড় বড়। তবে আজকালকার ছেলেমেয়েরা মুঠা খেতেই ভালোবাসে পেটির চেয়ে।

তাদের কথা ছাড়ো। তারা তো কাঁটাওয়ালা মাছ খেতেই পারে না। খেলেও একটা-কাঁটাওয়ালা মাছ খায়, যেমন পাবদা। নইলে রুই কী চিংড়ি অবশ্য খায়।

সত্যি। বাঙালির ছেলেমেয়ে পুঁটি, পারশে, বাটা, খয়রা, ইলিশ মাছ খেতে চায় না এ অভাবনীয়। শুধু ইন্টারনেট মোবাইল-ই নয়, এদের খাদ্যাভ্যাসেও আমূল পরিবর্তন এসেছে। হঠাৎই দেশসুদ্ধ ছেলেমেয়ে সাহেব-মেম হয়ে গেল। বোনলেস ছাড়া মাছ নাকি খাওয়াই যায় না।

এই বদলটা বড় হঠাৎই হল। তাই না? গত দশবছরে। দশ বছর নয়, আমি বলব পাঁচবছরে। নিজেদের ওদের প্রেক্ষিতে কেমন বুড়ো বুড়ো, আউট অফ প্লেস বলে মনে হয়। মনে হয় এবারে ছুটি হয়ে গেলেই ভালো।

অরা বলল।

তা কেন হবে। উই মাস্ট মুভ উইথ দ্যা টাইম। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পারলেই আমরা বাতিল হয়ে যাব। চলতেই হবে।

এই বয়সে এসে নিজেদের বদলানো বড় কষ্টকর।

কষ্ট হয়তো হবে একটু। কিন্তু আমরা নিরুপায়। নিজেদের বদলাতে হবেই।

অগ্নি নিজে হাতে ম্যাঙ্গো পান্নার গ্লাস নিয়ে এল অরার জন্যে। তারপর সেলারের দিকে গিয়ে বলল, একটু জিন বা ভদকা মিশিয়ে দিই?

না। বললাম না। অরা বলল, আমার ওসব ভালো লাগে না।

ভালো না লাগলে খেয়ো না।

চন্দনকে ডেকে বলল অগ্নি, ড্রাইভারকে ডাক চন্দন। চাইনিজ খাবারটা আনিয়ে রাখি। তোর কী খেতে ইচ্ছে?

চন্দন মুখ নামিয়ে বলল, আপনারা যা খাবেন আমিও তাই খাব।

—তা কেন? তোর কী ভালো লাগে বল না।

—বাড়িতে তো চাওমিয়েন, ফ্রাইড রাইস এসব আমরাই বানিয়ে খাই। সেই একদিন হাঁসের মাংস আনিয়েছিলেন, ভালো খেয়েছিলাম।

—অগ্নি হেসে উঠল।

অরাও হাসল চন্দনের কথা বলার ধরনে।

অগ্নি বলল, বেশ তাই হবে। যা ড্রাইভারকে ডেকে নিয়ে আয়। কী কী আনবে কাগজে লিখে দেব। টাকা এখন দিতে হবে না। দোকানে আমার অ্যাকাউন্ট আছে।

চন্দন চলে গেলে অরা বলল, একা থাকো, বেশি লাই দিয়ো না, কোনদিন গলা কেটে সব নিয়ে চলে যাবে।

আমার সর্বস্ব নেবে বলছ?

হ্যাঁ।

আমার সর্বস্ব তো এ বাড়িতে নেই।

মানে?

সে তো অন্য জায়গাতে আছে।

সে কি? কোথায়?

অবাক হয়ে, গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল, অরা।

যোধপুর পোস্ট অফিসের রাস্তা দিয়ে ঢুকে সেকেন্ড রাইট তারপর সেকেন্ড লেফট-এ গিয়ে সে বাড়ি।

কথা শুনে হেসে ফেলল অরা। অগ্নি নাগপুরে থেকে অবসর নিয়ে আসার পরে ভবানীপুরে ওর দিদির বাড়ি থেকে আসতে অরাদের যোধপুর পার্কের ফ্ল্যাটের ডিরেকশন জানতে চেয়েছিল যখন তখন এইভাবেই ডিরেকশান দিয়েছিল অরা।

অগ্নির কথার জবাব না দিয়ে মুখ নীচু করে শরবত খেতে লাগল সে। তার মুখে এক নিরুক্ত খুশির উচ্ছ্বাস আভাসিত হল।

অগ্নি বলল, নরেশ আর ব্রতীনকেও বলেছি? তুমি রাগ করবে না ত? ওরা অনেকই খাওয়ায় আমাকে। আজ এমনিতেই ব্রতীনের বাড়িতে যাবার কথা ছিল। পল কক্স-এর একটা ছবির সিডি জোগাড় করেছে ও। "দ্যা আইল্যান্ড"। একটি শ্রীলঙ্কান মেয়ে নায়িকা। ওই ছবিতে ঋতু গুহর গাওয়া রবীন্দ্রসংগীত "মাঝে মাঝে তব দেখা পাই বারেবারে কেন পাই না" গানটিকে থিম মিউজিক হিসেবে ব্যবহার করেছেন ডিরেকটর।

ইংরেজি ছবিতে বাংলা গান?

অপর্ণা সেনও তার ৩৬, চৌরঙ্গী লেন-এ ঋতু গুহর গাওয়া "এ কী লাবণ্য পূর্ণ প্রাণে" গানটির কিছুটা একটা পার্টি সিন-এ ব্যবহার করেছিলেন, মনে আছে?

আছে।

পল কক্স-এর ছবিটি দেখার আগ্রহর সেটাও একটা কারণ।

তারপরই অগ্নি বলল, ওরা কিন্তু হুইস্কি-টুইস্কি খাবে। তোমার আপত্তি নেই তো?

হুইস্কি খাওয়ার মধ্যে তো দোষ নেই। তুমি আর আশিস তো কতই খেতে। হুইস্কি কারোকে খেলেই বিপদ। তাছাড়া, তুমি তো অপালার স্বামী উজ্জ্বল ঘোষ সাহেবকেও বলেছ। তিনি তো রোজই খান। হুইস্কি না খেলে খাবারের স্বাদই পাবেন না।

বড় বড় উকিল-ব্যারিস্টারেদের মধ্যে অধিকাংশরাই খান। বাবার মুখে শুনেছিলাম, শচীন চৌধুরী সাহেব কনফারেন্সের সময়ে নিজে তো খেতেনই সব মক্কেলদেরও খাওয়াতেন। রাত নটা বেজে গেলেই একজন বেয়ারা স্কচ হুইস্কি আর সোডার গ্লাসে ভরা ট্রে নিয়ে সবাইকে দেখাত আর অন্যজন ফাইভ-ফাইভ-ফাইভ আর স্টেট এক্সপ্রেস সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই ট্রেতে করে নিয়ে ঘুরত।

—আচ্ছা তখন তো স্মোকিং আর প্যাসিভ স্মোকিং নিয়ে এত হইচই হত না। তাঁরা তো নিজেদের জীবন পুরোপুরি উপভোগ করে গেছেন।

করেছেনই তো। শচীন চৌধুরী সাহেব শিকারও করতেন। পরিমিতি বোধ ছিল সেসব মানুষদের। তাছাড়া ব্যাপারটা কী জানো? এসব টাবু পশ্চিমি দেশে বা জাপান সিঙ্গাপুরেই মানায়। গড়িয়াহাটের মোড়ে দশ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকলে একজন মানুষের যতখানি ক্ষতি হয় ততখানি চার প্যাকেট সিগারেট বা চার পেগ হুইস্কি খেলেও হয় না। শহরের পরিবেশ আগে দূষণমুক্ত করতে হবে নইলে এসব বাড়াবাড়ি আমাদের দেশে মানায় না। সরকারের যা করণীয় তা না করে এমন করে আমাদের ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হাত দেওয়াটা সমর্থনযোগ্য নয়।

—তা অবশ্য ঠিকই বলেছ।

তারপর ড্রাইভার উপরে এলে অগ্নি ওর নাম লেখা স্লিপ-প্যাড-এ খাবারের সব আইটেম লিখে দিল।

বেশি আনিয়ো না, নষ্ট হবে।

না। চন্দন আর আমাদের দুজনের মতোই অর্ডার দিলাম। আর চার প্লেট ফ্রায়েড প্রণ লিখে দিলাম। রেখে দেবে। সকলে এলে মাইক্রো-ওভেন-এ গরম করে দেবে চন্দন হুইস্কির সঙ্গে খাওয়ার জন্যে।

ড্রাইভারকে তারপরে বলল, এগুলো এনে দিয়ে তুমি তোমার খাবাতে খেয়ে নিয়ে তৃষা দিদির অফিসে চলে যেয়ো।

ড্রাইভার চলে গেলে বলল, রাতে সবসুদ্ধ কজন হবে তাহলে? আমরা দুজন, রুরু আর চুমকি, অপালা আর ঘোষ সাহেব, নরেশ আর ব্রতীন আর চন্দন। কজন হল?

তৃষাকে বাদ দিলে।

ও হ্যাঁ।

দশজন হল সব মিলে।

তারপরই বলল, দেখেছ। বিস্পতিকে ধরা হয়নি। তার খাবার তো পাঠাতে হবে ড্রাইভারকে দিয়ে বাড়িতে।

খাওয়ার কম পড়বে না তো?

না, না। এত এত কেজি করে মাছ এনেছ। সবাই কি রাক্ষস?

পোলাউ হবে? না ভাত?

ভাতই করতে বলো চন্দনকে। চিতলের পেটি আর ভাপা ইলিশ পোলাউ দিয়ে ঠিক জমবে না। তাছাড়া, হুইস্কি যারা খাবে তারা খাবার বেশি খাবেও না।

—তুমিই জান। শুনেছিলাম হুইস্কি খেলে খিদে বেড়ে যায়।

অনেকের হয়তো বাড়ে। সকলের নয়।

খাওয়ারটা এলে, খেয়ে নিয়েই রান্না শুরু করতে হবে। নইলে সময়মতো সব করে ওঠা হবে না। তোমার চাইনিজ রেস্তোরাঁ কত দূরে?

আরে কাছেই। আধঘন্টার মধ্যে চলে আসবে। আজকাল যোধপুর পার্কতো লানডান-এর অক্সফোর্ড স্ট্রিট হয়ে গেছে।

বলেই বলল, তোমার চেঞ্জ আনোনি? সন্ধেবেলা এই শাড়ি পরেই থাকবে? চান করবে না?

এনেছি তো। কিন্তু ওহো! চেঞ্জ তো ছোটো স্যুটকেসে গাড়িতেই আছে। চন্দনকে বলে রাখো ড্রাইভার ফিরলেই ওটাকে উপরে নিয়ে আসবে। নইলে ড্রাইভার সঙ্গে করে নিয়ে যাবে হয়তো বুঝতে না পেরে।

এখুনি বলে রাখছি।

আমি দুটো ভদকা খাব লেবু আর কাচালংকা দিয়ে—উইথ প্লেন্টি অফ আইস। তোমার আপত্তি আছে?

অগ্নি বলল।

আমার কি কোনোদিনও আপত্তি ছিল? আশিস আর তুমি তো এসব দেখা হলেই খেতে। আর অ্যাকসিডেন্টটাও তো হল বেশি খেয়ে গাড়ি চালাবার জন্যেই।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, এখন বয়স হচ্ছে। এসব কমাও এবারে।

—আরে এই বয়সেই তো একটু পিপ-আপ-এর দরকার। আমার বউ নেই, সংসার নেই, ছেলেমেয়ে নেই, এমনকি একটা কুকুর পর্যন্ত নেই। এই তো একমাত্র শখ। উজ্জীবনী।

তোমার নিজের সংসার করোনি ঠিকই কিন্তু অন্যের বোঝা তো শখ করে সব নিজের কাঁধেই বয়ে বেড়াচ্ছ প্রতিদানে কিছুমাত্র না পেয়েই।

শখ করে নিয়েছি বা দৈবাদেশে নিয়েছি কে বলতে পারে।

তাছাড়া, কী পেয়েছি আর কী পাইনি তা আমিই জানি। আমাদের ছেলেবেলাতে পঙ্কজ মল্লিকের একটা গান খুব জনপ্রিয় হয়েছিল না? একটা রবীন্দ্রসংগীত?

কোন গান?

"কী পাইনি তার হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজি।"

হুঁ।

তুমিই তো আমার ছেলেমেয়েদের বাবার মতো।

অরা বলল, মুখ নীচু করে।

"বাবার মতো" আর বাবাতে তফাত আছে।

অগ্নি বলল।

অরা চুপ করে রইল। ভাবছিল, এই বাক্যটিই তার ছেলেমেয়েদের অরা নিজে বহুবার বলেছে। আশ্চর্য! আজ অগ্নিও সে কথা বলল। তবে অগ্নির গলাতে দুঃখের রেশ ছিল। অগ্নির সেই দুঃখ অরার বুকে নিরুপায়তার 'অবলিগাটো' হয়ে বাজল যেন।

অগ্নি তারপরে বলল, তুমি এবং তোমার ছেলেমেয়েরা কেউই যে আসলে আমার কেউই নয় তা আমার মতো আর কে জানে! তবে এই আমার আনন্দ। নিজের সংসারের জন্যে তো সবাই-ই সবকিছুই করে। পরের সংসারের জন্যে করাটার মধ্যে একটা অন্য আনন্দ আছে। তোমাদের জীবনে আশিস-এর অভাব কিছুটা যে মোচন করতে পেরেছি এই আমার মস্ত আনন্দ। বন্ধু আমার অনেকই ছিল কিন্তু আশিসের মতো বন্ধু কেউই ছিল না।

—আমার এখানকার দুই বন্ধু নরেশ আর ব্রতীনের আলাপ তো হয়েছে। তাদের বেশ কয়েকবার নেমন্তন্নও খাইয়েছ কিন্তু তেমন ঘনিষ্ঠভাবে জানোনি ওদের। তোমাকে নিয়ে ওদের ঔৎসুক্যেরও শেষ নেই। আমাদের সম্পর্ক নিয়েও ওদের ঔৎসুক্য কম নয়। আজ ওদের সেই ঔৎসুক্যের আরও একটু নিরসন হবে।

ওঁরা যদি হতাশ হন। আমাকে আরও কাছ থেকে দেখে।

তা যে হবে না, তা তুমি ভালো করেই জানো। ওরা দুজনেই গান পাগল। তাই তো তোমাকে ওরা এত ভালোবাসে। আজ তোমার গান শুনে ওদের খুবই ভালো লাগবে। তোমার নিজের বাড়িতে তুমি কিন্তু ওদের একদিনও গান শোনাওনি। তাছাড়া, তোমাকে খারাপ লাগবে এমন পুরুষ কি এই ধরাধামে আছে?

—রুরু তোমাকে সেদিন কী বলেছিল?

প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে অরা বলল। অগ্নির মুখে অরার নিজের প্রশংসা একঘেয়ে লাগছিল।

—কোনদিন?

—তোমার কাছে যেদিন পাঠিয়েছিলাম আমি। তোমাকে কনফেশানাল করতে।

—ও। হ্যাঁ। এসেছিল তো রুরু কিন্তু কী যে বলল ঠিক বুঝতে পারলাম না।

গ্লাসটা টেবিল-এর উপরে নামিয়ে রেখে অরা বলল, সাংঘাতিক কাণ্ড হতে পারত সেদিন।

কীরকম?

আমার স্কুলের পিকনিকে যাবার কথা ছিল। তৃষা বম্বে গেছিল অফিসের কাজে, সেখান থেকে হর্ষদের কাছে যাবার কথা।

তারপর?

তারপর আর কী?

রুরু বিস্পতিকে নিজে টিকিট কেটে প্রিয়া সিনেমাতে একটা হিন্দি ছবি দেখতে পাঠিয়ে ফ্ল্যাট ভিতর থেকে বন্ধ করে চুমকিকে নিয়ে বেডরুমে ঢুকেছিল। এদিকে স্কুলের একজন অল্পবয়সি টিচার হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে স্কুলেই মারা যাওয়াতে পিকনিক ক্যানসেল হয়ে গেল। আমি যে অসময়ে ফিরে আসব তা তো জানত না ও।

—বলো কী? দারুণ ইন্টারেস্টিং ব্যাপার।

—ইন্টারেস্টিং বলছ তুমি? কী বিপদ যে হতে পারত।

রাগের গলাতে বলল অরা।

—তারপর কী হল বলো?

—অরা হেসে বলল, আমি যখন চুমকিকে বললাম, তোরা বেডরুমে কী করছিলি?

—ও প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, রুরু বহুদিন হল আমাকে দেখবে বলে ঘ্যান ঘ্যান করছিল। দেখবে মানে? ওকে তো প্রায় রোজই দেখছে।

—না, দেখা মানে ওর Nakedness দেখা।

—বলো কী?

—হ্যাঁ। বলল, রুরু আমাকে আঙ্গাপাঙ্গা দেখতে চেয়েছিল।

আঙ্গাপাঙ্গা মানে? কোন দেশি শব্দ সেটা?

শব্দটা বাংলাই। চুমকির মা নাকি ওর ছোটোবেলায় চান করাবার আগে বলতেন, আঙ্গাপাঙ্গা হও। তাই আঙ্গাপাঙ্গা।

মানে ন্যাংটো হওয়া বলছ?

অরা মুখ টিপে হেসে বলল, ওই।

শুধু দেখতেই চেয়েছিল?

ওরা দুজনেই তাই তো বলল।

অগ্নি খুব জোরে হেসে উঠে বলল, হাউ সুইট অফ দেম। ব্যাপারটা দারুণ রোম্যান্টিকও। ভাবা যায়? এ তো দেবশিশু-দেবকন্যার প্লেটোনিক ব্যাপার।

কী বলছ তুমি। আগুন নিয়ে খেলতে গেছিল।

হাত তো আর পোড়ায়নি। কী দারুণ স্বর্গীয় একটা ব্যাপার বলো তো! আমাদের সময়ে এমন রোম্যান্টিজম-এর কথা আমরা ভাবতে পর্যন্ত পারতাম না। ওরা এক অন্য প্রজন্মের ছেলেমেয়ে। ওদের দুজনের প্রতিই আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। ওরা আগুনের মধ্যে বাস করেও পোড়ে না। আমার হাজারিবাগের গুরু একটি শের আওড়াতেন।

—শেরটা কী?

"আগ চারোতরফ দহকতি হ্যায়,
জীনা ইস বীচ কিতনা মুশকিল হ্যায়
ফিরভি জাঁবাজ খে লেঁতে হ্যায়
উনকো আহসান হরেক মঞ্জিল হ্যায়।"

মানেটা ইংরেজিতেই বলতেন উনি "The valiant takes delight in danger and face fires and floods with joy. Indeed no difficulty seems too great for them."

বলেই বলল, ওদের সংযমটার কথাও ভাব একবার। শরীরকে ওরা মন্দিরের মতো দেখতে যে পারে এটা একটা কতবড় ব্যাপার একবার ভাবতো! গ্রে-এ-এ-ট। সকলকে তো এ ঘটনার কথা বলা যাবে না। সব মানুষের মন সমান উদার নয়—বেশিরভাগেরই অনুদার—। তবে এই "আঙ্গাপাঙ্গা" শব্দটা চালু করে দেব আমি। শব্দটা উচ্চারণ করতেই কেমন রোমাঞ্চ বোধ করছি।

তুমি অদ্ভুত। চিন্তাতে আমার রাতের ঘুম চলে গেছে। সেদিন তো দশ মিলিগ্রাম ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়েছিলাম আমি। কবে যে কী বিপদ ঘটে যাবে।

কোনো বিপদই ঘটবে না। ওরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি ম্যাচিওরড। ওদের আই-কিউ যেমন

আমাদের চেয়ে অনেক বেশি ওদের মানসিকতাও অন্যরকম। ওরাই টেনিস-এর ড্যুলিসিসের মতো বলতে পারে। "I will drink life to the lees" সত্যিই গ্রেট ব্যাপার ঘটিয়েছে রুরু আর চুমকি একটা। আমার কাছে এসে কী আঙ্গাপাঙ্গা করছিল চোরের মতো মুখ করে, এখন বুঝছি তোমার কাছে তাড়া খেয়ে—আমি কিছু বুঝতে তো পারিইনি, বোঝার চেষ্টাও করিনি।

অরা বলল যাই এবার কিচেনে। আর গল্প করলে চলবে না। ভাতটা শুধু সবাই আসার পরে করব। ভাত চন্দনই করে নিতে পারবে। গোবিন্দভোগ চাল আছে তো বাড়িতে?

—গোবিন্দভোগ নেই, বাসমতি আছে।

—তাহলেই হবে। তবে বাসমতির পোলাউই ভালো হয়। ইলিশ মাছ আর চিতল মাছ বাসমতি দিয়ে খেতে কী ভালো লাগবে? তার চেয়ে এমনি সিদ্ধ চাল দিয়েই ভাত করুক।

—তুমি যা বলবে।

১৩

দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পরে যখন অরা কিচেনে গেল তখন অগ্নিও গেল তার সঙ্গে।

তুমি কী করতে এলে?

তোমাকে দেখতে।

পাগলামি না করে বসার ঘরে গিয়ে বোসো।

এখানেই থাকি। তোমাকে তো দেখতেই পাই না আজকাল। তুমি রান্না করো, আমি মোড়া পেতে বসে গল্প করি।

ফোনে তো কথা প্রায় রোজই হয়।

তা হয়। দেখা তো হয় না।

যতো বুড়ো হচ্ছো তত পাগল হচ্ছো।

ভাগ্যিস বুড়ো হয়েছি। রুরুর মতো ছেলেমানুষ থাকলে তো আঙ্গাপাঙ্গা দেখার বায়না ধরতাম।

অরা হেসে ফেলে বলল, চন্দন এখুনি এসে ঢুকবে। তুমি যাওতো। গিয়ে বোসো বসার ঘরে।

বসার ঘরে গিয়ে রাশিদ খাঁর একটি সিডি চালিয়ে দিয়ে ইজিচেয়ারে বসল অগ্নি। ভল্যুমটা একটু বাড়িয়ে দিল যাতে রান্না করতে করতে কিচেন থেকেও শুনতে পারে অরা। গান শুনতে শুনতে চোখ জুড়ে এল অগ্নির। সকালে ব্রতীনের সঙ্গে বেশি টেনিস খেলার ক্লান্তিতে এবং ভালো লাগায়ও, অরা যে তারই কিচেনে রান্না করছে এই ভাবনাটাই তাকে বড় সুখী করে তুলেছিল।

সিডি-টা শেষ হয়ে যাওয়াতে বন্ধ হয়ে গেছিল। অগ্নি ইজিচেয়ারে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। ষাট পেরোলে নিজের অজানতে কিছু ক্লান্তি এসে জমা হয় মস্তিষ্কে। মানসিকতাতে সে খুবই তরুণ, কিন্তু শরীরটা এখন মাঝে মাঝে মনের সঙ্গে তাল মেলাতে পারে না। যদিও ষাটে এখনও পৌঁছোয়নি।

চোখ খুলে দেখলেন, অরা বসার ঘরে সোফাতে গা এলিয়ে বসে আছে।

বাজল কটা?

চোখ খুলেই বলল, অগ্নি।

চারটে।

তাই? দেখেছ কেমন বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। দুপুরে খাওয়ার পরে ঘণ্টা দেড়েক শোওয়া এখন অভ্যেস হয়ে গেছে। আমার ডাক্তার তো বলেছেন খাওয়ার পরে ফোনেও কথা না বলতে। ডঃ বিধান রায় কিন্তু বলতেন দুপুরে খাওয়ার পরে কিছুক্ষণ ঘুমোনো খুবই ভালো, বিশেষ করে একটু বয়স হলে।

ভালোই তো। রিটায়ার যখন করেছ তখন রিটায়ার্ড লাইফই লিড করা উচিত। লাফিয়ে বেড়াবার দরকারই বা কী?

তা ঠিক। আমি এবারে চানে যাই। তাড়াহুড়ো আমি করতেও পারি না আজকাল। কোন বাথরুমে যাব? গেস্টরুমের?

অরা বলল।

কেন? তুমি আমার বাথরুমেই যাও। তোমার স্যুটকেসটা নিয়ে যাও। ঘরের দরজা বন্ধ করে একটু শুয়েও নিতে পারো। তারপর চান করে চেঞ্জ করো। আমার ঘরের ডেসিং টেবিলের আয়নাটা বড়। তোমার সুবিধে হবে। দাঁড়াও, এ সি-টা চালিয়ে দিই নইলে চান করে উঠে তোমার গরম লাগবে।

তারপর বলল, একদিন তোমার চান দেখার বড় ইচ্ছা ছিল। বিশেষ করে বয়স যখন কম ছিল।

ইচ্ছাকে দমন করাটাই বড় মানুষের লক্ষণ। তোমার মনুষ্যত্বের মাপ তো মস্ত বড়। এমন সস্তা ইচ্ছা তোমাকে মানায় না।

জানি! "মনকে মারো, ভাবনাগুলি মাড়িয়ো না, পাবে না, যা না পাওয়াটাই সভ্যতা।"

কার কবিতা এটি?

আমার।

আমি চানে চললাম।

বলে, অরা চলে গেল।

অরার মুখে জয়ীর অভিব্যক্তি নয়, অগ্নির মনে হল, এক দারুণ সহমর্মিতার ভাব মাখামাখি হয়ে গেল বৈজয়ন্তীর কথা শুনে। সম্ভবত জীবনে অরা কারোকেই হারাতে চায়নি। সহজ জয়ে ও কখনোই বিশ্বাস করেনি। সকলের সঙ্গে হাতে হাত ধরে বাঁচতে চেয়েছে সে চিরটাকাল। তাই তো অরাকে এত ভালোবাসে অগ্নি।

অগ্নি ভাবছিল, বিস্পতিও অগ্নিকে 'আগুনবাবু' বলে ডাকে। বিস্পতিও খুব ভালোবাসে অগ্নিকে তার মতন করে, বৈজয়ন্তীও বাসত, অরাও বাসে—প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা রকম। সব ভালোবাসার রকমই বোধহয় আলাদা আলাদা।

তাই? তুমি আজকাল কবিতাও লিখছ না কি?

—"আজকাল" কেন? কবিতা তো লিখি সেই ছেলেবেলা থেকেই। এমন কোনো শিক্ষিত বাঙালি আছে কি যে কৈশোরে এবং প্রথম জীবনে কবিতা লেখেনি? আমার সতেরো বছর বয়সে একটি কবিতার বইও বেরিয়েছিল। তার প্রচ্ছদও আমিই এঁকেছিলাম।

তার নাম 'জলজ'।

—কে ছিল? প্রেরণা?

—সে ছিল, পাড়ারই একটি মেয়ে। খুব উজ্জ্বল, পুঁইডাঁটার মতো কালচে-সবজে সতেজ ছিপছিপে।

—নাম কী ছিল।

—বৈজয়ন্তী।

—এখনও যোগাযোগ আছে?

—না। সে তো তোমার কাছে হেরে গেছে। তার নাম এখন পরাজিতা।

তবে মাস ছয়েক আগে হঠাৎ দেখা হয়েছিল গড়িয়াহাট বাজারে। প্রচণ্ড মোটা হয়েছে, খুঁড়িয়ে চলে, পানবাহার খায়, সঙ্গে স্কুলে-পড়া নাতি। বলল, আগুনদাদা, এসো নাগো একবার আমরা এগডালিয়াতে থাকি।

—তোমার স্বামী কী করেন?

রাইটার্স-এর কেরানি ছিল। রিটায়ার করেছে। এখন সিপিএম করে। হোল টাইমার

১৪

সন্ধ্যা হয়ে গেছে ঘণ্টাখানেক হল। অরা একটি কচিকলাপাতা রঙা সিল্কের শাড়ি পরেছিল। গলাতে ও কানে সবুজ পান্নার হার ও দুল। একটা বটল-গ্রিন রঙের ব্লাউজ। মুখে হালকা প্রসাধন। অগ্নি ওকে ফিরদৌস আতর দিয়েছিল মাখতে। বগলতলিতে, ঘাড়ে, কানের লতিতে ও স্তনসন্ধিতে আতর মেখেছে অরা।

সাড়ে সাতটা নাগাদ অতিথিরা সকলেই এসে গেলেন। ব্রতীন সব সময়ে পাজামা-পাঞ্জাবি পরে আর নরেশ ফেডেড জিনস ও কলারওয়ালা গেঞ্জি। রুরু এসেছে চুমকির সঙ্গে। দুজনেই জিনস পরেছে। রুরু কলারওয়ালা গেঞ্জি আর চুমকি একটি হালকা গোলাপি টপ—কটন-এর। অপালা কাঞ্জিভরম সিল্কের একটি শাড়ি পরে এসেছে। ঘোষ সাহেব আদ্দির গিলে-করা পাঞ্জাবি ও ধুতি, পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি।

রুরু আর চুমকি একটু অপরাধী অপরাধী মুখ করে বসেছিল। অগ্নি তাদের স্বাভাবিক করার জন্যে বলল, রুরু, তুই একটা ব্যান্ডের গান দিয়ে আজ সন্ধের ম্যায়ফিল শুরু কর।

আমি?

হ্যাঁ তুই-ই।

তোর পরে ঘোষ সাহেব একটি গান গাইবেন।

অপালা হেসে বলল, ঘোষ সাহেব? গান গাইবেন?

হ্যাঁ। ঘোষ সাহেবই।

অগ্নি বলল।

ঘোষ সাহেব, মানে, উজ্জ্বল ঘোষ কিন্তু সপ্রতিভভাবে বললেন, গেয়ে দেব। গান গাওয়া আর কী কঠিন কাজ। গান কি তোমাদের অগ্নিদাদাই শুধু গাইতে পারেন?

ঘোষ সাহেবের এই কথাতে ঘরের সকলেই হেসে উঠলেন। ঘোষ সাহেব নিজেও সেই হাসিতে যোগ দিলেন।

অপালার যেন টেনশান হতে শুরু করল ঘোষ সাহেবের এই ননশালান্ট অ্যাটিট্যুড দেখে।

রুরু বলল, এখুনি মনে পড়ছে না কোনো জুতসই গান। অন্য সকলের গান শুনতে শুনতে মনে পড়ে যাবে। আমি পরে গাইব।

তাহলে অপালাই একটা গান শোনাও।

তারপরই বলল, ঘোষ সাহেবের হাতের গ্লাসের দিকে চেয়ে, কী ঘোষ সাহেব। আপনি তো শুধু জলই খাচ্ছেন? এত কম হুইস্কি? কিরে ব্রতীন? তোর উপরে বার-এর ভার দিলাম আর আমার অতিথিদের জল খাওয়াচ্ছিস?

ঘোষ সাহেব বললেন, না, না, উনি তো বড়ই দিয়েছিলেন, আমিই কমিয়ে নিয়েছি। অনেকগুলো খাইত, তাই ছোট ছোট করে খাই।

অনেকগুলো মানে? কটা খান আপনি?

তারপরই অগ্নি বলল, যারা গুনে গুনে হুইস্কি খায় তারা মানুষ খুন করতে পারে, সুদের কারবার করতে পারে।

অগ্নির এই কথাতে সকলেই হেসে উঠলেন।

অগ্নি এবারে বলল, অপালা, তাহলে শুরু হোক একটা অতুলপ্রসাদের গান। তোমাকে বিয়ার দেয়নি বুঝি ব্রতীন? ব্রতীন মিসেস ঘোষকে এক গ্লাস বিয়ার দে। শ্যান্ডি নয় কিন্তু প্রপার বিয়ার। উনি অরার মতো বেরসিকা নন।

বিয়ার খেলেই রসিকা আর না খেলেই বেরসিকা এর কোনো মানে নেই।

অপালা বললেন।

এবারে গানটা।

ব্রতীন বিয়ার এনে দিলে, বিয়ারের গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে শুরু করল অপালা।

অতুলপ্রসাদের একটি ক্বচিৎ-শ্রুত গান গাইল অপালা। 'বিফল সুখ আশে জীবন কি যাবে?'

গান শেষ হলে সকলেই বাঃ। বাঃ করে উঠল।

নরেশ বলল, এবারে ঘোষ সাহেবের টার্ন।

ঘোষ সাহেব বললেন, "সে ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়, আমি কি ডরাই সখি ভিখারি রাঘবে?"

তারপর বললেন কিন্তু আমি নিদেনপক্ষে চারটি না খেলে গাইতে পারি না। বন্দুকে গুলি পুরলে না ট্রিগার টানলে গুলি বেরুবে। আমি পরে।

ব্রতীন বলল, অগ্নি, তুই-ই তাহলে একটা গেয়ে দে।

অগ্নি বলল, একটা অতুলপ্রসাদের গান গাই? ফর আ চেঞ্জ। সন্তোষ সেনগুপ্ত, মানে সন্তোষদা খালি গলাতে এই গানটি রেকর্ড করেছিলেন। অনেকদিন আগে শোনা, ভুল-ভাল হতে পারে। তোমরা কেউ গানটি জানলে ক্ষমা-ঘেন্না করে শুনো।

বলেই, ওর হুইস্কির গ্লাসে একটি চুমুক দিয়ে অগ্নি গান ধরল :

"আমি বাঁধিনু তোমার তীরে তরণী আমার
একাকী বাহিতে তারে পারি না যে আর....." ইত্যাদি।

গান শেষ হলে ঘর বেশ কিছুক্ষণের নিস্তব্ধতাতে ভরে রইল। শ্রোতাদের প্রত্যেকের মুখেই মুগ্ধতা।

এমন সময় ডোর বেলটা বাজল। অগ্নির বন্ধু নরেশ মিত্র গিয়ে দরজা খুলল। তৃষা এল। মনে হল, বাড়ি গিয়ে চেঞ্জ করে এসেছে। একটা সি-গ্রিন সালোয়ার কামিজ পরে এসেছে ও। হাতে মোবাইল ফোন। সবুজ প্লাস্টিকের বালা, সবুজ রঙা টিপ, সবুজ রঙা চটি।

অরা বললেন, মোবাইলটাকে অফফ্ করে দাও।

দিচ্ছি মা।

অরার এই কথাতে অন্য যাদের কাছে মোবাইল ছিল তাঁরাও সকলেই অফফ্ করে দিলেন।

অপালা বলল, অরা, এবারে তুই একটা গান শোনা। কতদিন হয়ে গেছে তোর গান শুনি না।

অরা বলল, কতদিন গানটান গাই না। অভ্যেসই চলে গেছে।

নরেশ বলল, গান গাওয়া, সাইকেল চড়া আর সাঁতার কাটা একবার শিখলে কেউই আর ভোলে না।

ব্রতীন বলল, আমার ঠাকুমা বলতেন, লজ্জা নারীর ভূষণ, কিন্তু গানের বেলা নয়।

অগ্নি বলল, গাও গাও, একটা গান গাও।

অরা একটু গলা খাঁকরে নিয়ে ধরে দিল একটি রবীন্দ্রসংগীত।

"ঘাটে বসে আছি আনমনা, যেতেছে বহিয়া, সুসময়
আমি সে হাওয়াতে তরী ভাসাব না, যাহা তোমা পানে নাহি বয়।"

ব্রতীন বলল, আহা। কী ভাব আপনার গলাতে।

ঘোষ সাহেব বললেন, "ভাব ভাব কদমের ফুল।"

ব্রতীন বলল, এ নামে রাজলক্ষ্মী দেবীর একটি কবিতার সংকলন আছে। দারুণ সুন্দর সব কবিতা।

রাজলক্ষ্মী দেবীর কবিতা তো বিশেষ দেখতে পাই না। তিনি কোথায় থাকেন? ওঁর কবিতা রমাপদ চৌধুরী আনন্দবাজারের বিশেষ সংখ্যাগুলিতে নিয়মিত ছাপতেন।

উনি একজন আর্মি অফিসারের স্ত্রী পুনেতে থাকতেন। সম্ভবত সেখানেই সেটল্ করেছেন।

ওঁর কবিতা একটা শোনা ব্রতীন? আগে বললে বইটা নিয়ে আসতাম। আমার মুখস্থ থাকে না। তাহলে নরেশ তোর তো মুখস্থ থাকে, আবৃত্তিও ভালোই করিস, তোর প্রিয় কোনো কবির একটি কবিতা শোনা। শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ অথবা অমিতাভ দাশগুপ্তর।

দাঁড়া। গানটান হোক আগে তারপর শোনানো যাবে। কলরোল স্তিমিত হয়ে এলে।

ইতিমধ্যে ঘোষ সাহেব কালি-পটকা ফোটাবারই মতো হঠাৎ করে গান ধরলেন, গেলাসটা সাইড টেবল-এ টাক্ শব্দ করে নামিয়ে রেখে।

"দুটো ঘুঘু পাখি দেখিয়ে আঁখি
জাল ফেলেছে পদ্মার জলে।
দুটো ছাগল এসে হেসে হেসে
খাচ্ছে চুমু বাঘের গালে।।"

দুবার রিপিট করলেন গানটা।

সকলেই গান শুনে হাসতে হাসতে হইহই করে হাততালি দিয়ে উঠলেন।

তারপর অপালা, নরেশ এবং ব্রতীনও একসঙ্গে বলে উঠলেন অগ্নিকে, এবারে অগ্নির একটা টপ্পা শোনা যাক।

চুমকি, রুরু এবং তৃষাও তাল মেলাল সেই অনুরোধে।

সকলেই অনেক কথা বলছেন ও বলছে। অরাই শুধু চুপচাপ। অরা চোখ দিয়ে কথা বলে। তবে সন্ধেটা যে উপভোগ করছে সেও তা তার চোখ মুখই বলে দিচ্ছে। ও যে ওর চেহারাতে, কথাবার্তায়, মানসিকতাতে সকলের চেয়েই আলাদা এ কথা কারোকে বলে দিতে হয় না।

গাইতে কি হবেই?

অগ্নি বলল।

তারপর বলল, নিন্দুকে বলতে পারে যে নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খাইয়ে গাজোয়ারি করে গান শোনাচ্ছে।

কেউই যে তা বলবে না এ কথা আপনি ভালো করেই জানেন।

অপালা বলল।

অগ্নি একটু চুপ করে থেকে বলল, গাইছি একটি গান। তবে এটি নিধুবাবুর নয়।

তবে কার?

শ্রীধর কথকের।

নরেশ বলল, নে শুরু কর।

অগ্নি ধরল, "যে যাতনা যতনে, মনে মনে আমার মনই জানে।"

এক কলি গেয়েই গান থামিয়ে বলল, "যতন" শব্দটির মানে, এখানে ভালোবাসা। বুঝেছো?

ব্রতীন বলল, বুঝলাম। এবারে গাও।

"যে যাতনা, যতনে, আমার মনে মনে মনই জানে।
পাছে লোকে হাসে শুনে আমি লাজে প্রকাশ করিনে।

প্রথম মিলনাবধি, আমি যেন কত অপরাধী,
সাধি প্রাণপণে,
তবুতো সে নাহি তোষে,
আমায় আরও দোষে অকারণে,
যে যাতনা যতনে............"

সকলেই অনেকক্ষণ নীরব থেকে গানটা যে তাদের প্রাণে বেজেছে তাই বোঝালেন।

চন্দন বরফের বাকেটে করে ফ্রিজ থেকে বরফ এনে ফুরিয়ে যাওয়া বাকেটটা নিয়ে যেতে এসেছিল।

অগ্নি বলল, ওরে, চন্দনবাবু বিস্পতিদিদির খাবারটা হটকেস-এ করে দিয়ে দিতে ভুলিস না যেন, অরা মায়েরা যখন বাড়ি যাবেন।

না বাবু। ভুলব না।

ড্রাইভারকেও উপরে ডেকে খাইয়ে দিস। ওতো টালিগঞ্জেই গাড়ি রেখে চাবি দিয়ে ওখান থেকেই বাড়ি চলে যাবে।

হ্যাঁ বাবু।

ঘোষ সাহেব বললেন, ওতো আগেই চলে যেতে পারে। ওঁরাতো আমাদের সঙ্গেও ফিরতে পারেন। আমার তো কালিস গাড়ি। অনেক জায়গা।

এত তাড়াতাড়ি তো ওর খিদে পাবে না। তাছাড়া, আমাদের খাওয়া না হলে কি খাবে ও? চন্দনবাবুই দেবেন না খেতে। প্রোটোকল-এর ব্যাপার আছে না!

হাসলেন ঘোষ সাহেব। বললেন, যা বলেন।

অগ্নি বলল, ওর খাওয়া হয়ে গেলে ও যেতেই পারে।

১৫

আজ শনিবার। অরার স্কুল ছুটি।

তৃষা আর অরা বসার ঘরে বসে ছিলেন।

অরা বললেন, তুই কি কোথাও বেরুবি?

কোথাও না। কী যে ছাতার চাকরি। কুকুরীর মতো খাটায় মা। শনিবার রবিবারেও তো রেহাই নেই। আর যে উইকএন্ডে কাজ থাকে না তখন এত ক্লান্ত লাগে যে মনে হয় পড়ে পড়ে ঘুমোই। কতদিন যে কোনো ডিসকোতে যাইনি।

কার সঙ্গে যাবি। হর্ষদ থাকলে না হয় যেতিস।

হর্ষদ তো আমার বয়ফ্রেন্ড মা। এমনি বন্ধুবান্ধবী কত আছে আমার। আজকাল আমার কাজের জন্যে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

—তোদের বন্ধুত্বের বয়স তোরাই জানিস। হর্ষদকেও তো 'তুই' 'তুই' করে বলিস। যাকে তুই বলে সম্বোধন করা যায় তার সঙ্গে প্রেম কী করে হয় এ তো আমি ভেবে পাই না।

এমন সময়ে ডোরবেল বাজল। তৃষা উঠে দরজা খোলাতে অপালা এল হাতে একটা ক্যাসারোল।

কী ব্যাপার অপালা মাসি?

তোর মেসোমশায়ের এক ভেড়িওয়ালা মক্কেল অনেকখানি ভেটকি মাছ, প্রায় পাঁচ কেজি হবে ফিলে করে পাঠিয়েছিলেন। আমরা মানুষ তো মাত্র দুজন। তোদের জন্যে কিছু নিয়ে এলাম আর

কিছু পাঠিয়ে দিলাম অগ্নিভদার বাড়িতে। সেদিন কত খাওয়ালেন আমাদের। যদিও রান্নাটা তুমিই করেছিলে। সত্যি চেতলের পেটিগুলো যেমন ভালো ছিল, ইলিশ মাছটাও। আর তেমনই রেঁধেছিলে তুমি। আমার কর্তার তো আর কোনো খাবার রুচছেই না তার পর থেকে। বলছেন, রান্নাটাও তো ভালো করে শিখতে পারতে—গানটা না হয় অরার মতো ভালো নাই গাইতে পারলে।

ছাড় তো। বিবাহিত পুরুষেরা সবাই-ই ওইরকমই হয়। পরস্ত্রীর সবই ভালো দেখে।

—আর অগ্নিভর মতো অবিবাহিত পুরুষেরা?

—অপালার রসিকতাতে হেসে ফেলল অরা। বলল, তাদের তো পরস্ত্রীর ব্যাপার নেই—নিজের স্ত্রী যাদের নেই তাদের পক্ষে তুলনা করার কোনো প্রয়োজনই নেই। তাদের কাছে আমরা সকলেই তুলনাহীনা।

মা মেয়েতে কী গল্প হচ্ছিল?

আসলে তৃষা বসে আছে হর্ষদের ফোনের জন্যে।

ও হ্যাঁ তাইতো! ওতো প্রতি শনিবারেই এই সময়ে ফোন করে।

হ্যাঁ। এমনিতে তো ইন্টারনেটেই কথাবার্তা হয়। তবু সপ্তাহে একবার করে ফোন করে।

তৃষা ক্যাসারোলটা কিচেনে বৃহস্পতিকে দিয়ে এল। বলল, বৃহস্পতিদিকে বলে এসেছি—খালি করে তোমারটা দিয়ে দেবে।

ওমা। তার কী দরকার। ওতেই থাকুক। খাবার সময়ে গরম গরম বের করে খাবি। আমি তো ন্যু ইয়র্ক থেকে নিয়ে আসিনি। ক্যাসারোলটা কাল সকালে দিলেই হবে।

তা অগ্নিকে যে পাঠালে, সে কি তোমাকে ধন্যবাদ দিল ফোন করে?

সঙ্গে দুই লাইনের চিঠি দিয়েও পাঠিয়েছিলাম। আমার ড্রাইভার বলল, সাহেব বাড়ি নেই। চন্দনের কাছে দিয়ে এসেছে।

তোমার ফোন নাম্বার জানে কি ও?

জানে তো! মাঝে মাঝে ফোনও তো করে। আমিও করি কখনো কখনো একা লাগলে।

বাঃ। খুবই ভালো করো। মানুষটাও যে একা তাতে তো কোনো সন্দেহ নেই।

অরা বলল।

তৃষা বলল, মা বলছিল, আমরা তুই-তোকারি করতে করতে তাদেরই সঙ্গে প্রেম কী করে করি?

সত্যিই। আমারও একথা ভেবে অবাক লাগে। "তুই" বললে কি প্রেম থাকে?

—তোমাদের সময়ের প্রেম তো আর এখন নেই। আমরা তোমাদের মতো রোম্যান্টিক নই। রোম্যান্স করার সময়ও আমাদের নেই। জীবনটাই কেরিয়ারের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। কেরিয়ারে আর জীবনে কোনো তফাত নেই, সে কেরিয়ার যাই হোক না কেন। বিয়ে যেখানে হচ্ছে, যদিও বিয়ে ব্যাপারটা আর কতদিন টিকে থাকবে তা নিয়ে ঘোর সংশয় দেখা দিয়েছে, সেখানে সেটা একটা প্রয়োজন বলেই হচ্ছে। রোম্যান্সের কোনো জায়গা নেই।

হাই সোসাইটিতে হতে পারে। আমার মনে হয় না এই কথা সকলের বেলাতে সত্যি। তোরা তো প্রেম করিস না, ভালো গান শুনিস না, ভালো সাহিত্য পড়িস না—কিন্তু এসব করে এমন অগণ্য মেয়ে আছে মধ্যবিত্ত সমাজে যারা আজও পুরোপুরি বাঙালি। সবকিছু বাঙালিয়ানা তারাই বাঁচিয়ে রেখেছে। তারা সবাই তাদের প্রেমিককে 'তুই' বলে না, দু-একজন বললেও বলতে পারে।

তৃষা বলল, জানো মা, সেদিন আমার এক কলিগের বিয়ে হল অন্য এক কলিগের সঙ্গে। দুজনেই তুমুল তুই-তোকারি করতে করতেই বিয়ের ডিসিশানটা নিয়ে ফেলল। মেয়েটির নাম ঝিনুক। তার বড়ো মামা তাকে একটা লাল গোলাপ ফুল আঁকা টিনের তোরঙ্গ দিয়েছেন, উপহার হিসেবে, অন্য

অনেক উপহারের সঙ্গে। সেই কালো ট্রাঙ্কের উপরে সাদা রঙ দিয়ে বড়ো বড়ো করে লিখিয়ে দিয়েছেন "সুখে শান্তিতে ঘর করো, তুই-তোকারি বন্ধ করো।"

—অপালা আর অরা দুজনেই জোরে হেসে উঠল তৃষার কথা শুনে।

অপালা বলল, দারুণ তো। গল্প করতে হবে সবাইকে।

অরা বলল, ঘোষ সাহেবকেও নিয়ে এলি না কেন, আড্ডা মারা যেত। তবে হুইস্কি তো আমার কাছে নেই।

হুইস্কি না হয় সে নিজেই নিয়ে আসত কিন্তু নীচে একবার উঁকি মেরে দ্যাখো না গাড়ির লাইন। বলেছি না, শুক্রবার রাত ছাড়া একদিন রাতেও ছুটি নেই। ছেলেমেয়ে নেই, তেমন প্রয়োজনও নেই, তবু কাজ কাজ করেই মানুষটা গেল।

কাজ কি শুধু টাকার জন্যেই করে কেউ অপালা মাসি? সফল মানুষদের কাছে কাজ একটা নেশা। এই যে এত মানুষ তাঁর উপরে নির্ভর করছে, তিনি নইলে চলবে না এই কথা বারে বারে বলছে, এর একটা নেশা নেই? সফল একবার হতে পারলে টাকা দৌড়ে এসে তাঁর পকেটে ঢোকে। তখন "না" করার উপায় থাকে না।

অপালা বললেন, আর শুধুই কী টাকা? মান সম্মান, নানারকম উপহার, শ্রদ্ধা এসবের একটা ইনটক্সিকেটিং এফেক্ট হয় সব সফল মানুষের উপরেই। কাজই তাঁদের কছে এক নম্বর প্রায়রিটি হয়ে যায়। এ কথা ওঁরা সকলেই মানেন যে 'work comes first in a person's life' সে কাজ ওকালতিই হোক, চাকরিই হোক, লেখালেখি বা অভিনয়ই হোক। কাজের মতো বড় নেশা আর নেই। কথায় বলে না 'WORKHOLIC' অ্যালকোহলের চেয়েও বড়ো নেশা কাজের নেশা। মক্কেলরা ভালো ভালো হুইস্কিই কি কম এনে দেয়? আমার জন্যে গয়না, পারফ্যুম, শাড়ি, বাংলাদেশ থেকে ইলিশ মাছ, লইট্যা, শুঁটকি, ঢাকাই শাড়ি। এমন ভাব করেন যেন তাঁরা সব দিয়ে ধন্য হচ্ছেন।

অরা বলল, তবু আমার মনে হয় এই ভাবনাটা ভুল তৃষা।

কেন মা? ভুল বলছ কেন?

প্রত্যেক মানুষেরই জীবিকা একটা থাকেই। কিন্তু সব জীবিকাই জীবনেরই জন্যে। জীবিকার দ্বারা উপার্জন করে সেই উপার্জিত অর্থ সুন্দর, সুস্থ আনন্দময় জীবনের জন্যে ব্যয় করা উচিত। জীবনে যদি একটুও সময় না থাকে, মানে সুন্দর জীবনযাপনের জন্যে, জীবিকাই যদি জীবনকে গ্রাস করে নেয় তাহলে তো বেঁচে থাকাই অর্থহীন। তোর অগ্নিকাকা কিন্তু এ কথাটা বোঝেন। তোর বাবাও বুঝতেন। অগ্নির রিটায়ারমেন্টের পরে বম্বের একটি অত্যন্ত নামি প্রাইভেট সেক্টর কোম্পানি ওকে তিনগুণ মায়না আর অঢেল পার্কস দিয়ে রিটেইনার নিয়োগ করতে চেয়েছিল। কিন্তু ও রিফিউজ করে দিয়ে কলকাতা চলে এল।

হয়তো সে তোমাদেরই জন্যে।

অপালা বলল।

তৃষা বলল, হয়তো আমাদেরই জন্যে। কিন্তু ওঁর এক বিশেষ ফিলজফি অফ লাইফ ছিল। হি ডিডনট বিলঙ টু দ্যা রান অফ দ্যা মিলস।

—অপালা বলল, জানো তোমাদের ঘোষ সাহেব যে এত সাকসেসফুল, ওঁর এত নাম, যশ, টাকা। কিন্তু মানুষটা টোট্যালি ফ্রাস্ট্রেটেড।

—অরা বলল, জানো অপালা, শুধু ব্যর্থতা থেকেই ফ্রাস্ট্রেশান আসে না, সাফল্য থেকেও আসে। আমি এমন অনেককে দেখেছি এ জীবনে যাঁদের ফ্রাস্ট্রেশানের মূলে তাঁদের প্রচণ্ড সাফল্য।

ব্যাপারটা খুবই কম্পলিকেটেড মা। তবে একথা হয়তো ঠিক যে প্রত্যেক মানুষের জীবনেই কিছু অপূর্ণ চাওয়া থাকা প্রয়োজন। সব কিছু পেয়ে গেলেই কি মানুষ তৃপ্ত হয়?

তৃষা বলল।

সে কথা ঠিক। নইলে রবীন্দ্রনাথের মতো অমন সফল্ল মানুষ অত অল্প বয়সে লিখতে পারতেন "কিছুই তো হলো না সেই সব, সেই সব, সেই অশ্রু সেই হাহাকার রব।"

এই গানটা অগ্নিকাকার গলাতে শুনেছ অপালা মাসি কখনো? না শুনলে একবার শুনো। চোখের জল ধরে রাখা যায় না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল সবাই।

অপালা বলল, রুরুকে দেখছি না।

সে ফেস্ট-এ গেছে। সেখানে তাদের ব্যান্ডের গান আছে। ফিরতে রাত হবে।

তৃষা বলল।

কী যে করবে আমার ছেলে, কে জানে? ওকে নিয়ে আমার বড় চিন্তা হয়।

কেন? পড়াশুনোতে তো ও ব্রিলিয়ান্ট।

পড়াশুনাই জীবনের ভালত্বর একমাত্র ক্ষেত্র নয় অপালা। তোমার যে ছেলেমেয়ে নেই একদিক দিয়ে তুমি বেঁচে গেছ। মা-বাবার জীবনে নিজেদের আনন্দ বলে আর কিছু থাকে না। ছেলেমেয়ের ভালত্ব-খারাপত্ব তাদের সুখ-দুঃখই নিজেদের কাছে প্রধান হয়ে ওঠে। এ এক বড় পরনির্ভর অবস্থা। মুখে বলে ঠিক বোঝাতে পারব না।

ল্যান্ড লাইনের ফোনটা বাজল।

তৃষা উঠে ধরল।

বলল হাই! অগ্নিকাকা! হ্যাঁ আছেন। নাও কথা বলো।

অপালার দিকে কর্ডলেসটা এগিয়ে দিয়ে বলল, অগ্নিকাকা তোমাকে চাইছেন।

অপালার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে গেল। বলল, সামান্য একটু ফিশফ্রাই তার জন্য আবার এত কথা।

উত্তরে অগ্নি কী বলল তা তো শোনা গেল না তবে অপালা ব্লাশ করল।

অরা কৌতুকের সঙ্গে কিন্তু গভীর মনোযোগের সঙ্গেও অপালার মুখের অভিব্যক্তি লক্ষ করছিল।

কিছুক্ষণ কথা বলার পরে অপালা বলল, ঠিক আছে। পরে কথা বলব। আপনি কি অরার সঙ্গে কথা বলবেন? না? ঠিক আছে। গুড ডে। বলে, কর্ডলেসটা ক্র্যাডল-এ নামিয়ে রাখল অপালা।

এমন সময়ে তৃষার মোবাইলটা বাজল।

তৃষার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

বলল, মা হর্ষদ। পুনে থেকে।

তারপর অপালাকে বলল, এক্সকিউজ মি, অপালা মাসি। আমি একটু আমার ঘরে যাচ্ছি।

অপালা ওর চলে যাওয়া দেখল। স্বগতোক্তির মতো বলল, প্রেমে পড়লে মানুষ মানুষি সবাই খুব সুন্দর হয়ে যায় না?

কী করে জানব বলো। একটু আগেই বলছিল না তৃষা যে, ওদের প্রেম নেই।

বাজে কথা।

অপালা বলল, তারপর বলল 'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে, কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে।'

এমন সময়ে ফোনটা আবার বাজল।

অরা উঠে গিয়ে রিসিভারটাই তুলল। বলল, বলছি।

অপালা বুঝল যে সম্ভবত অগ্নির ফোন। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ফ্রাইগুলো খেয়ো। কড়া করে ভেজেছে, মাস্টার্ড দিয়ে খেতে ভালো লাগবে।

কানে ফোন লাগানো অরা মুখে কথা না বলে নীরবে মাথা হেলাল।

দ্যাখ রুরু ম্যাকলাস্কি'জ নোজ।

সামনের সিটে বসা গাড়ির জানালা দিয়ে দেখল অগ্নি রুরুকে। ড্রাইভার গাড়িটা দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল অগ্নির নির্দেশে।

এ গাড়িতে রুরু, অগ্নি, নরেশ ও ব্রতীন আছে। অগ্নি ড্রাইভারের পাশে। আর ঘোষ সাহেবের গাড়িতে অরা, অপালা আর স্মিতা। চুমকিরও আসার কথা ছিল কিন্তু ওর মায়ের জ্বর তাই আসতে পারেনি ও। সামনের গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়াতে পেছনের গাড়িও দাঁড়াল। ওরা সকলেই নামল গাড়ি থেকে। ঘোষ সাহেব তাঁর গাড়ির ড্রাইভারের পাশে বসেছেন। সবাই মিলে দেখল ম্যাকলাস্কি'জ নোজ। ছবিও তুলল। নরেশ এবং স্মিতা। অপালা ক্যামেরা এনেছে কিন্তু সেটা এখনও স্যুটকেস থেকে বের করেনি। থিতু হয়ে বের করবে।

হাজারিবাগেই যাবে ভেবেছিল কিন্তু ব্রতীনের এক বন্ধুর বাড়ি থাকাতে ম্যাকলাস্কিগঞ্জেরই দিকে বেরিয়ে পড়ল ওরা। খুব ভোরে বেরিয়েছিল ওরা কলকাতা থেকে সন্ধের আগে আগেই পৌঁছে যাবে বলে। এখান থেকে আর দশ-পনেরো মিনিট লাগবে পৌঁছোতে। গাড়ি নিয়ে না এলেও হত। এখন শক্তিপুঞ্জ ট্রেন হয়ে গেছে। দুপুরে কলকাতা ছেড়ে রাত দেড়টাতে ম্যাকলাস্কি পৌঁছোয়। আগে বলে রাখলে ট্যাক্সিও আসে স্টেশনে। অনেক গেস্ট হাউস হয়েছে এখন থাকার মতো।

ব্রতীন বলল, 'একটু উষ্ণতার জন্যে' উপন্যাস পড়েই সব মানুষে আসেন এখানে।

অপালা বলল, ব্যারিস্টার ও লেখক সুকুমার বোস এবং তাঁর অল্পবয়সি পাঠিকা ছুটির জন্যে এ জায়গাটা রোম্যান্টিক ট্যুওরিস্টদের টেনে আনে।

অরা ফিস ফিস করে অপালাকে বলেছিল হাজারিবাগের সঙ্গে এই জায়গাটার অনেকই মিল আছে তবে অমিলও কম নেই।

মন খারাপ করছিস কেন? অগ্নিদা তো বলেছেন হাজারিবাগেও নিয়ে যাবেন আমাদের। তোদের বিক্রি হয়ে যাওয়া বাড়ি দেখাবেন। এখন তো কোডারমা স্টেশনে নেমে বড়হি হয়ে তিলাইয়া ড্যাম-এর পাশ দিয়ে হাজারিবাগে যাওয়া খুবই সহজ বলেই শুনেছি।

অরা বলল, আমরা তখন বগোদর হয়ে, সারিয়া হয়ে হাজারিবাগ রোড স্টেশনে নেমে আসতাম এবং যেতাম। তখন ঝুমরি তিলাইয়ার নাম শুনতাম বটে তবে তিলাইয়া ড্যামের কাজ সবে আরম্ভ হয়েছে হয়তো তখন। আমরা খুব ছোটো ছিলাম। দামোদর ভ্যালি করপরেশান দামোদরের বাৎসরিক বান ঠেকাতে তিলাইয়া, পাঞ্চেত, মাইথন এই সব বাঁধ বানান ভারত সরকার আমেরিকার টেনিসি ভ্যালি করপরেশানকে মডেল করে। প্রত্যেক ড্যামের সঙ্গেই হাইডাল প্রজেক্ট ছিল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জলাধার হওয়াতে প্রতিটি জায়গাতেই অনেক গ্রামকে সরিয়ে দিতে হয়েছিল। তারা সব গিয়ে অন্যত্র নতুন গ্রামের পত্তন করেছিল। বিরাট সব ক্রিয়াকাণ্ড।

তারপর বলল, তপন সিংহ "পঞ্চতপা" নামের একটি ছবি করেছিলেন না এইরকম কোনো একটি বাঁধের প্রস্তুতির পটভূমিতে? মা ছবিটি দেখে এসে খুব উত্তেজিত হয়ে আমাদের গল্প করেছিলেন। তখন আমরা নীচু ক্লাসে পড়ি। ছবি দেখার অনুমতি ছিল না।

ব্রতীন পেছন থেকে ড্রাইভারকে বলল, একটু আস্তে করো ভাই। এই চড়াইটা থেকে নেমেই ডানদিকে একটা গেট পাবে—গেটটা একটু ভিতরে ঢোকানো। সেই গেটে হর্ন দিতে হবে।

সেই গেটে গাড়ি পৌঁছোলে ব্রতীন ডানদিক থেকে নেমে গেটের কাছে গিয়ে বলল, তালা খুলেই রেখেছে। তার মানে কেয়ারটেকার খবরটা পেয়েছে।

তিনি এত তাড়াতাড়ি খবর পেলেন?

জানি না, ইন্দ্রজিৎ হয়তো মিস্টার ক্যামেরণকে ফোন করে দিয়েছিল।

বাড়ির ভিতরে দুটো গাড়িই ঢুকে এল। অগ্নি বলল, রুরু, যাতো, গেটটা বন্ধ করে দিয়ে আয়। নইলে গোরু কী ছাগল ঢুকে বাগান নষ্ট করে দেবে। যদিও এখানে গোরু ছাগল কমই আছে।

রুরু বলল, তারা সব এখন শহরে ভিড় করেছে।

গেট বন্ধ করে রুরু এরই মধ্যে বাড়িটা সার্ভে করে এসে বলল, বাড়িটা একটা পাহাড়ের চুড়োতে। পেছন দিকে পাহাড়টা অনেকখানি নেমে গিয়ে একটা উপত্যকাতে মিশেছে।

ব্রতীন বলল উপত্যকাতে শুনেছি মিস্টার ক্যামেরণের স্টার্ড-ফার্ম ছিল—ঘোড়া ব্রিডিং করাতেন উনি। সেই ফার্ম এখন বন্ধ করে দিয়ে হোটেল খুলেছেন উনি স্টেশনের কাছে। ওখানেই আগে মিসেস কার্নি একটি হোটেল চালাতেন, একটু ভিতর দিকে। দু কামরার হোটেল।

তুই এত জানলি কী করে?

অগ্নি বলল।

আমি যে গত ত্রিশ বছরে বহুবার এসেছি এখানে। এখানের নাড়িনক্ষত্র সব আমার জানা। এখানে আমিও একটা ছোটো কটেজ কিনব ভেবেছিলাম। তখন জলের দর ছিল। এখন দাম বেড়ে গেছে।

চল আমরা তিনজনে মিলে একটা কিনি। নরেশ বলল।

আমাদের কারোই তো উত্তরাধিকারী নেই। কে দেখবে আমাদের পরে?

তারচেয়ে ঘোষ সাহেবই কিনে ফেলুন একটা।

আমার কি উত্তরাধিকারী আছে?

ঘোষ সাহেব বললেন।

রুরু বলল, তা নিয়ে চিন্তা করছ কেন অগ্নিকাকু। আমাকে দিয়ে দিয়ো।

সকলেই রুরুর কথাতে হেসে উঠলেন।

অরা বলল, বড়দের কথার মধ্যে কথা বলো না রুরু। দিন দিন তোমার ম্যানারস গোল্লায় যাচ্ছে। ওকে একটু শাসন করতে পারিস না তৃষা?

আরে খারাপই বা কী বলেছে রুরু?

ঘোষ সাহেবসুদ্ধ ওঁরা সকলেই বলে উঠলেন একসঙ্গে।

ততক্ষণে বাড়ির কেয়ার টেকার মুখার্জিবাবু এসে নমস্কার করে দাঁড়ালেন। আদিবাসী পরিচারিকা জীরুয়াও এসে নমস্কার করল। একজন আদিবাসী কাজের লোক, জানি। ওর পুরো নাম জানি ওঁরাও।

ব্রতীন আর অগ্নি মুখার্জিবাবুকে আড়ালে ডেকে নিয়ে তাঁর হাতে দু হাজার টাকা দিয়ে বললেন, এটা রাখুন। ফুরিয়ে গেলে বলবেন। রাতে কী খাওয়াবেন আমাদের?

যা বলবেন স্যার।

আজ তো জোগাড় যন্ত্র করতে সময় লাগবে। আমরাও সারা দিন জার্নি করে ক্লান্ত। আজ মুগের ডাল আনিয়ে চালে-ডালে খিচুড়ি করে দিতে বলুন। সঙ্গে কড়কড়ে করে আলুভাজা আর ডিম ভাজা। শুকনো লংকাও ভাজতে বলবেন। কাল মুরগি ও ডিম নিয়ে আসবেন বেশি করে। এখানে হাট কবে? ভুলে গেছি।

হাট কালকে।

তবে তো আমরা কাল সকলেই হাটে যাব। তবে হাট লাগতে লাগতে তো দুপুর হয়ে যাবে।

কাল তাহলে লাঞ্চে এগ-কারি, ডাল আর একটা সবজি ও স্যালাড করুন। ডিমের কারিতে বেশি করে কারি পাতা দিতে বলবেন। কিচেনের পাশেই তো গাছ।

তা ঠিক। পাঠার মাংস আর শুয়োরের মাংস দুই-ই আনব কালকে হাট থেকে। আপনার কাজের মেয়েটি কি পর্ক-এর ভিন্ডালু রাঁধতে পারবে?

ভিন্ডালু পারবে না হয়তো। এমনিই ওরা শুয়োরের মাংস যেমন করে খায় ঝালটাল দিয়ে রাঁধে, তেমন করে রাঁধতে পারবে।

ব্রতীন বলল, ভিন্ডালু না হয় আমিই রাঁধব।

অগ্নি বলল, এখানে ভালো মহুয়া পাওয়া যাবে মুখার্জিবাবু?

মুখার্জিবাবুর হয়ে ব্রতীন বলল, হ্যাঁ। হ্যাঁ।

তাহলে মহুয়া আনবেন তো আজই তিনবোতল। আমি ডক্টর করে নেব।

ব্রতীন বলল।

ঠিক আছে।

ডক্টর করবি কী করে?

অগ্নি বলল, আরে, বাড়ির মালিক ইন্দ্রজিৎবাবুকে একজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সাহেব শিখিয়ে গেছিলেন।

কী করে করতে হয়?

একটা তাওয়াতে লবঙ্গ আর চিনি লাল করে ভেজে বোতলের মধ্যে ফেলে দিয়ে খুব ভালো করে ঝাঁকিয়ে তারপর ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে অন্য বোতলে ঢালতে হয়। তখন তার রং হয়ে যায় হুইস্কির মতো। আর খেতেও চমৎকার। যে জানে না, তাকে বিলিতি জিনিস বলে খাইয়ে দিলে সে মহা আহ্লাদ করে খাবে।

মুখার্জিবাবু বললেন, আমি তাহলে বেরুই একটু দোকানের দিকে। আপনারা চান করবেন তো? জল তোলার জন্যে আলাদা লোক আছে। কুয়ো থেকে জল এনে বাথরুমে দিয়ে দেবে। দুটি বাথরুম আছে। গরম জল লাগলেও বলবেন দিয়ে দেবে আলাদা বালতিতে। বাইরে কাঠের উনুনে জল গরম হচ্ছে। সকালে আর রাতে দু বেলাতেই হয়।

ঠিক আছে।

নরেশ বলল, বড়ো বাথরুমটা মেয়েদের জন্যে ছেড়ে দেওয়া যাক। সঙ্গে একটি বড়ো ড্রেসিং রুমও আছে। আর অন্যটা আমরা ব্যবহার করি।

গিজার নেই বাথরুমে?

তৃষা এসে বলল।

তা নেই কিন্তু গরম জলের কোনো অসুবিধে হবে না। মায়েদেরও বলো চান করার আগে বললেই বাথরুমের পিছনের দরজা দিয়ে এনে দেবে।

পেছনটাতে যা জঙ্গল। বাঘ ভাল্লুক ঢুকে পড়বে না তো!

অগ্নি বলল, নারে মা। এই ব্রতীন কাকা বাড়ির মালিকের সঙ্গে কতবার এসে থেকে গেছে এখানে। জায়গাটা অবশ্যই জঙ্গুলে। একসময়ে হয়তো সব জানোয়ারই ছিল। কিন্তু এখন শুয়োর আর ক-টি ভাল্লুক ছাড়া কিছু নেই। শেয়াল আছে অবশ্য। কী বল ব্রতীন?

ঠিকই বলেছিস।

ওরা সকলে চানটান করে, সঙ্গে করে আনা চা, কুরকুরে, পোট্যাটো চিপস ইত্যাদি খেয়ে ফ্রেশ হয়ে বারান্দার সামনে চেয়ার পেতে বসেছে। ব্রতীন বলল সন্ধের পরেই মনোরম হয়ে যায় আবহাওয়া এখানে। কত রকম পাখি ডাকছিল শেষ বিকেলে লক্ষ্য করেছিস? মনে হচ্ছিল বাড়িতে যেন পাখিদের ডাকাতই পড়েছে। ম্যাকলাস্কিগঞ্জে দু-একজনের বাড়িতে টেবিল পাখা আছে অথবা পেডেস্টাল

ফ্যান—সিলিং ফ্যান প্রায় কারও বাড়িতেই নেই। এপ্রিলের মাঝামাঝি অবধি রাতে গায়ে চাদর দিয়ে শুতে হয়। বাইরে বসলেও পাতলা সোয়েটার বা চাদর লাগে। টাক থাকলে, টুপি। কখনোই ফ্যান লাগে না। বৃষ্টি নেমে গেলে আবার চাদরও চড়াতে হয়।

কী কী দেখার জায়গা আছে এখানে?

অপালা শুধোলো।

এখানে সবই তো দেখার জায়গা। চামা থেকে বাঁদিকে ঘোরার পরেই তো জঙ্গলে জঙ্গলে পথ। দু-পাশে পাহাড়। দেখলেন না সব জায়গাই পিকনিক করার জায়গা। তবে বিশেষ পিকনিক স্পট হচ্ছে চাট্টি নদী। ভারী সুন্দর জায়গাটা। তবে বর্ষাকালে আরও সুন্দর হয়।

বলেই, রুরুর দিকে চেয়ে ব্রতীন বলল, জানো তো রুরু। চাট্টি নদীতে পিকনিক করতে যাওয়া এক সাহেবের পেছন খুবলে নিয়েছিল এক ভাল্লুক। শখ করে বানানো নতুন ট্রাউজারের দেড় গিরে কাপড় খামচে নিয়েছিল। তোমার ট্রাউজারটাও তো দেখছি নতুন। চাট্টি নদীতে গেলে সাবধানে থেকো তুমি।

সকলেই হেসে উঠল ব্রতীনের কথা শুনে।

তারপর ব্রতীন বলল, আরেকটি সুন্দর জায়গা ম্যাকলাস্কিগঞ্জ স্টেশন। কোনো উঁচু প্লাটফর্ম নেই। গ্রাউন্ড লেভেল-এর প্লাটফর্ম। উলটোদিকে শাল জঙ্গল। জানি না এখনও আগের মতো আছে কি না!

শেষ কবে এসেছিলি তুই?

অগ্নি জিজ্ঞেস করল।

তা বছর তিনেক তো হবেই।

অরা বলল, "একটু উষ্ণতার জন্যে"-তে ওই স্টেশনের কথাও পড়েছি।

নয়নতারার প্রেমিক শৈলেন যেখানে আত্মহত্যা করেছিল?

অপালা বলল।

হুঁ। অরা বলল। আর শুধু কি তাই-ই? সেই প্লাটফর্মে তো মিস্টার কাব্রালের মুণ্ডুহীন ভূত রাতের বেলা টুপি হাতে পায়চারি করে।

তৃষা বলল, উরি বাবা।

ব্রতীন বলল, গভীর শুনশান রাতে তো স্টেশনে যাব না আমরা তাই কাব্রাল সাহেবের ভূত হয়তো দেখাতে পারব না কিন্তু মিসেস কার্নির চায়ের দোকানটা এখনও আছে। এদিকে বারকাকানা আর ওদিকে ডালটনগঞ্জ থেকে যে দুটি প্যাসেঞ্জার সকালে বিকেলে যাওয়া-আসা করে এদিকে গোমিয়া, পত্রাতু, রায় এসব স্টেশন আর ওদিকের ডালটনগঞ্জ, ছিপাদোহর, লাতেহার, মহুয়ামিলন, ওইসব স্টেশন থেকে। তাদের যাত্রীরা নেমে গরম গরম চা আর নিমকি-শিঙাড়া খায় আজও মিসেস কার্নির দোকান থেকে। মিসেস কার্নি যদিও দেহ রেখেছেন অনেকই দিন হল। তাঁর এক কর্মচারী মাজিদ এখন চালায় দোকানটি। তার চুলেও নিশ্চয়ই পাক ধরেছে এতদিনে।

ঘোষ সাহেব বললেন, যাই বলুন আর তাই বলুন মশায়, জায়গাটা এখনও একটা আউট-অফ-দ্যা-ওয়ার্ল্ড প্রেস রয়ে গেছে কোনো ফেয়ারি টেলস-এর বইয়ে বর্ণিত জায়গার মতো। অথচ রাঁচী থেকে মাত্র পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে।

ব্রতীন বলল, রাঁচী এখন রাজধানী হয়ে গেছে নতুন স্টেট ঝাড়খণ্ড-এর। রাঁচীতে খুবই কনজেসশান হওয়াতে ম্যাকলাস্কির কাছেই নতুন রাজধানী তৈরি হচ্ছে। তাই এই জায়গাটা আর বেশিদিন এমন নির্জন থাকবে না। জমি বাড়ির দামও বেড়ে গেছে প্রচুর। আগে সব বাংলো বাড়ি ছিল বহু বিঘা

জায়গার উপরে এবারে হয়তো পাকা বাড়ি হতে শুরু হবে। মালটিস্টোরিড হবে। সর্বনাশ হবে "একটু উষ্ণতার জন্যের" ম্যাকলাস্কিগঞ্জের।

অগ্নি বলল, শুনেছি সাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরীর ছেলেবেলার কিছুটা কেটেছিল এখানে। তখন স্টেশানটির নাম ছিল আস্তাহল্ট। তাঁর বিখ্যাত গল্প 'ভারতবর্ষ' এই আস্তাহল্ট স্টেশন নিয়েই লেখা নাকি। যুদ্ধের সময়ে ব্রিটিশ টমিদের ব্রেকফাস্ট খাওয়ার জন্যে ট্রুপস ট্রেইন এখানে দাঁড়াত তাই মুখে মুখে স্টেশনের নাম হয়ে গেছিল আস্তাহল্ট।

ব্রতীন বলল, সেই সময়ে, মানে চল্লিশের দশকে, ফুটফুটে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়েরা গোরুর গাড়ি চালিয়ে যেত, খেতে কাজ করত গান গাইতে গাইতে। এখানে চার্চ ছিল, ক্লাব ছিল। এখনও আছে ক্লাব, যদিও ছাগল চরে বেড়ায়। তবে চার্চ এখনও আছে। দিশি পাদরিরা আছেন সেখানে। তবে ক্রিশ্চান এখন আর খুব বেশি নেই হয়তো।

নরেশ বলল, কাল হাট আছে। মেয়েরা কি হাটে যেতে চান? আমরা পাঁঠা আর শুয়োরের মাংস কিনব। তরি-তরকারি যা পাব। মোরগা-আন্ডা।

থাকাতো হবে মোটে আড়াইদিন। আপনাদের ফিরিস্তি শুনে মনে হচ্ছে মাসখানেকই থাকা হবে বুঝি।

অরা বলল।

তারপর বলল, যে-কোনো দেহাতি জায়গাতে হাট একটা অবশ্য দ্রষ্টব্য জায়গা। স্পেশালি টু হ্যাভ আ ফিল অফ দ্যা প্লেস। আমরা অবশ্যই যাব। হাজারিবাগের আশেপাশের কত হাটে যেতাম ছেলেবেলাতে।

ব্রতীন বলল, একমাস থাকতেও অসুবিধে নেই। ইন্দ্রজিৎবাবু তো চানই যে তার বাড়িতে মানুষে যান। গিয়ে থাকুন। তাঁর ছবির মতো একটি বাড়ি আছে শান্তিনিকেতনেও, অর্কিডে ভরা দারুণ বাগান। উনি প্রতি উইক-এন্ডে সেখানেই যান। এখানে আজকাল আসতে প্রায় পারেনই না। আমরা একমাস ইচ্ছে করলে থাকতেই পারি। ওঁর কোনো অসুবিধে নেই।

নরেশ বলল, অসুবিধে আমাদেরও কারও নেই শুধু ঘোষ সাহেবের ছাড়া। তার তো মিনিটে হাজার। বহতই লস হয়ে যাবে।

থাকলে, তৃষা বলল, আমার নতুন চাকরিটাও যাবে।

রুরু বলল, কলেজে আমি ফেইল করব। মায়েরও তো স্কুল আছে। হেড মিস্ট্রেস না থাকলে স্কুল কি চলবে?

অগ্নি অপালাকে বলল, তাহলে দেখা যাচ্ছে আমরা তিনজন রিটায়ার্ড বন্ধু আর আপনিই কেবল মুক্ত পুরুষ ও নারী। আর সকলেরই বন্ধন আছে।

অপালা বললেন, আমার থাকতে আপত্তি নেই আপনাদের সঙ্গে।

ঘোষ সাহেব বললেন, আমারও তোমাকে ছেড়ে যেতে আপত্তি নেই। আমার কাজ তো সব করে কেষ্টা আর রাম, আর ড্রাইভার কালু সিং। আমি, অরা তৃষা আর রুরু আমার গাড়ি নিয়ে ফিরে যাব। অগ্নিবাবু আর তাঁর বন্ধুরা থেকে যাবেন ওঁর গাড়ি নিয়ে। তোমরা থেকেই যাও না। বন্ধন-মুক্তি সবসময়েই ভালো বিরহ যত দীর্ঘ হয় ততই তো মিলন মধুরতর হয়। তাই না?

কাট......অরা বলল।

নীচু গলাতে বলল, তৃষা আর রুরুকে। তোমরা যাও না, একটু হেঁটে এসো না বাগানে, কত রকম বড় বড় গাছ আছে, দ্যাখো তো কতগুলো গাছের নাম জানো তোমরা?

ওরা দুজনে উঠে গেল।

অগ্নি চাপা স্বরে বলল, এটা তোমার বাড়াবাড়ি অরা। তুমি একটু বাড়াবাড়ি রকমের কনসার্ভেটিভ। ওরা কি ছোট আছে? তাছাড়া আমাদের চেয়ে ওরা বেশি ছাড়া কম ম্যাচিওরড নয়। ওদের এমন করে ট্রিট করলে ওরা ইনসালটেড ফিল করতে পারে। দিস ইজ নট ডান।

অরা চুপ করে রইল। কোনো জবাব দিল না।

তারপরে অগ্নি নরেশকে বলল, তুই তো একটা দড়কচ্চা মেরে যাওয়া ব্যাচেলর। তুই মিলন-বিরহর কী জানিস রে?

সকলেই ওই কথাতে হেসে উঠল। একটু পরে অরা বলল, তোমার কথার জের টেনেই বলছি, জীবনে সব জিনিসেরই সময় আছে। ওয়াল্ট হুইটম্যানের সেই কবিতাটি আছে না?

কোন কবিতার কথা বলছ অরা?

অগ্নি বলল।

আরে! ওয়াল্ট হুইটম্যানের, LEAVES OF GRASS-এ আছে না কবিতাটি?

বলো না কোন কবিতা?

"ALL TRUTHS WAIT, IN ALL THINGS,
THEY NEITHER HASTERN THEIR OWN DELIVERY NOR RESIST IT,
THEY DO NOT NEED THE OBSTERIC FORCEPS OF THE SURGEON"

তোমার উদ্ধৃত এই কবিতাটি তো আমারই বক্তব্যর পক্ষে গেল।

যে যেমন মানে করবে।

অরা বলল।

১৭

বেশ কিছুক্ষণ পরে মুখার্জিবাবু বাজার নিয়ে ফিরে এলেন। হাতে টর্চ আর থলে। উনি অপরাধীর গলাতে বললেন ওই জিনিসটা পাওয়া গেল না স্যার। কাল অবশ্যই পাওয়া যাবে।

কোন জিনিসের কথা বলছেন উনি?

অপালা বলল।

কাল পেলে বলব।

আপনাকে টেস্ট করতে দেব।

ব্রতীন বলল।

জিনিসটা কী?

মহুয়া।

ঈসস। ভদ্রলোকে মহুয়া খায়!

মুখ বিকৃত করে বলল অপালা।

আমরা তো ভদ্রলোক নই। মানে, অগ্নি আমি আর নরেশ।

অনেক ভদ্রলোকেই খায়। তার উপরে আমি এমন করে DOCTOR করে দেব না!

ভদ্রলোকেরা খেলেও খেতে পারে। কোনো ভদ্রমহিলা কখনোই খান না।

ঘোষ সাহেব বললেন, দেখলেন তো বুর্জোয়া অ্যাটিট্যুড। সব ব্যাপারে একটা সুপিরিওরিটি কমপ্লেক্স।

রান্না কটা নাগাদ হয়ে যাবে মুখার্জিবাবু?

ব্রতীন জিজ্ঞেস করল।

আমরা কি একটু সাহায্য করব গিয়ে?

অরা বলল।

না, না আজকে তো খিচুড়ি, ডিম ভাজা আর আলুভাজা হচ্ছে। কোনো দরকার নেই।

শুকনো লংকা ভাজতে বলতে ভুলে যাবেন না যেন মুখুজ্যেমশায়।

আজ্ঞে না।

মুখার্জিবাবু চলে গেলে ব্রতীন বলল, কাল দুপুরেও আন্ডাকারি একটা ডাল আর একটা সবজি। কারিপাতা দিতে বলেছি ডিমের ডালনাতে বেশি করে। কিচেনের পাশেই দুটো গাছ আছে।

কারিপাতা গাছ? কী দারুণ! চলো অপালা, দেখে আসি।

—উত্তেজনার কোনো কারণ নেই। কাল সকালে দেখলেই চলবে। এখানে আরও কত কী দেখার আছে। খয়ের গাছ, কুঁচফল-এর গাছ।

কুঁচফলটা কী ফল অগ্নিকাকা! আঁশফলের মতো?

তৃষা বলল।

দূর বোকা মেয়ে। কুঁচফল আগেকার দিনের স্যাকরারা সোনা ওজন করার সময়ে ব্যবহার করতেন, সোনা ওজন করতেন পেতলের হালকা ছোট্ট দাঁড়িপাল্লাতে। উজ্জ্বল, মসৃণ লাল আর কালো রঙের হয় ছোটো ছোটো ফলগুলো। শীতকালে হয়। এ বাড়িতেই আছে গাছ। শীতকাল হলে ফলও দেখতে পেতে।

নরেশ বলল, একটা কথা এখনই পরিষ্কার করে বলে দেওয়া ভালো।

কী কথা?

মহিলারা এখানে কিচেনে যাবেন না। কিচেন আপনাদের জন্যে আউট-অফ-বাউন্ডস। অগ্নির ভাষাতে, "দড়কচ্চা মারা ব্যাচেলররাই" যা রান্না-বান্না করার তা করব। ঘোষ সাহেব সংসারী মানুষ। তাছাড়া ডাকসাইটে ব্যারিস্টার। তাঁকেও রান্নাঘরে ঢুকতে দেওয়া হবে না। আপনাদের কোনো অসুবিধা হলে তখনই বলবেন।

ঘোষ সাহেবও বললেন, সময় চলিয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায়। সাতটা তো বাজতে চলল। দড়কচ্চা-মারা ব্যাচেলরেরা গ্লাস-টাস-এর বন্দোবস্ত করুন। শিভাস রিগ্যালের বোতল আছে চারটে আমার ব্যাগে।

কোন ব্যাগে?

ওই কালো ব্যাগটাতে। স্মিরনফ ভদকাও আছে। একটি ভ্লাডিভারও আছে। বিয়ারও এনেছি। ফস্টার বিয়ার। বরফ হবে তো ফ্রিজে?

এখানে ফ্রিজ নেই। গরমে তো বিশেষ কেউ আসেন না এখানে। আর শীতটা এমনই জব্বর পড়ে যে তখন বরফের দরকারই হয় না। এখনও কুঁয়োর জল বরফের মতোই ঠান্ডা।

যা করার তাড়াতাড়ি করুন মশায়। নটার সময়ে খিচুড়ি রেডি হয়ে যাবে। ফ্রুট জ্যুস, পেপসি, কেক সব আছে। মেয়েরা কে কী খাবেন?

ব্রতীন অরাকে বলল, আপনি কী খাবেন?

কিছু না। এক গ্লাস জল খাব শুধু।

নরেশ বাড়ির ভিতরে গেল সব বন্দোবস্ত করতে।

ব্রতীন গলা তুলে ডাকল তৃষা, রুরু তোমরা সব কোথায় গেলে। আরে, জঙ্গুলে জায়গা। টর্চ না নিয়ে যেয়ো না। সাপ বিছেতে কামড়ে দেবে।

সাপ আছে না কি এখানে?

অরা আতঙ্কিত গলাতে বলল।

সাপ নেই মানে? সাপ, কাঁকড়া বিছে, কী নেই? তবে এখনও তো তেমন গরম পড়েনি। গরমের সময়েই প্রকোপ বাড়ে।

আপনারা কিছু মনে করবেন না ঘোষদা, আমি পা-টা তুলে বসছি, বলে, একটা খালি চেয়ার টেনে নিয়ে তার উপরে পা দুটি তুলে বসল অরা।

ঘোষ সাহেব বললেন, আহা। এতদিন শুধু অরার মুখটিই দেখেছি। কী সুন্দর পায়ের পাতা দুটি অরার। সাপ বা বিছের তো কামড়াতে ইচ্ছে করতেই পারে আমার কিন্তু চুমু খেতে ইচ্ছে করছে। সত্যি। পায়ের পাতা থেকে মাথার সিঁথি পর্যন্ত এমন সুন্দরী কলকাতা শহরে অরার মতো আর আছেন কি না জানা নেই।

আপনিও ফ্লার্ট করেন তা তো জানতাম না। আপনি আর ক'জন মহিলা দেখলেন জীবনে। মোটা মোটা মক্কেল আর টেকো-টেকো জজসাহেবদের দেখেই তো জীবন কাটল আপনার।

অরা বলল।

সকলেই সে কথাতে হেসে উঠল। এমনকি ঘোষ সাহেব নিজেও।

নরেশ বলল, অরা দেবীর মাথার সিঁথি, মুখ আর পায়ের পাতা ছাড়া আর কিছু কি দেখেছেন আপনি?

অরা কপট রাগ দেখিয়ে বলল, বড় বাজে রসিকতা করেন আপনারা।

নরেশ বলল, আমরা মানুষগুলোইতো থার্ড গ্রেড—তবে অগ্নি আর ঘোষ সাহেব আমাদের মধ্যে পড়েন না।

একটু পরে রুরু আর তৃষা কাছে এল।

কী কী গাছ দেখলে?

অন্ধকারে কি গাছ চেনা যায়? বেঁটে গাছ, লম্বা গাছ, সরু গাছ, মোটা গাছ এই সবই দেখলাম।

রুরু বলল, আমরা একটা করে কোক খাই অগ্নিকাকা? আর একটু কুরকুরে।

অরা বলল, ওসব বেশি খেয়ো না। নটাতে ডিনার সার্ভড হবে। খিদে নষ্ট হয়ে যাবে।

নরেশ, জানি ওঁরাওকে সঙ্গে করে গ্লাস জলের বোতল এবং হুইস্কির বোতলও নিয়ে এল। ভদকাও।

তারপর বলল, সোডা লাগবে কারও? আমি নিয়ে এসেছি দু ক্রেট।

এখানে যেন সোডা পাওয়া যেত না?

ব্রতীন বলল।

এখানে পাওয়া যাবে না?

গাড়িতে জায়গা ছিল। ভাবলাম, যদি দরকার হয়। স্প্রাইট আর লিমকাও এনেছি। যদি কেউ ভদকার বা জিন-এর সঙ্গে খায়। আমার কাছে জিন আছে।

—টনিক এনেছিস না কি?

ব্রতীন বলল।

—এ কি বম্বে নাকি যে পানের দোকানেও টনিক পাওয়া যাবে। বড় বড় ক্লাব ও হোটেল ছাড়া কলকাতাতে তো টনিক পাওয়াই যায় না।

অপালা, আপনাকে কি স্প্রাইট দিয়ে একটা জিন বানিয়ে দেব? অথবা ভদকা?

নিতে পারি যদি অরা আর অগ্নিবাবু গান শোনান। এমন পরিবেশ। গান শোনার এমন জায়গা কী আর পাওয়া যাবে?

ব্রতীন বলল, তা তো শুনতেই হবে। এই আড়াই দিন শুধু গানই শুনব।

রুরু বলল, 'গান ভালবেসে গান'।

বাঃ! ভেরি গুড। রুরু কোকটা নিয়ে এসে তুই বাংলা ব্যান্ডের 'গান ভালবেসে গান'টা দিয়েই শুরু কর আজকের সান্ধ্য আসর। গিটারটাও আনতে ভুলিস না।

আচ্ছা, তৃষা গান গায় না কেন?

ঘোষ সাহেব বললেন।

তৃষার গলাটা চাপা। কিন্তু গান ও খুব সুরেই গায় রুরু অথবা হর্ষদেরই মতো। কিন্তু গাইতে একেবারেই চায় না। গানটা ভালোবাসার জিনিস, প্রাণের জিনিস, জোর করে কি কারোকে দিয়ে গান গাওয়ানো যায়? তাও এতবড় মেয়েকে।

তা অবশ্য ঠিক।

ঘোষ সাহেব বললেন।

নরেশ বলল, "দুটো ঘুঘু পাখি দেখিয়ে আঁখির মতো" আরও কিছু গান কি আছে আপনার স্টকে, ঘোষ সাহেব?

না মশাই। ওই এক এবং অদ্বিতীয়ম্।

তাহলে ওই গানটাই আরেকবার শুনব।

সকলেই বলে উঠল, তাই সই।

যার যার গ্লাসে চুমুক দেওয়া হলে ব্রতীন বলল, তুই-ই শুরু কর অগ্নি।

দাঁড়া দাঁড়া। একটা খাই। নইলে আমার গলা সুরে বলে না। আর দেখছিস তো অরা আছে। ও অসুরদের একেবারেই সহ্য করতে পারে না।

তারপর বলল, ফর আ চেঞ্জ এবং অরার হাজারিবাগের অনুষঙ্গ মনে করে ছোট্ট একটা ব্রহ্মসংগীত গাইব প্রথমে?

ছোট্ট কেন? বড় গাইতেই বা ক্ষতি কী?

যে গানটি গাইব সেটি দিল্লির সুধীর চন্দ মশায় কিছু ব্রহ্মসংগীত আমাকে ক্যাসেট করে পাঠিয়েছিলেন, সেই ক্যাসেট থেকেই তোলা।

অপালা বলল, ইনি কোন সুধীর চন্দ? শান্তিনিকেতনে ছিলেন কি? অরূপ গুহঠাকুরতাদের ব্যাচ।

হ্যাঁ। তাই-ই তো। আপনি চিনলেন কী করে!

শান্তিনিকেতনেই দেখেছি। তখন আমি পাঠভবনে পড়তাম। একেবারে পুঁটকি মেয়ে ছিলাম।

তাই?

অবাক হয়ে বলল অগ্নি।

তারপর বলল, সুধীরদা তো দিল্লির চিত্তরঞ্জন পার্কে নিজের বাড়িতে একটা গানের স্কুলও চালান।

অপালা বলল, শুনেছি উনি আপনাদেরই মতো। ব্যাচেলর।

সুধীরদা কোনো বিবাহিতা ছাত্রীকেই তুমি বলে ডাকেন না। সে কিশোরী হলেও 'আপনি' বলেন।

কেন?

নরেশ বলল।

হয়তো কোনো "তুমি-সম্বোধিত" বিবাহিতা মহিলা তাঁকে কখনো দাগা দিয়ে থাকবেন।

ব্রতীন বলল।

সব জিনিসেরই কেন হয় না। আর মাত্রাতিরিক্ত কৌতূহলও অশিষ্টতা।

—তাই না অপালা?

অরা বলল।

সে তো বটেই।

এবারে গানটা ধর অগ্নি।

অগ্নি গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে ধরল :

"তাঁরে দূর জানি ভ্রম সংসার সংকটে
আছে বিভু তোমা হতে তোমারও নিকটে।
কেন তুমি নিরন্তর থাকো তা হতে অন্তর
ভাবো সেই পরাৎপর নিত্য অকপটে।
ভ্রম, সংসার সংকটে।"

অরা বলল, বাঃ। এ গানটি এতবছরে কখনোই তো শোনাওনি।

কখন শোনাব? তুলেইছি তো গতমাসে।

সকলেই বলল, ভারী সুন্দর।

নরেশ বলল, পুরো পরিবেশটা ব্রাহ্মসমাজ ব্রাহ্মসমাজ হয়ে উঠল যেন।

উদ্ভট যত কথা নরেশের।

ব্রতীন বলল। তুই ব্রাহ্মসমাজে গেছিস কখনো?

যাইনি? ভবানীপুরের গাঁজা পার্ক-এর কাছে টাবলুর মৃত্যুতে যে উপাসনা হয়েছিল তাতে যাইনি? তুইও তো গেছিলি।

আমি তো বহুবারই গেছি। তবে একদিন কোনো মৃতর স্মরণসভাতে গিয়েই তুই স্পেশালিস্ট হয়ে গেলি? কটি ব্রাহ্মসমাজ আছে তা জানিস?

ব্রাহ্মসমাজের বিল্ডিং বলছিস?

না রে, বিল্ডিং নয়। সমাজের কথা বলছি।

না।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এবং নববিধান সমাজ।

সেই জমায়েতে ব্রাহ্ম কেউই ছিলেন না।

একমাত্র অরা ছাড়া। তাও তো তার বিয়ে হয়েছিল হিন্দুর সঙ্গেই। কিন্তু এই অনধিকারীদের আলোচনাতে যে একেবারেই নীরব ছিল।

নরেশ বলল, অত সব ডিটেইলস তো জানি না ভাই, তবে একথা বলব যে ভবানীপুরের গাঁজা পার্কের কাছের বাড়িটির অবস্থা অতীব শোচনীয়। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এত বড় বড় এবং বড়লোক মানুষ ছিলেন এবং এখনও আছেন অথচ ওই বাড়িটির একটু সংস্কার সাধন কি করা যায় না? মনে হয়, ভেঙে পড়ে যাবে ক'দিন বাদেই।

তা বটে। ঘোষ সাহেব বললেন। ডাঃ বিধান রায় থেকে সিদ্ধার্থশংকর রায় থেকে সত্যজিৎ রায়, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, মানে অপর্ণা সেন-এর বাবা, ব্রাহ্ম, কে না ছিলেন বা আছেন?

অগ্নি বলল, এ প্রসঙ্গ থাক। এটা আমাদের এক্তিয়ার বহির্ভূত-ও বটে। অন্য প্রসঙ্গে যাওয়া যাক।

ঘোষ সাহেব বললেন, তা ঠিক।

অরা বলল, যে গানটা গাইলে ওটি কার লেখা?

ওটি কালীনাথ রায়ের লেখা। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা একটি গানও আমি জানি।

গেয়ে শোনান না।

ঘোষ সাহেব বললেন।

পরে হবে। এখন গাইলে ওভারডোজ হয়ে যাবে।

তবে অন্য একটি গান শোনাতে পারি। অসাধারণ গান একটি।

কী গান?

"কেন ভোলো মনে করো তাঁরে যে সৃজন পালন করেন এ সংসারে।" উপনিষদের একটি বিখ্যাত শ্লোক 'জবনো অপানিপাদো' ইত্যাদির বাংলা তর্জমা করে নিমাইচরণ মিত্র মশায় সুরারোপও করেছিলেন।

অগ্নি তারপর বলল, আমরা কেবল রবীন্দ্রনাথকেই জানি। কিন্তু ঠাকুর পরিবারের অন্যান্য বহু মানুষই যে সাহিত্যে, গানে, ছবি আঁকাতে অসাধারণ প্রতিভাবান ছিলেন সে খবর আমরা খুব কম জনেই রাখি। বহুবছর আগে এক গ্রীষ্ম সন্ধ্যাতে দিল্লির মিরান্ডা হাউসের লন-এ একটি অনুষ্ঠান করেছিলেন সুধীর চন্দ মশায়, "Other Tagores"-দের গান নিয়ে। তখন আমি ছেলেমানুষ। মায়ের সঙ্গে শুনতে গেছিলাম। এখনও সেই অনুষ্ঠানের স্মৃতি মনে জ্বলজ্বল করে। অসাধারণ!

ব্রতীন বলল, অপালাও শান্তিনিকেতনে পড়তেন জানলাম। আপনারাও কি ব্রাহ্ম?

অপালা মাথা নোয়াল, বলল, অরা তো জানে। ব্রাহ্ম হওয়াটা কি অপরাধের?

ব্রতীন লজ্জা পেয়ে বলল, না, না, ছিঃ ছিঃ অপরাধ কেন? গর্বেরই।

হিন্দুদের মধ্যে যাঁরা ক্রিম তাঁরাই তো ব্রাহ্মধর্মের পত্তন করেছিলেন একসময়ে। তাঁরাই হিন্দু সমাজের মাথা ছিলেন।

অগ্নি বলল, রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে কিন্তু লিখেছিলেন : "হিন্দু ধর্ম যদি মৃত হইত তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্মকে প্রসবই করিতে পারিত না।"

ঘোষ সাহেব বললেন বাঃ। সবই ভালো। কিন্তু ব্রাহ্ম মেয়েরা কি তাদের সমাজে ভালো ছেলে পায় না বিয়ে করার মতো? পেলেও, অনেক সময়েই পিসতুতো, মাসতুতো ভাইবোনকে বিয়ে করেন। তবে আমার নিজের অনেক ব্রাহ্ম বন্ধুবান্ধব আছে। তাদের একটি বিশেষ ক্যারেস্টারিস্টিক লক্ষ করেছি।

কী?

তাঁরা স্ত্রী ও বাড়ির ডাক্তারকে গোঁড়া হিন্দু ব্রাহ্মণ যেমন নারায়ণ শিলাকে মান্য করেন, ঠিক তেমন করেই মান্য করেন।

কেন?

কেন জানি না।

তবে এ নিয়ে একটি গবেষণা হওয়া দরকার। গবেষণা হলে, ডক্টরেটও কেউ হয়ে যেতে পারেন। আমেরিকাতে তো বাঁদরের গা কেন চুলকোয়? অথবা বকবকম বা পায়রা কেন করে এ নিয়েও ডক্টরেট হচ্ছে মানুষে। কামাচকাটকান, হুঁহুঁকান ইত্যাদি কত ভাষা নিয়ে গবেষণা করেও ডক্টরেট হচ্ছেন কতজনে। কেউ কেউ আবার বিলম্বিত ডক্টরেটও। শিবঠাকুরের দেশ বটে একটা।

তাঁরা সব দুকান-কাট্টান মানুষ।

সকলে ঘোষ সাহেবের কথাতে হেসে উঠলেন।

এবারে এই সব পেটিফগিং ছেড়ে গানে ফেরা যাক। এসব তুচ্ছাতিতুচ্ছ মানডেন ব্যাপার নিয়ে আলোচনা তো কলকাতাতে বসেও যে-কোনো সময়েই করা যেতে পারে।

ব্রতীন বলল।

তা ঠিক। এবারে কে গাইবে অপালা না অরা?

অগ্নি বলল।

অপালা বলল, অরা গাইবে। স্প্রাইট দিয়ে জিনটা বেশ উপভোগ করছি আমি। দারুণ পরিবেশ,

না? ঝুপড়ি ঝুপড়ি গাছ থেকে কালো কালো বেড়ালের মতো ছায়াগুলো লাফিয়ে পড়েছে বাংলোর আলো-আঁধারি মাখা হাতার মধ্যে। সত্যিই মনে হচ্ছে, এখানে কাব্রাল সাহেব তাঁর মুণ্ডুহীন ধড় নিয়ে টুপিটি হাতে করে যখন তখন দেখা দিলেও দিতে পারেন।

তৃষা আপত্তি করে বলল, অপালা মাসি, ভালো হচ্ছে না কিন্তু, প্লিজ এসব টপিক বন্ধ করো।

এই ইন্টারেস্টিং কাব্রাল সাহেবটি কে বটেন?

নরেশ বলল।

এই কাব্রাল সাহেবের কথা 'একটু উষ্ণতার জন্যে' উপন্যাসেও আছে।

প্রশ্নটাকে এড়িয়ে গিয়ে ব্রতীন বলল, ইন্দ্রজিৎবাবুর কাছ থেকেই শুনেছিলাম যে কাব্রাল সাহেবের বাড়িটিই সাহেবের মাইনিং এঞ্জিনিয়র জামাইয়ের কাছ থেকে কেনেন সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহ। আর তাঁর কাছ থেকে বছর পনেরো পরে কেনেন অপর্ণা সেন। পরে অপর্ণা সেন-এর কাছ থেকে কেনেন গুনেন মিত্র মশায়, লাইসি স্কুলের মালিক সোমনাথ মিত্রর বাবা। অপর্ণা সেন-এর মালিকানাধীন থাকার সময়ে ও বাড়িতে রাইফেলের গুলিতে একজনের মৃত্যুও ঘটে।

—খুন?

—তা বলতে পারব না। তবে অপর্ণার তৎকালীন স্বামী মুকুল শর্মার রিটায়ার্ড আর্মি অফিসার বাবার কারবাইন রাইফেলের গুলিতেই নাকি মরে একজন।

মুকুল শর্মা মানে কঙ্কনা সেন শর্মার বাবা?

ইয়েস। অপর্ণার সেকেন্ড হাজব্যান্ড।

আর কল্যাণ রায় তা হলে কে?

উনি থার্ড হাজব্যান্ড।

অ।

মানে? ঠিক কী ঘটেছিল?

নরেশ উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

আমার তা জানার বা গোয়েন্দাগিরি করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। অ্যাকসিডেন্টই হবে হয়তো। তবে যা শুনেছি ইন্দ্রজিৎবাবুর কাছে তাই বললাম। আমরা এসেছি আড়াইদিনের জন্যে বেড়াতে। এসব নিয়ে গসিপ করতে তো আসিনি।

তা অবশ্য ঠিক।

মিসেস বাসু, এবারে গানটা হোক।

বলেই, খালি হওয়া গ্লাসটা নরেশের দিকে এগিয়ে দিলেন ঘোষ সাহেব।

অরা ধরল,

"অবেলায় যদি এসেছো আমার মনে দিনের বিদায়ক্ষণে।"
গেয়োনা, গেয়োনা, চঞ্চল গান ক্লান্ত এ সমীরণে.........."

অপালা বলে উঠল, সাধু! সাধু!

তার গলাতে উচ্ছ্বাসের একটু আধিক্য লক্ষ্য করা গেল। যা সচরাচর দেখা যায় না।

বলেই, অপালা তার গ্লাসটাও নরেশের দিকে বাড়িয়ে দিল।

বোঝা গেল যে, এই আরণ্যক সন্ধেটি খুবই এনজয় করছে অপালা।

নরেশ ওর গ্লাস জিন আর স্প্রাইটে ভরে দিয়ে বলল, ভালো লাগছে না মিসেস ঘোষ?

ঘোষ সাহেব নরেশের দিকে চাইলেন একবার। চাউনিতে কোনো অসূয়া ছিল না। মজা ছিল।

অপালা বলল, ব্যাপারটা কী জানেন?

নরেশ একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলল।

Ambience! আপনি এক কাপ কফি বাড়িতে খান আর এক কাপ কফি খান তাজ বেঙ্গলের স্যুইমিং পুল-এর পাশের কফি শপ-এ বসে, দেখবেন, আকাশ-পাতাল তফাত। সেইরকমই এই যে গান শোনাল অরা আমাদের রাতে ম্যাকলাস্কিগঞ্জে, এই পরিবেশে, এর সঙ্গে তুলনা করা যায় এরকম খুব কম জায়গারই। একেকটা গান, কোনো এক বিশেষ পরিবেশে, প্রতিবেশে শুনলে, তা আজীবন মনে গেঁথে যায়। রবীন্দ্রনাথের তরুণ সমালোচকেরা তাঁদের মূর্খামি এবং অকারণ ঔদ্ধত্যে যাই বলুন না কেন, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত বাঙালির মনে চিরদিনই বেঁচে থাকবেন, বিশেষ করে তাঁর গানে। যাঁরা এই সুধারস থেকে বঞ্চিত হলেন তাঁদের অনুকম্পা করা ছাড়া আর কীইবা করা যায়।

বাবাঃ! খুব কঠিন কঠিন শব্দের বাংলা বলছ তো তুমি আজ। হলটা কী? কী জিন দিয়েছিলেন মশাই আমার স্ত্রীকে?

নরেশ বলল, Booths Gin।

অ!

নরেশ বলল, আপনি একেবারেই ঠিক বলেছেন অপালা। রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা অস্বীকার করেন তাঁদের বিসমিল্লাতেই কিছু গলদ অবশ্যই থেকে গেছে বলতে হবে। সে কথা তাঁরা স্বীকার করুন আর নাই-ই করুন।

এরপরে কে গাইবে?

অপালা বলল, গা না একটা গান, তৃষা।

আমি পারি না।

যা পারিস তাই গা না।

অরা বললেন।

তাহলে একটা গান পুনেতে হর্ষদকে শুনিয়েছিলাম, সেটাই গাই, সবসুদ্ধ জানিই তো সাড়ে তিনটে গান।

আগেকার দিনে প্রত্যেক বাঙালি মেয়েকে বিয়ের আগে অন্তত পাঁচটি পুরো গান শিখতে হবে। তা কি জানো? তা তার গলাতে গান থাকুক আর নাই থাকুক। মেয়ে দেখতে যাঁরা আসতেন তাঁদের সামনে তো গাইতে হতই এবং সেই পাঁচটিই গাইতে হত বাসরেও।

ব্রতীন বলল।

—কী টরচার বলুন তো!

ঘোষ সাহেব বললেন।

নিশ্চয়ই। মেয়েটির উপরে তো অবশ্যই।

নরেশ বলল।

আমি শ্রোতাদের কথা বলছি।

সকলে হেসে উঠলেন ঘোষ সাহেবের এই কথাতে।

গাও তৃষা।

অপালা বলল।

তৃষা ধরল, "তুমি আমায় ডেকেছিলে ছুটির নিমন্ত্রণে
তখন ছুটি ফুরিয়ে গেছে কখন অন্যমনে।"

সকালে ঘুম থেকে আগে পরে উঠে কেউ চা খেয়ে, কেউ না খেয়েই হাঁটতে বেরিয়ে পড়েছিল বাড়িটির বাঁদিকের পথে নামার দিকে নয়তো ডান দিকের পথে। ব্রতীন, নরেশ এবং অপালা একটি দলে, ঘোষ সাহেব, রুরু ও তৃষা অন্য দলে এবং অগ্নি আর অরা অন্যদলে। পলাশ এখনও ফুটছে। গাছে গাছে নতুন পাতা এসেছে। কোথাও বা পাতার রং গাঢ় সবুজ হয়ে গেছে, কোথাও এখনও কচিকলাপাতা সবুজ। কচিৎ কুসুমের পাতাতে হালকা লাল আভা এসেছে। মাছের রক্ত-ধোওয়া জলের মতো লাল।

বাড়ির সামনেই পথের উপরে একটা ছোট্ট পুকুর মতো আছে। এখন জল সামান্যই আছে। তার পাশে একটি বড় গাছ বাজ পড়ে মরে গেছে। কী গাছ কে জানে।

ঘোষ সাহেব বললেন, তৃষা ও রুরুকে, এই গাছে বসে টিপনিস নামের এক সাহেব একটা চিতাবাঘ মেরেছিলেন। চিতাটা একটা বাছুর ধরেছিল। প্রথম রাতে কিছুটা খেয়ে পরদিন সন্ধেবেলা যখন বাকিটা খেতে এসেছিল তখনই মারেন টিপনিস সাহেব। বাঘটা খুব বুড়ো হয়ে গেছিল।

—তাই?

হ্যাঁ। না হলে আর বলছি কী?

কতদিন আগে?

এই বছর পনেরো আগে।

আপনি তো আংকল এই প্রথমবার এলেন এখানে। আপনি জানলেন কী করে?

রুরু জেরা করল ঘোষ সাহেবকে।

ঘোষ সাহেব হেসে বললেন, সারমাইজ। বুঝলে না! অনুমানের মধ্যেই সত্য লুকিয়ে থাকে। এমন তো হতেই পারত, না কি বল?

ওরা হেসে উঠল।

তারপর বললেন, আসলে ব্রতীনবাবুর কাছে শুনেছি।

নিঃসন্তান ঘোষ সাহেব অরার ছেলেমেয়েদের খুবই ভালোবাসেন। এমনকি হর্ষদকেও মাঝে মাঝে ফোন করেন পুনেতে, সময় পেলে। সন্তানহীন মায়ের দুঃখ নিয়ে অনেক গল্প উপন্যাস লেখা হয়েছে সব ভাষারই সাহিত্যে কিন্তু সন্তানহীন পুরুষের দুঃখ নিয়ে খুব কমই লেখা হয়েছে। সময়ে ছেলেমেয়ে হলে তৃষা ও রুরুর মতো ছেলেমেয়ে ওঁরও থাকতে পারত। বিদেশ থেকে মক্কেলরা নানারকম চকোলেট এবং অন্যান্য উপহার নিয়ে আসেন ওঁর জন্যে। সঙ্গে সঙ্গে উনি ওদের তা চালান করে দেন। তৃষার আঠারো বছরের জন্মদিনে অগ্নি ওকে একটি মোবাইল ফোন দিয়েছিল। আর কুড়ি বছরের জন্মদিনে একটা কম্প্যুটার। রুরুর সতেরো বছরের জন্মদিনে রুরুকেও একটি কম্প্যুটার উপহার দিয়েছেন ঘোষ সাহেব। যে দান বা উপহারে কোনো স্বার্থ নেই তার দামই আলাদা। অগ্নিকে উনি মনে মনে ঈর্ষা করেন। কারণ উনি জানেন যে তৃষা ও রুরু অগ্নিকে বাবার মতোই দেখে। তিনি তো ওদের চেনেন যোধপুর পার্কে ওরা ওঁর প্রতিবেশী হবার পরই। মাত্র পাঁচ-ছ বছর হল। কিন্তু এই অল্পসময়েই উনি ওদের মায়ায় জড়িয়ে পড়েছেন।

এগুলো কী ফল আংকল?

রুরু বলল, একটা সাত-আট ফিট উঁচু গাছকে দেখিয়ে।

এ গাছ চিনিস না রে বোকা। এর নাম আমলকি। ওই দ্যাখ, ফলও ধরেছে। পাড়, পেড়ে খা। আমলকি খেয়ে জল খেলে মুখটা যে কী মিষ্টি লাগে তা বলার নয়। আমাদের মামাবাড়ির বাগানে অনেক বড় বড় গাছ ছিল। জলপাই গাছ ছিল।

যে জলপাই দিয়ে টক হয়, আচার হয়?

তৃষা বলল।

রুরু বলল। হ্যাঁরে।

ঘোষ সাহেব ভাবছিলেন এরা কম্প্যুটারে বসে ইন্টারনেট ব্রাউজ করে পৃথিবীর সব খবর নখদর্পণে রেখেছে কিন্তু জলপাই বা আমলকি গাছ চেনে না। কে জানে! হয়তো ধান গাছও চেনে না। পৃথিবীটাই বদলে গেছে এখন। বড় অল্পকদিনেই বদলে গেল। এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের শৈশব নেই। কৈশোর নেই, ঘোষ সাহেবরা যাই জেনেছিলেন, ধীরে সুস্থে জেনেছিলেন, এত অল্পবয়সে অত কিছু জানতেন না তাঁরা। তাঁদের অতি সাধারণ সব ব্যাপারে কৌতূহল ছিল অপরিসীম, বিস্ময়বোধ ছিল, অতি সহজেই তাঁরা খুশি হতেন।

পেড়েছিস? দাঁড়া! আমি রুমাল দিয়ে ভালো করে মুছে দি। ধুলো পড়ে থাকবে আমলকির উপরে। নে, খা এবারে।

ঘোষ সাহেব বললেন।

তারপর বললেন, তুই যে প্যান্টটা পরেছিস সেটা ভারী অদ্ভুত দেখতে। না ফুল না হাফ। আমাদের ছেলেবেলাতে কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক কনস্টেবলরা এমন প্যান্টুলুন পরত।

—প্যান্টুলুন কী ? বলুন প্যান্টালুন। প্যান্টালুন-এর দোকান দেখেননি?

—কী আর দেখলাম বল? দেখলাম তো শুধুই হাইকোর্ট। তা এই পেন্টুলুনের নাম কী? প্যান্টালুন?

এগুলোকে বলে বাহামাজ। অগ্নিকাকু কিনে দিয়েছেন।

তাই?

তবে এর সঙ্গে হাফপ্যান্টের তফাত কী ? আমরা তো খাকি-রঙা হাফপ্যান্ট পরে স্কুলে যেতাম আর ছিটের শার্ট।

তফাত? তফাত হচ্ছে এই যে এটাই আজকালকার ফ্যাশান। আর খুব দামি। অবশ্য মোটা কাপড়ে বানানো হয় বলে ট্যাকেও অনেকদিন।

অ।

ঘোষসাহেব বললেন।

ঘোষসাহেবের বাবা ব্যারিস্টার ছিলেন না, অধিকাংশ সফল ব্যারিস্টারদের মতো। নিজের কৃতিত্বেই তিনি বড় হয়েছেন। এক বড়লোক আত্মীয়র কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে বিলেতে গেছিলেন ব্যারিস্টারি পড়তে। দেশে ফিরে নিজের বাগ্মিতায় আর মেধায় ধীরে ধীরে পসার গড়ে তোলেন। হাইকোর্টে এখন মানুষে ওঁকে প্রথম পাঁচজনের মধ্যে গণ্য করে। গোপনে অনেক দানধ্যানও করেন। অনেক গরিব ছাত্রদের পড়াশোনার খরচ জোগান। তবে মানুষটা শুধু আইনই বোঝেন। সাহিত্য সংগীত এসব নিয়ে তাঁর বিশেষ উৎসাহ নেই। ভারতীয় সংবিধানের উপরে খুব বড় একটা কাজ হাতে নিয়েছেন।

ইস্টার্ন ল হাউস থেকে বেরোবে শেষ হলে। বইটা বেরুলে সারা দেশে যে হইহই পড়ে যাবে সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই।

ঘোষ সাহেব বললেন, কেমন লাগছে রে, জায়গাটা?

দা—রু—ণ।

সমস্বরে বলল, ওরা দু ভাইবোন।

প্রকৃতির একটা আলাদা প্রভাব আছে মানুষের মনের উপরে। তোরা বড় অভাগা। তোদের জীবনের সঙ্গে প্রকৃতির প্রায় কোনোই যোগাযোগ নেই। ছেলেবেলায় আমরা থাকতাম কৃষ্ণনগরের নেদেরপাড়াতে। কত গাছপালা, মাঠ ঘাট, চুর্নী নদী। রাণাঘাটের কাছে ছিল জলঙ্গী নদী। রাজবাড়িতে রাসের মেলা। তখন চারদিকে গাছপালা আর গাছপালাই ছিল। পাখি প্রজাপতি আর ফুলেদের সঙ্গে ছিল আমাদের খুব ভাব। তোদের মতো কংক্রিটের জঙ্গলে তো বড় হয়ে উঠিনি আমরা। পাগলাচণ্ডীতে খুব নাম করা ব্যারিস্টার শংকরদাস ব্যানার্জির বিরাট বাগান এবং খামারবাড়ি ছিল। ওঁর ছেলে শিবদাস ব্যানার্জিও ব্যারিস্টার। বাবাকে শংকরদাসবাবু খুব ভালোবাসতেন। বাবার সঙ্গে গিয়ে মাঝে মাঝেই উইকএন্ডে সেখানে গিয়ে থাকতাম। উনি আসতেন কলকাতা থেকে। ওঁকে দেখেই তো আমার ব্যারিস্টার হবার ইচ্ছে জাগে মনে। ব্যারিস্টারি পাশ করে এসে আমি ওঁর জুনিয়রও ছিলাম অল্প কিছুদিন।

চলুন আমরা ফিরি। অনেক তো হাঁটা হল। মা আর অপা কাকিমা কোথায় গেল?

যার যেদিকে খুশি যাক না। শহরে সকলেই তো খাঁচার পাখি। একটু ইচ্ছেমতো ডানা মেলুক যার যেমন খুশি। তোদের অপা কাকিমা ভীষণ আমুদে, ফূর্তিবাজ। আমি তো ওকে কোনো কোম্পানিই দিতে পারি না। তাও তোর মা আর তোরা পাশে আছিস। ও একটু নিশ্বাস নিয়ে বাঁচে।

কেন দিতে পারেন না মেসোমশাই?

তোরা এখনও ছোট। এখন বুঝবি না, পরে বুঝবি। জীবনে প্রত্যেক জিনিসের জন্যে একটা দাম ধরা থাকে। বুঝেছিস বড়ো বড়ো দোকানে জিনিসের উপরে যেমন প্রাইস-ট্যাগ থাকে না? আমাদের জীবনটাও তেমনই। পুরো মূল্য না দিয়ে কোনো কিছুই পাওয়া যায় না। আমি জীবনে অনেক টাকা, মান, সম্মান ও প্রতিপত্তি পেয়েছি। কিন্তু আমি যদি একজন সাধারণ আনসাকসেসফুল মানুষ হতাম তবে বড় হতে গিয়ে যা কিছু আমি হারিয়েছি তা হারাতে হত না। তোদের সামনে মস্তবড় জীবন পড়ে আছে। আমি যা পারিনি তোরা যেন তা করতে পারিস। সবকিছুর মধ্যে একটা ব্যালান্স, একটা হারমণির খুবই দরকার। নইলে, মানুষের জীবন সার্থক হয় না।

ওরা দুজনে চুপ করে শুনল। বাড়ির দিকে ফিরে যেতে যেতে। ঘোষ মেসোমশাইয়ের জন্যে ওদের কষ্ট হচ্ছিল।

ঘোষ সাহেব ভাবছিলেন, এত কথা ওদের বলে কী লাভ হল। ওরা ছেলেমানুষ। কত স্বপ্ন ওদের, কত মজা সামনে। এসব গভীর কথা বোঝার সময় এখনও হয়নি ওদের।

নিজেই বললেন, এই যে তোদের এত কথা বললাম তাও এই প্রকৃতিরই প্রভাবে। মানুষ আসলে প্রকৃতিরই সন্তান। প্রকৃতির মধ্যে এলে তার মন পাপড়ি মেলতে থাকে। যে কথা, যে কাজ অন্য জায়গাতে করা যেত না, যা করার কথা ভাবাও যেত না, তাই করা যায়, ভাবা যায়। উই আর ওলওয়েজ ইন আওয়ার এলিমেন্টস হোয়েনেভার উই কাম টু নেচার।

তারপর বললেন, তোদের অগ্নিকাকা আর তার বন্ধুদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। কী সুন্দর একটা জায়গাতে নিয়ে এল বলত কলকাতা থেকে মাত্র চব্বিশঘণ্টার মধ্যে।

তৃষা বলল, আমার তো কলকাতা থেকে বেরোলেই, নীল আকাশ দেখতে পেলেই, মন ভালো হয়ে যায়।

নীল আকাশ তো ফ্ল্যাট থেকেও দেখা যায়।

রুরু বলল।

সেরকম দেখা নয়। পথের দুপাশের গাছগাছালি বাড়িঘর দিগন্ত অবধি যেখানে চোখ চলে যায় বাধাহীন, সেই আকাশের কথা বলছি।

তৃষা বলল।

সেটা অবশ্য ঠিক।

রুরু বলল।

২০

এখানে বসবে একটু?

অগ্নি বলল, পথের বাঁ পাশে মস্ত একটি কালো পাথরের চ্যাটালো শরীর দেখিয়ে। পাথর তো নয় যেন কোনো ভিল যুবকের বুক।

—বসবে? দেরি হয়ে গেলে ওঁরা কিছু মনে করবেন হয়তো।

—অরা বলল।

—পৃথিবীর সব মানুষের মন বুঝেই তো বেঁচে এলে এতদিন। এবারে আমার মনটা একটু বোঝার চেষ্টা করো।

—ছেলেমেয়ে দুটোই বা কী করছে?

—কিছুই করছে না। অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন একজন মানুষের সঙ্গে আছে। বেশ কিন্তু মানুষটি। খাঁটি মানুষ। লোক দেখানো কোনো ভড়ং নেই। প্রফেশানাল টু হিজ বোনস। নিজের জগতে থাকা মানুষ। ভাবটা live and let live.

—তা ঠিক। তবে অপা আর ঘোষ সাহেবের ম্যাচটা ফিটিং হয়নি।

—কজন স্বামী-স্ত্রীরই বা পুরোপুরি মিল থাকে। তুমি আর আশিস একসেপশনাল কেস ছিলে। তবে ওঁদেরও মানে, ঘোষ সাহেবদের ছেলেমেয়ে যদি থাকত তবে এই অমিলটা চোখে পড়ত না। ছেলেমেয়েরাই এসে দাম্পত্যের ফাঁকটা পূরণ করে দেয়।

—ওঁরা দুজনেই দুরকম। বেচারা।

—সংসারে বেচারা নয় কে? তুমি এবং আমিও কি বেচারা নই?

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে অরা বলল, ছেলেমেয়েদের বড়ো করে তোলার দায়িত্ব যদি না থাকত, যদি আমাকে চাকরিও করতে না হত তবে এরকমই কোনো জায়গাতে, অথবা হাজারিবাগের মতো, বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতাম।

এ জায়গাটা হাজারিবাগের চেয়েও সুন্দর। তোমার ছেলেবেলার হাজারিবাগকে তো দেখিনি, বলতে পারব না, তবে তোমার সঙ্গে আলাপিত হতে যখন আশিসের সঙ্গে গেছিলাম তখন জায়গাটাতে এই জায়গার চেয়ে ভিড় অনেক বেশি ছিল। এখানেও ভিড় আছে নিশ্চয়ই তবে সেটা স্টেশনের দিকেই হবে। রেলগাড়ি এলেই জায়গার নির্জনতা ছিঁড়ে-খুঁড়ে যায়। হাজারিবাগে এখনও রেল লাইন যায়নি বলেই হয়তো এখনও জায়গাটার কিছু নিজস্বতা আছে।

—তা ঠিক।

যে জায়গাটাতে আমরা বসে আছি এখানের চারপাশে নাকি রাসেল স্ট্রিটের সাটনস্ সিডস থেকে

অনেক প্যাকেট পুর্টোলাকার বীজ এনে বুদ্ধদেববাবু ছড়িয়ে দিতেন প্রতি বর্ষাতে। যাতে, বসন্ত শেষে বহুবর্ণ পুর্টোলাকাতে ছেয়ে যায় জায়গাটা। পেছনে চেয়ে দেখো, একটা উপত্যকা আছে অনেক নীচে। পথের ডানদিকেও আছে উপত্যকা—ম্যাকলাস্কি'জ নোজ-এর নীচে। সেখানে একটি গ্রামও আছে, যার নাম বাসারিয়া।

—তুমি এত জানলে কোথা থেকে?

—'একটু উষ্ণতার জন্যে' বইটি পড়ে এবং ব্রতীনের মুখে শুনে।

বইটি আমার পড়া নেই।

তোমাকে পড়াব কলকাতাতে ফিরে। পড়াব মানে, প্রেজেন্ট করব। কিছু বই থাকে যা বারবার পড়বার। যে-কোনো ক্লাসিক সম্বন্ধেই এ কথা খাটে।

—তা ঠিক।

ইচ্ছে করে, এখানে আমরা বাকি জীবনটা এই পাথরটার উপরে বসেই কাটিয়ে দিই।

ইচ্ছে তো কত কিছুই করে। সব ইচ্ছের আগুনকে হাওয়া করতে নেই, বিশেষ করে যেসব ইচ্ছে ভিজে গেছে, আগুন জ্বলার সম্ভাবনা নেই।

অরা বলল।

অগ্নি চুপ করে রইল।

তারপর বলল, অগ্নির ইচ্ছেতেও যদি আগুন না জ্বলে তবে তা বড় দুর্দৈবরই কথা বলতে হবে।

শব্দ না করে হাসল অরা।

তারপর বলল, চলো, উঠি। ওরা সকলেই ফিরে গেছে নিশ্চয়ই। ব্রেকফাস্ট খেয়ে তারপরে জায়গাটাকে ঘুরে দেখার জন্যে বেরুতে তো হবেই।

হেঁটে তো দেখা যাবে না। বিরাট এলাকা। গাড়িতেই যেতে হবে।

—চলো, ওঠো।

ব্রেকফাস্টে কী খাবে?

দ্যাখো, এখানে আড়াইদিনের জন্যে এসে তুমি বা অপালা এসব নিয়ে একেবারেই মাথা ঘামিয়ো না।

অগ্নি বলল।

তারপর বলল, তবে এসব রান্নাবান্নার ব্যাপারে আমি অপদার্থ হতে পারি কিন্তু ব্রতীন আর নরেশ খুব ভালো। তাছাড়া, রান্নার লোকও তো আছে এখানে। আড়াইটা দিন, জাস্ট রিল্যাক্স করো। খাওয়ার সময়ে যা হয় পেলেই চলবে আমাদের সকলের।

ঠিক আছে। তুমি যা বলবে তাই হবে।

একটু দাঁড়াও অরা। হঠাৎই দাঁড়িয়ে ওঠা অরার পথরোধ করে বলল অগ্নি।

একটু দাঁড়াও। আবারও আকুতি করে বলল অগ্নি।

কী হল আবার তোমার।

তোমাকে একটা চুমু খাব।

অরা একটুক্ষণ চুপ করে থেকে, মুখ নামিয়ে বলল, খাও।

চুমু অশনিসংকেতের সূত্রপাত। রক্তের মধ্যে তুফান তোলে চুমু। নিশ্বাস দ্রুততর হয়। চুমু থেকে দুটি শরীর গড়িয়ে যেতে পারে অনেক খানাখন্দে। কিছুক্ষণ ফাঁদে-পড়া পাখির মতো ছটফটানির পরে অরা দুহাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিল অগ্নিকে।

অস্ফুটে বলল অরা, আশিসের কাছে, আমার সন্তানদের কাছে ছোট হয়ে গেলাম আমি।

তুমি কোন যুগে যে বাস করো! সত্যি! আজকের দিনে অভাবনীয়।

কী করব!

নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে অরা বলল, আমি যে আমিই। আমাকে ক্ষমা করো। তোমার কাছে আমি যে কত অপরাধী হয়ে থাকি প্রতিটা মুহূর্ত তা তুমি কখনও জানবে না। এমন অবুঝপনা করে আমার দুঃখ আরও বাড়িয়ো না অগ্নি। তোমাকে তো বলেইছি আমি, যা দিতে পারি তা তো দিই-ই, সবসময়েই দিই, যা পারিনা, তা চেয়ে তুমি আমাকে আরও বেশি অপরাধী করো না। প্লিজ।

২১

পাথরটা ছেড়ে, ছোট ছোট টিলাটা থেকে নেমে ওরা ঘনজঙ্গলের মধ্যে পিচ-বাঁধানো পথে এসে পড়ে ইন্দ্রজিৎবাবুর বাড়ির দিকে এগোল।

চলতে চলতে অরা বলল, একটা কথা ভেবে আমি অবাক হই। যৌবনের যেসব দুরন্ত কামনার দিনগুলিকে তুমি পিছনে ফেলে এসেছ, নিজেকে যেভাবে সংযত সংহত করেছ, তা মনে করলেই আমি আজও অবাক হই। তবে একটা কথা তোমারও স্পষ্ট করে জানা দরকার। কষ্ট আমারও কিছু কম হয়নি। পুরুষেরা ভাবে এসব ব্যাপারে শারীরিক কষ্ট বুঝি শুধু পুরুষদেরই। মেয়েদের কষ্টও কী কম? তাদের বুঝি কষ্ট হয় না নিজেকে সহজ সুখের দুয়ার থেকে বারেবারে ফিরিয়ে আনতে? পরম প্রিয় মানুষকে বারেবারে না, না, না বলতে।

একটু চুপ করে থেকে বলল, অগ্নি তুমি যে আমার জন্যে অনেক এবং অনেকরকম কষ্ট পেয়েছ তা আমি অস্বীকার করি না। তোমাকে আমি বুঝি। আমার একমাত্র অনুরোধ যে তুমিও আমাকে বোঝো একটু। আমরা যে সাধারণ নই, অসাধারণ, এ কথা জেনে আমাদের দুজনেরই গর্বিত হওয়ার কথা। নিজেদের বঞ্চনা করার মধ্যে যে এক গভীর আনন্দ আছে তা সহজ প্রাপ্তির মধ্যে নেই। কোনোদিনই ছিল না। তোমার সঙ্গে শরীরী সম্পর্ক হলে আশিসের স্মৃতির কাছে তো বটেই আমরা আমাদের দুজনের কাছেই ছোট হয়ে যেতাম না কি? আমাদের এই পারস্পরিক বঞ্চনার শিকার করতে পারার জন্যে আমাদের নিজেদের অভিনন্দিত করা উচিত।

একটু থেমে অরা আবার বলল, আমি তোমাকে আমার চিঠিতেও একথা বলেছি, তুমি যদি অন্য কোনো নারীর সঙ্গে তোমার শরীরের সুখের জন্যে শারীরিক সম্পর্ক করো কোনোদিন, আমি কিছুই মনে করব না। সত্যিই বলছি, একটুও মনে করব না।

তারপরই বলল, অপাই তো তোমার প্রেমে পাগল। তাছাড়া, ওর হাবে-ভাবে মনে হয় ওর স্বামী যতই ধনী, মানী ও ভালোমানুষ হন না কেন শারীরিকভাবে ওকে সুখী করতে পারেননি উনি একটুও। স্ত্রীকে উনি বোঝেন না একটুও। মেয়েদের মন আর কজন পুরুষ বোঝে। অধিকাংশ পুরুষের কাছে মেয়েদের শরীরটাই সব।

মাঝে মাঝে ভারী দুঃখ হয়।

আর নিজের জন্যে হয় না?

না। আমার জীবনে কোনো যে অসাধারণ সাধারণের দুঃখ তাই আমাদের বাজে না।

তুমি কী করে বুঝলে।

অগ্নি অবাক হয়ে বলল।

মেয়েরা অনেক কিছুই বোঝে যা তোমরা বোঝো না। তাছাড়া, ও যে মা হতে পারেনি তার

জন্যে ও নিজে দায়ী নাও হতে পারে। এখন মা হওয়ার সময় হয়তো আর নেই কিন্তু শারীরিকভাবে আনন্দিত হওয়ার সময় তো ওর শেষ হয়ে যায়নি।

২২

অরার জন্যে পোলাউ-এর চাল নিয়ে এসেছি। ওঁর এক জুনিয়র চুঁচুড়া থেকে এনে দিয়েছিলেন। ভাবলাম এঁচড় নিয়ে যাই। গাছ-পাকা। ভালো গাওয়া ঘিও এনেছি। তা দিয়েই রাঁধব।

সবাই-ই এত ভুলে যাচ্ছে কেন? ব্যাপারটা কী ঘটছে এখানে?

নরেশই বলল।

ব্রতীন বলল, একেই বলে প্রকৃতির অভিঘাত।

প্রকৃতির অভিশাপ। এর কথা শুনেছি, অভিঘাতটা আবার কী জিনিস? এত কঠিন কঠিন বাংলা শব্দ ব্যবহার করিস যে টেনশান হয়ে যায়। হচ্ছিল এঁচড় আর পাঁউরুটির কথা, তার মধ্যে হঠাৎ অভিঘাত এনে ফেললি কেন?

তোর দৌড় তো এঁচড় অবধিই। এঁচড়েই থাক।

এঁচড় তো আর পচবে না। কোথায় আছে বলুন বউদি আমি উদ্ধার করি।

নরেশ বলল।

ভালো গাওয়া ঘি এনেছ আর কাল রাতে খিচুড়ির সঙ্গে দিলে না? গাওয়া ঘি দিয়ে খিচুড়ি রাঁধলে তার স্বাদই তো অন্যরকম হত।

ঘোষ সাহেব অভিযোগের সঙ্গে বললেন।

অরা বলল, ঠিক আছে। কাল কী পরশু আমি নিজে হাজারিবাগী ভুনিখিচুড়ি রেঁধে খাওয়াব সবাইকে। আমার মায়ের কাছে শেখা।

তৃষা বলল, মা! তোমরা সকলে এমন খাওয়া খাওয়া করে ক্ষেপে গেলে কেন বলো তো? চলো তাড়াতাড়ি চান করে তৈরি হয়ে আমরা ম্যাকলাস্কিগঞ্জ স্টেশন আর চাট্টি নদীটা আগে দেখে আসি।

ব্রতীন বলল, রাঁচী যেতে আসতে গাড়ির কতক্ষণ লাগবে?

খুব বেশি হলে দেড় ঘণ্টা।

বলেই ব্রতীন বলল, নরেশ, আমরা সকলে ফিরে এলে তুই-ই চলে যা একটা গাড়ি নিয়ে। সেখানে পারফেক্ট আইস-এর দোকান নিশ্চয়ই পাবি। পাউরুটি, যদি আরও লাগে। সসেজ, সালামি, বেকন আর বরফ নিয়ে আয় গিয়ে। বেশি বরফ না হলে ভোদকাটা জমবে না।

ঘোষ সাহেব বললেন, রাঁচী যদি যাবেনই তাহলে আমিও যাব। পথের উপরেও মাছ নিয়ে বসে অনেক মাছওয়ালা। রাঁচী হাইকোর্ট-এ মামলা করতে এসে দেখেছিলাম গত মাসেই। তাহলে মাছও নিয়ে আসব।

অপালা বলল, সত্যি! তুমি কি এখানে খেতেই এসেছিলে? তাছাড়া, তোমাকে রাঁচী পাঠাতে আমার ভয়ও করে। মেন্টাল অ্যাসাইলাম-এ ভরে দিলে!

অরা বলল, এই অপা। কী বাজে ইয়ার্কি হচ্ছে।

ঘোষ সাহেব অপার কথাতে কান না দিয়ে বললেন। বাঃ রে। আমি একা খাব কেন? ছেলেমেয়েগুলো মাছ ছাড়া খেতে পারে নাকি?

রুরু আর তৃষা সমস্বরে বলল, বাঃ। নিজেদের দোষ আমাদের ঘাড়ে কেন চাপাচ্ছেন মেসোমশাই?

অপালা বলল, দ্যাখ তৃষা তোরা, তোদের মেসোমশাইকে। মানুষটা এইরকমই।

সকলে দু-তিন কাপ করে চা খেয়ে, চান করে নিয়ে ব্রেকফাস্ট করে ম্যাকলাস্কিগঞ্জ ঘুরে দেখবার জন্যে বেরিয়ে পড়ল। একটু চাপাচাপি হল বটে কিন্তু মুখার্জিবাবুকে ওদের গাড়িতে নিয়ে নিল ব্রতীন। স্টেশনে গিয়েই অবশ্য নামিয়ে দেবে মহুয়া সংগ্রহের জন্যে। এখানের দ্রষ্টব্য স্থান তো ব্রতীনই জানে। সেই গাইডের কাজ করবে।

আমরা দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পরে হাটে যাব। কী বলেন মুখার্জিবাবু?

হ্যাঁ স্যার। হাট জমতে জমতে তো বিকেল চারটেই হয়ে যায়।

চার্চ, ক্লাব, স্টেশন, বুথস ফার্ম, হাটের পথ, এবং চাট্টি নদীতে নিয়ে যাব আপনাদের। কঙ্কা, লাপরা আর হেসাডি এই তিন গ্রাম নিয়ে ম্যাকলাস্কিগঞ্জ।

ব্রতীন বলল।

তুই জানলি কী করে?

'একটু উষ্ণতার জন্যে' পড়ে। ওই বইটা পড়লে এই জায়গা সম্বন্ধে তোর অজানা কিছুই আর থাকবে না।

এতই যদি ভালোবাসা তাহলে লেখক নিজের বাংলো বিক্রি করে দিলেন কেন?

নরেশ বলল।

ঘোষ সাহেব বললেন, 'আ রাইটার শুড নেভার বি টায়েড ডাউন টু ওয়ান প্লেস'।

সেটা অবশ্য খুব দামি কথা। সেইজন্যেই হয়তো উনি অমন সুন্দর বাংলোটা বিক্রি করে দিয়েছিলেন।

২৩

অগ্নিভর ফ্ল্যাট। সকালবেলা। অগ্নিভ ব্রতীনের সঙ্গে টেনিস খেলে ফিরে এসে ব্রেকফাস্ট করছে দুজনে।

অগ্নি বলল, আজ কি তোর কিছু কাজ আছে জরুরি।

আমার আবার কাজ কী। ছোট মামিমাকে একবার দেখতে যেতে হবে। সে বিকেলে গেলেও হবে। বয়স হয়েছে পঁচাত্তর। তার উপর টার্মিনাল কেস।

কী? ক্যানসার?

—তা ছাড়া কী? এখন তো একটাই রোগ। বম্বেতে টাটা ইনস্টিট্যুটেও দেখিয়ে এনেছে মাসতুতো দাদা। এখনও কেমো চলছে। তবে হয়তো আর মাসখানেক আছেন। চোখে দেখা যায় না। কী রূপসি মহিলার কী অবস্থা। কেমো করে করে সব চুল পড়ে গেছে। দেখলে ভয় করে। ওঁর নিজের মনেও এখন মৃত্যুভয় এসেছে। চোখ মুখ দেখলেই বোঝা যায়। সবসময় জোরে টিভি চালিয়ে বসে থাকেন। একা থাকতে ভয় পান।

ব্রতীন বলল, সকলেরই তো একসময়ে এই মৃত্যুভয় আসেই। তবে জরাকে আমি সবচেয়ে বেশি ভয় পাই। কত তাবড়-তাবড় মস্তানদের চোখের সামনে জরা-কবলিত হতে দেখলাম। জীবনে কোনো যুদ্ধেই না-হারা সব মানুষ—জরার কাছে হেরে গেলেন বিনা প্রতিবাদে। অন্যভাবে বললে বলা যায়, জরাই তাঁদের হারিয়ে দিল হ্যান্ডস্ ডাউন।

ব্রতীন বলল, তোর লা দোল্‌চে ভিতা ছবিটার কথা মনে আছে অগ্নি?

ফেলিনি না আন্তোনিওনি কার যেন ছিল ছবিটা।

—কার ছবি সেটা অবান্তর। ছবিটা আন্তোনিওনির তাতে একটা আইডিয়া ছিল সেটা আমার মনে গেঁথে আছে। আজকের ছবি তো নয়, প্রায় চল্লিশ বছর আগের ছবি। ফিল্ম ক্লাবে দেখেছিলাম সরলা মেমোরিয়াল হল-এ।

—আইডিয়াটা কী?

—"To die with a bang and not with a whimper".

—মানে, দুম করে শব্দ করে মরে যাও—কুকুরের মতো কঁকিয়ে কেঁদে মরো না।

—আর্নেস্ট হেমিংওয়েও এ কথা বিশ্বাস করতেন। তাই তো তাঁর জীবনে তাঁর মনোমতো বাঁচা যখন আর হল না উনি আত্মহত্যা করে মারা গেলেন।

—আত্মহত্যা করাটা কাপুরুষের কাজ।

—আমার কিন্তু তা মনে হয় না।

—কেন মনে হয় না?

—আমার তো মনে হয়, যাঁরা এই সুন্দর পৃথিবী থেকে অমন দুম করে চলে যেতে পারেন, নিজেদের জীবন নিজে হাতে নিভিয়ে দিতে পারেন, তাঁরা অসীম সাহসের অধিকারী।

তারপর বলল, আমি আন্তোনিওনির একটি লেখা পড়েছিলাম। তাঁর অধিকাংশ নায়ক-নায়িকাই আত্মহত্যা করে কেন মারা যান এই প্রশ্নর উত্তরে তিনি বলেছিলেন : "If life is a gift of God, the right to take it away is also a gift of God".

তাই?

—তোকে একটু কাসুন্দি দিই? বেকন আর হ্যাম মাস্টার্ড ছাড়া জমে না। ইতালিয়ান মাস্টার্ড হলে তো কথাই নেই।

ছাড়ত। ওসব সাহেবব্যাটাদের রটনা। নিজেদের দেশে মাস্টার্ড হয় না বলেই ইটালির মাস্টার্ড-এর প্রয়োজন পড়ত ওদের। আমাদের কাসুন্দির কোনো বিকল্প আছে?

—তুই কি রোজই এসব খাস না কি?

—না, না। প্রতি শনি-রবিতে খাই। হ্যাম, বেকন, ডিমের পোচ, কড়কড়ে করে টোস্ট করা গার্লিক ব্রেড আর কাসুন্দি। সঙ্গে মাখম আর অরেঞ্জ মার্মালেড।

বয়স তো ষাট হবে শিগগির আমাদের। এখন এত ডিম খাওয়া কি উচিত।

আরে সেদিন সি.সি.এফ.সি.-তে পি বি দা আর চুনীদার সঙ্গে কথা হচ্ছিল।

কে পি বি দা?

আরে পি বি দত্ত, ক্রিকেটার। আর চুনীদা মানে চুনী গোস্বামী—ফুটবলার এবং ক্রিকেটারও।

কী বললেন ওঁরা।

বললেন, ব্রতীন দিনে দুটো করে ডিম খাবি। এরকম প্রোটিন আর নেই। ওঁরা দুজনেই আমাদের চেয়ে বয়সে অনেকই বড়ো।

ব্রতীন বলল, আমার বাবা বলতেন গ্রামে গঞ্জে হিন্দুমুসলমানেরা ইকুয়ালি পুওর। কিন্তু তাদের বেসিক ডায়েটে একটাই ডিফারেন্স।

কী?

মুসলমানেরা পেঁয়াজ রসুন এবং লংকা হিন্দুদের চেয়ে অনেক বেশি খায়। এগুলো, বলতে গেলে Staple Food ওঁদের কাছে। একজন মুসলমান কৃষক বা শ্রমিক যত পরিশ্রম করতে পারে একজন হিন্দু কৃষক ও শ্রমিক তা কখনোই পারে না।

তারপর বলল, তুই কি জানিস যে ভারতবর্ষে যতগুলো বন্দর আছে সেই সব পোর্টে যারা মজুরের কাজ করে, মাল তোলা এবং মাল খালাসের কাজ, তারা সবাই-ই মুসলমান।

তাই নাকি?

হ্যাঁ তাই।

—তাদের দুপুরের খাদ্য হচ্ছে ক-টি আটার রুটি আর প্রচুর পেঁয়াজ রসুন লংকা এবং একটু আচার। আচারটুকুই বিলাসিতা।

এটাতো জানা ছিল না।

—অনেকেই জানেন না, শুধু তুই কেন?

তারপর বলল, ব্রিটিশ আর্মিতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে বার্মা ফ্রন্টে একজন জেনারেল ছিলেন, তাঁর নাম জেনারেল উইংগেট। তাঁর স্টেপল-ফুডই ছিল কাঁচা পেঁয়াজ। তাঁর বড় বড় পকেট ভরতি পেঁয়াজ থাকত। তাঁর সৈন্যদল এমন এমন সব অবিশ্বাস্য কাণ্ডমাণ্ড ঘটিয়েছিলেন যে আর্মি ভোকাব্যুলারিতে তাঁর ব্রিগেডের নাম হয়ে গেছিল "উইংগেটস সার্কাস"। আমি তো আমার বাবাকে অনুসরণ করে সকালে একটি এককোয়া রসুন মুড়ি দিয়ে খাই—ফারস্ট থিং ইন দ্যা মর্নিং, তারপর চা। আর দুপুরের ও রাতে খাওয়ার সময়ে দু কোয়া রসুন ঘি দিয়ে ভাজা, দুটি করে কাঁচালংকা এবং একটি গোটা এবং সদ্য ছাল ছাড়ানো কাঁচা পেঁয়াজ।

—সম্ভবত এইজন্যেই তোকে কোনো মেয়ে চুমু খেতে চায় না।

অগ্নি বলল।

তা না চাক কিন্তু তুই নিশ্চয়ই স্বীকার করবি যে আমার বয়সের তুলনাতে আমি শরীরে মনে অনেকের চেয়ে বেশি ইয়াং আছি।

হুঁ। সেইটাই তো ভয়। ম্যাকলাস্কিগঞ্জে অপালা তোর দিকে যেমন ঝুঁকেছিল তা দেখে তো তোর মন্ত্রগুপ্তিটি কী তাই জানতে ইচ্ছে করছিল।

অপালা ভারী ভালো মেয়ে। বাজে কথা বলিস না।

আমার কাছে তো মেয়ে মাত্রই ভালো।

তুই তো একজনে সমর্পিত মন-প্রাণ ঋষিকুমার। দেহিপদবল্লভ মুদারম্। তুই দেবতা। মানুষ নোস।

আমরা প্রত্যেকেই দেবতা। তুই তোর দেবত্বকে উপলব্ধি করিসনি বা করার চেষ্টা করিসনি, তাই এ কথা বলছিস।

যাক এসব ভারী ভারী কথা। আমার কাজ আছে কি না জিজ্ঞেস করছিলি কেন?

না, তাহলে রবীন্দ্রসদনে গিয়ে ব্রাত্য বসুর ছবিটা দেখে আসতাম।

ব্রতীন বলল, আইনক্স-এ গিয়ে ব্ল্যাক দেখতাম। OH Kolkata-তে একদিনও খাওয়া হয়নি—ওখানে বাঙালি খাওয়াটাও খেয়ে নেওয়া যেত।

না। আইনক্সও যাব না। 'OH Kolkata'-তেও যাব না।

কেন?

ওদের নিয়ে এখনও যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

বাবাঃ। এটা বাড়াবাড়ি। ওদের মানে, তৃষা রুরু অরা?

—হ্যাঁ। তবে এটা বাড়াবাড়ি নয়। যেখানে পরিবার নিয়ে সকলে যায় সেখানে একা একা যেতে বড় স্বার্থপরের মতো মনে হয়।

—তবুও যদি তোর নিজের পরিবার হত।

—নিজের না হলেও নিজেরই মতো তো।

যাক, এ নিয়ে আমি আর কিছু বলব না। আজকে জেদাজেদি করে রোদের মধ্যে চারটি সেট টেনিস খেলে ফেলেছি। ক্লান্ত লাগছে। আফটার অল, বয়স তো হয়েছে।

আমার সঙ্গে তো মাত্র দু সেট খেললি। আর দুটো কার সঙ্গে খেললি?

কেন? বিয়ান্দকারের সঙ্গে। খুব ভালো খেলে ও। যৌবনে তো কমপিটিটিভ টেনিসও খেলত।

তাই?

হ্যাঁ।

আজ বাড়ি গিয়ে শাওয়ারের নীচে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে খুব ভালো করে চান করব। তারপর দু বোতল বিয়ার খাব। তোর সনাতনের দোকান থেকে মঙ্গল বড় বড় কই মাছ এনেছে। কালো জিরে কাঁচালংকা দিয়ে তেল-কই করতে বলেছি। আজকাল তো দেশি মাথা-মোটা বড় কই পাওয়াই যায় না। জানি না আজ কী করে পেয়ে গেল। খাবি তো চান করে চলে আয়।

নাঃ। আজ যাব না।

কী করবি?

অনেকগুলো চিঠি লিখতে হবে নাগপুরে।

নাগপুরে কি তোর অন্য কোনো হার্টথ্রব আছে না কি?

—না তা নয়। তবে কর্মজীবনের অতগুলো বছর তো নাগপুরেই কাটালাম।

বন্ধু ও পরিচিত তো কম নেই।

পুরুষ না স্ত্রী?

দুই-ই আছেন। অনেকগুলো চিঠি পেয়েছি গত এক মাসে, একটারও উত্তর দেওয়া হয়নি।

এই মোবাইল ফোন আর ইন্টারনেটের দিনে এত চিঠি লেখে কোন ব্যাকডেটেড মানুষেরা?

চিঠি লেখা ব্যাপারটা সকলেরই আয়ত্তাধীন নয়। ভালো চিঠি লেখা তো নয়ই! যাঁরা ভালো চিঠি লিখতে পারেন তাঁরা চিরদিন চিঠিই লিখবেন।

আই বেগ টু ডিফার।

ব্রতীন বলল।

অত সময় নষ্ট করাটা আজকাল মূর্খামি বলেই গণ্য হওয়া উচিত।

ব্যাপারটা তর্কের নয়। আই বেগ টু ডিফার অ্যাজ ওয়েল।

তুই তো কফি খাবি?

না চা।

চন্দন চা নিয়ে এসো।

আনছি বাবু।

চা নিয়ে এলে দুজনেই চা-ই খেল। তারপর ব্রতীন উঠে পড়ে বলল, তাহলে চলি আজকে, ফোন করিস। দুই ব্যাচেলারের আরও একটি অলস দুপুর শুরু হবে একটু পর থেকে। আজ খুব ঘুমোব আমি। তারপর সন্ধেবেলা ছোটো মামিকে দেখে বাড়ি ফিরে আসব। নরেশটা আসতে পারে। তোর যদি কোথাও যাবার না থাকে এবং চিঠি লেখা শেষ হয়, তবে চলে আসিস। জুবিলি স্টোরস-এর পল্লব একটা ব্ল্যাক টিচার্স দিয়েছে পরশু।

দিয়েছে মানে? প্রেজেন্ট করেছে?

প্রেজেন্ট কখনো সখনো করে না যে তা নয় কিন্তু রোজ প্রেজেন্ট করলে তো ওর দোকানই উঠে যাবে। ওর দোকানের মতো পুরোনো এবং ভালো মদের দোকান কলকাতাতে তো কমই আছে।

—কালো টিচার্স, কথাটার মানে বুঝলাম না।

টিচার্স তো সাদাই খেয়েছিস। এই কালোটা নতুন বেরিয়েছে।

গুড।

চানচানির বাড়ি খেয়েছিলাম। যদি রাতে আসিস তো খাওয়াব। সেলিম বাখখরখানি রুটি আর গুলহার কাবাব পাঠিয়েছে। তার ছেলের জন্মদিন আজকে।

তা দিয়ে ডিনারও খেতে পারিস এলে।

তারপর বলল, বুঝলি, একটা সময় পর্যন্ত সংসার করলাম না বলে মাঝে মাঝে দুঃখ হত। এখন মনে হয়, যা হয়েছে তা ভালোই হয়েছে। স্ত্রী পুত্র-কন্যা প্রতিপালনের পরে রিটায়ার করার পরেও এমন কাপ্তানি করে কি জীবনটা কাটাতে পারতাম?

জীবনের আসল অধ্যায়ই তো এখনও বাকি আছে।

সেটা কী?

শেষ জীবন। সেটা যে ওল্ড এজ হোম-এই কাটবে তা তার গ্যারান্টি কোথায়। চিরটাজীবনই কি এমন হরিণের মতো লাফিয়ে বেড়াতে পারব?

সে তখন দেখা যাবে।

আসবি?

দেখি। বড় বহির্মুখী হয়ে উঠেছি আমি সাম্প্রতিক অতীত থেকে। এমনিতে আমি খুবই অন্তর্মুখী মানুষ, যদিও কুনো যাকে বলে তা নই। রবীন্দ্রনাথের সেই গানটা আছে না?

বলেই গেয়ে উঠল, "বাহির পথে বিবাগী হিয়া কিসের খোঁজে গেলি, আয়, আয়, আয় রে ফিরে আয়। পুরানো ঘরে দুয়ার দিয়া ছেঁড়া আসন মেলি বসিবি নিরালায়, আয়, আয় রে ফিরে আয়।"

বাঃ। ছেলেবেলা থেকে তোর গানটাকেই প্রফেশান করা উচিত ছিল। এঞ্জিনিয়র তো লক্ষ লক্ষ আছে।

তারপর বলল, আজকাল তো কত মানুষের গানই শুনি। শিল্পীর ভিড়ে তো পথ চলাই দায়। কিন্তু কজনের গলাতে সুর লাগে বল? এখন গান শোনা একটা অত্যাচার হয়ে উঠেছে। মন ভরে না। তুই যে কেন একটা সিডি করিস না।

অগ্নি হেসে বলল, আগে হলেও বা কথা ছিল। এখন দেশে ক্যাসেট আর সিডি-র বন্যা বয়ে যাচ্ছে। কে না করল সিডি? তাদের সঙ্গে নিজেকে একাসনে বসাতে রাজি নই আমি। এই বেনোজল নেমে যাক, যদি আরও কিছুদিন বেঁচে থাকি তো এ নিয়ে ভাবা যাবে।

বয়স হয়ে গেলে গলা কি এরকম থাকবে?

ভীমসেনজির গান শুনলাম সেদিন সানি টাওয়ার্স-এ জয়ন্ত চ্যাটার্জির ওখানে। আশি তো পার করেছেন কবেই কিন্তু এখনও কী গলা!

ভাবাই যায় না। ঈশ্বরের কৃপাতে কারও কারও গলা বয়স যত বাড়ে, ততই ভালো হয়।

এই তোর এক রোগ। তোর মতো আধুনিক একজন বিজ্ঞানী যে কেন ঈশ্বর ঈশ্বর করিস তা বুঝতে আমার বড়ই অসুবিধে হয়।

ব্যাপারটা সকলের বোঝার নয় রে ব্রতীন। এ বাবদে আমরা না হয় ভিন্নমতই পোষণ করলাম। তাতে আমাদের বন্ধুত্বটা অটুট থাকবে। ভগবান মানে, দেবদেবীর কথা আমি বলিনি। বলেছি, এক সুপিরিয়র ফোর্স-এর কথা। অনেক নোবেল-লরিয়েট বিজ্ঞানীও আমারই মতো ঈশ্বর বিশ্বাসী। এ নিয়ে আলোচনা শুরু করলে দিন রাত কেটে যাবে।

তাহলে একদিন দিন স্থির কর। নরেশটাকেও ডাকব। ওতো প্রতি শনিবারে দক্ষিণেশ্বরে যায়,

বছরে একবার তিরুপতিতেও। অথচ ছাত্র ছিল ফিজিক্সের।

—ডাকিস। ওর বিশ্বাসের রকম আর আমার বিশ্বাসের রকমটা আলাদা।

ব্রতীন উঠে পড়ে বলল, আমার বিশ্বাসেরও।

ব্রতীন চলে গেলে এক ঘুম দিয়ে উঠে চা খেয়ে চান করে অগ্নি লেখার টেবিলে বসল চিঠি লিখতে। নাগপুরে অনেকগুলো চিঠি লেখার ছিল কিন্তু প্রথমে সে অরাকে চিঠি লিখতে বসল। বহুদিন চিঠি লেখে না অরাকে।

টালিগঞ্জ
কলকাতা
শনিবার

অরা,

কল্যাণীয়াসু,

বহুদিন বাদে গতকাল ন্যাশানাল লাইব্রেরিতে গেছিলাম। আমার এখনকার নিরবচ্ছিন্ন আসরে মাঝে মাঝেই ন্যাশানাল লাইব্রেরির রিডিং রুম-এ গিয়ে একটু পড়াশোনা করি। বলাই বাহুল্য যে প্রেমচাঁদ বৃত্তি পাব বলে করি না, করি, নিজের মনের ও মানসিকতার উপরে যে ধুলোর আস্তরণ জমে প্রাত্যহিকতার সাধারণ্যে, যাই তারই কিছুটা পরিষ্কার করতে।

সেদিন রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্র প্রবন্ধের' তৃতীয় খণ্ডে পড়ছিলাম যে লাইব্রেরি সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন : "বিদ্যুতকে মানুষ লোহার তারে বাঁধিয়াছে কিন্তু কে জানিত মানুষ শব্দকে নিঃশব্দের মধ্যে বাঁধিতে পারিবে। কে জানিত, সংগীতকে, হৃদয়ের আশাকে জাগ্রত আত্মার আনন্দধ্বনিকে আকাশের দৈববাণীকে সে কাগজে মুড়িয়া রাখিবে। কে জানিত মানুষ অতীতকে বর্তমানে বন্দী করিবে। অতলস্পর্শ কাল সমুদ্রর উপর একখানি বই দিয়া সাঁকো বাঁধিবে।"

কী সত্যি কথা বলো?

ম্যাকলাস্কিগঞ্জের ঘোর এখনও কাটেনি। প্রকৃতির প্রভাব যে আমাদের জীবনে কতখানি তা প্রকৃতির মধ্যে না গেলে বোধহয় বোঝা যায় না। ছিন্নপত্রাবলীতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : "প্রকৃতির মধ্যে, মানুষের মধ্যে আমরা আনন্দ কেন পাই? সে আনন্দ যতই ক্ষুদ্র, যতই চঞ্চল হোক।

এর একটি মাত্র সদুত্তর আমাদের উপনিষদেই আছে। আনন্দধ্বেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রযুন্ত্যভিসংবিশন্তি। এ কথা নিজে না বুঝলে কাউকে বোঝাবার যো নেই।"

তাইতো আমরা গাই "জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ, ধন্য হলো ধন্য হলো মানবজীবন।"

আমাদের উপনিষদে মায়াবাদ প্রসঙ্গে সালম্বন ভ্রম এবং নিরালম্বন ভ্রম-এর কথাও আছে। সালম্বন ভ্রম হচ্ছে ILLUSION। তুমি জানলেও জানতে পারো। এখন বুঝি, তোমার আমার প্রেম হচ্ছে একটি বিশুদ্ধ সালম্বন ভ্রম।

তুমি কী বলো?

ইতি—অগ্নি

চিঠিটা লিখে ফেলতে পেরে খুব হালকা বোধ করল অগ্নি নিজেকে। নিজের মন যখন গ্রীষ্মদিনের ধুলোর মধ্যে ছটফট করা চড়াইপাখির মতো অশান্ত হয়ে ওঠে তখন অরার কথা ভাবলে, অরাকে চিঠি লিখতে পারলে, সেই অশান্ত মন শান্ত হয়ে যায়। চুমু-থেরাপিরই মতো এই চিঠি-থেরাপি।

ফোনটা বাজল এই সময়ে, নাগপুরের চিঠিগুলি শুরু করার আগেই। মনে মনে বিরক্ত হল অগ্নি।

ইয়েস।
আমি অপা বলছি।
অপা মানে, অপালা?
হ্যাঁ।
বাবাঃ। আমার কী সৌভাগ্য।
আপনার সৌভাগ্য না আরও কিছু। সৌভাগ্য তো আমার।
তাই?
নয়তো কী? কী করছেন এখন?
এই! চিঠি লিখছিলাম।
কাকে? অরাকে?
না, নাগপুরের বন্ধুবান্ধবদের।
শুনেছি নাগপুরের আশেপাশে অনেক জঙ্গল আছে। একবার নিয়ে চলুন না আমাদের। আমার জঙ্গল খুব ভালো লাগে।
গেলেই হল। আগে থাকতে আমাকে জানালেই হবে।
কোথায় কোথায় যাওয়া যায়?
কত্ব জায়গাতে। চন্দ্রপুরের কাছে আন্ধারী তাড়োবা টাইগার প্রোজেক্ট আছে। দারুণ। সেখানে অনেক ভূত-গাছ আছে।
ভূত-গাছ? সেটা আবার কী?
হ্যাঁ। সত্যিই বলছি। যে জানে না, সে অন্ধকার রাতে ওই গাছ দেখলে হাত-পা ছড়ানো ভূত ভেবে ভিরমি খাবে।
গাছগুলোর নামই ভূত গাছ?
ইংরেজি নাম KARU GUM TREES এ অন্য জায়গাতেও আছে। তবে কম।
অন্য কোন জঙ্গলে?
আমি পূর্ব-ভারতের জঙ্গলের কথা বলতে পারব না। আমার তো এদিকের জঙ্গল তেমন দেখা নেই। তোমাদের দৌলতে, আসলে ব্রতীনেরই দৌলতে ঝাড়খণ্ডর ম্যাকলাস্কিগঞ্জ দেখা হয়ে গেল।
নাগপুর থেকে আর কোন জঙ্গলে যাওয়া যায়?
নাগজিরাতে। সাতপুরা রেঞ্জের গোখুরি হিলস-এর নাগজিরা। সেও দারুণ জঙ্গল। নাগপুরের কাছেই সাতপুরা রেঞ্জ-এই আছে পেঞ্চ ন্যাশানাল পার্ক। পেঞ্চ নদী বয়ে গেছে মধ্যপ্রদেশ আর মহারাষ্ট্রের মধ্যে দিয়ে। দু রাজ্যের জঙ্গলই দেখার মতো। নাগপুর থেকে একটু দূরে, এই শ তিনেক কিমি দূরে আছে মেলঘাটের জঙ্গল। চিকলধারা হিল স্টেশান। আর সেখান থেকে নেমে সেমাডোহ হয়ে সমতলের জঙ্গল।
বাবাঃ। আপনি কত জায়গাতে গেছেন।
কত মানুষে কত জায়গাতে যায়। আফ্রিকা, আলাস্কা, অ্যানটার্কটিকা, সি-ক্রুইজ, লাক্সারি বোট-এ করে, মানস সরোবর। আমি তো শুধু কিছু জঙ্গলেই গেছি।
—কাল কী করছেন?
কাল? কাল কী বার?
বারও ভুলে গেছেন? মাস ও বছর মনে আছে তো?
মনে পড়েছে। কাল রবিবার। কিন্তু কেন? কাল কী?

আপনি সন্ধেবেলা বাড়িতে থাকবেন?

কেন বলুনতো? হঠাৎ।

বলুন নয়, বলো বলুন। অরাকে তো তুমিই বলেন।

ও। সে তো অভ্যেস হয়ে গেছে।

এটাও অভ্যেস করে ফেলুন। মানে, আমাকে তুমি বলাটা।

বেশ। তাই না হয় বলব। কিন্তু কাল সন্ধেবেলা কী হবে?

আপনার কাছে আসতে চাই।

ঘোষ সাহেবও কি আসবেন?

না। তিনি তো আজ দিল্লি গেছেন সুপ্রিম কোর্টে মামলা নিয়ে। ফিরবেন সেই মঙ্গলবার।

ও। তুমি একাই আসতে চাও?

হ্যাঁ। একাই। অরাকে জানাবেন না কিন্তু।

তারপর বলল, আপনাদের ঘোষ সাহেব কলকাতাতে ফিরলে বাড়িতে একটি পার্টি দেব। ম্যাক্‌লাস্কিগঞ্জের দলের সকলকে ডাকব সেদিন। মানে, আপনার দুই বন্ধুকেও।

বাঃ। সে তো উত্তম কথা। কিন্তু কাল রাতে, মানে সন্ধেতে কী হবে?

—হতে পারে অনেক কিছুই। গিয়েই না হয় ঠিক করব। আমরা দুজনে বাইরে কোথাও খেতেও যেতে পারি। নইলে আপনার বাড়িতেই বসতে পারি। আমি আর আপনি ছাড়া আর কেউ থাকবে না কিন্তু।

—আমার চন্দন। সে যে আমার লোকাল গার্জেন? অন্ধের নড়ি।

তাকে সিনেমা দেখতে পাঠিয়ে দেবেন।

বাঃ বাঃ। এ তো, রীতিমতো রহস্যময় ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে। এ তো দেখছি রুরুর চুমকির আঙ্গাপাঙ্গা দেখার মতোই রহস্যময় ব্যাপার।

সেটা আবার কী?

এই রে! মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল। তবে বলব কখনও।

সব ব্যাপারে ঠাট্টা ভালো লাগে না আমার। আঙ্গাপাঙ্গা দেখা। সেটা আবার কী?

আমারও নয়।

কী?

সব ব্যাপারে ঠাট্টা।

এখন বলুন আমি আসব কি না! আবারও বলছি, আর কেউই যেন চলে না আসে তা দেখতে হবে কিন্তু।

ঠিক আছে। চন্দনকে বাইরে পাঠিয়ে দরজা লক করে দেব।

ল্যান্ড লাইনের রিসিভার নামিয়ে রাখতে হবে। মোবাইলও অফ্‌ফ্ করে রাখতে হবে।

বেশ তাও না হয় করব। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার। হবেটা কী বলো তো?

গিয়েই বলব।

বেশ।

কালকে আবার সকালে ফোন করে ক্যানসেল করে দেবেন না তো?

আমি কথা দিলে আমার ডেডবডিও কথা রাখে।

—বাঃ। চমৎকার। তবে ওসব মরাটরার কথা ভালো লাগে না আমার একেবারেই।

—আজ রাতে উত্তেজনাতে আমার ঘুম হবে না। কালকের কথা ভেবে।

আমারও হবে না।

তারপর বলল, আপনি অন্ধ।

কেন?

এতদিনেও কিছু বুঝতে পারলেন না?

কী?

কালই গিয়ে বলব। আমি আপনার মতো হাঁদা পুরুষ আর দেখিনি।

ঠিক আছে। চাইনিজ কী মোগলাই খাবার আনিয়ে রাখব কি? তুমি এলে, ফোন করেও আনানো যায় অবশ্য।

এখনই কিছু করতে হবে না। আপনার কিছুই করতে হবে না। কাল আমিই খাওয়াব আপনাকে। কালকের প্রোগ্রামটা পুরোপুরি ফ্লুইড থাকুক। সবকিছুই কাল আমি যাবার পরে প্ল্যান করব।

—ওক্কে। ডান।

ক্যানসেল করবেন না যেন? প্রমিস?

—প্রমিস।

ফোনটা ছাড়ার পরে অগ্নির অত্যন্তই নার্ভাস লাগতে লাগল। এতখানি নার্ভাস কখনোই বোধ করেনি। অপার এই Move-এর পেছনে অরার কি কোনো হাত আছে? অরা কি পরীক্ষা করতে চায় অগ্নিকে? না কি অরার প্ররোচনাতেই অপা কি অগ্নির সঙ্গে.............

নাঃ। কিছুই বুঝতে পারছে না।

বুঝতে না পেরে চিঠি লেখার খোলা প্যাড বন্ধ করে চন্দনকে বলল, আজ সাড়ে নটাতেই শুয়ে পড়বে খেয়ে দেয়ে। ঠিক করল শোওয়ার আগে একটা পয়েন্ট ফাইভ অ্যালজোলাম খাবে। তারপর ন্যাশানাল জিয়োগ্রাফিক চ্যানেল খুলে দিয়ে, অরার চিঠিটা খাম বন্ধ করে খামটা চন্দনকে দিয়ে কাল সকালেই পোস্ট করতে বলে টিভির সামনের ইজিচেয়ারে পা ছড়িয়ে বসল। অনেকগুলো চিঠি লেখার ছিল। মনের এই উত্তাল অবস্থাতে চিঠি লেখা সম্ভব নয়।

সাড়ে আটটার সময়ে মোবাইলটা বাজল।

ব্রতীন।

কী রে! তুই কি আসবি? নরেশ এসেছে। তুই এলেই খুলব গোল্ড-লেবেলের বোতলটা।

অগ্নি মিথ্যে কথা বলল। বলল, নারে! জ্বরজ্বর লাগছে। আজ আমি আর যাব না। এনজয় ইওরসেলভ্‌স।

কাল টেনিস খেলতে যাবি তো?

দেখি, কেমন থাকি। জ্বর না এলে, যাব। তুই সকালে ফোন করিস একটা।

ঠিক আছে।

বলল, ব্রতীন।

২৪

অপা একটা লাল-কালো সম্বলপুরী সিল্কের শাড়ি পরে এসেছে। শ্যাম্পু করা খোলা চুল। কী সুগন্ধি মেখেছে কে জানে! রেড ডোর হতে পারে। অনেক বছর আগে সেমন্তি তাকে একটি রেড ডোর পারফ্যুম এনে দিতে বলেছিল। জোগাড় করতে পারেনি।

অপা যথেষ্ট সুন্দরী এবং তার মধ্যে একধরনের চাপল্য আছে, যাকে অবাঙালিরা বলে, নামকিন। এয়ার কন্ডিশান্ড গাড়িতে এসেছে, এয়ার কন্ডিশান্ড ঘরে বসে আছে তবু ওর বাহুমূল ঘেমে গেছে। চোখে গাঢ় করে কাজল দিয়েছে। একেবারে ডিভাস্টেটিং দেখাচ্ছে ওকে।

এত গোপনীয়তা করলে, কিন্তু তোমার ড্রাইভার যদি বোস সাহেবকে বলে দেয় যে তুমি একা আমার কাছে এসেছিলে।

অগ্নি বলল।

বাড়ির গাড়ি নিয়ে আমি থোড়াই এসেছি। ট্রাভেল এজেন্সির গাড়ি নিয়ে এসেছি।

বাবাঃ। তুমি তো খুব স্কিমিং।

হলেই বা। মার্ডার করতে তো আসিনি।

তবে কি মার্ডারড হতে এসেছ?

দেখি কী হয়। আপনি তো অরারই নিরামিষ বন্ধু। নারী-বিদ্বেষী একরকম। আপনার সঙ্গে অরার সম্পর্কটা আমি আজও বুঝে উঠতে পারলাম না। এত বছরের প্রেম অথচ কখনো শরীরী সম্পর্ক হয়নি আপনাদের মধ্যে এটা অভাবনীয়।

সম্পর্কটা প্রেমের কি না তা আমি আজও সঠিক জানি না। তবে কর্তব্যের নিশ্চয়ই। তাছাড়া, প্রেমের অনেকই রকম থাকে। সব প্রেম সবার বোঝার নয়।

যাই বলুন, আপনাদের সম্পর্কটা অ্যাবনর্মাল। হয়তো কিছুটা আনহোলসামও। অবিশ্বাস্য। অরার সঙ্গে কখনো আপনার শারীরিক সম্পর্ক হয়নি এ কথা সত্যিই বিশ্বাস করার নয়।

কোরো না বিশ্বাস। তাছাড়া হোক আর নাই হোক তাতে তোমার এত কৌতূহল কেন? আমার আর তোমার সম্পর্ক নিয়েই কি আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয়?

—তা ঠিক।

তারপর বলল, আমি জানি না জীবনের এই অবেলাতে এসে আমার কী হল!

কী হল, তা গানে বলি?

বলুন। অনেকদিন আপনার গান শুনি না। খালি গলাতে আপনার মতো গান খুব কম মানুষেই গাইতে পারেন।

হাঃ। আমি তো আর গাইয়ে নই। যন্ত্রটন্ত্র পাবই বা কোথায়? তাছাড়া সেদিন রামকুমারবাবু একটি কথা বলেছিলেন এক মজলিস-এ।

কী কথা?

বলেছিলেন, আমাদের সময়ে কথাটা ছিল গান-বাজনা আর এখন হয়ে গেছে বাজনা-গান। মানে, হারমনিয়ম, তবলা, সিন্থেসাইজার, গিটার, বাঁশি, পারকাশান ইত্যাদি ইত্যাদি। অনেক গায়ক-গায়িকার আবার জোড়ায় জোড়ায় দরকার হয়। গায়ক-গায়িকার গলা যে কেমন তা বোঝার জোটি পর্যন্ত নেই।

তা যা বলেছেন। কিন্তু গানটা গাইবেন তো? কী হল গান।

হ্যাঁ। গাই।

সত্যি। আপনি যেমন করে মানুষে বলে, "চানে যাই" তেমনই করে গানে যান। বিনা প্রস্তুতিতে এমন গান গাইতে আমি কোনো মানুষকেই শুনিনি।

আমি আবার গায়ক নাকি? ছাতার গায়ক।

হয়েছে। এবার গান।

"কী হলো আমারো সই, বল কী করি
নয়ন লাগিল যাহে কেমন পাশরি।
কী হলো আমারো সই বল কী করি।

হেরিলে হরিষচিত, না হেরিলে মরি
তৃষিত চাতকী যেন থাকে আশা করি।
ঘন মুখ হেরি সুখী, দুখ বিনে বারি।
কী হল আমারো সই, বল কী করি।"

বাঃ। সত্যি! আপনার প্রেমে যে পড়েছি সে তো অবশ্যই। অনেক কিছুর জন্যেই পড়েছি। তার মধ্যে আপনার গান সম্ভবত একটি কারণ।

তুমি মেয়েটি বড় সরলা অপালা। প্রেমে অনেক মেয়েই পড়ে কোনো না কোনো পুরুষের কিন্তু তোমার মতো অবলার মতো তা অকপটে বলতে খুব কম মেয়েই পারে। মেয়েদের প্রেম বুঝে নিতে হয় চোখের ভাষায়, তাদের নীরবতায়, তাদের আপাত-বিদ্বেষে।

আমরা যে অন্যরকম। আমরা আর আপনারা বিপরীত না হলে একে অন্যের প্রতি কোনো আকর্ষণই থাকত না।

—তা অবশ্য ঠিক।

—আমরা তো পুরুষদের চেয়ে দুর্বল।

—সেটা হয়তো শারীরিকভাবে। তোমাদের ভূমিকাটা প্যাসিভ, আমাদেরটা অ্যাকটিভ। তবে আজকাল নারী পুরুষের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশই কমে আসছে সেটা ভালো কী মন্দ তা জানি না অবশ্য। মেয়েরাও ক্যারাটে শিখছে, কুংফু শিখছে, তাদের মধ্যেও জ্যাকি চ্যাঙ পাওয়া যাচ্ছে।

—তাহলেও, আমার মনে হয় মেয়েরা দুর্বল।

—আসলে, যেটাকে তোমরা দুর্বলতা বলে জানো, সেটাই তোমাদের বল।

বাঃ। বেশ বললেন তো কথাটা।

তা কথা বলেই কি কাটবে সময়? কিছু একটা খাও। কী খাবে? মাঙ্গো-পান্না? না কি বাকার্ডি বানিয়ে দেব? না কি ব্লাডি-মারি খাবে একটা। ভালো ভদকা আছে। টোম্যাটো জ্যুসও আছে, ভালো করে বরফ দিয়ে বানিয়ে দিতে পারি।

—আপনি যা ভালোবেসে দেবেন।

—তাহলে তার আগে ভালোবেসে তোমার দু চোখের পাতাতে দুটি চুমু খাই—তারপর তোমার দু কানের লতিতে।

অপার মুখটি লাল হয়ে উঠল—ব্লাশ করল সে। অগ্নিভ উঠে গিয়ে তাকে দু-হাতে আলতো করে জড়িয়ে ধরে তার দুচোখে আর কানের লতিতে দুটি করে চুমু খেল।

অপা দাঁড়িয়ে উঠেছিল। তার শরীরময় রক্ত ছোটাছুটি করতে লাগল। অপা বলল, আমার শরীরে গান বাজছে। স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ. সব একসঙ্গে বেজে উঠেছে।

বলেই, অপা অনেকক্ষণ অগ্নিকে জড়িয়ে রইল। তার নরম স্তন অগ্নি দৃঢ় বুকে ঝড়ের পাখির মতো আশ্রয় খুঁজল। তারপর ভেজা চোখে অস্ফুটে বলল অপা, আমার স্বামী কোনোদিনও আমাকে এমন করে আদর করেনি।

—তো কী করে করেছে?

শুয়োরে যেমন করে শটিখেত তছনছ করে, তেমন করে করেছে ফুলশয্যার রাত থেকে কাল রাত অবধি।

অগ্নি খুব জোরে হেসে উঠল। বলল, তুমি কচুবনে শুয়োর দেখেছ কখনও?

দেখেছি বইকী। আমার মামাবাড়ি ছিল বহরমপুরের গ্রামে। রাতের বেলা কচুবনে ঘোঁৎ করে কচুবন তছনছ করতে দেখেছি।

হাসতে হাসতেই অগ্নি বলল, স্ত্রীকে আদর করার রকম দিয়েই একজন পুরুষের পৌরুষকে বিচার কোরো না। ঘোষ সাহেব যখন শামলা গায়ে হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টের বিপক্ষের তাবড় উকিল ব্যারিস্টারদের তাঁর সওয়ালে কচুকাটা করেন সেটাও কিন্তু পৌরুষের মস্ত নিদর্শন। পুরুষ এবং অবশ্যই নারীরও একমাত্র কৃতিত্বের ক্ষেত্র তো শোওয়ার ঘর নয়।

কিন্তু.........

কিন্তু নয়, আমি জানি যে অনেক মেয়ে ফ্রিজিড। তাদের স্বামীরা তাদের কাছ থেকে যা চায় তা সারাজীবন পায় না—কিন্তু তা বলে তার জীবন, তার সংসার তার সন্তান এসব কিছুই তো মিথ্যা হয়ে যায় না অপা। মানুষ তো পশু নয়। রমণ করাটাই তার একমাত্র কৃতিত্ব নয়—কী পুরুষের কী নারীর। মানুষের মনটাই সব। সব না হলেও জীবনের অনেকখানি। অন্তত আমাদের ভারতীয় ঐতিহ্যে। পশ্চিমি দেশের স্ত্রী পুরুষ আমাদের চেয়ে অনেক বেশি শরীর-সর্বস্ব।

—কী বানিয়ে দেবেন বললেন দিন। আমি আজকে ড্রাঙ্ক হয়ে যাব।

—দিচ্ছি।

বলে, অগ্নি সেলারের দিকে এগিয়ে গেল। গ্লাসে বাকার্ডি ঢেলে ফ্রিজের দিকে এগিয়ে গেল বরফের আর সোডার জন্যে।

তারপর ড্রিঙ্কটি বানিয়ে অপার কাছে এসে একটি ন্যাপকিনে গ্লাসটি মুড়ে অপার দিকে এগিয়ে দিল। বলল, বোসো ওই চেয়ারে, বসে তারিয়ে তারিয়ে খাও। ড্রাঙ্ক হতে যাবে কোন দুঃখে? ড্রাঙ্ক হয় জীবনে অসফল, ফ্রাস্ট্রেটেট, হেরে-যাওয়া মানুষেরা।

—জিতে যাওয়া মানুষেরাও হয়। ফেইলিওরের মতো সাকসেসও মানুষকে ফ্রাস্টেটেট করে।

—বাঃ। খুব ভালো বলেছ তো কথাটা। এমন করে ভাবিনি কখনো।

আপনাদের ঘোষ সাহেবই তো এই স্পেসির জাজ্বল্যমান উদাহরণ একটি।

—ঘোষ সাহেব মানুষটি বড় ভালো। আই লাইক হিম। কোনো মানুষেরই কি সবই গুণ থাকে, দোষ তো দু-একটা থাকবেই।

—সে কথার উত্তর না দিয়ে অপালা বলল, আপনি কিছু নিলেন না? আমি বানিয়ে দেব?

—আজ থাক। আজ তুমিই আমার নেশা হও।

—বেশি, বেশি।

—কপট ভর্ৎসনার স্বরে বলল, অপা।

তারপরে বলল, না, আপনি একটা অন্তত ড্রিঙ্ক নিন। আমি আজ আপনার আদর খেতে এসেছি।

আদর তো করলাম তোমাকে অপা।

না।

তারপর চোখ মাটির দিকে নামিয়ে বলল, বড় আদর।

অগ্নি ছেলেমানুষের মতো হেসে উঠল। বলল বাঃ দারুণ তো শব্দটি।

এই শব্দটিকে চালু করে দিতে হবে। যেমন চালু করব আঙ্গাপাঙ্গা শব্দটি।

সেটা কী শব্দ?

অগ্নিভ জোরে হেসে উঠল বলল, ফ্যান্টাসটিক শব্দ একটা। বলব, বলব। পরে বলব।

তারপর নিজের জন্যে একটি ভদকা তৈরি করে নিয়ে এসে বলল, জীবনে কারোকে প্রথমবার

আদর করতে হলে চার দেওয়ালের মধ্যে কখনো করতে নেই।

অপা অবাক হয়ে বলল, তাহলে? কোথায় করতে হয়?

প্রকৃতির মধ্যে। ফুল, পাখি, গাছগাছালি, চাঁদ তারাকে সাক্ষী রেখে। মানুষের 'বড় আদর' ব্যাপারটা তো একটা মহৎ ব্যাপার, শূকর-শূকরীর চর্মঘর্ষণ নয়,—তার জন্যে আয়োজন লাগে, শরীর মনে নহবৎখানাতে সানাই বাজাতে হয়।

আপনার ব্যাপার-স্যাপারই আলাদা।

ব্যাপার-স্যাপার নয়, বলো, স্টাইল।

তারপর বলল, তা বলতে পারো। আমি অন্য দশজনের থেকে আলাদা। আই কনটেইন মালটিট্যুডস।

২৫

আজকে তৃষা অফিসে যায়নি। মাঝে খুবই খাটনি গেছে। দিল্লি বম্বে চেন্নাই দৌড়াদৌড়ি করে একেবারে ক্লান্ত। রুরুর কলেজের বাংলার এক অধ্যাপক কানকাটা স্যার আচম্বিতে বড়বাজারের গলিতে তলপেটে এক ষাঁড়ের গুঁতো খেয়ে সাংঘাতিক আহত হয়ে হাসপাতালে তিনদিন ভুগে গতকাল সন্ধেতে মারা গেছেন। তাই আজ কলেজ ছুটি।

অরা যথারীতি স্কুলে গেছে।

সকালের জলখাবারের পরে ভাইবোনে বসবার ঘরে বসে গল্প করছিল। আজকাল ওরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তৃষাকে তো প্রায় দেখাই যায় না। সাতসকালে বেরিয়ে যায় গভীর রাতে ফেরে। তবে কোম্পানির গাড়িই নামিয়ে দিয়ে যায়। এয়ারপোর্টে নিয়ে যাওয়া এবং ফিরিয়ে নিয়ে আসাও কোম্পানির গাড়িই করে। বিস্পতিদিকে বলে, ভাইবোনে আজ জম্পেস করে লুচি, ঝাল-ঝাল আলুর তরকারি, বেগুন ভাজা আর পায়েস দিয়ে ব্রেকফাস্ট করেছে। তারপর দুজনে বসে গল্প করছে।

তৃষা বলল, অগ্নিকাকা অনেকদিন আসে না, না রে? অগ্নিকাকা এলে বাড়ির পরিবেশটাই বদলে যায় যেন।

যা বলেছিস। মা এতদিন স্কুলমাস্টারি করে কেমন বেরসিক, রাশভারী, রামগড়ুরের ছানার মতো গুরুগম্ভীর হয়ে গেছে।

মা-ই তো আমাদের মানুষ করেছেন। মা-এর সম্বন্ধে এমন হেলাফেলার কথা তোর বলা উচিত নয় রুরু। তুই বড় ইল-ম্যানার্ড, অ্যারোগান্ট হয়ে উঠছিস দিনে দিনে।

সরি। আই ডিড নট মিন টু হার্ট ড্যু অ্যান্ড নট দ্যা লিস্ট মাই মাদার।

জানি।

তোর বাংলা ব্যান্ড কেমন চলছে?

ভালোই। পরশু একটা প্রোগ্রাম আছে আমাদের খড়্গপুরে। ভোরে যাব সবাই বাসে করে আর গভীর রাতে ফিরব।

মায়ের পারমিশান নিয়েছিস।

আমি কি কিন্ডার গার্টেনের ছাত্র? পারমিশানের কী আছে? তাও রাতে তো আর বাইরে থাকছি না।

এটা কি নতুন ব্যান্ড?

হ্যাঁ।

পুরানোটা ছাড়লি কেন?

আরে শীদাদার জন্যে। চোখের সামনে মানুষটা মেগালোম্যানিয়াক হয়ে গেল। আমরা সকলে মিলে বড়ো করলাম ব্যান্ডটাকে আর তাঁর ধারণা হয়েছে তিনি একাই এর সাকসেস-এর মূলে। মেগলোম্যানিয়াটা একটা অসুখে দাঁড়িয়ে গেল।

তা ঠিক। এই রোগটা প্রায় মহামারির চেহারা নিয়েছে সমাজের সর্বত্র। অথচ কলেরা-টাইফয়েড তো নয় যে ইনজেকশান দিয়ে ভালো করা যায়।

তৃষা বলল।

ওষুধ যে ছিল না তা নয়। ছিল।

—কী?

—আড়ং ধোলাই। তবে আমরা ওঁকে স্পেয়ার করলাম।

—কেন?

—ফর ওল্ড টাইমস সেক।

—ভালোই করেছিস।

—তা তোদের নতুন ব্যান্ডের নাম কী?

কেঁচে গণ্ডুষ।

কী নাম বললি?

বললামই তো, "কেঁচে গণ্ডুষ।" কেন? ভালো হয়নি নামটা?

দুর্দান্ত।

তৃষা বলল।

তারপর বলল, তোদের নতুন ব্যান্ডের গান শোনাস একদিন। তোর লেখা গান আছে কোনো?

নেই? অবশ্যই আছে।

কী গান? শোনাবি?

গিটার-ফিটার ছাড়া তো জমবে না।

গানের কথাটা শোনা অন্তত। প্রথম লাইনটা—প্রথম লাইনটা রঘুদাদুর কবিতার থেকে মারা।

রঘুদাদু কে?

আরে, রুদ্র পলাশের দাদু। রঘু ব্যানার্জি।

শোনা না, অত কথা না বলে।

'এক ঠোঙ্গা খাবার নিয়ে যায় মতিলাল
তাই দেখে দূর থেকে মারলে ছোঁ চিল'

এটা আবার কী কবিতা?

কেন দেশ-এ কি এর চেয়ে খুব ভালো কবিতা বেরোয় না কি প্রতি সংখ্যাতে? চিলের 'ল' আর মতিলালের 'ল'-তে মিল নেই?

তৃষা হো হো করে হেসে উঠল। তারপর বলল, পরের লাইনগুলো বল।

"চিলকে দেখে বাচ্ছা মামা উড়িয়ে দিল ঢিল
তাই না দেখে মামার মামা পিঠে ঝাড়ল কিল।"

—তৃষা বলল, বাঃ। বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ অতীব উজ্জ্বল।

—বাংলা কাব্য-সাহিত্য-সংগীতের লোকাল গার্জেন তো এখন একটি সর্বজ্ঞ মিডিয়া। তাঁদের হাতেই তো ভুবনের ভার।

—সেই হচ্ছে কথা। আ কান্ট্রি গেটস আ মিডিয়া ইট ডির্সাভস।

—রুরু তারপর বলল, দ্যাখ দিদি, মাকে কদিন হল কেমন মন-মরা দেখছি। কেন? তুই কি জানিস?

কী করে বলব বল? টাকা-পয়সা নিয়ে কোনো টেনশান হচ্ছে কি?

—জানি না। মাতো কিছু বলেন না।

—আমি কি বলব কিছু অগ্নিকাকাকে?

—মা জানলে রাগ করতে পারেন।

—মা জানবেন না।

—আমি কিন্তু মাকে মাসে আরও আড়াই হাজার করে দিতে পারি। আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে এখুনি অত ভাববার দরকার নেই। ভবিষ্যৎ-এর ভাবনা ভাবার এখনও সময় আসেনি।

—আমিও পারি মাকে হাজারখানেক করে দিতে।

—তোর টিউশনির টাকা? মা নিলে তো?

তবে অগ্নিকাকাকেই বলব। উনি তো আমাদের বাবারই মতো।

মা বলেন, "বাবার মতো" আর "বাবাতে" তফাত আছে।

—জানি।

—দিদি। তোকে একটা কথা বলব? এ কথাটা তোর মনেও আমার থেকে অনেকই আগে এসেছে নিশ্চয়ই।

—কী?

মা, অগ্নিকাকাকে বিয়ে করলেন না কেন? অগ্নিকাকাই তো বাবার হঠাৎ মৃত্যুর পর থেকে আমাদের বাবারই মতো আগলেছেন। উনি না থাকলে আমাদের কী যে হত তা কে বলতে পারে।

—কথাটা মনে আসেনি তা নয়। বহুবছর আগে থাকতেই এসেছে। কিন্তু ব্যাপারটা মা আর অগ্নিকাকার পার্সোনাল ব্যাপার। আমাদের এক্তিয়ার নেই ও ব্যাপারে কথা বলার।

—কিন্তু দুজনে দুজনকে ভালো তো বাসেন।

—তাতো অবশ্যই বাসেন। এমন শুদ্ধ পবিত্র ভালোবাসার কথা আমাদের প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা ভাবতেই পারি না।

—তা ঠিক।

—তোর সঙ্গে হর্ষদদার কখনো ফিজিক্যাল রিলেশান হয়নি? সত্যি করে বলতো?

—হয়েছিল। মাত্র একবারই। এবারে যখন পুনেতে গেছিলাম। আমি বলেছিলাম, বিয়ে অবধি অপেক্ষা করো। তাতে আমাদের সম্পর্কর মাধুর্য আরও বাড়বে।

—ও কী বলল?

—তোরা ছেলেরা বড় অবুঝ, অধৈর্য, ছেলেমানুষ। তোরা যাই-ই চাস এখুনি চাস। তোদের তর সয় না কিছুতেই।

—এতে তোদের সম্পর্কটা কি আগের থেকে গভীর হয়েছে?

—গভীর হয়েছে কি না বলতে পারব না কিন্তু শরীরের স্বাদ পাওয়ার পর আমারও ইচ্ছা করেছে, করে, যে আবারও পাই। বাঘ যেমন মানুষের রক্তর স্বাদ পেলে আবারও মানুষ খেতে চায়, শরীরও বোধহয় শরীরের স্বাদ পেলে আবারও পেতে চায়। ভালোবাসাতে শরীরেরও যে একটা মস্ত ভূমিকা

আছে তা সে সম্পর্ক হওয়ার আগে পর্যন্ত বোঝা যায় না।

মানে?

আগে হর্ষদের প্রতি ভালোবাসার রকমটা অন্য ছিল এখন আরেক রকম হয়েছে। এত কাকুতি-মিনতি করল, এমন কাঙালের মতো করল যে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলাম না। ওর কাঙালপনাটা এখন আমার মধ্যেও চারিয়ে গেছে।

তবে? মাও তো তোরই মতো একজন মেয়ে, অগ্নিকাকাও হর্ষদদার মতো একজন পুরুষ। ওঁরা দুজনে সম্পর্কটাকে এমন স্বর্গীয় করে রাখলেন এতবছর কী করে!

—জানি না। তবে যেভাবেই তা করে রাখুন না কেন দুজনেরই যে খুবই কষ্ট হয়েছে হয়, তাতে কোনো সন্দেহই নেই।

—ওঁরা হয়তো ভাবেন যে, আমরা ওঁদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটাকে মেনে নিতে পারব না, আপত্তি করব। আমাদের কি উচিত নয় ওঁদের দুজনকেই জানিয়ে দেওয়া যে, আমরা কিছুমাত্রই মনে করব না।

—ওরে বাবা! কে বলবে? বিশেষ করে মাকে? হু উইল বেল দ্যা ক্যাট?

—তা অবশ্য ঠিক।

২৬

ওরা সকলে বসে আছে। চোখের সামনে সূর্য ডুবেছে। ঝুরুঝুরু করে হাওয়া দিচ্ছে একটা। কোকিল আর পিউ কাঁহা ডাকছে বুকের মধ্যে চমক তুলে।

নরেশ বলল, অগ্নি আর আপনার ওয়াইফ কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন ব্যারিস্টার সাহেব? বিকেলে বেড়াতে তো গেছিলাম আমরা সকলেই!

—যেখানে গেছে যাক। কিন্ডার গার্টেনের ছাত্র তো নয়।

—নরেশ বলল, তা নয়। তবে এখানে আজকাল এম.সি.সি.-র ছেলেদের দৌরাত্ম্য আরম্ভ হয়েছে না কি।

—ব্রতীন বলল, যতটা রটনা ততটা ঘটনা নয়। বেড়াতে-আসা মানুষদের ওরা কিছুই বলে না। আমরা ওদের শ্রেণিশত্রু নই।

—তা নই। কিন্তু যদি একবার জেনে যায় যে ডাকসাইটে ব্যারিস্টার ঘোষ সাহেবের স্ত্রী অপালা দেবী, তবে তাঁকে কিডন্যাপ করে মোটা র‍্যানসাম মানি দাবি করতে পারে।

—ব্রতীন বলল, আপনার কোনো টেনশান হচ্ছে না ঘোষ সাহেব? পাঁচটা নয়, দশটা নয়, একটামাত্র বউ।

—আরে মশাই! যদি কেউ নিয়েই যায় তবে র‍্যানসাম চাইতে হবে না আমি তাকে এমনিতেই মোটা অঙ্কের চেক লিখে দেব। বিয়ে তো করেননি আপনাদের কেউই। "কী যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে, কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।"

তৃষা বলল, আশীবিষ মানে কি মেসোমশাই। আমি বিজ্ঞাপনের কপি রাইটিং করি, বাংলাতেও করি অথচ এই শব্দটি তো কখনো পাইনি।

—কী করে পাবি মা! তোরা কি মাইকেল পড়েছিস?

—রুরু বলল, মাইকেল জ্যাকসন? তিনি আবার বইও লিখেছেন না কি? স্ট্রেঞ্জ!

—ব্রতীন, নরেশ, অরা সকলেই একই সঙ্গে জোরে হেসে উঠল রুরুর কথা শুনে।

ঘোষ সাহেব বললেন মাইকেল মানে মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ব্যারিস্টার ছিলেন, মানে, সেম ফ্রাটানির্টির মানুষ বলেই যে তাঁর লেখা পড়েছি তাই নয়, বাংলা সাহিত্য নিয়ে যাঁদের কারবার তাদের পক্ষে মাইকেল পড়াটা একটা মাস্ট। আমি বেশি কিছু পড়িনি, তবে ওটি পড়েছি।

—ব্রতীন বলল, রুরু তোরা তো বাংলা ব্যান্ড, লিটল ম্যাগ, নাটক-টাটকও করিস-টরিস, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তর জামাই মেঘনাদের একক অভিনয়ও দেখিসনি? মেঘনাদবধ কাব্য থেকে একটি অংশ নিয়ে করা?

রুরু কিছুক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থাতে থেকে বলল, মেসোমশাই যে মেঘনাদবধ কাব্যর কথা বললেন একটু আগেই। মেঘনাদ যদি মরেই যাবে তাহলে আবার নাটক করবে কী করে!

অরা খুব লজ্জিত হল রুরুর অপার অজ্ঞতাতে। অস্ফুটে বললেন, ছিঃ ছিঃ। আমার ছেলেমেয়েগুলো যে কী হল। ম্যাকলাস্কিগঞ্জের অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরাও বোধহয় এদের চেয়ে বেশি বাংলা জানে! তারপর বলল, ব্রতীনবাবু, রুদ্রপ্রসাদের জামাই মেঘনাদ ভট্টাচার্য নয়, তার পদবি হালদার এবং নামও মেঘনাদ নয়। নাম, গৌতম।

নরেশ বলল, মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্ত্রী কিন্তু অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ছিলেন। অপরূপ সুন্দরী। নাম ছিল হেনরিয়েটা।

ব্রতীন বলল, আমাদের একেবারে ছেলেবেলাতে যে বাংলা ছবিটি এসেছিল মাইকেলের জীবনী অবলম্বন করে তাতে হেনরিয়েটাকে উদ্দেশ্য করে গাওয়া মধুসূদন দত্তর চরিত্রের অভিনেতার মুখে একটি গান ছিল মনে আছে অরা দেবী?

কোন গান?

"তুমি যে আমার কবিতা"।

না। আমি ছবিটি দেখিনি।

তারপর বলল, অপালা মানবী হতে পারে কিন্তু দেবী হলাম কী করে!

ঘোষসাহেব বললেন, যারাই আপনার সংস্পর্শে এসেছে তারাই আপনার দেবী-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অবহিত। তাই আপনা থেকেই সম্বোধনে দেবী বেরিয়ে আসে।

—খুবই বিপজ্জনক কথা। আমি অতি সাধারণ মানবী, দয়া করে আপনারা কেউই আমাকে দেবী বলবেন না।

—বলেই বলল, এবারে কিন্তু আপনাদের ওদের খোঁজে যাওয়া উচিত। মুখার্জিবাবুকে ডেকে নিয়ে টর্চ নিয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে দেখলে কি ভালো হয় না। ঘোষ সাহেব? শুনেছি আপনার কাছে তো পিস্তলও আছে।

ঘোষ সাহেব হেসে বললেন, যাক না। যারা ইচ্ছে করে হারিয়ে যায় তাদের খুঁজতে যাওয়ার মতো মূর্খামি আর নেই। তাছাড়া, অপালা তো সারা জীবন আমার মতো কাঠখোট্টা মানুষের সঙ্গেই জীবনটা কাটাল। অগ্নির মতো একজন পুরুষের মতো পুরুষের সঙ্গে এই অনন্তকালের মধ্যে দুদণ্ড কাটাতে চাইলে কাটাকই না।

অরা বলল, ওরা নিশ্চয়ই পথ ভুলে গেছে।

—হয়তো গেছে। কিন্তু পথ ভোলা শব্দটা দ্ব্যর্থক। পথ হয়তো ভুলেছে কিন্তু তা ম্যাকলাস্কির পথ নয়।

আপনার মতো উদার স্বামী পাওয়া খুবই সৌভাগ্যর কথা। আশিস কিন্তু ভীষণই পজেটিভ ছিল আমার ব্যাপারে আর জেলাস ছিল বিশেষ করে অগ্নির ব্যাপারে। আর বিধাতার কী লীলাখেলা দেখুন।

সেই অগ্নিই তৃষা আর রুরুর গডফাদার হয়ে এল ওর হঠাৎ চলে যাওয়ার পরে।

—ঘোষ সাহেব বললেন, আমি উদার কি না জানি না। তবে আমি নর্ম্যাল। অনেকইদিন আগে "স্বামী হওয়া" নামের একটি গল্প পড়েছিলাম কোনো সাপ্তাহিক পত্রিকাতে। অসাধারণ গল্প মশাই। সেই গল্পে স্ত্রী স্বামীর এক অল্পবয়সি ব্যাচেলার সহকর্মীর সঙ্গে অ্যাফেয়ারে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু ছেলেটি যথেষ্ট মাখামাখির পর তার বাড়ির পছন্দে বিয়ে করে অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সঙ্গে পুরানো সম্পর্কটিকে ছিঁড়ে ফেলে।

—আমিও পড়েছি গল্পটা।

—ব্রতীন বলল।

অরা বলল, তারপর?

তারপর অপমানিত, আহত, ব্যথিত স্ত্রী এক রাতে তার স্বামীর কাছে ভেঙে পড়ে ক্ষমা চায় তার কৃতকর্মের জন্যে। স্বামী বলে, তুমি তো আমাকে কোনোভাবেই ঠকাওনি। আমার প্রাপ্য এবং চাহিদার, তার সবটুকু মিটিয়ে তোমার যা উদ্‌বৃত্ত তা থেকে অন্যকে যদি কিছু দিয়েও থাকো, এবং দিয়ে খুশি হয়ে থাকো তবে আমার আপত্তির কী থাকতে পারে!

ব্রতীন বলল, শেষ লাইনটা বলুন ঘোষ সাহেব।

আপনিই বলুন।

সেই স্বামী বলছেন, যেদিন উলুধ্বনির মধ্যে, সানাইয়ের সুরের মধ্যে, গুরুজনদের আশীর্বাদের ধন্য হয়ে একটি নারীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলাম সেদিন আমি 'বর' হয়েছিলাম। আর আজ এতদিন পরে স্বামী হলাম।

'স্বামী হওয়া' আমি পড়িনি কিন্তু এরকমই একটি গল্প পড়েছিলাম, 'বাবা হওয়া'। সন্তানের জনক হওয়া আর বাবা হওয়াতে অনেকই তফাত।

ঘোষ সাহেব বললেন, আমরা এই তিন মক্কেলের কেউই তো বাবা হতে পারলাম না তাই 'বাবা হওয়া' গল্পের সারমর্ম আমাদের উপলব্ধি করা হল না। তাই সে প্রসঙ্গ না হয় থাক।

২০

অন্ধকার নেমে-আসা জঙ্গলের মধ্যের একটি চ্যাটালো কালো পাথরের উপরে চিৎ হয়ে অপা শুয়েছিল। বিবস্ত্রা। পাশে দাঁড়ানো অগ্নি কেটে কেটে, সামান্য উত্তেজিত গলাতে বলল, চলো, এবারে ফেরা যাক। যেতেও মিনিট কুড়ি লাগবে। যদিও চাঁদ উঠেছে তবে সবে গরমটা পড়েছে। সাপ বিছে আছে।

অপার জামাকাপড় পরা হয়ে গেছে, অগ্নির পাশে এসে অগ্নিকে পাগলের মতো চুমু খেতে লাগল শব্দ করে অপা।

ভালো লেগেছে তোমার?

অগ্নি বলল।

এখন কথা বলো না। চলো, এগোই।

তারপর বলল, তোমার জীবনে এই কি প্রথম অভিজ্ঞতা?

মিথ্যে বলব না। প্রথম নয়।

কিন্তু অরার সঙ্গে একদিনও হয়নি এ অভিজ্ঞতা?

হয়তো বিশ্বাস করবে না। হয়নি। ও আমাকে ওর কুলুঙ্গির ঠাকুর করেছে। আমাকে সে বিছানাতে পেতে চায় না।

বিছানাতে না পেতে চাক এমন বনের মধ্যে তো পেতে পারত।

পারত হয়তো। কিন্তু চায়নি।

ওই স্বপ্ন আলোতেও সদ্য তৃপ্ত শরীরের সব আনন্দ অপালার মুখে এক জ্যোতি দিয়েছিল যা শরীরের পূর্ণ পরিতৃপ্তির পরেই শুধু আসে। যারা জানেন, তারাই শুধু জানেন, বিশেষ করে, মেয়েরা।

—অগ্নি বলল, ওরা সবাই খুব চিন্তা করছে।

—তুমি শুধু চিন্তা করাটার কথাই ভাবছ? ওরা কী মনে করছে তা ভাবছ না একবারও।

তোমার জন্যেই তো এত দেরি হল। পথের কাঙালিরাও এমন করে চেটেপুটে খিচুড়ি খায় না।

আমিও বুঝতে পারলাম যে তুমি বড়ই উপোসী ছিলে।

উপোসী ছিলাম না। কচুবনে শুয়োরের আবির্ভাব তো ঘনঘনই হয়। কিন্তু আমার শরীরের বনে বাঘ তো আসেনি এর আগে। কখনোই আসেনি। আমি জানি না কী করে তোমাকে ধন্যবাদ জানাব। আমি তোমার জন্যে সব করতে পারি। ঘরও ছাড়তে পারি।

ঘর ছাড়ার মতো সোজা কাজ আর কী আছে? তাছাড়া ঘোষ সাহেবের মতো এমন দেবতুল্য স্বামী।

দেবতুল্য না ছাই!

ছিঃ। উনি একজন চমৎকার মানুষ। একজন মহৎ, উদার মানুষ। তাঁর একটি অপূর্ণতার জন্যে পুরো মানুষটাকে কি বাতিল করা যায়? জানি না, তুমি বুঝতে পারবে কি না বললে, আমরা প্রত্যেকেই খণ্ড মানুষ। রবীন্দ্রনাথ যে 'পূর্ণ-মনুষ্যত্ব'র কথা বলতেন, তাঁর শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তা চারিয়ে দিতে চাইতেন, তা আদর্শ হিসেবে অবশ্যই গ্রহণীয়। কিন্তু এই পৃথিবীতে এই জীবনে, 'পূর্ণ মানুষ' কজন হতে পারে? কজন নারী বা পুরুষ? এ জীবনে আমার দেখা নারী পুরুষদের মধ্যে একমাত্র অরাকেই পূর্ণ মনুষ্যত্বের কাছাকাছি আসতে দেখেছি। ও আমাকে ওর কুলুঙ্গির ঠাকুর করেছে। ও বলে যে, কিন্তু আসলে ও নিজেই আমার মনে দেবীর আসনেই অধিষ্ঠিতা।

একটু পরে অগ্নি বলল, আসলে আমরা প্রত্যেকেই খণ্ড মানুষ। আমার একটি গুণে তুমি অভিভূত হলে, আমার যে কত দোষ তার কোনো খবরই তুমি রাখো না। ঘোষ সাহেবকে তুমি অসম্মান করো না কখনো। তুমি একজন আশ্চর্য মানুষ। তোমাকে যত দেখছি তোমার প্রতি শ্রদ্ধা ততই বাড়ছে।

একটু চুপ করে থেকে বলল, দেখে চলো, পড়ে যেয়ো না।

অপালা বলল, পড়ে তা গেছিই। এখন আর দেখে চলে লাভ কী?

২৮

ব্রতীন বলল, সত্যিই তো অনেকই দেরি হয়ে গেল। নাঃ এবারে একটা কিছু করতে হয়। মুখার্জিবাবুকে ডাকি? ঘোষ সাহেব আপনাকেও উঠতে হবে। আপনার সঙ্গে পিস্তল আছে।

ওরে বাবা। আমি মোটা মানুষ। অনেক হাঁটা হয়েছে বিকেলে। আমার দ্বারা আর হাঁটাহাঁটি সম্ভব নয়। তাছাড়া আমার আহ্নিকেরও সময় হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। পরস্ত্রী হলেও না হয় কথা ছিল। নিজের স্ত্রীকে গোরু খোঁজা খুঁজতে অত কষ্ট করার মধ্যে আমি নেই। তাছাড়া ইংরেজিতে একটা

কথা আছে না? কী কথা? "দেয়ার ইজ নো পয়েন্ট ইন ট্রাইং টু ডু সামথিং হোয়েন দেয়ারস নাথিং টু বি ডান।"

আপনাকে কিছু বলার নেই। আশ্চর্য মানুষ আপনি।

নরেশ বলল।

ব্রতীন বলল, কিছু বলতে যাসও না। ওদের একটু আলগা থাকতে দে না।

পরের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাতে হস্তক্ষেপ করাতে আপনাদের এত উৎসাহ কেন মশায়? ঘোষ সাহেব বললেন।

তারপরই বললেন নরেশকে, আপনারা শিভালরি দেখাতে যেখানে খুশি যান স্যার, যাওয়ার আগে আমাকে একটা বড়ো করে হুইস্কি সেজে দিয়ে যান।

আশ্চর্য মানুষ তো আপনি। আপনারই তো স্ত্রী। আর আপনারই কোনো হেলদোল নেই?

আহা। সে তো যোগ্যজনের সঙ্গেই আছে। কিডন্যাপড তো আর হয়নি।

ইতিমধ্যে শোরগোল শুনে মুখার্জিবাবু নিজেই ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন।

—নরেশ বলল, আপনার টর্চটা নিয়ে একবার আসবেন আমাদের সঙ্গে?

—কী হল?

—না, অগ্নিবাবু আর অপালা দিদি এখনও ফেরেননি।

নিরুদ্‌বেগ গলাতে উনি বললেন, ফিরে আসবেন। চাঁদের আলো আছে। জঙ্গলে এই সময়ে হেঁটে বেড়াবার মজাই আলাদা।

আর এম.সি.সি.-র ছেলেরা?

ওরা সব ভালো ছেলে। আমাদের অতিথিদের কোনো ক্ষতি করবে না।

—একটু এগিয়ে গিয়ে দেখলে হত না? ঘোষ সাহেবের কাছে পিস্তলও আছে।

—আস্তে বলুন। ওরা জানতে পেলে ওটিকে ট্যাকস্থ করবে। তাছাড়া পিস্তল-ফিস্তল আজকাল কোনো কাজে আসে নাকি? ওরা সব এ.কে. ফর্টিসেভেন আর ল্যান্ডমাইনের কারবারি। তাও আবার রিমোট কন্ট্রোলে এক্সপ্লোশান ঘটায়।

তাই নাকি?

নরেশ বেশ ভয়ার্ত গলাতে বলল।

ঘোষ সাহেব হুইস্কির গ্লাসে একটু চুমুক দিয়ে তৃষাকে বললেন, একটা গান শোনাত মা। তোর মা তো আমার কথাতে গাইবেন না।

—রুরু বলল, তাহলে কার কথাতে গাইবেন।

—অগ্নিবাবু বললে গাইতেও বা পারেন।

—গাইতে ইচ্ছা করছে না। করলে, আপনি বললেও গাইতাম।

শেষ পর্যন্ত ওরা কেউই অগ্নি আর অপালাকে খুঁজতে গেল না, মুখার্জিবাবুর কথা মেনে নিয়ে। এবং বলাই বাহুল্য, সকলেই আহ্নিক শুরু করে দিলেন।

তৃষা বলল, দেখেছো মা, জঙ্গলের মধ্যে আলো-ছায়া মিলে কেমন একটা রহস্যর বাতাবরণ তৈরি হয়েছে।

হুঁ।

অরা অন্যমনস্ক গলাতে বলল। অগ্নি যে অপালাকে নিয়ে রাতের জঙ্গলে ঘুরছে সেজন্যে তার কোনোই উত্তেজনা ছিল না। অগ্নি সম্বন্ধে অরা এতটাই আত্মবিশ্বাসী ছিল যে ওর মনে কোনোকিছুই হচ্ছিল না। ঘোষ সাহেবের মনেও হল না বলেই মনে হল অরার।

ঘোষ সাহেব বললেন, কী হল তৃষা? গান হবে না একটা? রবীন্দ্রসংগীত।

কোনটা গাইব মা? "তুমি কিছু দিয়ে যাও"

ওটা তো সকালের রাগের গান। অন্য কোনো গান গা।

অরা বলল।

—তাহলে 'ও চাঁদ তোমায় দোলা দেবে কে' গাই।

—গাও।

তৃষা গান ধরল। সকলে মাথা নেড়ে হাতে তাল দিয়ে সেই গান অ্যাপ্রিসিয়েট করতে লাগলেন। অরা ছাড়া। ঘোষ সাহেব সামনে কনফিডেন্টলি বেতালে তাল দিয়ে যেতে লাগলেন।

এমন সময়ে গেট দিয়ে অগ্নি আর অপালাকে আসতে দেখা গেল।

ওঁরা সকলেই একসঙ্গে ওদের আক্রমণ করল—ঘোষ সাহেব ও অরা ছাড়া।

ওরা কাছে এলে অরা লক্ষ্য করল যে অপার শাড়িটা ক্রাশড যে শুধু তাই নয়, পেছন দিকে ধুলো বালি খড়কুটো লেগে আছে।

অপা বলল, কী যে মিস করলি তুই অরা। কী অপূর্ব সানসেট যে দেখলাম।

জীবনে এত কিছু অপূর্ব দৃশ্য আছে, এত সব জায়গা, এত সব অনুভূতি, সবই কি এক জীবনে পাওয়া যায়? তৃষাদের মোবাইল ফোনেরই মতো জীবনটা, প্রত্যেকের জীবনই 'মিসড কল'-এ ভরা। 'মিসড কল'-এই ঝুড়ি ভরে ওঠে জীবনের। সব ডাকে, সবার ডাকে কি সবসময় সাড়া দেওয়া যায়? বল তুই? অনেক কিছুই ছেড়ে দিতে হয়, হারাতে হয় জীবনে।

—অরার বক্তব্যর অনেকখানিই হয়তো অপালার সেই ঘোরলাগা অবস্থাতে ওর মাথার উপর দিয়ে চলে গেল। কিন্তু অন্য সকলেই অরার কথা শুনে একই সঙ্গে বলে উঠলেন, ভেরি ওয়েল সেইড ইনডিড।

অপালা, ঘোষ সাহেবের দিকে ফিরে বলল, তুমিও খুব মিস করলে কিন্তু। অন্য সকলেই, বিশেষ করে তৃষা ও রুরু। ব্রতীনবাবু তার বন্ধু ইন্দ্রজিৎবাবুর কাছ থেকে এই জায়গাটার সব গলি-অলি চিনে রেখেছেন। ব্রতীনবাবু জায়গাটার হদিস না দিলে তো আমরা খুঁজেই পেতাম না।

আমি!

অবাক গলাতে বলল ব্রতীন। তারপর আরও কিছু বলতে গিয়ে চুপ করে গেল।

—ঘোষ সাহেব বললেন, আমি কিছুই মিস করিনি। তুমি সেই একটা গান গাও না? 'তুমি সুখী হলে আমি সুখী হই' না কী যেন। আমার সেই কথা।

অগ্নি চুপ করে ছিল। অপার সুগঠিত শরীরের ঘ্রাণ, মসৃণ ত্বকের স্পর্শ, তার আশ্লেষ তাকে তখনও আচ্ছন্ন করে ছিল। কত বছর পরে যে সে নারীসঙ্গ করল। মন-বিবর্জিত শরীরে যাওয়া আর দেহপসারিণীর কাছে যাওয়া একই ব্যাপার। কিন্তু পুরুষকে বিধাতা বড় ভঙ্গুর করে গড়েছেন। বড় দুর্বল। তাই মহাজ্ঞানী গুণী পুরুষকেও তাঁর পিপাসা তেমন তীব্র হলে তাঁর দেহ বড় বেশিদিন উপোসী থাকলে, অমন জায়গাতেও যেতে হয়। নয়তো তিনি এমন কিছু করে বসেন যা অভাবনীয়। তাঁর ভাবমূর্তি তাতে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু প্রাণ তো বাঁচাতেই হবে। পুরুষের অসহায়তার কথা শুধু অন্য একজন পুরুষই বুঝতে পারে।

—জায়গাটা কোন দিকে? অনেক দূরে?

নরেশ প্রশ্ন করল।

—অগ্নি কোনো বিশেষ দিক না দেখিয়ে আঙুল তুলে বলল ওইদিকে। সে দিকটা যে কোন দিক তা কেউই বুঝতে পারল না। আসলে কোনো সানসেট পয়েন্টেই তো যায়নি ওরা। ম্যাকলাস্কিতে

কোনো সানসেট পয়েন্ট নেইও, নেতারহাটের "ম্যাগনোলিয়া পয়েন্টের" মতো। ওরা নিজেদের শরীরের চাঁদ সূর্য নিয়ে খেলা করতেই ব্যস্ত ছিল। অগ্নি ভাবছিল, শরীরের মধ্যে যে কী গভীর আনন্দ থাকে তা তো দুই সন্তানের মা অরা ভালো করেই জানে তবু কেন, কী করে, সে নিজেকে এবং অগ্নিকেও এমন করে বঞ্চিত করে রাখল? এইজন্যেই বোধহয় কথা আছে "শ্রীয়াশ্চরিত্রম্ দেবা না জানন্তি. কুতো মনুষ্যাঃ"।

২৯

ঘোষ সাহেব বললেন, এতক্ষণে তো শান্তি হয়েছে আপনাদের। নিন আমার গ্লাস শেষ। আরেকটা সাজুন দেখি। ভেবেছিলাম এম.সি.সি.-র ছেলেগুলো উঠিয়ে নিয়ে যাবে তা না দেখি দিব্যি ফিরে এল। আরে বউতো আমার, আমার নিজের কোনো টেনশান ছিল না আর এই ব্রতীনবাবুরা টেনশানে মরে গেলেন।

পরস্ত্রী সম্বন্ধে পরপুরুষ মাত্রই অত্যন্ত কনসার্নড। তাঁদের ভালোমন্দর চিন্তা নিজের স্ত্রীর ভালোমন্দর চেয়ে অনেক বেশি মথিত করে ওঁদের।

ঘোষ সাহেব পাইপটা মুখ থেকে নামিয়ে জোরে হেসে উঠলেন।

—নরেশ ওঁর গ্লাসটা নিয়ে আবার ভরে দিয়ে বলল, আচ্ছা খ্যাপা লোক ঘোষ সাহেব আপনি। ওরা নিয়ে গেলে র‍্যানসাম তো আপনাকেই দিতে হত।

ওরা জানত কী করে যে অপালা আমার বউ। ওরা ভাবত সে অগ্নির বউ। তাছাড়া জানলেও র‍্যানসাম আমি থোড়াই দিতাম।

হ্যাঁ। তাই ভাবছেন।

অপালা অরার পাশের চেয়ারে উঠে এল তৃষা আর রুরু ভিতরে চলে গেল। বড়দের কথার মধ্যে থাকাটা অরা পছন্দ করে না। খাওয়ার আগে ওরা দুজনে ঘুমিয়েও নেবে একটু। অনেক হাঁটাহাঁটি হয়েছে। অভ্যেস তো নেই।

অরা পূর্ণদৃষ্টিতে অপার মুখে চাইল।

অপালাকে অপরাধী অপরাধী দেখাচ্ছিল।

অপা অরার এই উদাসীনতাতে অবাক হল। ও ভেবেছিল অরার চোখে রাগ বা ঘৃণা বা কোনো মিশ্র অনুভূতি দেখতে পাবে কিন্তু দেখল, অরা তেমনই উদাসীন এবং অপার প্রতি অপার প্রীতিময়ী।

অরা শুধু ফিসফিস করে, প্রায় অপার কানে কানেই বলল, একটা সিল্কের শাড়ি পরে গেলেই পারতিস, তাঁতের শাড়ি না পরে।

ধরা-পড়া অপার মুখ লজ্জায় এবং অপরাধে লাল হয়ে গেল। রক্ত উঠে এল ওর গালে। উত্তর না দিয়ে ও মুখ নামিয়ে নিল।

ঘোষ সাহেব অগ্নিকে বললেন, একটা গান শোনান তো মশাই। কোথায় যে আমার বউকে নিয়ে ভাগলবা হলেন আর তা নিয়ে আপনার দুই বন্ধুর কী নার্ভাসনেস। আরে! যার সম্পত্তি, তাঁরই নেই কোনো মাথাব্যাথা এঁরা ভেবে ভেবে কপালের শিরা ফাটালেন। টিপিক্যাল বাঙালি! নিন, গান ধরুন একটা, নইলে আমি কিন্তু সেই ঘুঘু পাখির গানটা আবার গেয়ে দেব।

—সকলেই বলল, তা হোক না গানটা। ও গান তো হাজারবার শোনা যায়। তা ও গান শিখলেন কোথায়?

চাটুজ্যে শিখিয়েছিল?

তিনি কে?

সে ছিল আমার গল্ফ খেলার পার্টনার। টলি ক্লাবে। একটা বিদেশি কোম্পানির সি.ই.ও ছিল। এক রবিবার খেলার পরে আমরা যখন খড়ের চালের গোল ঘরের নীচে বসে বিয়ার খাচ্ছি, তখন খোনা চাটুজ্যে গানটা শুনিয়েছিল।

উনি কি খোনা ছিলেন?

একটু। দেশ ছিল খন্যানে। বড়লোকের মেয়েকে বিয়ে করে বিলেতে গিয়ে এঞ্জিনিয়ারিং আর এম বি এ পড়ে এসেছিল। খুব আমুদে মানুষ ছিল চাটুজ্যে। মারা গেছে প্রায় পনেরো বছর। আমি গল্ফ খেলা ছেড়ে দিয়েছি চোদ্দ-পনেরো বছর হল। তারপরেই তো এই ভুঁড়ি।

—তা ছাড়লেন কেন?

—ব্রতীন বলল।

সময় কোথায়? তা ছাড়া, তখন সপ্তাহে দু-তিনদিন বিভিন্ন হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টে যেতে হত। জীবনে এখন সবই আছে শুধু সময়ই নেই।

ঘোষ সাহেবের দিকে চেয়ে অগ্নির অপালার বর্ণনা দেওয়া কচুবনে শুয়োরের ঘোঁতঘোতানির কথা মনে হচ্ছিল। হাসিও পাচ্ছিল আবার দুঃখও হচ্ছিল। ঘোষ সাহেব মানুষটা যে বড় ভালো।

ঘোষ সাহেব বেশিক্ষণ চুপ করে থাকার পাত্র নন।

আবার বললেন, কী হল? গানটা কী হল অগ্নিবাবু?

অগ্নি একবার আড়চোখে অরা এবং অপালার দিকেও চেয়ে শুরু করল :

"কলঙ্কেতে ভয় করো না বিধুমুখী
যে যা বলে সয়ে থেকো
হয়ে আমার দুখে দুখী।
মাতঙ্গ পড়িলে জলে,
পতঙ্গেতে কী না বলে,
কণ্টকেরি বনে গেলে কাঁটা ফোটে পায়
তাই বলে কি বিধুমুখী অমনি থাকা যায়?

ডুবেছি না ডুবতে আছি পাতাল কত দূরে দেখি
কলঙ্কেতে ভয় করো না বিধুমুখী
যে যা বলে সয়ে থেকো
হয়ে আমার দুখে দুখী।"

৩০

দিন যায়, রাত যায়, এমনি করে জীবনও যায় অমোঘ মৃত্যুর দিকে। পর্ণমোচী গাছেরা পাতা খসায় প্রতি বছরে পরের বছরে নবসাজে সেজে আসবে বলে। কিন্তু মানুষ চলে গেলে আর ফিরে আসে না। যদি জন্মান্তরবাদ সত্যিও হয় তবুও ফুলের মতো পাতার মতো তার পুরনো অনুষঙ্গে, তার পুরনো বৃন্ততে ফিরে আসে না। এক জীবনের সব চাওয়াপাওয়া সব পাপপুণ্য সেই জীবনেই

জারিত হয়। কোনো মানুষ যদি অসাধারণ হন তবে তাঁর প্রভাব থেকে যায় অন্যদের মধ্যে, তাঁর লেখা, তাঁর ছবি আঁকা, তাঁর গান এ সবই তাঁর চলে যাবার পরে অন্য মানুষেরা, কাছের এবং দূরের, এক অন্য চোখে আবিষ্কার করেন। কিন্তু সেসব ঘটে অসাধারণ মানুষদেরই বেলাতে। অরা তো অসাধারণ নয়, সে অতি সাধারণ। তার জীবনের বিশ্বাস অবিশ্বাস, ন্যায় নীতি, শুচি অশুচি বোধ, যা কিছুই আঁকড়ে সে এতদিন বেঁচেছিল সেই সবই যেন লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। ম্যাকলাস্কিগঞ্জ থেকে ফিরে আসার পরে ইংরেজিতে যাকে বলে 'CRESTFALLEN'-ও তাই হয়ে গেছে।

অগ্নিকে মুখে এবং চিঠিতে ও বহুবার বলেছিল যে তুমি অন্য নারীতে যেতে পারো আমার আপত্তি নেই। শুধু আমাকে চেয়োনা। আমি তোমাকে কুলুঙ্গির ঠাকুর করেছি। মুখে বলেছিল, 'তোমার উপর আমার কোনো দাবি নেই' কিন্তু মনে মনে যে তার দাবি কায়েম করেছিল পুরোপুরিই অগ্নির উপরে সে কথা অগ্নির শরীরের আগুন অপালা নিভিয়ে দেবার পরেই অরার কাছে প্রাঞ্জল হয়েছে।

অগ্নিকে সে সত্যিই কুলুঙ্গির ঠাকুরই করে রেখেছিল। দেবতাকে যে ভক্ত পুজো করে সে তো তার সব ভক্তি সঁপে দিয়েই তাঁকে পুজো করে কিন্তু দেবতারও কি ভক্তর প্রতি কোনো দায়দায়িত্ব নেই,? পুজোর যে উপচারকে ভক্ত পূত-পবিত্র বলে জানত সেই উপচারের কোনো মূল্যই কি দেবতার নিজের কাছে ছিল না?

ম্যাকলাস্কিগঞ্জ থেকে ফিরে আসার পর অরা যেন তার মনের সব ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিল। অগ্নিকে যে কতখানি ভালো বেসেছিল তা অগ্নি অপালার সঙ্গে ম্যাকলাস্কিগঞ্জের আরণ্যক পরিবেশে সংগমে লিপ্ত হবার পরই যেন হাহাকারের সঙ্গে বুঝতে পেরেছে অরা। অথচ ও জানে যে এই শাস্তি তার নিজেরই কৃতকর্মর ফল। অরা যে অসাধারণ, অসাধারণ তার ভালোবাসা, এই সৎ ও গভীর বোধ অরার প্রেমিককেও যে সমানভাবে আচ্ছন্ন করবে না এ কথা দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারেনি অরা। ওর মনে মনে এই Wishful Thinking ছিল যে যত কষ্টই হোক না কেন অগ্নির, সে অরার প্রেমিক হিসেবে সেই দুঃখের মহান ভার সারাজীবন হাসিমুখে বইবে। অগ্নিও যে আর দশটি পুরুষের মতো সাধারণ এই সত্য তাকে বজ্রর মতো বেজেছে। অরা বুঝেছে যে একজন নারী যা পারে একজন পুরুষ তা কখনোই পারে না। একজন ভারতীয় নারী, তার প্রেমে, তার বিরহে, তার কৃচ্ছ্রসাধনে চিরদিনই একজন পুরুষের চেয়ে অনেকই বড়। সত্যিই যে বড় তাতে সন্দেহ নেই। তাই বাংলা সাহিত্যে পুরুষ ও নারীর প্রেমের যেসব উপাখ্যান আছে সেসবে এই সত্যই স্বমহিমাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সমারসেট মম-এর একটি গল্প পড়েছিল প্রথম যৌবনে। গল্পটির নাম সম্ভবত 'দ্যা রেইন'। ঠিক মনে নেই এতদিন পরে। সেই গল্পের যুবতী এক অরমিতা নারী শেষে একজন ধর্মযাজকের দ্বারাও রমিত হয়েছিল তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। গল্পের শেষে আছে যে সেই নারী বলছে "অল মেন আর পিগস"। পুরুষ মাত্রই শুয়োর। চর্ম ঘর্ষণই তাদের জীবনের সারাৎসার। প্রেম বা রমণীর কোমল মানসিকতার যথার্থ মূল্য কোনো পুরুষের পক্ষেই দেওয়া সম্ভব নয়—তারা সকলেই নারীকে ব্যবহার করে করে জীবনানন্দর কবিতার নারীর মতো শূকরীর মাংস করে তুলতে চায়।

না, অরার চোখে অগ্নি এক ব্যতিক্রমী পুরুষ ছিল। তার স্বপ্নের পুরুষ। রবীন্দ্রনাথের নায়কদের মতো পুরুষ। কিন্তু আজকে অরার সে ভুল ভেঙেছে।

তবে শুধু অগ্নিকে দোষ দেওয়াটা বোধ হয় ঠিক নয়। তার বান্ধবী অপালাই বা কী কম শরীর-সর্বস্বী! অরা তো বহুদিনই বিধবা কিন্তু অপালার স্বামী তো জলজ্যান্ত বর্তমান। সে মানুষটার প্রতি কোনো দায় এমনকি দয়াও কি অপলার ছিল না? ছিল যে না, তা অরা তো বুঝতেই পারছে। ঘোষ সাহেবও অরারই মতো প্রাঞ্জলভাবে বুঝতে পেরেছেন সেই আরণ্যক গা-ছমছম সন্ধেতে তার

স্ত্রী ও অগ্নির মধ্যে কী ঘটেছিল। কিন্তু বোঝার পরও তার মানসিকতা ও ঔদার্য হঠাৎ করে অরাকে সেই মানুষটির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাতে আপ্লুত করেছে। প্রীতি, মায়া, মমতা, সহানুভূতি এবং করুণারই মতো শ্রদ্ধা ও প্রেমের বীজতলি। প্রেমের বীজ এসবের কোন জমিতে রোপিত হয়ে যে ফুল ফোটায় তা হয়তো আগে থাকতে বোঝা যায় না। সাধারণত প্রেম নিঃশব্দ চরণেই আসে, নিঃশব্দ চরণে চলে যায় কিন্তু কখনো কখনো হয়তো বিস্ফোরকের স্ফুটনের মতো হঠাৎই শব্দ করেও প্রেমের ফুল ফোটে। নর-নারীর মনের সম্পর্ক বড় দুর্জ্ঞেয়। যখন মনে হয় সবই জানা হয়ে গেছে অন্যের সম্পর্কে তখনই বড় বিস্ময় ও বেদনার সঙ্গে মন জানে যে সেই মনে হওয়াটা ভুল। মস্ত ভুল।

বাড়িতে ছেলেমেয়েরা কেউই ছিল না। আজ রবিবার। থাকবেই বা কেন? ওদের এখন উড়ে বেড়াবার সময়। এখানে ওখানে ওড়াওড়ি করে নানা ফুলের মধু খেয়ে অনেক পরে নীড় বাঁধার কথা ভাববে ওরা কোনো বসন্ত প্রভাতে। ওদের প্রজন্ম আর অরাদের প্রজন্ম আলাদা। অরার আজকাল প্রায়ই হাজারিবাগের কথা মনে পড়ে—তার ব্রাহ্ম বাবার কড়া কিন্তু আদর্শ শাসনের মধ্যে একটি মেয়ের বড় হয়ে ওঠা। সেই শাসন চোখ রাঙানির ছিল না। তাতে বাঁধন যতটুকু ছিল তা সম্ভ্রান্ততার বাঁধন। একটি বাজে পরিবারের মেয়ের সঙ্গে সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ের যতটুকু তফাত থাকা উচিত—সেই তফাতটুকুই অরাকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছিল। এতদিন অগ্নিকেও অরা ওরই মতো সম্ভ্রান্ত ও স্বতন্ত্র বলে মনে করত। অগ্নি অবেলায় পৌঁছে নিজেকে বদলাল।

পাগল পাগল লাগে অরার ম্যাকলাস্কিগঞ্জ থেকে ফিরে এসে। রোজই রাতে একটি করে দীর্ঘ চিঠি লিখেছে অগ্নিকে আর তার পরই ছিঁড়ে ফেলেছে। ছিঁড়েছে কুচি কুচি করে, যাতে ছেলেমেয়ে কারোই চোখে না পড়ে সেই সব টুকরো-টাকরাও। ম্যাকলাস্কিগঞ্জের চাঁদভাসি আকাশে একটা পিউ-কাঁহা পাখি পিউ-কাঁহা-পিউ-কাঁহা-কাঁহা-হা-হা করে হাহাকার করে ডেকে ফিরত। সেই হাহাকারটা বুঝি অরার বুকে ফিরে এসেছে—বয়ে নিয়ে এসেছে সেই বসন্তবনের বুক থেকে অরা এই কলকাতাতে।

ম্যাকলাস্কিগঞ্জে অথবা হাজারিবাগে অথবা এদিকের অন্য কোনো বনেও বোধহয় ভূত-গাছ নেই। যে গাছের ইংরেজি নাম KARU-GUM TREE। নাগপুর থেকে একবার মহারাষ্ট্রের আন্ধারী-তাড়োবা টাইগার রিসার্ভে গেছিল বসন্ত শেষে। সেখানেই প্রথম ভূত গাছ দেখে। রাতের কালো বনের মধ্যে ধবধবে সাদা পত্রশূন্য সে গাছ দেখে চমকে উঠতে হয়। সত্যিই ভূত দেখার মতো অবস্থা হয় মনের মধ্যে। ম্যাকলাস্কিগঞ্জে ভূত গাছ ছিল না। কিংবা কে জানে! হয়তো ছিল। অরা দেখেনি। একটি ভূত গাছকেও উপড়ে নিয়ে এসেছে অরা বুকে করে। সেই ভূত গাছটাকে একেবারে অগ্নির মতো দেখতে কি?

অগ্নি বেচ্চারা। আহা ভালো তো বেসেছিল দুজনে দুজনকে। ভীষণই ভালো বেসেছিল। শ্যামার মতো গেয়ে উঠতে ইচ্ছে করছে অরার "হায়! এ কী সমাপন!"

লিখবে লিখবে লিখবে করে চিঠি আর লেখা হল না অগ্নিকে।

৩১

'কেঁচে গণ্ডূষে'র একটি অনুষ্ঠান আছে আগামী রবিবারে, স্বভূমিতে। তারই মহড়া ছিল বেদেদার বাড়িতে। বেদেদার বাবা বড় ইন্ড্রাস্টিয়ালিস্ট। লনওয়ালা বাড়ি। একতলায় বসবার ঘরটাও মস্ত বড়। ওদের ব্যান্ডের মহড়া সাধারণত সেখানেই করে। কিন্তু এত বেশি ডেসিবল্‌-এ গাঁক-গাঁক করে বাজনা

ও গান হয় যে প্রতিবেশীরা পুলিশে ফোন করেছিলেন তিনদিন। তারপর থেকে মহড়া লন থেকে সরিয়ে বসার ঘরে করা হয়।

বয়স্করা বলেন, নয়েজ পল্যুশান। কিন্তু উঁচুগ্রামে বাজনা এবং তার সঙ্গে উঁচুগ্রামে যৌবনদীপ্ত গান রুরুদের রক্তে নাচন তোলে। তবে এখন অলিতে-গলিতে বাংলা ব্যান্ডের জন্ম হয়েছে। সংখ্যাতে বেশি হলে যা হয় আর কী। তাই হয়েছে। মান বিঘ্নিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

রুরু আর একটা গান বেঁধেছে তার প্রথম দু-পঙ্‌ক্তি হল এইরকম—

"বৃন্দাবনে দেখে এলাম মাটি উঁচু নিচু
সেথা ময়ূর ময়ূরী নাচে উঁচু করে ফুচু।"

বোদেদা বলেছে, জমিয়ে দিয়েছিস রুরু।

বোদেদাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়েছিল রুরু মিনি ধরবে বলে। এখন প্রায় সন্ধে ছটা বাজে। সকাল দশটা থেকে মহড়া শুরু হয়েছিল। দুপুরে লাঞ্চ খাইয়েছেন বোদেদা। শুয়োরের সসেজ, সালামি বেকন ভাজা তার সঙ্গে ফ্রায়েড এগস এবং শুকনো শুকনো খিচুড়ি। একেবারে জমে গেছিল।

একটা বাস এল কিন্তু তাতে পা রাখার জায়গা নেই। পরের বাসের জন্যে অপেক্ষা করছিল এমন সময়ে পেছন থেকে চুমকি ডাকল—কী রে রুরু। তুই বেপাড়াতে কী করছিস?

রুরু ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, তুইও বেপাড়াতে কী করছিলি?

—কোচিং নিতে এসেছিলাম। আমি তো তোর মতো ব্রিলিয়ান্ট নই।

—ছাড়তো। ব্রিলিয়ান্ট তো তোর বান্ধবী তৃষা, মানে আমার দিদি। নইলে প্রায় একই বয়সি হয়ে পড়াশুনোতে এত তেজি হয়।

—তা অবশ্য ঠিক।

—মাসিমা কেমন আছেন?

—ভালোই। তবে কলকাতাতে নেই।

—কোথায় গেছেন?

—জানি না।

—উদাসীন গলাতে বলল রুরু।

—মানে?

—মানে ফানে নেই। পরশু সকালে উঠে একটা নোট দেখলাম বসার ঘরের টেবিলে, মা লিখেছেন, আমি দিনকয়েকের জন্যে কলকাতার বাইরে যাচ্ছি। সব বাজার-টাজার করে দিয়ে গেলাম। বিস্পতিকেও সব বলে গেছি। তৃষা কলকাতাতে ফিরলে ওকেও এই চিঠি দেখিয়ো।

—হঠাৎ? মাসিমা কি এর আগে কখনো এমন করেছেন?

—না, কখনো করেননি।

—তৃষা কোথায়?

সে তো কুয়ালালামপুরে। সত্যি! এই অ্যাড এজেন্সির কাজের কোনো মাথামুণ্ডু নেই। হর্ষদদা পুণে থেকে তিনবার ফোন করেছিল। ওর সঙ্গে তো অন্তত মোবাইলে বা ই-মেইল-এ কথা বলতে পারে। কিছুই বুঝি না।

—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বলবি নাকি? তার চেয়ে আমাদের বাড়ি চল না। মা-বাবা কেউই নেই। আমিও একা। বাড়িতে শুধু রঘুদা আছে। দারুণ চাইনিজ রাঁধে রঘুদা। আমাদের বাড়িতেই খেয়ে যা না। তুইও তো একা।

—বলছিস্? তাহলে চল্।

তুই কি অগ্নিকাকার বাড়ি যাবি ভেবেছিলি নাকি? তাঁর বাড়ি তো কাছেই। গতসপ্তাহেই ওঁর বাড়িতে কী জমজমাট পার্টি হল বল? গান হল কত, খাওয়াদাওয়া, খাসির রেজালা, বাখখরখানি রুটি, বটি কাবাব আর রাবড়ি। আহা। এখনও মুখে লেগে আছে।

—অগ্নিকাকা থাকলে যাওয়া যেত। কিন্তু উনিও তো নেই কলকাতাতে।

—বলেই বলল, তুই কি হেঁটেই যাবি?

—মিনিবাসের অপেক্ষাতে অনির্দিষ্ট কাল অপেক্ষা না করে থেকে হাঁটাই তো ভালো। আজকাল ট্যাক্সির যা ভাড়া। ট্যাক্সি করার মতো সামর্থ্যও আমার নেই।

—আমার তো নেই-ই!

—তুই আমাকেও পড়ালে তোর আরও কিছু আয় বাড়ত।

—দুসস্। তোকে পড়ালে কি তোর কাছ থেকে টাকা নিতাম নাকি?

অন্যদের কাছ থেকে নিতে পারিস আর আমার কাছ থেকে নিতে বাধা কী ছিল? তোর ব্রিলিয়ান্স-এর একটা দাম তো আছে।

—তা হয় না। তোর সঙ্গে আমার একটা আলাদা সম্পর্ক। সব সম্পর্কর মধ্যেই কি টাকাপয়সা আনতে হয়? আনলে, সম্পর্কর মাধুর্যই নষ্ট হয়ে যায়। তাছাড়া, বাধার কত্ত রকম হয়।

—জানি না। হয়তো তুই ঠিকই বলছিস।

চুমকি বলল, অরা মাসির জন্যে তোর চিন্তা হচ্ছে না?

—হচ্ছে বইকী! মা তো কখনো এমন করে চলে যাননি। দিদিও বারবার ই-মেইল করছে মায়ের ব্যাপারে জানতে চেয়ে কুয়ালালামপুর থেকে।

—"কয়েকদিনের জন্যে বাইরে যাচ্ছি" ব্যসস এইটুকুই লিখে গেছেন শুধু?

—ঠিক ওইটুকুই নয়। তারপরে যা লিখেছেন তাতেই আমার চিন্তা আরও বেড়েছে।

—কী লিখেছেন?

—লিখেছেন যে, "তোমাদের বাবার মৃত্যুর পর থেকে তোমাদের পাখি-মায়েরই মতো দু-ডানার নীচে রেখে বড়ো করেছি। আজ তোমরা উড়তে শিখেছ। স্বয়ম্ভর হয়েছ। তৃষাতো স্বাবলম্বী হয়েই গেছে। তুমিও শিগগিরি হবে—তুমিও মেধাবী হয়েছ—তাই তোমাদের নিয়ে আমার কোনো চিন্তা নেই। আমি আমার নিজের দিকে তাকাইনি কখনোই। নিজের সুখ, নিজের আনন্দ, নিজের অবকাশ বলতে আমার কিছুই ছিল না গত কুড়িবছরে। এখন সময় হয়েছে এই কর্তব্যর বাঁধন থেকে, অভ্যাসের একঘেয়েমি থেকে নিজেকে অন্তত কয়েকদিনের জন্যে ছুটি দেবার। আশাকরি, তোমরা দুজনে আমার এই ছুটি না-মঞ্জুর করবে না।"

—এই অবধি বলে রুরু চুপ করে গেল।

—চুমকি, রুরুর চিন্তিত, বিভ্রান্ত মুখের দিকে চেয়ে বলল, সত্যিই আশ্চর্যর ব্যাপার তো!

—আসলে মুশকিলটা কী হয়েছে জানিস—মায়ের অনুপস্থিতিতে আমাদের লোকাল গার্জেন অপা মাসি আর মেসোমশাই। তাঁরা দুজনেও কলকাতাতে নেই।

তাহলে কি ওঁরা চারজনে একসঙ্গে কোথাও হলিডে করতে গেছেন? মানে, অগ্নিকাকা সুদ্ধু? তোদের আসল লোকাল গার্জেন তো অগ্নিকাকাই। তোরা নিজেরাও তো শতমুখে সে কথা বলিস।

তারপর বলল, যাই বল আর তাই বল, আমার কিন্তু পুরো ব্যাপারটা জেনে কারও জন্যেই একটুও চিন্তা হচ্ছে না, বরং খুব একসাইটেড ফিল করছি আমি। এ একটা গ্রেট অ্যান্ড প্লেজেন্ট মিস্ট্রি। ফুল অফ এক্সপেক্টেশান। রীতিমতো রহস্যময় ব্যাপার, তবে খারাপ কিছু ভাবিস না। আমি

তো এই চারজনের হঠাৎ অন্তর্ধানের জন্যে চিন্তিত হবার কোনো কারণই দেখছি না।

—না, তা নয়। তবে সব রহস্যময়তার মধ্যেই চিন্তা তো থাকেই।

তারপরই বলল, চুমকি, আজকে তোর বাড়ি নাই বা গেলাম। আমার তো মোবাইল ফোন নেই। মায়েরও নেই। বাড়িতে দিদি আর মা ফোন করতে পারে। কাল রবিবার আছে। তুই-ই বরং কাল সকালে আয়। কী খাবি বল? বিস্পতি দিদি রাঁধবে। সারা দিন গান শুনব। ভালো ছবি দেখব। দিদি অনেকগুলো ভালো সিডি এনেছে কুয়ালালামপুরে যাবার আগের দিনই।

দেখি। রাতে জানাব। তুই আবার অসভ্যতা করবি না তো কোনো?

প্রমিস। করব না।

তাহলে তুই তোর মিনি ধর। তোদের বাড়ি তো কাছেই, হেঁটেই তো যেতে পারিস। আমি বরং সামনের বাসস্টপ থেকে একটা মিনি ধরি। টা-টা।

—টা-টা।

৩২

ঘোষ সাহেব ও অরা হোটেলের ঘরের লাগোয়া বারান্দাতে বসেছিলেন। সামনে উথাল-পাথাল করছে সমুদ্র। পুরীতে গিয়েছিল অরা বিয়ের পরে পরে। কিছুদিন পরে গেছিল গোপালপুরে। পুরী আর গোপালপুর-অন-সির সঙ্গে ভাইজাগ-এর অনেক তফাত আছে। গোপালপুরের সমুদ্রে চান করা যায় না। বড় বড় পাথর আছে জলের উপরে এবং নীচে। সকালে জেলেরা তাদের মাছ-ধরা নৌকো বোঝাই করে লাল-রঙা ভেটকি মাছ ধরে আনে। এইরকম লাল-রঙা ভেটকি কোথাওই দেখেনি অরা আগে।

ঘোষ সাহেব অরাকে বললেন, আর উ্য হ্যাপী? মাদাম?

হুঁ।

স্বল্প হাসি হেসে বলল। অরা।

গতকাল প্লেনেই এসেছিল ভাইজাগ-এ ওরা দুজনে কিন্তু আলাদা দুটি ঘরে আছে। দু ঘরে আছে চরিত্র বা সুনাম রক্ষার জন্যে নয়। অরার অভ্যেস চলে গেছে বহুদিন কারও সঙ্গে একঘরে শোওয়ার। তাছাড়া শারীরিক সংসর্গ করবেন বলেও আসেননি দুজনে একসঙ্গে বাইরে। অপালাকে নিয়ে অগ্নি যে পুরীতে গেছে এ কথা ওরা দুজনেই জানেন। ওঁরা লুকিয়েই গেছেন কিন্তু হয়তো ইচ্ছে করেই সূত্র রেখে গেছেন যাতে ঘোষ সাহেব এবং অরা দুজনেই জেনে যান ব্যাপারটা। ওদের দুজনকে দুরকম কষ্ট দেওয়ার জন্যেই হয়তো গেছেন। ওঁরা।

সত্যি! মানুষের মন বড় দুর্জ্ঞেয়।

—রাতে ঘুম হয়েছিল মাদাম?

—না। প্রথম রাতে হয়নি। মাঝরাতে উঠে একটা পাঁচ মিলিগ্রামের অ্যালজোলাম খেয়েছিলাম। তার রেশ এখনও কাটেনি।

—আরেকটু ঘুমোলেই তো পারতেন।

—পারতাম। কিন্তু আপনি একা উঠে বসে থাকবেন। ভেবেই, অপরাধী লাগল নিজেকে।

অপরাধী লাগার তো কোনো কারণ নেই। আমরা তো কোনো অপরাধ করিনি। আমাদের একে অন্যের প্রতি তো করিইনি, অন্য কারও প্রতিও নয়।

—তা করিনি। তবুও অপরাধী লাগল। অপা আর অগ্নিও তো কোনো অপরাধ করেনি।

—না। তা করেননি।

—কিন্তু ওদের এই নিরুদ্দেশ হবার পেছনের কারণ নিয়ে কি কিছু ভেবেছেন আপনি?

—ভেবেছি।

—আর আপনি?

—আমিও ভেবেছি।

—ঘোষ সাহেব বললেন, কী ভেবেছেন আপনি?

আসলে, অপাকে নিয়ে অগ্নির এমন করে বাইরে আসার পেছনে হয়তো আমারই প্রচ্ছন্ন প্ররোচনা ছিল।

—বলেন কী? অপা আর অগ্নিকে আপনিই পাঠিয়েছেন নাকি?

—ঠিক তা নয়। অপা নয়, আমি অগ্নিকে বলেছিলাম যে, তুমি যে-কোনো নারীতে যেতে পারো। শুধু আমাকে চেয়ো না। তাতে অসম্ভব আহত হয়েছিল ও।

—আপনিই বা অত নিষ্ঠুর হলেন কেন? কী হারাত আপনার? অগ্নিবাবু তো আপনার স্বামীরই মতো।

স্বামী আর স্বামীর মতোতে তফাত আছে।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, ওকে আমি কুলুঙ্গির ঠাকুর করেছি। যে আসনে ওকে আমি বসিয়েছি সেই আসন থেকে ওকে টেনে নামিয়ে আনতে চাইনি। কিন্তু আমি ওকে দেবত্ব দান করলে কী হয় ও সেই আসন নিয়ে সুখী থাকতে পারেনি। ও একজন সাধারণ পুরুষের স্তরে নিজেকে নামিয়ে আনতে চেয়েছিল। হয়তো নামিয়ে এনেওছিল।

ও কি আপনার শরীর চেয়েছিল? চাইলেও আমি তো দোষ দেখি না। আপনার মতো একজন নারীকে না-চেয়ে থাকাও তো কম কষ্টর ব্যাপার নয়। তাছাড়া, আপনার ছেলেমেয়েরাও যখন ওকে বাবার মতোই মান্যিগণ্যি করে, ভালোবাসে। তাছাড়া, এতদিন ও যখন আপনাদের জন্যে এত করেছে। ওকে বিয়ে করতে আপনার অসুবিধে কী ছিল?

অরা একটু হাসল। বলল, শরৎবাবুর 'গৃহদাহ'তে সেই আছে না, অচলা সুরেশকে বলছে : 'একসময়ে যাকে বাঁচানো যায়, আর এক সময়ে ইচ্ছে করলেই বুঝি তাকে খুন করা যায়?'

তারপর বলল, তাছাড়া, বাবার "মতো হাওয়া" আর "বাবা হওয়া তো" সমার্থক নয়।

—না, তা নয়।

—আপনার আর অগ্নির মতো কৃতবিদ্য পুরুষেরা হয়তো অনেকই বোঝেন কিন্তু সব বোঝেন না। অরা বলল।

—হয়তো তাই।

—এবারে আপনি বলুন, আপনি কী ভেবেছিলেন?

মানে?

মানে, অপা আর অগ্নির অমন একসঙ্গে চলে যাওয়া সম্বন্ধে।

ঘোষ সাহেব বললেন, সেরকম কিছু নয়। মানে, কিছুই ভাবিনি। ইটস আ ফ্যাক্ট অফ লাইফ। আমি অপাকে দোষ দিই না। ও যা কিছু ওর স্বামীর কাছ থেকে চেয়েছিল, যেমন করে চেয়েছিল, তা আমি ওকে দিতে পারিনি। তবে ওর উপরে আমার অভিমান এইটুকুই যে, আমি ওর কাছ থেকে আশা করেছিলাম যে, যতটুকু আমি ওকে দিতে পেরেছিলাম তার দাম ও বুঝবে। আজকে আমি দিন রাতে পেশার কাজে কুব্যস্ত থেকে থেকে হয়তো চেহারাতে আনকুথ হয়ে গেছি কিন্তু

যে অঢেল স্বাচ্ছল্য এবং সামাজিক সম্মান ওকে আমি দিয়েছি তার পেছনে আমার স্যাক্রিফাইসও তো কম নয়!

—আসলে, স্ত্রী বা পুরুষ, আমরা কেউই তো স্বয়ংসম্পূর্ণ নই। আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু অপূর্ণতা থাকেই। আর অন্য ক্ষেত্রে আমাদের সব সাফল্য ওই সামান্য অপূর্ণতার কারণেই হয়তো বাতিল হয়ে যায়।

—তা ঠিক। আর সেই অপূর্ণতার হাত ধরেই অন্য পুরুষ বা নারী আমাদের জীবনে প্রবেশ করে, লখীন্দরের লোহার বাসর ঘরে যেমন করে সাপ প্রবেশ করেছিল।

"প্রবেশ করা" কথাটার গভীরতা একেক ক্ষেত্রে একেক রকম। এই অনুপ্রবেশে শরীর যে থাকবেই তার কোনো মানে নেই। এই 'প্রবেশ' বা অনুপ্রবেশ পুরোপুরি মানসিকও হতে পারে।

তা পারে। অবশ্যই পারে।

—আমি যদিও অনেকদিন থেকেই একা তবু একদিন তো আমিও বিবাহিত স্ত্রী ছিলাম একজনের। তাই দাম্পত্যর রকমটা বুঝি।

অরা বলল।

তা তো অবশ্যই বুঝবেন।

ঘোষ সাহেব বললেন।

তবে এত দীর্ঘদিন আপনার একা থাকার দরকার কী ছিল আমি ভেবে পাই না। নিজেকে এমন করে বঞ্চিত করার কি দরকার ছিল কোনো? যে-কোনো ব্যাপারেই আত্মত্যাগের মধ্যে আনন্দ অবশ্যই থাকে তবে এই ব্যাপারে একটা সীমারেখা টানা অবশ্যই দরকার বলে মনে হয় আমার।

তারপর বললেন, অগ্নির সঙ্গে আপনার যে সম্পর্ক তা পুরোপুরি মানসিক থেকে শারীরিকে গড়িয়ে যেতে বাধা কোথায় ছিল সে কথা আমি অনেক ভেবেও বুঝে উঠতে পারিনি।

আমার সম্বন্ধে আপনি তো অনেক ভেবেছেন দেখছি।

অরা বলল।

আপনার বহিরঙ্গ রূপ দেখে আপনার অন্তরঙ্গ রূপের কোনো হদিশ পাওয়া মুশকিল।

—হয়তো তাই-ই।

ঘোষ সাহেব বললেন।

তবে এ কথা সত্যি যে আপনাকে আমার খুবই ভালো লাগে প্রথম আপনার সঙ্গে আলাপিত হবার পর মুহূর্ত থেকেই। তাই যখনই অবকাশ পেয়েছি তখনই আপনাকে নিয়ে ভেবেছি। ভেবেছি, অগ্নিকে নিয়েও। আর যতই ভেবেছি ততই অবাক হয়েছি।

—অপা তো খুবই প্রাণবন্ত এবং উচ্ছল মেয়ে। ভালো মেয়েও। অপালার সান্নিধ্য সত্ত্বেও আপনি আমাকে নিয়ে এত ভাবাভাবি করলেন কেন?

—সব কেনর তো উত্তর হয় না অরা দেবী।

—অরা হেসে ফেলে বলল, আবারও বলছি। আমি প্রচণ্ড রকমের মানবী। 'দেবী' 'দেবী' করবেন না প্লিজ। দেবী বললে মনে হয় যাত্রা করছেন। আমাকে শুধুই অরা বলেই ডাকবেন আপনি।

—বেশ। তাই হবে মাদাম।

—অরা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আরেক কাপ চা খাবেন?

—আপনি দিলে বিষও খেতে পারি।

—বিষ দিতে যাব কেন আপনাকে? তাছাড়া, এই আপনি-আজ্ঞে-টাজ্ঞেও কি পুরানো হয়ে যাওয়া জামারই মতো ত্যাগ করা যায় না?

—থাকুকই না। কিছু পুরানো জামা থাকে যা অতি প্রিয়। সহজে ফেলে দেওয়া যায় জেনেও ফেলা হয়ে ওঠে না, কেমন মায়া পড়ে যায়। আপনাকে এই 'আপনি' বলাটাও সেরকমই একটা অভ্যেস। দেবীত্বকে না হয় বিসর্জন দেওয়া গেল, আপনিটা থাকুক।

যা আপনার ইচ্ছা।

—আপনিও তো আমাকে আপনিই বলেন।

—অরা হেসে ফেলে বলল, যা-কিছুই আপনা-আপনি না ঘটে, তাকে না ঘটানোই ভালো।

—বাঃ। ভারী চমৎকার বললেন তো আপনি।

—অরা সে কথার জবাব না দিয়ে বলল, এই যে আমরা ভাইজাগ-এর হোটেলের বারান্দাতে ভরদুপুরের ঘুঘুর মতো একে অন্যের ঘন ছায়ার নীচে বসে আছি এটা আমার কাছে বিশ্বাসই হচ্ছে না। অথচ এ এক অন্য গাছ, অন্যরকম পাতা সে গাছের, অন্যরকম ছায়া। এবং এ কথাও সত্যি যে আমরা দুজনেই দুজনের পুরানো গাছে ফিরে যাব। সেই পুরানো গাছটিই স্থায়ী। নিত্য। আর আমাদের এই হঠাৎ—উৎসাহটাই অনিত্য। একেবারেই টেম্পোরারি। তাই না? এটা একটা দুর্ঘটনা।

—হয়তো তাই। কিন্তু কিছু দুর্ঘটনা হয়তো থাকে যা সুখবহ। এও তেমনই এক দুর্ঘটনা।

—তা তো বটেই! আসলে আপনি অগ্নির কাছে আর আমি অপার কাছে নিজেদের নতুন করে প্রমাণিত করতে চেয়েছিলাম হয়তো।

—হয়তো তাই। "আমি নারী আমি পারি" এ কথাটাও হয়তো নিজের কাছে প্রমাণ করার ছিল।

—অগ্নি কি বিশ্বাস করবে যে আমরা হঠাৎ করে বাঁধন ছিঁড়ে বাইরে এলেও আমরা আলাদা ঘরে আছি। অগ্নির প্রিয়তমা অরাকে যে আমি স্পর্শও করিনি, সেই কথা?

—একটু ভেবে অরা বলল, অগ্নিকে যতটুকু জেনেছি, তাতে মনে হয় যে করবে বিশ্বাস। আর এ কথা ও অবিশ্বাস করলে আমাকে ও ক্ষমা করবে না। হয়তো খুনই করে দেবে। তবে মনে হয় না তা। সে খুব বুঝী মানুষ।

—এতই যদি বুঝী তাহলে পরস্ত্রীকে নিয়ে এমনভাবে পালিয়ে গেল কেন? তাও আবার ব্যারিস্টারের স্ত্রীকে নিয়ে! দুঃসাহস তো কম নয়।

—পরস্ত্রীটি তো নাবালিকা নয়। তাই অগ্নি তাকে ইলোপ করেছে একথা বলা চলে না। পরস্ত্রীটি যথেষ্টই সাবালিকা এবং অগ্নির জন্যে সে অনেকই দিন হল প্রেম ও কাম জরজর। তাছাড়া ইলোপ তো করেনি। দাম্পত্যর একঘেয়েমি কাটাবার জন্যেই হয়তো।

আচ্ছা, ওরা কোথায় যেতে পারে তা নিয়ে অপালার কোনো মাথাব্যথা নেই?

না। একটুও নেই। পাখি কখন খাঁচা থেকে উড়ে যায় তখন কোন দিকে যায় আদিগন্ত সুনীল আকাশে সেটা বড় কথা নয়, উড়ে যে গেল, এইটাই বড় কথা। চিরদিনের মতো গেলে চিন্তা হয়তো হত। পায়রারা যেমন সন্ধের আগে গ্রামীণ গৃহস্থের বাড়ি ফিরে এসে বাড়ির টিনের চাল-এ সার দিয়ে বসে, অপাও এক সময়ে ফিরে এসে আমার ঘরেই সেঁধোবে। কিছুদিনের জন্যে ঠাঁই-নাড়া হয়েছে মাত্র। এটা ওর শরীর ও মনের স্বাস্থ্যের জন্যে খুবই ভালো হল।

অরা বলল, আপনি আশ্চর্য মানুষ সত্যি। অপালার দুর্ভাগ্য যে ও আপনাকে ঠিক বুঝতে পারল না।

কেই বা কাকে ঠিকমতো বোঝে। সবাই ঠিকঠাক অন্যাকে বুঝতেই যদি পারত তবে আর গোল ছিল কি? কে জানে! সব মানুষের মধ্যে এই দুর্বোধ্যতা হয়তো ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই রোপিত হয়েছে। প্রত্যেক মানুষ এইজন্যেই বোধ হয় এত ইন্টারেস্টিং।

তারপরে একটু চুপ করে থেকে ঘোষ সাহেব বললেন, আমার স্ত্রী অপা কি প্রেম আর কাম-

এর মধ্যে তফাত বোঝে? আপনার কী মনে হয়?

অরা একটু চুপ করে থেকে বলল, ঠিক জানি না। নাও বুঝতে পারে। খুব কম মানুষই বোঝে।

—এই যে "জরজর" শব্দটা ব্যবহার করলেন আপনি এতে আমার জ্বর-এর কথা মনে পড়ে গেল। জ্বরের কত রকম হয় আপনি কি জানেন?

—টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হিট-ফিভার এই সব জানি।

—না, এছাড়াও মানুষের জ্বর হয়। অন্যরকম জ্বর। তার মধ্যে কাম-জ্বরই প্রধান। কারও কারও আবার ভাল্লুকের জ্বরও হয়।

—ভাল্লুকের জ্বর? সেটা কীরকম?

ভরতি চায়ের কাপটা ঘোষ সাহেবের দিকে ঠেলে দিতে দিতে বলল, অরা।

—সেই জ্বর হঠাৎ করে আসে আবার হঠাৎ করে ছেড়েও যায়। অনেকের কাম-জ্বরও এমন ভাল্লুকের জ্বরেরই মতো।

—বলেই, বললেন, তবে অপার কামজ্বর ভাল্লুকের জ্বর নয়। আসলে ও খুবই শরীর-সর্বস্বী। তাছাড়া, ও বৈচিত্র্যেও বিশ্বাসী। তবে ও একদিন বুঝতে পারবে রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতার মানে।

—কোন কবিতা?

অরা বলল।

—"যাহা পাই তাহা ভুল করে পাই, যাহা চাই তাহা পাই না।"

—অরা বলল, অপা তো বটেই অগ্নিও এত শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান হয়েও একটা ব্যাপারকে জীবনে উপলব্ধি করেনি। অথচ করা উচিত ছিল দুজনেরই।

—কী ব্যাপার?

—মানুষের মুক্তি আসে তার মনেরই মাধ্যমে, শরীরের মাধ্যমে নয়। শরীরের প্রয়োজন স্বীকার করে নিয়েও বলছি। সেই মুক্তি গৃহীরই হোক, কী সন্ন্যাসীর।

—এ তো অনেক গভীর কথা। সাধু-সন্তদের কথা। এ কথা ওরা কেন? আমার মতো সাধারণ মানুষেও বুঝবে এটা আশা করাই অন্যায়।

ঘোষ সাহেব বললেন।

—জানি না। এটা বুঝতে অসাধারণত্বর কী দরকার?

—আপনার মতো যাঁরা অসাধারণ তাঁরা নিজেদের অসাধারণত্ব সম্বন্ধে নির্বিকার, উদাসীন। আমি আপনার মতো অত জানি না।

—অরা বলল, আমিও বিশেষ কিছু জানি না। তবে সেইন্ট অগাস্টিনের সেই উক্তিরই মতো আমি বিশ্বাস করি যে 'The sufficiency of my knowledge consists in knowing that my knowledge is not sufficient'.

—বাঃ। সুন্দর কথা তো!

—ঘোষ সাহেব বললেন।

তারপর বললেন, রুরু আর তৃষার কথা আপনার মনে হচ্ছে না?

হচ্ছে না তা নয়, মনে হচ্ছে। কিন্তু বাঘিনিও তার বাচ্চাদের বড় করে তুলে তাদের স্বাবলম্বনের শিক্ষা দিয়ে একটা সময়ে তাদের ত্যাগ করে। কারও ছেলেমেয়েই তাদের চিরদিনের নয়। তাদের একটা সময়ে পৌঁছে, ছেড়ে দিতেই হয়। তাদের কাছ থেকে কিছু প্রত্যাশা করাটাও উচিত নয়। পশ্চিম দেশ-এ কেউ করেও না। ওদের জীবন ওদের। পশ্চিমি জগতের অনেক কিছুই আমার ভালো লাগে না কিন্তু ওদের এই স্বাবলম্বনের ঐতিহ্যটা আমার খুব ভালো লাগে। আসলে, প্রত্যেক মানুষই

চিরদিনের একা। মায়ার বাঁধনে, কর্তব্যের বাঁধনে কম বা বেশিদিনের জন্যে অন্যের সঙ্গে জড়িয়ে-জড়িয়ে থাকি এইমাত্র। আমরা যে একা এই সত্যটা খুব কম মানুষই উপলব্ধি করে।

—তারপর বললেন, চলুন ব্রেকফাস্ট করে গাড়ি নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়ি অরাকু ভ্যালির দিকে। এই পথের সৌন্দর্যই আলাদা। লাঞ্চ বাইরেই করে নেব। ফিরে এসে রাতে ডিনার খাব হোটেলেই। শ্রীকাকুলম দেখিয়ে আনব আপনাকে।

—শ্রীকাকুলম কোথায়?

—ওই পথেই পড়বে। উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়ির পরে এই শ্রীকাকুলমে এই নকশাল আন্দোলন ভিত পেয়েছিল। দেশের যা অবস্থা, আমার নিজেরই মাঝে মাঝে নকশাল হয়ে যেতে ইচ্ছে করে। এই ভুঁড়ি নিয়ে তো এখন বন্দুক রাইফেল হাতে জঙ্গলে পাহাড়ে ঘুরতে পারব না। কিন্তু আমি ব্যারিস্টার বলেই বলছি। সারাজীবন আইনি তামাশা দেখার পর আমারও মনে হয় যে সব ক্ষমতার উৎস হচ্ছে বন্দুকের নল। এখনও বঙ্কিমচন্দ্রর সেই উক্তি "আইন! সেতো তামাশামাত্র! বড়লোকেরাই পয়সা খরচ করিয়া সে তামাশা দেখিতে পারে" আজও সত্যি। গণতন্ত্র যদি সত্যি গণতন্ত্রই না হয়ে উঠতে পারল পঞ্চাশ বছরের বেশি সময়ে—চারদিকে এত দুর্নীতি, এত অনাচার অত্যাচার, গরিব আরও গরিব হয়ে রইল আর পয়সা আর ক্ষমতা কুক্ষিগত হল সামান্যসংখ্যক মানুষের হাতে, তাতে এছাড়া পথই বা কি?

—একজন ডাকসাইটে ব্যারিস্টার যদি এ কথা বলেন তবে তো অবশ্যই চিন্তার কথা।

—চিন্তা আর কে করে এখানে। সকলেই তো নিজের নিজের স্বার্থ, অর্থ আর যশের চিন্তাই করে। দেশ নিয়ে ভাবে আর কজন!

—সত্যি! এসব কথা ভাবলেও উত্তেজনা হয়।

—আমাদের ছোট ছোট সুখ, ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়া নিয়েই আমরা ব্যতিব্যস্ত সর্বক্ষণ "দেশ"-এর মতো বড় ব্যাপার নিয়ে ভাবার সময় কার আছে? অথচ দেশ না থাকলে যে আমরাও থাকব না এই সরল সত্যটা কারোই মাথায় ঢোকে না।

৩৩

অগ্নি বলল, পৃথিবীর এত দেশের এত সমুদ্রতীরে গেলাম অথচ পুরীর সমুদ্রের মতো চান করে আরাম আর কোথাওই নেই।

—ও আর অপা সমুদ্রমুখী বারান্দাতে বসে ছিল। পুরীর একটি নতুন হোটেলে।

—তারপর বলল, ভালো লেগেছে তোমার?

—খু-উ-উ-ব। আর তোমার?

—আমি তো উপোসী ছারপোকা হয়েই ছিলাম। তোমাকে চেটেপুটে খেয়ে যে সুখ পেলাম, পাচ্ছি, তার কোনো তুলনা নেই।

চলো, ব্রেকফাস্ট করে আমরা সমুদ্র চানে যাই। তারপর ফিরে এসে তোমাকে নিজে হাতে চানঘরে চান করাব আজ আমি। নোনা জলের চ্যাটচেটে ভাব তুলে দিয়ে মিষ্টি জলে সাবান দিয়ে তোমাকে নতুন করে নিয়ে আবারও আদর করব।

অগ্নি বলল।

—আমরা কি হানিমুনিং কাপল?

—আমার তো হানিমুন হয়নি। কী করে তুলনা করি?

—অপালা বলল, আমাদের বিয়ের পর গোপালপুর অন সি-তে হানিমুনে গেছিলাম। তখন চান করা, খাওয়া আর ঘরে আগল তুলে ঘনঘন আদর। একজন চাইনিজ ম্যানেজার ছিল আমাদের হোটেলের। সে তোমার ঘোষ সাহেবকে আলাদা করে ডেকে বলেছিল, "ইউ সি, দেয়ার আর ওনলি টু ওয়েজ উইথ দ্যা উইমেন। আইদার উ্য কিস দেম অর কিল দেম উ্য, দেয়ার ইজ নো ইন-বিটউইন ওয়ে।"

ঘোষ সাহেব কী বলেছিলেন?

কৌতুকের স্বরে বলল অগ্নি।

ঘোষ সাহেব বলেছিলেন, হাউ বাউট ইওর ওয়াইফ?

উত্তরে সেই চীনে বলেছিল, ইউ থী, আই ক্যুদ নাইদার কিয হার নর কিল হার। থো আই লেফ্ট তায়না অ্যান্ড কেম টু ইন্দিয়া।

—হো হো করে হেসে উঠল অপা।

তারপর বলল, সত্যিই মনে হচ্ছে আমরা হানিমুনিং কাপল।

—অগ্নি বলল।

—শরীরের মধ্যে যে এত সুখ আছে তা তুমি আমার জীবনে না এলে বোধহয় কখনো জানতেই পেতাম না। অরা জানলও না, জীবনে ওকি হারাল।

—অরা আর দশজনের মতো নয়। ওর সুখদুঃখ ওরই একার। ও দেবী।

—দেবীরা দূরে থাকলেই ভালো। তাদের পুজো করা যায় কিন্তু তাদের কাছে আনা যায় না।

—কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ বলেও তো কিছু নেই। আমি তোমার সঙ্গে চলে এসে দুঃসাহসী হয়েছি বটে কিন্তু আমাকে তো ঘোষ সাহেবের ঘরে ফিরেই যেতে হবে কদিন পরেই। আমাদের সন্তান না থাকলেও ঘর-ভাঙাটা আমার দ্বারা সম্ভব হবে না।

—অরা, তৃষা এবং রুরুকে জড়িয়ে আমার যে জীবন সেই জীবনেরও একটা আলাদা আনন্দ আছে। আমার এই মিথ্যে ঘরও আমার পক্ষে ভাঙা সম্ভব নয়।

—অগ্নি বলল।

—আমরা এইভাবে চলে এসে, দুজনে দুজনের শরীর নিয়ে অনেক খেলা করছি বটে, গভীর শারীরিক আনন্দে বদ্ধ হয়ে রয়েছি বটে, কিন্তু মিথ্যা বলব না, উজ্জ্বলের উপরে আমার যা কিছু অভিমান ছিল সবই ভেঙে গেছে। মানুষটাকে আমি যেন এক অন্য চোখে দেখতে শুরু করেছি। এখন মন চাইছে, কখন ফিরে যাব। মানুষ অত্যন্ত নীচ ও নিজ স্বার্থপরায়ণ না হলে তার পক্ষে ঘর ভাঙা সম্ভব নয়।

উজ্জ্বল মানে?

আরে! তোমাদের ঘোষ সাহেবের নাম তো উজ্জ্বল ঘোষই।

অ। ভুলে গেছিলাম।

অগ্নি বলল।

—ঘর ভাঙাটা উচিতও নয়।

অগ্নি বলল।

বাঃ।

বলল, অপা।

তারপর বলল, তোমার সঙ্গে এসে এখন বুঝতে পারছি যে দাম্পত্যটা একটা ঘর। কিন্তু সব

দাম্পত্যরই একটি বারান্দা থাকা উচিত। দাম্পত্যকে সুন্দর করে তুলতে। এই বারান্দাই পরকীয়া। ঘর ছেড়ে এই বারান্দাতে এসে দাঁড়ালে একটু চাঁদের আলো, পাখির ডাক, ফুলের গন্ধে নিজেকে নবীকৃত করা যায়। কিছুক্ষণ বারান্দাতে থাকলেই ঘর থেকে ডাক আসে। মেয়ে বলে, মা ব্লাউজ খুঁজে পাচ্ছি না, স্বামী বলেন টাইটা বেঁধে দাও, ছেলে বলে, মা খাবার দাও, এখুনি বেরোতে হবে। তারপরই ঘরে ফিরে যেতে হয়। প্রত্যেক বিবাহিত স্ত্রী ও পুরুষের জীবনেই একটি বারান্দার দরকার। এই বারান্দাই দাম্পত্যর সবচেয়ে বড়ো সেফটি-ভালভ। যে বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের জীবনে একটি বারান্দা নেই তারা সাংঘাতিক বিপর্যয়ের মুখে পড়তে বাধ্য। না থাকলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের দাম্পত্য একঘেয়েমি আর অভ্যেসেই পর্যবসিত হয়। তাতে হয়তো আর কোনো মাধুর্যই থাকে না, তা তাঁরা স্বীকার করুন আর নাই-ই করুন। তবে এ কথাও বলব যে, ব্যতিক্রম থাকেই। "Exception proves the rule!"

তোমার কি তাই মনে হয় না?

আমি কী বলি বলো। আমি তো বিবাহিত জীবনযাপন করিনি। অথচ স্বামী না-হয়েও অরা আর ওর দুই সন্তানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছি। তোমার কথা পুরো না বুঝলেও একটু একটু বুঝতে পারি বইকী! অরার শরীর না পেলেও তার কাছে থেকে এবং সন্তানের কাছ থেকে যা পেয়েছি তাও তো ফ্যালনা নয়।

বুঝি, তোমার কথা বুঝি।

অপালা বলল। ·

সামনের সমুদ্র উথাল-পাথাল করছিল। তবে উদ্দাম নয়। সকালের সমুদ্র সাধারণত শান্তই থাকে জোয়ারের সময় ছাড়া। জোয়ার শুরু হয়ে গেছে। সাদা সি-গাল, টার্ন আর স্যান্ডপাইপার পাখিরা ওড়াওড়ি করছে। জোয়ারের পরে ভাটা আসবে তার পরে আবার জোয়ার। এই চলেছে পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে। মানুষের জীবনও এরকম হলে ভালো হত। কিন্তু কোনো মানুষ সার্ফ-রাইডার-এর মতো সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ আর ফেনার সঙ্গে বেগে ভেসে চলে আর অন্য কেউ ভাটার সমুদ্রের প্রায় নিস্তরঙ্গ টান টান জলরাশির মতো শান্ত স্থির ভাবে বাঁচে। তাদের প্রত্যেকের বাঁচার রকমটা বোধহয় প্রি-ডেস্টিনড। সব বোধহয় আগে থেকেই ঠিক করা থাকে। দম্পতির মধ্যে একজন জোয়ার আর অন্যজন ভাটা হলে বোধহয় তাদের দাম্পত্য খুব সুখের হয়। ভাবছিল অপালা। অগ্নি হঠাৎ বলল, তুমি কী ভাবছ তা জানি না। তবে আমার মনে হয়, আমাদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষই এই সমুদ্রের ঢেউ ছুঁয়ে ছুঁয়ে জল-সইয়ে, উড়তে-বসতে থাকা টার্ন আর স্যান্ডপাইপার পাখিদেরই মতো জীবনকে ছুঁয়ে ছুঁয়েই জীবন কাটিয়ে দিই, জীবনের আবর্তে প্রবেশ করি না। করতে পারলে, ওই তোলপাড়ের মধ্যে ভাসতে-উঠতে পারলে জীবন বড় ইন্টারেস্টিং হতে পারত, গভীর, নোনা স্বাদে স্বচ্ছ।

অপা সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে অন্যমনস্কর মতো বলল, বোধহয়।

সুখের কাছে

কল্যাণীয়েষু

সুবোধ ভট্টাচার্য-কে

চাঁদের আলোয় দু'পাশের এবড়োখেবড়ো রুক্ষ প্রান্তর, দূরের ধুঁয়ো ধুঁয়ো পাহাড়, কাছের জঙ্গল সমস্ত মিলিয়ে একটা রাত্রিকালীন অপরিচিতিজনিত গা-ছম্‌-ছম্‌ অস্বস্তির সৃষ্টি করেছে।

মহুয়ার ঘুম পেয়ে গেছে। সেই সকালে কলকাতা থেকে বেরুনোর পর তিনশো মাইলেরও বেশি গাড়িতে এসেছে ওরা।

দিনে বেশ গরম ছিল। মার্চের শেষ। ক'টার সময় যে পৌঁছোবে সে কুমারই জানে। মনে মনে কুমারের উপর বিরক্ত হয়ে উঠেছে মহুয়া।

বহুক্ষণ হয়ে গেছে—কোনো লোকালয়, জনমানব চোখে পড়েনি। রাস্তাটাও কাঁচা। কোথায় চলেছে ওরা কিছুই বোঝার উপায় নেই এখন।

একটু আগেই দুটো শেয়ালকে দেখেছে রাস্তা পেরুতে। জানালার নামানো কাচ দিয়ে হাওয়ার সঙ্গে এক এক ঝলক মিষ্টি গন্ধ আসছে। কীসের গন্ধ মহুয়া জানে না। জানতে ইচ্ছা করছে।

সামনেই একটা হেয়ারপিন্ বেন্ড। কুমার গাড়ি চালাচ্ছিল। কুমারের পাশে সান্যাল সাহেব। পিছনের সিটে মহুয়া। মহুয়ার পাশে টুকিটাকি—জলের বোতল, সন্দেশের বাক্স, ডালমুট এই-ই সব।

মোড়টা ঘুরেই, গাড়িটা হঠাৎ প্রচণ্ড আওয়াজ করে বন্ধ হয়ে গেল। অনেকক্ষণ থেকেই ইঞ্জিনটা ধাক্কা দিচ্ছিল—কিন্তু এ শব্দটা বনেটের নীচ থেকে এল না। মনে হল, গাড়ির চেসিসের নীচ থেকে এল। বন্ধ হতে হতেও, গতিতে ছিল বলেই অনেকটা এগিয়ে যাবার পর গাড়িটা থামল।

কুমার স্টিয়ারিং বাঁদিকে কাটিয়ে একটা গাছের নীচে রাস্তার পাশে দাঁড় করাল গাড়িটাকে।

মহুয়া উদ্বিগ্ন গলায় বলে উঠল, কী হল? সাংঘাতিক কিছু নিশ্চয়ই!

সান্যাল সাহেব পাইপ মুখে ভুরু তুলে কুমারের দিকে তাকালেন।

কথা বললেন না কোনো।

কুমারের প্রোফাইল দেখা যাচ্ছিল পেছন থেকে। একটা উঁচু কলারের কালো-সাদা খোপ-খোপ টেরিকটের জামার আড়ালে বৃষ্টিতে ভেজা কাকের মতো রোগা গ্রীবা, একমাথা হিপিদের মতো চুল—ছ'ইঞ্চি সাইড-বার্ন—তীক্ষ্ণ নাক।

কুমার কথা না বলে, দরজা খুলে নেমে, বনেট তুলে, টর্চ জ্বেলে এটা-ওটা নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল।

সান্যাল সাহেবও নামলেন।

সামনে বনেটটা তুলে দেওয়াতে এখন কাচটা পুরোপুরি ঢাকা পড়ে গেল। সামনে আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না।

মহুয়া পথের দু'দিকে তাকাল।

এতক্ষণ গাড়ি চলছিল বলে গাড়ির আওয়াজে, গতির মত্ততায় এবং গন্তব্য পৌঁছোনোর একাগ্রতায় শুধু সামনের দিকেই চেয়ে বসেছিল ও। গাড়ির চলার শব্দে নিজেদের মধ্যের টুকিটাকি কথার মধ্যেই ডুবে ছিল। বাইরে যে একটা চন্দ্রালোকিত এবং অত্যন্ত সুখপ্রদ রাত জেগে ছিল, সেই রাতের কোনো অস্তিত্বই ছিল না ওর কাছে।

গাড়িটা থেমে যাওয়াতে এবং হেডলাইট নিবিয়ে দেওয়ার পর চাঁদের আলোয় এই জংলি পাহাড়ি পরিবেশের আসল রূপ স্পষ্ট হল।

কতরকম রাত-চরা পাখি চম্‌কে চম্‌কে আবছায়া প্রান্তরে ডেকে ফিরছে। আলতোভাবে ঝিঁঝির আওয়াজ ভেসে আসছে দূর থেকে। আরও কতরকম ফিসফিসানি উঠছে হাওয়ায় হাওয়ায়। শুকনো পাতা গড়িয়ে যাচ্ছে পাথরের বুকে—একটা অপার্থিব সড়-সড় শব্দ উঠছে। আরও কতরকম শব্দ ও গন্ধ। মহুয়া অবাক হয়ে বাইরে চেয়ে রইল।

কুমার তার বাবার সহকর্মী। একই সাহেবি কোম্পানিতে কাজ করেন দুজনে। মহুয়া নিজেও একটা সাহেবি কোম্পানির রিসেপশনিস্ট। কলকাতায় তাদের ফ্ল্যাটে কুমার এসেছে, ও-ও গেছে কুমারের ফ্ল্যাটে বাবার সঙ্গে। ও যেখানে-যেখানে গেছে সেইসব জায়গায়—এ-পার্টিতে ও পার্টিতে, ক্লাবে গেট-টুগেদারে কুমারের সঙ্গে দেখা হয়েছে।

কুমারের সঙ্গে আলাপ সান্যাল সাহেব অথবা মহুয়ার কারোই বেশিদিনের নয়। বলতে গেলে কুমারের পীড়াপীড়িতেই দোলের আগে সান্যাল সাহেবরা দিনকয়েকের ছুটি নিয়ে বেড়িয়ে পড়েছেন—পালামৌর বনজঙ্গল দেখতে।

এ-এ-ই-আই থেকে ইটিনিরারি নেওয়ার কথা বাবা তুলেছিলেন কিন্তু কুমার বলেছিল যে, এসব অঞ্চল তার হাতের রেখার মতো মুখস্থ। কিন্তু কী করে যে ওরা এতখানি পথ সুন্দর মসৃণ পাকা রাস্তায় আসার পর হঠাৎ এমন কাঁচা রাস্তায় এসে পড়ল মহুয়া বুঝতে পারছে না। ওর মন বলছে, ওরা নিশ্চয়ই রাস্তা ভুল করেছে। রাস্তা যে ভুল করেছে এ-বিষয়ে মহুয়ার কোনোই সন্দেহ নেই। কারণ কুমার বেশ কিছুক্ষণ হল মোটেই কথাবার্তা বলছে না। অথচ সারা রাস্তা কথার ফুলঝুরি ফোটাতে ফোটাতে আসছে ও।

এই সাহেবি কোম্পানিতে ঢোকার আগে কুমার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসে ছিল। সেখানকার অভিজ্ঞতা, মুসৌরী পাহাড়ে তাদের ট্রেনিং সেন্টারে পোলো খেলার কথা, ইত্যাদি-ইত্যাদি নানারকম গল্প। সত্যি কথা বলতে কি, ওর এই বক্‌বকানি শুনতে শুনতে মহুয়া এই দশ-বারো ঘণ্টায় বেশ বিরক্ত ও ক্লান্ত হয়ে উঠেছে। হয়তো সান্যাল সাহেবও হয়েছেন। কারণ তিনিও বেশ অনেকক্ষণ হল কোনো কথাই বলছেন না।

মহুয়ার ভেবে আশ্চর্য লাগছে যে, শহরে কারও সঙ্গে বহু বছরের আলাপ থাকলেও তার সম্বন্ধে বা তাকে যতখানি না জানা যায়, তার সঙ্গে বাইরে বেরোলে তাকে আট-দশ ঘণ্টার মধ্যেই অনেক বেশি জানা হয়ে যায়।

সান্যাল সাহেব একবার মহুয়ার জানলার কাছে এলেন।

বললেন, কী রে মৌ, ভয় করছে নাকি?

মহুয়ার একটু গা ছমছম করলেও বলল, না বাবা! ভয়ের কী? তারপর বলল, কিন্তু গাড়ি কি ঠিক হল?

সান্যাল সাহেব পাইপ ভরতে-ভরতে বললেন, চেষ্টা করছে কুমার।

মহুয়া বলল, গাড়ি খারাপ হওয়ার কথা ছেড়ে দাও। কিন্তু আমরা কি ঠিক রাস্তায় এসেছি?

সান্যাল সাহেব চারদিকের লোকালয়শূন্য রাতের চন্দ্রালোকিত বনপ্রান্তরের দিকে চেয়ে বললেন, বোধহয় না।

ক'টা বেজেছে বাবা?

'সাতটা।'

মহুয়া আর কথা না বাড়িয়ে গাড়ির দরজা খুলে বাইরে এল। কুমার ওর বাইরে আসার শব্দ

শুনে এগিয়ে এল। এসেই স্মাগল্‌ড্‌ বিলিতি সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, সরি। আ-অ্যাম রিয়্যালি সরি।

মহুয়া সোজাসুজি বলল, কী ব্যাপার? আমরা কোথায় এসেছি? বেত্‌লা থেকে কত দূরে? গাড়ির কী করবেন কিছু কি ভেবেছেন?

কুমার বলল, উই হ্যাভ বিন ডিস্‌কাসিং বাউট দ্যাট্‌। কিছু একটা করব নিশ্চয়ই। প্লিজ, ডোন্ট গেট আপ্‌সেট। এভরিথিং উইল বি ওল্‌ রাইট্‌।

মহুয়া কথা না বলে দূরের পাহাড়ের দিকে চেয়ে রইল। ওর ভয় করতে লাগল খুব। সন্ধের আগে আগে যেখানে ওরা চা খেয়েছিল, ভুলে গেছে জায়গাটার নাম—সেখানে শুনেছিল যে, গতরাতে নাকি আঠারোটি রাইফেল নিয়ে গয়া জেলা থেকে ডাকাতরা এসে এই রাস্তাতেই ডাকাতি করে গেছে। অবশ্য এই রাস্তাই সেই রাস্তা কিনা একমাত্র কুমারই তা বলতে পারে। এও বলেছিল যে, মেয়েদের নিয়ে রাতে এসব পথে যাওয়া ঠিক নয়।

আসলে এই মুহূর্তে ভয়ের চেয়েও বেশি রাগ হচ্ছে মহুয়ার। কুমারের প্রকৃত স্বরূপ এত তাড়াতাড়ি মহুয়া না বুঝলেই ভালো হত। মানুষটাকে বড় কৃত্রিম বলে মনে হয়েছে মহুয়ার এরই মধ্যে। বাঙালিদের সঙ্গেও সবসময় দাঁত টিপে টেঁশো-ইংরিজি বলে কী যে আনন্দ পায়, কী যে এরা প্রমাণিত করতে চায়, তা মহুয়া বোঝে না। এ বোধহয় একরকম হীনমন্যতা। মনে হয়, সঠিক জানে না মহুয়া।

সান্যাল সাহেব মুখে একবারও না বললেও মহুয়ার বুঝতে ভুল হয়নি যে, এইবাবে বেড়াতে আসার আসল কারণ মহুয়া আর কুমারকে ঘনিষ্ঠভাবে মেশার সুযোগ দেওয়া। মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে সান্যাল সাহেব স্বাভাবিক কারণেই উদ্বিগ্ন। বছর পাঁচেকের মধ্যেই রিটায়ার করবেন উনি।

ছেলে হিসেবে কুমার ভালো। পাত্র হিসেবেও ভালো। সত্যি কথা বলতে কি, আজ ভোরে মহুয়া যখন ওদের হিন্দুস্থান রোডের বাড়ি থেকে বেরিয়ে বসন্তের মিষ্টি হিমেল আমেজ-ভরা সকালে একটা অফ্‌-হোয়াইটের মধ্যে কালো কাজ করা ছাপা শাড়ি পরে কুমারের গাড়িতে ওঠে, তখন ওর ভারী ভালো লাগছিল। ও ভেবেছিল যে কুমারকে ও কিছুদিন হল জেনেছে; সেই সপ্রতিভ, যোগ্য ছেলেটিকে তার আরও অনেক বেশি ভালো লাগবে এবং তার সঙ্গে ঘর করতে চাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে ওর বেশি দেরি হবে না।

কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যে ওর খারাপ লাগতে শুরু করবে ও তা বুঝতে পারেনি।

ডাকাতির ভয়ের কথাটা সান্যাল সাহেব এবং কুমারের মনেও এসেছিল। কিন্তু মহুয়া ভয় পাবে বলে তা নিয়ে আর আলোচনা করবেন না ওঁরা।

বনেটটা বন্ধ করে দিতেই ফুটফুটে চাঁদের আলোয় দেখা গেল সামনেই একটা পাহাড় এবং পথটা সেই পাহাড়ের মধ্যে মিশে গেছে ঘুরে ঘুরে।

কুমার ঐদিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকাতে সান্যাল সাহেব বললেন, কী দেখছ?

না। মানে দিস্‌ ওয়াজ নট সাপোজড্‌ টু বি হিয়ার, কুমার বলল।

হায়াট ডু ট্যু মিন? রাগত গলায় সান্যাল সাহেব শুধোলেন কুমারকে। বললেন, ভৌতিক ব্যাপার নাকি? এতক্ষণও পাহাড়টা নিশ্চয়ই ছিল। যখন আলো জ্বলছিল ও টর্চ জ্বালিয়েছিলে তখন কাছটাই নজরে আসছিল। দূরে আমরা কেউই তাকাইনি।

কুমার বলল, তা নয়। পথের এই ল্যাপে কোনো পাহাড় থাকার কথাই ছিল না।

সান্যাল সাহেব রাগ চেপে, ধরা গলায় বললেন, রাস্তা ভুল করলে রাস্তায় আনচার্টেড পাহাড় নদী অনেক কিছুই পড়বে। যে-রাস্তায় তোমার আসার কথা, সে-রাস্তা নিশ্চয়ই কোথাও ফেলে এসেছ।

তারপর একটু চুপ করে থেকে গম্ভীর হয়ে বললেন, গাড়িটাও গেল বন্ধ হয়ে। তোমাকে এতবার

করে বললাম রামবিলাসকে নিই, আমার গাড়ি নিয়ে আসি—তা তুমি জেদ ধরলে যে তোমার গাড়িতেই যেতে হবে—গাড়ি নিজে না চালালে রাফিং হয় না। এখন করো রাফিং।

মহুয়া ব্যাপারটাকে লঘু করার জন্যে মধ্যে পড়ে হেসে বলল, কুমার, আপনি তো গাড়ির সবকিছু বোঝেন বলেছিলেন, বলুন তো দেখি কী হয়েছে?

কুমার ঠোঁট থেকে সিগারেটটা নামিয়ে বলল, বুঝতে পারছি না। এখন হোয়াট টু ডু?

কুমার কিন্তু তখনও সপ্রতিভ। পুরো ব্যাপারটা যে তার জন্যেই ঘটেছে সে-কথা সে তখন স্বীকার করলেও, পুরোপুরি মেনে নিতে রাজি নয়।

সে বলল, আসুন গাড়িতে বসে ভাবা যাক কী করা যায়!

সান্যাল সাহেব দরজা খুলেই সামনের সিটে বসলেন। তাঁকে ভীষণ চিন্তিত দেখাচ্ছিল। পায়ের কাছে রাখা ছোট্ট ব্যাগ থেকে হুইস্কির বোতল বের করে ওয়াটার বট্‌ল্ থেকে গেলাসে জল ঢেলে মেশালেন। তারপর চুমুক দিলেন।

কুমারকে বললেন, খাবে নাকি?

কুমার নিস্পৃহ গলায় বলল, আ-স্মল ওয়ান্।

বলেই আবার বলল, কাছাকাছি নিশ্চয়ই গ্রাম-টাম থাকবে। আপনারা বসুন। আমি একটু এগিয়ে গিয়ে দেখে আসি।

সান্যাল সাহেব বললেন, তা কী হয়? এই জংলি জায়গায়, অচেনা অজানা পরিবেশ—একা যাবে কেন?

কুমার বলল, এইরকম জায়গা বলেই তো বলছি। মহুয়াকে সঙ্গে নিয়ে পায়ে হেঁটে এমন জায়গায় কি ঘুরে বেড়ানো সেফ? তারপর ডাকাতির কথা তো শুনলেন।

সান্যাল সাহেবের গলার স্বরে কেমন এক শুষ্ক বিরক্তি ও রাগ ঝরে পড়ল। বললেন, কী করা উচিত তুমিই বলো—কী করাটা সেফ?

ইতিমধ্যে পিছন থেকে একটি আগন্তুক জীবের শব্দ শোনা গেল। অসমান প্রস্তরাকীর্ণ লাল ধূলি-ধূসরিত পথে জিপের উঁচু হেডলাইটের আলোটা লাফাতে লাফাতে এগিয়ে আসছিল।

হঠাৎ কুমার বলল, মহুয়া, তুমি নীচু করে বসে পড়ো। তোমাকে যেন দেখা না যায়।

মহুয়া বলল, আপনারা থাকতে আমার ভয় কী?

কুমারের গলায় ভয়। বলল, যা বলছি করো। তর্ক করো না। লিসন্ টু মি।

মহুয়া ভয় এবং বিরক্তিসূচক একটা সংক্ষিপ্ত চ-কারান্ত শব্দ করে সিটের নীচে আধশোয়া ভঙ্গিতে বসে পড়ল।

সান্যাল সাহেব পাইপ কড়মড় করে বললেন, বন্দুকটা আনার কথা বললাম; তাও আনতে দিলে না তুমি। তুমি,...............রিয়্যালি..........।

জিপটা যত কাছে আসছিল ততই যেন গতি কমে আসছিল—এবং মহুয়ার গলার কাছে কী একটা অননুভূত অনুভূতি দলা পাকিয়ে উঠছিল। ওর প্যারিসে-থাকা মায়ের কথা মনে পড়ল ওর—আরও অনেক কথা। হঠাৎ।

কুমার তাড়াতাড়ি জানালার কাচটা তুলে দিল। একটা সিগারেট ধরাতে গেল। কিন্তু পারল না। ওর কাঁপা-হাতে দেশলাইটা জ্বালাতে পারল না। একবার যদিও-বা জ্বলল, পরক্ষণেই জ্বলন্ত কাঠিটা গাড়ির মধ্যেই হাত থেকে পড়ে গেল।

মহুয়া ফিস্‌ফিস্ করে বলল, কী করছেন! আগুন লাগাবেন নাকি?

সান্যাল সাহেব কুমারের দিকে এবার ঘৃণার চোখে তাকালেন। তারপর হঠাৎ বাঁদিকের দরজা

খুলে নেমে পড়ে রাস্তার পাশে এসে সাহসের সঙ্গে গাড়ির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

চলন্ত জিপটার মধ্যে হিন্দিতে অনেক লোক কথা বলছিল। কারা যেন হাসছিল। এমন সহজ শিকার পেয়েছে দেখে বুঝি ওদের আনন্দের সীমা ছিল না।

সান্যাল সাহেব হাত তুললেন।

জিপের ইঞ্জিনটা ওদের গাড়ির ঠিক পিছনে এসেই যেন বন্ধ হয়ে গেল। প্রথমে মনে হল বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই মহুয়া বুঝল বন্ধ হয়নি—গাড়িটা থেমে গেছে। কিন্তু ইঞ্জিনের ধক্ ধক্ শব্দ শোনা যাচ্ছে।

দু'পাশ থেকে একসঙ্গে চার-পাঁচজন লোকের লাফিয়ে নামার শব্দ শুনল মহুয়া। কুমারের সাড়াশব্দ পেল না। মনে হল ভয়ে ও গাড়ির মধ্যে জমে গেছে। মরেই গেল বুঝি-বা।

বাবার গলা শুনতে পেল মহুয়া। বাবা পাইপটা ধরিয়ে, শুধু হাতে, বিপদের মুখে শুধুমাত্র গলার স্বরে যতখানি ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করা যায় তা করে বললেন, হিঁয়া কোই মেকানিক মিলেগা? গাড়ি জাদ্দা খারাপ হো গ্যয়া।

ডাকাতদের মধ্যে একজন অডাকাতসুলভ অত্যন্ত ভদ্র গলায় বাংলায় বলল, আপনারা বাঙালি—কলকাতার নম্বর দেখেই বুঝেছিলাম। কী, হয়েছে কী?

গাড়িটা খারাপ হয়ে গেছে। এখানে মিস্ত্রি-টিস্ত্রি পাওয়া যাবে?

ওঁদের মধ্যে থেকে একজন বললেন, এই পাহাড়টা পেরিয়েই ওপাশে ফুলটুলিয়া গ্রাম। সুখন মিস্ত্রির একটা কারখানা মতো আছে।

ওঁদেরই মধ্যে আরেকজন বললেন, সুখন মিস্ত্রি কে রে?

প্রথম ভদ্রলোক বললেন, আরে দুখন মিস্ত্রির ভাই। দুখন মারা গেছে তো মাসখানেক হল। ওর ভাই সুখন এসে কারখানার জিম্মা নিয়েছে।

সান্যাল সাহেব বললেন, আমাদের মধ্যে কেউ কি একটু যেতে পারি আপনাদের সঙ্গে কারখানা অবধি?

ওঁরা সমস্বরে বললেন, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

ইতিমধ্যে মহুয়া সিটের তলা থেকে শরীর বের করে সিটের উপরে বসেছে আস্তে আস্তে। যারা ডাকাত নয়, তাদের কাছে অমন লুকিয়ে থাকা অবস্থায় ধরা পড়তে চায়নি ও।

মহুয়া ভিতর থেকে ডাকল, বাবা!

নারীকণ্ঠ শুনে জিপের আরোহীরা অবাক গলায় বললেন, সঙ্গে মেয়েছেলে আছে নাকি? তাহলে তো মুশকিল করলেন। তাহলে আপনারা সকলেই থাকুন এখানে—আমরা গিয়েই সুখনকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আরেকটা কাজ করা যায়। আমরা টো করে নিয়ে যেতে পারি আপনাদের গাড়ি। কিন্তু আমাদের কাছে দড়ি নেই। আপনাদের কাছে কি আছে?

কুমার এতক্ষণে নেমেছে গাড়ি থেকে। নেমে বলল, নেই।

সান্যাল সাহেব বললেন, কী আছে কী তোমার সঙ্গে? কিছুই না নিয়ে এত লম্বা পথে বেরিয়েছ?

মহুয়া মনে মনে বলল, গলায় দড়ি দেওয়ার জন্যেও তো কিছুটা আনা উচিত ছিল।

কী করা হবে এই নিয়ে সান্যাল সাহেব ও কুমার ভদ্রলোকদের সঙ্গে কথা বলছেন। এমন সময় পাহাড়ের উপরের রাস্তা থেকে একটা আশ্চর্য উদ্ভট আওয়াজ কানে এল। চোখে পড়ল একটা স্তিমিত এবং কম্পমান ঘূর্ণায়মান আলো।

ওঁরা সকলেই ওদিকে তাকালেন।

হঠাৎ একজন চেঁচিয়ে বললেন অন্যজনকে, আরে এ তো সুখনের গাড়ি।

তারপর সান্যাল সাহেবের দিকে ঘুরে আশ্বস্ত করার জন্যে বললেন, পর্বতই চলে আসছে মহম্মদের কাছে। বলেই কুমারের দিকে ঘুরে বললেন, যান মশাই, আর ভয় নেই। সুখনকে ভগবান পাঠিয়ে দিয়েছেন ঠিক সময়মতো।

যে যন্ত্রটা পাহাড় বেয়ে এদিকেই এগিয়ে আসছে, সেটাকে গাড়ি বলে ভুল করার কোনো কারণ নেই। একটা নড়বড়ে ধাতব ব্যাপার টুং-টাং-ঠিন্-ঠিন্-টকা-টক্-ঝকা-ঝং আওয়াজ করতে করতে লাফাতে-থাকা ঘুরন্ত মিটমিটে একটা-মাত্র হেডলাইট নিয়ে পাহাড় বেয়ে অন্য কোনো গ্রহের এক কিম্ভূতকিমাকার অদৃশ্যপূর্ব জন্তু যেন হামাগুড়ি দিয়ে নামছে পাহাড় থেকে।

সকলেই সেদিকে নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছেন। এমনকি জিপের আরোহীরাও। এঁরা বোধহয় সুখন মিস্ত্রির এই গাড়িটাকে দিনমানে দণ্ডায়মান অবস্থাতেই দেখে থাকবেন এতদিন। রাতের অন্ধকারে তার চলন্ত রূপটি দেখে তাঁরা সকলেই বিস্ময়বিমূঢ় এবং চলচ্ছক্তিহীন হয়ে গেছেন।

গাড়িটা যতই এগিয়ে আসতে লাগল ততই তার আওয়াজ বাড়তে লাগল। এতক্ষণ অর্কেস্ট্রার দূরাগত ঐকতান শোনা যাচ্ছিল। এখন কাছে আসায় বিভিন্ন যন্ত্রবিশেষের বিভিন্ন আওয়াজ আলাদা আলাদা হয়ে কানে লাগছে।

পথের মধ্যে দু-দুটো গাড়ি ও এত লোকজন দেখে বোধহয় সুখন মিস্ত্রি হর্ন বাজাল।

সেই চন্দ্রালোকিত হলুদ বাসন্তী রাতে তাবৎ জীবন্ত পশুপাখি, কীটপতঙ্গ মায় সমবেত জনমণ্ডলীর হৃৎপিণ্ড চমকিয়ে দিয়ে সেই যন্ত্রযান একটি প্রাগৈতিহাসিক মোরগের মতো ডেকে উঠল—কঁরর—র্-র্-র্। আবার ডাকল, কঁ-কঁর্-কঁ-র্-র্-র্-র্।

এরা সকলে হইচই করে উঠল। প্রায় চিৎকার করেই থামাল যন্ত্রটাকে।

ইঞ্জিনটার সঙ্গে একচোখা আলোটাও মাথা দোলাতে দোলাতে এসে ওদের সামনে থেমে গেল। ঘটাং শব্দ করে ব্রেক কষে দাঁড় করাল ড্রাইভার গাড়িটাকে।

সুখন্, এ সুখন্—বলে জিপের আরোহীদের মধ্যে কে যেন ডাকল।

সিটের উপরে একটা তাকিয়া রেখে তার উপর বসে গাড়ি চালাচ্ছিল কালো হাফ-প্যান্ট ও লাল-গেঞ্জি পরা একটা বছর বারো-তেরোর বেঁটেখাটো কালো-কালো ছেলে। সে গুড়গুড়িয়ে নেমে এসে বলল, হুয়া কা?

জানা গেল ও সুখন নয়, সুখনের খিদ্‌মদ্‌গার। গাড়ি নিয়ে সুখনের জন্যে গুঞ্জা বস্তিতে যাচ্ছিল মহুয়ার মদ আনতে। সুখন কারখানা-সংলগ্ন তার বাড়িতেই আছে।

মহুয়ার মদের কথা শুনে সান্যাল সাহেব চিন্তিত হলেন ও কুমার আঁতকে উঠল।

জিপের আরোহীদের দিকে সপ্রশ্ন চোখে তাকালেন ওঁরা দুজনেই। বোধহয় সুখন মিস্ত্রির চরিত্র সম্বন্ধে নীরব প্রশ্ন করলেন।

তাঁদের মধ্যে যিনি নেতা-গোছের, তিনি বললেন, আরে নে—হী। মহুয়া তো হিঁয়া সব কোই-ই পীতা। সুখন্ বড়া আচ্ছা আদ্‌মী। আপলোগ বে-ফিক্কর্ রহিয়ে। এ্যায়সা কুছ দুগ্‌গী-তিগ্‌গী আদমী নহী হ্যায়। উও বড়ে-খানদানকে পড়ে-লিখে আদ্‌মী—আভি পেট্‌কা লিয়ে গাড়ি মেরামতীকা কামমে লাগা হুয়া হ্যায়।

তারপর বললেন, কইভী ডর নেহী। আপলোগ ইতমিনান্‌সে যানে শকতা।

কখন ওরা সুখন মিস্ত্রির কারখানায় পৌঁছেছিল—কখনই-বা কারখানার লাগোয়া সুখনের বাড়িতে ঘুমিয়ে পড়েছিল খিচুড়ি খাওয়ার পর, আর কখনই-বা রাত পেরিয়েছিল, মনে নেই মহুয়ার।

এদিকে কাছাকাছি কোনো ডাকবাংলো-টাকবাংলো নেই। একটা ছিল; সেটা নাকি দশ মাইল দূরে। এতখানি আসার পর আর কোথাও যাবার মতো অবস্থা ছিল না কারোই। তাই বাবা এবং কুমার ডিসাইড করেছিলেন যে এখানেই রাত কাটাবেন।

টালির ছাদ উপরে। সিলিং-টিলিং নেই। টালির ফাঁক-ফোক দিয়ে আলো চুঁইয়ে এসে ঘরে পড়েছে।

দেওয়ালের দিকের চৌপাইয়ে মহুয়া শুয়ে ছিল। মধ্যের চৌপাইতে বাবা, ওপাশে কুমার। শেষ রাতে বেশ শীত-শীত করছিল। চাদর মুড়ে শুয়ে মহুয়া আলস্যে পড়ে থাকল অনেকক্ষণ। আড়মোড়া ভাঙল।

কুমারের শোয়াটা বিচ্ছিরি। তাছাড়া অমন ছিপছিপে চেহারার লোক যে অমন নাক ডাকাতে পারে এ-কথা মহুয়ার জানা ছিল না। কুমারের দিকে তাকিয়ে এক বিষণ্ণ হতাশায় ওর মন ভরে এল।

মহুয়া উঠল। শাড়িটা ঠিক করল। তারপর দরজা খুলে বারান্দায় এল। বারান্দায় আসতেই দেখল, কাল রাতের সেই যন্ত্রযান-চালক-কাম্-তাড়াতাড়ি খিচুড়ি রেঁধে-দেওয়া মংলু যেন তারই অপেক্ষায় বসে আছে।

মংলু বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসেছিল। মহুয়াকে দেখেই বলল, চা করব দিদিমণি?

মহুয়া বলল, করো; কিন্তু এক কাপ। ওঁরা এখনও ওঠেননি।

তারপর বলল, তোমার বাবু কোথায়?

মংলু বলল, কে? ওস্তাদ? ওস্তাদ তো কারখানায়। গাড়ি নিয়ে পড়েছেন। আপনাদেরই গাড়ি।

বাথরুম থেকে ঘুরে এসে বারান্দার মোড়ায় বসে চা খেল মহুয়া।

শেষ রাত থেকেই কী একটা চাপা অনামা খুশিতে ওর মন ভরে রয়েছে। ভিতরে একটা ছটফটে কষ্ট। কষ্ট মানে: আনন্দ।

বাবা এবং কুমার যে এখানে রাত কাটাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সেজন্যে ওঁদের দুজনের কাছেই মহুয়া খুব কৃতজ্ঞ।

বারান্দা ঘেঁষে থামের গায়ে পর-পর নানারঙা বোগেনভোলিয়া লতা। মেরি পামার ও আরও অনেকরকম ফুলে-ফুলে ছেয়ে আছে। তার মধ্যে একটা নিমগাছ। কোণায় একটা কুয়ো—লাটাখাম্বা লাগানো আছে। এপাশে-ওপাশে ছড়ানো-ছিটানো মবিলের টিন, টায়ার-টিউব, নানারকম গাড়ির মরচে পড়া রিম্। একটা ম্যাটমেটে লালরঙা পুরোনো ভাঙাচোরা চাকাহীন গাড়ি মাটিতে বুক দিয়ে বসে আছে।

বারান্দায় বসে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে তাকিয়ে এই সকালে একা-একা চা খেতে ভারী ভালো লাগছিল মহুয়ার। অনতিদূরে শালবন থেকে কোকিল ডাকছে শিহরন তুলে: অন্য দিক থেকে সাড়া দিচ্ছে অন্য কোকিল। তখনও হিম-হিম ভাব। পলাশে শিমুলে দূরের লাল এবড়োখেবড়ো প্রান্তর ভরে আছে। এই ভোরের সমস্ত সত্তা ভরে রয়েছে কী-যেন-কী ফুলের উগ্র গন্ধে। চতুর্দিক ম' ম' করছে।

নাক দিয়ে জোরে হাওয়া টানল মহুয়া।

মংলুকে শুধোল, কীসের গন্ধ এ? কোন্ ফুলের?

মংলু অবাক চোখে তাকাল মহুয়ার দিকে।

মহুয়া বুঝতে পারছিল মংলুর মুখ-চোখ দেখে যে, জীবনে মহুয়ার মতো কখনো কারও খিদ্‌মদ্‌গারি করতে পারার এত সৌভাগ্য যে আসবে, তা বোধহয় ও কখনও ভাবেনি। তাই মহুয়াকে কোথায় বসাবে, কী খাওয়াবে ভেবেই পাচ্ছে না মংলু।

মহুয়ার প্রশ্নে অবাক চোখে তাকাল ও। এই অপার অজ্ঞানতায় আশ্চর্য হয়ে রইল অনেকক্ষণ। তারপর বলল, এ তো মহুয়ার গন্ধ!

মহুয়ার লজ্জা পাওয়ার কথা ছিল না। তবু ও লজ্জা পেল; ওর ভালোও লাগল। ওর নামের ফুলে-ফলে যে এমন মাতাল-করা গন্ধ তা বুঝি ও নিজে এখানে না এলে জানতে পেত না। নিজেকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করল।

বারান্দার ওপাশে আর একটা ঘর। দরজা খোলা রয়েছে হাঁ করে।

মহুয়া শুধোল, এটা কার ঘর?

ওস্তাদের। মংলু বলল।

তুমিই ওস্তাদের রান্না করে দাও?

মংলু হাসল।

বলল, ওস্তাদ কিছুই খেতে চায় না। রাঁধব আর কী? কার জন্যে? সারাদিন কাজ করে, তারপর সন্ধ্যার পর যা-হয় দুজনে কিছু ফুটিয়ে নিই।

মহুয়া শুধোল, কেন? দুপুরে কিছু খাও না তোমরা?

আমি খাই। পাঁড়েজির দোকানে গিয়ে পুরি, আলুর তরকারি এসব খেয়ে আসি। রান্না করি না কিছু। একার জন্যে কে ঝামেলা করে? ওস্তাদ তো কিছুই খায় না। চা আর পান আর একশো বিশ জর্দা—ব্যাস্। সারাদিনে ওই।

কাল রাতেই বিহারি-নামের এই বাঙালি লোকটাকে দেখা অবধি মহুয়ার যেন কিছু একটা গোলমাল হয়ে গেছে ভেতরে। এমন প্রচণ্ড গোলমাল ওর অন্তর্জগতে এবং হয়তো শরীর-জগতেও আগে কখনও ও অনুভব করেনি। লম্বা, রোদে-পোড়া সবল চেহারা। জুলপির চুলে একটু পাক ধরেছে। শক্ত চোয়াল। কথা কম বলে—চোখ দুটোতে এক স্তব্ধ ঔজ্জ্বল্য—কিন্তু সব মিলিয়ে এই সুখন মিস্ত্রিকে প্রথম দেখার পরই এমন কিছু ঘটে গেছে মহুয়ার ভিতরে যে, তাদের গাড়ির মতো তার মনেরও বুঝি মেরামতির বড় দরকার হয়ে পড়েছে এখুনি।

এ-কথা ও কাউকে বলতে পারেনি। পারবেও না। মহুয়া এই মিস্ত্রিকে স্বপ্ন দেখেছে রাত্রে। একঝলক দেখেছে। ঘুমের মধ্যে এক দারুণ ভালোলাগায় ও ভরে গেছে। কেন ও জানে না। আজ এই স্পষ্ট ভোরেও অস্পষ্টতায়-ভরা রাতে-দেখা এবং স্বপ্নে-দেখা সুখন মিস্ত্রি তার সমস্ত সত্তায় একটা অদ্ভুত সুখময় আভাস রেখে গেছে। আভাসটা কোন্ সত্যের, মহুয়া এখনও বুঝে উঠতে পারছে না।

শেষে কিনা পালামৌর একটা অখ্যাত গ্রামের এক মোটর-মিস্ত্রি! কিন্তু তাই কি?

নাঃ। নিজেই নিজেকে বকল মহুয়া। বলল—ওর রুচি বড় খারাপ হয়ে গেছে। বলল, নিজেকে সংযত করো। এ-সব ভালো নয়।

মংলু বলল, দিদিমণি, আর একটু চা খাবেন?

মহুয়া বলল, করো।

বলতেই মংলু ঘর ছেড়ে রান্নাঘরে গেল। যেতে যেতে বলল, নাস্তার বন্দোবস্ত করে রেখেছি। ওস্তাদ সূর্য ওঠার আগেই নিজে গুঞ্জা বস্তিতে গিয়ে আপনাদের জন্য আনাজ, ডিম, মুরগি সব নিয়ে এসেছে। এখানে তো মাছ পাওয়া যায় না। যখনি বলবেন পরোটা, আলুভাজা, ডিমের তরকারি

বানিয়ে দেব। ওস্তাদ বলেছেন, আপনাদের কোনোরকম কষ্ট হলে আমার চাকরি যাবে। দুপুরে মুরগির ঝোল, বাইগন্‌কা ভাত্তা, পুদিনার চাট্‌নি, কাঁচা আম আর লংকা বাটা;আর সবশেষে গুঞ্জার প্যাড়া। আপনি শুধু বলবেন, কখন কী খাবেন!

মহুয়া বলল, কেন? গাড়ি সারাতে কি খুব দেরি হবে? গাড়ির কী হয়েছে আগে সেটাই জানা যাক।

বিকেলের আগে নিশ্চয়ই হবে না। চিন্তা করবেন না দিদিমণি। ওস্তাদ সময়মতো ঠিকই জানাবে।—মংলু বলল।

মহুয়া একবার ঘরের মধ্যে তাকাল। দেখল বাবা ও কুমার এখনও ঘুমিয়ে কাদা। রাতে হুইস্কিটা বেশি খেয়েছেন দুজনেই। তার উপর বিপদ থেকে ত্রাণের আরাম বোধহয় ঘুমের ওষুধের কাজ করেছে ওদের স্নায়ুতে।

চা-টা খেয়ে মহুয়া একবার ঘরে গেল। ঘরের দেওয়ালে একটা আয়না ছিল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে একটু দেখে নিল। চুলটা ঠিক করে নিল। বাথরুমে গিয়ে কালকের সারাদিনে পরা শাড়িটা ছেড়ে একটা কালো আর লাল ডুরে পাছাপেড়ে শান্তিপুরি শাড়ি পরল। একটু আলতো করে কাজল লাগাল চোখে। মহুয়া জানে যে, মহুয়ার চোখ দুটো ভারী সুন্দর। ও-যে সুন্দর, ওকে দেখে যে অনেক পুরুষ আত্মহারা হয়, এ-জানাটা ও ফ্রক পরা বয়স থেকেই জেনেছে। কিন্তু কাল রাতের লণ্ঠনের আলোয় হঠাৎ যে-লোকটিকে দেখেছিল—সেই লোকটির মতো কাউকে নিজে এর আগে ও দেখেনি। ও-যে নিজেও কাউকে দেখে আত্মহারা হতে পারে—লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট বলে একটা সুতীব্র বেদনাময় অনুভূতি যে তার জীবনেও সত্যি হবে এই এতদিন পরে, ও কখনোই তা ভাবেনি। ওর ভিতরে যে একটা ভীষণ দামি আসল-আমি ছিল, সেই আমিটাকে,—সেই মুখটি, সেই ব্যক্তিত্বটি বড় চমক তুলে ডাক দিয়েছে। ওর হৃদয়ের গভীরে কেউই আর এমন করে পথ কাটেনি আগে।

অথচ আশ্চর্য! কেমন করে কী হয়ে গেল, হয়ে গেছে, ও জানে না। ওর শরীরে জোর পাচ্ছে না। ওই বাসন্তী সকালের কোকিলের ডাকে, মহুয়া আর শালফুলের গন্ধে, এই অলস হাওয়ায়, অনতিদূরের জঙ্গলের মধ্যে চরেবেড়ানো মোষের গলার কাঠের ঘণ্টার গম্ভীর ডুং ডুং শব্দে ও নিজেকে সম্পূর্ণ খুইয়ে ফেলেছে। ওর সব গর্ব, সব অহংকার, সব কিছুই বুঝি এই ফুলটুলিয়ায় ধুলোয় ফেলা গেল।

মহুয়া বাইরে এল। তারপর ওঁরা ওঠার পর ওঁদের চা দেওয়ার জন্যে মংলুকে বলে সিঁড়ি বেয়ে নেমে কারখানার দিকে পা বাড়াল।

পাশেই কারখানা। মধ্যে সরু সরু বাঁশ পুঁতে একটা বেড়ার মতো দেওয়া। বেড়ার উপর ওদেরই গাড়ির কার্পেট, পাপোশ, সব রোদে দেওয়া হয়েছে।

কারখানায় ঢুকে মহুয়া দেখল, ওদের গাড়ির বনেটটা তোলা। ভদ্রলোক মাথা নামিয়ে কী যেন ঠুক-ঠাক করছেন। কাল রাতে-পরা খয়েরি-রাঙা জিনের প্যান্ট—পায়ে টায়ার-সোলের চটি। ঝুঁকে-পড়া সবল সুগঠিত পা ও পেছনের আভাস, সুন্দর বলিষ্ঠ হাতের কনুই অবধি দেখা যাচ্ছে। মুখ নামিয়ে ইঞ্জিনের গভীরে কী যেন দেখছেন, যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করছেন। আর পায়ের কাছে মাটিতে লেজ-গুটিয়ে বসে আছে একটা কালো নেড়ি কুকুর। এই পরিবেশে কুকুরটি অদ্ভুত মানিয়ে গেছে।

লক্ষ করে দেখল মহুয়া যে, কুকুরটার পিছনের একটা পা ভাঙা।

মহুয়া কথা না বলে একটা খালি মবিলের ড্রামে হেলান দিয়ে মানুষটিকে দেখতে লাগল নিমগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে। নামটা বাজে;সুখন।

ওর অস্তিত্ব টের পায়নি সুখন।

এত সকালে কারখানায় অবশ্য কেউই আসেনি। নিমগাছে কাক ডাকছে, দূরের বনে কোকিল। ঝিরঝির হাওয়ায় কারখানার তেল-মবিলের গন্ধ ছাপিয়ে শালফুলের, মহুয়া ফুলের ও আরও কত কিছুর বনজ গন্ধ ভাসছে।

কুকুরটা একদৃষ্টে দেখছিল মহুয়াকে। ঈর্ষাকাতর চোখে চেয়ে ছিল। কুকুরটা বোধহয় মেয়ে। মহুয়ার প্রতি মনোভাবটা ঠিক কীরকম হওয়া উচিত তা ঠিক করে উঠতে পারছিল না বুঝি।

কিছুক্ষণ পর কুকুরটা হঠাৎ ভু-উক-ভুক্-ভুক্-ভুঃ করে ডেকে তিনপায়ে নড়বড়ে তে-পায়ার মতো দাঁড়িয়ে উঠল। উঠেই ছুঁচলো মুখে কান খাড়া করে মহুয়ার দিকে চেয়ে ক্রমান্বয়ে ডাকতে লাগল।

সুখন মুখ না তুলেই বলল, 'আঃ কালুয়া, চুপ কর্।'

তাতেও যখন কালুয়া চুপ করল না তখন সুখন মুখ তুলল। মুখ তুলেই মহুয়াকে দেখে অবাক হল। একটা অপ্রতিরোধ্য ভালো-লাগা এসে তার মুখের রং বদলে দিল। পরক্ষণেই সামলে নিল সুখন নিজেকে। সুখন মিস্ত্রি—নিজের কারখানার পটভূমিতে ফিরিয়ে আনল নিজেকে। নিজেকে মনে মনে চাব্‌কাল।

কালিমাখা দু' হাত তুলে নমস্কার করল। বলল, নমস্কার।

সুখনের বাঁ গালে অনেকখানি কালি লেগেছিল। ওর চওড়া চোয়াল, ছোট ছোট করে ছাঁটা খেলোয়াড়দের মতো চুল, উদ্ধত চিবুক, বুক-খোলা গেঞ্জির মধ্যে দিয়ে দেখা-যাওয়া চওড়া বুকের একরাশ কোঁকড়া চুল—এ-সব মহুয়া একনিমেষে দেখে নিল। দেখে ভালো লাগল। শুধু ভালোই নয়, কেমন যেন গা শিরশির করে উঠল ওর। সে অনুভূতিটা যে কেমন তা শুধু মেয়েরাই জানে; বোঝে। এই শিরশিরানি-তোলা একান্ত মেয়েলি অনুভূতি কোনো পুরুষের পক্ষে কখনও বোঝা সম্ভব নয়।

অনেকক্ষণ পরে যেন ঘোর কাটার পর মহুয়া বলল, নমস্কার। তারপর একটু দ্বিধাগ্রস্ত গলায় বলল, আমার নাম মহুয়া।

সুখন অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল। কী বলবে ভেবে পেল না। সুখন জীবনে এই প্রথমবার অপ্রতিভ বোধ করল। ও যে এমন ক্যাবলা হয়ে যেতে পারে তা কখনও জানেনি আগে; বিশ্বাস করেনি।

সুখন নীচু গলায় প্রায় স্বগতোক্তির মতোই বলল, এখন তো বসন্তের দিন। এই-ই তো সময় মহুয়ার। গন্ধ পাচ্ছেন না বাতাসে?

আপনি?

মহুয়া জবাব না দিয়ে উলটে প্রশ্ন করে দু'চোখ তুলে পূর্ণদৃষ্টিতে সুখনের দিকে তাকাল।

সুখন বলল, পাচ্ছি। সবসময়ই পাই। মহুয়ার আমি ভীষণ ভক্ত—মহুয়া ফুলের।

আর মহুয়ার মদের না?—বলেই মহুয়া হেসে উঠল।

সুখনও হাসল।

সুখনের হাসি মিলানোর আগেই মহুয়া বলল, আমি কিন্তু মদও নই, ফুলও নই। শুধুই মহুয়া।

সুখন পাশ ফিরে একটা রেঞ্জ হাতে নিয়ে বলল, মদ খাই না তা নয়; আমরা মিস্ত্রি মজুর লোক। তবে মদের চেয়ে ফুলই ভালো লাগে আমার।

পরক্ষণেই রক্ষীহীন একজন অপরিচিতা সুন্দরী ভদ্রমহিলার সঙ্গে মোটর মেকানিকের এতখানি অন্তরঙ্গতা ঠিক হচ্ছে কী না ভেবে নিয়েই সুখন গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল, আপনি রাগ করলেন তো? আমি—কোথায় কী কথা বলতে হয় ঠিক জানি না। দোষ করে থাকলে মাফ করে দেবেন।

মহুয়া কথার জবাব না দিয়ে বারান্দায় একটা কাঠের বাক্সে অনেকগুলো গোল গোল চকচকে বল-বেয়ারিং পড়েছিল, সেদিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'আমি একটা নিতে পারি'?

নিন না। কিন্তু কী করবেন? অবাক হয়ে শুধোল সুখন।

কিছু না। এমনিই। স্টিলের তৈরি না? দেখতে একেবারে মার্বেলের মতো। আচ্ছা, আমি কি দুটো নিতে পারি?

নিন না, আপনার যতগুলো ইচ্ছে নিন। বলেই হেসে ফেলল সুখন।

মহুয়া দুটো গোলাকৃতি বল তুলতে তুলতে বলল, আপনি খুব দিলদরাজ লোক তো!

কথার জবাব দিল না সুখন।

সুখন মনে মনে একটু ভয় পেতে আরম্ভ করেছে।

কুমার ভদ্রলোককে ওর মোটেই ভালো লাগেনি। টিপিক্যাল শহুরে, চালিয়াৎ। ক্লাশ-কনশাস্। এ-লোকগুলোই দেশের অন্য ভালো লোকগুলোরও সর্বনাশ করে দিল। কুমার কতখানি উদার সে সম্বন্ধে সুখনের সন্দেহ ছিল। মহুয়াকে সুখনের সঙ্গে একা দেখে যদি সুখনকে কিছু বলে সে আকার-ইঙ্গিতেও, তাহলে সুখন কিন্তু ঘুষি-টুষি মেরে দেবে। যেদিন ভদ্রলোক ছিল, ছিল। আজ আর সে ভদ্রলোক নেই। ভদ্রলোকদের কারও কাছেই সে ভদ্রলোকি পায় না; হয়তো আজ চায়ও না। তাই ছোটলোকি কায়দায় কথায় কথায় ঘুষি চালাতেও ওর আজকাল একটুও দেরি হয় না। সহ্যশক্তি পরিণামজ্ঞান, সভ্যতা-জ্ঞান ওর আর নেই বললেই চলে। ও নিজেকে আর ভদ্রলোক ভাবে না। ভদ্রলোক হবার ইচ্ছাও আর ওর নেই।

সুখন এড়িয়ে গিয়ে বলল, আমি হলাম একজন সামান্য মিস্ত্রি। দরাজ দিল থাকলেও বা তা দেখাবার সামর্থ্য কোথায়?

তারপর কথা ঘোরাবার জন্যে বলল, আপনি চা-টা খেয়েছেন?

খেয়েছি।—মহুয়া বলল।

তারপর বলল, আপনি চা খাবেন না? সকালে কি চা খেয়েছেন? আমি নিয়ে আসব? শুনলাম, চা আর জর্দা-পানই নাকি আপনার প্রধান খাদ্য-পানীয়?

সুখন অবাক হল; বলল, কে বলল? মংলু বুঝি?

বললেন না তো চা খাবেন কিনা? মহুয়া বলল।

না, না, থাক আপনি মাথা ঘামাবেন না। একটু পরে মংলুই নিয়ে আসবে। ও জানে। একবার তো খেয়েছি।

আহা, আজ না হয় আমিই আনলাম? আমাদের গাড়ি সারাচ্ছেন এত কষ্ট করে গালে কালি লাগিয়ে—আমি...।

ওকে থামিয়ে গিয়ে সুখন বলল, কষ্ট কী! এ তো আমার কাজ। এই তো রুজি। কাজ হয়ে গেলে টাকা দেবেন না বুঝি? টাকাও দেবেন—আবার এত ভালো ব্যবহারও করবেন, এটা ঠিক নিয়ম হচ্ছে না।

মহুয়া বলল, ওসব কথা আমার সঙ্গে নয়। এটা কুমারবাবুর গাড়ি। এ ব্যাপারটা তাঁর। আমি জাস্ট্ প্যাসেঞ্জার।

একটু থেমে মহুয়া আবার বলল, কি? খাবেন কিনা বলুন? নাকি আমার হাতে খাবেন না? আমি কিন্তু ব্রাহ্মণের মেয়ে। বাবার পদবি যখন সান্ন্যাল! বোঝা উচিত ছিল!

সর্বনাশ করেছে। আপনারা বারেন্দ্র নাকি? আমার তো খেয়ালই হয়নি! বলেই হেসে ফেলল সুখন।

মহুয়াও হেসে উঠল হোঃ হোঃ হোঃ করে। বলল, 'আমাদের এত গুণ যে পুরো বাংলাদেশের লোক আমাদের এঁটে উঠতে পারল না বলেই মেনেও নিতে পারল না—তাই-ই তো সকলে পিছনে লাগে।'

শুধু গুণ কেন? রূপও আছে।—সুখন বলল।

কথাটা বলেই সুখন মুখ নামিয়ে নিল। নিজেই লজ্জা পেল বলে ফেলে।

মহুয়াও উচ্ছলতার মধ্যে ভাসতে ভাসতে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। তারপর চটির মধ্যে ডান পায়ের বুড়ো আঙুল ঘষতে ঘষতে বলল, আহা! কী রূপ!

নিমগাছের মগডালে হঠাৎই কাকেদের মধ্যে ঝগড়া লেগে গেল। ওরা উড়ে-উড়ে ঘুরে-ঘুরে, কা-খ্বা-কা-খ্বা-খ্বা-কা করে ভোরের সমস্ত শান্তি, নির্লিপ্তি, সমস্ত আমেজটুকু নষ্ট করে দিল।

মহুয়া আর সুখন দুজনেই একই সঙ্গে নিমগাছের দিকে তাকাল। দেখল একটা ছিপছিপে মেয়ে-কাককে নিয়ে দুটো কর্কশ পুরুষ কাকের মধ্যে ভীষণ লড়াই বেঁধেছে। আর সমবেত কাকমণ্ডলী দু' দলে ভাগ হয়ে গিয়ে দুই লড়িয়েকে চিৎকার করে মদত দিচ্ছে।

সুখন একটা পাথর তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিল উপরে। মুহূর্তের মধ্যে সব কাক নিমগাছ ছেড়ে উড়ে চলে গেল। কিন্তু রয়ে গেল শুধু সেই মেয়ে-কাকটা। ও নড়ল না। ডালে বসে মসৃণ ছাই-ছাই গ্রীবা বেঁকিয়ে লাল পুঁতির মতো চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একবার এ-কোটরে আরেকবার ও-কোটরে এসে কত কী ভাবতে লাগল।

কিছুক্ষণ উপরে তাকিয়ে থেকে সুখন স্বগতোক্তির মতো বলল, এবার আপনি বাড়ি যান। মিস্ত্রি-টিস্ত্রিরা এক্ষুনি এসে পড়বে। চিৎকার, চেঁচামেচি, আওয়াজ, গালিগালাজ—এর মধ্যে থাকতে নেই। গিয়ে ভালো করে চান-টান করে নাস্তা করুন। বেলা হলে কুয়োর জল গরম হয়ে যাবে। মংলুকে বলবেন আরও জল লাগলে কুয়ো থেকে বাথরুমে এনে দেবে।

মহুয়া কপট রাগের গলায় বলল, আপনি তাহলে আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন?

সুখন বলল, আপনি আমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে গল্প করলে গাড়ি সারাতেই আমার দেরি হবে। কারিগরিটা এখনও রপ্ত হয়নি যে।

তারপর একটু থেমে বলল, আপনারা তো বেত্‌লা যাবেন; তাই না? বেত্‌লা যাবার জন্যেই তো কলকাতা থেকে বেরিয়েছেন। এইখানে দেরি ও কষ্ট করবার জন্যে তো আসেননি। প্লিজ যান। আরাম করুন গিয়ে।

ফিরে আসতে আসতে ও মনে মনে বলছিল যে, এত তাড়া কেন তোমার আমাকে তাড়াবার? চলে তো আমরা যাবই। থাকার জন্যে ত' আসিনি। তবু, গাড়িটা এক্ষুনি না-সারালেই কী নয়? গাড়ি সারাতে সময়ও তো লাগতে পারত।

মনের মধ্যে একটা চাপা কষ্ট, একটা প্রচ্ছন্ন অভিমান, অস্বস্তিকর এক অপমানবোধ নিয়ে মহুয়া ধীর পায়ে ফিরে এল ডেরায়। ওরা তখনও ঘুমোচ্ছিলেন।

ডেরাটা চুপচাপ। মংলু বারান্দায় বসে তরকারি কাটছিল।

বারান্দায় একটা ঠান্ডা ভাব। ঝির্‌ঝির্ করে প্রভাতি হাওয়া বইছে।

মহুয়াকে আসতে দেখে হঠাৎ মংলু বলল, দিদিমণি, ওস্তাদের ঘর দেখবে?

কী হবে?

উদাসীনতার গলায় বলল মহুয়া। মনে মনে বলল, লাভ কী অপরিচিত লোকের ঘর দেখে? পরক্ষণেই পরম অনিচ্ছা-সহকারে বলল, আচ্ছা চলো দেখি।

কিন্তু সুখন মিস্ত্রির ঘরে মংলুর সঙ্গে ঢুকেই মহুয়া অবাক হয়ে গেল।

বইয়ে-বইয়ে ভরা ঘরটা। সব জায়গায় বই। ইংরিজি বাংলা মেশানো। থ্রিলার-টিলার নয়, রীতিমতো সাহিত্যের বই। বিছানার মাথার কাছে বই, পায়ের কাছে বই, কোল-বালিশ করে রাখার মতো করে রাখা, দু' পাশেই বই—জানালার তাক, মেঝে, কিছুই প্রায় বাকি নেই।

চৌপাই-এর মাথার কাছে একটা টুল। টুলের উপর একটা দিশি মদের খালি বোতলে খাবার জল—আধা ভর্তি। তার পাশে একটা ডট্ পেন এবং একটা মোটা খাতা।

ঘরে আর কিছুই নেই। আয়না নেই, ড্রেসিং টেবল্ নেই, আলমারি নেই। কাঠের খুঁটিতে পেরেক মেরে তাতে ঝোলানো আছে একটা নীলরঙা তালি-মারা কিন্তু পরিষ্কার জিনের প্যান্ট, হাতাওয়ালা টেনিস খেলার গেঞ্জির মতো গেঞ্জি। পায়জামা, দেহাতি খদ্দরের মোটা পাঞ্জাবি, একজোড়া কাবলি জুতো ঘরের কোণায়। ব্যস-স্, আর কিছুই না।

মংলু ঘর ছেড়ে চলে যেতেই মহুয়া টুলটার দিকে এগিয়ে গেল। লণ্ঠনটা তখনও জ্বলছিল। পলতেটা কমিয়ে, নিবিয়ে দিল সেটাকে। তারপর অন্যমনস্কভাবে টুলের উপর রাখা খাতাটা তুলে নিল।

সেই লেখার খাতার প্রথম পাতাতে সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা আছে সুখরঞ্জন বসু, ফুলটুলিয়া, গুঞ্জা, জেলা—পালামৌ। তারপর লেখা আছে, "রোজকার কথা—হিজিবিজি"।

প্রথম পাতা খুলতেই অবাক হয়ে গেল মহুয়া। ও নিজে সাহিত্য ব্যাপারটা ভালোবেসেই পড়েছে। কিছু যা-হয় একটা পড়তে হয় বলে পড়েনি। তাই ডাইরিগোছের খাতাটা দেখে ওর ঔৎসুক্যটা স্বাভাবিক ছিল। এই ঘরে, এমন হাতের লেখায় এমন ডাইরি দেখবে, ও আশা করেনি। ও ভাবল যে, তাহলে ও ভুল করেনি। কাল রাতের মুখটি, সেই গভীর গলার স্বরের মানুষটি, যে তার সমস্ত সত্তাকে শুধু চোখ-চাওয়াতেই, শুধু কণ্ঠস্বরেই অমন করে নাড়া দিয়েছে— তার মধ্যে কিছু একটা অসাধারণত্ব নিশ্চয়ই আছে। মিস্ত্রির পরিচয়টা যেন তাকে মানায় না।

ফুলটুলিয়া

আজ আমার জন্মদিন। জন্মদিন হয় বড়-লোকদের, যাদের পয়সা আছে। আর সেই সব বড়-লোকদের, যাদের যশ আছে। আমি দুখন মিস্ত্রির ভাই সুখন মিস্ত্রি—আমার আবার জন্মদিন!

যখন ছোট ছিলাম, মনে আছে, ছোট পিসিমা আসতেন কোডারমা থেকে ওই সময়। আমার জন্মদিন উপলক্ষে নয়—আসতেন ঠাকুরমাকে দেখতে। প্রতি বছর দু'টাকা করে হাতে ধরে দিতেন। বকশিবাজারে গিয়ে মাধুবাবুর বইয়ের দোকানে ঢুকে একটা বই কিনতাম—নিজের ছেলেমানুষি কাঁচা হাতের লেখায় লিখতাম—"আমার জন্মদিনে আমাকে দিলাম।"—

ইতি সুখরঞ্জন।

কত কী ভেবেছিলাম। ছোটবেলায় কত কী স্বপ্ন দেখেছিলাম। এই করব, সেই করব; এই হবো সেই হবো।

আর কী হলাম! কী হলাম; মানে মোটর মেকানিক হয়েছি বলে কোনো দুঃখ নেই। আমি কারও কাছে হাত পেতে খাই না, ভিক্ষা করি না। কারও দয়ার অন্ন নিই না—ভালো খাই, মন্দ খাই—খেটে খাই। ঘামের ভাত খাই এতে লজ্জা নেই। কে কী করে সেটা অবান্তর। কোনো কিছু করার মধ্যেই কোনো গ্লানি নেই—গ্লানিটা বরং কিছুই না-করার মধ্যে। ছোটলোকির কাজ না করে যারা ভদ্রলোকি কেতায় হাত পাতে, পরের ঘাড়ে স্বর্ণলতার মতো ঝুলে থাকে—তারা মানুষ নয়। সে বাবদে আমি মানুষ। এ জীবনে কারও বোঝা হইনি আমি। কারও বোঝাও নিইনি অবশ্য।—এক

বউদি আর শান্তর দায়িত্ব ছাড়া। সে দায়িত্বকে আমি বোঝা বলে মনে করি না। দাদা মারা গেলেন। এই মিস্ত্রিগিরি করেই আমাকে কোনোভাবে ঋণ শোধের সুযোগ না দিয়েই নিজের জীবনটা প্রায় অবহেলায় নষ্ট করেই তো দাদা মারা গেলেন!

আজ আমার একটাই আনন্দ। দাদা হয়তো বুঝতে পারেন, জানতে পারেন যে, ভাইটা তার অমানুষ হয়নি। বাংলায় এম-এ পাস করার পর একটুও দ্বিধা না করে দাদার হঠাৎ-মৃত্যুর পর দাদার কারখানার ভার সহজে গ্রহণ করেছিলাম। মনে হয় যে, দাদার আত্মা এ কথা জেনে শান্তি পান।

দুঃখটা এই কারণে যে, চিরদিন এই কারখানা আঁকড়েই পড়ে থাকতে হবে—শান্তটা যতদিন না নিজের পায়ে দাঁড়ায়। সে তো অনেক বছর। বউদিকে যতদিন না তাঁর স্বাবলম্বনের মতো কিছু করে দিতে পারি—ততদিন আমার ছুটি নেই। পড়াশুনা করতে পারি না, লিখতে পারি না এক লাইন। গাড়ির মিস্ত্রি হয়ে কী কখনও লেখা যায়? দুঃখ এইটুকুই রয়ে গেল এ-জীবনে। এ জীবনে আমাকে অভ্যস্ত হতে হবে কখনও ভাবিনি।

সুখন মিস্ত্রির জীবনে জন্মদিনের কোনো দাম নেই। তার জন্মদিন কেউ মনে রাখেনি কখনও; সে নিজেও না। যার জন্ম একটা জৈবিক বা যৌন দুর্ঘটনা—তার জন্মদিন আবার পালন করার কি? তাছাড়া পালন করেই বা কে? নিমগাছের ঝরা পাতার মতো প্রতি বছর এই উত্তর-তিরিশের গাছ থেকে অনেক পাতা ঝরে যায়। এখানে শুধুই লাল-টাগরা দেখানো ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত কাকেদের বাস—ঝরা পাতার দীর্ঘশ্বাস। ঘুমভাঙা—কাজ করা—ঘুম পাওয়া—ঘুম ভাঙা। এ-জীবনে কখনও কোনো কোকিল আসেনি, আসবেও না। যতদিন না সব পাতা ঝরে, সব সাধ বাসি ফুলের মালার মতো না শুকোয়, ততদিন শুধুই প্রশ্বাস নেওয়া ও নিশ্বাস ফেলা! সুখন মিস্ত্রির সব জন্মদিনের গন্তব্যই এক। তারা একই দিকে গড়িয়ে যাবে—তার মৃত্যুদিনে।

মহুয়া অনেকক্ষণ চুপ করে সেই ঘরে দাঁড়িয়ে রইল ডাইরিটা হাতে করে। এই ফাটা-ফুটো গ্যারেজ-বাড়িতে যে তার জন্যে এতবড় একটা বিস্ময় লুকোনো ছিল, তা ও স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি।

সেই স্বল্প-পরিচিত পুরুষের শোবার ঘরে দাঁড়িয়ে তার বুকের মধ্যে ধড়াস্-ধড়াস্ করতে লাগল। সে কী আনন্দে, বিস্ময়ে, ভয়ে না বেদনায় তা বোঝার মতো ক্ষমতা মহুয়ার ছিল না।

তাড়াতাড়ি কাঁপা-কাঁপা হাতে ও পাতা উলটে যেতে লাগল—ওর মন যেন কী বলতে লাগল ওকে—ওকে যেন কী এক নীরব ইঙ্গিত দিতে থাকল।

দ্রুত মহুয়ার সুন্দর আঙুলগুলি এসে থেমে গেল ডাইরির একেবারে শেষে।

মহুয়া উত্তেজনায় স্তব্ধ হয়ে গেল। ওর হৃৎপিণ্ড যেন বন্ধ হয়ে গেল।

এত সৌভাগ্যও কী সুখন মিস্ত্রির ছিল?

যাকে সে জীবনে চোখে দেখেনি অথচ আকৈশোর স্বপ্নে দেখেছিল, যার সঙ্গে আলাপ হয়নি অথচ মনে মনে যে ভীষণ আপন ছিল, যে পৃথিবীর সব সৌন্দর্যের সংজ্ঞা, যে সুরুচির শান্ত স্নিগ্ধ প্রতিমূর্তি, যে নারী-সুলভতার সেই চিরন্তন সান্ত্বনাদাত্রী গাছের নিবিড় নরম নিভৃত ছায়া—সে কিনা এমন করে ঝড়ের ফুলের মতো উড়ে এল! উড়ে এল সুখেন মিস্ত্রির ভাঙা ঘরে!

এল যদিও, কিন্তু ক্ষণতরে এল; চলেও যাবে ক্ষণপরে।

হায় রে সুখন! তোর সাধ্যি কী একে আদর করিস; একে যত্ন করিস। এ কোকিল সুখন মিস্ত্রির দাঁড়ে বসার জন্যে জন্মায়নি। দু' দণ্ডের জন্যেও না। তোর জন্যে নিমগাছভরা দাঁড়কাক। দিনভর, জীবনভর কা-খ্ব-খ্বা-কা।

আমি জানি, তুমি ক্ষণিকের অতিথি। তুমি তোমার বড়লোক প্লে-বয় বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে, বয়স্ক বাবার সঙ্গে, ক'দিনের জন্যে মজা করতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছ। গাড়ি খারাপ হওয়াতে, এই মোটর মেকানিকের ডেরায় এসে রাত কাটালে—কত কষ্ট হল তোমার। গাড়ি সারা হলে কতকগুলো টাকা মিস্ত্রির মুখে ছুঁড়ে দিয়ে তোমরা চলে যাবে।

জানি, সব জানি। তবু সুখন, বড় কষ্ট পেলি রে সুখন, বড় কষ্ট পাবি। পৃথিবীটা এ-রকমই। বাঘবন্দির ঘর। সে ঘরে সুখন শুধুই মোটর মিস্ত্রি। সুখনের মনের ঘরে, কী টালির ঘরে—কোনো ঘরেই জায়গা নেই মহুয়ার।

তোমাকে জানাবার সুযোগও আসবে না কখনও যে, তোমাকে আমি কী চোখে দেখেছি। তাছাড়া, জানিয়ে লাভই বা কী? নিজেকে ছোট করা, অপমানিত করা ছাড়া আর তো কিছুই পাওনা নেই আমার তোমার কাছে!

তুমি যে মহুয়া! আর আমি যে হতভাগা সুখন।

তবু, বাঃ মহুয়া! তুমি কী সুন্দর মহুয়া। তুমি কী সুন্দর! তোমার মতো এত সুন্দর আর কিছুই আমি এ-জীবনে দেখিনি। কখনও বুঝি দেখবও না। দুঃখ এইটুকুই যে, তোমাকে কখনও আপন করে পাওয়া হবে না।

আরাম করে পাশের ঘরে ঘুমোও। তোমার একটু কষ্ট হবে। একটা রাত, একটা বেলা। বিশ্বাস করো—এ কথাটা—আজ আমার বড় আনন্দ। কত যে আনন্দ, তা তুমি কখনও জানতে পাবে না। ঘুমিয়ে থাকো। সোনা-মেয়ে।

ডাইরিটা এবার নামিয়ে রাখতে পারলে বাঁচে মহুয়া।

ওর সারা শরীর যেন অবশ হয়ে এল। বুকটা উঠতে-নামতে লাগল। বারান্দায় বেরিয়ে এসে মহুয়া ডাকল, মংলু, আমাকে একটু জল খাওয়াও না। শিগগিরি।

বড় পিপাসা পেয়েছে মহুয়ার। এত পিপাসার্ত ওর সাতাশ বছরের জীবনে আর কখনোই বোধ করেনি ও আগে।

মংলু জল এনে দিল। জল খেয়ে মহুয়া আবারও বাইরে গিয়ে কারখানার পাশের গাছগাছালিভরা মাঠে পায়চারি করে বেড়াতে লাগল।

মাঠটা থেকে কাজে-ডুবে-থাকা সুখনকে দেখতে পাচ্ছিল মহুয়া। পুরুষ মানুষদের কর্মরত অবস্থায় যতখানি সুন্দর দেখায়, তত সুন্দর বোধহয় আর কখনোই দেখায় না—মনে হল মহুয়ার।

পায়চারি করতে করতে মনোযোগের সঙ্গে কাজ করতে থাকা সুখনের দিকে আড় চোখে চেয়ে মহুয়ার হঠাৎ মনে হল, কাউকেই এমন চুরি করে দেখেনি ও এর আগে। কাউকে শুধু চোখের দেখা দেখেও যে এত সুখ, তা ও কোনোদিনও জানত না।

আশ্চর্য! মহুয়া ভাবল, এখনও ও কতকিছুই জানে না; বোঝে না। কতরকম অননুভূত অনুভূতিই না আছে! অথচ কাল এখানে আসার আগে অবধিও ও দুর্মরভাবে বিশ্বাস করত যে ও নিজে মোটামুটি

৩

সান্যাল সাহেব জেগেছিলেন একটু আগে। কুমার তখনও অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

বালিশের তলা থেকে বের করে হাতঘড়িটা দেখলেন, সাড়ে আটটা বেজে গেছে। লজ্জিত

হলেন তিনি। পরের বাড়িতে এরকম যখন-খুশি ওঠা, যখন-খুশি খাওয়া যায় না। ধড়মড়িয়ে চৌপায়াতে উঠে বসলেন।

ডাকলেন, কুমার, ও কুমার!

অনেকক্ষণ ডাকার পর কুমার সাড়া দিল।

কুমার উঠলে বাইরে এলেন দুজনে। এসে মুখ-হাত ধুয়ে বারান্দায় বসলেন মংলুর দেওয়া চা নিয়ে।

দূরে মেঘ-মেঘ পাহাড় দেখা যাচ্ছে। পাহাড়ের পর পাহাড়। কাছেপিঠেই টিলা আছে অনেক। ঝাটি জঙ্গল; পিটিসের ঝোপ। মাঝে মাঝেই ভর্‌র-র্‌ আওয়াজ করে ছাতারে আর দু'একটা তিতির ওড়াউড়ি করছে। দূর থেকে কালি-তিতির ডাকছে তুরর্‌র্‌-তিতি-তিতি-তুরর্‌র্‌। সান্যাল সাহেব সকালের আলোয় চারদিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলেন যে, বড় বড় গাছের মধ্যে বেশিই শাল। সাদা সাদা ফুল ধরেছে তাতে থোকা-থোকা। বারান্দায় বসে সামনে প্রায় আধ মাইল খোয়াইয়ে-ভরা লালমাটি, লালফুলে-ছাওয়া টাঁড় দেখা যাচ্ছে। তারপর পাহাড়।

কুমার বলল, বি-উটিফুল কান্ট্রি। কিন্তু ওই লাল লাল ফুলগুলো কী সান্যাল সাহেব? চতুর্দিকে কার্ল মার্কস-এর বাণী ছড়াচ্ছে?

সান্যাল সাহেবের মুখে মৃদু হাসি ফুটল। বললেন, তোমরা সব শহুরে ছেলে। মাটির সঙ্গে তো যোগ নেই। এসব জানবে কী করে? আমার ছোটবেলা কেটেছে দেওঘরে, বুঝলে? তখন দেওঘর একটা ছোট্ট শান্ত জায়গা ছিল। ছোটবেলার কথা বড় মনে পড়ে।

লাল ফুলগুলো কী?—অসহিষ্ণু গলায় বলল কুমার।

মনে মনে বলল, বুড়োগুলোর এই দোষ। কথায় কথায় এমন রেমিনিসেন্ট মুডে চলে যান যে, কথা বলাই মুশকিল। শুধোলাম লাল ফুল, এনে ফেললেন ছোটবেলা; দেওঘর। সময়ের যেন মা-বাবা নেই।

সান্যাল সাহেব বললেন, পলাশ, শিমুল, অশোক সবের রঙই লাল। তবে যেগুলো দেখছ, এগুলোর বেশিরভাগই পলাশ। পলাশ জংলি গাছ—বিনা যত্নে বিনা আড়ম্বরে জঙ্গলে পথে-ঘাটে সব জায়গায় ওরা বেড়ে ওঠে।

এমন সময় মহুয়াকে আসতে দেখা গেল।

কুমার লক্ষ করল মহুয়ার চোখে-মুখে একটা খুশি উপছে পড়ছে। অথচ ও উলটোটাই হলে আনন্দিত হত। কোথায় ওরা এতক্ষণে বেত্‌লাতে ডানলোপিলো সাজানো গিজার-লাগানো ওয়েল-ফার্নিশড ঘরের লাগোয়া বারান্দায় বসে ছিমছাম ট্রে-তে বসানো টি-পট থেকে ঢেলে চা খেতে-খেতে হরিণ দেখত, তা নয়—এই টালির ছাদের নীচে, ছারপোকা-ভরা মোড়ায় বসে, কেলে-কুৎসিত কাচের গেলাসে বিচ্ছিরি চা খাচ্ছে। মহুয়া যে রকম ফাস্‌সী মেয়ে,—ফাস্‌সী বলেই তো জানে কুমার; তাতে এইরকম পরিবেশে তার খুশি হবার তো কোনোই কারণ নেই।

কুমার মনে মনে বলল, ব্যাপারটা একটু ইনভেস্টিগেট করতে হচ্ছে। মহুয়ার এত খুশি, খুশ্‌বু; হঠাৎ। কোত্থেকে?

মহুয়া সিঁড়ি অবধি আসতেই সান্যাল সাহেব শুধোলেন, কোথায় গেছিলি মা?

কারখানা ঘুরে এলাম। গাড়ির কাজ হচ্ছে। উনি বললেন, বিকেলের আগে হবে না।

অ্যাই মরেছে! কোথায় ভাবলাম বেত্‌লায় বসে চান-টান করে একটু বিয়ার খাব। দুস্‌স্‌।—কুমার বলল।

মহুয়া কথা ঘুরিয়ে সান্যাল সাহেবকে উদ্দেশ্য করে বলল, এবার জলখাবার খাবে তো? মংলু একা পারবে না। আমি গিয়ে একটু সাহায্য করি।

কুমার কথা কেড়ে নিয়ে বলল, আরে বোসো বোসো। কী আমার ইংলিশ ব্রেকফাস্ট বানাচ্ছে যে পারবে না ছোকরা? যা পিণ্ডি বানিয়ে দেবে তাই-ই খাব।

তারপরই বলল, বুঝলেন সান্যাল সাহেব, যেবার কন্টিনেন্টে যাই—কী কেলেঙ্কারি! ব্রেকফাস্ট মানে কী জানেন? ব্রেড-রোলস্ আর কফি অথবা চা। টেবিলের উপর মাখন আর জ্যাম বা মার্মালেড রাখা আছে। লাগিয়ে খাও। আর চা বা কফি সঙ্গে। সত্যি! ব্রেকফাস্ট খেতে জানে ইংরেজরা।

স্কচরা আরও ভালো জানে, সান্যাল সাহেব বললেন।

আপনি কী ছিলেন নাকি ওদিকে?

খুব অবাক হয়ে গলা নামিয়ে কুমার শুধোল। ভাবল, অফিসে তো কখনও শোনেনি যে এই বৃদ্ধ ভাম বাইরে ছিলেন কখনও।

সান্যাল সাহেব হাসলেন। বললেন, পাঁচ বছর ছিলাম ইংল্যান্ডে, ছ'বছর সুইট্জারল্যান্ডে। তুমি তখন পাড়ার গলিতে গুলি অথবা ড্যাংগুলি খেলছ।

কুমার মোড়া ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠল। বলল, ওঃ বয়! আপনি এত বছর বিদেশে থেকে এসেও এখনও লুঙি পরেন?

সান্যাল সাহেব হেসে উঠলেন। বললেন, তাতে কী হয়েছে? লুঙি পরতে ভালো লাগে, তাই-ই পরি। এটা তো ইন্ডিভিজুয়াল রুচির ব্যাপার। আমি লুঙি পরতে ভালোবাসি তাই পরি, তুমি পায়জামা পরতে ভালোবাসো তাই পরো, কেউ-কেউ তো বাড়িতে ধুতিও পরেন। লুঙি পরার সঙ্গে বিদেশে থাকার কী সম্পর্ক?

না, মানে কেমন প্রিমিটিভ-প্রিমিটিভ লাগে—কুমার বলল।

সান্যাল সাহেব পাইপের পোড়া তামাক ঝেড়ে ফেলে বললেন, আমরা কী সত্যিই প্রিমিটিভ নই? আমি তুমি এ দেশের ক'জন? ক' পার্সেন্ট? আমরা দেশের কেউই নই, কিছুই নই। শহর ছেড়ে গ্রামে এসেছ, চোখ-কান খুলে দেখো, শোনো,—অনেক কিছু জানবে, শুনবে।

কুমার চুপ করে থাকল। ওর চোখে অসহিষ্ণুতার ছাপ পড়ল। মনে মনে বলল, বুড়োগুলোকে নিয়ে এই বিপদ। কথায়-কথায় এত জ্ঞান দেয় না! ভাবখানা যেন, জ্ঞান দেওয়ার টাইম চলে যাচ্ছে—এইবেলা না দিলে কখন কে ফুটে যায় কে জানে!

সান্যাল সাহেব হঠাৎই শুধোলেন, তুমি কতদিন বিদেশে ছিলে?

কুমার অপ্রতিভ হল। বলল, সবসুদ্ধ বারো দিন।

তারপর সুবোধ্য কারণে কুমার অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল।

একটু পরে মংলুকে সঙ্গে করে মহুয়া জলখাবার নিয়ে এল। মেটে-চচ্চড়ি, ওমলেট, আলু-কুমড়ো-পেঁয়াজ-কাঁচা লংকা দিয়ে একটা গা-মাখা তরকারি আর গরম-গরম পরোটা। সঙ্গে প্যাঁড়া।

সান্যাল সাহেব মংলুর দিকে সপ্রশংস চোখে বললেন, করেছ কী মংলু? এ যে বেজায় আয়োজন?

মংলু খুশি-খুশি গলায় বলল, ওস্তাদ বলেছে আপনাদের কোনো কষ্ট হলে আমার চাকরি থাকবে না। তারপরই এক নিশ্বাসে বলল, মেটে-চচ্চড়ি দিদিমণির করা।

কুমার বলল, একজন মোটর মেকানিকের ঘাড়ে এত অত্যাচার করাটা ঠিক হচ্ছে না। দিস ইজ আন্ফেয়ার। যাক্গে, যাওয়ার সময় মেরামতের বিল ছাড়াও ভালো মতো টিপস্ দিয়ে যাব। নাথিং ইজ অ্যাজ এলোকোয়েন্ট অ্যাজ মানি। টিপস্ দিয়ে খুশি করে দেব সুখন মিস্ত্রিকে।

কুমারের কথাটা শেষ হতে না হতেই সুখন এসে দাঁড়াল সিঁড়ির কাছে, প্রায় নিঃশব্দ পায়ে। মহুয়া পিছন ফিরে ছিল—দেখেনি।

হঠাৎ সুখনের গলা পেয়ে ফিরে দাঁড়াল।

সুখন বলল, গাড়ির একটা কাটিং শ্যাফ্‌ট লাগবে। আর যা যা দরকার তার সবই আমার কাছে আছে। ফুয়েল ইনজেক্‌শান পাম্পে গোলমাল আছে। কারবোরেটারে ভীষণ ময়লা জমেছে। এই-ই সব, আমার কাছে নেই। গুঞ্জা বস্তিতে যে দোকান আছে, তাতেও পাওয়া যাবে না। পাওয়া যেতে পারে একমাত্র রাঁচীতে। লোক পাঠিয়ে রাঁচী কিংবা ডালটনগঞ্জ থেকে আনাতে হবে। কিন্তু মুশকিল হয়ে গেছে যে, আজ সকাল থেকে বাস-স্ট্রাইক। কাল মান্দারের কাছে এক বাসের ড্রাইভারকে খুব মারধোর করে লোকেরা—তাই আজ এ-রুটে সকাল থেকে বাস বন্ধ। অথচ ওটা না হলে ও গাড়ির কিছুই করা যাবে না। কলকাতা থেকে বেরুনোর আগে গাড়িটা দেখিয়ে বেরুনো উচিত ছিল। পথের যে-কোনো জায়গাতেই ভেঙে যেতে পারত। গাড়ি হাই-স্পিডে থাকলে সাংঘাতিক অ্যাকসিডেন্টও হতে পারত। এ-রকম অবস্থায় এ-গাড়ি নিয়ে বেরুনোটাই আপনাদের অন্যায় হয়েছে।

কুমারের মুখে পরোটা ছিল। গবগবে গলায় বলল, থামো মিস্ত্রি, থামো। তোমার কাছ থেকে দায়িত্বজ্ঞান শিখতে হবে না আমার। এ-রকম কারখানা রাখো কেন? আমরা এসেছি কাল রাতে, এখন বাজে সকাল ন'টা—এখন বলছ যে, গাড়ি সারানো যাবে না। এতক্ষণ কী ঘাস কাটছিলে? না, নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছিলে?

সান্যাল সাহেব ও মহুয়া একই সঙ্গে কুমারের দিকে চাইলেন।

কুমার কেয়ার না করে বলল, বলো, তোমার কী বক্তব্য আছে? বলো, মিস্ত্রি।

সুখন অবাক চোখে কুমারের দিকে তাকিয়েছিল। ভুরু দুটো কুঁচকে উঠেছিল। অনেকক্ষণ কুমারের দিকে তাকিয়ে থেকে সুখন ধীর গলায় বলল, আমার কিছু বলার নেই।

কুমার বলল, তোমার পক্ষিরাজ গাড়ি নিয়েও তো যেতে পারতে রাঁচী—এতক্ষণে তো পার্টস নিয়ে আসা যেত।

মংলু মধ্যে পড়ে রাগ রাগ গলায় বলল, ও গাড়ি গুঞ্জা বস্তি অবধি যায়—তাও অতি কষ্টে।

সুখন এক ধমক দিয়ে মংলুকে চুপ করিয়ে দিল।

কুমার বলল, গুঞ্জায় তো যাবেই। মদ আনবার জন্য যেতে পারে, আর আমাদের গাড়ির পার্টস আনার জন্যে রাঁচী যাওয়া যায় না?

কুমার আবার বলল, বাস স্ট্রাইক তো ট্যাক্সির বন্দোবস্ত করে মাল আনালে না কেন? আমরা কী ফালতু লোক? কত টাকা চাই তোমার? টাকা নিয়ে যাও যত চাও, কিন্তু গাড়ি তাড়াতাড়ি ঠিক করে দাও।

সুখন শান্ত গলায় বলল, আমি কিন্তু আপনাকে বরাবর আপনি করেই কথা বলছি সম্মানের সঙ্গে।

কুমার বলল, বলবে বইকি। সম্মানের জনকে সম্মান দেবে না! তুমিও কী আমাকে তুমি বলতে চাও নাকি?

সান্যাল সাহেব সুখনের চোখে প্রলয়ের পূর্বাভাস দেখে থাকবেন। তিনি তাড়াতাড়ি করে কুমারকে ধরে টেনে নিয়ে গেলেন ঘরের দিকে।

কুমার ঘরে না গিয়ে, বাইরে বেরিয়ে চলে গেল। বলল, আমি জায়গাটা সার্ভে করে আসছি।

কুমার চলে যেতে সান্যাল সাহেব কুমারের অভদ্র ব্যবহারের পাপক্ষালন করে নরম গলায় বললেন, তার মানে, কাল সকালে লোক পাঠিয়ে বিকেলে নিয়ে আসতে পারবেন তো? এই তো বলতে চাইছেন আপনি? নিয়ে আসার পর কতক্ষণের মধ্যে গাড়ি ঠিক হয়ে যাবে?

মনে হয়, দু-তিন ঘণ্টায়। সুখন বলল।

সুখন মুখ নীচু করে ছিল।

বেশ! বেশ! তাই-ই হবে। আমরা তো আর জলে পড়ে নেই। এমন সুন্দর পরিবেশ, এমন আদরযত্ন: ভালোই তো হল। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যে।

তারপর সুখনের স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনবার জন্যে বললেন, আপনি কী বলেন?

সুখন প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে ঠান্ডা, ভাবাবেগহীন গলায় বলল, তাহলে রাতেই আমার লোককে টাকাটা দিয়ে দেবেন, যাতে সকালের প্রথম বাসেই চলে যেতে পারে।

সান্যাল সাহেব বললেন, রাতে কেন? এক্ষুনি নিয়ে যান। কত টাকা?

সুখন বলল, এখন দেবেন না। নেশাভাঙ করে উড়িয়ে দিতে পারি। আমরা সব ছোটলোক; ভরসা কী? রাতেই দেবেন। তিনশো টাকা।

কথা ক'টি বলেই সুখন ফিরে, কারখানার দিকে পা বাড়াল।

মহুয়া ডাকল। বলল, শুনুন সুখনবাবু।

সুখন থেমে তাকাল।

মহুয়া বলল, আপনি খেয়ে যান। একটা তরকারি আমি নিজে রেঁধেছি।

সুখন হাত তুলে অত্যন্ত ভদ্রভাবে বলল, ধন্যবাদ। অনেকদিন হল আমার সকালে খাওয়ার অভ্যেস চলে গেছে। আপনারা খান। আপনারা খেলেই আমার খাওয়া হবে।

তারপরই বলল, মংলু, এঁদের ভালো করে যত্ন করছিস তো? সকালের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে আমাকে একটু চা দিয়ে যাস কারখানায়।

সুখন চলে যেতে, মহুয়াও ওর নিজের খাবার নিয়ে মংলুর সঙ্গে রান্নাঘরে চলে গেল।

যাবার সময় মুখ নীচু করে সান্যাল সাহেবকে বলে গেল, বাবা তোমার কিছু লাগলে আমাকে ডেকো।

একটু পরই কুমার ফিরে এল। এসেই বলল, একটা ট্র্যাশ্ জায়গা। এমন ব্যাড লাক এবারে—যেমন জায়গা, তেমন মোটর মিস্ত্রি। কাল রাতে এলাম—এখন সকাল ন'টায় বলছেন যে গাড়ির কাটিং শ্যাফট্ ভেঙে গেছে।

সান্যাল সাহেব বললেন, আমরাও ন'টা অবধি ঘুমোচ্ছিলাম। দোষ তো আমাদেরও। তাছাড়া, তাড়া কীসের অত? এই-ই তো বেশ, আস্তে আস্তে যাওয়া—তোমার তো আর কন্‌ফারেন্স নেই বেত্‌লার হাতি কী বাইসনদের সঙ্গে!

পরিবেশটাকে লঘু করবার জন্যে বললেন সান্যাল সাহেব।

কুমার বলল, না, আমার এইরকম পয়েন্টলেস্ ভাবে টাইম ওয়েস্ট করা একেবারেই বরদাস্ত নয়।

সান্যাল সাহেব একটু চুপ করে থেকে বললেন, কুমার, তোমাকে একটা কথা না বলে পারছি না। ভদ্রলোকের সঙ্গে এ-রকম ব্যবহার করলে কেন? মনে হয় উনি লেখাপড়াও জানেন—লেখাপড়া জানুন আর নাই জানুন, নিজে হাতে খেটে খান—সেটাই তো যথেষ্ট সম্মানের বিষয়—তোমার এই ব্যবহারের কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাই না আমি।

কুমার বলল, আই অ্যাম সরি! কিন্তু প্রথম দেখা-থেকেই লোকটাকে আমি সহ্য করতে পারিনি। জিনের প্যান্ট, ফ্রেডপেরি গেঞ্জি, মুখ-চোখের ভাব, তাকাবার কায়দা—লোকটার মধ্যে মডেস্টি বলতে কিছু নেই। এমন একটা ভাব যেন আমাদের সঙ্গে সমান-সমান ও। আই ওয়ান্টেড টু কাট্ হিম ডাউন টু হিজ্ ও-ওন্ সাইজ।

সান্যাল সাহেব অবাক চোখে তাকিয়ে রইলেন কুমারের দিকে।

বললেন, স্ট্রেঞ্জ!

তারপর বললেন, যাই-ই হোক, তোমার ব্যবহারের দায়িত্ব আমাদের উপরও বর্তেছে। কারণ তুমি আমাদের সঙ্গী। আমি তোমাকে প্লেইন্‌লি বলব, তোমার এই নিষ্প্রয়োজনীয় অভদ্রতা আমি পুরোপুরি ডিস-অ্যাপ্রুভ করি। তুমি তাতে যাই-ই মনে করো না কেন।

কুমার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধত গলায় বলল, আমি একাই আমার দোষ-গুণের দায়িত্ব নিতে রাজি। কারও অ্যাপ্রুভাল বা ডিস-অ্যাপ্রুভালের তোয়াক্কা করি না আমি।

সান্যাল সাহেব বললেন, ভালো কথা। জানা রইল আমার।

এর পরেই পরিবেশে একটা ভারী নীরবতা ছড়িয়ে গেল, জেঁকে বসল।

সবার খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে, মহুয়া নিজে হাতে বেশি করে ময়াম দিয়ে চারটে পরোটা ভাজল। তারপর প্লেটে সাজিয়ে নিয়ে, চা করে মংলুর হাতে প্লেটের উপর চা বসিয়ে নিয়ে কারখানার দিকে চলল।

কুমার বারান্দায় বসে সিগারেট খাচ্ছিল। সান্যাল সাহেব বাথরুমে গেছিলেন চান করতে।

কুমার বলল, কোথায় চললে?

কারখানায়।

'কেন?'—বলেই কুমার উঠে দাঁড়াল রাগতভাবে।

মহুয়া বলল, আমাদের হোস্টকে খাওয়াতে।

তারপর দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, এতে আপনার কি কোনো আপত্তি আছে?

কুমার বলল, ঘরে এসো, একটা কথা আছে তোমার সঙ্গে।

এক মিনিট কী ভাবল মহুয়া। তারপরে বলল, আপত্তি আছে তাহলে। কিন্তু কেন? আপত্তি করার কে আপনি? আমার যা খুশি আমি তাই-ই করব। আমি কী আপনার পোষা পুড্‌ল্?

কিন্তু তারপরই বারান্দায় উঠে এসে ঘরে গেল।

কুমার আগেই ঘরে গেছিল। ঘরের এদিকে জানালা ছিল না। দরজার অন্য পাশে মহুয়া গিয়ে পৌঁছতেই কুমার তাকে জোর করে আলিঙ্গনাবদ্ধ করল। আবেগের সঙ্গে বলল, তুমি এরকম করবে নাকি? একটা মিস্ত্রির জন্যে এত দরদ উথলে উঠল কেন? আমি তোমাকে ভালোবাসি মহুয়া—আই মিন ইট্‌....।

মহুয়া ছটফট করে উঠল। চোখে আগুন ঝরিয়ে বলল, সো হোয়াট?

কুমার জোর করে কামড়াবার মতো করে মহুয়ার ঠোঁটে চুমু খেল।

মহুয়া তাকে ধাক্কা দিয়ে চৌপায়ার ওপরে ফেলে দিয়ে গরম নিশ্বাস ফেলে বলল, শুনুন আপনি, ভালোবাসা ভিক্ষা করে পাওয়া যায় না, ভালোবাসার যোগ্য করতে হয় নিজেকে। আই হেট দিস্‌। আই হেট য়্যু।

তারপর বলল, আপনাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি। আপনি এরকম জোর করেছিলেন আমাকে, একবার আমাদের ফ্ল্যাটে। সেদিন আপনাকে কিছু বলিনি। কারণ আপনার সম্বন্ধে আমার তখনও দ্বিধা ছিল। ভেবেছিলাম, আপনাকে কোনোদিন ভালোবাসতেও বা পারি। কিন্তু আজ দ্বিধা নেই আর। আপনার নামের পিছনে অনেক ডিগ্রি, ভালো চাকরি; যাকে তাকে—আপনি অনেক মেয়েকেই পেতে পারেন—যারা আপনার যোগ্য। আমি আপনার যোগ্য নই। আমার পথ ছাড়ুন।

কুমারের উত্তরের প্রত্যাশা না করেই মহুয়া ঝড়ের বেগে বাইরে চলে গেল।

গিয়েই, অত্যন্ত সহজ গলায় হেসে বলল মংলুকে, চলো মংলু। তোমাকে অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখলাম। দাদাবাবু গেঞ্জি খুঁজে পাচ্ছিলেন না; খুঁজে দিয়ে এলাম।

কুমার চৌপাইতে আধ-শোয়া অবস্থায় বসে মহুয়ার কথা শুনল। মহুয়ার অভিনয় করার ক্ষমতা, সহজ হবার ক্ষমতা দেখে অবাক হয়ে গেল। কুমারের পেট তখনও ওঠানামা করছিল উত্তেজনায়। ও মনে মনে বলল, এই মেয়েরা এক অদ্ভুত জাত। এদের কিছুতেই বুঝতে পারল না সে।

সান্যাল সাহেব তোয়ালে জড়িয়ে ঘরে এলেন চান সেরে। বললেন, কী হল তোমার?

কুমার বলল, বুকে ব্যথা করছে—বড় বেশি সিগারেট খাচ্ছি আজকাল।

সান্যাল সাহেব ওর দিকে তাকালেন। অন্য সময় হলে হয়তো কিছু বলতেন, কুমারের ভাষায় 'জ্ঞানও' দিতেন। কিন্তু নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে এখন শুধু বললেন, বেশি সিগারেট খেয়ো না। বলেই, জামাকাপড় পরতে লাগলেন।

কারখানার মধ্যে মংলুকে নিয়ে ঢুকতেই একটা সোরগোল উঠল। নানারকম ধাতব ও উচ্চগ্রামে বাজতে-থাকা আওয়াজগুলো মুহূর্তের মধ্যে থেমে গেল। মিস্ত্রির কাজ থামিয়ে সকলেই মহুয়ার দিকে চেয়ে রইল।

মহুয়াকে চেহারায় সহজেই ফিল্ম আর্টিস্ট বলে ভুল করা যায়। লম্বা, ছিপছিপে। ভারী ভালো ফিগার। অত্যন্ত সুন্দর চোখ, নাক ও মুখ। মাথা ভরা চুল। সরু কপালে মস্ত একটা টিপ। সবচেয়ে বড় কথা, ওর হাঁটা-চলা-কথা বলার মধ্যে এমন এক আড়ম্বরহীন আভিজাত্য ও ব্যক্তিত্ব আছে যে, ওর দিকে চাইলে যে-কোনো উচ্চশিক্ষিত, মার্জিত ও রুচিবান পুরুষেরই চোখ আটকে যায়। আর এই গণ্ডগ্রামের মিস্ত্রিদের কথা তো বলাই বাহুল্য।

সুখন মিস্ত্রি নেই। কোথায় গেছে কাউকে বলে যায়নি। মংলুর সঙ্গে মিস্ত্রিদের যে হিন্দীতে কথাবার্তা হল, তাতে মহুয়া বুঝতে পারল যে, সুখন মিস্ত্রি হলেও সুখনকে অন্য মিস্ত্রিরা অত্যন্ত সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার চোখে দেখে। হয়তো বা ভয়ও করে।

ওরা ফিরে এল। পিছন ফিরতেই কারখানার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মহুয়ার রূপ সম্বন্ধে নানা অশ্লীল মন্তব্য কানে এল মহুয়ার।

মংলু পিছন ফিরেই ওদের ধমক দিল! বলল, ওস্তাদকে বলে দিলে জিভ ছিঁড়ে নেবে ওস্তাদ; তখন মজা বুঝবে।

ওরা সমস্বরে দেহাতি হিন্দিতে বলল, ওস্তাদকে বলিস না। আমরা তো বেয়াদবি করিনি। সৌন্দর্যের প্রশংসা করেছি শুধু।

প্রথমে মিস্ত্রিদের এই অশালীনতা মহুয়ার খুব খারাপ লাগল। তারপরই এক অদ্ভুত ভালোলাগা ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। কুমারের কাছে যে সুখন অপমানিত হয়েছে—সেই অপমানের দুঃখ, মিস্ত্রিদের মুখের বুলিতে নিজে অপমানিত হয়ে ও যেন কিছু পরিমাণে শুধতে পারল। এই শোধের বোধটা বড় সুখের বোধ বলে মনে হল মহুয়ার।

ফেরার পথে মংলুর সঙ্গে ফিস্‌ফিস্ করে কীসব কথা হল মহুয়ার। ওর দুজনে যেন কীসব বুদ্ধি-পরামর্শ করল। ওরা ছাড়া আর কেউই তা জানতে পারল না।

মহুয়া ফিরে এসে চান করতে গেল।

ও ফিরে আসতেই কুমার কারখানায় গিয়ে পৌঁছল। মিস্ত্রিদের দামি সিগারেট খাইয়ে তার গাড়ির অবস্থা ও সুখন মিস্ত্রির স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে যা জানা যায়, জানার চেষ্টা করল। যা জানল কুমার, তা ওর পক্ষে মোটেই সুখকর নয়। তার গাড়ির সম্বন্ধে যা জানল, তা অত্যন্ত খারাপ এবং সুখন সম্বন্ধে যা জানল, তা অত্যন্ত বিরক্তিজনকভাবে ভালো। এ-বাজারে এতগুলো মিস্ত্রি-হেল্পার লোকেদের

হৃদয়ের একচ্ছত্রাধিপতি হওয়ার মতো এমন কী গুণ থাকতে পারে সুখনের তা কুমার ভেবে পেল না।

কারখানার একপাশে নিমগাছের ছায়ায় বসে সিগারেটের পর সিগারেট পুড়িয়ে কুমার অনেক কিছু ভাবতে লাগল।

ওর একটা গুণ আছে—সেটা এই যে, ওর দোষ-গুণ সম্বন্ধে ও সম্পূর্ণ সচেতন। ও যে সুখন মিস্ত্রির সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে সেটা ও জেনেশুনেই করেছে। সুখনকে অপমান করে ওর দারুণ ভালো লেগেছে। ও জানে যে, অন্যায় করেছে ও—কিন্তু করেছে।

ও কাল রাতেই বুঝতে পেরেছিল যে, মহুয়া ও সুখন দুজন দুজনকে দেখে কেমন যেন হয়ে গেছে। ও ঘাস খায় না। ওর বুঝতে ভুল হয়নি যে, এই বিহ্বলতার মানে কী। ও কপালে কোনোদিনও বিশ্বাস করেনি—পুরুষকারে বিশ্বাস করেছে—পুরুষালি জেদে বিশ্বাস করেছে—কিন্তু কপাল বলে যে কিছু আছে, এ-কথা অস্বীকার করার মতো জোর পায় না আজকে, এই মুহূর্তে। কপাল না থাকলে—যে গাড়ি তাকে একদিনও ডোবায়নি গত চার বছরে—সে-গাড়ি এমনভাবে ডোবাবে কেন? আর ডোবাবেই বা যদিও, তাও সুখন মিস্ত্রির গ্যারেজের কাছে? এইসব ঘটনাবলির পিছনে কোনো শালা অদৃশ্য ভগবানের হাত অবশ্যই আছে।

মহুয়ার সঙ্গে এই বাইরে আসার পিছনে সবিশেষ ও গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল কুমারের। পৃথিবীতে সব কাজের পিছনেই একটা 'মোটিভ' থাকে। এত এত পরীক্ষা পাস করে এসে, এত এত বাঘা-বাঘা ইন্টারভ্যু বোর্ডের মেম্বারদের ঘোল খাইয়ে শেষে কিনা একটা মোটর মেকানিকের কাছে হেরে যেতে হবে ওকে! যে কম্‌পিটিটরের হিট-এ ওঠারই কোনো সম্ভাবনা ছিল না, সে কিনা ফাইন্যালে জবরদস্তি করে ঢুকে পড়ে ওকে হারিয়ে দেবে?

অত সহজ নয়।—দাঁতে দাঁত চেপে কুমার বলল।

ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেট ধরে কুমার মনে মনে বলল, ভগবান বা আর যারই হাত থাক—মহুয়াকে ও চায়। ওর এই চাওয়াটা হয়তো ভালোবাসার আদালতের জুরিস প্রুডেন্স জানে না। কিন্তু তবু ওর চাওয়াতে কোনো মেকি নেই। মহুয়াকে ও চেয়েছে এ জীবনে; ও জানে মহুয়াকে ও পাবে। জীবনে যা কিছু চেয়েছে—জেদ ধরে চেয়েছে; অথচ পায়নি এমন দুর্ঘটনা ওর জীবনে কখনও ঘটেনি। যদি ভগবান থেকে থাকে—তবে সেই শালা ভগবানের নামেই ও শপথ করছে যে, মহুয়াকে সে পাবেই—মহুয়াকে জীবনসঙ্গিনী করবে ও। মহুয়াকে সত্যিই কুমার ভালোবাসে। ভালোবাসার সঠিক মানে হয়তো জানে না ও। শুধু জানে, মহুয়াকে দেখলেই কেমন একটা সেন্‌সেশান হয়। মাথার মধ্যে, তলপেটে কী যেন একটা পোকা ওকে কুড়ে কুড়ে নিঃশব্দে খেতে থাকে।

না, না, মহুয়াকে না পেলে ওর চলবে না। সিরিয়াসলি বলছে: হি মাস্ট হ্যাভ হার। বাই হুক্ ওর বাই ক্রুক্।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর একটা ইরিটেটিং আলস্য। কিছুই করার নেই। গড়িয়ে, বসে, সিগারেট খেয়ে, ধু-ধু গরম ধোঁয়া ওঠা উদোম টিডিয়াস্-টাঁড়ের দিকে চেয়ে চেয়ে ক্লান্তি লাগছিল কুমারের। খেয়ে-দেয়ে পায়জামার দড়ি ঢিলে করে দিয়ে চৌপায়াতে শুয়ে পড়েছিল কুমার, এবং কখন যেন ঘুমিয়েও পড়েছিল।

সান্যাল সাহেবের বয়স হলেও দুপুরে ঘুমোনোর অভ্যাস কোনোদিনই নেই। ছুটির দিনে, খাওয়ার পর মিনিট পনেরো ইজিচেয়ারে শুয়েই উঠে পড়েন। ম্যাগাজিন পড়েন, ক্রসওয়ার্ড নিয়ে বসেন, তারপর বেলা পড়লে বাড়িসংলগ্ন একফালি জায়গাটুকুতে ফুল, লতাগাছগুলোতে জল-টল দেন নিজে হাতে, দেখাশোনা করেন।

সান্যাল সাহেব লুঙি পরে, হাতাকাটা গেঞ্জি গায়ে, সুখনের দরজা-খোলা ঘর থেকে খুঁজেপেতে একটা এস্কিমোদের উপর লেখা বই বের করলেন—ফার্‌লি মোয়াটের লেখা—'দ্যা পিপল্ অব দ্যা ডিয়ার'। তারপর বারান্দায় এসে ইজিচেয়ারে আধোশুয়ে, পাইপটাতে অন্যমনস্কতা ও তামাক ভরে ধরিয়ে নিয়ে বইটা নিয়ে পড়লেন। ভাবলেন, সুখন ছোকরা এরকম জায়গায় বসে এমন এমন সব বই জোগাড় করল কোথা থেকে?

সান্যাল সাহেবের বারান্দায় এসে বসার আরও একটা কারণ ছিল। উনি সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, সুখনকে নিয়ে কুমার আর মহুয়ার মধ্যে একটা চাপা মনোমালিন্য ঘটেছে। এ-ব্যাপারটার জন্যে সান্যাল সাহেব খুশি ছিলেন না। চাইছিলেন যে, ওরা একটু নিরিবিলি পেলে এই ব্যাপারটা মিটিয়ে নিক নিজেরাই।

সান্যাল সাহেব ভাবছিলেন যে, কুমারের আর যাই-ই দোষ থাক, কুমারের মতো ভবিষ্যৎসম্পন্ন জামাই এ-যুগে পাওয়া দুষ্কর। ছেলেটা মেধাবী—চিরকাল স্কলারশিপ্ নিয়ে পড়েছে—ন্যাশনাল স্কলারশিপও পেয়েছে। কাজ খুবই ভালো জানে। কিন্তু অত্যন্ত অসচ্ছল অবস্থা ও সাদামাটা জীবন থেকে এসে যারা নিজগুণে জীবনে সচ্ছলতার মুখ দেখে এবং আশাতীত ইম্পর্ট্যান্স পেয়ে যায়, তাদেরই মাথা খারাপ হতে দেখা যায় বেশি। তারা ধরাকে সরা জ্ঞান করে। সাইকেলের পেছনে গুড়ের বস্তা নিয়ে যে বাড়ি-বাড়ি গুড় বিক্রি করত, সে-ই ফেঁপে-ফুলে উঠে গাড়ি চড়ে বেড়াবার সময় সাইকেল আরোহীকে ধাওয়া করে নর্দমায় ঠেলে ফেলে আনন্দ পায়। এ তিনি নিজের জীবনেই বহু দেখেছেন। আসলে প্রত্যেক মানুষই তার বুকের মধ্যের অন্য একটা পুরনো চাপা-পড়ে যাওয়া মানুষকে ভুলে যেতে চায়। কিন্তু ভুলতে না-পেরে সেই মানুষের প্রতিভূ অন্য মানুষদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। একজন মানুষ, তার মধ্যের একখণ্ড মানুষকে যতখানি ঘৃণা করে, কোনো জানোয়ার তার নিজের কোনো অঙ্গকে অন্ধক্রোধে কামড়ালেও সেই ঘৃণার সমকক্ষ হয় না। সমস্ত মানুষকেই জীবনের কিছু কিছু ক্ষেত্রে জানোয়ারের কাছেও হার মানতে হয়। সান্যাল সাহেবকেও হয়েছে, সান্যাল সাহেব জানেন, কুমারেরও হার মানতে হবে।

জীবনের দুই-তৃতীয়াংশ অতিক্রম করে এসে, আজ সান্যাল সাহেব বুঝতে পারেন, শুধু বুঝতে পারেন যে তাই-ই নয়, উনি বিশ্বাস করেন যে, জীবনে ভারসাম্য না রাখলে, না থাকলে, কোনো একটি ক্ষেত্রে দারুণ গুণী হয়েও কিছুমাত্রই লাভ নেই। বড় ইঞ্জিনিয়ার, অ্যাকাউন্ট্যান্ট বা বড় জার্নালিস্ট খুব সহজেই হওয়া যায়—কিন্তু সুস্থ, সীমা-জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ হওয়া যায় না। সেটা বড় কঠিন কাজ।

কুমারের মেধা ও বাল্যকালের অসাচ্ছল্য ও অপ্রতীয়মানতার পরিপ্রেক্ষিতে যৌবনের সাচ্ছল্যই ওর সবচেয়ে বড় শত্রু হয়েছে। ওর সাফল্যই ওর সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা।

সান্যাল সাহেব ভাবছিলেন যে, এ-দেশে সবচেয়ে গরিবের ঘরের ছেলেরাই অবস্থার পরিবর্তন হলে সবচেয়ে বেশি ক্রুর-দুর্মর ও নিষ্ঠুর বুর্জোয়া হয়। অথচ উলটোটাই হওয়া উচিত ছিল; হলে ভালো হত। তারা যদি অন্যের দুঃখ না বোঝে তো কারা বুঝবে?

এরা না অ্যারিস্টোক্র্যাট—না প্রলেতারিয়েত্। এরা ডুডুও খায়, তামাকও খায়।

যাই-ই হোক, এ-সবই দোষ। কিন্তু এমন কোনো দোষ নয় যে, কুমারকে জামাই হিসাবে ভাবা যায় না। আর বড়জোর বছর পাঁচেকের মধ্যে ও এতবড় কোম্পানির একটা পুরো ডিভিশনের নাম্বার ওয়ান হয়ে যাবে। অর্থাৎ মাইনে ও পার্কস্ মিলিয়ে যা পাবে, তারপর সাপ্লায়ার কন্ট্রাকটরদের ভেট-টেট তো আছেই—সারা জীবন রাজার হালে হেলে-দুলে চলে যাবে।

বর্তমান সমাজে এই কুমারের মতো জামাইরা সুদুর্লভ। 'পাত্র-পাত্রী' শিরোনামা এদেরই আড়ম্বরপূর্ণ ও নির্লজ্জ ঢাকের শব্দে ভরে থাকে। সান্যাল সাহেব সব জানেন, সব বোঝেন; তিনি

বোকা নন। জেনেশুনে তিনি তাঁর একমাত্র মেয়ের জন্যে এমন জামাই হাতে পেয়েও হাতছাড়া করতে দিতে পারেন না। এর একটা আশু-বিহিত দরকার।

কিন্তু মহুয়া বড় জেদি মেয়ে। কলকাতায় বেশ ছিল—উইক-এন্ডে ক্লাবে যেত, সিনেমায় যেত দুজনে, কুমারের যখন আসবার কথা, তখন ইচ্ছে করে সান্যাল সাহেব ফ্ল্যাট ছেড়ে অন্য কোথাও যেতেন—অন্য কারও ফ্ল্যাটে অথবা ক্লাবে অসময়ে গিয়ে বসে ম্যাগাজিন উলটোতে উলটোতে বিয়ার সিপ্ করতেন।

কুমার আর মহুয়ার সম্পর্কটা রীতিমতো ঘন হয়ে এসেছিল, চিকেন অ্যাসপারাগাস্ স্যুপের মতন। উনি তাতে বড় খুশি ছিলেন। কুমার ছেলেটার এমনিতে কোনো দোষ নেই—পেডিগ্রি নেই এই-ই যা, ব্যাড-ব্রিডিং, সে কারণে বস্তি বস্তি ভাবটা রয়ে গেছে ওর মধ্যে পুরোমাত্রায়। কিন্তু সান্যাল সাহেব জীবনে অনেক দেখলেন, আজ এটা তিনি বিশ্বাস করেন যে, একটা মিনিমাম অ্যামাউন্ট অব ঔদ্ধত্য ও গর্ব ছাড়া এবং এমনকি ক্রুডনেস ছাড়াও জীবনে ম্যাটেরিয়ালি বড় হওয়া যায় না।

এই মিস্ত্রি ছোকরা ভালো ছেলে সন্দেহ নেই—কিন্তু মহুয়া যদি তাকে কুমারের সঙ্গে তুলনীয় বলে ভেবে থাকে, তাহলে শুধু কুমারের প্রতিই নয়, তার নিজের প্রতিও অত্যন্ত অন্যায় করবে।

বইটা কোলেই পড়ে থাকল সান্যাল সাহেবের। উনি ভাবতে লাগলেন। বাইরে ধুলো উড়তে লাগল। লাল ধুলো। গরম হাওয়ার সঙ্গে লু চলছে। শুকনো শাল পাতা পাথরে জড়িয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে ঘূর্ণি উঠছে। হলুদ, লাল, পাটকিলে শুকনো পাতা, খড়কুটো, সব কুড়িয়ে জড়িয়ে হাওয়ার স্তম্ভ উঠছে উপরে—ঘুরপাক খাচ্ছে—নাচছে; তারপর সেই স্তম্ভটা শালবনের কাঁধ ছুঁই ছুঁই হলেই হাওয়াটা ওদের বিকেন্দ্রীকরণ করে রাশ আলগা করে ছেড়ে দিচ্ছে। একরাশ খুদে ভারহীন ছত্রীবাহিনীর সৈন্যদের মতো ওরা চতুর্দিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে—মাধ্যাকর্ষণে নেমে আসছে যেখান থেকে ঊর্ধ্বলোকের আশায় রওয়ানা হয়েছিল—সেই অধঃলোকে।

সান্যাল সাহেব অন্যমনস্ক হয়ে দেওঘরের দিনগুলোয় ফিরে গেছিলেন। ডিগারীয়া পাহাড়—পাহাড়ের মাথায় রোজ সাঁঝের বেলায় দেখা শান্ত সন্ধ্যাতারা। একটি মিষ্টি সাধারণ শ্যামলা মেয়ের মুখ—শালবনের ভিতরে। বিবাহিতা অল্পবয়সি একটি মেয়ে। সান্যাল সাহেব তাকে ঘর থেকে বাইরে এনে নিজের ঘরে তুলেছিলেন। সান্যাল সাহেব কখনও সংস্কার মানেননি, সমাজ মানেননি। লুঙি পরলে কী হয়, মনে-প্রাণে জানেন যে, পুরোদস্তুর সাহেব তিনি। কিন্তু সেই শ্যামলী মেয়েটি মহুয়াকে উপহার দেওয়ার পরই তাঁকে সেই ঘরে মেয়ের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে একা রেখে এক দুর্মর উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও আরও বিলাসী জীবনের মোহে পড়ে ওদেরই কোম্পানির এর ফরাসি ডিরেক্টরের সঙ্গে পালিয়ে গেছিল। শ্যাম্পেনের দেশের লোকের নাকে বাংলার শ্যামলা মেয়ের গায়ের বনতুলসী গন্ধ ভারী ভালো লেগে গেছিল বুঝি। ঘর ভাঙতে ঘর বাঁধতে এবং আবার ঘর ভাঙতে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল শ্যামলী। এর পরে তার কোনো খবর সান্যাল সাহেব আর রাখেননি। রাখার প্রয়োজনও বোধ করেননি। লোকমুখে শুনেছেন যে, ভালোই আছে শ্যামলী স-পুত্র। সেদিন থেকে নারীচরিত্র সম্বন্ধে তাঁর মনে এক অসীম দুর্জ্ঞেয়তা ছাড়া আর কোনো অনুভূতিই অবশিষ্ট নেই। পুরো মেয়ে জাতটা সম্বন্ধে—একমাত্র নিজের রক্তজাত মেয়ে ছাড়া—তিনি একেবারেই নিস্পৃহ হয়ে গেছেন। প্রত্যেকটি মেয়েকে তিনি মনে মনে ঘৃণা করেন সেদিন থেকে। ঘৃণা বললেও ঠিক বলা হয় না; একটা ঘৃণাজনিত ও অনুশোচনাজনিত উদাসীনতার শিকার হয়েছেন তিনি।

আশ্চর্য! শ্যামলীকে আর মনেও পড়েনি কখনও। কিন্তু দেওঘরে যে সাধারণ অল্পে-সন্তুষ্ট বিনয়ী ও বেসিক্যালি ভালো স্কুল-মাস্টারের স্ত্রী ছিল শ্যামলী, যার ঘর ভেঙে সান্যাল সাহেব কোকিলের মতো উজ্জ্বল কালো শ্যামলীকে নিয়ে এসেছিলেন, সেই লোকটার কথা বারবার মনে পড়ে তাঁর।

লোকটার অনুযোগহীন, উদার, উদাস চোখ দুটির কথা মনে পড়ে। পালিয়ে আসার পর ভদ্রলোক শ্যামলীকে একটি চিঠি দিয়েছিলেন—একটিই—তাতে লিখেছিলেন যে, তুমি যদি খুশি হয়ে থাকো, সুখে থাকো, তাহলেই ভালো। তুমি যা চেয়েছিলে, যা আমি দিতে পারিনি ও কখনও পারতাম না, তা সুধীর সান্যালের কাছে পাবে শুধু এই কামনা করি।

সান্যাল সাহেব জানেন যে, একমাত্র এই লোকটার কাছেই উনি হেরে গেলেন, হেরে রইলেন; হেরে থাকবেন সারা জীবন।

৪

এখন দুপুর খাঁ-খাঁ।

একমাত্র শীতকাল ছাড়া অন্য সব ঋতুতেই দুপুর আড়াইটে থেকে চারটে অবধি একটা ভারী, ক্লান্ত ও মন্থর নিস্তব্ধতা যেন প্রকৃতিকে পেয়ে বসে।

সান্যাল সাহেব বই পড়তে পড়তে কখনও যা করেন না, সেই কর্ম করলেন আজ। একটু গড়িয়ে নেওয়ার জন্যে ঘরে গেলেন। ঘরের জানালা সব বন্ধ। দরজা ভেজানো। মধ্যেটা অন্ধকার, ঠান্ডা। উপরের টালির ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে ও জানালা-দরজার ফাটা-ফুটো দিয়ে আলো এসে এক লালচে উদ্ভাসনায় ঘরটাকে চাপাভাবে উদ্ভাসিত করে রেখেছে। বাইরে লু বইছে তখনও। পাতা ওড়ানোর, পাতা খসানোর আর পাতায়-পাতায় হাওয়ার ঝরনা ঝরানো আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। দূরের নির্জন নির্যান সড়ক বেয়ে গোঁ গোঁ করে, ক্বচিৎ ট্রাক যাচ্ছে গরম হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। কুয়োয় লাটাখাম্বা উঠছে নামছে। কোনো মিস্ত্রি-টিস্ত্রি চান করছে বোধহয়। লাটাখাম্বার ক্যাঁচোর-ক্যাঁচোর, একঘেয়ে যন্ত্রণা-কাতর একটা আওয়াজ সমস্ত খাঁ-খাঁ পরিবেশকে আরও বেশি উদাস ও বেদনাবিধুর করে তুলেছে।

সান্যাল সাহেব ঘরে যাওয়ার পরই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। কুমারেরও নাক ডাকছিল। মহুয়া দেওয়ালের দিকে মুখ করে, পাশ ফিরে বাঁ-হাতটা দু' চোখের উপরে রেখে শুয়েছিল।

একটুক্ষণ পরেই সান্যাল সাহেবের গভীর নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা গেল। ভিতরে ঘর-ভরা ঘুম; বাইরে দুপুর নিঝুম।

মহুয়া আস্তে উঠে, নিঃশব্দে আয়নার সামনে দাঁড়াল।

ঘরের এই সামান্য আলোয় নিজের মুখ ভালো দেখতে পেল না মহুয়া। তবু, যতটুকু আলো ছিল, সেই আলো আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে তার দুটি গভীর চোখে পড়ল এবং পড়েই দ্বিতীয়বার প্রতিফলিত হল আয়নায়। হাতব্যাগ থেকে চিরুনি বের করে নিয়ে ও চুলটা একটু আঁচড়ে নিল; মুখে একটু ভেস্‌লিন লাগাল, ঠোঁটেও। হাওয়াটা বড় শুকনো, সারা-গা, মুখ চোখ সব জ্বালা-জ্বালা করছে। তারপর দরজায় একটুও শব্দ না করে বেরিয়ে পড়ল। বেরোবার সময় ঝোলানো থার্মোফ্লাস্কটা তুলে নিল দেওয়ালের পেরেক থেকে।

রান্নাঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে মংলু মেঝেতেই শুয়ে ছিল।

দরজায় টোকা দিতেই দরজা খুলল। শালপাতার দোনায় পুরি, তরকারি, প্যাঁড়া সব সাজিয়ে রেখেছিল ও। উনুনে তখনও আঁচ ছিল। ওগুলো একটু গরম করে নিয়ে শালপাতার দোনায় আবার বেঁধে-ছেঁদে নিল। তাড়াতাড়ি নিজে-হাতে চা বানাল মহুয়া—দারচিনি এলাচ এ-সব দিয়ে। যাতে বেশিক্ষণ ফ্লাস্কে থাকলেও গন্ধ না হয়ে যায় চায়ে। তারপর চা-টা ফ্লাস্কে ঢেলে মংলুর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল মহুয়া।

ডান হাতের হাতঘড়িতে সময় দেখল একবার—চারটে বাজতে দশ। বাড়ির পেছন দিকে বেড়ার মধ্যে একটা বাঁশের দরজা ছিল। তা দিয়ে গলে বাইরে বেরুলেই একটা বড় অশ্বত্থ গাছ। ঝরনার মতো শব্দ হচ্ছিল হাওয়ায় এই গাছের পাতার।

তারপরই একটু খোয়াই; খোয়াইটুকু পেরিয়ে একটা উঁচু বাঁধের মতো—বাঁধের উপরে সামান্য জল; একটা দহ। গোটা চারেক দুধ-সাদা গো-বক ঠা-ঠা রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে। কালো-কালো ছোট্ট দুটো হাঁসের মতো পাখি জলে কিছুক্ষণ সাঁতার কাটছে, আবার পরক্ষণেই জলে ঢেউয়ের বৃত্ত তুলে ডুব দিয়েই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

দাঁড়িয়ে পড়ে অবাক হয়ে ওদিকে তাকিয়ে মহুয়া শুধোল, ওগুলো কী পাখি?

মংলু বলল, ডুবডুবা।

মহুয়া অবাক হয়ে চারদিকে তাকাতে তাকাতে চলেছে। ও বাবার সঙ্গে কাশ্মীরে গেছে, নৈনিতালে গেছে, উটীতে গেছে, যায়নি এমন ভালো জায়গা নেই ভারতবর্ষে, অথচ এই অখ্যাত অজানা ছোট্ট জায়গা—এই ফুলটুলিয়ার বিবাগী রুক্ষ দুপুরে যে চোখ ভরে এত কিছু দেখার ছিল, কান ভরে শোনার ছিল, ও কখনও তা স্বপ্নেও ভাবেনি।

দুটো শুয়োর কাদায় প্যাচ-প্যাচ আওয়াজ তুলে হাঁটু অবধি কাদা-মেখে দৌড়ে গেল অন্যদিকে।

মহুয়া চমকে উঠে মংলুর বাহু ধরে ওকে দাঁড় করাল। বড় বড় চোখ করে ভয়-পাওয়া গলায় ওকে শুধোল, জংলি?

মংলু হাসল। বলল, না না। এসব কাহারটোলার শুয়োর।

একটু পরই পথটা শালবনের মধ্যে ঢুকে গেছে। এখানে গরম অনেক কম—ছায়া আছে বলে। আঁকাবাঁকা লাল মাটির পথ চলে গেছে নালা পেরিয়ে, টিলা এড়িয়ে বনের অভ্যন্তরে। জঙ্গলের মধ্যে পাতার শব্দে হাওয়াটাকে ঝড় বলে মনে হচ্ছে। মাথার উপর দিয়ে ঝড়ের চেয়েও দ্রুতগামী টিয়ার ঝাঁক, ঘন সবুজের মধ্যে কচি-কলাপাতা সবুজের ঝিলিক তুলে, মস্তিষ্কের কোষে কোষে চমক হেনে, উধাও হয়ে যাচ্ছে নীল-নির্জন ঝক্‌ঝকে আকাশে।

কী একটা পাখি ডাকছিল দূর থেকে। চিঁহা...চিঁহা...চিঁহা...চিঁহা....চিঁহা....চিঁহা ....চিঁউ...চিঁউ. ..চিঁউ....।

মহুয়া অবাক হয়ে শুধোল, এটা কী পাখি?

মংলু বিজ্ঞের মতো বলল, তিত্তির। আগে ডাক শোনেননি?

মহুয়া বাচ্চা মেয়ের মতো সরল হাসি হাসল। বলল, 'কখনও না।'

মহুয়ার মন এক দারুণ ভালো-লাগায় ভরে গেছিল। এই পরিবেশ, অত্যন্ত স্বল্প-পরিচিত একটা মানুষ, কিন্তু যার প্রথম পরিচয়ের শিকড় অত্যন্ত গভীরে প্রোথিত হয়ে গেছে মহুয়ার ভিতরে—সেই সুখনের জন্যে এই নিজে-হাতে খাবার বয়ে-নিয়ে যাওয়া, অপরিষ্কার জীর্ণ রান্নাঘরে চা-বানানো উবু হয়ে বসে—এ সবের মধ্যেও একটা ভীষণ আনন্দ পেয়েছিল। নিজেকে কষ্ট দিয়ে অন্যকে আনন্দিত করতে যে এমন অভিভূত হতে হয় তা ও আগে কখনও জানেনি।

আনন্দ আর সুখ এ দুই অনুভূতি একই পাড়ার বাসিন্দা ছিল আগে ওর মনে। এরা যে সম্পূর্ণ বে-পাড়ার লোক মহুয়া জানত না। প্রথম জানল।

কুমার তাকে অপমানসূচক কথা বলার পরেই কারখানায় গিয়ে, মিস্ত্রিদের কাজটাজ বুঝিয়ে সুখন উধাও হয়ে গেছিল। একমাত্র মংলু জানত ও কোথায় যায়; যেতে পারে। কালুয়াকেও আর দেখা যায়নি তারপর। মানে, সুখন চলে যাওয়ার পর থেকে।

মংলু বলছিল, কালুয়া ওস্তাদকে এত ভালোবাসে যে, ওস্তাদ বলেছে, ওস্তাদ মরে গেলে তাকে শাকুয়া-টুণ্ডে কবর দিয়ে কালুয়ার জন্যে তার পাশেই যেন একটা ঘর বানিয়ে দেয় মিস্ত্রিরা।

মহুয়া মংলুকে শুধোল, এই শাকুয়া-টুঙ ব্যাপারটা কী?

উত্তরে মংলু উৎসাহের সঙ্গে বলল, শাকুয়া-টুঙ শালবনের মধ্যের একটা টিলার চুড়ো। সেখানে বসে পুরো পালামৌ জেলার এবং হাজারীবাগ জেলারও কিছু জঙ্গল চোখে পড়ে। ওস্তাদ ওখানে একটা ছোট্ট ঘর বানিয়েছে। মাটির দেওয়াল, মাটির মেঝে, উপরে ঘাস। বেশিরভাগ ছুটির দিনে, অথবা মনে দুঃখ-টুঃখ হলে ওস্তাদ ওখানে গিয়ে কাটায়। কোনো-কোনো দিন সারা রাতও থাকে।

মহুয়া অবাক হয়ে বলল, বাবু সেখানে করেন কী?

মংলু তাচ্ছিল্যের গলায় বলল, কী-সব লেখাপড়ি করে, চুপ করে বসে থাকে।

আর খান কী? মহুয়া আবার শুধোল।

কিছুই না। মহুয়ার দিনে মহুয়ার ফল চিবোয়। পিপাসা পেলে নীচের ঝরনায় গিয়ে জল খায়। ওস্তাদ বলে—'বুঝলি মংলু, আমি হচ্ছি ময়াল সাপের জাত। একবার খেলে বহুদিন আমার খেতে হয় না।'

মংলুর সঙ্গে কথা ছিল মহুয়াকে সুখনের কাছে পৌঁছে দিয়ে ও দৌড়ে ফিরে যাবে। কুমার আর বাবাকে বিকেলে চা-জলখাবার করে দেবে। আর ঘুণাক্ষরেও জানাবে না কাউকে যে, মহুয়া কোথায় গেছে। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবে যে, বড় রাস্তার দিকে যেতে দেখেছে ও দিদিমণিকে। যাওয়ার সময় দিদিমণি ওকে বলে গেছেন—একটু বেরিয়ে আসছি, সন্ধ্যার আগেই ফিরব।

আর একটু এগোতেই টিলাটার কাছাকাছি এল ওরা। এমন সময় দূরে কোথা থেকে মাদলের আওয়াজ ও একটানা ঝিম-ধরা গানের সুর শোনা গেল। কিছু অসংলগ্ন দূরাগত কথাবার্তা। পুরুষকণ্ঠই বেশি—স্ত্রীকণ্ঠও ছিল মাদল মাঝে মাঝে থামছে—টুকরো টুকরো কথার পরই আবার বেজে উঠছে।

মংলুকে শুধোতে সে বলল যে, কোনো শাদি-টাদি আছে বোধ হয়। নীচে ছোট্ট একটা বস্তি আছে গঞ্জুদের।

ওরা ছোট্ট টিলাটা চড়তে শুরু করেছে পাকদণ্ডী পথ দিয়ে, এমন সময় একটা মোড় ঘুরতেই মহুয়া হঠাৎই সুখনের একেবারে মুখোমুখি এসে পড়ল। সুখন হনহনিয়ে কোথায় চলেছিল, বোধহয় কারখানার দিকেই। ধাক্কা লাগছিল আর একটু হলে।

সুখন হঠাৎ মহুয়াকে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠল।

বলল, এ কী? কী ব্যাপার? আপনি এখানে কেন?

তারপরই আবার বলল, এটা কী একটু বাড়াবাড়ি হল না?

মহুয়ার আনন্দ, উৎসাহ সবই একমুহূর্তে নিভে গেল। রোদে হেঁটে ওর সমস্ত মুখ লাল হয়ে গেছিল।

কিন্তু সুখন মহুয়ার অমন সুন্দর, ভালো-লাগা আর ভালোবাসায় মোহিত, অমন অনুতাপ-কাতর মুখটির দিকে একবার তাকালও না।

অন্যদিকে চেয়ে বলল, 'কী রে মংলু? তোকে কে আনতে বলেছিল দিদিমণিকে এখানে? মেরে শালা তোর দাঁত ভেঙে দেব!'

মংলু ভয়ে সিঁটিয়ে গেল।

কালুয়া সুখনের পায়ে-পায়ে এসেছিল—সে-ও সুখনের রাগ দেখে কেঁউ কেঁউ করে উঠল।

সুখন ধমক দিয়ে বলল, 'বল্, কে আনতে বলেছিল?'

মংলুকে আড়াল করে হতভম্ব মহুয়া মুখ তুলে বলল, 'এটা অন্যায়। কিছু বলার থাকলে আমাকে বলুন। ওর কী দোষ?'

তখনও সুখন অন্যদিকেই মুখ ঘুরিয়ে ছিল।

বলল, 'দেখুন, ন্যায়-অন্যায় আমাকে শেখাবেন না। এখন ভালোয় ভালোয় এখান থেকে চলে যান। বলছি তো, আপনাদের গাড়ি পার্টস এলেই ঠিক করে দেব। ভাঙা হোক, যাই-ই হোক, আমারই বাড়ি থেকে তো অন্যায়ভাবে অপমান করে আপনারা আমাকে তাড়ালেন—তবু সুখন মিস্ত্রির কী একটু নিরিবিলি থাকারও উপায় নেই—নাকি গাড়ির মালিকদের কাছে তামাম জিন্দগী বিকিয়েই বসে আছে সে?'

পরক্ষণেই, সোজা মহুয়ার চোখে তাকিয়ে ধমকের গলায় সুখন বলল, 'কী চান কী আপনারা সবাই, আপনি; আমার কাছে? বলতে পারেন, কী চান?'

মহুয়া মুখ নামিয়েই ছিল।

মংলু সুখনের এই ব্যবহারের কারণ বুঝতে না পেরে অত্যন্ত ব্যথিত মুখে জঙ্গলের দিকে তাকিয়েছিল, কাঁধে থার্মোফ্লাস্ক ঝুলিয়ে আর হাতে খাবার নিয়ে।

মহুয়া মুখ তুলে সুখনের দিকে তাকাল।

হঠাৎ, বিদ্যুৎ-চমকের মতো সুখন মুখ তুলে আবিষ্কার করল; আবিষ্কার করল মহুয়াকে। আবিষ্কার বলল না, বলা উচিত পুনরাবিষ্কার করল। আবিষ্কার তো কাল রাতের লুণ্ঠনের আলোতেই সে করেছিল।

সুখন তার অন্তরের অন্তরতম তলে অনুভব করল যে, ওর দিকে আজ পর্যন্ত কখনও কোনো নারী এমন চোখে তাকায়নি।

সুখন দেখল দু' ফোঁটা জল মহুয়ার চোখের পাতার চিকন-কালো গভীরে টলটল করছে—শীতের সকালের গোলাপের পাপড়ির গায়ের শিশিরের মতো—উজ্জ্বল, নির্মল। তার মুখ, কপাল, গাল যেন এতখানি রোদে হেঁটে এসে লাল হয়ে উঠেছে পদ্মকলির গোড়ার দিকের কোমল লালে। সুখনের খুব একটা ইচ্ছে করেছিল। মংলু সামনে না থাকলে, সে ইচ্ছেকে ও সফল করত—করতই—। ইচ্ছে করছিল, দু'টি চকিত চুমুর উত্তাপের বাষ্পে মহুয়ার সেই দু' চোখের জল ও শুষে নেয়; মুছে দেয়।

সুখন মহুয়ার চোখে চোখ রেখেই স্তব্ধ হয়ে গেল।

দু' ফোঁটা জল চোখ ছাড়িয়ে, গাল গড়িয়ে, বুক টপকে এসে লাল মাটিতে পড়ল। রুক্ষ মাটি মুহূর্তে তা শুষে নিল।

সুখন অপ্রস্তুত অপ্রতিভ গলায় বলল, 'যাঃ বাবা! এ আবার কী? মহা ঝামেলা দেখছি।'

'বিশ্বাস করুন'—বলেই ওর দু'হাত মহুয়ার দু' বাহুতে রাখবে বলে হাত উঠিয়েই পরক্ষণেই অবাক মংলুর দু'কাঁধে রাখল। রাখল তো না, যেন থাপ্পড় মারল।

এবার বলল, 'কী রে মংলু, সেই সকাল থেকে কিছু খাইনি। কিছু খেতে দিবি, না হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকবি?'

বলেই মহুয়াকে উদ্দেশ করে বলল, 'আসুন, আসুন এতদূর যখন আমারই জন্যে, এ-হতভাগাকেই খাওয়াবেন বলে এলেন, তখন চলুন আমার ডেরাটা দেখে যাবেন।'

সুখন আগে আগে চলতে লাগল। একটু উঠেই ঘরটা চোখে পড়ল। জায়গাটার তুলনা নেই। ঘরটারও না। লাল ও হলুদ মাটির দেওয়াল, তাতে নানারকম আদিবাসী মোটিফ্ আঁকা। পরিষ্কার করে গোবর-নিকোনো বারান্দা।

সামনেটাতে কী এক মন্ত্রবলে যেন পৃথিবী হঠাৎ বেঁটে হয়ে গিয়ে এই মালভূমির পদপ্রান্তে নেমে গেছে—প্রায় পাঁচশ' ফিট—নেমে গিয়েই যেন গড়িয়ে গেছে শ'য়ে শ'য়ে মাইল সবুজ, ঘন-সবুজ, হলদেটে-সবুজ, লালচে-সবুজ এবং পত্রশূন্যতার পাটকিলে রাঙা জমাট-বুনুন গালচে হয়ে গড়াতে-গড়াতে চতুর্দিকে যতদূর চোখ যায়, বিস্তৃত হয়ে গিয়ে দিগন্তরেখার তিন সীমানায় পৌঁচেছে।

ঘরটা ছোট। একদিকে একটা চৌপাই—বারান্দায় একটা দড়ির ইজিচেয়ার। শালকাঠের বুক-র‍্যাক। তার উপর কিছু বইপত্র। কোণায় মেটে কলসি; জল রাখার।

ঘরে পৌঁছে সুখনের মেজাজটা একটু শান্ত হল মনে হল। শামুক যেমন অভ্যন্তরে তুলতুলে থাকে, তেমন তার স্বাভাবিক নম্রতার স্বভাবে ফিরে গিয়ে, বাইরের শক্ত খোলস ভুলে গিয়ে সুখন বারান্দার কোণায় বসে বলল, 'দে, মংলু, খেতে দে।'

মহুয়া মুখ নামিয়েই বলল, 'এবার মংলুকে ছুটি দিলে ভালো হত। মংলুর ওখানে কাজ আছে। মংলুর মতো অত ভালো না পারলেও, আপনাকে খাবারটুকু দিতে পারব আশা করি।'

সুখন চকিতে মুখ তুলে মহুয়ার দিকে তাকাল। মহুয়া যে সুখনকে একা চায় এ-কথা বুঝল-ও। অনভ্যস্ত ভালো-লাগায় সুখনের বুকটা মুচড়ে উঠল।

মুখে বলল, 'আপনার বাবাকে, কুমারবাবুকে খাবার-টাবার দিতে হবে—তাই না!' তারপর বলল, 'যারে মংলু, তুই যা।'

মংলু মহুয়ার দিকে তাকাল। অনেকক্ষণ পর ওর মুখে হাসি ফুটল। বলল, 'চললাম দিদিমণি।'

কেন জানে না, মংলু এই দিদিমণির প্রেমে পড়ে গেছে—একজন বারো-তোরো বছরের দেহাতি সরল ছেলের দাবিহীন মিষ্টি প্রেম।

'যেতে নেই; এসো।'—মহুয়া বলল মংলুকে।

নড়বড়ে দড়ির ইজি-চেয়ারটা এনে পেতে দিল সুখন। বলল, 'বসুন। কিন্তু হেলান দিয়ে বসবেন না; ছারপোকা আছে।'

মহুয়া হাসল। বলল, 'আপনি কোথায় বসবেন?'

'এই যে'—বলেই সুখন জিন-পরা অবস্থাতেই মাটির বারান্দার উপর আসন করে বসে পড়ল।

মহুয়া বলল, 'খুব খিদে পেয়েছে, না? পায়নি খিদে?'

'খিদে? না না। আমার খিদে-টিদে সব মরে গেছে। মেরে ফেলেছি।'

তারপর একটু থেমে উদাস গলায় বলল, 'সব খিদেই।'

সুখনের সামনে মাটিতে বসে পড়ে, শালের দোনার বাঁধনটা ঢিলে করতে করতে মহুয়া বলল, 'কার উপর এত অভিমান? খালি পেটে চা আর জর্দা-পান খেয়ে কী প্রমাণ করতে চান আপনি?'

সুখন হাসল।

দারুণ দেখাল হাসিটা—অন্তত মহুয়ার চোখে।

সুখন বলল, 'প্রমাণ কিছুই করার নেই। জ্যামিতিক অঙ্ক মেলানোর দিন চলে গেছে। বলতে পারেন, এখন যা-কিছুই করি তার সবটাই কিছু অপ্রমাণ করার জন্যে।'

মহুয়া চুপ করে থাকল একটু। সুখন মিস্ত্রির হঠাৎ-উত্তরের অভাবনীয়তায় অবাক হয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ।

তারপর বলল, 'পুরিগুলো ঠান্ডা হয়ে গেছে। যে ঠান্ডা খাবার দেয়, তার খারাপ লাগে। তাছাড়া, ঠান্ডা কী কেউ খেতে পারে?'

'আমি পারি'।—সুখন বলল।

তারপর খেতে খেতে বলল, 'আমাকে খাওয়াতে আপনার খারাপ লাগছে হয়তো, আমার কিন্তু আপনার হাতে খেতে ভারী ভালো লাগছে। এমন আদর করে কেউ আমাকে কখনও খাওয়ায়নি। মা'র কথা মনে নেই। তারপর তো স্কুল-কলেজের হস্টেলে হস্টেলেই কেটেছে।'

মহুয়ার চোখের দৃষ্টি নরম হয়ে এসেছে। বাইরে রোদের তাপও নরম হয়েছে। হাওয়ার তোড় কমে আসছে। লম্বা হয়ে শাল-সেগুনের ছায়া নামছে জঙ্গলে। নীচ থেকে নানারকম পাখির ডাক ভেসে আসছে মাদলের আওয়াজের সঙ্গে মিশে।

মহুয়া বলল, 'খান তো; ভালো করে খান। বাড়িতে একটু আচার-টাচার রাখেন না কেন?'

'আচার?'—বলেই একটু হাসল সুখন।—বলল, 'আচার-টাচার তাদেরই মানায়, খাওয়াটা যাদের কাছে একটা বিরাট ব্যাপার, মানে, সুখের ব্যাপার। আমরা খাই তো খেতে হয় বলে। গরমের দিনে মাসের পর মাস বিউলির ডাল আর একটা তরকারিতে চলে। শীতের দিনে প্রায় রোজই খিচুড়ি, সঙ্গে আলু কী বেগুনভাজা। খাওয়া ব্যাপারটাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কোনোই মানে দেখি না আমি।' তারপর একটু থেমেই বলল, 'খুবই সুখের বিষয়, মংলুও দেখে না।'

'বেশ। এবার খান। খাওয়ার সময় অত কথা বলতে নেই। হজম হবে না'। বলেই, মহুয়া উঠে ঘরে গিয়ে কুঁজো থেকে গড়িয়ে চটে-যাওয়া কলাই-করা একটা গেলাসে করে জল নিয়ে এল।

সুখন বলল, 'খাওয়ার সময় জল খাই না'। তারপরেই বারান্দার কোণে নামিয়ে রাখা ফ্লাস্কের দিকে চেয়ে বলল, 'ফ্লাস্কে কী? চা? তাহলে খেয়ে উঠে চা খাব।'

মহুয়া বলল, 'আমি তাহলে জলটা খাই? ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে।'

খাওয়া থামিয়ে সুখন বলল, 'পাবেই তো! অতখানি পথ, রোদে। তার উপর আপনাদের তো অভ্যেস নেই। কেন যে এত কষ্ট করলেন, বুঝলাম না। কুমারবাবু খারাপ ব্যবহার করেছেন আমারই সঙ্গে। তাতে আপনার অপরাধবোধ কেন? আপনি না থাকলে ও-ইঁদুরটাকে মেরে দু'পা ধরে তুলে পুরোনো মবিলের টিনে মুখ চুবিয়ে দিতাম। সুখন মিস্ত্রিকে চেনে না! শুধু আপনার জন্যে, আপনারই জন্যে সহ্য করতে হল; করলাম।'

মহুয়া জল খেয়ে গেলাসটা নামিয়ে রেখে বলল, 'কেন? আমার জন্যেই বা কেন? আমি আপনার কে?'

সুখন খাওয়া থামিয়ে মুখ তুলল। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। কী বলবে, ভেবে পেল না। তারপর বলল, 'কেউ নন। কেউ নন বলেই তো।'

একটু ভেবে বলল, 'হঠাৎ এসে পড়লেন, একদিনের মেহমান।'

খেতে খেতে সুখন মনে মনে বলল—কেন জানি না, আপনাকে দেখার পর থেকেই কেমন হয়ে গেলাম। আমার মধ্যে যে এতসব নরম ব্যাপার-ট্যাপার ছিল আমি জানতাম না। গাড়ির অ্যাব্জরবারের মতো আমার মনটাও একটা যন্ত্র হয়ে গেছিল। কোনোরকম আনন্দ বা দুঃখই আর সাড়া জাগাত না তাতে। একদিনের জন্যে এসে আমার সব গোলমাল করে দিলেন।

তারপরই চোখ তুলে মহুয়ার দিকে অনেকক্ষণ পূর্ণদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বলল, 'কেন এলেন বলুন তো?'

মহুয়া মুখ নামিয়ে চুপ করে রইল। কথা বলল না কোনো। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল।

মনে মনে ও নিজেকে বলল—আমিই কী জানতাম যে আমি এমন? আমি তো নিজে আসিনি। পুরো ব্যাপারটাই বুঝি প্রি-কন্ডিশানড্।

তারপর বলল, 'আপনার নাম তো সুখ। এখানে স্থানীয় লোকেরা আপনাকে সুখন বলে ডাকলে ডাকুক, আপনি নিজেও নিজেকে সুখন বলেন কেন? বিচ্ছিরি শোনায়।'

'কী জানি? কখনও ভেবে দেখিনি। সুখ নামটা হয়তো আমাকে মানায় না বলে।'

মহুয়া কথা কেড়ে নিয়ে বলল, 'সুখরঞ্জন তো একেবারেই মানায় না। আমি কিন্তু আপনাকে সুখ বলে ডাকব।'

সুখন বিদ্রুপের হাসি হাসল। বলল, 'ক' ঘণ্টা! আর ক' ঘণ্টা থাকছেন এখানে? সুখ বা অসুখ যা আপনার ইচ্ছে, তাই বলেই ডাকতে পারেন। যে নামেই ডাকুন না কেন, এখান থেকে চলে গেলেই লোকটাকে ভুলে যাবেন। মানুষটাকেই যখন মনে থাকবে না, তখন একটা নাম নিয়ে এত তর্ক কীসের?'

'আপনি জানেন, আপনি সবই জানেন, না?'

'কী জানি!'—সুখন শুধোল।

তারপর আবার বলল, 'বোধহয় জানি। কিন্তু যা জানি, সেটা ঠিক কিনা জানি না।'

তারপর গেঞ্জির হাতায় জংলির মতো মুখ মুছে বলল, চা দিন।

মহুয়া এতক্ষণ ধরে লক্ষ করছিল মানুষটার ছটফটে, ছেলেমানুষি স্বভাব। বয়স হয়েছে, কিন্তু বড় হয়নি একটুও।

কালুয়া দূরে তিন-ঠাঙে বসে একদৃষ্টে সুখনের খাওয়া দেখছিল। সুখন শালপাতা মুড়ে একটা পরোটা ও মেটের তরকারি দিয়ে এল তাকে পলাশ গাছের গোড়ায়। খাবারটা দিতে গিয়ে সামনে তাকিয়েই থমকে দাঁড়াল। মহুয়ার দিকে ফিরে বলল, 'দেখেছেন? বেলা পড়ে যাওয়াতে কেমন দেখাচ্ছে সামনেটা এখান থেকে?'

মহুয়া তাকাল ওদিকে। ধুলোর ঝড়ের মধ্যে, প্রখর উষ্ণ ঝাঁজের মধ্যে পলাশের লাল বুঝি এতক্ষণ ঝাপসা ছিল। সারা দুপুর আগুনে পুড়ে সব খাদ ঝরে গেছে সোনার—এখন লালে একটা নরম স্নিগ্ধতা লেগেছে। লালের ছোপে-ছোপে সবুজের মহিমা আরও খুলেছে যেন।

ও বলল, 'সত্যি! আপনার এই শাকুয়া-টুঙ্ দারুণ।'

ফ্লাস্ক খুলতে-খুলতে একদৃষ্টে ওদিকে চেয়ে মহুয়া জীবনে এই প্রথমবার জানল, ওর সাতাশ বছর বয়সে যে, প্রকৃতির কী দারুণ প্রভাব মানুষের মনের উপর! এই উদার উন্মুক্ত জঙ্গলে যার যা-কিছু দাবি আছে সবই বুঝি দিতে পারা যায় কাউকে, কিছুই বাকি না রেখে।

সুখন ফ্লাস্কের ঢাকনিতে চা নিল। পরক্ষণেই মহুয়ার কথা মনে হওয়াতে ও বলল, 'আপনি এটা নিন, আমাকে গেলাসেই চা ঢেলে দিন।'

'না, না। ঠিক আছে।' মহুয়া বলল।

সুখন কঠিন গলায় বলল, 'কথা শুনতে হয়। আপনি আমার চেয়ে অনেক ছোট।'

'ঈ-শ্—! কত্তই যেন ছোট।' ঠোঁট উলটে মহুয়া বলল।

হাসতে হাসতে সুখন বলল, 'অনেক ছোট। দশ-বারো বছরের ছোট তো বটেই।'

'আহা, মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে অনেক বেশি ম্যাচিওরড্ হয়। এই ডিফারেন্স ডিফারেন্সই নয়।'

'হুম্ম্'—বলল সুখন।

পরক্ষণেই চায়ে চুমুক দিয়েই চমকে উঠে বলল, 'চা কে বানিয়েছে? এ তো মংলুর হাতের চা নয়? আপনি'?

মহুয়া মুখ নামিয়ে বলল 'কেন? খারাপ হয়েছে?'

সুখন পুলকভরে বলল, 'খারাপ কী? দারুণ হয়েছে। একেবারে টাটী-ঝারীয়ার পণ্ডিতজির দোকানের চায়ের মতো ফারস্ট ক্লাস।'

চা খাওয়া হলে, মহুয়া ব্যাগ হাতড়ে কাগজের মোড়ক বের করল একটা। বলল, 'এই নিন।'

সুখন হাত বাড়িয়ে নিল।

মহুয়া ঠোঁট টিপে হাসছিল।

আবার বলল, 'এই নিন, এটাও; আমি আপনাকে দিলাম, আমার প্রেজেন্ট।' বলেই, ছোট টিনটা এগিয়ে দিল সুখনের দিকে।

হাসছিল সুখনও। প্যাকেটের মধ্যে পান এবং একশোবিশ জর্দার আস্ত একটা টিন পেয়েই, খুশিতে ওর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বলল 'একি? কোত্থেকে পেলেন?'

মহুয়া বলল, 'কী কিম্ভূতকিমাকার নাম রে বাবা। একশো বিশ!'

সুখন হাসল। বলল, 'চারশো বিশ হলে খুশি হতেন?'

দুজনেই হেসে উঠল। তারপর দুজনেই অনেকক্ষণ চুপচাপ।

বেলা পড়ে এসেছিল। রোদের তেজ নেই আর। পশ্চিমাকাশে ম্লান একটা গোলাপি আভা ঝুলে রয়েছে। শাকুয়া-টুঙে বসে অস্তগামী সূর্যকে তখনও দেখা যাচ্ছে। আর তারই সঙ্গে দেখা যাচ্ছে উলটোদিকে উদীয়মান চাঁদ। দোলের আর তিনদিন বাকি। সূর্য আর চাঁদে মিলে পৃথিবীকে চব্বিশ ঘণ্টাই উজালা করে রাখবে বলে স্থির করেছে যেন।

এখানের এই এক মজা। দিনে যত গরমই থাক না কেন, আলোটা কমে আসতেই কেমন শীত-শীত করতে থাকে। অন্ধকার হয়ে গেলে তো কথাই নেই। তখন পাতলা সোয়েটার বা চাদর থাকলে, বাইরে বসতে ভালো লাগে।

চা খেয়ে, পান খেয়ে, একটা সিগারেট ধরিয়ে সুখন চুপ করে পিছনে একপাশে বসে মহুয়াকে দেখছিল।

মহুয়া বারান্দাটার সামনের দিকে বসে নীচের উপত্যকার দিকে চেয়েছিল।

মহুয়ার মদের নেশা যেমন সুখনকে এখানে বহু রাতে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, তেমন মহুয়া নামে এই মেয়েটির আশ্চর্য সান্নিধ্যর আমেজ ওকে যেন আরও কোনো তীব্রতর নেশায় আবিষ্ট, আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। মহুয়াকে অবশ করেছে এই প্রকৃতি, এই হঠাৎ-দেখা, হঠাৎ কাছে-আসা, রুক্ষ, ছেলেমানুষ ও বর্বর পুরুষটি। মহুয়ার সাতাশ বছরের জীবনের পরমপুরুষ।

অনেকক্ষণ এমনি করেই দুজনে চুপ করে বসেছিল। দুজনে বারান্দার দু'দিকে, আগে পিছনে। মধ্যে অনেকখানি ব্যবধান। ব্যবধান শুধু ভূমির নয়, অনেক কিছুর।

বাইরে দিনের নিভন্ত রং, সন্ধের আসন্ন তরল অন্ধকার, চাঁদের ফুটন্ত আলো, ঘর-ছাড়া টি-টি পাখির বুক-চমকানো ডাক ও ঘরে-ফেরা টিয়ার দলের তীক্ষ্ণ ছুরির ফলার মতো স্বগতোক্তি, সব মিলে-মিশে ভেঙে-চুরে যখন দারুণ কোনো একটা মিশ্র ও অলৌকিক আবেশের সৃষ্টি হচ্ছে ধীরে ধীরে—চুপিসারে—প্রকৃতির আধো-খোলা বুকের মধ্যে, তখন সুখন আর মহুয়ার বুকের মধ্যেও অনেককিছু বোধ-সংস্কার, আনন্দ-দুঃখ, পাহাড়ি নদীর স্রোতের মধ্যের তাণ্ডবে গড়াতে-থাকা ক্ষয়িষ্ণু নুড়িগুলোরই মতো ক্রমান্বয়ে ভাঙচুর হচ্ছিল। ওরা কেউই চেতনে ছিল না। অবচেতনের আশ্চর্য কুঠুরিতে এক পরিপূর্ণতার স্বপ্নে ওরা দুজনেই ডুবে গেছিল। ওরা দুজনে ভাঙচুর হচ্ছিল যে-যার মনের মধ্যে। একের ভাবনা অন্যে জানছিল না। ভাবনা তো দেখানো যায় না। দুজনের অজানিতে, এই ফিসফিসে গুমরানো বনজ বাতাসে ওরা একে-অন্যের পরিপূরক হয়ে উঠছিল।

নীচের নদীর অন্ধকার খোলে-খোলে পেঁচা ডেকে ফিরছিল—কিঁচর-কিঁর, কিঁ-চিঁ-কিঁ-চিঁ-কিচর—। ওদের কানে আসছিল, অথচ সে ডাক কানে আসছিলও না। এক নিষিদ্ধ অথচ নির্মল আত্ম-অবলুপ্তির মধ্যে ওরা দুজনেই দুজনের সান্নিধ্যর নরম নেশায় যেন বেদম বুঁদ হয়ে ছিল।

কতক্ষণ যে ওরা ওইভাবে বসেছিল, ওরা কেউই জানে না।

যখন হুঁশ হল তখন একেবারে বেলা পড়ে গেছে। নীচু থেকে নানারকম রাত-চরা পাহাড়ি পাখি ডাকছে। চারদিকে, বারান্দায়, উপত্যকায় তরল সুগন্ধি ক্ষণিক অন্ধকার তখন।

আলোর মধ্যে ওরা নিরুচ্চার ছিল। অন্ধকারে ওদের দুজনেরই মন কিছু বলার জন্যে উন্মুখ হয়ে রয়েছে।

হঠাৎ নীচের পাহাড়ি নদীর খোল থেকে হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ করে একটা ভয়-পাওয়ানো বুক-চমকানো ডাক ভেসে এল।

মহুয়া ভীষণ ভয় পেয়ে, কী করবে ভেবে না পেয়ে এক দৌড়ে সুখনের একেবারে কাছে চলে এল।

দেওয়ালে হেলান দিয়ে, দু'পা সামনে ছড়িয়ে বসেছিল সুখন। কাকে এই সমর্পণ জানে না সুখন, কিন্তু এমন সমর্পণী অবস্থায় কখনো ও নিজেকে আবিষ্কার করেনি।

সুখন ওর সবল ডান হাতে মহুয়াকে অভয় দিয়ে ওকে কাছে টেনে বসাল।

মহুয়ার বুক ওঠানামা করছিল—সত্যি সত্যি ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল ও।

সুখন মহুয়ার রেশমি-চুলের মাথাটি ওর বুকের কাছে নিয়ে এসে ডান হাত দিয়ে ওকে আশ্বাসে, অভয়ে, বড় যতনভরে জড়িয়ে রইল।

ফিসফিস করে বলল, ভয় পেয়েছেন?

লজ্জা, ভয়, এই হঠাৎ অভাবনীয়ভাবে সুখনের বুকে আসার আনন্দ, সব মিলিয়ে মহুয়া অস্ফুটে বলল, হুঁ।

সুখন কথা বলল না কোনো। ওর থুতনিটা মহুয়ার সিঁথির উপর ছুঁইয়ে বসে রইল। বসে রইল অনেকক্ষণ।

মহুয়া মুখ তুলে এক সময় বলল, 'ওটা কীসের ডাক?'

'হায়েনার।' সহজ গলায় বলল সুখন।

'আপনি এখানে একদম একা-একা থাকেন, ভয় করে না আপনার?'

'কীসের ভয়?' কোনোরকম বাহাদুরি না দেখিয়েই বলল সুখন।

তারপর বলল, 'আপনি একা থাকলেও ভয় করত না। থাকলেই অভ্যেস হয়ে যেত।'

তারপর কথা ঘুরিয়ে বলল, 'আপনি আশ্চর্য মেয়ে। এই রাতে বনের হায়নাকে ভয় পেলেন, আর এই অশিক্ষিত লোকটাকে, যে লোকটার সঙ্গে আপনার কোনো ব্যাপারেই কোনো দিকেই মিল নেই, সেই মিস্ত্রিটার সঙ্গে রাতের বেলায় এখানে থাকতে ভয় পেলেন না? আপনাকে সত্যিই বুঝতে পারলাম না। আপনি ভীষণ অন্যরকম।'

আপনিও—মহুয়া ভয় কাটিয়ে উঠে বলল।

সুখন বলল, 'আমি যদি আপনাকে নিয়ে ওই সামনের গভীর জঙ্গলে পালিয়ে যাই, তখন কী করবেন?'

'কিছুই করব না'। স্পষ্ট গলায় মহুয়া বলল।

তারপরই বলল, 'পারবেন? আমাকে নিয়ে সত্যিই পালাতে পারবেন? তাহলে বুঝব আপনার সাহস কত? আমি কিন্তু পালাতে পারি! এমন সুন্দর জায়গা—আহা!'

'আশ্চর্য!' বলেই সুখন উঠে দাঁড়াল।

উঠে প্যান্টের পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরাল। সুখনকে রীতিমতো চিন্তিত দেখাচ্ছিল। ওর মনে হল, এমন চিন্তায় ও জীবনে আগে পড়েনি। ওর সমস্ত বুদ্ধি দিয়েও মহুয়াকে ও পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারল না। এই মুহূর্তে নিজেকেও না।

ও পায়চারি করতে লাগল বারান্দায়—সিগারেট টানতে টানতে।

মহুয়া আড়চোখে দেখছিল সায়াহ্নকারে জ্বলন্ত সিগারেটের আগুনটা একবার বাড়ছে আর একবার কমছে।

সিগারেট খাওয়া শেষ করে, হঠাৎ আগুনটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল সুখন।

কালুয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘরের সামনে শুয়ে ছিল—ও হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল—যেমন অদ্ভুত দীর্ঘশ্বাস একমাত্র কুকুররাই ফেলতে পারে।

কালুয়ার দিকে একঝলক তাকিয়েই সুখন সহজ গলায় বলল, 'চলুন এবার যাওয়া যাক। আপনার বাবা ও কুমারবাবু চিন্তা করবেন। ইতিমধ্যে ওঁরা খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন নিশ্চয়ই।'

মহুয়া বলল, 'এখন না। এখুনি আমি যাব না। আমি এখানে থাকব।'

তারপর হঠাৎ ধরা-গলায় আবার বলল, 'আমি এখানেই থাকব।'

সুখনের মনে হল, 'এখানেই' এবং 'থাকব' কথা দুটির উপর অস্বাভাবিক জোর দিল যেন মহুয়া।

সুখন দৌড়ে এল মহুয়ার কাছে। এসে মহুয়ার চোখে খুব কাছ থেকে তাকাল।

মহুয়া ওর চোখে চাইল। অস্ফুটে বলল, 'আমি কিন্তু সত্যি-সত্যিই থাকব—সত্যি।'

সুখন হেসে ফেলল। বলল, 'পাগলি। আপনি একেবারে পাগ্‌লি। কী যে বলেন, তার ঠিক নেই।'

মহুয়া রাগ করে, জেদ ধরে বলল, 'আমি যা বলছি, অনেক ভেবে বলছি।'

তারপরই বলল, 'আমাকে বুঝি আপনার অপছন্দ?'

সুখন ওর ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে ওর ঠোঁট বন্ধ করে দিল। বলল, 'এবারেই ঠিক বলেছেন।'

তারপর বলল, 'আপনাকে অপছন্দ করবার মতো লোক কি কেউ আছে? কিন্তু আপনি কী বলছেন, আপনি জানেন না। আমি কী, কেমন লোক, কী পরিবেশে থাকি, কীরকম মিস্ত্রিগিরি করি সবই তো নিজের চোখে দেখলেন—তারপরও কী করে বলি যে, আপনি সুস্থ? আপনার সত্যিই মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

সুখন অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আমাকে কষ্ট দিয়ে আপনার কী লাভ? কালই তো গাড়ি সারানো হয়ে গেলে চলে যাবেন—আমি যা, যেমন আছি, তাই-ই থাকব। আমি থেমে-থাকা গাড়ি সারাই—এই-ই আমার কাজ।'

তারপরই একেবারে চুপ করে গেল সুখন।

মহুয়া তেমনই দাঁড়িয়ে রইল ওর সামনে নিথর হয়ে।

দীর্ঘ নীরবতার পর সুখন বলল, 'সব গাড়িই সারানো হয়ে গেলে এক সময় ধুলো উড়িয়ে, হর্ন বাজিয়ে চলে যায়। আমি যেখানে থাকার সেখানেই থাকি, থাকবও। আমার সঙ্গে এতবড় রসিকতা করবেন না। প্লিজ, আপনাকে বারণ করছি, এমন করবেন না।'

মহুয়া সুখনের কাছ থেকে সরে গিয়ে ভীষণ রেগে গিয়ে বলল, 'কী? আমি রসিকতা করছি?'

মহুয়ার ছোট্ট কপালের মস্ত টিপটার অর্ধেক মুছে গেছিল, এক কোমর চুলের খোঁপাটা ভেঙে গেছিল—কপালের চুল লেপটে ছিল কানের পাশে। ওর নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠছিল, চোখে আগুন জ্বলছিল।

মহুয়া বলল, 'ভীতু, ভীষণ ভীতু আপনি।'

সুখন কী করবে ভেবে পেল না। কী করবে, কেমন করে ওর অন্তরের তীব্র আনন্দ এবং অসহায়তা ও মহুয়াকে বোঝাবে তা বুঝতে পারল না।

সুখনের ইচ্ছে হল অনেক কিছু বলে, কিন্তু কিছুই না বলে ও চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

মহুয়া ঝাঁপিয়ে এসে সুখনের বুকে ওর নরম হাতের ছোট্ট ছোট্ট মুঠি দিয়ে বারবার আঘাত করতে লাগল। বলতে লাগল, 'ভীতু, কাপুরুষ!'

সুখন কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

চাঁদটা আরও উপরে উঠেছে একটা হলুদ থালার মতো। হলুদ চাঁদের আলোয় বিশ্বচরাচর ভরে গেছে। সন্ধের পর থেকেই যে ঠান্ডা হিম-হিম ভাবটা বনে-পাহাড়ে ভরে যায়, তাতে মহুয়া, করৌঞ্জ আর শালফুলের গন্ধ মিশে গেছে। পাশ থেকে একটা কোকিল নাভি থেকে স্বর তুলে ডাকছে—কুহু-কুহু-কুহু-কুহু—দূর থেকে তার সঙ্গিনী সাড়া দিচ্ছে শিহর তুলে কুহু-কুহু-কুহু।

সুখনের মাথার মধ্যে একজন মিস্ত্রি হাতুড়ি পিটিয়ে কোনো গাড়ির বাঁকা মাডগার্ড সিধে করছিল ক্রমান্বয়ে—হাতুড়ির পর হাতুড়ি মেরে।

সুখন সেই সুন্দরী হাওয়া-লাগা আমলকী বনের মতো থরথর করে ভালোবাসায় কাঁপতে-থাকা সুগন্ধি মহুয়ার দিকে একবার ভালো করে চাইল। তারপরই তার হাত ধরে বলল, 'চলুন।'

সুখনের মনে হল, সে তার জন্মস্থানের গ্রহ-নক্ষত্রের নির্ভুল নির্বন্ধ-র দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। এই গন্তব্য যেন বহুদিন আগে থেকেই নির্দিষ্ট ছিল।

সুখন নিজেকে বুঝতে পারল না। সুখনের মনে হল, এই বড়লোকের বেড়াতে-আসা মেয়েটি—সুখনের অনেকানেক জমিয়ে-রাখা অপমানের গ্লানি, অসম-ব্যবহারের ক্রোধ—এই সবকিছুকে নিবিয়ে ফেলার সুযোগ দিতে এসেছে।

সুখনের চোখ জ্বলে উঠল মুহূর্তের জন্যে। ও আর মানুষ নেই, ও হায়নার মতো কোনো অশ্লীল জানোয়ার হয়ে গেছে বলে ওর মনে হল।

মহুয়া একটু ভয় পেল। বলল, 'কোথায়?' বলেই ঘরের দিকে পা বাড়াল।

সুখন বলল, 'এখানে নয়, আপনি ঘরের মধ্যের নন, আপনি যে মহুয়া— প্রকৃতির; জঙ্গলের। জঙ্গলে চলুন।'

মহুয়ার হাত ধরে পাহাড়ি ঘুরালের মতো নেমে চলল সুখন পাকদণ্ডী দিয়ে নীচের ঝরনার দিকে।

মহুয়া হাঁপাচ্ছিল, অমন খাড়াপথে নামা ওর অভ্যেস ছিল না। ওর হাঁটু, দু' উরু উত্তেজনায়, নিষিদ্ধ ভালো-লাগায় এবং একটু ভয়েও থরথর করে কাঁপছিল। সুখন ওকে এক ঝট্‌কায় কোলে তুলে নিল; তারপরই কাঁধে।

তারপর তরতর করে নেমে এল নদীর খোলে। সেখানে পৌঁছেই মহুয়াকে নামিয়ে দিয়ে ওর দুই সবল হাতে মহুয়ার নরম মহুল ফুলের মতো ছিপছিপে শরীর জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চুমু খেতে লাগল সুখন যে, মহুয়ার নিশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এল। ছটফট করতে লাগল মহুয়া।

সুখন ওকে ছেড়ে দিতেই মহুয়া এতক্ষণের, হয়তো এত বছরের রুদ্ধ আবেগ ও মেয়েলি কামের তীব্র অথচ চাপা উচ্ছ্বাসে সুখনকে চুমুতে চুমুতে ভরে দিল।

মহুয়া থামলে, সুখন বলল, 'আসুন, সব কিছু খুলে আসুন।'

মহুয়া মুখ নামিয়ে অন্যদিকে চেয়ে লাজুক গলায় বলল, 'সব?'

'হ্যাঁ, সব',—কঠিন গলায় বলল সুখন।

সুখনের চোয়াল শক্ত হয়ে এল।

চাঁদের আলোয় সুখনের দিকে চেয়ে মহুয়ার মনে হল যে, এ লোকটাকে জানে না ও। একেবারেই চেনে না।

মহুয়ার মনে হল, একটা নিরীহ, ঘুমন্ত বাঘকে গুহা থেকে বের করে এনেছে ও খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে। বাঘটা এবার বদলা নেবে। বাঘটার শরীরের পেশী ফুলে উঠেছে, গলায় ঘড়ঘড়ানি শব্দ উঠেছে। বাঘটা বুঝি ওকে আঁচড়ে-কামড়ে রক্তাক্ত করে দেবে।

পাথরের মধ্যে কী যেন একটা পড়ার শব্দ হল। জিনিসটা পড়েই পাথরে গড়িয়ে বালিতে থামল। সুখন তুলে নিল জিনিসটা। চাঁদের আলোয় গোলাকার পদার্থটা চক্‌চক্ করছিল।—বল্ বেয়ারিং।

সুখন হেসে ফেলল। বলল, 'এ কী?'

মহুয়াও লাজুক হাসি হাসল। বলল, 'বুকের মধ্যে রেখেছিলাম।'

'এত ভালোবাসেন আপনি এগুলো? আপনি এখনও ছোটই আছেন। সত্যিই ছোট আছেন। আপনি মিছেই ভাবেন যে আপনি বড় হয়ে গেছেন।'

তখন জঙ্গলের ভিতর থেকে, নদীর অববাহিকায় ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে একটা পিউ-কাঁহা পাখি

ডাকছিল। ক্রমান্বয়ে ডেকেই চলেছিল, পিউ-কাঁহা, পিউ-কাঁহা বলে। অন্য পাশ থেকে ঢাব্ পাখি ডাকছিল, গম্ভীর ভূতুড়ে গলায় ঢাব-ঢাব-ঢাব-ঢাব। পিউ-কাঁহার গলায় মহুয়া আর সুখনের আসন্ন মিলনের আনন্দ উড়ছিল, আর ঢাব পাখির স্বরে ওদের অসামাজিক নিষিদ্ধ সম্পর্কের গোপনীয়তা।

কালো পাথরের পাশে পিছন ফিরে দাঁড়ানো বিবসনা, চুল-খোলা মহুয়াকে চাঁদের আকাশের পটভূমিতে দেখে সুখনের মনে হচ্ছিল যে, মহুয়াই পৃথিবীর প্রথম ও শেষ নারী। এই শালফুল, করৌঞ্জ আর মহুয়ার গন্ধের মধ্যেই ও জন্মেছিল, এরই মধ্যে ওর পরম পেলব পরিণতি।

সুখন নিজের বশে ছিল না। উচিত-অনুচিত বোধ, ভবিষ্যতের সব কথা, ওর মস্তিষ্ক থেকে মুছে গেছিল।

সে-মুহূর্তে সুখনের মনে হচ্ছিল যে, নারীমাত্রই বুঝি মহুয়ার মতো। তারা জন্মায়, হাসে, খেলে, তারা খেলায়; নিজেরা পূর্ণ হয়, পরিপ্লুত করে পুরুষকে। করেই, আবার চাঁদের আলোয়, ফুলের গন্ধে ভাসতে ভাসতে অন্য পরিপ্লুতির দেশে, নতুন আবেশের, আবেগের দেশে ভেসে যায়। নারীরা কাছে থাকে, বাঁচে ও বাঁচায়। পুরুষকে উজ্জীবিত করে, পুরুষের জীবনে নরম সুগন্ধি সব ফুল ফোটায়; কিন্তু তারা নিজেরা কখনও ফুরোয় না; ঝরে যায় না।

সাদা বালির মধ্যে হোলির চাঁদকে সাক্ষী রেখে, ফুলের গন্ধে মন্থর বাতাসকে সাক্ষী রেখে, মহুয়া সুখনের সঙ্গে এক দারুণ সুগন্ধি খেলায় মাতল।

খেলে, খেলিয়ে, আনন্দ দিয়ে, আনন্দ পেয়ে, ফুরিয়ে দিয়েই নতুন করে ভরিয়ে দিয়ে ওরা দুজনেই এক তীব্র ভালোবাসায় বিভোর হয়ে যেতে লাগল। করৌঞ্জের গন্ধের মতো, চাঁদের আলোর মতো ওরা একে অন্যের মধ্যে এবং দুজনে প্রসন্ন প্রকৃতির মধ্যে অঙ্গীভূত হয়ে গেল।

পাখিটা ডেকেই চলল, পিউ-কাঁহা, পিউ-কাঁহা, পিউ-কাঁহা।

মহুয়া অস্ফুটে বলল, 'সুখ, আপনি কোথায়? আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না।'

সুখন মহুয়ার চোখে চুমু খেল। ফিসফিস করে বলল, 'এই তো আমি, আমি এই যে!'

তারপর ওর ঠোঁটে ঠোঁট নামিয়ে এনে বলল, 'সুখকে দেখা যায় না শুধু অনুভব করতে হয়।'

ক্ষণকালের জন্যে মহুয়ার মন একেবারে অসাড় হয়ে গেছিল। সমস্ত সাড় তখন তার শরীরেই শুধু দাপাদাপি করে ফিরছিল। এমনটি ওর জীবনে আর কখনও হয়নি।

উপরে তারা-ভরা, চাঁদ-ওরা আকাশ, ঝুঁকে-পড়া শালবন; ঝিঁঝিদের ঝিন্‌ঝিনি।

তখন চতুর্দিকে রাত ঝরছিল, চাঁদ ঝরছিল; মহুয়ার শরীরের ভিতরে মহুয়া ঝরছিল ধীরে-ধীরে। ফিস্-ফিস্-ফিস্-ফিস্-ফিস্।

৫

একটা চ্যাটানো চওড়া পাথরে সুখনের পাশে পা ঝুলিয়ে বসেছিল মহুয়া। একটা একলা টিটি পাখি টিটির-টি—টিটির-টি করে ডাকতে ডাকতে জঙ্গলের গভীরে উড়ছিল।

ওরা কতক্ষণ যে অমন করে বসেছিল তা ওদের দুজনেরই হুঁশ ছিল না কোনো।

অনেকক্ষণ পর যেন স্বপ্নোত্থিতের মতো মহুয়া বলল, 'শুনুন।'

সুখন বলল, 'উঁ...।'

—এখানেই থাকা হবে?

—থাকুন। আপনি তো বললেন চিরদিন থাকবেন।

—বলেছিই তো!

—জানি।

—কী জানেন?

—বলেছিলেন যে, সে কথা।

—আপনার কী এখনও সন্দেহ আমাকে?

—আপনাকে? না, না। আপনাকে সন্দেহ নয়।

—তবে?

সুখনের মনে এখন বড় প্রশান্তি। এত সুখ এত শান্তি ও জীবনে আগে কখনও জানেনি। পৃথিবীর সব অশিক্ষিত পয়সাওয়ালা গাড়ি-চড়া খদ্দেরদের ও ক্ষমা করে দিল। এই মুহূর্তে সুখন বড় উদার, মহৎ; সুখী মানুষ।

মহুয়ার প্রশ্নের উত্তরে সুখন বলল, 'আমাকে আমি চিনি না।'

—আমি চিনি।

—'চেনেন? ভাবতে ভালো লাগছে যে, আমাকে কেউ, অন্তত একজনও চেনে! তারপরই বলল, 'চলুন। ক'টা বাজে বলুন তো?'

—আটটা। রেডিয়াম দেওয়া হাতঘড়িতে দেখে বলল মহুয়া।

তারপর বলল, যেতে ইচ্ছে করছে না।

ও উঠে দাঁড়াতেই কালুয়া পাথরের আড়াল থেকে কুঁই-কুঁই করে ডেকে উঠল।

সুখন মহুয়ার শাড়ি থেকে বালি ঝেড়ে দিতে দিতে বলল, 'দেখেছেন, কালুয়াটার কীরকম ঈর্ষা। মেয়েরা, মানে মেয়ে মাত্রই ঈর্ষাকাতর।'

মহুয়া বলল, 'আমি কী শুধু কোনো কুকুরীরই ঈর্ষার পাত্র?'

সুখন হাসল। বলল, 'যেমন আপনার রুচি। সুখন মিস্ত্রিকে যার ভালো লাগল তাকে ঈর্ষা করবে আর কে?'

মহুয়া উম্‌ম্—ম্‌ম্ করে একটু মিথ্যে আপত্তি জানাল।

সুখন বলছিল, নিজের মনেই—তুমি বড় সুন্দর মহুয়া! সত্যিই তোমার মতো সুন্দর কিছুই আমি দেখিনি জন্মের পর থেকে।

দেখতে দেখতে ওরা শাকুয়া-টুঙ-এ উঠে এল।

সুখন বলল, 'জানেন, আমি মিস্ত্রিদের বলি যে, আমি মরলে এখানে আমাকে কবর দিয়ে রাখতে। ওরা বলেছে দেবে। ভাবছি, এখন থেকেই এ জায়গাটাতে অনেকগুলো মহুয়া গাছ লাগিয়ে রাখব।'

মহুয়া রাগত গলায় বলল, 'থাক্ অন্য কথা বলুন।'

সুখন বলল, 'হ্যাঁ, যা যা কথা আছে বলে ফেলুন। সময় খুব কম। সময় বড় তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়।'

মহুয়া আবার বলল, 'আশ্চর্য, আপনি এখনও আমাকে সিরিয়াসলি নিলেন না? আরও কিছু কী চান আপনি আমার কাছে?'

বাইরে থেকে ঘরের দরজা বন্ধ করতে করতে সুখন বলল, 'কিছু না। যা দিয়েছেন, সেটুকুর দামই দিতে পারব না এ জন্মে। আর কী চাইব?'

মহুয়া চুপ করে রইল।

মনে মনে বলল, যে-দানের কথা সুখন বলছে তার দাম কিছুই নয়। যা ওকে মহুয়া সত্যিই দিয়েছে তার দাম কী ও কখনও বুঝবে?

ওরা শাকুয়া-টুঙ-এর টিলা ছেড়ে নীচের শালবনে নেমে এল। তারপর পাশাপাশি হাঁটতে লাগল।

সুখন মহুয়ার হাতটা নিজের হাতের মুঠোয় নিল।

বলল, 'আপনার হাতের আঙুলগুলো কী সুন্দর! আপনার সব সুন্দর।'

মহুয়া জবাব দিল না। বলল, আমি একটা কথা ভাবছি।

—কী কথা? বলুন?—সুখন মুখ তুলে বলল।

মহুয়া অনেকক্ষণ দ্বিধা করল। তারপর বলল, 'যদি কিছু হয়?'

সুখন প্রথমে বুঝতে পারেনি মেয়েলি কথাটা। বুঝতে পেরে বলল, কিছু হবে না।

—আহা। আপনি যেন সব জানেন!

—সব জানি না। তবে আমার মন বলছে, কিছুই হবে না।

—তবুও যদি কিছু হয়ে যায়!

—আপনার এখন ভয় করছে বুঝি? খারাপ লাগছে?

—ভয় নয়। খারাপ তো নয়ই। কীরকম অবাক লাগছে।

—স্বাভাবিক। কী করে যে হঠাৎ ব্যাপারটা ঘটে গেল, আমিও বুঝে উঠতে পারছি না।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, আপনি কী চান?

—মানে?

—মানে, কী—ছেলে না মেয়ে?

—মহুয়া লজ্জা পেল। মুখ ঘুরিয়ে নিল।

সুখন অবাক হল।

মেয়েদের সত্যিই বোঝা মুশকিল। কীসে যে লজ্জা পায়, আর কীসে যে পায় না!

একটুক্ষণ পর মহুয়া লাজুক গলায় বলল, ছেলে।

তারপরই বলল, 'ঠিক আপনার মতো।'

সুখন স্বগতোক্তির মতো বলল, 'যদি ছেলে হয় তার নাম রাখবেন পলাশ।'

—পলাশ? মহুয়া মুখ তুলে তাকাল।

—পলাশ ভালো না?

—ভালো। খুব ভালো। মহুয়া বলল।

—আর যদি......? মহুয়া শুধোল।

—মেয়ে হলে তার নাম রাখতে পারেন—টুঁই!

—টুঁই?

হ্যাঁ। টুঁই। টুঁই পাখি দেখেননি? টিয়ার মতো। কিন্তু খুব ছোট্ট পাখি—নরম কোমল কচি-কলাপাতা-সবুজ তার গায়ের রং, চিকন গলায় ডাকে, টি-টুঁই-টুঁই—টি-টুঁই টি-টুঁই। প্রাণে ভরপুর। গাছের চারায়-চারায় উড়ে বেড়ায়—ছটফটে—মিষ্টি। কোথাও একদণ্ডর বেশি স্থির হয়ে বসে না।

—বাঃ বেশ নাম তো!

জঙ্গলটা পেরিয়ে আসতেই দূরের বড় রাস্তায় চোখ গেল ওদের।

আলো-জ্বালা একটা বাস হু হু করে চলে গেল রাঁচীর দিকে।

—এই রে!—বলল সুখন।

তারপর বলল, কপালে খুব গালাগালি আছে আপনার বয়-ফ্রেন্ডের কাছে।

'কেন?' সন্ত্রস্ত চোখে মহুয়া তাকাল।

—মনে হচ্ছে বাস স্ট্রাইক মিটে গেছে। সকাল থেকে আমি উধাও। শাকুয়া-টুঙে চলে না গেলে

এতক্ষণ তো আপনাদের গাড়ি ঠিক করে দেওয়া যেত। তাহলে আর আপনাদের এতক্ষণ কষ্ট করে ফুলটুলিয়ায় থাকতে হত না। এতবড় একটা দুর্ঘটনা থেকেও হয়তো বেঁচে যেতেন আপনি।

মহুয়া প্রথমে জবাব দিল না কথার। তারপর বলল, 'দুর্ঘটনা বলছেন কেন?'

না। এমনিই বললাম।—সুখন বলল।

একটু পর মহুয়া বলল, আমরা কী একসঙ্গে বাড়ি ফিরব?

এই কথাটার সঙ্গে সঙ্গে এতক্ষণের এই কয়েক ঘণ্টার পরজ-বসন্ত আবহাওয়াটা উধাও হয়ে গেল। কেমন বেসুর, বেতাল। ওরা দুজনেই একই সঙ্গে বুঝত পারল যে, ওদের ছাড়াছাড়ি হওয়ার সময় হয়েছে। জঙ্গলে অনেক কিছু হয়, কিন্তু শহরে হয় না। জঙ্গলের সত্য এখানে মিথ্যা। সব মিথ্যা।

সুখন বলল, 'একসঙ্গে বাড়ি ঢুকতে আমার আপত্তি নেই, ভয়ও নেই। তবে আপনার দিক থেকে বোধহয় সেটা ঠিক হবে না। জঙ্গলের জাদুর বশে জংলি লোকের সঙ্গে যা ব্যবহার করেছেন, এই লোকালয়ে, আপনার বাবার সামনে, বয়-ফ্রেন্ডের সামনে তো তেমন করলে চলবে না। জঙ্গলের গন্ধ জঙ্গলেই থেকে যাবে। সেই জঙ্গলের মধ্যের ঝরনার বুকের মহুয়া, আর যে-মহুয়া সকালে চলে যাবে সে তো এক নয়!'

মহুয়া মুখ ঘুরিয়ে একবার সুখনকে দেখল। তারপর বলল, 'আমরা একসঙ্গেই যাব।'

না। আমরা একসঙ্গে যাব না—সুখন বলল।

ততক্ষণে ওরা দহটার পাশ দিয়ে বাঁধের উপরে এসে পৌঁচেছে। পিছনে ফেলে-আসা জঙ্গলের শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ সমস্তই সেই চন্দ্রালোকিত রাতে এক মোহময় স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে।

সুখন জানে যে, সেই স্বপ্নে সে আবার ফিরে যাবে। রোজই ফিরে যাবে। কারণ জঙ্গলের মধ্যেই তার জীবন, তার জীবনের অঙ্গ এই স্বপ্ন। কিন্তু মহুয়া আর কখনও এখানে ফিরবে না। ফিরতে পারবে না। কালি পোকা যেমন আলোর দিকেই ওড়ে, তেমনই শহুরে পরিবেশেব কাছাকাছি এসে মহুয়া ওর ভিতরে নিশ্চয়ই একটা প্রবল প্রত্যাবর্তনের তাগিদ অনুভব করছে। বড়লোকের সুন্দরী মেয়ের এক ক্ষণিক খুশির খেয়ালে সুখন মিস্ত্রিকে তার ভালো লেগেছিল, জঙ্গলের আবেশে তার নেশা ধরেছিল, শহরে ফিরলেই সে যে সমাজের লোক সেই সমাজে পৌঁছলেই পুরো ব্যাপারটাকে—মহুয়া "আ গ্রেট ফান, অর অ্যান অ্যাকসিডেন্টাল এপিসোড" ছাড়া অন্য কিছুই হয়তো ভাববে না।

এই মুহূর্তে সুখনের বুকে ভাবী একটা চাপা কষ্ট হচ্ছিল। সুখন জানে যে, এই কষ্টটা বেশ কিছুদিন তাকে পেয়ে বসবে; চেপে থাকবে বুকে ভারী পাথরের মতন। একটা গভীর ক্ষতর মতো দগদগ্ করবে অনেকদিন। যখনই বাতাসে মহুয়ার গন্ধ পাবে ও, তখনই এই রক্তমাংসের নরম মিষ্টি এক-কোমর চুলের, দীঘল-কালো চোখের মহুয়ার কথা মনে পড়বে। তারপর একদিন সবই ঠিক হয়ে যাবে। রুখু বাতাসে, টান আবহাওয়ায়, ক্ষতটা একদিন শুকিয়েও যাবে। যদি তাড়াতাড়ি না শুকোয় তখন বোতল বোতল মহুয়ার মদ ঢালবে গলায়—বিশল্যকরণী। তবু সুখন এও জানে যে, ক্ষত শুকোলেও ক্ষতর দাগটা থেকেই যাবে।

সুখন মহুয়ার পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিল যে, মেয়েরা যত সহজে সব কিছু ভোলে নিজেদের স্বার্থে, নিজেদের প্রয়োজনে—পুরুষরা অত সহজে পারে না।

সুখন ওর জীবনে বেশি মেয়ে দেখেনি; কিন্তু যে-ক'জনকে দেখেছে, গভীরভাবে, মনোযোগের সঙ্গে, অত্যন্ত কাছ থেকে দেখেছে। তাদের দেখে সুখনের এই ধারণাই হয়েছে যে, যাযাবর বৃত্তিতে মেয়েদের কাছে বেদেরাও লজ্জিত হয়।

ঘোর কাটিয়ে সুখন বলল, 'মহুয়া, একটু দাঁড়ান।'

মহুয়া ওর দিকে ফিরে দাঁড়াল।

সুখন ওকে বুক টেনে নিল। নিয়ে চুমোয় চুমোয় ভরে দিল। ওর সুন্দর পাহাড়ি-ঘুঘুর মতো বুকের সন্ধিস্থলে নাক ডোবাল। মহুয়ার চোখ দুটি বড় সুন্দর। এমন আবেশ-ভরা দৃষ্টি সুখন কখনও দেখেনি; হয়তো আর দেখবেও না।

মহুয়া আবেশে চোখ বুজে রইল। তারপর সুখনের দাম সুখনকে ফিরিয়ে দিল। সুখনকে ছেড়ে দিয়ে বলল, সাধ মিটেছে?

সুখন হাসল। বলল, সাধ কী মিটবার?

তারপরই কেজো-গলায় বলল, আপনি এইদিক দিয়ে গিয়ে বড় রাস্তায় উঠুন। তারপর সামনে দিয়ে বাড়িতে ঢুকুন কোনো ভয় নেই। তবুও আপনি ভয় পেতে পারেন বলেই আপনাকে লক্ষ রাখব। আপনি বাড়ি ঢুকে যাবার একটু পর আমি যাব—পিছনের দরজা দিয়ে। কেমন?

মহুয়া সামনের দিকে পা বাড়াল। সুখন তার ডান হাতটি নিজের ডান হাতে তুলে নিয়ে চুমু খেল। নরম গলায় বলল, 'আসুন মহুয়া।'

মহুয়া থমকে দাঁড়াল। মুখ নামিয়ে নিল। বলল, আসি।

সুখন দেখতে পাচ্ছিল টর্চ হাতে কারা যেন এদিক-ওদিক ঘেরাফেরা করছে। হয়তো সান্যাল সাহেবরা। ওঁদের পক্ষে চিন্তিত হওয়া স্বাভাবিক।

মহুয়া চাঁদ-ভেজা অসমান জমি বেয়ে নিজস্ব পা ফেলার অভিজাত ছন্দে হেঁটে যাচ্ছে বড় রাস্তার দিকে। লতানো হাতে জড়িয়ে খোঁপাটা বেঁধে নিয়েছে। ওর ছিপছিপে শরীর একটা আলতো সুগন্ধি ছায়ার মতো সরে যাচ্ছে—দূরে—ক্রমাগত দূরে; অন্য ছায়াদের গভীরে।

কালুয়াটা সুখনের পায়ের কাছে বসে মহুয়ার দিকে মুখ তুলে চেয়েছিল।

সুখন সিগারেট ধরিয়ে একদৃষ্টে সেই অপস্রিয়মাণ ছায়াটির দিকে চেয়ে রইল।

পিছনের খোওয়াই-এর উপরে একটা একলা টিটি পাখি ডেকে ফিরছিল।

সুখন মিস্ত্রি জীবনে কখনও এত দুর্বল বোধ করেনি এর আগে। এত মঙ্গলকামনায়, এত শুভভাবনায় ভরপুর হয়ে চলে-যাওয়া কারও পথের দিকেই এমন করে আর তাকায়নি সে।

হঠাৎ সুখন অনুভব করল তার চোখের কোল ভিজে গেছে।

সুখন এক ঝটকায় সিগারেটটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল—এই মিস্ত্রি। হচ্ছে কী? এটা কী হচ্ছে? শালা। বাঁদর হয়ে চাঁদে হাত। চল্ শালা, আর্মেচারে তার জড়াবি। ডিস্ট্রিবিউটারের কার্বন পরিষ্কার করবি!

জীবনে এই প্রথমবার সুখনের মনে হল, ওর মনের ডিস্ট্রিবিউটরেও বড় ময়লা জমেছে। ভালো করে খুলে ওটাকে একদিন পরিষ্কার করতে হবে। প্লাগগুলো থেকেও ঘষে ঘষে কার্বন তুলতে হবে।

ও জানে যে, রোম্যান্টিকতার রঙবাজি সুখন মিস্ত্রিকে মানায় না। মানাবে না কোনোদিনও।

৬

কুমারের যখন ঘুম ভেঙেছিল, তখন বেলা পড়ে এসেছিল।

ঘর থেকে বারান্দায় এসে মোড়ায় বসল কুমার।

ওকে উঠতে দেখে মংলু চা বানিয়ে দিল, সঙ্গে হালুয়া আর পাপড়ভাজা।

এইসব হালুয়া-মালুয়া দিশি খাবার পছন্দ করে না কুমার। কেমন পিছলে-পিছলে যায়। যখনই

ও হালুয়া খেয়েছে—এই হালুয়ার সঙ্গে 'লে হালুয়া' কথাটার কী সম্পর্ক ও ভাববার চেষ্টা করেছে। কিন্তু ভেবে পায়নি।

চা খেতে খেতে একটা বিলিতি লম্বা সিগারেট ধরাল কুমার। মংলুকে শুধোল, এই ছোকরা, তোর ওস্তাদ কোথায়?'

মংলু বলল, জানি না।

—দিদিমণি কোথায়?

—বেড়াতে গেছেন।

—আর বুড়ো বাবু?

—উনিও বেড়াতে গেছেন।

—একই সঙ্গে দু'জন?

—না। আলাদা, আলাদা। আগে, পরে।

কুমারের মাথার মধ্যে 'লে হালুয়া' কথাটা ফিরে এল।

তারপরই আবার ও মংলুকে জেরা করল, একই দিকে?

'জানি না। দেখিনি।' সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল মংলু।

কুমার আর সময় নষ্ট করল না। পায়জামা পরে শুয়েছিল। ছেড়ে ফেলে, জামাকাপড় পরে নিল। ইমপোর্টেড হলুদ কাপড়ের ট্রাউজার আর ঘন বেগুনি-রঙা গেঞ্জি। পোশাক পরে আয়নার সামনে দাঁড়াল।

মনে মনে বলল—এমনই মিস্ত্রি, ঘরে একটা ভদ্রগোছের আয়নাও রাখতে পারেনি। অবশ্য কীসের জন্যেই বা রাখবে? অমন চাঁদবদন দেখার আর কী আছে?

আয়নার সামনে দাঁড়াতে খুব একটা পছন্দ করে না কুমার। ওর চেহারাটা দিন-কে-দিন গুড়ের হাঁড়িতে পড়া নেংটি ইঁদুরের মতো গুড়-চুক্-চুক্ অথচ পাকানো হয়ে যাচ্ছে। এত পরিমাণে মদ্যপান করছে প্রতিদিন যাতে গায়েগতরে একটু লাগে, কিন্তু কিছুতেই আর কিছু হচ্ছে না। অফিসে ওর যত ভার বাড়ছে, পদ বাড়ছে ওর শরীরের ভার যেন ততই কমছে। এ-একটা প্যারাডক্স। কিছুই করার নেই।

কুমার বেরিয়ে, মহুয়া যেদিকে গেছে বলে জানিয়েছে মংলু, সেদিকে হাঁটতে লাগল রাস্তা ধরে।

রাস্তায় যানবাহন কিছু নেই। কাঁচা লাল ধুলোর রাস্তা। সামনেই একটা নালা। তার উপর কজ-ওয়ে। গাছগাছালির বুনো-বুনো গন্ধ, পাথর- মাথর; রাজ্যের বোগাস্ জিনিস।

একটা মোষের গাড়ি চলেছে ক্যাচোর-কোঁচর করতে করতে। মাথার মধ্যে যন্ত্রণা হয় আওয়াজে।

মনে মনে বিরক্তির পরাকাষ্ঠা ঝরিয়ে কুমার ভাবল, এমনই জায়গা যে, একটা তেমন পানের দোকানও নেই যেখানে সোডা পাওয়া যায়। আজ রাতে তো করার কিছুই নেই। বৃদ্ধ ভাম তো মেয়ে সামলে সামলেই গেল। একমুহূর্ত চোখের আড়াল করে না মহুয়াকে। এখানে মানে কলকাতার বাইরে আসার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মহুয়ার সঙ্গে একটা শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন। আন্‌লেস্ শী ইজ্ গুড ইন বেড, মহুয়াকে বিয়ে করবে না কুমার। ওসব মন-ফন, আজকের মেট্রিক সিস্টেমের দিনে কন্‌ডেমড্ ব্যাপার। এখন শরীরম্ আদ্যম্। এ-ব্যাপারে মিল না হলে খামোখা বিয়ে-ফিয়ের ঝামেলার মধ্যে যাবে না ও। তারপরই ভাবল, সত্যিই কী যাবে না?

কুমার ভাবছিল, মেয়েটাও যেন কেমন। পদি পিসি পদি-পিসি ভাব। এ নিয়ে কীসের এত ফাসস্ করা তা এরকম নেকু-পুষু-মুনু মেয়েরাই জানে।

হঠাৎ কুমার দেখল যে, সান্যাল সাহেব উলটোদিক থেকে আসছেন হন্তদন্ত হয়ে। বিয়ার টেনে টেনে তলপেটটা তরমুজের মতো করেছে বুড়ো।

কুমার ওঁকে দেখে কজ্-ওয়েটার উপরে দাঁড়াল। মোষের গাড়িটা হেভি ধুলো উড়োচ্ছে। এগিয়ে যাক ওটা। তাছাড়া মোষেদের গায়ে একটা বোঁটকা গন্ধ। বুড়ো চান করে বেরোবার পর বাথরুমে এরকম একটা গন্ধ পেয়েছিল কুমার।

সান্যাল সাহেবের হাতে একটা বাঁশের লাঠি। খাকি শর্টস্। গায়ে শাদা কলারওয়ালা গেঞ্জি। অনেকখানি হাঁটতে, ঘামে কপাল মুখ সব ভিজে গেছে।

সূর্য হেলে গেছে পশ্চিমে, অথচ এখনও পাথর থেকে গরমের ঝাঁজ বেরোচ্ছে। হরিবল্ জায়গা।

সান্যাল সাহেব কাছে এসেই বললেন, বড় চিন্তার কথা হল।

কুমার ঠান্ডা, ইমপার্সোনাল গলায় বলল, কী?

—মহুয়া কি ফিরেছে?

না তো।—কুমার বলল।

—সেই বিকেলে নাকি বেরিয়েছে। কোথায় গেল, কোনদিকে গেল, কিছুই বলে যায়নি। প্রায় দু' আড়াই ঘণ্টা হতে চলল। এখুনি সন্ধে হয়ে যাবে। কী করি বলো তো?

সান্যাল সাহেবের গলায় চিন্তার রেশ ছড়িয়ে পড়ল।

কুমার বলল, সেই মিস্ত্রি ব্যাটা কোথায়?

—সে তো তুমি গালাগালি করার পরই বেপাত্তা। ওই ছোকরা চাকরটা বলল যে, ও নাকি খেতেও আসেনি।

'ওরই কনস্‌পিরেসি নয় তো! মহুয়ার যা সফট্-কর্নার দেখছিলাম ওই মিস্ত্রির জন্যে।' চিবিয়ে চিবিয়ে কুমার বলল।

—আহা! কী যা-তা বল কুমার। উ্য শুড নট ফরগেট দ্যাট আফটার অল শি ইজ মাই ডটার। তুমি এমন কথা বলছ বা ভাবছ কী করে?

কুমার বলল, 'আমি কিছুই ভাবছি বা বলছি না। আপনাকে ভাবতে বলছি। আফটার অল সি ইজ ইয়োর ডটার। আমার কে?'

কথাটা বলে, এবং বুড়োকে আরও একটু দুশ্চিন্তায় ফেলে, কুমার খুশি হল। ও লক্ষ করেছে চিরদিনই যে, লোককে আঘাত করে ও ভীষণ আনন্দ পায়। বাক্যবাণে লোককে বিদ্ধ করার আর্টটা ও দারুণ রপ্ত করেছে। সত্যি কথা বলতে কী, ওর ইচ্ছে আছে যে, এই আর্টটা ও কমপ্লিটলি মাস্টার করে ফেলবে।

চিন্তান্বিতভাবে সান্যাল সাহেব আগে আগে এবং কুমার পিছনে পিছনে আবার সুখনের ডেরায় ফিরলেন।

সান্যাল সাহেব খুব আশা করছিলেন যে, ফিরে এবারে মহুয়াকে দেখতে পাবেন। দেখবেন মহুয়া গা-টা ধুয়ে শাড়ি বদলে বারান্দায় বসে বই পড়ছে। মেয়েকে সান্যাল সাহেব বড় ভালোবাসেন। তাছাড়া স্ত্রীর বিকল্পও বটে। মানে, ওঁর অত বড় ফ্ল্যাটে একজন নারীর বিকল্প। মহুয়ার জন্যে যত বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন তিনি, তত বেশি করে বুঝতে পারেন মহুয়াকে তিনি ঠিক কতখানি ভালোবাসেন।

উঠোনে পৌঁছেই তিনি শুধোলেন, 'কী রে? আসেনি এখনও দিদিমণি?'

নাঃ। সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল মংলু।

এই উত্তর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মংলুর মুখেও চিন্তার ছাপ দেখা দিল। দিদিমণি এতখানি দেরি করবে বলে বুঝতে পারেনি মংলু। যদি কোনো বিপদ-আপদ হয়, সাপে কামড়ায়, ভাল্লুকে খোবলায়, দায়িত্ব পড়বে মংলুর ঘাড়ে। যদি কেউ দেখে থাকে যে মংলুর সঙ্গে দিদিমণি শাকুয়া-টুঙের দিকে

গেছে, তাহলে গুঞ্জার দারোগাবাবু এসে নির্ঘাৎ ওকে হাত-কড়া লাগিয়ে থানায় নিয়ে যাবে, তারপরে মারের চোটে বাপের নাম ভুলিয়ে ছেড়ে দেবে।

সুখনের কারখানায় রঙের কাজ করে যে মিস্ত্রি, তার বাড়ি কারখানার কাছেই। সান্যাল সাহেবের পীড়াপীড়িতে মংলু তাঁকে নিয়ে তার বাড়ি গেল।

কুমার বলল, 'আমি এখানেই থাকি। যদি মহুয়া এসে পড়ে, তবে ও একা পড়ে যাবে। তাছাড়া আমি একটু ভেবে দেখি যে, কী করা যায়; কী করা উচিত। একটা অ্যাকশান প্ল্যান।'

সান্যাল সাহেব দিশাহারা হয়ে গেছেন। রাত অনেকক্ষণই হয়ে গেছে। যদিও চাঁদের আলো আছে ফুটফুটে, তবুও অচেনা-অজানা বুনো জায়গা। কোথায় গেল? কী হল মেয়েটার?

রঙের মিস্ত্রি সবে জামাকাপড় ছেড়ে গামছা পরে, লুঙি আর গোলা-সাবান নিয়ে কুয়োতলায় যাচ্ছিল, এমন সময় মংলুর সঙ্গে সান্যাল সাহেব গিয়ে হাজির।

সব শুনে মিস্ত্রি বলল, 'এখানে তো ভয়ের কিছু নেই, তবে জঙ্গলের দিকে সাপের ভয় আছে। গরমের দিনে মহুয়ার সময় ভালুকের ভয়ও আছে। কিন্তু—দিদিমণি জঙ্গলে যাবেনই বা কেন একা একা? খারাপ লোকের ভয় এখানে নেই। আজ হাটবারও নয়। হাটের দিনে লোকে একটু মহুয়া-টহুয়া পচানিটচানি খায়—তখন অনেক সময় মাতাল হয়ে মেয়েদের উপর হামলা-টামলা করে। কিন্তু আজ তো হাটবারও নয়।'

তারপর আশ্বাস দিয়ে বলল, 'যাই হোক বাবু, আপনি যান, আমি তো বাড়িতেই আছি। রাত দশটা পর্যন্ত না ফিরলে আমাকে খবর দিবেন। থানায় নিয়ে যাব আপনাদের।'

সান্যাল সাহেব বললেন, 'যাবে কীসে করে? বাস তো স্ট্রাইক! এখানে ট্যাক্সি পাওয়া যাবে?'

'বাস স্ট্রাইক তো বিকেল চারটেয় মিটে গেছে। বিকেলে বাস গেল দেখলেন না আপনারা?'

অবাক গলায় সান্যাল সাহেব শুধোলেন, মিটে গেছে? আশ্চর্য।

তারপর বললেন, তাহলে তো আমরা আজই গাড়ি সারিয়ে চলে যেতে পারতাম।

রঙের মিস্ত্রি বলল, 'তা পারতেন। কিন্তু আপনার সঙ্গের বাবু ওস্তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলেন বলে ওস্তাদ রাগ করে চলে গেল। উনি থাকলে তো সবই হয়ে যেত। ওই বাবু খারাপ ব্যবহার করেছে শুনে মিস্ত্রিরা বলছিল বাবুকে মারবে। তা ওস্তাদই ওদের বকল। বলল, একদিনের মেহমান; ক্ষমা করে দে।'

সান্যাল সাহেব একমুহূর্ত মহুয়ার কথা ভুলে গিয়ে বললেন, তা তোমার ওস্তাদ গেলেন কোথায়?

—কে জানে কোথায়? ওস্তাদের কথা! পড়েলিখি আদমি। মিস্ত্রি হলে কী হয়। মাথায় অনেক পোকা আছে। বোধহয় শাকুয়া-টুঙে বসে পড়া-লিখা করছে!

—সেটা আবার কী?

—ওই টিলার উপরে ওস্তাদের আস্তানা আছে একটা। চলে যায় সেখানে রাগ-টাগ হলে ছুটিছাটার দিনে।

সান্যাল সাহেব মহা বিপদেই পড়লেন। ফেরার পথে সান্যাল সাহেব মংলুকে শুধোলেন, 'এই শাকুয়া-টুঙটা কোনদিকে রে? তুই চিনিস?'

রঙের মিস্ত্রির কথা শুনে এমনিতেই মংলুর টাগরা শুকিয়ে গেছিল। এবার আরও শুকোল। বলল, 'চিনি। কিন্তু ওস্তাদ ওখানে যাননি।'

—কী করে জানলি যে, যাননি?

—গেলে আমি জানি, গেলে আমাকে বলে যান, জিনিসপত্র নিয়ে যান।

'অ...।' বললেন সান্যাল সাহেব।

ডেরার কাছে এসে অনেকক্ষণ এ-পাশে ঘুরে ঘুরে তারস্বরে মহুয়া, মহুয়া বলে ডাকলেন।

চাঁদনি রাতের বন-পাহাড় সে ডাককে ফিরিয়ে দিল বারে বারে গভীর স্বরে সান্যাল সাহেবের ক্লিষ্ট বুকে; কিন্তু মহুয়া সাড়া দিল না।

বারান্দার সামনে এসে সান্যাল সাহেব দেখলেন যে, কুমার টুলের উপর হুইস্কির বোতল রেখেছে—নিজেই কোথা থেকে জলটল জোগাড় করে একা একা বসে হুইস্কি খাচ্ছে।

অত্যন্ত উত্তেজিত গলায় উনি বললেন, 'তুমি হুইস্কি খাচ্ছ? ভাঙা গাড়িতে আমাদের ভুল রাস্তায় এনে এমন বিপদ ঘটিয়ে, আমার মেয়েটার এমন সর্বনাশ করে এখন তুমি কোন্ আক্কেলে হুইস্কি খাচ্ছ?'

কুমার আরেকটা মোড়া এগিয়ে দিয়ে বলল, 'বসুন, বসুন।' বলেই একটা বড় হুইস্কি ঢেলে ওঁকে দিয়ে বলল, 'আরও একটু দেখুন। তারপর যা করার করতে হবে। একটা সার্চ পার্টি অর্গানাইজ করে চারদিকেই বেরোনো যাবে। এখনও তার সময় হয়নি। তাছাড়া নিন—এটা এক গাল্পে শেষ করুন—উ্য উইল ফিল বেটার।

তারপর একটু থেমে বলল, "দেয়ারস্ নো পয়েন্ট ইন্ ট্রায়িং টু ডু সামথিং, হোয়েন দেয়ারস্ নাথিং টু বী ডান্", ডক্টর চেসারের একটা বইয়ে পড়েছিলাম। 'নিন, হ্যাভ্ অ্যানাদার ওয়ান। কুইক্।'

সান্যাল সাহেব দিশেহারা, হতাশ অবস্থায় কুমারের কথামতো পর পর দুটো বড় হুইস্কি খেয়ে ফেললেন।

তারপর বললেন, তোমার কী মনে হয় কুমার?

কুমার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার মনে হয় আর আধ ঘণ্টার মধ্যে মহুয়া ফিরে আসবে। তার একটু পরেই সুখন মিস্ত্রি। আর আমার যা মনে হয়, তা ঠিকই মনে হয়। চিরদিনই।'

তারপর সান্যাল সাহেবকে অভয় দিয়ে বলল, 'আপনি হুইস্কি খান, হুইস্কি খেতে খেতে দেখুন মহুয়া আসে কী না।'

সান্যাল সাহেব উত্তর না দিয়ে মাথা নীচু করে চুপ করে বসে রইলেন।

কুমার সান্যাল সাহেবকে প্রায় জোর করেই একটার পর একটা হুইস্কি খাইয়ে যেতে লাগল। কিন্তু নিজে অতটা খেল না। কুমারের মাথার মধ্যে পুঞ্জীভূত রাগ এবং প্রতিশোধের স্পৃহা একটা সামুদ্রিক কাঁকড়ার মতো দাঁড়া নাড়তে লাগল।

হঠাৎ উঠোনের দরজায় আওয়াজ হল। সান্যাল সাহেব, কুমার, মংলু সকলে একই সঙ্গে মুখ তুললেন ও তুলল।

মহুয়া দাঁড়িয়েছিল। চুল এলোমেলো, শাড়ি ক্রাশড্। টিপ ধেবড়ে গেছে। মুখের মধ্যে অপরাধ ও ভয় মেশানো একটা আনন্দের ছাপ।

কুমারের মনে হল, আনন্দের ছাপটাই প্রধান।

সান্যাল সাহেব এতক্ষণ মেয়ের শোকে পাগল হয়েছিলেন। ভাবছিলেন, মহুয়া ফিরলে মহুয়াকে বুকে জড়িয়ে ধরবেন। কিন্তু মহুয়া তাঁর চোখের সামনে এসে দাঁড়াতেই বহু বহু বছর আগে দেওঘরের শালবনের মধ্যে ভরদুপুরে দেখা একটি মেয়ের মুখ তাঁর মনে পড়ে গেল। সান্যাল সাহেবের বুঝতে ভুল হল না যে মহুয়া সেই মায়েরই মেয়ে। একই রক্ত বইছে এরও শরীরে। এরা শিকল-কাটার দলে। পায়ে শিকল রাখে না এরা। কোনো শিকলই।

সান্যাল সাহেব রেগে প্রায় চিৎকার করে বললেন, 'কোথায় ছিলে এতক্ষণ?'

—বেড়াতে গেছিলাম বাবা।

—বেড়াতে? এত সময়? তোর চেহারা এরকম হয়েছে কেন?

মহুয়া হাসল। এক দারুণ বিশ্বজয়ী হাসি।

তারপর বলল, 'সে অনেক গল্প বাবা, দারুণ ইন্টারেসিটং। পরে তোমাকে বলব। কিন্তু আই অ্যাম স্যরি যে, তোমাকে এতক্ষণ ভাবিয়েছি। রাগ কোরো না প্লিজ। সোনা বাবা।'

এতক্ষণ কুমার চুপ করেছিল। হুইস্কি সিপ্ করতে করতে মহুয়ার দিকে তাকাচ্ছিল।

হঠাৎ কুমার বলে উঠল, 'সময়টা ভালোই কাটল। কী বলো, তাই না?'

মহুয়া সোজা সর্পিণীর মতো ফণা তুলে তাকাল কুমারের দিকে—তারপর হাসল—আবার সেই হাসি। তারপর চোখে আগুন ঝরিয়ে ঠান্ডা গলায় বলল, 'দ্যাটস্ নান্ অফ ইওর বিজনেস।'

কুমার এক ঢোকে গেলাসটা শেষ করে বলল, 'সার্টেন্লি। আই নো দ্যাট। ইট ইজন্ট্। থ্যাঙ্ক উ্য।'

কুমারের কথা শেষ হতে না হতেই দরজা ঠেলে এসে দাঁড়াল সুখন।

সুখন অন্য কাউকে কিছু বলতে না দিয়েই বলল, 'টাকাটা দিলে ভালো হয়। তিনশো টাকা।'

কুমার ওকে দেখে যেন ক্ষেপে গেল; তড়াক করে দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে মিস্ত্রি? বিকেল চারটেয় স্ট্রাইক মিটে গেল—এতক্ষণে আমরা গাড়ি সারিয়ে চলে যেতে পারতাম বেত্‌লা—কিন্তু তুমি ছিলে কোথায়? তুমি কী মনে করো যে, তোমার এই ফাইভ-স্টার হোটেলে আমরা চিরজীবন থেকে যাব আর তুমি আমাদের যেমন খুশি তেমন ট্রিট করবে? তুমি ভে-ভে-ভে-ভে-বেছ কি।'

কুমারের মুখ দিয়ে একটু থুথু ছিটল। কুমার অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়ায়, তোত্‌লাচ্ছিল।

সুখন ওর দিকে চেয়ে শান্ত গলায় বলল, 'যতখানি উত্তেজনা আপনার সয়, শুধু ততখানিই উত্তেজিত হওয়া উচিত। বেশি নয়। সেটা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। কার্ডিয়াক অ্যাটাক হতে পারে।'

হোয়াট? হোয়াট? বলেই, কুমার সিঁড়ি দিয়ে নেমে সুখনের দিকে তেড়ে গেল। বলল, 'স্কাউনড্রেল—সব জিনিসের সীমা থাকা দরকার। উ্য হ্যাভ সারপাসড্ অল লিমিটস্। বলেই, কেউই যা ভাবতে পারেনি, যা কারও পক্ষেই, এমনকি কুমারের নিজের পক্ষেও ভাবা সম্ভব ছিল না, হয়তো একমাত্র অন্তর্যামী হুইস্কিই যা জানত, তাই করে বসল কুমার।

ঠাস্ করে এক চড় মেরে বসল সুখনকে।

গুলি-খাওয়া বাঘের মতো প্রথমে রুখে দাঁড়াল সুখন। সান্যাল সাহেবের মনে হল আজ কুমারের কুমারত্বর আখ্‌রী দিন। আর কিছুই করার নেই।

কিন্তু পরমুহূর্তেই গায়ে জল-পড়া মেনি বিড়ালের মতো নিজের থেকেই সম্পূর্ণ অজানা কারণে সুখন নিজেকে নেতিয়ে, গুটিয়ে নিল।

যেন বললও আদুরে গলায়, মিঁয়াও।

কুমার ওর সামনে তখনও দাঁড়িয়েছিল ছাতের কার্নিসে ঘাড়ের লোমফোলানো লেজ-ওঠানো হুলো বেড়ালের মতো এক অদ্ভুত হাস্যকর ভঙ্গিতে।

হঠাৎ মহুয়া সুখনকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'আপনি কী মানুষ? আপনার গায়ে কী রক্ত নেই? যে যা বলবে, বা করবে তা আপনি মুখ বুজে সহ্য করবেন? চুপ করে মার খেতেই পারেন—আপনি মারতে পারেন না?' বলেই মহুয়া কেঁদে ফেলল।

সুখন একবার মহুয়ার দিকে আর একবার কুমারের দিকে শান্তভাবে তাকিয়ে আশ্চর্য এক হাসি হাসল। তারপর বলল, 'আমি কাপুরুষ। আমি বীরপুরুষ নই।' বলেই, বেরিয়ে গেল।

বেরিয়ে যেতে যেতে উঠোনের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সান্যাল সাহেবকে উদ্দেশ্য করে বলল, টাকাটা মংলুর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন।

কুমার যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেইখানেই স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ।

এক সময় স্বগতোক্তির মতো কুমার বলল, কিন্তু মহুয়াকে শুনিয়ে—'লম্বা চওড়া পাঠানের চেহারা থাকলেই বীরপুরুষ হয় না। পুরুষত্ব অন্য ব্যাপার। ফুঃ।' বলেই, হুইস্কির বোতল থেকে অনেকখানি হুইস্কি ঢালল গলায়।

৭

টাকাটা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পাঠিয়ে দিয়েছিল কুমার মংলুকে দিয়ে।

মংলু চলে যাবার পরই সান্যাল সাহেব কুমারকে বললেন, তোমার কী এখান থেকে প্রাণ নিয়ে ফেরার ইচ্ছে নেই?

কুমার বলল, 'পৃথিবীতে আমার প্রাণের এনট্রান্সও যেমন আমার ইচ্ছাধীন ছিল না, একজিট্ও নয়।' কিন্তু এ প্রশ্ন কেন? কুমার শুধোল।

কুমার ও সান্যাল সাহেব দুজনেই বেশি হুইস্কি খাওয়ার দরুন "হাই" হয়েছিলেন। কুমার কম। সান্যাল সাহেব বেশি।

সান্যাল সাহেব বললেন, 'রঙের মিস্ত্রির কাছে শুনলাম যে, সকালে তুমি সুখনবাবুকে গালাগালি করার জন্যেই মিস্ত্রিরা বলেছিল মারবে তোমাকে। সুখনই নাকি তাদের থামিয়েছিল। আর এখন তুমি সুখনকে থাপ্পর মেরেছ জানলে তো আমাদের ঘরসুদ্ধ আগুন দিয়ে মারবে।'

কুমার বলল, 'তা আর কী করা যাবে? আপনার অত ভয় লাগলে নিজের ইজ্জৎ রুমালে-মোড়া সিক্নির মতো পকেটে ভরে আপনি আপনার মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে যান কোথাও। আমি একাই থাকব।'

সান্যাল সাহেব বললেন, 'আহা। সে কথা নয়; সে কথা নয়।'

এর পর বেশি কিছু কথা-টথা হল না। কথা বলার মতো অবস্থা বা মনের ভাব মহুয়া, তার বাবা বা কুমার কারোই ছিল না।

রাতেও মুরগির মাংস আর পরোটা বানিয়েছিল মংলু। সান্যাল সাহেব ও কুমার খেলেন। মহুয়া কিছুই খেল না। খাওয়া-দাওয়ার পর ওরা শুয়ে পড়লেন।

সান্যাল সাহেব বললেন, আমার বড় গরম লাগবে ঘরে—আমি বারান্দাতেই শুচ্ছি।

দরজার পাশে বারান্দায় তাঁর চৌপাই বের করে দিল মংলু।

উনি কুমারকে বললেন, 'দরজাটা ভেজিয়ে শুয়ো, আর মহুয়াকে দেখো। আমি তো দরজার সামনেই রইলাম। ভয় নেই। তোমাকে কেউ মারতে এলে আমাকে মেরে তারপর তোমাকে পাবে।'

মংলু যখন কারখানায় গেল টাকাটা নিয়ে, তখন সুখন কারখানাতেই ছিল। মংলু মুখ নীচু করে টাকাটা দিল সুখনের হাতে। মংলুর চোখ জ্বলছিল। বলল, 'ওস্তাদ, তুমি ছেড়ে দিলে কেন ওই লোকটাকে?'

সুখন হাসল। বলল, 'দূর্, ইঁদুর মেরে কী হবে! তুই কিন্তু ওদের যত্ন-টত্ন করিস ভালো করে। টাকা ফুরিয়ে গেলে টাকা চেয়ে নিস আমার কাছ থেকে। আশা করি কাল দুপুর নাগাদ গাড়ি ঠিক হয়ে যাবে। দুপুরেই ওরা চলে যেতে পারবে যেখানে যাবার।'

মংলু বলল আপদ বিদেয় হবে।

সুখন আবার শুধোল, ওরা সকলে খেয়েছে রে?

—হ্যাঁ, কিন্তু দিদিমণি খাননি।

তাই বুঝি? স্বাভাবিক গলায় বলল সুখন।

মংলু শুধোল, আপনি ঘরে যাবেন না?

নাঃ—সুখন বলল।

মংলুর মনে হল ওস্তাদ 'না'-টাকে ওর দিকে ছুঁড়ে দিল যেন।

মংলু আবার শুধোল, খাবার নিয়ে আসব এখানে?

—দূর্। আবার কী খাব? দুপুরে অত খেলাম। তুই খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়। আমার ঘর থেকে একটা বালিশ আর চাদরটা দিয়ে যাস। আজ কারখানাতেই শোবো।

কিছুক্ষণ পর বালিশ আর চাদর বগলে কারখানায় ফিরে এসে মংলু দেখল যে কারখানার শেডের নীচে, অনেকগুলো নামানো ইঞ্জিন ও গিয়ার-বক্সের মধ্যে প্যাকিং-বাক্সের উপরে, পাঁচ লিটারের মবিলের টিন রেখে একটা টেবল-মতো বানিয়ে নিয়েছে ওস্তাদ। তারপর চৌপাইয়ে বসে, সামনে লণ্ঠন রেখে, কাগজ কলম বাগিয়ে বসেছে।

মংলু যেতেই সুখন বলল, 'একটু পান আর সিগারেট এনে দিবি মংলু? মিসিরজির দোকান কী খোলা আছে?'

খোলা না থাকলে খুলিয়ে আনব। উৎসাহের গলায় বলল মংলু।

ওস্তাদকে বড় ভালো লাগে মংলুর। আর ভালো লেগেছিল দিদিমণিকে। দিদিমণি যদি এখানে থেকে যেতে পারত, বড় মজা হত। আজ সকালে দিদিমণি ওর সঙ্গে লুডো খেলেছিল। কী মিষ্টি করে কথা বলে দিদিমণি। কী সুন্দর করে তাকায়! ভদ্রলোকদের সব মেয়েরাই কী এত ভদ্র এত ভালো?

মংলু রাস্তায় মিসিরজির দোকানে পান আনতে গেছিল। দোকান তখনও খোলা ছিল। একদিকের ঝাঁপ বন্ধ হয়ে গেলেও, হ্যাজাক জ্বলছিল দোকানে, হ্যাজাকের আলোর ফালি এসে পথে পড়েছিল। দোকানঘরের পাশে কতকগুলো সেগুন গাছ। হাওয়ায় সেগুনের বড় বড় পাতা থেকে সড় সড় আওয়াজ উঠছিল। হাতির কানের মতো দেখতে পাতাগুলো খসে যাচ্ছিল হাওয়াতে।

মহুয়া জানালায় দাঁড়িয়েছিল। ঘরে কোনো আলো ছিল না। ফিতে কমিয়ে-রাখা হ্যারিকেনটা বারান্দায় বাবার চৌপায়ার পাশে রাখা ছিল। দরজাটা আধভেজানো। দরজার দিকে কুমারের চৌপায়া। মহুয়ারটা ভিতরে।

বাবার উপর খুব রাগ হচ্ছিল মহুয়ার। এত বেশি হুইস্কি খাওয়ার কোনো মানে নেই। কুমারের সঙ্গে তাকে এক ঘরে দিয়ে নিজে বারান্দায় শোওয়ারও মানে নেই। বাবার মনের ইচ্ছেটা মহুয়া বুঝতে পারে, কিন্তু কী করবে; কুমারকে কলকাতায় যাও-বা ভালো লাগত, বাইরে এসে এ দুদিনেই একেবারে বিরক্ত হয়ে উঠেছে ও। কুমারকে বিয়ে করবার কথা ভাবতেও পারে না আজ মহুয়া। অ্যাপার্ট ফ্রম বিয়ে, ওর সঙ্গে অন্য কোনো সম্পর্কের কথাও ভাবতে পারে না।

জানালায় দাঁড়িয়ে ফুটফুটে কাক-জ্যোৎস্নায় ভেসে যাওয়া পথ, প্রান্তর, কজওয়ের নীচের ঝিরঝির করে জল-বয়ে যাওয়া নালাটা দূরের পাহাড় সব দেখছিল মহুয়া।

ও ভাবছিল যে, সুখ শাকুয়া-টুঙ থেকে ফেরার সময় বলেছিল, আরও ক'দিন পরে এলে দেখতে পেতেন পাহাড়ে পাহাড়ে কেমন আগুনের মালা জ্বলে—মালা বদল হয়। পাহাড়দের বিয়ে হয়। কী আশ্চর্য অনাবিল স্বল্প চাহিদার সরল জীবন সুখের। চাহিদা নেই কিছু ওর, অথচ দেওয়ার ক্ষমতা কী অসীম। এ পর্যন্ত মহুয়া একাধিক পুরুষের সান্নিধ্যে এসেছে—কিন্তু কখনও এত ভালো লাগেনি

ওর আগে। অবশ্য ওর সর্বস্ব দেয়ওনি আগে ও কাউকে এমন করে। সমস্ত শরীর কারও পরশ মাত্রই এমন মাধবীলতার মতো মুহূর্তের মধ্যে ফুলে ফুলে ভরে যায়নি। এই রুক্ষ অথচ ভীষণ নরম লোকটা কী যেন জাদু জানে।

মংলুকে দেখতে পেল মহুয়া। মংলু আলোর সামনে দাঁড়িয়ে পানওয়ালার সঙ্গে কথা বলছে। হাসছে, কী যেন বলছে অপাপবিদ্ধ মুখে। বেশ ছেলেটা!

মহুয়া ভাবছিল, সুখন খেল কী না কে জানে? এখন আর শুধোনো যাবে না। বাবা অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। কুমার ঘুমিয়েছে কী না তাও মহুয়া জানে না। কুমার ঘুমিয়ে পড়ার আগেই মহুয়া ঘুমিয়ে পড়তে চায়—নইলে এত কাছে কুম্ভকর্ণর নাকডাকার আওয়াজে ঘুম আসবে না কিছুতেই।

কিন্তু আজ কী মহুয়ার ঘুম আদৌ আসবে? ঘুম কী আসবে কিছুতেই? নাই-ই বা ঘুমোল এক রাত। এমন রাত। এমন সুখ-স্মৃতির; আবেশের রাত। কাল কী করবে ভাবতে হবে মহুয়াকে। ও কী সত্যিই থাকবে সুখের কাছে? পারবে? যদি নাই-ই পারবে, তাহলে এত বড় বড় কথা বলল কেন ও মুখে? সুখ কী আগেই জানত যে, ও থাকতে পারবে না, থাকতে চায় না, তাই-ই কী অমন করে হাসছিল তখন? যদি কিছু সত্যিই হয়, হয়ে যায়, তবে কী সুখের কাছে ফিরে আসবে মহুয়া—কোনো ভিক্ষা নিয়ে? সে যদি আসেই, সুখ কী তাকে চিনতে পারবে তখন?

জানে না, মহুয়া কিছুই জানে না। এই বন-জঙ্গল বড় খারাপ। ফিস্‌ফিস্ ফিস্‌ফিস্ করে কারা যেন কথা বলে, আড়ালে-আড়ালে; হাসে, কারা যেন গান গায়, দীর্ঘশ্বাস ফেলে, অভিশাপ দেয়। বিড়বিড় করে ডাইনির মতো—তাদের দেখা যায় না।

সুখকে প্রথম দেখাতেই সে সব দিতে রাজি ছিল, তবুও তার সংস্কার, তার শিক্ষা, তার সহজাত লজ্জা সব কিছু অত সহজে হারাত না ও, যদি না ভুল করে শাকুয়া-টুঙ-এ যেত। প্রকৃতির বুকের মধ্যে গিয়ে পড়তেই, এত বছরের শিক্ষা, শিক্ষার দম্ভ, রুচির অহংকার, লজ্জার আড়াল যেন একমুহূর্তে, কাচের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছিল। প্রকৃতির মধ্যে এলে কোনো আড়ালই বুঝি থাকে না: রাখা যায় না। এখানে না এলে এ কথা জানতে পেত না মহুয়া।

এখনও পুরো ব্যাপারটা ভাবলে একটা স্বপ্ন বলে মনে হয়। দুঃস্বপ্ন নয়, একটা দারুণ সুন্দর স্বপ্ন; যে-স্বপ্ন বুঝি এ জন্মে আর কখনও মহুয়া দেখতে পাবে না। কিংবা পাবে হয়তো, কে জানে, যদি কখনও আবার অমন পাথরের উপর, নদীর সাদা বালিতে এমন চাঁদের আলোয় সুখের বুকে আশ্লেষে ঘুমিয়ে থাকার সুযোগ আসে।

বাইরের বাতাসে মহুয়ার গন্ধ ভাসে। মহুয়ার ভীষণ গর্ব হয়। ওর নামের জন্যে। কে যেন তাকে প্রথম এ-নামে ডেকেছিল? যখন ডেকেছিল তখন সে তো একটা ডাক মাত্র ছিল। আজ, এই চাঁদের রাতে, দোলপূর্ণিমার কাছাকাছি, হাওয়ায়-ওড়া এত সুগন্ধের মধ্যে ও ওর নামের মাহাত্ম্য খুঁজে পেল। নাম, সে যে-কোনো নামই হোক না কেন, সে তো শুধু একটা ডাক মাত্র নয়। সে-যে নিছক ডাকের চেয়ে অনেক বড়; হৃদয়ের অন্তস্তলে, মস্তিষ্কের কোষে কোষে সে ডাক হাজার হাজার কুঁড়ি ফোটায় কুঁড়ি ঝরায়। মহুয়া ভাববার চেষ্টা করছিল। কে—কে প্রথম তাকে ডেকেছিল মহুয়া বলে?

মংলু পান আর সিগারেট দিয়ে চলে গেল।

সুখন টেবল ঠিক করে কারখানা থেকে বেরিয়ে কুয়োতলায় গিয়ে চান করল। তোয়ালে-টোয়ালে নেই। ভিজে গায়েই আবার ছাড়া জামাকাপড় পরল। আঙুলগুলোকে চিরুনি করে মাথা আঁচড়াল, তারপর কারখানায় এসে তার চৌপাইয়ে বসল।

ছোটবেলা থেকে সুখন লেখক হবার স্বপ্ন দেখেছিল। হয়েছে মোটর মিস্ত্রি। লেখার মধ্যে কলেজ ম্যাগাজিনে একটি গল্প লিখেছিল। একটি মাত্রই লেখা তার ছাপা হয়েছিল। সুখন পড়েছে, শুনেছে যে, অনেক বিখ্যাত লেখকের হাতে-খড়ি হয়েছে প্রেমপত্র লিখে। সে জীবনে প্রেমপত্র লেখেনি কাউকে। কলেজের একটি মেয়ে, যে তাকে চোখের ভালো-লাগা জানিয়েছিল, তার উদ্দেশে কবিতা লিখেছিল একটি, কিন্তু পৌঁছয়নি তার কাছে। এক বন্ধু চানাচুর কিনে সেই কবিতা মুড়িয়ে বাড়ি নিয়ে গেছিল।

আর লিখেছে ডাইরি। অনেক। কিন্তু তার ডাইরি সে নিজে ছাড়া আর কেউই পড়েনি।

আজ সে জীবনে এই পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে প্রথম প্রেমপত্র লিখতে বসেছে। এ এক আশ্চর্য প্রেমপত্র।

প্রেমপত্রর উদ্দেশ্য সাধারণত প্রেমের পাত্রর কাছ থেকে প্রেম পাওয়া বা ঈপ্সিত প্রেমিক বা প্রেমিকাকে পাওয়া। ওর জীবনের প্রথম প্রেমপত্র সে এমন একজনকে লিখছে যে, সে কিছু চাইবার আগেই যে তাকে সবই দিয়ে দিয়েছে কিছুই বাকি না রেখে। একজন মেয়ে কাউকে ভালোবেসে যা কিছু দিতে পারে তার প্রেমিককে সেই সব-ই। তার এই প্রেমপত্রর উদ্দেশ্য, কিছু পাওয়া নয়, বরং যা পেয়েছে সেই প্রাপ্তিকে স্বীকার করা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে।

এই প্রথম এবং হয়তো বা শেষ চিঠি মহুয়াকে লিখতে বসার জন্যে সে মনে মনে নিজেকে ধন্যবাদ দিচ্ছে। একটা দারুণ ভালোলাগা, এক সার্থকতার উষ্ণ বোধ তাকে অত্যন্ত আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। জীবনে কারও ভালোবাসা পায়নি সে এতদিন; কিন্তু আজ ওর মনে হচ্ছে যে, কাউকে ভালোবাসা ও কারও কাছ থেকে ভালোবাসা পাওয়া ব্যতিরেকে কোনো পুরুষের পক্ষেই বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। কুমারকে আজ ক্ষমা করে দিয়ে সে নিজেই নিজের কাছে প্রমাণ করেছে যে, ভালোবাসা মানুষকে বড় বদলে দেয়। হয়তো নিজের সত্যিকারের নিজত্বের চেয়ে কাউকে অনেক বড় করে; হয়তো বা ছোটও করে কাউকে। কিন্তু যে-কোনো মানুষের জীবনেই ভালোবাসার অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্ব যে তাকে প্রচণ্ডভাবে পরিবর্তিত করে—একথা সুখন এই কয়েক ঘণ্টাতেই নিশ্চিতভাবে বুঝেছে। ভালোবাসার জনের সুখে, তার আনন্দে, যে ভালোবাসে তার যে কত গভীর সুখ, সেই জনের জন্যে একটু কিছু করতে পারার মধ্যে যে কত ভালোলাগা, তা সুখন জেনেছে।

রাস্তায় বীরজু শাহ'র গদির কুকুরগুলো একসঙ্গে ঘেউ ঘেউ করে ডাকছে। শেয়াল-টেয়াল দেখে থাকবে কিংবা কোনো শুয়োরের দল। টাঁড় পেরিয়ে জঙ্গলের দিকে যাচ্ছে বোধহয়।

চাঁদের আলোয় মশারির মতো রাত ঝুলে আছে বাইরে।

একটা পিউ-কাঁহা ডাকছে গুঞ্জার দিকের টাঁড়ে। চারদিকে এই চাঁদের রাতে এক চকচকে অথচ স্থির স্নিগ্ধ উজ্জ্বলতা। করৌঞ্জ, শালফুল ও মহুয়ার গন্ধ ভাসছে সমস্ত আবহাওয়ায়। আঃ মহুয়া! তুমি বড় সুন্দর মহুয়া। তোমার মহুল ফুলের মতো ছিপছিপে শরীর, তোমার লাজুক-লতানো ব্যক্তিত্ব—তোমার সব, সব, সব। তোমার চোখ, চিবুক, তোমার ঠোঁটের তিল।

"মহুয়া", "মহুয়া" বলে কে যেন ডাকল মহুয়াকে।

মহুয়া ঘুমিয়ে পড়েছিল যে তা নয়। কিন্তু কেমন একটা মদির আবেশে নিমগ্ন ছিল। চোখ খুলে, অন্ধকারেই মহুয়া দেখল, কুমার কখন তার চৌপাইয়ের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

বাইরে বাবার গভীর ঘুমের নিশ্বাসের একটানা ওঠানামার শব্দ শোনা যাচ্ছে। মহুয়া কিছু বলার আগেই কুমার তার ঠোঁটে হাত রাখল। তারপর এক হাত ওর মুখে চেপে, অন্য হাতে তার বাহু ধরে তাকে তুলে নিজের চৌপাইয়ে উঠিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগল।

মহুয়ার মনে হয়েছিল, ওকে নিশিতে ডেকেছে। স্লিপ-ওয়াকিং করে পথটুকু চলে গেলে ওর

আর কিছুই বাকি থাকবে না। মহুয়া আর মহুয়া থাকবে না।

তখনও সুখের সঙ্গে কাটানো সন্ধের, সেই শিরশিরানি সুখ তার শরীরে মনে মাখামাখি হয়েছিল—খুশ্‌বু আতরের মদিরতার মতো। ও তখন নিজের বশে ছিল না। কুমার যা-কিছু করতে চাইল তার কোনো-কিছুতেই মহুয়ার বিন্দুমাত্র সায় ছিল না। কিন্তু প্রথমে ও বাধা দিল না। ওর মনে হল কুমার যেন জন্মাবধি বুবুক্ষু কোনো মন্বন্তরের কাঙালি।

সুখের সঙ্গে একটুও মেলে না।

এককালীন ক্ষুধা, রুচিহীনতা, আদেখলাপনা ও অস্থির আন্‌রোম্যান্টিকতার সঙ্গে কুমার মহুয়াকে কুৎসিতভাবে কুটুরে ব্যাঙের মতো জড়িয়ে ধরল।

কুমারের এই জান্তব ব্যবহার মহুয়ার ভালো অথবা মন্দ কিছু লাগল না। ওর উদাসীনতায় ও ভরে রইল। ওর মনে হল সুখনের কোলেই যেন বনজ-গন্ধে ভরা পাহাড়ি নদীর খোলে ও শুয়ে রয়েছে এখনও, আর একটা শেয়াল তার শরীর শুঁকছে, কামড়ে খাচ্ছে। ও-যে ওর সুখের কাছেই আছে এই সুখময় বোধটুকু ছাড়া মহুয়ার আর কোনো বোধই ছিল না সে মুহূর্তে।

মহুয়া সেই মদির ঘোরের মধ্যে যেন পাশ ফিরে শুলো। তারপর হঠাৎ দু'হাত জোড়া করে আসুরিক শক্তিতে রোগা-পাতলা ও নেশাগ্রস্ত কুমারকে বুকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল।

কুমার পড়ে গেল চৌপায়ার উপরে। চৌপাইটা নড়ে উঠল—হঠাৎ খুব জোর আওয়াজ হল তাতে।

বাইরে থেকে সান্যাল সাহেব ঘুম-ভেঙে চেঁচিয়ে উঠলেন—প্লিজ, মেরো না, ওকে মেরো না, মাপ চাইছি বাবা আমরা, আমরা মাপ চাইছি।

মহুয়া দৌড়ে এল বাইরে। বলল, 'বাবা, জল খাবে?'

সান্যাল সাহেব উঠে বসেছিলেন; সারা শরীর ভয়ে ঘেমে গেছিল ওঁর। মহুয়াকে দেখে উনি শুধোলেন, কুমারকে কী খুব মেরেছে ওরা? মেরে ফেলেছে?

মহুয়া ঘর থেকে জল এনে দিয়ে সান্যাল সাহেবের কপালে হাত দিয়ে বলল, কুমার তো ঘুমোচ্ছে বাবা! তুমি স্বপ্ন দেখছিলে!

তবে শব্দ? শব্দ কীসের হল ঘরে! সান্যাল সাহেব ঘুম জড়ানো গলায় বললেন।

কুমার ঘর থেকে বাইরে এসে বলল, 'বেড়াল।'

মহুয়া কথা কেড়ে বলল, 'একটা উপোসী হুলো বেড়াল ঘরে ঢুকেছিল।'

৮

আধ-ফোটা ভোরের প্রথম বাসেই সুখন নিজেই রাঁচী যাবে। এমন জিনিসই ভাঙল গাড়িটার যা এ তল্লাটে পাওয়া অসম্ভব। চিঠিটা শেষ করল সুখন।

হাতঘড়িতে দেখল তিনটে বাজে। আর এক ঘণ্টার মধ্যেই আলোর আভাস জাগবে পুবে। মদনলাল কোম্পানির বাস ঠিক চারটে বেজে দশ-এ এসে দাঁড়াবে মিসিরজির দোকানের সামনে। তখন শেষ রাত। ঝিরঝির করে আসন্ন ভোরের গন্ধ-মাখা একটা হাওয়া ছেড়েছিল।

সুখন একটা বড় হাই তুলল। আড়মোড়া ভাঙল। পায়ের কাছে শুয়ে থাকা কালুয়া নড়েচড়ে বসল, ডান পা দিয়ে খচ্‌র-খচ্‌র করে ঘাড় চুলকোলো, তারপর একটা বড় নিশ্বাস ফেলে সামনের দু'পায়ের উপর মুখটা রেখে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

একটা সিগারেট ধরাল সুখন। সারা রাত পান খেয়ে জিভটা ছুলে গেছে। জর্দাও বেশি খাচ্ছে

আজকাল। মাঝে মাঝে বাঁদিকের বুকে ব্যথা করে। কেয়ার করে না ও। নিজেকে নিয়ে, নিজের শরীরকে নিয়ে কখনও বেশি মাথা ঘামায়নি ও। আবার একটা পান মুখে দিল। তারপর চিঠির পাতাগুলো একসঙ্গে করে চিঠিটাকে পড়বে বলে, চৌপাইতে এসে শুয়ে পড়ল। সারারাত সোজা বসে থেকে, কোমরটা ভীষণ ব্যথা করছিল। ঘুম না এসে যায়। মনে মনে নিজেকে বলল সুখন।

২৫শে মার্চ

ফুলটুলিয়া, গুঞ্জা

পালামৌ

তোমাকে মহুয়া বলেই ডাকতে পারতাম। কিন্তু তুমি চলে গেলে যে-ডাকে কেউই সাড়া দেবে না, সে ডাকে ডেকে লাভ কী?

তোমাকে কী বলে ধন্যবাদ দেব, জানি না আমি। ধন্যবাদ আদৌ দেওয়া উচিত কিনা তাও জানি না। কারণ ধন্যবাদ ব্যাপারটাই পোশাকি সৌজন্যের এবং তোমার বয়-ফ্রেন্ডের গাড়ির মতোই, "ইম্পোর্টেড"। কোনোরকম পোশাক এবং পোশাকি ব্যাপারকেই যখন আমরা দুজনেই প্রশ্রয় দিইনি, তখন পোশাকি সৌজন্য আমাদের মানায় না।

এখন রাত গভীর। পায়ের কাছে কালুয়া শুয়ে আছে। কালুয়ার মন খুবই খারাপ। কালুয়া তোমাকে ভালো মনে নেয়নি। ও ওর স্বাভাবিক সারমেয়-স্বভাবে ভেবেছিল, চিরদিন ও একাই আমার মালকিন থাকবে। কেউ একদিনের জন্যে এসে আমার উপর এমন জবরদখল নেবে তা ওর ভাবনার বাইরে ছিল।

আমার ধারণা, তুমি কালুয়ার মুখের দিকে ভালো করে একবারও তাকাওনি। কালুয়া বড় সুন্দরী। সাধারণত সব কুকুরের মুখশ্রীই অত্যন্ত সুন্দর। পথের কুকুরের মুখেও যে বুদ্ধিমত্তা এবং চোখে যে ব্যক্তিত্বময় ঔজ্জ্বল্য দেখা যায় তা অনেক মানুষের মুখেও দেখিনি। অনুরোধ, যাওয়ার আগে আমার কালুয়ার মুখে একবার ভালো করে চেয়ো এবং ওকে একবার আদর করে যেয়ো।

তোমার সঙ্গে হয়তো আর দেখা হবে না। তবু, আমি হারিয়ে যেতে চাই না। পালাতে তো নয়ই। তাছাড়া, আমার পালাবার মতো কোনো জায়গাও নেই। সুখন মিস্ত্রি এই ফুলটুলিয়া বস্তিতেই থাকবে আমৃত্যু। তোমাদের মতো গতিবেগসম্পন্ন মানুষদের গতি যাতে অব্যাহত থাকে, তা দেখাই আমার কাজ। অথচ আমরা নিজেরাই গতিমান নই: অনড়, স্থাবর।

যা ঘটে গেছে, তার জন্যে আনন্দরও যেমন সীমা নেই আমার, দুঃখেরও নয়। তোমার মতো একজন উচ্চবংশের, শিক্ষিতা অভিজাত মেয়েকে আমি কোনোরকম বিপদেই ফেলতে চাইনি। আশা করি যা ঘটে গেছে তার দায়িত্ব তুমি আমার সঙ্গে সমানে ভাগ করে নেবে।

মনে কোনো পাপবোধ রেখো না এ বাবদে। যে মিলনে আনন্দ নেই, সে মিলন অভিপ্রেত নয়। আনন্দই যেন থাকে, আর আনন্দের স্মৃতি। এ নিয়ে আমার অথবা তোমার মনে-কখনও যেন কোনো অনুশোচনা না হয়। তা হলে এই পরম প্রাপ্তির সব মিষ্টত্ব তেতো হয়ে যাবে চিরদিনের মতো।

তবে স্বীকার কর আর নাই-ই কর, তুমি বড়ই ছেলেমানুষ। ছেলেমানুষ বলেই তুমি এখনও অপাপবিদ্ধ, মহৎ। পৃথিবীর নীচতা, দৈনন্দিন জীবন-জাত ব্যবসায়ীসুলভ সাবধানতা এখনও তোমার অস্তিত্বকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করেনি। সে কারণেই তোমার পক্ষে অত সহজে সহজ হওয়া সম্ভব হয়েছিল। প্রার্থনা করি, তোমার এই সহজ-সত্তাকে চিরদিন এমনিই রাখতে পারো তুমি।

তুমি আমার জীবনটাকে, এই নিরুপায় মেনে-নেওয়া মিস্ত্রিগিরির জীবনটাকে, বড় নাড়া দিয়ে গেলে। আমার গর্ব ছিল যে, নিজেকে বইয়ের মধ্যে, কাজের মধ্যে, ডাইরি লেখার মধ্যে এবং

আমার উৎসারিত আনন্দের উৎস এই প্রকৃতির মধ্যে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়ে দিয়ে আমি বুঝি একজন স্বয়ংসম্পূর্ণ মানুষ করতে পেরেছিলাম নিজেকে। যে নিজেকে নিয়ে, নিজের কাজ এবং অকাজ নিয়েই এ যাবৎ ষোলো আনা খুশি ছিল, খুশি ছিল শাকুয়া-টুণ্ড-এর একাকী এবং একক অস্তিত্বে, বাইরের কোনো কিছুতেই তার প্রয়োজন ছিল না বলেই সে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছিল। জানো মহুয়া, শাকুয়া-টুণ্ডের নির্জন নির্মোক প্রদোষে অথবা উষায় আমার প্রয়াই মনে হত, আমি বোধহয় স্বয়ংভু। শুধু তাই-ই নয়, আমি সম্পূর্ণ স্বয়ম্ভর এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ।

কিন্তু তুমি আমার এই মিথ্যে গর্বকে ভেঙে টুকরো করে দিয়ে গেলে। বুঝিয়ে দিয়ে গেলে যে, জীবনে ষোলো আনা প্রাপ্তিই সব নয়। ষোলো আনার উপরেও কিছু থাকে; যা উপরি, পড়ে পাওয়া, অথচ যার উপর জীবনের সার্থকতা দারুণভাবে নির্ভরশীল। তোমার চোখের পূর্ণ শান্ত দৃষ্টিতে, তোমার নম্র শান্ত ব্যবহারে, তোমার স্বচ্ছতোয়া শরীরের সুগভীর স্নিগ্ধ উষ্ণতায় তুমি আমাকে চিরদিনের মতো জানিয়ে দিয়ে গেলে যে, পৃথিবীর কোনো পুরুষই স্বয়ম্ভর নয়। হতে পারে না।

যতদিন অভাব পূরিত হয়নি, ততদিন অভাবটাকেই একমাত্র অমোঘ এবং অনস্বীকার্য ভাব বলে মেনে নিয়েছিলাম। সেই অবস্থাকেই স্বয়ংসম্পূর্ণতা বলে সাংঘাতিক এক ভুল করেছিলাম। তুমি আমাকে এক আশ্চর্য আকাশতলের আনন্দযজ্ঞে ডাক দিলে। আমার প্রাণের কেন্দ্রের সব শূন্য পূরণ করে জানিয়ে গেলে বরাবরের মতো যে, পুরুষের শেষ এবং একমাত্র গন্তব্য, তার চরম চরিতার্থতা শুধু কোনো নারীতেই।

তোমরা যে আমাদের রুক্ষ, ধুলোমাখা জীবনের, আমাদের নির্বুদ্ধি সর্বজ্ঞতার, আমাদের দুর্মর দুর্দম পুরুষালি-বোধের উপর কিছুমাত্র নির্ভরশীল নও, তোমরা যে তোমাদের চোখ-চাওয়া, তোমাদের হাসি, তোমাদের ভালোবাসায় ঐরাবত-প্রবর স্থূল-গর্বসর্বস্ব পুরুষদের ইচ্ছেমতো ভাসিয়ে দিতে পারো অবহেলায়, এটা একটা দারুণ জানা।

মহুয়া, তোমাকে দিতে পারি এমন আমার কিছুমাত্র নেই। সত্যিই নেই। তোমার হয়তো প্রয়োজন কিছুতেই নেই; তবু আমার দেওয়ার আগ্রহটা তোমার প্রয়োজনের তীব্রতার উপর ডিপেন্ডেন্ট নয়। তোমাকে কিছু একটা, কোনো কিছু দেবার বড় ইচ্ছে ছিল—যাতে আমাকে কিছুদিন অন্তত তোমার মনে থাকে। কিন্তু এই স্বল্প সময়ে কিছুতেই ভেবে পেলাম না পার্থিব কোনো দানের কথা। কতটুকু আমার ক্ষমতা। আমার কী-ই বা আছে তোমাকে দেবার মতো। তোমার যে সবই আছে, সমস্ত কিছু।

হাতে করে কিছু দিই আর নাই-ই দিই, তুমি জেনো যে, তোমাকে এমনই কিছু দিয়েছিলাম যা আর কাউকেই দিইনি, হয়তো কখনোই দিতে পারবও না।

তুমি রানির মতো চলে যাবে কাল, আমাকে ভিখিরি করে। যা-কিছু আমার ছিল, এতদিনের, এতবছরের, যা-কিছু যত্ন করে রাখা—তার সবই তুমি নিয়ে যাবে তোমার সঙ্গে।

বিনিময়ে যা দিয়ে যাবে, তার সঙ্গে শুধু তুলনা চলে কোনো মহীরুহর বীজের। এই মুহূর্তে ভবিষ্যতের স্পষ্ট অনুমান ও কল্পনাও বুঝি সম্ভব নয়। আশাকরি, তোমার এই দান একদিন শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে আমার মনের গভীরে এক সান্ত্বনা-দাত্রী ছায়ানিবিড় গাছের মতো প্রতিষ্ঠিত হবে। তোমার স্মৃতি বুকে করে বাকি জীবনটা সুখন মিস্ত্রির দিব্যি পান-জর্দা খেয়ে, গাড়ি মেরামত করে, হেসে-খেলেই চলে যাবে।

আমার আজকে মনে হচ্ছে, বারবার মনে হচ্ছে যে, জীবনে একজন মানুষ কত পায়, কতবার পায়; তাতে কিছুই যায় আসে না; কিন্তু সে কী পায় এবং কেমন করে পায় তাতে অনেক কিছুই যায় আসে।

যারা সাধারণ, তারা দস্তুরের দাগা বুলিয়েই বাঁচে। একজন আর্টিস্ট-এর সঙ্গে সাধারণ লোকের এখানেই তফাত। তুমি একজন উঁচুদরের আর্টিস্ট। তোমার জীবনটাকে নিয়ে ইচ্ছেমতো রং-তুলির আঁচড় বোলাতে এবং এমনকী ইচ্ছেমতো জীবনের ইজেলটাকে ছিঁড়ে ফেলতেও বুঝি তোমার বাধে না। তুমি আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। তবু তোমাকে আমি এক বিশেষ শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছি; আমার মনে।

আমার মতো অখ্যাত লোকের মস্ত সুবিধে এই-ই যে, তাদের লেখা কোনো পত্র-পত্রিকায় ছাপা হবে না। খ্যাতি যেমন তার নেই, তেমন পাড়া-বেপাড়ার গণ্ডমুর্খদের তাকে সমালোচনা করার অধিকারও সে দেয়নি। বিখ্যাত লোকের বিচারক সকলেই, তাদের সে বিচারের যোগ্যতা থাক আর নাই-ই থাক। আমার বিচারের ভার রইল শুধু তোমারই হাতে। আমার মহুয়ার হাতে।

পরিশেষে, তোমাকে একটা কথা বলব। কথাটা হচ্ছে এই-ই যে, কুমারবাবু তোমারই শ্রেণীর লোক। তুমি এবং তোমার বয়সি অনেকেই হয়তো শ্রেণীবিভাগ মানে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই-ই যে তোমার কী আমার মানা-না-মানার উপর আজও শ্রেণীবিভাগের কালাপাহাড় অস্তিত্বর কিছুমাত্র যায় আসে না। তার শিকড় বড় গভীরে প্রোথিত আছে। তাই বলছি যে, কুমারবাবুকে বাতিল করার আগে দু'বার ভেবো।

ভেবে অবাক লাগছে যে, তোমার কারণেই কুমারবাবুর উপরে আমারও একটা দুর্বোধ্য দুর্বলতা জন্মে গেছে। নইলে সান্যাল সাহেবকে হয়তো তার লাশ নিয়ে ফিরতে হত এখান থেকে। সুখন মিস্ত্রি গাড়ির কাজ ভালো না জানলেও খুন-খারাবিটা খারাপ জানে না। আমার যা-কাজ, যাদের নিয়ে কাজ, তাতে আমার নিজেরই অজান্তে আমি অনেক বদলে গেছি। কখনও সুযোগ এলে কুমারবাবুকে বলো, তোমার খাতিরে সুখন মিস্ত্রি ছেড়ে দিলেও, অন্য অনেকে না-ও ছাড়তে পারে। তার নিজের মুখের টোপোগ্রাফি রক্ষার স্বার্থেই তাঁকে একটু ভদ্রতা শিক্ষা করতে বোলো।

চিঠিটা অনেক বড় হয়ে গেল। একসঙ্গে এত কথা মনের মধ্যে ভীড় করে আসছে যে, গুছিয়ে লিখতে পারা গেল না। আমার সমস্ত অস্তিত্বটাই বড় অগোছালো করে দিয়ে গেলে তুমি।

ভালো থেকো মহুয়া, সবসময় ভালো থেকো। নিঃস্বার্থভাবে মঙ্গল কামনা করার অন্তত একজন লোকও তোমার রইল, এটাকে বড় কম পাওয়া বলে ভেবো না।

যা করলাম, অথবা করলাম না, তা সবই তোমার ভালোর জন্যেই; এটুকু জেনো। তুমি যা বলেছিলে, যা করতে চেয়েছিলে, তা যে নিতান্তই ছেলেমানুষি, তা তুমি এখান থেকে চলে গেলেই বুঝতে পারবে। এই চলে-যাওয়ায় আমার প্রতি যেটুকু মমত্ববোধ জাগবে তোমার, হয়তো থাকবেও; সেটুকু আমার কাছাকাছি চিরদিন থাকলেও জাগত না। এটা সত্যি। বিশ্বাস কোরো।

যাকে কাছে রাখতে চায় কেউ, তাকে দূরে দূরে রাখাই বুঝি তাকে কাছে রাখার একমাত্র উপায়। বড় বেশি কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি বেশিদিন থাকলে ভালো লাগার, ভালোবাসার রঙটা ফিকে হয়ে যায়।

সবসময় আমাকে মনে পড়ার দরকার নেই। পড়বে যে না, সেও জানি। মাসান্তে কী বৎসরান্তে কোনো একলা অবসরের মুহূর্তে হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে-আসা জঙ্গলের বনজ গন্ধের মতো আমার কথা যদি মনে পড়ে তোমার, তাহলেই আমি ধন্য বলে জানব নিজেকে।

আমি জানি, তুমি চলে গেলে, বড়ই ফাঁকা লাগবে, আমি, কালুয়া, মংলু—আমাদের তিনজনের সংসার। পাগল-পাগল লাগবে—জানি আমি। কিন্তু কিছু করার নেই।

মহুয়া, আমার ঝড়ের ফুল; ভালো থেকো, সবসময় ভালো থেকো।

—ইতি সুখন মিস্ত্রি

চিঠিটা আরও একবার পড়ল সুখন। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে অনেকক্ষণ ভাবল।

অনেকক্ষণ ভেবে-টেবে, তারপর হঠাৎ কুচি কুচি করে ছিড়ে ফেলল চিঠিটাকে। মনে মনে বলল, দুস্স্, কী লাভ? লাভ কী?

চিঠিটা ছিঁড়ে মুঠো পাকিয়ে কাগজের কুচিগুলো কারখানার আবর্জনার স্তূপে ফেলে দিল। তারপর একেবারে নিশ্চল রইল বহুক্ষণ।

সুখন খুব বিষণ্ণতার সঙ্গে ভাবল, ছিঁড়বেই যদি, তাহলে এত কষ্ট করে রাত জেগে এ চিঠি লিখল কেন? কী লাভ হল?

বিড়বিড় করে বলল, সব ফেলা গেল। তারপরই ভাবল, সত্যিই কী ফেলা গেল? জানে না সুখন এতসব। এমন করে কখনও ভাবেনি আগে। কখনও যে ভাবতে হবে, তাও ভাবেনি।

সুখন বলল আবার নিজেকে—যানে দেও মিস্ত্রি। তুমি যেখানে থাকার, এই পোড়া-মবিলের, ওয়েল্ডিং করার গ্যাসের গন্ধে, নানারকম যান্ত্রিক ও ধাতব শব্দের মধ্যে যেমন আঁছো, তেমনই থাকো। হঠাৎ-হাওয়ার ঝল্কানিতে যেটুকু বাস পাও মহুয়ার সেটুকুই ঢের—এর বেশি আশা করোনা, ভুলেও চেয়ো না। ভুলে যেয়ো না যে তুমি শালা দুখন মিস্ত্রির ভাই সুখন মিস্ত্রি। যা পেয়েছ তার স্মৃতিটুকুই বুকে করে রেখো, রোমন্থন কোরো—গায়ের লোম-পড়া দহের পাঁকে গা-ডুবানো বুড়ো মোষ যেমন করে জাবর কাটে, তেমনি করে—এর বেশি কিছু এই পোড়া জীবন থেকে তোমার পাবার নেই।

৯

মনের মধ্যের সুখনজনিত লুকোনো অথচ তীব্র আনন্দটা মহুয়াকে আধো-ঘুমে আধো-জাগরণে কোথায় যেন ভাসিয়ে নিয়ে চলেছিল, হাওয়ায় ভেসে যাওয়া সেগুন পাতাদের সঙ্গে।

কিন্তু মধ্য রাতে সেই আনন্দ যখন বিঘ্নিত হয়েছিল, হঠাৎ তলা-ফেঁসে যাওয়া নৌকোর মতো মনে মনে ও তলিয়ে গেল। পরক্ষণেই ফেঁসে-যাওয়াটা মিথ্যে এবং ভেসে-যাওয়াটাই সত্যি এ-কথা জানতে পেরে ও আবার আনন্দিত হয়েছিল।

কিন্তু ঘুম ভাঙতেই দেখল বেলা অনেক, শরীর মন সবই ক্লান্তিতে এবং আলস্যে ভরা।

হঠাৎ চোখ মেলে, শূন্য মস্তিষ্কে উপরে মাকড়সার জাল-ঝোলা টালির ছাদে চেয়ে রইল। অনেকক্ষণ বুঝতে পারল না যে, ও কোথায়? তারপর ধীরে ধীরে সব মনে পড়ল; স—ব কিছু। মস্তিষ্কের শূন্যতা আস্তে আস্তে পাখির ডাকে, রান্নাঘরের শব্দে, লাটাখাম্বার জল ওঠার ক্যাঁচোর-কোঁচরে—এই সমস্ত টুকরো টুকরো শব্দের ঝুমঝুমিতে ভরে গেল। লাল-কালো কুঁচফলের মতো চোখের সামনে দেখতে লাগল গতকালের স্নিগ্ধ রঙিন মুহূর্তগুলিকে। স্যাকরার নিক্তির মতো, ও নিজের বিবেক-বুদ্ধি-বিবেচনার পাল্লার একধারে সেই সব উজ্জ্বল মুহূর্তগুলিকে বসাল আর অন্যদিকে বসাল তার একান্ত মেয়েলি বাস্তব ও সাংসারিক বোধকে। দেখল, গতকালের মুহূর্তগুলির সমষ্টির ঔজ্জ্বল্য চোখ-ভরানো, মন-ভরানো; কিন্তু তার ভার কম।

মহুয়া জানল যে, তাকে আজ কুমার ও তার বাবার সঙ্গে চলেই যেতে হবে।

সুখ বাসের জানলায় বসে বাইরে চেয়েছিল। মান্দার পেরিয়ে এসেছে। একটু পর রাতু হয়ে রাচী পৌঁছবে সুখন। ভোর হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। বাইরে চেয়ে নিদ্রাহীন চোখে অনেক কিছু ভাবছিল ও।

ভাবছিল, কাল বিকেল ও রাতের কথা। ও জানে, এই ভাবনাটুকু ছাড়া তার নিজের বলতে আর কিছুই রইবে না। সবই চুরি হয়ে যাবে। ভাবনার মধ্যে একটি মুখ, একরাশ রেশমি চুল, দুটি

দীঘল কালো চোখ, চিকন চিবুক, ঠোঁটের ছোট কালো তিলটি বারে বারে বহু দিন বহু বছর তার ঘুম কাড়বে; একটা চাপা অসহায় যন্ত্রণা বোধ করবে ও সব সময়। কাজের মধ্যে তাকে অন্যমনস্ক করে দেবে। হয়তো এমনি কোনো অন্যমনস্ক মুহূর্তেই বুকে ইঞ্জিনব্লক চাপা পড়ে তার দাদার মতো সুখনও মারা যাবে। কিন্তু তবুও ভাবনাটুকু ছাড়া তার আর কোনো কিছুই রইবে না থাকার মতো, তার নিজের বলতে।

মহুয়া মুখ-টুক ধুয়ে বারান্দায় এসে বসল।

মংলু চা দিয়ে গেছিল। রান্নাঘরের চালে বসে একটা কাক ডাকছিল।

চা-এর গেলাস হাতে নিয়ে বসে উদাস চোখে দূরে চেয়ে মহুয়ার মন এক বিষণ্ণতায় ছেয়ে গেল।

এখানে এসেছিল পরশু রাতের অন্ধকারে। আজ বোধহয় দুপুরেই চলে যাবে। সবসুদ্ধ আটচল্লিশ ঘণ্টাও নয়। অথচ এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে যেন চিরদিন এখানেই ও থাকত। এত সহজে, এত স্বল্প সময়ে এক একটা জায়গার উপর কী করে যে এমন মায়া পড়ে যায় তা ভাবলে আশ্চর্য লাগে।

মংলু এসে দাঁড়াল। হাসল একগাল। শুধোল, 'নাস্তা কী হবে?'

মহুয়া চমকে উঠল। হাসি পেল ওর। যেন এ ওরই সংসার। নাস্তা কী হবে, দুপুরে কী হবে এসব যেন মহুয়া না বললে চলছিল না।

মহুয়া বলল, 'মংলু, তোর ওস্তাদ কী কী খেতে ভালোবাসে রে?'

মংলু অবাক হল প্রথমটা—তারপর অনেক ভেবে-টেবে বলল, 'ওস্তাদ কিচ্ছু, ভালো-টালো বাসে না।' তারপরই বলল, 'এঁচড়ের তরকারি।'

মহুয়া হেসে ফেলল ওর বলার ধরন দেখে। তারপর শুধোল, 'এখানে এঁচড় পাওয়া যায়?'

—রঙের মিস্ত্রির বাড়ি একটা কাঁঠাল গাছ আছে। তবে ভালো হয় না এখানে কাঁঠাল। যদি বলেন তো খোঁজ করতে পারি এঁচড় ধরেছে কিনা।

মহুয়া উৎসাহের সঙ্গে বলল, 'যা না এক দৌড়ে; দেখে আয়।'

— এখন? মংলু দ্বিধায় পড়ে বলল।

—কেন, এখন যেতে অসুবিধা?

—না। তবে বাবুরা বেড়াতে গেলেন—ফিরে এসেই তো নাস্তা করবেন, নাস্তার বন্দোবস্ত করতে হবে তো।

—সে আমি করছি। তুই যা না।

মংলু চলে গেলে মহুয়া ভাবল—যেমন বাবা, তেমন কুমার। সব সময় কী ভাবে, কেমন করে খাবে এই ভেবেই দিন কাটিয়ে দিল।

রান্নাঘরে গিয়ে অনেকগুলো ডিম একসঙ্গে ভেঙে ওমলেট বানাবে বলে কাঁচা লঙ্কা, পেঁয়াজ, আদা কুঁচি এসব কেটে ফেটিয়ে রাখল। চিজ্ থাকলে চিজ্ ওমলেট বানাতে পারত। গতরাতের মুরগি ছিল কিছু; মহুয়া ও সুখন কেউই খায়নি। দুটো ঠ্যাং থেকে মাংস ছাড়িয়ে কিমা মতো করে নিয়ে ও ঠিক করে রাখল। আটা মেখে রেখেছিল মংলু—লেচি বানিয়ে রাখল মহুয়া। তারপর আলু আর কুমড়ো কাটল একটি ছেঁচকি মতো বানাবে বলে। তারপর সব ঢেকে-ঢুকে রেখে সুখনের ঘরে এল।

সত্যি! ঘর না যেন একটা কী! একেই বোধ হয় বলে ব্যাচেলারস্ ডেন।

কাল সন্ধেয় সুখনের রোমশ বুকে শুয়ে থাকার সময় ও যেমন একটা উগ্র অথচ মিষ্টি গন্ধ পেয়েছিল, সারা ঘরে সেই গন্ধই ছড়িয়ে আছে। হাওয়ায় ভাসছে। বাঘের মতো প্রত্যেক পুরুষের গায়েই বোধ হয় একটা নিজস্ব গন্ধ থাকে। বাবার গায়ের গন্ধ মহুয়া চেনে। বাবার ছাড়া-জামাকাপড়

ধোপাবাড়ি পাঠাতে, কাচতে দেবার সময় সে গন্ধটা চিনেছে মহুয়া। কিন্তু সুখনের গায়ে অন্যরকম গন্ধ। বুনোফুলের মতো; ঝাঁঝালো।

মহুয়া ঠিক করল চলে যাবার আগে আজ নিজে হাতে সুখনের ঘরটা মনোমতো সাজিয়ে দিয়ে যাবে। ফুলদানির বিকল্প, সুখনের ঘরের ভাঙা কাচের গেলাসে ফুলসুদ্ধ একটা মহুয়ার ডাল আনিয়ে রেখে যাবে। মহুয়া চলে যাবার পরও যেন ওর গন্ধ থেকে যায় সুখনের গন্ধের সঙ্গে।

সুখনের খাটের উপর বসল মহুয়া। বুকের মধ্যে ভারী একটা চাপা কষ্ট বোধ করতে লাগল। বাবাকে বলে সুখনের জন্যে কলকাতায় একটা চাকরির বন্দোবস্ত যে করতে পারে না মহুয়া তা নয়, কিন্তু প্রথমত সুখন তা গ্রহণ করবে না বলেই মহুয়ার বিশ্বাস। দ্বিতীয়ত—এই পরিবেশে থেকে—এই শাকুয়া-টুঙ, পলাশ, টুঁই পাখিদের এলাকা থেকে সুখনকে উপড়ে নিয়ে গেলে সুখন আর এই-সুখন থাকবে না। তা করে কোনোই লাভ নেই।

মহুয়া ভাবছিল সুখন কী চিঠি লিখবে ওকে? যদি না লেখে? চিঠি লিখবে না সুখ? তাহলে এই হঠাৎ-নামা, হঠাৎ-থাকা হঠাৎ-ঘটা ঘটনাগুলো ঘটার কী দরকার ছিল?

কাঁচা রাস্তা ধরে গুঞ্জার দিকে বেড়াতে গেছিলেন সান্যাল সাহেব ও কুমার। বেরিয়েছিলেন অনেকক্ষণ। এখন ফিরে আসছেন।

সান্যাল সাহেব বলছিলেন, 'হ্যাঁ, তোমাকে যা বলছিলাম; মাঝে মাঝে এ-রকম কষ্ট করা ভালো। এ-রকম ভাঙা টালির ঘর, নোংরা আন-অ্যাটাচড্ বাথরুম, নানারকম অসুবিধা—এতে পারস্‌পেকটিভটা অনেক ব্রডার হয়।'

কুমার চুপ করে ছিল। ওর চোখের সামনে ভেসে উঠছিল ছোটোবেলার কথা। বস্তির মধ্যে ওদের ঘর। দাওয়ায় বসে মুড়ি-খাওয়া।—টু হেল উইথ পারস্‌পেকটিভ।

কুমার কথা ঘোরাল। বলল, 'যাক, আপনি তখন ঠিকই বলছিলেন; রাফিং হয়ে গেল জবরদস্ত। এখন দেখুন সে ব্যাটা মিস্ত্রি আজও ডোবায় কিনা। এদিকে বেত্‌লাতে ঘর পাওয়া গেলে হয়। এতদিন কী আর ওরা আমাদের জন্যে ঘর রেখে দিয়েছে?'

সান্যাল সাহেব বললেন, 'আরে চলো, বন্দোবস্ত একটা হবে।'

কুমার বলল, 'হ্যাঁ, যেখানেই হোক এর চেয়ে অন্তত ভালো অ্যাকোমোডেশান পাওয়া যাবে।'

সান্যাল সাহেব স্বগতোক্তির মতো বললেন, 'যতই ভাবছি, ব্যাপারটা খুবই অবাক করছে আমায়।'

'কোন্ ব্যাপারটা?' কুমার শুধোল।

—এই মহুয়ার ব্যাপারটা।

'কোন্‌টা?' তাড়াতাড়ি শুধোল কুমার। একটু ভয়ও পেল।

বুড়ো কী রাতে জেগেছিল নাকি?

সান্যাল সাহেব বললেন, 'মহুয়ার এই এডাপ্টেবিলিটির ক্ষমতা।'

তারপর বললেন, 'মেয়ে যে আমার এমন সুন্দর মানিয়ে নেবে তা কল্পনারও অতীত ছিল। ওর মধ্যে খুব একটা শিক্ষার জিনিস দেখলাম। জীবনে সব কিছু মানিয়ে নিয়ে, মেনে নিয়ে তার মধ্যে থেকে আনন্দ নিংড়ে নেবার ক্ষমতাটা একটা দারুণ গুণ।'

কুমার বলল, 'তা যা বলেছেন। তবে আপনি ইনডায়রেক্টলি আমাকে যাই-ই বলার চেষ্টা করুন না কেন, আমি ওই ভাঙা গেলাসের কেলে ও পুরোনো-মোজার গন্ধের চা, ছারপোকা-ভরা মোড়ায় বসা—এ-সবই মানিয়ে নিতে রাজি আছি, মানিয়ে নিয়েওছি; কিন্তু ওই অ্যারোগ্যান্ট মিস্ত্রিকে মানিয়ে নিতে বলবেন না আমায়।'

সান্যাল সাহেব একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'জানো কুমার যত লোক আমরা দেখি তারা

কেউই খারাপ নয়। এমনকী অন্ধকারতম চরিত্রের মধ্যেও একটা আলোকিত জায়গা থাকে। আসল কথাটা হচ্ছে, এই আলোকিত জায়গাটা আবিষ্কার করা। আবিষ্কার করে ফেলতে পারলে দেখবে যে, পৃথিবীতে সকলেই তোমার বন্ধু, বশংবদ; শত্রু তোমার কেউই নয়। কোনোই গুণ নেই এমন মানুষ কী কেউ আছে? আর দোষ নেই এমনও তো কেউ নেই। দোষগুলো ভুলে গুণ দেখলেই যে-কোনো মানুষের মধ্যেই একটা চমৎকার মানুষকে আবিষ্কার করা যায়।'

কুমার মনে মনে বলল, মাই ফুট্। বৃদ্ধ-ভাম আবার জ্ঞান দিতে শুরু করেছে।

কুমারের নীরবতাকে সম্মতি ভেবে ভুল করে সান্যাল সাহেব আবার শুরু করলেন, 'সেদিন আমার বন্ধু ভ্যাবলা রায়, ভ্যাবলা রায়কে চেনো তো? ইনকাম্-ট্যাকসের বাঘা অ্যাডভোকেট্, আমাকে একটা বই পড়তে দিয়ে গেছিল। জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির লেখা। বইটা পড়ে আমি রীতিমতো চমকে গেছি। উনি বলছেন যে, আমরা সকলেই হয় ভবিষ্যতের জন্যে বাঁচি অথবা অতীতের স্মৃতি মন্থন করে, কিন্তু বাঁচা উচিত শুধু বর্তমানে। কারণ বর্তমানের প্রতিটি মুহূর্তের মালা গেঁথেই জীবন।'

কুমার মনে মনে বলল, খেয়েছে। আবার মালা-ফালা গাঁথতে লেগেছে বুড়ো। সকাল থেকেই মনে হচ্ছে আজ দিনটা খারাপ যাবে।

একটা লোক একটা হাঁড়ি মাথায় নিয়ে টাঁড় পেরিয়ে যাচ্ছিল। প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার জন্যে প্রায় বেপরোয়া হয়ে কুমার হঠাৎ তাকে উদ্দেশ করে বলল, 'হাঁড়িমে কেয়া হ্যায় তাড়ি?'

'নেহী বাবু'।—লোকটা অনিচ্ছাসহকারে বলল। তারপরেই সাহেবি পোশাক পরা দুজন লোককে আসতে দেখে আবগারি অফিসার-টফিসার ভেবে টাঁড় পেরিয়ে ভোঁ-দৌড় লাগাল। দৌড় লাগাবার আগে বলে গেল, 'কুচ্ছু নেহী, ইসমে কুচ্ছু নেহী হ্যায়।'

কুমার তার বাঁশপাতার মতো শরীর থেকে একটা বাজখাঁই আওয়াজ বের করে বলল, 'অ্যাই। ইধার আও। ইধার আও।'

লোকটা ততক্ষণে ওধারে চলে গিয়ে উদ্ধার হয়েছে। উদ্ধার করেছেও হয়তো বা কুমারকে সান্যাল সাহেবের হাত থেকে।

কুমার বলল, 'একটু খেজুরের রস পেলে খাওয়া যেত।'

—কোথায় আর পাবে!

'তাই-ই তো ভাবছি', কুমার বলল।

মহুয়া সুখের ঘর গোছাতে লাগল। দেখতে দেখতে সুন্দর করে গুছিয়ে ফেলল ঘরটা। বিছানার চাদর, জামা-কাপড় সব বের করে বারান্দায় রাখল। আজ নিজে-হাতে কেচে দেবে যাওয়ার আগে। সুখ ওকে অনেক সুখ দিয়েছে; মনের সুখ, শরীরেব সুখ। ওর জন্যে এইটুকু না করলে, না করে যেতে পারলে বড়ই ছোট লাগবে নিজেকে।

সান্যাল সাহেব ও কুমার বেড়িয়ে ফিরলেন। মংলুও ফিরল হাতে একটা এঁচড় নিয়ে। কুমার দেখেই আঁতকে উঠল। 'এ কি, এঁচড়? এঁচড় কী ভদ্রলোকে খায়? আজ কী এঁচড় রান্না করবে নাকি তুমি?' বলেই মহুয়ার দিকে তাকাল।

মহুয়ার আজ সকাল থেকেই ইচ্ছে করছিল যে, কুমারের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে। কিন্তু কুমার কোনো সুযোগ দিচ্ছে না।

মহুয়া বলল, 'ছোটলোকরাই না-হয় খাবে, ভদ্রলোকরা না খেলেই তো হল।'

সান্যাল সাহেব বললেন, 'এই যে মংলু; তাড়াতাড়ি নাস্তা লাগাও তো বাবা। বহুত ভুক্ লাগা হ্যায়।'

তারপর কুমারের দিকে ফিরে বললেন, 'জায়গাটার গুণ আছে—জল হাওয়া খুবই ভালো—দেড়-দিনেই কেমন বেটার ফিল করা যাচ্ছে, তাই না?'

কুমার তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, 'হ্যাঁ। জল আর হাওয়া ছাড়া আর কিছুই তো এখানে নেই। তাই জল-হাওয়াও যদি ভালো না হত তবে তো বিপদের কথা ছিল।'

কিছুক্ষণ পর ওরা মুখ-হাত ধুয়ে বারান্দায় বসেই নাস্তা করছিল। মহুয়া ও মংলু তদারকি করছিল। কুমার বলল, 'এ-রকম প্রিমিটিভ হাউসওয়াইফের মতো শেষে খাওয়ার মানে নেই। বসে পড়ো আমাদের সঙ্গে, বসে পড়ো।'

মহুয়া বলল, 'ঠিক আছে। আপনারা খান না। সামনে বসে খাওয়াতে ভালো লাগে আমার।'

কথাটা বলতে বলতেই, মহুয়ার চোখের দৃষ্টি নরম হয়ে এল। কাল বিকেলে, তার সামনে মাটির দাওয়ায় আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে-থাকা একজন পূর্ণবয়স্ক শিশুর কথা মনে পড়ল।

কথাটা শুনে কুমারের ভালো লাগল। ও ভাবল, কাল রাতের পরই মহুয়া ওর সঙ্গে খুবই অ্যাটাচড্ ফিল করছে। ইট ওয়াজ আ গ্রেট এক্সপিরিয়েন্স—যদিও একতরফা।

কুমার চোখ তুলে মহুয়ার চোখে তাকাল। বলল, উ্য আর রিয়েলি গ্রেট।

মহুয়া কুমারের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই চোখ নামিয়ে নিল।

কাল ঘরের মধ্যে ঘুমের ঘোরের গ্লানি, লজ্জা এবং হয়তো ঘৃণাও তার মনে ছেয়ে এল। ওর মনে হল, সুখ হচ্ছে গিয়ে ডাকাত; আর এটা একটা ছিঁচকে চোর। লুণ্ঠিতই যদি হতে হয়, তাহলে ডাকাতের হাতে হওয়াই ভালো।

হঠাৎ কুমার বলল, 'মংলু, যা তো একবার দেখে আয় তোর ওস্তাদ এল কি না। গাড়িটা যে কখন ঠিক হবে তার কোনো হদিসই পাওয়া যাচ্ছে না।'

মংলু চলে যেতেই, কুমার বলল, 'আমাদের হাবভাব দেখে মিস্ত্রি ভাবছে আমাদের এখান থেকে নড়ার ইচ্ছে নেই—কী যেন মধু পেয়েছি আমরা—এমনই মধু যে দু' বেলা বারান্দায় কাঙালিভোজনের মতো করে চেটেপুটে খেয়ে আমরা দিব্যি আনন্দে আছি—আমাদের যেন ফ্রন্ট গিয়ার, রিভার্স গিয়ার সবই অকেজো হয়ে গেছে। একেবারে যাচ্ছেতাই অবস্থা।'

একটু পর মংলু এসে বলল, 'ওস্তাদ ফিরে এসেছে। গাড়ির কাজ শুরু হয়েছে। ওস্তাদ নিজে তো আছেই, আরও চার-পাঁচজন মিস্ত্রি হাত লাগিয়েছে। বেলা একটার মধ্যেই গাড়ি ঠিক হয়ে যাবে।'

কুমার চেঁচিয়ে উঠল। বলল, 'থ্রী চিয়ারস্ ফর মংলু। হিপ-হিপ-হুররে, হিপ-হিপ-হুররে, হিপ-হিপ-হুররে।'

পরক্ষণেই খুশি-খুশি গলায় হিন্দিতে বলল, 'মংলু, গরম গরম পরোটা লাও।'

সান্যাল সাহেবকেও খুশি খুশি দেখাল। এই দেড় দিনের গতিহীনতা তাঁর মধ্যে কেমন একটা স্থবিরত্ব এনে ফেলেছিল। আবার গাড়ির সামনের সিটে বসবেন, আবার হাওয়া লাগবে চোখে-মুখে, কত নূতন পথ, মোড়, পাহাড়, বন—ভালো-লাগা। সবচেয়ে আশ্বস্ত হলেন তিনি মনে মনে এই ভেবে যে, এই সুখন মিস্ত্রির খপ্পর থেকে মহুয়াকে উদ্ধার করে নির্ভাবনায় এবার কুমারের জিম্মায় দেওয়া যাবে। সুখন মিস্ত্রির উপর রাগ কুমারের যতটা না ছিল, তাঁর ছিল তার চেয়েও বেশি। আসলে কুমারের খুব অ্যাড্‌মায়ারার হয়ে গেছেন তিনি কাল রাতে সুখনকে চড় মারার পর। ছোকরার বাহাদুরি আছে। লিক্‌পিকে হলে কী হয়, মেরে তো দিল চড়! ওই চড়টা মারবার ইচ্ছে ছিল তাঁরই। কিন্তু ছোটবেলা থেকে অন্তর ও বাহিরের মধ্যে একটা ব্যবধান রচনা করে এসেছেন তিনি। মনে যাই-ই থাক, মুখে কিছু বলেননি কখনও; কাউকেই। মন আর মুখ এক করা ব্যাপারটা তিনি মূর্খামি ও ব্যাড স্ট্রাটেজি বলেই চিরদিন বিশ্বাস করে এসেছেন।

সুখনকে কিছু বলতে পারেননি, পাছে মহুয়া তাঁকে বুঝে ফেলে। মহুয়ার চোখের সামনে তাঁকে

সব সময় একটা নিরপেক্ষতার মুখোশ পরে থাকতে হয়েছে। সান্যাল সাহেব জানেন যে, অভিনয়টা তিনি ভালোই বোঝেন এবং কুমার যতই লাফাক-ঝাঁপাক না কেন, বুদ্ধির জোরে তিনি কুমারকে ট্যাঁকে করে নিয়ে এক হাট থেকে অন্য হাটে গিয়ে বিক্রি করে আসতে পারেন। "শো অফ্ এমোশনস্" কোনো বুদ্ধির লক্ষণ নয়। সেন্টিমেন্ট্, এমোশন এসব বাজে বোধ তাঁর কখনও ছিল না। ঠান্ডা মাথায় দাবার চাল চেলে এসেছেন তিনি সব সময়—অনেক হাতি ঘোড়া নৌকো উলটেছেন আজ অবধি।

পরোটাতে ওমলেট জড়াতে জড়াতে ভাবছিলেন সান্যাল সাহেব যে, একমাত্র একটা চালেই তিনি ভুল করেছিলেন জীবনে। সে শ্যামলীকে দেওয়া চাল। শ্যামলী, একমাত্র সে-ই, তাকে বড় বোকা বানিয়ে দিয়েছিল এ জীবনে। শোধ তোলার উপায়ও নেই আর।

মহুয়াকে তিনি ভালোই বোঝেন। এই জেনারেশানের ছেলেমেয়েদের জানতে তাঁর আর বাকি নেই। সুখন মিস্ত্রিকে মহুয়াই যে নাচিয়েছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কালকে মহুয়ার অন্তর্ধানের মানে সান্যাল সাহেব বিলক্ষণ বুঝেছিলেন; প্রথম থেকেই বুঝেছিলেন। মহুয়া সারা সন্ধে ওই মিস্ত্রির সঙ্গেই ছিল, সে বিষয় কোনো সন্দেহই নেই সান্যাল সাহেবের। মিস্ত্রির সঙ্গে মহুয়ার একটা অ্যাফেয়ার যে হয়েছে তা তিনি বুঝতে পারেন। কিন্তু ঠিক কতখানি গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে তা উনি জানেন না—তবে কুমার যা বলেছিল তা ঠিকই। সময়টা নিশ্চয়ই খারাপ কাটেনি মহুয়ার।

এইসব কারণে, গাড়ি সারানো হচ্ছে, গাড়ি একটু পরেই ঠিক হয়ে যাবে, এই খবরে সবচেয়ে খুশি হয়েছিলেন তিনি। জীবনে পরের বউ ভাগিয়ে এনে এক স্ক্যান্ডাল করলেন। তারপর সেই বউ অন্য লোকের সঙ্গে চলে গিয়ে আর এক স্ক্যান্ডাল করল। তার উপর মেয়ে মোটর-মিস্ত্রির সঙ্গে চলে গেলে সমাজে আর মুখ দেখাতে পারবেন না তিনি। সেদিক দিয়ে শ্যামলী তার মুখোজ্জ্বলই করেছে বলতে হবে। পালিয়েছে তো কোম্পানির ফরাসি ডিরেকটরের সঙ্গে। চলে যাওয়ার পরে লোকে বলেছে—শ্যামলীর তাহলে রূপ-গুণ কী একবার ভেবে দেখো! সে মেয়ে যে একদিন তোমার সঙ্গে ছিল এই-ই তো যথেষ্ট সম্মান তোমার।

কিন্তু সেই পরিপ্রেক্ষিতে মহুয়া যদি সুখন মিস্ত্রির সঙ্গে এখানে থেকে যেত, তাহলে কী যে হত ভাবতেই পারেন না সান্যাল সাহেব। স্ক্যান্ডাল বড় ভয় করেন তিনি। ঘোমটার নীচে খ্যামটা নাচো। জানছে কে? লোকসমাজে না জানিয়ে যা খুশি করো না! আপত্তির কোনো কারণ দেখেন না তিনি। কিন্তু এ সব কী?

মহুয়ার দিকে চেয়ে নরম গলায় সান্যাল সাহেব বললেন, 'এবারে চান-টান করে তাহলে তুই খেয়ে নে মা।'

তারপরেই কুমারের দিকে ফিরে বললেন, কখন বেরোবে ঠিক করেছ কুমার?

কুমার বলল, একটায় গাড়ি ঠিক হলে, তখনই বেরিয়ে পড়া যাবে।

'বেতলা এখান থেকে ক'ঘণ্টা?' সান্যাল সাহেব শুধোলেন।

'মিস্ত্রি তো বলছিল দু-আড়াই ঘণ্টার রাস্তা।' কুমার বলল।

—তা হলে তো দুপুরটা রেস্ট করে বিকেল বিকেল বেরোলেই হয়।—মহুয়া কী বলিস?

মহুয়া নীচু, অন্যমনস্ক গলায় বলল, 'আমার কিছু বলার নেই। তোমরা যা বলবে।'

কুমার খাওয়া শেষ করে বলল, 'মহুয়া, তুমি চান-টান করো। ততক্ষণে আমরা গিয়ে গাড়ির কাজ একটু তদারকি করি। যা ঢিলে লোক—ওর উপর ছেড়ে দিলে আবার কী ঘটবে কে জানে?'

সান্যাল সাহেব ও কুমার কারখানার দিকে চলে গেলেন। মহুয়া মংলুকে রান্নাঘরের বারান্দায় খেতে বসাল। মহুয়া মংলুকে ভালো করে আদর করে খাওয়াচ্ছিল। মংলু অভিভূত হয়ে পড়েছিল। এরকম আদর-যত্নে ও অভ্যস্ত নয় মোটেই।

মহুয়া বলল, ডিমটা নে আর একটু।

মংলু বলল, আপনি না খেলে আমি খাব না।

মহুয়া ধমক দিল। বলল, 'আমি বড় না তুই বড়? কথা শুনতে হয়।'

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, তোর ওস্তাদ রাতে কিছু খেয়েছে?

—নাঃ। জর্দা পান শুধু।

—একটু পরে গিয়ে ওস্তাদকে ডেকে আনবি। তোর ওস্তাদ খেলে তবে আমি খাব।

মংলু বলল, 'আমি যেতে পারব না। আমাকে মারবে ওস্তাদ। তার উপর তোমাদের সঙ্গের ওই বাবু থাকবে তো সঙ্গে—কে যাবে ওর সামনে?'

'আমি চিঠি দিয়ে দেব তোর ওস্তাদকে। আমার চিঠি পেলে নিশ্চয়ই আসবে।'—আত্মবিশ্বাসের গলায় বলল মহুয়া।

মংলু বলল, 'তা আসবে। আপনি আসতে বললে আসবে।'

একটু পর মংলু বলল, দিদিমণি, আপনি থেকে যান না এখানে?

মহুয়া বলল, এ কথা বলছিস কেন?

মংলু বলল, 'আপনাকে খুব ভালো লেগেছে বলে। আর জানেন দিদিমণি, আপনার কথা ওস্তাদ যা শোনে আর কারও কথাই তেমন শোনে না। আপনি থাকলে ওস্তাদ আর সকলের উপর ওস্তাদি করতে পারবে না। ওস্তাদেরও একজন ওস্তাদ হবে।'

মহুয়া চোখ দিয়ে হাসছিল, বলল, 'আমি কোথায় থাকব?'

—কেন? তোমরা যে ঘরে আছো এখন, সে ঘরে। তুমি দেখো তোমার কোনো অযত্ন করব না আমরা। দুপুরে রোজ আমি আর তুমি লুডো খেলব। খুব মজা হবে, তাই না?

'হু।' মহুয়া বলল। তারপর বলল, 'থাকতে পারলে বেশ হত।'

মংলুর খাওয়া হয়ে গেলে, মহুয়া সুখের ঘর থেকে কাগজ আর ডট্ পেন নিয়ে একটা ছোট্ট চিঠি লিখল—

"সুখ,

আপনার জন্যে খাওয়ার নিয়ে বসে আছি আপনার ঘরে। একবার এখুনি আসবেন।

—মহুয়া"

মংলু মুখ-টুখ ধুয়ে চিঠিটা নিয়ে কারখানায় চলে গেল। তারপর ওস্তাদকে ডেকে নিয়ে চিঠিটা দিল।

সুখন চিঠিটা পড়েই ছিঁড়ে ফেলল। সুখনের না-কামানো খোঁচা-খোঁচা দাড়ি রোদে মাটিতে ধুলোতে ঘামে বিচ্ছিরি চেহারা, রাত-জাগা লাল-লাল চোখ দেখে মংলু ভয় পেল।

সুখন বলল, 'এখন সময় নেই কোথাও যাবার। আগে গাড়ি সারাব; তারপর অন্য সব। বলে দিস গিয়ে।'

মংলু আর কথা বাড়াল না। মহুয়াকে এসে সব বলল।

মহুয়া ভীষণ ক্ষুব্ধ হল। মহুয়া ভেবেছিল তার নিজের হাতের লেখা চিঠি এবং নিরিবিলিতে তারই একা-ঘরে আমন্ত্রণ জানাবার মানে বুঝবে সুখ। মহুয়া অনেক কিছু কল্পনাও করে নিয়েছিল। কল্পনা করছিল যে, সুখ ঘরে ঢুকেই তার সবল হাতে ওকে জড়িয়ে ধরবে, আদর করবে; মহুয়া ভালো-লাগায় মরে যাবে।

খুব রাগ হল মহুয়ার।

মংলু শুধোল, 'যাবেন না দিদিমণি? চলুন, আপনার খাবার দিই।'

মহুয়া বলল, 'না। কিছু খাব না আমি। আমাকে এক কাপ চা করে দে তো মংলু।'

একা ঘরে, সুখনের ঘরময় পায়চারি করতে করতে অভিমানে মহুয়ার দু' চোখ জলে ভরে এল। লোকটা সত্যিই জংলি, অভদ্র; মেয়েদের সম্মান করতে জানে না।

চা-টা খেয়ে, মহুয়া এক সময় এঁচড়ের তরকারিটা নিজে হাতে রাঁধবে বলে রান্নাঘরে গেল। ঠিক করল তরকারি রেঁধে তারপর ভিজানো কাপড়গুলো কেচে দেবে।

সুখন ও আরও তিনজন মিস্ত্রি কাজ করছিল। মিস্ত্রিরা যত তাড়াতাড়ি পারে হাত চালিয়ে কাজ সারছিল। কারখানার মধ্যে নিমগাছের ছায়ায় একটা ভাঙা মাডগার্ডের উপর বসে কুমার তদারকি করছিল কাজের।

একটা ছোকরা মিস্ত্রি বনেটের উপরে রাখা রেঞ্জটা তুলে নেবার সময় হাত ফস্‌কে সেটা বনেটের উপর পড়ে যেতেই সেখানের রঙটা সামান্য চটে গেল এবং একটা টোল মতো পড়ে গেল।

কুমার এক লাফে এগিয়ে এলে বলল, 'করছ কী? এটা কী হল? এই যে কলকাতার মির্জার গ্যারেজ থেকে রং করিয়ে নিয়ে এলাম সদ্য, আর রং যে চটালে বড়? যত সব গেঁয়ো উজবুক-বুড়বাকের দল।'

ছোকরা মিস্ত্রিটা লাল চোখে একবার তাকাল কুমারের দিকে, কিন্তু কিছু বলল না। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই সেই মিস্ত্রির হাত থেকে আবারও রেঞ্জটা বনেটের উপর পড়ল।

কুমারের মনে হল মিস্ত্রিটা যেন ইচ্ছা করে এবং আছাড় মারার মতো জোরে ওই ভারী রেঞ্জটাকে ফেলল। রেঞ্জটা পড়তেই একটা বড় টোল পড়ল বনেটে।

কুমার দৌড়ে এসে বলল, 'বাস্টার্ড!'

কথাটা বলতেই, ছোকরা মিস্ত্রিটা এক লাফে চিতাবাঘের মতো এসে পড়ল কুমারের ঘাড়ে। তারপর এক বেদম চড় কষাল কুমারের গালে।

চড় কষাতেই কুমার থতোমতো খেয়ে পিছিয়ে গেল। সমস্ত কারখানার মিস্ত্রিরা কাজ থামিয়ে ওইদিকে চেয়ে রইল। দু'-একজন এগিয়েও এল।

ছোকরা মিস্ত্রি বলল, 'আর একটা কথা বলেছ তো পেঁয়াজি বার করে দেব। শালা তেল দেখাতে এসেছ এখানে? দু'দিন ধরে তেল দেখাচ্ছ। এ জায়গার নাম ফুলটুলিয়া। এ তোমার কলকাতা নয়। এখানে মেরে, গুঁড়িয়ে, তোমার অ্যাশ ধরিয়ে দেব বুড়োর হাতে। কোথায় থাপ্ খুলতে এসেছ জানো না?'

মিস্ত্রিদের সকলের মুখ-চোখের অবস্থা দেখে কুমার নিজের দামি টেরিকটের প্রিন্টের শার্টের মধ্যে ধুকপুক-করা কলজেটাকে গুটিয়ে নিল।

ওর মুখ শুকিয়ে গেছিল। চড়টা বড় জোর মেরেছে ছোকরা। মনে হচ্ছিল ওর গালে কেউ লংকাবাটা লাগিয়ে দিয়েছে, এমনই জ্বলছিল গালটা।

ছোকরা মিস্ত্রি আরও কী যেন বলতে যাচ্ছিল। এমন সময় সুখন জলদগম্ভীর গলায় বলল, 'এ রামলাল, মেরে তোর খুপরি খুলে নেবো। কারখানার মধ্যে দাঁড়িয়ে খদ্দেরের গায়ে হাত? তোরা ভেবেছিস কী? আমি কী মরে গেছি?'

তারপরই কুমারের দিকে ফিরে কালিমাখা হাত দুটো জোড়া করে বলল, 'মাপ করে দেবেন। আমি ওর হয়ে মাপ চাইছি। রেঞ্জটা ওর হাত থেকে অ্যাক্‌সিডেন্টালি পড়ে গেছিল। যাই-ই হোক, আমি ক্ষমা চাইছি।'

সান্যাল সাহেব এতক্ষণ ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে এগিয়ে এসে সেই ছোকরা মিস্ত্রিটির কাছে গিয়ে নরম গলায় বললেন, 'তুমি বড় ছেলেমানুষ ভাই। অত সহজে মাথা গরম করে?' তারপর কুমারের দিকেও ফিরে বললেন, 'উ্য আর ভেরী আপসেট। এসো, এসো। বসে একটা সিগারেট খাও, কুমার। ডোন্ট গেট একসাইটেড্। যা হবার তা হয়ে গেছে।'

কুমার সরে আসতে আসতে বলল, 'আই উইল টিচ দিজ বাস্টার্ডস্ আ গুড লেস্‌ন—'

কুমারের কথা শেষ হবার আগেই সেই ছোকরা-মিস্ত্রিটি আবার মুহূর্তের মধ্যে উড়ে এসে কুমারের পেছনে কষে এক লাথি লাগাল। লাথি লাগিয়েই বলল 'শালা তোর মাকে ডাক। এ জন্মের মতো চারদিকে দেখে নে ভালো করে—নাক ভরে মহুয়ার গন্ধ শুঁকে নে—তোর আজই শেষ দিন।'

সুখন এবার দৌড়ে গিয়ে ওদের মধ্যে পড়ল। পড়ে, ওকে টেনে আনল জামার কলার ধরে। বলল, 'বড় রঙবাজ হয়েছিস তো তুই! আমি বারণ করা সত্ত্বেও তুই এমন করছিস?'

ছোকরা বলল, 'তুমি ঠিক করছ না ওস্তাদ। আমরা কী মানুষ নই? ও শালা যা-তা গালাগালি করছে কেন ফের?'

সান্যাল সাহেব দেখলেন, পরিস্থিতিটা এমন হয়ে যাচ্ছে যে তাঁর মতো বিচক্ষণ মাথাঠান্ডা লোকের পক্ষেও এটা নিয়ন্ত্রণ করা মুশকিল হয়ে পড়েছে। তিনি হাত জোড় করে থিয়েটারি কায়দায় দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, 'ভাই সব, আমি এর হয়ে ক্ষমা চাইছি। রাগের মাথায় একটা অন্যায় কথা বলে ফেলেছে। এর মাথা খারাপ হতে পারে, আমার তো হয়নি—আমি একে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।' বলেই তিনি কুমারকে নিয়ে বাড়ির দিকে এগোতে লাগলেন।

যেতে যেতে সান্যাল সাহেবের হাত-ধরা অবস্থাতেই কুমার আবারও চিৎকার করে হাত নাড়িয়ে গিলে-ফেলা অপমানটার হজ্‌মি দাওয়াইয়ের মতো বলল, 'আমি তোমাদের দেখে নেব স্কাউন্ড্রেলস্—পুলিশ না এনেছি তো আমার নাম নেই। এই ওস্তাদ সমেত সবগুলোকে আমি জেলে....।'

কথা শেষ করার আগেই সান্যাল সাহেব কুমারের মুখ চেপে ধরলেন।

কিন্তু মুখ চাপার আগেই মুখনিঃসৃত আওয়াজ মিস্ত্রিদের কানে পৌঁচেছিল। পৌঁছতেই একই সঙ্গে চার-পাঁচজন মিস্ত্রি ওদিকে দৌড়ে গেল। পুরোভাগে সেই ছোকরা মিস্ত্রিটি। তার হাতে একটা বড় রেঞ্জ—যে রেঞ্জ নিয়ে সে এতক্ষণ কাজ করছিল।

সুখন বিদ্যুৎবেগে তাদের আগে গিয়ে পৌঁছল। বলল, 'কী করছিস রামলাল, কী করছিস; ছেড়ে দে ছেড়ে দে।'

কিন্তু সুখনের কথা শেষ হবার আগেই রামলালের ডানহাতটা রেঞ্জ সমেত ডান কাঁধের উপরে উঠে গেছিল। ততক্ষণে সুখন কুমারের পাশে গিয়ে পৌঁচেছে।

রামলালের হাতটা যখন প্রচণ্ড জোরে নেমে আসতে লাগল কুমারের মাথা লক্ষ্য করে, কুমার কুকুরের মতো ভয় পেয়ে বিদ্যুৎগতিতে মাথাটা নীচু করে সুখনের দু' হাঁটুর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে বসে পড়ল মাটিতে।

মুহূর্তের মধ্যে রেঞ্জটা এসে পড়ল সুখনের কপালে। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটতে লাগল। দেখতে দেখতে রক্তে সুখনের মাথা, চোখ-মুখ, জামাকাপড় সব ভিজে গেল। সুখনের মাথার রক্ত দেখেই রামলাল রেঞ্জটা ফেলে দিয়ে সুখনকে বুকে জড়িয়ে ধরে অনুতপ্ত গলায় বলল, 'হা রাম, ম্যায় কা কিয়া ওস্তাদ, ম্যায় ক্যা কিয়া।'

সুখনের চোটটা মারাত্মক হয়েছিল। সুখন প্রায় অজ্ঞানাবস্থায় রামলালের কাঁধে ভর করে ঝুঁকে পড়ল। নইলে মাটিতে পড়ে যেত ও। সঙ্গে সঙ্গে অন্য মিস্ত্রিরা সুখনের সেই ছ্যাকরা গাড়িটা বের করে নিয়ে তাকে চত্তকের কম্পাউন্ডার বাবুর কাছে নিয়ে যাবে বলে বেরোল।

রামলালও সঙ্গে গেল। শেষ মুহূর্তে সান্যাল সাহেবও দৌড়ে এসে সার্কাসের ক্লাউনের মতো গাড়ির পা-দানিতে উঠে পড়লেন।

স্ট্র্যাটেজিক এবং টাইম্‌লি মুভ্ ।

গাড়িটা ছেড়ে দিতেই রামলাল জানালা দিয়ে মুখ বের করে কুমারকে বলল 'ফিরে আসছি। তোমাকে শেখাব ফিরে এসে।'

সুখন গোঙাতে গোঙাতে বলল, 'গাড়ির কাজ যেন বন্ধ না হয়—ও গাড়ি যত তাড়াতাড়ি পারো রেডি করো; আমি আসছি।'

মংলু গোলমাল শুনে কারখানায় দৌড়ে এসেছিল। মহুয়াও কাপড়-কাচা ছেড়ে এসে ভিজে কাপড়ে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। মংলু এক দৌড়ে আবার ফিরে গিয়েই হাঁপাতে হাঁপাতে মহুয়াকে সব বলল।

কুমার ভয় ও আতঙ্কে ফ্যাকাশে হয়ে টলতে টলতে ফিরে এসে ঘরের মধ্যে দিনদুপুরেই হুইস্কির বোতল খুলে বসল।

মহুয়া খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে কোমরে হাত দিয়ে। চিড়িয়াখানায় লোকে যেমন গরাদের ফাঁক দিয়ে জংলি জন্তু দেখে, তেমন চোখে পূর্ণদৃষ্টিতে কুমারকে দেখল অনেকক্ষণ ধরে। মুখে কোনো কথা বলল না। তারপর ফিরে গিয়ে আবার কাপড় কাচতে লাগল।

কারখানার মিস্ত্রিরা বলল—এটা অ্যাক্সিডেন্ট। কিন্তু ওস্তাদ যেমনভাবে বারবার অন্যায়কে সমর্থন করছিল, ওস্তাদকে মিস্ত্রিরা সকলে মিলেই এক সময় মারতে বাধ্য হত। আজ রামলালের হাত দিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে ভালোই হয়েছে। ওস্তাদ ভবিষ্যতে অন্যায়কে আর মদত দেবে না।

একজন বয়স্ক মিস্ত্রি বলল, 'আরে ওস্তাদের ভীমরতি ধরেছে। অনেক ব্যাপার আছে।' বলেই, এদিক ওদিক চেয়ে গলা নামিয়ে বলল, 'ওই সুন্দরী বাঙালি মেয়েটার সঙ্গে ওস্তাদ ফেঁসে গেছে। শ্বশুরালের লোকের সঙ্গে লোকে কী খারাপ ব্যবহার করে? না করতে পারে?'

সেই মিস্ত্রির কথা শেষ হতে না হতে অন্য মিস্ত্রিদের মধ্যে চার-পাঁচজন সমস্বরে বলল, 'এই গফুর, সাবধানে কথা বল। আমরা তোর মুখ ভেঙে দেব। শালা নেমহারাম। ওস্তাদ না থাকলে এতদিন যক্ষ্মায় মারা যেতিস, এই তোর কৃতজ্ঞতাবোধ! তুই শালা এক নম্বরের নেমকহারাম।'

কম্পাউন্ডার ইঞ্জেকশন দিয়ে ভালো করে ড্রেসিং করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়ে বললেন, 'বেশ সাবধানে থাকতে হবে। কাজকর্ম ক'দিন বন্ধ। কোনোরকম স্ট্রেইন নয়। একেবারে বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে দিনকয়েক।' সঙ্গে আরও কীসব ওষুধ-টষুধ দিলেন খাওয়ার জন্যে।

সুখন যখন ফিরে এল কারখানায়, তখন রামলালও গাড়ি থেকে নেমে কানে হাত দিয়ে নিজের থেকেই ওঠ-বোস করল। বলল, 'ওস্তাদ, মাপ করে দাও ওস্তাদ।'

সান্যাল সাহেব কম্পাউন্ডারবাবুকে টাকা দিতে যাচ্ছিলেন; কিন্তু মিস্ত্রিরা দিতে দেয়নি। এখন কারখানায় ফিরে এসে সান্যাল সাহেব বেশ কিছুক্ষণ মিস্ত্রিদের সঙ্গে থাকলেন। এমনকি কখনও যা করেন না তাই করলেন। এক মিস্ত্রির দেওয়া দুটো পান টিপিক্যাল কেরানির মতো খেলেন। একজনের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে বিড়িও খেলেন একটা। যখন ওঁর মনে হল অবস্থা সম্পূর্ণ শান্ত তখন উনি বাড়ি যাবেন বলে পা বাড়ালেন। চলে যাবার আগে সুখনকে বললেন কাঁধে হাত দিয়ে, আপনি বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়বেন চলুন।

সুখন গাছতলায় মাটিতে বসেছিল। বলল, আমি ঠিক আছি। তারপর বলল, 'আপনি যান। আমাকে থাকতে হবে। আপনাদের গাড়ির কাজ শেষ হয়নি এখনও।'

সুখনের মুখ দেখে মনে হল ওর খুব যন্ত্রণা হচ্ছে। কথা বলতেও কষ্ট হচ্ছে ওর।

সান্যাল সাহেব বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন।

কুমার চান-টান করেনি। অপমানটা তখনও হজম হয়নি ওর। সান্যাল সাহেব চান করে নিলেন। মহুয়াও আগেই চান করেছিল। রান্নাও হয়ে গেছিল। ওরা খেতে বসবে, এমন সময় সান্যাল সাহেবের হুঁশ হল যে মহুয়া ঘরে নেই। মংলুও নেই।

মহুয়া আর মংলু দুজনেই সুখনকে ধরে নিয়ে আসবার জন্যে কারখানায় গেছিল। সুখন পা

ছড়িয়ে, নিমগাছে হেলান দিয়ে বসে খুব মনোযোগের সঙ্গে গাড়ি মেরামতির কাজ দেখছিল।

হঠাৎ সমস্ত মিস্ত্রির কাজ-থামানো দেখে ওদের চোখ অনুসরণ করে সুখন দেখল যে, মহুয়া আর মংলু বেড়ার কাছে দাঁড়িয়েছে এসে।

সুখন মহুয়াকে দেখে হাসল।

হাসতে ওর কষ্ট হচ্ছে, পরিষ্কার বোঝা গেল।

মহুয়া এগিয়ে এসে আদেশের স্বরে বলল, আপনার এখন ঘরে যেতে হবে।

এই আদেশের স্বরে সুখন অভ্যস্ত নয়। ও জানে, ওর মধ্যে একটা জানোয়ার বাস করে, যে কখনোই কারও আদেশেরই ধার ধারেনি। আদেশের গলায় কেউ কথা বললেই ওর রক্ত মাথায় চড়ে যায়। সে যেই-ই হোক।

সুখন ইশারায় মিস্ত্রিদের কাজ করতে বলল। মাথায় রক্ত ফুটে-ওঠা ব্যান্ডেজ-বাঁধা সুখনের সে চেহারা দেখে মহুয়ার বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল।

সুখন মংলুর হাত ধরে উঠে, বেড়ার বাইরের একটা শিশুগাছের তলায় এসে দাঁড়াল। বলল, 'মংলু, একটু চা করে নিয়ে আয় আমার জন্যে; দৌড়ে যা।'

মংলু চলে যেতেই মহুয়া আবার বলল, আপনাকে এখন ঘরে যেতেই হবে।

সুখনের মনে হল, মহুয়ার গলার স্বরে একটা গর্ব ঝরে পড়ছে। সুখনের জীবনে বোধ হয় ওর আগে ভালোবেসে আদেশ করার মতো কোনো লোক আসেনি। মনে মনে ক্ষমা করে দিল সুখন মহুয়াকে।

সুখন বলল, 'ঘর মানে কী শুধুই একটা টালির ছাদ? ঘর মানে তো তার চেয়ে অনেক কিছু বেশি। ঘর মানে, ঘর মানে...।'

তারপর একটু থেমে বলল, 'এই-ই আমার ঘরবাড়ি, এই-ই আমার সব; এই কারখানা আর মিস্ত্রিরা।'

মহুয়া অভিমানের গলায় বলল, 'সকালে আসতে বলে চিঠি লিখে পাঠালাম, এলেন না কেন? কাল দুপুর থেকে খাননি। তার উপর এমন কাণ্ড। —কী যে করেন, ভালো লাগে না। আপনার দিকে তাকাতে পারছি না আমি। বাঁচাতে গেলেন কেন এমনি করে অন্যকে?'

তারপরই বলল, 'না। আমি কোনো কথাই শুনব না। আপনাকে এখন আমার সঙ্গে যেতেই হবে। আমি নিজে-হাতে আপনার জন্যে এঁচড়ের তরকারি রান্না করেছি। আপনার আসতেই হবে। খেতেই হবে। রান্না কখন হয়ে গেছে। খেয়েদেয়ে ঘরে চুপচাপ শুয়ে থাকতে হবে। এই বলে দিলাম।'

যেতেই হবে? সুখন বলল। তারপর একটু হেসে বলল, কীসের এত জোর আপনার আমার উপর?

—তা আমি জানি না। কিন্তু আমি জানি যে, আমার অনুরোধ আপনি ফেলতে পারবেন না।

সুখন অদ্ভুত হাসি হাসল। বলল, 'জানেন? জানেনই যদি, তাহলে এত দ্বিধা কেন নিজের সম্বন্ধে?'

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, 'যান, লক্ষ্মী মেয়ে ফিরে যান, রোদ লেগে আপনার সুন্দর মুখটা লাল হয়ে গেছে। আর চলে যাওয়ার আগে চুপ করে এখানে একটু দাঁড়ান দেখি। কথা বলবেন না, নড়বেন না একটুও; আপনাকে শেষবারের মতো ভালো করে দেখি একবার।'

মহুয়া লজ্জা পেল, খুশি হল এবং খুব দুঃখিতও হল। বলল, তাহলে আপনি আসছেন না?

নাঃ।—বলল সুখন। বলেই মহুয়ার চোখের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাল।

হেরে-যাওয়া অপমানিত হওয়া মুখে চোখ-নামিয়ে মহুয়া বলল, আমরা একটু পরেই চলে যাব কিন্তু।

সুখন বলল, জানি।

—তবুও আসবেন না? আমার ঠিকানা নেবেন না আপনি।

না।—কাটাভাবে বলল সুখন।

—আপনি ভীষণ খারাপ, পচা আপনি। আপনি বড় দাম্ভিক, অবাধ্য।

সুখন নৈর্ব্যক্তিক গলায় বলল, হয়তো তাই।

মহুয়ার চোখ ছলছল করে উঠল।

আবারও বলল, আপনি সত্যিই আসবেন না?

—না। এখন যেতে পারি না। অনেক কাজ। যাওয়া সম্ভব নয়।

মহুয়া বলল, আমি চললাম তাহলে। আর কিন্তু দেখা হবে না।

সুখন বলল, দাঁড়ান।

হঠাৎ ওর গলার স্বরটা কেমন কেঁপে গেল। সুখন বলল, 'অমন করে যেতে নেই। একটু হাসুন তো দেখি। এই হাসি আবার কবে দেখতে পাব—পাব কিনা তাই-ই বা কে জানে? লক্ষ্মীটি, একবার হাসুন শেষবার।'

মহুয়া বলল, ইয়ার্কি, না? বলেই, হেসে ফেলল। এবং সঙ্গে সঙ্গে কেঁদেও ফেলল। ওর গাল গড়িয়ে জলের ফোঁটা নামল।

সুখনের বুকের মধ্যেটা হুহু করে উঠল। কিন্তু এখন কিছুই করবার নেই। মহুয়া ছেলেমানুষ হতে পারে, কিন্তু ও ছেলেমানুষ নয়। এখন দিনের সুস্পষ্ট আলো, কত লোকজন; বুদ্ধিবিবেচনা চারদিকে। কাল জঙ্গলের নির্জনতায় চাঁদের আলোয় যে ছেলেমানুষি ভুল করেছিল, আজ তার পুনরাবৃত্তি সম্ভব নয়। ও যে মহুয়াকে এক দারুণ ভালোবাসা বেসে ফেলেছে। সুখন যে মহুয়ার ভালো চায়।

সুখন চুপ করে মহুয়ার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মহুয়ার দু'চোখ জলে ভরে এল। মহুয়া আর দাঁড়াল না। বলল, 'অসভ্য! আপনি একটা জংলি।' বলেই মহুয়া চলে গেল।

যতক্ষণ না মহুয়া বেড়ায় আড়ালে চলে যায়, ততক্ষণ সুখন তার সুন্দর চলার ভঙ্গির দিকে চেয়ে রইল। মহুয়ার প্রতি মঙ্গল-কামনায়, ভালো-লাগায়, ভালোবাসায়, তার সুস্থ, বয়স্ক দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন মন কাণায় কাণায় ভরে উঠল এবং সেই সঙ্গে ওর মনের মধ্যে যে ছেলেমানুষটা বাস করে সেই মানুষটা ধুলোর মধ্যে পা-ছড়িয়ে বসে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

সে কান্না শোনা গেল না।

কুমার চান করে উঠেও ঘরে বসে হুইস্কি খাচ্ছিল। সান্যাল সাহেব মানা করেছিলেন। বলেছিলেন, 'এই গরমে কী করছ এসব? এখন মানে মানে এখান থেকে রওয়ানা হওয়া গেলেই বাঁচা যায়! আবার হুইস্কি খেয়ে কাকে ঘুষি মেরে বসবে, তখন আর প্রাণ বাঁচানোর কোনো উপায়ই থাকবে না।'

হুইস্কির দয়ায় কুমারের হারানো বিক্রম আবার ফিরে পেয়েছে ও। কুমার বলল, 'প্রাণ যাওয়া অতই সোজা কিনা? নেহাত মেয়েছেলে সঙ্গে আছে নইলে দেখে নিতাম এদের।'

সান্যাল সাহেব মনে মনে বললেন, এ যাত্রা মহুয়া সঙ্গে আছে বলেই বেঁচে গেলে, নইলে তোমাকে কে বাঁচাত তাই-ই দেখতাম। মুখে বললেন, 'সব তো মিটে গেছে, আর তো কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার। আর পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটা কেন?'

মহুয়া ফিরে আসতেই সান্যাল সাহেব বললেন, কোথায় গেছিলি?

—এই একটু দেখে এলাম গাড়ির কতদূর।

মহুয়ার চোখ ভেজা—বৃষ্টির পরের জঙ্গলের মতো। সান্যাল সাহেব ঘাঁটালেন না ওকে। বললেন, কী দেখলি?

—প্রায় হয়ে এসেছে।

বলেই মহুয়া অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে সুখনের ঘরের দিকে চলে গেল।

তাহলে তো এবার বিল-টিল মিটিয়ে দিতে হয়। গোছগাছ করে নে মহুয়া—এখুনি রওয়ানা হব।—সান্যাল সাহেব বললেন।

ততক্ষণে মহুয়া সুখনের ঘরে ঢুকে গেছে। কুমার বলল, 'এখনি পালাবার কী হয়েছে? আমরা কী ভয় পেয়েছি নাকি?'

কুমারের গলার স্বর শুনে পরিষ্কার বোঝা গেল যে, সে বিলক্ষণ ভয় পেয়েছে।

কুমার আবার বলল, 'খেয়ে-দেয়ে রেস্ট নিয়ে এক কাপ করে চা খেয়েই বেরোনো যাবে। তা ছাড়া অ্যাট দ্য মোমেন্ট আই অ্যাম নট ফিজিক্যালি ফিট টু ড্রাইভ।'

মহুয়া সুখনের ঘরে ঢুকেই বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। বাইরে দড়িতে কেচে-দেওয়া সুখনের জামাকাপড়, বিছানার চাদর, টেবল-ক্লথ সব শুকোচ্ছিল। যা কড়া রোদ—একটু পরেই তুলে নেওয়া যাবে। ভাবল মহুয়া। সব তুলে এনে সুখনের ঘরটা সুন্দর করে আবার সাজিয়ে দিয়ে চলে যাবে ও।

মহুয়া ভাবছিল যে, ও এই ঘরের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হতে চেয়েছিল, যদি সুখন তাকে একটু জোর দিত। লোকটা অদ্ভুত। নিজে ভালোবাসতে জানে ভীষণ, অথচ অন্যের ভালোবাসা নিতে জানে না। সমস্ত সুখ তার নিজের ভালোবাসার ক্ষমতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, অন্যকে ভালোবাসতে দিতে জানে না। তাকে ভালোবেসে, তার জন্যে কিছু করে অন্যের যে সুখ, সেই সুখ থেকে সে বঞ্চিত করতে চায় অন্যকে। বড় দাম্ভিক লোকটা। স্বার্থপরও হয়তো বা। কিন্তু এমন একটা অদ্ভুত লোককেই বা ওর এমন করে ভালো লেগে গেল কেন?

কিছু ভালো লাগে না মহুয়ার। মহুয়ার কিছুই ভালো লাগে না।

এত করে যত্ন করে রান্না করল, মুখের উপর বলে দিল যে আসবে না; খাবে না। কপাল দিয়ে এখনও রক্ত চোঁয়াচ্ছে—তবুও বলল আসবে না।

মহুয়া নিজের মনে, জল-ভেজা চোখে অঝোরে বলে চলল—তুমি যে ঘর চাও সে ঘর তোমাকে কেউ দিতে পারবে না সুখ। তোমার চিরজীবন এমনি একাই থাকতে হবে। সুখী হতে হলে সাধারণ হতে হয়, আত্মসম্মানজ্ঞানহীন লোভী হতে হয়, কুমারের মতো; ছোট্ট মাছরাঙা পাখির মতো। বারে বারে জলে ছোঁ মেরে মেরে সুখের ছোট ছোট মাছ কুড়িয়ে এনে জড়ো করে সুখের ডালি ভরাতে হয়। তুমি সমস্ত সুখকে একবারে কবজা করতে চাও, তাই-ই তো তোমার আঁজলা গলে সব সুখই গড়িয়ে যাবে। কোনো মহুয়াকেই ধরে রাখতে পারবে না তুমি। হয়তো ধরে রাখতে চাও-ও না। জানি না। বুঝলাম না তোমাকে।

মহুয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুখনের বিছানায় নড়েচড়ে শুয়ে মনে মনে বলল—তোমাকে আমি সব সুখ দিতাম সুখ, স—ব সুখ; কিন্তু তুমি মহুয়াকে দাম দিলে না। দম্ভ ভরে তাকে ফিরিয়ে দিলে। ঠিক আছে। তুমি নিষ্ঠুর হৃদয়হীন হতে পারো, আর—আমিই কী পারি না? তুমি দেখো যাওয়ার আগে তোমার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করব না। সন্ধেবেলা ঘরে ফিরে যখন দেখবে, ঘরময় আমার হাতের ছাপ, মহুয়ার গন্ধ, চারদিকে আমি, টুকরো টুকরো আমি, তখন দেখব, তুমি কাঁদো কী না আমার জন্যে! দেখব তখন।

আমি তোমাকে স—ব দিলাম। আর তুমি আমার শেষ অনুরোধের দামটুকুও দিলে না! জংলি।

গোছগাছ করার বিশেষ কিছুই ছিল না। যা নামিয়েছিল, সেগুলোই স্যুটকেসে ভরে নেওয়া। চটিটি তো পিছনের সিটের পায়ের কাছেই রাখা যাবে।

মহুয়া দুপুরে ঘুমোয়নি। খাওয়নি। খিদে পেয়েছিল প্রচণ্ড। তবুও খায়নি। না-খাওয়ার আর কোনোই কারণ ছিল না। শুধু একমাত্র কারণ ছিল, জেদি, একগুঁয়ে লোকটা রাতে ফিরে এসে জানতে পারবে মংলুর কাছে যে, সে নিজে না খেয়ে মহুয়াকেও অভুক্ত রেখেছিল। লোকটাকে বড় দুঃখ দিতে ইচ্ছা করে, কাঁদাতে ইচ্ছা করে; যেমন করে সে কাঁদাল ওকে।

বাবা ও কুমার তখনও ঘুমোচ্ছিলেন। সত্যি, ঘুমোতেও পারেন! আর এই কুমারের মতো লোকরা কেন যে বাইরে আসে তা মহুয়ার জানা নেই। শুধু খেতে, হুইস্কি খেতে; আর দরজা বন্ধ করে তাস খেলতে। বন্ধ দরজার বাইরে যে এমন একটা দারুণ সুন্দর মর্মরধ্বনি তোলা পৃথিবী পড়ে রয়েছে তার দিকে এদের চোখ নেই। এদের চোখ হয়তো আছে, কিন্তু দেখার শক্তি নেই। চোখের লেন্সে ক্যামেরার লেন্সের মতো অব্যবহারে ফাঙ্গাস পড়ে গেছে। এদের কানে ট্রাম-বাস-গাড়ির শব্দ তালা লাগিয়ে দিয়েছে। অলস মন্থর হাওয়ায় পাথরের উপর শুকনো পাতা গড়ানোর চলমান ছবি এদের চোখে পড়বে না। দূর থেকে ভেসে আসা মৌটুসি পাখির চিকন গলার স্বর এদের কানে কখনও পৌঁছোবে না।

এই স্নিগ্ধ মধুর অপরূপ পটভূমিতে তাই-ই তো ওই আশ্চর্য লোকটা এমন করে আকৃষ্ট করেছিল তাকে, অমন শিহর ভরে পুলক তুলে ডাক দিয়েছিল তার বুকে, তার প্রাণের প্রাণে, তার শরীরের কেন্দ্রবিন্দুতে সে লোকটা সমস্ত সুখও কেন্দ্রীভূত করেছিল।

বাইরে হাওয়ার বেগ কমে এসেছে। রাস্তার ওপারের টাঁড় থেকে তিতির ডাকছে ক্রমাগত। শালবন থেকে টিয়ার ঝাঁকের চমকে-দেওয়া ট্যাঁ ট্যাঁ রব ভেসে আসছে।

বড় উদাস, বিধুর এই সময়টা। এই বিধুর ভাবটা মহুয়ার মনের মধ্যে এসে বাসা বেঁধেছে। এখন মহুয়া প্রস্তুত। শরীরে; মনেও।

যাওয়ার সময় হয়েছে। সুখনের ঘর গোছানো শেষ। মংলুকে দিয়ে মহুয়ার ডাল ভাঙিয়ে নিয়ে এসে ঘরে রেখেছে। রাতে এ ঘর মহুয়ার উগ্র গন্ধে ভরে যাবে। সুখনের গায়ের গন্ধ উগ্র। মহুয়া চেয়েছিল ওর নিজের স্নিগ্ধ সত্তার হালকা বাস রেখে যাবে সুখনের জন্যে।

মহুয়া ফুলের গন্ধের সঙ্গে মানবী মহুয়ার শরীর-মনের গন্ধের মিল নেই।

মহুয়া জানে, এ ছাড়া সুখের জন্যে রেখে যাবে এমন কিছুই ওর নেই। তবুও ও জানে, জাগতিক কিছু রেখে যাবে না বলেই ও অনেক কিছু রেখে যাবে এখানে। ওর জীবনের এক আশ্চর্য সুরেলা সুখ ও বিষণ্ণ অভিজ্ঞতার স্মৃতি।

বাইরে হাওয়াটা সারা দুপুর পাতা উড়িয়ে, পাতা ঝরিয়ে মন্থর হয়ে এসেছে। বেলা পড়ে আসছে।

না। লোকটা সত্যিই এল না। গাড়ি সারানোর পর কোথায় যেন চলে গেছে। শাকুয়া-টুঙে? কে জানে? এখন শাকুয়া-টুঙ থেকে সামনের উপত্যকাটা কেমন দেখাচ্ছে? একদিকে চাত্রার জঙ্গল, সোজা অন্যদিকে সীমারীয়া-টুটিলাওয়া-হাজারীবাগের জঙ্গল আর বাঁয়ে আদিগন্ত পালামৌ। কী আশ্চর্য ভালো-লাগা জায়গাটাতে।

কে একজন মিস্ত্রিমতো লোক এসে দরজায় দাঁড়াল। মহুয়া বাবাকে ডাকল। তার হাত থেকে কাগজটা নিয়ে দিল বাবার হাতে।

সান্যাল সাহেব কাগজটা হাতে নিয়ে বললেন, একি? তাঁর গলায় অবাক হওয়ার সুর। কুমারও পাশে এসে দাঁড়াল।

কাগজটা একটা ক্যাশমেমো। একটা মোটরপার্টসের দোকানের। লেখা তিনশো পনেরো টাকা। সঙ্গে একটা চিঠি। সুখন লিখেছে—

সবিনয় নিবেদন,

তিনশো টাকা দিয়েছিলেন, তার ক্যাশমেমো।

বেশি যা লেগেছে তা আর দিতে হবে না আপনাদের। মেরামতির কোনো বিল করিনি। কুমারবাবুকে বলবেন আমার যা-কিছু অপরাধ ক্ষমা করে দিতে। আপনারা আপনার জনের মতো আমার পর্ণকুটিরে উঠেছিলেন—এতেই আমি বড় খুশি। আমার আপনার জন বলতে বিশেষ কেউই নেই। এখানে বাঙালির মুখও খুব বেশি দেখি না।

আপনাদের এ দুদিন বড়ই কষ্ট হল। আশা করি, এই কুঁড়ে ছেড়ে গিয়ে বেত্‌লার বাংলোয় আপনারা সুখেই থাকবেন। এই কষ্টর কথা ভুলে যাবেন। ইতি—

বিনীত
সুখরঞ্জন বসু
ফুলটুলিয়া, গুঞ্জা

কুমার চুপ করে ছিল।

সান্যাল সাহেব মিস্ত্রিকে শুধোলেন, সুখনবাবু কোথায়?

মিস্ত্রি বলল, 'জানি না। গাড়ি ঠিক করেই চলে গেছেন।'

—কোথায় গেলেন? তাঁর না ঘরে শুয়ে থাকবার কথা?

মিস্ত্রি বলল, 'আমরাও বলেছিলাম। ওস্তাদ কারও কথা শোনেই না।'

সান্যাল সাহেব বললেন, দ্যাখো তো কী অন্যায়!

কুমার বলল, 'আমাদের একটা ধন্যবাদ দেওয়ারও সুযোগ দিল না মিস্ত্রি। কিন্তু গাড়ি সারাবার পয়সা না হয় নাই-ই নিল, কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার? এটাও এক ধরনের অপমান করা।'

মিস্ত্রি নমস্কার করে চলে গেল। বলে গেল যে, গাড়ি ধুয়ে-টুয়ে পরিষ্কার করিয়ে রেখে গেছে ওস্তাদ কারখানার বাইরে শিশুগাছতলায়।

মিস্ত্রি চলে গেলে কুমার আবার বলল, 'বিনি পয়সায় তো আমি কারও খাবার খাইনি। আর খাবোই বা কেন? জোর করে নুন খাইয়ে গুণ গাওয়াবার ব্যবস্থা। কায়দাটা ভালোই।'

মহুয়া একবার চোখ তুলে তাকাল কুমারের দিকে। তারপর চুপ করে রইল।

মংলু চা করে নিয়ে এসেছিল। চা খেতে খেতে সান্যাল সাহেব ও কুমার জামাকাপড় পরে নিলেন।

দেওয়ালে-ঝোলানো ফ্লাস্কটা সবার অলক্ষ্যে হাতে নিয়ে মহুয়া রান্না ঘরে গেল। মংলুকে বলল, 'এটা তোর ওস্তাদের জন্য রেখে দিস মংলু। যখন শাকুয়া-টুঙে যাবেন তখন চা বানিয়ে দিস। আর এই লুডোটা তোর জন্যে দিয়ে গেলাম। এই টাকাটা রাখ—মিষ্টি খাবি।'—বলেই কুড়িটা টাকা গুঁজে দিল মংলুর হাতে।

মংলু আপত্তি জানাল টাকাটা নিতে। বলল, ওস্তাদ রাগ করব।

মহুয়া বলল, 'আর না-নিলে আমি যে রাগ করব? তোর ওস্তাদকে বলিস যে রাগ আমিও করতে পারি। আর বলিস যে, তোর ওস্তাদ বড় অসভ্য।'

মহুয়া চলে আসছিল রান্নাঘর ছেড়ে। কেন জানে না, তার চোখ জলে ভরে গেছিল। তার অভিমান, রাগ, তার উষ্মা যে দেখাবে সে সুযোগও লোকটা তাকে দিল না। এ যেন হাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করা; আর ক্লান্ত হওয়া।

সান্যাল সাহেব বারান্দায় দাঁড়িয়ে পাইপে তামাক ভরছিলেন। বললেন, কই রে মৌ, হল তোর?

মহুয়া আসি বলে, বাইরে এল।

সান্যাল সাহেব বললেন, 'মংলু, বাবা, মালগুলো এক এক করে তোলো এবার গাড়িতে।'

তারপর বললেন, 'কুমার যাও, বুটটা খুলে দাও গাড়ির।'

কুমার বারান্দায় বেরিয়ে মংলুকে ডাকল। বলল, 'এই ছোঁড়া এদিকে আয়, তুই অনেক করেছিস আমাদের জন্যে, তোকে একটু বকশিশ দিই।'

মংলু বলল, 'না, না। নেব না।'

সান্যাল সাহেব বললেন, 'সে কি? নিয়ে নে, বাবা, নিয়ে নে।'

কুমার ভীষণ গর্বভরে দু' পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে একটা এক টাকার নোট বের করে মংলুকে দিল সবাইকে দেখিয়ে।

মহুয়ার সমস্ত অন্তর কুমারের দীনতায় কুঁকড়ে গেল। এই এক ধরনের লোক। এরা দেখিয়ে দান দেয়। এবং এমন দান যে, সে বলার নয়। এরাই গ্রান্ড হোটেলে খেয়ে উর্দি-পরা বেয়ারার সেলাম প্রত্যাশা করে দশ টাকার নোট ফস্ করে বের করে। ফাইভ-স্টার হোটেলের পেজবয়কে কিছুই না করার জন্যে পাঁচ টাকার নোট ছুঁড়ে দেয়। যেহেতু মংলু মংলু, যেহেতু এই দানের সাক্ষী শুধু তারাই আর কুমারের নীচ অন্তঃকরণ, তাই-ই এমন জায়গায় তার হাত দিয়ে শুধু এক টাকার নোট বেরোয়।

এরপর কুমার আরও এক কাণ্ড করল। দুটো দশ টাকার নোট বের করে মংলুকে দিয়ে বলল, 'তোর ওস্তাদকে দিয়ে দিস—আমাদের খাওয়ার টাকা।'

সান্যাল সাহেব হইহই করে উঠলেন, বললেন, 'একি করছ কুমার? সুখনবাবু তো খাওয়ার টাকা চাননি? এ দিলে তাঁকে অপমান করা হবে। তাছাড়া টাকার কথাই যদি বলো, উনি বোধহয় আমাদের জন্যে এক এক বেলাতেই কুড়ি টাকার বাজার করেছেন। তাছাড়া টাকাটাই তো সব নয়।'

তারপর মহুয়ার দিকে চেয়ে বললেন, 'যে আদর-যত্ন, আন্তরিকতা উনি দেখিয়েছেন তার দাম কী টাকায় দেওয়া যায়?'

কুমার টাকাটা পার্সে রাখতে রাখতে ভুরু তুলে বলল, 'টাকায় দাম দেওয়া যায় না, এমন কিছু আছে নাকি পৃথিবীতে? বেশ তো কুড়ি টাকা না হয়, দুশো টাকাই নেবে—দুশো টাকাই দিচ্ছি।'

সান্যাল সাহেব বললেন, না, না! এতে আমি রাজি নই। উনি নিজে থাকলেও বা কথা ছিল, খাওয়ার টাকা এভাবে মংলুর হাতে দেওয়া যায় না।

মহুয়া বলল, 'বাবা, তোমার একটা কার্ড দিয়ে যাও মংলুকে। আর ওঁর ঠিকানা তো আমরা জানিই। তুমি কলকাতায় ফিরে ওঁকে একটা চিঠি লিখে ধন্যবাদ জানিয়ো।'

সান্যাল সাহেব বললেন, 'কলকাতা কেন? বেতলা থেকেই লিখব। তুই ভালোই বলেছিস।'

বলেই সান্যাল সাহেব তাঁর বাড়ি ও অফিসের ঠিকানা লেখা একটা কার্ড মংলুকে দিলেন।

মহুয়া খুশি হল। সে নিজে থেকে তার ঠিকানা দিতে চেয়েছিল। সুখ নেয়নি, কিন্তু বাবার কার্ড থাকলে ঠিকানাও রেখে যাওয়া হল আবার তার নিজের সন্ধানও রইল।

মংলু মালপত্র তুলে দিয়েছিল। ওরা ধীর পায়ে গাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। বেলা পড়ে গেছিল। এখন রোদ নেই, তবে আলো আছে। থাকবে এখনও আধঘন্টা পৌনে এক ঘন্টা।

বারান্দা ছেড়ে নেমে আসবার সময় মহুয়ার বুকের মধ্যেটা মুচড়ে উঠল। গাড়ির খোলা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে একবার শাকুয়া-টুঙের দিকে চাইল শেষবারের মতো। পশ্চিমাকাশে নীল শান্তির ছবি হয়ে সন্ধ্যাতারাটা সবে উঠেছে। অনেক রকম পাখি ডাকছে শাকুয়া-টুঙের দিক থেকে।

মংলুর গাল টিপে দিয়ে একবার আদর করে মহুয়া গাড়িতে উঠল। সান্যাল সাহেব একটা দশ

টাকার নোট মংলুর হাতে দিয়ে নিজেও উঠে পড়লেন। দরজা বন্ধ করার শব্দ হল। ইঞ্জিন গুমরে উঠল।

ধুলো উড়িয়ে মুখ ঘুরিয়ে গাড়িটা বড় রাস্তার দিকে চলল।

মংলু দাঁড়িয়েছিল। লাটাখাম্বায় কে যেন জল তুলছিল। তার ক্যাঁচোর-কোঁচর শব্দে এই আসন্ন সন্ধ্যার নিস্তব্ধ বিষণ্ণতা আরও ভারী হয়ে উঠেছিল।

কাঁচা রাস্তাটা বন-জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গেছে। বাঁদিক দিয়ে একটা নালা বয়ে চলেছে রাস্তার সমান্তরালে। ওরা আধ মাইলটাক এসেছে।

কুমার বলল, 'সব নিয়ে আসা হয়েছে তো? ফ্লাস্কটা? ফ্লাস্কটা তো দেখলাম না।'

তারপর পিছনে মুখ ঘুরিয়ে মহুয়ার দিকে চেয়ে বলল, আছে?

মহুয়া বলল, 'এ মাঃ। একদম ভুলে গেছি। রান্নাঘরে ছিল—আনতে মনে নেই।'

কুমার বলল, 'রান্নাঘরে কেন? আমি তো বিকেলেও দেখলাম আমাদের ঘরের দেওয়ালে টাঙানো ছিল।'

ছিল বুঝি? কই আমি দেখিনি তো?

মহুয়া মিথ্যে কথাটা সত্যি মতো করে বলল।

কুমার বলল, 'ওই ছোঁড়া ঝেড়ে দিয়েছে। ওস্তাদের চেলা তো! আর কত হবে? তারপরই বলল, ব্যাক করব নাকি?'

সান্যাল সাহেব বললেন, 'ছাড়ো, ছাড়ো; ফ্লাস্কের শোকে এত উতলা হওয়ার দরকার নেই। ফেরার ঝামেলা কোরো না।'

রাস্তাটা একটা বাঁক নিয়েছে, বাঁক নিয়েই পাকা রাস্তা। একটা মোড়। দু'তিনটে কাঁচা-পাকা রাস্তা এসে মিশেছে ওখানে, কিন্তু গন্তব্য-নির্দেশক কোনো বোর্ড-টোর্ড নেই।

কুমার গাড়ির গতি কমিয়ে বলল, 'অ্যাই মরেছে! এখন কোন্‌দিকে যাই? আবার রাস্তা ভুল করলেই তো চিত্তির। একবারেই যা নাজেহাল।'

মোড়টার কাছেই রাস্তার ডানদিকে অনেকগুলো বড় বড় কালো ন্যাড়া পাথর। জায়গাটায় শুধুই মহুয়া গাছ—পত্রশূন্য শাখা-প্রশাখা বিস্তার করা বহু পুরোনো সব মহীরুহ। ধুলো, শুকনো গাছাগাছালি, আর শেষ বিকেলের গায়ের গন্ধের সঙ্গে মেশা মহুয়ার গন্ধে জায়গাটা ম-ম করছে।

গাড়িটা ঐখানে থামাতেই হঠাৎ মহুয়ার চোখে পড়ল একটা তিন-পেয়ে কালো কুকুর পাথর বেয়ে উপর থেকে লাফাতে লাফাতে নেমে আসছে গাড়ির দিকে। কালুয়া।

একি! বলেই কুমার থেমে গেল।

ওর গলায় বিরক্তি ঝরে পড়ল। বিড়বিড় করে বলল, শালা খাওয়ার-টাকা নেবার জন্যে পথে দাঁড়িয়ে আছে!

সান্যাল সাহেব চাপা গলায় বললেন, কী হচ্ছে কুমার?

কালুয়ার পিছু পিছু মাথায় ব্যান্ডেজ-বাঁধা সুখন ধীরে ধীরে নেমে আসছিল নীচে। ওকে দেখে মহুয়ার মনে হচ্ছিল যে, তার সুখ বড় বুড়ো হয়ে গেছে একদিনেই। অভুক্ত, বড় ক্লান্ত, শ্রান্ত।

মনে হচ্ছিল, এইটুকু আসতেই ওর একযুগ লাগবে।

মহুয়া মনে মনে বলল—লাগুক; এক যুগই লাগুক। তবু তুমি নেমে এসো সুখ, তুমি কাছে এসো।

কাছে আসতেই দেখা গেল সুখনের হাতে একটা মহুয়ার বোতল। আগে বোধহয় আরও খেয়ে থাকবে। ধীর পায়ে নামার এও একটা কারণ।

মাঝপথে থেমে দাঁড়িয়ে সুখন মিস্ত্রি বোতলটাকে মুখে তুলে, মাথাটাকে পিছনে হেলিয়ে ঢক্‌ঢক্

করে আবার খেল অনেকখানি। গেঞ্জির হাতায় জংলির মতো মুখ মুছল। তারপর কাছে এগিয়ে এল।

কুমার ফিসফিস করে বলল, অ্যাবসলুটলি ড্রাঙ্ক্।

মহুয়া মনে মনে বলল—মহুয়া খেলেই ড্রাঙ্ক, আর হুইস্কি খেলে ড্রাঙ্ক নয়! বাঃ!

কুমার বলল, তুমি গাড়ি থেকে নেমো না মহুয়া। খুব সাবধান। ব্যাটা বেহেড মাতাল। তোমার গায়ে-টায়ে হাত দিয়ে বসতে পারে।

সান্যাল সাহেব গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়েছিলেন ইতিমধ্যেই। সুখন কাছে আসতেই বললেন, 'আরে আসুন, আসুন। আমরা তো ভাবলাম আর দেখাই হল না বুঝি। কী যে লজ্জায় ফেললেন না আপনি আমাদের।'

ততক্ষণে মহুয়াও দরজা খুলে নেমে সান্যাল সাহেবের পাশে দাঁড়িয়েছিল। সুখন সত্যিই মাতাল হয়ে গেছে বলে মনে হল মহুয়ার। ওর দিকে তাকিয়ে এক অপ্রকাশিতব্য কষ্টে মহুয়ার বুক ভেঙে যেতে লাগল।

কালুয়া ওর পায়ের কাছে দৌড়োদৌড়ি করে একবার রাস্তায় যাচ্ছিল, একবার গাড়ির কাছে আসছিল। সুখন জড়ানো গলায় ওকে ধমক দিয়ে বলল, 'এদিকে আয় কালুয়া। একটা পা তো গেছে, তোর কী গাড়ি চাপা পড়ে মরার ইচ্ছা হয়েছে?' একটু পর আবার টেনে টেনে বলল তুই ছাড়া....।

যে লোকটা সুস্থ অবস্থায় দৃঢ়, শক্ত, অন্যের দয়া ও ভালোবাসার প্রতি উদাসীনতায় মুখ ফেরান, সেই লোকটা মাতাল অবস্থায় যেন শিশু হয়ে গেছে; বড় দুর্বল, অসহায় হয়ে পড়েছে।

সুখন কাছে এসে বোতলসুদ্ধ হাত তুলে বলল, নমস্কার। তারপর আবার জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, নমস্কার সান্যাল সাহেব, নমস্কার কুমার সাহেব।

মহুয়ার কথা যেন ভুলেই গেছিল এমনিভাবে মহুয়ার দিকেও জোড়হাত তুলে বলল, নমস্কার।

সান্যাল সাহেব বললেন, আপনি এখানে কী করছেন?

'আমি? কিছু না। কী আবার করব? তারপরেই বলল, ও না। হ্যাঁ হ্যাঁ। আমি কী যেন একটা করতে এসেছিলাম এখানে। অ্যাই—এইবার মনে পড়েছে।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, 'এখানে আপনারা রাস্তা ভুল করতে পারতেন। আপনাদের আগেই বলে দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু মনে ছিল না। ভুল রাস্তায় গেলে সন্ধের পর ডাকাতির ভয় আছে এদিকে। তাই এলাম। ভাবলাম, রাস্তা বাতলে দিয়েই আমার ছুটি। ঠিক রাস্তা। ঠিক রাস্তায় আপনারা সব ভালোমতো চলে গেলেই ছুটি।'

সান্যাল সাহেব উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, 'সে কী? মাথায় এত বড় একটা উন্ড্ নিয়ে এতখানি হেঁটে এসেছেন? আপনার না বিছানায় শুয়ে থাকার কথা? কী করে আবার এতটা ফিরবেন? চলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

সুখন হাসল। মাতালের অপ্রকৃতিস্থ হাসি। তারপর বলল, বিছানাও আছে। ওই যে। বলেই পাথরগুলোর দিকে দেখাল। বলল, ওইখানেই শুয়েছিলাম।

কুমার এতক্ষণে গাড়ি থেকে বেরিয়েছে। কুমারও দরদ দেখিয়ে বলল, 'সে কী ? ওখানে বিছে আছে, সাপ আছে, গরমের দিন।'

সুখন হাসল। বলল, 'বিছে তো কতই কামড়াল। কই? কিছু হল কী? কী কুমার সাহেব, হল কিছু?'

কুমার দ্ব্যর্থক কথাটার মানে বুঝতে পেরেই মনে মনে বলল—শালা। এখন তোমাকে একা পেয়েছি মাতাল অবস্থায়। গাড়ির জ্যাক বের করে মাথায় মারলে এখানেই তোমাকে চিরতরে শুইয়ে দিয়ে যেতে পারতাম—কিন্তু সঙ্গে সব মিস্ত্রি-দরদি সাক্ষী থেকেই গড়বড় হয়ে গেল।

কুমার উত্তর দিল না। তারপর শুধোল, আমরা কোন্‌দিকে যাব?

সুখন হাত তুলে বলল, বাঁয়ে—সোজা বাঁয়ে চলে গেলেই ঠিক যাবেন।

মহুয়া কী করবে, কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। ও বুঝছিল যে, ওর কিছু একটা বলা উচিত। আর কিছু বলার সুযোগ আসবে কী না কে জানে? তাছাড়া ওর এই নীরবতায় বাবা ও কুমার সন্দেহ করতে পারেন কিছু।

মহুয়া হঠাৎ বলল, ব্যথা কেমন আছে?

সুখন চমকে উঠল গলার স্বরে শুনে। বলল, ব্যথা?

ব্যথার কথা যেন ভুলেই গেছিল। তারপর যেন মনে পড়ায় বলল, 'ও, ব্যথা একটু আছে। থাকবে কিছুদিন। তারপর চলে যাবে। ভাববেন না।'

সান্যাল সাহেব বললেন, 'আপনি যে কী করলেন না! গাড়ি সারাবার টাকা নিলেন না, দু'দিন খুব খাওয়ালেন সব নিজের খরচে—সত্যি, আপনার ঋণ শোধবার নয়। আমরা তো আপনার খদ্দের বই আর কিছুই নই; আমরা আপনার কে যে আমাদের জন্যে নিজের এমন ক্ষতি স্বীকার করলেন?'

সুখন একটুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর যেন অনেক দূর থেকে বলছে, যেন অন্য কেউ বলছে, এমন গলায় বলল, বলার আগে একবার মহুয়ার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নিল; বলল: 'কী জানেন সান্যাল সাহেব, জীবনে কিছু কিছু ক্ষতি থাকে—তা পূরণ হওয়ার নয়—তা চিরদিন ক্ষতিই থেকে যায়। সে সব ক্ষতি শুধু স্বীকারই করার।'

তারপর বলল, 'মনে করুন এও সেরকম কোনো ক্ষতি। তাছাড়া, যে ক্ষতি স্বীকার করে, সেই স্বীকার করার সুখটা তারই একার তাকে। সে কারণে যাদের জন্যে অন্যের ক্ষতি হয়, তারা নিজেরা লাভবান হয় বলেই সুখের ভাগটা কিছু পায় না।'

কুমার মনে মনে বলল—শালা হেভি যাত্রা করছে তো। শালা বহুরূপী!

সান্যাল সাহেব বললেন, 'আপনার কথা শুনে কেউই বলবে না যে, আপনি মোটরগাড়ির মিস্ত্রি।'

সুখন হাসল। বলল, 'সেইটিই দুঃখ। খদ্দেররাও স্বীকার করে না; আমার মিস্ত্রিরাও নয়। আমার মেরামতির গুণ কেউই স্বীকার করল না।'

পরক্ষণেই বলল, অন্ধকার হয়ে এল। আর দেরি করা ঠিক নয় আপনাদের। এবার রওয়ানা হয়ে পড়ুন, আবার কখনও এদিকে এলে, গাড়ি খারাপ হলে সুখন মিস্ত্রিকে খবর দেবেন—দুখন মিস্ত্রির ভাই সুখন মিস্ত্রিকে। আর কী বলব?'

মহুয়ার পা দুটো মাটি আঁকড়ে ছিল। ওর মুখে আসছিল যে, আমি যাব না। আমি আপনার কাছে থাকব। আমাকে আপনি কেড়ে নিন, জোর করুন আমার উপর, আপনার জোর দেখান। পরক্ষণেই ওর মনে হল, বড় দাম্ভিক তুমি সুখ। তুমি নিজে দুঃখ পাবে, অন্যকে দুঃখ দেবে। তুমি এরকমই।

সান্যাল সাহেব বললেন, 'আপনি এরকম করেন কেন? এরকম মহুয়া-ফহুয়া খাওয়া খারাপ। এরকম করবেন না।'

সুখন হাসল। বলল, 'এই—আমি এরকমই। আমি ভালো না।'

কুমার ছটফট্ করছিল। বলল, এবার এগোনো যাক।

সান্যাল সাহেব কিছু বলার আগেই, কুমারকে উদ্দেশ্য করে সুখন বলল, 'ওহোঃ, ভুলেই গেছিলাম। আপনার জন্যে একটা জিনিস এনেছিলাম।'

বলেই পকেট থেকে একগাদা পলাশ ফুল বের করে কুমারকে দিল সুখন।

কুমার স্মার্টনেস দেখিয়ে নাকের কাছে তুলল ফুলগুলোকে।

সুখন বলল, 'নাকের অত কাছে নেবেন না—এতে পিঁপড়ে থাকে—কামড়ে দেবে।'

তারপর বলল, 'আরও একটা জিনিস দেবো ভেবেছিলাম—একটা পাখি—টুঁই পাখি। কিন্তু এত অল্প সময়ে জোগাড় করা গেল না।'

—সেটা আবার কী পাখি?

দেখেননি? ছোট্ট, মিষ্টি পাখি—সবুজ সবুজ—লেজ-ঝোলা—উড়ে উড়ে ডাকে টিঁ-টুঁই—টিঁ-টিঁ-টুঁই....।

কুমার এই পলাশ ও টুঁই পাখির ব্যাপারটা বুঝল না।

তবে এটুকু বুঝল যে, এর পেছনে কোনো রহস্য আছে। শালা হেভি খচ্চর।

কুমার বলল, 'চলুন, সান্যাল সাহেব, এবার যাওয়া যাক।'

বলেই কুমার গাড়িতে গিয়ে বসল ড্রাইভিং-সিটে।

তারপর সান্যাল সাহেবও সুখনকে নমস্কার করে উঠে বসলেন। মহুয়া উঠল শেষে।

সুখন মহুয়ার দিকে এগিয়ে গেল একটু। হঠাৎ মহুয়ার হাত দুটো দু' হাতে ধরে বলল, 'নমস্কার দিদিমণি। অনেক কষ্ট করে গেলেন এখানে। সুখন মিস্ত্রিকে মনে থাকবে না, জানি আপনাদের কারোই; কিন্তু আপনাদের সবাইকেই মনে থাকবে সুখন মিস্ত্রির।'

মহুয়া মুখ নামিয়ে নিল। চোখটা ভারী হয়ে এল মহুয়ার। গলার কাছে কী যেন একটা চাপা কষ্ট দলা পাকিয়ে এল। মহুয়া বলল, চলি।

সুখন দরজাটা নিজের হাতে বন্ধ করে দিল। তারপর বলল, 'চলি বলতে নেই, বলতে হয় আসি। এও জানেন না?' তারপর আবার নমস্কার করে বলল, এদিকে এলে আবার আসবেন দিদিমণি।

ইঞ্জিনটা স্টার্ট করেই আবার বন্ধ করে দিল কুমার। কুমার ডাকল সুখনকে। বলল, এই যে এদিকে শুনুন।

সুখন অবাক হয়ে ওদিকে যেতে যেতে বলল, 'কী ব্যাপার? আপনি তো সুখন মিস্ত্রিকে তুমি করেই বলতেন। হঠাৎ অধমের এ উন্নতি কেন?'

সান্যাল সাহেব ও মহুয়া অবাক হয়ে কুমারের দিকে তাকিয়ে ছিল। কুমার কেন ডাকল, ওরা বুঝল না।

সুখন সামনের ডানদিকের দরজার কাছে গেলে কুমার হিপ্-পকেট থেকে পার্স বের করে দুটো একশো টাকার নোট ফট্ করে বের করে সুখনের হাতে দিয়ে বলল, আমাদের খাওয়া-দাওয়ার খরচা।

সুখন কুঁজো হয়ে গাড়ির জানালার কাছে মুখ নামিয়ে এনেছিল। টাকাটা হাতে নিয়ে ওইভাবেই অনেকক্ষণ চুপ করে রইল।

তারপর খুব আস্তে আস্তে বলল, এটার কী খুবই দরকার ছিল?

কুমার বলল, এটা না নিলে আমার খুব ছোট লাগবে নিজেকে।

সুখন আশ্চর্য হবার মতো মুখ করে থাকল অনেকক্ষণ। যেন ও বোবা হয়ে গেছে। তারপর বলল, 'আপনারও তাহলে ছোট লাগে নিজেকে কখনও কখনও? আশ্চর্য!'

কুমার রাগত গলায় বলল, মানে?

সুখন জবাব না দিয়ে, মহুয়াকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'এই যাঃ, একদম ভুলেই গেছিলাম। আপনার জন্যেও একটা জিনিস এনেছিলাম। গরিব মিস্ত্রি—আর তো কিছুই দেওয়ার নেই'—বলেই পকেট হাতড়ে একমুঠো চক্চকে বল-বিয়ারিং বের করল সুখন।

বের করে, জানালা গলিয়ে হাত ঢুকিয়ে মহুয়ার হাতে দিল।

প্রয়োজনের চেয়েও অনেক বেশিক্ষণ মহুয়ার হাতে হাত ছুঁইয়ে রাখল ও। তারপর বলল, আপনি এখনও বড় ছেলেমানুষ আছেন দিদিমণি।

সান্যাল সাহেব বললেন, তা যা বলেছেন।

সান্যাল সাহেবও চাইছিলেন যে এবার এগোনো যাক। টাকাটা দিয়ে ফেলে কুমার এখন কী

নতুন বিপত্তি বাধাল কে জানে? কুমারটা একটা স্কাউন্ড্রেল। সব জিনিসেরই সীমা থাকা উচিত। ওর অভদ্রতার কোনো সীমা নেই।

কুমার আর কিছু না বলে এঞ্জিনের সুইচ ঘোরাল। গাড়িটাকে গিয়ারে দিল।

সুখন তখনও গাড়ির পাশে দাঁড়িয়েছিল। সুখন বলল, 'এক সেকেন্ড। আর আপনার সঙ্গে দেখা হবে না। একটা কথা বলে নিই।'

তারপর একটু থেমে বলল, 'কুমার সাহেব, টাকা—বড় বেশি টাকা চিনেছেন আপনি। তাই না? জিন্দ্গীতে টাকার চেয়েও বড় বহত্ বহত্ জিনিস আছে। এখনও বয়স আছে, দিন আছে; সেসব চিনুন।'

তারপর বলল, এই নিন্। বলেই, একশো টাকার নোট দুটোকে ফস্স্ ফস্স্ করে কুচি কুচি করে ছিঁড়ে কুমারের মুখে ছুঁড়ে দিয়ে সুখন বলল 'এই জঙ্গলে পাহাড়ে এমন লক্ষ লক্ষ শুকনো পাতা এই চোত্-বোশেখে হাওয়ায় ওড়ে।'

তারপরই মুখ সরিয়ে নিয়ে বলল, যান, স্টার্ট দিন।

কুমারকে বলতে হল না আর। অ্যাকসিলারেটর পুরো দাবিয়ে দিয়ে স্টিয়ারিং সোজা ধরে বসেছিল কুমার। ক্লাচে পা রেখে। ক্লাচ থেকে হঠাৎ পা সরাতেই গোঁ-গোঁ আওয়াজ করে ভয়-পাওয়া শুয়োরের মতো লাফিয়ে গেল গাড়িটা সামনে।

কুমার ভয় পেয়ে গেছিল। মনে মনে বলল, এ শালাকে বিশ্বাস নেই। টাকা ছিঁড়েও হয়তো শান্তি হয়নি, এবার দৌড়ে এসে হয়তো মেরেই বসবে।

সুখন ওইখানেই দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছিল। সান্যাল সাহেব জানালা দিয়ে। মহুয়া পেছনের কাচ দিয়ে। একটু পরেই রাস্তা বাঁক নিল।

সুখনকে আর দেখা গেল না। আবছা অন্ধকার, কালো পাথর, ঝোপ-ঝাড়, জঙ্গল, এ-সবের মধ্যে সুখনের দাঁড়িয়ে থাকা, হাত-নাড়া চেহারাটা হঠাৎই হারিয়ে গেল।

মহুয়া পিছনের সিটে হেলান দিয়ে আধশোয় ভঙ্গিতে বসেছিল।

তার দু'গাল ভিজে যাচ্ছিল চোখের জলে।

গাড়ির হেডলাইট জ্বালিয়ে দিয়েছিল কুমার। ড্যাশবোর্ডের আলোতে ও হেডলাইট ইন্ডিকেটরের সবুজ আলোতে ড্যাশবোর্ডের উপরে রাখা একগুচ্ছ পলাশের লাল রঙে কেমন সবুজ আভা লেগেছে।

মহুয়া হাতের মধ্যে বল্‌বিয়ারিংগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। অনেকক্ষণ হাতের মধ্যে থাকায় গরম হয়ে উঠেছে ওগুলো।

হঠাৎ সান্যাল সাহেব বললেন, টুঁই পাখিটা কী পাখি?

কুমার তাচ্ছিল্যের গলায় বলল, 'আপনিও যেমন! ব্যাটা মিস্ত্রি নিশ্চয়ই মন-গড়া নাম দিয়ে দিয়েছে কোনো পাখির। আজব চিজ একটি। সুখন মিস্ত্রি!'

তারপরই পিছনে মুখ ঘুরিয়ে খুশি খুশি গলায় কুমার বলল, 'মহুয়ার কী হল? চুপচাপ কেন! অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে বেত্‌লা পৌঁছোব আমরা।'

মহুয়া জবাব দিল না। সান্যাল সাহেব বলল, কী রে মৌ?

মহুয়া বলল উঁ।

—কী হল তোর?

মহুয়া বলল, কিছু না।

—তবে, চুপ করে কেন?

মহুয়া উত্তর দিল না অনেকক্ষণ।

তারপর অস্ফুটে বলল, ভাবছি....।

স্বগতোক্তি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

প্রীতিভাজনেষু

আমি, তুমি, আমরা সকলেই অনেক কিছু বলতে চাই, বলিও, কিন্তু বোধহয় শোনবার লোক পাই না।

পাই না, কারণ যে শুনবে তারও যে বলার অনেক কিছু আছে। তার নিজের কথা কেউ মনোযোগ দিয়ে শোনে না যখন, সে কেন আমার-তোমার কথা শুনতে যাবে?

তাই বোধহয় আমি, আমরা সকলেই, প্রায়ই নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলি, দুপুরবেলার খোঁটায় বাঁধা একলা বাছুরের মতো আমরা সবাই বলি। ভাগ্যিস সোচ্চারে বলি না। আয়নার সামনে বসে চুল বাঁধতে বাঁধতে, অথবা ক্লাসের অফ পিরিয়ডে, অথবা চান করতে করতে আমরা সকলেই নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলি।

আমরা সকলেই লেখিকা নই। আমি তো চিঠি পর্যন্ত লিখতে পারি না, অথচ আমি কী দারুণ ভাবতে পারি। সময় নেই, অসময় নেই, আমি কেমন ভাবতে বসে যাই। নিজের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা-কাটাকাটি করি।

আজকে আমার ছুটি। আজকে মঙ্গলবার ; অথচ আমার ছুটি। জামশেদপুরে অন্য সবকিছু মঙ্গলবার বন্ধ বলে, আমার স্কুলও ছুটি।

আজ অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম। এখানে যা গরম, প্রথমরাতে ঘুম মোটে আসেই না ; ঘুম আসে শেষ রাতে। ভোরের দিকে খুব আমেজ লাগে, উঠতে ইচ্ছে করে না।

ঘরের মধ্যেই শুই। আমি বাবা পারি না বাইরে শুতে। আমি কলকাতার মেয়ে, বাইরে খোলা আকাশের নিচে শুয়ে আমার অভ্যেস নেই, তারপর পাশেই রাস্তা; কখন শাড়ি উঠে যায়, সায়া উড়ে যায় হঠাৎ হাওয়ায়—আমি পারি না, লজ্জা করে ; তাই আমায় ঘরেই শুতে হয়।

রমেন বাইবেই শোয়। কোনো কোনোদিন শেষরাতে আমার ঘুম ভাঙাতে ঘরে আসে। ঘুমের মধ্যে তখন মনে হয় সবকিছু স্বপ্ন ; অথবা দুঃস্বপ্ন। আমরা মেয়ে, অনেক কিছু ভালো না লাগলেও আমাদের করতে হয় ; ইন্দিরা গান্ধীর রাজত্বেও।

এই গরমে কারুর গায়ের ছোঁয়াই ভালো লাগে না। রমেন অথবা রমেনরা রাতের কোনো এক প্রহরে কালা হয়ে যায়, কানা হয়ে যায়, তখন, কিছুক্ষণের জন্য তারা গুহামানব হয়ে যায়। সেই সব মুহূর্তে ভাবতে ঘেন্না করে যে ওকে আমি স্বেচ্ছায়, ভালোবেসে, বাড়িসুদ্ধ সকলের অমতে বিয়ে করেছিলাম। ভাবতেও ঘেন্না হয়।

ঘুম থেকে উঠে চা খেয়ে ঘরবাড়ি পরিষ্কার করলাম ভালো করে। আজ মুখী আসেনি। মুখী সাঁওতাল মেয়ে। ওই বাড়ির সব কাজকর্ম করে। আজ ও আসেনি। ওর মেয়েটার হাম উঠেছে খুব।

যা তরি-তরকারি কেনা ছিল সব শেষ। একবার বাজারে যেতে হবে।

বাইরে বেরোতে হবে ভাবলেই ভয় হয়—যদিও কদমা বাজার বেশিদূর নয়। রমেন আজ দুপুরে খেতে আসবে—একটু কিছু স্পেশ্যাল রাঁধতে হয় ওর জন্যে।

বাজারে বেরোতে হবে এমন সময় মিস্টার বোস এলেন। সুশান্ত বোস। পাশের বাংলোয় থাকেন। রমেনের প্রথম স্ত্রীর কীরকম দূর-সম্পর্কের কাজিন। ভদ্রলোক মানুষ বড় ভালো। আমার খুব ভালো

লাগে। আজকালকার ছেলেদের মধ্যে স্মার্টনেসের বিকল্প চিবিয়ে চিবিয়ে আমেরিকান উচ্চারণের ভুল ইংরিজি ও অদ্ভুত সাজপোশাক দেখে দেখে এমন ক্লান্তি এসেছে যে তার মধ্যে সুশান্ত বোস একজন ব্যতিক্রম। স্মার্টনেস মানে যে লাফানো-ঝাঁপানো নয়, ড্রেইনপাইপ বা অ্যালিফ্যান্ট্ ট্রাউজার নয়, তার মানে যে ঘন ঘন সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়া নয়, সে সুশান্তকে দেখলে বোঝা যায়। ভারী একটা শান্ত সমাহিত চেহারা। কথা বলেন কম, যা বলেন তা বক্তব্যে ভরা। কেন জানি না, ওঁকে আমার খুব ভালো লাগে। এবং ওঁকে ভালো লাগে বলেই ওঁর কাজিন, আমার সতীন (?) অদেখা মমতার প্রতিও আমার বেশ একটা দুর্বলতা জন্মায়; জন্মে গেছে।

মমতার প্রতি যে রমেন অবিচার করেছে একথা সবসময়েই মনে হয়। প্রথম প্রথম ভেবে খারাপ লাগত যে এমন একজন ভালো মেয়ের স্বামীকে আমি ছিনিয়ে নিলাম তার কাছ থেকে। এখন মনে হয়, রমেনের মতো শনিকে তার কাছ থেকে সরিয়ে এনে তার পরম হিতাকাঙ্ক্ষীর কাজ করেছি।

রমেনের সঙ্গে ঘর করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। হয়তো আমার পক্ষেও নয়। কিন্তু কী করব? দাদা বাবা মা দিদিমা সকলেই বলেছিল এমন করিস না। তাদের প্রত্যেকের সামনে তুড়ি বাজিয়ে বলেছিলাম যে, তোমরা দেখো, দেখে নিও যে, আমি ভুল করিনি।

আমার মনে মনে এই জেদ ছিল যে, ও খারাপ হলেও, ওর সব দোষ থাকলেও, ওকে আমার গুণে আমার নিজের মতো করে নিতে পারব।

কিন্তু পারলাম কই?

আর পারলাম যে না, এ জানাটা দিনে দিনে আমার কাছে যতই স্পষ্ট হয়ে উঠছে, ততই আমার অসহায়তা বাড়ছে। আমি জীবন থাকতে, আমার জ্ঞান থাকতে, কখনো বলতে পারব না, স্বীকার করতে পারব না, বাবাকে গিয়ে জানাতে পারব না যে আমি ভুল করেছি, আমাকে একজন ঠগ মর্মান্তিকভাবে ঠকিয়েছে। সে কথা বললে, নিজের কাছে, নিজের বিচার-বিবেচনা, নিজের গর্ব, দম্ভ নিজের সমস্ত কিছু আমিত্বর কাছেই যে আমি চিরদিনের মতো হেরে যাব।

তাই রমেন আমাকে লাথি মারলেও তা আমায় সহ্য করতে হবে। তাকে যে আমি অনেক সাধ করে একদিন মালা পরিয়েছিলাম। অনেকে সেদিন বলেছিল, 'বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা'। তবুও ভেবেছিলাম, বাঁদর বশ করা কী এতই কঠিন? দেখবে তোমরা, আমি ওকে কী একজন তৈরি করি, পুরুষের মতো পুরুষ।

আজ বিয়ের পর প্রায় আড়াই বছর কেটে গেছে—কিন্তু পারিনি।

এখনও শরীরটা বড় ভীষণভাবে আমাদের সম্পর্কটাকে ছেয়ে আছে। মানা করি, যাই করি, ভালো লাগুক কী না লাগুক, একটু সময় পরে, আমার অজান্তে আমি আমার শরীরের দাসী হয়ে যাই। আমার মতো নরম লাজুক মেয়েও যে এমন হঠাৎ নির্লজ্জ হয়ে উঠতে পারি—সমস্ত মানসিক অবরোধ, ভালো লাগা ভুলে গিয়ে শুধু অন্য একটা পুরুষের শরীরের কাছেই সম্পূর্ণ সমর্পিত হতে পারি—এ কথা অন্য সময় ভাবলে আমার লজ্জা হয়।

আসলে আমরা মেয়েরা ঠিক কতখানি শরীর-নির্ভর আমরা নিজেরাই হয়তো তা জানি না। জানলে, আমাদের ন্যাকামিগুলো হয়তো একটু কমাতে পারতাম। কিন্তু সত্যিই বলছি, ঘুমপাড়ানো শরীরের আমরা, আর ঘুমজাগানো শরীরের আমরা একেবারে আলাদা আলাদা মানুষ। আমি জানি না, আশা করি পুরুষরা কোনোদিন আমাদের সত্যি সত্যি বুঝতে শিখবে। আমাদের বিভিন্ন সত্তাকে সম্মান করতে শিখবে।

ভদ্রলোক কতক্ষণ বসবার ঘরে বসেছিলেন, খেয়াল ছিল না। থলে হাতে আমাকে ঢুকতে দেখে অপ্রতিভ হয়ে বললেন, বাজারে যাচ্ছেন? আমি আসি তাহলে।

আমি বললাম—আসবেন কেন? চলুন না বাজারে আমার সঙ্গে। আজকে ছুটির দিন তো—একা একা বাজারে ঐ ঠেলাঠেলির মধ্যে যেতেও ইচ্ছে করে না।

সুশান্ত বলল, বেশ তো। চলুন।

—আপনার কাজের কোনো ক্ষতি করলাম না তো? বললাম আমি।

—তা একটু করলেন বইকি।

—কী কাজ?

—এই ভেবেছিলাম, শার্টের বোতামগুলো সব ঠিক করে লাগাব। ধোপাটা এমন বিনা কারণে আছাড় মারে না, সব ক'টা বোতাম সব শার্টেরই প্রায় ছিঁড়ে এসেছে।

আমি হেসে ফেললাম।

ও বলল, হাসছেন যে?

বললাম, কেন জানি, আমার খুব হাসি পায়। কোনো লম্বা-চওড়া পুরুষমানুষ মনোযোগ সহকারে বালিশের ওয়াড় অথবা পায়জামার দড়ি কিংবা জামার বোতাম লাগাচ্ছে দেখলেই আমার হাসি পায়। কিছু মনে করবেন না।

—তা আর কী করা যাবে?

হাসি হাসি মুখে বলল সুশান্ত। সকলের তো আর রমেনবাবুর মতো স্ত্রী নেই। লক্ষ লক্ষ ব্যাচেলার লোকেরা নিজেরাই ওসব করে।

—না করে উপায় কী?

—তারা করে করুক, আপনার করতে হবে না। আমাকে পোঁটলা করে সব দিয়ে যাবেন, আমি লাগিয়ে দেবো।

—বাঃ তাহলে তো ভালোই হয়। আমি আসলে পারিও না, জানেন? দেখুন না, আসবার আগেই আঙুলে অনেকখানি ছুঁচ ঢুকে গেছে।

ওর হাতটা আমার হাতে তুলে নিয়ে দেখলাম।—তাইই তো! ঈসস্।

পরমুহূর্তেই ওর চোখ আমার চোখে লাগল।

আমরা দুজনেই কয়েক মুহূর্ত কথা বলতে পারলাম না।

রমেন আমাকে ভীষণ ভীষণ আদর করলেও আমার এত ভালো লাগে না, সুশান্ত চোখ তুলে তাকাতে আমার যেমন লাগল।

কেন এমন হল? কেন এমন হয়? ভাবতে লাগলাম আমি।

একজনের চোখ চাওয়ায় এমন হয় অন্যজনে নিরাবরণে আলিঙ্গন করলেও তা হয় না। কেন? এ কেন হয়?

সুশান্ত বলল, চলুন যাবেন না?

চলুন। বলে ঘরের পাল্লা ভেজিয়ে বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে আমরা পথে নামলাম।

সুশান্ত ছাতাটা খুলল। বলল, আসুন, আমার দিকে সরে আসুন, রোদ লাগবে না। নাকি, রমেনবাবু দেখতে পাবেন?

আমি বললাম, ঈস্স্ দেখলেই বা—। আমি কাউকে কেয়ার করি না।

—না করলেই ভালো।

—রাখুন তো। এই রোদে ছাতার তলায় যাচ্ছি, তার আবার কৈফিয়ত। আমি বললাম।

আমার কিন্তু বেশ লাগছিল।

সুশান্তর বুকের কাছে আমার মাথা। সুশান্তর গায়ের গন্ধটা বেশ। মিষ্টি মিষ্টি। রমেন বড় পাউডার

মাখে। পাউডারের গন্ধ ছাপিয়ে ওর গায়ের নিজস্ব গন্ধটা কখনো বুঝতে পাইনি! তাছাড়া ওর বোধহয় নিজস্ব কিছুই নেই, দু'একটা অতি অবশ্য জিনিস ছাড়া। ওর সবই পরস্মৈপদী। ওর ব্যক্তিত্বটাও তাই। সব সময়ে ও যেন অন্য কারো চরিত্রে অভিনয় করে। অভিনেতা হিসেবে ভালো হলেও কথা ছিল, অভিনয়ও করতে পারে না ও ভালো করে।

পথ গরমে ঝাঁ-ঝাঁ করছিল। পথের পাশের সোনাঝুরি গাছ থেকে ফুল ঝরে পড়েছিল পথে। ইউক্যালিপটাসের শুকিয়ে ওঠা পাতার গন্ধে গরমের সকাল ম' ম' করছিল। সুশান্তর পাশে পাশে হ্যাজেল রোড দিয়ে হেঁটে যেতে বেশ লাগছিল।

রমেন যদি পুরুষমানুষ হয়, যদি এই কোম্পানির কাজে বরাবর লেগে থাকে, যদি সৎভাবে খাটে, তবে হয়তো হ্যাজেল রোড কী গাড়ুয়া রোড কী পার্ডি রোডে থাকবে প্রোমোশন হলে। বেশ লাগে আমার, এই কাইজার বাংলোগুলো। জানি না, কী হবে।

কত কী-ই তো ভাবি কত কী-ই-ই তো ভালো লাগে। তার চেয়ে এই মুহূর্তের ভালো লাগাটা দিয়ে মন ভরেনি।

বেশ লাগছে সুশান্তর বুকের কাছের, ছাতার নীচে আস্তে আস্তে পথ চলা। রমেনের আসলে দারুণ চটক ছিল একটা, হয়তো এখনও আছে। যে চটক দেখে আমি ভুলেছিলাম। এখন বুঝতে পারি মলাটটাই সব নয় কোনো মানুষের। মলাটের অন্তরালে যা থাকে সেইটেই সব।

বিয়ের পর পরই ও আমাকে একটা দারুণ মিথ্যা কথা বলেছিল, বলেছিল ওর একটা লিফট্ হয়েছে, ও কভেনান্টেড অফিসার হয়ে গেছে, শিগগিরই ট্রেনিংয়ে যেতে হবে ওকে হায়দরাবাদ না কোথায় যেন। আমি জানি যে ও মিথ্যা কথা বলেছিল এবং ও-ও জানে যে ওর মিথ্যা কথা ধরা পড়ে গেছে।

তখন কোনো ভালো ফ্ল্যাটে গেলে, কোনো সাদা-রঙা ছোট ছিমছাম গাড়ি দেখলে, আমি হাঁটতে হাঁটতে ওর হাত জড়িয়ে ধরে বলেছি, তুমি এমন ফ্ল্যাট পাবে কখনো?

ও বলেছে, নিশ্চয়ই।

তখন বলেছি, আমরা কবে এমন গাড়ি কিনব?

ও বলেছে, শিগগিরই।

তখন এসব কিছুই অবিশ্বাস করিনি। অবিশ্বাসই যদি করব, তাহলে সকলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওকে গ্রহণ করব কেন? তখন বিশ্বাস করতাম, সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করতাম। কিন্তু এখন আর করি না। কারণ আমি জেনে গেছি যে, ও একটা শঠ, ও একটা মিথ্যেবাদী প্রবঞ্চক।

ও চাকরিতে উন্নতি করেনি, করবে না কোনোদিনও, একথা জেনে বা অন্য দশজন মেয়ের মতো আমার ভালো ফ্ল্যাট হবে না বা গাড়ি হবে না বলে আমার কোনো দুঃখ নেই। সে তো কত মেয়েরই থাকে না। দুঃখটা সে জন্যে নয়। দুঃখটা এই জন্যে যে আমার-জেদকে জেতাতে গিয়ে আমি আমার সম্মান আর বুদ্ধিকে এমনভাবে হারিয়ে দিলাম। আমাকে ও এমন মর্মান্তিকভাবে ঠকালো এ কথাটাই আজকাল আমাকে বড় পীড়িত করে, বড় ক্লান্ত, অবসন্ন করে রাখে সবসময় ; সে ক্লান্তিটা এই জামশেদপুরের গরমের চেয়েও বেশি ক্লান্তিকর।

আসলে আমরা মেয়েরা, মানি আর নাই মানি, এখনও মেয়েদের সবচেয়ে বড় পরিচয় তাদের স্বামী। আমরা নিজেরা যতই গুণবতী হই না কেন, যাকে নিয়ে জীবন, যার হাতে মাথা রেখে শোওয়া, যার পাশে পাশে জীবনের পথে হাঁটা, সে যদি আমার মাথা ছাড়িয়ে আমার পাশে দৃশ্যমান হয়ে না প্রতিভাত হয়, সে যদি আমারই ছায়া হয়, আমারই অনেক গয়নার এক অপছন্দসই গয়নার মতো আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে, তাহলে আমার নিজের সম্মান কোথায় থাকে?

যখন কলেজে পড়তাম তখন ন'বউদি বলত, দেখিস, যাকেই বিয়ে করবি, দেখে করিস, তার মধ্যে যেন সম্মান করবার মতো কিছু থাকে। যাকে সম্মান না করা যায়, শ্রদ্ধা না করা যায়, তাকে কখনো বিয়ে করিস না। সুখী হবি না।

তখন ভাবতাম, ন'বউদি বেশি বোঝে। ভাবতাম, আমি কী আর কচি খুকি? আমার কী আর বুদ্ধি নেই?

তখন বুঝতে পারিনি যে আমার সত্যিই বুদ্ধি নেই। ভালোবাসা ব্যাপারটার মূল ও স্থায়ী উপাদান যে সম্মান তখন তা বুঝতে পারিনি।

রমেন প্রায় হাতে-পায়ে ধরত, বলত আমাকে না হলে বাঁচবে না ; তারপর ওর নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ও এত সব কথা বানিয়ে বলত যে ওর উপর কখন নিজের অজান্তে দয়া করে ফেলেছিলাম। আত্মীয়স্বজনের বিরোধিতা, আমাকে ভীষণ জেদি করে তুলেছিল, মন বলেছিল যে যাকে আমার ভালো লাগল তাকে তোমাদের একটুও ভালো লাগল না? আমার উপর তোমাদের একটুও ভরসা নেই কেন?

এ সব মিলিয়ে ব্যাপারটা ঘটে গেল। বাবা অনেক ধার করলেন বাজারে। সে সময়ে বাবার ব্যবসাটা ভালো যাচ্ছিল না, তাই ধার করলেন, দাদারা প্রভিডেন্ড ফান্ড থেকে টাকা ওঠালেন, কিন্তু যে করেই হোক আমার বিয়েতে জাঁকজমক কিছু কম হল না। রোশনচৌকী বসল, হাজারখানেক লোক খেল, শুধু খেলই নয়, খেয়ে সব বাহা! বাহা! করল।

পেছনে চাইলে এখন বুঝতে পারি, আমার বিয়েতে কোনো কিছুরই বিন্দুমাত্র ত্রুটি ছিল না, ত্রুটি যতটুকু ছিল, তা ছিল আমার সঙ্গী নির্বাচনে। যে এসে মখমলমোড়া সিংহাসনে বসেছিল—শুধু তাকেই চিনতে আমার ভুল হয়ে গেছিল। নইলে ফুলের সাজ, ফ্রায়েড রাইস, আতরের পিচকিরি, ফার্নিচারের পালিশ, গয়নার ডিজাইন, বিয়ের বেনারসী, বিভিন্ন-রঙা শাড়ির সঙ্গে মানানসই নানারঙা শায়া সবকিছুই পারফেক্টলি মানানসই হয়েছিল। সেদিন যদি জানতে পেতাম যে আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর দিনে আমি একটা সবচেয়ে অসুন্দর ভুল করলাম, তাহলে হয়তো সেদিন অমন হাসতে পারতাম না ; ফোটোগ্রাফারের দিকে তাকিয়ে শুভদৃষ্টির সময় অমন তনুজার মতো ভুরু তুলে তাকাতে পারতাম না।

যাঁরা আমার নিজের এই জবানবন্দি পড়ছেন, তাঁরা হয়তো ভাবছেন যে আমি ডাইভোর্স কেন করছি না এখনও রমেনকে। বিশেষ করে আমার সহপাঠিনী, আমার বন্ধু-বান্ধবী, আমার পরিচিতরা, যাদের কাছে বিয়ের আগে আমি সদম্ভে বারংবার ঘোষণা করেছিলাম যে একটু এদিক-ওদিক হলে, আমার মনঃপূত না হলেই আমি যাকে বিয়ে করব তাকে ডাইভোর্স করব—যাতে সেপারেশন হয় তাই-ই করব। তাদের আমি আজ কী করে মুখ দেখাব?

ওসব কথা শুধু আমি কেন, হয়তো আমার বয়সি সব মেয়েরাই বলে ও ভাবে—আধুনিকা ও শিক্ষিতা সব মেয়েরা।

কিন্তু এখন আমি জানি বলা যত সহজ, করা তত নয়। এই জন্যে নয় যে, করা অসম্ভব। করা খুবই সম্ভব, কিন্তু ডাইভোর্স করতে কঠিন হতে হয়। আমরা বেশির ভাগ মেয়েরাই কঠিনহৃদয় নই। এমনকী আজকেও যত ডাইভোর্স হচ্ছে, তার দশগুণ বেশি ডাইভোর্স হওয়ার কথা ছিল।

আমরা জ্বলে-পুড়ে মরি, প্রতিবাদ করি, তারপর যেই আমাদের মতো মেয়েদের মিথ্যাবাদী, অপদার্থ, রেসুড়ে, জুয়াড়ি, মাতাল ও দুশ্চরিত্র স্বামীরা বাড়ি ফেরে, তাদের পরিচিত মুখের দিকে চেয়ে আমরা আমাদের সব অভিযোগ ভুলে যাই। তাদের খাবার দিই। তাদের কীসে আরাম হবে দেখি, তারপর ওরা নির্লজ্জের মতো (নির্লজ্জের মতো কেন বলি, বলা উচিত ধুরন্ধরের মতো)

আমাদের সরল মন ও নরম শরীরের বেলাভূমিতে নামে। ওদের সব অপারগতার একমাত্র সমস্যা একটা বিশেষ বর্ম দিয়ে ওরা ঢেকে রাখতে চায়। গা জ্বালা করে।

রমেনের কাছে যেতে আমার ঘেন্না হয়, অথচ তবু একসময় কাছে যাই। একসময় ঘেন্নার অনুভূতিটা চলে গিয়ে একটা উদাসীনতার অনুভূতি আসে, তারপর একটা সময়, হয়তো একটা ক্ষণিক মুহূর্তের জন্যে আমার সব ঘৃণা, সব উদাসীনতা, সমস্ত ছুঁড়ে ফেলে আমি পৃথিবীর সবচাইতে সুখী রমণী হয়ে উঠি।

একটি বিশেষ মুহূর্তে—একটি ক্ষণিক জয়ে জয়ী হয়ে রমেনরা ওদের স্বামীত্বের মেয়াদ আবার কিছুদিন বাড়িয়ে নেয়। পরদিন, সারাদিন, কাজের ফাঁকে ফাঁকে কেবলি মনে হয় আর কোনোদিন ঐ জন্তুটার, যে আমার সবচেয়ে বড় আপন, যাকে আমার শ্রদ্ধা করার কথা ছিল, যাকে আমার ভীষণ ভীষণ ভালোবাসার কথা ছিল, সেই মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক জন্তুটাকে কিছুতেই আর আমার কাছে আসতে দেব না।

আমি জানি না, কেন এমন হয়। হয়তো সারাদিন মেয়েদের সঙ্গে চেঁচামেচি করে ও তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভেবে এত ক্লান্ত থাকি যে বাড়ি ফিরে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে আর ভাবার সময় পাই না। মন বলে, বর্তমানে তো বাঁচি, আজকের দিনটা তো কাটুক, তারপর কাল সকালে উঠে ঠান্ডা মাথায় একটা কর্তব্য ঠিক করা যাবে। কিন্তু সকাল হতে না হতেই তো স্কুলের তাড়া, রমেনের কারখানার তাড়া, দৌড়াদৌড়ি করে কখন যে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়, বিকেল গিয়ে রাত আসে, বুঝতে পারি না। বাড়ি ফিরে, জামাকাপড় খুলে অনেকক্ষণ ঘর অন্ধকার করে শুয়ে থাকি। তারপর অনেকক্ষণ আরাম করে চান করি। চান করার পরে শরীর ও মন ঠান্ডা হলে অনেক কথা মনে হয়। অনেক কিছু কর্তব্যের কথা। কিন্তু বাথরুম থেকে বেরিয়ে আর কিছু মনে থাকে না।

২

সুশান্ত বলল, কী হল। চুপচাপ যে?

—এই, ভাবছি।

—কী ভাবছেন এত?

—ভাবনা কী দেখানো যায়?

—না তা যায় না, তবে হয়তো ইচ্ছে করলে শোনানো যায়।

—হয়তো শোনাতে ইচ্ছে করছে না।

—তাহলে থাক।

পেট্রোল-পাম্পটার কাছাকাছি পৌঁছে আমি বললাম, আপনার বাজার হয়ে গেছে?

—না।

—কেন?

—আজকে আমার বাহন আসেনি। ময়ূরের সানস্ট্রোকের মতো হয়েছে কাল। যা গরম, আর দোষ কী শরীরের।

—কী নাম বললেন? ময়ূর? আপনার বাহনের নাম ময়ূর? তাহলে আপনি হচ্ছেন কার্তিক। সুশান্ত হেসে উঠল। বলল, এমন কথা বলেন না আপনি।

—ময়ূর আসেনি, তাহলে দুপুরে খাবেন কোথায়? শুধোলাম আমি।

—চলে যাব বিষ্টুপুর। সেখানে পাঞ্জাবি হোটেলে রুটি-তড়কা খেয়ে নেব।

—থাক, এই রোদে আর রুটি-তড়কা খেতে এতদূরে মোটর সাইকেল ফটফটিয়ে যেতে হবে না।

—তবে কী উপোস করব? তাছাড়া আমার মোটর সাইকেলের উপর আপনার এত রাগ কেন?

—রাগ না, আমার ঐ শব্দটা শুনলে বিরক্তি লাগে। আর মনে হয় কেমন সুড়সুড়ি লাগে।

—হাসালেন আপনি। মোটর সাইকেলের আওয়াজে সুড়সুড়ি লাগে এমন কথা তো কখনও শুনিনি।

আমি বললাম, সত্যি। তারপর বললাম, মোটর সাইকেল চড়েন কেন?

—গাড়ি কেনার সামর্থ্য নেই বলে। তাছাড়া, এইরকম শহরে গলাকাটা ট্যাক্সিভাড়া দিতে পারি না। বাসের ভরসায় থাকলে তো চাকরি রাখা যাবে না।

—মোটর সাইকেল চড়া কিন্তু খুব ভয়ের।

—অ্যাকসিডেন্টের কথা বলছেন?

—না। অ্যাকসিডেন্ট তো আছেই। তাছাড়া কুকুর কামড়ানোর ভয়।

সুশান্ত এবারে হো হো করে হেসে উঠল। বলল, বাঃ বাঃ, আপনি সব নজর করেছেন তো।—সত্যি! সাধু সাহেবের কুকুর দুটো ভারী পাজি। আমাকে আসতে দেখলেই এমন তাড়া করে দু'পাশে। সত্যিই ভয় হয় কবে কামড়ে দেবে।

—ওদের বোধহয় আমার মতো সুড়সুড়ি লাগে ঐ ফটফট আওয়াজটাতে। তবে সত্যি বলছি—আমার এক জামাইবাবুকে কলকাতার এক পাগলা কুকুর মোটর সাইকেল ধাওয়া করে কামড়ে দেওয়ার পর তিনি মোটর সাইকেলটাই বেচে দিলেন। তাছাড়া এপাড়ার সাধু সাহেবের কুকুর ছাড়াও বে-পাড়ার অসাধু সাহেবদের কুকুররাও কী কম আছে জামশেদপুর শহরে?

সুশান্ত হাসল, বলল, আপনার সঙ্গে কথায় পারব না।

বাজারে ঢুকে বললাম, বলুন, কী মাছ খেতে ভালোবাসেন আপনি?

—আমি তো মাছ খাই না।

—সে কি! মাছ খান না কেন?

সুশান্ত একটু চুপ করে থাকল। তারপর বলল, আমার ছোটবোন মাছ খেতে খুব ভালোবাসত। একেবারে মাছের পোকা ছিল। মাস ছয় আগে ও হঠাৎ মারা যায়। তারপর থেকে মাছ খাই না। এমনিই খাই না। কোনো কারণ নেই।

আমি কিছু বললাম না। মাছ না খেয়ে মৃত বোনকে কীভাবে ভালোবাসা দেখানো হয় বুঝি না। তবে সুশান্তর মনটা ভারী নরম। ওর চোখ দেখলেই মনে হয়।

আমি কোনো কথা বললাম না। তারপর শুধোলাম, তাহলে মাংস কিনি?

—মাংস! বলে সুশান্ত একবার আমার দিকে তাকাল। বলল, আমার জন্যে ব্যস্ত হবার কী আছে। তাছাড়া আপনি কিনবেন কেন? আমিই কিনি। মুরগি কিনি।

—না না, এই গরমে মুরগি খাওয়া যায় না। তার চেয়ে ছোট খাসির মাংস আছে, মাংসই কেনা ভালো।

—আপনি কেন কিনবেন? আমি কিনব।

—প্লিজ। বলে সুশান্ত একবার তাকাল আমার চোখে।

চশমার আড়ালে ওর কালো গভীর চোখের দিকে চোখ পড়ল আমার।

ওর চোখে কী যেন একটা আছে। ও মুখে যত কথা না বলে চোখে বলে তার চেয়ে অনেক বেশি। ও কিছু বললে, কিছু আবদার করলে, উত্তরে 'না' বলা বড় শক্ত। অস্বস্তির কথা এই যে,

এ সব লোক সহজে অথবা সস্তা কিছু চায় না কখনো।

সুশান্তকে একটু বেশি ভালো লেগে যাচ্ছে আমার। মনে মনে নিজেকে এক ধমক লাগালাম। মেয়েদের ধমকে ধমকে নিজেকেও ধমকাতে শিখেছি আমি।

মাংস কিনল সুশান্ত। আমি কিছু আনাজ কিনলাম। পটল, আলু, পোস্ত, কাঁচা-কলাইয়ের ডাল। এ গরমে কাঁচা-কলাইয়ের ডাল ছাড়া আর কিছু খেতে ভালো লাগে না। কাঁচা-কলাইয়ের ডাল আর পোস্তর তরকারি।

বাজার থেকে বেরিয়ে গরমটা যেন আরও বেশি লাগতে লাগল।

সুশান্ত বলল, ঈস্‌স্‌, গরমে আপনার মুখটা লাল হয়ে গেছে।

—গরমেই লাল হয়েছে কী করে বুঝলেন?

—তাহলে?

বলে সুশান্ত থেমে গেল আমার দিকে চেয়ে। মুখ নামিয়ে নিল।

আমি জানি, সুশান্ত আমাকে খুব পছন্দ করে। বিয়ের আগে আগে বিশেষ বিশেষ ছেলে-বন্ধুদের সঙ্গে যেমন দুষ্টুমি করতাম, তেমন দুষ্টুমি করলাম একটা সুশান্তর সঙ্গে।

আমার দিদিরা বলত, তুই এক নম্বরের পাজি। ছেলেগুলোকে এমন নাজেহাল করিস না।

দিদিরা যদি দেখতে পেত যে আজ সেই আমি সত্যিই কেমন নাজেহাল হচ্ছি রমেনের কাছে। ভাগ্যিস মনে মনে নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলা যায়, নইলে দিদিরা একথা শুনতে পেলে বলত, কেমন? বলেছিলাম না? তখন কত করে বলেছিলাম এমন ভুল করিস না।

দিদিদের মরে গেলেও বলব না। তার চেয়ে বলব, রমেন খুব ভালো ছেলে। কালই তো ছোড়দিকে চিঠি লিখলাম—দারুণ চিঠি—আমি কী দারুণ আছি, কী ভীষণ সুখী আমি, এসব কথা ইনিয়ে-বিনিয়ে বানিয়ে-টানিয়ে ডাইরেক্টলি-ইনডাইরেক্টলি লিখলাম।

আমি ভাবছিলাম, তোমরা জানো না দিদি। আমি মরে গেলেও কখনও স্বীকার করব না যে, আমি ভুল করেছি, স্বীকার করব না যে রমেন ভালো ছেলে নয়।

রমেনকে ছাড়লেও ভবিষ্যতে ছাড়ব, এই মুহূর্তে রমেন খারাপ এ কথা আমার পক্ষে মানা অসম্ভব। আমি ভুল করেছি এ কথা বলা অসম্ভব।

কী করব বল ছোড়দি? বলো বাবা? নিজের সম্মান কি নিজে এমন করে নষ্ট করা যায়? সম্মান ছাড়া কি কেউ বাঁচে? বলো?

সমস্ত কষ্ট আমি নিজে সহ্য করব। তোমাদের এর মধ্যে জড়াব না। ডিসিশান যখন আমি একাই নিয়েছিলাম, এর কনসিকোয়েন্সের দায়িত্ব তো আমার! আমার নিজের কাছে আমি সৎ। বাবা, তুমি আমাকে দোষ দিও না। তোমাকে দু'মাস দেখি না। প্রতি সপ্তাহেই ভাবি রাউরকেল্লা এক্সপ্রেসে চলে যাব কলকাতা শনিবার রাতে। কিন্তু যাওয়া আর হয় না। এ মাসে যাবই। বাবার জন্যে আম নিয়ে যাব একঝুড়ি। বাবা আম খেতে বড় ভালোবাসেন। বাবা, তুমি কেমন আছ বাবা? তুমি এখন কী করছ? আজ তো রবিবার। বেলা দশটা। তোমার তৃতীয় কাপ চা খাওয়া হয়ে গেছে—তুমি এখন তোমার ইজিচেয়ারে বসে বই পড়ছ। খবরের কাগজ পড়াও শেষ।

আমার বাবার মতো একটা সুন্দর মুখ আমি এ পর্যন্ত দেখলাম না। আমার বাবার মতো আদর করতেও দেখলাম না কাউকে। দিদিদের কাছে শুনেছিলাম, বিয়ের পরদিন আমি শ্বশুরবাড়ি গেলে বাবা নাকি ছাদে গিয়ে হাউ হাউ করে কেঁদেছিলেন। বাবাকে কখনও আমি কাঁদতে দেখিনি জীবনে।

বাবা, আমি ভালো আছি, দারুণ সুখে আছি বাবা। এই দেখো না আমার পাশে সুশান্ত আছে। দেখো, বাবা, একবার দেখো। সুশান্ত ভালো ছেলে না? তোমার খুব ভালো লাগত ওকে, তুমি

যদি দেখতে। কী করব বলো, বাবা, সুশান্তরা আগে কোথায় ছিল, কোথায় লুকিয়েছিল, বুঝতে পারিনি। আমার সামনে তখন শুধু রমেনই ছিল। ছোড়দি যাকে 'পটানো' বলে, ও আমাকে তেমনি পটিয়েছিল। এখন বুঝি বাবা, যে ভালো ছেলেরা কাউকে কখনও পটায় না। তারা যা বলার, চোখের চাউনিতে বলে, সুন্দর চিঠিতে বলে, তারা কেউ এসে হাতে-পায়ে ধরে বিয়ে করতে চায় না। তারা তাদের আত্মসম্মান নিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের ভালো লাগা জানাবার পর তারা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে—কোন্ শুভ মুহূর্তে আমরা সসম্মানে তাদের পাশে গিয়ে তাদের সম্মানিত করি এবং নিজেরাও সম্মানিত হই; সেই অপেক্ষায়।

কী করব বলো বাবা? ভুল করেছি।

তুমি তো বলতে বাবা, সবসময় বলতে ; মানুষ ভুলের মধ্য দিয়ে যা শেখে, তেমন করে আর কিছুই শেখে না। তুমিই তো বলতে বাবা যে, প্রত্যেকের জীবন তার নিজের নিজের। তার নিজের জীবনের নিয়ন্তা সে নিজে। বাবা নয়, মা নয়, দাদা নয় ; কেউ নয়। প্রত্যেকের অধিকার আছে নিজের জীবনে আর নিজের ইচ্ছে ও পছন্দমতো বাঁচবার। সেই অধিকার প্রয়োগ করতে তুমি তো আমাকে একবারও বারণ করোনি। অন্য সবাই-ই করেছিল, তুমি করোনি। যে ভুল করেছি, সে তো আমার ভুল। তুমি এজন্য কষ্ট পাও কেন, বাবা? এই ভুলের মধ্য দিয়ে কোনোদিন হয়তো আমি আবার কোনো বড় ও ঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারব। আমার জন্যে কষ্ট পেও না বাবা। লক্ষ্মী, সোনা বাবা।

আমি একেবারে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম।

সুশান্ত হঠাৎ বলল, কী হল?

আমি চমকে উঠলাম, বললাম, না। বাবার কথা ভাবছিলাম। হঠাৎ বাবার কথা মনে পড়ে গেল। একবার কলকাতা যাব শিগগিরই। এখানে ভালো আম কোথায় পাওয়া যায় জানেন? বাবার জন্য আমি নিয়ে যাব একঝুড়ি যাবার সময়।

সুশান্ত বলল, জানি না, তবে খোঁজ নেব ; নিয়ে জানাব আপনাকে। কোনো বিশেষ আম কি?

—না। এমনি। ভালো ল্যাংড়া আম।

ততক্ষণে রোদটা সত্যিই দারুণ চড়া হয়ে গিয়েছিল।

সুশান্তর সঙ্গে বড় বড় পা ফেলে পথের পাশে পাশে যতটুকু ছায়ার সুযোগ পাওয়া যায়, সেই সুযোগ নিয়ে নিয়ে আমরা দুজনে বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলাম।

মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া দিচ্ছিল। শুকনো পাতা, খড়কুটো, ঝরা ফুল সব ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে হঠাৎ হঠাৎ হাওয়ার ফুৎকারে হইহই করে আকাশের দিকে উড়ে যাচ্ছিল। গরমে চতুর্দিক ঝাঁ ঝাঁ করছিল। পাশে লোকজন ছিল না বললেই চলে। এই কদমা- সোনারি লিংকের আশে-পাশে লোকজন এমনিতেই কম।

যতই রোদ থাকুক, যতই গরম থাকুক, তবু হাঁটতে বেশ ভালো লাগছিল, দারুণ ভালো লাগছিল, সুশান্তর সঙ্গে। সুশান্তর সঙ্গ।

৩

গতকাল রমেনের ফ্যাক্টরির ফর্ম্যাল ওপেনিং সেরিমনি ছিল।

কাজে ও ঢুকেছে প্রায় ছ'মাস, কিন্তু এতদিন কারখানার কাজ পুরোপুরি চালু হয়নি। আমি ওসব বুঝি না। রমেন যা গল্প করত, তাই-ই শুনতাম।

এর আগে টেলকোতে কাজ করত ও। সে কাজ এক অজ্ঞাত কারণে রাতারাতি চলে গেল। কারণটা হয়তো রমেনের কাছে অজ্ঞাত ছিল না, কিন্তু আমার কাছে ও বানিয়ে বানিয়ে যা বলেছিল সেটাকে বিশ্বাস করার ইচ্ছা হয়নি আমার।

কিছুদিন কাজ ছিল না। আমার রোজগারই তখন একমাত্র রোজগার ছিল। আমি যা রোজগার করি, সে রোজগারে আমার স্বামীকে স্বচ্ছন্দে খাওয়াতে পারি, কিন্তু যে স্বামী নিজের দোষে নিজের চাকরি বার বার খোওয়ায় তাকে খাওয়ানোর ভাবনাটাও ভালো লাগে না। যোগ্যতা না থাকলে অন্য কথা ছিল, যোগ্যতা না থাকলে বিভিন্ন জায়গায় চাকরি পায় কী করে চটপট রমেন? তার যোগ্যতায় আমার সন্দেহ নেই ; আমার যত সন্দেহ ওর সততায়। পাওয়া চাকরি সে রাখতে পারে না। কোনো চাকরিই। তাছাড়া বড় কুঁড়ে ও।

কারখানায় যাবার আমার মোটেই ইচ্ছা ছিল না, রমেনের বিশেষ অনুরোধে আমায় যেতে হল।

রমেন বলেছিল, আমি গেলে নাকি ওর সম্মান বাড়বে, রমেনের যে আমার মতো একজন স্ত্রী আছে, তা জানলে কোম্পানিতে ওর কদর হবে।

জানি না, কদর হবে কি না ; কিন্তু রমেন একবারও বোঝেনি, যে আমি বিলক্ষণ বুঝতে পারছিলাম যে, রমেনের যাই হোক, ওখানে গিয়ে আমি নিজেকে সম্মানিত করিনি।

কারখানার মোল্ডার, মেল্টার, লেবাররা সকলেই আমার দিকে কেমন অবাক চোখ তুলে তাকিয়েছিল। সকলের চোখেই লেখা ছিল, আরে? এ মেয়েটা রমেনের মধ্যে কী দেখল? এত ছেলে থাকতে তাকে বিয়ে করতে গেল কেন?

ডিরেক্টরদের স্ত্রীরা এবং অন্যান্য অনেকের স্ত্রীরাও এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে আমার সমবয়সি দু'তিনজন ছিলেন। এ কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টরদের মধ্যে প্রায় সকলেই কমবয়েসি। দারুণ দারুণ শাড়ি পরেছিলেন মহিলারা, কিন্তু দেখতে বেশির ভাগ পানওয়ালির মতো, একজনকে দেখতে অবিকল আমাদের ভবানিপুরের ভাড়াবাড়ির ঠিকে ঝি মোক্ষদার মতো।

কিন্তু হলে কী হয়, বাঘা বাঘা লোকেদের স্ত্রী তারা। সকলেই তাঁদের চারপাশে ভিড় করে আছে। কেউ ডিরেক্টরের ছোটো বাচ্চার নাকের পোঁটা রুমাল দিয়ে পুঁছছে, কেউ ছোটো মেয়েকে কাঁধে নিয়ে বেড়াচ্ছে, অন্য কেউ বউদিরা কখন কী বলবেন বা আজ্ঞা করবেন সেই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

আমি নিরুপমা চৌধুরী, যেহেতু আমি দেখতে ওঁদের সকলের চেয়ে ভালো, যেহেতু আমি ওঁদের সকলের চেয়ে শিক্ষিতা ও সকলের চেয়ে সুন্দর করে সেজেছি—এবং যেহেতু আমি রমেন ঘোষের স্ত্রী—আমাকে ওঁরা সকলেই কৃপার চোখে দেখতে লাগলেন।

আমি যে আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে রইলাম, আমাকে কেউ একটা চেয়ার এনে বসতে পর্যন্ত বলল না। অনেকক্ষণ পরে রমেন নিজেই কোথা থেকে একটা চেয়ার বয়ে নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে আমার জন্য পেতে দিল। ওর মুখ গরমে ঘেমে গিয়েছিল, আমাকে বলল, বোসো, তোমার গরমে কষ্ট হচ্ছে না?

কষ্ট আমার হচ্ছিল, সেটা গরমের জন্যে নয়, কী জন্যে তা রমেনকে বলে লাভ ছিল না তখন। রমেনের জন্যেও কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু সে কষ্টের চেয়েও বড় একটা কষ্ট, প্রত্যেক বিবাহিতা মেয়ের মনে যে কষ্ট মাঝে মাঝে হয় সেই কষ্ট আমাকে সে মুহূর্তে বড় পীড়িত করেছিল। নিরুপমা চৌধুরী নিজে যাই-ই হোক, তার চেহারা যাই-ই হোক, তার পারিবারিক পটভূমি যাই-ই হোক, তার শিক্ষা যাই-ই হোক, এই মুহূর্তে এই ইলেকট্রিক ফারনেসের পাশে দাঁড়িয়ে, তার স্বামীর কর্মক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে তার বিন্দুমাত্র দাম নেই তার নিজের জন্যে। হয়তো কোনো বিবাহিত মেয়েরই নেই। এখনও, এই

টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরিতেও স্বামীর পরিচয়ই মেয়েদের সবচেয়ে বড় পরিচয়। এটা ভালো কী মন্দ, ন্যায় কী অন্যায়, তা আমি জানি না, কিন্তু এটা মর্মান্তিকভাবে সত্যি।

আমার যে সব বন্ধু এখনও বিয়ে করেনি, কিন্তু ডেটিং করছে বা প্রেম করছে, আমার চেয়ে ছোটো যে সব মেয়েদের আমি চিনি না, অথচ যারা একদিন বাবা-মার অমতে আমার মতো জেদ করে নিজের মতামতকে ভীষণ রকম দামি ভেবে জীবনের পথে পা বাড়াবে, তারা যদি আমার এ লেখা পড়ে, এ কথা শোনে, তবে তারা হয়তো কিছু করার আগে দুবার ভাববে।

এই মুহূর্তের অনুভূতি আমি বোঝাতে পারব না কাউকে, আমার মতো অবস্থায়, এই রকম সিচুয়েশানে যদি অন্য কোনো বিবাহিতা মেয়ে কোনোদিন পড়ে থাকেন তবে একমাত্র তাঁরাই আমার দুঃখের কথা বুঝবেন। আমরা, এই বর্তমান যুগের, উদ্ধত ও অবুঝ মেয়েরা স্বীকার করি আর না-ই করি, এ কথা সত্যি যে, আমাদের বিবাহিত জীবনে একমাত্র আমাদের স্বামীরাই আমাদের যথার্থ সামাজিক সম্মান দিতে পারেন, স্বামী ছাড়া আর কেউই তা পারেন না। যতদিন সমাজ থাকবে, স্বামী-স্ত্রীতে একসঙ্গে বসবাস করতে হবে, নেমন্তন্নে, পার্টিতে মিস্টার অ্যান্ড মিসেস দুজনেরই আমন্ত্রণ থাকবে, ততদিন আমাদের মতো সবজান্তা, বোকা ইমপালসিভ মেয়েদের এমনি করেই অপমানিত হতে হবে। এর কোনো প্রতিকার নেই। স্বামীদের বড়লোক হবার দরকার নেই, তারা যেন যথার্থ পুরুষমানুষ হয়, তাদের যেন যথার্থ ভবিষ্যৎ থাকে, তাদের জন্য আমরা যেন গর্বিত হতে পারি—এ ছাড়া আর কিছু রমেনদের কাছে চাইবার নেই, কোনোদিন ছিলও না আমাদের।

ওদের কারখানায় দুটো কিউপোলা কাস্ট আয়রন ফাউন্ড্রি, আর দুটো ইলেকট্রিক আর্ক ফারনেস। একটু পরে আর্ক ফারনেস দুটো চার্জিং হবে। বোতাম টিপবেন ম্যানেজিং ডিরেক্টরের স্ত্রী। সে মহিলা মাঝবয়সি, মিষ্টি দেখতে, একটা অফ-হোয়াইট শাড়ি পরেছেন, হালকা বেগুনি পাড়, সঙ্গে হালকা বেগুনি ব্লাউজ, গলায় মঙ্গলসূত্রম।

আমি একা অন্যদিকে বসে আছি—ফারনেসগুলোর কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে অন্য সবাই বসে আছেন। লাইমস্টোন, পিগ আয়রন এ সমস্ত চার্জ করা হচ্ছে ফারনেসের ঢাকা খুলে, এমন সময় দেখি শেফালি আসছে।

শেফালি চ্যাটার্জি। আমাদের সঙ্গে কলেজে পড়ত--ভীষণ রোগা ছিল—এখনও আছে—পার্ট টু পরীক্ষায় পাস করতে পারেনি।—শেফালি এত রোগা যে ও বরাবর শাড়ির নীচে দুটো শায়া পরত মোটা দেখাবার জন্যে—আজও পরেছে। আমাকে দেখেই ও হাসল, সোজা আমার কাছে এল—রোগা হলেও বেশ দেখাচ্ছে শেফালিকে--একটা লাল জমির উপর হলদে কাজ করা ঢাকাই পরেছে। ও বলল, বাংলাদেশ থেকে আনিয়েছে। শেফালি আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, নীরু? তুই এখানে? বেশ বাবা, বিয়ে করলি খবরও দিলি না। তোর বর কি এখানে কাজ করেন নাকি?

আমি ঘাড় হেলালাম।

—তোর বরের কী নাম? নিশ্চয়ই ডিরেক্টরদের মধ্যে কেউ? কথাটা জিজ্ঞেস করতে গিয়ে শেফালির ফর্সা মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে এল।

আমি আবার মাথা নাড়লাম। রমেনের নাম বললাম। শেফালির মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, বলল, ও! ও, তাই নাকি? তারপর বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, রমেনবাবু তোর বর? তার সম্বন্ধে শুনেছি আমার স্বামীর কাছে।

কী শুনেছে জিজ্ঞেস করার মতো বুকের জোর আমার ছিল না। পাছে ও নিজেই রমেনের সম্বন্ধে কিছু বলে বসে, তাই আমি তাড়াতাড়ি কথা ঘুরিয়ে বললাম, তুই এখানে কোথায় থাকিস?

শেফালি বলল, কাইজার বাংলোয়—এদের কোম্পানিরও পাঁচটা বাংলো নেওয়া আছে ডিরেক্টরদের

জন্যে, আর—বলে কপাল থেকে চুল সরিয়ে বলল, আমার স্বামী তো ওয়ার্কস ম্যানেজার—দাঁড়া, তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি—বলেই, শেফালি ফারনেসের দিকে চেয়ে যেখানে সকলে দাঁড়িয়েছিলেন সেদিকে ডাকল, ওগো শুনছ।

শেফালির ডাকে সাদা কচ্ছপের মতো দেখতে বেঁটেখাটো গাবলু-গুবলু এক ভদ্রলোক আমাদের দিকে আসতে লাগলেন। ভদ্রলোকের পরনে কমলা-রঙা একটা টেরিলিনের প্যান্ট, গায়ে নীলরঙা ব্যাংলনের গেঞ্জি, চুলটা ব্যাকব্রাশ করে আঁচড়ানো—দেখেই বোঝা যাচ্ছে আগে পাশ ফিরিয়ে আঁচড়াতেন, বিয়ের পর শেফালির ডাইরেকশানে এই শাসন চুলের ওপর।

ভদ্রলোক বেশ ভালো মানুষ, দেখলেই মনে হয় পড়াশোনায় ভালো ছাত্র ছিলেন, এতদিন পড়াশোনা ছাড়া আর কিছুই করেননি, এখন আর সমস্ত কিছু, সাজ-পোশাক, চুলের কায়দা, স্মার্টনেস ইত্যাদি শেফালির প্যাকেজ-ট্রেনিংয়ে তাড়াতাড়ি সব শিখে নিচ্ছেন ; মানে শেফালি যেমন শেখাচ্ছে, তাই শিখছেন। নইলে কী এমন সাজে সাজেন কোনো ভদ্রলোক?

উনি নমস্কার করে বললেন, ওকি? আপনি এখানে একা বসে আছেন কেন? কী অন্যায় কথা! চলুন চলুন, ওদিকে চলুন, মেয়েরা সব একসঙ্গে বসবেন, গরমে একটু কষ্ট হবে, কী আর করবেন?

আমি হেসে বললাম, আমি কিন্তু বেশ হাওয়া পাচ্ছি, একটু এখানে বসি। ভিড় ভালো লাগে না।

উনি একটু পরে চলে গেলেন।

শেফালি বলল, গরমও পড়েছে, বল? আর সারাদিন এয়ারকন্ডিশান্ড ঘরে বসে থাকি, বাইরে বেরোলে এত কষ্ট হয় যে কী বলব। তুই তো আসবি না, আমিই যাই ওদিকে, বুঝলি?

শেফালি চলে গেল।

আমি বসে বসে ভাবছিলাম যে, একটু আগেই আমি যা ভাবছিলাম তা ঠিকই।

শেফালিকে আমি হিংসা করি না, তবু ক্লাসের পরীক্ষায় ফেল করা শেফালি—যাকে এই নিরুপমা চৌধুরী একজন নন্-এনটিটি বলেই জেনে এসেছে এতদিন, যার বলার মতো কোনো গুণই নেই—সেই শেফালি তার স্বামীর পরিচয়ে আজ আমার চেয়ে এইখানে অনেক বড় হয়ে রইল।

আমি হয়তো কখনো অমন ক্যাবলা ছেলেকে বিয়ে করতে পারতাম না—পড়াশুনায় সে যতই ভালো হোক না কেন—কিন্তু রমেনের মতো হ্যান্ডসাম অথচ শেফালির বরের মতো গুণী ছেলেও কলকাতায় বহু ছিল। তাদের আমার সঙ্গে দেখা হল না। প্রথম বয়সের ঘোরে, প্রথম জনকে দেখে, তার সস্তা সেলস্ম্যানশিপে ভুলে গিয়ে আমি তাকে গ্রহণ করলাম। এতগুলো লোকের সামনে একজন সন্দেহজনক চরিত্রসম্পন্ন চালিয়াৎ ও আত্মসম্মানজ্ঞানহীন স্বামীর স্ত্রীর পরিচয়ে এককালীন রূপে-গুণে চোখ-ঝলসানো আমি মাথা নীচু করে বসে থাকলাম।

কিছুক্ষণ পর ম্যানেজিং ডিরেক্টরের স্ত্রী ফারনেস চালু করলেন। প্রচণ্ড শব্দ করে ফারনেস চালু হল। ইলেকট্রোডগুলো ধীরে ধীরে নেমে এল ফারনেসের মধ্যে। তারপর অতিকায় প্রেসার কুকারের মতো ফারনেসের মধ্যে ইস্পাত রান্না হতে লাগল। কিউপোলাগুলো অনেকদিন আগেই চালু হয়েছিল। আজ সেগুলো চলছে না। দারুণ উঁচু শেডের নিচে একা একা নিঃসঙ্গ হয়ে দূরে দূরে দাঁড়িয়ে আছে ওগুলো।

সকলকে খাবার দেওয়া হল। কারখানার সকলের জন্যে প্যাকেটে করে মিষ্টি, সিঙাড়া ইত্যাদি আনা হয়েছিল। আমাকেও কে যেন এনে দিল একটা প্যাকেট।

বাড়িতে রান্না করে এসেছিলাম, গিয়ে আরেকবার চান করে আরাম করে খাব—ঘামে ব্লাউজ, ভিতরের জামা ভিজে জব্ জব্ করছে। এখানে আর এক মিনিটও বসতে ইচ্ছে করছে না।

এখন অফিস বিল্ডিংয়ের মধ্যে এয়ারকন্ডিশান্‌ড ঘরে ডিরেক্টররা ও তাঁদের স্ত্রীরা সকলে বসে আছেন। শেফালিও আছে। নভেলটি থেকে বিয়ার এসেছে, নটরাজ থেকে চাইনিজ খাবার।

এখনও পর্দা-টর্দা লাগানো হয়নি বলে ঘরের মধ্যে কী হচ্ছে দেখা যাচ্ছে।

আমি উঠে দাঁড়ালাম বাড়ি যাব বলে। রমেন এসে জিজ্ঞেস করল খেয়েছি কিনা। ও নিজে হাতে খুরিতে করে এক কাপ চা নিয়ে এল আমার জন্যে। চা-টা খেলাম। ফাই-ফরমাশ খেটে বেচারির চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে। ওর দিকে তাকিয়ে আমার কষ্ট হল। শাড়িটা ক্রাশড্ হয়ে গেছিল, ঠিক করে নিয়ে আবার ওর মুখের দিকে তাকালাম।

আমার মনে হল ওকে বলি, আমার কোনো উপায় নেই তোমাকে সাহায্য করার। পুরুষমানুষরা একমাত্র নিজেরাই নিজেদের সাহায্য করতে পারে।

ও বলল, সেন তার মোটর সাইকেলের পেছনে তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবে।

আমি শুধোলাম, তুমি যাবে না?

রমেন বলল, পাগল! মেটাল গলবে, পোরিং হবে। সকলে মিলে দেখতে হবে কেমন কাস্টিং হল, তারপর ল্যাবরেটরিতে কার্বন-কন্টেন্ট পরীক্ষা হবে, কত ঝামেলা। ঝামেলা কী সোজা? সব শেষ করে যেতে যেতে আমার রাত হয়ে যাবে।

—রাত হয়ে যাবে তোমার?

—বাঃ হবে না? আমার ওপর কত দায়িত্ব। আমি না থাকলে হয়?

আমি কিছু বললাম না, কারখানার গেটের দিকে এগোতে লাগলাম। যখন অফিস বিল্ডিংয়ের কাছাকাছি এসেছি এমন সময় শেফালি দৌড়ে এসে বলল, এই নীরু, তোকে সকলে ডাকছেন।

কেন জানি না, আমার মেজাজ খুব খারাপ হয়ে গেল, কিন্তু হেসে বললাম, কেন রে?

—তোকে যেতে দেখে ম্যানেজিং ডিরেক্টর জিজ্ঞেস করলেন, "হু'জ দ্যাট প্রেটি লেডি"? যেই শুনেছেন যে তুই আমার বন্ধু, বললেন ডেকে আনতে। আয় না আমাদের সঙ্গে একটু চাইনিজ খাবি?

আমি বললাম, না রে। আমার তাড়া আছে।

শেফালি হাত ধরল, বলল, আয় না বাবা, এম.ডি. বলছেন।

আমার সত্যিই এবার রাগ হল, বলে ফেললাম, এম.ডি. কী ভগবান?

শেফালি চমকে উঠল। বলল, না। তা নয়। তবে তোর না হলেও তোর বরের ভগবান তো বটেই। তোর ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর তোর বরের চাকরি নির্ভর করছে।

আমি হেসেই বললাম, তবে সে ভগবানের পুজো আমার স্বামীরই ব্যাপার, আমার নয়। তাই-না। বল?

তারপর কথাটাকে হালকা করার জন্যে বললাম, সত্যিই বলছি রে, গরমে অবস্থা কাহিল, দেখা করার মতো অবস্থা নেই।

শেফালি হালকা গলায় বলল, তোর মতো মেয়েকে যে-কোনো অবস্থাতে দেখতে পেলেই যে-কোনো পুরুষ ধন্য হয়ে যাবে।

পরক্ষণেই বলল, তোর আর তোর বরের সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিল।

আমি আর কথাটাতে ফেনাতে দিলাম না। আমি জানি কী আলোচনা হয় ; কী আলোচনা হতে পারে। সে আলোচনা তো আমিও করি ; সবসময় মনে মনে। কিন্তু উপায় কী? মুক্তির এখনও কোনো উপায় নেই। হয়তো পরে কোনোদিন হবে। জানি না, সেদিন কবে হবে।

সেন গেটে দাঁড়িয়েছিল, ডাক দিল, বউদি আসুন, রোদে বেগুনপোড়া হয়ে গেলাম।

আমি পৌঁছতে ও এঞ্জিন স্টার্ট করল। ওর কোমর জড়িয়ে ধরে বসতে আমার লজ্জা করছিল।

মোটর সাইকেলের পেছনে বসলেই যে চালায় তাকে জড়িয়ে ধরে তার পিঠে বুক লাগিয়ে বসতে হয়, নইলে জামশেদপুরের এই ফাঁকা রাস্তায় যা জোর চালায় এরা, যে-কোনো মুহূর্তে পড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে।

সেন আমার ছোটো ভাইয়ের মতো। ওকে জড়িয়ে ধরতে লজ্জা নেই কোনো—কিন্তু সারা গা ভিজে গেছে ঘামে। আমার তো লজ্জা করবেই ; হয়তো ওরও লজ্জা করবে।

সেন ভটভটিয়ে বের হল বাইরে, তারপর জোরে ছোটাল তার মোটর সাইকেল।

বাতাসে আমার চুল উড়ছিল, আঁচল উড়ছিল। গরম হাওয়ায় চোখ শুকিয়ে যাচ্ছিল। অসহ্য গরম।

সেন যেন কী বলল। হাওয়ায় ওর কথাগুলো উড়ে গেল। আমার দু'হাতই আটকা। হাত বাড়িয়ে যে কথার টুকরোগুলো ধরব, তার উপায় ছিল না। চেঁচিয়ে বললাম, জোরে বল, শুনতে পাচ্ছি না।

সেন বলল, বলছি যে, মোটর সাইকেলের পেছনে আপনাকে মানায় না।

—তো, কীসে মানায়?

—ক্যাডিলাক গাড়িতে।

বললাম, ফাজিল।

একটু পরে সেন আবার বলল, বউদি, আপনার ছোটো বোন নেই?

হেসে বললাম, আছে। দু'বোন।

—আপনার মতো দেখতে?

—আমার চেয়ে অনেক ভালো দেখতে।

সেন মুখ ফিরিয়ে বলল, আমার জন্যে একটু কিছু করুন না বউদি।

আমি হাসলাম, বললাম, মুখ ফিরিয়ো না, অ্যাকসিডেন্ট হবে।

—আপনার সঙ্গে অ্যাকসিডেন্ট হলেও সুখ। তারপর বলল, আপনার সঙ্গে মরলেও দুঃখ নেই আমার।

আমি বললাম, কিন্তু আমার আছে। আমি আমার এই জীবনকে দারুণ ভালোবাসি।

—এই জীবনকে? সেনের গলা গম্ভীর শোনাল। বলল, বউদি আপনি বড় মিথ্যুক।

—কেন? এই কথা বলছ?

—এই জীবনকে আপনি সত্যি ভালোবাসেন? বলেই গতিটা আস্তে করল।

আমি বললাম, কোন্ জীবনের কথা তুমি বলছ জানি না—তবে জীবন তো আমাদের একটাই—জীবন হয়তো খণ্ড খণ্ড, টুকরো টুকরো বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা, তবু সব মিলিয়ে তো একটাই জীবন। সত্যিই আমি আমার জীবনকে ভালোবাসি।

বাড়ির দরজায় পৌঁছে পেয়ারাগাছের নীচে মোটর বাইকটা রাখল সেন। বলল, একটু বসে যাই।

বললাম, বসবে? এসো। কী খাবে বল? ঘোলের সরবৎ করে দিই? না লেমন স্কোয়াশ খাবে।

সেন উত্তর দিল না।

আমি তালা খুলে ভিতরে এলাম।

বসবার ঘরটা বাইরের তুলনায় অনেক ঠান্ডা।

সেন বলল, আঃ কী আরাম! আপনার ঘরটা কী ঠান্ডা বউদি।

সেন ভিতরে ঢুকে দরজাটা ভেজিয়ে দিল। আমি পাখাটা খুলতে গিয়েছিলাম, পাখা খুলে স্ট্যান্ড লাইটটা জ্বেলে ফিরেই দেখি সেন একেবারে আমার পেছনে।

কিছু বোঝার আগেই ও আমার কোমর জড়িয়ে ধরল, জড়িয়ে ধরেই আমার ঘামে ভেজা বুকে মুখ গুঁজল। পরক্ষণেই মানা করার বা বাধা দেওয়ার বিন্দুমাত্র সুযোগ না দিয়েই এমন একটা কাণ্ড করে বসল, যা আমি বলতে পারছি না।

ঠাস্ করে ওর গালে এক চড় লাগালাম আমি। ও তড়িতাহতের মতো সরে গেল। ওর চোখের দিকে চাইতেই দেখলাম ও আমার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে, ওর চোখের কোণ জলে ভিজে উঠেছে।

সেন দেখতে কুৎসিত—কুচকুচে কালো রঙ, মোটা ধ্যাবড়া নাক, ছোটো ছোটো কদমছাঁট চুল, মোটা ঠোঁট, ওকে ওরকমভাবে আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমার গা জ্বালা করতে লাগল। আমি দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললাম, বেরোও এখান থেকে, বেরিয়ে যাও এখুনি—চেঁচিয়ে বললাম।

ঠিক সেই সময় দরজা ঠেলে সুশান্ত ঢুকল, অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে ও বলল, আমাকে বলছেন?

আমার কী যেন হয়ে গেল। মাঝে মাঝে আমার মাথার ঠিক থাকে না, বললাম, সবাইকেই বলছি, সবাইকেই বলছি বেরিয়ে যেতে।

তারপরেই বললাম, আমাকে একটু একা থাকতে দিন, প্লিজ আমাকে একটু একা থাকতে দিন।

সুশান্ত কিছু না বলে যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

সেনও কোনো কথা বলল না। আরেকবার আমার দিকে তাকিয়ে চলে গেল। দেখলাম ওর দু'চোখ বেয়ে জল পড়ছে।

হঠাৎ আমার মনে হল রমেন আমার কাছে যে মুখ নিয়ে আসে, সেনের এ মুখে সেই মুখের ছায়া নেই। সেনের সমস্ত মুখে কী যেন ভীষণ একটা কষ্ট ছড়িয়ে ছিল, সে কষ্টের কোনো ব্যাখ্যা আমি জানি না।

একটু পরে সেনের মোটর সাইকেলের শব্দ দূরে মিলিয়ে গেল কালীবাড়ির মোড়ের দিকে। দরজাটাতে ছিটকিনি দিয়ে আমি ঠান্ডা মেঝেতে শুয়ে পড়লাম।

আমি কী করব জানি না। এত অপমান, এতরকম অপমান আমার আর সহ্য হয় না। পাখার ব্লেডগুলো দেখা যায় না—পাখাটা 'অন'-এ ঘুরছিল। হঠাৎ মনে হল পাখার সঙ্গে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুললে কেমন হয়? কী করে ঝোলে লোকে? যারা ঝোলে, তারা হঠাৎ কখন সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছয়? হয়তো এমনই কোনো মুহূর্তে। আমি আজ সে মুহূর্তের সামনে এই অসহ্য গরম ও অসম্মানে দাঁড়িয়ে আছি।

আমার চোখ দিয়ে সচরাচর জল পড়ে না। কিন্তু ঠান্ডা মেঝেতে শুয়ে ঘুরন্ত পাখার দিকে চেয়ে দু'চোখ বেয়ে জল ঝরতে লাগল। ছিঃ, সুশান্ত কী ভাবল আমাকে। সুশান্ত এই মরুভূমির মধ্যে একমাত্র মরূদ্যান আমার, আমার এক এবং একমাত্র সম্মানের পাত্র, যে আমাকে সম্মানের চোখে দেখে ; সে আমাকে ভাবল, হয়তো সেনের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক আছে। ভাবল, সেনকে আর ওকে আমি একই চোখে দেখি।

জানি না কেন এমন হল, আমার কেন এমন কপাল হল? এত মেয়ে থাকতে শুধু আমার জন্যেই কী পৃথিবীর সমস্ত সমস্যা জমা হয়েছিল?

৪

বাইরে কখন প্রখর রোদের বেলা পড়ে এসেছিল বুঝতে পারিনি। বোধহয় অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম।

ঘুম যখন ভাঙল, তখন প্রায় ছ'টা বাজে। বাইরে পেয়ারাতলায় রোদের ফালিগুলো বেঁকে গেছে। একটা একলা বুলবুলি কোথা থেকে উড়ে এসে শুকনো ডালে বসে ফিস্ ফিস্ করে কী সব বলছে।

জানালাগুলো খুলে দিলাম। আমার দম বন্ধ হয়ে এসেছিল। এই ভাড়া করা ফার্নিচার, এই ভাড়া করা গালিচা, এই ভাড়া করা জীবনের গ্লানি, এই অসম্মানের জীবন বড় দুর্বিষহ বলে মনে হচ্ছিল।

মুখী এলে, ওর ওপর ঘরদোর পরিষ্কারের ভার দিয়ে চান করতে গেলাম।

আমার সারা গা দিয়ে গরম ঝাঁঝ বেরোচ্ছিল।

বাথরুমে ঢুকে সমস্ত জামাকাপড় ছেড়ে বাথরুমের আয়নার সামনে চুল খুলে দাঁড়ালাম শাওয়ারের নিচে। সারা শরীর বেয়ে ঠান্ডা জল গড়াতে লাগল।

ভালো করে বার বার অনেকবার সাবান মাখালাম সারা গায়ে মুখে, বুকে, তবুও ঘেন্না গেল না। সেন আমার শরীরের যেখানে যেখানে হাত দিয়েছিল সেই সমস্ত জায়গা তখনও জ্বলছিল—যেন ওর হাতে লঙ্কাবাটা ছিল। ঘেন্নায় গা রি রি করছিল।

জানি না, পুরুষগুলো কী আনন্দ পায়? এমন ইচ্ছার বিরুদ্ধে, রুচির বিরুদ্ধে, এমন অপমানকর পরিস্থিতিতে এক মুহূর্ত আমার বুক হাতের মধ্যে ধরে ও কী সুখ পেল তা ও-ই জানে।

জানি না, আমি মেয়ে, আমি, আমরা, কোনোদিনও হয়তো পুরুষদের এই লজ্জাকর প্রবৃত্তি-সর্বস্বতা ক্ষমা করতে পারি না।

সেনকে আমার ছোটো ভাইয়ের মতো দেখতাম, ঐ কালো কালো অল্পবয়সি ছোটো ছেলেটার জন্যে আমার মনের কোণে বেশ একটা আদুরে অনুকম্পার স্থান গড়ে উঠেছিল। ও এই এক মুহূর্তের স্পর্শের সামান্য পাওয়ার বিনিময়ে কেন যে এত বড় পাওয়াটাকে ধুলোয় ফেলে দিল তা ও-ই জানে ; পুরুষরাই জানে।

আয়নার সামনে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে দাঁড়ালে এখনও আমার গর্ব হয়। আমার ফিগারটা সত্যিই ভালো। নীলামে চড়ালে এর দাম কত হত জানি না। হয়তো এ এক বহুমূল্য বস্তু, অন্যদের চোখে, পুরুষের চোখে, কিন্তু এই সুন্দরী নারী-শরীরের আড়ালে যে একটা নরম ভালোবাসার কাঙাল কাঠবিড়ালির মতো মন আছে, সে মনটার খোঁজ কেউ রাখল না। এই সুন্দরী শরীর না থাকলে আমার—আমি কখনো রমেনের মতো লোকের শিকার হতাম না। সত্যিকারের সুন্দর মনের কেউ হয়তো একদিন আমাকে আদর করে, সমস্ত সম্মানের সঙ্গে তার ছোটো মধ্যবিত্ত সংসারের রানি করত।

কিছুই হল না।

আমি, এই উদ্ধত, সুন্দরী, সর্বগুণসম্পন্না নিরুপমা চৌধুরী আজ কিছু নিয়েই আর গর্ব করতে পারি না। গর্ব করার মতো কিছুই বুঝি আমার অবশিষ্ট রইল না আজ।

অনেকক্ষণ ধরে চান করার পর শরীরটা বেশ স্নিগ্ধ লাগতে লাগল। পয়লা বৈশাখে ছোড়দি একটা সাদা জমির ওপর হালকা হলদে পোল্‌কা ডটের খাটাউ ভয়েল দিয়েছিল। সে শাড়িটা বের করে পরলাম। হালকা হলদে রঙের ব্লাউজ পরলাম যা ঐ শাড়ির সঙ্গে মানায়। ফলস্ মুক্তোর সাদা মালা পরলাম একটা গলায়। ভুরুতে আইব্রো-পেনসিল মাখলাম—অনেকদিন ভুরু প্লাক করাইনি, একদিন করতে হবে। কেন জানি না, সেই অসম্মানের দুপুরের পর, সেই সন্ধের ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে অনেক অনেকদিন পর ভালো করে সাজতে আমার ভারী ভালো লাগছিল।

বিয়ের সময় বন্ধুরা মিলে একটা ইন্টিমেট সেন্ট কিনে দিয়েছিল। বিশেষ বিশেষ দিনে, যেদিন মন খারাপ থাকে, অথবা অত্যন্ত ভালো থাকে, আমি ঐ সেন্টটা মাখি। ইন্টিমেটটা বের করে ঘাড়ে, গলায় একটু মাখলাম। তারপর চটিটা পায়ে গলিয়ে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে পড়লাম।

কোথায় যাব জানি না, এখানে আমার তেমন জায়গাও নেই যাওয়ার ; তবু বেরোলাম।

মাঝে মাঝে এমন বোধহয় সব মেয়েরই হয়। দমবন্ধ-দমবন্ধ লাগে। কোথাও যাবার জায়গা নেই জেনেও বেরোতে হয়, পথে পথে ঘুরতে হয়, কোনো অপরিচিত পথিকের স্তুতিভরা চোখের আয়নায় নিজের ব্যক্তিত্বের ছায়া দেখে নিজেকে নতুন করে নিজে ভালোবাসতে ইচ্ছে যায়।

অনেকক্ষণ একা একা সোনারি লিংকে হেঁটে বেড়ালাম। কত রকম লোক হাঁটতে বেরিয়েছে। গরমের সন্ধে। একদল কাক আসন্ন সন্ধ্যার গান গাইছে সমবেত হয়ে। কোম্পানির কুকুরগুলোকে কে যেন ট্রেনিং দিচ্ছেন—পাশের মাঠে। বড় বড় অ্যালসেশিয়ান কুকুরগুলো লাফাচ্ছে, ঝাঁপাচ্ছে, পরমুহূর্তেই শান্ত ও বাধ্য ছেলেদের মতো কথা শুনছে।

হাঁটতে হাঁটতে প্রায় এয়ারস্ট্রিপ অবধি চলে গিয়েছিলাম তারপর ফিরলাম। এখন পথে পথে আলো জ্বলে উঠেছে। অন্ধকার হয়ে গেছে সোনারির রাস্তা। মাঝে মাঝে তীব্র গতিতে বুকের মধ্যে চমক তুলে কোনো গাড়ি ছুটে চলেছে পথ বেয়ে।

কাইজার বাংলোগুলোর কাছে এসে মোড় নিলাম। মোড়েই একটা ফুলগাছ। বোধ হয় কেসিয়া নডুলাস্। পথটা ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে।

ফুলের গালচের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতেই আমার মনে বিদ্যুৎ চমকের মতো একজনের কথা মনে পড়ল। একটা ব্যথিত মুখ। মনে পড়তেই, বুকের মধ্যেটা মুচড়ে উঠতে লাগল।

কী আশ্চর্য! সেনকে বের করে দেবার পর থেকে সুশান্তর কথা একবারও আমার মনে পড়েনি। এই মুহূর্তে ফুল মাড়ানোর সময়ে কেন জানি না, আশ্চর্যভাবে সুশান্তর কথা মনে পড়ে গেল আমার। ইচ্ছে হল এক্ষুনি গিয়ে ওর কাছে ক্ষমা চাই। ওর কাছে দৌড়ে গিয়ে বলি, তোমাকে কিছু বলতে চাইনি, বলতে চাইনি গো, যা বলেছি তা আমার মুখের কথা ; মনের কথা নয়।

জানি না, কী এক অদৃশ্য টানে আমি বড় বড় পা ফেলে বাড়ির দিকে এগিয়ে চললাম।

সুশান্তর বাড়ি আমাদের বাড়ির পাশেই। পথে বেরোবার সময়ও ওর বাড়ির পাশ দিয়েই গিয়েছি, অথচ একবারও মনে পড়েনি ওর কথা তখন, অথচ এখন কী এক অজানা কারণে ও এমন করে টানছে আমাকে।

বাড়ির বাইরের দরজায় দেখি ওর বাহন ময়ূর সিঁড়িতে বসে আছে।

বললাম, দাদাবাবু আছেন না কি?

ময়ূর হেসে বলল, আছেন।

—খবর দেবে একটু যে, আমি এসেছি।

ময়ূর উঠে দাঁড়াল। বেশ চটপটে সপ্রতিভ ছেলে। বলল, খবর দেবার দরকার নেই। দাদাবাবু জানেন যে আপনি আসবেন।

—সেকি? তুমি কী করে জানলে?

—বারে। আমাকে উনি যে বললেন, বললেন পাশের বাড়ির বউদি এলে ভেতরে পাঠিয়ে দিবি।

আমি একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে পড়ে ঠোঁট কামড়ে একটু ভাবলাম। যেতে বড় সংকোচ হচ্ছিল। আমি কোনোদিনও যাইনি এ পর্যন্ত সুশান্তর বাড়ি। ওই বরাবর এসেছে। তাছাড়া একজন বিবাহিতা অল্পবয়সি মেয়ের পক্ষে একা একা ব্যাচেলারের বাড়ি যাওয়ার কোনো যৌক্তিকতাও নেই। তবু যেতেই হবে

আমাকে। আজ ক্ষমা না চাইতে পারলে হয়তো রাতে ঘুমোতে পর্যন্ত পারব না। ছিঃ ছিঃ, কী ভাবল আমাকে সুশান্ত—কত কী ভাবল হয়তো।

আমি ময়ূরকে বললাম, তুমি একটু খবর দিয়ে এসো মুখীকে যে, আমি এ বাড়িতে আছি। দাদাবাবু এলেই যেন খবর দেয় আমাকে—আর দাদাবাবুকে যেন বলে যে আমি এখানে আছি।

ময়ূর বলল, আপনি ভেতরে যান, আমি বলে আসছি।

বাইরের ঘরটায় একটা সোফাসেট, পাটের একরঙা কার্পেট—একটা তেলরঙা ছবি।

বাইরের ঘরে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে ভেতরে ঢুকলাম আমি পর্দা সরিয়ে। একফালি বারান্দা—অন্ধকার। বারান্দার ওপারের একটি ঘর থেকে আলোর ফালি এসে বারান্দায় পড়ছিল। ঘরে সবুজরঙা পর্দা ঝুলছে। ঘরের পাখার হাওয়ায় দুলছে পর্দাটা।

আস্তে আস্তে পর্দার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি। ভিতরে কোনো শব্দ নেই—শুধু পাখাটার একটানা একটা গুনগুনানি শব্দ ছাড়া। অনেকক্ষণ পর, যেন বহুযুগ পর—কে যেন একটা বইয়ের পাতা ওলটালো—তারপরই সুশান্ত নিজের মনে বলে উঠল, 'The woods are lovely, Silent and deep, Silent and deep, I have miles to go and promises to keep.' কবিতা পড়ছিল সুশান্ত।

ওর গলার সুন্দর আন্তরিক শুদ্ধ উচ্চারণে সেই কথাগুলো আমার সমস্ত কানভরে ঝুমঝুম করে বাজতে লাগল।

কতক্ষণ পর জানি না, অনেকক্ষণ পর আমি বললাম, আসতে পারি?

আমার নিজের কাছেই নিজের গলাটা বড় চোর চোর শোনাল।

সুশান্ত লাফিয়ে উঠে পর্দার দিকে এগিয়ে এল, এসে পর্দা সরিয়ে বলল, আসুন, আসুন। ময়ূর কি ছিল না? এ কি? অন্ধকারে কতক্ষণ থেকে দাঁড়িয়েছিলেন।

—অনেকক্ষণ।

—সে কি! ডাকেননি কেন আমাকে?

—লজ্জা করছিল। বললাম আমি।

—লজ্জা? কীসের লজ্জা আপনার? আচ্ছা এসব কথা পরে হবে, এখন বসুন তো।

বসুন তো বলেই সুশান্ত খুব মুশকিলে পড়ল, কোথায় বসতে দেবে ভেবে না পেয়ে।

ঘরময় একটা সতরঞ্জি পাতা, তার উপর অনেকগুলো ইংরেজি বাংলা বই একসঙ্গে ছড়ানো। একটা তাকিয়া। ঘরের দেওয়ালজোড়া একটা বইয়ের আলমারি—ছোটো একটা ডিভান—তার উপরও বই স্তূপীকৃত করা আছে।

কিছুক্ষণ বোকার মতো দাঁড়িয়ে থেকে সুশান্ত দৌড়ে গিয়ে কোথা থেকে যেন একটা চামড়ার মোড়া নিয়ে এল, বলল, বসুন তো, বসুন।

তারপর বলল, এ ঘরে তো খুব আপনজন ছাড়া কেউ আসে না, সবাই বাইরের ঘরেই বসে। আপনি যখন এসেই পড়েছেন, তখন বসবার একটা বন্দোবস্ত তো করা উচিত।

আমি বললাম, আমি তাহলে চলে যাই বাইরের ঘরে? আমি তো আপনজন নই আপনার।

সুশান্ত অনেকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইল, কোনো কথা বলল না। তারপর নীচু গলায় বলল, বসুন বসুন আমার কী সৌভাগ্য।

অনেকক্ষণ কেউই কোনো কথা বললাম না।

সুশান্ত মুখ নীচু করে বসেছিল।

একটা চাপা পায়জামা আর একটা হালকা বেগুনি পাঞ্জাবি পরেছিল সুশান্ত। চশমাটা নাকে একটু

নেমে গিয়েছিল। ডান হাতে একটা খোলা বইয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ও বসেছিল। কিন্তু ওর মন ছিল অন্য কোথাও। ও কিছু ভাবছিল, যা সে বইয়ের কথা নয়।

পাখাটা গুন্ গুন্ করছিল।

সারা ঘরে আর কোনো আওয়াজ ছিল না।

অনেকক্ষণ পর সুশান্ত মুখ তুলল, মুখ তুলে আমার দিকে ভালো করে তাকাল।

ওর চোখের বিস্ময়ের দৃষ্টিটা আস্তে আস্তে মুগ্ধতায় ভরে গেল, ও যেন নিজের মনেই বলল, বাঃ তোমাকে, সরি, আপনাকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে তো আজকে, ঠিক যেন...

—ঠিক যেন কী? আমি মুখ তুলে বললাম।

সুশান্ত মুখ নীচু করে বলল, ঠিক যেন করবীফুল। হলুদ করবী। বলেই থেমে গেল।

অনেকক্ষণ পরে বলল, তারপর? হঠাৎ এলেন যে? কী মনে করে?

আমি মুখ নীচু করে বললাম, ক্ষমা চাইতে।

সুশান্ত কোনো জবাব দিল না।

অনেকক্ষণ কোনো জবাব না পাওয়াতে আমি ওর দিকে তাকালাম ভয়ে ভয়ে, লজ্জায়, তাকিয়ে দেখি সুশান্ত হাসছে—এক অদ্ভুত হাসি। এক দারুণ ভালোবাসা, ক্ষমা ও কৌতুকমেশা হাসি ওর মুখময় ছড়িয়ে ছড়িয়ে গিয়ে ওর সমস্ত মুখকে এক দারুণ দীপ্তিতে দীপ্তিমান করেছে।

সুশান্ত বলল, ক্ষমা কীসের জন্যে?

আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি বলে।

—আমার সঙ্গে তো করেননি, আপনার মেজাজ তখন খুব খারাপ ছিল বুঝতে পেরেছিলাম। আমি জানি, রাগটা আমার উপর নয়, ঐ ভদ্রলোকের উপর হয়েছিল। আমি নেহাত উপলক্ষ।

তারপর বলল, ভদ্রলোক কী করেছিলেন? আপনাকে এমন রাগতে আমি তো কখনো দেখিনি।

—ওকে ভদ্রলোক বলবেন না। কোনো ভদ্রলোক এরকম ব্যবহার করেন না। কী করেছিলেন তাও আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না।

—জিজ্ঞেস করছি না। না বললেও অনুমান হয়তো করতে পারছি। ভদ্রলোককে আমি চিনি না, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে তাঁর উপর আপনি অবিচার করছেন।

আমার রাগ হল, ভীষণ রাগ হয়ে গেল।

বললাম, আপনি কিছুই জানেন না, তাই এরকম মহৎ হওয়ার ভান করছেন। কী করেছিলেন জানলে আপনি এত বড় বড় কথা বলতেন না।

—ওঃ—বলে মুখ তুলল সুশান্ত।

বলল, আমি জানি না উনি কী করেছিলেন, জানতে চাইও না, তবে আমি বলছিলাম যে, কোনো লোকের এক মুহূর্তের কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যবহারই কোনো লোককে সামগ্রিকভাবে বিচার করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। কারও উপরেই অত সহজ বিশ্বাস হারাতে নেই। মানুষকে, যে-কোনো মানুষকেই বাতিল করার আগে তাকে বিশ্বাস করা উচিত, তাকে বোঝানো উচিত ; তাকে বোঝা উচিত। আমি অবশ্য সেই ভদ্রলোক সম্পর্কে কিছুই জানি না, তবে আমার সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল যে আপনি হয়তো ভদ্রলোককে ভুল বুঝেছিলেন।

—আবারও আপনি ভদ্রলোক ভদ্রলোক করছেন!

—কী করব? বেসিক্যালি আমরা প্রত্যেকেই যে ভদ্রলোক, কখনো-কখনো মাঝে-মধ্যে আমরা অভদ্র হয়ে উঠি, কিন্তু সেজন্যে আমাদের সমগ্র পরিচয়টা তো আর বদলে যায় না ; যেতে পারে না। এই তো আপনি আমাকে আপনার বাড়ি থেকে পত্রপাঠ বের করে দিলেন, আমি তো কারণ

না বুঝতে চেয়ে, আপনি কী ও কীরকম লোক তা না জানতে চেয়ে, আপনার উপর রাগ করে থাকতে পারতাম ; কিন্তু সেটা কি চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়া হত না?

আমি অধৈর্য হয়ে বললাম, আপনি জানেন না তাই বলছেন। একজন ভদ্রমহিলাকে একলা পেয়ে, তার স্নেহের সুযোগ নিয়ে যে তাকে অপমান করতে পারে, তাকে ভদ্র বা ভালো বলা কী করে সম্ভব তা তো আমার বুদ্ধিতে কুলোয় না।

সুশান্ত এবার হেসে বইটাকে মুড়ে রাখল, বলল, আমাদের বুদ্ধিতে তো অনেক কিছুই কুলোয় না, আমার অথবা আপনার বুদ্ধিতে কুলোয় না বলেই যে সেটা বুদ্ধিগ্রাহ্য নয় এমন কথা তো নেই। উনি যাই করে থাকুন, আপনাকে অপমান করার জন্যে যে করেছেন তা আপনি বুঝলেন কী করে? আপনি কাজটা, কী কাজ আমি জানি না; খারাপ ভাবতে পারেন, কিন্তু কাজের উদ্দেশ্যটাও যে খারাপ তা জানলেন কী করে?

—জানি। আমরা মেয়ে। আমাদের চোখে কিছুই এড়ায় না। আমাদের সহজাত বুদ্ধিতে পুরুষদের ব্যবহারের উদ্দেশ্য আমাদের চোখ এড়ায় না।

ভুল ভুল; একেবারেই ভুল, বলল সুশান্ত।

তারপর হেসে বলল, পুরুষদের পক্ষ নিয়ে দেখছি আপনার সঙ্গে আমার রীতিমতো ক্রুসেডে নামতে হবে।

বলেই খুব হাসতে লাগল।

আমার আবার রাগ হয়ে গেল, বললাম, আপনি লোকটা মোটেই ভালো নয়, নইলে এরকম একজন লোকের ধামা ধরতেন না।

সুশান্ত আবার হাসল, বলল, ধামা তো ধরিনি। ছেলেটির চেহারা দেখে মনে হল ও একেবারে ছেলেমানুষ—ও কী করেছে আমি জানি না, তবে ওকে আপনি যেমন দাগী আসামী ভাবছেন, ওকে দেখে আমার তেমন মনে হল না। আমরা প্রত্যেকেই, প্রত্যেক মানুষই মানুষ ; আমরা মেশিন নই। তাই আমাদের দু'একটা কৃত বা অকৃত কর্মকে ম্যাগনিফাইং গ্লাসের নীচে ফেলে অত বড়ো করে দেখলে আমাদের প্রত্যেকের প্রতিই অবিচার করা হয়। আমার বিশ্বাস, সব লোকই ভালো। ঐ ছেলেটিও ভালো। কেন জানি না, আমার মন কেবলই বলছে যে ওকে আপনি যা ভেবেছেন ও তা নয়।

আমি বললাম, জানি না। হয়তো জানতে চাইও না। তারপর বললাম, ক'টা বেজেছে দেখুন তো আপনার ঘড়িতে। আমার ঘড়িটা তাড়াতাড়িতে ফেলে এসেছি।

সুশান্ত ঘড়ি দেখল, বলল, আটটা। বসুনই না আর একটু। এই তো এলেন। আমার সামনে মোড়ায় বসে আছেন, আমার সমস্ত ঘর দারুণ মিষ্টি গন্ধে ভরে গেছে, আমার ভীষণ ভালো লাগছে। এই অগোছালো ব্যাচেলারের ঘর ছেড়ে আপনি একটু পরে আপনার সাজানো সুখের ঘরে ফিরে যাবেন, অথচ আমার এই ঘরও এক দারুণ সুখে ভরে যাবে। আপনার পারফ্যুমের গন্ধে তখনও ঘর ম' ম' করবে। আপনি চলে যাবার বহুক্ষণ পর পর্যন্ত আমি কল্পনা করব আপনি আমার সামনে বসে আছেন, মনে মনে আপনার সঙ্গে আরও কত ঝগড়া করব দেখবেন।

—ভারী সুন্দর কথা বলেন তো আপনি। আপনার অনেক বান্ধবী আছে, না? তারা সকলেই কি আমার মতো হাঁ করে আপনার কথা শোনেন?

—সকলের সঙ্গে সব কথা বলে সমান আনন্দ হয় না। বান্ধবী হয়তো আছেন, তবে আপনার মতো এমন বান্ধবী কেউ নেই। আপনি আপনিই। ভয় পাবেন না। কিছু চাইব না আপনার কাছে। কিছুই না। তাছাড়া আজ দুপুরেই একজনের যা হেনস্তা দেখলাম চোখের সামনে, তাতে মনের কোণে যদি বা কিছু ভিক্ষা চাওয়ার সাধ জন্মেছিল তা উবে গেছে। বিশ্বাস করুন, আপনাকে শুধু আপনার

জন্যেই আমার ভালো লাগে, বদলে আপনি আমায় কিছু কোনোদিন দেবেন বা দিতে পারেন বলে নয়। কথাটা হয়তো বুঝিয়ে বলতে পারলাম না, কিন্তু কী করব বলুন, আমার কথার ধরনই এমনি। নিজেই ভালো বুঝি না নিজের কথা, আর আপনি যে বুঝবেন না এতে আশ্চর্য হবার কী আছে।

তারপর সুশান্ত বলল, যাক, বাজে কথা থাক, আপনি কী খাবেন বলুন?

—আপনি কী রান্না করতে পারেন? খাওয়ানোর কথা যে বলছেন? আমি বললাম।

সুশান্তকে ভীষণ বিব্রত দেখাল, মুখটা লাল হয়ে উঠল, বলল, রান্না মানে, একেবারে পারি না তা নয়, পারি। মানে, এই ওমলেট, খিচুড়ি আর মাংস পারি ; সত্যিই, কারও সাহায্য ছাড়াই পারি।

আমি হাসলাম। বললাম, তবে তো অনেক কিছুই পারেন। তাও কারও সাহায্য ছাড়াই যখন পারেন।

ও বলল, আমি একটা স্পেশাল শরবত বানাতে পারি এমন আপনি কোথাওই খাননি, দাঁড়ান বানিয়ে আনছি।

—আপনি অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? ময়ূরই তো এনে দিতে পারে।

—ময়ূর পারবে না। আমিই আনছি। বলেই সুশান্ত চলে গেল।

আমি একা বসে সুশান্তর ঘরের চারিদিকে চোখ বোলালাম। বইয়ে বইয়ে ঘর ভর্তি। বদলির চাকরি করে! এত বই কী করে যে সব জায়গায় বয়ে বেড়ায় ও-ই জানে। ঘরের এক কোনায় একটা ছোট ইজেল, মাঝে রঙ, তুলি, টার্পেনটাইন তেল, রঙমাখা ছেঁড়া ন্যাকড়া। ইজেলে কোনো কিছু আঁকার মহড়া চলেছে।

সব মিলিয়ে এই ঘরে বসে সুশান্তর মন সম্বন্ধে একটা ধারণা করা চলে। কোনো ঝাঁকড়া গাছের নীচে গরমের দিনে এসে বসলে যেমন লাগে তেমন একটা শান্ত ঠান্ডা ভাব ঘরটায়।

বই রমেনও পড়ে, বেশিরভাগ ক্রাইম থ্রিলার, মারামারি-কাটাকাটির বই, নয়তো অর্ধনগ্ন মেয়ের ছবিসর্বস্ব মলাটওয়ালা ওয়েস্টার্ন পেপারব্যাক। কিন্তু সুশান্ত নানারকম বই পড়ে। সাহিত্যের বই-ই বেশি।

সত্যি কথা বলছি, সুশান্তকে যতই পাশাপাশি দেখছি, আমার পক্ষে রমেনের মধ্যে ভালোলাগার মতো কোনোরকম গুণই খুঁজে পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে। অথচ আজ থেকে আড়াই বছর আগে এই লোকের মধ্যে আমি কত গুণ দেখেছিলাম—। গুণ আর রূপে কোনো রকম খুঁতই চোখে পড়েনি। শনিবার শনিবার ও আমাকে যখন বাইরে নিয়ে যেত, কোনো ইংরেজি বা হিন্দি ছবি দেখে এসে পার্ক স্ট্রিটের কোনো রেস্তোরাঁতে যখন ও আমাকে নিয়ে খেতে ঢুকত, স্টুয়ার্ডকে ডেকে স্মার্ট ইংরিজিতে খাবারের অর্ডার দিত, অবহেলায়, ক্যাজুয়ালি, দামী সিগারেটের প্যাকেট থেকে সিগারেট ধরাত ঘন ঘন এবং ওর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ইনডায়রেক্ট্লি আমাকে এক দারুণ সুন্দর স্বপ্নলোকের আভাস দিত—আমার বেশ লাগত তখন।

তখন ও আমার বড় বাধ্য ছিল। এখন ও জ্ঞানে থাকলে বাধ্যতার ভান করে। সেদিন, মানে বিয়ের আগে আগে ওর এই বাধ্যতা গুণটাই আমাকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু সেদিন আমি বুঝিনি যে বাধ্যতা গুণই পুরুষমানুষের একমাত্র গুণ নয় ; তাহলে যে-কোনো ককারস্ স্প্যানিয়েল কুকুরকে বিয়ে করেই আমার মতো মেয়েদের সুখী হওয়া উচিত ছিল! স্বামীদের মধ্যে আর কিছুই খোঁজার ছিল না।

মা যখন স্নেহের সঙ্গে বলতেন, তুই ভুলে যাস না নীরু, আমাদেরও তোর মতো বয়স ছিল একদিন। আমরাও তোদের অনুভূতি, তোদের বয়স সব পেরিয়ে এসেছি। তুই এত তাড়াতাড়ি মনস্থির

করিস না। আজকে যে জানাকে শেষ বা পরম জানা বলে জানছিস, কাল দেখবি, সেটাই মিথ্যা।

তখন আমার মনে আছে, আমি সদম্ভে মাকে বলতাম, যে, আমি যা জানি তা ঠিকই জানি। তোমরা যা জানতে তা ভুল। আমি, আমরা, আমাদের জেনারেশনের মেয়েরা, তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি জানি ও ঠিক ঠিক জানি।

আসলে আমারই ভুল হয়েছিল। সেদিন যদি বলতাম যে, মা হয়তো আমি আজ যা জানছি তা ভুল, তবুও আমার ভুলের দায়িত্ব আমারই, ঠিকই করি বা ভুলই করি, তার সমস্ত কৃতিত্ব ও অসম্মান আমার একারই প্রাপ্য—সব আমার একারই সামলাবার। আমার ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে তোমরা কেন মাথা ঘামাও?

এ বললেও হয়তো ভালো করতাম।

সেদিন এটুকুও বলিনি মাকে। মাকে শুধুই বলেছিলাম যে তোমরা ব্যাক-ডেটেড ফসিল, তোমাদের সঙ্গে আমাদের মেলে না।

মায়ের ছবির দিকে এখন মাঝে মাঝে চেয়ে সব সে সব কথা ভাবি। একা একা চোখ দিয়ে জল পড়ে!

মা, আমার মাগো, তুমি ঠিকই বলতে মা, আমি তখন ছোটো ছিলাম, আমি আমার নিজের ভালো বুঝিনি, আজ তুমি নেই বলে তাই আমার বাঁচোয়া—। তুমি আজ বেঁচে থাকলে তুমি সবই বুঝতে, সবই জানতে ; আর কেউ নাই-ই বুঝুক, নাই-ই জানুক, কিন্তু তবুও আমি আমার দম্ভ ভেঙে, আমার সবজান্তার মুখোশ খুলে কখনো তোমার কোলে মাথা রেখে কাঁদতে পারতাম না। তোমাকে হয়তো আরও দুঃখ দিতাম, আরও কষ্ট দিতাম, যা বলার নয় সেই সব অন্তঃসারশূন্য সর্বৈব মিথ্যা কথাগুলো পাকা অভিনেত্রীর মতো তোমার নিষ্কম্প চোখে চোখ রেখে বলে আসতাম—বলে এসে—নিজে হাউ মাউ করে কাঁদতাম।

আমরা এই যুগের এই অসংখ্য অল্পবয়সি মেয়েরা কী যেন এক অভিশাপ মাথায় করে জন্মেছি। ক্যাডবারি, আইসক্রিম, সিনেমা, রেস্তোরাঁ, কাররেসিং, ক্লাব, পার্টিতে আমরা যা খুঁজে বেড়াই বিয়ের আগে এবং হয়তো বিয়ের পরও, তা হয়তো আসলে আমরা কেউই চাই না। আসলে আমরা যা চাই তা আমার মায়েরা যা চাইতেন তার চেয়ে পৃথক কিছু নয়। চাই, সত্যিকারের ভালোবাসা।

ভান নয়, ভণ্ডামি নয়, জুয়াচুরি নয়; নিছক অম্লান, দাবিহীন সত্যিকারের ভালোবাসা। একজন সৎ, সুপুরুষ স্বামী, একটি শান্ত ঠান্ডা থাকার জায়গা, এবং একগোছা চাবি। পৃথিবীতে কোনো সুখের আলমারি নেই যে আমাদের সেই চাবির থোকার কোনো না কোনো চাবিতে না খোলে।

কতক্ষণ যে একা একা বসে এতসব ভাবছিলাম জানি না, এমন সময় সুশান্ত ফিরে এল। বলল, সরি, ভীষণ দেরি হয়ে গেল। সেনগুপ্ত সাহেবের বাড়ি যেতে হল তাই দেরি হয়ে গেল!

অবাক হলাম আমি, বললাম, কেন? সেনগুপ্ত সাহেবের বাড়ি কেন?

—ওঁর বাড়িতে লেবুগাছ আছে।

—লেবুগাছ? মানে বুঝলাম না আপনার কথায়।

—মানে লেবু-পাতা আনতে গিয়েছিলাম। আমি যে শরবত বানালাম তাতে লেবু-পাতা অবশ্যই লাগে।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে ওর হাত থেকে গ্লাসটা নিলাম। লালচে ও ঘন দেখতে কী এক অদ্ভুত তরল পদার্থ তার মধ্যে শোভা পাচ্ছে। চুমুক দেবার আগে শুধোলাম, বস্তুটি কী?

—আগে খান এক চুমুক, তারপর বলব; বলল সুশান্ত।

এক চুমুক দিয়েই কিন্তু দারুণ লাগল খেতে। টক্ টক্ মিষ্টি মিষ্টি, ঝাল ঝাল।

বললাম, কী দিয়ে বানালেন?

সুশান্ত খুব খুশি হল, আমার ভালো লেগেছে শুনে, তারপর সতরঞ্জিতে বসে পড়ে চোখ মুখ নাচিয়ে বাচ্চা ছেলের মতো বলল, বলব কেন? ট্রেড সিক্রেট্।

—বলুনই না। হেসে বললাম আমি।

—সুশান্ত বলল, আগে বসুন, বলছি।

আমি বসলাম, আপনি নীচে বসে আছেন, আর আমি মোড়ায়, মনে হচ্ছে আমি আপনাকে পড়াচ্ছি। খারাপ লাগছে আমার। নীচে বসি, কেমন?

সুশান্ত তাড়াতাড়ি করে বই সরিয়ে আমার জন্যে জায়গা করে দিল, তারপর বলল, তেঁতুলের রস, শুকনো লংকা পোড়া, একটু নুন, একটু চিনি, আর লেবুপাতা এই-ই তো সব উপাদান। তবে উপাদানেই তো আর সব হয় না, হাতের গুণও চাই; খুব যত্ন করে ভালোবেসে বানাতে হবে। ফ্রিজে বরফ নেই, থাকলে দেখতেন, এর ওপর কয়েকটা আইস-কিউব্স ফেলে দিলে কেমন লাগে।

আমি বললাম, সত্যিই ভারী ভালো খেতে।

সুশান্ত কী বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় ময়ুর দৌড়ে এসে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, দাদাবাবুর খুব অসুখ, ট্যাক্সি করে বাড়িতে নিয়ে এসেছে, শিগগির চলুন।

গ্লাসটা নামিয়ে রেখে আমি উঠে পড়লাম। সুশান্তও লাফিয়ে উঠল, বলল চলুন।

দৌড়ে এসে দেখি, সেন আর মুখী রমেনকে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছে।

আমরা ঘরে ঢুকতেই হুড় হুড় করে অনেকখানি বমি করে ফেলল রমেন বিছানাতে। ওর কপালে গালে অনেকগুলো কালশিরার দাগ, জামাকাপড় ধুলোমাখা।

রমেন ঘোরের মধ্যে একটি অশ্লীল ইংরিজি গালি দিল।

মুখী ওর কাছে দাঁড়িয়েছিল, বললাম বমিটা পরিষ্কার করে ফেলতে। সুশান্ত চলে গেল, একটু পরেই একটা লাইমজুস কর্ডিয়ালের বোতল নিয়ে ফিরে এল, বলল, জলের সঙ্গে মিশিয়ে খাইয়ে দিন ওঁকে।

সেন মাথা নীচু করে দাঁড়িয়েছিল। ওকে শুধোলাম, কী হয়েছিল?

কোনো উত্তর দিল না।

আমি দাঁতে দাঁতে চেপে বললাম, কী হয়েছিল বল?

সেন একবার মুখ তুলে সুশান্তর দিকে তাকাল।

আমি বললাম, এসো পাশের ঘরে এসো, ওঁর কাছে কিছু লুকোবার দরকার নেই, তুমি বলো।

আমরা এসে বসবার ঘরে বসলাম।

সেন বসল না, দাঁড়িয়েই রইল, মেঝের দিকে তাকিয়ে বলল, বিকেল থেকে রাম খাচ্ছিল রমেনদা, তখনই শরীর খারাপ হয়েছিল, কিন্তু কথা শুনল না, আমি বারণ করাতে আমাকে ঘুষি মারল—বলে হাত দিয়ে ওর কপাল দেখাল, দেখলাম ওর কপালেও কালশিরা পড়ে গেছে।

তারপর বলল, আমার কথা না শুনে আদিবাসী কুলিদের সঙ্গে ওদের বস্তিতে চলে গেল। ওখানে গিয়ে আবার মহুয়া খেল। খাওয়ার পর বুধিয়া বলে একটা রেজা কুলিকে রমেনদা অসম্মান করাতে বস্তির আদিবাসীরা রমেনদাকে ভীষণ মারতে লাগল। আমাকেও মার খেতে হল ওঁর সঙ্গে। ওরা বোধ হয় মারতে মারতে মেরেই ফেলত যদি না ভড়সাহেব খবর পেয়ে কারখানার দারোয়ানদের নিয়ে দৌড়ে না আসতেন।

—ভড়সাহেব কে?

—ভড়সাহেব আমাদের ওয়ার্কস ম্যানেজার। ওঁর স্ত্রী তো আজ সকালেই আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন ওঁর, মনে নেই বউদি? আপনার বান্ধবীর স্বামী।

বললাম, মনে আছে। শেফালির স্বামী।

সুশান্ত এতক্ষণ সোফার কোনায় মুখ নীচু করে বসেছিল। উঠে পড়ে ও আমাদের শোবার ঘরে রমেনের কাছে গেল। গিয়ে কী করল জানি না। মুখী ঘরেই ছিল।

সেন তখনও দাঁড়িয়েছিল। বললাম, বোসো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

আমি চুপ করে বসে রইলাম। শোবার ঘরে আহত মত্ত স্বামী, বাইরের ঘরে আমি, আজ দুপুরেই যে আমাকে অপমান করেছে তার সঙ্গে বসে আমার স্বামীর সম্মানের উপাখ্যান শুনছি তারই মুখে। শুনছিই শুধু; আমার করার তো কিছুই নেই।

অনেকক্ষণ পর হঠাৎ সেন নিজের থেকেই বলল, নীচু গলায়, বউদি আমাকে ক্ষমা করেছেন তো?

আমি মুখ তুলে তাকালাম। দেখলাম সেন তক্ষুনি মুখ নামিয়ে নিল।

সেন আবার বলল, বউদি এখন আপনার মনের অবস্থা কীরকম অনুমান করতে পারছি, এখন ওসব প্রসঙ্গ আলোচনা করব না। পরে সময়মতো কখনো আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে আসব।

তারপরেই হঠাৎ বলে উঠল, আমি ভীষণ কুৎসিত না বউদি? যেমন চেহারা, তেমন স্বভাব। তাই না?

আমি কোনো জবাব দিলাম না। সেনকে বললাম, রমেন হঠাৎ এই গরমে রাম খেতে আরম্ভ করল কেন? তুমিও কি খাচ্ছিলে নাকি?

—আজ যে কারখানার লেবারদের সবাইকে সন্ধের সময় রাম খাওয়ানো হয়েছে। সন্ধের পর নাচও হয়েছিল। রেজা কুলিরা সকলে নাচ-গান করল।

—ওঃ। বললাম, আমি। তারপর শুধোলাম, তুমি খাওনি সেন?

সেন বলল, আমি তো ওসব খাই না বউদি।

কথাটা বিশ্বাস হল না আমার, বললাম, সেকি? ভারী আশ্চর্যের কথা তো? একা থাকো, কারখানায় কাজ করো, এত স্বাধীনতা, এত রোজগার; আর ড্রিঙ্ক করো না? আজকাল এসব কথা ভাবলেও অবাক লাগে যে!

সেন অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল।

আমার কথায় যে বিদ্রূপ ও শ্লেষের ঝাঁঝ ছিল, তা বোধহয় হজম করছিল ও, হজম করতে সময় লাগল, তারপর সেন এক সময় মুখ তুলে বলল, করি না বউদি। সত্যিই করি না, কারণ এর মধ্যে বাহাদুরি করার মতো কিছু আছে বলে মনে হয় না আমার। তাছাড়া আমার মাইনেতে কলকাতায় আমাদের সংসার চলে। আমার বিধবা মা ও আমার ছোট দু ভাইবোন আমার মুখ চেয়ে সারামাস বসে থাকেন। যা রোজগার করি তার চেয়ে বেশি রোজগার করলে, নিজের খুশিমতো খরচ করার মতো পয়সা থাকলে কী করতাম জানি না, তবে এখন এসব করতে গেলে চুরি করতে হয়। চুরি করতে পারি না বলেই, হয়তো পারি না।

সেনের গলার স্বরে কোনোরকম ঔদ্ধত্য বা বাহাদুরি ছিল না, বরং বিনয় ছিল।

ওর কথা শেষ হতেই ওর দিকে তাকালাম। স্ট্যান্ড লাইট ছাড়াও উপরের বড় বাতিটাও জ্বলছিল, দেখলাম সেনের কালো কুৎসিত মুখটার মধ্যে ওর চোখ দুটো অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং সরল। কেন জানি না সেই মুহূর্তে আমার মনে হল, হয়তো সুশান্ত একটু আগে যা বলছিল, তা ঠিক।

সেন বলল, বউদি, রমেনদা এরকম করলে কিন্তু রমেনদার চাকরি বেশিদিন থাকবে না। এ বাজারে

চাকরি গেলে নতুন চাকরি পাওয়া কিন্তু সত্যিই মুশকিল। তাছাড়া জানেনই তো, আমাদের মতো মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়র এখন ছড়াছড়ি যাচ্ছে দেশে। আপনি রমেনদাকে একটু বুঝিয়ে বলবেন।

আমি বললাম, ব্যাপারটা আমার নয়, আর যাকে বলব সে-ও শিশু নয়, তাই এসব কথা আমাকে বোলো না।

একটু পরে সেন আবার বলল, আমি কি রাতে থাকব? আমার কি দরকার হবে?

—না। না। কোনো দরকার নেই। কীসের দরকার?

আমার বলার ধরনে সেন লজ্জা পেল, আমিও ওরকমভাবে কথাটা বলে ফেলে লজ্জিত হলাম।

আজ দুপুরের ঘটনাটা মন থেকে চট করে মুছে ফেলা সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে।

সুশান্ত যে ওঘরে এতক্ষণ ধরে কী করছে, ও-ই জানে।

সেন উঠে পড়ল হঠাৎ, বলল, রমেনদাকে বলে আসি।

ও ঘর থেকে ফিরে এসে সেন বলল, চলি, রমেনদা ঘুমোচ্ছেন; কাল সকালে এসে খোঁজ নিয়ে যাব।

সিঁড়ির কাছে এসে মুখ ঘুরিয়ে ও আবার বলল, চলি বউদি!

আমি বললাম, দাঁড়াও—বলে আরও কাছে গিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বললাম, তুমি দুপুরে ওরকম করলে কেন?

সেন লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে গেল।

ঘরের মধ্যেও এতক্ষণ যে বসেছিল আলোয়, তাতেই মনে হচ্ছিল এত আলোয় বসে থাকতে বুঝি ওর খুব অসুবিধা হচ্ছে, ও যেন কোনো অন্ধকার কোণের আশ্রয় খুঁজছে। এমন রাস্তায় দাঁড়িয়ে ও যেন একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে গেল। তারপর আস্তে আস্তে মুখ নীচু করে বলল, আমি জানি না বউদি। তখন থেকে আমিও কেবলি সে কথাই ভাবছি; কেন এমন করলাম? সত্যিই জানি না।

—শোনো! আমি ডাকলাম ওকে।

ও আমার দিকে চোখ তুলে তাকাল।

বললাম, তুমি আর কোনোদিন আমাদের বাড়ি এসো না; কোনোদিনও না।

বলেই, সম্পূর্ণ বিনা কারণে শব্দ করে দরজাটাকে ওর মুখের ওপর বন্ধ করে দিলাম।

সেনের মোটর সাইকেল ছিল না; ও রমেনকে নিয়ে ট্যাক্সি করে এসেছিল। ও নিশ্চয়ই হেঁটে হেঁটে কালীবাড়ির ট্যাক্সি-স্ট্যান্ডের দিকে যাচ্ছিল। আমি জানি ও মাটির সঙ্গে মিশে কোনো পোকার মতো হীনমন্য পদক্ষেপে হেঁটে যাচ্ছিল, ওকে আমি যদি শংকর মাছের চাবুক দিয়ে চাবকাতাম তবেও বোধহয় ও এত আঘাত পেত না।

কিন্তু আমার কিছু করার নেই। অন্তত এই মুহূর্তে আমার মনে হয় যে আমার কিছুই করার নেই ওর জন্যে।

ওঘরে গিয়ে দেখি, সুশান্ত মুখীকে দিয়ে বিছানার চাদর বদলেছে। ও ওডিকোলনের পটি লাগিয়েছে রমেনের মাথায়, বড় আলোটা নিভিয়ে দিয়ে ছোটো টেবল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে দিয়েছে। সুশান্ত রমেনের মাথার কাছে বসে ওর গায়ে হাত বুলোচ্ছে; রমেন ঘুমিয়ে পড়েছে।

আমি গিয়ে রমেনের পাশে দাঁড়ালাম। সুশান্ত দাঁড়াল, তারপর বসে পড়ে বলল, আমি এখানে বসছি; আপনি খেয়ে আসুন।

—আমার খেতে ইচ্ছা করছে না। আমি বললাম।

সুশান্ত দৃঢ় গলায় বলল, ইচ্ছে না করলেও, অনেক কিছু করতে হয়। যান, খেয়ে আসুন।

সুশান্তর গলার স্বর শুনে আমার অবাক লাগল, ও যেন আমাকে আদেশ করছে। আমার ও কে যে ও আমাকে আদেশ করে?

আমি বললাম, আমি খাব না।

আপনি খাবেন। যান বলছি, খেয়ে নিন। জোর দিয়ে বলল সুশান্ত।

তারপর বলল, আপনি বড় জেদী। এই জেদের জন্যে জীবনে আপনি অনেক কষ্ট পাবেন। মেয়েদের এত জেদ ভালো নয়।

আমার রাগ হয়ে গেল। বললাম, আপনি পিসিমার মতো কথা বলবেন না তো। আমি কষ্ট পাচ্ছি, কী পাব তা আমার ব্যাপার। আপনার মাথা ঘামাতে হবে না! আপনি বাড়ি যান।

সুশান্ত আমার মুখের দিকে চাইল, তারপর বলল, বেশ। আমি যাচ্ছি। রাতে কোনো রকম দরকার হলে আমাকে ডাকবেন।

মুখ ফিরিয়ে আমি বললাম, ডাকব; যদি দরকার হয়। হয়তো দরকার হবে না।

আমার দিকে বিস্ময়ের চোখে তাকাল সুশান্ত, তারপর বলল, চলি নমস্কার।

আমার অবাক লাগল। ও কোনোদিনও আমার সঙ্গে এমন ফর্ম্যালিটি করেনি। আমার ধারণা ছিল এসব সামাজিক ফর্ম্যালিটি ওর আসে না। জানি না, কেন আজ ও হঠাৎ এমন ফর্মাল হয়ে উঠল।

আমি উঠে ওঘর অবধি গেলাম না।

মুখী গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

মুখীকে বললাম, খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়তে।

তারপর একটা বই নিয়ে এসে ইজিচেয়ারে শুলাম। কেন জানি না, রমেনের পাশে শুতে আমার ঘেন্না করছিল। আমার প্রেমিক, আমার আদরের রমেন, আমার অবলম্বন, আমার ভবিষ্যৎ, আমার সোনা, আমার সর্বস্ব; আমার স্বামীর পাশে শুতে আমার ঘেন্না করছিল।

মাঝরাতে হঠাৎ কতকগুলো কুকুরের চিৎকার শুনে আমার ঘুম ভেঙে গেল।

ইজিচেয়ারে শুয়ে থাকায় কাঁধে একটা ব্যথা হয়েছিল। উঠে একবার রমেনের কাছে গেলাম। ও তেমনি ঘুমোচ্ছে। Sleeping it off—খোঁচা খোঁচা দাড়ি; নাকের ফুটো থেকে কয়েকটা লোম বেরিয়ে আছে, দেখলে আমার ঘেন্না লাগে, চোখে-মুখে মারের দাগ, মুখে এখনও ভক্ ভক্ করছে গন্ধ, চুলগুলো লেপ্‌টে আছে কপালে। আমার বয় ফ্রেন্ড, আমার ইহকাল-পরকালের ভরসা, আমার সম্মান ও প্রেমের পাত্র, আমার প্রিয় রমেন, মাতাল হয়ে শুয়ে আছে। ঘুমিয়ে আছে।

জানালার কাছে সরে গেলাম।

ইউক্যালিপটাস গাছের পাতায় পাতায় জ্যোৎস্না ঠিকরে যাচ্ছে। টিস্‌কোর কারখানার ব্লোয়িং হচ্ছে; আকাশের চাঁদের রুপোকে ম্লান করে তার রক্তিমাভা থৈ থৈ করছে। কী একটা রাতচরা পাখি ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল জানালার পাশ দিয়ে।

চারদিক নিস্তব্ধ। প্রত্যেক বাংলোয় প্রত্যেকে শান্তির ঘুম ঘুমোচ্ছে। আমি একা মাঝরাতের জানলায় দাঁড়িয়ে ভাবছি আমি কী করব। বাবার শরীরটা ভালো না; বাবাকে বড় দেখতে ইচ্ছে করছে।

এতক্ষণ আমি একটা দারুণ মিষ্টি স্বপ্ন দেখছিলাম। ভাবছিলাম জীবনে সবকিছু করারই একটা রকম আছে, রুচি আছে। এই রুচিভেদই একজন মানুষের সঙ্গে অন্য একজন মানুষের পৃথকীকরণের উপায়।

স্বপ্ন দেখেছিলাম, আমার স্বামী কারখানা থেকে ফিরল রাত করে। আমি বসবার ঘরে এসে

উল বুনছিলাম। আমরা ঠিক করেছি, আগামী মাসে আমি কনসিভ করব। স্বামীর বিশেষ ইচ্ছা ছিল না, ও বলেছিল, চাকরিতে আর একটু উন্নতি হোক, একটা গাড়ি কিনি; তারপর।

আমি বলেছিলাম যে না, তা নয়। সময়মতো ছেলে-মেয়ে না হলে তাদের মানুষ করা মুশকিল। ও রাজি হয়েছিল। তাই এখন থেকে আমি আগন্তুকের জন্যে তৈরি হচ্ছি। আমার ইচ্ছা দারুণ একটা দুরন্ত ছেলে হবে, ঘরময় হুটোপাটি করে বেড়াবে, এটা ভাঙবে, ওটা ভাঙবে, চেঁচামেচি করবে; ওর মতো লম্বা-চওড়া হ্যান্ডসাম হবে।

ছেলেরা বেশি ফর্সা হলে ভালো লাগে না, গায়ের রঙ ওর মতো হবে ; মুখটা যেন আমার মতো হয়।

ও এসে জামাকাপড় খুলেই সোজা বাথরুমে গেল। ওর পায়জামা-পাঞ্জাবি দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। পায়জামা-পাঞ্জাবি দিয়ে বাথরুমের দরজায় টোকা দিতেই, দরজা খুলেই সাবান-মাখা মুখে ও আমায় আদর করে দিল।

অসভ্য কোথাকার! বলে, আমি ওগুলো এগিয়ে দিয়ে পালিয়ে এলাম।

চান-টান করে ও এসে বসবার ঘরে বসল।

পায়জামা-পাঞ্জাবি পরলে ওকে খুব ভালো দেখি আমি। ও বলল, বুঝলে নীরু, আজ একটা ভালো খবর আছে।

—কী খবর? বললাম আমি, উলের কাঁটা থেকে চোখ না তুলে।

—চোখ তোলো, না হলে বলব না।

—বলো না বাবা, বলে আমি তাকালাম ওর দিকে।

—তোমার শোওয়ার ঘরে এয়ার-কন্ডিশনার লাগছে পরের সপ্তাহে।

—আমার ভীষণ আনন্দ হল, কিন্তু মুখে তা প্রকাশ না করে বললাম, বাজে কথা বোলো না।

—বাজে কথা নয় ম্যাডাম। আজকে এম.ডি. ডেকেছিলেন, বললেন, আমার কাজে উনি খুবই সন্তুষ্ট। এই গরমে মিসেস ঘোষের খুবই অসুবিধা হয় নিশ্চয়ই, তাছাড়া আমি চাই যে আমাদের কোম্পানির সকলে ভালোভাবে থাকুন। তাই আমি বলে দিয়েছি, মেনটেনেন্স ডিপার্টমেন্টকে যে, পরের সপ্তাহে আপনার বেডরুমে একটা এয়ার-কন্ডিশনার লাগিয়ে দিয়ে আসবে।

—সত্যি! আমি বললাম।

—সত্যি ম্যাডাম, সত্যি। আমাদের কোম্পানিটা খুব ভালো। এম.ডি.-র মতো তো লোক হয় না। আমাদের কোম্পানির প্রতিটি লেবার খুশি। ইউনিয়ন-ফিউনিয়নের বালাই নেই—ছ'মাসের বোনাস পায় প্রত্যেকে, তাছাড়া কারও কোনো অসুবিধাই নেই।

—বাঃ! খুব ভালো।

—খুশি তো, তুমি?

আমি হেসে বললাম, খু-ব-উব। তারপর বললাম, তুমি দেখো, তোমার আরও উন্নতি হবে। তুমি কত ভালো তা তুমি জানো না। তাছাড়া তোমার জন্যে আমি যে সবসময় কত বলি!

—কাকে বল? আমার স্বামী দুষ্টুমির হাসি হেসে বলল।

—যাকে বলার, সেই একজনকে। তুমি তো বিশ্বাস করো না; আমি করি। তুমি বড় হও গো জীবনে; শুধু টাকায় নয়, সব দিক দিয়ে, তোমার জন্যে যেন আমি গর্বিত হতে পারি। আমার বাড়ির আত্মীয়স্বজন একদিন কত কী বলেছিল, আমি ঠকেছি, বলেছিল নিজের পায়ে আমি নিজে কুড়ুল মারছি। আমি একদিন দেখিয়ে দেব যে আমি যা করেছিলাম, তা ঠিক; তোমরা ভুল। তোমাকে অনেক বড় হতে হবে। হবেও তুমি; তুমি দেখো। একদিন লোকে বলবে, এরকম ব্রিলিয়ান্ট ইঞ্জিনিয়র

দেশে নেই, এরকম ভালো লোক হয় না; এরকম সৎ লোক হয় না।

ও হাসল, বলল, তুমি কিন্তু যতখানি আছ, তার চেয়ে বেশি ভালো বা বেশি সুন্দরী হয়ো না।

আমি হাসলাম, বললাম, কেন?

—বাঃ তাহলে তোমাকে হারাবার ভয় থাকবে সবসময়। এমনিতেই তোমাকে আমার এ ঘরে মানায় না; আমার জীবনে তুমি হলে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। যা হয়েছে এবং যা হবে সবই তো তোমার জন্যে, তোমার শুভকামনায়, বলো, কী চাকরি করতাম কলকাতায়, আর এখন কী করছি।

—জানো, আমার বিশ্বাস, ভালো করলে ভালো হয়। কখনো ফাঁকি দিও না, কাজে ফাঁকি দিও না, অন্যকেও না, দেখবে, ভালো একদিন হবেই। সফলতা বা বিফলতা; সব ব্যাপারেই তার পেছনে কারণ থাকেই।

ও হাসল, বলল, মেয়েদের পড়িয়ে পড়িয়ে তোমার একেবারে দিদিমণি দিদিমণি ভাব হয়ে গেছে। এমন চোখ বড় বড় করে বলো না।

—আমি হেসে বললাম, ইয়ার্কি কোরো না।

একটু পরে ও বলল, আজ বড় খাটুনি গেছে। গরমটাও কমবে না। জুন মাসের মাঝামাঝি, অথচ বৃষ্টির দেখা নেই।

—সত্যি, তাছাড়া তোমাদের কারখানায় যা গরম, শরীরের রক্ত শুষে নেয়। একটা বিয়ার খাও না। সেদিন দাশগুপ্ত সাহেব বলেছিলেন যে কারখানা থেকে আসার পর গরমের দিনে একটা করে বিয়ার খাওয়া খুব ভালো।

—তা ভালো, কিন্তু রোজ বিয়ার খেতে গেলে কত টাকা লাগে? এখনও অত সব অ্যাফোর্ড করতে পারি না। তাছাড়া তুমি আবার গুণ্ডা ছেলের মা হবে—টাকা-পয়সা জমাতে হবে তো?

—আহা? অসভ্য! মাঝে মাঝে খেও। রোজ খেতে হবে না। তাছাড়া আমি কী রোজগার করি না? আমিই তোমাকে খাওয়াব। বলে, মুখীকে দিয়ে তার বরের হাতে চিঠি দিয়ে টাকা দিয়ে পাঠালাম। সে সাইকেল নিয়ে গিয়ে ওর জন্য কোল্ড-বিয়ার নিয়ে এল।

আমার সামনে বসে, গল্প করতে করতে বিয়ার শেষ করে উঠল ও।

খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা শুতে গেলাম।

ওর ভীষণ শখ, আমি যেন নাইটি পরে শুই। আমার ভালো লাগে না। কেন, জানি না। বিয়ের আগে তো কখনো পারিনি। আসার আগে নিউ-মার্কেট থেকে একটা নাইলনের নাইটি কিনে নিয়ে এসেছিল ও। ও বলে নাইটির উপর দিয়ে আমার গা ছুঁতে ওর নাকি দারুণ লাগে, ওর নাকি মনে হয় ও অ্যারাবিয়ান নাইটসের যুগে চলে গেছে।

ও এঞ্জিনিয়র হলে কী হয়, ও খুব রোমান্টিক। ও জানে মেয়েদের কী করে ভালোবাসতে হয়, কী করে আদর করতে হয়। ওর চরিত্রে কোথাও কোনো স্থূলতা নেই। আমার সঙ্গে ওর ব্যবহার আমার কাছে আলি আকবরের বাজনার মতো মনে হয়। ওর সবল হাতে মাথা রেখে শুয়ে থাকতে আমার দারুণ ভালো লাগে। জানতে ভালো লাগে যে, আমি কত বুদ্ধিমতী, নিজের মতানুযায়ী আমি কী দারুণ একজনকে বিয়ে করেছি ; জীবনের সঙ্গী নির্বাচনে আমার ভুল হয়নি কোনো। ওর ব্যবহারে, ওর চেহারায়, ওর বিনয়ে, আমাদের পরিবারের সকলে মুগ্ধ। ওর একমাত্র খুঁত ছিল এই যে, ওর প্রথম স্ত্রী ওকে ডিভোর্স করেছে। ওকে দেখে আমার এই বিশ্বাস জন্মেছে যে, সে নিশ্চয়ই কোনো হতভাগিনী। যে মেয়ে এমন ছেলের সঙ্গে ঘর করতে না পারে, সে কারও ঘর করারই যোগ্য নয়।

কতক্ষণ জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না। ভোর হয়ে এল। মালহোত্রা সাহেবের বাড়ির মুরগিগুলো ডাকতে আরম্ভ করল। গুপ্ত সাহেবের বাড়ির গোয়ালা চেঁয়াক্ চোঁয়াক্ আওয়াজ করে গোরু দুইতে আরম্ভ করল।

আমি রমেনের কাছে এলাম।

ডান পা-টা বুকের কাছে গুটিয়ে শুয়ে আছে রমেন।

পায়জামাটা হাঁটুর অনেকখানি উপরে উঠে গেছে। অসভ্যর মতো দেখাচ্ছে।

ওর দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম যে, আমি অনেকদিন ভাবার বা বোঝার চেষ্টা করেছি ও কেন এমন করে।

অনেক সময় অনেক পুরুষমানুষ এমন করে যাদের কোনো গভীর দুঃখ আছে, যে দুঃখকে তারা ভোলার জন্যে এমন করে নিজেদের নষ্ট করে। কারও বা কোনো অভিযোগ থাকে জীবন সম্বন্ধে—যে অভিযোগের কোনো প্রতিকার নেই। সমস্ত দিক থেকে আমি রমেনকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি, যাতে ওঁকে খারাপ ভাবার আগে ওর প্রতি আমি যথেষ্ট সুবিচার করি। আমার কাছে এর কোনো ব্যাখ্যা নেই।

মনে হয় যারা দাগী চোর, তারা বোধহয় কিছুদিন বাদে কোনো কারণ ছাড়াই চুরি করে, চুরি করার আনন্দেও চুরি করে, খুনী যেমন রক্তের নেশায় খুন করে, রমেনও বোধহয় তেমনি কোনো অজ্ঞাত কারণেই এরকম করে।

বিয়ের আগে ও আমার কাছে যে রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল, যে সব ভূরিভূরি মিথ্যাকথা বলে আমাকে ভুলিয়েছিল, তা বোধহয় শুধুই আমার শরীর এবং আমার পরিবারের সঙ্গে জড়িত হয়ে নিজের নামগোত্রহীন পরিচয়কে উন্নত করার জন্যে।

জানি না। জেনে এখন লাভও নেই কোনো। ভগবানকে সাক্ষী রেখে বলতে পারি যে, আমার দিক থেকে কোনোরকম ত্রুটি হয়নি। আমার কোনো দোষ নেই ওর খারাপ হবার জন্যে। ও কেন যে এমন ঠগীর মতো ব্যবহার করল আমার সঙ্গে তা ও-ই জানে।

আমার লজ্জা নানা কারণে। এই লোকের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার জন্যে ধার করে, কত কষ্ট স্বীকার করে বাবা ও দাদা-দিদিরা আমার জাঁকজমক করে বিয়ে দিয়েছিলেন। এ তো শুধু আমার একার সর্বনাশ নয়; আমার জেদের জন্যে কতজন নিরপরাধ লোকের কত ক্ষতি। এই লজ্জা আমার রাখার জায়গা নেই। এ অপমান আমার একারই সইতে হবে।

যে আশ্রয় ত্যাগ করে, নিজে মাথা উঁচু করে একদিন রমেনের হাত ধরে সানাইয়ের সুরের মধ্যে, ফুলের গন্ধের মধ্যে, অগণিত বন্ধুবান্ধব ও দাদা-দিদিদের অশ্রুসিক্ত চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম, সেই আশ্রয়ে ফিরে গিয়ে মাথা নিচু করে আমি কোনোদিনও বলতে পারব না যে, আমারই ভুল হয়েছিল। তোমরাই ঠিক।

মাঝে মাঝেই আমার বিয়ের দিনটার কথা মনে পড়ে। আমার জীবনে এত সুন্দর, এত বড়, অথচ এতখানি ব্যর্থ আর কোনো উৎসব আর কোনোদিনও উদ্‌যাপিত হবে না।

মনে মনে আমি আজকাল বাবার মৃত্যুকামনা করি। বাবা বেঁচে থাকতে যেন বাবা কোনোদিনও জানতে না পান যে তাঁর সবচেয়ে আদরের মেয়ের আজ এই অবস্থা।

রমেন চোখ খুলল।

বললাম, কেমন আছ?

রমেন হাসল। অনুশোচনার হাসি নয়। বাহাদুরির হাসিও নয়। জেমস্ বন্ডের ছবির ভিলেনরা যেমন হাসে তেমন হাসি। এ হাসির কোনো মানে হয় না।

ও বলল, মুখী কোথায়? চা দিতে বলো।

মুখীকে চা করতে বললাম। আজ আমার স্কুল আছে, চা খেয়ে চান করতে যাব।

তারপর ঘরে এসে বললাম, চান করবে না? কারখানায় যাবে না আজ?

—তোমার অত মাথাব্যথা কীসের? আমাকে তো তাড়ালেই তুমি খুশি হও।

—মানে?

—কোনো মানে নেই।

—বললাম, সেন বলছিল, তোমাদের ওয়ার্কস ম্যানেজার না গিয়ে পড়লে নাকি তোমাকে মেরেই ফেলত।

—মেরে ফেলা কী এতই সহজ? আমি হচ্ছি অক্ষয়; অমর। তবে তোমার বান্ধবীর বরই সময়মতো বাঁচিয়ে দিয়েছে। সে কথা সত্যি।

আমার হঠাৎ শেফালির কথা মনে পড়ে গেল। শেফালির বর বাড়ি ফিরে নিশ্চয়ই শেফালিকে সব কথা বলেছে।

আমি মুখ নীচু করে রইলাম। তারপর বললাম, এরকম করলে চাকরিটা কি থাকবে?

—না থাকলে, থাকবে না। আমার কোয়ালিফিকেশান আছে, আমার মতো স্মার্ট সেলস্‌ম্যান পাবে ওরা? চাকরি গেলে আবার অন্য চাকরি নেব। আমাকে তো তুমি মনে করো যে আমি একটা কিছুই না। আমার এলেম আর বুঝল কে?

বললাম, আর কেউ না বুঝুক, আমি অন্তত বুঝেছি।

রমেন আমার দিকে আগুনের চোখে তাকাল। তারপর বলল, কাল পাড়ার লোক জড়ো করেছিলে কেন? ঐ সুশান্ত বোসকে সব ব্যাপারে ডাকার দরকার কী? আমি মার খেয়েছি, কী নেশা করেছি সেটা আমার তোমার ঘরোয়া ব্যাপার—তাতে বাইরের লোককে ডাকার দরকার ছিল কি কোনো?

—ব্যাপারটা আর ঘরোয়া রইল কোথায়? বললাম আমি।

—রাখা উচিত ছিল।

—সেটা যাতে থাকে, তা ভবিষ্যতে তুমি মনে রেখো। এরকম ব্যাপার যাতে না ঘটে, তা দেখো।

আর কথা না বলে আমি চান করতে গেলাম।

মুখীকে বললাম, আমি খাব না, দাদাবাবু খাবেন কী না জিজ্ঞেস করে রান্না করিস। কারখানায় না গেলে হয়তো খাবেন।

আমার কোথাও যাবার ছিল না, স্কুলের তখনও অনেক দেরি, তবু সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ সকালের পথে একা একা হাঁটা দরকার। রাতে ঘুম হয়নি, মাথাটা বড় ধরে আছে। কাল সারাদিন খাইনি।

বাড়ি ছেড়ে এগিয়েছি, পথে ডাকপিয়নের সঙ্গে দেখা। বলল, চিঠি আছে। চিঠিটা রমেনের নামে। হাতের লেখাটা চেনা লাগতে নিয়ে নিলাম। দেখলাম মেজকাকার লেখা চিঠি।

মেজকাকা হঠাৎ রমেনকে কেন চিঠি লিখতে গেলেন ভেবে পেলাম না। চিঠিটা হাঁটতে হাঁটতে খুললাম। ভীষণ কৌতূহল হল।

ভবানীপুর
কলিকাতা

কল্যাণীয় বাবা রমেন,

আশাকরি তোমরা দুজনে ভালো আছো। জামশেদপুরে আসার সময় তুমি ব্যবসা করবে বলে যে আড়াই হাজার টাকা ধার হিসেবে নিয়েছিলে তা আজও শোধ দাওনি। তুমি বলেছিলে যে তোমার চাকরির রোজগারের উপর আরও কিছু রোজগার হলে নীরু খুশি হবে। নীরু আমাদের সকলেরই স্নেহের পাত্র। তার সুখের জন্যে তোমাকে ঐ টাকা তখন জোগাড় করে দিই। কথা ছিল, তুমি তিনমাসের পরই মাসে মাসে পাঁচশো করে দিয়ে টাকাটা শোধ দিয়ে দেবে। কোনোরকম সুদ দিতে হবে না, তাও তোমাকে বলেছিলাম।

আজ দেড়বছর হয়ে গেল, এ পর্যন্ত তুমি টাকাটা পাঠালে না, এবং আমাকে এ সম্বন্ধে কিছু জানালেও না। তোমার সঙ্গে আমার যা সম্পর্ক, তাতে টাকার তাগাদা করে চিঠি লেখা আমার পক্ষে অত্যন্ত লজ্জাকর। কিন্তু আমার ছোটো মেয়ে মণির বিয়ে প্রায় ঠিক হয়ে গেছে। টাকাটা আমার অত্যন্ত দরকার। বুঝতেই পারছ, খুব দরকার না থাকলে এ চিঠি তোমাকে লিখতাম না।

সেরকম অবস্থা থাকলে টাকাটা তোমাকে এমনিই দিয়ে দিতে পারলেই আমি সুখী হতাম, কিন্তু সেরকম অবস্থা আমার নয়; তা তুমি জানো।

এ চিঠি অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে লিখছি। যদি আমার নীরু মা এ কথা জানে, তবে সে বড় লজ্জা পাবে। আমি তাকে ভালো করেই জানি—তার মতো আত্মসম্মানজ্ঞানী মেয়ে বড় একটা দেখিনি। আমার অনুরোধ, অন্তত তার সম্মানার্থে এ টাকাটা তুমি পাঠাবার চেষ্টা করবে জুলাই মাসের মধ্যে। ইতি—

আশীর্বাদক
হরিচরণ চৌধুরি।

শ্রীরমেন ঘোষ, কল্যাণীয়েষু
কদমা, জামশেদপুর

আমার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করল।

মনে হল পা বুঝি আর চলবে না।

কী করব ভেবে পেলাম না। স্কুলে যাওয়া আমার হল না। এ অবস্থায়, এমন মন নিয়ে কিছু করা চলে না। মেয়েদের পড়ানোর মতো মনের অবস্থা আমার নেই। এখনও স্কুল খোলেনি, খুললে কোথাও থেকে ফোন করে দেব মিসেস প্রধানকে, আজ ক্যাজুয়াল লিভ নেব।

মনস্থ করলাম বাড়িই যাব। কোনোদিন রমেনের সঙ্গে ঝগড়া বলতে যা বোঝায় তা করিনি আমি, আমার খুব গলা ছেড়ে আজ ঝগড়া করতে ইচ্ছে হল। একদিন আমার মনে হত যে যতটুকু কষ্ট বা অপমান তা আমার একারই; আমার জন্যে যে আমার পরিবারের অন্য কেউ এমনভাবে জড়িয়ে পড়বে তা ভাবতে পারিনি।

মেজকাকার অবস্থা কী আমি জানি। তাঁর একমাত্র অপবাধ যে উনি আমাকে ভীষণ ভালোবাসেন। সে কথা রমেন জানত। রমেন যদি মেজকাকার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে আসতে পারে, তাহলে হয়তো অন্য অনেকের কাছ থেকেই নিয়েছে। যা আমি গোপন করে রাখতে চাইছিলাম এতদিন, আমার সম্মানের জন্যে, তা বুঝি অনেক আগেই সকলের কাছে ফাঁস হয়ে গেছে। সকলে জেনে গেছে আমি কতবড় একজন জোচ্চোরকে বিয়ে করেছি। সত্যি সত্যি, আমার এখন কী করণীয় তা আমি জানি না।

বাড়ির পথে আসতে আসতে সুশান্তর বাড়ির সামনে এসে কালকের মতো থমকে দাঁড়ালাম।

সুশান্ত অফিসে কাজ করে, কারখানায় নয়; তাই সকাল সাড়ে ন'টার আগে ও বেরোয় না বাড়ি থেকে।

ময়ূর এসে দরজা খুলল, বলল, দাদাবাবু এখনও ঘুম থেকে ওঠেননি।

বললাম, সে কী? দাদাবাবুকে তোলো, বলো আমি এসেছি।

ময়ূর বলল, বউদি, আমি একটু বাজারে যাচ্ছি, একদৌড়ে যাব আর আসব। আপনি গিয়ে তুলে দিন দাদাবাবুকে। দরজা খোলা আছে। কাল দাদাবাবু খাননি রাতে, শোওয়ার ঘরেও যাননি। ঐ ঘরেই বইপত্রের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছেন বই পড়তে-পড়তে।

আমি যখন দরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম সে ঘরে, সুশান্ত তখনও বাচ্চা ছেলের মতো সতরঞ্জির উপর শুয়েছিল।

আমি ডাকতে পারলাম না, বুঝলাম না, কী বলে ডাকব ওকে।

ঘুমের মধ্যে ওকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। ও নিজেই একবার পাশ ফিরল, তারপর হঠাৎ উঠে বসল। উঠে বসেই মাথার পাশে রাখা হাতঘড়িটা তুলে নিয়ে দেখে বলল, ঈস্‌স্‌...।

বলেই, যেই দরজার দিকে চাইল, দেখতে পেল আমাকে।

আমাকে ঐ সকালে দেখে অবাক হল সুশান্ত। বলল, রমেনবাবু ভালো আছেন তো?

আমি বললাম, ভালোই আছেন।

—তবে?

—আপনি ভালো আছেন কী না তাই দেখতে এলাম।

—ও। বলল সুশান্ত। পরক্ষণেই বলল, আপনি বসবার ঘরে বসুন, আমি মুখ-চোখ ধুয়ে আসি।

আজ বসবার ঘরে বসতে বলায় আমার মনের কোণে কোথায় যেন কী একটা বাজল। কালকে যে আপনজনের মতো আদর করে আমাকে ভিতরের ঘরে বসিয়েছিল, আজ সেই-ই আমাকে বাইরের ঘরে গিয়ে বসতে বলল।

একটু পরে সুশান্ত ট্রেতে বসিয়ে চায়ের পট, দুধ, চিনি এবং কয়েকখানা ক্রিমক্র্যাকার বিস্কিট নিয়ে এল। বলল, চা খান। আমার অফিসের আজ ভীষণ দেরি হয়ে যাবে। কাল পড়তে পড়তে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল।

বললাম, কাল খাননি কেন?

সুশান্ত চায়ে চিনি মেশাতে মেশাতে বলল, আপনাকে কে বলল? ময়ূর বুঝি?

—হ্যাঁ।

—এমনিই খাইনি, কোনো কারণ নেই।

বলেই মুখ ঘুরিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে রইল।

অনেকক্ষণ সুশান্ত কোনো কথা বলল না।

কী বলব, আমিও ভেবে পেলাম না।

বলতে ইচ্ছে করল আমার, সুশান্ত, তুমিই এখানে আমার একমাত্র বন্ধু, তোমার কাছে আমার অনেক কিছু বলার ছিল, ছিল অনেক কিছু পরামর্শ করার, তুমি ছাড়া আমার কেউই নেই যে এই মুহূর্তে আমাকে বলতে পারে, কী আমার করা উচিত। তুমি আমাকে পথ বলে দাও সুশান্ত। আমি একজন সাধারণ মেয়ে, আমি এক সাংঘাতিক ভুল করেছি জীবনে, এর চেয়ে বড় ভুল আর হয় না। তুমি আমাকে এই মুহূর্তে ফিরিয়ে দিও না, চলে যেতে বোলো না। তোমার সঙ্গে আমি খারাপ ব্যবহার করেছি, কেন করেছি তা তুমি জানো; সব জেনেও তুমি আমাকে ফিরিও না। এমন করে, আমার এই অসহায়তায় আমাকে দূরে ঠেলো না।

একটু পরে ময়ূর এল বাজারের থলে নিয়ে।

সুশান্ত আমাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বলল, তাড়াতাড়ি রান্না কর ময়ূর—আমার অফিসের দেরি হয়ে যাবে।

তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, একটা ওমলেট খান না, আরেক কাপ চায়ের সঙ্গে।

ময়ূরকে ডেকে বলল, ময়ূর তাড়াতাড়ি একটা ওমলেট ভেজে আন, আর টি-পটটা নিয়ে যা, চা নিয়ে আয় আবার।

আমি কিছু বললাম না।

আমি আজ তোমার ঘরে একটু বসে থাকতে চাই সুশান্ত, একটু ভাবতে চাই; আমি কী করব? আজ তুমি নিজের হাতে কিছু কোরো না, ওমলেট ভেজো না, তুমি আমার সামনে বসে থেকো, যাতে আমি বুঝতে পারি, জানতে পারি যে, এই পরবাসে আমার তবু একজন লোকও আছে যার কাছে আমি বিপদে যেতে পারি। একটুখন নিরুপদ্রবে শান্তিতে বাস করতে পারি।

সুশান্ত বলল, স্কুলে যাবেন না আজ?

—যাব। বললাম, আমি।

—আপনাকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে। হালকা গলায় বলল ও।

—হুঁ। আমি বললাম।

আর কিছু বলার ছিল না। ও আর কিছু জিজ্ঞেসও করল না।

আমার অফিসে আজ একটা বিশেষ কাজ আছে, ন'টার সময় বেরোতে হবে। ওমলেটটা আসুক, আর এক কাপ চা খান, তারপর আমি চান করতে যাব, কেমন? নইলে আমার দেরি হয়ে যাবে।

আমি বিব্রত হয়ে বললাম, ওমলেট, চা থাকুক, আমি চলি, নইলে আপনার দেরি হয়ে যাবে।

সুশান্ত বলল, দশ মিনিটে এমন কিছু দেরি হবে না।

আমি মুখ নিচু করে বসে রইলাম; কিছু বলা হল না।

চা ও ওমলেট এলে, আমি যেন ভিখারি এমনিভাবে যন্ত্রচালিতের মতো তাড়াতাড়ি খেলাম। চা-টা শেষ করে কাপটা নামিয়ে রাখলাম। কাপটা হাত ফসকে পড়ে যাচ্ছিল, কোনোরকমে ঠিক করে ডিশের ওপর বসালাম।

সুশান্ত তবুও চোখ তুলল না আমার দিকে; কথা বলল না; পথের দিকেই চেয়ে রইল।

একবার খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে হেডলাইনগুলোয় চোখ বোলাল, তারপর স্বগতোক্তি করল, কবে যে বৃষ্টি হবে; এভাবে বাঁচা যায় না।

তারপর একটু পরে সুশান্ত হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, বলল, কিছু মনে করবেন না। এবার আমি চান করতে যাই। তারপর নিরুত্তাপ গলায় বলল, আবার আসবেন।

এই বলে কোনোদিকে না তাকিয়ে সুশান্ত পর্দার আড়ালে চলে গেল।

আমি আমার ব্যাগটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

সুশান্তর বাড়ির বাইরে এসে পথে দাঁড়িয়ে হঠাৎ আমার মনে হল, আমার কোথাও যাবার নেই। তবু যে পথে এসেছিলাম, সে পথেই আবার পা বাড়ালাম।

কোথায় যাব? এখন আমি কোথায় যাব ভেবে পেলাম না। সোনারির দিকে হাঁটতে লাগলাম।

গলার কাছে কী একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা দলা পাকিয়ে উঠে আসতে লাগল, সে যন্ত্রণার কোনো তল নেই।

রমেনের সম্বন্ধে এই মুহূর্তে আমার ঘৃণা ছাড়া অন্য কোনো অনুভূতি নেই।

কিন্তু এই একই মুহূর্তে সুশান্তর উপর এক দারুণ অভিমানের তীব্রতা হঠাৎ আমার জীবনের

আর সমস্ত বোধকে আচ্ছন্ন করে অতিক্রম করে ফেলল। আমার মন, আমার সমস্ত অভিমানী মন বলতে লাগল, সুশান্তকে, বার বার বলতে লাগল, তুমি নিষ্ঠুর; তুমি বড় নিষ্ঠুর। আমার মন বলতে লাগল যে, সুশান্তর এই ক্ষণিকের শীতল উপেক্ষা রমেনের প্রতিদিনের চিৎকৃত উষ্ণ অসভ্যতার চেয়েও অনেক বেশি কষ্টদায়ক।

ব্যাগটা কাঁধে ফেলে সোনারির রাস্তায় আমি উদ্দেশ্যহীনের মতো হাঁটতে লাগলাম। আমার দু'চোখ জলে ঝাপসা হয়ে এল।

কতক্ষণ এরকম একা একা হাঁটতে পারব, জানি না। আমি জানি না।

আমি আধুনিকা, হতে পারি আমি শিক্ষিতা; তবুও আমি যে একজন নরম মনের চিরদিনের মেয়ে। কোনো পুরুষের হাতের অস্বস্তির উষ্ণ তালুতে হাত না রেখে যে আমরা হাঁটতে পারি না বেশিক্ষণ। এখনও পারি না। কোনোদিনও বুঝি পারব না। যারা আমার মতো অবস্থায় না পড়েছে, তারা আমার এ কথা যে কতবড় সত্যি তা বুঝবে না।

ধরার মতো কোনো হাত, কারও হাত আমার পাশে নেই—আজ আমার কেউই নেই।

সুশান্ত, তুমি ভীষণ খারাপ, তুমি অসভ্য, তুমি এক নম্বরের দাম্ভিক। আমার যা হবার তা হবে, কিন্তু আমি মরে গেলেও তোমার কাছে কখনো যাব না, কখনো কথা বলব না তোমার সঙ্গে।

তুমি দেখো; সত্যি বলছি, তুমি দেখো।

অসভ্য।

তুমি একটা ভীষণ অসভ্য।

৬

কাল গরমের ছুটি হয়ে যাবে।

আজই শেষ স্কুল ছিল। তারপর লম্বা ছুটি। খুলবে একেবারে জুলাই-এর গোড়ায়। আজকাল ছুটি হবে ভাবতেই আমার ভয় করে। সময়টা ভারী হয়ে থাকে। সময় আর কাটতে চায় না।

আজ আমার আর ক্লাস নেই। শেষ ক্লাস সেরে এসে কতকগুলো হোমওয়ার্কের খাতা দেখার ছিল ইংরেজির, সেগুলো দেখছিলাম টিচার্স রুমে বসে।

বেলা পড়ে এসেছিল, তবুও রোদের তাপ বেশ। স্কুলের মাঠটার দেওয়ালের পাশে পাশে সারি করে বোগেনভোলিয়া লাগানো আছে। মেরি-পামারই বেশি। বিভিন্ন রঙা ফুলের বিভিন্ন রঙা আভা সেই গরমের বিকেলের রুক্ষ মাঠে একটু বিধুর ছায়া এসেছে। একদল চড়াই ধুলোর মধ্যে, ধুলো উড়িয়ে, ধুলো ছড়িয়ে ওদের ছোট ছোট ঠোঁটে কিঁচকিঁচ করে কত কী বলছে আর খেলছে।

মালি কালো রবারের লম্বা পাইপ টেনে এনে মাঠে জল দিচ্ছে। গেটের কাছে বড় সোনাঝুরি গাছদুটোর ছায়া ঝুঁকে পড়েছে মাঠের পুব কোনায়।

জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে থাকতে থাকতে আনমনা হয়ে পড়েছিলাম। খাতাগুলো খোলা ছিল সামনে, খোলা পেনটা ধরা ছিল আঙুলে, কিন্তু আমার মন ছিল ঘরের বাইরে; দূরে। মন কোনো বিশেষ জায়গায় ছিল না, ছড়িয়ে ছিল অনেক জায়গায় আল্‌তো হয়ে, উদ্দেশ্যহীন হয়ে।

চমক ভাঙল স্কুলের বেয়ারা রামরতনের গলার স্বরে।

রামরতন বলল, দিদি আপ্‌কো কই বাবু বুলা রহা হ্যায়।

আমি চমকে উঠলাম। বললাম, অফিসের বাবু?

ও বলল, না, না, বাইরের বাবু, আপনার সঙ্গে ভেট করতে এসেছে।

কলমটা খোলা থাকায় শুকিয়ে গিয়েছিল। আমি কলম বন্ধ করে রাখলাম, খাতাগুলো মুড়ে রাখলাম।

বুঝতে পারলাম না কে এখানে আসতে পারে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে বাইরের লোক!

যে দু'বছর জামশেদপুরে এসেছি কখনও কেউ স্কুলে দেখা করতে আসেনি। এখানে রমেন কখনও আসবে না। ও বলে, আমার ভাবতেই খারাপ লাগে যে তোমার সহকর্মীরা আঙুল দেখিয়ে বলবে ঐ যেরে নিরুপমা ঘোষের হাজব্যান্ড।

তাছাড়া, রমেনের আমার সঙ্গে কোনো দরকার থাকে না আজকাল; দরকার নেই তো! ওর সবরকম খিদে নিবৃত্ত করা ছাড়া আমার আর কোনো প্রয়োজন বা দরকার ওর কাছে নেই এখন আর!

পুরুষ বলতে এখানে আমার হাজব্যান্ড রমেন ঘোষ ছাড়া আর তেমন চিনি শুধু সুশান্তকে। সুশান্ত সেদিন আমার প্রতি যেরকম ঠান্ডা ব্যাঙের মতো নিরুত্তাপ শীতল ব্যবহার করেছে, তাছাড়া ও যা দাম্ভিক, ও কখনও আসবে না আমার স্কুলে। আর ও যদি সতিাই এসে থাকে, ওকে চলে যেতে বলব, দেখা করব না ওর সঙ্গে। কিংবা ও যেমন করেছিল আমার সঙ্গে সেদিন সেরকম করব।

বলব আমার খুব তাড়া আছে!

বলেই, ক্যান্টিন থেকে ওমলেট আর চা আনতে বলব ওর জন্যে। তারপর ও যখন ওগুলো খাবে, ওর সঙ্গে একটাও কথা বলব না, অন্যদিকে চেয়ে বসে থাকব। ওর খাওয়া হলে বলব, এবার আপনি আসুন, কেমন? আমার খুব তাড়া আছে আজ।

সুশান্ত একদিন আমাকে ভীষণ কষ্ট দিয়েছে। সে কষ্ট রমেনের দেওয়া কষ্টের চেয়ে অনেক বেশি। রমেনের দেওয়া কষ্ট, ওর সমস্ত রকম স্থূলতা, ওর সমস্ত চরিত্রের ভণ্ডামি এসব এখন আমার গা সওয়া হয়ে গেছে। ওকে আমি এখন শুধু সহ্য করি। ওকে ভালোবাসি না, ওর জন্যে কোনোরকম ফিলিংস নেই আমার। সব কিছু মরে গেছে আমার মনের মধ্যে, যেসব সুগন্ধি ভালোলাগার বীজ আমার বুকের মধ্যে কুসুমিত হয়ে উঠেছিল ওর সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর, ওকে সকলের অমতে বিয়ে করার পর; এখন সে সমস্ত কুসুম শুকিয়ে গেছে প্রখর তাপে। ওর আত্মসম্মানজ্ঞানহীনতার দারুণ দাবদাহে।

রামরতনকে বললাম, বাবুর কাছ থেকে একটা স্লিপ নিয়ে এসো নাম লিখে। কে বাবু দেখি।

রামরতন চলে গেল।

ও চলে যেতেই আমার হঠাৎ মনে হল কলকাতা থেকে কেউ আসেনি তো? কোনো খারাপ খবর নেই তো? বাবার কথা মনে হলেই খুব দুশ্চিন্তা হয়।

যতক্ষণ না রামরতন ফেরে ততক্ষণ আমি বসে রইলাম।

রামরতন ফিরে এল একটা কার্ড নিয়ে হাতে।

কার্ডটা তুলে নিয়ে দেখি লেখা আছে ইংরেজিতে সুশান্ত বোস। এরিয়া সেল্‌স ইনচার্জ, ইনসাফ এবং ট্রব ইঞ্জিনিয়ারিং কোং অব ইন্ডিয়া, জামশেদপুর। তারপর ওর ঠিকানা-টিকানা সব দেওয়া আছে।

সুশান্তর নামটা দেখেই আমার বুকের মধ্যেটা খুশিতে চল্‌কে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ল আমার উচিত নয় ওকে বেশি পাত্তা দেওয়া। ওকি ভেবেছে, আমার কী সুশান্ত ছাড়া আর কেউ নেই যে ও আমার সঙ্গে যেরকম খুশি সেরকম ব্যবহার করবে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই খেয়াল হল শাড়িটা ক্রাশ্‌ড হয়ে গেছে। আমি তো জানতাম না আজ সুশান্ত আসবে। যাক্‌, এখন আর কিছু করার নেই।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ব্যাগ থেকে চিরুনিটা বের করে চুলটা একটু ঠিক করে নিলাম, মুখে একটু পাউডার পাফটা বুলিয়ে নিলাম আলতো করে, তারপর মাঠ পেরিয়ে বাইরের অফিসের ওয়েটিং হল-এর দিকে এগিয়ে গেলাম।

জানালা দিয়ে দেখতে পেলাম সুশান্ত বসে আছে। একটা সাদা ট্রাউজার, সাদা শার্ট তার উপরে একটা মেরুনের ওপরে কালো কাজ করা টাই।

সুশান্ত মুখ নিচু করে বসে ছিল।

আমি ঘরে ঢুকতেই উঠে দাঁড়াল। কোনো কথা বলল না।

আমি আশ্চর্য হবার গলায় বললাম, আপনি হঠাৎ এখানে? কী মনে করে?

সুশান্ত হাসবার চেষ্টা করল। বলল, কিছু মনে করে না। এমনিই।

তারপরই বলল, আপনার ছুটি হতে দেরি আছে?

আমি বললাম, কেন বলুন তো?

ও বলল, না, তাহলে একসঙ্গে যেতাম।

সেদিনের সেই প্রচ্ছন্ন অথচ সুগভীর অপমানের কথা আমার মনে ছিল। আমি বললাম, আমার তো যেতে অনেক দেরি হবে।

সুশান্ত হাত দুটো বুকের সামনে আড়াআড়ি করে রেখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, কত দেরি হবে?

আমি বললাম, তা বলতে পারছি না। এক ঘণ্টাও হতে পারে দু'ঘণ্টাও হতে পারে।

সুশান্ত আমার চোখের দিকে একবার তাকাল, তারপর বলল, ওঃ। আচ্ছা ঠিক আছে। আমি তাহলে চলি।

আমি বললাম, আপনি আমাকে কিছু বলতেন?

সুশান্ত বলল, না। তেমন জরুরি কিছু নয়। পরে বললেও চলবে। এখন আসি।

এই বলে সুশান্ত চলে গেল।

সুশান্ত চলে যেতেই আমার সমস্ত মন হাহাকারে ভরে গেল। নিজেকে নিজে খুব বকতে লাগলাম। বলতে লাগলাম, তোমার এই কাঠ-ফাঠা জায়গায় সুশান্ত ছাড়া আর কে আছে। ও নিজে যেচে এত দূরে এল অফিস থেকে উলটো দিকে, আর তুমি মিথ্যা গর্বে অভিমানে তাকে তাড়িয়ে দিলে।

আমি ঠিক করলাম, এক্ষুনি স্কুল থেকে বেরিয়ে পড়ে আমি বাড়ি যাব। বাড়ি ফিরে গা-টা ধুয়ে সুশান্তর বাড়ি যাব। আজ বেশ ভাব হয়ে যাবে আবার আমাদের দুজনের। আমি আজ ওকে বলব, ওর কাছে স্বীকার করব যে, আমি কতখানি নির্ভর করে থাকি ওর ওপর। মনে মনে আমি কতখানি নিজের লোক বলে জানি ওকে।

কিন্তু ভয় হল যদি ও তাড়াতাড়ি না ফেরে?

যাই হোক টিচার্স রুমে গিয়ে আমার সেদিন আর খাতা দেখা হল না। তাড়াতাড়ি করে সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে আমি ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

এখন রোদ প্রায় পড়ে এসেছে, তবুও বাস স্ট্যান্ড অবধি হেঁটে যেতে বিকেলেও কষ্ট হয়। মাঝে মাঝে মনে হয় রমেন বিয়ের আগে আমাকে যা যা বলেছিল তা যদি সত্যি হত, তো বেশ হত। ও যদি ইতিমধ্যে একটা গাড়ি পেত তাহলে রোদের মধ্যে রোজ আমাকে কষ্ট করে এতখানি যেতে হত না। বিয়ের আগে ও অনেক কথা আমাকে বানিয়ে বানিয়ে বলেছিল বলেই এখন ওর কথাগুলো এমন করে মনে পড়ে বার বার।

স্কুলের গেট থেকে বাইরে বেরিয়েই দেখি সুশান্ত সামনের চায়ের দোকানের বেঞ্চে বসে আছে ত্রিপলের তলায়।

ঐ পরিবেশে, ঐরকম ভাঙা ও নড়বড়ে টিনের চেয়ারে সুশান্তর সম্ভ্রান্ত চেহারা ও পোশাক কেমন বেমানান লাগছিল।

ও আমাকে আসতে দেখেই উঠে দাঁড়াল। হাসল। তারপর এগিয়ে এল আমার দিকে। তারপর বলল, বেশিক্ষণ বসিয়ে রাখেননি বলে ধন্যবাদ।

আমি লজ্জা পেয়ে বললাম, আমার দুটো ক্লাস নেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু হেডমিস্ট্রেস বললেন যে উনি নিজেই নেবেন।

সুশান্ত আমার চোখের দিকে চেয়ে কথাগুলো রিপিট করল, বলল, তাহলে উনি নিজেই নেবেন?

পরক্ষণেই বলল, মিথ্যা কথা বলতে শিখতে হয়। এরকমভাবে মিথ্যা কথা যারা বলে, তারা সহজেই ধরা পড়ে যায়। তাদের চোখই ধরিয়ে দেয়। কিন্তু মিথ্যা কথা কেন? আমি যদি আপনাকে বিরক্ত করে থাকি এসে, তো বলুন চলে যাচ্ছি।

আমি অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে হাঁটতে লাগলাম। কথা বললাম না।

সুশান্ত বলল, ওদিকে কোথায় চললেন। আমরা ওদিকে যাব না।

মানে? আমি বললাম।

সুশান্ত বলল, উলটোদিকে চলুন। মোড়ে একটা ট্যাক্সি নিশ্চয়ই পেয়ে যাব। চলুন রিভার্স-মিট-এ যাই। আপনি গেছেন কখনও?

না। যাব যাব ভেবেছি। কিন্তু যাওয়া হয়নি। ওরকম জায়গায় একা গিয়ে লাভ কী? একা কি ভালো লাগে?

সুশান্ত হাসল। বলল, আমি কিন্তু প্রায়ই একাই যাই, গিয়ে চুপ করে বসে থাকি। অবশ্য একা থাকতে ভালোবাসি বলেই হয়তো ভালো লাগে।

তাহলে আজকে আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন? যদি ভালো না লাগে?

নাও লাগতে পারে। ভালো লাগে কি না তা পরখ করার জন্যেই তো আপনাকে নিয়ে যাওয়া।

মোড় থেকে সুশান্ত একটা ট্যাক্সি নিল। তারপর দেখতে দেখতে ট্যাক্সি জনবহুল জায়গা ছাড়িয়ে নির্জনে এসে পড়ল কিছুক্ষণের মধ্যে।

বড় বড় শালগাছ ভরা জায়গাটিতে আমরা এসে পৌঁছলাম।

সুশান্ত ট্যাক্সিকে দাঁড় করিয়ে রাখল। তারপর আমার পাশে পাশে হেঁটে চলল নদীর দিকে।

সুবর্ণরেখা আর খড়াই নদী এসে মিশেছে এ জায়গাটাতে। ভারী সুন্দর জায়গা। এখন দু'নদীতেই জল নেই বললেই চলে। শুধু মধ্যে দিয়ে তিরতির করে জল বয়ে চলেছে। দু'পাশে গভীর জঙ্গল। সুবর্ণরেখার অন্য পাড়ে জঙ্গলের মধ্যে দু-একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। গোরুর পাল নিয়ে রাখাল ছেলে জল পেরিয়ে জঙ্গলের গ্রামে ফিরছে।

চতুর্দিকে একটা দারুণ শান্তি। নদীর গেরুয়া বালির ওপরে বড় বড় গাছের ছায়া লম্বা হয়ে পড়েছে। দূরে নদীর ওপরে স্থানীয় কোনো কলেজের ছেলে গোল হয়ে বসে গল্প করছে, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গান গাইছে। ওদের এই চেঁচামেচি কিন্তু খারাপ লাগছে না। তাতে জায়গাটার নির্জনতা ও শান্তি যেন আরও বেড়ে গেছে।

সুশান্ত বলল, ভালো লাগছে?

আমি বললাম, খুউব।

বসবেন না? সুশান্ত বলল।

আমি কথা না বলে একটা পাথরের ওপর বসে পড়লাম গাছের ছায়ায়। সুশান্ত আমার সামনে ট্রাউজার পরেই আসনপিঁড়ি হয়ে বসে পড়ল।

অনেকক্ষণ আমরা কেউই কোনো কথা বললাম না।

সুশান্ত বলল, সেদিন আপনি খুব রেগে গেছিলেন না?

আমি হাসলাম, কথাটাকে উড়িয়ে দিয়ে বললাম, কই না তো? রাগব কেন?

সুশান্ত বলল, কী করব? রাগ করলে করেছেন। আমার সত্যিই তাড়া ছিল সেদিন।

আমি কিছু বললাম না।

হঠাৎ সুশান্ত বলল, একটা গান শোনাবেন?

গান? আমি আকাশ থেকে পড়লাম। আমি যে কোনোদিন গান গাইতে পারতাম সে কথাই যেন আমি ভুলে গিয়েছিলাম। বিয়ের আগে কলেজে ইউনিভার্সিটিতে গাইয়ে বলে আমার রীতিমতো সুনাম ছিল। তবে শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতাম। তারপর এই আড়াই বছরে রমেন কখনও আমার গান শুনতে চায়নি, একটিও রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড কেনেনি। আর কিনলেও বা বাজাতাম কী করে? রেকর্ড প্লেয়ার কোথায়?

সুশান্ত আবার বলল, কী? সাধতে হবে বুঝি?

আমি লজ্জা পেলাম, বললাম, কতদিন গাই না, ভুলে গেছি।

ও বলল, ভুলে যাওয়া গানই গান না হয়।

আমি আর কথা না বাড়িয়ে খুব নিচু গলায় গাইলাম,

"অশ্রু নদীর সুদুর পাড়ে
ঘাট দেখা যায় তোমার দ্বারে।"

সুশান্ত মন দিয়ে গান শুনল।

তারপর গান শেষ হলে হাততালি দিল না, সাধু সাধু বলল না, শুধু আমার দিকে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ।

তারপর বলল, ভারী ভালো লাগল। এমন গলা, গান না গেয়ে আপনি নষ্ট করছেন কেন?

কত কিছুই তো নষ্ট হয়ে গেল। শুধু গান বাঁচিয়ে রেখে আর কী হবে?

সুশান্ত আমার দিকে তাকাল পূর্ণ দৃষ্টিতে। বলল, কিছুই নষ্ট হয় না, নিজে নষ্ট না করলে। আপনি নিজে নষ্ট করলে, বলার কিছুই নেই।

প্রথম "কিছুই" কথাটা এমন একটা বিশেষ জোর দিয়ে বলল ও যে, আমার কানে লাগল।

আমি চমকে মুখ তুলে তাকালাম ওর দিকে।

সুশান্ত চোখ নামিয়ে নিল।

সুশান্ত হঠাৎ বলল, রমেনবাবু কেমন আছেন?

আমার মাথায় কে যেন হাতুড়ি মারল। ঠিক এই মুহূর্তে, এই সময়, এই পরিবেশে যখন আমার আর সুশান্তর মধ্যে অন্য কেউই নেই, তখন হঠাৎ অন্য একজন লোকের প্রসঙ্গ এখানে টেনে আনার কী প্রয়োজন ছিল জানি না।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে আমি বললাম, জানি না।

কথাটা বলেই আমার খারাপ লাগল।

আফটার অল্ রমেন আমার স্বামী, ওর প্রসঙ্গে কোনো অসম্মানসূচক কথা আমার বলা উচিত নয়, বলিওনি কখনও। অন্য কাউকে কখনও বলিনি। কিন্তু সুশান্তর সামনে আমার মিথ্যা ভান করতে

ইচ্ছে করল না। কেন জানি না, কিছুদিন থেকেই আমার মনে হচ্ছিল যে, সুশান্তর সঙ্গে সম্পর্কটা আমার ভান করার নয়।

সুশান্ত দূরে তাকিয়েছিল।

আমি বসে বসে ভাবছিলাম যে প্রত্যেক মানুষের জীবনেই দু'একটি সম্পর্ক থাকে যেখানে কোনো বিষয়েই কখনও ভান করতে নেই। ভান বা ভণ্ডামি করলে সেই সমস্ত সম্পর্কের শিকড় আলগা হয়ে যায়। এই ভাসমান সতত সঞ্চরমান সম্পর্ক ভরা পৃথিবীতে যদি অন্তত দু-একটা সম্পর্কের মধ্যে কেউ তার মনের শিকড় প্রোথিত না রাখে, না রাখে সততায়, তবে তার জীবনময়ই যাযাবরের মতো এ মনে ও মনে ঘুরে বেড়াতে হয় স্থায়িত্বের মিথ্যা আশ্রয়। আমার মনে হয়, আমার জীবনে সুশান্ত তেমনই একজন লোক, যার সঙ্গে ভান মন করলে শুধু নিজেকেই ঠকানো হবে।

সুশান্ত আবার বলল, রমেনবাবুর সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয় না। ওঁর শরীর ভালো আছে?

আমি এবার বিরক্ত গলায় বললাম, রমেনবাবুর কথা রমেনবাবুই ভালো জানেন। আপনি গিয়েই তো শুধোলে পারেন। আমাকে বলার মতো কোনো কথাই কি আপনার নেই?

সুশান্ত অবাক চোখে আমার দিকে তাকাল। বলল, আপনার কথা আমি জানি। আমারও রমেনবাবুর প্রতি তেমন কোনো ইন্টারেস্ট নেই। আপনার খবরের জন্যেই রমেনবাবুর খবর নেওয়া। আপনি কি এ কথা অস্বীকার করেন যে রমেনবাবুর ভালো-মন্দর সঙ্গে আপনার ভালো-মন্দ জড়ানো নেই?

আমি বললাম, না, এখন অবধি অস্বীকার করি না। হয়তো কোনোদিন করব।

এখনও অস্বীকার করেন না বলেই এ কথা শুধিয়েছিলাম।

যাক্ গে, অন্য কথা বলুন। ও বলল।

আমি বললাম, অন্য কথা নেই। আর কী কথা? সন্ধে হয়ে গেল। চলুন বাড়ি যাই।

সুশান্ত বলল, আর একটু বসুন। আমার খুব খিদে পেয়েছে। আপনারও নিশ্চয়ই পেয়েছে। চলুন ফেরার সময় কোয়ালিটিতে কফি খেয়ে যাওয়া যাবে। আপনার কি সত্যিই তাড়া আছে?

আমি বললাম, না। তেমন তাড়া নেই।

মনে মনে বললাম, সুশান্ত তুমি জানো না, তোমার সঙ্গে আমি সারা দিন, সারা রাত কাটাতে পারি। তোমার সঙ্গ আমার বড় ভালো লাগে। তোমার সঙ্গে আমার আগে কেন দেখা হল না সুশান্ত? তুমি এতদিন কোথায় ছিলে?

সুশান্ত হঠাৎ বলল, আপনার পায়ের পাতাদুটো কী সুন্দর। এমন সুন্দর পা নিয়ে ধুলোর মধ্যে হাঁটা আপনাকে মানায় না।

আমি হাসলাম। বললাম, তাহলে কী করব? উড়ে যাব?

সুশান্তও হাসল। বলল, না, তা নয়, আপনি যদি আমার আপন কেউ হতেন তাহলে আপনার পা আমি মাটিতে পড়তে দিতাম না।

আমি হাসলাম। জানি না সেই হাসিটা কেমন দেখাল। ওকে বললাম, ও প্রসঙ্গ থাক। আমি যখন আপনার আপন কেউ নই তখন আমাকে ধুলো মাড়িয়েই চলতে হবে, কাঁটা পাথর সব কিছুর ওপর দিয়ে। উপায় কী?

সুশান্ত আবার বলল, উপায় আছে কী নেই জানি না। তবে আমার বড় খারাপ লাগে। বিশ্বাস করুন, আপনার জন্যে এত খারাপ লাগে যে কী বলব।

আমি বললাম, আমার জন্যে খারাপ লাগার তো কোনো দরকার দেখি না। নিজের দিকে তাকান, নিজের ভালো ভাবুন, দেখবেন আর বাইরের কারও কথা ভেবে নিজের সময় নষ্ট হবে না। সত্যি!

আপনার কিন্তু নিজের কথা ভাবার সময় হয়েছে। আপনি যেন কীরকম? নিজের দিকে তাকান না কেন?

তাকাই তো। সবসময় তাকাই। নিজের দিকে তাকালে কেবলই অন্য একজনকে দেখতে পাই।

আমি চমকে উঠে বললাম, কাকে?

সুশান্ত যেন খুব ভাবনায় পড়েছে, এমনভাবে বলল, তার প্রকৃত স্বরূপ এখনও বুঝে উঠতে পারিনি, তার রূপও নয়। যেই তাকাই ভিতরের দিকে অমনি দেখি কে যেন দৌড়ে গেল হালকা পায়ে বাইরের দিকে। তার অস্তিত্ব দারুণভাবে উপলব্ধি করি, সে যে আছে তা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারি, কিন্তু সে কী এবং কে তা জানতে পারি না।

খুব অস্বস্তিকর অবস্থা, না?

আমি বললাম, হবে। তারপর বললাম, ভালো করে তাকান, তাকে সম্পূর্ণভাবে দেখতে চান তো তাকে নিশ্চয়ই দেখতে পাবেন।

পাব? সুশান্ত বলল।

পরক্ষণেই লাজুক হাসি হেসে বলল, আমারও মনে হয় তাই।

কী মনে হয়? আমি বললাম।

মনে হয় যে একদিন তাকে সমস্ত কুয়াশা ও ধোঁয়ার বাইরে তাকে তার সহজ স্বচ্ছন্দ সম্পূর্ণতায় প্রত্যক্ষ করব।

আমি মুখ নীচু করে বসেছিলাম।

সেই সুবর্ণরেখার পাড়ে, শেষ বিকেলের আকাশের সব রঙ, বনের গায়ের সব পূরবী গন্ধ, রাখাল ছেলের গলার স্বর সমস্ত মিলেমিশে আমার মুখের ভাবনায় আঁকা হয়ে গিয়ে আমার মুখটি একটি প্রসন্ন প্রতিবিম্ব হয়ে উঠল আমার মনের।

সুশান্ত হঠাৎ আমার চিবুকে হাত ছোঁওয়াল।

আমার সারা শরীর, শরীরের সমস্ত অণু-পরমাণু, শরীরের কেন্দ্রবিন্দু, আমার সর্বস্ব সব থর থর করে কেঁপে উঠল সেই আঙুলের আদরের একটু ছোঁওয়ায়।

সুশান্ত বলল, নিজের মনেই, আপনি ভীষণ সুন্দর, আপনার মতো সুন্দর কিছু আমি কখনও দেখিনি।

তারপরই বলল, আপনি এত সুন্দর কেন?

আমি বাচ্চা মেয়ের মতো রাঙিয়ে গেলাম লজ্জায়।

আজ অবধি এ কথা আমাকে অনেক পুরুষ বলেছে। রমেন বলেছে বহুবার বিয়ের আগে। কিন্তু কেউ এমন করে বলেনি। হঠাৎ আমার মনে হল সুশান্তর মতো এত সুন্দর করে আমার সৌন্দর্যের কথা কেউ কখনও বলেনি। আমার সৌন্দর্য যদি সত্যিই কিছু থেকে থাকে তাহলে সেই সৌন্দর্যর এই প্রশস্তি তার চেয়েও সুন্দর।

আমি হাসছিলাম, আইসক্রিম-খাওয়া বাচ্চা মেয়ের মতো আমি খুশিতে হাসছিলাম; এত খুশি আমি বহুদিন হইনি।

আমি হাসি থামিয়ে বললাম, সুন্দরী মেয়েরা কিন্তু পাজি হয়।

সুশান্ত বলল, জানি না, জানতে চাই। বলেই সুশান্ত হঠাৎ আমার কোলে মাথা রেখে পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল।

আমি লজ্জিত হলাম, কিন্তু ভীষণ ভালোও লাগল আমার।

বললাম, এই, কেউ দেখে ফেলবে। কী হচ্ছে?

সুশান্ত বলল, দেখুক না; ওরা দেখুক এসে। দেখে হিংসেয় মরুক।

তারপরই সুশান্ত বলল, জানো আজ অফিসে ভীষণ ঝগড়া করে এসেছি। মনটা বড় খারাপ ছিল, কী যে খারাপ, তোমাকে তা বোঝাতে পারব না নিরুপমা!

অফিস থেকে বেরিয়ে কেবলি তোমার কথা মনে হতে লাগল। মনে হল তোমার কোলে মাথা দিয়ে একবার শুলে আমার সমস্ত মন খারাপ চলে যাবে। তাই তুমি কী ভাববে কেয়ার না করে তোমার কাছে দৌড়ে চলে এলাম। তুমি যে নিরুপমা। বলো? অন্যায় করেছি?

আমি ওর কপালে হাত রেখে বললাম, না। অন্যায় করেননি।

ও আমার কোলে মাথা দিয়ে শুয়েছিল। আমার কী যে ভালো লাগছিল কী বলব? ওর চরিত্রের মধ্যে রমেনের মতো কোনো ভিক্ষা চাওয়ার ব্যাপার ছিল না। ওর মধ্যে দারুণ একটা আত্মবিশ্বাস ছিল। যাকে ওর নিজের বলে মনে মনে ও মনস্থ করেছে, তা যে নিঃসন্দেহে ওর নিজেরই এই ব্যাপারে ওর মনে কোনো সংশয় ছিল না। আর যা ওরই একান্ত, তাকে নিয়ে ফুরিয়ে যাচ্ছে ফুরিয়ে যাচ্ছে আদেখ্‌লেপনাও ছিল না। কোনোরকম। ওর কথাই আমার সমস্ত শরীরে যা সুখের হিল্লোর তুলেছিল, আমার মনে যা রাশ রাশ পুঁটিলেখা ফুটিয়ে তুলছিল, জানি না ওর পরশ আমার মধ্যে কোন্ গভীর আনন্দের ঝড় তুলবে। সে আনন্দের ভার কি আমি সইতে পারব?

সুশান্ত বলল, তুমি আমাকে আপনি বলছ কেন? পালাবার পথ খোলা রাখতে চাও বুঝি? ইচ্ছে করলেই বাতিল করে পালাবে বলে দূরে রাখছ?

আমি হাসলাম। বললাম, মোটেই না।

ও বলল, তবে?

সবাইকে আপনি বলা যায় না। আপনি আমার চেয়ে সবদিক দিয়ে বড়। আপনার মতো কাউকে তুমি বলতে আমার ভালো লাগে না।

সুশান্ত এক লাফে উঠে বসল। বসেই অবাক হয়ে বলল, আমার মধ্যে গুণের কী দেখলে তুমি? আমি তোমার পায়ের নখের যোগ্য নয়।

আমি বললাম, সেটা আমি বুঝব। আপনি বললে আপনি অখুশি হবেন?

সুশান্ত হাসল। খুব জোরে জোরে হাসল। বলল, আমি এখন দারুণ খুশি। এত খুশি আমি ছোটোবেলা থেকে কখনও হইনি। তুমি যাই-ই করো, যাই-ই বলো ; আমি অখুশি হব না। কখনও হব না! তুমি দেখো।

তারপর আবার সুশান্ত আমার কোলে শুয়ে পড়ল। শুয়ে পড়েই দু'হাত দিয়ে আমার মুখটা ওর মুখের কাছে নামিয়ে আনল। কিন্তু ঠোঁটে চুমু খেল না। প্রথমে ও আমার দু'চোখে আলতোভাবে চুমু খেতে লাগল।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, ও কী? অন্ধ হয়ে যাব যে।

সুশান্ত বলল, অন্ধ হবে না, তোমার দিব্যদৃষ্টি হবে ; তুমি আমাকে আমার সত্যিকারের আমার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর দেখবে।

তারপর সুশান্ত উঠে বসে আমার চোখে মুখে বুকে হাজার চুমু খেলো।

একটু বিরাম দিয়ে সুশান্ত ওর দু'হাতের তেলোর মধ্যে আমার মুখ ধরল, বলল, আমি আজকে ঔরঙ্গজেব হয়ে গেলাম। ভাবছি, ট্যাক্সি ড্রাইভারকে আজ একটা জায়গীর দিয়ে দেব।

তারপরই বলল, তোমার কিছু চাই নিরুপমা? জাহাঁপনার কাছে তুমি কিছু চাইবে না?

আমি হাসছিলাম। আমি যেন কেমন হয়ে গিয়েছিলাম। সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত। সুশান্তর মধ্যে যেন

কী একটা ছিল—কোনো জাদুকরের জাদুর মতো, অজগরের চাউনির মতো, কিন্তু তাতে কোনো ভয় ছিল না। শুধু আকর্ষণ ছিল।

সুশান্ত আবার বলল, বলো না? তোমার কিছু চাই না?

আমি খুব হাসতে হাসতে কাঁপতে কাঁপতে বলেছিলাম, জাহাঁপনাকে চাই।

সুশান্ত আমার ডান হাতটা ওর ঠোঁটের কাছে তুলে নিয়ে চুমু খেয়ে বলেছিল, আমি তোমার! আমি চিরদিনের তোমার।

৭

ছিঃ ছিঃ এ আমি কী করলাম, কেমন করে করলাম?

ভালো হোক, খারাপ হোক, রমেন আমার স্বামী। এখনও সে আমার স্বামী। আমি তার বিবাহিতা স্ত্রী। স্বামী থাকতে অন্য পুরুষের সঙ্গে এরকম সম্পর্ক যে রাখে তাকে কি কেউ ভালো বলে? লোকে জানতে পারলে কী বলবে?

ফেরার সময় ট্যাক্সিতে বসে আমি নিজেকে নিজে অভিশাপ দিচ্ছিলাম।

সুশান্ত আমার হাতটা ওর হাতে নিয়ে চুপ করে বসেছিল। কোনো কথা বলছিল না।

দেখে মনে হচ্ছিল ও আনন্দের ভারে ক্লান্ত হয়ে গেছে।

আমি হঠাৎ বললাম, আজ আর বিষ্টুপুর যাব না বুঝলেন। দেরি হয়ে গেছে এমনিতেই। ও হয়তো অফিস থেকে ফিরে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। অন্য একদিন যাব এখন, কেমন? না কি আপনি রাগ করলেন?

সুশান্ত চশমার আড়ালের গভীর কালো চোখ দুটি তুলে তাকাল আমার দিকে। বলল, ঠিক আছে। তুমি যেমন বলবে।

সুশান্তকে এখন দেখে ভাবাই যাচ্ছিল না যে একটু আগেই ও প্রগলভ্ হয়ে গিয়েছিল, অত কথা বলছিল, আমাকে অমন পাগলের মতো আদর করছিল। এখন দেখে মনে হচ্ছে ও নিউক্লিয়র ফিজিক্স-এর প্রফেসর বুঝি, এক্ষুনি কোনো তত্ত্ব নিয়ে পড়বে।

সুশান্তর এই চেহারাটাই আমার ভালো লাগে। ওর গাম্ভীর্য, ওর সম্ভ্রান্ত ঋজু চেহারা, ওর গলার স্বর এসব মিলিয়ে মনে হয় এরকম কোনো ছেলে যে-কোনো মেয়ের দায়িত্ব নিতে পারে সারা জীবনের। এরকম কারও উপর নির্ভর করলে শুধু নিজে সুখী ও নিশ্চিত হওয়াই যায় না, নিজে সম্মানিতও হওয়া যায়। মাথা উঁচু করে দশজনকে বলা যায়, এই যে, ইনি আমার স্বামী। যেদিন রমেনের সঙ্গে ওর কারখানায় গিয়েছিলাম, সেদিনের কথা আমার বারে বারেই মনে হয়, মনে পড়ে যায়। সেদিন সত্যিই লজ্জা করছিল আমার। আমার স্বামী যদি গরিব হত তাতে আমার কোনো লজ্জা ছিল না। আমি অমন চালিয়াৎ পরিবারে মানুষ হইনি। আমরা নিজেরাও কিছু বড়লোক ছিলাম না কখনও; কিন্তু চিরদিনই সম্ভ্রান্ত ছিলাম। টাকা ছিল না; কিন্তু সম্মান ছিল; সততার সরলতার পরিচয় ছিল। নিজের অসম্পূর্ণতার জন্যে যদি কোনো অপমানের সম্মুখীন হতে হয়, সে অপমান আমি হাসিমুখে সইতে রাজি ছিলাম। কিন্তু অন্য একজনের কৃত ও অকৃত কর্মের সমস্ত দায়িত্ব আমি যেহেতু তাকে একদিন বিয়ে করেছিলাম তাই আমার ওপর বর্তাবে এ কথা ভাবতেই আমার খারাপ লাগছিল। সবসময় খারাপ লাগত।

সেদিন শেফালি যেভাবে আমাকে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কাছে যাবার জন্যে বলছিল তাতে আমার

রীতিমতো অপমান লেগেছিল। রমেনও যদি ঐ কোম্পানির একজন ডিরেক্টর কী নিদেনপক্ষে একজন কেউ-কেটা হত তাহলে কি ওরা আমাকে অমন করে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে পারত?

কিন্তু কোনো উপায় ছিল না। সেখানে নিরুপমা চৌধুরি কেউ নয়, সেখানে সে গিয়েছিল রমেন রায়ের স্ত্রী হিসেবে। মিসেস রমেন রায় হিসেবে। ঈস্ রমেন যদি ও যেমন তেমন না হত। ও যদি এমন করে আমাকে এ জীবনে না ঠকাত!

হঠাৎ সুশান্ত বলল, তুমি বলেছিলে না গরমের ছুটিতে কোলকাতায় যাবে বাবার কাছে? কবে যাবে?

বললাম, যাব তো নিশ্চয়ই। তবে দেখি কবে যাই। যাওয়াটা তো সমস্যা নয়। যে-কোনোদিন সকালের স্টিল এক্সপ্রেসে চেপে বসলেই হল।

সুশান্ত বলল, তা ঠিক।

তারপর অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল, তোমার কাছে আজ না গেলেই ভালো হত।

কেন? ওকথা বলছেন কেন? আমি শুধোলাম।

না। তুমি চলে গেলে খুব খারাপ লাগবে। তোমার সঙ্গে আজ যে ঘনিষ্ঠতা হল তা না হলেও খারাপ লাগত, তবে এখন আরও বেশি খারাপ লাগবে। জানি না তুমি লক্ষ্য করেছ কি না, আমার কোনো বান্ধুবান্ধব নেই। চিরদিনই আমি একলা। তার প্রধান কারণ আমার পছন্দ-অপছন্দটা বড় বেশি, রুচিজ্ঞানটাও বড় বাড়াবাড়ি রকমের তীব্র। আমার যাকে-তাকে মোটে পছন্দ হয় না। বলার মতো কোনো কথা না থাকলেও ঘন্টার পর ঘন্টা আজে-বাজে আলোচনা করে সময় নষ্ট করাকে ক্রিমিনাল অফেন্স বলে মনে হয় আমার। তার চেয়ে নিজের ঘরে বসে পড়াশুনা করা অনেক ভালো। বান্ধবীর বেলাতেও তাই। তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ যে আমার একজনও বান্ধবী নেই। কেন জানি না তোমাকে প্রথম দিন দেখার পর থেকেই এত কষ্ট পেয়েছি তা তুমি কখনও জানতেও পারবে না।

আজ যে তোমার স্কুলে গিয়ে পৌঁছেছিলাম সে কী এমনি এমনি, অফিসের ব্যাপারে মন খারাপ করে তোমার কথা মনে হল প্রথম। আজ ভেবেই গিয়েছিলাম, তোমাকে খোলাখুলিভাবে কিছু বলব। ভেবেছিলাম, এভাবে কেউ বাঁচতে পারে না।

আমি বললাম, আপনার ভয় করে না, বিবাহিতা মেয়েকে ভালোবাসতে? আপনি জানেন, রমেন আপনাকে জড়িয়ে ফেললে তার পরিণাম কী হবে?

কীসের পরিণাম?

দুর্নাম। লোকসমাজের কাছে ছিঃ ছিঃ, তারপর হয়তো অর্থদণ্ড। জেলও তো হতে পারে।

তা পারে, সবই হতে পারে।

তবে? সব জেনেশুনে আপনি কেন এমন করছেন?

কী করব বলো? আমি যে তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি। এর পরে তো আমার আর করণীয় কিছুই নেই। ভালোবাসার ভান করিনি। সত্যি সত্যি ভালোবেসে ফেলেছি। এর জন্যে যদি শাস্তি কিছু পেতে হয়, এটা যদি দোষ বলে গণ্য হয়, তবে শাস্তি পাব। ওসব শাস্তিকে ভয় করি না। একমাত্র ভয় অন্য শাস্তিকে।

কোন্ শাস্তি? আমি শুধোলাম।

সুশান্ত বলল, তোমার কাছে শাস্তি। যাকে ভালোবেসে এত কষ্ট, সে যদি সে ভালোবাসা গ্রহণ না করে, তার চেয়ে শাস্তি আর কিছু নেই।

আমি বললাম, একথা সত্যি যে আপনি আমার জন্যে অনেক কষ্ট পেয়েছেন? আশ্চর্য। আগে বলেননি কেন? কেন বলেননি?

কী বলব? বলে সুশান্ত হাসল।

আমি বললাম, বলতেন; যা বলার।

সুশান্ত আবার হাসল। বলল, আমি কখনও তোমাকে এসে বলতে পারতাম না যে, "আমি তোমাকে ভালোবাসি।" জীবনটা তো যাত্রা নয়। একথা আজ বলা চলে কিন্তু সেই প্রথম প্রথম দিনে যেত না। তাছাড়া, ভালোবাসা কি কেউ কখনও মুখে বলে বোঝাতে পারে? আর একজনের প্রতি অন্য জনের মনোভাব, তার জন্য কনসিডারেশান, তার জন্যে কিছু করা, তার পাশে দাঁড়ানো, তার বিপদে ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়া, তার জন্যে সব সময় ফিল করা এই তো ভালোবাসা। এ যে করে, সে ভালো নিশ্চয়ই বাসে। এ কথা মুখে বলে কী লাভ হত বলো? বরং জোলো লাগত পুরো ব্যাপারটাই। তাছাড়া আমরা কেউ কলেজের ছাত্র নই যে অমন নাটক করতে পারতাম ভালোবাসা নিয়ে।

দেখতে দেখতে বাড়ি এসে গেল।

সুশান্তর বাড়ির সামনেই ট্যাক্সি ছেড়ে দিলাম।

সুশান্ত নামার সময় আমার হাতে একটু চাপ দিয়ে নামল। বলল, যখনই একা লাগবে, মন খারাপ লাগবে চলে এসো। এরকম নিরাপদ ব্যাচিলারের বাড়ি ভূ-ভারতে নেই। বিপদ যদি কখনও ঘটে, তুমি চাও বলেই ঘটবে। অন্য পক্ষের ইচ্ছায় কখনোই তা ঘটবে না। এইটুকু কথা তোমাকে দিতে পারি। তুমি যদি আমার সামনে বসে থাক, তোমাকে যদি আশ মিটিয়ে দেখতে পারি তাহলেই আমার ভারী আনন্দ হবে। বুঝেছ? বেশি চাই না।

আমি বললাম, বুঝেছি।

ট্যাক্সি থেকে নেমে আমি বাড়ির দিকে হেঁটে চললাম।

আমার ভারী ভালো লাগছিল সেই সন্ধেবেলায়। মনে হচ্ছিল আমি যেন কোনো ফার্স্ট ইয়ারে পড়া মেয়ে হয়ে গিয়েছি। সমস্ত শরীর পাখির মতো হালকা, মন যুঁইফুলের মতো সাদা।

একসময় আমি যেন উড়ে গিয়ে পৌঁছলাম বাড়ির দরজায়।

আশ্চর্য। রমেন আজ এখনও আসেনি।

মুখী এসে দরজা খুলল। হাতের ব্যাগটা বিছানায় ছুড়ে ফেলে অনেকক্ষণ অন্ধকার ঘরে শুয়ে থাকলাম।

মুখী এসে বলল, দিদিমণি, চা-জলখাবার খাবেন না?

আমি বললাম, তুই খেয়ে নে।

সুশান্তর সঙ্গে একঘণ্টা কাটিয়ে আমি আনন্দে বিবশ হয়ে গিয়েছিলাম। আমার সমস্ত শরীর আনন্দের ভারে ভারী বলে মনে হচ্ছিল। রমেন আমাকে একঘণ্টা ধরে নগ্নাবস্থায় আদর করলেও সে ভালোলাগার ক্লান্তি এমন আশ্চর্য সুখময় হত না।

আনন্দে আমার চোখ বেয়ে জল গড়াতে লাগল। বালিশে মুখ গুঁজে আমি বিড় বিড় করে বললাম, সুশান্ত তুমি ভারী ভালো। সুশান্ত তুমি ভীষণ ভালো।

আমি বোধহয় ঐভাবেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

কলিং বেলটা অনেকক্ষণ ধরে বাজছিল। ঘুম ভেঙে ধড়মড়িয়ে উঠে গিয়ে দরজা খুলতেই দেখি, পুলিশ!

পুলিশের দারোগা হিন্দিতে বললেন, এটা রমেন রায়ের বাড়ি?

আমি বললাম, হ্যাঁ। কী ব্যাপার?

উনি বললেন, রমেনকে এক জুয়ার আড্ডায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কাল কাঠগড়ায় ওঠানো হবে, উকিল মোক্তারের বন্দোবস্ত যেন করি।

আমি ওদের একটু বসতে বলে মুখীকে দিয়ে সুশান্তকে ডেকে পাঠালাম।

সুশান্ত একটা বাড়ির-কাচা পায়জামা পাঞ্জাবি ও রবারের চটি পরে এসে সব শুনল, তারপর কাগজে লিখে নিল।

আমি চুপ করে সোফায় বসেছিলাম।

দারোগাবাবু অসভ্যের মতো আমার দিকে বার বার তাকাচ্ছিলেন।

সুশান্ত বলে, থ্যাঙ্ক য়্যু। এবার আপনারা আসতে পারেন। কাল কোর্টে আমরা জামিনের ব্যবস্থা করব।

দারোগাবাবু উঠে দাঁড়ালেন। তারপর সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে চলে গেলেন।

আমার বুক ফেটে কান্না আসছিল।

রমেন যে আমার স্বামী—। সুশান্তর কাছে সে এমনভাবে রোজ রোজ ছোট না হয়ে গেলে আমার পক্ষে তাকে আবার সম্মান করা সম্ভব হত; সুশান্তও হয়তো খুশি হত। সুশান্ত আমাকে ভালোবাসুক আর না বাসুক এখন ঐ তো আমার একমাত্র বল-ভরসা। একজন অসহায়া অবলা মেয়েকে লোকে যেমন করে দয়া করে, আমাকে ও বুঝি তেমনি করে দয়া করে ভালোবেসেছে; কৃপা করেছে।

লজ্জায় অপমানে আমার মাথা কাটা যেতে লাগল। চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়তে লাগল।

সুশান্ত মুখীকে বলল, মুখী তুমি আজ রাতে দিদিমণির কাছে থেকো। তোমার বরকে বোলো বাইরের ঘরে শুয়ে থাকতে।

তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, এখনও চান খাওয়া কিছু হয়নি? কখন হবে?

মুখী ঘর থেকে চলে গেলে সুশান্ত আমার কাছে এসে বলল, কী করবে বলো? কোনো চিন্তা কোরো না। ভালো করে চান করো তো। চান করে ঘুমোও। কাল আমি রমেনবাবুকে ছাড়িয়ে আনব। কোনো ভাবনা নেই।

আমার গলা বন্ধ হয়ে আসছিল, আমি বললাম, আমাকে কী কাল কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে?

সুশান্ত আমার মাথায় হাত রাখল। বলল, পাগলি! তোমায় কেন দাঁড়াতে হবে? তোমার কিছুই করতে হবে না। তুমি যেমন স্কুলে যাও, যাবে। ভালো করে খেয়ে দেয়ে যেও। না খেয়ে যেও না যেন, এই গরমে লু লেগে যাবে। তারপর বলল, রমেনবাবুর জন্যে যা ব্যবস্থা করার তা আমি করব। ওঁর কারখানাতেও তো একবার জানাতে হবে।

আমি বললাম, আমি ফোন করে দেব স্কুল থেকে।

সুশান্ত বলল, তাই দিও, কিন্তু অত বিস্তারিত বোলো না। শুধু বোলো যে ও অফিস যাবে না।

তারপর বলল, কোনো চিন্তা নেই, তুমি স্কুল থেকে ফিরে দুপুরের খাওয়ার সময় তোমার বরকে দেখতে পাবে। হল তো। তারপর বলল, একবার হাসো তো দেখি?

রমেনের জন্যে লজ্জা, অপমান এবং সুশান্তর জন্যে ভালোলাগা সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল আমার মুখে।

আমার মাথায় আর একবার হাত রেখে সুশান্ত বলল, দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এবার চান করে খেয়ে নাও। লক্ষ্মী সোনা মেয়ে। যদি আমার কথা না শোনো, তাহলে খুব বকব কিন্তু।

সুশান্ত চলে গেলে দরজা বন্ধ করে বন্ধ দরজায় মুখ রেখেই অনেকক্ষণ ঝর ঝর করে কাঁদলাম।

আমার নড়তে ইচ্ছে করছিল না।

আমার স্বামী আমাকে আর কোন্ কোন্ অসম্মানের সম্মুখীন করাবে জানি না।

রমেনের ওপর রাগে আমার গা জ্বলে যাচ্ছিল।

আর সেই সঙ্গে আমার মন বার বার বলছিল যে অনেক অনেকদিন কেউ আমাকে এমন করে আদরের, বকার, ভয় দেখিয়ে নাইতে খেতে বলেনি। মা মারা যাবার পর কেউই বলেনি।

সুশান্ত! তুমি আমার মরে-যাওয়া মা?

সেদিন রাতে আমি সিরিয়াসলি ভাবছিলাম যে, রমেন সম্বন্ধে কী করা যায়।

কিছুদিন আগে ফ্যাক্টরিতে মদ খেয়ে মাতলামি করে মারধর খেয়ে এল। আজ জুয়াড়িদের সঙ্গে গ্রেপ্তার হল, কাল কী করবে তা ঐ জানে। আমার আর ওর সঙ্গে এক মুহূর্তও থাকতে ইচ্ছে করে না। গা ঘিনঘিন করে; ঘেন্নাও করে।

অথচ ও যখন অসহায়ের মতো ঘুমিয়ে থাকে, ওর কপালের পাশে চুলগুলো লেপটে থাকে, মাঝে মাঝে ঘুমের মধ্যে শিশুর মতো আমার কোমরে বুকে হাত তুলে দেয়, তখন ওকে দেখে মায়া হয়।

এ আমার কপালের দোষ যে, আমি অত সহজে ঠকেছিলাম।

ও আমাকে প্রথম থেকে শেষ অবধি ঠকাবে বলেই মনস্থির করেছিল। ওর মতো মেরুদণ্ডহীন, পরনির্ভর অপদার্থ অথচ চালিয়াৎ ছেলেদের যে কোনো বিবেক বা কর্তব্যজ্ঞান বা আন্তরিকতা থাকে না, তা আমি জানতাম না। ও আন্তরিকভাবে আমাকে ঠকিয়েছিল, জেনেশুনে ও আমার সর্বনাশ করেছিল নিছক আমার শরীরটা চিরদিনের মতো পাওয়ার আশায়।

আমি হয়তো ওর জুয়াখেলার নতুন কোনো পণ ছিলাম। যেমন করে হোক, মিথ্যা কথা বলে, প্রবঞ্চনা করে ও আমাকে জিততে চেয়েছিল। জিততে চেয়েছিল, যেন-তেন-প্রকারেণ।

কিন্তু আমি তো আন্তরিকই ছিলাম। ও যতখানি আন্তরিকতার সঙ্গে আমার সঙ্গে অভিনয় করেছিল, আমি তার চেয়েও বেশি আন্তরিকতার সঙ্গে ওকে ভালোবেসেছিলাম।

আমার মতো মেয়ে সহজে কাউকে ভালোবাসে না, ভালোবাসতে পারে না; কিন্তু একবার ভালোবেসে ফেললে বহমান ভালোবাসাকে গুটিয়ে ফেলার কোনো ক্ষমতাই যে আমার মধ্যে নেই। আমার পরিণতি, আমার সমস্ত জীবন, সমস্ত ভবিষ্যৎ কি সত্যি সত্যিই রমেনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে? আমি কি সে বাঁধন ছিঁড়তে পারি। সত্যিই কি পারি না?

বাঁধন হয়তো ছিঁড়তে পারি। আইনের পাতায় যে সব প্রতিবিধানের কথা লেখা আছে, সে সব কথা খুব সহজে বলা আছে। করলে খুবই সহজ। কিন্তু যে কথা আইনের বইয়ে লেখা নেই, লেখা থাকে না, তেমন অনেক কথাও তো আছে?

এই সবে আড়াই বছর হল বিয়ে হয়েছে আমার। কত গর্ব, মায়ের সঙ্গে এ নিয়ে কত ঝগড়া, বন্ধুদের সঙ্গে কত মজা, বিয়ের দিন রানির মতো সেজে সিংহাসনে বসা সবই কি এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাব? সেদিন বাড়িসুদ্ধু লোকের মতের ওপর আমার মতের জয় হয়েছিল। সেদিন সিংহাসনে বসে আমি নিজেকে সত্যিই এক দারুণ প্রতাপশালিনী কোনো রানি বলে ভেবেছিলাম—ভেবেছিলাম মুখ-নীচু করা দিদিরা, মা এবং অন্যান্য কাছের লোকেরা আমার কাছ কী নিদারুণভাবে হেরে গেল। আমার মতের কাছে, আমার জেদের কাছে।

সেদিন যে বড় গর্বভরে সকলের সঙ্গে ঝগড়া করেছিলাম। নিজেকে বলেছিলাম যে, বাড়িসুদ্ধু সকলে একদিন জানবে, বুঝবে যে আমার বুদ্ধি সকলের চেয়ে বেশি। বলেছিলাম, রমেনের মতো স্মার্ট ছেলে জীবনে খুব উন্নতি করবে। ভেবেছিলাম বেচারা আমাকে বড় ভালোবাসে—আমাকে

পেলে ও জীবনে সম্পূর্ণ হবে, নিজে অনেক বড় হবে। আমার এই গর্ব, আমার এই অল্পবয়সি মেয়ের শরীর ও মনের, আমার আত্মত্যাগের, ওকে বিয়ে করতে গিয়ে আমার লড়াই করতে হল সকলের সঙ্গে এ সব কিছুর যোগ্য সম্মান দেবে ভেবেছিলাম, রমেন; আমাকে!

ভেবেছিলাম ও আমার মুখ রাখবে। ও যে এমন করে আমাকে ধুলোয় ফেলবে কখনও ভাবিনি।

কিন্তু কিছুই তো হল না।

হল না, তবুও আজ আমি একা একা বাড়ি ফিরব কী করে? একা বাড়ি ফিরে আমি কাউকে বলতে পারব না যে বাবা, আমাকে ঠকিয়েছে একটা ঠগ, বাবা আমি একজন অকর্মণ্য কুঁড়ে, জুয়াড়ি মাতালের পাল্লায় পড়েছিলাম। আমি আমার সব খুইয়ে, আমার সুন্দর মনের মধ্যে যা ছিল, আমার নরম প্রথম যৌবনের সুগন্ধি শরীরে যা ছিল, তোমার ব্যাঙ্কে, তোমার সিন্দুকে যা ছিল, দাদাদের যা ছিল, সব খুইয়ে আমি আবার তোমাদের কাছেই ফিরে এসেছি।

কখনও, কোনোদিনও বলতে পারব না, বাবা! রমেন ভালো নয়। বাবা, রমেনের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। বাবা, রমেন একজন মানুষ হিসেবেও মানুষ নয়, পুরুষের কোনো গুণ নেই ওর মধ্যে!

না, না, না। তা আমি বলতে পারব না। ফিরে যেতে পারব না। ফিরে যেতে পারব না আমি। তার চেয়ে এই নরকও আমার ভালো। আরও দেখব। অনেক তো দেখলাম, আরও দেখব। এক এক করে আমার সমস্ত মিষ্টি-দুষ্টু ইচ্ছেগুলো হালকা বেগুনি কোনো চন্দ্রমল্লিকা ফুলের পাপড়ির মতো ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলব।

আমার জীবন এখন মরুভূমি হয়ে গেছে। সেখানে শুধুই গরম, তৃষ্ণা, শুধুই কাঁটাঝোপ; বেদুইন ডাকাত। সেখানে ছায়া নেই, শান্তি নেই; স্বস্তি নেই।

তবুও এ আমার ভাগ্য, আমার মনের চাওয়া মায়ের আশীর্বাদ, তাঁর ক্ষমায় মমতার ফুল, আমার একমাত্র মরূদ্যান, আমার ছায়া; আমার ঠান্ডা হাওয়া, আমার মুক্তি · সুশান্ত।

সুশান্ত, ও আমার সুশান্ত, তুমি আমাকে কখনও ছেড়ে যেও না। তোমার কাছে গর্ব করার মতো আমার কিছুই নেই। তুমি সবদিক দিয়ে আমার চেয়ে বড়। তুমি যথার্থ পুরুষ মানুষ। তুমি সভ্য, তুমি সৎ, তুমি নরম এবং তুমি কঠোর।

তুমি আদর করতে জানো, বকতেও জানো, তুমি যাকে ভালোবাসো, তাকে প্রখর তাপ থেকে আড়াল করে রাখতে জানো। তোমার বুকে মুখ রাখলে আমার মনে হবে এ আমার পরম নিশ্চিন্ত স্যাংচুয়ারি। এখানে কোনো শেফালি, কোনো রমেন, রমেনের সহকর্মীর মতো কোনো সেন আমাকে অপমান করতে সাহস পাবে না। তোমার পরিচয়ে শুধু আমি পরিচিত হব—আমার সমস্ত আমিত্ব, আমার সমস্ত গুণ, আমার রূপ সব আমি তোমাকে সমর্পণ করে রিক্ত, নিঃস্ব হয়ে মুক্ত হতে চাই সুশান্ত।

সুশান্ত তুমি আমাকে বাঁচাবে।

আমার সেই আশ্চর্য রাজকীয় নিঃস্বতার নৈবেদ্য তুমি কি প্রসন্নমনে, নিঃশেষে গ্রহণ করবে সুশান্ত?

আমি শুধু খণ্ডমাত্র, অংশমাত্র, আমি অপূর্ণ, অপরিপ্লুত। সুশান্ত, ও সুশান্ত, আপনি কি আমাকে সমগ্রতায় ভরে দেবেন, পরিপূর্ণ করবেন? পরিপ্লুত করবেন? আপনি কি নির্দ্বিধায় আমার সমস্ত শরীর, সমস্ত মনকে অক্লেশে, আনন্দে, আক্ষেপহীনতায় গ্রহণ করবেন?

করবেন কি? সুশান্ত? আপনি?

সুশান্ত। তুমি কী করবে।

আজ কোনো ক্লাস হল না।

মেয়েরা ক্লাসরুম সব সাজিয়েছিল নানারকম ফুল দিয়ে। একটা অ্যাসেমব্লির পর ক্লাস ডিসলভড্ হয়ে গেল।

টিচার্স কমনরুমে আজ সকলে বসে জমিয়ে গল্প করছিলেন। আবার কবে সকলের সঙ্গে দেখা হবে—কতদিন পর।

মিসেস চাহাল স্বামীর কাছে যাবেন বাঙ্গালোরে গরমের ছুটিতে, সেখান থেকে উটিতে বেড়াতে যাবেন। ওঁর চোখ-মুখ আনন্দে ঝক্‌ঝক্ করছিল। ছুটির পর উনি আর ফিরে আসবেন না। বাঙ্গালোরেই কোনো চাকরি দেখে নেবেন। ওখানে ভালো ভালো স্কুল-কলেজ আছে। তাছাড়া মিসেস চাহালের বিদেশি ডিপ্লোমা আছে। ওঁর চাকরি পেতে অসুবিধা হবে না।

আমি তো চাকরি করব ভাবিনি কখনও—যদি কখনও করতাম তো নেহাত স্বাবলম্বনের জন্যে করতাম। নিজের পছন্দমতো শাড়ি কেনার জন্যে বাবা-মাকে বা মেজদাকে কিছু দেওয়ার জন্যে করতাম। কাউকে কিছু দিতে পারলে আমার খুব ভালো লাগে। মেজদা আমার জন্য অনেক কিছু করেছে—আজকালকার দিনে মায়ের পেটের দাদারা সাধারণত এরকম করে না!

আমাকে লেখাপড়া শেখানো, আমার দিকে সবরকম দৃষ্টি রাখা, কীসে আমার ভালো হবে না হবে সেই চিন্তা করা, সবই করেছে। আমার সব দাদাদের মধ্যে মেজদাকে আমি সবচেয়ে ভালোবাসি। মেজদাই জোর করে আমাকে এম-এ ক্লাসে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিল। অনেক কাণ্ড করে। কারণ সময় পেরিয়ে গিয়েছিল তখন ভর্তি হবার।

অনেক বন্ধু-বান্ধবদের দাদাদের দেখলাম, তাঁরা নিজেদের চাকরি এবং চাকরির পর বন্ধু-বান্ধব আড্ডা এসব নিয়েই দিন কাটাতেন, তাঁদের বোনেরা কী করছে না করছে, তাদের কিছু অভাব আছে কী নেই, কী তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা এ নিয়ে কখনও তাঁরা মাথা ঘামাতেন না। আমার যা হয়েছে, যতটুকু হয়েছে, সবই মেজদার জন্যে। মেজদার ইনিসিয়েটিভে।

চাকরি এখন করছি প্রয়োজন বলে। কিন্তু ভগবানই জানেন, কোনো মেয়েরই প্রয়োজনে পড়ে, দায়ে ঠেকে চাকরি করতে ইচ্ছা করে না। স্বাবলম্বনের জন্যে হয়তো সকলেরই ইচ্ছা করে, কিন্তু চাকরি না করলে যখন চলে না, তখন সেই চাকরি আনন্দজনক নয়।

মিনাদি পানের বাটা খুলে পান খাচ্ছিলেন। পান মুখে পুরে অনেকখানি জরদা ফেললেন মুখে, তারপর হাসতে হাসতে আমাকে বললেন, তুই কোথায় যাচ্ছিস রে নীরু?

আমি বললাম, আমি আর কোথায় যাব? কোলকাতা যাব একবার। বাবার শরীরটা ভালো না। তাছাড়া মেজদার বিয়ের কথা হচ্ছে। বিয়ে হলে এই ছুটির মধ্যেই হবে হয়তো। তাহলে বিয়েতে মজা করে আসব।

তারপর বললাম, আপনি? আপনি কোথায় যাবেন?

মিনাদি পান খেতে খেতে হাসলেন, বললেন, এখনও বিশ্বাস নেই। তবে আমার হাজবেন্ডের বুড়ো বয়সে পেরেম জেগেছে। বলছে, ছেলেমেয়েদের সবাইকে কোলকাতায় আমার দাদার কাছে রেখে আমাকে নিয়ে একা দার্জিলিং যাবে পনেরো দিনের জন্যে। বলছে মাউন্ট এভারেস্ট কী উইন্ডমিয়ারে উঠবে—হনিমুন করবে না কি আবার। ঢং দ্যাখো না? বলেই, মিনাদি নিজেই হেসে উঠলেন।

মিনাদির কথায় আমরা সকলেই হেসে উঠলাম।

নমিতাদি বললেন, মুখে যাই বলো না কেন, আসলে তুমি খুশিতে ডগমগ মিনাদি। মিনাদি নমিতাদির দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, কেন হব না রে খুশি? বর আদর করে, মাথায় করে, নতুন করে হনিমুনে নিয়ে গেলে কার না ভালো লাগে বল? তাছাড়া আমার বরের বাহান্ন বয়স বলে কি ভাবিস বুড়ো হয়ে গেছে? অনেকের চেয়ে জোয়ান আছে।

বলেই, চোখ নাচিয়ে এক দারুণ ভঙ্গি করলেন।

সকলে হো হো করে হেসে উঠল।

নমিতাদি বললেন, ছেলেমেয়েদের ছেড়ে বেড়াতে যেতে কষ্ট হয় না তোমার?

মিনাদির মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল।

ঢোঁক গিলে বললেন, হয় না বললে মিথ্যা বলা হয়। এখন তো ওরা বেশ বড়ই হয়েছে। কিন্তু বড় হয়ে গেছে বলেই বুঝতে পারি, বুঝতে কষ্ট হলেও বুঝতে পারি যে, ওরা আমার কেউ নয়। আমাদের কেউই নয়। ওরা সব একুশ বছরের অতিথি। ওরা আমাদের জন্যে ভাবে না, ওদের মনে কোনো মায়া দয়া কিছু নেই।

ওদের জন্যে অনেক করেছি, আর কী করব? সবাইকে লেখাপড়া শিখিয়ে দেব--যাতে যে যার পায়ে দাঁড়াতে পারে। নিজেদের সুখ সম্বন্ধে যখন ওরা এতই সচেতন, তখন নিজের নিজের সুখ নিজেরা দেখে নিক। ওদের জন্যে, ওদের মানুষ করতে তো সারা জীবনই গেল, আর আমাদের জীবনের বাকি আছে কী? এখনও যদি শেষবেলায় একটু আনন্দ না করে নিই, তো কবে করব বল? মেয়ে-জামাই কি ছেলে-বউ কি আমাকে মাথায় করে নিয়ে দেশ দেখিয়ে বেড়াবে? তাদের কাছে বাবা মা তো তখন বোঝা। এই আজকালকার ছেলে-মেয়েদের কাছে কোনো সুখের ভরসা রাখি না।

এ কথার পর সমস্ত টিচার্স রুমে একটা নিস্তব্ধতা নেমে এল। কেউই কোনো কথা বললেন না। সবাই চুপ করে নিজের ভাবনা ভাবতে লাগলেন।

হঠাৎ আমার মরে-যাওয়া-মা এবং রুগ্ণ বাবার কথা মনে হল। মনটা বড় হু-হু করে উঠল।

আমার মা-বাবা মিনাদির মতো ছিলেন না। তাঁরা কিন্তু ছেলে-মেয়েদের মুখ চেয়েই ছিলেন; আছেন। চিরদিন তাঁরা বিশ্বাস করেছিলেন যে, তারা তাঁদের সুখী করবে, তাঁদের খুশি করবে। সেই প্রজন্ম অন্যরকম ছিল। এ প্রজন্ম একেবারেই অ-্যরকম।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম প্রায় বারোটা বাজে।

আমি উঠলাম, সকলের কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

বাড়ি ফিরেই দেখি রমেন এসে বসে আছে।

শুনলাম, সুশান্ত ওকে পৌঁছে দিয়েই চলে গেছে।

কাল থেকে ও দাড়ি কামায়নি!

খোঁচা খোঁচা দাড়ি হয়েছে রমেনের। যে প্যান্টশার্ট পরেছিল কাল, তাই পরেই আছে।

পা-ছড়িয়ে বসবার ঘরের সোফায় বসে সিগারেট খাচ্ছে। পাশের অ্যাসট্রেতে সিগারেট স্তূপীকৃত হয়ে আছে।

ভেবেছিলাম, আমাকে দেখে ও লজ্জা পাবে। কিন্তু আমাকে দেখেই ও কিছুই হয়নি এমন গলায় বলল, কী ব্যাপার? স্কুল ছুটি হয়ে গেল?

আমিই লজ্জা পেলাম ওর নির্লজ্জতা দেখে।

আমি বললাম, তোমাকে কে বলল?

রমেন উত্তর দিল, সুশান্ত বলল। এখন তো তার কাছ থেকেই আমার তোমার খবর সব জানতে হয়।

আমি চুপ করে রইলাম।

রমেন আবার বলল, তোমাকে আমি বলেছিলাম না যে, আমাদের ঘরোয়া ব্যাপারে বাইরের লোককে ডাকবে না।

আমি জবাব দেবার মতো কিছু ভেবে পেলাম না।

অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

আমার বয়স বেশি হয়নি, কিন্তু এ পর্যন্ত মানুয কম দেখিনি! কিন্তু রমেনের মতো মানুষ হয়, হতে পারে, এ পর্যন্ত আমার ধারণার বাইরে ছিল।

রমেন আবার কৈফিয়ত চাওয়ার গলায় বলল, কী? জবাব দিচ্ছ না যে?

আমি বললাম, ওকে খবর না দিলে কাকে দিতাম? আমাদের জানাশোনা কে আছে ধারে কাছে? ও গিয়ে ছাড়িয়ে না আনলে তো জেলে পচতে।

পচতাম, পচতাম। তাতে তোমার কী? তাতে ওরই বা কী?

এ কথার কোনো জবাব হয় না। তাই এবারেও আমি চুপ করেই রইলাম।

অনেকক্ষণ পর আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুমি জুয়া খেলেছিলে কেন?

রমেন আমার মুখের দিকে চোখ মেলে তাকাল।

ওর চেহারাটা সত্যিই সুন্দর। মাঝে মাঝে এখনও ওকে সুন্দর দেখায়। তবে শুধু চেহারার সৌন্দর্যে কেউ তো সত্যিকারের সুন্দর হয় না, যদি না মনের সৌন্দর্য থাকে। তাই ওর ভগবানের দেওয়া সুন্দর মুখে, ওর গড়ে-তোলা অসুন্দর মনের একটা ছাপ কালো-ছায়ার মতো সবসময় লেগে থাকত আজকাল।

ওর দিকে চাইলেই সে ছাপটা আমার চোখে পড়ত।

রমেন বলল, টাকার জন্যে।

টাকা যা পাও সারা মাস কাজ করে, তার ওপর আমি যা পাই তাতে কি আমাদের দুজনের ভদ্রভাবে চলে যাওয়া উচিত নয়? চলে না কি?

সে জন্যে নয়। টাকার দরকার, ধার শোধ করার জন্যে।

কীসের ধার?

তোমার হরি কাকার কাছ থেকে ধার করেছিলাম কিছু টাকা। এখন সেই বুড়ো রোজ তাগাদা দিয়ে চিঠি দিচ্ছে। জামাই-এর সঙ্গে এমন ব্যবহার কেউ করতে পারে যে, তা ভাবতে পারি না।

আমি বললাম, কাকা তাগাদা করছেন তাঁর মেয়ের বিয়ে এসে গেছে বলে! তাছাড়া বিয়ের পর পরই আমাকে না জানিয়ে চোরের মতো আমাদের বাড়ির লোকের কাছে টাকা ধার করতে তোমার সম্মানে বাধল না। ও সরি! তোমার সম্মান বলে কিছু থাকলে তো লাগবে।

রমেন বলল, টাকাটা নিয়েছিলাম তোমারই সুখের জন্যে।

আমার সুখের জন্যে?

হ্যাঁ। এই যে রেফ্রিজারেটরটা দেখছ এ তোমার কাকার কাছ থেকে ধার নেওয়া টাকা। তুমি বিয়ের আগে আগে আমাকে বলতে না, একটা ছোট ছিমছাম দুজনের মতো ফ্রিজ তোমার খুব পছন্দ?

আমি বলতাম, সে তো অনেক কিছুই বলতাম। ছিপছিপে সাদা স্ট্যান্ডার্ড হেরাল্ড গাড়ি, আরও কত কী বলতাম! সবচেয়ে বেশি যা চাইতাম তা সৎ, পরিশ্রমী ও ভদ্র স্বামী। তাই যখন হল না, তখন আর অন্য কিছু দিয়ে কী হবে? সে কথা আজ আর বলে লাভ কী? তুমিও অনেক কিছু

আমাকে বলেছিলে, বিয়ের পরই তোমার লিফট্ হবে, তুমি দারুণ ফ্ল্যাট পাবে কোম্পানির, গাড়ি পাবে, কত কী-ই তো তুমি বলেছিলে।

কত মিথ্যা স্বপ্নই তখন দেখেছিলাম। তুমিই দেখিয়েছিলে। অন্য সমস্ত ইচ্ছাগুলোই যখন মিথ্যা হল, তুমি শুধু ফ্রিজটাই সত্যি করতে গেলে কেন। তাও আবার আমারই কাকার কাছ থেকে টাকা ধার করে। ছিঃ ছিঃ আমি ভাবতে পারিনি, তুমি এত ছোট, তুমি আমাকে এমন করে ঠকাবে সবদিক দিয়ে, আমার এমন করে সর্বনাশ করবে তুমি রমেন।

তারপর বললাম, কেন তুমি এমন করলে বলো? আমি তো তোমার কোনো ক্ষতি করিনি, তবে, আমার জীবনটা একটা মস্ত ধাপ্পার মধ্যে দিয়ে এমন করে নষ্ট করে দিলে কেন? বলো, বলো?

আমার কী হল জানি না, আমি ঝরঝর করে কাঁদতে লাগলাম। অনেকদিন আমি কাঁদি না অমন করে। আমার দেওয়ালে মাথা ঠুকে কাঁদতে ইচ্ছা করল। হয়তো বুকের মধ্যে অনেক কান্না জমে ছিল কোনো উৎসমুখের অপেক্ষায়, যে উৎসে তা উৎসারিত হতে পারে।

আজ আমার কান্না থামতে চাইল না সহজে।

রমেন আমাকে বসে বসে দেখতে লাগল।

আমি ঠোঁট কামড়ে কাঁদছিলাম, যাতে শব্দ না হয়।

রমেন আমাকে দেখে হাসছিল, ওর মুখে একটা অদ্ভুত কুটিল হাসি ফুটে উঠেছিল।

কিছুক্ষণ পর আমি বললাম, তুমি আজই এই ফ্রিজ বিক্রি করে দাও। আজই এ বিক্রি করে সে টাকা নিয়ে কাকার ধার শোধ করো।

রমেন হাসল, বলল, পুরোনো ফ্রিজ কে কিনবে? তাছাড়া বিক্রি হলেও কতই বা দাম পাওয়া যাবে এর। আর বিক্রি করব বললেই তো বিক্রি হবে না। বিক্রি যদি হয়ও তো এখন এক হাজারের বেশি দাম পাওয়া যাবে না।

একটু পরেই রমেন হেসে উঠল একটু চুপ করে থেকে।

বলল, একটা রাস্তা আছে। যে-কোনো দামে এটাকে বিক্রি করা যেতে পারে। এক্ষুনি। আমি এমন একজনকে জানি সে এর জন্যে যে-কোনো দাম দিতেই রাজি আছে।

আমার মাথার মধ্যে ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল। আমি বললাম, কে সে?

রমেন অর্থপূর্ণ হাসি হাসল, বলল, সে একজন আছে।

আমি বললাম, হেঁয়ালি অন্য সময় কোরো। তোমাকে এই আমার আলটিমেটাম। আজকের মধ্যে এই ফ্রিজ বিক্রি করে আমার কাকার ধার শোধ করতে হবে তোমার। তোমার লজ্জা করে না? তুমি সর্বক্ষণ স্টেট এক্সপ্রেস সিগারেট খাচ্ছ, কথায় কথায় ট্যাক্সি চড়ো, তোমার ভাব দেখলে মনে হয় তুমি যেন কোথাকার রাজা-মহারাজা!

কিন্তু একবারও মনে পড়ে তোমার যে, এত ধার বাজারে। পৃথিবীর সব লোকের কাছে ধার। এই ধার-করা চালিয়াতি করতে তোমার লজ্জা করে না?

করে না। কখনও করবে না। যারা বোকা, যারা ইডিয়ট তারাই আমাকে ধার দেয়। যারা দেয় তারাও জানে এবং আমিও জানি যে ধার কখনও শোধ হবে না। শোধ যখন দেবই না তখন ও নিয়ে মনোকষ্ট পেয়ে কী লাভ? ধার করি আর যাই-ই করি তোমাকে তো অসুখী রাখিনি?

আমি বললাম, না। পরম সুখে রেখেছ। দু'বেলা ভাত খাওয়ালেই তো সুখ। ধারের টাকায়, জুয়ার টাকায় আমাকে ট্যাক্সি চড়ালে, নটরাজে খাওয়ালেই সুখ। তুমি তো তাই মনে করো। মনে আমার কত যে সুখ তা আমিই জানি।

বলেই, আমি উঠে এলাম বসবার ঘর থেকে। ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। আমার কিছুই ভালো লাগছিল না।

দুপুরের দিকে রমেন দাড়ি-টাড়ি কামিয়ে সেজেগুজে কোথায় যেন বেরোল।

ফিরে এল যখন তখন সন্ধে হয়ে গেছে।

এসেই বলল, ফ্রিজটা বিক্রি করে এলাম।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কততে বিক্রি করলে? কার কাছে?

রমেন হাসতে লাগল, হাঃ হাঃ করে। বলল, চার হাজারে। যততে কিনেছিলাম তার দু গুণ দামে। এখনও পৃথিবীতে অনেক গাধা আছে। যারা "পেরেমে" বিশ্বাস করে।

তারপর রমেন বলল, বিয়ের পর থেকে তোমাকে তো কিছুই দিইনি। এবার তোমাকে এই টাকায় একটা গয়না বানিয়ে দেব।

আমি বললাম, কাকার টাকা শোধ দেবে না?

নিশ্চয়ই। শোধ দেবার পর যা থাকবে তাই দিয়ে বানিয়ে দেব।

আমি বসে বসে এলোপাতাড়ি ভাবছিলাম। ভাবছিলাম কার কাছে গিয়ে রমেন এত তাড়াতাড়ি এই পুরোনো ফ্রিজ বিক্রি করে আসতে পারে, আর কে এমন সত্যি সত্যিই বোকা লোক যে এই ফ্রিজ চার হাজার টাকায় কিনল?

ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম পরদিন সকালে।

সুশান্ত একেবারে ভোরেই এসে হাজির এ বাড়িতে। যে পায়জামা পাঞ্জাবি পরে শুয়েছিল, তা পরেই।

এসেই ও রমেনকে একটা খাম দিল। বলল, আপনি যা চেয়েছিলেন। দশ টাকার নোট আছে, চার হাজার। কালই ব্যাঙ্ক থেকে তুললাম।

রমেন বলল, থ্যাঙ্ক য়্যু। আপনি আমার বড় উপকার করলেন। তারপর বলল, ফ্রিজটা পাঠিয়ে দিই এক্ষুনি?

সুশান্ত বলল, না, না, এখানেই থাক না। পরে নিয়ে যাব একসময়। আমার এক বন্ধু একটা ফ্রিজের খোঁজ করছিল, তাকে দেখাব। তার পছন্দ হলে তখন নিয়ে গেলেই হবে।

আর তার পছন্দ না হলে?

বলে রমেন হাসি হাসি মুখ করে তাকাল সুশান্তর দিকে।

সুশান্ত বলল, না হলে পড়েই থাকবে। কখনও হয়তো কারও পছন্দ হবেই। যতদিন না হয় আপনারাই ব্যবহার করুন। আমার তো ফ্রিজ আছেই একটা।

আমি কোনো কথা বললাম না, চুপ করে বসে থাকলাম।

সুশান্ত অস্বস্তি বোধ করছিল, একটু পরই বলল, উঠি!

আমি বললাম, আপনার কত খরচ হল কাল? জামিনে খালাস করার জন্যে রমেনকে?

সুশান্ত বলল, ও কিছু না।

আমি দৃঢ় গলায় বললাম, কিছু না হলেও এখুনি এই ফ্রিজের টাকা থেকে তা আপনি কেটে নিন।

রমেন বলল, আহা। সুশান্তবাবু যেন আমাদের পর। তুমি এমন ছোটমনের লোকের মতো কথা বলছ কেন নীরু? বলেই খামটাকে রাখল।

আমি অবাক হয়ে রমেনের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

তারপর সুশান্তকে বললাম, না বলুন, কত খরচ হয়েছে?

সুশান্ত তবু উত্তর দিল না। মুখ নিচু করে রইল।

সুশান্ত বলল, আমি কী আপনাদের পর?

আমার বেশ রাগ হয়ে গিয়েছিল।

বললাম, নিশ্চয়ই। পর ছাড়া আর কী?

সুশান্ত কোনো উত্তর দিল না। বলল, চলি এখন।

রমেন বলল, ওকি বসুন, এত ভোরে এলেন, চা খেয়ে যান এক কাপ।

সুশান্ত বলল, নাঃ, বাড়ি গিয়েই খাব, অফিসের জন্যে তৈরি হই গিয়ে। আজ একটু তাড়াতাড়ি যেতে হবে।

সুশান্ত চলে যেতেই, রমেন আমার মুখের দিকে তাকাল। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। আমার মুখের ভাব বোঝার চেষ্টা করতে লাগল। আমি তা বুঝতে পেরে মুখ তুললাম না।

রমেন বলল, তোমার বড়কাকাকে দু'হাজার টাকা দেব। বাকি দু'হাজার আমার। আমার স্ত্রীর সঙ্গে একজন ক্যাবলা লোককে প্রেম করতে দিচ্ছি তার ট্যাক্স।

আমি চমকে উঠলাম, বললাম, রমেন, মুখ সামলে কথা বলো।

রমেন হাসল। বলল, আমার অভ্যেসই নেই সামলে কথা বলার। তবে তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। মিষ্টি মিষ্টি কথা বোলো। বলল, ইতি-উতি চাও তো চাও। কিন্তু বাড়াবাড়ি কোরো না। আমার কাছে একটা স্প্রিং-নাইফ আছে। দু'জনকেই শেষ করে দেব।

আমার চোখ দিয়ে জল বেরোতে লাগল।

আমি বললাম, ছিঃ ছিঃ কী ভাষা তোমার, তোমার কী কাজ? তুমি না ইঞ্জিনিয়র, তুমি না লেখাপড়া শিখেছ, তুমি না আমার স্বামী। তুমি তো এমনিতেই অনেক কষ্ট দিয়েছ আমায়, অনেক অসম্মান করছ প্রতি মুহূর্তে, তবু এ আবার নতুন কী পথ, নতুন কী ছল তোমার মাথায় এল।

আমি মনে মনে বলছিলাম, রমেন, তুমি আমার যা ছিল সব কেড়েছ। আমার বাপের স্নেহছায়ার আশ্রয়, আমার যুবতী শরীরের সব ফুল, আমার অল্পবয়সি মনের সব সাধ। তোমাকে আর কিছু কাড়তে দেব না। আমার নতুন পাওয়া সুশান্তকে আমি কাড়তে দেব না। এটুকু জেনো রমেন, এ জীবনে কেউ কারও প্রতিই এমনি আকৃষ্ট হয় না; যখন কেউ সত্যিকারের আকৃষ্ট হয়। তুমি ছল করেছিলে, তুমি ভণ্ড, জোচ্চোর, তুমি ভালোবাসার কী বুঝবে?...তোমার কাছে এক দিক দিয়ে আমি ঋণী।

ভালোবাসার সস্তা স্মার্ট অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে আজ আমি একটু একটু করে বুঝতে পারি ভালোবাসার মানে কী। কাউকে সত্যিকারের ভালোবাসলে গায়ে কেমন কাঁটা দিয়ে ওঠে। বুঝতে পারি ভালোবাসলে কেউ কাউকে ঠকায় না, ভালোবাসার জনের জন্যে হাসিমুখে সে নিজে ঠকে।

মনে মনে দাঁত চেপে নিজেকে বললাম, তুমি আমার সব কেড়েছ রমেন, তুমি আমার শেষের অবলম্বন সুশান্তকে কাড়তে পারবে না।

আমি বললাম, রমেন আরও ক'টা দিন আমাকে দয়া করো, তোমার পায়ে পড়ি আমাকে দয়া করো। এখন আমার বাড়ির ফেরার উপায় নেই। এখন ফেরার চেয়ে, বাড়ি ফিরে আমি তোমাকে ছেড়ে এসেছি বলার চেয়ে, আমার আত্মহত্যা করা ভালো। আরও কিছুদিন তোমার সঙ্গে আমাকে থাকতে দাও। রমেন, তুমি আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার কোরো না। তোমার পায়ে পড়ি রমেন।

রমেন তবুও হাসতে লাগল। বলল, লোককে কষ্ট দিয়ে আমার দারুণ আনন্দ লাগে। বিশেষ করে তোমার মতো কোনো সুন্দরী মেয়েকে। এতদিন জানতাম, তুমি বোকা। আজ দেখছি তোমার চেয়েও বোকা লোক পৃথিবীতে আছে। ভালো। অনেকদিন বাদে একটা ভালো ভালোবাসায় জরজর

মুরগি পাকড়েছি। তোমার সামনে এর পালক ছিঁড়ব আমি এক এক করে। তুমি দেখো। সুশান্ত বোস জানে না, কার ঘরে সে খাপ খুলতে এসেছে।

রমেনের সঙ্গে আমার আর কোনো কথাই বলতে ইচ্ছে করছিল না।

আমি ওঘর ছেড়ে উঠে শোবার ঘরে চলে গেলাম।

রমেন মুখীকে আবার চা দিতে বলে খুক্ খুক্ করে কাশতে কাশতে সিগারেট খেতে লাগল।

একটু পরে রমেন তৈরি হয়ে কারখানায় গেল। যাবার আগে আলমারি খুলে ওর ড্রয়ারে টাকা রাখল। দেখলাম একমুঠো টাকা নিয়ে প্যান্টের হিপ পকেটে গুঁজে নিল যাবার সময়। কত টাকা, তা ওই জানে।

রমেন চলে যেতেই আমি চান করে তৈরি হয়ে নিলাম। তারপর দশটা নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম।

সুশান্তর অফিসটা বিষ্টুপুরে।

বাস থেকে নেমে খুঁজে খুঁজে জিজ্ঞেস করে করে যেতে যেতে অনেক সময় লাগল।

অফিসটা বিরাট। ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করেছে। সুন্দরী একজন পার্সি মেয়ে রিসেপশনিস্ট বসে আছে রিসেপশনে।

সুশান্তর নাম বলতেই, ও ইন্টারকমে কথা বলল সুশান্তর সঙ্গে, আমার নাম বলল, তারপর বলল, উনি একটু ব্যস্ত আছেন। পনেরো মিনিট যেন আমি বসি, যেন চলে না-যাই।

চলে যাবার জন্যে আমি আসিনি। তাই বসলাম।

আজ রমেন যা বলল, তাতে আমার সত্যিই ভয় করতে লাগল। এখন থেকে সুশান্তর সঙ্গে বাড়িতে দেখা করব না আর। বাড়িতে দেখা করতে বড় ভয় করে—ওর বাড়িও আমাদের বাড়ির কাছে।

তাছাড়া রমেনের পক্ষে আমাদের পিছনে চর লাগানোও অসম্ভব নয়।

আমি আমার জন্যে ভয় পাই না। আমার যা হবার হবে। আমার যা হয়েছে এর চেয়ে বেশি আর কী হবে? কিন্তু আমার জন্যে সুশান্তর যদি কোনো বিপদ ঘটে, তো সে দুঃখ রাখার জায়গা থাকবে না আমার।

কিছুক্ষণ পর একজন সাহেব ও একজন পাঞ্জাবি ভদ্রলোক একটি চেম্বার থেকে বেরোলেন, তাদের পিছন পিছন সুশান্তও বেরোল, বেরিয়ে রিসেপশন অবধি এসে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে ভিতরে গেল।

ঘরের ভিতরে ঢুকতেই দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। দরজায় ডোরক্লোজার লাগানো ছিল।

একটা সাদা গ্রিলের এয়ারকন্ডিশনার চলছিল ভিতরে।

সুশান্ত একটা চেয়ার টেনে আমাকে দুহাতে ধরে বসাল, তারপর আমার গ্রীবায় আলতো করে একটা চুমু খেল।

আমি লজ্জায়, ভালোলাগায় মরে গেলাম।

সুশান্ত নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল, বসে বলল, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা এত তাড়াতাড়ি ঘনিষ্ঠ হয়ে গেল, বলার নয়। নিজেই নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছি না।

তারপরই বলল, এক মিনিট বোস্রো, আমি এই চিঠি কটায় একটু সই করে দিই, নইলে ডাক ধরতে পারবে না।

সুশান্ত আমার সামনে বসেছিল। ও মুখ নীচু করে বসে খসখস করে চিঠি সই করছিল। তার আগে একবার করে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিল চিঠিগুলোতে।

আজ ও একটা নীলের ওপর সাদা ডোরাকাটা টাই পরেছিল। চওড়া কলারের সাদা শার্ট, মোটা

ফ্রেমের কালো চশমা, সুন্দর টাইয়ের সঙ্গে ম্যাচ-করা নীল কাফলিংকস। সুশান্তকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল। এবং খুব বুদ্ধিমান বলে মনে হচ্ছিল।

তবে? রমেন যে বলছিল ও বোকা। বলছিল ও পাঁঠা, মুরগি, আরও কত কী বলছিল। সত্যি! রমেন একটা ক্যারেকটার। অন্য কেউ হলে ওকে নিয়ে হাসা যেত। কিন্তু ও যে আমার স্বামী।

টেলিফোনটা বাজল। সুশান্ত ফোনটা তুলল। কার সঙ্গে যেন ইংরিজিতে কথা বলছিল। কোনো কাস্টমার হয়তো কমপ্লেন করছিলেন, তাকে নরম গলায় বোঝাচ্ছিল সুশান্ত, দোষ স্বীকার করছিল; ক্ষমা চাইছিল অন্যায়ের জন্যে।

সেই লাইন কেটে যাবার পরই, ইন্টারনাল বোর্ডের লাইনটা ট্যাপ করে সুশান্ত মিস্টার কাপুর বলে কাকে যেন চাইল। তারপর দেখলাম, সুশান্ত অন্য লোক। দেখলাম ও রমেনের চেয়েও হিংস্র। কিন্তু ওর রাগের ঘোড়ার রাশ ওর নিজের হাতে।

কত ভদ্রভাষায়, আস্তে আস্তে অথচ দৃঢ়তার সঙ্গে কাউকে গালমন্দ করা যায় তা দেখছিলাম। শেষে সুশান্ত বলল, এর পরে যদি এরকম করো তাহলে জানব যে তুমি আমাদের কোম্পানির মতো বাজে কোম্পানিতে চাকরি করতে চাও না।

বলেই ফোনটা ছেড়ে দিল।

ফোন ছেড়ে, চিঠি সই শেষ করে বলল, তারপর? বলো? কী মনে করে? হঠাৎ অফিসে?

আমি বললাম, আপনার সঙ্গে ঝগড়া করতে এলাম।

সুশান্ত হাসল। একটা চারমিনার সিগারেট ধরাল। বলল, তোমার মতন একজন মেয়ের সঙ্গে আমি ঝগড়া করতে রাজি নই! কোনোদিনও রাজি নই।

আমি শক্ত গলায় বললাম, আপনার কি পয়সা বেশি হয়েছে?

বেশি কথাটা রিলেটিভ। আমার প্রয়োজন যা তার তুলনায় হয়তো বেশিই। কিন্তু তা বলে সস্তা নয়। আমাকে অনেক খেটে রোজগার করতে হয়। বাবা ঠাকুর্দা বা শ্বশুরমশায় কিছু রেখে যাননি আমার জন্য। রেখে গেলেও তা নিতাম না হয়তো। আর কী বলব?

এমনভাবে পয়সা নষ্ট করার কী মানে হয়? রমেনের কথায় আপনি চার হাজার টাকা দিয়ে দিলেন? আপনার তো ফ্রিজ আছেই, তবু কেন এমন করলেন।

সুশান্ত হাসল। বলল, ওটা তো যা-তা ফ্রিজ নয়, ওটা যে নিরুপমার ফ্রিজ। তাই দাম বেশি হবে বইকী।

আমি বললাম, ভালো হচ্ছে না। সবসময় ঠাট্টা ভালো লাগে না।

সুশান্ত গম্ভীর গলায় বলল, ঠাট্টা করছি না নিরুপমা। সত্যি কথাই বলছি।

আমি যা করেছি জেনেই করেছি। তুমি বলো? অন্যায় করেছি?

নিশ্চয় অন্যায় করেছেন। আমি বললাম।

তাহলে করেছি। কী শাস্তি দেবে দাও।

আমি লজ্জা পেলাম, বললাম আমি আবার কী শাস্তি দেব?

হঠাৎ সুশান্ত অন্য স্বরে বলল, নিরুপমা, তুমি এত বোকা কেন?

মানে?

মানে তুমি নিজেকে ভালোবাস না কেন? তুমি নিজের জীবনকে ভালোবাস না কেন? তুমি কি বিশ্বাস করো যে পুনর্জন্ম আছে? পুনর্জন্ম যখন নেই, যখন আমাদের একটাই এবং একইমাত্র জীবন তখন সে জীবনে তোমার নিজের কোনো অধিকার নেই নিজেকে ঠকাবার। তোমার নিজের জন্যেই তোমাকে বাঁচতে হবে। বাঁচার মতো বাঁচতে হবে।

বাঁচতে তো চেয়েছিলাম।

এখন কি মরে গেছ? বাঁচার উপায় কি নেই?

জানি না। হয়তো আছে।

হয়তো নয়। নিশ্চয়ই আছে।

কে বাঁচাবে?

তুমি নিজে বাঁচাবে নিজেকে। অন্য কেউ কি বাঁচাতে পারে? কখনও পারে না। যার বাঁচার, সে নিজে বাঁচে, যার মরার সেও নিজেই মরে।

আমি বললাম, বিশ্বাস করুন! আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না।

সুশান্ত বলল, অনেক সময় আমারও করে না। কিন্তু সেটা সাময়িক। বাঁচতে হবে বইকী। আমার জন্যে আমার, তোমার জন্যে তোমার। আমাদের সকলেরই বাঁচতে হবে।

আমি বললাম, এসব বড় বড় কথা। আমি আপনাকে সাবধান করে দিতে এসেছি।

সুশান্ত চোখ বড় বড় করে বলল, কী ব্যাপার?

আমি সব বললাম. ও সব শুনে হেসে উঠল হো হো করে। বলল, দারুণ ইন্টারেস্টিং ব্যাপার তো।

আমি বললাম, আপনার ভয় করছে না?

সুশান্ত উত্তর দিল না। হাসতে লাগল। তারপরই বলল, তুমি কলকাতা যাবে কবে?

আমি বললাম, আমি তাড়াতাড়ি গেলে কি আপনি সুখী হন?

সুশান্ত বলল, হই।

আমি কথা বললাম না।

খারাপ লাগল ওর কথাটা।

ও বলল, দুটি কারণে সুখী হই। প্রথমত, তুমি তোমার বাবার কাছে যাচ্ছ বলে, আর দ্বিতীয়ত, তুমি দূরে গেলে তোমাকে আরও বেশি করে ভালোবাসতে পারব বলে।

আমি হাসলাম। বললাম, কাছে থাকলে বুঝি বেশি করে ভালোবাসা যায় না?

ও বলল, যায়। তবে সেটা হচ্ছে স্থূল ব্যাপার। দূরের ভালোবাসাটা অনেক সূক্ষ্ম।

আমি বললাম, তাই বুঝি?

সুশান্ত আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল। ও হঠাৎ বলল, তুমি কি জানো, তোমার প্রভাব আমার ওপর কতখানি—তুমি কি জানো, যে তোমার মতো মেয়ে দেশ ছেঁচে পাওয়া যায় না। তুমি কি কখনও জেনেছ যে তুমি কী?

বললাম, রমেনও কলকাতার স্কাইরুমে বসে এরকম কথা বলেছিল আমাকে। রমেন আমাকে চেয়েছিল। আপনিও কি তাই চান? আপনারা পুরুষরা কি সবাই একরকম? যা চান তা পেয়ে গেলে, আপনাদের তা ধুলোয় ফেলতে, তা মাড়িয়ে যেতে একটুও কি বাধে না?

সুশান্ত হাসছিল। ও হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। ওর মুখে কেমন একটা বিষাদ এসে বাসা বাঁধল।

ও বলল, না। রমেন যা চেয়েছিল তোমার কাছে আমি তা চাই না। আমি আসলে কিছুই চাই না; চাওয়ার মতো। আমি যা চাই, তা আমার জন্যে নয়। কেন এবং কী চাই তা তুমি হয়তো একদিন বুঝতে পারবে। যদি না বোঝো, তাহলেও ক্ষতি নেই। তোমার মনে আমার সম্বন্ধে যেরকম খুশি একটা ধারণা করে নেবে।

তার জন্যে দুঃখ নেই। আমার জন্যে ভেব না। আমি আজও তোমার জীবনে কোনো সমস্যা নই; কখনও হব না।

এমন সময় একটা ফোন বাজল।

সুশান্ত বলল, বড়সাহেব ডাকছেন। তুমি বোসো একটু।

আমি বললাম, না। আমি উঠব।

উঠবে? সুশান্ত বলল। তারপর বলল, এখন তো স্কুল ছুটি। মাঝে মাঝে ফোন কোরো সময় পেলে। তোমার যদি মন খারাপ লাগে। বলেই একটা কার্ড দিল সুশান্ত।

ও উঠে দাঁড়াল। আমি উঠে দাঁড়ালাম।

হঠাৎ সুশান্ত আমার ডান হাতের পাতাটা ঠোঁটের কাছে তুলে চুমু খেল। বলল, তোমার মতো সুন্দর হাত আমি কারও দেখিনি।

আমি কিছু বললাম না। বলতে ইচ্ছে হল যে, এ হাতে এমন চুমুও কেউ খায়নি। সকলের সব জিনিস দেখার চোখ থাকে না। ছেলেদের চোখ মেয়েদের হাতের দিকে চাইবার অবকাশ পায় না।

ঘর থেকে বেরিয়ে আমি বললাম, আমি যেজন্যে এসেছিলাম, তা আবার বলে যাই।

সুশান্ত ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে বলল, বলো?

আমি বললাম, আপনাকে এমন করে ঠকতে দেব না আমি আব। এতে আপনি কাব উপকার করছেন? নিজের অপকার করা ছাড়া এতে লাভ কী?

সুশান্ত বলল, একটা কথা বলব?

আমি দাঁড়িয়ে পড়ে বললাম, বলুন।

ও বলল, আমি তোমাকে যেমন ভালোবাসি, তুমি যদি তেমন করে কোনোদিন কাউকে ভালোবাস, কোনোদিনও; সেদিন জানবে যে, ভালোবাসার জনের জন্য ঠকার সুখ কী এবং কতখানি।

একটু থেমে বলল, চালাক লোকেদের একরকমের আনন্দ, বোকা লোকদের অন্যরকমের। আমি বোকা লোক। আমি বোকাই থাকতে চাই। তুমি যদি কখনো আমার মতো করে কাউকে ভালোবাস, সেদিন আমার কথার মানে বুঝতে পারবে। আজ এ আলোচনা থাক।

বলেই, ও চলে গেল। আমার দিকে হাত তুলল, বলল দেখা হবে।

ওর অফিস থেকে বেরিয়ে আমার মনে হল আমার সব গোলমাল হয়ে গেল।

ও সত্যি সত্যিই চালাক না ভীষণ বোকা এখনও বুঝতে পারলাম না।

কখনও কি বুঝব?

৯

আমি রমেনকে ভালোবাসি না?

যাকে ভালোবেসে এতদিন এত কাণ্ড করেছিলাম, নিজের জেদের জন্যে সকলের অমতে লড়েছিলাম, তার জন্যে কি আমার আর কোনো বোধই অবশিষ্ট নেই? যাকে আমার শরীরের স্বর্গ ও মনের ময়ূর সিংহাসনে তখন সম্মানিত অতিথি হিসেবে এনে বসিয়েছিলাম, তার প্রতি আজ কি আমার কোনো দুর্বলতাই নেই?

জানি না। আমি নিজেকে বুঝতে পারি না। কেউই কি সম্পূর্ণভাবে পারে?

রমেন খারাপ বলে তাকে আজ ত্যাগ করা কি আমার ন্যায় হবে? আমার কি উচিত হবে না যে আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা? রমেন সুস্থ ও স্বাভাবিক না হলে আমার সন্তানের পিতৃত্বের অধিকার ও কোনোদিনও পাবে না। সে অধিকার

আমি মরে গেলেও তাকে দেব না—যতদিন না ও নিজেকে শোধরাচ্ছে। আমাকে নিয়ে ও যা-খুশি করুক—বাঁধা পড়েছি আমি নিজের জালে—নিজের দোষে। কিন্তু আমার অনাগত আমিকে আমার প্রথম যৌবনের সমস্ত দুষ্টু ও মিষ্টি ইচ্ছেগুলোকে আমি নাভিমূলের সঙ্গে সংযুক্ত আমার জরায়ুর মধ্যে সঞ্জাত আমার স্বপ্নের কাউকে আমি রমেনের কদর্যতার শিকার হতে দেব না। আমার মধ্যের অদেখা, অনামা, অননুভূত ছোট্ট আমিটাকেও যদি ও এমন করে কলুষিত করে ফেলে তাহলে কাকে নিয়ে আমি বাঁচব? কোন্ গর্বে ভর করে আমি বেঁচে থাকব তারপর?

রমেন ইচ্ছে করলেই ভালো হতে পারত। ভালো হওয়ার সব উপাদান ওর মধ্যে ছিল, কিন্তু যে একবার ঠগী হয়ে গেছে, ছল-চাতুরী মিথ্যাচার যার মজ্জায় মজ্জায় বাসা বেঁধে গেছে, সে সমস্তরকম ন্যায় ও মেহনতের পথকে ভয় করে। যা সহজে চুরি করে লোকঠকিয়ে পাওয়া যায় তার জন্যে কোন্ বোকা পরিশ্রম করে? রমেন সেই সব চালাক লোকদের দলে পড়ে; য়ারা এইরকম বোকামিতে বিশ্বাস করে।

রমেন যদি আজ অথবা ভবিষ্যতে কোনোদিনও নিজেকে শুধরে ফেলে, নিজের মধ্যে ঠগীটাকে ঠ্যাঙাড়ের দল দিয়ে নিগৃহীত করায় তাহলে আমি হয়তো রমেনের সঙ্গেই সবচেয়ে সুখে ঘর করব। কারণ রমেনের ভালো হওয়ার সঙ্গে যে আমার জেদ, আমার আত্মসম্মান, আমার সমস্ত অস্তিত্বের প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। রমেনকে নিয়ে সুখী হতে পারলে আমি আর কাউকেই চাই না। এমনকি সুশান্তকেও নয়।

রমেন আজ এমনভাবে আমাকে অপমানিত, বঞ্চিত, ক্ষুব্ধ করেছে বলেই তো সুশান্ত এসে আমার মনের দরজায় দাঁড়িয়েছে। রমেনকে নিয়ে সুখী হলে হয়তো আমার মনে আর কেউ অত সহজে ছায়া ফেলতে পারত না। আমার মন অন্তত দারুণভাবে তাকে প্রতিহত করতে চেষ্টা করত—এমনভাবে তাকে স্বেচ্ছায় বরণ করত না। আমার সব অশান্তি, সব দ্বন্দ্বর মূলে রমেন। রমেন আমার জীবনের শনি; অথচ ওই আমার বৃহস্পতি, আমার চন্দ্র, আমার বুধ। আমার ওই অমঙ্গল এবং আমার সর্বমঙ্গল।

আজ সকাল থেকেই আকাশে মেঘের আনাগোনা। ঝুরুঝুরু করে একটা হাওয়া বইছে। এতদিন পরে অবশেষে জামশেদপুরে বৃষ্টি হবে।

এই আকাশের মেঘলা ঠান্ডা মিষ্টি হাওয়ায় মনটা কেমন উদাস উদাস লাগে। সকাল থেকেই কেমন কুঁড়েমি লাগছিল। কিছুই করতে ভালো লাগছিল না।

রমেন কারখানায় চলে গেছে অনেকক্ষণ। অনেকক্ষণ গড়িমসি করে প্রায় বারোটা নাগাদ চান করতে গেলাম। অনেকক্ষণ ধরে চান করলাম আজকে। মাঝে মাঝে আমার নিজেকে পরীর মতো পরিষ্কার করতে ইচ্ছে করে। পবিত্র করতে ইচ্ছে যায় সমস্ত শরীর, কুমারী মেয়েদের মতো। কিন্তু আমি তো আর কুমারী হতে পারব না।

চান করে উঠে জামাকাপড় পরে কী করব কী করব ভাবছি, এমন সময় দরজায় কে যেন কড়া নাড়ল।

দরজা খুলে দেখি সুশান্ত। ওকে দেখে আমি চমকে উঠেছিলাম। ভালো লেগেছিল খুব। বলেছিলাম, আপনি? অসময়ে?

সুশান্ত লজ্জা পেয়েছিল। বলেছিল, এই খেতে এসেছিলাম বাড়িতে, ভাবলাম, দেখে যাই তুমি কী করছ?

আমি বললাম, বসুন।

সুশান্ত সোফায় বসেছিল। বসেই বলেছিল, তুমি আমার সামনে এসে বোসো। তোমাকে একটু ভালো করে দেখি।

আমি বলেছিলাম, আমি কি দেখার মতো? দেখে কি আশ মেটেনি?

—দেখার মতো কিনা সে তো যে দেখবে সে বুঝবে। আর আশ কী অত সহজে মেটে?

আমি কথা না বলে ওর সামনে এসে বসেছিলাম।

ও একদৃষ্টে আমার চোখের দিকে চেয়েছিল, তার দু'চোখের মণিতে কী যেন খুঁজছিল। ওর কী যেন হারিয়ে গিয়েছিল—এমনভাবে ও চাইছিল আমার চোখে, যেন কোনো হারানো জিনিস ও খুঁজে পাবে।

আমি কথা বলছিলাম না কোনো। অবাক হয়ে সুশান্তর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। সুশান্ত একটা ব্রাউন রঙের সুট পরেছিল।

হঠাৎ সুশান্ত বলেছিল, নিরুপমা, তুমি আমাকে পছন্দ করো?

আমি একটুক্ষণ চুপ করে ছিলাম।

ও বলেছিল, কি পছন্দ করো না, না?

আমি চোখ তুলে বলেছিলাম, আপনি জানেন না?

ও অবুঝেব মতো বলেছিল, আমি জানি না। জানলেও আমি তোমার নিজের মুখ থেকে শুনতে চাই!

আমি ওর চোখের দিকে চেয়ে বলেছিলাম, করি। খু-উ-ব করি।

তারপর ও বলল, তুমি আমার জন্যে রমেনবাবুকে ছাড়তে পারো? পারো নীরু?

আমি চুপ করে ছিলাম। অনেকক্ষণ কথা বলিনি কোনো।

সুশান্ত অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে ছিল। যেন, কথাটা বলে খুব অপরাধ করেছে!

অনেকক্ষণ পর আমি বলেছিলাম, আমাকে একটু সময় দিন। আপনি আমাকে বুঝুন একটু। আপনি......।

সুশান্ত আমার কাছে উঠে এসেছিল, এসে আমাকে উঠিয়ে নিয়ে ওর বুকের মধ্যে টেনে নিয়েছিল। আমার ভীরু বুক ওর সবল ঋজু বুকে লুকিয়ে ছিল। আমার খুব জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ছিল।

আমাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে আমার সিঁথিতে ওর থুত্নি রেখে সুশান্ত বলেছিল, আমি জানতাম নীরু, আমি জানতাম। তুমি মানুষটা বড় নরম। বড় ভালো মেয়ে তুমি। তুমি কাউকে কষ্ট দিতে পারো না, কষ্ট দিতে চাও না, তাই তো সমস্ত কষ্ট তোমার নিজেকে একা বইতে হয়। তোমাকে আমি সম্মান করি। তোমাকে ভালোবাসি। তোমাকে ভালোবাসি বলেই বলছি, কখনও এমন কিছু কোরো না যাতে তোমার মন সম্পূর্ণভাবে সায় না দেয়। আমি তোমার মন বুঝি। কি? বুঝি না আমি?

তারপর একটু থেমে, আমার ঠোঁটে ওর নিজের ঠোঁট চেপে ধরে অনেকক্ষণ আমাকে আদর করল সুশান্ত। আমার মনে হচ্ছিল আমি এক্ষুনি ভেঙে পড়ব, নিজেকে সামলাতে পারব না বুঝি। ছিঃ ছিঃ সে বড় লজ্জার হবে। মরে গেলেও আমি সুশান্তকে বলতে পারব না যে, তোমার আদর আমার ভালো লাগছে। সুশান্তর ছোঁওয়া আমাকে এক মুহূর্তের মধ্যে পাগল করে তোলে—অথচ রমেন কাছে এলে আমার শরীর আড়ষ্ট হয়ে যায় আজকাল। সুশান্তর মধ্যে কী আছে, আমি জানি না।

হঠাৎ সুশান্ত বলল, নিরুপমা, তোমাকে তোমার সম্পূর্ণতায় দেখতে চাই। এরকম টুকরো টুকরো তোমাকে নয়। তোমার অনাবৃত অখণ্ড তুমিকে। কি? আপত্তি? আমার প্রার্থনায় আপত্তি?

আমার সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল। লজ্জায়; আবার ভালোলাগাতেও।

সুশান্ত আবার বলল, কি? দেখতে দেবে না? দেখাবে না?

আমি মুখ নীচু করে বললাম, ঐ সব ভালো না। আমার ইচ্ছা করে না। আমার ভীষণ লজ্জা করে। আমার কী আছে দেখাবার মতো?

সুশান্ত বলল, আমার কিন্তু খুব ভালো লাগত। আমি কিন্তু খুব খুশি হতাম। আমাকে খুশি দেখতে চাও না তুমি?

আমি সুশান্তর মুখে আমার ডান হাতের আঙুল চাপা দিয়ে বললাম, চাই; চাই।

আমার মন বলল, তোমাকে আমি সবসময় খুশি দেখতে চাই সুশান্ত। তুমি অমন করে বোলো না।

তারপর অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে আমি বললাম, শুধু দেখাই কিন্তু। আর কিছু না। ঠিক তো?

সুশান্ত আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেই বলল, বেশ। শুধুই দেখা। তুমি দেখো; আর কিছুই না। তারপর বলল, নিরুপমা, তুমি আমাকে ভরসা করতে পারো। জোর করে কিছু পাওয়ায় কখনও আমি বিশ্বাস করিনি। তোমার যা ইচ্ছা করে না তা আমি কখনও চাইব না। সেই ইচ্ছাবিরুদ্ধ পাওয়ার দাম অন্যদের কাছে কী জানি না, কিন্তু আমার কাছে সে পাওয়া সম্পূর্ণ মূল্যহীন।

আমি বললাম, আপনি দাঁড়ান এখানে। আমি শোবার ঘরে যাচ্ছি।

সুশান্ত শুনল না। আমার সঙ্গে সঙ্গে শোবার ঘরে এল।

তারপর আমাকে নিজহাতে পরম যত্নে অনাবৃত করল।

আমার দু বুকে চুমু খেয়ে সুশান্ত বলল, তুমি কী সুন্দর নিরুপমা। তুমি কী দারুণ সুন্দর।

শাড়ি আমি খুলে ফেলেছিলাম। সুশান্ত শায়াটাকে টেনে নামাতে যেতেই আমি চোখ বন্ধ করে ফেললাম। আমি চোখ বন্ধ করেই বললাম, আমি খুলে দিচ্ছি। বলে চোখ বন্ধ অবস্থাতেই শায়াটা টেনে নামালাম আমি।

কিছুক্ষণ পর সুশান্ত আমার নাভিতে চুমু খেল। তারপর নাভির নীচে।

আমি দু পা জোড়া করে শুয়েছিলাম। পুরুষজাতটাকে বিশ্বাস নেই। এমনকি সুশান্তকেও না। কিন্তু সুশান্ত কথার খেলাপ করেনি কোনোরকম। আশ্চর্য!

ও শুধু বলতে লাগল, নিরুপমা, আমি জীবনে কখনও কোনো অনাবৃত যুবতীকে দেখিনি। বিশেষ করে, যাকে আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে তাকে। তুমি কী সুন্দর নিরুপমা! তোমাকে প্রথম দিন দেখার পর থেকেই তোমার শরীর সম্বন্ধে একটা কল্পনা করতাম। তুমি জানো না, কতদিন তোমাকে তোমার নগ্নতার স্বপ্ন দেখেছি। সত্যি বলছি কত দিন। আমি তো ভগবান নই নিরুপমা, আমিও তোমারই মতো রক্তমাংসের একজন মানুষ। একজন অতি সাধারণ মানুষ। কিন্তু বিশ্বাস করো, তুমি আমার সেই সুগন্ধি স্বপ্নের চেয়েও সুন্দর—তোমার সবই সুন্দর নিরুপমা। নিরুপমা, নিরুপমা, বলতে বলতে সুশান্ত আমার সমস্ত শরীরে চুমু খেতে লাগল।

আমার শরীরটাকে আমার বড় ভয়। ভয় হল, আমি নিজে যদি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে বসি। আমি তো সুশান্তর মতো সংযমী নই।

আমি হঠাৎ বলে উঠলাম, আর না সুশান্ত, আর না। আজকে আর না। উঠুন, প্লিজ উঠুন।

সুশান্ত লক্ষ্মী ছেলের মতো সরে গেল।

আমি বললাম; বসবার ঘরে যান, আমি আসছি।

ও বসবার ঘরে চলে গেলে আমি জামাকাপড় পরে ড্রেসিং টেবলের সামনে চুলটা টিপটা ঠিক করে নিয়ে ওঘরে গেলাম। সুশান্ত একটা ঘোরের মধ্যে বসেছিল। আমাকে দেখামাত্রই বলতে লাগল, কী সুন্দব, তুমি কী সুন্দর! তারপর আমার হাতটা ওর হাতে নিয়ে বলল, ছোটোবেলা থেকে আজ অবধি এত সুন্দর কিছু আমি দেখিনি। সত্যি নিরুপমা।

আমি হাসলাম। বললাম, আপনি অনভিজ্ঞ তাই এ কথা বলছেন। যে-কোনো মেয়েই এমন সুন্দর। সব মেয়ের শরীরই একরকম। আমার কী এমন বিশেষ কিছু আছে, যা অন্যদের নেই? আপনি কখনও কাউকে এমনভাবে দেখেননি তাই বলছেন।

তারপর সুশান্তর থুতনি ধরে নেড়ে বললাম, বোকা কোথাকার। এত বয়স হয়েছে এখন পর্যন্ত কচি খোকা—কিছুই জানেননি, কিছুই দেখেননি।

সুশান্ত তখনও সেই ঘোরের মধ্যে বসেছিল। ও ঘোরের মধ্যে থেকেই হাসল। বলল, ভাগ্যিস বোকা ছিলাম, নইলে আজ কী নিরুপমাকে দেখতে গেতাম! জানো নীরু, আমার নজরটা চিরদিনই উঁচু—এর জন্যে আমি চিরদিন গর্বিত! আজ আমি ভগবানে বিশ্বাস করলাম। যিনি ফুল গড়েন, প্রজাপতি গড়েন, হলুদ-বসন্ত পাখি গড়েন, তুমি তাঁরই হাতের গড়া। তুমিও তো একটা পাখি। একটা দারুণ পাখি নীরু। আজ আমি সত্যিই প্রাপ্তবয়স্ক হলাম।

আমি হাসলাম। বললাম, বকে গেলেন বলুন। আমিই বকিয়ে দিলাম আপনাকে।

সুশান্ত হাসল। বলল, জীবনে এক বিশেষ ক্ষেত্রে আমি কিশোর ছিলাম। তুমি আজকে আমাকে যুবক করলে। নিরুপমার দয়ায় আজ আমি নিরুপম হলাম।

একটু চুপ করে থেকে সুশান্ত বলল, তুমি একদিন তোমার সম্পূর্ণ তুমিকে দিয়ে দেবে আমায়? একটুও বাকি না রেখে? কোনো দারুণ ক্লারিওনেটের মতো তোমাকে আমি খুশিমতো বাজাব। সেদিন শুধু দেখা নয়—যা আমার মন চাইবে, যা আমার শরীর চাইবে তা-ই করব। দেবে? সেদিন তুমিও আমাকে আমার চাওয়ার মতোই তীব্রতায় চাইবে তো? ঠকাবে না, ফাঁকি দেবে না আমাকে?

আমি কুঁকড়ে গেলাম। বললাম, আমার ওসব ভালো লাগে না। বিশ্বাস করুন, ইচ্ছা করে না। আপনি কি কখনও আমাকে জোর করবেন?

সুশান্ত খুব আশাভঙ্গতার চোখে তাকাল আমার দিকে।

তারপর বলল, না। কখনও না। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো ইচ্ছাই খাটাব না আমি। তুমি দেখবে, তোমার সব ইচ্ছার দাম আমি কেমন করে দিই। একদিন তুমি দেখতে পাবে।

তারপর হঠাৎ সুশান্ত বলল, নিরুপমা, আমাকে অন্য দশজন পুরুষ বলে ভাবলে ভুল করবে। আমি বলছি না যে অন্যদের চেয়ে আমি ভালো, শুধু বলছি যে, আমি অন্য রকম। আমাকে তুমি কখনও ভুল বুঝো না।

আমি বললাম, আমি জানি সুশান্ত। আমি জানি আপনি কী! আমি যা দিতে পারি না তা চেয়ে আপনি আমাকে কখনও দুঃখ দেবেন না। যখন সময় হবে, যদি হয়, তাহলে আপনা থেকেই দেব, আপনার চাইতে হবে না কিছু আমার কাছে। আপনি কিছু চাইলেন অথচ আমি দিতে পারলাম না এ কথা ভাবতেই আমার ভীষণ খারাপ লাগবে।

তারপর একসময় আমার কপালে চুমু খেয়ে সুশান্ত চলে গিয়েছিল।

ঠিক সেদিনই রাতে এক দারুণ ঘটনা ঘটল। রমেন কারখানা থেকে ফিরে চানটান করে বসবার ঘরে সোফায় বসেছিল। রমেনের মুখে ওর চিরাচরিত দুর্বিনীত অসভ্য ঔদ্ধত্যের বদলে কেমন যেন একটা অসহায়তা ছিল। এমন অসহায়তা আমি কখনও দেখিনি ওর মুখে আগে।

ইদানীং ওর সঙ্গে আমি বড় একটা কথা বলি না প্রয়োজন ছাড়া। কথা বলতে ইচ্ছাও করে না। তবু শোবার ঘরের খাটে বসে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বসবার ঘরের দরজার মধ্যে দিয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে কী একটা দারুণ কষ্টে আমার বুক ভরে গেল। আমার মন বলতে লাগল, এই হতভাগা লোকটার আমি ছাড়া কেউ নেই। পৃথিবীর আর সকলেই ওকে দূর-ছাই করে। আমিও ওকে ত্যাগ করলে ওর কী হবে ভাবতে পারি না আমি। তাছাড়া ওর আজকের এই হঠাৎ—অসহায়তা

দেখে আমার মন বলতে লাগল, সে সুশান্তর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ও কোনো সিকসথ্ সেন্সে আঁচ করতে পেরেছে? আমার খুব ভয় হল যে, ও কি জেনে গেছে যে আজ দুপুরে সুশান্ত এখানে এসেছিল? সুশান্ত আজ এমন কিছু দেখে গেছে, ওর অনভিজ্ঞ রোমাঞ্চিত আঙুলে স্পর্শ করে গেছে, যা এতদিন রমেনের একারই ছিল। একমাত্র রমেনের।

জানি না। ওর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে আমার মনের মধ্যে কে যেন ছিঃ ছিঃ করে উঠল। কে যেন বলে উঠল, তুমি খুব খারাপ হয়ে গেছ নীরু। তুমি কী খারাপ হয়ে গেছ?

চুল বাঁধা সেরে আমি বসবার ঘরে গেলাম। তারপর ক্যাজুয়ালি জিজ্ঞেস করলাম, তুমি চা খাবে?

রমেন মুখ নামিয়েই ছিল। মুখ না তুলেই বলল, নাঃ।

আমি বললাম, তোমার কী হয়েছে?

আমার মন যত নরম করে, যত দরদভরে এ কথাটা শুধোতে চাইল, মুখ তেমন করে শুধোল না। মনের উষ্ণতা মুখের কথায় প্রতিফলিত হল না।

আমার নিজের ওপর খুব রাগ হল। মন যা বলতে চায়, মুখ তা অকপটে বলে না কেন? এই বাধা কোথা থেকে আসে? ভেবে পেলাম না।

আমি এবার ওর কাছে গিয়ে বসলাম, বললাম তোমার মন খারাপ? কেন? কী হয়েছে বলবে না আমাকে?

রমেন কোনো কথা না বলে ওর হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে আমার হাতে রাখল।

আমি মুখ তুলে দেখলাম ওর দু'চোখ জলে ভরা।

আমার বুকের মধ্যে কে যেন একশো ছুঁচ ফুটিয়ে দিল এক সঙ্গে।

আমি ওর আরও কাছে সরে গিয়ে বললাম, কী হয়েছে রমু, তোমার কী হয়েছে আমাকে বলো।

রমু বলে ডেকে, আমি নিজেই অবাক হয়ে গেলাম। কত দিন; কত দিন যে ওকে এ নামে ডাকিনি! আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে রমেনের একটা আদরের নাম ছিল। আমারই দেওয়া।

রমেন খুব আস্তে আস্তে বলল, আমি তোমাকে খুব কষ্ট দিই, না নীরু?

আমি ওর চোখে জল দেখে নিজেকে সামলাতে পারলাম না, ওর প্রতি আমার কঠোর না হওয়ার কোনো কারণ ছিল না; কিন্তু আমি ওর প্রতি কঠোর থাকতে পারলাম না। আমার নিজের দু'চোখও কেন জানি না জলে ভরে গেল। ওর বিরুদ্ধে আমার পুঞ্জীভূত সমস্ত অভিযোগ আমি সেই মুহূর্তে ভুলে গেলাম।

আমি বললাম, কষ্ট কীসের? আমার তো কোনো কষ্ট নেই।

তারপর গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললাম, আমার নিজের জন্যে কোনো কষ্টই নেই। যতটুকু কষ্ট তা তোমার জন্যে, তোমাকে দেখে। তুমি এরকম হয়ে গেলে কেন?

রমেন বলল, আমার দোষ। আমারই দোষ নীরু। তোমাকে আমি যেমন করে রাখতে চেয়েছিলাম তেমন করে রাখতে যে পারিনি, পারি না যে, সেটা কী আমার কম দুঃখ। আমি নিজেও কী শালা জানি, কেন আমি এরকম হয়ে গেলাম? তোমার হয়তো মনে আছে যেদিন তুমি আমাদের ফ্যাক্টরিতে গিয়েছিলে সেদিন আমি মাতাল হয়ে মারামারি করে এসেছিলাম। তুমি আমাকে মাতাল অবস্থায় বাড়ি ফিরতে দেখেছিল, আমি বমি করেছিলাম, কামীনদের সঙ্গে নোংরামি করেছিলাম। কিন্তু কেন তা করেছিলাম তুমি কখনও ভাবোনি। ভাবার প্রয়োজনও বোধ করোনি।

আমি বললাম, না। সত্যিই ভাবিনি। তুমি বলো, কেন করেছিলে? আমাকে বলো!

রমেন বলল, তোমাকে সেদিন ওখানে নিয়ে গিয়ে তোমাকে যে কতখানি অপমান করেছিলাম তা তুমি যখন সেনের সঙ্গে মোটর সাইকেলে করে চলে গেলে সেই মুহূর্তেই বুঝতে পেরেছিলাম।

দুঃখে রাগে আমার হাত কামড়াতে ইচ্ছা করছিল। আমি ভেবে পাইনি কী করে সে দুঃখ ভোলা যায়। তাই অমন করেছিলাম। আমি জানি যে, তুমি বলবে যে ওরকম করে কোনো দুঃখই ভোলা যায় না। কিন্তু আমি আর কী করব তখন ভেবে পাইনি।

তারপর একটু চুপ করে থেকে রমেন বলল, চল নীরু, আমরা এদেশ ছেড়ে চলে যাই। বিয়ের আগে তোমাকে যা যা বলেছিলাম, মানে আমার সম্বন্ধে, তার এক বর্ণও মিথ্যা ছিল না। কিন্তু বিয়ের পর সেই কোম্পানির ইউনিয়নের কর্তার এক লোক মালিকের ইচ্ছানুযায়ী এসে রাতারাতি আমার ওপরের পদে বহাল হল। আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ সেদিন শালা পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে গেল। তাই সে চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হলাম। তোমাকে এত কথা তখন বলিনি, কারণ বললেও তুমি হয়তো বিশ্বাস করতে না। আমি জানতাম, আমার কথাগুলোর ওপর তোমার ছেলেমানুষ মন কতখানি ভরসা করেছিল। আমি আমার নিজের কেস সমর্থন করে সেদিন এবং তার পরেও কখনও কোনো কথা বলিনি। আমি তোমার আত্মীয়স্বজন তোমার যারা প্রিয়জন তাদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে সবরকমভাবে চেষ্টা করেছিলাম যাতে তোমার মন আমার থেকে সরে যায়। তুমি জানো না নীরু, তুমি আমার কত আদরের। আমার কারণে তোমার এই কষ্ট আমার দেখতে ভালো লাগে না আর। অথচ উপায় নেই কোনো।

আমি বললাম, কোনোই কি উপায় নেই?

আমার কানে ওর বারবার উচ্চারিত 'শালা' কথাটা বাজছিল।

এ দেশে আমি আর থাকব না নীরু। এখানে সহায়সম্বলহীন মামা-মেসোহীন বাঙালি ছেলেদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। চোরে বদমাইসে দেশটা ভরে গেছে। খুঁটির জোর ছাড়া এখানে কিছু করার নেই। প্রথম আমি একা চলে যাব। তারপর ওখানে ভালো করে সেট্‌ল্ করে তোমাকে নিয়ে যাব। যে করে হোক আমার পাঁচ-সাত হাজার টাকার দরকার। দরকার হলে চুরিও করতে হবে।

আমার খুব খারাপ লাগল।

বললাম, চুরি করতে হবে কেন? আমার সেভিংস অ্যাকাউন্টে হাজার তিনেক টাকা হবে আর আমার গয়না বন্ধক দেব বা বিক্রি করব। তুমি যদি মনস্থির করেই থাকো, তাহলে তুমি যা বলছ তাই-ই হবে।

তারপর একটু চুপ করে থেকে আমি বললাম, বিশ্বাস করো, এরকম গ্লানির জীবন ভালো লাগে না। তুমি জামশেদপুরে চাকরি নিয়ে এলে বলেই আমি এলাম। কলকাতায় যে স্কুলে ছিলাম তাতে আমার মাইনে অনেক বেশি ছিল। এখনও সবিতাদি আমাকে ফিরে আসতে বলেন সব সময়। বলেন, উনি আমাকে খুব মিস্ করেন। তুমি যতদিন না আমাকে নিয়ে যাও সেখানে, ততদিন বাবার কাছেই থাকব। বাবাকেও দেখাশুনা করতে পারব। আমি তো আর দাদাদের ঘাড়ে বোঝা হয়ে থাকব না, নিজের রোজগারেই নিজে থাকব। অবশ্য দাদারা টাকা না দিলেও কিছুই মনে করবেন না, বরং ভালোবেসেই রাখবেন। তবু তোমার সম্মানের জন্যেই টাকা দেব আমি। বিয়ের আগে এক রকম থাকে, বিয়ের পরে মেয়েদের সম্মানটা তাদের স্বামীর সম্মানের সঙ্গে যে কতখানি জড়ানো থাকে তা আশা করি তুমি বুঝতে পারো; বোঝো।

রমেন চিন্তিত মুখে বলল, বুঝি, সবই বুঝি। তারপর হঠাৎ বলল, গয়না তো তুমি বাড়িতে রাখোনি? লকারে রেখেছ না? লকারের চাবি তোমার কাছে?

আমি বললাম, আছে। টাকাটা তোমার কবে দরকার?

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। অসুবিধা না হলে কালই। জব ভাউচার আমি ইতিমধ্যেই জোগাড় করে ফেলেছি। পাসপোর্ট আমার করাই আছে। টাকাটা পেলে কলকাতায় গিয়ে কালই প্যাসেজ বুক করব।

ভিসা-করে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

আমি বললাম, কই? জব ভাউচারের কথা তো তুমি আগে কখনও বলোনি? পাসপোর্টের কথাও না।

রমেন বলল, তুমি শুনতে চাইলে তো বলব। তারপরই মুখ ঘুরিয়ে বলল, কেন? তুমি কি আমাকে সন্দেহ করো?

আমি লজ্জিত হলাম। বললাম, ওরকম করে বলছ কেন?

না। সন্দেহ করছ, তাই বললাম।

আমি বললাম, তুমি কলকাতা গেলে তো আমিও তোমার সঙ্গে যেতে পারি। আমার তো স্কুল বন্ধই হয়ে গেছে। আমি তো এমনিতেই যেতাম। কতদিন বাবাকে দেখি না।

রমেন বলল, বাড়ি ফাঁকা রেখে দু'জনে একসঙ্গে যাওয়া কি ঠিক হবে? আমি প্যাসেজ-ট্যাসেজ ঠিকঠাক করে ফিরে আসব, তারপর এ বাড়ি ছেড়ে দিয়ে এখানকার পাট-চুকিয়ে একেবারে ফিরে যাব। একসঙ্গে যাব দু'জনে কলকাতা তখন। একটা দিন তুমি এখানে থাকো। কেমন?

আমি বললাম, বেশ! তুমি যা বলবে।

রাতে শোবার ঘরের আলো নিবিয়ে যখন রমেনের পাশে শুলাম তখন অনেক রাত হয়ে গেছে। বাইরে জ্যোৎস্না ফুট্‌ফুট্‌ করছে। জ্যোৎস্নার একটা বড় ফালি এসে পড়েছে বিছানার ওপর।

রমেন পায়জামা পরে খালি গায়ে শুয়েছিল। অনেক অনেকদিন পর আমি ভালোবেসে নিজের থেকে রমেনের বুকে হাত রাখলাম। আমি খাওয়ার আগে ভালো করে গা ধুয়েছিলাম। সারা গায়ে পাউডার মেখেছিলাম। কেন জানি না, রমেনের কথা ভেবে মনটা খারাপ লাগছিল। সত্যিই যদি ও মনে করে এ দেশে ওর জন্যে কোনো ওপেনিং নেই, তাহলে যাকই না অন্য দেশে। বেচারা! আমি হয়তো সত্যিই ওকে কখনও বুঝিনি।

আমি বললাম, রমু বাবু, মুখটা এদিকে ফেরান।

রমেন পাশ ফিরে শুয়ে আমাকে জড়িয়ে রইল।

আমি ওর বুকের চুলে বিলি কাটতে কাটতে বললাম, কতদিন—কতদিন পরে তুমি আমাকে নিয়ে যেতে পারবে বলে মনে করো?

রমেন বলল, তিন-চার মাস। তার মধ্যেই চাকরি ও অ্যাপার্টমেন্ট দেখে নেব। ওখানে ছোটো গাড়ি কেনারও অসুবিধা নেই। তবে বেশ ঠান্ডা জায়গা।

আমি বললাম ক্যানাডাতেই যাবে বলে ঠিক করেছ?

ও বলল, জব-ভাউচার তো ওখানেরই। মনট্রিল-এর একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে।

ওখানে টিচিং লাইনে আমিও তো কোনো কোর্স করে নিতে পারব? কি? পারব না?

রমেন বলল, নিশ্চয়ই পারবে।

আমার ভাবতে ভালো লাগছে। তুমি একটু গুছিয়ে নিলে আমরা আমাদের নিজেদের গাড়িতে কিন্তু বেড়াতে বেরোবো। আমাকে নায়গ্রা ফলস্‌ দেখাবে তো?

রমেন আমাকে চুমু খেয়ে বলল, সব দেখাব।

এইটুকু বলেই রমেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। আমাকে ছেড়ে দিল।

কলকাতা থেকে ফিরবে কবে?

কিছুদিনের মধ্যেই ফিরতে পারব বলে মনে করি।

বাবার সঙ্গে দেখা কোরো কিন্তু। বাবাকে বোলো যে আমি যাবার সময় বাবার জন্যে আম নিয়ে যাব।

রমেন বলল, বলব।

আমি একটু পরে বললাম, ও মা, সরি! তোমার তো উঠতেও হবে আমাদের বাড়িতেই। ওখানে তো তোমার ওঠার কোনো জায়গাই নেই এখন।

তোমাদের বাড়িতে আবার কী উঠব? কোনো হোটেলে-টোটেলে থাকব। কয়েকটা তো দিন আর রাত।

থাকলেই পারতে। এতদিন পরে কলকাতা যাচ্ছ, বাবা কি দাদারা কি অখুশি হতেন?

—না। তা না। আমার ভালো লাগে না।

বললাম, যা ভালো মনে করো।

আমার চুপ করে শুয়ে থাকতে ভাবতে খুব ভালো লাগছিল। আমার স্বামীর নিজের অ্যাপার্টমেন্ট। কত তলায় হবে কে জানে? বেশ একটা টেরাস্ থাকবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কিচেন, সঙ্গে ছোট প্যান্ট্রি, গ্যাস তো থাকবেই, একটা ইলেকট্রিক কুকিং রেঞ্জও নিশ্চয় থাকবে। এখানে তো আর চাকর রাখা যাবে না। সব কাজ নিজেদেরই করতে হবে। রমেন যা কুঁড়ে ও তো ঘরের কাজ কিছুই করবে না। ভাবতে ভালো লাগছিল, তারপর একসময় আমাদের একটি বাচ্চা হবে। ততদিনে আমার পড়াশোনা শেষ করে ফেলব। তখন চাকরিও ছেড়ে দেব। সব সময় বাচ্চাকে দেখাশোনা করব। সেটাই তখন আমার একমাত্র কাজ হবে। সব, সব, এ সমস্ত কিছু আমার ভাবতে ভীষণ ভালো লাগছিল।

কিন্তু তারপরই একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল। রমেন যখন আমাকে আদর করছিল, চরম আদর; ঠিক সেই সময় আমার চোখের সামনে থেকে রমেনের মুখটা অদৃশ্য হয়ে গিয়ে সেখানে সুশান্তর মুখটা ভেসে উঠল। আমি চোখ বন্ধ করে ফেললাম। সেই মুহূর্তে সেই বন্ধ চোখের অন্ধকারে ভেসে আমি সুশান্তকে সব কিছু দিয়ে দিলাম—একজন মেয়ে কোনো পুরুষকে ভালোবেসে তাকে তার সবচেয়ে যা দামী দান দিতে পারে, তাই-ই দিয়ে দিলাম।

রমেন ক্লান্তিতে, ভালোলাগায়, পাশ ফিরে শিশুর মতো ঘুমোচ্ছিল।

আমার সে রাতে ঘুম এল না।

অনেক কথা ভিড় করে এল মনে।

আমার মন নিশ্চিত ভাবে নিঃশব্দে বলল, আমি রমেনকেও ভালোবাসি এবং সুশান্তকেও। অথচ আশ্চর্য! এই দুই ভালোবাসা কত অন্যরকম। এ দুই ভালোবাসাই সত্যি। অথচ কত বিভিন্ন এদের রূপ, এদের প্রকৃতি। একজন মেয়ে কি একসঙ্গে দুজনকে ভালোবাসতে পারে না? পারে না কি? আমার ভালোবাসা কি এতই সীমিত যে একজনকে দিয়েই তা নিঃশেষে ফুরিয়ে যাবে? সুশান্তকে দেওয়ার মতো আমার কিছুই কি বাকি থাকবে না? কিছুমাত্র না?

কিন্তু জামশেদপুরের পাট চুকিয়ে কলকাতা চলে গেলে তো সুশান্তর সঙ্গে দেখা হবে না? হবে না কেন? ওকে বলব কলকাতায় ট্রান্সফার নিতে। তারপর যখন ক্যানাডায় চলে যাব তখন? তখন কি সুশান্তকে ক্যানাডাতে যেতে বলব? ঈশ্-শ্ কী শখ আমার? এও চাই ওও চাই। দরকার নেই। রমেন আমার স্বামী। রমেন যদি আমাকে আমি যেমন করে চাই তেমন করে সুখী করে, তাহলে আর সবকিছুই ছাড়তে পারব। এমনকী, সুশান্তকেও।

রমেন নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছিল।

রমেনের পিঠে হাত রেখে মনে মনে বললাম, তুমি ভালো হও রমেন, তুমি ভালো হও। তোমার ভালো হওয়া না-হওয়ার ওপর আমার সমস্ত জীবন, আমার সমস্ত চাওয়া-পাওয়া, আমার পুরো অস্তিত্ব নির্ভর করছে। ভালো হবে তো রমেন? রমু বাবু?

পরদিন খুব ভোরে আমার ঘুম ভেঙে গেল।

এখনও সূর্য ওঠেনি। রাতে একপশলা বৃষ্টি হয়েছিল। বেশ একটি মিষ্টি ঠান্ডা আছে সকালে। শোবার ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে দেখলাম সাধু সাহেব কুকুর নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন। কাপুর সাহেবের বাংলোর পিছনের লনে গোরু দুইছে ওঁদের মালি।

অনেকক্ষণ আমি চুপ করে জানালায় দাঁড়িয়ে রইলাম।

দিন এখনও আরম্ভ হয়নি, মানে দিনের ব্যস্ততা। গত রাত আর আজকের দিনের মধ্যে এই একফালি উষার আভাসের গর্ভবতী নিস্তব্ধতার কোলে একা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেক কিছু ভাবছিলাম।

আমার জীবনেও এক নতুন ভোর হতে চলেছে। জানি না, এই নতুন দিন আমার জন্যে কী বয়ে আনবে। ভালোই আনবে আশাকরি। ভালোই আনা উচিত। ছোটবেলা থেকে ভালো করেছি, ভালো ভেবেছি, কখনও কাউকে ঠকাইনি, ঠকাবার ভাবনাও ভাবিনি। আমার কেন খারাপ হবে? খারাপ হয়তো হয়েছিল কিছুদিনের জন্যে—কিন্তু সেটা একটা অপম্রিয়মাণ অবস্থা। জীবনে কোনো কিছুই ফেলা যায় না। হয়তো এই খারাপ অবস্থার মধ্যে দিয়ে বেশ কিছু সময় কাটালাম বলেই আজ ভালোর চৌকাঠে এসে দাঁড়িয়েছি। অবিমিশ্র খারাপ বা ভালো বলে কিছু নেই। যাদের জীবনে কেবলি সুখ বা কেবলি অসুখ তাদের জীবন বোধহয় বড় একঘেয়ে, আনইন্টারেস্টিং।

তোমাকে আমি বাতিল করেছিলাম রমেন, তোমাকে হয়তো সত্যিকারের যাচাই না করেই। তোমাকে যেদিন গ্রহণ করেছিলাম আমার সরল অপাপবিদ্ধ মনে, সেদিনও যাচাই করিনি। জীবনে কখনও কোনো কিছুকে আমি সন্দেহের চোখে দেখিনি, যুক্তি, অবিশ্বাস, বিচার-বিবেচনা ইত্যাদি কষ্টিপাথরে আমি আমার হৃদয়সঞ্জাত কোণে বোধকে, কোনো অনুভূতিকেই যাচাই করে তেতো করতে চাইনি। সে বাঁচা বড় সাবধানীর মতো বাঁচা। তার চেয়ে অসাবধানী মৃত্যু ভালো। শুভ্র, অকলঙ্ক সাবলীল হাঁস যেমন প্রথম ভোরে শিউলিতলা দিয়ে দুলতে দুলতে গিয়ে তার কমলা-পায়ে কমলা-রঙে শিউলি ফুলের গালচে পেরিয়ে এক সমর্পণী বিশ্বাসে ভর করে পুকুরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন পুকুর তাকে বিনিময়ে কী দেবে অথবা দেবে না সে কথা ভেবে সে ঝাঁপায় না। ঝাঁপিয়ে পড়ার আনন্দে নিজের মনে নিজের স্বগতোক্তির প্যাঁকপ্যাঁকানিতে সে শরৎ সকালে নিজেকে সর্বাঙ্গীণভাবে সার্থক করে। পুকুরের মধ্যে যদি কোনো অপূর্ণতা থাকে, তার যদি কিছুই দেয় না থাকে হাঁসটিকে, সে লজ্জা বা সংকোচ তো পুকুরেরই, তাতে হাঁসের হলুদ ঠোঁটের হাসি মোছে না; বোধহয় মোছে না।

আমি নিরুপমা চৌধুরী, ছোটোবেলা থেকে এমনি এক হাঁসের মতো জীবনের পুকুরে বাঁচতে চেয়েছি, সাঁতার কাটতে চেয়েছি। দুঃখ বা সুখ সবকিছুকেই চেষ্টা করেছি হাঁসের গায়ের জলের মতো গড়িয়ে ফেলতে। পৃথিবীর জলে যাতে গা না ভেজে তারই চেষ্টা করেছি সাধ্যমতো। আমি সবসময় মনে করতে চেয়েছি যে, একজন মানুষের সমস্ত দুঃখ, কষ্ট, অশান্তি সত্ত্বেও কেবলমাত্র বাঁচার আনন্দের জন্যেই তার বেঁচে থাকা উচিত। আমি কি ভুল ভেবেছি? জানি না।

সত্যি কথা বলতে কী সুশান্তর সঙ্গে আলাপ হওয়ার আগে আমার মনে হত না বাইরের এই দৃশ্যমান জগতে আমিও একজন গণ্য লোক। আগে, এই নিরন্তর জীবনযাত্রা, যাতে আমি সবসময়েই উপস্থিত ছিলাম; এই অনাদিকাল থেকে প্রবাহিত ও আমার সম্পর্ক-সংশ্লিষ্ট প্রবহমান জগতে আমি কোনো ক্ষণিকের অতিথির মতো নিরুত্তাপ উদাসীনতায় সবকিছু অমনোযোগের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করতাম। আমার কখনও মনে হত না, মনে হয়নি যে, এই দৃশ্যাবলীতে, এই বিভিন্ন অঙ্কের নাটকে ক্ষুদ্র হলেও আমারও একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত-নির্দেশক পটভূমিকা আছে। চিরদিনই চালিত না হয়ে, এই জগৎকে

আমার অভিমত, খুশি ও ইচ্ছা দ্বারা চালিত করার অধিকারটুকুই যে আমার আছে শুধু তাই-ই নয়, সেই অধিকারের জবরদখল নেওয়াও যে আমার কর্তব্য এমন কথা আমার কখনও মনে হয়নি আগে।

সুশান্তই প্রথমে আমার দু চোখে চোখ রেখে বলেছিল, তোমাকে তোমার নিজের জন্যেই বাঁচতে হবে, অন্য কারও জন্যে নয়, তোমার নিজের জন্যে, নিজের কারণে। বলেছিল, 'তুমি নিজে তোমার কাছে চরম সত্য, পরম অনুভূতি। তোমার নিজের পরিপ্রেক্ষিতে আর সবকিছুই, সকলেই তুচ্ছ—।' সেই তোমার মধ্যের আশ্চর্য নীরব অথচ প্রচণ্ড বাঙ্ময় তুমিকে না চিনতে পারলে, না ভালোবাসলে তোমার বেঁচে থেকে লাভ কী? বলেছিল, তোমার জগতে তুমিই সবকিছুকে আবর্তিত, চালিত ও নির্ধারিত করবে। বাঁচবে, শুধু তোমার নিজেরই শর্তে; নিজের সুখের জন্যে। পৃথিবীর অন্য কেউই—স্বামী, পুত্র, প্রেমিক, বাবা, মা, অন্য কেউই যেন তোমার এই সুস্থ স্বাভাবিক মানসিকতার প্রতিবন্ধক না হয়।

হঠাৎ মনে হল, সুশান্ত কি এত কথা বলেছিল? মনে পড়ে হাসি পেল। নাঃ ও এত কথা মুখে বলেনি, কিন্তু চোখে বলেছিল। মুখের কথায় আমরা কেই বা কতটুকু বলতে পারি? মুখে শুধু বক্তব্যর আভাসমাত্র দেওয়া যায়। মূল বক্তব্য শ্রোতাকে নিজেকেই নিজের মনে মনে, মনের কানে শুনে নিতে হয়।

ঠিক বলেছিল সুশান্ত।

রমেন ওঠার আগেই আমি চান করে নিলাম। তারপর পেছনের বারান্দায় চা নিয়ে বসলাম।

পেঁপে গাছে কতকগুলো শালিক এসে বসে কিচিরমিচির করছিল। ভোরের নরম রোদ একফালি রুক্ষ ঘাসওঠা জমিতে পড়েছে। সোনাঝুরি গাছের ডালগুলো এদিকটাতে ঝুঁকে আছে। বেশ ছায়াচ্ছন্ন থাকে জায়গাটা দুপুরবেলা। এই জায়গাটা আমার বড় প্রিয় জায়গা। আমার একা বসে ভাবার জায়গা।

প্রত্যেক মেয়েরই বাড়ির মধ্যে কোনো-না-কোনো একটা বিশেষ জানালা, বারান্দার কোনো বিশেষ কোণ এমনি প্রিয় থাকেই—যেখানে এক কাপ চা নিয়ে এসে বসে আমার মতো লক্ষ লক্ষ মেয়ে তাদের সংসারের অনেকানেক ঝামেলা ও অশান্তি ভুলে যেতে চেষ্টা করে। এক চিলতে নীল আকাশে হঠাৎ চোখ পড়ে যায়—ঘুরে ঘুরে ওড়া কোনো চিলের তীক্ষ্ণ ডাক সেই-সেই মুহূর্তে চমক তুলে যায় বুকের মধ্যে—তার শৈশবের, কৈশোরের, তাব যৌবনের অনেক স্মৃতি মুহূর্তের মধ্যে ঝিলিক মেরে যায় মাথার মধ্যে। কোনো স্নেহময় বাবার মুখ, দারিদ্র্যক্লিষ্ট মায়ের মিষ্টি ক্ষমাময় হাসি, কোনো বিস্মৃত উত্তীয়র সুস্থ উজ্জ্বল চোখ তখন মনের কোণে আসা-যাওয়া করে।

ক্ষণকালের জন্যে।

পরমুহূর্তেই চায়ের কাপ খালি হয়ে যায়, সংসারে, স্বামীর, ছেলেমেয়ের অথবা জীবিকার প্রতি কর্তব্যের ডাক আসে। শূন্য চায়ের কাপ এবং শূন্য মন নিয়ে আকাশের হাতছানি ছেড়ে চিলের ডানার গন্ধ মন থেকে মুছে ফেলে তাকে আবার ঘরের মধ্যের অন্ধকারে ফিরতে হয়। সব মেয়েকে। যে মেয়েদেরই মন আছে। এমনি করেই।

রমেন উঠে পড়েছিল।

মুখী আজ সকাল-সকাল এসেছিল। কাল ওকে বলে রেখেছিলাম যে আমরা সকাল-সকাল চা জলখাবার খেয়ে ব্যাঙ্ক খুললেই ব্যাঙ্কে যাব।

রমেন বাথরুম থেকে চান করে শিস দিতে দিতে বেরিয়ে এল। তারপর ঘরে গেল জামাকাপড় পরতে। জামাকাপড় পরে এসে চা খেল।

ব্যাঙ্ক খোলার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় আমরা গিয়ে হাজির হলাম। কিন্তু টাকা তুলতে গিয়ে এক বিপত্তি হল। আমার সেভিংস ব্যাঙ্কে তিন হাজার পঁয়ত্রিশ টাকা ছিল। তিন হাজার টাকা তুলব শুনে কাউন্টারের

ভদ্রলোক বললেন, তাহলে অ্যাকাউন্ট বন্ধ করতে হবে। সেভিংস ব্যাঙ্ক থেকে ওভাবে টাকা তোলা যায় না। অগত্যা অ্যাকাউন্টটাই বন্ধ করতে হল। রমেনকে একশো টাকার ত্রিশটা নোট দিয়ে, আমি আমার হাত ব্যাগে পঁয়ত্রিশটা টাকা রাখলাম। মাইনে পাব আবার স্কুল খুললে। তাই ভালোই হল এই টাকাটা পেয়ে।

ব্যাঙ্কে এত সময় লেগে গেল যে বলার নয়। তারপর সেখান থেকে লকারে গেলাম। লকারে থাকার মধ্যে কিছুই ছিল না। একটা কাপড়ের বটুয়ায় গয়নাগুলো ছিল। অনেকদিন পর গয়নাগুলো খুলে দেখলাম।

এই পেন্ডেন্টটা বড়দি ও বড় জামাইবাবু দিয়েছিলেন। আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর দোকান থেকে আমার পছন্দমতো কিনে দিয়েছিলেন। আর এই দুলটা ছোড়দির দেওয়া। এটা নিয়ে আমার বাসিবিয়ের দিন, মানে যেদিন রমেনের সঙ্গে আমাদ্দের বাড়ি ছেড়ে চলে এলাম সেদিন অনেক কাণ্ড হয়েছিল। সবাই মোটামুটি ভালোই প্রেজেন্টেশান দিয়েছিলেন। সুবীরদার সে সময় চাকরিটা ছিল না। বিলিতি কোম্পানির ভালো চাকরিটা গিয়েছিল মাস ছয় আগে। উনি নিরুপায়ভাবে চাকরি খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। আমাকে ছোড়দি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসত। স্বাভাবিক। আমরা পিঠোপিঠি ছিলাম। অথচ আমার বিয়েতে ছোড়দি একটা সামান্য দুল ছাড়া কিছু দিতে পারল না বলে ছোড়দির মনে খুব কষ্ট ও লজ্জা হয়েছিল। যদিও এর কোনো মানে হয় না। কিন্তু মানে না হলেও মেয়েদের মনে এমন এমন অনেক কিছু হয় যা পুরুষরা কখনও বোঝে না।

বিয়ের দিন ছোড়দি ঐ দুল সকলের সামনে দিল না। বলল, আমার লজ্জা করে। আমি জানি, বিয়ের ধুমধামের মধ্যে ছোড়দি বাথরুমে গিয়ে কেঁদেছিল। বাসিবিয়ের দিনও ছোড়দি ছিল না। বাসিবিয়ের দুপুরে আমি বললাম, তুই কী রে ছোড়দি? আমার সঙ্গে তোর কি দেনা-পাওনার সম্পর্ক? আমাকে যদি তুই কিছুই না দিতিস তাতেই বা কী হত? তাছাড়া তুই কি আমাকে কিছুই দিসনি? কত আদর করে তুই আর সুবীরদা বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিস, কত জায়গায় কত কত খেয়েছি, মজা করেছি আর এখন সুবীরদার অসুবিধে আছে বলে তুই এরকম করবি? সুবীরদা জানলে কী ভাববে বল তো? আমাদের কত খারাপ ভাববে। ছোড়দি বলেছিল, ওর জন্যেই তো আমার কষ্ট। ও যখন পেরেছে সকলকে ও এত আনন্দ করে দিয়েছে, খাইয়েছে যে; সে বলার নয়। এখন ওর চোখের দিকে তাকাতে আমার কষ্ট হয় রে নীরু। যে লোকের জন্য করে, লোককে ভালোবাসে সেই একমাত্র জানে, সে যখন আর করতে পারে না তখন তার মনে কী হয়।

ছোড়দি কাঁদতে কাঁদতে নিজের হাতে দুলটা পরিয়ে দিয়েছিল আমার কানে।

ছোড়দির জন্যে আমি এই আড়াই তিন বছরে প্রায় কিছুই করতে পারিনি। সুবীরদার জন্যেও না। তবু সেই সব ঐতিহাসিক গয়নাগুলোকে আজ আমি রমেনের হাতে তুলে দিলাম। কারণ রমেন আমার স্বামী। একজন মেয়ে এই একটি প্রাপ্তির বিনিময়ে পৃথিবীর অন্য সব ক্ষেত্রে হাসিমুখে সর্বস্বান্ত হতে রাজি থাকে। যদি রমেনরা শুধু এই কথাটা বুঝত, পুরোপুরি বুঝত, তাহলে কোনো দুঃখের কারণ ছিল না।

গয়নাগুলোর দাম সবসুদ্ধ কত হতে পারে আমার ধারণা ছিল না। তবে বিয়ে ও বৌভাতের প্রেজেন্টেশান ও আমাদের বাড়ি থেকে যে গয়না দেওয়া হয়েছিল তা নিয়ে পনেরো হাজার টাকার মতো হবে কম করে। সেদিন আমার যা কিছু জাগতিক সম্পত্তি ছিল সব নিঃশেষে রমেনের হাতে তুলে দিয়ে বাড়ি ফিরলাম ওর সঙ্গে।

অনেক অনেকদিন পর দুজনে একসঙ্গে খেতে বসলাম। মুখী ঝিঙে-পোস্ত, মুগের ডাল আর ছানার ডালনা করেছিল।

খেতে খেতে রমেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল বারবার।

আমি বললাম, ও কী? ভালো করে খাও। কী হয়েছে তোমার? কারখানার কথা ভাবছ!

ও বলল, না, শালার চাকরিই যখন করব না তখন ভাবনা কীসের? একটা ক্যাজুয়াল লিভের দরখাস্ত ছেড়ে দিয়ে চলে যাব। তারপর যা হবার হবে।

আমি শুধোলাম, তোমার এ মাসের মাইনে নেবে না? আজ তো তেইশ তারিখ।

রমেন বলল, নিশ্চয়ই নেব। কলকাতা থেকে ফিরে আসি।

আমি হেসে বললাম, হ্যাঁ বাবা, মাইনে না নিলে মুশকিল। এ মাসটাই মুশকিল। আমি তো মাইনে পাব সেই স্কুল খুললে। প্রায় পৌনে দু'মাস পরে।

কথাটা বলতে আমার লজ্জা করল, এ পর্যন্ত রমেনকে কখনও আমি টাকার কথা বলিনি। এমনকি সংসারের টাকার কথাও নয়! কিন্তু এ মাসে না বলে উপায় ছিল না।

রমেন বলল, জানি। আমার কী দায়িত্ব বলে কিছু নেই?

রমেন সেদিন কলকাতা গেল না। বিকেলে কার কার সঙ্গে যেন দেখা করতে বেরিয়েছিল। ফিরল অনেক রাত করে। মুখে গন্ধ পেলাম।

রমেন বলল, সেনের বাড়ি গিয়েছিলাম।

আমি বললাম, সেন তো মদ খায় না।

রমেন বলল, সেন খায় না, সেনের বন্ধু-বান্ধব খায়। তারা এসেছিল। ওরা সকলে মিলে আমাকে ফেয়ার-ওয়েল দিল। সেনের হাতে ছুটির অ্যাপ্লিকেশনটাও দিয়ে এলাম।

আমি বললাম, ছুটির অ্যাপ্লিকেশন কেন? তুমি তো বললে চাকরি ছেড়ে দেবে?

রমেন বলল, যে ক'দিন কাজ না করে মাইনে পাওয়া যায় শালাদের কাছ থেকে।

প্রথম প্রথম রমেনের মুখে শালা কথাটা বড় ধাক্কা দিত। আজকাল শুনতে শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

আমার মনে অনেক কথা এসে ভিড় করেছিল। নানারকম অবয়বহীন ভয়। আবার ছেঁড়া মেঘের মতো তা উড়েও যাচ্ছিল। এখন আমার রমেনকে বিশ্বাস করতে হবে পুরোপুরি—বিশ্বাস না করার জন্যেই হয়তো রমেন চিরদিন নিজেকে এমন করে আমার কাছে গুটিয়ে রেখেছিল। যা বলতে চেয়েছিল, চেয়েছে আমার কাছে তার উলটোটাই বলেছিল, বলে এসেছে চিরদিন। যে ভুল করেছি, যে দুঃস্বপ্ন দেখেছি তা আমি ভুলে যাবার চেষ্টা করব। এখন রমেনকে বিশ্বাস না করলে আমি নিরুপায়। রমেনকে, রমেনের মধ্যের ভালোত্বকে, সততাকে আমার বিশ্বাস করতেই হবে।

১১

রমেন চলে গেছে প্রায় চার-পাঁচদিন হল।

বিয়ের পর আমি কখনও একা থাকিনি। এই প্রথম একা একা। সত্যি কথা বলতে কী রমেন যখন কলকাতা যাবে বলেছিল তখন এই ভেবে খুব ভালো লেগেছিল যে অন্তত দু'একদিন কোনোরকম ভয় বা সংকোচ না করে সুশান্তকে আমার কাছে পাব। মুখীকে ছুটি দিয়ে দিলেই হবে—তারপর আমি কয়েকঘণ্টার জন্যে পুরোপুরি সুশান্তর হয়ে যাব। ও ওর নরম ছেলেমানুষি সৎ চোখ দিয়ে লজ্জামাখা মুখে আমাকে দেখবে, আমার সমস্ত আমিকে—আর শিউরে উঠবে ভালোলাগার, সেদিন যেমন উঠেছিল। আমার ভাবতেই ভালো লাগছে আমার মধ্যে এমন জাদু আছে যে, আমাকে দেখেই

কেউ অমন করতে পারে। সুশান্তটা বড় ছেলেমানুষ। বড় ছেলেমানুষ। ও যা বলেছিল, তা সেদিন আমি বিশ্বাস করেছিলাম। আমি বিশ্বাস করেছিলাম যে, ওর জীবনে আমিই প্রথমা। এ কথাটা শুধুই বোঝার কথা, অনুভবের কথা, প্রমাণ করার কথা নয়।

ভেবেছিলাম; অনেক কিছু ভেবেছিলাম। এই ভাবনা মনে আসাতে প্রথমে মনে মনে নিজেকে খুব বকেছিলাম। আমি কী খারাপ মেয়ে? আমার কী চরিত্র ভালো নয়? তারপরই মনে হয়েছিল চরিত্র মানে কী? চরিত্র বলতে কী বোঝায় এই ভাবনাটা আমাকে ভীষণ ভাবিয়ে তুলেছিল। নিজেকে বলেছিলাম, চরিত্র কথাটার যেমন একটা সাধারণ সমাজ-স্বীকৃত মানে আছে, তেমন প্রতিটি মানুষ-মানুষীর চরিত্রই আলাদা। যাত্রাদলের বিবেকের মতো, সমাজের এককালীন প্রতিভূদের মতানুসারে যারা চরিত্রের ব্যাখ্যা চার খোঁটার মধ্যে সীমিত রেখেছেন, আমি তাদের দলে নই।

আমি যা ভাবি, যা করি, আমি যেরকম প্রতিক্রিয়াশীল, তার ওপর আমার চরিত্র নির্ভর করে। অন্য কথায়, সেইটাই আমার চরিত্র। অবশ্য এ কথা সত্যি যে, আমার প্রথম প্রেমিক, আমার স্বামীর মধ্যে আমি যা চেয়েছিলাম, তা যদি পেতাম, আমি যদি এমনভাবে বঞ্চিত না হতাম, তাহলে হয়তো আমার চরিত্রর যে-কোনো তথাকথিত চরিত্রের মতোই হতেও পারত। কিন্তু আমি আমার জীবন দিয়ে, জীবনের ভুল দিয়ে, জীবনের সমস্ত নিখাদ অনুভূতি দিয়ে বুঝেছি যে, সেই সম্মত চরিত্রে বা কোনো কাচের আলমারিতে রাখা অভিধানে কিছুই খোঁজার নেই। চরিত্রর ব্যাখ্যা প্রতিটি মানুষের কাছেই আলাদা আলাদা। তার জীবনের প্রাপ্ত আঘাত, আনন্দ, বেদনা তার জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত তার চরিত্রকে বদলে দিতে বাধ্য। প্রত্যেকের চরিত্রই জলের মতো। জীবনের আকার অনুপাতে, আকারের ঢাল মতো তা গড়িয়ে যায়। তাকে তার সামাজিক ও পৌরাণিক ব্যাখ্যার বদ্ধতায় কখনোই ধরে রাখা যায় না। হয়তো ধরে রাখা উচিতও নয়। যারা সেই বদ্ধতায় বিশ্বাস করে, তারা চরিত্রের ব্যাখ্যা ঠিক রাখতে গিয়ে নিজেদেরই বেঠিক করে, বদলে ফেলে। নিজেদের জীবনে চরিত্ররক্ষার মিথ্যা অবক্ষয়ী প্রাপ্তিহীন যুদ্ধে তারা নিজেদের শুধু কাতরই করে, ক্ষুব্ধই করে। এ পৃথিবীর কাছে তাদের পাওয়ার থাকে না কিছুই। তাই আমি ঠিক করেছি, আমি বাঁচব। সুশান্তর কথামতো আমি নিজের সুখের জন্যেই বাঁচব—আর কারও জন্যেই নয়।

আসলে এ সময়ে সুশান্ত জামশেদপুরে থাকলে খুব ভালো হত। কিন্তু রমেন যেদিন গেল, তার পরদিন ভোরে সেও ট্যুরে বেরিয়ে গিয়েছিল। আমার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করেনি—ময়ূরকে দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিল শুধু একটা। এখন আমার স্বামীও নেই, প্রেমিকও নেই। আমি এখন একা, রক্ষীহীন; প্রেমহীন। এমনভাবে কি কোনো মেয়ে থাকতে পারে? সুশান্তকে জানার আগে আমি জানতাম না যে আমার জীবনও এত স্পর্শকাতর, এত আনন্দ-ভিখারী। কোনো শরীর নয়, কাউকে বুকের মধ্যে পাওয়া নয়, এই বোধটা একটা দারুণ অন্যরকম বোধ। যে-বোধ শরীরের আনন্দের চেয়ে অনেক তীব্র। যে বোধ, যে উষ্ণতার বোধ একজনের সমস্ত শীতার্ত কষ্টকে এক আশ্চর্য মসৃণ দামী আরামে ভরে দিতে পারে।

মুখী ঘর পরিষ্কার করে মুছে, কী রান্না হবে তা জিজ্ঞেস করতে এসেছিল। আমি শোবার ঘরে আমার পড়ার টেবিলের সামনে দু'হাতের তেলোয় মুখ রেখে জানালার পাশে বসেছিলাম। রান্নার কথা মুখীকে বলেছিলাম। যা হয় কিছু রাঁধতে। আমার একার জন্যে কোনোরকম ঝামেলা করতে ভালো লাগে না আমার। আজ সকাল থেকেই কুঁড়েমি লাগছিল। মাঝে মাঝে আমার এমন হয়। কিছুই করতে ভালো লাগছিল না। বসে বসে পর পর তিন কাপ চা খেয়েছিলাম, পরীক্ষার খাতার বান্ডিল সামনে খোলা ছিল—একটাও খাতা দেখা হয়নি—দেখা হবে শিগগিরি যে, এমন সম্ভাবনাও দেখছি না। সেদিন নমিতাদি ভালো বলেছিলেন। বলেছিলেন, তোরা সব নতুন নতুন দিদিমণি হয়েছিস,

তোদের উৎসাহই আলাদা। আমরা আর কী তোদের মতো করে খাতা দেখি? বিশেষ করে আজকালকার ছেলেমেয়েদের পরীক্ষার খাতা। আমি অবাক হয়ে বলেছিলাম, তাহলে কী করে দেখেন? কোনো বিশেষ কায়দা আছে কি?

নমিতাদি দুটো পান মুখে দিয়ে, দু আঙুলে একটি সুগন্ধি জর্দা উঠিয়ে অনেক উঁচু থেকে মুখে ফেলে পান-জব্‌জবে গলায় বলেছিলেন, আছে।

আমি শুধিয়েছিলাম, সেটা কী?

নমিতাদি বলেছিলেন, আমার বাড়ির পেছনে, আমার চাকরের থাকার একটা খাপ্‌রার ঘর আছে। বান্ডিলসুদ্ধু খাতা তার ছাদে ছুঁড়ে মারি। যেগুলো ছাদে থেকে যায় সেগুলো পাস; আর যেগুলো গড়িয়ে পড়ে যায়, সেগুলো ফেল।

নমিতাদির কথা শুনে টিচার্স-রুমের আমরা সকলে হি-হি করে হেসে উঠেছিলাম।

নমিতাদি সেই হাসিতে যোগ দিয়ে বলেছিলেন, ঠাট্টা নয়, পরীক্ষা করে দেখিস, প্রত্যেকটা খাতা আলাদা করে দেখলেও ওর চেয়ে ভালো কিছু ফল হয় না।

স্কুলের সকলে বলে নমিতাদির সঙ্গে স্কুলের সেক্রেটারির অ্যাফেয়ার আছে। আমার বিশ্বাস হয় না। নমিতাদির বড় ছেলের বয়স সতেরো, মেয়ের বয়স পনেরো, নমিতাদির নিজের বয়স বেয়াল্লিশ, সেক্রেটারির বয়স বাহান্ন এবং তাঁর বড় ছেলের বয়স বাইশ। বিশ্বাস হয় না। কিন্তু রত্না বলেছিল, ওর নিজের চোখে দেখা। জানি না, হয়তো হবে। নমিতাদির জীবনে আনন্দের একটু সুপ্ত ফল্গুধারা আছে। নইলে উনিও হয়তো অন্যান্য সিনিয়র দিদিমণিদের মতো খিটখিটে, গোমড়ামুখো হয়ে যেতেন। জীবন সম্বন্ধে এত উৎসাহ থাকত না হয়তো, এত হাসতে পারতেন না সময়ে অসময়ে, মনটা হয়তো এত উদার থাকত না। জীবনে নিয়মবদ্ধতা না থাকলে, সংসারের কৃপণ হাতায় আনন্দের জলপান না করলে, এবং সামাজিক সমাজের আড়ালে কোনো গোপন সম্পর্ক থাকলেই কি মানুষ এমন উদার হয়? হাসি-খুশি হয়? তারাই কি একমাত্র লোক যারা জীবনের একঘেয়েমি ও দৈনন্দিনতার মধ্যে থেকেও এক আশ্চর্য আনন্দের ভাগীদার হয়? জানি না আমি। এখনও জানি না। সুশান্তকে আমি এখনও তো তেমন করে পাইনি, তাকে আমার নিজের করে জানি না।

যদি সত্যিই রমেন ক্যানাডা চলে যায়, তাহলে তো আমারও একদিন না একদিন যেতেই হবে। কিন্তু যতদিন না যাই ততদিন সুশান্ত কী আমার একাকিত্ব ভরিয়ে রাখবে সবদিক দিয়ে? আর যদি সুশান্তকে বেশিরকম ভালো লেগে যায় তাহলে কি আমার ক্যানাডা যাওয়া হবেই না? সুশান্তর মধ্যেই সমস্ত পৃথিবী প্রত্যক্ষ করতে হবে? সুশান্ত কি আমাকে তেমন করে চায়? বুঝি না, ও বড় গভীর, ওর চোখের চাউনির কোনো তল নেই। মাঝে মাঝে মনে হয় ওকে বুঝি আমি, পর মুহূর্তেই মনে হয় যে ওকে বুঝি না। ও যেন কীরকম। হেঁয়ালির মতো।

জানালার পাশে বসে কত কী ভাবতে ভাবতে একেবারে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম, এমন সময় মুখী এসে বলল, দিদিমণি চিঠি।

রমেনের চিঠির আশা করছিলাম আমি। একদিন বলে গেল যাওয়ার সময়, আর এখনও ফেরার নামটি নেই; কোনো খবরও নেই। কিন্তু না। দুটি চিঠির মধ্যে একটি বাবার লেখা। অন্যটির হাতের লেখা তেমন চেনা নয়।

প্রথমে বাবার চিঠিটা খুললাম। গতকাল লেখা চিঠি। বাবা লিখেছে, বাবা ভালো আছেন (আমি জানি যে কথাটা সত্যি নয়)। তারপর আমার খবর জানতে চেয়েছেন। শেষে লিখেছেন, রমেন কলকাতায় এসেছে? ওঁর বন্ধু, আমার পরমেশকাকা যিনি রেসের বুকমেকার, তিনি নাকি রমেনকে রেসের মাঠে দেখেছেন। বাবা বলেছেন, যে রমেশকাকা নিশ্চয়ই ভুল দেখেছেন কারণ রমেন কলকাতায়

এসেছে অথচ ওর সঙ্গে দেখা করেনি, এ হতে পারে না।

অন্য চিঠিটা খুলতেই আনন্দে আমার বুক ধক্ করে উঠল। সুশান্ত লিখেছে পাটনা থেকে। ছোট্ট সুন্দর হস্তাক্ষরে, কিন্তু কী সুন্দর যে চিঠি।

২/৫/৭৩

নিরুপমা,

অনেক জায়গা ঘুরে কাল এখানে এসেছি। এখানে গরম আরও বেশি। কিংবা জানি না, আমার হয়তো বেশি লাগছে। কারণ জামশেদপুর ছাড়া ইদানীং এই উত্তপ্ত পৃথিবীর আর কোথাওই আমার ভালো লাগে না। একমাত্র ওখানেই আমার ওয়েসিস্ আছে, টলটলে শান্ত নীল জল, খেজুরগাছের ছায়াঘেরা, একমাত্র সেখানে জীবনের কোনো বেদুইন ডাকাতকেই আমার ভয় করার নেই।

তুমি কি জানো সে ওয়েসিসের খবর?

তুমি কেমন আছো?

ভালো থেকো, সবসময় ভালো থেকো। সবসময় সুন্দর করে সেজে থেকো, বুঝলে?

পরশু ফিরব। পাটনা থেকে গজাধর মণ্ডির বিখ্যাত দোকানের তিলের খাজা নিয়ে যাব তোমার জন্যে। ছোটোমেয়েরা আর কী কী ভালোবাসে জানি না। লাল-নীল রিবন্? ক্যাডবারি চকোলেট? বেলোয়ারী চুড়ি?

এসব কিছুই নিয়ে যাব না, তবে বেলোয়ারী চুড়ির মতোই ভঙ্গুর একটি ভীষণ দামী জিনিস তোমাকে ইতিমধ্যেই দিয়েছি। তাকে খুব সাবধানে রেখো। তোমার নরম ভালোবাসার চোখ থেকে তাকে তোমার মন থেকে এক মুহূর্তের জন্য সরালে, তাকে উপেক্ষা করলে, তা ঝুন্ ঝুন্ করে কাচের চুড়ির মতোই ভেঙে যাবে।

তুমি কি জানো, সে জিনিস কী? কী তার নাম?

ইতি—তোমার কাছের

সুশান্ত।

চিঠিটাকে বারবার পড়লাম। কতবার যে পড়লাম, তার ঠিক নেই। এতবার পড়েও আশ মিটিল না। সুশান্ত সুন্দর করে কথা বলে জানতাম। ও যে এমন সুন্দর চিঠি লেখে, কেউ যে এমন সুন্দর করে চিঠি লিখতে পারে; তা আমার জানা ছিল না।

চিঠিটাকে কোথায় রাখব, কী করে যত্নে রাখব ভেবে পেলাম না। সে সব পরে ভাবা যাবে। এক্ষুনি, এই মুহূর্তে চিঠিটাকে আমার বুকের ভাঁজে গুঁজে রাখলাম, লুকিয়ে। আপাতত সুশান্ত এবং আমাকে ঘিরে তার সব সুন্দর উজ্জ্বল সমস্ত ভাবনাগুলি এখানে ঘুমিয়ে থাকুক। এর চেয়ে নিভৃততর নিশ্চিন্ততর সুন্দরতর কোনো ঠাঁই তো মেয়েদের নেই!

সুশান্তর চিঠিটিকে তুলে রেখেই আমার বাবার চিঠির কথা মনে পড়ল। চিঠিটা আরেকবার পড়তেই বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠল। রমেন একদিনের জন্যে কলকাতা গিয়ে রেসের মাঠে কী করছে? এতদিন হল যখন ওখানে আছেই তখন বাবার সঙ্গেই দেখাই বা করল না কেন? আমার মনের মধ্যে অনেক খারাপ ভাবনার প্রস্তাবনার ঝড় উঠল, কিন্তু তাদের আমি দূর-দূর ছাই-ছাই করে তাড়ালাম। তাদের বললাম, আমার মনটাই ছোটো, আমিই মানুষকে বিশ্বাস করি না, মানুষের ভালোত্বে, সততায় বিশ্বাস করি না, তাইত আমার কপালে এত দুঃখ।

যে ভাবনাগুলো মনের মধ্যে ভয়-দেখানো মুখোশ পরে উঁকিঝুঁকি মারছিল সেগুলোর দিক থেকে মুখ সরিয়ে আমি আবার সুশান্তর চিঠিটার কথা ভাবলাম। সুশান্ত লিখেছিল সে পরশু আসবে—দু তারিখের চিঠি। আর আজ চার তারিখ।

সুশান্ত আসবে, আজ আসবে, অথবা এসে গেছে ইতিমধ্যেই। এই ভাবনাটা আমাকে তখনকার মতো ভীষণভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলল। আমার মন বলতে লাগল, আজ যেন রমেন না আসে, রমেন যেন আজ না আসে। আমি তো আইনত রমেনরই; কিন্তু আমি তো সুশান্তর বে-আইনের। এই বেইমানি অথবা বে-আইনির আনন্দর জন্যে আমার সমস্ত মন উন্মুখ হয়ে রইল।

সেদিন আমি খুব ভালো করে চান করলাম। অনেকদিন আগে একদিন সেন আমার শরীর ছুঁয়েছিল বলে খুব ভালো করে চান করেছিলাম। আমার শরীরের অণু-পরমাণু থেকে সেনের ছোঁয়ার কালিমা মুছে ফেলার জন্যে। আজও আমি ভালো করে চান করছি। কিন্তু আশ্চর্য! সম্পূর্ণ অন্য কারণে। আজ একজন আমার শরীর ছোঁবে বলে আমার শরীরের অণু-পরমাণুতে যেন কোথাও কোনো কালিমা না থাকে সেজন্যে আমি চান করছিলাম। আমি নিরুপমা, আমার মনের মধ্যের নিরুপমের জন্যে আমি নিজেকে নির্দ্বিধায় প্রস্তুত করছিলাম। মনের মতো শরীরেরও প্রস্তুতি লাগে। লাগে না?

আমি ঠিক করেছিলাম যে, নিজে থেকে আমি সুশান্তর খোঁজ নেব না। কেন জানি না, একরাশ লজ্জা এসে আমার সমস্ত মন ছেয়ে ফেলল। মনে হতে লাগল যে, আমার কী দায়? সে যদি সত্যিই তেমন করে আমাকে চায়, তো সেই আসুক। আমি একজন মেয়ে। আমি নির্লজ্জতা ভালোবাসি, কিন্তু তা অন্যের মধ্যে। আমরা নিজেরা তা বলে অমন নির্লজ্জ হতে পারি না! এটা আমাদের দোষও নয়; গুণও নয়। ভগবান আমাদের এমনি করেই তৈরি করেছেন। আমরা কী করব?

সুশান্ত এসেছে কী আসেনি আমার জানার উপায় ছিল না। তবু, আন্দাজেই আমি মুখীকে বলেছিলাম, তুই তো ছুটি-ছাটা পাস না, যা তুই বিকেলের শো-তে সিনেমা দেখে আয় তোর বরের সঙ্গে। বলে, ওকে পয়সাও দিয়ে দিলাম। বললাম, ন'টা-সাড়ে ন'টার মধ্যে ফিরে আসিস কিন্তু।

মুখী চলে যাওয়ার পরই আমি চান করতে ঢুকেছিলাম। চান করে বেরিয়ে অনেক অনেকক্ষণ ধরে আয়নার সামনে বসে সাজলাম। আলমারির সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে একটা কালো জমি লাল পাড়ের ধনেখালি শাড়ি বের করলাম-- সঙ্গে ম্যাচ-করা কালো ব্লাউজ একটা। লাল পুঁতির একটা মালা বের করলাম ড্রয়ার খুঁজে। শাড়ি-টাড়ি পরে বড় করে কালো টিপ পরলাম, ঠোঁটে হালকা করে ভেসলিন্ লাগালাম।

সাজা যখন শেষ হল তখন আয়নার সামনে একবার দাঁড়িয়ে ভালো করে নিজেকে দেখলাম। কলেজে পড়ার সময় যেমন মাঝে মাঝে দেখতাম নিজেকে। সত্যি বলছি, ভারী গর্ব হল। আমি নিরুপমা চৌধুরি সেই ছোটোবেলার প্রজাপতির মতো, কাচপোকার মতো গুন্‌গুন্ করা দিনগুলোতে ফিরে গেলাম যেন। মনে হল, যা সাজা হয়েছে এই-ই ভালো হয়েছে। এর চেয়ে বেশি সাজলে বেমানান হত, সুশান্তর কাছে আমার মনটা বড় বেশি স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ত। মেয়েদের এতখানি স্পষ্ট হতে নেই; কোনো ব্যাপারেই বোধহয় নয়। অস্পষ্ট থাকার মধ্যেই মেয়েদের সব জারিজুরি। যে মেয়েরা এটা না বুঝেছে তারা এখনও কিছুই বোঝেনি।

হঠাৎ একটা কথা মনে হয়ে আমার খুব হাসি পেল। যদি সুশান্ত সত্যিই এসে থাকে, যদি সত্যিই একটু পরে এখানে আসে, আমার কাছে আসে, তাহলে এই এত কষ্ট করে পরা শাড়ি, এত কষ্ট করে সাজা আমার সমস্তই এক মুহূর্তে মাটি হবে। আমার সমস্ত আবরণ, আভরণ; নিরাবরণতাতে পর্যবসিত হবে। কিন্তু তাই কি? নিরাবরণ হওয়ার জন্যেই তো এত আবরণ! নির্লজ্জতাই কি সমস্ত লজ্জার শেষ গন্তব্য নয়?

সাজগোজ শেষ করে বসবার ঘরে এসে রাস্তার দিকের জানালায় দাঁড়িয়ে পর্দার ফাঁক দিয়ে সুশান্তর বাড়ির দিকে চাইতে লাগলাম। কেন জানি না, আমার মন কেবলি বলতে লাগল সুশান্ত এসেছে।

কেন জানি না, মন বলতে লাগল যে আমি কেমন করে সুশান্তর জন্যে নিজেকে তৈরি করলাম, সুশান্তও বুঝি আমার জন্যে তেমনি করে নিজেকে তৈরি করছে। করছে কি ? ছেলেরাও কি মেয়েদের মতো এত রোমান্টিক হয়? সব ছেলে হয় না; যেমন রমেন। কিন্তু কেউ কেউ হয়; যেমন সুশান্ত। সুশান্ত জানে কী করে কাউকে চাইতে হয়, কী করে কাউকে পেতে হয়। সুশান্ত নিশ্চয়ই জানে যে চাওয়াটাও, পাওয়ার মতোই একটা দারুণ আর্ট। সব মেয়েরা এমন পুরুষকে পছন্দ করে কি না জানি না। কিন্তু আমি করি।

জানলার ফাঁক দিয়ে দেখলাম ময়ূর একবার দরজা খুলে বেরোল। একটু পরে হাতে দেশলাই আর সিগারেট নিয়ে ফিরে এল।

আমার মনটা আনন্দে নেচে উঠল। তাহলে সুশান্ত নিশ্চয়ই ফিরেছে। খুব জানতে ইচ্ছে হল, সুশান্ত এখন কী করছে?

একটু পরেই দেখি সুশান্ত বাইরে বেরোল। পায়জামা পাঞ্জাবি পরে। বেরিয়েই আমাদের বাড়ির দিকে আসতে লাগল।

আমার হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে আমার গলায় উঠে এল। হিন্দী সিনেমাতে একেই বোধহয় "দিল ধড়কানো" বলে। কী করব, কী করা উচিত আমি ভেবে পেলাম না। তাড়াতাড়ি আমি জানালা থেকে সরে এসে এ সপ্তাহের 'দেশ'টা নিয়ে সোফায় বসে পড়লাম, যেন কত মনোযোগ সহকারে 'দেশ' পড়ছি।

সুশান্ত আসতেই, দরজায় বেল টিপতেই, আমি তক্ষুনি দরজা খুললাম না। ইচ্ছে করে ওকে একটু দাঁড় করিয়ে রাখলাম, যাতে ও আমার আগ্রহ বুঝতে না পারে।

দরজাটা খুলতে গেলাম 'দেশ'টা হাতে নিয়েই, যেন সুশান্ত আসবে এমন কথা আমার জানাই ছিল না।

দরজাটা খুলেই, যেন খুব অবাক হয়েছি এমনভাবে বললাম, বেড়ানো হল?

আমার মুখ যাই-ই বলুক, ওকে দেখে যে আমি খুব খুশি হয়েছি এ ভাব কিন্তু গোপন রইল না আমার মুখে।

ও অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। মুখের দিকে নয়, চোখের দিকে।

তারপর বলল, রমেনবাবু ফেরেননি?

আমি মাথা নাড়লাম।

ও বলল, আজ ফেরার কথা আছে?

আমি আবার মাথা নাড়লাম।

ও তাড়াতাড়ি বলল, মুখী কোথায়?

আমি অস্ফুটে বললাম, বাইরে।

পরমুহূর্তে সুশান্ত দরজাটা বন্ধ করে ছিটকিনি তুলে দিল। তারপর আমাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে সোজা শোবার ঘরের দিকে চলল।

আমি হাত-পা ছুড়তে লাগলাম, মুখে অস্ফুটে বলতে লাগলাম, না, না; এই না। আমার মুখ সুশান্তর বুকের কাছে ছিল। সুশান্ত কী সাবান মাখে জানি না, ওর বুকের লোম থেকে একটা মিষ্টি গন্ধ বেরুচ্ছিল। আমি হাত পা ছুঁড়ছিলাম, মেয়েসুলভ ন্যাকামি করছিলাম, যেরকম ন্যাকামি আমরা অন্য মেয়েদের মধ্যে দেখলে ধিক্কার দিই; ঠিক সেই রকম ন্যাকামি। আসলে আমরা সব মেয়েরাই বেসিকালি ন্যাকা—আর আমরা জানি যে পুরুষরা, সব পুরুষরা, সব পুরুষই সময় বিশেষে এই ন্যাকামি দারুণ পছন্দ করে।

সুশান্তর নাকের পাটাটা ফুলে উঠেছিল। ওর গরম প্রশ্বাস পড়ছিল আমার মুখে। সুশান্ত অবুঝ হয়ে গিয়েছিল।

আমাকে খাটের ওপর এনে শোওয়াবার পর এত অবিশ্বাস্য কম সময়ের মধ্যে পুরো ব্যাপারটা এমন অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্সের মধ্যে ঘটে গেল যে আমি ভাবতেও পারিনি।

আমার লজ্জানত আমার মধ্যে একটা অন্য আমি বাস করে। তাকে আমি এতদিন চিনতে পারিনি। সেই লজ্জানত আমার মধ্যে থেকে এক অদ্ভুত লজ্জাহীন আমি জেগে উঠেছিলাম, আমার শরীরের অণু-পরমাণু, আমার শিরায়-শিরায় এক দারুণ উদ্দীপনা সবে জেগেছিল, আমি এক প্রলম্বিত আনন্দের জন্যে নিজেকে অনেক ঘণ্টা ধরে তৈরি করেছিলাম, কিন্তু দেখলাম সুশান্তর এই রোমান্টিক চড়ুই পাখির সোহাগ আমাকে ভীষণভাবে অস্থির করে তুলেছে মাত্র। আমার মধ্যে এক দারুণ আগুন জ্বলে উঠেছে—তাকে নেবানো আমার একার পক্ষে অসম্ভব। আমার পাগল-পাগল লাগছিল। কেমন লাগছিল তা বোঝাতে পারব না।

সুশান্ত বিছানার এক কোনায় শুয়ে ছিল মুখে হাত ঢেকে, ওর নিজের একার স্বার্থপর আনন্দে বুঁদ হয়ে। ওকে দেখে আমার সেই মুহূর্তে ঘেন্না হচ্ছিল। ও শুধু নারী শরীরকে জাগাতেই জানে, ঘুম পাড়াতে জানে না।

আমি জানতাম যে ও অনভিজ্ঞ। তাই ওকে প্রথমবার ক্ষমা করে দিলাম আমি। অনেকক্ষণের যতির পর সুশান্ত, আমার আনাড়ি খেলোয়াড়, আমার পেলব বেলাভূমিতে খেলতে নামল, কিন্তু আবারও ও ব্যর্থ হল।

আমি ভরা শ্রাবণের কদম্বগন্ধী কোনো বানের ভরসায় আমার নরম নৌকো ভাসিয়েছিলাম—অনেক প্রত্যাশা নিয়ে। কিন্তু জোয়ার এল না, পালে হাওয়া লাগল না; আমার সমস্ত নৌকোখানি শুকনো চড়ার গ্লানির মধ্যে, নোঙর করাই রইল। সুশান্ত নৌকো বাইতে জানে না, হাল ধরতে জানে না, কোন্‌দিকে স্রোত, কোন্‌দিকে জোয়ার ও কিছুরই খোঁজ রাখে না।

বারেবারে ও ব্যর্থ হল।

আমি শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম, সুশান্তদের দূর থেকে অ্যাড্‌মায়ার করা যায়, ওদের সঙ্গে সাহিত্যালোচনা করা যায়, নন্দনতত্ত্ব, দর্শন ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কিন্তু ওদের নিয়ে জীবনে সুখী হওয়া যায় না। রমেন এবং সুশান্ত কেউই আমাকে সুখী করতে পারেনি, পারবেও না। প্রথমজন তার ক্রুডনেসের জন্যে, তার ভণ্ডামির জন্যে, তার নোংরা প্রস্তাবনার জন্যে, আর অশোভনতার জন্যে, দ্বিতীয়জন তার বাড়াবাড়ি রিফাইনমেন্টের জন্যে, তার ইনডায়রেক্টনেসের জন্যে। জীবনের মধ্যে একজনের পায়ে শুধু ভালো ও জোরালো শট আছে—কিন্তু সে ড্রিবল্‌ করতে জানে না, তার স্টাইল নেই। অন্যজন শুধু স্টাইলসর্বস্ব, তার পায়ে জোর নেই, গোলের সামনে এসেও গোল করতে পারে না সে।

সুশান্তর একটা হাত আমার কোমরের ওপর রাখা ছিল। সুশান্ত পাশ ফিরে শুয়েছিল। ও নিজের আনন্দে নিজে মগ্ন হয়েছিল।

সুশান্তর চোখের উজ্জ্বলতার মধ্যে আমি এক দারুণ স্বার্থপরতার আগুন দেখছিলাম। ওকে আমি ইতিমধ্যেই ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছিলাম।

হঠাৎ কে যেন দরজায় ধাক্কা দিল, তারপর কে যেন কলিং বেল টিপল জোরে জোরে।

আমরা দুজনেই ভয় পেয়ে উঠে বসলাম।

আমি উঠে বসতেই সুশান্ত কোনো গৃহপালিত জন্তুর মতো আমার খোলা বুকের কাছে উঠে এল।

আমি ওকে ধাক্কা দিয়ে সরালাম।

আবার দরজায় ধাক্কা পড়ল জোরে জোরে।

আমি তাড়াতাড়ি জামা-কাপড় পরে চুল ঠিক করে নিয়ে দরজার কাছে দাঁড়ালাম। ভিতর থেকে বিরক্তির গলায় বললাম, কে?

ওপাশ থেকে কে যেন জড়ানো গলায় বলল, আমি।

—আমি কে?

—আমি সেন।

—কী চাও তুমি?

—আমি আপনাকে চাই। আমি শুধু আপনাকে চাই।

আমি দৌড়ে গিয়ে বেডরুমের দরজাটা বাইরে থেকে টেনে বন্ধ করে দিয়ে এসে দরজা খুললাম।

সেন দমকা হাওয়ার মতো ভিতরে ঢুকল। ওর মুখ দিয়ে গন্ধ বেরুচ্ছিল।

সেন হাসছিল, বলল, একটা খুব সুখবর দিতে এলাম। কারখানার পর সোজা এখানে আসছি। না এসে পারলাম না। তাই-ই এলাম।

আমি বললাম, তুমি মদ খেয়েছ?

সেন অপরাধীর মতো মাথা নাড়ল।

আমি ধমকের গলায় বললাম, কেন খেয়েছ? সেদিন না কত কী বলেছিলে, তোমার দায়িত্ব কর্তব্যের কথা? সব ভুলে গেলে? এত তাড়াতাড়ি?

সেন বাইরের দরজাটা ভিতর থেকে ভেজিয়ে দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। জড়ানো গলায় বলল, সে কথা আপনি বুঝবেন না।

তারপরই বলল, আমি বড় কদর্য দেখতে না বউদি? আমাকে দেখলেই আপনার ঘেন্না হয়? তাই না?

কেন জানি না, আলোর নীচে দাঁড়িয়ে সেনের সেই কুৎসিত অথচ সরলতামাখা মত্ত মুখের দিকে চেয়ে আমার ভিতরটা যেন কেঁপে উঠল। ভয় পেয়ে গেলাম আমি। বললাম, ঘেন্না করি না; ঘেন্না করব কেন?

সেন অনুনয়ের সঙ্গে বলল, তাহলে আমার কাছে একটু আসুন বউদি, আমার সামনে একটু আসুন, আপনাকে একটু ভালো করে দেখি। একটা দারুণ ভালো খবর দিই আপনাকে।

আমি ধমকের সুরে বললাম, না! কেউ এসে পড়বে। ওরকম কোরো না।

সে অনুনয় করে বলল, প্লিজ, বউদি প্লিজ।

আমি ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

সেন বড় যত্নে, বড় আদলে, বড় সাবধানে আমার মুখটা ওর দু'হাতে নিল।

আমি দেখতে পাচ্ছিলাম, এক অবরুদ্ধ, অশ্রুরুদ্ধ শিশুসুলভ কামনা ওর সমস্ত শরীরময় থর্‌থর্‌ করে কাঁপছে।

সেন অনেকক্ষণ ওর রুক্ষ হাতে আমার নরম মুখটা ধরে রইল। তারপর যেন ওর সেদিনের কথা মনে পড়ে গেল, সেদিন ওকে যে অপমান করেছিলাম সে কথা মনে পড়ে গিয়ে যেন ও কুঁকড়ে গেল। ও বোধহয় আমাকে চুমু খেতে চেয়েছিল, বোধহয় এক মুহূর্তের জন্যে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে চেয়েছিল, কিন্তু মত্ত অবস্থাতেও নিজেকে ও সামলে নিল। সামলে নিয়ে আমার দুটি হাতের পাতা ওর দুটি হাতে তুলে নিয়ে কী যে উষ্ণতার সঙ্গে তার ঠোঁটে ছোঁয়ালো, কী বলব?

এমন সময় হঠাৎ শোওয়ার ঘর থেকে একটা আওয়াজ হল।

মুহূর্তের মধ্যে সেনের চোখের স্বপ্নময় ভাব বদলে গেল। কী এক বিষাদ ও বিরক্তির ভাবে ওর চোখ ভরে গেল। ও আমার হাত ছেড়ে দিয়ে বলল, ও ঘরে কে? রমেনদা কি ফিরে এসেছে?

আমি মাথা নাড়লাম। বললাম, কেউ না। বিড়াল-টিড়াল হবে।

সেন হঠাৎ আমার মুখের দিকে একাগ্রভাবে চেয়ে বলল, আপনার চুল এলোমেলো কেন? ও ঘরে কে?

আমি রাগের গলায় বললাম, কী পাগলের মতো বকছ। কিন্তু আমার বুকের মধ্যেটা হিম হয়ে গেল। আমি ওর হাত ধরে একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে বললাম, এসো, তোমার কী চাই বলো আমার কাছ থেকে। কী চাই?

সে ওর পা দুটো ফাঁক করে আলোর তলায় দাঁড়িয়ে এক দারুণ হিমেল হাসি হাসল আমার মুখে চেয়ে। বলল, কিছু চাই না। আমার কিছুই চাই না।

বলেই ধীরে ধীরে ও বেডরুমের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

আমি চিৎকার করে বললাম, কী হচ্ছে কী?

সেন আমার কথায় কর্ণপাত করল না।

এগিয়ে এক ঝটকায় বেডরুমের দরজাটা ধাক্কা দিয়ে খুলল।

আমিও ওর পিছনে পিছনে গেলাম। আমার মাথার ঠিক ছিল না। আমি বুঝতে পারছিলাম না, আমি কী করব, কী আমার করা উচিত।

বেডরুমে বেডলাইটা জ্বলছিল। খাটের বেডকভারটা লণ্ডভণ্ড অবস্থাতেই ছিল।

হঠাৎ সেন থমকে দাঁড়াল।

সেনের দৃষ্টি অনুসরণ করে আমিও দেখলাম, মেঝেতে সুশান্তর চটি-জোড়া পড়ে আছে এবং আমার ও রমেনের জোড়া ওয়ারড্রোবের দরজার ফাঁক দিয়ে সুশান্তর পাঞ্জাবির কোনার কিছুটা বেরিয়ে আছে।

সেন আমার মুখের দিকে তাকাল।

আমি মুখ নামিয়ে নিলাম। সেদিন আমি ওকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম; আজ ওর দিন।

সেন বলল, বিড়ালটার চেহারা দেখব নাকি?

আমার বুকের মধ্যে ধক্‌ধক্ করছিল। আমি ওর দিকে অপরাধীর চোখে তাকালাম।

সেন তেমনি জড়ানো গলায় বলল, না। থাক। ছিঁচকে মেনি বিড়ালের মুখ অন্ধকারেই থাক। ও মুখে আলো না পড়াই ভালো।

আমাদের কথাবার্তা সুশান্ত নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছিল, কিন্তু সুশান্ত কোনো কথা বলল না, ভেতর থেকে বেরিয়েও এল না।

হঠাৎ সেন ঠাস্ করে আমার গালে একটা চড় মারল।

আমার মাথাটা ঘুরে গেল। ওর পাঁচ আঙুলের দাগ আমার গালে গভীর হয়ে বসে গেল।

ওর গলার জড়ানো ভাব কেটে গেল। ও যেন হঠাৎ আমার চেয়ে, রমেনের চেয়ে, সুশান্তর চেয়ে, অনেক বড় হয়ে গেল। ও স্পষ্টভাবে কেটে কেটে বলল, নিরুপমা, আমি তোমাকে ভালোবেসেছিলাম। রমেনদার মতো নয়, তোমার এই বিড়ালের মতো করেও নয়, আমার সবকিছু দিয়ে। যা কিছু আমার ছিল বা আছে বা হবে তার সবকিছু দিয়ে।

তারপর একটু থেমে বলল, তোমাকে আমি যেখানে বসিয়েছিলাম মনে মনে, তুমি সেখানে বসার যোগ্য নও। তুমি আমার ভালোবাসা পাবার যোগ্য নও।

এই বলেই সেন সোজা দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। তারপর দু গাল বেয়ে দরদরিয়ে জল পড়তে লাগল। আমি দাঁতে ঠোঁট কামড়ে ধরে খাটের কোনায় বসে পড়লাম।

সেন আমাকে বউদি বলে ডাকত। সেন, আজকে আমার সঙ্গে এক অদ্ভুত ব্যবহার করে গেল। এমন ব্যবহার করল ও, এমন দ্বিধাহীনতায় আমাকে চড় মেরে গেল যে, আমার সমস্ত পুরোনো মরচে পড়া জানা, আমার সমস্ত বোধ, ঝন্‌ঝন্‌ করে বেজে উঠল।

আমি কতক্ষণ যে অমন ভাবে বসেছিলাম, আমি জানি না।

অনেকক্ষণ পর ক্যাঁচ-কোঁচ আওয়াজ করে আলমারির দরজা খুলল। ভেতর থেকে সুশান্ত চোরের মতো ভয়ার্ত মুখ বের করে ফিস্‌ফিস্‌ করে জিজ্ঞেস করল, চলে গেছে?

আমি জবাব দিলাম না।

আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলাম। কাঁদতে কাঁদতে আমাকে, আমার অভিশপ্ত জীবনকে, আমার অল্প বয়সের দম্ভকে, অভিশাপ দিচ্ছিলাম।

সুশান্ত আবার মুখ বের করে বিরক্তির গলায় ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, বলো না? চলে গেছে কিনা?

আমি তবুও জবাব না দেওয়াতে ও আলমারি খুলে বেরোলো। চটি দুটো পরল। তারপর আমার দিকে একবারও না চেয়ে, আমার চড়-খাওয়া গালের দিকে একবারও না তাকিয়ে বলল, আমি চলি, আবার হয়তো কে এসে পড়বে, বলেই হন্‌ হন্‌ করে বেরিয়ে চলে গেল।

চলে যাওয়া সুশান্তর দিকে তাকিয়ে ওর সমস্ত কিছুর জন্যে এক দারুণ ঘৃণায় আমার শরীর ঘিন্‌ ঘিন্‌ করে উঠল। ওকে আমি যা দিয়েছি তা আর ফেরানো যাবে না। কিন্তু ওকে আমি ভুল করে তা দিয়ে ফেলেছি বলে, আমার নিজের ওপরও এক অদ্ভুত ঘৃণা হতে লাগল। আমার মন কেবলই বলতে লাগল যে, আমার বুঝি সব কিছুই এমনি করে হারিয়ে যাবে, যা কিছু আমার ছিল, আমার বলতে যাই-ই ছিল; সব। সব; সব।

১২

আজ কুড়ি দিন হল রমেন কলকাতা গেছে। আজ অবধি তার কোনো চিঠি আসেনি আমার কাছে। বাবার আর একটা চিঠি পেয়েছিলাম তাতে উনি লিখেছিলেন যে পরমেশ কাকা রমেনকে পরের সপ্তাহে রেসের মাঠে দেখেছেন।

এতদিনে আমার যা বোঝার ছিল, সবই বোঝা হয়ে গেছে। বুঝতে যে কষ্ট হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই কোনো, কিন্তু তবুও বুঝতে হয়েছে। রমেন আমাকে সব দিক দিয়ে, সর্বতোভাবে নিঃস্ব রিক্ত করে গেছে। আমি তো এমনিতেই নিঃস্ব ছিলাম, কিন্তু বার বার ওকে সুযোগ দেওয়া সত্ত্বেও, ওকে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও কেন যে নিজেকে বার বার এত ভাবে ছোটো করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিল সেটাই আমার বুদ্ধির বাইরে।

গতকাল থেকে আমি কেবলি ভাবছি, ভাবছি কী করা যায়। কী আমার করা উচিত।

সুশান্তর মধ্যের মেয়ে মানুষটা সেদিন সব দিক দিয়ে এমনভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল আমার কাছে, আমার চোখের সামনে, যে তারপর থেকে সুশান্তর সঙ্গে আর কোনোরকম সম্পর্ক রাখার ইচ্ছা ছিল না। অথচ ওর সবই ছিল। শিক্ষা, দীক্ষা, রুচি, সভ্যতা, এমনকি সততাও ছিল। অথচ তবুও এমন এক পরীক্ষায় ফেল করল, এমন এক স্বার্থপরতাময় জগতের আভাস দেখতে পেলাম ওর মধ্যে যে ওকে আর আমার ভালো লাগা সম্ভব নয়। আশ্চর্য! সুশান্তর ওপর মনে মনে আমি

অনেকখানি নির্ভর করতে শুরু করেছিলাম। কতখানি যে, তা সুশান্ত নিজেও জানে না।

আমার জীবন হয়তো কারও অভিশাপে অভিশপ্ত হয়ে গেছে। নইলে যাতেই আমি হাত দিই, যাকেই আমি আপন করে পেতে চাই, সেই কেন এমনভাবে ব্যর্থ করে নিজেকে ও আমাকে?

গত সপ্তাহ থেকেই বর্ষা নেমেছে জামশেদপুরে। গরমটা অনেক কম। গাছে-গাছে ক্ষুদে-ক্ষুদে কচিকলাপাতা রঙা নতুন পাতা গজিয়েছে। কদ্‌মা-সোনারি লিংক্‌সের শুকিয়ে-ওঠা রুক্ষতার মধ্যে এখন নতুন নতুন ঘাস গজিয়ে উঠেছে। সোনাঝুরি গাছগুলোর পাতাগুলো রোদ পড়লে চক্‌চক্ করে। এখানকার শান্ত নিস্তব্ধ ঠান্ডা দুপুরগুলো ভারী ভালো লাগে।

বাইরের প্রকৃতি শান্ত স্নিগ্ধ হয়েছে, কিন্তু আমার অন্তরের প্রকৃতি বড়ই বিক্ষুব্ধ হয়ে আছে। অথচ খুব তাড়াতাড়ি আমায় একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কারণ রমেনের কলকাতায় পাকাপাকিভাবে থেকে যাবার কথাটা আমাদের বাড়িতে আর বেশিদিন চাপা থাকবে না। হয়তো বাবা অথবা কোনো দিদি জামাইবাবুকে আমাকে না জানিয়েই ব্যাপারটার সরেজমিনে তদন্ত করতে এসে হাজির হবেন এখানে ঝুপ করে। তাই যদি হয়, তাহলে এতদিন আপ্রাণ চেষ্টায় যে সত্যটাকে গোপন রেখেছিলাম, সেই হঠাৎই ফাঁস হয়ে যাবে, বড় মর্মান্তিকভাবে।

জানি না কেন, কিছুদিন থেকে, মানে সেনের আমাকে চড় মারার পর থেকেই সেনের কথা আমার বার বার মনে পড়ছিল। রমেন আমাকে ভালোবাসেনি, সুশান্ত আমাকে তার নিজের সংকীর্ণ মেনিবিড়ালের ভালোবাসায় ভালোবেসেছিল, সে ভালোবাসা আমার গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি। তবে কী ঐ কুদর্শন ছেলেমানুষ সেনই আমাকে সত্যিকারের ভালোবাসে? তাকেই কী আমার এই জটিল মনের কোনো অবচেতন কোণে আমি আসন দিয়েছি আমার অজ্ঞাতসারে? অতীতের কোনো অজানা মুহূর্তে? এও কি সম্ভব?

কী জানি? আগে ভাবতাম আমি কত বুঝি, কত জানি। ভাবতাম, বাবা, মা, দাদা, দিদিরা সব সব ব্যাক-ডেটেড্, প্রি-হিস্টোরিক ফসিল। ভাবতাম, আমি যা জানি, আমি যা বুঝি সেটাই ঠিক। অন্যরা সকলেই ভুল। তখন আমার নিজের উপর পুরোপুরি বিশ্বাস ছিল—নিজেকে, নিজের বিচার-বুদ্ধিকেই একমাত্র বিশ্বাস করে অন্য সকলকেই অবহেলায় অবিশ্বাস করেছিলাম।

আজ আমার স্বীকার করতে কোনো দ্বিধা বা লজ্জা নেই যে, আমার সেই এককালীন কংক্রিটের বিশ্বাসের ভিত আজ বড় নড়বড়ে হয়ে গেছে। নিজের ওপর আগের মতো নির্দ্বিধায় ভর করার সাহস আমার নষ্ট হয়ে গেছে।

আমার এই অল্পবয়সি জীবন, আমার সুন্দর শরীর এবং সরল অপাপবিদ্ধ মন এমন, এমন সব অসততা, ছল চাতুরী প্রবঞ্চনার মধ্যে দিয়ে গত দুবছর পার হয়েছে যে একটা পরম সত্য বড় মর্মান্তিকভাবে বুঝেছি। দুঃখ এইটুকুই যে এ সত্য বোঝার জন্যে বড় বেশি দাম দিতে হল। বুঝেছি যে, জীবনের কোনো জানাই, কোনো বিশ্বাসই, কোনো বোধই স্থাবর নয়। জীবন যেমন নদীর মতো বহমান, তেমন বহমান আমাদের সব বিশ্বাস, সব জানা, সব বোধ। গতকাল যেটাকে সত্য বলে জেনেছি, আজকেই সেটাকে মিথ্যা বলে জানছি। গতকাল যে নির্ভুল বলে নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করেছি, আজকে সেই বিশ্বাসের অযৌক্তিকতাতে নিজেরই হাসি পেয়েছে।

এ কথা সত্যি যে আমি হেরে গেছি। নিজের কাছে নিজে বারবার হেরে গেছি—তবু বাইরের কারও কাছে আমি হারিনি, হারতে চাইনি কখনও। বাইরের কারও কাছে এখন অবধিও হারিনি। জানি না আমার কপালে কী আছে। আধুনিকই হই আর লেখাপড়াই শিখি, কপাল অতিক্রম করার কোনো শক্তি আমার আছে বলে আমি মনে করি না।

এখন বারে বারেই মনে হয় মেয়ে হয়ে-জন্মানো, সুন্দর নারীশরীর নিয়ে জন্মানো যেমন এক

দারুণ আশীর্বাদ, তেমন এক দারুণ অভিশাপও বটে। আমার সুন্দর শরীর না থাকলে রমেন আমার প্রতি আকর্ষিত হত না। নইলে রেসের মাঠের কিম্ভূতকিমাকার নামের অনেক ঘোড়ার মতো একটি ঘর্মাক্ত ঘোড়ার মতো ও আমাকে বেছে নিয়ে আমার উপর বাজি লাগাত না। জানি না, আমাকে বিয়ে করা নিয়েও ও কারও সঙ্গে ভাও লাগিয়েছিল কি না। রেসে জেতার পর যেমন জুয়াড়িদের যে ঘোড়া তাকে জেতাল সে সম্বন্ধে আর কোনো ঔৎসুক্য থাকে না—তেমন বিয়ের পর আমার সম্বন্ধেও আর কোনো ঔৎসুক্য ছিল না। যা ছিল, তা নিরুপমা চৌধুরি নামের মেয়েটির প্রতি কোনো বোধই নয়, তার সুন্দর শরীরটার প্রতি এক অদ্ভুত লোভ। যা কেবল পুরুষদেরই একচেটে। পুরুষদের চাওয়া, বড় নোংরা চাওয়া।

মন বিবর্জিত, মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারুকাজহীনতার মধ্যে রমেন শুধুই একটি ভালো-ফিগার মিষ্টি-মুখের শরীর চেয়েছিল। এখন বুঝি, আজ বুঝি, ও আমাকে আমার জন্যে কখনও চায়নি।

রমেনের পরে আমার এই আশ্চর্য অভিশপ্ত জীবনে এল সুশান্ত—রূপকথার রাজপুত্রের মতো। ভাবলেও অবাক লাগে। সুশান্ত সম্বন্ধে মনে মনে কত না কল্পনার ছবি এঁকেছিলাম। আমি যা চাই, আমি যা স্বপ্ন দেখেছি সবই সুশান্তর মধ্যে দেখতে পেতাম। এখনও আমার ভাবতে কষ্ট হয় যে, এতদিন ধরে তিল তিল করে গড়ে তোলা মানসিকতা কেমন এক মুহূর্তের একটা ঘটনায় মাকড়সার জালের মতো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

শারীরিক ব্যাপারে সুশান্তর অক্ষমতা একটা বড় ব্যাপার হলেও সেটা কিন্তু আমি কখনও বড় করে দেখতাম না। আমার মনে হয়, কোনো মেয়েই দেখে না। হাজার হাজার সুখী মেয়ে আছে যারা এ বাবদে সুখী নয়, সুখী হয়নি। কিন্তু তাদের স্বামীরা তাদের আরও এমনকিছু জীবনে দিয়েছে যে তারা এইদিকের অপূর্ণতা অনায়াসে ভুলে গেছে। সেই অন্য অনেক কিছু বলতে যে শুধু টাকা-পয়সাই পড়ে তা নয়। টাকা-পয়সা, সচ্ছলতা এসব ভীষণ দরকারি; কিন্তু এর চেয়েও বড় জিনিস চাইবার থাকে আমাদের পুরুষদের কাছ থেকে। কথাটা কী করে বোঝাব জানি না। হঠাৎ লোডশেডিং হয়ে গেলে, যখন ঝুপ করে অন্ধকার হয়ে আসে, ঝড়ের রাতে হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের সঙ্গে যখন বুকের মধ্যে চমক দিয়ে বাজ পড়ে, অতর্কিতে যখন খাটের তলা থেকে কুৎসিত আরশোলা ডানা মেলে ফর্‌র্‌-র-র্‌ ফর্‌র্‌-র্‌-র্‌ করে ঘরময় উড়ে বেড়ায়, ঠিক তখন, ঠিক সেই মুহূর্তে আমি বা অন্য যে-কোনো মেয়ে যার দিকে দৌড়ে যাই, যার হাতে হাত রাখতে চাই, সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হয়ে, নিজেদের দেশি-বিদেশি য়্যুনিভার্সিটির ডিগ্রি, আমাদের সব ইন্ডিপেনডেন্স ও লিবারেশনের গুমোর ভুলে গিয়ে আমরা যাদের বুকে আছড়ে পড়ে যাদের ওপর নিঃশর্ত নির্ভরতায় নির্ভর করি—একমাত্র তারাই তা দিতে পারে; যা মেয়েরা চায়।

শীতার্ত দিনের উষ্ণতা, অন্ধকারে আলো, অনিশ্চয়তার মধ্যে নিশ্চয়তা এবং আমাদের কাছে সবচেয়ে যা বড়, সেই অন্তরের অনাবিল অবলম্বন যে পুরুষ দিতে পারে, মেয়েরা তাকেই পুরুষ বলে মানে। তাকেই তার নরম শরীরে, তার ভঙ্গুর কম্পমান মনে আদর করে বরণ করে নেয়।

এত কথা মনে হচ্ছে এই জন্যেই যে, সুশান্তর আচরণে, তার চোরের মতো আসা, ধরাপড়া এবং চোরের মতো পালিয়ে যাওয়ার মধ্যে এমন এক কাপুরুষতা ছিল, এমন এক বিশ্রী ব্যাপার ছিল যে, তার সেই ক্ষণিকের ব্যবহার, তার আগের এতদিনের ছবি আমার কাছে একেবারে মলিন করে দিল। ও মলিন হয়ে গেল সেনের পটভূমিতে। হঠাৎ করে আবিষ্কার করে বসলাম আমি যে, যে লোকটা কাউকে, নিছক ভালোবাসার দাবিতে, বিনাভূমিকায়, বিনা আড়ম্বরে ঠাস্‌ করে চড় লাগাতে পারে—আর যাই-ই হোক সে লোকটার মধ্যে মেকীর কিছু নেই। এ সব লোক কথায় কথায় রবার্ট ফ্রস্ট বা টি. এস. এলিয়ট বা জীবনানন্দ আওড়ায় না, এরা আধুনিক ফিল্‌ম-এর ওপর অথরিটি

বলে নিজেদের দাবি করে না, এরা পৃথিবীর তাবৎ শিল্পবোধ ও রুচিজ্ঞানকে এদের সিগারেট ধরা আঙুলগুলির মধ্যে বন্দী করে রেখেছে বলে বিশ্বাস করে না—এরা সাদা-মাঠা লোক—এরা কেউ ইঞ্জিনিয়র, কেউ কেরানি, কেউ পিওন, কেউ ডাক্তার—কিন্তু এরা একটা বাবদে সমান—তাদের বিদ্যা বুদ্ধি পেশা বৃত্তি যাই-ই হোক না কেন—এরা নিজেদের ওপর, এদের প্রত্যেকে নিজের নিজের ওপর বিশ্বাস রাখে। এদের প্রত্যেকের আত্মবিশ্বাস আছে।

আমি নারীজাতির প্রতিনিধি নই, সকলের কথা আমি জানি না—আমি আমার কথা জানি। এই-ই আমার মত। যে পুরুষের সমস্ত ব্যাপারে তার নিজের ওপর আত্মবিশ্বাস নেই, সে কাউকে ভালোবাসার শখ রাখে, কিন্তু তার চোখের সামনে তার ভালোবাসার জনকে অন্য লোক মেরে যেতে পারে, তেমন লোককে ভালোবাসা নিরুপমা চৌধুরির পক্ষে সম্ভব নয়।

সুশান্তটা একটা থার্ডক্লাস ফ্লপ্। ও একটা ভণ্ড। রমেনের মতো ক্রুড ভণ্ড নয়; রিফাইন্ড ভণ্ড। এদের উচিত বালিগঞ্জ পাড়ার মেগিয়া-স্লিভস্ ব্লাউজ পরা কোনো বড় লোকের ইন্‌সিপিড ন্যাকুপুষুমুনু মেয়ের সঙ্গে প্রেম করা। নিরুপমা সুশান্তর জন্যে নয়।

কিন্তু ওকে যা দেবার তা তো দিয়েই দিয়েছি। তার পুনরাবৃত্তি হবে না, কিন্তু তা তো আর ফেরানোও যাবে না।

মনে মনে এত কথা বললাম বটে, কিন্তু কখনও-সখনও সুশান্তর কথা ভেবে মনটা একটু একটু খারাপও হচ্ছিল। ওর টানা-টানা কালো চোখ দুটি আমার চোখের সামনে ভাসছিল। তারপর মনে মনে নিজেই নিজেকে বললাম, দুপুরবেলায় খোঁটায় বাঁধা গোরুদের চোখও তো ওরকম হয়।

আমি জানি না আমি কী করব? নিরুপমা চৌধুরি আর কতবার, কতবার, কতবার এমন করে ভুল করবে? প্রতি পদে পদে কতদিন নিজের জীবনটাকে এমন হোঁচট খাওয়াতে খাওয়াতে এগিয়ে নিয়ে যাবে—আর কতদিন। নিরুপমা, তুমি কি চিরদিন ভুলই করবে? চিরটা দিন; চিরটা কাল?

সেনের ভাবনাটা আমাকে আজ দুপুর থেকে ভীষণ পেয়ে বসেছিল। সেনের ঠিকানা আমাদের ঠিকানার খাতায় লেখা ছিল। দু'বার সেই ঠিকানাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করলাম। কী করব বুঝতে পারলাম না। জীবনে এমন এমন সময় অনেক আসে যখন কী করব বা কী করা উচিত তা কেবল নিজেকেই ঠিক করতে হয়। নিজের পাশে দাঁড়াবার, বুদ্ধি দেবার মতো কেউই থাকে না তখন। আমার স্কুলও খুলে এল বলে। রমেন যদি সত্যিই আর না ফিরে আসে তাহলে আমার কোনো হস্টেলে গিয়ে উঠতে হবে। একা আমার পক্ষে এরকমভাবে থাকা সম্ভব নয়। কোনোও দিক দিয়েই নয়। তারপর বুঝে-সুঝে কলকাতাতেই চলে যেতে হবে লাজলজ্জার মাথা খেয়ে।

আজ কখন যে উদ্‌ভ্রান্তের মতো সেনের ঠিকানার দিকে বেরিয়ে পড়েছিলাম সন্ধের মুখে, আমি নিজেই জানি না। যখন সাইকেল রিকশা নিয়ে নিয়ে ঠিকানা চিনে পৌঁছলাম তখন সন্ধে সাতটা। সেনকে পাওয়া গেল না, একজন মাদ্রাজি ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এসে বললেন যে, সেনসাহেব নতুন বাসায় উঠে গেছেন তাঁর চাকরিতে উন্নতি হয়েছে বলে। ভদ্রমহিলা সেই নতুন বাসার ঠিকানাই দিলেন।

অনুমানে বুঝলাম যে, ভদ্রমহিলার স্বামী রমেনদের কারখানাতেই কাজ করেন। আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করাতে আমি বললাম, আমি সেনের কাজিন হই।

সেই নতুন ঠিকানা অনেক দুর এখান থেকে—পশ্ পাড়ায়। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম প্রায় সাড়ে সাতটা বাজে। একবার ভাবলাম বাড়ি ফিরে যাই, আর একবার ভাবলাম, না এখনই যাই ওর কাছে।

তারপর রিকশা ঘুরিয়ে নিয়ে এগোলাম নতুন ঠিকানার দিকে।

এ ক'দিন দিন-রাত ভাবনা-চিন্তায় আমার শরীরটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল—চোখ বসে গিয়েছিল—খাওয়া-দাওয়ারও অনিয়ম হয়েছে খুব—রাতে প্রায় বেশিরভাগ দিনই খাইই নি কিছু। ঘুমোতেও পারিনি।

রিকশাটা গিয়ে যেখানে দাঁড়াল সেটা রীতিমতো বড়লোকি জায়গা।

রিকশাওয়ালাকে দাঁড় করিয়ে রেখে, ওর বাড়ির পাশের একটা পানের দোকানের আয়নায় নিজেকে একবার দেখে নিলাম। এ ক'দিনে একেবারে হতশ্রী হয়ে গেছি আমি। আমাকে চেনা যায় না একেবারে! কিন্তু উপায় নেই—সেনের সঙ্গে একবার দেখা করা আমার বড় দরকার। নিজেকে বোঝার জন্যে। ওকে বোঝার জন্যে।

দরজার কলিং বেল টিপলাম।

বেয়ারা এসে দারুণ সাজানো-গোছানো একটি ড্রইং রুমে এনে আমাকে বসাল। বলল, সাহাব আভি কারখানাসে আয়া। আপ তসরীফ্ রাখিয়ে। উনোনে নাহানে গ্যায়া।

আমি বললাম, ঠিক হ্যায়।

ব্যাপারটা আমার একটু অবাক অবাক লাগছিল। অল্প কিছুদিনের মধ্যে কারখানায় সেনের এমন কী উন্নতি হল যে ঐ বাড়ি থেকে একেবারে এই বাড়িতে উঠে এল? হঠাৎ মনে হল, ভুল ঠিকানায় আসিনি তো! লোকটিকে আবার ডেকে ভালো করে শুধোলাম, সেনের নাম, সেনের কোম্পানির নাম।

সব ঠিক ঠিক মিলে গেল।

ড্রইং রুমটার চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। একটি বড় সোফা সেট, একটা গ্লাস-টপ দেওয়া গোল সেনটার টেবল্—। মেঝেতে হালকা সবুজ রঙা কার্পেট। চতুর্দিকে সাচ্ছল্যের সঙ্গে সুরুচির ছাপ পরিষ্কার। আমার বড় ইচ্ছা ছিল এমন একটা বসবার ঘর থাকুক আমার। বড় ইচ্ছা ছিল। রমেনকে নিয়ে আমি যা যা স্বপ্ন দেখতাম, তার মধ্যে এও একটা স্বপ্ন।

বসে বসে ভাবছিলাম, সেনও রমেনের মতোই ইঞ্জিনিয়ার। তবে পড়াশোনায় সেন খুব ভালো ছিল, রমেনের কাছে শুনেছি আমি। হয়তো ভালো করে কাজ করেছে, সৎভাবে খেটেছে, হয়তো ফাঁকি দেয়নি। রমেনদের কোম্পানি সরকারি নয়; খুব বড়ও নয়, তাই এখনও যোগ্যতার ও সততার দাম আছে এ সব জায়গায়।

এত সব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ভিতরের প্যাসেজ থেকে চটির আওয়াজ শুনতে পেলাম।

সেন পায়জামা আর আদ্দির পাঞ্জাবি পরে পর্দা সরিয়ে ঘরে এসে ঢুকেই অবাক হয়ে গেল?

পর্দার সামনেই দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ ও।

তারপর থতমত খেয়ে বলল, তুমি! আপনি! কী মনে করে?

আমিও উঠে দাঁড়িয়েছিলাম, কিন্তু আমি কিছু বলতে পারলাম না। বললাম, এমনিই। কোনো দরকার নেই। এমনিই।

সেনের দিকে তাকিয়ে সেনকে যেমন ও যতখানি কুৎসিত দেখাত আগে, ততখানি দেখাল না। মনে হল, যে ছেলেটির মোটর সাইকেলের পিছনে বসে আমি বেড়াতাম, এ সে নয়। এ অন্য কেউ। সেই সাবালক ছেলেমানুষ কবে যেন সাবালক বীরপুরুষ হয়ে গেছে। পুরুষমানুষদের কৃতিত্বর পটভূমিতে তাদের বিচার করলে, তাদের চেহারাটা মানে চোখ মুখ নাক গায়ের রঙ বোধ হয় আলাদা করে চোখে পড়ে না; যা চোখে পড়ে তা বোধ হয় তাদের ব্যক্তিত্ব। কেন জানি না, যেদিন আমাকে সেন চড় মেরেছিল, সেদিনও ওর চেহারাটা খুব ব্যক্তিত্বময় বলে মনে হয়েছিল আমার।

অনেকক্ষণ আমি সেনের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

সেন যেন আদেশের সুরে বলল আমায়, বোসো।

তারপরই বলল, তোমাকে তুমিই বলছি, কারণ বয়সে তুমি আমার চেয়ে সামান্য ছোটই হবে। রমেনদার সম্পর্কে তুমি আমার বউদি হতে—সে সম্পর্কটা যখন আমাদের কেউই আর মানি না তখন তোমাকে তুমি বলার কোনো বাধা দেখি না।

আমি বসে পড়লাম।

সেন বলল, তুমি কিছু খাবে?

আমি বললাম, না।

না কেন?

ও এ কথাটাও আদেশের সুরে বলল।

আমি যেন কেমন হয়ে গেলাম। বললাম, শুধু চা।

সেন বেয়ারাকে ডেকে বলল, সিরিফ চায়ে লাও। আর কিছু যে আনতে বলল না, তা আমি লক্ষ্য করলাম।

তারপর বলল, রমেনদার খবর জানো?

আমি মাথা নাড়লাম।

তুমি কি আমার কাছে তার খবর জানতে এসেছ?

আমি আবার মাথা নাড়লাম।

ও বলল, তাহলে কেন এসেছ? এসেছ কেন?

আমি বললাম, জানি না।

আমি মুখ নিচু করে রইলাম।

পরমুহূর্তেই আমি বুঝতে পারলাম যে. আমার দু চোখ জলে ভরে গেছে।

সেন আমার দিকে অপলকে তাকিয়ে ছিল। শুকনো চোখে। ওর চোখে অনুশোচনা, সমবেদনা বা বিস্ময় কোনো কিছুই ছিল না। ফারনেসের পাশের হাওয়ার মতো ওর চোখ দিয়ে এক আশ্চর্য গরম হল্‌কা বেরোচ্ছিল। ওর চোখে কোনো ভাবালুতা ছিল না।

সেন আমার সঙ্গে কোনো কথা বলল না। সমস্তক্ষণ শুধু আমার চোখে চেয়ে রইল।

একটু পরে বেয়ারা ম্যাটস্‌-পাতা ট্রেতে বসিয়ে, সুন্দর টি-কোজিতে ঢাকা টি-পটে চা নিয়ে এল।

সেন উঠে এসে আমার পাশে বসল। নিজে হাতে চা ঢালল। তারপর বলল, চিনি ক'চামচ।

আমি বললাম, এক।

সেন চা তৈরি করে আমাকে এগিয়ে দিল।

আমি বললাম, তোমার?

ও আবার নিজের জায়গায় গিয়ে স্বগতোক্তির মতো বলল, সারাদিন কারখানায় থেকে শরীর এত কষে যায় যে কিছু ভালো লাগে না।

আমি বললাম, একটা করে বিয়ার খাও না কেন? ফিরে এসে? গরমের দিনে?

সেন অবাক হয়ে তাকাল আমার দিকে।

তারপর বলল, কে আনায়? কে দেয়? নিজের জন্যে কখনও কিছু করিনি ছোটোবেলা থেকে, অভ্যাস নেই, ভালোও লাগে না।

আমি কথা বললাম না আর।

কিছুক্ষণ পর আমি বললাম, উঠি।

সেন বলল, বেশ। বলে উঠে দাঁড়াল। একবারও বলল না আবার এসো, বলল না যে ও খুশি হয়েছে! বলল না আর একটু বোসো।

ও দরজা অবধি এসে দরজা খুলে দিল।

দরজা খুলতেই দেখি একটা সাদা স্ট্যান্ডার্ড হেরাল্ড গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ির পাশে কোম্পানির নীলাভ য়্যুনিফর্ম পরা ড্রাইভার।

ড্রাইভার এগিয়ে এসে দরজা খুলে দিল আমার জন্যে।

সেন বলল, মেমসাব রিকশাসে যায়েগী—তুম্ গাড়ি গ্যারাজমে লাগা দেও।

রিকশাওয়ালা একটু দূরে দাঁড়িয়েই ছিল। আমাকে দেখে এগিয়ে আসতে লাগল।

এমন সময় সেন আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, এটা ভদ্রলোকের পাড়া এখানে বাজারের মেয়েরা যাওয়া-আসা করে না। এমন করে আর এসো না, বুঝলে।

আমার কান দুটো গরমে ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল। ওর দিকে না তাকিয়ে, ওকে কিছু না বলে আমি রিকশায় উঠে বসলাম।

রিকশাওয়ালা রিকশা চালিয়ে দিল।

একবার পিছন ফিরে দেখলাম সেন দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। ওর চোখে তখনও সেই শুকনো আগুনের হল্‌কা। মুখে কোনো ভাব নেই। ভাবলেশহীন কঠিন আত্মমগ্ন মুখ।

সেদিনও রাতে আমার খাওয়া হল না। রাত তিনটে অবধি বিছানায় ছটফট করলাম আমি। তারপর মনস্থির করে ফেললাম। ঠিক করলাম, কালই সকালের স্টিল-এক্সপ্রেসে কলকাতা যাব। আমাদের বাড়ি গিয়ে উঠব। এতদিনে আমার মাথা উঁচু করে থাকার দিন বুঝি সত্যিই শেষ হয়ে গেছে। যে-বাড়ি থেকে একদিন সানাইয়ের আওয়াজের মধ্যে সকলকে কাঁদিয়ে এসেছিলাম, সে-বাড়িতে কাল দুপুরের রোদে চিলের কান্নার মধ্যে ভীরু পায়ে চোরের মতো ফিরে যাব। বাবার পা জড়িয়ে ধরে বলব, বাবা আমি ভুল করেছিলাম, বলব, বাবা তুমি আমাকে চাবুক মারো, চাবুক মেরে আমার পিঠের চামড়া তুলে দাও।

অন্য মেয়ে হলে হয়তো এ অবস্থায় আত্মহত্যা করত। কিন্তু আমি যে এই সুন্দর পৃথিবীকে বড় ভালোবাসি, আমার এই এক ও একমাত্র জীবনকে যে আমি বড় ভালোবাসি। আমি যেই নিজেকে নিজে হাতে মারতে শিখিনি। মারার কথা ভাবিওনি কখনও। এ জীবনে সকলে কি আমাকে ঠকাতেই এসেছিল? আমার কি এইই প্রাপ্য ছিল পৃথিবীর কাছ থেকে? আর কিছুই কি আমার পাওয়ার ছিল না কারও কাছে?

রাত তিনটে নাগাদ উঠে মুখ-হাত ধুয়ে আমার স্যুটকেসটা গুছিয়ে নিলাম আস্তে আস্তে। আপাতত একটা স্যুটকেস নিয়েই যাই। তারপর দাদা-দিদিদের কারও সঙ্গে ফিরে এসে সব বন্দোবস্ত করব।

ভোর পাঁচটার আগেই অন্ধকার থাকতে থাকতে মুখীকে উঠিয়ে একটু চা করতে বললাম। তারপর আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে মুখীকে পাঠালাম কালীবাড়ির মোড় থেকে একটা ট্যাক্সি ডেকে আনতে। মুখী চলে গেলে দরজা বন্ধ করে স্যুটকেস নিয়ে বাইরের ঘরে বসে থাকলাম আমি। আমার অস্পষ্ট অজ্ঞাত ভবিষ্যতের মধ্যে।

এই সময় সুশান্তর কথা আমার ভীষণ মনে হচ্ছিল। ওরও হয়তো দুঃখ হয়েছে আমার জন্যে। ও-ও নিশ্চয়ই ওর মতো করে আমাকে ভালোবেসেছিল। কিন্তু ও বড় পুঁথি-পড়া বিদ্বান, ও বড় স্বার্থপর, ও বড় ভীরু—ওর মতো ছেলের ওপর জীবনে একবার ভুল করার পরও দ্বিতীয়বার নির্ভর করা যায় না। ওরা দূর থেকে মেয়েদের মন কাড়তে পারে, মেয়েদের সহানুভূতি পেতে পারে; কাছ থেকে নয়। ওদের নিয়ে এক ঘরে বাস করা যায় না। ওরা অন্তরে পুরুষ নয়, ওরা পোশাকি পুরুষ।

কলিং বেলটা বাজল। বাইরে ট্যাক্সি থামার শব্দ হয়েছিল একটু আগে। ট্যাক্সি পেতে মুখীর দেরি হয়নি।

আমি স্যুটকেসটা হাতে করে এসে দরজা খুললাম।

দরজা খুলেই অবাক হয়ে গেলাম।

দেখি, সেন দাঁড়িয়ে আছে—কালকের সন্ধেয় যে পোশাক পরেছিল, সেই এলোমেলো হয়ে যাওয়া পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে।

সেনের চুল উস্কো-খুস্কো, হাতে গাড়ির চাবি। পিছনে ওর সাদা ছিপছিপে গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে।

সেন বলল, আমি তোমাকে নিতে এসেছি। আশ্চর্য তুমি যে তৈরি হয়ে আছো? তুমি কি জানতে যে আমি আসব?

আমি অন্যদিকে চেয়ে বললাম, মুখীকে ট্যাক্সি ডাকতে পাঠিয়েছি—। স্টিল এক্সপ্রেসে আমি কলকাতা যাব এখুনি।

সেন দরজাটা ভেজিয়ে দিল। আমার পথ আগলে বলল, তুমি কোথাওই যাবে না; তুমি এখন তোমার নিজের ঘরে যাবে; নিজের সংসারে।

আমি বললাম, পথ ছাড়ো। আমি সারারাত ঘুমোইনি। রসিকতা বোঝার মতো শরীর বা মনের অবস্থা নেই আমার।

সেনের চোখ দুটো আবার কাল রাতের মতো শুকনো হয়ে গেল।

ও বলল, আমিও সারারাত ঘুমোইনি। রসিকতা আমি করছি না। অন্তত তোমার সঙ্গে করিনি কখনও।

ইতিমধ্যে মুখী এসে গেল ট্যাক্সি নিয়ে।

সেন মুখীকে বলল, আমিই পৌঁছে দেব দিদিমণিকে স্টেশনে।

বলেই, আমাকে কিছু বলতে দেবার আগেই পকেট থেকে পার্স বের করে ট্যাক্সি-ওয়ালাকে দুটো টাকা দিয়ে দিল। তারপর গাড়ির বুট খুলে আমার স্যুটকেসটা পিছনে তুলে সামনের বাঁদিকের দরজা খুলে দিল আমার জন্যে। খুলে দাঁড়িয়েই থাকল।

আমি মুখীর দিকে তাকালাম।

মুখী কী বুঝল জানি না। মুখী আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি মুখ বাড়িয়ে বললাম, বাড়ি ছেড়ে যাস না মুখী, সাবধানে থাকিস।

গাড়িটা স্টার্ট করেই সেন বলল, মুখীর জন্যে মন খারাপ হল?

আমি বললাম, না। আমার আবার মন খারাপ। আমার কারও জন্যেই মন খারাপ হয় না।

সেন হাসল। এই প্রথম ও আমার সামনে বহুদিন পরে।

আমি পাশ থেকে ওর মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম হাসলে ওকে আরও ছেলেমানুষ দেখায়।

ও বলল, আজ হয় না, একদিন হয়তো হবে। কে বলতে পারে?

তারপরই বলল, মুখীকে আমরা কালই এসে নিয়ে যাব। মুখীর বরকেও। ও নইলে তোমার দেখাশুনা করবে কে?

আমি অবাক হয়ে বললাম, কোথায়?

তোমার বাড়িতে। তোমার নিজের ঘরে—তোমার চিরদিনের ঘরে।

আমি ভর্ৎসনার গলায় বললাম, কী ছেলেমানুষি করছ তুমি! ও সবের মানে বোঝো? আমার জন্যে তোমার এত সব ঝড়-ঝাপটা সইবার দরকার কি? আমি এমনি করেই বেঁচে থাকব—আমার জীবন অভিশপ্ত হয়ে গেছে। আমাকে চলে যেতে দাও। এমন ছেলেমানুষি কোরো না। তাছাড়া তোমার

সঙ্গে তো আমি কখনও ভালো ব্যবহার করিনি—তুমি আমার সম্বন্ধে এত নিঃসন্দেহ কী করে হলে? আমি তোমাকে পছন্দ করি যে, তুমি তা জানলে কী করে?

সেন হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, এখনও জানিনি। তবে একদিন যে করবে, সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আমাকে সুযোগ দাও তুমি। তোমাকে আমি প্রথম দিন থেকে ভালোবাসি। আমি গুছিয়ে কথা বলতে পারি না, কিন্তু আমি প্রমাণ করব আমার ব্যবহারে যে, আমি তোমাকে ভালোবাসি। তাছাড়া তোমাকে যখন এমন করে ভালোবেসেই ফেলেছি—তখন আমার চোখের সামনে তোমাকে নষ্ট হতে দিতে পারি না। তুমি যদি আমাকে ছাড়া, আমাকে ঘৃণাভরে চড় মেরেও সুখী হতে, সুখে থাকতে সবদিক দিয়ে, তাহলে আমার দুঃখ আমি একাই বয়ে বেড়াতাম। তোমার ওপর কোনোরকম দাবি করতাম না। কিন্তু এখন এ শুধু দাবি নয়, এ আমার কর্তব্যতে দাঁড়িয়েছে।

আমি বললাম, আমার প্রতি তোমার কোনো কর্তব্য নেই। তোমার অনেক দায়িত্ব আছে, তুমি ছেলেমানুষ, তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, তুমি কেন আমার জন্যে নিজেকে নষ্ট করবে? নিজের জীবন নষ্ট করবে?

নষ্ট নয়। নষ্ট নয়। আমি নিজেকে সার্থক করব। তুমি দেখো। সেন বলল। তুমি দেখো নিরুপমা।

দেখতে দেখতে আমরা ওর বাড়ির সামনে এসে পৌঁছলাম।

বেল টিপতেই বেয়ারা এসে আমার স্যুটকেস ভিতরে নিয়ে গেল।

সেন আমার হাত ধরে আমাকে ভিতরে নিয়ে এল। ঢুকে বলল পছন্দ তো? এই-ই তোমার বসবার ঘর। তারপর খাবার ঘর, ভাঁড়ার ঘর, গেস্ট রুম, সব দেখিয়ে আমাকে বেডরুমে নিয়ে এল।

বলল, এই তোমার বেডরুম। আর বাথরুমটা পছন্দ?

বলেই বিরাট ঝক্‌ঝকে মোজাইক্ করা গিজার-লাগানো বাথটাব বসানো বাথরুম দেখাল। বেডরুমের এয়ারকন্ডিশনার চালানোই ছিল। সেটাকে বন্ধ করে দিল ও। তারপর হঠাৎ সেন দরজাটা বন্ধ করে আমাকে বুকের মধ্যে টেনে নিল। বলল, বড় কষ্ট পেয়েছ না নীরু, পৃথিবীর হাতে তুমি বড় কষ্ট পেয়েছ, না?

তারপরই আমার গালে ওর হাত বুলোতে বুলোতে বলল, সেদিন তোমার গালে কি খুব লেগেছিল? ঈশ্-শ্ বেচারি! তোমাকে চড় মেরে আমি নিজে যে কত কষ্ট পেয়েছিলাম তা যদি তুমি কখনও জানতে! তুমি যে সেদিন আমাকেও বড় কষ্ট দিয়েছিলে।

দরজায় কে যেন টোকা দিল।

দরজা খুলে বেয়ারাকে সেন বলল, পেছনের বারান্দায় লনের পাশে চা দিতে।

বেয়ারা চা দিতে এসেছিল।

বেডরুমের জানালা দিয়ে বারান্দাটা দেখা যাচ্ছিল। চওড়া সাদা টাইলের বারান্দা—সাদারঙ রট্-আয়রনের চেয়ার-টেবল্। লনে অনেক রকম ফুল করেছে মালি। আমি আনমনে বাগানের দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

ভাবছিলাম, আমার মধ্যেও যেমন কতরকম ফুল ফুটছে এক এক করে। আমি সেই সুগন্ধি ফুলেদের ফোটা ভীষণভাবে উপলব্ধি করছিলাম। আমার কিছুতেই কিছু বিশ্বাস হচ্ছিল না। আমার চারপাশের সব কিছু, সব ঘটনা অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছিল।

আমার বড় ভয় করছিল।

সেন আমার ঘোর ভাঙিয়ে বলল, আমি জানি, আমি দেখতে ভালো নয়, হয়তো কোনোদিক দিয়েই আমি তোমার যোগ্য নই, কিন্তু বিশ্বাস করো, তোমাকে চাওয়ার মধ্যে কোনো ফাঁকি নেই,

কোনো চালাকি নেই। আমি আর যাই-ই হই. আমি ভণ্ড নই নিরুপমা। তুমি যা দেখছ, যা শুনছ সবই সত্যি! তারপর একটু থেমে বলল, এই সবে শুরু। তুমি আমার সঙ্গে থাকলে, আমার পাশে থাকলে আমি জীবনে অনেক বড় হব; সার্থক হব। সেদিনও আমি ভুলে যাব না যে, তুমি আমার পাশে ছিলে বলেই আমি বড় হয়েছি! আমি তোমার ওপর অনেক ব্যাপারে, জীবনের সমস্ত রকমক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করব। তুমিও সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে পারো আমার ওপর বাইরের ব্যাপারে। যা কষ্ট পেয়েছ; পেয়েছ। আজ থেকে তোমাকে আমি সব রকম কষ্ট থেকে আড়াল করে রাখব। তুমি দেখো। দেখো তুমি নিরুপমা। আমার সোনা।

আমি যেন অসুস্থ, যেন দুর্বল, যেন নিজের পায়ে আমার ভর নেই নিজের, এমনি করে আমার বাহু ধরে বারান্দার দিকে আমাকে নিয়ে যেতে যেতে সেন আস্তে আস্তে বলল, আমি চাই, আমার কাছে দু'দিন থাকার পর তুমি কলকাতায় তোমার বাবার কাছে যাও। আমি সব বন্দোবস্ত করে দেব। ওখানে গিয়ে তুমি ঠাণ্ডামাথায় সব ভেবে দেখো। তোমার দিক দিয়ে তুমি সম্পূর্ণ মুক্ত—এখনও এবং ভবিষ্যতেও। যতখানি সময় চাও, আমি দেব; কিন্তু সময় নিও। তোমার দিক দিয়ে তাড়া করার প্রয়োজন নেই কোনো। যা করবে, ভেবে কোরো।

তারপর বলল, আমার কথা বলতে পারি যে, আমার দিক দিয়ে ভাবাভাবি সব শেষ।

আমি মনে মনে বললাম, এক্ষুনি আমি বাবার কাছে যাব না।

কিন্তু মুখে কিছুই বললাম না। আমি জানি, বাবার কাছে পরাজিত হয়ে না যেতে পারলেই আমি সুখী হই।

সেন মাঝরাস্তা থেকে আবার বেডরুমে ফিরে এল। ফিরে গিয়ে দেওয়ালজোড়া ওয়াড্রোবটা খুলল।

বলল, তোমার দিকটা খালি আছে। তোমার মনস্থির হলে তোমার জিনিস দিয়ে এটা ভরে দেব। তোমার পুরোনো জীবনের কোনো জিনিস এখানে এনো না। আমি নতুন-তোমাকে সব নতুন নতুন জিনিস ভরে দেব। আর দ্যাখো। এই ওয়াড্রোবে কাউকে লুকিয়ে রেখো না কিন্তু; কোনো বিড়ালকেও না।

আমার ভীষণ লজ্জা হল। আমি কৈফিয়ত দিতে যাচ্ছিলাম।

সেন আমার মুখে হাত চাপা দিল। বলল, না। পুরনো কথাও ভুলে যেতে হবে। আমি কিন্তু ভুলে গেছি। আমি কিছু মনে করিনি, মনে রাখিনি—আমি যে তোমাকে ভালোবেসেছি নিরুপমা। আমার ভালোবাসার প্রকাশটা হয়তো বড় বুনো, বড় জংলি কিন্তু আমি যে তোমাকে ভালোবাসি, এতে কোনো ফাঁকি নেই।

এই অবধি বলে, সেন আমার দিকে এক অদ্ভুত আদুরে চোখে চেয়ে রইল।

যে ছেলেটিকে, যে নাবালক ছেলেটিকে একদিন চড় মেরেছিলাম আমি, তার দিকে তাকাতে আজ আমার ভীষণ লজ্জা করতে লাগল। ও যেন সবদিক দিয়ে এ কয়েকমাসে আমার চেয়ে কত বড় হয়ে গেছে। ও যেন আমার নমস্য হয়ে গেছে; আমার সম্মানের যোগ্য হয়ে গেছে। আমি ভাবতে পারছিলাম না কী করে এমন হল; এত তাড়াতাড়ি কী করে হল। এত তাড়াতাড়ি সব কিছু কী করে বদলে যায়?

সেন আমার দিকে ওর দু'হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়েছিল। ওর চোখে এক আশ্চর্য দৃষ্টি ছিল।

আমি স্বেচ্ছায়, ধীরে পায়ে, সুস্থমস্তিষ্কে, এক শান্ত কুয়াশাহীন আনন্দে ভেসে হেঁটে গিয়ে ওর বুকে নিজেকে সমর্পণ করলাম।

জানি না। আমি কি আবারও ভুল করলাম? নিজের মনে আমি নিজেকে বললাম, তুমি কি আর একটিও ভুল সইতে পারবে? আর একটি ভুলও? নিরুপমা?

কী করে ও আমার মনের ভাবনা জানতে পেল জানি না। সেন আমার সিঁথিতে ঠোঁট ঘষতে ঘষতে বলল, নিরুপমা, তুমি ভুল করোনি। দেখো, তুমি দেখো, এবারে ভুল করোনি।

আমি চুপ করে থাকলাম; আমি জানি না। একমাত্র কালই বলতে পারবে, ভবিষ্যৎই বলতে পারবে; আমি ভুল করলাম না ঠিক করলাম।

সেনের বুকের আশ্রয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎই আমার মনে হল, এই ঠিক ভেবে ভুল করা এবং ভুল ভেবে ঠিক করা, এই সব ভুলের দুঃখ, সব ঠিক করার আনন্দ, এই টুকরো টুকরো সুখ ও দুঃখ নিয়েই তো আমাদের জীবন। মনে হল, কারও জীবনেই, কেউই কাউকে সুখের গ্যারান্টি দিতে পারে না। জীবনে বেঁচে থাকতে হলে প্রতিনিয়ত দুঃখ হয়তো পেতেই হয়—তবুও এই অনেক দুঃখের মধ্যে যেটুকু সুখ যে ছিনিয়ে নিতে পারে, সেই-ই সুখী; সেই-ই তা পেল। যে ছিনিয়ে নিতে পারল না; পেল না। এর কোনো বিকল্প নেই।

আলোকঝারি

আলোকঝারির দিনগুলিকে

রাঁধলা কী? ও বুড়ি?

শিলি বলল।

ফোক্‌লা দাঁতে হাসি ফুটল কিরণশশীর।

এখনও কিসু রাঁধি নাই। রাঁধবোনে। বুড়ির আবার রাঁধারাধির কী। দুইডা ভাত ফুটাইয়া লম্যুআনে। একটুক ঘি ফ্যালাইয়া, দুইডা আলু দিয়া দিমু ভাতে। আর কাঁচা মরিচ তো আছেই।

রোজ রোজ এত দেরি কইর‌্যা রান্ধো ক্যান্। শরীলডা এক্কেরেই যাইব। তখন দেখবনে কেডা'

ক্যান্? তুইই দেখবি। দেখবি না?

চুপ করে রইল শিলি। উত্তর দিল না।

কীরে ছেমড়ি! কথা কস না ক্যান?

কী কম্যু? কেডা কারে দ্যাহে? শরীল, ভাইঙ্গা গ্যালে কেউই দেখব না কইয়া দিলাম।

হে তো জানি। কিন্তু এ পোড়াকপাইল্যা শরীল একটাদিনের লগেও কি খারাপ হয়? পাথর দিয়্যা গইড়া থুইছিল আমারে ব্রহ্মা।

হাসল শিলি।

কিরণশশীর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে, শিলি হেসে বলল, বালাই-যাট। খারাপ হইয়া কাম নাই। এই কইর‌্যাই যেন পার হইয়া যাও বুড়ি!

কইছস ঠিক ছেমড়ি। দেহিস্ তুই। আমি পড়ুম আর মরুম।

তা, তিনি আইতাছেন কবে? শিলি ভুরু তুলে জিগগেস করল।

এহনে বুঝছি। তাই ক'! তর এত ঘন ঘন আসন-যাওন আমার ছাওয়ালের লাইগ্যাই! কীরে? ভুল কইছি? ক'?

বাড়ির চারপাশ থেকে নানারকম পাখি ডাকছিল। বড় বাঁশঝাড়ের মধ্যে বাদামি বড় পাখিটা ধরে ধরে পোকা খাচ্ছিল। সকালের হাওয়াতে বাঁশে বাঁশে কটকট আওয়াজ হচ্ছিল। পাশের ডোবাতে, শাপলা যেখানে ঢেকে রাখেনি জল; সেখান থেকে সাত-সকালের নরম সূর্যের আলো প্রতিসরিত হয়ে এসে, তেঁতুলগাছের পাতায় পড়ে, চারদিকে আলোর চিরুণির মতন তিরতির করে কাঁপছিল।

কিরণশশী, শেষ চৈত্রর প্রথম সকালের রোদে, বড়ঘরের মাটির দাওয়াতে দুটি পা ছড়িয়ে দিয়ে বসেছিলেন।

তুমি একটা যাচ্ছাতাই। বুড়ি।

তাত কইবিই। আমারে ভালো কইর‌্যা স্যাবা-যত্ন কর। পুতন আইলে অইব কী? ছাওয়াল আমার বড্ডই মাতৃভক্ত। আমি যদি "না" কইর‌্যা দেই, অইবই না বিয়া। বুঝছস ছেমড়ি। আমার কথাই হইতাছে গিয়া শ্যাষ কথা।

বিয়ের কথাতেই, শিলির চোখমুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

হাসিমুখে বলল, হঃ। কী আমার ছাওয়াল। তারে বিয়া করনের লইগ্যা আমি তো কাইন্দা বেড়াই য্যান। তুমি নিজ্যা নিজ্যা ছাইভস্ম ভাইব্যাই মরো।

তাইতো।

হাসলেন কিরণশশীও।

বললেন, আচ্ছা। দেহি তরে কোন রাজার পুত আইয়া বিয়া করে।

শিলি ভুরু নাচিয়ে, চোখে ঝিলিক তুলে বলল, হ। হ। দেইখ্যো আনে। আমারে তুমি ভাবতাছোটা কী? তোমার ছাওয়ালরে বিয়া কেডা করে?

যা ভাবতাছি, ঠিকই ভাবতাছি।

একটু পরে শিলি বলল, দাও দেহি, তোমার চাউলডা ধুইয়া আনি ইন্দারা থিক্যা।

লইয়া যা। কুলায় বাইর কইর‍্যা থুইছি। হবিষ্য-ঘরেই রাইখ্যা আইছি।

শিলি চলে গেল হবিষ্য-ঘরের দিকে।

কিরণশশী, চলে-যাওয়া শিলির দিকে চেয়ে একটা বড় দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

বড় ভালো এই মেয়েটা। রায়দের বাড়ির ছোট তরফের ছোট ছেলের মেয়ে। ছোট তরফের রায়রা কোনোরকমে টিমটিম করে বেঁচে আছেন এখনও। পয়সা কোনোদিনও ছিল না। বংশ পরিচয় ছিল। মানুষ ওঁরা ভালো। ভালো বলেও বটে এবং কুঁড়ে বলেও বটে; টাকা পয়সার দিকে কোনোদিনও বিশেষ লোভ ছিল না। ঘর বাড়ি ছেড়ে উত্তরবঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে ওরা সকলেই নিম্ন আসামের এই কুমারগঞ্জে এসে একটু মাথা গোঁজার ঠাই করে নিয়েছেন। তাও চল্লিশ বছর হতে চলল।

এঁদের কারও দেশ ছিল বগুড়া, কারও নিলফামারি, গাইবান্ধা, ডিমলা, কারও পাবনা বা রাজশাহী। কিরণশশীদের দেশ ছিল বগুড়ায়। এখনও পেছনে তাকালে, ফেলে-আসা দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। মনে হয়, এইতো সেদিনের কথা। মনে পড়লেই মন খারাপ হয়ে যায়। এখনও কেন যে মনে পড়ে! চেনা জানা মানুষজন আর নেই। অল্পবয়সিরা চেনে না।

পুরানো পাড়া আর চেনন যায় না। বাড়িটার মধ্য দিয়ে চওড়া পিচের রাস্তা চইল্যা গেছে গিয়া। ঐথ্বনে নাকি এয়ারপোর্ট হইবে শুইন্যা আইছে হেরম্ববাবুর ছোট পোলায়। স্যা গত বছর পূজায় গেছিল, বগুড়ায়। অনেক কথাই কইল। সেই তাগো হরিসভার পূজাও আর হয় না। মস্ত মসজিদ উঠছে। ঈদের সময়ে উট বলি হয়। কোন শ্যাখেরা নাকি পাঠায় সে সব। মকবুল মিঞা, যে নাকি ঘরামির কাজ কইর‍্যা খাইত, এহনে মস্ত বড়লোক হইছে। ঢাউস গাড়ি চড়ে।

ভরসার কথা এই যে, পিছনের কথা মনে করার সময় তাঁর নেইই। হইলে হইছে। বদলাইয়া ত যাইবই। কুমারগঞ্জও কি আর সেই আগের কুমারগঞ্জ আছে নাকি। সবই বদলাইয়া গেছে। বদলাইয়া গেছে মানুষের মন, মানুষের দৃষ্টি। সবকিছুই এই কয় বছরে বদলাইয়া গেছে। বড় মানুষ। বড় ধুলা। বড় আওয়াজ। বড় খাই খাই, নোংরামি, চাইরধারে। এর মধ্যে কিরণশশীর আর বেশিদিন বাঁচার ইচ্ছা নাই। এহনে, মানে মানে যাইতে পারলেই হয়।

ভাবেন তিনি।

টিনের ছাদে বইস্যা একটা দাঁড়কাক ডাকতাছিল। লালরঙা। মাইয়াগো অসভ্য জায়গার মতন লাল তার মুখের ভিতরখান। অসভ্য-অসভ্য দেখায়।

কুমারগঞ্জের সকলেই বলে, কিরণশশী বড়ই অভাগী। দেশ ছেড়ে আসার পর আসামের এই গোয়ালপাড়া জেলার ধুবড়ি, গৌরীপুর, কুমারগঞ্জ, তামাহাট, গোয়ালপাড়া, ডিঙ্গডিঙ্গা, গোলোকগঞ্জ, ফকিরাগ্রামে অনেকেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন।

অনেকেই অবশ্য, যেমন কিরণশশীর শ্বশুরমশাই; চাষ-বাস, পাটের কারবারের কারণে এখানে অনেক আগে থেকেই ছিলেন। পাশ দিয়ে বয়ে গেছে গঙ্গাধর নদী। তার মাথা গিয়ে পড়েছে ব্রহ্মপুত্রে আর লেজ রয়েছে তিস্তায়। দেশ ভাগ হবার আগে পুব-বাংলা থেকে বড় বড় মহাজনি নৌকো

করে পাট আসত এই নদী বেয়ে। পাটের বড় বড় আড়ত, গদিঘর, সব ছিল তখন প্রত্যেক বর্ধিষ্ণু বাড়িতেই। লাল আর সাদা, মিহি আর মোটা, নানারকম পাটের গন্ধে, শীতকালে পাট ওঠার পর, পুরো এলাকাটা ম' ম' করত যেন। গেছে সে সব দিন।

অনেক ভেসে আসা পরিচিত পরিবারই এসে এখানে আবার নতুন করে শিকড় গেড়েছেন। ব্যাবসা, চাকরি ইত্যাদিতে কুচবিহার শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, মালদা, বালুরঘাট, বহরমপুর, কৃষ্ণনগর এবং কলকাতাতে অনেকে ছড়িয়ে গেছেন। যদিও আগে আসা বা পরে আসা সকলেরই মূল এখনও রয়ে গেছে এই ধুবড়ি, গৌরীপুর, কুমারগঞ্জ, তামাহাটেই।

সাত-সাতটি সুন্দর, কৃতী যুবক ছেলেকে এবং তাঁর স্বামীকেও হারিয়েছেন কিরণশশী। আছে এখন এই সবেধন পুতন, সবচেয়ে ছোট ছেলে। পুতনের সঙ্গে তাঁর বয়সের এতই তফাত যে, মনে হয় তিনি বুঝি মা নন, পুতনের ঠাকুমা।

পুতন, জলপাইগুড়ির এক চা বাগানের অ্যাকাউন্ট্যান্ট। ধুবড়ি থেকে বি. কম. পাশ করে কলকাতায় গেছিল তাঁর ভাসুরের ভগ্নীপতির অডিট অফিসে খাতা লেখার কাজ শিখতে। এম-কমও পাশ করে সেখান থেকেই। তারপর তাঁদেরই সুপারিশে, তাঁদের মক্কেলের এই চা বাগানে অ্যাকাউন্ট্যান্ট হয়ে যোগ দিয়েছে বছর তিনেক হল।

পুতনের কাছেই শুনেছিলেন কিরণশশী যে, একসময়ে বেশিরভাগ নামি চা বাগানই ছিল বাঙালিদের। নয়তো সাহেবদের কোম্পানির। এখন সাহেবদের কোম্পানিগুলো কিনেছে বড় বড় মাড়োয়ারিরা আর বাঙালিদেরগুলো তাদের চেয়ে ছোট মাড়োয়ারিরা। হাতে বাঙালিদের মাত্র কয়েকটি বাগানই আছে এখন। হাতে গোনা যায়।

পুতন, বছরে একবার করে আসে কুমারগঞ্জে, একমাসের জন্যে। এবার আসবে বৈশাখের প্রথমে। চিঠি লিখেছিল যে, এবারে নববর্ষটা কুমারগঞ্জেই কাটাবে। আর সাত বোশেখির মেলা দেখতে যাবে অনেকদিন পর, আলোকঝারি পাহাড়ে।

শিলি এসে বলল, তোমার ভাত চড়াইয়া দিয়া আইলাম। একটু মটরের ডাইলও ধুইয়া ছড়াইয়া দিছি। দুইডা আলু আর দুই টুকরা কুমড়া। সময়মতো নামাইয়া লইওআনে। আমি যামু?

আইসাই যামু যামু করস্ ক্যান্ রে ছেম্‌ড়ি? ঘোড়ায় জিন্ দিয়া আইছস নাকি?

হেইরকমই পেরায়। বাবার যে জ্বর হইছে, তাইই বুঝি কয় নাই তোমারে?

কে?

হোন্দলের মায়ে?

না তো! হোন্দলের মায়ের কথা ছাড়ান দে। আয়, আর যায়। যার ঘরে চাইর-চাইরটা পোলাপান, হেই মায়ে কি কোথাওই মন লাগাইয়া কাম কইরবার পারে? ক দেহি? ক্ষুধায় কান্দে সেগুলান। আর তার ভাতার তো দিনরাত মদ গিল্যা পইড়্যাই থাহে। হে বেচারিই বা করেডা কী?

তুমিও তো একলা বুড়ি মানষি। তোমারে যদি নাইই দ্যাহে, তো ছাড়াইয়া দ্যাও না ক্যান্? তোমারে দ্যাহে কেডায়?

থাক। থাক। অমন কথা কইস না। ছাড়াইয়া দিলে, পোলাপানগুলানরে লইয়া এক্কেরে না-খাইয়া মরব।

পোলাপান হয় ক্যান তাগো? যাগো খাওয়াইবারই মুরদ নাই।

সে হোন্দলের মায়ের কী দোষ। পোলাপান হয় ক্যান তা জিগাইবার লাগে হোন্দলের বাপরে। এই পুরুষ জাতটার হক্কলই এক্কেরে বে-আক্কাইলা।

শিলি আর কথা বাড়াল না। ও ভুলেই গেছিল যে, পুতন কিরণশশীর নিজের আট নম্বর এবং

শেষ ছেলে। মধ্যে তিনটি মেয়েও ছিল। দুটি মারা গেছে কৈশোরে। একটির বিয়ে হয়েছে কুচবিহারে। তার স্বামী রেলের টিকিট কালেক্টর।

খুব সময়মতো মনে পড়ে যাওয়ায় চুপ করে গেল ও।

পুরুষমানুষগুলোর সত্যিই কি কোনো আক্কেল ছিল না? ছিল না শুধু নয়. এখনও নেই। নইলে হোন্দলের বাবায় এমনডা করে। ছিঃ ছিঃ।

চলি বুড়ি।

আরে। তর বাবার না জ্বর আইছে কইলি, তা এহনে বাবা আছেডা ক্যামন, তাতো কইয়া গেলি নারে ছেমড়ি। কী যে করস।

ভালো নাই। জ্বর উইঠ্যা গেছিল পাঁচ। এখন নাইম্যা দুই হইছে।

ঔষধ টোষধ দিছস কিছু? না, ভালোবাসাতেই ছাইড়্যা যাইব গিয়া জ্বর?

দিছিতো! শৈলেন ডাক্তারের ভাইরে আনাইছিলাম তামাহাট থিক্যা। কইয়া গ্যালেন, মাথার নিচায় কচুপাতা দিয়া কইয্যা জল ঢাইল্যা যাও আর কুইনিন মিক্সচার চালাইয়া যাও!

হইছেডা কী? ম্যালোরি নাকি? তাইলেই খাইছে।

আঃ। বুড়ি, তোমারে লইয়া পারিনা আর। তোমার ছাওয়াল হইল গিয়া ক্যালকাটা উনিভার্সিটির ফার্স্ট ক্লাস এম.কম. আর তুমি ম্যালেরিয়ারে কও ম্যালোরি? এক্কেরে হোন্দলের মা হইয়া গ্যালা দেহি।

ওই হইল। বুঝছস তো তুই। বোঝন যাইলেই হইব। ইংলিশ-ফিংলিশ আমি জানুম কোত্থিকা এত? দেহি। আজ বিকাল বিকাল যাইয়া একবার দেইখ্যা আসুমনে নরেশরে।

তোমারে কে দ্যাহে তার ঠিক নাই। তোমার কাম নাই যাওনের। তেমন যদি বুঝি তো আমিই পাঠামু আনে ক্যাবলারে। তোমারে বইল্যা যাইবো আইস্যা। খামকা আইস্যা ভিড় বাড়াইও না তো!

আমি তো ভিড়ই বাড়াই শুদামুদা। এহন আর কোন কামে লাগি কার?

অভিমানের সুর লাগল গলায়, কিরণশশীর।

তারপর বললেন, তর কাকায় বাড়ি নাই বুঝি? ঘরে পুরুষ মানুষ নাই একজনও?

নাঃ। শিকারে গেছে গিয়া আবু ছাত্তাররে লইয়া। ধুবড়ি থিক্যা কোন সাহেব আইছে নাহি শুনি। পুরুষ মানুষ লইয়া, কোন কাম আমাগো। বেকামের লোক সব। কামের মধ্যে এক কাম। সে কাম ত কুত্তায়ও করে। বাহাদুরিটা কীসের অত?

সবসময় শিকার-শিকার। কী যে বাতিক হইছে পরেশের। কাম-ধান্দা নাই। ঘরে একটা কচি মাইয়ারে ফ্যালাইয়া।

একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন কিরণশশী, তর বাবার জ্বর দেইখ্যা যায় নাই নিশ্চয়? পরেশ?

না তো কী! যখন চইল্যা গেল, তখন বাবায় তো বেহুঁশ।

কস কী তুই? কী খিটকাল। এমন বেআক্কাইল্যাও হয়। ক' তো দেহি।

চলি আমি এহনে।

যাওন নাই। আইসো।

তারপর গলা তুলে বললেন, আবার আসিস লো ছেমড়ি।

শিলি শুনতে পেল কিনা বুঝতে পারলেন না উনি।

না শুনে থাকলে না শুনুক। ওঁর বলার, উনি বললেন।

চ্যাগারের দরজা পেরিয়ে রক্ত-জবা গাছটার পাশ দিয়ে জোড়া-রঙ্গনের পাশ কাটিয়ে, পেছনের

বাঁশবনের মাঝের আলোছায়ার ডোরাকাটা পথে পুকুর থেকে সদ্য উঠে বাড়ির দিকে ফেরা হেলতে-দুলতে আসা, হিস-হিসানি তোলা, একপাল সাদা কালো বাদামি হাঁসেদের মধ্যে দিয়ে, তাদের দুভাগ করে নিয়ে; সাদা-কালো ডুরে-শাড়ি জড়ানো কালো ব্লাউজ-পরা শিলি; আলো-ছায়ারই মতো মিলিয়ে যাচ্ছে। ওর ডান বগলের কাছে ব্লাউজটা ছিঁড়ে গেছে একটু। নবীন যুবতীর সুগন্ধী ঘামে ভিজে গেছে বগলতলি। এ বাড়িতে কোনো পুরুষ নেই বলে আঁচল দিয়ে ঢাকেনি শিলি, বগলতলি। পুরুষগুলোর চোখ দুপুরের কাকের মতন। কিরণশশী মুগ্ধ, স্নেহময় দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন ওর পথের দিকে, অনেকক্ষণ।

রঙ্গনের ডালে বুলবুলি হুটোপাটি করছিল। মৌটুসী পাখি ডাকছিল জবা আর যজ্ঞিডুমুরের পাতার আড়ালের ছায়া থেকে, প্রথম গ্রীষ্মের রোদের আঁচ বাঁচিয়ে। বাঁশবাগান থেকে ঘুররর-রঘু-ঘুঘুর-র্-র—ঘুউ করে কচি দুপুরের বিষণ্ণতাকে ছিদ্রিত করছিল এক জোড়া ঘুঘু। দমক দমক হাওয়ার, ধমকে ধমকে হলুদ ও লাল শুকনো কাঁটাল-পাতারা ঝাঁট দিচ্ছিল উঠোন, বিনা মাইনের মর্জিবাজ মুনিষের মতন থমকে থমকে।

নেশা লেগে গেল কিরণশশীর। শেষ চৈত্রর চড়া বেলায়ও চোখের দৃষ্টি যেন ঝাপসা হয়ে এল হঠাৎই, শিলির চলে যাওয়া পথের দিকে চেয়ে। শোক এবং স্বপ্ন দুইই বোধহয় চোখের দৃষ্টিকে সমান ঝাপসা করে।

ভাবলেন উনি। বয়স হলে, সঙ্গীহারা হলে বড় ঘন ঘন ঝাপসা হয় চোখ।

কিরণশশী, বড় ঘরের দাওয়া থেকে উঠে চান করতে গেলেন বাথরুমে। ইন্দারার একপাশে কিছুটা জায়গা বাঁধান এবং ঘেরা। দরজা-দেওয়া। মেয়েদের চান করার জন্যেই বানিয়েছিলেন গোপেনবাবু। যখন বেঁচেছিলেন।

তাও অনেকদিনের কথা হয়ে গেল।

চান করতে করতে কিরণশশী নিজেকে দেখেন আর বড় কষ্ট হয় তাঁর। সুন্দরী নারীর যৌবন চলে যাওয়ার সময়ে অনেক কিছুই সঙ্গে টান মেরে উপড়ে তুলে নিয়ে যায়। আর যৌবন যখন থাকে, সে মদমত্ত উদ্ধত থাকে বলে, কোনো সুন্দরী যুবতীই দুঃস্বপ্নেও ভাবে না একমুহূর্তের জন্যেও যে, যৌবন বড় অল্পসময়ের জন্য আসে, থাকে; চাঁপার বনের গন্ধের মতন। তারপর সেই শূন্য গহ্বর, সুখ-স্মৃতির গূঢ় গভীর গোপন সব অস্পষ্ট ছায়া বুকে বেঁচে থাকে। দেওয়াল থেকে, অনেকদিন ধরে টাঙিয়ে রাখা ছবি বা ক্যালেন্ডার হঠাৎ সরিয়ে নিলে যেমন চারদিকের অনুষঙ্গর মধ্যে সেই জায়গাটি বড়ই দৃষ্টিকটু লাগে; সুন্দরী নারীর বার্ধক্যও তেমনই। সহজে, সুখে বইতে পারা কঠিন।

এই চান করার সময়টাতে প্রত্যেকদিনই নিজেকে অভিশাপ দেন কিরণশশী। তাঁর এই একলা জীবনে আর কোনো মোহ নেই। আশা নেই। ভালোলাগা নেই। বেঁচে আছেন, রান্না করছেন, ভাত খাচ্ছেন, ঘরবাড়ি পরিষ্কার করে রাখছেন, শুধু একটিমাত্র স্বপ্ন বুকে নিয়ে। পুতনের সঙ্গে শিলির দুটি হাত মিলিয়ে দিতে পারলেই তার বেঁচে থাকার সব প্রয়োজনই ফুরিয়ে যাবে। একদিন এই পলেস্তারা খসে-যাওয়া ইন্দারার পাশের করমচা-রঙা চানঘরে তার একমাত্র বেঁচে থাকা ছেলের বউ, সুন্দরী যুবতী শিলি চান করবে।

নিজে চান করতে করতে ভাবেন, কিরণশশী। সুগন্ধি সাবান আর তেলের গন্ধে ঢেকে যাবে এই করমচা-রঙা মেঝের ক্ষারের গন্ধভরা চানঘরখানি।

তাঁর "পোলার বউ"। রাতভর বরের সোহাগ খেয়ে, নতুন সিঁদুর-লেপটানো কপাল আর লাল নাক নিয়ে, ব্রীড়ানম্র সোহাগি বিড়ালের মতন আড়ামোড়া ভেঙে, যখন পরিচিত অথচ একেবারে নতুন শিলি; গড়ানো সকালের চৌকাঠে এসে দাঁড়াবে প্রথম সোহাগের পরের চান করার জন্যে,

তখন চান করতে করতে হাই তুলবে শিলি। সিঁদুরে-আমের ডালে বসা বসন্ত-বৌরি পাখি লোভীর মতো দেখবে সেই ছাদখোলা চানঘরের মধ্যের শিলির জলভেজা নগ্ন-রূপ। তারপর কচিপাতা-ভরা চিকন ডালে শিহর তুলে আমের বোলের গন্ধ চারিয়ে দিয়ে উড়ে যাবে, তার সখার কাছে।

হলুদ পাখিরা হলুদ ভাষায় কথা বলে। গিয়ে বলবে, আদর করো। আদর করো। আমার খুব আদর খেতে ইচ্ছে করছে গো।

তার হলুদ সখা তাকে বলবে, অনেক কাজ। সময় নেই, সময় নষ্ট করবার।

পুরুষগুলো পৃথিবীময়ই সব একরকম। সে পাখিই হোক। কী মানুষ! মেয়েদের মনের কথা কেউই বোঝে না। ওদের সময় হলে, ইচ্ছে হলেই ওরা আদর করতে চায়। তখন "না" বললেই, ভারী গোস্‌সা।

বে-আক্কাইল্যা, এক্কেরেই বে-আক্কাইলা এই পুরুষগুলান।

ভাবছিলেন নিজের মনেই, কিরণশশী।

কে জানে? পুতন, শিলির মতো মেয়ের যথার্থ দাম দেবে কী না। শিলিদের অবস্থা পড়ে না গেলে, শিলির মতো মেয়েকে বউ করার স্বপ্নও দেখতে পারতেন না কখনো কিরণশশী।

জ্বরটা দুপুরের দিকে বাড়ে, বিকেলে ছেড়ে যায়। আবার বেশি রাতে আসে।

শৈলেন ডাক্তারের ভাই, দাদা ডাক্তার এই সুবাদেই গাঁয়ের ডাক্তার। এল-এম-এফ এর ডিগ্রিও নেই। কোয়াক।

ভাইয়ের ভিজিট দু টাকা আর দাদার আট টাকা। ভাই সামলাতে না পারলে দাদাকে ডাকে। তবে নরেশবাবুর বাড়াবাড়ি হলেও শৈলেন ডাক্তারকে আট টাকা ভিজিট দিয়ে ডাকার সামর্থ্য শিলির নেই। রোজগেরে বলতে তারা কাকা পরেশ একাই। কিন্তু শিকারের বাতিকেই তাকে খেল। মানুষটা ভালো। বিয়ে-থাও করেনি। জঙ্গলই তাকে পরীর মতো জাদু করেছে। তার বিয়ে হয়েছে জঙ্গলের সঙ্গেই।

কী যে ঘুরে বেড়ায় সারা বছর বনে-পাহাড়ে নদী-নালায়, তা সেই জানে। আর সঙ্গী হয়েছে বটে একজন। আবু ছাত্তার। তার বাবাকেও বাঘে খেয়েছে। তাকেও দুবার চিতাবাঘে ঠ্যাং কামড়ে আর ঘেঁটি কামড়ে ঘা করে দিয়েছিল। হাসপাতালে ছিল একবার দুমাস, একবার তিনমাস। তাতেও কি মতি-গতি কিছু বদলাল? না। কিছুমাত্রই না।

কিন্তু নরেশের ভাই পরেশ, সে মানুষ নয়, ডাকাত। ভদ্রলোকের বাড়ির ছেলে যে কী করে এমন হয়ে গেল, কে জানে। ওর সর্বনাশ করেছে আসলে ওই চালচুলোহীন, মাথার ওপরে পঞ্চাশটা মামলা-ঝোলা আবু ছাত্তার। ওটা মানুষ নয়ই! ওদের দোজখ-এর কোনো জীবই হবে।

আবু ছাত্তারের দুটি চোয়ালের দিকে তাকালেই শিলিরও ভয় করে খুবই। অথচ ছোটখাটো মানুষটি। মুখে হাসি লেগেই আছে।

মানুষের মুখের ভাবে পুরো মানুষ হয়তো কখনোই থাকে না, থাকে তার এক ফালি মাত্র। ঈদের চাঁদের মতো। কখন যে তাদের অমাবস্যা আর কখন পূর্ণিমা, তা বোধহয় এমন মানুষেরা নিজেরাও জানে না। বুঝতেও পারে না।

শৈলেন ডাক্তারের ভাই জ্বরের হিসেব রাখতে বলে গেছেন। ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে হিকস-এর থার্মোমিটারের পারা নামিয়ে বাবার বগলতলায় দেয় শিলি। বার বার। ঘড়ি ধরে।

মা চলে গেছেন পাঁচ বছর হল। তারপর থেকে বাবার দেখাশোনা সব শিলিই করে। ক্যাবলাই বাড়িতে একমাত্র কাজের লোক। বেশি কাজ থাকলে, মুনিষ ভাড়া করে নেয়। চালের খড় নিড়িয়ে নতুন করে ছাইতে, ঘরামিকে ডেকে নেয়।

জ্বরটা দেখে, চান করতে যাবে ও। বাবাকে বার্লি খাওয়াবে ফিরে এসে। নীল রঙের পিউরিটি বার্লির কৌটোটায় বেশি আর নেই। আনতে দিতে হবে ক্যাবলাকে একটা। মধুর দোকান থেকে। সে যখন ছোট ছিল, মা তাকেই পাঠাতেন মুদির দোকানে। যেখানে সেখানে। মেয়েরা বড় হলেই তাদের জগৎ সঙ্গে সঙ্গে ছোট হয়ে যায়।

গঙ্গাধর নদী বয়ে গেছে বাড়ির পেছন দিয়ে। ছোট যখন ছিল, তখন নদীতে কত ঝাঁপাঝাঁপি করেছে বন্ধুদের সঙ্গে। তখন সমবয়সি ছেলেরাও বন্ধু ছিল। ছেলে আর মেয়েরা যে আলাদা জাত, তা তখন অত বোঝেনি। উদবেড়ালের গর্ত ছিল নদীর উঁচু বালির পাড়ে। শুশুক ভেসে উঠত মাঝে মাঝেই। এই গঙ্গাধরই গিয়ে মিলেছে তিস্তাতে। একবার কাকার সঙ্গে শীতকালে গেছিল নৌকো চড়ে, তিস্তা পর্যন্ত। হাঁস মারতে গেছিল কাকা, মনা জেঠুর সঙ্গে। তামাহাটের মিত্তিরদের বাড়িতে এসে উঠতেন মনা জেঠু।

কী সুন্দর স্বচ্ছ জল গঙ্গাধরের। তিস্তার কাছাকাছি গেলে, আরও স্বচ্ছ। এতই স্বচ্ছ যে, জলের নীচের কমলা-গেরুয়া রঙা বালির ওপরে রং-বেরং-এর গোলগোল নুড়ি দেখা যায়। কত রঙ-বেরঙা হাঁস। বড়, ছোট। ছাইরঙা রাজহাঁস। কোঁয়াক-কোঁয়াক-কোঁয়াক করে উড়ে যায়, মাথার উপর দিয়ে। সেবারে অনেকই ডিম-সেদ্ধ, পাউরুটি, আর কলকাতার কেক খেয়েছিল, মনে আছে।

দেশ ভাগ হওয়ার আগে পর্যন্ত তামাহাট খুব বড় বন্দর ছিল। পাট বেচাকেনা হত। পূব পাকিস্তানের পাট-চাষের সব জেলা থেকে বড় বড় মহাজনি নৌকো করে পাট আসত। জায়গাটা খুবই রমরম করত নাকি তখন। তামাহাটের জেঠিমার কাছে শুনেছে সেই সব সুখের, স্বচ্ছলতার দিনের গল্প। হাটের দিনে, গোরুর গাড়ি করে ব্রহ্মপুত্র আর তিস্তার মহাশোল মাছ আসত। মস্ত মস্ত। বড় বড়, লাল-রঙা তাদের আঁশ। পাথালি করে রাখলে, গোরুর গাড়ির শরীর ছাড়িয়ে যেত মাছগুলো। যেমন দেখতে, তেমনই স্বাদ।

ওরাও ছোটবেলায় যে কিছুমাত্র দেখেনি এমন নয়, কিছু কিছু দেখেছে। দিশি ঘোড়ায় চেপে মুনসের মিঞা আসত বাঘডোরা গ্রাম থেকে হাটের দিনে। সাদা চুলের উপরে কালো কাজকরা মুসলমানি টুপি বসান। তামাহাটের হাটের গন্ধ এখনও নাকে লেগে আছে শিলির। গুড়, চিনি, খোল, সর্ষের তেল, কেরোসিন তেল, পাট, ধুলো, তামাক পাতা আর গোরু মোষের গন্ধ মিলে এক আশ্চর্য মিশ্র গন্ধ উঠত হাট থেকে। সে গন্ধ এখনও নাকে লেগে আছে। সময় চলে যায় ঠিকই, কিন্তু স্মৃতিতে সেই সব বর্ণোজ্জ্বল শব্দ, দৃশ্য, গন্ধ বড় অবিশ্বাস্যরকম জীবন্ত হয়ে থেকে যায়।

বারো বছর বয়সে শাড়ি ধরিয়ে ছিলেন মা। ও যখন হঠাৎ বড় হয়ে গেল একদিন, সেদিনের সেই ভয়, আনন্দ আর রহস্যের দিনের কথা এখনও মনে পড়ে। মা নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে অনেক কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, মেয়েদের অনেকই বিপদ। এই পৃথিবীর কোনো পুরুষমানুষকেই বিশ্বাস না করতে বলেছিলেন। কাউকেই না। এক নিজের বর ছাড়া, যখন বিয়ে হবে।

শিলি জিগগেস করেছিস, বাবাকে?

না। বাবাকে, কাকাকে, কাউকেই না।

বড় ভয় করেছিল শিলির। এ কেমন বড়-হওয়া যে, বাবাকেও পর করে দেয়? সুন্দর এক আশ্চর্য রস গন্ধ-স্বাদে ভরা পৃথিবী ছিল তার। বাঁশবাগানের আলোছায়ার খেলা ছিল। নদীতে সাঁতার কাটা ছিল, আকাশ পরিষ্কার থাকলে, যখন ভুটানের পাহাড় দেখা যেত উত্তরের আকাশে; হিমালয়, কখনো কখনো কাঞ্চনজঙ্ঘাও, সোনার মতো ঝলমল করে উঠত সেই পাহাড় শ্রেণির চুড়ো। শরতের মেঘের মধ্যে, আগুন লেগে গেছে বলে মনে হত তখন। দাঁড়িয়ে থাকত, খোলামাঠে তার খেলার সাথী কুমারের হাতে হাত রেখে। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে।

চলে গেল সেই সব দিন। কেমন হঠাৎ। বড় হঠাৎই চলে গেল ছেলেবেলাটুকু। বৃষ্টি মাথায় করে কদমতলায় রাধাকৃষ্ণ খেলা। তাও চলে গেল।

মেয়েদের শরীর যে মেয়েদের এত বড় শত্রু, তা মোটে বারো বছর বয়সেই জানতে পেরে বড়ই কষ্ট হয়েছিল শিলির। মেয়ে হয়ে জন্মেছে বলে নিজেকে অভিশাপও দিয়েছিল বার বার। আশীর্বাদও মনে হয়, মাঝে মাঝে এখন। অবিমিশ্র দুঃখ বা সুখ কোথাওই নেই, তা বুঝে।

এখন, এই ঘেরাটোপের জীবনই অভ্যেস হয়ে গেছে। মেনে নিয়েছে যে, মেয়েরা আলাদা সৃষ্টি বিধাতার। আলাদা জাত। ছোট জাত। পুরুষের কৃপাধন্য তারা।

বাবার জ্বরটা লিখে রেখে দিল স্লেটে।

তারপর বাবাকে বলে চান করতে গেল, ইন্দারার পাড়ে।

ক্যাবলাটার বয়স হবে পনেরো-ষোলো। ও এই সময় থাকে না। একদিন চান করার সময় শিলি হঠাৎই দেখেছিল যে, ইঁদারার পিছন দিকের মানকচুর ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে, ক্যাবলা চান দেখছে, শিলির। ভেজা কাপড় জড়িয়ে নিয়ে দৌড়ে গিয়ে এক থাপ্পড় মেরেছিল ওকে।

বলেছিল, চোখ গেলে দেব। বুজেছিস!

তারপর থেকে ও ভালো হয়ে গেছে। ক্যাবলা বলেই হয়তো হয়েছে। চালাক হলে হত না।

চান করতে করতে শিলি ভাবছিল, ক্যাবলা তার চান করা দেখেছিল বলে তাকে চড় মেরেছিল ও। অথচ এমনও কেউ আছে, যাকে সবকিছুই দেখানোর জন্য সে উন্মুখ। অথচ তারই কোনো সাড়া নেই।

কী আশ্চর্য! কেন যে এমন হয়!

মনে আজকাল ভয়ও হয় শিলির। পুতনের ব্যবহারে। পুতনের বয়স হবে ছাব্বিশ-সাতাশ। শিলির বাইশ। এত বয়সি কুমারী মেয়ে এখন আর এখানে নেই। না, একজনও নয়।

বিয়ে অবশ্য কালই হতে পারে।

গদাইদের অবস্থা ভালো, আলোকঝারি পাহাড়ের নীচে অনেক ধান জমি। কাঠের ব্যাবসা। ধুবড়িতে তার বাবার কয়লার দোকানও আছে। বড় দাদা স্টিমার কোম্পানিতে সাপ্লায়ার। ধুবড়িতে। মেজদাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরির। গদাই, ছোট ছেলে। চাষ-বাস দেখাশোনা করে। শরীর স্বাস্থ্য ভালোই। নাক থ্যাবড়া। গা দিয়ে একটা অদ্ভুত গন্ধ। নাদু ময়রার গায়ে যেমন ছানাছানা, চিনির শিরাশিরা গন্ধ, তেমনই মাটি-মাটি গন্ধ।

বর হিসেবে ওকে ভাবাই যায় না। কখনোই না। লেখাপড়াও করেছে মাত্র পাঠশালা অবধি। অথচ শিলির বাবার খুবই ইচ্ছে। শুধুমাত্র গদাইদের অবস্থা ভালো বলেই। গলায় কলসি বেঁধে নদীতে ডুবে মরতে ইচ্ছে করে মাঝে মাঝে শিলির। বেঁচে আছে ও শুধুই তার পুতনদারই আশায়, পুতনদারই জন্যে।

আগে, সপ্তাহে অন্তত একটি করে চিঠি লিখত পুতনদা। ফোটোও পাঠিয়েছিল গতবছরে। সাইকেলে হেলান দিয়ে কালো ডোরা ফুলশার্ট আর প্যান্ট পরে চা-বাগানে তার অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে আছে পুতনদা। ধবধবে রঙ। মুখটা গোলগাল। কিন্তু খুব মিষ্টি। কত সব খবর দিত সে তখন, প্রত্যেকে চিঠিতে। বারো বছর বয়সে যে-জগৎকে হারিয়েছিল শিলি, পুতনের চিঠির মাধ্যমে সেই জগৎকেই ফিরে পেয়েছিল আবার।

পুতনকে শিলিগুড়িতেও যেতে হত মাঝে মাঝে। অন্য সব বাগানেও বকেয়া পাওনা উশুল করতে যেতে হত।

ও লিখত, আজ বাগরাকোটের সাহেব ম্যানেজার ডনাল্ড ম্যাকেঞ্জী সাহেব আর তার বউ বেটি

ম্যাকেঞ্জীকে দেখলাম। আহা! দেখে মনে হয় যেন ইংরেজি বায়োস্কোপ দেখছি। কী সুন্দর যে সাহেব মেম! নিজে চোখে না দেখলে বিশ্বেসই হত না।

একদিন লিখল, তিস্তার চ্যাংমারীর চরে নতুন করে চাষের বন্দোবস্ত হচ্ছে। 'রিক্ল্যামেশন' হচ্ছে চর। এই চরের ঘাস পরিষ্কার করে চাষাবাদ হবে ভবিষ্যতে। তিস্তার সব চরেই চা-বাগানের ম্যানেজারেরা বাঘ শিকারে যেতেন। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের হাতি, পুলিশের হাতি সব এসে নাকি জমায়েত হত। উত্তর বাংলার কমিশনার আইভ্যান সুরিটা, ডি-আই-জি রঞ্জিত গুপ্ত, চিফ সেক্রেটারি রণজিৎ রায়, শিলিগুড়ির দুর্গা রায় আরও কত সব লোকের কথা লিখত পুতনদা। লিখত, জলপাইগুড়ির রানির কথা। রানি অশ্রুমতী দেবী—রায়কতদের রানি। তাঁর একমাত্র মেয়ে, রাজকুমারী প্রতিভা দেবী। তাঁর সঙ্গে নাকি বিয়ে হয়েছিল কম্যুনিস্ট নেতা জ্যোতি বসুর দাদা ডাক্তার কিরণ বসুর। জ্যোতি বসুর ডাকনাম যে গণা, তাও পুতনদার চিঠিতেই ও তখন জানতে পারে।

জলপাইগুড়ির রাজবাড়িতে এক জোড়া সাপ ছিল, বিখ্যাত। সে সাপেরা ছিল বাস্তুসাপ। কারোকে কিছু বলত না নাকি!

পুতনদা বছরখানেক হল চিঠি দেওয়া একেবারেই কমিয়ে দিয়েছে। মাসে একটা লিখত ছমাস আগে। তারপর দু'মাসে একটা।

শেষ চিঠি পেয়েছে ছমাস আগে। এবারে হয়তো বছরে একটা লিখবে। তারপরে থেমে যাবে চিঠি আসা, একেবারেই।

মাসিমা কিরণশশীর কাছে শুনেছে শিলি যে, পুতনদার কুমারগঞ্জে আসার আর দেরি নেই। সঙ্গে করে নাকি বাগানের ম্যানেজারের কাছে বেড়াতে আসা ম্যানেজারের শালার ছেলেকে নিয়ে আসছে। কলকাতার ছেলে। গ্রাম নাকি দেখেনি সে আগে। তাইই আসছে পুতনদার সঙ্গে। ছেলেটি নাকি পুতনদারই সমবয়সি, যেমন লিখেছে মাসিমাকে, পুতনদা। ভালো কাজ করে নাকি কোনো বিলিতি কোম্পানিতে। ভালো মানে, উঁচুদরের কেরানি। পুতনদা নাকি দুঃখ করে লিখেছে, ম্যানেজারের শালার ছেলে মানে, ম্যানেজারই। তাকে খাতিব যত্ন করে খুশি রাখতেই এবারের ছুটিটা কেটে যাবে। যদি না সে আগেই ফিরে যেতে চায় কুমারগঞ্জ থেকে। তার চাকরিটা শখের। অঢেল পয়সা। বনেদি পরিবার।

তবে শিলিকে লেখেনি কিছুই। যা লেখার তা সবই মাসিমাকেই লিখেছে। তাই খুবই অভিমান হয়েছে শিলির। ভয়ও যে হয়নি, তাও নয়। নানারকম ভয়েই বড় বিষণ্ণ হয়ে আছে ও, ক'দিন হল। সবসময়ই বুক দুরদুর করে।

চা-বাগানে কি অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে ভাব হল পুতনদার? একটা চা বাগানে নিশ্চয়ই অনেক বাঙালি কর্মচারী থাকেন। বিশেষ করে, বাগানের মালিক যখন বাঙালিই। তাঁদের সব বাড়িতে কি শিলির চেয়ে সবদিক দিয়ে ভালো একটিও মেয়ে নেই? না থাকলেও, তাদের কত শালি-টালিরাও আসতে পারেন তো বেড়াতে। কে জানে, কী হল? কেন হঠাৎ নীরব হয়ে গেল পুতনদা?

খুবই রাগ হয় শিলির, সেই সব অদেখা মেয়েদের উপরে। তাদের তো কতই আছে বাছাবাছির। শিলি যে ইন্দারার ব্যাং। ওর যে পুতনদা ছাড়া আর কেউই নেই এই জগতে। সেই শিশুকালের সাথী। সুখদুঃখের মধ্যে বেড়ে উঠেছে দুজনে। একসঙ্গে। একই ধরনের বোঝাবুঝি, সমঝোতাও গড়ে উঠেছে দুজনের মধ্যে।

তবে, সত্যি কথা বলতে কী, এই পুতনদা যে তার মনের আদর্শ পুরুষ, তা আদৌ নয়। তবে, পুতনদা ছাড়া আর অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগও তার আসেনি। বাছাবাছির সুযোগ না থাকাতে, যা হাতের কাছে থাকে, তাকেই ভালো লাগাতে হয়। দেখতে দেখতে, একসময় ভালো

লেগেই যায়। বার বার মনোযোগ দিয়ে কোনো গাছের দিকে তাকালেও তাকে ভালোবেসে ফেলে মানুষ; মানুষকে তো বাসতেই পারে। বাসেই!

"আদর্শ" পুরুষ বলতে সে নিজে যা বোঝে তেমন মানুষের সঙ্গে তার বিয়ে কোনোদিনও হবে না। কোনো মেয়েরই জীবনের আদর্শ পুরুষের সঙ্গেই বিয়ে কখনোই হয় না তার, আর যা-কিছুই হোক-না-কেন। হয়তো, না হওয়াই ভালো। এক ঘরের মধ্যে খুবই কাছাকাছি থেকে, দিনের পর দিন দেখলে, সব আদর্শেরই রঙ চটে যায়। জেল্লা ম্যাটম্যাট করে। "আদর্শ" ব্যাপারটার মধ্যেই বোধহয় দূরত্বের আর যাত্রার গন্ধ আছে একটু। ওসব দূরে রাখাই ভালো। শিলির "আদর্শ" পুরুষের কাছাকাছি মাত্র একজনকেই দেখেছিল সে, তামাহাটে।

মিত্তিরদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল সেই ছেলেটি, কলকাতা থেকে। মাসখানেকের জন্যে। সেখানেই দেখা হত। সে বাড়িতে দেখা হত, যখন শিলি যেত তামাহাটে। আবার সাইকেল নিয়ে সেও এই কুমারগঞ্জে চলে আসত, তামাহাট থেকে। শিলি ভেবেই আনন্দ পেত যে, সে আসত, হয়তো শিলিকে শুধু একবার দেখতেই। হয়তো সত্যিই তাই আসত। কলকাতার কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ত সে। কলেজের নামটা ভুলে গেছে শিলি।

ছেলেটির গায়ের রঙ ছিল মাজা। কিন্তু খুব লম্বা। মাথা-ভরতি চুল, সুন্দর, শক্ত চেহারা। ধবধবে সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি পরত, নয়তো হাওয়াই শার্ট আর প্যান্ট। তাও সাদা। ছেলেটির মধ্যে শুধু শিক্ষাই ছিল না, সহবৎ, সম্ভ্রান্ততা সবই ছিল। "বড়ঘরের ছেলে" বলতে শিলির মা চিরদিন যা বোঝাতেন, তার সবই ছিল সেই হিতেন বোস-এর মধ্যে। শিলির জ্ঞাতি সম্পর্কে কাকা হত তাই "হিতুকাকু" বলে সম্বোধন করত শিলি তাকে। একটা পুরো মাস, বর্ষায় চ্যাগারের পাশের গাছের গন্ধরাজ ফুলের গন্ধরই মতো তাকে আমোদিত, আনন্দিত, শিহরিত করে রেখে, হিতেন ফিরে গেছিল কলকাতায়।

যখন ছিল এখানে, তখন আলোকঝারি পাহাড়ে শিলি তার সঙ্গে সাত-বোশেখির মেলায় গেছিল। শিকারের শখও ছিল ছেলেটির। ধুবড়ির পূর্ণবাবুর দোনলা বন্দুক চেয়ে নিয়ে এসেছিল সে। শিলির "মারকুইট্টা" কাকার সঙ্গে, পর্বতজুয়ারে চিতাবাঘ আর শুয়োরের খোঁজে যেত হিতেন। ওসব একদিনও পায়নি। ফিরে আসত প্রায়ই সোনালি বনমোরগ সাইকেলে বেঁধে। অবশ্য লালচে কুটরা হরিণ মেরেছিল একদিন। কাকা আর হিতুকাকু দুজনে মিলে কষ্টে-সৃষ্টে টুঙ বাগানের মধ্যে দিয়ে বয়ে এনেছিল কুটরা হরিণটাকে।

রক্তারক্তি, মারামারি শিলি যে পছন্দ করে না, একথা বলার পরদিন থেকেই "হিতুকাকু" বলেছিল, 'যে-ক'দিন এখানে আছি শিলি, আর কিছুই শিকার করব না; হিংস্র কিছু ছাড়া।'

হিংস্র কিছু মানে? কী কী?

বাঘ, ভাল্লুক, চিতাবাঘ, বিষাক্ত সাপ, আর এই ধরো তোমার মতন সুন্দরী মিষ্টি-হাসির কোনো মেয়ে!

আহা!

বলেছিল, শিলি।

লজ্জাতে শিলির গাল লাল হয়ে গেছিল।

তারপরে হিতুকাকু চলে গেলে, দেওয়ালের আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছিল শিলি এসে। পড়ন্ত বেলার নরম কমলা রোদ, কালোজাম গাছের পাতার ঝালরের ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে এসে পড়েছিল। ঘরময়। শিলির চুলে, মুখে। কমলার সঙ্গে বেগুনি আভা মিশে গেছিল যেন সেই আলোয়।

কালোজামেব পাতারাও কি বেগুনি হয়? আলোমাখা কালোজামের পাতাদের দিকে চেয়ে ভেবেছিল ও।

কী বা আছে তার? ভেবেছিল, শিলি। জোড়া ভুরু, কুচকুচে কালো রঙ। নাকটি অবশ্য বেশ টিকালো, চোখ দুটি বড় বড়। বড় বড় চোখের পাতা আর পল্লব। দাঁতগুলোও খুব একটা খারাপ নয়। মন্দ কী?

নিজেকেই নিজে বলেছিল শিলি!

শিলির মা বলতেন, মেয়েদের সবচেয়ে বড় প্রসাধন হচ্ছে দুটি। একটি হল যৌবন। অন্যটি বুদ্ধি। যৌবন চলে গেলে, যতই সাজো লাভ নেই। যৌবনের দীপ্তিটাই আলাদা। আর বুদ্ধি না থাকলে, গায়ের ধবধবে রঙ, স্নো, পাউডার, রুজ কিছুতেই তার অভাব ঢাকা পড়ে না। প্রত্যেক মেয়েকেই যৌবন এক আলাদা শ্রী দেয়, দীপ্তি দেয়। যৌবনে কুকুরীকেও সুন্দরী দেখায়।

কে জানে! হিতুকাকু কী দেখেছিল তার মধ্যে!

অদ্ভুত দৃষ্টিতে এই গেঁয়ো শিলির দু চোখে তাকিয়ে থাকত। অসভ্যর মতন নয়। দারুণ এক দৃষ্টিতে, বোধহয় কবি-টবিরা এমন চোখে তাকান, যাঁদের নিয়ে তাঁরা কবিতা লেখেন, তাঁদের দিকে। গা শিরশির করে উঠত শিলির। হিতুকাকুর সেই চাউনি যেন তার আপাদমস্তক লেহন করত কিন্তু তাতে কোনো অশালীনতা ছিল না, নোংরামি ছিল না। হিতুকাকু মানুষটার মধ্যে কোনোরকম নোংরামিই দেখেনি শিলি। এমন পুরুষ জীবনে কমই দেখেছে।

চলে যাবার সময় শিলির একটা ফোটো চেয়েছিল হিতুকাকু। সম্প্রতি তোলা ফোটো নেই শুনে, তামাহাটের পিন্টুদাদের বাড়ি থেকে ক্যামেরা ধার করে এনে, আদর করে শিলির ফোটো তুলেছিল। কলকাতায় ফিরে গিয়ে তাকে সেই ফোটো আর একটি সুন্দর চিঠি পাঠিয়েছিল হিতুকাকু। এমন সুন্দর কাগজে, এমন সুন্দর ভাষায়, অমন নরম, ভদ্র ভালোবাসার চিঠি যে কেউ লিখতে পারে তা ওই চিঠি না পেলে জানতেও পেত না। একটি চিঠি যে রুখু মনের মধ্যেও সব ফুলগুলি কী ভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারে, তা হিতুকাকুর চিঠি না পেলে সত্যিই জানত না কখনো শিলি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল শিলি, ঘাড়ে আর পিঠে সাবান মাখতে মাখতে, চান করতে করতে।

মা চলে যাবার পর, এ বাড়িতে দ্বিতীয় কোনো মেয়ে নেই বলে, কতদিন যে পিঠে ভালোকরে সাবান দিতে পারে না। একদিন ও-বাড়িতে গিয়ে হোন্দলের মাকে দিয়ে পিঠ ঘষাবে ঠিক করল।

হিতুকাকু এখন বম্বেতে বড় চাকরি করে নাকি। বিয়েও করেছে গতবছর। ছেলেমেয়ে নাকি হয়নি এখনও। হিতুকাকুর বউ-এর ছবি দেখতে খুব ইচ্ছে করে, শিলির। সে কি শিলির চেয়েও সুন্দরী? শুনেছে, খুবই সুন্দরী। শহরের সুন্দরী। বি. এ. পাস। মোটর গাড়ি দিয়েছে নাকি মেয়ের বাবা হিতুকাকুকে, বিয়েতে। ছেলেগুলো বড় বোকা হয়। শিলিরও দেবার অনেক কিছুই ছিল। বিয়ে করলে, তবেই না জানতে পেত হিতুকাকু। সেই শহুরে মেয়ে কি তার মতো খেজুরে গুড়ের পায়েস রাঁধতে পারে? নতুন চালের পাগল-করা গন্ধের ফেনাভাত? বড় বড় কইমাছের হর-গৌরী? একপাশে—মিষ্টি, একপাশে—ঝাল? হিতুকাকুর বউ, বড় চিতল মাছের তেলওয়ালা পেটি কি রান্না করতে পারে শিলির মতো। কাঁচালঙ্কা, কালোজিরে ধনেপাতা দিয়ে? চিতলের মুইঠ্যা? মাঝারি শিঙ্গি মাছ দিয়ে কালোজিরে-কাঁচালঙ্কা-বেগুন আর পেঁয়াজ দিয়ে গা-মাখা চচ্চরি? ঝাল-ঝাল, ঝাঁঝ-ঝাঁঝ? গঙ্গাধর নদী ডুব সাঁতারে এপার ওপার করতে পারে কি সেই বড়লোকের মেয়ে? গাছ-কোমর করে শাড়ি পরে, সিঁদুরে-আমের গাছের মগডালে চড়ে আম পেড়ে খাওয়াতে পারে হিতুকাকুকে। চটের উপর রঙিন মিষ্টি-মিষ্টি গন্ধর নতুন পাট দিয়ে লিখতে পারে কি GOD IS GOOD অথবা DO NOT FORGET ME? সে কি বিশ্বাস করে মনে প্রাণে যে, "সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে"? শিলিরও দেবার অনেক কিছুই ছিল। সব দানের কথা আলোচনা করা যায় না। কিন্তু ছিল যে, তা শিলিই জানে। অনেক এবং অনেকরকম দান।

গা মাথা মুছে ফেলল শিলি। বাবার বার্লিটা জ্বাল দিতে হবে। পিউরিটি বার্লি ছাড়া অন্য বার্লি আবার বাবার মুখে রোচে না। মা খেতে ভালোবাসতেন হাণ্টলি-পামারের বিস্কিট। দু একবারই খেয়েছিলেন অবশ্য। বাবা কাকে দিয়ে যেন আনিয়েছিলেন, কলকাতা থেকে।

এসব ভেবে আর কী হবে? চলে-যাওয়া দিনের কথা। দূরে-থাকা "আদর্শ" পুরুষের কথা ভেবে?

তবু, ভাবনা তো শুধু মানুষেরই বিশেষ গুণ। ভগবানের বিশেষ দান। ভাবতে, সব জীবই তো আর পারে না।

ম্যানেজারবাবুর বাংলোর বারান্দার সাদা রঙ-করা বেতের চেয়ারে বসে, কাচের টেবিলের উপরে রাখা, সুন্দর দেখতে, বম্বের পেডার পটারির টি-পট্ থেকে ঢেলে চা দিচ্ছিল পুতনকে, ম্যানেজারবাবুর মেয়ে রুচি।

দার্জিলিং-এর লরেটো কলেজে পড়ে সে। কথায় কথায় কাঁধ-ঝাঁকিয়ে, ববকাট চুল উড়িয়ে, ইংরিজি বলে।

ঘোর লেগে যায় পুতনের। এ এক নতুন জগৎ!

উলটো দিকের চেয়ারে পুতন এবং রুচির কলকাতা থেকে আসা কাজিন, রাজেশ বসে আছে।

কুমারগঞ্জ গ্রামের অতি সাধারণ অবস্থার ছেলে পুতন প্রথম প্রথম এমন পরিবেশে কুঁকড়েই থাকত। কী করবে, কী বলবে, বুঝে উঠতে পারত না। আর বাঙালত্ব নিয়ে বাগানের অনেকে তো বটেই এবং খাস কলকাতার "ঘটি" মানুষ ম্যানেজারবাবুও বেশ একটু ঠাট্টা-তামাশাও করতেন।

বাগানের মালিক এখন আর বাঙালি নেই। মাত্র তিনমাস আগে মারোয়াড়িকে [illegible] করে দিয়েছেন আগের মালিক। সেই মারোয়াড়ি ব্যবসায়ীর ব্যাবসাও কলকাতাতেই। আগের মালিক কলকাতার বাঙালি ছিলেন বলেই কুলি-কামিনরা ছাড়া কলকাতার লোকই বেশি, এই বাগানে।

প্রথম প্রথম গেলুম, খেলুম, নুন, নংকা, নুচি, নেবু, এই সব শুনে ভিমরি খেত পুতন। কিন্তু বেশিদিন পতিত থাকার চরিত্র নিয়ে পুতন জন্মায়নি। কিছু মানুষ, পাটিগণিতের বইয়ের তৈলাক্ত বাঁশে-চড়া বাঁদরের মতো প্রচণ্ড অধ্যবসায় নিয়েই জন্মায়। পুতন, সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষীদের শ্রেণিতে পড়ে। যেহেতু ম্যানেজার এবং বাগানের অধিকাংশ অফিসার কলকাতার লোক, পুতন অচিরে শুধু তার বাঙালত্বই যে বিসর্জন দিয়েছে তাইই নয়, তাদের সঙ্গে সমানে করলুম খেলুম, মলুম, শুলুমও করে যাচ্ছে। শেয়াল যেমন হালুম হুলুম ডাক ছাড়তে পেরে কখনো সখনো শ্লাঘা বোধ করে যে, সে বাঘ হয়েছে; পুতনও তেমন খেলুম, শুলুম, নুন, নংকা, নুচি বলে বলে তার অকারণের হীনমন্যতাকে গলা টিপে মেরে ফেলে, খাস কলকাতার লোক হয়েছে ভাবতে লাগল।

এদিকে খাস-কলকাতার লোকেরাও যে, আজকাল হুম হুম ছেড়ে, "খেয়েছিলাম"-এ ফিরে আসছেন "গেসলুম' ছেড়ে "গেছিলাম"-এ সেটা নকল করার মতো বিদ্যে বুদ্ধি পুতনের ছিল না। অনুকরণের বিদ্যে অনেক সহজ, ওরিজিনালিটির শিক্ষা তা নয়। প্রোটোটাইপ সহজে হওয়া যায়, ওরিজিনাল ওরিজিনাল হতে পারেন। তাকে নিয়ে খাস কলকাতার লোক এবং খাস পূর্ব-বাংলার মানুষেরা সকলেই যে একইসঙ্গে সমানে হাসাহাসি করে সে কথা বোঝার মতন বুদ্ধি পুতনের ছিল না। বুদ্ধি পুতনের কোনোদিনই বিশেষ ছিল না। অধিকাংশ মানুষই দুর্বুদ্ধি আর সুবুদ্ধির মধ্যে যে তফাত আছে, তা কোনোদিনও নিজেরা পুরোপুরি বোঝে না। তাদের জাগতিক উন্নতির জন্যে, যে-কোনো ফলপ্রসূ বুদ্ধিকেই তারা সুবুদ্ধি বলে মনে করে। উচ্চাকাঙ্ক্ষী পুতন সেই গরিষ্ঠদের, জনগণের দলে।

রুচির পোশাক-আশাক, জামা-কাপড়, হাসি, সবই ঘোর লাগায় পুতনের মনে। তবে ও বোঝে

যে, রুচির দিকে হাত বাড়ালে তার হাতটাই যাবে কাটা। তাছাড়া মালিকানা বদলের পর ম্যানেজারবাবুর মাথাটাও যে ধড়ের উপরে বেশিদিন হয়তো নাও থাকতে পারে, এ জ্ঞানটাও পুতনের ছিল না। এই সময়ই কলেজের ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়ে রুচির এক মামাতো বোনও এসেছে এখানে বেড়াতে। ওদের বাড়ি বর্ধমানের কোনো গ্রামে। মেয়েটির মাজা রঙ, গালে একটি কাটা দাগ। গ্রামের মেয়ে হলেও বুদ্ধি যে সে রাখে তীক্ষ্ণ, তা দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু তার পোশাক-আশাক এবং আড়ষ্টতা দেখে মনে হয় যে, তাদের অবস্থা বিশেষ ভালো নয়, এবং রুচিদের কৃপাপ্রার্থী তারা। সবসময়েই সে এই পরিবারের মন যুগিয়ে চলে। নানা ব্যাপারেই পুতন, রুচির সঙ্গে সেই মেয়েটির এই তারতম্য লক্ষ্য করে। খাওয়ার সময়ে খাওয়ার টেবিলে বসে ম্যানেজারবাবু এবং রুচি এবং রুচির ছোটমামা রাজেন এমনকি রুচির মা এবং ছোট ভাইও একই সঙ্গে খেতেন। তাঁদের খাওয়া-দাওয়া দেখাশোনা করত সেই মেয়েটিই। অলকা তার নাম।

রুচির মা একদিন বলেছিলেন, অলকাকেই : অলি আমাদের খুবই কাজের মেয়ে। এই ক'দিন একটু যত্ন-আত্তি করত মা আমাদের।

অলি খেতে বসত, বাড়িসুদ্ধ সকলের খাওয়ার পর বাবুর্চিখানার মেঝেতে। কোনোদিন বা একটা টুলের উপর বসে, কোলের উপরে অ্যালুমিনিয়ামের থালা নিয়ে সে খেত। প্রায় বাবুর্চি-বেয়ারাদের মতো। লক্ষ্য করেছিল পুতন। অন্যরা খাওয়াদাওয়ার পর খাটে শুয়ে বা চওড়া বারান্দায় বসে যখন নভেল পড়তেন বা ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাতেন অথবা ছায়াচ্ছন্ন পাখিডাকা বাগানে দোলনা চড়তেন, তখন অলি আচার আর পাঁপড় বানিয়ে উবু হয়ে বসে, ঘুরে ঘুরে শুকোতে দিত বাগানেরই এক কোণায়।

অলিকে দেখে পুতনের দুটো জিনিস মনে হত। প্রথমত, অনেকই দিক দিয়ে অলকা পুতনের শ্রেণির। যদিও অমিলও ছিল অনেক। তাকে বিয়ে করতে যদি পারে পুতন, তাহলে পুতন এক নতুন জাতে উঠবে। এই চা-বাগানে "বাঙাল" বলে তার যে হেনস্থা, তা ঘুচবে।

দ্বিতীয়ত, ম্যানেজারবাবুর আত্মীয়াকে বিয়ে করায় তার উন্নতি অনিবার্য। গরিব আত্মীয়দের সচরাচর বড়লোকেরা এড়িয়েই চলেন। কিন্তু যে-আত্মীয় চোখের সামনে জলজ্যান্ত থাকে তাকে একটু মর্যাদা নিজেদের খাতিরেই দিতে হয়। অন্য কিছু না হলেও, লোকভয়েরই কারণে। তাছাড়া, প্রায় মরে-যাওয়া বিবেকও হঠাৎ হঠাৎ জেগে উঠে মৃগী রোগীর মতো খিঁচুনি দিয়ে হাত-পা ছুঁড়তে থাকে বলেও।

শিলির কথাও মনে যে পড়ে না পুতনের তা নয়। কিন্তু তাকে সে বিয়ে আদৌ করবে না। করা সম্ভব নয়। বিয়ের সঙ্গে প্রত্যেক বুদ্ধিমান, প্র্যাকটিকাল পুরুষও নারীর সমস্তটুকু ভবিষ্যৎ জড়িত। যে মূর্খরা একথা না বোঝে তাদের কপালে দুঃখ অবধারিত। এবং তা খণ্ডাতে পারে, এমন কেউই নেই। স্বয়ং ভগবানও না।

অনেকই ভেবে দেখেছে পুতন। শিলিকে বিয়ে করলে, শিলির বাবার দায়িত্বও পুতনকে নিতে হবে। তার নিজের মায়ের দায়িত্ব তো আছেই তার উপরে।

রুচির ছোট মামা রাজেন ছেলেটা যদিও তার সমবয়সি, কিন্তু একটু অদ্ভুত ধরনের। পুতনের সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ হতেই এবং ওকে একা পেতেই বার-বার বলেছে, কী গুরু! চা বাগানে এলুম, দুটি-পাতা একটি কুঁড়ির জায়গাতে দু একটি কুঁড়ি-ফুঁড়ি একটু দেখাও। কুঁড়ি ফুটিয়ে ফুল করি। যেমন শুকনো পাতা ফুটিয়ে চা করি। নানারকম আদিবাসী কামিন-টামিন...

প্রথম প্রথম বুঝতে পারেনি গাঁয়ের সরল ছেলে পুতন, কথাটা। কারণ পুতনের ওসব দিকে কোনো উৎসাহই ছিল না। কুলি-লাইনের কোন কোন ঘরে কেমন মেয়ে আছে এবং কোন কোন কামিনেরা পয়সার বিনিময়ে দেহ দেয়, তা সে জানত না। জানার কোনো ঔৎসুক্যও ছিল না। তবে,

কেউ কেউ যে দেয়, তা সে অফিসের বাবুদের কানাঘুষোয় শুনতে পেত।

ম্যানেজারবাবুর বাড়িতেই একটি মেয়ে কাজ করে? সে মেয়েটি নাকি ম্যানেজারবাবুরই রক্ষিতা। দারুণ দেখতে কিন্তু মেয়েটি। বছর কুড়ি বয়স হবে। কাটা-কাটা চোখমুখ, তেমনই শরীর, বেশ লম্বা, কোমর অবধি চুল।

ম্যানেজার সাহেবের বউ, বর্ষার সময় যখন কলকাতায় যান বাপের বাড়ি, একেবারে পুজো কাটিয়ে আসবেন বলে, তখন এই মেয়েটিই নাকি ম্যানেজারবাবুর স্ত্রী হয় রাতে।

পুতন অবশ্য সহজেই বাগানের অন্য কারও সাহায্যে কলকাতার রাজেনবাবুর জন্যে বন্দোবস্ত করতে পারত। কিন্তু তাহলে রাজেন যে তার হাত ছেড়ে দিয়ে অন্যের খপ্পরে গিয়ে পড়ত। রাজেনকে হাতছাড়া করে এমন বোকা পুতন নয়। রাজেনই এখন ম্যানেজারবাবুর বাড়ির সঙ্গে পুতনের একমাত্র সেতু। সেতু ভেঙে যাক, তা সে চায় না।

কী ভেবে, পুতন হঠাৎ একদিন রাজেনকে আশ্বস্ত করে বলেই ফেলল যে, আজকাল নানারকম প্রবলেম বাগানে। পলিটিকাল পার্টি-ফার্টি আছে। তিলকে তাল করে এরা। কামিনদের মধ্যেও শিক্ষার প্রসার হয়েছে। আগেকার দিনের মতন কোনো শালার জোতদারি নয় তারা। তাছাড়া, কোনোরকমে জানাজানি হলে ম্যানেজারবাবু পর্যন্ত বিপদে পড়বেন। সবচেয়ে আগে চাকরিটা যাবে তাঁরই। এখানে কিছু হবে না। তার চেয়ে চল আমার সঙ্গে, আমাদের দেশের বাড়িতেই বরং। আমার হাতেই আছে একটি। আমি যা বলব, তাইই সে করবে। আ বার্ড ইন হ্যান্ড ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু টু, ইন দ্যা বুশ।

জিনিস কেমন?

রাজেন ভুরু তুলে, সিগারেটে টান দিয়ে, লাল-লাল চোখ নাচিয়ে বলেছিল।

কেমন আর! গেঁয়ো জিনিস যেমন হয়। তেমন আর কী। তবে...ভালো।

আনটাচড তো?

এক্কেবারে। সেটুকু বলতে পারি। গ্যারান্টি।

গুরু, তুমি নিজে? নিজেও কি দু একটি পাঁপড়ি ছেঁড়োনি?

ছিঃ?

বলেছিল, পুতন। হঠাৎ-বিবেকের কামড় খেয়ে। বিবেক হচ্ছে, বিছের মতন জিনিস। কোথায় যে কোন চিপুতে লুকিয়ে থাকে, আর কখন যে হঠাৎ বেরিয়ে পড়ে কামড় দেয় মানুষকে, তা যারা বিবেক অথবা বিছে এ দুয়ের একটিকেও জানে; তারাই জানে!

পুতনের দুকান গরম, লাল হয়ে ঝাঁ ঝাঁ করছিল।

এ কথা ঠিক যে, পুতন ছেলেটার স্বচ্ছল জীবনের প্রতি বড় লোভ। শিশুকাল থেকে অর্থাভাবের জন্য বহুরকম কষ্ট ও অসম্মানকে সে জেনেছিল। তবু এখনও তেমন অন্যায় কিছু করেনি সেই লোভের বশবর্তী হয়ে। "খারাপ" হয়নি এখনও। জানে না, কোনোদিনও "খারাপ" হবে কী না। তবে খারাপ হতেও যে, ভালো হওয়ার চেয়ে কম কষ্ট হয় না; এই খারাপ কথাটা রাজেনকে বলে ফেলেই ও বুঝতে পারল। বুঝল পুতন, বি-কম-এ ফারস্ট-ক্লাস পাওয়াটা যেমন কষ্টের, শিলিকে তার নিজের উন্নতির জন্যে রাজেনের ভোগে লাগাতে দেওয়াও তার চেয়েও অনেকই বেশি কষ্টের। এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটাই বড় কষ্টের। যে, যেমন করেই বাঁচুক না কেন!

পুতনের ছিঃ শুনেই, খুব জোরে হেসে উঠেছিল রাজেন।

তারপর ডান হাতের তিন আঙুল দিয়ে ওর থুতনি নেড়ে দিয়ে বলেছিল মা-ন্-তু!

আমি ওসব লাইনেই নেই।

পুতন বলেছিল। রেগে।

আবারও বলেছিল, রাজেন।

মা-ন্-তু!

বলে, আবারও পুতনের থুতনি নেড়ে দিয়েছিল জোরে। বলেছিল, নেকুপুষুমুনু আমার।

পুতন মোটেই দুশ্চরিত্র নয়। কখনোই কোনো মেয়ের সঙ্গে ও কিছুমাত্রই করেনি। গতবার যখন দেশে গেছিল, তখন এক দুপুরবেলায় শিলিকে আমবাগানের ছায়ায় একটা চুমু খেয়েছিল শুধু। তাও, জোর করে, ওকে গাছে চেপে ধরে। উ-উ-উ-উমম করে আপত্তি জানিয়েছিল শিলি। কিন্তু পুতন বুঝেছিল যে, ভালো লেগেছিল শিলির। কোনো মেয়েকে আদর করতে গায়ের জোরের চেয়ে ভালোবাসাই যে অনেক বেশি লাগে, তা সেই দুপুরেই প্রথম জেনেছিল ও। উত্তেজনা, পুতনেরও কম হয়নি। সমস্ত শরীরে কত যে নাম-না-জানা অনুভূতি আকুলি-বিকুলি করে উঠেছিল ঝড়ের দোলালাগা ফুলেরই মতন, তা কী বলবে। নারী শরীরের ওই অদেখা অজানা অসীম রহস্যের আভাস পেয়েই উত্তেজনায় কেঁপেছিল। ভেবেছিল, একটি চুমুতেই যদি এতো উত্তেজনা, তবে আরও বেশি কিছু হলে হয়তো উত্তেজনাতে মরেই যাবে। ভালো লাগাটা এতই বেশি ভালো যে, খারাপ লেগেছিল ওর। ভেবেছিল পুতন, সমস্ত ভালো জিনিসই, অথবা নেশার জিনিসই, প্রথম প্রথম বোধ হয় খারাপ লাগে। মদেরই মতো।

চাকরিতে উন্নতি করতে হলে, একটু মদ-টদও নাকি খেতেই হয়। ম্যানেজারবাবু নিজেই বলেছিলেন একদিন।

বাগানের মালিক যদিও মারোয়াড়ি, তাঁর শখের অভাব নেই। সবরকম সাহেবিয়ানাতেই তিনি পোক্ত হয়ে উঠেছেন। ইংরিজি উচ্চারণটা যদিও পুতনের চেয়েও খারাপ। তাতে কী এসে যায়? মালিকেরা খোদার সৃষ্ট অন্য গ্রহের জীব। তাঁদের কোনো গুণাহ্ নেই। তাঁরা যাই করুন না কেন, বেহেস্ত-এর দরজা তাঁদের জন্যে সবসময়ই খোলা। মালিকের কাজ করতে হলে, উন্নতি করতে হলে, মালিকের "গু"কেও "সুগন্ধি" বলতে হবে।

লোকে বলে, ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে মালিকের বন্দোবস্ত আছে। ম্যানেজারবাবুর বাংলোর ওই মেয়েটিকে ডিরেকটরস্ বাংলোতে ডিউটিতে যেতে হয়, মালিক এলেই।

ব্যাবসাদার মারোয়াড়িরা শুধু কাজ আর টাকা-পাগলা বলেই জানত এতদিন পুতন। এমন "গুণী" মারোয়াড়ির কথা সে আগে শোনে নি। আজকাল নাকি গুণীদের সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছে, বিশেষ করে কম-বয়সিদের মধ্যে। একথাও শুনতে পায় অনেকেরই কাছে।

পুতন ঠিক করেছে শিলিকে ও তুলে দেবে রাজেনেরই হাতে। একদিনের জন্যে বই তো নয়, তুলে দেবে হুলো বেড়ালের মতন কলকাতার রাজেনের মুখে; অনভিজ্ঞ, বিন্দুমাত্র সন্দেহহীন শিলিকে, কালো, নরম কবুতরীর মতো। কালো কবুতরীরও ভিতরের দিকে তো সাদা পালক থাকেই। নরম, মসৃণ সেই সব পালক রাজেন ছিন্নভিন্ন করবে, এ কথা কল্পনা করেই পুতনের মনেই একধরনের তীব্র বিকৃত আনন্দ হচ্ছিল।

শিলির বাবা নরেশবাবু যদি জানতে পারেন? জানলেও কী? কিন্তু পরেশকাকু? সে জানলে, কী করবে কিছুই ঠিক নেই। অ্যালফাম্যাক্স এল.জি. দিয়ে, ধুনে দেবে হয়তো পুতন আর রাজেনকে। নরেশকাকু করতে পারে না, এমন কাজ নেই। ভালো কাজ। আর সঙ্গে আবু ছাত্তার থাকলে ত কথাই নেই। সোনায় সোহাগা।

রাজেন অবশ্য পুতনকে বলেছে, চিন্তার কিছু নেই গুরু; পেট করে দেবো না। অমন কাঁচা মাল আমি নই। সোনাগাছির রেগুলার খদ্দের আমি। তাইতো মাঝে মাঝে তামাগাছি, রুপোগাছি, পেতলগাছি, দেখতে একটু ভালো লাগে। আমার সঙ্গে কন্ট্রাসেপটিভ থাকে সবসময়ই। ডাক্তারের

ব্যাগে, যেমন রুগির জন্যে কোরামিন ইনজেকশান্ থাকে। কখন কোথায় যে দরকার হয়, কে বলতে পারে? বলো, গুরু? সব সময় প্রিপেয়ার্ড থাকতে হয়। "যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখো তাই, পাইলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন"। কে বলেছেলো জান কি?

কে?

নাই বা জানলে।

সীতার বাপের নাম জান কি?

পুতন চুপ করে থাকল। মানা করা সত্ত্বেও রাজেন কোয়ার্টারে বসে বেশি মাল খেয়ে ফেলেছে। ওটার নাম "ভুটান অরেঞ্জ"। ভুটানি হুইস্কি। এসব কি আলু-পোস্ত খাওয়া উত্তর কলকাতার শৌখিন লিভারে নেয়? ঠেলাটা বোঝো এবার। ভুটান-অরেঞ্জ এসেছে ফুন্টসোলিং থেকে।

পুতন ভাবে, এ সব গর্ভ-টর্ভর ঝামেলা না হলেই হল। "চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা, যদি না পড় ধরা।" রাজেন তাকে একদিনে অনেকই শিখিয়েছে। রোজ সন্ধেবেলা মংলুকে দিয়ে দিশি মদ আনিয়ে খাচ্ছে পুতনের কোয়ার্টারে বসে, দুজনে।

আজকের ভুটান অরেঞ্জই গোলটা বাধাল।

সিগারেটে বড় বড় টান দিতে দিতে রাজেন বলেছিল, ছাড় তো গুরু। ছাড়, ছাড়! আমার হাতে নতুন পাখি পড়লে এমন বুলি শেখাব না, যে বাকি জীবন শুধু এ ছাদ ও ছাদ, ও ডাল সে ডাল করে উড়ে বেড়াবে, খুঁটে খাবে। সে পাখি আর কোনো ছা-পোষা কেরানির ঘরে পোষই মানবে না।

খারাপ যে লাগে, তাও নয়। যদিও এক নিষিদ্ধ, অনাঘ্রাত, অদেখা অজানা জগৎ তার চোখের সামনে দিয়ে শীতের দুপুরের মন্থরগতি দারাজ সাপের মতোই যেন ধীরে ধীরে চলে যায়, জলপাই গাছের ছায়ায় ছায়ায়।

পুতন, ম্যানেজারবাবুর বাংলো থেকে নিজের কোয়ার্টারের দিকে ফিরে যেতে যেতে ভাবছিল এত সব কথা। বাগানের চা-গাছে ছায়া-দেওয়া, বড় বড় রেইনট্রির মতন গাছগুলোর ছায়া নেমেছে, ঘন হয়ে। কী নাম গাছগুলোর? কে জানে! দূরে, তিস্তার ফিকে-গেরুয়া চর দেখা যাচ্ছে। তার ওপাশে তরাই-এর জঙ্গলের রোমশ বাইসনদের প্রকাণ্ড এক দলের মতো হিমালয় পর্বতশ্রেণি কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে আদিগন্ত ছড়িয়ে আছে। বেলা পড়ে আসছে। পাখিরা ঘরে ফিরছে। দুটি বড় ধনেশ হাওয়ায় ডানা-ভাসিয়ে দিয়ে সূর্যের দিকে চলেছে, নিষ্কম্প। গ্লাইডিং করে।

ভালো যেমন লাগে, আবার মনটা খারাপও যে লাগে না, তাও নয়।

শিলি মেয়েটা পুতনকে সত্যিই ভালোবাসত। সবচেয়ে বড় কথা, পুতনের মা কিরণশশী, শিলিকে খুবই ভালোবাসেন। মায়ের খুবই ইচ্ছে যে, সে বিয়ে করে শিলিকে।

কিন্তু মা কি জানেন? কী জানেন মা? কতটুকু জানেন এই পৃথিবীর? এই ব্যাবসার জগতের ক্রিয়াকাণ্ডর? উন্নতির সিঁড়ির কথা?

তাছাড়া, মা আর কতদিনই বা বাঁচবেন? অলকাকে বিয়ে করলে ম্যানেজারবাবুর আত্মীয়া সে, তাকে নিয়ে গিয়ে কুমারগঞ্জ-এর ভাঙা বাড়িতে রাখা যে আদৌ যায় না, এ-কথা মাকে সহজেই বোঝানো যাবে। কানাঘুষো শুনছে এখানে যে, আরও একটি বাগান নাকি নিচ্ছেন ওদের মালিক, ভুটানের বর্ডারে। মালিকের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি মানে, তাদেরও সমৃদ্ধি। এসব কথা জেনে, মালিকের কুৎসিত, বদমাইস-বদমাইস মুখখানিকেও বড় সুন্দর, অপাপবিদ্ধ বলে মনে হয় তার দু-চোখে।

সংসারে টাকার মতো সুগন্ধি, এমন সুন্দর মুখোশ আর কিছুই নেই বোধহয়!

নতুন বাগান নেওয়া হলে, পুতনকে নাকি সেই বাগানে প্রমোশন দিয়ে পাঠানো হবে। বেশি মাইনে, ভালো কোয়ার্টার, স্কুটার।

একটা জিনিসই শুধু খারাপ। বুনো হাতির বড় অত্যাচারের কথা শোনে ভুটানের কাছে। তা, পয়সা রোজগার করতে হলেই মালিকের লাথির মতো হাতির লাথিও খেতে হবে বই কী। শিলিকেও তুলে দিতে হবে রাজেনের হাতে। বিড়ালকে কবুতর সাপ্লাই করতে হবে। পয়সা রোজগার আর অর্ডার-সাপ্লাই ব্যাপারগুলো একেবারেই জড়িয়ে-মড়িয়ে গেছে। পুতনের নিজের চরিত্রটা অবশ্য ফারস্ট-ক্লাস। অকলঙ্ক সে। থাকবেও তা।

পুতন বোঝে যে, সে বদলে গেছে। প্রতিদিন বদলে যাচ্ছে। গ্রাম থেকে কাশফুলের গন্ধে নাক আর ঘুঘুর ডাকে কান ভরে নিয়ে যে সরল, অল্পে-সন্তুষ্ট, সৎ, গ্রাম্য ছেলেটি একদিন কলকাতা গেছিল, সে আর বেঁচে নেই। সে অনেকদিন আগেই মরে গেছে।

যে-ছেলেটি একদিন এই চা-বাগানে এসেছিল, এম-কম পরীক্ষায় ফারস্ট-ক্লাস পেয়ে, ভবিষ্যৎ-এর অনেক সোজা সরল সুখের স্বপ্ন বুকে করে, সেও বদলে গেছে অনেকই।

পুতন এতদিনে বুঝেছে যে, দুরকম ভাবে বেঁচে থাকা যায় জীবনে। এক, ম্যাদামারা, ল্যাজে-গোবরে; থিতু হয়ে বাঁচা। অন্য: উচ্চাশা, চাহিদা এবং নিত্য নতুন প্রাপ্তি নিয়ে দৌড়তে দৌড়তে ক্রমাগত নিজেকে বদলাতে বদলাতে বাঁচা। ও ম্যাদামারা জীবন চায় না। যেহেতু চায় না, তাই স্বাভাবিক কারণে প্রত্যেকদিনই সেই পুরনো পুতনের মনের চেহারাটা একটু একটু করে বদলে যাচ্ছে।

বুঝতে পারে ও।

বাগানের কাজে একবার শিলিগুড়ি যেতে হয়েছিল ছুটি থেকে ফিরেই। নর্থবেঙ্গল ট্রাক্টর অ্যান্ড ফার্ম মেশিনারি থেকে তারা এবং আশেপাশের অনেক বাগানেই ম্যাসী-ফার্গুসন ট্রাক্টর কিনেছিল। ট্রাক্টর রিপেয়ার করার জন্যে শিলিগুড়ি থেকে মিস্ত্রি আনতে পাঠিয়ে ছিলেন ম্যানেজারবাবু।

ট্রাক্টর কোম্পানি এবং নর্থবেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানির মালিকের সঙ্গে সেভক রোডের কনস্ট্রাকশন নিয়ে ব্যস্ত থাকায় সকালে দেখাই হল না। ওঁদের হিলকার্ট রোডের দোকান থেকে পুতনকে ওঁদের মোটাসোটা কর্মচারী রতনবাবু বললেন যে, বিকেলে আসতে। সেই নেপালি ভদ্রলোকও ছিলেন না। থাপা, না কী যেন নাম।

জিপের ড্রাইভার ঘুঘা বলল, চলেন যাই পুতনবাবু, ধুলাবাড়ি থিক্যা ঘুইরা আসি। ট্রাক্টর এখানেই আনন লাগব, যদি তাগো্যো মেকানিক শ্যাষ পর্যন্ত যাইতে নাইই পারে।

ধুলাবাড়ি? সেখানে কী?

অবাক হয়ে বলেছিল, পুতন।

আরে! ধুলাবাড়ির নাম শোনেন নাই? আপনারে নিয়া হত্যেই চলে না। নেপালের বর্ডার। পৃথিবীর সব জিনিস পাইবেন সেইখানে। একবার দেইখ্যা আইলে এক্কেরে চক্ষু সার্থক। লাইফ কারে কয়, চলেন, দেখাইমুনানে আপনারে।

ধুলাবাড়িতে যেতে হয় নকশালবাড়ির উপর দিয়ে।

দারুণ অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্স।

এক জায়গার নামের সঙ্গে কিছু আদর্শবাদী বিপ্লবীর নাম জ্বলজ্বল করে, আর অন্য জায়গায়, চোরা-চালানের মোচ্ছব। প্রয়োজনীয় এবং একেবারেই অপ্রয়োজনীয় সব বিলাসেরই মোচ্ছব সেখানে।

তবে, গিয়ে চক্ষু সার্থক হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু তার সঙ্গে প্রচণ্ড এক জ্বালা অনুভব করেছিল চোখে, গলায়, শরীরের সর্বত্র। টাগরা শুকিয়ে উঠেছিল। এত্ত জিনিস? একজন মানুষের সুখী হয়ে বাঁচতে এত্ত লাগে? এত জামা, গেঞ্জী, ট্রানজিস্টার হেয়ার-ড্রায়ার; রেকর্ড-প্লেয়ার, টি.ভি. ছোট-বড়

সাদা-কালো, রঙিন; বাজনা, ক্যালকুলেটর কার্পেট-ক্লিনার, পারফ্যুম, নানা দেশের নানারকম কায়দার দাড়ি-কামানোর সরঞ্জাম!

শালার দাড়িকামানোরও যে এত কায়দা ছিল তা ভাবনারও বাইরে ছিল।

মেয়েদের বডিস। প্যান্টি না কী বলে, কতরকম সাইজের।

কত-রঙা বোতলে বিলাইতি মদ। টাইপ-রাইটার। মায় কম্প্যুটার পর্যন্ত।

জীবনে একজন মানুষের বেঁচে থাকতে হলে যে এত জিনিসের প্রয়োজন হয় বা আদৌ হতে পারে সে কথা কি হালার পুতন সরকার বাপের জন্মে কোনোদিনও ভাইব্যাছিল? এমন কইর‍্যা বাঁচনের নামই বোধহয় বাঁইচা থাকা। এইসব দ্যাখনের পর সকাল-বিকাল দুগা ডাইল-ভাইত খাইয়া লুঙি পইরা চৌকির উপর পাটি-বিছাইয়া শুইয়া থাইক্যা আর শিলির মতো একডা মাইয়ারে বউ কইরা আদর-টাদর, হুম-হাম্ দুচারখানা চুমু-চামা খাইয়া খাওয়াইয়া, ছাওয়াল-পাওয়াল লইয়া ল্যাজেগোবরে বাইচা থাকনের কথা আর ভাবনই যায় না। পিসারে পিসা! এ কি বাঁচনের আয়োজন কও তো দেহি। দুসস্ শালা।

ড্রাইভার ঘুঘা আর পুতনকে দোকানি চা খাওয়াল।

সার-সার দোকান ধুলাবাড়িতে। সবই মারোয়াড়িদের।

বাঙালি রিফিউজি মাইয়াগুলান, নানা বয়সি, খাড়াইয়া আছে। ওরাই নাকি জঙ্গলের মধ্য দিয়া নদী পারাইয়া স্মাগল্-কইর‍্যা ন্যাপাল থিক্যা মাল লইয়া গিয়া শিলিগুড়িতে পৌঁছাইয়া দিয়া আসে। দামের উপর ক্যারিং চার্জ একটা লইয়া লয় দুকানিরা। মাইয়াগুলান নাকি রাতে-রাতেই আসে। চেকপোস্টে ঘুষঘাষ তো দ্যাওনই লাগে। আরও যে কী কী দ্যাওন লাগে, তা জানে কেডায়? সব হালার গরমেণ্টই সমান। জ্যোতিবাবুদের অনেকেই আশা কইর‍্যা ভোট দিছিল এই মাইয়াগুলানও। তা হইলডা কী? যে তিমিরে, হেই তিমিরেই। বাঙালি বইল্যা যে একটা জাত আছে, ছিল কখনো; তাইই কইলকাতা বা শিলিগুড়ি দেইখ্যা বোঝনের উপায় পর্যন্ত নাই। ছ্যাঃ। বড় দুঃখে বুক ফাটে পুতনের। দুঃখ যখন হয়।

শোনলা কি তোমরা? পুতনেরও দুঃখ হয়।

মৃগেন কইতাছিল, আসানসোল, দুর্গাপুর, রানীগঞ্জেরও নাকি হেইরকমই হাল।

যাউকগা। পুতন তো আর ব্যাঙ্গলে স্যাটল করে নাই। বাঙালির প্রবলেম ব্যাঙ্গলের গভর্নমেন্টে বুঝুকানে। তারা তো এহনে আসামের মানুষ। যতদিন না খেদাইতাছে। বাঙালির না আছে জায়গা ব্যাঙ্গলে, না ব্যাঙ্গলের আউটসাইডে। পার্টিশান আর দিল্লীর কর্তারা মিল্যা ব্যাঙ্গলিদের একেরে মাইরা থুইছে না হালায়।

কী খিট্ক্যাল কী খিট্ক্যাল।

পুতন কী আর কিনবে?

একখানা চাইনিজ কলম, একবোতল রাশিয়ার সস্তা মদ। সাদা জলের মতো। তাই কিনল। এ হালায় আবার কী মদ কেডায় জানে? পেরছাপ না মদ, বোঝাই যায় না। আর একটা আমেরিকান লাল ব্যাঙ্গলনের গেঞ্জী, মাইনা পাছিল গতকাল। তার উপরে ঘুঘার কাছ থিকা ধারও নিল। হালার ধুলাবাড়িতে আইস্যা তো লাভের মধ্যে এই হইল। দুসস্ শালা।

ঘুঘা জিপটা ইন্ডিয়ার দিকে ঘুরিয়ে বলল, ক্যামন দ্যাখলেন, তাই কয়েন পুতনবাবু?

কইস নারে। তুই আমার হকল হব্বোনাশ কইরা ফ্যালাইলি। আর ক্যা?

ঘুঘা, একটা বিলিতি সিগারেটে অমিতাভ বচ্চনের মতো দেশলাই ঠুকে বলল, ইটারেই লাইফ

কয়। বোঝলেন, পুতনবাবু? লাইফ ইটারেই কয়। লাইফ ইনজয় করতে ব্যাশি কিছুর পেয়োজন নাই, বোঝলেন না, অনলি মানি। সবই চাই। বাই হুক্কো অর বাই কুরোক্কো।

পুতন বুঝল যে, কথাটা বাই হুক আর বাই ক্রুক।

বাবার জ্বরটা দুপুরের দিকে কমেছে একটু।

তিনটে নাগাদ বাবা বললেন, পরেশ কি আইছে রে শিলি?

না, এহনে কী? তার আইতে আইতে পরশু হইয়া যাইব গিয়া।

পরশু! কইস কী তুই? গেছে কোনদিকে?

কইয়া তো গেল, যমদুয়ার। সে কি ইখানে। হইবনা পরশু?

শিলি বলল।

যমদুয়ার?

হ।

নরেশবাবু কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

কাল রাতে গভীর জ্বরের মধ্যে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি যমের বাড়ি যাচ্ছেন। মস্ত একটা তোরণ। কোনো ফুল-টুল দিয়ে সাজানো নয়, রঙিন কাগজ বা কাপড়ের টুকরো দিয়ে সাজানোও হয়নি তা। জায়গাটাও ন্যাড়া সুনসান। একটা গাছ পর্যন্ত নেই। নদী নেই, ফুল নেই; শিশু নেই কোনো, সেই দেশে। সেই মস্ত তোরণটা করা হয়েছে বাজে পোড়া একটা মস্ত শিমুল গাছ দিয়ে। সেই তোরণের কাছে কোনো পাহারাও নেই। ভিতরে একরকমই দেখতে, একই ডিজাইনের সার সার একতলা কালো রঙা বাড়ি আছে। তাদের দরজা জানালা ছাই-রঙা। এবং প্রতিটি দরজা জানালা হাট করে খোলা। সোঁ সোঁ করে হাওয়া বইছে বাড়িগুলোর মধ্যে দিয়ে সমুদ্রপারের মতন অথচ দরজা জানালাগুলোতে একটুও শব্দ উঠছে না। উঠছে না তা নয়, উঠছে মাঝে মাঝে, রোগীর শেষ নিঃশ্বাসের মতন। আর মনে হচ্ছে কানের কাছে, ঘাড়ের কাছে, কে যেন ডাকছে, ক্রমাগত; ডেকেই যাচ্ছে, আয়! আয়! আয়! কিন্তু কোনো মানুষ নেই। কালো কালো বাড়ি।

গা ছম্ ছম্ করে উঠল নরেশবাবুর।

স্বগতোক্তির মতো আবারও শিলিকে বললেন, যমদুয়ার! সে তো মেলাই দূর রে। কী রে শিলি।

হ! দূরই তো! তবে ঠিক কতখানি দূর তা আমি জানুম কেমনে? মাইয়ারা ত আর শিকারে যায় না।

তা ঠিকই কইছস! কিন্তু মহারানি, রাজকুমারী, ম্যামেরা যায়।

পরেশবাবু বললেন।

অনেকই পুরানো কথা মনে পড়ে নরেশবাবুর। দমকে দমকে, বমির মতন অনেক পুরনো কথা বাইরে আসতে লাগল। কত রঙা সব জিনিস তার সঙ্গে। কোথায় যে ছিল তারা এতদিন স্মৃতির কোন কুঠুরির কোন কোণে, ভেবে অবাক হয়ে গেলেন জ্বরক্লিষ্ট নরেশবাবু। শিলি, তার বাবার মুখের দিকে চেয়ে উৎকণ্ঠিত গলাতে বলল, বমি করবা নাকি?

নরেশবাবু বললেন না, না।

মনে মনে বললেন, এই বমি অন্য বমি। তুই বুঝবি না রে ছেমড়ি।

অনেকদিন আগে, পার্টিশানের পরপরই একবার তিনিও গেছিলেন যমদুয়ারে শিকারে। হ্যাঁ। তিনিও।

মনে পড়ে গেল।

তবে শিকারি হিসেবে নয়। সঙ্গেই পাউরুটি মাখন আর কলা নিয়ে। ডিম সেদ্ধও। ওই ডিমেই নাকি বিপদ ডেকে এনেছিল। ডিম আর কলা নিয়ে শিকারে গেলেই যাত্রা পণ্ড।

কোকরাঝাড়ের গনা ঘোষের একটা বেবি অস্টিন গাড়ি ছিল। কারখানাও ছিল তাঁর। বলিষ্ঠ দীর্ঘদেহী ধবধবে ফর্সা সাহেবের মতন মানুষ। নীলরঙা লুঙি পরে, লাল হাফহাতা শার্ট গায়ে দিয়ে একটা মোড়ায় বসে কারখানার তদারকি করতেন। তাঁর কাজে তাঁকে সাহায্য করত তার বড় চার ছেলে। ছোট ছেলেও ছিল। আরও পাঁচটি। আর পাঁচ মিশেলি বয়সের আটটি মেয়েও। ওঁরা উদ্বাস্তু নন। কলকাতার হাওড়া জেলার লোক। অদ্ভুত ভাষায় কথা বলতেন। উঠোনকে বলতেন "বাকুল"। নীচোকে বলতেন "নাবো"। এইরকম। কত কথাই যে মনে পড়ে শুয়ে শুয়ে নরেশবাবুর আজকাল। এসব কথা মানুষ যতদিন কর্মঠ থাকে, কাজের মধ্যে থাকে, ততদিন মনে আসেনা, নিষ্কর্মা হয়ে গেলেই চৌকির অগণ্য ছারপোকার মতো কুটুস কুটুস কামড়াতে থাকে স্মৃতি, অনুক্ষণ।

সেই গনাবাবু, কলকাতার মনাবাবু, বৈদ্য, আর কে কে যেন ছিল। মনাবাবুর এক বন্ধুও ছিলেন। অজিত সিং। একটা রাইফেল নিয়ে এসেছিলেন তিনি।

মনাবাবুরা কলকাতা থেকে গৌরীপুরে এসেছিলেন সেখানে সকলে জমায়েত হয়ে এই পথ দিয়েই যমদুয়ারে যাবার সময়ে নরেশবাবুকে তুলে নিয়ে গেছিলেন। শীতকাল ছিল। মনে আছে। আর শীত কী শীত!

জীবনে সেই প্রথম রাইফেল দেখেন নরেশবাবু।

তামাহাট থেকে বড়বাধা, গুমা রেঞ্জ হয়ে, কচুগাঁও রাইমানা হয়ে যমদুয়ার। যমদুয়ারে পৌঁছবার আগেই সন্ধে হয়ে গেল আর হাতির পালে ঘিরে ফেলল সেই বেবি-অস্টিন গাড়ি। কী খিট্‌ক্যাল! কী খিট্‌ক্যাল! যমদুয়ার, সে তো ভারী গহন জঙ্গল। একপাশে বাংলার ডুয়ার্স, অন্যপাশে ভুটান। মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে সংকোশ নদী। বড় বাঘ, হাতি, বাইসন, চিতা, কোনো জানোয়ার নেই সেখানে?

সম্বিৎ ফিরে পেয়ে যেন বললেন পরেশবাবু, কইস কী রে শিলি? যমদুয়ারে গ্যাছে পরেশ?

হ্যাঁ।

সঙ্গে গেল কেডায় কেডায়?

ধুবড়ি থিক্যা আইছিল, শিকারিরা। বড় শিকারি। ভয় নাই তোমার। ছাত্তার চাচায়ও সঙ্গে গ্যাছে। এক সাহেবও আছে নাহি কইতাছিল কাকায়।

ভয় নাই? কস কী? ভয় তো হের লইগ্যাই। ছাত্তারটা না করতি পারে এমন কামই নাই। তার বাবারেও বাঘে খাইছে। অরেও খাইব। পরেশরে ক্যান যে এই মরণের নেশায় পাইল! কত নেশাই ত মানুষে করে। কিন্তু এ কি গরিবগো ন্যাশা? রাজা-রাজড়া, জমিদার; যাগো অন্নচিন্তা নাই, তাগো হ্যাই সব মানায়। না করে রোজগার, না করল বিয়া, ইটা কী?

একটু পরই বাবা বললেন, দুগা মুড়ি ভাইজা দে দেহি। তেল দিবার লাগব না। আর এট্টু পিঁয়াজ। কাঁঠালের বিচি ভাইজা দিবি নাহি এট্টু?

না না। কাঁঠালের বিচি খাইয়া কাম নাই। এত জ্বর। প্যাটের গোলমাল বাধাইবা আবার জ্বরের উপরে। আমি পড়ুম বিপদে।

যা ভালো বোঝস্ তুই। তবে, কাল আমার জ্বর ছাইড়া যাইব। মন কইতাছে। এতক্ষণ তো আবারও কম্প দিয়া জ্বর আসনের কথা ছিল। আইল না যহন, তহন, ছাইড়্যাই যাইব গিয়া। এই শৈলেনের ভাইডা, আমাগো ডাক্তার খুব ভালো। গদাই-এর বাপে তারে যাইই কউক না ক্যান্!

বাবাকে একটু আদার রস দিয়ে গরম চা আর মুড়ি-ভাজা খাইয়ে, জ্বরটা আরেকবার দেখে ক্যাবলাকে

বাবার কাছে রেখে, গা ধুয়ে নিল শিলি। তারপর চলল পুতনদাদের বাড়ি। ভাবছে, রাতে একটু সুজির খিচুড়ি রেঁধে দেবে। অথবা সাবুর। কয়েকটা আলু আর পটল ফেলে। আদা-কাঁচালঙ্কা দিয়ে। মসুর ডালের। বাবাকেও দেবে একটু। বুধাই গাইয়ের ঘি তো আছেই। অনেক ঘি খেয়েছে, দুধ খেয়েছে ছোটবেলা থেকে শিলি। কিন্তু বুধাই-এর দুধের যেমন গন্ধ, তেমনি ঘি-এর। এমন লক্ষ্মী আর মিষ্টি গাই কখনো দেখেনি। তেমন মিষ্টি হয়েছে বাছুরটা।

পুঁচকি।

নামটা দিয়েছে, শিলিই।

পুতনদাদের বাড়ি বড় রাস্তা দিয়ে গেল না। সেনদের বাড়ির পাশ দিয়ে আলোকঝারি পাহাড়ের দিকে মুখ করা পথটা ধরল ও।

এই শেষ বিকেলের এই সময়টা বড় প্রিয় সময় শিলির। পৃথিবী কেমন যেন নরম বিবাগী হয়ে যায় এই সময়টাতে। দিনের অন্য সময়ে যা-কিছুই সে নামঞ্জুর করত, গররাজি নারীর মতন, এই সময়ে সেইসব আর্জিও সহজে মঞ্জুর করে দেয়। মৈজুদ্দিন চাচার সন্ধ্যার নামাজের মতো এক বিষণ্ণ সুর বাজে এই শেষ বিকেলের আলোয়। সজনে গাছের ফিনফিনে পাতাদের গায়ে শিহর তুলে উড়ে যায় দুর্গা টুনটুনি। বাঁশঝাড়ের ছায়ায় ছায়ায় নেংচে হেঁটে যায় মস্ত লম্বা লেজ নিয়ে, ছায়াচ্ছন্ন বনের ছায়া ঝাঁট দিয়ে; সেই একলা, মস্ত বড় বাদামি কালো পাখিটা।

পরেশকাকু একদিন বলেছিল এর ইংরিজি নাম, ক্রো-ফেজেন্ট। গতবছর। হিতুকাকু আসত প্রায়ই তামাহাট থেকে। অনেক পাখি আর ফুল চিনত সে। পুতনদাটা চিরদিনই কাঠকাঠ। যে সব ছেলেরা আই-কম-বি-কম পড়ে, তারা বেশিরভাগই ওরকম হয়। কেন, কে জানে? আর যারা খাতা-টাতা লেখে, মুহুরি আর অ্যাকাউনট্যান্ট; তারা তো যাচ্ছেতাই। নস্যি নেয়। গোমড়ামুখো। নাকে একটা নিকেলের ফ্রেমের চশমা থাকবেই। কথাবার্তা কারও সঙ্গেই নেই। খালি বলবে; জাবদা, খতিয়ান, হরজাই খাতে, নাজাই খাতে; এই সব।

শিলি এইসব জানে, কারণ শিলির ছোটমামা মুহুরি ছিলেন। এখন ধুবড়ির এক মহাজনের কাছে কাজ করেন। টাউন স্টোর্স-এর শচীন রায়দের কাছেও কাজ করেছিলেন কিছুদিন। ধুবড়ি শহরে।

শিলি যখন গিয়ে পৌঁছল, তখন কিরণশশী রান্না ঘরের দাওয়ায় বসে চালতা মাখছিলেন। শিলিকে দেখেই বললেন, আইছস? তর লইগ্যাই মাখতাছিলাম। তর বাবায় কেমন?

বাবা এহনে ভালো। মনে হইতাছে জ্বর একেরেই ছাইড়া যাইব গিয়া কাইলই সকাল লাগাদ।

যা তো! রান্নাঘর থিক্যা দুইটা রেকাবি লইয়া আয় ত শিলি।

শিলি, রেকাবি এনে বলল, পিতলের উপর টক থুইব্যা? খারাপ হইয়া যাইব না?

তুইও য্যামন্। তরে পিতলের রেকাবি আনতে কইল কেডায়! পাথরেরডা আন।

শিলি, ঘরের ভিতর থেকে বলল, শ্বেতপাথরের, না লালপাথরের না কালাপাথরের? কোন পাথরের? কোন পাথরের আনুম তা ত কইবা?

নছল্লা থো তো তোর ছেমড়ি! পলকে লইয়া আয়।

শিলি একটু চালতা-মাখা মুখে দিয়েই চোখ মুখ নাচিয়ে জিভটা টাগরাতে ঠেকিয়ে বলল, উ-উ-উ-উ-ম্-ম্-ম্! বুড়ি তোমার মতন ত কাউরেই দ্যাখলাম না আইজ অবধি। সত্যই কই। চালতা, কাঁচা লঙ্কা, এট্টু লবণ, এট্টু কাঁচা মরিচ, এট্টু চিনি আর বেশি কইর‍্যা ধইনাপাতা। আহা স্বোয়াদখান কী? য্যান, হাতে চাঁদ পাইছি। এমন স্বোয়াদ পিরথীবির আর কিছুতেই নাই। কী ভালোই যে লাগে না বুড়ি।

কিরণশশী, শিলির অপাপবিদ্ধ মুখের দিকে চেয়ে মনে মনে বললেন, চালতা-মাখার চেয়েও

অনেক স্বাদু জিনিস এই পৃথিবীতে আছে। কত কী পাগল করা অনুভূতি! এমন এমন মুহূর্ত, যখন মনে হয় জীবনের সব শত্রুকে নিঃশর্তে ক্ষমা করে দিই। ওতো জানেনা সে সব! জানবে, বিয়ের জল গায়ে পড়লে।

তারপর নিজের মনেই না-বলে বললেন, জীবনভর তো আনন্দই। দুঃখ কতটুকু? এই চালতা-মাখার স্বাদেরই মতো টক্-টক্ মিষ্টি-মিষ্টি, ঝাল-ঝাল এই জীবন। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত।

লোকে জানে, বিধবা, একা, কিরণশশীর অনেকই দুঃখ। যারা তা জানে, তারা কিছুই জানে না। সুখ তাঁর চারধারেই ছড়ানো আছে। ঝরাপাতার মতো, মিষ্টি ধুলোর মতো; বাড়ি ফেরা গাইয়ের গায়ের মিষ্টি গন্ধরই মতো সুখ ভেসে বেড়াচ্ছে চারপাশে। শুধু তাকে চিনে নেওয়া চাই। মুহূর্তগুলোকে শুধু হারিয়ে যেতে দিতে নেই।

এসব গভীর কথা শিলি কী করে বুঝবে? ও তো ধুলোর মধ্যে ঘর-বানানোর খেলায় মেতে-থাকা চঞ্চল ছটফটে দুরন্ত চড়াই। যে ঘর বানায়নি, ঘরে থাকেনি কখনো, সেই মেয়েই কল্পনার ধুলোয় ঘর বানিয়ে এমন ছটফট করে। ধুলাবাড়ি। বাড়ি নয়। বেচারি জানবেই বা কী করে! এক একটি করে বছর হারিয়ে, শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব পেরিয়ে পায়ে পায়ে হেঁটে এসে বার্ধক্যে পৌঁছে, জীবনের পিছনে ফেলে আসা পথের ধুলোয়। মানুষ যা-কিছুই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আসে, হারিয়ে আসে, নিয়েও আসে; তার নামই তো জীবন। অভিজ্ঞতার আরেক নামই জীবন। যা বয়স হারিয়ে পাওয়া যায়, তা কি বয়স না-হারিয়ে কখনোই পাওয়া যায়?

শিলিকে বসিয়ে, রান্নাঘরের দাওয়ায় পা-ঝুলিয়ে বসে চালতা-মাখা খাওয়া শিলির খুশিমুখের দিয়ে চেয়ে, ক্ষণিকের জন্যে নিজের প্রথম যৌবনে ফিরে যান কিরণশশী। শিলির বয়সে। তাঁর ফোকলা মুখে হাসি ফুটে ওঠে। কুঁচকে-যাওয়া, কালিপড়া চোখ দু'খানিতে এক প্রসন্ন কৌতুক ভোরের প্রথম আলো পড়া শিশির বিন্দুর মতো ঝিক্‌মিক্ করে ওঠে।

শিলি মুখ ঘুরিয়ে, কনে-দেখা আলোয় কিরণশশীর মুখের হাসি দেখে। প্রথমে অবাক হয়। তারপর গম্ভীর হয়ে যায়। পরক্ষণেই নিজেও হেসে ফেলে।

বলে, মরণ। হাসো ক্যান মিটমিটাইয়া? ও বুড়ি?

বুড়ি আবারও হাসেন।

আরে! কইবা তো! এত হাসনের হইলডা কী?

তরে দেহি আর হাসি।

না। হাসবা না। কইয়া দিলাম।

ক্যান্? হাসির উপরও ট্যাক্সো চাপছে না কি?

তারপর দু'জনেই আবার হেসে ওঠে।

হাসতে হাসতে, শিলির আঁচল লুটিয়ে পড়ে বারান্দার দাওয়ায়।

এমন করে আগল খুলে, নিভৃতে দু'জন নারীই শুধু হাসতে পারে।

উঠোনের কোণা অবধি এগিয়ে-আসা একটা কাঠবেড়ালি হাসির শব্দে ভয় পেয়ে তরতরিয়ে সুপুরি গাছের উপরে উঠে যায়। গাছের অনেকখানি উপরে উঠে, লেজ তুলে তুলে শিহরভরে ডাকে, চিঁহর-চিঁহর-চিরিপ্-চিরিপ্-চিরিপ্। আর ঠিক সেই সময়ই গৌরীপুর থেকে আসা বিকেলের বাসটা তামাহাটের দিকে চলে যায় পঁক পঁক করে বাল্‌ব-হর্ন বাজিয়ে।

সন্ধে হল।

পুতনদাদাদের বাড়ির মোতি গাই ডাকে গোয়ালঘর থেকে, হাম্বা-আ-আ-আ। লিচু গাছের ডাল

ছেড়ে বাদুড়েরা পা-আলগা করে ভেসে যায়। অন্ধকারে মিশে যায় তাদের ডানায় সপ্ সপ্ সপ্ সপ্ শব্দ।

রমজান মিঞার ছোট ছাওয়ালটা সারাদিন শুকিয়ে-যাওয়া চৈত্রের পুকুরে পোলো দিয়ে দিয়ে কই-সিঙ্গি মাছ ধরে। দিনশেষে আব্বাসউদ্দিনের গান গাইতে গাইতে পুতনদের বাড়ির দিকে আসতে থাকে। গলা ছেড়ে গান গায় সে: বগা কান্দেরে, তোর্ষানদীর পারে পারে, ফান্দে পইড়্যা বগা কান্দেরে...

চৈত্র শেষের সন্ধ্যার কাঁসারঙা আলোয়, শ্যাওড়া গাছের গন্ধ, বাছুরের গায়ের গন্ধ, হাসনুহানার গন্ধ, সদ্য-চেরাই-করা হরজাই কাঠের মিষ্টি গন্ধের মধ্যে, 'া-মাথাময় পুকুরের পুরনো কাদা আর শামুক-গুগলির, কই-সিঙ্গির আর গুঁড়িগুঁড়ি শ্যাওলার গন্ধ গায়ে মেখে আলিমুদ্দিন এসে দাঁড়ায় উঠোনে।

বলে, ফুফা, একখান সানকি দাও দেহি। শিলিদিদিরে মাছ দিয়া যাই কয়খান।

শিলি হাসে।

বলে, খুব যে পেরেম দেহি রে ছ্যামড়া। কাইলকা সক্কালে আইস্যা, টাহা কয়ডা চাইবি তা ক' দেহি আগে?

আলিমুদ্দিন হাসে?

মিষ্টি ছেলেটা। বলে, টাহাই কি দুনিয়ায় সব শিলিদিদি? তুমি একবার হাইস্যা দিও তাইলেই হইব। দাম নিম্যু না। পেরেমটা চিনলানা, টাহাই চিনলা শুধু। তোমাব কপালে পেরেম লাই।

তবে রে ছ্যামড়া।

কপট-ক্রোধে শিলি তেড়ে যায় আলিমুদ্দিনের দিকে।

হাসতে হাসতে, কপট ভয়ে, আলিমুদ্দিন পিছিয়ে যায়।

মাছ ঢেলে দিতে দিতে বলে, দাম নিমু না। হত্যই কইতাছি শিলিদিদি। একদিন আইমু অনে পুতনদা আইলে পর। গান শুনাইও দিদি একখান, পূর্ণিমার রাতে, বারান্দায় বইস্যা। আহা! গান তো গাওনা তুমি, মনে হয় গঙ্গাধরে পূর্ণিমার রাইতে পাল তুইল্যা নৌকা ভাইস্যা যাইতাছে গিয়া। পরাণের মধ্যেটা কেমন কেমন করে যান।

শিলি আর কিরণশশী বলেন, যাত্রায় পার্ট করস না ক্যান তুই? গান তুইও তো খারাপ গাস না রে ছ্যামড়া।

আলিমুদ্দিন হাসে। বলে, মোক নেয় কেডায়, তাই কও। আলিমুদ্দিন তোমাদের গান শুনাইতে পারলেই সুখী। আর কিসুর লোভ নাই।

তারপরে বলে, গান তো গায় ফুফা সব পাখিতেই। কোকিল কি সবাই হইতে পারে? কও দেহি? আমাগো শিলিদিদি হইতাছে কুমারগঞ্জের কোকিল।

হইছে। ফাইজলামি রাইখ্যা এখন বাড়ি যাইয়া ধোয়াপাকলা কইরা চান কইর‍্যা ফ্যালা। রাত হইয়া গেল। এতক্ষণ, কী মাছ ধরতাছিলি তুই?

হঃ। হুদাই মাছ? এক একবার পোলো ফ্যালাই, পোলোর মধ্যে হাতটারে ফেরাই আর কত কী ভাবি। ভাবি, আমার বেহেস্ত আর দোজখ্ দুইই আছে এই পোলোর মধ্যেই। কোনটারে ফ্যালাই আর কোনটারে উঠাই? বাস এই করতা করতাই দিল এক ব্যাটা সাপে কামড় দিয়া।

সাপ?

শিলি চমকে উঠল।

তারপর?

কিরণশশী বললেন।

কী সাপ?

শিলি উৎকণ্ঠিত হয়ে শুধোল।

কিরণশশী আবার বললেন, তারপর? তারপর আর কী? দোজ্‌খে যে হাত দিছি বোঝাই গেল তা।

বলেই, ফুলে-যাওয়া হাতটা তুলে দেখিয়ে বলল, ত্যামন সাপ হইলে তো কামই সারত যাইত গিয়া এতক্ষণে।

তারপর স্বগতোক্তির মতন বলল, জল-ঢোঁড়াই হইব।

বলেই বলল, মাছগুলান লইয়া লও ফুফা। যামু এবার। কাদায় চিড়বিড় করতাছে গা।

সাবধানে যাইসানে ভাইডি। বাঁশবাগানের তলায়ও একজোড়া গোখরার বাসা আছে। জানস তো?

জানি জানি। বুকের মধ্যে কত গোখরার ছোবল খাই, গোখরারে আম্মি ডরাই না।

বুকের মধ্যে ছোবল? হেডা আবার কী?

শিলি বলল, অবাক হয়ে।

ক্যান। তোমার হাসি।

আলিমুদ্দিন বলল।

এইবার আমি তরে মারুম। পালা। যাইবি কিনা ক' তুই।

যাইতাছি। এই পলাইলাম।

বলেই, আলিমুদ্দিন আধো-অন্ধকারে কাদা-মাখা একটি মস্ত ভোঁদড়ের মতো দুপায়ে থপথপ করে চলে গেল।

শিলি গলা তুলে বলল, যাওন নাই রে, আসিস আলিম্ ভাই আবার।

আ-সু-ম্।

গলা তুলে বলল, আলিমুদ্দিন দূর থেকে।

তার গলার আওয়াজকে, লট্‌কাগাছের ঝুপরি পাতাগুলো অন্ধকারে কপাৎ করে গিলে ফেলল।

ওদের চালতা খাওয়া হয়ে গেছে। হোন্দলের মা এতক্ষণ হ্যারিকেন আর রান্নাঘরের লম্ফ পরিষ্কার করছিল। সব ঘরের বারান্দায়, ছাই দিয়ে কাচ মেজে, ঝকঝকে করে, হ্যারিকেন রেখে গেল।

শিলি বলল, গাছের ছায়া-ঘেরা মিটমিটে আলোতে ঘন হয়ে ওঠা উঠোনভরতি অন্ধকারে, লজ্জা লজ্জা গলায়; পুতনদার চিঠি কি আইছে? বুড়ি?

নাঃ।

কিরণশশীর দীর্ঘশ্বাস চাপা এই "না"টা অন্ধকার তারাভরা আকাশের দিকে দুটি নারীর চারটি উঁচু-করা প্রতিবাদের হাতের মতো বলে উঠল না, না, না।

দুজনের মনেই কু ডাক দিল। নীরবেই মনে মনে দুজনে বলল, দুজনের মতো করে, ও আসবে—না, ও আর আসবে না ফিরে। তাইই চিঠি লেখে না ও!

কিরণশশী বললেন, শিলিকে কাকুতি করে, তুই লিখছিলি কি অরে?

হ।

কবে?

গত মাসে।

গত মাসে। তারপর আর একবার লিখতে কী হইছিল? আঙুলে কী বাত ধরছে তর?

তা না। তোমার পোলারে তুমিই লিখবা। আমি ক্যান বারেবারে লিখুম? জবাব যে দ্যায় না, তারে লিখুমই বা ক্যান? স্যা আমার কেডা?

কিরণশশী কিছু না বলে, চুপ করে বাড়ির পশ্চিমে চেয়ে রইলেন।

আকাশে তখনও ফিকে গোলাপি আভা ছিল সামান্য। এক ঝাঁক সন্নি হাঁস কোণাকুণি উড়ে গেল। অন্ধকার নেমে এল ঝুপ করে। আলোর সামান্যতম আভাসও আর রইল না।

শিলি উঠল। বলল, যাই বুড়ি।

কিরণশশী বিড় বিড় করে, শীতের দীর্ঘরাতের আগুনের মতন বলল, যাওন নাই মাইয়া। আইস্যো।

সংকোশ নদীটা তার বরফ-গলা স্বচ্ছ জল বুকে করে দুপাশের নিবিড়, ভয়াবহ অরণ্যের মধ্যে দিয়ে বয়ে গেছে। নদী পার হলেই ভুটান। ভুটানের মহারাজা প্রতি বছরই এক দুবার হেলিকপটারে করে থিংম্পু থেকে যমদুয়ারে চলে আসেন শিকারের জন্যে। ভারতবর্ষে পাওয়া যায়, অথচ যমদুয়ারে পাওয়া যায় না, এমন প্রাণী খুব কমই আছে। হাতি, বাঘ, বাইসন, (গাউর), বুনো মোষ, চিতা, শম্বর, চিতল হরিণ, কোটরা, নানারকম সাপ, নদীর জলে দ্রুত সাঁতরে যাওয়া কালো ও লাল মাছের মস্ত মস্ত ঝাঁক, কী যে নেই এই গহন, ভয়াবহ বনে, তা খোদাই জানেন। ভাবে, আবু ছাত্তার। পাখি, নানারকম প্রজাপতি।

যমদুয়ার বাংলো থেকে মাইল দুয়েক দূরে পরেশ আর ছাত্তার সংকোশ নদীর পাশে একটি মোষের বাথানে বসেছিল।

নেপালিদের বাথান। প্রায় শ'খানেক মোষ আছে। ঘি তৈরি করে, তারা পৌঁছে দেয় ভুটানে। সংকোশের এক পারে ভুটান। আর অন্য পারে আসাম এবং পশ্চিমবাংলা।

নদীতে চান করে উঠেছে ওরা। তারপর দুপুরে ময়ূরের ঝোল আর ভাত দিয়ে ভরপেট খাওয়া দাওয়ার পর কষে ঘুম লাগিয়েছিল। রাতের বেলাতে বাথানের নেপালিদের সঙ্গেই খেয়ে নেবে। নেমন্তন্ন করেছে ওদের, নেপালি গোয়ালারা। আজই সকালে একটা কুটরা হরিণও মেরে ওদের দিয়েছিল। তারই ঝোল, মেটে-চচ্চড়ি আর ভাত খাবে রাতে। খিদেটাও বেশ চনমনে হয়েছে।

ক্যামেরন সাহেব যমদুয়ারের দোতলা বন-বাংলোতে আছেন। কলকাতা থেকে একটি পাঞ্জাবী মেয়েকে সঙ্গে করে এনেছেন উনি। বড়ঘরের মেয়ে। মহামূল্য বেশ্যা। রূপ ফেটে পড়ছে। বয়সও ত্রিশের নীচে। কিন্তু হলে কী হয়, বেশ্যারা বেশ্যাই। তাদের রকম-সকম চলন-বলন, তারা যতই সম্ভ্রান্ততা দিয়ে ঢেকে রাখুক না কেন; ঘরের বউ আর টানা মালে তফাত থাকেই।

চোখের সামনে ক্যামেরন সাহেবের ওই বেলেল্লাপনা সহ্য করতে পারে না পরেশ। জন্মেছিল বিত্তশালী পরিবারে কিন্তু ছেলেবেলাতে ভিটে-মাটি ছেড়ে চলে এসেছিল জন্মভূমি ছেড়ে, এক বস্ত্রে। "ইজ্জতের" জন্যে। যে ইজ্জতের জন্যে অনেক মূল্য দিয়েছে তারা সকলে, সেই ইজ্জতই কেনা-বেচা করছে এরা চোখের সামনে। যে দৃঢ়মূল, রক্ষণশীল মানসিকতাতে তারা মানুষ হয়েছে তাতে এই সব বড় চোখে লাগে। সহ্য করা মুশকিল হয়। অথচ প্রতিবাদও করতে পারে না। সে ক্ষমতা নেই। ফলে মনের মধ্যে সবসময়েই একটা চাপা উত্তেজনা গুমোট মেরে থাকে। দমবন্ধ লাগে। অমন উদার খোলামেলা পরিবেশেও নিশ্বাস নিতে পারে না যেন।

আবু ছাত্তার বড় স্থিতপ্রজ্ঞ মানুষ। বড় বাঘ তাকে পেড়ে ফেললেও, সে যেমন নিরুত্তাপ থাকে, চোখের সামনে দোতলার খোলা বারান্দায় দিনের বেলাই প্রায় ন্যাংটো মেয়েকে নিয়ে ক্যামেরন সাহেবের রমদা-রমদি দেখেও ও তেমনই নিরুত্তাপ। তবে, ছাত্তারের চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে ওঠে। দেখতে পায়, বুঝতে পারে পরেশ। আর চোয়াল শক্ত হলেই ভয় পায়।

বেশ কয়েকবছর পরে, এইরকম চোয়াল শক্ত করেই ছাত্তার তার বন্দুক তুলে নিয়ে তার এগারোজন রক্তের আত্মীয়কে একই দিনে গুলিতে শেষ করে দিয়েছিল।

মানুষটা বাঘের সঙ্গে কারবার করত। সাহসের কোনো খামতি ছিল না। কিন্তু নোংরামি নীচতা এসব সহ্য করতে পারত না। পারত না ভণ্ডামি।

ছাত্তারের ব্যক্তিগত আইন নিষ্ঠুর ছিল। ভয়াবহ ছিল, কিন্তু তা অন্যায় ছিল না, নীচ ছিল না।

এই ক্যামেরন সাহেবদের হাব-ভাব দেখে পরেশেরও একধরনের ঘৃণা জন্মে গেছে। মুখ ফিরিয়ে থুথু ফেলে ও, সংকোশের বহমান স্বচ্ছ জলে। ওর থুথু ভেসে যায় দ্রুত। ঘুরপাক খেতে খেতে হারিয়ে যায়। জলের নীচে নানা-রঙা নুড়ি দেখা যায়। মহাশোল মাছের ঝাঁক, কালো ছায়া ফেলে সাঁতরে যায় গভীরে গভীরে। জলের গভীরে আষাঢ়ের মেঘের মতো মনে হয় সে চলমান মাছের ঝাঁককে।

কাল বিকেলের আগেই ভুটানের দিকে একটা ল্যাংড়া, বাঁজা মোষকে বেঁধেছিল পরেশরা বাঘের জন্যে। যে মোষ দুধ দেয় না তার কোনোই প্রয়োজন নেই বাথানের গোয়ালাদের কাছে। গোস্ত করবে বলে কিনতে চায়, মুসলমান যাযাবর ব্যবসায়ীরা। কিন্তু নেপালিরা কট্টর হিন্দু। যদিও দুর্গাপুজোর সময় মোষ বলি দেয় তারা, কেউ জবা করে খাবে তা জেনে ল্যাংড়া, বাঁজা, অকর্মণ্য দামহীন মোষও বেচে না।

টাকা যাদের খুবই দরকার, তাদেরই দেখা যায় যে টাকার জন্যে হাহাকার না-করতে। টাকার জন্যে নিজেদের নিজস্বতা বিকিয়ে না দিতেও। সেই লোভ আছে শহরের মানুষদের। পরেশ ভাবে, একদিন শহরের মানুষেরা পুরো পৃথিবীটাকে নষ্ট-ভ্রষ্ট করে দেবে। এই গাছ থাকবে না, এই ফুল, এই বাঘ, এই শান্তি এবং এই মানসিকতাও। পেনসান এবং পুঁজিহীন রিটায়ার্ড পুরুষদের যেমন অবস্থা সংসারে, অনেকটা তেমনই অবস্থা ওই মোষটার। তবু ওকে কেউই অসম্মান করে না। না গোয়ালারা, না অন্য মোষেরা।

প্রায় প্রতি রাতেই বড় বাঘ এসে বাথানে হামলা করে, যদিও বাথানের শক্ত কাঠের বেড়ার মধ্যে ঢুকে মোষ নেবার সাহস কোনো বাঘেরই নেই। একসঙ্গে বাঘিনি এবং বাচ্চারা থাকলেও নয়। তবুও হম্বি-তম্বি করে। মোষগুলোও বোঁ-বোঁ-ও করে প্রচণ্ড চিৎকার করে ওঠে। দাপাদাপি, ঝাঁপাঝাঁপি হয় অনেকক্ষণ। ঘুমের দফা-দফা। মশাল হাতে করে গোয়ালারা ঘেরার মধ্যে থেকেই লম্ফ-ঝম্ফ করে। ক্যানেস্তারা পিটিয়ে ভয় দেখায় বাঘকে। ঘেরার বাইরে অবশ্য বেরোয় না। মোষদের রক্ষাকবচ ছাড়ে না।

একে বড় বাঘ, তায় রাত বলে কথা।

সচরাচর বাথানের মধ্যে রাতের বেলা বাঘে কিছু করতেও পারে না। অনেক মোষ যে থাকে একসঙ্গে সিং উঁচিয়ে। মোষ ধরে বাঘে, দিনের বেলাতেই, যখন কোনো মোষ চরতে চরতে একলা হয়ে যায়, তখন। তবু রাতে এসে ভয় না-দেখালেও যেন চলে না তাদের।

ল্যাংড়া, বাঁজা মোষটাকে মেরেছিল বাঘ গতকালই শেষ রাতের দিকে। মড়িটাকে বেঁধে ছিল অবশ্য বুদ্ধি করে বাঘের চলাচলের পথেই কাল। খেয়েছে সামান্যই। তাই আজ রাতে যে মড়িতে আসবেই বাঘ, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই।

ছাত্তার আর পরেশ বাঘের পায়ের দাগ দেখে বুঝেছে যে, মস্ত বাঘ।

নেপালিরাও বলেছিল যে, অত বড় বাঘ সারাজীবন বনে বনে ঘুরেও দেখেনি ওরা। মোষটা ভালো করে বাঁধা না থাকলে ওই বাঘের পক্ষে অতবড় মোষকে বয়ে নিয়ে ভুটান হিমালয়ের খাড়া পাহাড়ে উঠে চলে যাওয়াও অসুবিধার ছিল না। একটি বড় বাঘ তার শরীরে যে কতখানি শক্তি ধরে তা যারা বাঘকে জেনেছে, তারাই জানে।

খুব ভালো করে, শক্ত করে মাচা বেঁধেছে ওরা, সারা সকাল ধরে। চারজন লোককে নিয়ে।

ক্যামেরন সাহেব বাঘ মারবেন বলেই এখানে এসেছেন। এখন মানে মানে মারতে পারলেই ভালো। যদি না মারতে পেরে, আহত করেন তবে সেই বাঘকে পিছা করে মারার কাজ হবে পরেশ আর ছাত্তারেরই। পেশাদার শিকারি ওরা।

ক্যামেরন সাহেব নিজেই বাঘ মারতে পারলে দুশো টাকা দেবেন বলেছেন আর আহত করার পর সেই বাঘকে যদি ছাত্তারদেরই পিছা করে রক্তের দাগ দেখে দেখে খুঁজে বের করে শেষ করতে হয়, তবে তিনশো টাকা। সাহসী শিকারিদের কোনো সম্মান দেয়না এই সব মিথ্যাচারী, জালি মানুষেরা। সম্মানটা নিয়ে নিয়ে, টাকাটা হাতে ধরিয়ে দেন।

পরেশ ভাবে, ওই পাঞ্জাবী মেয়েটার সঙ্গে আসলে হয়তো ওদের নিজেদের বিশেষ তফাত নেই। ওরা বেচে, ওদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা, দুর্জয় সাহস; আর মেয়েটা বেচে অন্য কিছু। ওরা সবাই অসহায়।

তবে, ওদের, অসহায়তার রকমটা আলাদা।

ভাবে পরেশ কে জানে! হয়তো ক্যামেরন সাহেবও অসহায়। তার অসহায়তার রকমের খোঁজ হয়তো, তাঁরা রাখে না। প্রাণ বিপন্ন করেও বাঘের চামড়া বাইসনের বা বুনোমোষের মাথা, হাতির দাঁত তারা এনে দেয় শৌখিন আত্মসম্মান-জ্ঞানহীন শিকারিদের পায়ের কাছে। সামান্য অর্থের বিনিময়ে।

টাকার বড় দরকার পরেশের। ছাত্তারেরও টাকার দরকার কম নয়। তাইই ওরা চাইছিল ক্যামেরন সাহেব কোনোক্রমে গুলি ছোঁয়াক একবার বাঘের গায়ে। তারপর ওরাই দেখবে। মাথা-পিছু পঞ্চাশটা করে টাকা বেশি পাওয়া সোজা কথা নয়। যা বাজার!

বাঘ শিকারের ওই নিয়ম। যে আগে রক্ত ঝরাতে পারবে, বাঘ তার। সেই প্রথম গুলি, লেজেই লাগুক, কি কানের পাতাতে। রক্ত ঝরলেই হল।

তবে ক্যামেরন সাহেবকে পাঠিয়েছে গৌহাটির ল্যাম্পুন সাহেব। ল্যাম্পুন সাহেব কিন্তু ভালো শিকারি। ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে না ওদের যে, এই ক্যামেরন সাহেব শিকারের কিছু জানেন বলে। শিকারে তাঁর মনও নেই। শিশু যেমন সুন্দর খেলনা পেয়ে পৃথিবী ভুলে মত্ত হয়ে যায়, ক্যামেরন সাহেবও পাঞ্জাবী মেয়েটাকে নিয়ে তেমনই মত্ত। মেয়েটা যেন দুর্মূল্য আইসক্রিম। এখুনি চেটে পুটে শেষ আর্দ্রতাটুকুও না খেলে যেন গলে গিয়ে আঁজলা গলে গড়িয়ে যাবে সব রস, মিষ্টত্ব!

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর ভালো করে ঘুম দিয়ে উঠল ওরা দুজনে। রাতে জাগতে হবে। কে জানে, সারা রাতই জাগতে হবে কি না। বাঘের মতিগতির কথা কি বলা যায়? মড়িতে এসে হয়তো হাজির হল একেবারে শেষ রাতে।

ঘুম থেকে উঠেই পরেশ বলল, আমি একটু ঘুরে আসছি!

ছাত্তার ভালো করে জানে, কোথায় ঘুরতে গেল পরেশ। ওই একটিই কমজোরি পরেশের। পৃথিবীর সমস্ত বাহাদুর মানুষদেরই কোনো না কোনো কমজোরি থাকেই। থাকাটা অবধারিত।

ভুটানের দিকেই পাহাড়ের নীচে খড়ের ঘরে মদ পাওয়া যায়। ভুটানে তৈরি হুইস্কি। পাঁইটের বোতল। কমলালেবুর ছবি আঁকা। কমলা রঙা। সাদা লেবেলের উপর। নাম, ভুটান-অরেঞ্জ।

ছাত্তার মদ ছোঁয় না। ওর নেশার মধ্যে গুয়া-পান। শুধুই গুয়া-পান।

কেউ মদ খাক, তাও পছন্দ নয় ছাত্তারের।

পরেশ যাওয়ার সময়ে, ছাত্তার বলল, ক্যামেরন তো মাতাল হইবই, তুই বেশি খাস না। অত বড় বাঘ! মাতলামি যদি করিস, আমি কিন্তু তোক্ গুলি করুম।

থোও, থোও! পরেশরে কোনোদিন মাতাল হইতে দেখছ তুমি! যত্ত ফাক্সা কথা!

তাড়াতাড়ি আসস কিন্তু। দেরি যদি করস, তো খারাপ হইব। ভুটানি ছুকরিও তো আছে ওই দোকানে। কী হয় না হয়; আমি সবই জানি।

মুখ সামলাইয়া কথা কইও মিঞার পুত্। তোমার জিভখান্ কাইট্যা ফেলাউম। ওই সব মাইয়া-ফাইয়ার ধান্দা আমার লাই। মদ খাই; মদ খাই!

না থাকনই ত ভালো।

অবিশ্বাসী স্বগতোক্তি করল ছাত্তার।

পরেশ, একা একা চৈত্রর নদী পেরিয়ে ভুটানের দিকে যাচ্ছিল। মন্থর পায়ে। চৈত্রদিনের বিকেলের মধ্যেই একটা মন্থরতা আছে। সবকিছু শ্লথ হয়ে যায়, ভিতর বাহির।

ঘন, গহীন বন, পাহাড়ের গায়ে। পেছনে। সামনে, ডাইনে, বাঁয়ে। যমদুয়ারের সেগুন আর শালগাছের কাণ্ডর বেড় দশজন মানুষের দু হাতেও দেওয়া যায় না। এই বনে, গা ছমছম করে দিনের বেলাতেও। ছায়াচ্ছন্ন সবুজ অন্ধকারে ঢাকা থাকে দুপুরের রোদও, অনেকই জায়গাতে। যেখানে জঙ্গল ঘন।

এই ছমছমানির প্রেমেই পড়েছে আসলে পরেশ। চাকরি করল না, থিতু হল না। বিয়ে করল না কোনো দায়-দায়িত্বই নিল না জীবনে, শুধু এই ছমছমানিরই প্রেমে পড়ে। তার বিয়ে হয়েছে জঙ্গলেরই সঙ্গে। কী ভালো যে লাগে, এমন গহন জঙ্গলে এলে! মদ খায় মাঝে মধ্যে। নেশা করার জন্যে নয়। নেশা, তার জঙ্গলে এলে: এমনিতেই হয়। সেই নেশাকে জমাট করে তোলার জন্যেই মাঝে মাঝে একটু-আধটু খায়। জঙ্গলে বসে মাল খাওয়ার আনন্দই আলাদা। প্রকৃতির প্রভাবেরই মতো, হুইস্কির প্রভাবও আস্তে আস্তে চারিয়ে যায় নিজের ভিতরে। ধীরে ধীরে। বেলা শেষের বুনো হাঁস, যেমন করে ম্লান রক্তিম আলোয়, সারারাতের স্থির জলজ শীতের জন্যে তৈরি হয়ে যায়।

ছাত্তার মিঞা, এই মদ-ফদ কোনোদিন জিভেও দেয়নি। ও কী করে জানবে, ভুটান অরেঞ্জের স্বাদ।

কুমারগঞ্জ থেকে বেরুবার সময় দাদার জ্বর ছিল অনেক। শিলিটা একা ছিল বাড়িতে। পরেশের এমন করে চলে আসাটা ঠিক হয়নি।

খড়ের চালাটার বারান্দার এক কোণে বসে লালচে, মোটা কাচের গেলাসে, জল-মেশানো ভুটান-অরেঞ্জ খেতে খেতে ভাবছিল, পরেশ। ভাবছিল, এই জীবনে খুব কম কিছুই ও করেছে, যা, ওর করা উচিত ছিল। ছেলেবেলায় উদ্বাস্তু হয়ে চলে এসেছিল আসামে, উত্তরবঙ্গ থেকে। তারপর এখানে এসেই এই বন-জঙ্গলের প্রেমে পড়ে গেল। শিকারের এক গুরুও পেয়েছিল, সে কাসেম মিঞা। এই নেশাটাই ধরে নিল তাকে কিশোর বয়সে। সেই যে ধরল হাত, বজ্রমুঠি আর ছাড়ল না। রাঙামাটি, পর্বত-জুয়ার, গঙ্গাধর নদী, রাইমানা, কচুগাঁও, বরবাধা, যমদুয়ার।

এই নেশা যাকে একবার ধরেছে, তার ইহকাল পরকাল সবই গেল।

ভুটানি মেয়েটার গাল দুটি কমলা লেবুরই মতন। বুকদুটি পাকা টুকটুকে মাকাল ফলের মতো দেখতে। ইচ্ছে করেই বুকের পর্দা একটুখানি খুলে রেখেছে। মাকাল ফল নির্গুণ হয়, কিন্তু এই ফলেব অনেকই গুণ। আর রূপ তো আছেই।

এখানে সব গণ্ডার-মারা, হাতি-মারা চোরা শিকারিরা আসে। স্মাগলাররা আসে। সাংঘাতিক সাংঘাতিক সব চরিত্র। ভারতের দুটি রাজ্য এবং ভুটানের বর্ডার বলে নানারকম খারাপ কাজই হয় এখানে। মদ, আফিম, চরস, মেয়ে চালান যায়। মাঝে খুন-খারাপিও হয় দু-চারটে। রুক্ষ, দুর্দান্ত সব মানুষের গায়ের গন্ধ ভাসে এখানের বাতাসে এবং ভাসে বলেই এত ভালো লাগে পরেশের।

এক ঘণ্টার জন্যে ঘর বন্ধ করে কারও সঙ্গে বাঁশের মাচানে শুতে দু টাকা নেয় মেয়েটা। বাইরে

যারা বসে মদ খায়, তারা দুটি সলিড-শরীরের, কখনো মৃদু, কখনো জোর ধ্বস্তাধ্বস্তির শব্দ শুনতে পায়। হাঁসফাঁস নিশ্বাসের শব্দ, বাঁশের মাচার মচমচানি শব্দর সঙ্গে। সময় পেরুলে, জরায়ু ভিজলে; মেয়েটা ঘরের পেছনের জঙ্গলে চলে যায়। সেখানে মস্ত মাটির জালাতে জল রাখা থাকে, একটা প্রাচীন শিমুল গাছের নীচে।

ধোওয়া-পাকলা করে নিয়ে, পরের রাউন্ড কুস্তীর জন্যে তৈরি হয় সেই পাহাড়ি মেয়ে। রতি-ক্রীড়ায় ক্লান্তিহীন এরা। যেমন, পাহাড় চড়ায়। চড়াই-উৎরাই সহজে পেরুতে জানে। তবে, কাজ কারবার যা হওয়ার, তা সন্ধে রাতেই শেষ হয়ে যায়। কখনো বা ভর দুপুরেও। যমদুয়ার, যমেরই দুয়ার। এখানে অন্ধকার নামার পর যম নিজেও ঘরের বাইরে বেরতে ভয় পায়। এ বড় ভীষণ বন। এই বনে যম নানারকম "ভেক" ধরে আসে। কখনো বাঘ, কখনো হাতি, কখনো দানো, কখনো বার্গম্যানের ছবি "দ্যা সেভেন্থ সীল"-এর দাবাড়ু মৃত্যুর মতো কালো পোশাক পরে।

খড়ের ঘরের বারান্দায় বসে, ভুটান-অরেঞ্জ খেতে খেতে, পরেশ সংকোশ নদীর দিকে তাকিয়ে থাকে। দূরে, বন-বাংলোটা দেখা যায়। সূর্য ডুবতে আর ঘন্টাখানেক বাকি। একটু পরেই মাচায় গিয়ে বসতে হবে ওদের। এইই ওদের জীবিকা। পেশা। ইচ্ছে করেই দুটি মাচা বেঁধেছে। একটি বড়, একটি ছোট। বড় মাচাতে বসবে ছাত্তার আর ক্যামেরন। আর অন্য গাছে, ছোট মাচাটিতে বসবে পরেশ একা।

বাঘ কিন্তু মারাতে হবে ওই ক্যামেরনকে দিয়েই। পরেশ কিংবা ছাত্তারের মতো শিকারির কাছে, বাঘ মারা কিছুই নয়। কিন্তু অন্য শিকারিকে দিয়ে বাঘ-মারানো বড় কঠিন কাজ। হাতে দামি বন্দুক-রাইফেল থাকলেই তো আর শিকারি হয় না কেউ। কত রকম, কত দিশি-বিদেশি, আর কত্ত জাতের শিকারিই যে দেখল ওরা আজ অবধি।

পটাপট চারটে খেয়ে উঠল পরেশ। মেয়েটা খল-বল করছিল। মেয়েমানুষের দু-উরুর মাঝের আনন্দর স্বাদ পেতে তাকে কিশোর বয়সে একবার বাধ্য করেছিল পাড়াতুতো এক দশ বছরের বড় দিদি। ধর্ষিতা নারীদেরই মতন, সেও ধর্ষিত হবার পর থেকে ব্যাপারটাকে কোনোদিনও স্বাদু বলে মনে করতে পারে নি। প্রচণ্ড শারীরিক এবং মানসিক কষ্ট হয়েছিল ওর। তারপর থেকে এ ব্যাপারটার প্রতিই এক অসূয়া জন্মে গেছে পরেশের। পরেশ অস্বাভাবিক হয়ে গেছে। প্রচণ্ড নারী-বিদ্বেষীও। নারী সঙ্গর চেয়ে অনেকই বেশি আনন্দ পায় নরেশ উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে এসে থেকে।

মেয়েদের প্রতি ওর এই অনাসক্তি দেখে অনেকে ভাবে যে, ও নপুংসক। কিন্তু পরেশ নিজে জানে ও কী। কৈশোরের ওই দুর্ঘটনার পর থেকেই মেয়েদের প্রতি ওর এক তীব্র বিদ্বেষ জন্মে গেছে। তাছাড়া, ওর ধারণা হয়েছে যে, মেয়েরা পুরুষকে পুরুষ হতে বাধাই দিয়েছে চিরটাকাল। শালা আদম যা করেছিল, তা করেছিল, আদম মূর্খ ছিল বলে পরেশ কেন মূর্খ হতে যাবে? যতটুকু দাম মেয়েদের প্রাপ্য ঠিক ততখানি দামই দেয় তাদের।

সেটুকুর এক কণাও বেশি দাম দিতে রাজি নয় ও।

ভুটানি মেয়েটা পরেশের ঔদাসীন্যে ব্যথিত হয়। গতবছরও এসেছিল ওরা। তখনও হয়েছিল। মদ আর মেয়েমানুষ একসঙ্গে থাকলে, শুধু মদ দিয়ে সন্তুষ্ট কম পুরুষই থাকতে চায়। এমনই জেনে এসেছে মেয়েটি রূপোপজীবিনী হওয়ার দিন থেকে।

পরেশ অন্যরকম। পরেশ, কড়ায় গণ্ডায় নিজের ফেরত পয়সা বুঝে নিয়ে, মরা বিকেলের হলুদ আলোয় কমলা-রঙা মুখ ও বুকের ভুটানি মেয়েটির দিকে একবারও না তাকিয়ে মাচার দিকে ধীর পায়ে এগোতে থাকে। ওর বন্দুক ও সঙ্গে করেই এনেছিল। যমদুয়ারে এসে একমুহূর্তও বন্দুকটা হাতছাড়া করাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বন্দুকটা কাঁধের উপর ফেলে, দুটি হাত লাঠির মতো করে

শুইয়ে রাখা বন্দুকের উপর রেখে দিয়ে হাঁটে সে, ফিরে চলে বাথানের দিকে।

বেলা পড়ে এসেছে। ছায়ারা ঝুপড়ি হয়েছে। নিবাত নিষ্কম্প বন, ভরে উঠেছে নানারকম মিষ্ট-কটু-কষায় গন্ধে।

মাচার দিকে এগোতে দেখতে পেল পরেশ যে, ছাত্তার বনবাংলো থেকে জিপে করে ক্যামেরন সাহেব আর সেই পাঞ্জাবি মেয়েটিকে নিয়ে মাচার দিকেই আসছে।

মাচা অবধি এলে জিপের শব্দে বাঘ যেখানেই থাকুক হুঁশিয়ার হয়ে যাবে। মাচা অবধি আসার মতো বোকামি ছাত্তার করবে না যে তা পরেশ জানত। পরেশ ভেবে পেল না যে, বড় বাঘ মারবে ক্যামেরন সাহেব, সঙ্গে ওই রিংকি নামের মেয়েটি কী করতে আসছে?

বাঘ-শিকার খেলা নয়! এমনকী মাচায় বসে, বাঘ শিকার দেখাটাও খেলা নয়। অনভিজ্ঞ বাক্যিবাগীশেরা অর্বাচীনের মতন যা খুশি বলতে পারেন। মাচাতে হেগে-মুতে দিতে দেখেছে কত বড় বড় শিকারিকে, শুধু বাঘ দেখেই! বাঘ ত শুধু একটা জানোয়ার মাত্র নয়। বহু শতাব্দীর রূপকথা, লোকগাথা, কুসংস্কার আর ভয়ের জীবন্ত প্রতীক। প্রকৃত বুনো বাঘ যখন প্রতিবারেই সামনে এসে দাঁড়ায়, স্যাংচুয়ারির বসে-খাওয়া, ঘাড়ে-গর্দানে-হওয়া বাঘেদের কুলাঙ্গারদের কথা বলছে না পরেশ, তখন বুকের মধ্যে, পেটের মধ্যে যে কী হয়, তা পরেশই জানে।

যে-সব আরাম-কেদারা-বাসী, কিতাব-দুরস্ত, সাহসী সমালোচক, মাচায় বসে বাঘমারা শিকারের মধ্যেই পড়ে না, এ কথা ঠোঁট বেঁকিয়ে বলেন তাঁরা বনের বাঘকে তার স্বাভাবিকতায় কোনোদিনও দেখেন নি। স্যাংচুয়ারির বা চিড়িয়াখানার পোষা বাঘ নয়। জঙ্গলের আসল বাঘ। লজ্জাহীন মেয়েদের সব সৌন্দর্যই যেমন মাটি, পরাধীন এবং কোনোরকম ভয়ের কারণহীন বাঘেদের অস্তিত্বও তেমনই। ফাঁকা, মিথ্যে। তারা সত্যিই তাদের নিজ নিজ জাতের কুলাঙ্গার।

ভয়াবহতা না থাকলে, বাঘের বাঘত্বই লোপ পায়।

মাচা থেকে দুশো গজ দূরে ওদের নামিয়ে দিয়ে জিপ ফিরে গেল বাংলোতে। পরেশ কাছে গিয়ে দেখল, ক্যামেরন আর রিংকি দু'জনেই নেশাতে একেবারে চুর। ক্যামেরনের হাতে একটি হুইস্কির বোতল। সবুজ চৌকো দেখতে বোতলটা। নাম অ্যান্‌সেস্টর। রিংকি মেমসাহেব পিংক-রঙের একটি টাইট ব্লাউজ পরেছে, পিংক-রঙা স্কার্ট। ব্লাউজের তলাতে কিছু পরেনি। বোঝা যাচ্ছে। ওই শহুরে, ইংরিজি জানা মেয়ের, মোমের তালের মতো বুকের চেয়ে, একটু আগে দেখা ভুটানি মেয়ের পাকা মাকাল ফলের মতো শক্ত, লাল বুকের সৌন্দর্য অনেকই বেশি। যদিও মেয়েদের বুকের দিকে চোখ পড়লেই পরেশের গা-গোলায়, বমি-বমি পায়। তবু চোখ পড়ে গেল বলেই দেখল।

নারীরা নরকেরই কীট। ওর হাতে ক্ষমতা থাকলে পৃথিবীর সব মেয়েদের ও গুলি করে মেরে দিত। পুরুষদের এবং এই পৃথিবীর সমূহ সর্বনাশ করছে ওরা। ওদের প্রতি কোনো দুর্বলতাই নেই পরেশের।

ছাত্তার বলল, পরেশকে, সাহেবদের সঙ্গে তুইই বোস পরেশ, বড় মাচাতে।

পরেশ তীব্র আপত্তি জানাল।

ওর বমিই হয়ে যাবে। কোনো মেয়ের শরীরের অত কাছে থাকলে, ঘেন্নাতেই ওর বমি হয়ে যাবে। কিন্তু ছাত্তার নাছোড়বান্দা। তাছাড়া, ছাত্তারই তাকে সঙ্গে করে এনেছে। শিকারে কাউকে না কাউকে নেতা বলে মেনে নিতেই হয়। শুধু শিকার কেন, সমস্ত মারণযজ্ঞেই নেতার ভূমিকা থাকেই। সবাই যেখানে নেতা, সেখানে মারামারিটা প্রায়ই নিজেদের মধ্যেই ঘটে যায়।

অতএব ক্যামেরন এবং রিংকি মেমসাহেবের টলমল পায়ে মাচার ওঠার পরেই পরেশকেও উঠতে হল। রিংকি-মেমসাহেব যখন উঠছিল মাচাতে, দড়ি-দিয়ে বানানো সিঁড়ি বেয়ে দুলতে দুলতে, তখন

নিচে-দাঁড়ান পরেশ তার গোলাপি স্কার্টের ফাঁকে তার গোলাপি উরু এবং নিতম্বর আভা দেখেছিল। তখন সংকোশ নদীতেও শেষ সূর্যের গোলাপি আভা। রিংকি-মেমসাহেব স্কার্টের নীচেও কিছু পরে নেই, বুঝেছিল পরেশ।

ওই উরুর আভা দেখার পরমুহূর্ত থেকেই পরেশের বুকের মধ্যে একধরনের কষ্ট শুরু হল। সেই কষ্টর কথা ও আগে কোনোদিনও জানেনি। সে কষ্টটা, মেয়েদের প্রতি বছরের পর বছর ধরে জমিয়ে তোলা, ওর তীব্র ঘৃণার চেয়েও অনেক বেশি তীব্র কষ্ট। সে কষ্টের নাম ও জানে না। তাকে আগে জানেনি কখনো। এই কষ্ট নিশ্চয়ই কোনো রিপুজাত। সেই রিপুর সঙ্গে পরিচয় ছিল না আগে।

সত্যিই বড় কষ্ট হতে লাগল পরেশের।

বাঘটার আসার কথা, ভুটান পাহাড়ের দিক থেকে। পায়ের দাগ তাইই বলে। এমন গহন জঙ্গলে বেলা থাকতেই বাঘ এসে হাজির হওয়ার কথা। বিশেষ করে, আগের রাতের শেষে করা মড়ি। খেয়েও গেছে একটুখানি। অতএব...।

সূর্য ডুবে গেছে কিন্তু পশ্চিমাকাশে গোলাপি আভা আছে এখনও। সংকোশ নদীর বুকে যে নুড়িময় চর জেগেছে, এখন সেখানে একদল গোলাপি-মাথা বিদেশি হাঁস আর হাঁসী স্বগতোক্তি করছে, দিনশেষের আগে। তাদের ঠোঁট দিয়ে পালক পরিষ্কার করছে। মাচার উপরের এই গোলাপি শরীরের হাঁসীটিরই মতো, রিংকি।

ঝিঁঝিঁ ডাকতে আরম্ভ করেছে। সন্ধের ঠিক আগের মুহূর্তে বনের গভীরে আলো মরে যাওয়ার দুঃখে যে রুদ্ধশ্বাস শোক পালিত হয় কয়েক মুহূর্ত; প্রাণী, পশু, পাখি, গাছ-পালা যখন স্তব্ধ হয়ে থাকে স্বল্পক্ষণ, সেই মুহূর্তটিতেই এসে দাঁড়িয়েছে এখন দিন। এই মুহূর্ত পেরলেই রাত নামবে।

ক্যামেরন আর রিংকি বোতলটা থেকে ক্রমাগত খেয়েই চলেছে। খেয়ে, পরেশের উপস্থিতিতেই এমন এমন কাণ্ড করছে যে, পরেশের মনে হচ্ছে, ওরা যেন তাকেও কোনো পাথর বা গাছ বা ফুল বলে মনে করছে। মানুষ ত দূরের কথা গাছেরাও যে দেখতে পায়, তা কি ওরা জানে না! আর পরেশ তো মানুষই। জলজ্যান্ত শক্ত সমর্থ একজন মানুষ।

অন্য দিন হলে, ও ঘৃণাতে মুখ ফিরিয়েই থাকত কিন্তু আজকের এই নতুন অনুভূতি ওকে চোখ ফেরাতে দিচ্ছে না। ও যত ওই সব দেখছে, যতই বুঝছে যে, মাতাল বুড়োর দাঁতহীন কামড়ে এই যুবতী মেয়ের ছটফটানি যতই বেড়ে যাচ্ছে, ততই সেই ছটফটানিটা যেন পরেশের ভিতরে চারিয়ে যাচ্ছে।

আজকে কিছু একটা ঘটবে।

পরেশ নিজেকে বলল। মনে মনে। সত্যিই সাংঘাতিক কিছু ঘটবে। বাঘ শিকারে এসে আজ নিজেই শিকার হয়ে যাবে পঁয়ত্রিশ বছরের পরেশ। জঙ্গলের সব কিছুই ও জানে চেনে। এই নতুন গোলাপি মেয়ে জানোয়ারের দাঁত নখ-এর খবরই শুধু জানা নেই ওর। কীভাবে আক্রমণ করে তাও জানা নেই। আক্রমণ প্রতিহত করার প্রক্রিয়াও নয়।

অন্ধকার হওয়ার পরই বাঘটা ডাকল একবার। আশ্চর্য! বাথানের দিক থেকেই। মোষগুলো যে বাথানের মধ্যে হুড়োহুড়ি করে, নাক দিয়ে মুখ দিয়ে নানারকম শব্দ করছে তা এতদূরে বসেও শোনা গেল।

আশ্চর্য তো! বাঘটা কাল রাতে মড়ি করেছে, আসবেও এখানেই। তবুও মোষেদের বাথানের কাছে একবার না গিয়ে পারল না।

পরেশের মনে হল, রোজই একবার করে ভয় দেখিয়ে যায় সম্ভবত বাঘটা, বাথানে মোষেদের

উপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করবার জন্যে। কুমারগঞ্জের মুদির দোকানি মধুদা যেমন রোজই ধার-দেওয়া বন্ধ করে দেবে বলে ভয়ে খাবি-খাওয়ায় পরেশকে। নখ-দন্তওয়ালা জানোয়ার আসলে শহরে-গঞ্জেই বেশি আছে জঙ্গলের চেয়ে। মধুদার মতো, ক্যামেরন সাহেবের মতো। তবে ওদের দাঁত-নখ দিয়ে ফালা ফালা করে দিলেও রক্ত পড়ে না। এই যা তফাত।

অনেকের দাঁত-নখে সত্যি ধারও থাকে না, যেমন ক্যামেরনের। কিন্তু তবুও দাঁত-নখ দেখিয়েই তারা সহজে কাজ হাসিল করে। আলমারিতে, ব্যাঙ্কে, তাকের পর তাক তাদের দাঁত-নখ সাজানো থাকে। কাগজে-ছাপা নখ, রুপোর দাঁত, সোনার থাবা। পরেশ জানে। জানে বলেই, বাঘের চেয়ে এদের অনেকই বেশি ভয় করে ওর। বাঘের ঘোঁৎ-ঘাঁৎ তো জানাই। কিন্তু এদের ঘোঁৎ-ঘাঁৎ জানা যায় না। সব শিকারেরই নিয়মকানুন থাকে। শিকারি এবং এমনকী শিকাররাও সেই অলিখিত নিয়মকে মেনে চলেই। কিন্তু এই সব শিকারিরা কোনো নিয়ম, কোনো বিবেকেরই ধার ধারে না।

ঘনান্ধকার নেমে এসেছে এখন। জঙ্গলের চন্দ্রাতপের নীচে অন্ধকার গাঢ়তর হয়েছে। একটা ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব। রাত পাখিরা ডাকছে থেকে থেকে। অনেক পাখি। ছাত্তার ওদের সকলের নামই জানে। পরেশ ডাকগুলো চেনে; কিন্তু নাম জানে না।

বাথানের কাছ থেকে সেই যে ডেকেছিল বাঘ, সেই ডাক থেমে গেছে অনেকক্ষণ। এবারে সে বোধহয় মড়ির কাছাকাছিই এসে গেছে। খুবই সন্তর্পণে আসবে। চারদিক দেখে নেবে। অসম্ভব না হলে, গোল করে চক্কর মারবে চারদিকে। তারপর মড়ির কাছে কোনো বিপদ যে নেই, সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলেই মড়িতে আসবে। সন্দেহ যদি একটুও হয়, তাহলে সে ফ্রিজ করে যাবে, সিনেমার শট-এর মতন। নাম বাঘ। তার ধৈর্যর কোনো সীমা পরিসীমা নেই। একই জায়গাতে ঘাপটি মেরে বসে থাকবে হয়তো, মাচার কাছেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ছায়ার সঙ্গে মিশে থাকবে। ও জানোয়ারের চরিত্রে কোনো তাড়াহুড়ো নেই। পৃথিবীর সবটুকু সময়কে তার থাবার নীচে নিয়ে বসে থাকে সে। হঠকারিতা তার চরিত্রেই নেই।

সেই কারণেই বাঘে-করা মড়ির উপরে ধ্যানে-বসা মুনি-ঋষিদেরই মতো নীরব, নিষ্কর্ম হয়ে বসে থাকতে হয় শিকারিকে। কিন্তু পরেশের মাচায় যে সব কাণ্ড-মাণ্ড চলছে—হি-হি-হা-হা, উঃ-উঃ-ইঃ-ইঃ-ইঃ, কাতুকুতু, সুড়সুড়ি, ফুঁ, তার বিচিত্র আওয়াজে বাঘ তো দূরস্থান বন বেড়ালও মাচার এক মাইলের মধ্যে আসবে বলে মনে হচ্ছে না আজ রাতে।

ছাত্তারকে অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না। তবে কোনোই সাড়াশব্দই নেই ছাত্তারের মাচা থেকে। কী করছে সে ভূতের মতন নিঃশব্দ নিঃসাড় হয়ে, তা সেই জানে। সেও আজ বাঘ হয়ে গেছে।

ছাত্তার আধ ঘণ্টাটাক পরে চেঁচিয়ে বলে উঠল, এই পরেশ। এই হারামজাদা কি বাঘ মাইরবার লইগ্যা আইছে যমদুয়ারে? না লদকা লদকির লইগ্যা? যে জিনিস খাটে শুইয়াই করন যায়, তা করনের লইগ্যা সেগুন গাছের মাচার কী কাম বুঝি না। চল্ চল্। লাম্। ফিইর‍্যা যাই চল্। কী খিটক্যাল। কী খিটক্যাল। ওই বুড়ার মাগ্যে আমিই গুলি করুম আজ। দেইখ্যা লইস তুই। হালায় হারামির পুত।

পরেশকে মাচা থেকে নামতে দেখেই ক্যামেরন হাঁ হাঁ করে উঠল। বলল, হামারা টাইগার কঁহা? টাইগার?

ছাত্তার তার মাচা থেকে নামতে নামতে, নিজস্ব ভাষায় নিজের মনেই বলল, ওই ম্যামছাহাবের দুই ঠ্যাঙের ফাঁকে ভালো করি দ্যাখবার কয়্যা দে পরেশ, হারামি ছাহেবরে। বাঘ মারন লাগব না আর। তার বাঘ সেখানেই শুইয়া আছে। এ হালার লাইনই ভিন্ন। ছ্যাঃ ছ্যাঃ। টঙে বইস্যা।

ছ্যাঃ ছ্যাঃ পরেশের গা ঘিন ঘিন করে উঠল। এক বিচ্ছিরী দৃশ্য। তায়, এত বিচ্ছিরী করে তার বর্ণনা দেওয়া।

পরেশ আসলে কবি। প্রকৃতিপ্রেমিক। ওর সূক্ষ্ম রুচিতে বড় ধাক্কা লাগল।

গাছ থেকে নেমেই ওয়াক ওয়াক করে বমি করে ফেলল পরেশ। পরেশ আবার পুরোনো পরেশ হয়ে গেল। ছাত্তারই তাকে ফিরিয়ে আনল ওই রকম বর্ণনা দিয়ে। ভালোই হল। পরেশ যা নয়, তাই হতে যাচ্ছিল। পরেশ যা ছিল, তাই হতে পেরে; খুশি হল খুব। প্রচণ্ড নারীবিদ্বেষ আবার স্বাভাবিক করে তুলল তাকে।

ক্যামেরন, রাইফেল তুলল মাচাতে বসেই পরেশের দিকে। বলল, "কাম আপ উ্য সান্ অফ আ বিচ্। হোয়্যারস্ মাই টাইগার?"

ছাত্তার ততক্ষণে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে পরেশের।

সে মুখ তুলে বলল, ম্যামসাহেবের ঠ্যাঙের ফাঁকে তর বাঘ আছে হারামির পুত্। বড় বাঘ মারতে আইছে হালায়।

ক্যামেরন রাইফেলের নল তুলল ওদের দিকে।

মাতালের ঠিক নেই। সব মাতালের তাল ঠিক থাকে না। কী করতে কী করে বসে। মুহূর্তের মধ্যে ছাত্তার তার বন্দুক তুলে গুলি করল ওদের দিকে। গুলি BALL ছিল। সেটা গিয়ে গাছের কাণ্ডে লাগল ক্যামেরনের মাথার এক হাত উপরে। ছাত্তার যেখানে মারতে চেয়েছিল, সেখানেই লাগল।

রিংকি আর্তনাদ করে উঠল। ক্যামেরনও। পরক্ষণেই ক্যামেরন গুলি করল রাইফেল দিয়ে। গুলিটা ওদের তিনহাত বাঁ দিকে, শালের চারাগাছে পড়ল। মাটি ভেদ করে গেল।

রাইফেলের বজ্রনির্ঘোষ গম-গম করে ফিবে এল ভুটান পাহাড় থেকে।

ছাত্তার বলল, চল পরেশ, পালাই। এ হালার মাতালের ঠিক নাই। তায়, হাতে আবার ম্যাগাজিন রাইফেল। যদি গুলি লাইগ্যা যায় আন্দাজে। কওন ত যায় না। কপাল যখন খারাপ হয়, তহন...

ওরা এঁকে-বেঁকে দৌড়তে লাগল বাংলোর দিকে।

দৌড়তে দৌড়তে ছাত্তার বলল, হালার পুত্ এর নিশানাখানা দ্যাখছস। মাচার এক্করে নীচে খাড়াইয়া ছিলাম, তাই আমাগো তিনহাত বাঁয়ে ফ্যালাইল রাইফেলের গুলিখানরে। হালায় বড় বাঘ মারে! খাউক্! খাইয়া ফ্যালাক হালারে বাঘে। খুবই খুশি হমু আনে।

এখন কী করবে ছাত্তার! তুমি যে ওই গুলিটা ওকে ভয় পাওয়াবার জন্যেই করেছিলে, তাতো ও বিশ্বাস করবে না। থানায় গিয়ে বলবে, আমরা ওকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলাম।

পরেশ, চিন্তার গলায় বলল।

কউক না। যদি থানায় যায়, হালারে সত্যিই আমি জানে মাইবা থুমু।

তাতো! কিন্তু এখন কী করবে?

এখন চল্, জিপ চইড়্যা একটু হাওয়া খাইয়া আসি।

যাইবা কই?

রাইমানায় চল। বড়ই রসগোল্লা খাওনের ইচ্ছা করতাছে আমার।

পাগল হইল্যা নাকি তুমি মিঞা?

পাগল ক্যান হমু? জিপ লইয়া আমরা ঘুইর‍্যা-ফিইর‍্যা শ্যাষ রাতে মাচার কাছে ফিইর‍্যা যামু। ওই হালার ক্যামেরনের সাধ্য আছে নাকি এই জঙ্গলে মাচা থিক্যা নাইম্যা ওই মাইয়ারে সঙ্গে লইয়া বাংলোয় ফিরনের? ভয়েই মইর‍্যা থাকবোআনে পথে। যতক্ষণ আমরা না যামু, ততক্ষণই হালার শাস্তি।

লাভ কি অইলো? বাঘ তো মারা হইলো না। টাকাটাত দিব না। গুদামুদা হয়রানি।

থামতো। বাঘ মারতে কী লাগে? ওর লইগ্যা মারলে মারুম। যদি হালায় টাকা দ্যায়। নইলে বাঘ এমনিই মাইর‍্যা, চামড়া বেইচ্যা দিমু আনে লহর শেখরে। ধুবড়িতে। চইল্যা যাইবো গিয়া সে চামড়া, গৌহাটি। আমেরিকানরা বহুতই দামে লইয়া যাইবো গিয়া। যে টাকা, ওই ক্যামেরনে দিত, চাম্ বিক্রি কইর‍্যা তার থিক্যা অনেকই বেশি পামুনে। টাকা টাকা করস্ ক্যান্? আমরা কি ভিখারি? যদ্দিন হাতে বন্দুক আছে, তদ্দিন না-খাইয়া মরুম না। শুনছস? কান খুইল্যা শুইন্যা রাখ।

হ, পরেশ বলল, মাথা নীচু করে।

বাংলোতে পৌঁছেই দেখল, ড্রাইভার উৎকর্ণ হয়ে বসে আছে। ড্রাইভারও ধুবড়ির। সাহেবতো ভাড়ায় এনেছে জিপ, ধুবড়ি থেকে। ড্রাইভার আনসারকে বলল ছাত্তার, চলরে আনছার ভাই, রসগোল্লা খাইয়া আসি।

ড্রাইভার আনসার বলল, চিন্তিত গলাতে, সাহেব যদি ভাড়া-মাড়া লইয়্যা গোলমাল করে? ও ছাত্তার ভাই। পরে সামলাইব কেডায়?

ছাড়ান দে তো। ওর পেন্টুলুন খুইল্যা ফ্যালাইম্যু না। মাগিটারে রাইখ্যা দিমু অনে। তারপর নেপালিগো বাথানে পৌঁছাইয়া দিয়া আসুম। এক্কেরে ঘিই-বানাইয়া থুইবো তারা অরে। ওই সব পিঁয়াজি আমার থনে মারন লাগবো না। আমার নাম আবু ছাত্তার। হালার ক্যামেরনের কি চিনন বাকি আছে নাকি আর আমার? মুই ভালোর সঙ্গি ভালো, খারাপের সঙ্গি যম। হঃ। হালায় ভালো কইর‍্যাই জানে তা। কুনোই চিন্তা নাই তগো। চল চল, রসগোল্লার লইগ্যা মনটা হাঁচোর-পাঁচোর করতাছে।

খুব জোরে জিপ চালিয়ে আনসার যখন রাইমানাতে পৌঁছল, রাইমানার ছোট্ট মিষ্টির দোকানের মালিক, দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে, বাড়ি যাওয়ার তোড়জোড় করছিল।

ঠিক সময়েই ওরা গিয়ে হাজির। রসগোল্লা গরমই নেমেছিল সবে।

আনসার বলল, যা হইল্যো তা ভালোরই জন্য। মোর প্যাটটা নরম হয়্যা ছিল সকাল থিক্যা। ধইর‍্যা যাইব গিয়া গরম রসগোল্লা খায়্যা।

দোকানের মালিক ঘাঁটু বলল ছাত্তারকে, খান খান যতগুলা খুশি খান। পয়সা কিন্তু নিমু না।

ক্যান? পয়সা নিবি না ক্যান? আমরা কি তোর কুটুম?

কুটুম না অইলে হয় কী! সেই মাঘ মাসে আইছিলেন না ছাত্তারদা। যা হরিণের মাংস খাওয়াইছিলেন, কী কমু। আমার বউ তো কয়, মুখে লাইগ্যা আছে এহনো। এবারে কী হইল শিকার? কারে লইয়া আইছেন?

পরেশের মুখটা চিরদিনই খারাপ।

বলল, এবারে যা শিকার হইতাছে তা খাইলে তোমার প্যাটও নরম হইয়া যাইব গিয়া ঘাঁটু, আনসারেরই মতন। সব খাদ্য, সব শিকার; খাইতে পারে কি হক্কলে? ত্যামন ত্যামন খাদ্যর লইগ্যা, ত্যামন ত্যামন প্যাটের দরকার।

ঘাঁটু কথার মানে না বুঝে, হাঁ করে চেয়ে রইল পরেশের মুখে।

ছাত্তার মুখভরা রসগোল্লা নিয়ে মুখ-বন্ধ-করা অবস্থাতেই ফিচিক্-ফিচিক্ করে হাসতে লাগল।

এমন সময় বাসটা এল। শেষ বাস। জানলার খড়খড়ি খড়খড়িয়ে গ্যাটিস লাগানো টায়ারে ভটর-ভটর আর ঢিলে বনেটে ঝ্যাকর্-ঝ্যাকর্ শব্দ করে, পেট্রোল-ট্যাঙ্কের মুখ থেকে উপছে-পড়া পেট্রোলের তীব্র মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে।

বাসটা মিষ্টির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়তেই ড্রাইভার, বয়স-হয়ে-যাওয়া বাঈজির পেল্লাই মাই-এর মতো চামড়া ফাটা-ফাটা বালব-হর্নটি জম্পেস করে ধরে, তিনবার টিপল, প্যাঁকু-প্যাঁকু-প্যাঁকু।

রওয়ানা হবে আবার উলটো পথে। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে নির্জন পথ। প্যাসেঞ্জার বেশি থাকলে সাহস হয়। এই দিকে নেই, এমন জানোয়ারও তো নেই।

বাসটার দিকে চেয়ে থেকে রসগোল্লা খেতে খেতে হঠাৎই পরেশ উঠে দাঁড়াল তড়াক করে। ঘটি চেয়ে, হাতটা পথে ধুয়েই বলল, ছাত্তার ভাই, আমি চলি। ডাক আইছে আমার। দাদায় আমারে ডাকে। তুমি ওই ম্যামসাহেব আর বুড়ারে সামলাইওনে।

ছাত্তার ভুরু তুলে তাকাল একবার ওর দিকে।

পরেশ ততক্ষণে বেরিয়ে পড়েছে দোকান ছেড়ে, ড্রাইভারের পাশের ভালো সীটে বসবে বলে। বাসের ড্রাইভারও বন্দুক-কাঁধে পরেশ শিকারিকে দেখে খুশি হল। এই রাস্তায়, সঙ্গে শিকারি থাকলে বুকে বল লাগে। বড় বাঘ, পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রায়ই হুঁয়াও-হুঁয়াও করে।

ড্রাইভার বলল, আজ কিন্তু তামাহাটেই থাকন লাগব পরেশদা। বাস তো ওই অবধিই যাইব।

তুই থাকবি কই?

আমি তো গুলাবচাঁদজীর গদি ঘরে শুইয়া থাকুম। বারান্দায় খাটিয়া টাইন্যা লইয়া। গরমের দিনে শোওনের চিন্তাডা কী?

আর খাওন-দাওন?

গুলাবচাঁদজীর শেঠানি পুরি তরকারি দিবে অনে। ফুট-ফরমাস্ খাইট্যা দি না কন্ত? ধুবড়িতে পুর্চা পৌঁছাইয়া দ্যাও, কচুগাঁতে মাইয়ার বাড়ি আঁচার পৌঁছাইয়া দ্যাও, কারিপাতা গাছ থিক্যা পাতা ছিঁইড়া আনো বন খুঁইজা। খাওইবনা ক্যান্? ভাবনা কী? আপনেও খাইবেননানে আমার লগে।

নাঃ। আমি মনা মিস্তিরের বাড়ি চইল্যা যামু।

মনা মিস্তির নাই। ধুবড়ি গ্যাছেন গিয়া।

বাচ্চু আর পাঁচুতো থাকব। মানিকদায়, গল্প করে ভারি মজার মজাব। কী কও পাঁচু?

হঃ। যা কইছেন পরেশদা। ওয়ার-রিটার্ন মানুষগুলানের ব্যাপার-স্যাপারই আলাদা। কী কন?

হ। একসপিরিয়েন্স-এর দাম নাই? পুরুষ মানুষে যদি দুনিয়াই না দ্যাখল, তয় কইরবার মতো কইরলোটা কী?

আনসার অবাক হয়ে পরেশের দিকে তাকিয়ে ছিল। মানে, বাসটার দিকে। পরেশের কম্বল, সুজনি, বালিশ সব পড়ে আছে নেপালিদের বাথানেই। জঙ্গলে তখনও রাতে বেশ ঠান্ডা। লোকটা বলা নেই, কওয়া নেই অমন হুট করে চলে গেল! আরও অবাক হল ও, ছাত্তার ভাইও ওকে কিছুই বলছে না বলে।

রসগোল্লা খেয়ে ছাত্তারও হাত ধুয়ে বাসের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পরেশকে বলল, ফিরনের পথে কুমারগঞ্জে তর সাথে দেখা কইর‍্যা যামু আনে।

দেখি, কী হয়।

যা হয় অইব। তোমারে কি অবিশ্বাস করি আমি?

না। সে কথা...

ঠিক আছে।

যাই।

যাওন নাই। আসো।

জিপটা চলে গেল। একটু গিয়েই, বন বিভাগের চেক-নাকাটা পেরিয়েই, টপ-গিয়ারে ফেলে, হেডলাইটটা ডিপার করে দিল আনসার। তারপর গভীর বনের মধ্যের রাস্তায় জিপের স্পিড বাড়িয়ে বলল, অদ্ভুত মানুষ এই পরেশদা। না, ছাত্তার ভাই।

রসগোল্লা খেয়ে ছাত্তার মুখে গুয়া পান দিয়েছিল।

বলল, সব মানুষই অদ্ভুত। মানষের ছা তো আর জানোয়ারের ছা লয় যে, একইরকম অইব। আমাগো পরেশ হইলো গিয়া পোয়েট। ভাবুক। যখন ওর যা মুড হয়, বাবু ঠিক তখনই তাই করেন। আমারও খুব ইচ্ছা যায়, পরেশ হইয়া যাই। কিন্তু ঘরে বিবি আছে, পোলা-পান; ক্ষুধা; এইটা চাই, ওইটা চাই। এই জীবনে যহন যা ইচ্ছা করে, তাইই করনের মতো কঠিন কাম আর কিছু নাই রে আনসার। আমরা পারি না, পারি নাই; পরেশ পারছে। লোকে ওরে ভ্যাগাবন্ড, দায়িত্বজ্ঞানহীন, লোফার কয়। কয় তো কয়! হ্যাতে পরেশের কিছুই যায়-আসে না। নিজের জীবনের স্টিয়ারিং ওর নিজেরই হাতে। আমাগো মতন বেড়ি লাই অর দ্যাখ, তুই জিপ চালাইতাছস আর আমি বইস্যা আছি তোর পাশে।

নিজের জীবনের গাড়ি নিজে চালাইতে না জানলে শুদামুদা বাঁইচ্যা কোনোই লাভ নাই।

লোক ভরে যেতেই, বাসটাও ছেড়ে দিল।

পরেশ, ড্রাইভারের পাশে বসে ভাবছিল, দাদার অসুখের কথা মনে পড়াতেই যে ও ফিরে যাচ্ছে; শুধু তা নয়। তা ছাড়াও আরও কিছু ছিল।

ওই রিংকি মেয়েটার শরীর ওর সমস্ত শরীরে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিল। এমন যন্ত্রণা ও কখনো ভোগ করেনি। মেয়েরা হল গিয়ে পুরুষের শত্রু। ওদের ওই শরীরের মধ্যে জাদু আছে। পুরুষ হল, বহির্মুখী জীব। বনে পাহাড়ে বন্দুক হাতে ঘুরে বেড়ানোই তার কাছে জীবনের সব। ওই মেয়েটা তাকে বন্দি করতে চেয়েছিল, না চেয়েই। অনেক বিপদের হাত থেকে বেঁচে সে এই পঁয়ত্রিশ বছর পথ পেরিয়ে এসেছে। ওই লোভের পথে পা বাড়াবে না বলে, নিজের ভিতরে এই মেয়ে জাতটার প্রতি এক গভীর ঘৃণা জমিয়ে তুলেছে ও। সংসার, ছেলে-মেয়ে, রান্না-বান্না, অসুখ-বিসুখ এ সব সে দাদার পরিবারে থেকেও জেনেছে। উপর উপর দাদার জন্যে বউদির জন্যে যতটুকু পেরেছে, করেছে। টাকা পয়সা, তার যা দেয়, তার থেকেও বেশি দিয়েছে চিরদিন। কোনো গদিতে থাকলে ওর চেয়ে কম খরচে ওর চলে যেত দিন। বিবেকের কারণেই পারেনি। তবে নিজের সংসার করার মতো মূর্খামি এতখানি পথ পেরিয়ে এসে সে করতে রাজি নয়। তাছাড়া ও মেয়ে তো সংসারের মেয়ে নয়। বাজারের মেয়ে। যাদের নষ্ট করার মতো অঢেল টাকা আছে ক্যামেরনের মতো, তারাই পারে ওরকম বাজারি মেয়ের সঙ্গে বাজার করতে। ওই সব মেয়ের ধর্মই পুরুষকে নষ্ট করা। যার ঘর আছে, তার ঘর ভাঙা। যার ঘর নেই, তাকে ঘরের মিথ্যা স্বপ্ন দেখানো। বেঁচে থাকলে, শিকার অনেকই করবে, টাকাও রোজগার করবে শিকার করে। মানে মানে প্রাণ নিয়ে, তার স্বাধীনতা নিয়ে, সে তাই পালিয়ে এসেছে।

পরেশ ভাবছিল, তার শরীরটা তার সঙ্গে এ প্রথম বেইমানি করল। তার শরীর মধ্যে এত হাজার কাঁকড়া ঘুমিয়ে ছিল, তাদের দাঁড়ার কামড় যে এমনই ভীষণ; তা আগে কখনো জানেনি ও। খোলা হাওয়ায় শেষ চৈত্রর বনের রাতের গন্ধে, পরেশের মন আবার খুশিতে ভরে উঠেছে।

ড্রাইভার বলল, বিড়ি খাবা না কি একটা পরেশদা?

দ্যাও।

বলে, পরেশ হাত বাড়াল।

তারপর বিড়িটা, হাওয়া আড়াল করে ধরিয়ে, জোর ধোঁয়া ছাড়ল এক বুক।

আঃ। শান্তি; বড় শান্তি। বড় আনন্দ এই আগল-খোলা, বাঁধন-হারা জীবনে। এই শান্তির কথা ঘরে ঘরে নিজের নিজের বউ নিয়ে জাবর-কাটা, খোঁটায়-বাঁধা পুরুষেরা কল্পনাও করতে পারে না।

শিলি নদীতে চান করতে গেছিল আজ। বহুদিন পরে।

পাশের বাড়ির মুনিয়াও গেছিল সঙ্গে। ও বলল, বাড়িতে অনেক কাজ। তাই তাড়াতাড়ি চান সেরে উঠে চলে গেছে আজ ও।

রোজ তো বাড়িতে চান করে। তোলা কুঁয়োর জলে, ঘেরা বাথরুমে। সপ্তাহে একবার করে আসে নদীতে। ভালো করে পা ঘষে, মাথা ঘষে, সঙ্গে কেউ থাকলে, তাকে বলে পিঠে সাবান দিয়ে দিতে। তারপর অনেকক্ষণ সাঁতার কাটে। নদীর স্রোত তার উলঙ্গ শরীরের আনাচে-কানাচে বয়ে যায়। অননুভূত অনুভূতিতে সারা শরীর আরামে আবেশে ভরে যায়। জলের যে কত সহস্র হাত, আঙুল তা যারা নদীতে অবগাহন না করেছে তারা জানে না। তার শরীরের গোপন, অসূর্যম্পশ্যা জায়গাগুলি সেই সব আঙুলের আদরে শিরশির করে ওঠে। ভালোলাগায় মরে যায় শিলি। কত কী কল্পনা করে সেই সব মুহূর্তে, কত সব স্বপ্ন সত্যি হয়ে ওঠে। যে-সব স্বপ্ন, শিশুকালের পুতুল খেলার দিন থেকে প্রত্যেক মেয়েই বুকে করে বড় হয়; সেই সব স্বপ্নই জলের তলায়, দুপুরের নিরিবিলিতে সত্যি হয়ে উঠতে থাকে এক এক করে।

মাঝে মাঝে ডুব দিয়ে অনেকক্ষণ থাকে জলের তলায় চোখ খুলে। জলের নীচের হলদেটে সবজে আলো প্রতিসরিত হয়ে গিয়ে তার দু'চোখের মধ্যে দিয়ে তার মস্তিষ্কের ভিতর নানা নরম রঙ ছড়িয়ে দেয়।

দুপুরের এই সময়টা নদীপারে কেউই থাকে না। কোনো নৌকোও এই সময় থাকে না নদীতে। জোয়ারভাটা দেখেই ওরা তরী বায়। সকালে জোয়ারে ভেসে যায়, বিকেলে ভাটায় ফেরে।

শাড়ি-শায়া-ব্লাউজ সব নদীপারের একটি ঝোপের উপরে খুলে রেখে এসেছিল। চান করে যে নতুন শাড়ি পরবে, তাও। যখনই আসে, তখন এমনই করে।

জলে অনেকক্ষণ পড়ে থাকার পর যখন তার হাত পায়ের আঙুল, মুখের চামড়া ঢেউ-খেলানো হয়ে গেল, শরীরে নদীর সব স্নিগ্ধতা বসে গেল, তখনই শুধু নদী ছেড়ে উঠল ও। জল ছেড়ে নগ্ন, রোদ-পিছলানো শরীরে ও যখন ঘুঘু-ডাকা নদীপারে উঠে আসে জল ঝরাতে ঝরাতে, তখন প্রতিবারেই ওর মনে হয়, ও যেন কোনো জলকন্যা। জলের নীচের কোনো প্রাসাদেই বুঝি ওর বাস। মাটির কোনো রাজপুত্রর দেখা পাবে বলেই যেন ও মাঝে মাঝে এই মাটির, গাছ-গাছালির, পাখ-পাখালির পৃথিবীতে উঠে আসে।

ঝোপটার কাছে তখনও ও এসে পৌঁছোয়নি এমন সময় একটা মাদার গাছের ঝুপড়ি ডাল থেকে কে যেন মোটা কর্কশ গলায় ডেকে উঠল, শিলি।

চমকে উঠে, প্রথমেই দু হাত দিয়ে বুক আড়াল করল শিলি। পরমুহূর্তেই বুক খোলা রেখে ও উরুসন্ধি ঢাকল দু হাতে। মেয়েদের শরীরের কোন জায়গাটা যে বেশি গোপন, পরকে দেখানোতে বেশি লজ্জা; তা বুঝি ক্ষণেকের জন্যে বুঝে উঠতে পারে না ও।

ততক্ষণে গদাই ঝুপ্ করে গাছ থেকে লাফিয়ে নামে। একটা নীল রঙা টুইলের শার্ট ওর গায়ে। মিলের ফাইন ধুতি। সে শিলির দিকে দৌড়ে এসে যে-ঝোপে ওর শাড়িটাড়ি ছিল, সেই ঝোপটার আর শিলির মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে। ওর চোখেমুখে মুগ্ধ, লুব্ধ দৃষ্টি। জড়িয়ে জড়িয়ে বলে, একটিবার হাত সরা শিলি। তোকে একবার দেখি ভালো করে।

শিলি গর্জে উঠে বলে, অসভ্য। জানোয়ার। দাঁড়াও। কাকাকে বলে দেব। কাকা তোমাকে কুকুরের মতো গুলি করে মারবে।

সরল শিশুর মতো মনের গদাই বলে, শুধু একটু দেখতে চাওয়ার জন্যে পরেশ কাকু গুলি করে মারবে আমাকে? তুই বড় কৃপণরে শিলি! যা নদী দেখল, মাছ দেখল, দেখল জলের শুশুক, এত

বড় আকাশ যা দেখল, দেখল এত এত গাছ আর পাখি, দেখল আকাশ-ভরা রোদ, তাই দেখতে চাওয়ায় এতবড় শাস্তি আমার?

একবার দেখতে দে শিলি। তোর পায়ে পড়ি।

গদাইকে অপ্রকৃতিস্থ দেখাল।

শিলি, এক ধাক্কায় গদাইকে সরিয়ে দিয়ে শাড়ি, জামা সব তুলে নিয়ে দৌড় লাগাল কোনো নিরাপদ আড়ালে গিয়ে ওগুলো পরে নেবে বলে।

আশ্চর্য! গদাই তার পেছনে পেছনে এল না। কোনোরকম অসভ্যতা করল না। শুধু মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল শিলির দিকে। জল-ভেজা ছিপছিপে কালো, লাফিয়ে-ওঠা শিঙ্গি মাছের গায়ে রোদ পড়লে যেমন চেকনাই ওড়ে, তেমন চেকনাই উড়ল দৌড়ে যাওয়া উলঙ্গ জল-ভেজা শিলির উড়াল শরীর থেকে। পেছনটাও কী সুন্দর। মনে মনে বলল, গদাই। তারপর স্তব্ধ, মুগ্ধ চোখে গদাই চেয়ে রইল, যেদিকে শিলি গেল।

গদাইও কবি। পরেশেরই মতো। একজন নারী-প্রেমী কবি। অন্যজন নারী-বিদ্বেষী।

গদাই ভাবে, কবি এই দুনিয়ার সকলেই। কেউ কাগজে কবিতা লেখে, কেউ মনে মনে। কেউ কবিতা পাঠায় সম্পাদকের দপ্তরে, কেউ মাকাল গাছের পাতা ছিঁড়ে অদৃশ্য মনের কালিতে সেই গোপন গা-শিউরানো কবিতা লিখে ভাসিয়ে দেয় নদীর জলে। কবিতার যে অনুপ্রেরণা, তারই উদ্দেশ্যে, নৈবেদ্যর মতো। বিজয়া দশমীর দিনে পলতেতে আগুন জ্বালিয়ে প্রদীপ ভাসায় যে মেয়েরা, তারাও গদাই-এরই মতো কবিতাই লেখে, প্রদীপের আগুন-রঙা কালি দিয়ে জলের কাগজে। ভাবছিল গদাই।

সবুজ গাছ-গাছালির মধ্যে ত্রস্ত হরিণীর মতো ছুটে-যাওয়া শিলির দিকে শুভকামনা, মুগ্ধতা, নীরব স্তুতিতে নির্বাক হয়ে চেয়ে থাকে গদাই, অনেকক্ষণ। নদীর ওপার থেকে উড়ে-আসা শঙ্খচিল ডাকতে ডাকতে উড়ে যায় শিলির মাথার ওপর দিয়ে। বহুদূর থেকে নিঃশব্দে গুণ টেনে বাদামি পাল তোলা নৌকোকে স্রোতের মুখে আসতে দেখা যায়। আঁৎকে ওঠে শিলি। আজ বড় বেশিক্ষণ জলে ছিল! নইলে নৌকো আসার সময় ত এ নয়।

গদাইও মনে মনে গুণ টানে। বাদামি পাল তুলে দেয় তার মনের নৌকোয়। জোরে হাওয়া এসে লাগে তাতে। যে হাওয়াতে জল-ভেজা শিলির নগ্নতার গন্ধ, সেই হাওয়া নাকে নিয়েই ভালোলাগায় মরে যায় গদাই।

তারপর গদাই-লশকরি চালে, বাড়ির দিকে হাঁটে। গদাই মনে মনে ভাবে, শিলিকে বউ না করতে পারলে, তেঁতুল গাছ থেকে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলবে ও। শিলিকে ছাড়া ও থাকতে পারবে না। ও যে কত ভালো, শিলিকে যে ও কত ভালোবাসে তা শিলিকে নিয়ে তার দোরবন্ধ ঘরের পালঙ্কে না শুতে পারলে, কী করে বোঝাবে শিলিকে?

গদাই-এর বুক ভেঙে এক মস্ত দীর্ঘশ্বাস উঠে এসে চৈত্র দুপুরের ঘুঘুর ঘু-ঘু-র-র-র-ঘু-ঘু-র-র-র, ঘুঘুর-র-র-র বিধুর স্বরের সঙ্গে মাখামাখি হয়ে যায়।

ঝিকা গাছের ডালে বসে বউ-কথা-কও ডাকে, বউ-কথা-কও—বউ-কথা-কও।

গদাই না বলে বলে, ও বউ কথা কও। কথা কও। কথা কও না ক্যান?

হাঁফাতে হাঁফাতে বাড়ি ফিরতেই শিলির বাবা বলেন, চান কইরতে কতক্ষণ লাগেরে তর? তুই কি রাধা হইলি? কোন্ কৃষ্ণ বইস্যা থাকে তর চান-দ্যাখতে, কদমের ডালে?

ধক করে ওঠে শিলির বুক। থরথর করে ঝড়ের গাছের মতো বুক কাঁপে তার।

বাবা কি জেনে গেছে?

নরেশ বলেন, ক্ষুধায় প্যাট চুঁই চুঁই করে। পরেশ আইস্যা বইস্যা আছে। রাঁধন-বাড়নের কাম নাই।

শিলি নীচু গলায় বলে, সবই তো রাইন্ধ্যা থুইয়াই গেছি। খালি, গরম গরম ভাত লামাইয়া দিমুআনে পাঁচ মিনিটেই।

বলেই, রান্নাঘরে ঢোকে ও।

হাঁসের ঘর থেকে দুটো মুরগি কঁক-কঁক করে ওঠে। ওদিকে চোখ তুলে চায় শিলি অবাক হয়ে। মুরগি এল কোত্থেকে?

নরেশ বলেন, পরেশ আনছে তামাহাট থিক্যা। আজ হাট ছিল। রাতে মুরগির ঝোল আর ভাত রাঁধিসানে। ক্যাবলারে কইয়া বিকাল-বিকাল ওগুলানরে কাটাইয়া থুস্।

শিলি ভাবে, খাওয়া ছাড়া বাবার আর কোনো চিন্তা নেই। শুধু খাওয়া আর খাওয়া। ম্যালোরীর জ্বর ছাইড়া যাওনের সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষুধা আরও জোর হয় য্যান।

এবার ভাত চড়িয়ে দেয় শিলি রান্নাঘরে গিয়ে। চাল ধুয়েই রেখে গেছিল। ঘি-এর ভাণ্ডটা কাত করে দেখে, কতখানি ঘি আছে। তেলের শিশিটা, রান্নাঘরের বাঁশের ছ্যাঁচা-বেড়ার দেওয়ালে গোঁজা ছিল। সেটাতেও একবার চোখ বেলায়। গরম গরম ভাত। মুসুরির ডাল। কড়কড়ে করে আলু আর বেসন-দেওয়া কুমড়োশাক ভাজা। আর সঙ্গে কাঁটালের বিচি ভাজা। এই আজকের রান্না।

রান্নাঘর থেকেই, উনুনের সামনে আম-কাঠের ছোট চৌকিতে বসে বলে, কাকায় গেল কই? ভাত নামাইলে তো ঠান্ডা হইয়া যাইবানে।

আইতাছে আইতাছে। নদীতে গেছে চান কইরার লইগ্যা।

নদীতে?

বুকটা ধক্ করে ওঠে শিলির।

বলে, আমি তো আইতাছি নদী থিক্যাই। তারে দেখি নাই তো!

কোন নদীতে আর কোন পথে গেছিলি তুই, তা তুইই জানস্।

শ্লেষের সঙ্গে বলেন নরেশ।

শিলির শরীরের সব জলীয় ভাব, উরুসন্ধির জলজ স্নিগ্ধতা সব কাঠের উনুনের তাপে শুকিয়ে যায় মুহূর্তের মধ্যে। অনেকখানি ভয়েও।

হঠাৎই বাইরে উঠোনে, পরেশের গলা শুনতে পেল ও।

পরেশ বলল, কই গেলিরে শিলি? দ্যাখ, কারে লইয়া আইছি।

শিলি কোমরে আঁচল গুঁজে বাইরে এসেই দেখে, কাকার সঙ্গে গদাই।

ভয়ে আধমরাই হয়ে যায় ও। কিন্তু হেসে বলে, কী খবর? গদাইদা?

এইতো তোমাগো খবর লইতেই তো আইলাম!

বলেই, একদৃষ্টে চেয়ে থাকে গদাই, শিলির দিকে।

পরেশ বলে, আমাগো গদাই-এর মাথাখান্ একেরে গ্যাছে গিয়া।

বড়ঘরের দাওয়ায় বসে নরেশ বলেন, ক্যান হইল কী?

ও নাকি আজ নদীর থিক্যা উইঠ্যা আসা পরীরে দ্যাখছে। কেবলই কয়, কী রূপ তার!

শিলি খিলখিল করে হেসে ওঠে। অভিনেত্রীর মতো।

বলে, বড়লোকের পোলাগো তো একমাত্র কাজই হপন দেখা। কী কও গদাইদা।

কমু কী আর। যা কই তা সত্যই।

তা তুমি কী কইরলা তারে দেইখ্যা? কথা কয় নাই কুনো? কোন ভাষায় কথা কয় পরীরা?

শিলি নিজের সপ্রতিভতায়, নিজেই ঝলমল করে উঠল।

রীতিমতো ভালো অভিনয় করছে ও। মেয়ে মাত্রই জন্ম-অভিনেত্রী।

ভাবল, শিলি।

কথা কী আর শোনবার অবস্থা ছিল আমার?

হে তো অজ্ঞান হইয়া পইড়্যা ছিল গাছতলায়। আমি কাছে গিয়া ডাক দিতেই, হায়! হায়! কী কান্না পোলার। যেন সাপে কাটছে তারে।

গদাই চুপ করে থাকল একটু।

তারপর বলল, বিশ্বাস করেন পরেশকাকা। সাপের কামড়ও ঢ্যার ঢ্যার ভালো আছিল। পাগল যে হইয়া যাই নাই, তাই যথেষ্ট। সে রূপ খালি-চোখে দেখনই যায় না। এত্ত তেজ।

শিলি বলল, তা ধুবড়ি থিক্যা বা তামাহাটে হাটের দিন যাইয়া একজোড়া গগলস কিন্যা আনো না ক্যান? আবারও যদি দর্শন পাও কুনোদিন। অমন ড্যাবা ড্যাবা চোখ দুইখান যে যাইব গিয়া চিরদিনেরই লইগ্যা।

হ। ভাবতাছি। তাইই করুম। পরীর দেখা তো, সাপের লেখারই মতো। আবার কবে যে হঠাৎ কইর‍্যা ঘটব ব্যাপারখান, তাতো কওন যায় না। আজ থিক্যা যখনই নদীর পারে যামু তখনই সেই গগলসখান পইরাই যামুআনে।

তারপরই গদাই বলল, আমি যাই। বাবায় তা নাইলে চিন্তা করবোআনে। না-খাইয়া বইস্যা রইব।

শিলি বলল, দুগা গরিবের ঘরে খাইয়াই যাও না, যাইই রান্ধা হইছে। আইস্যাই যহন পড়ছ, খাওনের সময়ে। ভালো খাবার কিছু না, তবে ভালোবাসা তো আছে।

গদাই হেসে বলল, ভালোই কইছো তুমি। ভালোবাসা কি চিবাইয়া খাওনের জিনিস? কপাল আমার।

বলেই, পা বাড়াল। বলল, আসুমানে অন্য একদিন। আগে আমারে নেমন্তন্ন পাঠাইও, তবে না আমু।

পরেশ বলল, মাসিমার কাছে সকালে শুইন্যা আইলাম পুতন নাকি আইতাছে ম্যানেজারের কে এক ছোকরা আত্মীয়রে লইয়া। সামনের শনিবারে। তা ওদের তো একদিন খাওয়াইতেই অইব। সেইদিন তোমারেও কইয়া দিম্যু। আইস্যো য্যান।

উত্তর না দিয়ে গদাই বলল, কে? কে আইতাছে?

গদাই-এর মুখের সব হাসি মিলিয়ে গেল। কালো হয়ে গেল অমন সুন্দর মুখটা।

পরেশ বলল, পুতন।

পুতন? আইতাছে নাকি?

গদাই ক্লিষ্ট কণ্ঠে বলল।

হ। তাইই তো কইলো মাসিমায়।

দেখুমানে।

বলেই, চলে গেল গদাই।

শিলির বুক নেচে উঠল আনন্দে। রাগও হল একটু। আসছেনই যদি এতদিন পর, তাও আবার সঙ্গে অন্য একজনকে নিয়ে কেন? একা আসতে যেন অসুবিধা ছিল! ভারী খারাপ!

নরেশ, চলে-যাওয়া গদাই-এর দিকে চেয়ে পরেশকে বললেন, গদাইটারে ভাবতাম বোকা-সোকা। কিন্তু কথা তো বেশ চোখা-চোখাই কয় দেহি।

পরেশ অন্যমনস্ক গলায় বলল, কোন কথা?

ওই যে, কইলো না? ভালোবাসা কি চিবাইয়া খাওনের জিনিস?

পরেশ হেসে ফেলল, দাদার কথা শুনে।

বলল, যা কইছো। দারুণই কইছে সেণ্টেন্সখান। এক্কেরে যাত্রার ডায়ালগ এরই মতো।

মাদারীহাট হয়ে, কুচবিহার হয়ে পুতনরা এসে পৌঁছেছিল, রবিবার সন্ধের বাসে, ধুবড়ি থেকে। ঠিক কখন আসবে তা জানত না। তবে জানত শিলি যে, বিকেলের দিকেই আসবে।

প্রথম-বিকেলে একবার কিরণশশীর কাছে গিয়ে কালো পাথরের বাটিতে একবাটি পায়েস দিয়ে এসেছিল।

পুতন যদি একাই আসত তাহলে থাকত ওখানে, যতক্ষণ না আসে। তবে, সঙ্গে অচেনা মানুষ নিয়ে আসছে। কেমন লোক তা কে জানে? তাই শিলি যায়নি ইচ্ছে করেই। পুতনের দরকার থাকলে সে নিজেই আসবে।

শিলি সামান্য দুশ্চিন্তাতেও আছে। নরেশবাবুর আর্থিক অবস্থা এমনই হয়ে পড়েছে যে, তা বলার নয়। কাকারও কোনো স্থায়ী রোজগার নেই। শিকার করেই যা হয়। আজকাল বনবিভাগও কড়াকড়ি আরম্ভ করেছে। ছাত্তারকাকাকে তো একবার অ্যারেস্টও করেছিল। ছাত্তারকাকু নাকি সংকোশের পারে হাতি মেরে তার দাঁত বিক্রি করে দিয়েছিল। পারমিট টারমিট নিয়ে তো শিকার কোনোদিনও করে না। তাই কাকার উপরে ভরসা বিশেষ নেই। কবে যে শ্রীঘরে যেতে হয়।

শিলির বাবাও ক্রমাগতই চাপ দিচ্ছেন গদাইকে বিয়ে করার জন্যে। গদাই-এর বাবার সঙ্গে বোধহয় কোনো অলিখিত চুক্তিও হয়েছে। শিলিকে গদাই-এর সঙ্গে বিয়ে দিলে ওঁকে বোধহয় একটা মাসোহারার বন্দোবস্ত করে দেবেন গদাই-এর বাবা। শিলির মনে হয়। তাতে বাবা-কাকার খাওয়া-দাওয়া, ক্যাবলারও, ক্যাবলার মাইনে, বাবার সিগারেটের খরচ ইত্যাদি দিব্যি চলে যাবে। সেটা অবশ্য গদাই-এর বাবার কাছে কিছুই নয়। অত সম্পত্তি যাঁর। তার উপর কুঁজোর জল তো গড়িয়ে খান না এখনও। সঞ্চয় যা আছে তো আছেই, তার উপরেও সমানে রোজগার করে যাচ্ছেন। আর বংশের বাতি বলতে তো ওই গদাইই একা।

তবু শিলিকে এইভাবে বিক্রি করে দিয়ে তার বাবা নিজের আখের গুছোচ্ছেন এই কথাটা ভাবলেই বড় ঘেন্না হয় ওর। বাবার উপরে তো হয়ই, তার নিজের উপরেও হয়। তাছাড়া গদাইদাটা যদি লেখাপড়াও করত একটু আধটু। এদিকে চালাক-চতুর আছে। সেদিন যা খেলাটা দেখাল। বলে কিনা, ভালোবাসা কি চিবানোর জিনিস?

নরেশবাবু বলেন, কলেজে পড়লেই কেউ অমনিতেই বিদ্বান হয়ে ওঠে না। যে ছেলে ব্যাবসা করতে পারে, সে কি বুদ্ধি ছাড়াই পারে? বুদ্ধি না থাকলে তো গদাই বাবার অতবড় ব্যবসায় সাহায্য করতে পারত না! তাছাড়া সাধারণত ব্যাবসাদারের ছেলেদের বুদ্ধিটা দুর্বুদ্ধিই হয়। বিশেষ করে আজকাল। কী করে লোক ঠকানো যায়, কী করে পয়সা আরও বেশি রোজগার করা যায়, এই ধান্দাতে থাকতে থাকতে তাদের সুবুদ্ধি বলতে আর বিশেষ কিছু বাকি থাকে না। পুরো নজরটাই বেঁকে যায় ওদের। কিন্তু গদাই ওরকম নয়। সুবুদ্ধি নিয়েই ব্যাবসা করে ও। প্রাণে মায়া দয়া আছে। এমনকী, এও শুনতে পান নরেশবাবু লোকমুখে যে, বাবাকে না জানিয়েই ও কর্মচারীদের নানাভাবে সাহায্য করে। বাবা নিজে যা করতেন না, বা জানলে করতে দিতেন না।

গোপেন সুকুলকে বাড়ি করার জন্যে টাকা দিয়েছে গদাই, রহমতুল্লার মেয়ের বিয়ে দিয়েছে, সব খরচ দিয়ে। সুভাষের ছেলেটাকে ধুবড়ির কলেজের হস্টেলে রেখে পড়াচ্ছে। নিজে পড়াশোনা না করলেও পড়াশোনার প্রতি যে ওর শ্রদ্ধা আছে, এসবেই তা বোঝা যায়।

ছাইন্যার দাদাটার পা কেটে গেছিল কোকরাঝাড় স্টেশনে রেলের ইঞ্জিনিয়ারের ট্রলির নীচে পড়ে, তাকে ধুবড়ি ম্যাচ-ফ্যাক্টরিতে চাকরিও করে দিয়েছে এই গদাইই। ম্যাচ-ফ্যাক্টরিতে শলাই কাঠের

সাপ্লাই বিজনেসটাও গদাই একাই সামলায়। সাহেবরা তো এখনও আছে দু একজন। তাদের সঙ্গে ইংরিজিতে কথা টথাও তো চালাতে হয়। স্কুল-কলেজে দু পাতা পড়ে কি লেজ গজায়? রবি ঠাকুর বা জি.ডি. বিড়লারা কি কলেজে পড়েছিলেন।

এসব নানা কথা বলে শিলিকে বোঝাতে চান তিনি। বলেন, যারা বেশি পড়ে, পড়াশুনায় ভালো হয়, তারা তো ওই ফার্স্টক্লাস পাওয়া পুতনের মতো ব্যাবসাদারদেরই চাকর হয়। যারা জানে, তারাই জানে যে, চাকরদের মধ্যে যতখানি নোংরামো, যতখানি নীচতা, খেয়োখেয়ি, ততখানি মালিকদের মধ্যে নেই। প্রমোশনের জন্যে পা-চাটে তারা, মেরুদণ্ড বিকিয়ে দেয়, বউ বা বোনকে পাঠিয়ে দেয় উপরওয়ালা বা মালিকের খাটে। অনেক বড় বড় চাকর দেখেছেন নরেশবাবু। চাকরেরা সব চাকরই। আর এই বাঙালি জাতটা চাকরের বংশধর, চাকর হবার প্রত্যাশা নিয়েই ওদের জীবনের যা কিছু বিদ্যা-শিক্ষা, আর তাদের ছেলেদেরও বংশপরম্পরায় তারা চাকরই বানায়।

গদাই কলেজে পড়েনি, স্বাধীন ব্যাবসা করে বলেই যে খারাপ ছেলে, তা নয়। তাছাড়া, ছেলেবেলা থেকেই বড়লোকির মধ্যে যারা মানুষ হয়, তাদের মনে অনেকরকম ক্ষুদ্রতা, ইতরামি, ছিঁচকেমিই থাকে না। হা-ভাতে ঘর থেকে এসে যেগুলো বড়লোক হয়, তাদের বেশিরভাগেরই বড়লোক হওয়ার প্রক্রিয়ার রকমটা নরেশবাবু ভালোই জানেন। এক জীবনে তো আর কম দেখলেন না। তাই অনেক ভেবেচিন্তেই নরেশবাবু শিলির সঙ্গে গদাই-এর বিয়ে দিতে চান।

তাছাড়া, পুতন ছিল ভালো। ওই কলকাতায় গিয়ে চা-বাগানে চাকরি নিয়ে, ডুয়ার্সে যাবার পর থেকেই, ওর চোখে মুখে লোভ চকচক করে। নরেশবাবুর মনে হয় যে, পার্থিব সুখের জন্যে ও করতে পারে না, এমন কিছুই নেই। ভালো-থাকা ভালো-খাওয়ার জন্যে, একটি স্কুটার বা টি.ভি কেনার জন্যে পুতন এখন মানুষও খুন করতে পারে।

গ্রাম থেকে উদ্বাস্তু হয়ে গ্রামেই এসে বাসা বেঁধেছেন নরেশবাবু, ইচ্ছে করেই। শান্তি যতটুকু থাকার, তা এখনও গ্রামেই আছে, এই গরিবির মধ্যেই, যেন-তেন-প্রকারেণ বড়লোকির মধ্যে কোনো বাহাদুরি নেই, সম্মান নেই। সুখ তো নেইই। মেয়ের ভালো চান বলেই গদাই-এর কথা ভাবেন। তিনি নিজে আর কতদিন! শিলির মায়েরও তাই কথা ছিল। দারিদ্র্য যদি মোটামুটি রকমের হয়, মধ্যবিত্তর জীবন হচ্ছে সব চেয়ে সুন্দর, সুখের, নিরুদ্‌বেগের জীবন। জীবনের মানে শুধুমাত্র ভালো-খাওয়া, ভালো-থাকা নয়, তার চেয়েও বড় কিছু। মূল্যবোধের উপর যে জীবন দাঁড়িয়ে থাকে, তার ভিত, বুনিয়াদ অনেকই বেশি শক্ত হয়, মূল্যহীন সমাজ বা সংসারের স্বাচ্ছল্যের চেয়ে।

কিন্তু নরেশবাবু এও দেখেছেন যে, দারিদ্র্য অসহনীয় হলে তা থেকে যেসব খারাপ জিনিস জন্মায়, তা বড়লোকির খারপত্বর চেয়েও অনেকই বেশি। মানুষের তখন অমানুষ হয়ে যাবার প্রবণতা জন্মায়। তিনি নিজের জীবন দিয়েই এটা উপলব্ধি করেছেন। বর্তমানের অপরিসীম দারিদ্র্য যেন তাঁর অমন রূপগুণের একমাত্র মেয়েটার জীবনেও না বর্তায়, তাইই দেখে যেতে চান উনি।

বড়লোকি যেমন ভালো নয়, মোটামুটি খেতে-পরতে না পেলে মানুষের মনুষ্যত্ব বাঁচিয়ে রাখাও যে দায় হয়ে ওঠে।

মাঝে-মাঝেই তিনি নিজেও যে অমানুষ হয়ে উঠছেন, তাও বুঝতে পারেন। খিদের মতো খারাপ রোগ আর কিছুই নেই। মানুষের শরীর, মানুষের মন, সবকিছুই ছুঁচোর মতো কুরে কুরে খেয়ে যায় এই খিদে। শিলিটার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার যে করেন, সেটা এই দারিদ্র্যরই জন্যে। নিজের অপারগতারই জন্যে। অপারগতা অসীম হলে, তখন অপারগ, অসভ্য, অবুঝ, অভব্য হয়ে ওঠে। এই দারিদ্র্যর কামড় যে না খেয়েছে, সে কখনোই জানবে না ওঁর জ্বালা।

নরেশবাবুর, গদাই বা তার বাবার কাছ থেকে বিন্দুমাত্রও প্রত্যাশা নেই। উনি জানেন না, শিলি

কী ভাবে তাঁর সম্বন্ধে। শিলির সঙ্গে গদাই-এর বিয়েটা হয়ে গেলে তিনি কুমারগঞ্জ ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবেন, এই ভিটে পরেশকে লিখে দিয়ে। কারণ, চোখের সামনে থাকলেই জামাই তাঁর জন্যে কিছু করবেই। মেয়েরও কষ্ট হবে বাবার জন্যে। মেয়ের বিয়ের পরে উনি পথে পড়ে মরলেও কোনো দুঃখ নেই ওঁর। এই জীবন, যে-জীবনে কাউকেই কিছুমাত্র দেবার ক্ষমতা নেই, কাউকেই সুখী করার ক্ষমতা নেই কোনোভাবেই; সে জীবন থাকা না-থাকা সমান।

আত্মহত্যা করে মরে যাবেন বলেও ভাবেন, কখনো কখনো। জীবন মানে তো শুধু নিশ্বাস ফেলা বা প্রশ্বাস নেওয়া নয়। জীবন যদি জীবন্ত না হয়, তবে তা নিজে হাতে নিভিয়ে দেওয়াই ভালো। জীবন যদি ঈশ্বরের দান হয়, তবে সে জীবন নিভিয়ে দেওয়ার স্বাধীনতাও ঈশ্বরেরই দান। সব জীবেরই মতন, মনুষ্যেতর জীবের মতো বেঁচে থাকার চেয়ে, মরে যাওয়া অনেকই বেশি সম্মানের।

গা-টা ধুয়ে শিলি একটি পরিষ্কার করে ধোওয়া কালো-সবুজ ডুরে শাড়ি পরেছিল। চোখে, কাজল দিয়েছিল। গলায় কুঁচফলের লাল-কালো মালা পরেছিল। উঠোনের কোণ থেকে তুলে গন্ধরাজ ফুল গুঁজেছিল খোঁপায়। লাল-কালো অথবা লাল কিংবা কালো কোনো ফুলই হাতের কাছে পায়নি যে, শাড়ির রঙের সঙ্গে মিলিয়ে খোঁপায় দেয়। কালো ব্লাউজ পরেছে একটি। সবচেয়ে ভালো "ব্রা"টি বের করে পরেছে আজ। তিনটি ব্রা আছে ওর সবসুদ্ধু। তার মধ্যে একটিই আস্ত। ওর চলে-যাওয়া মায়ের ব্রা আছে আলমারিতে, গোটা পাঁচেক। কিন্তু তার কুমারী বুকে তা ঢলঢল করে। ওর বুক যতদিনে মায়ের ব্রা-এর যোগ্য হয়ে উঠবে ততদিনে ব্রাগুলো ছিঁড়েই যাবে, নয়তো ইঁদুরে কেটে দেবে। ব্রা কাটলে কাটুক! ইঁদুরে-বাদুড়ে বুক না কাটলেই হল।

কোনো মেয়েই চায় না যে, তার সৌন্দর্যের মধ্যে সবচেয়ে যা সুন্দর, সেই বুক তাড়াতাড়ি মায়েদের মতো বড় হয়ে যাক।

বারান্দার দাওয়ায় বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসেছিল শিলি। বাবা, নগেন জ্যাঠাদের বাড়ি গেছেন। কাকা বাসস্ট্যান্ডে যায় এই সময়ে। রোজই। পান খায়, গল্পটল্প করে। দু-দিকের বাস ক্রশিং করে। নানা খবরাখবর চালাচালি হয়। ড্রাইভারদের দিয়ে কখনো-সখনো মুরগিটা, পাউরুটিটা আনিয়েও নেয়, আপ বা ডাউনের কোনো জায়গা থেকে।

চাঁদ উঠেছে এখন বাঁশঝাড়ের পেছনে। সন্ধের আগে একঝাঁক চাতক পাখি চমকে চমকে বেড়াচ্ছিল, ফটিক-জল, ফটিক-জল বলে। বছরের এই সময়টাতেই পাখিগুলোকে দেখা যায়। অন্য সময়ে কোথায় যে যায়, কী যে করে ওরা, তা কে জানে!

একটা লক্ষ্মী পেঁচা উড়ে এসে বসল, সিঁদুরে আমগাছটার ডালে।

চাঁদের আলোয় একটুক্ষণ বসে থেকেই উড়ে গেল।

লক্ষ্মী পেঁচা, লক্ষ্মীকে আনে ঘরে। এলে, ভালো হয় খুব।

একটা গান গাইতেন মা, লক্ষ্মী বন্দনার। মনে পড়ে শিলির। ভারী সুন্দর গানটি;

"এসো সোনার বরণ রানি গো, এসো শঙ্খ কমল করে
এসো মা লক্ষ্মী, বসো মা লক্ষ্মী, থাকো মা লক্ষ্মী ঘরে"

লক্ষ্মীকে ত ডাকে সকলেই, কিন্তু লক্ষ্মী কি সাড়া দেন সবার ডাকে?

শিলি লক্ষ্মীকে অবশ্যই চায়, কিন্তু এই দারিদ্র্যর জন্যেও তার এক বিশেষ অহংকার আছে। দারিদ্র্যমাত্রই প্রত্যাশায় ভরা, ভবিষ্যতের স্বপ্নে ভরা। তার গর্ভে যে কী ঢেকে রাখে, তা শুধু দারিদ্র্যই জানে। দারিদ্র্যর মধ্যে বিন্দুমাত্র লজ্জা নেই। শিলি অন্তত করে না লজ্জাবোধ। লজ্জা, দারিদ্র্য লুকোনোর চেষ্টার মধ্যেই।

চারপাশ থেকে চৈত্রসন্ধ্যার গন্ধ উঠছে। পাঁচমিশেলি গন্ধ। তার সঙ্গে সাবান দিয়ে ভালো করে চান-করে ওঠা শিলির গায়ের সুগন্ধও মিশে গেছে। চৈত্রসন্ধ্যার গন্ধ শুধু ওঠে না, উঠেই পাগলামিভরা চৈতি হাওয়াতে ইতস্তত ছড়িয়ে যায়। ফতিমা দিদির বুকের ভাঁজের আতরের গন্ধর মতন তা ছড়িয়ে যায় চতুর্দিকে, সমানভাবে। মনটা পাগল-পাগল করে। শুধু মনটাই করে না শরীরটাও, কে জানে! কোনটা শরীরের পাগলামি আর কোনটা মনের, জানে না ও।

আতরের গন্ধে নিজেকে কখনো কখনো খুউব ভালোবাসতে ইচ্ছে করে ওর।

আজ চান করে ওঠার পর যখন জামা কাপড় পরে কাজল আঁকছিল চোখে, দেওয়ালে ঝোলানো আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে, তখন লণ্ঠনের আলোতে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল শিলিকে। নিজেরই চোখে। বেশ, বউ বউ। যেদিন ও বউ হবে সস্তার বেনারসী পরে, সোনালি রুপোলি রিবন দিয়ে খোঁপা বাঁধবে, পায়ে আলতা পরবে, গায়ে-হলুদের হলুদ হলুদ ছোপ লেগে থাকবে বুকের ভাঁজে, দুই কুঁচকির পাশে, নাভিতে, ক্যালকাটা কেমিকেলের কান্তা সেন্টের গন্ধে ভুরভুর করবে যেদিন তার গা, নিজের গায়ের মিষ্টি গন্ধের চেয়েও অনেক বেশি মিষ্টি হয়ে সেদিনকার সেই স্বপ্নের সুখেরই মতন সুন্দর এক ভাব ফুটেছিল তার আলোকিত মুখখানিতে।

আজকে খুব ভালোবাসতে ইচ্ছে করছে নিজেকে। বাড়িতে কেউই নেই এখন। ক্যাবলাটাও ছুটি নিয়ে গেছে গৌরীপুরে। এই চাঁদের রাতে, একা-বাড়িতে পুতনদা যদি আসত, যদি দুহাতে তার এই মুখখানিকে আদরে ধরে তার ঠোঁটে আলতো করে একটা চুমু খেত, বেশ হত তাহলে।

ও খুব ন্যাকামি করত, ঢঙ করে বলত, করো কী? অসভ্য! ছাড়ো ছাড়ো! তোমার দাড়িতে লাগে। জ্বালা করে গাল। দাড়ি কামাও নাই ক্যান্? জংলি!

পুতন বলত, কামাইছিলাম তো। তবে সেই সাত সকালে। আমি কী আর জানতাম ছাই যে, তোমারে চুমু দিমু আজ? তাইলে তো বিকালে আরও একবার কামাইয়াই আইতাম।

পুতনদা তাকে ছেড়ে দেওয়ার পরও অনেকক্ষণ তার ঠোঁট দুটি জ্বলত। জ্বালাতেও কত্ব ভালোলাগা। কত রকমের জ্বালাই না থাকে। সত্যি।

দেখতে দেখতে কখন যে চাঁদের আলোতে ভরে গেছে চারপাশ, নিঃশব্দে, খেয়ালই করেনি শিলি। হিজল গাছটার মাথার উপরে সন্ধ্যাতারাটা উঠে স্নিগ্ধ নীল দ্যুতিতে ফুটে রয়েছে, যেন কোনো নীলরঙা উজ্জ্বল ফুল।

বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। টর্চের আলো এসে পড়ল গেটের কাছে। চাঁদের আলোতে ফিকে দেখাল সে আলো। পুতনের গলার স্বর না? তাইই তো। কার সঙ্গে যেন কথা বলতে বলতে আসছে।

শিলি। শিলি আছস্ নাকি? কাকাবাবু? পরেশকাকু?

আমি পুতন!

কে?

শিলি, জবাব না দিয়ে উঠে দাঁড়াল দাওয়ায় হেলান-দেওয়া অবস্থা থেকে।

মুখে বলল, ভিতরে আইতাছো না ক্যান? বাবায়-কাকায় কেউই বাড়িতে নাই। আমি একাই আছি।

পুতনের সঙ্গের মানুষটি বলল, ফার্স্ট ক্লাস। চাপা গলাতে।

শুনল, শিলি।

মানুষটার গলার স্বরটা ভালো লাগল না ওর। গলার স্বরেও মানুষের অনেকখানি বোঝা যায় লোকটা ভালো নয়। এই কি সেই?

শিলি বলল, মনে মনে।

পুতন লোকটিকে নিয়ে চ্যাগারের দরজা দিয়ে ঢুকে এল।

বলল, দ্যাখ শিলি, কাকে এনেছি।

পুতনদার মুখে এমন কোলকাতাইয়া ভাষা শুনে, ঘাবড়ে গেল শিলি।

পুতন আবারও বলল, অনেকক্ষণ আগেই আসতুম, কিন্তু আমার বন্ধু রাজেন, চান করতে, পাউডার মাখতে এতই সময় নিল যে কী বলব। কলকাতার মানুষ তো! বড়লোকের ছেলে।

শিলি, তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে মাদুর এনে বিছিয়ে দিল, বড় ঘরের দাওয়াতে।

রাজেন পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে আছে। গা থেকে সেন্টের মিষ্টি নয়, ভীষণ উগ্র গন্ধ বেরুচ্ছে, ভুরভুর করে। গন্ধটাও ভালো নয়। সুগন্ধের মধ্যেও, কিছু সুগন্ধি কাছে টানে শিলিকে; আর কিছু সুগন্ধ দূরে সরায়। হয়তো সব মেয়েরই এমন হয়। হয়তো পুরুষেরও হয়, যারা সুগন্ধ ভালোবাসে। তাছাড়া, ওদের দুজনের মুখ থেকেই ভক্‌ভক্ করে কীরকম একটা গন্ধ বেরোচ্ছে। তাতে গা-গুলিয়ে উঠল শিলির। গন্ধটা কীসের তা বুঝল না, তবে অনুমান করতে পারল। পেরেই, পুতনদার কথা ভেবে, ওর হাত পা ঠান্ডা হয়ে এল। প্রচণ্ড কষ্ট হতে লাগল বুকের মধ্যে।

পুতন বলল, ওকী? দূরে কেন? আরে কাছে এসে বসো। কলকাতা থেকে তোমার জন্যে নতুন বন্ধু আনলুম। কতা-বাতরা বলো।

পুতনের মুখে এই ভাষা শুনে শিলির ক্রমশই রাগ বাড়তে লাগল। বাকরোধ হয়ে গেল। সত্যিই। অনেকই বদলে গেছে মানুষটা। যে-সব মানুষ নিজের ছেলেবেলা, নিজের মা-বাবা, নিজের পরিবেশ, অনুষঙ্গ, নিজের মুখের ভাষাকে এত তাড়াতাড়ি ভুলে যেতে পারে, দুটো পয়সা বা দুটো বেশি পয়সা রোজগার করার জন্যে, সেই সব মানুষ কখনোই খাঁটি হয় না।

মেকি মানুষরাই এরকম করে। হীনমন্য মানুষেরা। অমন ভণ্ড মানুষদের চিরদিনই ঘেন্না করে এসেছে শিলি।

মনটা হঠাৎই খারাপ হয়ে গেল শিলির।

এমন সময় পুতনদার সেই বন্ধু রাজেন যার নাম, পুতনদাই বলছিল, ফস করে হাতের পাঁচ ব্যাটারির টর্চটি ফোকাস করল শিলির মুখে। হঠাৎই আলো পড়ায় দুটি চোখই বুজে গেল শিলির।

রাজেন নিজের মনে বলল, খাসা! ভিলেজ বিউটি!

পুতন চাপা ধমক দিল। আঃ! রাজেন!

হলটা কী? বিউটি দেখে অ্যাপ্রিসিয়েট করব না?

পুতন সামলে নিয়ে বলল, বুজেচো শিলি, রাজেন কলকাতার খুব বড়বাড়ির ছেলে। ও হচচে আমাদের বাগানের ম্যানেজারের আত্মীয়। কোনোদিন গ্রামই দেকেনি তো। তাই এয়েচে আমার সঙ্গে। গ্রামের মেয়েদের সৌন্দর্য সম্বন্ধে ওর দারুণ ইন্টারেস্ট। তোমাকে দেখে তো প্রেমেই পড়ে গেচে। অবশ্য পড়েছিল আগেই। আমার মুখে তোমার গল্প শুনে শুনে।

শিলি পাথরের মূর্তির মতো বসেছিল।

লক্ষ্মী পেঁচাটা উড়ে গেছিল আমগাছ ছেড়ে, অনেকক্ষণ। শিলিকে ছেড়ে সব স্বপ্নও উড়ে গেছিল। অমন গন্ধভরা উদ্‌বেল চৈত্রর চাঁদের রাতে স্তব্ধ হয়ে এই নতুন পুতনের সামনে কাঠের পুতুলের মতন বসেছিল শিলি।

ভাবছিল, পুতন আসার স্বপ্নটা সত্যি না হলেই ভালো হত।

একটা গান শুনিয়ে দাও তো শিলি, আমার ফ্রেন্ডকে।

শিলি বিরক্ত গলায় বলল, যখন তখন গান আসে না আমার।

কখন আসে?

রাজেন ভকভক করে গন্ধ ছড়িয়ে বলল।

যখন আমার ইচ্ছে হয়।

শিলি বলল।

শক্ত করে মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে।

এখন একটু শোনালে হত না। আজ কী সুন্দর রাত মাইরি। গান গাইবার মতো রাত। ইচ্চেকে কি হওয়ানো যায় না?

শিলি কিন্তু সত্যিই দারুণ গান গায়।

পুতন বলল, শিলিকে রাজি করাবার আশায়।

কী গান গায়?

কত গান। রবীন্দ্রসংগীত, অতুলপ্রসাদ, শ্যামাসংগীত।

"তুমি কাদের কুলের বউ গো তুমি কাদের কুলের বউ? যমুনায় জল আনতে, আনতে যাচ্চো, সঙ্গে নেইকো কেউ?" এই গানটা জানো নাকি গো?

অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করে বলল, রাজেন।

শিলি মাদুর থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, না। আমি জানি না। আর আমারে "তুমি" কইর‍্যা কইয়েন না আপনে। আপনে কইর‍্যাই কয়েন।

রাজেন হাসল, রসিকতা করে বলল, আচ্ছা! তাই কম্যু।

বলেই, বাঙাল ভাষাটা ঠিক বলতে পারল কী না তা জানবার জন্যে পুতনের দিকে চাইল।

পুতন বলল, সাতবোশেখির মেলা তো এসে গেল। সামনের রবিবার। আমার বন্ধুকে নে যাব দেখাতে। তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে? শিলি?

না।

না কেন? তোমার বড় গুমোর হইয়েচে দেকচি।

"গুমোর' কথাটা শোনেনি আগে শিলি। কেউই বলেনি তাকে।

বুঝল, কথাটার মানে দেমাক। পুতনের মুখে ওইরকম বিজাতীয় ভাষা শুনে ও আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিল। বিড়ালে যেমন করে কবুতরের পালক ছিটিয়ে রক্তের ফিনকি দিয়ে ছিন্নভিন্ন করে খায় তেমন করেই শিলিকে ছিন্নভিন্ন করে দিল এই নতুন ক্যালকেশিয়ান কালচারের পুতন।

শিলি স্তব্ধ হয়ে ভাবছিল, কত অল্পদিনে কত্ত বদলে যেতে পারে একজন মানুষ!

তারপর ভাবল, হয়তো মানুষই পারে। কুকুর-বেড়ালের পক্ষেও সম্ভব নয়।

পুতন বলল, শিলি, আমার মুখ চেয়ে 'না' করো না তুমি। আমি নরেশকাকাকে বলব। মাও তোমাকে বলবেন। মানে, আমার মা।

শিলি হঠাৎ বলল, না। আমি কোত্থাও যাম্যু না। আর তোমাগো ভালয় ভালয় কইতাছি, বাবা কাকা আসনের আগেই তোমরা চইল্যা যাও পুতনদা। তোমার তো অনেকই উন্নতি হইছে দেহি! মদও খাইতাছো আজকাল। কাকা আইয়া পড়লে বিপদ অইব কিন্তু। গুলি কইর‍্যা মাইরাও ফ্যালাইতে পারে তোমাগো। একা বাড়িতে আমি, আর তোমরা মদ খাইয়া আইছো আমার লগে দেখা করনের লগ্যে। তোমাগো সাহস তো কম না!

কইচে কি পুতন? ও পুতন? ময়না কইতিচে কী? আরে ভিলেজ-বিউটি, মদ খেয়েই তো মানুষে মেয়েমানুষের কাচে আসে! তুমি তো অবাক করলে মাইরি। আমিই কি তোমার পত্তম নাগর? অ্যাঁ।

এমন সময় দূরে সাইকেলের ঘন্টি বাজল।

টর্চের আলোর ঝলকও দেখা গেল।

আতঙ্কিত শিলি বলল, ওই কাকায় আইতাছে। তোমরা পিছনের দরজা দিয়া পালাও। কাকার সামনে মদ খাইয়া যদি যাও, তো বিপদ হইবনে।

পুতন বলল, ন্যাকামি কোরো না। তোমার কাকা যেন মাল খায় না।

পুতনের মুখে এমন ভাষা এবং সে ভাষা উচ্চারণ করার ভঙ্গি দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল শিলি।

এমন সময় কাকা এসে ঢুকলেন, সাইকেল হাঁটিয়ে নিয়ে।

এই যে! পরেশকাকু! আমি এসেছি। সঙ্গে আমার বাগানের ম্যানেজারের আত্মীয় রাজেন চাটুজ্যে।

পরেশ কাছে এসে, শেয়ালের মতো নাক তুলে বাতাস শুঁকে বলল, বাবাঃ পুতন দেখি লায়েক হইছো।

পুতনের ভাষার-নতুনত্বের ঘোর তখনও কাটেনি পরেশের।

সেই ঘোরের মধ্যেই বলল।

রাজেন বলল, পরেশকাকা, ওর দোষ নেই। আমিই খাইয়ে দিয়েচি ওকে। আপনি খাবেন?

কী?

চমকিত পরেশ বলল।

হুইস্কি। একটা আস্ত পাঁইট পকেটেই আছে। ব্ল্যাক-নাইট। বিলিতি মাল।

মদ আমি খাই পুতন। কিন্তু বাড়িতে খাই না। সকলের সঙ্গেও নয়।

এটা কি ভণ্ডামি নয় পরেশকাকা?

রাজেন বলল।

সেটা আমি বুঝব।

তারপর পুতনের দিকে ফিরে বলল, মদ খাইয়া বাড়িতে আইস্যা শিলির লগ্যে কী গপ্প করতাছিলি তুই?

পুতন একটু ঘাবড়ে গেল।

বলল, এই রাজেনকে নিয়ে সাতবোশেখির মেলায় যাব। তাই শিলিকে বলতে এসেছিলাম। ও যদি যেত, তবে আমার কলকাতার ফ্রেন্ড খুশি হত।

পুতন বলল।

পরেশ বলল, এখনও দেরি আছে সাতবোশেখির মেলার। তা শিলি কী কয়?

ও তো বলল, যাবে না। আপনি একটু বুঝিয়ে বলুন না পরেশকাকা। ও গেলে রাজেনের ভালো লাগত। আমাদের এই গ্রামে তো বায়োস্কোপ-থিয়েটার কিছুই নেই। বেচারার সময়ই কাটছে না। শিলি গেলে বেশ এনজয় করত ও।

পরেশ বলল, শিলি তো আর খুকি নয়। মেলাতে তো ও যাইব নিশ্চয়ই। তবে তোমাগো লগ্যে যাইব কী যাইব না, তা সম্পূর্ণ ওরই ইচ্ছা। ভাইবা দ্যাখনের সময় তো যথেষ্টই আছে। না, কি কও পুতন?

হ্যাঁ, তাত আচেই।

পুতনের চেহারা, চাল-চলন, মুখের ভাষা সবই আমূল বদলে গেছে। পড়াশুনো করে, বড় পরীক্ষা পাশ করে, বড় মানুষ হতে গেলে যে নিজেকে বদলাতে হয় তা জানত পরেশ এবং সেই জন্যে হয়তো, সবাইই যাকে "বড় হওয়া" বলে তা ও কোনোদিনই হতে চায়নি। সকলের মতো ও যে হয়নি, তা জেনে নতুন করে আশ্বস্ত হল পরেশ। পুতনটার জন্যে দুঃখ হল। ছেলেটা একেবারেই বয়ে গেছে, শহরের চোর-জোচ্চোরদের মতো হয়ে গেছে স্বভাব। কিরণমাসির একমাত্র বেঁচে-থাকা

ছেলেটা পুরোপুরি বুঝি অমানুষই হয়ে গেল! এর চেয়ে কিরণমাসির অন্য ছেলেগুলোর মতন ও-ও মরে গেলেই ভালো হত।

কী ভাবছেন পরেশকাকা?

ভাবতাছি। তা, ভাবনা তো আর দেখান যায় না। আইজ তোমরা ওঠো। আমি না হয় মদটদ খাই। কিন্তু দাদাতো এসব একেবারেই পছন্দ করে না। জানোই তো তুমি। পথে দাদা আসতাছে দেইখ্যা আইলাম। তারিণীদার বাড়ি থিক্যা বাইরাতে দেখলাম। আইয়া পইড়লো বইল্যা। দাদার আসনের আগেই তোমরা ওই পশ্চাতের চ্যাগারের দরজা দিয়া পলাও। নইলে, কীসে কী হয়, তা কহন যায় না। দাদায় তো লো-প্রেসারের রোগী। হঠাৎ হঠাৎ রাইগ্যা যায়। জানোই তো। কী পুতন? জানো, না কি?

হ্যাঁ। হ্যাঁ। জানব না। নরেশকাকার মেজাজ তো নোটোরিয়াস। আমাকে দু-ঘা বসিয়ে দিলেই বা কী? কিন্তু আমার ফ্রেন্ডের তো ইজ্জৎ বলে একটা ব্যাপার আছে।

বাঃ। শুইন্যা বড় আনন্দ পাইলাম। ইজ্জৎ জ্ঞানসম্পন্ন লোক এ দ্যাশে পেরায় গণ্ডারের মতোই দুইষ্পাপ্য হইয়া উঠছে। হত্যই আনন্দ পাইলাম।

এবার বাইরে নরেশবাবুর কাশির শব্দ আর টর্চের আলো শোনা এবং দেখা গেল।

পরেশ বলল, ওই যে আইতাছে।

সঙ্গে সঙ্গে পুতন রাজেনকে নিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে ছায়াচ্ছন্ন বাঁশবনের নীচের পথে মিলিয়ে গেল।

বাইরে বেরিয়েই, কথা বলতে যাচ্ছিল রাজেন। পুতন মুখ চেপে ধরল। কিছুদূর ওকে মুখ-চেপে নিয়ে গিয়ে, মুখ-থেকে হাত সরিয়ে নিল।

রাজেন বলল, তুমি কী মাইরি গুরু! শালা! গা গরম করতে করতেই বিবি পালাল। তোমাকে তো বলেইচি গুরু, পেটে আমার মাল পড়লে মাগি আমার চাইই। তোমাদের গ্রামে খারাপ পাড়া-ফারা নেই কি? রেডলাইট এরিয়া। যেখানে শান্তির সঙ্গে ট্যাকের কড়ি গুনে দিয়ে মাগিদের খোমা দেখা যায়। নিজের খুপরিতে, নিজে সম্রাট হয়ে, নিজস্ব সুন্দরীকে নিয়ে যা খুশি করা যায়?

পুতন বলল, না। এই গ্রাম ভদ্রলোকদের গ্রাম।

মরে যাই! মরে যাই! কী কতাই শোনালে মাইরি। ওসব আমার জানা আছে। ঘোমটার তলায় খ্যামটা নাচে না এমন মেয়েছেলে নেই কোনো ভদ্রলোকের গেরামে, এমন কথা আর যে মক্কেলেই বিশ্বাস করুক, এই মক্কেল করবে না। আসলে বলো যে, তুমি ঝেড়ে কাশছ না।

পুতন একটু অসহিষ্ণু গলায় বলল, সত্যিই বলছি থাকলেও আমি জানিনা।

যাঃ শালা! এখন কী করি? গা গরম হয়ে গেছে যে! এখন ঠান্ডা হই কী করে?

একটু এগিয়েই, ফাঁকা মাঠে এসে পড়ল ওরা। সামনে হরিসভার বাঁধানো চাতাল। পাশে পুকুর। হরিসভার চারপাশে হাসনুহানার ঝাড়। মিষ্টি গন্ধ ভাসছে চাঁদ মাখা আকাশে।

রাজেন হরিসভার চওড়া, সিমেন্ট-বাঁধানো, চাঁদের-আলোতে চকচক-করা চাতাল দেখে বলল, বাঃ। ওই তো মাল খাওয়ার জায়গা। তা গুরু, প্রথমেই এইকানে নিয়ে এলে না কেন? এসো, এই চাতালে বসে নতুন পাইটটাকে শেষ করি।

পুতন বলল, ছিঃ। এখানে অষ্টপ্রহর কেত্তন হয়। হরিনাম হয়। পালাগান সব। কখনো চব্বিশ প্রহরও হয়। হরিসভার চাতালে বসে মদ খাবে কী?

যাঃ শালা। এ ক্যালানে বলে কি মাইরি! সেই শায়েরি জানো না? এক মাতাল মসজিদে বসে

মাল খাচ্ছিল। তো মৌলবি এসে বলল, এখানে বসে টানচো তুমি? কেমন বে-আক্কেলে লোক হে? জানো না, এখানে খুদাহ্ থাকেন?

বলেই রাজেন হরিসভার চাতালে উঠে ভালো করে জোড়াসনে বসে পকেট থেকে পাইটটা বের করল।

তারপর কী হল, শোনো। নিজেই বলল, আবার।

কী হল? বিরক্তির গলায় শুধোল পুতন।

সে শালা মাতাল, মৌলবির দাড়ি নেড়ে দিয়ে বলল,

"পীনে দে মুঝে
মদজিদমে বৈঠকর।
ইয়ে উ জাগে বাতাঁদে যাহাঁ খুদাহ্ ন হো।"

মানে?

পুতন শুধোল। তখন বিরক্ত গলায়।

রাজেনকে এখানে এনে যে ও ভুল করেছে, তার নিজের ক্ষতিই সবচেয়ে বেশি করেছে, তা ক্রমশই ও বুঝতে পারছে।

আবারও বলল পুতন, মানে কী হল তোমার ওই শায়রির?

শোনো গুরু, মানেটা হল, খুদাহ যদি একমাত্র মসজিদেই থাকেন তো ভালো কতা। আমি চলেই যাচ্ছি। কিন্তু আমাকে এমন জায়গা দেখিয়ে দাও তো বাওয়া, যেখানে খুদাহ নেই। একটা জায়গা দেকাও। তাকেই বলল। সারা পৃথিবীটাই ত ঈদগাহ্। তোমার হরিসভা তো মসজিদেরই মতো ধম্মোস্থান? নয় কি? আরে!

কী হল? ঢালো মুখে এট্টু। মেজাজ বিগড়ে গেছে মনে হচ্ছে গুরুর।

নাঃ। ওমনি।

নাও, ঢালো।

না, না। আমি আর খাব না।

সে কি? কী হল?

নাঃ।

পুতন ভাবছিল, নিজের জায়গায় খারাপ হতে লজ্জা করে। সকলেরই তো পরেশকাকার মতো বুকের পাটা নেই যে, যাইই করে তা বুক ফুলিয়ে করে। বাবা যখন বেঁচেছিলেন, বাবার মুখে শুনেছিল যে, অ্যামেরিকান আর টমী সৈন্যরা অথবা চা বাগানের ম্যানেজারেরা যে বেলেল্লাপনা এদেশে এসে করেছে, তা নিজেদের দেশে করার কথা তারা চিন্তা পর্যন্ত করতে পারত না। পুতনও আস্তে আস্তে বুঝতে পারছে, নিজের শিকড়ের কাছাকাছি থেকে, নিজের আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-পরিচিত, নিজের আজন্ম পরিবেশের মধ্যে থেকে, একজন মানুষের খারাপ হয়ে যেতে অনেক বেশি খারাপত্ব লাগে। ভালো হতে যে জোর লাগে, খারাপ হতেও তেমনই জোর লাগে। স্রোতের শ্যাওলা যারা, তাদের কথা অন্য। পুতন নিজের কাজের জায়গায়, চা-বাগানে কুলি বস্তীতে বা ওর নির্জন কোয়ার্টারে যা কিছুই করতে পারে রাজেনের সঙ্গে, তা ও নিজের গ্রামে এসে করার কথা ভাবতেও পারে না। মনে হয়, ভাবলেও অপরাধবোধ জাগে এক ধরনের। এই বোধটা এখানে আসার আগে ওর ছিল না। এখানে এসে বুঝছে।

কী হল গুরু? খাও এক চুমুক।

বলেই, জোর করেই পাইটের বোতলটা এবারে মুখে ধরে দিল পুতনের।

পুতন, আপত্তি সত্ত্বেও বড় চুমুক লাগাল একটা।

মদের এই দোষ। অথবা গুণ! বিবেক যখন চুলকোয়, মন বলে কাজটা ভালো হচ্ছে না, অন্যায় করছ খুব; তখন জোর করে মদ খেয়ে নিলে বিবেকের চুলকুনি কমে আসে। মন বলে, ঠিক আছে। ঠিক কচ্চো বাওয়া।

ভালো উকিলেরই মতো, মনও গেলাসের জলের দিকে যেন তাকিয়ে প্রয়োজনানুসারে প্রমাণ করতে বসে যায় যে; গেলাসটা 'আধভর্তি'? না "আধ খালি"?

পেটের মধ্যে গিয়ে মস্তিষ্কে ক্রিয়া শুরু করল মদ। ধীরে ধীরে পুতনের জেগে ওঠা বিবেক, তার আশৈশব অনুষঙ্গর শালীনতা, তার মূল্যবোধ; গলে যেতে লাগল অ্যালকোহলের নিঃশব্দ, প্রলয়ংকরী প্রক্রিয়াতে। ধীরে ধীরে।

পুতন একটি হেঁচকি তুলে বলল, কেমন দেখলে ভাই?

কী?

একটু যেন অন্যমনস্ক, রাজেন বলল।

শিলিকে?

সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বলল, ওঃ। খাসা মাল। সুইট নাইনটিন ইয়েট আনকিসড।

একটু চুপ করে থেকে, রাজেন বলল, তবে কী জান? আসল ব্যাপারের সময় এই সব আনটাচড জিনিস বড্ডই ন্যাকামি করে। অবশ্য পুরো মজাটাই আবার সেখানেই। রেজিস্টেন্স না থাকলে কোনো ভূখণ্ডই জয় করে মজা নেই। কতাটা বলত, আমাদের নাদুদা। আমার গুরু।

বলেই, রাজেন হরিসভার চাতালে উঠে দাঁড়াল। তারপর চাঁদের আলোয় সাদা পাজামা পাঞ্জাবি পরে পায়চারি করতে করতে, না, যেন চাঁদের আলোতে ভাসতে ভাসতে জোরে জোরে কথা বলতে লাগল পুতনের সঙ্গে।

পুতনের ভয় করতে লাগল। গ্রাম্য জায়গা। তার ওপরে কাছেই ঘোষেদের বাড়ি। সে বাড়ির ছোটকর্তার কানে যদি এই কথোপকথন যায়, তবে এক্ষুনি ওদের দু'জনকে মেরে পুকুরে লাশ ফেলে দেবে। এ তো কলকাতা নয়। এখানে তো চেঁচিয়ে-বলা-কথাকেও ঘরে ঘরে পাখা, আর রেডিয়ো-টিভি, ট্রাম আর বাস আর গাড়ির আওয়াজ ডুবিয়ে দেয় না, উড়িয়ে দেয় না। তা ত রাজেন জানে না! এখানে ফুলশয্যার রাতের স্বামী-স্ত্রীর ফিসফিসে কথাও পাশের বাড়ি থেকে শোনা যায়। নাঃ। রাজেনকে নিয়ে এসে কাজটা ও ভালো করেনি আদৌ। এবারে সে নির্ঘাতই বিপদে পড়বে। বুঝতে পারছিল পুতন।

পুতন ভাবছিল, যে, মা কিরণশশী জেগে বসে আছেন ওদের খাবার নিয়ে। হোন্দলের মা কি আর এতক্ষণ আছে? বেলাবেলিই তো চলে যায়। মুখে মদের গন্ধ নিয়ে মায়ের সামনে বসে খেতে হবে বলে বিবেক, রাজেনের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, 'খচ্‌খচ্' করছে একটু।

কিন্তু হলে কী হয়। শুধুমাত্র জন্মদাত্রীর অধিকার ছাড়া, অন্য কোনো অধিকার তো নেই মায়ের। এই বাড়িটাও বাবা তাকেই উইল করে দিয়ে গেছেন। কিরণশশীর তো কোনোই জোর নেই। পুতন যা বলবে, যা করবে; তাইই এখন নিয়ম। অশক্ত, বৃদ্ধা, পরনির্ভর কিরণশশীর সাধ্য কী পুতনের মুখের উপর কথা বলেন কোনো! শহরে কিছুদিন থেকে, বাগানে চাকরি করতে এসে, স্বার্থ ও সমৃদ্ধির স্বরূপ ও প্রক্রিয়া দেখে পুতন বুঝেছে যে, নিজের ভালো করতে গেলে পরের মন্দ করতে দুবার ভাবলে চলে না। অত যারা ভাবে, তাদের সুখী হওয়া এই জীবনে আর হয়ে ওঠে না।

মায়ের সঙ্গে বাবা শুয়েছিল, দুজনে দুজনকে এনজয় করেছিল, তাই পুতন জন্মেছিল। তার মায়ের প্রতি পুতনের বিশেষ দায়দায়িত্ব ত থাকার কথা নয়।

বসে বসে খাও না। অমন পায়চারি করার দরকার কী?

পুতন ফিস্‌ফিস্ করে বলল, রাজেনকে।

রাজেন বলল, বসে বসে মাল খাওয়া মানা। সায়েবরা কী বলে জানিসনি? বলে "হাউ মেনি ড্রিঙ্কস ক্যান উ্য স্ট্যান্ড?" যদি মাল বসে বসেই খাওয়ার ছেলো, তালে তো বলতেই পাত্তো "হাউ মেনি ড্রিংকস ক্যান উ্য সিট?" হুঁ। হুঁ। তা কি তারা বলেচে? এ কতাও আমার গুরুর কাছ থেকে শোনা। হুঁ বাবা! সায়েবদের সবসময়ই আমি মেনে চলি। সায়েবদের পায়ে জুতো পরিয়ে, তেল মাকিয়ে, আমার মোমের পুতুল ঠাকমাকে, পালকি করে সায়েবকে দিয়ে ব্রীডিং করাবার জন্যে ঠাকুদ্দা পাইটেচেলো। এমনিতে কি আর আমার গায়ের রঙ এমন সায়েবের মতো? সায়েব দিয়ে একবার করিয়ে নেওয়ায়, পুরো গুষ্ঠি কেমন ফর্সা বনে গেছে বলো। আমার জ্যাটার মাথার চুলও কটা রঙ। জ্যাটাকে পাড়ার লোকে শুধোতো, এই যে হরেন। মাকে শুধিওতো, ব্যাপারখানা কী?

জ্যাটা চটে গিয়ে বলত, তোদের মায়েরা সেকেনে গিয়ে পালঙ্কের উপরে কেলিয়ে শুলেও সায়েব তাদের ইয়েতে মুতেও দিতোনা। বুয়েচিস্।

হ্যাঁ। কতা কইতো বটে বাবা। বাবার কতার সামনে কোনো শালার দাঁড়াবার জো টি ছিল না। মিত্যে কতাও বলতে পারত অনগগল, চোখের পাতা একটুও না-কাঁপিয়ে। ভালো উকিল হবার সবরকম গুণই ছেলো। কিন্তু হল না কিছুই।

কী করতেন তোমার বাবা?

জিগেস করল, রাজেন।

তুমি হলে, আমার এক বোতলের স্যাঙাৎ। তোমাকে ভাই বলতে বাধা নেই। অনেক কিছুই হত। তবে, শখ হিসেবে, মেয়ের দালালিও করত কখনো সখনো বলে শুনিচি। তা বলে, সোনাগাচির মেয়ে নয়। বড় ঘরের সব ফাস্টোকেলাস মাল। সাপ্লাই করত সাহেব সুবোদের, তারপর দিশি সায়েবদের, ব্যাবসাদার ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তো দিল্লীই চলে গেসল। মাইরি! সুখ কত্তে হয়, ত দিল্লী চলো। কোটি কোটি টাকার ডীল হচ্ছে সেকেনে। মেয়েচেলে একহাতে দাও আর অন্যহাতে কনট্রাক্ট নাও; লাইসেন্স নাও। পেটে খাওয়া, জামাকাপড় পরা, মদ খাওয়াও সবই একসময় এসে 'বাস্' করতেই হয়। কিন্তু বিধাতা এই যে হাড়বিহীন ওয়ান্ডারফুল গুণী যন্তরটি দিয়েচে মাইরি সব পুরুষকে, এর গুণ হচ্চে বিদ্যেরই মতো। কজন পুরুষ শালা এই যন্ত্রের প্রপার ইভ্যালুয়েশন করল। শুধু বংশ রক্ষা করেই রিটায়ার করিয়ে দেয় নাইনটি-নাইন পার্সেন্ট পুরুষ। এর ভার্সেটাইলিটি সম্বন্ধে কতটুকু ধারণা আছে? কজনের আছে?

পুতনও, রাজনের এমন জ্বালাময়ী ভাষণে একটু ঘাবড়ে গিয়ে শুধোল, বিদ্যেরই মতন মানে। মানে কী?

মানে, যতই করিবে দান, তত যাবে বেড়ে।

পুতন হেসে ফেলল, ওর কথা শুনে।

কিন্তু পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে গেল। ছিঃ ছিঃ, কী ভাষা। কী সব আলোচনা! কিরণশশীর ছেলে সে। গরিব তারা হতে পারে কিন্তু মধ্যবিত্তর সব শালীনতা সভ্যতার গুণ তার মধ্যে তখনও কুঁই-কুঁই করে হলেও একটুখানি বেঁচে ছিল। শিলির প্রেমিক ছিল সে। লেবুপাতার গন্ধ ছিল সেই প্রেমে, বৈশাখের ভোরের হাওয়ার পরশ ছিল। সব গোলমাল হয়ে গেল। তার চাকরি, তার ম্যানেজারের আত্মীয়কে খুশি করা, এসব কি চাকরির উন্নতির জন্যই করতে হত? মাইনে একটু কম থাকলেই বা কী ক্ষতি হত?

এই কথা মনে হতেই তার মাথার মধ্যে কে যেন গমগম করে বলে উঠল ধুলাবাড়ি! ধুলাবাড়ি।

কত কী ইলেকট্রিকাল গুডস, কত সুগন্ধ, কত আরাম-বিলাসের উপকরণ, কত রঙিন নাইলনের প্যান্টি, ব্রেসিয়ার, কতরকম হুইস্কি। না, না। উন্নতি তাকে করতেই হবে। পেছনে ফেরার উপায় নেই কোনোই। আত্মিক উন্নতি-ফুন্নতি বোকাদের ডিকশনারিতেই পাওয়া যায়। এখন আর্থিক উন্নতিই হচ্ছে একজন মানুষের পরম কামনা। যার অর্থ আছে আজ, তার সবই আছে। যার দুনম্বর অর্থ আছে, তার সবেরও বেশি আছে। সেই রাজা। দণ্ডমুণ্ডের বাপ। সেই এক নম্বর দুনম্বর মান যে-কোনো ফেরেলবাজি করেই, চুরি জোচ্চুরি, স্মাগলিং করেই এককাট্টা করা হোক না কেন! একবার পকেটে ঢুকে এলেই বাসস্।

রাজেন বলল, জিনিসটি কিমতি হবে।

বলেই বলল, কিন্তু কেন বলতো গুরু?

পুতনের ভয় ভয় করতে শুরু করেছিল ইতিমধ্যেই, একটু শীত শীতও। ও তুতলে বলল, কে-কে-কেন?

নোন্‌তা বলে। আর কেন! শালা মিষ্টি খেয়ে খেয়ে মুখ মরে গেছে। একটু নিমকিন না হলে; বলেই, গোড়ালির উপর দু-পাক ঘুরে নেচে নিয়ে বলল, নিমকিন না হলে জমে না। নোনতা স্বাদ হচ্ছে দুনিয়ার সেরা স্বাদ। পৃথিবীর সব সেরা জিনিসের স্বাদই নোনতা।

বলেই, গলা ছেড়ে গান ধরে দিল, নিজের পেছনে তাল ঠুকে, খেমটার সুরে।

"বল, গোলাপ মোরে বল, তুই ফুটিবি কবে সখী, বল্ গোলাপ মোরে বল্"...

গান থামিয়েই বলল, কার গান বলো তো গুরু?

পুতন গান-ফান বিশেষ জানে না, শোনেওনি। শুনেছে ওই শিলিরই কাছে যা একটু-আধটু। তাই চুপ করেই থাকল।

তুমি কী ভাবছ? গহরজানের?

রাজেন নিজেই বলল আবার।

কে গহরজান?

গহরজানের নাম শোননি। কী হে তুমি! তুমি একটি মাল! ছ্যাঃ! যাকগে তার কথা বলতে বসলে রাত পোয়াবে। আম্মো অবশ্য তাকে চোকে দেকিনি। কাকা-জ্যাটাদের কাছে শুনিচি। কিন্তু এ গান গহরজান বাঈজিরও নয়।

তো কার?

আমাদেরই পাড়ার এক লোকের লেখা।

সে কে? তোমাদের পাড়ার মানে?

জোড়াসাঁকোর। রবীন্দ্রনাথ টেগোরের।

আলোকঝারিতে বিকেলে গেছিল পরেশ, বন্দুকটাকে কাঁধে নিয়ে। কাল রাতে পুতন আর পুতনের বন্ধু রাজেনকে খেতে বলেছে, গদাইকেও বলেছে, দাদা নরেশ। যদি মুরগি অথবা কোটরা হরিণ পায় তো ভালো হয়। পাঁঠা আর হাঁস-মুরগির মাংস তো ওরা রোজই খায়। বুনো মোরগ অথবা হরিণ খাওয়াতে পারলে, সস্তাও পড়ে। তাছাড়া, ওরাও নিশ্চয়ই খুশি হবে। শহরের লোক রাজেন তো বুনো পশু-পাখির স্বাদই জানে না।

বেলা হয়েছে, কিন্তু সন্ধে হতে এখনও ঘণ্টা দুই দেরি। সাইকেলটা রেখে এসেছে টুণ্ড বাগানের মধ্যেই। হরিণ পেলে, সঙ্গে কাউকে নিয়ে আবার ফিরে আসতে হবে। মুরগি পেলে তো সাইকেলের হ্যান্ডেলে ঝুলিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। অসুবিধে নেই কোনোই।

পাহাড়ে কিছুটা চড়েই, নালাটার মধ্যে নেমে এল পরেশ। নালার শুকনো বালিতে জানোয়ারদের পায়ের দাগ পাবেই। তারপর ঠিক করবে কী করবে, না করবে।

নালাটায় নামবার সময়েই ওর ষষ্ঠেন্দ্রিয় ওকে হঠাৎই সাবধান হতে বলল। এরকম হয় কখনো কখনো। কী করে হয়, তা ও ব্যাখ্যা করে বলতে পারবে না। কিন্তু হয়।

নালাটাতে নেমে একটু এগোতেই পরেশ দেখল মস্ত একটি মাদীন বাঘের পায়ের দাগ। চিতা নয়, বড় বাঘ। একেবারেই টাটকা। কিছুক্ষণ আগেই বাঘিনি গেছে শুকিয়ে-যাওয়া নদীর বালি-রেখা ধরে।

মন খুবই খারাপ হয়ে গেল পরেশের। বাঘ যখন মারতে চায় না, তখনই বাঘের খোঁজ পায়। আর যখন চায়, তখন জঙ্গল হাঁকা করলেও টিকি দেখা যায় না। আজ ওর মন ওসব ঝামেলা-ঝক্কিতে যেতে চায় না। বাঘের মোকাবিলার মতো মন নিয়ে আজ বিকেলে ও বাড়ি থেকে বেরোয়নি আদৌ।

তবুও, সাবধানের মার নেই। যে জঙ্গলে বিপজ্জনক জানোয়ার থাকতে পারে বলে মনে হয়, সেখানে ঢুকলে বন্দুকের ডান দিকের ব্যারেলে সবসময়ই এল.জি.রাখে, ছাত্তারের কথা মতো। কখন যে "ইমার্জেন্সি" হয়, কে বলতে পারে? কিন্তু এখন তো সম্ভাব্যতার কথা নয়, বাঘ যে আছেই, তাতে কোনো সন্দেহই নেই। তাই কোনো ঝুঁকি না নিয়ে, এক ব্যারেলে বুলেট আর অন্য ব্যারেলে এল.জি.পুরল। হরিণও মারা যাবে এল.জি. দিয়ে। দূরে থাকলে বলও চালাতে পারে।

এই শুকনো নালাটার মধ্যে আরও কিছুদূর এগিয়ে গেলেই একটি দোলামতো জায়গা আছে, ও জানে। তাতে মে মাসের শেষেও জল থাকে। ঐখানে পৌঁছে, ওই জলের পাশে, কোনো গাছের উপরে উঠে বসে থাকলে কোনো-না-কোনো জানোয়ারের দেখা যে পাবেই, সে কথা ও জানত। মুরগি, ময়ূরও জল খেতে আসবেই। শুয়োরও আসবে তবে শশুরে রাজেন শুয়োর খায় কি না, জানা তো নেই!

তবে বাঘিনি, পরেশের আগে-আগেই গেছে। পরেশ তার একেবারে পায়ে পায়ে গিয়ে ঘাড়ে চড়তে রাজি নয়। আজকে বাঘিনির মোকাবিলা করতে আদৌ রাজি নয় পরেশ। আজ ওর মনে বাঘ নেই। মনে যেদিন বাঘ না থাকে, সেদিন বাঘের মোকাবিলা করা ঠিকও নয়। বাঘের শিকারে মন যদি পুরোপুরি কেন্দ্রীভূত না থাকে বাঘেরই উপরে, তাহলেই বিপদ। বিষম বিপদ।

কিছুটা এগিয়ে গেলেই ও পৌঁছোবে, নালাটা বাঁক নিচ্ছে যেখানে, সেইখানে ডানদিকে। সাবধানে, শুকনো পাতা এড়িয়ে বাটা-কোম্পানির হান্টার শু পরে বালির উপরে উপরে ও নিঃশব্দে এগোতে লাগল।

কাঠ-ঠোকরা ঠক্‌ঠক্ করে কাঠ ঠুকছে। কাঠবিড়ালি ডাকছে লেজ তুলে তুলে, চিবির-র-র-র, চিরি-র-র-র-র্, করে। ময়ূর ডেকে উঠল নালার বাঁদিকের গভীর জঙ্গল থেকে কেঁয়া-আ-আ করে। বনমোরগের একটা মস্ত দল ডানদিকের জঙ্গলের গভীরে ঘুরে ঘুরে পোকা খাচ্ছে। শেষ-বিকেলের আলো লাল-কালো মোরগ আর মুরগিদের গায়ে পড়ে চমকে ঠিকরে যাচ্ছে চারদিকে। মুরগিগুলো স্বগতোক্তি করছে পাতার মধ্যে, পাতা উলটে, পোকামাকড় খুঁটে খেতে খেতে।

বাঘিনি কাছাকাছিই আছে, তাই গুলির শব্দকরা সম্ভব হল না।

আরও একটু এগোতেই, বাঘিনি একবার ডাকল উঁ-আ-ও করে।

এখন বাঘ-বাঘিনির মিলনের সময়। সঙ্গী খুঁজছে বাঘিনি। মেজাজ এখন খিঁচিয়ে আছে তার। রিংকি মেমসাহেবের মতন। এই সময়ে মানুষীরা আর বাঘিনিরা করতে পারে না এমন কম্মো নেই। মানুষ আর বাঘেরা এই সময়ে সাবধান না হলেই বিপদ।

বাঘিনি ডাকবার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত বন নিস্তব্ধ হয়ে গেল। কাঠঠোকরা কাঠ ঠোকা বন্ধ করল।

ময়ূর-মুরগি এবং অন্যান্য সব পাখিরাও হঠাৎ চুপ করে গেল। বনের রানি রোদে বেরিয়েছে। চুপ করে থেকেই তাকে সম্মান জানাতে হয় যে, সেকথা ওরা সকলেই জানে।

বাঘিনি ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই এক্কেবারেই "ফ্রিজ" করে গেল পরেশ। একটি খয়ের গাছের আড়াল নিয়ে। পোড়া কাঠের মতো দাঁড়িয়ে রইল। আরও একটু এগিয়ে যাওয়ার সময় দিল বাঘিনিকে। যেদিকে যেতে চায়, যাক।

তারপরই ওর মনে হল, বাঘিনি যদি জল খেয়ে, এই নালা ধরেই ফিরে আসে তাহলে তার মুখোমুখি হতেই হবে। আর মুখোমুখি হতে তো আজকে চায় না পরেশ। তাই, তাড়াতাড়ি নালা ছেড়ে পরেশ বাঁদিকের জঙ্গলে উঠে গেল।

বেলা শেষ হয়েছে। কাল পয়লা বৈশাখ। নববর্ষ। নববর্ষ বলেই নেমন্তন্ন করেছে ওদের। কিছু শিকার না করে নিয়ে গেলেই নয়। বাঘ তো আর খাওয়াতে পারবে না। শালী! বাঘিনি মস্করা করার সময় পেল না আর।

মনে মনে বলল, পরেশ।

পাতা ঝরে গিয়ে গভীর বন এখন ন্যাড়া। যে-সব গাছে পাতা আছে সেই সব গাছেও লালচে হলদেটে পাতারা ফুলেরই মতো ফুটে আছে কালো কালো ডালে, হাওয়ার ছোঁওয়ায় ঝরে যাবার অপেক্ষায়। সামনেই এক দঙ্গল কুঁচফলের ঝাড়। লাল-কালোর দাঙ্গা লাগিয়েছে বনে। নীচে-ন্যাড়া. শালের বন। হাতির কানের মতো পাঁপড় ভাজার মতন মুচমুচে, বড় বড় পাতা ঝরিয়ে দিয়ে সেগুন বন এক আশ্চর্য বিধুর মৌনী ভেক ধরেছে। চৈত্রশেষের আর প্রথম বোশেখের বন, পরেশের মনকে উদাস করে দেয়। কিছুই ভালো লাগে না তার তখন।

কোনো গাছে উঠে বসলে, সেখান থেকে নালাটা ভালো করে ঠাহর করা যায়, তাই ঠাহর করছিল ভালো করে পরেশ, ঠিক সেই সময়ই ওর বাঁ দিকে শুকনো পাতা মচমচিয়ে, কোনো কিছু নড়াচড়া করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে খয়ের গাছের পেছন থেকে সরে গিয়ে একটা শিমুল গাছের মোটা গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ চোখে চাইল সেদিকে। চেয়েই স্তব্ধ হয়ে গেল ও। বাসরে বাস্। শঙ্খচূড় সাপের জোড় লেগেছে। প্রকাণ্ড বড় এক নাগ আর নাগিনি। মাটি থেকে চার পাঁচ ফিট উঁচু হয়ে জড়িয়ে মড়িয়ে আছে একে অপরকে। হিস্‌হিসানি শোনা যাচ্ছে তাদের।

এই দৃশ্য যে দেখতে পায় সেইই নাকি রাজা হয়। শুনেছে অনেকেরই কাছে।

এবার কি রাজা হবে পরেশ?

নিজেই বলল, নিজেকে, নিরুচ্চারে, ওই দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে।

এতদিন জঙ্গলে পাহাড়ে ঘুরছে, কিন্তু আগে কখনোই দেখেনি শঙ্খচূড়ের জোড় লাগা।

বন্দুকের বাঁ নল থেকে বলটা বের করে একটা দু-নম্বর ছররা পুরলো তাতে পরেশ। যদি নাগ বা নাগিনি হঠাৎ দেখে ফেলে তাকে, তবে তাদের হাত থেকে বাঁচতে হলে ছররা মারা ছাড়া উপায় নেই। বল বা এল-জি দিয়ে হঠাৎ তেড়ে-আসা সাপকে ঠেকানো মুশকিল।

বন্দুকে ছররা পুরে, সে অনিমেষে নাগ-নাগিনির মিলন দেখতে লাগল। ছাত্তার মিঞার ভাষাতে বললে বলতে হয়, ওর "দিল খুশ" হয়ে গেল।

কেন জানে না, হঠাৎই ওর রিংকি মেমসাহেবের কথা মনে পড়ে গেল শরীরের মধ্যে সেই ছটফটানিটা হঠাৎ ফিরে এল। পরেশ ভাবছিল বাঘ বা সাপ বা অন্য সব জন্তু জানোয়ারই অন্য লিঙ্গর সঙ্গে মিলিত হয়ই। তারা তাদের মায়ের সঙ্গে মিলিত হচ্ছে, না মেয়ের সঙ্গে, তার বাছ-বিচার তারা কখনোই করে না। এই বিচার থাকে কেবল মানুষেরই। শুধুমাত্র মানুষই মিলিত হয় না যন্ত্রের মতো, স্বজাতের যে-কোনো স্ত্রীলিঙ্গের সঙ্গে। এবং শুধুমাত্র দু'একজন মানুষই পারে, অথবা অবিবাহিত

মানুষই পারে, না মিলিত হয়ে থাকতে। যেমন, পরেশ পেরেছে। মিলনের সঙ্গী, নিজের মনমতো পছন্দ করা শুধুমাত্র মানুষেরই ধর্ম। এই পছন্দের পেছনে নানারকম সামাজিক এবং বিবেকজাত বাধাও থাকে। পছন্দ না হলে, সমাজের অনুমোদন না পেলে সারাজীবন একা একাই একজন মানুষ কাটিয়ে দিতে পারে, দেয়ও তো সত্যিই! কত পুরুষ ও নারীও!

সেই মুহূর্তে, ও যে মানুষ হয়ে জন্মেছে, কোনো মনুষ্যেতের জীব হয়ে নয়; এই কথাটা নতুন করে জেনে খুবই ভালো লাগল পরেশের। এই একাকিত্বর আনন্দ এবং যন্ত্রণা শুধুমাত্র মানুষেরই যে একার। অন্য প্রাণীরা এই তীব্র আনন্দ এবং দুঃখ সম্বন্ধে কোনো ধারণাই যে করতে পারে না। মেসিনের মতো তারা খায়, ঘুমোয়, জোড় লাগে, বংশবৃদ্ধি করে; তারপর একদিন মরে যায়। বেশি সময়েই তারা মরে, অন্যের খাদ্য হয়ে। কম সময়েই মানুষের মতো অসুখ-বিসুখে মৃত্যু হয় ওদের। জন্মায় অলক্ষ্যে যেমন, হঠাৎ করে; চলেও যায়, তেমনই করে।

একদৃষ্টে, জোড়া-লাগা নাগেদের দিকে চেয়েছিল পরেশ। এমন সময় ওর মনে হল ওকে কেউ দেখছে পেছন থেকে।

জঙ্গলে নড়াচড়া, কখনোই হঠাৎ করতে নেই। হঠাৎ ঘাড়-ঘোরাতে গেলে ঘাড়টিই খুইয়ে বসতে হয়। তাই খুব সন্তর্পণে পরেশ শরীর না ঘুরিয়ে নিজের ঘাড়টাকে আস্তে আস্তে ঘোরাতে লাগল দুই গোড়ালির উপরে পা রেখে। আধখানাও ঘোরেনি, তখুনি তার চোখের কোণায় সে দেখতে পেল বাঘিনি নালার মধ্যে দাঁড়িয়ে জার্মান-জঙ্গলের ঝাড়ের আড়াল থেকে মুখ তুলে; একদৃষ্টে তাকে দেখছে নিশ্চল হয়ে।

বাঘিনিকে দেখতে পাওয়া মাত্র পরেশও স্থাণুরই মতো নিশ্চল হয়ে রইল। বাঁ চোখের কোণে বাঘিনিকে নজর করতে লাগল সাবধানে একটুও নড়াচড়া না করে।

চোখের পাতা পর্যন্ত ফেলল না আর। পুরো দুটি মিনিট বাঘিনি তাকে দেখল। তারপরই জার্মান-জঙ্গলের ঝাড়ের আড়ালে আড়ালেই চলতে শুরু করল নালার মধ্যে মধ্যে। শেষ সূর্যের সোনা আলো, সেই ঝাড় ও গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে দেখা-যাওয়া তার বাদামি-লাল-আর কালো ডোরাকাটা-সাদার ছোপলাগা শরীরে পড়ে তাকে যেন আরও জমকালো করে তুলল। আস্তে আস্তে অদৃশ্য হয়ে গেল তার হেলতে-দুলতে যাওয়া শরীর, নালার অন্য প্রান্তে।

বাঘিনি অদৃশ্য হয়ে গেলে, পরেশ সাবধানে, জোড়-লাগা নাগ-নাগিনির দৃষ্টি এড়িয়ে, নালায় নামল এসে। তারপর চলতে লাগল জলের দিকে। যেখান থেকে বাঘিনি সবে জল খেয়ে উঠে গেল।

কে জানে! সে আজ জোড়-লাগার সাথী খুঁজে পাবে কি না।

বাঁকটা নিয়েছে যেই, অমনি দেখে একটা মস্ত শজারু চলেছে জলের দিকে। তাকে দেখেই, বন্দুক তুলল পরেশ। সেও পরেশকে দেখেছিল। দেখেই, সঙ্গে সঙ্গে গায়ের সাদা সাদা উলের কাঁটার চেয়েও অনেক মোটা আর লম্বা, কাঁটাগুলো ফুলিয়ে সে পিঠ গুটিয়ে গোলাকৃতি হয়ে একটি প্রকাণ্ড সাদা-কালো বলেরই মতো হয়ে গেল। হয়ে গিয়েই, ঝনঝন করে কাঁটা বাজিয়ে গভীর রাতে বল্লমের মাথায় ঘুঙুর বেঁধে, নির্জন গ্রামের পথে দৌড়ে-যাওয়া ডাক-হরকরারই মতো ঝুম্-ঝুম্-ঝুম্ আওয়াজ তুলে বেগে দৌড়ে এল পরেশরই দিকে। তাকে ভয় পাওয়ানোর জন্য।

পা দুটি শক্ত করে দাঁড়াল পরেশ। খুশিতে ঝলমল করে উঠল ওর মুখ। মনে মনে বলল, আয় শালা! আরও কাছে আয়।

শজারুটি যখন খুবই কাছে এসে পৌঁছল, শেষ মুহূর্তে, হাস্যকর এবং শজারুর পক্ষে লজ্জাকর ভঙ্গিতে ঘুরে সে চলে যেতে চেয়েছিল যদিও পরেশ তখনই ভালো করে নিশানা নিয়ে গুলি করল।

অত কাছ থেকে রোটাক্স-বল-এর থাপ্পড় খেয়ে মুখ থুবড়ে ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়ল শজারুটা কাঁটা-ছড়িয়ে, দিনশেষের গরম বালি আর নুড়ির উপরে। খানিকক্ষণ থর্‌থর্ করে কাঁপতে থাকল। কয়েকফোঁটা রক্ত বেরুল মুখ দিয়ে। ঝুম্-ঝুম ফুলিয়ে-তোলা কাটা, তার দম্ভের প্রতীক, ধীরে ধীরে শুয়ে পড়ল শায়ীন ওর গায়ের উপরে। তারপর এই জন্মের মতন স্থির হয়ে গেল। প্রবলের হাতে দুর্বল চিরদিনই এমন করেই মরে! এতে নতুনত্ব কিছু নেই। কী জঙ্গলে, কী শহরে! কী জানোয়ার, কী মানুষ। শেষাঙ্কটা একইরকম।

পেল্লায় সাইজের, প্রায় মন-খানেক ওজন হবে শজারুটার। ওই কাঁটাসমেত তাকে একা একা বয়ে নিয়ে যেতে পারবে না কোনোমতেই পরেশ। এত বড় শজারু, নিম্ন-আসামের এই অঞ্চলে যে আদৌ আছে, তাও ও জানত না। আবু ছাত্তারকে বলতে হবে।

এখানে এখন তাকে রেখে গেলেও, শেয়াল বা হায়নার বা চিতার খাদ্য হয়ে যাবে। ফিরে আসার আগেই তারাই সাবড়ে দেবে পুরোপুরি। নিয়ে যেতে পারলেও নিয়ে গিয়ে লাভ ছিল না কোনো। শজারুর মাংস সকলে ভালোও বাসে না। মাটি-মাটি গন্ধ থাকে একরকম, খরগোশের মাংসর গন্ধর মতো। পরেশ নিজে যদিও ভালোবাসে। শিলিও। দাদা নরেশও শজারু ভালোবেসেই খায়। পুতনও খায় যদিও। আগে তো শজারু, বাড়ির মেয়েরাই মারত কলাগাছ ছুঁড়ে। কলাগাছ গেঁথে যেত কাঁটাতে। দৌড়ে পালাতে পারত না। তারপর অন্যেরা গিয়ে লাঠিপেটা করে শেষ করত।

পুতনের কলকাতার বন্ধু রাজেন হয়তো কোনোদিন শজারু খাওয়া দূরে থাকুক, শজারু কখনো চোখেও দেখেনি, চিড়িয়াখানায় ছাড়া। তার কাছে এ এক নতুন অভিজ্ঞতাই হবে। এই সব ভেবে, কোমরের বেল্ট থেকে রেমিংটনের ছুরিটা বের করে ওখানেই বসে শজারুটাকে কাটল পরেশ। তারপর সবচেয়ে ভালো জায়গা থেকে সের পাঁচেক মাংসের একটা টুকরো কেটে, তাতে একটা ফুটো করে নিয়ে বন থেকে লতা ছিঁড়ে এনে বেঁধে ডান হাতে ঝুলিয়ে, বাঁ হাতে বন্দুক নিয়ে ফিরে চলল।

এই রকমই হয়। ভাবছিল, শিকার করবে কোটরা হরিণ, ময়ূর, অথবা বনমুরগি। অথচ শিকার হল শজারু। জঙ্গলে এমনই হয়। যা চাওয়া যায়, তা পাওয়া যায় না; আর যা না চাওয়া যায়, তাই পাওয়া হয়।

এখানের রকমসকমই সব আলাদা।

সূর্য প্রায় ডুবে এসেছে। উঁচু-নীচু পথ বেয়ে চলেছে পরেশ, টুঙ বাগানের দিকে। গাছের ছায়ারা দীর্ঘতর হয়ে বসেছে। ঝিঁ ঝিঁ ডাকতে আরম্ভ করেছে চার পাশ থেকে, একটানা, ঝুমঝুমির মতো। যেন হাজার হাজার শজারু কোন মন্ত্রবলে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে তাদের গায়ের লক্ষ লক্ষ কাটা বাজাচ্ছে কোন অদৃশ্য শত্রুকে ভয় পাওয়ানোর জন্যে। এই শেষ বসন্তর আসন্ন সন্ধের বনপথে হাঁটতে হাঁটতে ঝিঁ ঝিঁ-র ডাকের মধ্যে, শিমুলের আর পলাশের ঝিম-ধরা লাল রঙের মধ্যে, কালো পাথর আর লাল-হলুদ শুকনো পাতার রাশ, আর হলুদ, পিছল-পিছল, শুকনো বাঁশপাতার উপরে ভেসে চলতে চলতে নেশা লাগে পরেশের। নেশা বলতে, ওর এইটিই প্রধান। মদ, মাঝে মাঝে খায় বটে ঠিকই; কিন্তু মদ কোনোদিনও ওকে খেতে পারেনি। অথচ এই বন আর পাহাড়, নদী আর বাদার নেশা কিন্তু তাকে খেয়েছে। পুরোপুরিই। সম্পূর্ণভাবেই পেয়েছে। ঘাড় মট্‌কেছে ওর, বাঘে যেমন হরিণের ঘাড় মটকায়। কোনো মুক্তি নেই পরেশের আর এই জন্মে। এই সুন্দরীর হাতেই সে নিঃশর্তে হত হয়েছে, নিরুপায়ে।

বাড়ি পৌঁছোতেই দাদা নরেশ, শজারুর মাংস দেখে খুশি হল খুবই। এক গোছা শজারুর কাটা এনেছিল পরেশ, শিলির জন্যে। এই কাটা, শখ করে শিলি কখনো কখনো মাথার চুলে গোঁজে। বন্ধুদের দেয়।

জংলি জানোয়ারের মাংস একদিন ঝুলিয়ে রাখলে বা ধুঁয়ো দিয়ে রাখলে নরম হয়। খেতে ভালো লাগে। কিন্তু শিলি বলল, কাকা। আজই ডুমা ডুমা কইর‍্যা কাইট্যা রাখুমানে।

হাত দুটো ধুয়ে এসেই জামা-কাপড় না ছেড়েই বন্দুক পরিষ্কার করছিল বারান্দায় বসে, পরেশ। অন্যঘরের বারান্দায় বসে দাদা নরেশ, ভাইয়ের সঙ্গে গল্প করছিল।

ক্লীনিং রড-এর মাথায় শিলির ছেঁড়া শাড়ির নরম টুকরো পেঁচিয়ে থ্রী-ইন-ওয়ান তেল দিয়ে মুছে রাখল এবারে। শুকনো কাপড় দিয়ে আগেই ফোটা কার্তুজের বারুদের ময়লা ঘষে ঘষে তুলেছিল। তারপর ক্লীনিং রড থেকে নোংরা ন্যাকড়া খুলে ফেলে ক্লীনিং-রড ও বন্দুক ঘরে তুলে রেখে সে, চান করতে যাচ্ছিল যখন, তখনই দাদা বলল, বুঝলিরে, ছাত্তার আইছিল।

কখন?

ঘরের দাওয়ার খুঁটি ধরেই দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, পরেশ।

এই, বেলা চারটা নাগাদ হইব।

কইল কী?

কয় নাই কিছু। ত'রে এই খামটা দিয়া গ্যাছে। কইলো, টাকা আছে।

ক্যামেরন সাহেবের কথা কইলো কি কিছু?

পরেশ শুধোল।

হ। কইলো, বাঘ মারাইয়া দিছে তারে ছাত্তারে। সাহেবে নাকি খুশি খুবই।

পরেশের খুবই ইচ্ছে হল, রিংকি মেমসাহেবের কথা জিগগেস করে একবার দাদাকে। ছাত্তার মিঞা কিছু বলেছে কী না, তার সম্বন্ধে? কিন্তু লজ্জায় জিগগেস করতে পারল না।

কেন যে লজ্জা হল নির্লজ্জ পরেশের, ভেবে পেল না।

লুঙ্গি আর গামছা নিয়ে ইন্দারায় যাওয়ার জন্যে সিঁড়ি দিয়ে নামছে ও, সেই সময়ে দাদাই আবার বললো রিংকি মেমসাহেবডা কেডা রে?

পরেশ চমকে উঠল।

আবারও লজ্জা হল খুব।

বলল, ক্যামেরন সাহেবের লগে আইছিল শিকার করনের লইগ্যা।

ম্যাম নাকি? দাদা শুধোল।

হ! ম্যামই বটে। তবে বিলাতি না। দিশি ম্যাম।

দিশি ম্যামরাও আবার শিকার করতাছে নাহি আজকাল। আগে তো রাজা-রাজড়ার ঘরের মাইয়ারাই খালি শিকার করত বইল্যা জানি।

আইজকাইল যার ঘরে পয়সা, হেই রাজা-রাজড়া। তাগোই দিন এহন। রাজাদের আর দাম লাই কোনোই। সব, মরা হাতি।

একটু চুপ করে থেকে বলল আবার পরেশ, ছাত্তারে, আর কইলো কী? রিংকি ম্যামসাহেবের কথা?

নারী-বিদ্বেষী পরেশের এই রিংকি ম্যামসাহেবের প্রতি এত ঔৎসুক্যে অবাক হল দাদা নরেশ। পরেশ নিজেও কম হল না।

ও। ভুইল্যাই গেছিলাম গিয়া। ছাত্তারে কইলো, যে তর লইগ্যা একশত টাকা রিংকি ম্যামসাহেবে দিছে। ক্যামেরন সাহেবের টাকার লগেই আছে হেই টাকা। ওই খামেই।

পরেশ কিছু বলতে যাবার আগেই নরেশ বলল, আর তরে একবার দেখাও করতে কইছে সেই ম্যামে।

আমারে? ক্যান? কোনখানে?

অবাক হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে বলল পরেশ।

আরও কয়দিন ধুবড়িতে থাকব ম্যামে। জিঞ্জিরাম নদীতে যাইব নাকি শুনি। কুমিরের ফোটো তুইলবার লইগ্যা। স্যা নদীটাই বা কোনখানে? নাম শুনি তো নাই কখনো।

নরেশ শুধোল।

পরেশ বলল, স্যা নদী গারো পাহাড়ের কোলে। ছোট্ট, মানে চওড়াতে ছোট্টই নদী, কিন্তু কুমিরে কুমিরে ভরতি। কিন্তু আমারে ডাকে ক্যান ম্যামে? ছাত্তারই তো যথেষ্ট। হ্যা তো আর বাঘ শিকার না, যে দোসর লাগব।

ম্যামেদের কথা, ম্যামেরাই জানে।

দ্ব্যর্থক গলায় বলল, নরেশ।

পরেশ বলল, যাই, চানটা কইরাই আসি। চ্যাট-চ্যাট করতাছে গা ঘামে আর শজারুর রক্তে।

বাইরে ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না। আমগাছে কাক ডাকছে। আর ক'দিন পরেইতো পূর্ণিমা। ইন্দারা থেকে বালতি বালতি জল তুলে ঝুপ্ ঝুপ করে চান করতে লাগল পরেশ।

হাসনুহানা আর বেলফুল ফুটেছে উঠোনে। ওর গায়ে মাখা নিম সাবানের গন্ধের সঙ্গে হাসনুহানা আর বেলফুলের গন্ধ মিশে গেল। কিছু হাসনুহানা কেটে দিতে হবে। সাপ আসে, হাসনুহানার তীব্র গন্ধে।

পরেশ ভাবছিল যে, এই জ্যোৎস্না রাতের গায়েও এক ধরনের গন্ধ আছে, মেঠো ইঁদুরের গন্ধের মতো, বছরের এই সময়ের রাতে লিচু গাছে গাছে লিচু-খেয়ে-বেড়ানো বাদুড়ের গায়ের গন্ধের মতো। গ্রামের গায়ে এক-রকমের গন্ধ; বনের গায়ে অন্যরকমের। এই চাঁদনী রাতও কতরকম গন্ধের কারবার করে। এই জ্যোৎস্না-রাতও যেন আর-এক সাদা দাড়িওয়ালা মুসলমান আতরওয়ালা। রিংকি মেমসাহেবের গায়ের গন্ধের সঙ্গে যেমন শিলির গায়ের গন্ধের মিল নেই, তেমন শিলির গায়ের গন্ধের সঙ্গে আবার আলোকঝারি পেরিয়ে গিয়ে পৌঁছুনো পর্বতজুয়ারের মেচ মেয়েদের গায়ের গন্ধের মিল নেই। যেমন জিঞ্জিরাম নদীর পারে দাঁড়িয়ে-থাকা গারো বা রাভা মেয়েদের গায়ের গন্ধের সঙ্গে মেচ মেয়েদের গায়ের গন্ধেরও মিল নেই। প্রত্যেক দেশ, প্রত্যেক নদী, প্রত্যেক মেয়ের গায়ের গন্ধ আলাদা। কোনো মেয়ের খুব কাছে না এসেও পরেশ জানে তা। নদীর গন্ধেরই মতো, মেয়েদের গায়ের গন্ধও দূর থেকে পায় ও।

হাওয়ায়, আর বৃষ্টিতে, জ্যোৎস্নায় আর কুয়াশায়, ভেসে আসে সেই গন্ধ।

কোয়াক। কোয়াক। কোয়াক করে, গম্ভীর গলায় মন খারাপ করা ডাক ডাকতে ডাকতে একদল কেশর-ওয়ালা লম্বা-ঠ্যাং-এর সরু-গলা সাদা পাখি উড়ে গেল মাথার উপর দিয়ে, ময়নামারীর বিলের দিকে। আলোকঝারি পাহাড় থেকেই এল ওরা। ছাত্তার বলছিল, এই বকগুলোর ইংরিজি নাম নাকি "হেরন।"

ভালো করে সাবান মেখে, আবার জল ঢেলে ঢেলে হাপুস হুপুস করে চান করতে করতে পরেশ গায়ে সেই জ্বালাটা আবারও অনুভব করল। সেই যমদুয়ারের মাচায় বসে, রিংকি মেমসাহেবের কাছে থাকার সময়ে, যেমন হয়েছিল। গা-ছমছম করে উঠল বীর শিকারির। তাকে ডেকেছে কেন রিংকি মেমসাহেব কে জানে? নিশির ডাকের মতোই সেই নিরুচ্চারিত ডাক তার বুকে এক অনামা ভয় জাগিয়ে তুলল। তাড়াতাড়ি, শুকনো গামছা দিয়ে গা মুছে, ভেজা গামছা ছেড়ে ফেলে, লুঙ্গিটা পরে ফেলল পরেশ। এই জ্যোৎস্নামাখা উদোম রাতে, একমুহূর্ত উদোম থাকলেই গা-শিরশির করে পরেশের। বিয়ে-করা মানুষ ও মানুষীরা অনেক সহজেই বোধহয় নিজেদের নগ্নতাকে মেনে নিতে

শিখে যায়। নগ্নতাতে অভ্যস্ত হয়ে যায় তারা। বিয়ে না-করা লোকেরা পারে না। মুহূর্তের জন্যে নগ্ন হলেও হঠাৎ সামনাসামনি পড়ে যাওয়া বুনো শজারুর মতোই তাদের গায়ের সবকটি অদৃশ্য কাঁটা ঝমঝম করে বাজতে থাকে, গা-ময় কাঁটারই মতো, লোমগুলো খাড়া হয়ে ওঠে।

এই চাঁদের রাত, হাসনুহানার গন্ধ, রাত পাখির ডাক আর নিজের ক্ষণিক নগ্নতা মিলে-মিশে, গোঁড়, গেঁয়ো, আনপড় পরেশকে তারা যেন হাত ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে যায় এক অচেনা-পুরের দিকে। রিংকি মেমসাহেবের কথা ভাবলেই সে যেন এখনও কেমন ঘোরের মধ্যে পড়ে যায়। পরেশ ভাবে, পরেশও কি কোনোদিন তার এতোদিনের নারীবিদ্বেষ মুছে ফেলে অন্য দশজন ল্যাজে-গোবরে পুরুষমানুষের মতো, আবু ছাত্তারেরই মতো, "কাবিন নামাহ্"তে সই করে বিবি আর আওলাদ নিয়ে ঘর করবে? জীবনের এই মধ্যাহ্নে এসে?

এখন যে বড় তাপের সময়। শরীরে তাপ, সংসারে তাপ; বাজারে তাপ। ঘর বাঁধার মতো ভুল প্রথম যৌবনের অবুঝ উচ্ছ্বাসেই করা যায়, এখন আর তা হয় না। "কাবিন নিমাহ্"র ওয়াক্ত চলে গেছে। এখন প্রত্যেক মানুষ ও মানুষী স্বরাট সম্রাট আর সম্রাজ্ঞী। মেয়েরাই বোরখা আর পরতে চাইছে না। "নিকাহ্" করে সারাজীবন বেঁধে রাখতে চাইছে না তারাও আর নিজেদের, অন্য কোনোই পুরুষ গাধা-বোটের সঙ্গে।

জীবনের মানে ভেসে-যাওয়া, নদীর নিত্য নতুন বাঁকের নিত্য নতুন চমকের সৌন্দর্যর শিহরণে মুহুর্মুহু শিহরিত হতে থাকারই অভিজ্ঞতা। বিয়ে বা "নিকাহ"।

সামাজিক বা শারীরিক প্রয়োজনীয়তা হয়তো ছিল পাঁচশো বছর আগেও। আজকে এই পুতুলখেলার কোনো অবকাশই নেই। অন্তত পরেশের কাছে। বিয়ে না-করা মানুষ, পরেশের মতো, রিংকি মেমসাহেবের মতো, বিয়ে-করা মানুষদের চেয়ে অনেকই বেশি স্বাধীন। এবং খুশিও। তারা নিজেদের জন্যেই বাঁচে জীবনে, বিবি আর একপাল বাচ্চাদের নিয়ে হিমসিম হয়ে এই একটামাত্র জীবন, জীবনের মধ্যে থেবড়ে বসে, তাদের জীবনের মাছি ভন ভন আঠালো মুহূর্তগুলিকে কাঁঠালের প্যাতপ্যাতে কোয়ার মতো নেড়ে চেড়ে, জীবনের মেয়াদ শেষ করে যায় না।

সেই জীবন, এক একঘেয়ে রিক্ত রিয়াজের জীবন. সে জীবন কোনোদিনও "বন্দেগী" হয়ে ওঠে না।

না, না। পরেশ অমন ভুল করবে না।

রিংকি মেমসাহেবের কথা ভেবে, তার যতই রিকিঝিকি হোক না কেন শরীরে।

এতো ভালো ভালো কথা পরেশ মুখে হয়তো বলে না, কিন্তু তার মাথার মধ্যে যে ভাবনার অনুরণন ওঠে, তা ভালো ভালো শব্দে প্রকাশ করলে হয়তো এই রকমই শোনাত।

এ জন্মে হল না। অনেক কিছুই হল না। পরের জন্মে, ভালো করে লেখাপড়া শিখবে পরেশ। অনেক বড়লোক হবে। ক্যামেরন সাহেবদের সমাজের কোনাকের গন্ধ নেবে নাকে। মস্ত্ হয়ে থাকবে সারাক্ষণ।

পরের জন্মে।

আজ পুতন এবং তার বন্ধু রাজেন খাবে।

সকাল থেকে শিলি রান্নাঘরেই আছে। শহরের ছেলেকে গ্রামের রান্না খাওয়াব, বলেছে পরেশ। কুঁচো মাছ ভাজা। শিঙ্গি-বেগুন-আলু-পেয়াজ-কাঁচালঙ্কার রসা, চিতলের পেটি, ধুবড়ি থেকে আনিয়েছে পরেশ, বাস-ড্রাইভারকে দিয়ে। রান্না করছে শিলি, ধনেপাতা কাঁচালঙ্কা দিয়ে। কাঁটালের বিচিভাজা। বড় বড় কইয়ের হরগৌরী। একপাশে মিষ্টি, অন্য পাশে ঝাল। চালতার আর করমচার টক। মধুদার

দোকানের রসগোল্লা। আর ঘন করে জ্বাল-দেওয়া দুধের লাল-থকথকে পায়েস। সেদ্ধ চালের। কিরণশশীকেও খেতে বলেছে রাতে শিলি। বুড়ির জন্যে লুচি করে দেবে ক'খানা। কুমড়ো, আলু আর ছোলার তরকারি করবে। নিরামিষ। পায়েস তো আছেই। গদাইও আসবে।

এতদিন গদাইকে সহ্য করতে পারত না শিলি। বদলে-যাওয়া পুতন আর তার বন্ধু রাজেনকে দেখার পর থেকে গদাইকে অতখানি খারাপ আর লাগে না। যাই হোক, গদাই গ্রামের ছেলে। শিলি ওকে তবু বোঝে। ওদের বোঝে না। পুতন এতটাই বদলে ফেলেছে নিজেকে যে, তাকেও প্রায় অচেনা বলেই ঠেকছে শিলির চোখে।

রাজেন ছেলেটার চোখের দৃষ্টির মধ্যেই দারুণ এক অভব্যতা আছে। শিলিকে নদীপারে নগ্ন দেখার পরও গদাই-এর চোখে এমন বিচ্ছিরি কদর্য দৃষ্টি ছিল না। জানে শিলি।

রাজেনের দুটি চোখের যেন অনেকগুলো অসভ্য হাতও আছে। মাকড়সার হাতের মতো রোমশ, গা ঘিন-ঘিন হাত। তার চোখের যে অদৃশ্য হাত দুটি দিয়ে ও শিলিকে চকিতে নগ্ন করে ফেলে, তার সমস্ত লজ্জাস্থানই যেন অসভ্যর মতো অধৈর্যে স্পর্শ করে।

রাজেন ওর দিকে তাকালেই ভীষণই অস্বস্তি বোধ করে শিলি। ভীষণ খারাপ লাগতে থাকে। নরকের কীট ও একটি। ওই রাজেন।

কাকা ওকে খেতে বলাতে তবু আপত্তি করেনি শিলি। কারণ, বাবা ও কাকার মুখের উপর কিছু বলার মতো শিক্ষা ও পায়নি। রাজেনের জন্যেই এত-পদ রান্না করতে হবে শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল ও। তবু ভেবেছে, পুতনদার মতি যদি ফেরে। অনেকই বদলে গেছে তার পুতনদা। মতি আর ফিরবে বলে মনে হয় না। মুখের ভাষায়, ব্যবহারে, পোশাকে-আশাকে, চাউনিতে সেও অন্য এক রাজেন হয়ে উঠেছে। যে পুতনদাকে দেখলেই ভালোলাগায় মরে যেত একদিন, তাকে দেখেই এই কদিন কেমন এক শঙ্কা বোধ করেছে শিলি। খারাপ-লাগা।

একদিন দুপুরে কিরণশশীর কাছে গেছিল শিলি। পুতন আর রাজেন বাড়ি ছিল না। ধুবড়িতে গেছিল সিনেমা দেখতে।

শিলি বলেছিল, কী বুড়ি? ছাওয়াল আইছে বইল্যা কি আমারে ভুইল্যা যাওনটা ঠিক?

কিরণশশীও বদলে গেছেন। এই ক'দিনেই তার চোখ কোটরে বসে গেছে। ছেলে-আসার আনন্দের বদলে এক গভীর ভয় ও শঙ্কা তাকেও ঘিরে রয়েছে।

খুবই লজ্জিত গলায় কিরণশশী বলেছিল, কার ছাওয়াল? পুতন, আমার ছাওয়াল না।

কও কী তুমি? পাগল হইল্যা নাকি?

ঠিকই কই রে শিলি। পুতন আর সেই পুতন নাই। এক্কেরে গোল্লায় গ্যাছে। আমার সামনেই ছিগারেট খায়, মদ খায়। বোঝছস?

একটু চুপ করে থেকে বললেন, একদিন তর কাকা পরেশরে কতই কী না কইছি মদ খাওনের লইগ্যা। অথচ ওর কত বয়স হইছে। একদিনও আমারে অসম্মান করে নাই। আমার সামনে কখনো খায় নাই। গাল-মন্দ কইরলে, মাতা নীচু কইর‍্যাই খাড়াইয়া থাকছে। আর বলছে, আমি খারাপ মাসিমা। আমি একটা বকা। বাউন্ডুইল্যা। আমার কথা ছাড়ান দ্যান। বাবা-মায়ের সম্মান কি সব পোলায় রাখে? আমি হইলাম গিয়া আমাগো পরিবারের কুলাঙ্গার।

তাইই কয় নাকি কাকায়?

অবাক গলায় বলেছিল, শিলি।

হ। তাইই তো কইছে চিরডা দিন।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন, আর আমার পুতন? ছিঃ ছিঃ কী ঔদ্ধত্য। কী কম্যু

আর। সঙ্গে ওই এক হারামজাদারে লইয়া আইছে। তরে কী কম্যু আর শিলি! সেদিন হোঁদলের মায়ের বড় মাইয়াডা আইছিলো, মায়ের দেরী হইত্যাছে দেইখ্যা খোঁজ করনের লইগ্যা। ডাগর মাইয়া। ষোলো সতেরো বছর বয়স হইব।

জানি, পাঁচী নাম তো? দেখছি আমি তারে। তা হইছিল কী তাই কও।

শিলি, জিজ্ঞেস করেছিল।

আরে মাইয়াডা যখন ফিইর‍্যা যাইতেছে তখন বাঁশবাগানের মধ্যে তারে এক্কেরে পাইড়া ফ্যালাইছিলো ওই হারামজাদায়। কী লজ্জা! কী লজ্জা! পাঁচী আইয়া আমার কাছে কাইন্দা মরে। ইডা কেমন ভদ্দরলোকের পোলা, ক'তো দেহি? আমি তহনই হারামজাদারে ডাইক্যা কইয়া দিছি যে, পরেশরে কইয়া দিলে পরেশ গুলি কইর‍্যা মাইর‍্যা থুইবে আনে। তার অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা নাই কোন। আর যদি কহনও দেহি...

কইতেই আমার পোলার আমার উপর কী গোসসা। সে কয়, তোমার এত্ত বড় সাহস!

কও কী বুড়ি?

বোঝ্‌তয়। মায়েরে কয় পোলায়! কয়। তুমি আমার অতিথিরে অপমান করো! তোমারে আমি আর এক পয়সাও পাঠাইম্যু না। না-খাইয়া মরণ লাগবো তোমার দেইখআনে। কইয়া দিলাম আজ।

শিলি কাঁদতে থাকা কিরণশশীকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, তুমি কান্দো ক্যান্ বুড়ি? আমরা তো সবাই আছি নাকি, নাই আমরা? আমরা যদি দুগা খাই, নিজেরা যদি না-খাইয়া না মরি; তয় তোমারেও খাওয়াইমু। পুতনদার মাথাটাই এক্কেরে গ্যাছে গিয়া। ভূত চাপছে মাথায়।

নারে শিলি। মাথা-টাথা যায় নাই। ওডায় এক নম্বরের শয়তান। এক্কেবে ওঁচা হইয়া গেছে। অরে প্যাটে ধরছিলাম ক্যান, তাই ভাইব্যাই ঘেন্না হয় বড়।

ছাড়ান দাও। ছাড়ান দাও। তাছাড়া পুতনদায় তো তোমার একমাত্র পোলা। তারে ফ্যালাইবাই বা কী কইর‍্যা তুমি? পারবা ফ্যালাইতে? শিলি বলেছিল।

কিরণশশীর মুখে এক অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠেছিল।

বলেছিলেন, পারি কী না দেখিস তুই আমি সব পারি। আমারে তরা অর্ধেক চিনছস। পুরা চিনস নাই। এমন পোলা থাকনের চাইয়া, না থাকনই ঢের ভালো।

শিলি বলেছিল, কাইন্দো না বুড়ি।

কিরণশশী বলেছিলেন, তরে আর পুতনরে লইয়া বুড়া বয়সে সুখে কয়ডা দিন কাটাইম্যু এই স্বপন বুকে লইয়াই এতগুলা বচ্ছর প্রায় না-খাইয়াই কাটাইয়া দিছিরে শিলি! শুধাই কল্পনা আর স্বপ্ন খাইয়াই বাঁচছি। আর...

কাইন্দো না বুড়ি।

শিলির গলা ধরে এসেছিল।

তর কী হইবরে শিলি? ওই হারামজাদায় যে তোরে এমন কইর‍্যা ফ্যালাইয়া দিবে তা আমি জানুম কী কইর‍্যা? ক? তর মতন ভালো, লক্ষ্মী একখান মাইয়া ওই হারামজাদার জীবন সুখে ভইর‍্যা দিতো নে। ছিঃ ছিঃ। কী পোলায় আমার কী হইয়া গেল। শহরে যেন কোন গ্রামের ছাওয়ালরে কেউ না পাঠায় "মানুষ" কইরবার লইগ্যা। কী মানুষই হইল! হায়। হায়।

ছিঃ ছিঃ। কী বল বুড়ি। তোমার একমাত্র সন্তান সে। আর সকলেই তো গ্যাছে গিয়া। পুতনদা ছাড়া তোমার আর তো কেউই নাই। অমন শাপ দিও না তারে। কে কইতে পারে, আবার বদলাইতেও পারে কুনোদিন। কোন কু-দেবতায় ভর করছে তার উপর। তার দৃষ্টি কাইট্যা যাইব গিয়া।

যাউক। যাউক। এও যাউক। আমি অভিশপ্তা। বুঝছস? হতভাগী আমি। কাউরেই লাগব না

আর আমার। গলায় দড়ি দিয়া মইর‍্যা থাকুম এক রাতে। দেখিসানে তুই।

শিলি আর কথা না বাড়িয়ে চলে এসেছিল, বুড়ির গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে। চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে।

ফেরার পথে, শিলির নিজের দুচোখও জলে ভরে গেছিল। বড় বড় ফোঁটা গাল গড়িয়ে পড়ে, বুকের ব্লাউজের সামনেটা ভিজে গেছিল একেবারে।

কী করবে শিলি? ওর চোখের জল মোছাবার তো কেউই নেই।

সাড়ে সাতটা নাগাদ এসে গেল ওরা সকলে।

বড় ঘরের দাওয়ায় মাদুর পেতে তাকিয়া বের করে দিয়েছিল শিলি।

সন্ধের পর জোর হাওয়া বয় প্রথম বৈশাখে। গরমের 'গ'ও থাকে না। তবুও হাত পাখা দিয়েছিল তিন চারটি। রেকাবিতে মিছরি, জল, পান। বড় বড় কাঁসার গ্লাস। বাবার বিয়ের সময় পাওয়া। এ সবই এক এক করে বের করেছিল শালকাঠের বড় বাক্স থেকে। তেঁতুল দিয়ে মেজেছিল ভালো করে। সেই সব গ্লাসে খোদাই করে লেখা ছিল "সংসার সুখী হয় রমণীর গুণে।"

শিলি লক্ষ্য করছিল যে, বাবার সঙ্গে মাঝে মাঝে ইংরিজিতে কথা বলছিল রাজেন। ইংরিজিতে কথা বলতে পারে এমন বেশি লোক দেখেনি শিলি। কথার মানে না বুঝলেও, অবাক হচ্ছিল।

পুতনদাও মাঝে মাঝেই ইংরিজি শব্দ, এমনকী বাক্যও বলছিল।

সবচেয়ে অবাক হল শিলি গদাইদাকেও কলকাতার সবজান্তা বাবুদের ওই সব রাজনীতি, ফুটবল, সিনেমার আলোচনাতে যোগ দিতে দেখে। গাঁইয়া গদাইও ওদের সঙ্গে তাল দিয়ে পটাপট ইংরিজি বলছিল দেখে তাজ্জব বনে গেল শিলি।

পুতন ধরল, শিলিকে গান গাইতে হবে।

শিলির খুবই আপত্তি ছিল। কিন্তু পুতনই ঘরে গিয়ে ভাঙা হারমোনিয়ামটাকে বের করে নিয়ে এল। নিয়ে এসে, রাজেনকে দিল।

রাজেন, জ্যাঠার মতো দুটি পান মুখে দিয়ে, হারমোনিয়ামটি নেড়ে চেড়ে সুর বের করল।

বলল, ওবাবা! এ যে দেখি আমাদের ডোয়ার্কিন এন্ড সন্স-এর। কলকাতার?

কাকা বলল, তা বটে। তবে এই হারমোনিয়াম থিক্যা সুরের থিকা ত্যালপোকাই বারাইব বেশি। সাবধানে নাড়া চাড়া করণই ভালো।

হ। ডোয়ার্কিন এন্ড সন্স-এরই বটে!

লজ্জা-মাখা স্মৃতিচারণের সঙ্গে বলেছিলেন নরেশ, শিলির বাবা।

একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন, আমার বড় শালা যেবার আইছিলেন, শিলির মায়ের জন্যে লইয়া আইছিলেন।

হারমোনিয়ামটা শিলির দিকে ঠেলে দিয়ে রাজেন বলেছিল, একটা গান হোক।

উঠোনে, কাঁঠালগাছে, লিচুগাছে, গোলাপজামগাছের পাতাতে জ্যোৎস্না চকচক করছিল। ভালো করে চান করে, একটি ফলসা-রঙা খোল আর বেগনে রঙা পাড়ের টাঙ্গাইলের শাড়ি পরা, চোখে কাজল-দেওয়া, শিলিকে খুবই সুন্দর দেখাচ্ছিল। গায়ে বোধহয়, ক্যালকাটা কেমিকেলের কান্তা সেন্ট মেখেছিল। কী সাবান, কে জানে? লাক্স কি?

ভাবছিল, রাজেন।

শিলির হাঁটু সমান মিশমিশে কালো চুলে বোধহয় আমলকির তেল দিয়েছিল, চুলের গন্ধ ভাসছিল জ্যোৎস্নাতে। জ্যোৎস্নার গন্ধ, শিলির গায়ের গন্ধ, চুলের গন্ধ, রাজেনের গায়ের আতরের উগ্র গন্ধ,

হাসনুহানা আর বেলফুলের গন্ধে মাতালকরা বৈশাখি হাওয়ায়-ওড়া বাঁশবনের হলুদ পিছল-পিছল ফিনফিনে পাতাদের গন্ধ; সব মিলে মিশে রাত একেবারে গন্ধমাতাল হয়ে উঠেছিল।

চাঁদের আলোয়, গদাই চোরের মতো, শিলির চোখের দিকে তাকাচ্ছিল। হ্যাজাকের আলোতে সবকিছুই বড় বেশি স্পষ্ট দেখায়। কল্পনার কোনো অবকাশই থাকে না সেখানে।

বড় ভালো লাগছে গদাই-এর এই শিলিকে। যদি শিলিকে জীবনে পায়, তবে এমন চাঁদের রাতে, নদীপারের চাপ চাপ নরম ঘাসের ওপর শুইয়ে একদিন আদর করে দেবে ও! ভালোলাগায় শিলি বলে উঠবে উঁ-উঁ-উঁ-উঁ-উঁ।

গদাই মনে মনে বলল, আহা, "এমন চাঁদের আলো মরি যদি সেও ভালো!"

গদাই-এর স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে রাজেন বলল, বুঝেছি। তোমার লজ্জা ভেঙে দেবার জন্যে অন্য কারও গাইতে হবে তোমার আগে। তাই না? জানো, আমার ছোটোপিসির গানের খাতায় আমাদের পাড়ার গোপেন কাকা লিখে দিয়েছিল : "লজ্জা নারীর ভূষণ কিন্তু গানের বেলায় নয়।"

গোপেন কাকার "লব" ছিল ছোটোপিসির সঙ্গে।

শিলি লজ্জায় বেগনে হয়ে গেছিল।

এমন সব কথা গুরুজনদের সামনে বলে কী করে লোকটা? কোনো সহবৎই কি শেখেনি এই কলকাতার বাবু?

তারপরই রাজেন বলল, ঠিক আচে। আমিই শুরু করলুম তবে আগে।

বলেই, হারমোনিয়ামটা টেনে নিয়ে, শুরু করল :

মাঝে মাঝেই বেলো করা ছেড়ে, বাঁ হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে গাইতে শুরু করল। বাঁ হাত দিয়ে হারমোনিয়ামের উপর তালও দিতে লাগল মধ্যে মধ্যে। গলাটা বেশ ভালো। তবে গায়কীটা কেমন অসভ্য অসভ্য।

"ফাঁকি দিয়ে প্রাণের পাখি,
উড়ে গেলো আর এলো না
'কু' দিয়ে চলে গেলো
কোথায় আমার প্রাণ ময়না।

বলো সখী, কোথা যাবো
কোথা গেলে পাখি পাবো?
পুলিশে কি খবর দেবো
বলো তো, জানাইগে থানায়।

ফাঁকি দিয়ে প্রাণের পাখি
উড়ে গেলো আর এলো না।

এমন ধনী কে শহরে?
আমার পাখি রাখলে ধরে
দেকলে পরে, মেরে ধরে
কেড়ে নেবো প্রাণ ময়না।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইল গানটা রাজেন।

শিলি অবাক হয়ে গেল। অবাক হল বাবা এবং কাকাও। রান্নাঘরের দাওয়ায় বসা কিরণশশীও কম অবাক হলেন না।

বড় ভালো গান গায় রাজেন। যেমন গলার স্বর, তেমনই সুরজ্ঞান, তালের উপরও তেমনই দখল।

রাজেনের উপর যত বিরক্তি জমেছিল এ কদিনে দেখে শুনে, সবই যেন এই একটি গান ধুইয়ে দিয়ে গেল। আশ্চর্য। গান, বড় দারুন শখের জিনিস।

বুঝল শিলি।

শিলি ভাবছিল, পৃথিবীতে এমন কোনো লোক বোধহয় নেই, যার সবই দোষ। এই খারাপ মানুষটা যে এত ভালো গান গায় তা বিশ্বাস করতেও মন চায় না। শুধু গানের জন্যেই মানুষটাকে ভালোবাসা যায়। সব কিছুই দেওয়া যায়। যে মেয়েদের মধ্যে সুর আছে, গান আছে, তারাই জানে গানের মহিমা, গানের প্রভাব।

মন্ত্রমুগ্ধর মতো রাজেনের দিকে চেয়ে রইল শিলি।

নরেশ বললেন, বাঃ বাঃ। এসব গান তুমি শিখলা কার কাছে।

রাজেন বলল, কাকাবাবু, আমাদের পাড়া তো গানেরই পাড়া। বাঈজিদের গান শুনেই তো বড় হয়েছি। তাছাড়া, আমার মামারা সব ছিলেন গানের পোকা। কত সব বড় বড় গাইয়ে আসতেন মামাবাড়িতে। তেলিনীপাড়ার কালোবাবু, কালিপদ পাঠক, গহরজান বাঈজি। মস্ত জমিদার ছিলেন তো মামারা। পায়রা ওড়াতেন, বেড়ালের বে দিতেন। খুবই রমরমা ছিল। হুইস্কি খেয়ে মৌজ হবার পর আলবেলার নল হাত থেকে পড়ে গেলে, চাকরের পুরো নাম ধরে ডেকে কখনো মৌজ নষ্ট করতেন না। বলতেন, রে। রে রে।

অমনি চাকরেরা দৌড়ে এসে, নল তুলে দিত হাতে।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, আমি তো আমার পরিবারের কুলাঙ্গার।

হঠাৎই বলল রাজেন কথাটা, হ্যারিকেনের আলোতে শিলির দিকে এক ঝলক চেয়েই।

গানটা ভালো কইর‍্যাই করন উচিত ছিল রাজেন তোমার। বুঝছ। কথায় কয়, নরাণাং মাতুলক্রমঃ। মামাদের গুণগুলান সবই পাইছ দেহি।

রাজেন হেসে বলল, তা আজ্ঞে। তবে শুধু গুণগুলো পেলেই ভালো হত। শুধু গুণ নয়, দোষগুলোও যে পুরোমাত্রাতেই পেয়েছি। ভালো করে কিছু করা যে আমার চরিত্রেই নেই। আমার মন হচ্ছে, ঘাস ফড়িং-এর মন। চিড়িক চিড়িক করে চমকে চমকে উড়ে বেড়ায়। কোনো কিছুতেই স্থির হয়ে বসতে চায় না। তাইই কিছুই ভালো করে করা হল না। না পড়াশুনো, না গান-বাজনা, না শেয়ার বাজার। আমি একটি ওয়েস্টার। ওয়ার্থলেস। তাই শুধুই লাথি-ঝ্যাটা আর অপমানই জুটল কপালে। অবশ্য যার যেমন যোগ্যতা, তেমনই তো হবে প্রাপ্তি।

হেসে, বলল রাজেন।

শিলির কিন্তু মনে হল, যেন কেঁদে বলল।

অনেক হাসির মধ্যেই কান্না থাকে। সকলের চোখে পড়ে না তা।

কথাও কিন্তু চমৎকার বলে রাজেন। শিলি ভাবছিল।

শিলি তো কোন গাঁইয়া অশিক্ষিত মেয়ে। রাজেনের কথা আর গানে ভুলে যাবে পৃথিবীর যে-কোনো রাজকুমারীই। কথা দিয়ে বোধহয় জগৎ মাৎ করা যায়। হয়তো, শুধু কথার কথা হলেও। মনে মনে বলল শিলি, দিয়ে দেবে সহজেই ও রাজেন যা চায়। তাছাড়া ওর যা কিছুই আছে। সে তো

অন্য সব মেয়েরই আছে। বিশেষ কিছু বা বেশি কিন্তু ওর নেই দেমাক করার মতন।

ওর ফুলে, ওর নরম, সবুজ বর্ষা শেষের স্নিগ্ধ মাঠে। একটু বসবে হয়তো তারপরই ঘাসফড়িং আবারও হয়তো উড়ে যাবে অন্যদিকে।

কে জানে, শিলি হয়তো জানে না, কিছু ক্ষণিক মরণ থাকে, যা দারুণ সুখের। সেই ক্ষণিক মরণের গভীর আনন্দর স্মৃতি নিয়ে বাকি জীবনের অনেক দুঃখই হয়তো লাঘব করা যায়। পুতনদাকে আর ভালো লাগছিল না একটুও।

শিলি কেবলই ভাবছিল। ভাবনার যদি পা থাকত, তবে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কত হাজার মাইল যে পরিক্রম করে ফেলত ও, তা সেই জানে। ভাবছিল শিলি, মরারও অনেক রকম থাকে। কিছু কিছু মৃত্যু হয়তো থাকে, যা জীবনের চেয়েও অনেক বেশি প্রার্থনার।

কে জানে? কতটুকুই বা জানে শিলি?

গদাই বলল, এবার শিলির গান হোক একটা। কী বলেন নরেশ কাকু?

রাজেন বলল, নরেশ কিছু বলার আগেই, নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই।

ওঁর গান হবে বলেই ত আমার উপক্রমণিকা। ওঁর গান শুনব বলেই তো বসে আছি। বলেই, হারমোনিয়ামটা ঠেলে দিতে যেতেই, শিলি বলল, আপনি আরেকটা গান। আপনার এই গানের পর আমার গান হয় না।

সে কী? একটা গান শুনেই। আমি কিন্তু এর চেয়ে ভালো গাই। আজ আমার গলাটা সত্যিই ভালো নেই।

গদাই পাতিহাঁসের মতো ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, রাজেনকে, খুবই ন্যাকার ঠ্যাকার জানা আছে দেহি আপনের।

"ন্যাকার-ঠ্যাকার" কথাটার মানে?

অবাক হয়ে রাজেন শুধোল।

নরেশ বলল, তুমি চুপ করবা গদাই। ন্যাকার-ঠ্যাকার কারে কয় জানো তুমি?

গদাই অপ্রতিভ হয়ে পড়ল।

রাজেন পরিবেশ অপ্রিয় হয়ে ওঠে, সেই ভয়ে কথা ঘুরিয়ে শিলিকে বলল, নাও নাও, তুমি এবার গাও। না গাইলে আমি খাব না কিন্তু এখানে।

আর বলতে হল না শিলিকে। বাড়ির সামনে আলোকঝারি পাহাড় দেখা যাচ্ছে শূন্য খেতের পর। চাঁদের আলোতে রুপোঝুরি হয়ে উঠেছে পুরো অঞ্চল। আলোকঝারি দিনের আলোয় সোনাঝুরি, আর অন্ধকারে মিশি-নিশি। ওইদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে, হারমোনিয়ামটাকে কোলের কাছে টেনে নিতে নিতে শিলি নিজেই আলোকঝারি হয়ে উঠল। ওর মনে হল, গানেরই আরেক নাম আলোকঝারি। আজ ওর ভিতরে গান ফুলের মতো ফুটেছে। এক্ষুনি এর সুবাস ছড়িয়ে না দিতে পারলে, নিজ-সুবাসেই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাবে শিলি।

শুরু করল শিলি,

> "চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে। উছলে পড়ে আলো।
> ও রজনীগন্ধা তোমার গন্ধসুধা ঢালো॥
> পাগল হাওয়া বুঝতে নারে ডাক পড়েছে কোথায় তারে
> ফুলের বনে যার পাশে যায় তারেই লাগে ভালো॥
> নীল গগনের ললাটখানি চন্দনে আজ মাখা,
> বাণীবনের হংসমিথুন মেলেছে আজ পাখা।

পারিজাতের কেশর নিয়ে ধরায় শশী, ছড়াও কী এ।
ইন্দ্রপুরীর কোন রমণী বাসরপ্রদীপ জ্বালো॥

তারপর অস্থায়ী, অন্তরা হয়ে সঞ্চারী থেকে আভোগে এসে পৌঁছলো শিলি।

গান শেষ হলে, রাজেন বলল, বাঃ।

একটি মাত্র শব্দ। শুধুই বাঃ।

ওই একটি শব্দ দিয়েই, যা বোঝাবার বুঝিয়ে দিল রাজেন। হৃদয়-মথিত শব্দ।

শিলি যখন গান গাইছিল, তখন চাঁদের আলোয় বসে পুতন ভাবছিল, ও একাই জানে, এই গান কার উদ্দেশে গাওয়া। শিলি যে পুতনকেই ভালোবাসে, পুতনের অপেক্ষাতেই যে তার সব প্রতীক্ষা, তা রাজেন জানবে কেমন করে? ভালোবাসাতো আর রাতারাতি হয় না।

আর তখন গদাই ভাবছিল, ফুলের বনে কারে ভালো লাগে শিলির তা ওই কলকাতাইয়া বকাটায় জানবো ক্যামনে? কিরণমাসির ছাগল-পুত ওই পুতনেই বা বোঝব ক্যামনে। এই গান গাইল শিলি, হুদা গদারই লইগ্যা।

রাজেন ভাবছিল, সম্পূর্ণই অন্য কথা।

ভাবছিল, বড় হবার পর থেকে মেয়েদের শরীর নিয়ে অনেকই ঘাঁটাঘাটি ছিনিমিনি করল। মেয়েদের ও যেমন বোঝে, তেমন কম লোকেই বোঝে, এমন একটা ধারণা জন্মে গেছিল ওর। "ভিলেজ-বিউটি" শিলির শরীরটাকেই পেতে চেয়েছিল রাজেন। শিলিকে দেখার পর থেকেই ওকে শারীরিকভাবে পাবার জন্যে তীব্র এক আসক্তি বোধ করছিল। প্রত্যেক শরীরের স্বাদই আলাদা। তাইই তৃপ্তি হয় না কিছুতেই। এত পেয়েও তৃপ্তি হয়নি। সবসময়েই মনে হয়েছে, আরও চাই, নতুন চাই। নতুন প্রক্রিয়াতে চাই। অথচ আজ এই আলোকঝারির পায়ের কাছের গণ্ডগ্রামের চাঁদ-মাখা সন্ধেবেলা কী যে ঘটে গেল হঠাৎ ওর মধ্যে। প্রতিসরিত চাঁদের আলোয় শিলির মুখটিকে দেখে রাজেনের মধ্যে প্রেম কাকে বলে, সেই সম্বন্ধে এই প্রথম যেন এক অনুভব জাগল। এই প্রথম ও জানল কাম শুধু জ্বালাই বাড়ায়, আর প্রেম দেয় স্নিগ্ধতার প্রলেপ। ওর মধ্যে এক আশ্চর্য গভীর শান্তিকে অনুভব করতে লাগল ও। কারও সামনে বসে থাকলেও যে এতো ভালো লাগতে পারে কখনো, সে সম্বন্ধে সত্যিই ওর কোনো ধারণা ছিল না। ওর সামনে কোনো মেয়ে বসে থাকলেই ওর অভিজ্ঞ চোখ দিয়ে মনে মনে তাকে নিরাবরণ করেই দেখতে ভালোবেসেছে রাজেন এতদিন। কিন্তু আজকের এই শালীন, সুন্দর অনুভূতির শরিক এর আগে সত্যিই কখনো হয়নি। নিজের মধ্যের দুর্বলতায়, নিজের ভঙ্গুরতায়, মুগ্ধতায় বিস্মিত হয়ে যাচ্ছিল রাজেন ক্রমশ নিশ্চুপে।

এমন সময় শিলি বলল, আর একখানা গান কি গাওয়া যায় না?

বাঙাল, গেঁয়ো মেয়েটির সবকিছুই বড় মিষ্টি লাগছে রাজেনের। এমনকী ওই দুর্বোধ্য ভাষাও।

রাজেন বলল, ইনডায়রেক্ট ন্যারেশানে কথা কইলে আমি জবাব দিই না সে কথার। তাছাড়া আমার কি মা-বাবার দেওয়া নাম নেই কোনো?

শিলি হাসল। প্রায়ান্ধকারের মধ্যেও উঠোনে ও দাওয়ার আলোর প্রতিসরণে শিলির দাঁত ঝিকঝিক করে উঠল।

শিলি বলল, আচ্ছা! আবারও কইতাছি, রাজেনদা আর একখান গান গাইয়া ধন্য করেন আমাগো।

বলেই, হেসে উঠল।

নরেশ এবং পরেশ দুই ভাইই তাদের মেয়ে এবং ভাইঝির হঠাৎ প্রগলভতাতে একটু রুষ্ট হল। কিরণশশী, এই নতুন শিলিকে দূরে বসে বোঝবার চেষ্টা করছিলেন। সবচেয়ে বেশি অবাক হয়েছিল পুতন। এবং হতাশ হয়েছিল গদাই।

আর কথা না বাড়িয়ে, রাজেন হারমোনিয়ামটাকে টেনে নিয়ে শুরু করল :

"কী হলো আমারো সই বলো কী করি।
নয়ন লাগিল যাহে, কেমন পাসরি।
হেরিলে হরিষ চিত, না হেরিলে মরি
তৃষিত চাতকী যেন যাকে আশা করি।
ঘনমুখ হেরি সুখী, দুখী বিনে বারি।"

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিধুবাবুর এই টপ্পাখানি গাইল রাজেন।

এই গানটি তার ছোটমামার কাছে তোলা। এ পর্যন্ত এই গানটি কয়েকশোবার গেয়েছে একা একা, নিজেকে শোনাবার জন্যে এবং অন্যকে ও অন্যদের শোনাবার জন্যেই বেশি। কিন্তু এই গানের বাণীর আসল তাৎপর্য ও যেন এই মুহূর্তে প্রথমবার আবিষ্কার করল। এতদিন টপ্পার কাজের প্রতিই মনোযোগ ছিল বেশি। আজ গানের প্রতিমার শোলার কাজ ছাপিয়ে প্রতিমার পূর্ণ, প্রস্ফুটিত মুখখানি গোচরে এল, মনের অতল গভীর স্পর্শ করল গান রাজেনের জীবনে। গেয়েও যে এতখানি মগ্ন হওয়া যায়, শুধু শুনেই নয়; এই অভিজ্ঞতাও যেন জীবনে এই প্রথম হল।

শিলি স্তব্ধ হয়ে বসেছিল। আরও একঝাঁক "হেরন" কোয়াক কোয়াক কোয়াক করে ডাকতে ডাকতে চাঁদভাসি রাতের মোহময়তাকে মুহূর্তের জন্যে ছিন্ন করে আলোকঝারির দিক থেকে এসে ময়নামারীর বিলের দিকে চাঁদের আলোয় ভাসতে ভাসতে চলে গেল। গানের পরের নৈঃশব্দ্য তাদের ক্ষণিক অপার্থিব দূরাগত শব্দে যেন গাঢ়তর হল।

অনেকক্ষণ সকলেই চুপ করে রইলেন।

নৈঃশব্দ্যর চেয়ে বড় গান আর কিছুই নেই। ভাবছিল রাজেন।

সেই ঐশ্বরিক স্নিগ্ধ নিস্তব্ধতাকে হঠাৎ ধেবড়ে দিয়ে গদাই তার পাতিহাঁসের গলায় বলল, খাইতে দ্যাও শিলি। ক্ষুধা লাগছে বড়। কাল ভোরেই আবার কোকরাঝাড় যাওন লাগব আমার।

পরেশ ও নরেশ দুজনেই বলল, হ। হ। শিলি। এইবারে আস্তে আস্তে জোগাড় যন্তর কর।

কিরণশশী মৃদু ভর্ৎসনার স্বরে গদাইকে বললেন, সন্ধ্যাকালেই ক্ষুধা লাগে ক্যানরে তর? তুই কি শিশু?

গদাই উত্তর দিল না। ওকে কেউ শিশু বললে ও খুশিই হয়। শিশুরই মতো মুখ হাঁ করল। এমনই করে যে, যে-কোনো সময়েই পোকামাকড় ঢুকে যেতে পারত।

রাজেন ভাবছিল "ক্ষুধা" ওরও পেয়েছে। কিন্তু এই খিদে ভাতের খিদে নয়, নারী শরীরের খিদেও নয়, এমনই এক খিদে, যার বোধ মনে না জাগলে মানুষজন্মই বৃথা। ও মানুষ হয়েই তো জন্মেছিল। জোড়াসাঁকোর রাজেন। আজ ও দ্বিজ হল।

কিরণশশী, হাঁটু মটমটিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। গাঁটে গাঁটে বড়ই ব্যথা। ধনেশ পাখির দুর্গন্ধ তেল মালিশ করেন। নরেশ, কিরণশশীর জন্যে ধনেশ পাখি মেরে আনে বন পাহাড় খুঁজে।

তারপর স্বগতোক্তি করলেন, যাই। মাইয়াটারে সাহায্য করি গিয়া। এতগুলান পাত, ও একা সামলাইব কী কইর‍্যা?

হাঁসের ঘরে, সেই কথা শুনে, একটা হাঁসী হিসহিস করে উঠল।

গদাই-এর গলার স্বর শুনেও করে থাকতে পারে।

আর ক'দিন বাদেই সাতবোশেখির মেলা। রাজেনকে নিয়ে পুতন বেরিয়েছে সন্ধের পরে চাঁদের আলোতে সাতবোশেখির মেলার পথটি দেখাতে।

কথা হয়েছে, সেদিন ওরা সকলে মিলে একই সঙ্গে যাবে মেলাতে। পুতন, রাজেন, শিলি, চাঁপা, চামেলি, গদাইও।

পরেশ কাকা পরে যাবেন নিজের সময় মতো, সাইকেলে। শিলি এবং অন্যান্য মেয়েরা যাবে গোরুর গাড়িতেই। ছইয়ের নীচে খড় বিছিয়ে, তার উপর শতরঞ্চি পেতে নেবে। আর রাজেন, পুতন, গদাই ওরা সকলে যাবে হেঁটেই।

সেদিন নানারকম মানুষ যাবে পাহাড়ে। রাজবংশী, অহমীয়া, রাভা, মেচ সব নারীরা। বাঙালি বাবুরাও অনেক। বউ-মেয়ে-আন্ডা-বাচ্চা নিয়ে ডিমডুমা চা বাগানের সাঁওতাল কুলিরা। ধুবড়ীর ম্যাচ ফ্যাক্টরির বিহারি কুলিরা। মিশ্র মানুষের পায়ের ধুলোয় বন-পাহাড়ের পথ পাশের গাছ-গাছালি ভরে যাবে। গমগম করবে পথ, মানুষের গলার স্বরে। টুঙ-বাগানে, অভিজ্ঞ মাত্রই জানেন যে, সেদিন সাইকেল লুকিয়ে রেখে যাওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। সাইকেল চুরিও হয়ে যেতে পারে।

আলোকঝারি পাহাড়ের দিকেই হাঁটতে গেছিল আজ বিকেলে, রাজেন আর পুতন।

পুতন ভাবছিল, এই রাজেন ছেলেটার নিশ্চয়ই কোনো অসুখ করেছে।

দু'তিনদিন হল একেবারেই বদলে গেছে ও। খায় না, হাসে না. খারাপ খারাপ কথা বলে না, মেয়েদের দিকে রসের চোখে তাকায় না। আশ্চর্য। ড্রিঙ্কও করতে চায় না। শুধুই সিগারেট। খেয়ে যাচ্ছে, একের পর এক।

ওর চোখে এক দারুণ ঔজ্জ্বল্য এসেছে। বিয়ের পর পর মেয়েদের চোখে যেমন আসে। ওর মনের মধ্যে কী যেন সব ঘটছে। ভাঙচুর। নদীর পাড় ভাঙার মতো। অথচ যে ভাঙাভাঙির আওয়াজ পাশে দাঁড়ানো মানুষও শুনতে পায় না।

পুতন বলছিল. শৈলেন ডাক্তারের কাছেই রাজেনকে নিয়ে যাবে একবার তামাহাটে। নিদেনপক্ষে শৈলেন ডাক্তারের ছোট ভাইকে খবর দিয়ে আনিয়ে একবার দেখিয়ে নেবে ঠিক করল রাজেনকে। কিছু একটা ব্যামো বাধালে বিপদে পড়বে পুতনই।

কেমন দেখলে?

পুতন শুধোল।

উঁ?

অন্যমনস্ক গলায়, রাজেন বলল।

কেমন দেখলে?

পুতন আবারও বলল।

ভালো। পাখিটাতো?

আরে না না। পাখি নয়। আলোকঝারি পাহাড়ে যাওয়ার পথটা কেমন দেখলে?

স্বপ্নোত্থিতর মতো রাজেন বলল, ওঃ। হ্যাঁ। বেশ ভালোই তো! বাঃ! চমৎকার।

আসলে রাজেনের উপরে এই আলোকঝারি পাহাড়, গঙ্গাধর নদী, এই গ্রাম্য এবং বন্য প্রকৃতি এক আশ্চর্য অজ্ঞাতপূর্ব, অপ্রতিরোধ্য, প্রভাব বিস্তার করেছে। কলকাতার ছেলে। শিশুকাল থেকেই প্রকৃতির সঙ্গ বলতে ক্বচিৎ বটানিকাল গার্ডেনে যাওয়া আর মাসে একবার দাদু বা মামাদের সঙ্গে গাড়িতে ময়দানে যাওয়াকেই জেনেছে। হর্টিকালচার গার্ডেনেও গেছে অবশ্য বার কয়েক। মামাদের বাগানবাড়িতে।

তারপরেই চা বাগান।

উত্তরবঙ্গর সৌন্দর্যর তুলনা হয় না কোনো। তবে তা তিস্তার উপত্যকার। ওই চা বাগানটা একটি ছোট শহরের লাগোয়া। বড় জঙ্গল বা নদী কাছাকাছি নেই। সোজা লালমাটির বা পিচের পথ,

মাপা-জোঁকা। তার দুপাশে সমান মাপের চা বাগান। সারবন্ধ কুলি লাইন। বাবু-কোয়ার্টার। অফিসারদের বাংলো। বড় গাছ বলতে, শেড-ট্রিগুলো। প্রকৃতির মধ্যে যে অনিয়মের নিয়ম আছে, অবিন্যাসের মধ্যে নিহিত থাকা দারুণ এক বিন্যাস আছে, তা হঠাৎ করে চোখে পড়ে না কারোই। এখানে এতদিন আসার পরও চোখে পড়েনি রাজেনের। হঠাৎ পড়ল। ওর মনের মধ্যে এই আলোকঝারির আঁচল-ঘেঁষা ছোট গ্রামের প্রভাব তার উপর অনিবার্যভাবেই পড়েছে। শিলির এবং রাত পাখিদের গলার স্বর, বাঁশবনের চৈতি-হাওয়ার কান্না, দিনের বেলাতে আলোকঝারির পাতা-ঝরা বনের মধ্যে দিয়ে দৌড়ে যাওয়া কোটরা হরিণের লালচে-চমক। জুম-চাষের জন্যে পুড়িয়ে-দেওয়া জঙ্গলের প্রান্তবর্তী খেতের সীমানাতে কালো হয়ে যাওয়া পত্রহীন গাছের উপরে লাল-কালো ফুলের মতো সার সার বনমুরগিকে বসে থাকতে দেখা সবই ওর জীবনকে এক নতুন ব্যাপ্তি দিয়েছে।

গঙ্গাধর নদী বেয়ে চলে যাওয়া পাল-তোলা নৌকোর নিঃশব্দ গতি, উদবেড়ালের বালির পারের গর্ত ছেড়ে হঠাৎ জলে লাফিয়ে পড়া, এই সব দৃশ্য, শব্দ, গন্ধ রাজেনকে এক সম্পূর্ণ অনাস্বাদিত জগতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। বাস-ট্রাম-ঘোড়ারগাড়ির কলকাতায় আশৈশব লালিত হয়েছে বলেই, এই ভিড়ের, ধুলোর ধুঁয়োর পৃথিবীতে এখনও এমন এক আশ্চর্য জগৎও যে বেঁচে আছে; তা ওর জানাই ছিল না।

এসব তো আছেই! তার উপরে শিলি! শিলিকে কতটুকুই বা জেনেছে ও? অথচ তবু, সেই রাতের পর থেকেই, রাজেনের স্বপনে-জাগরণে শুধু মাত্র শিলিই। শিলি ছাড়া আর কেউই নেই। এমনকী বাগবাজারের সোনালি, যার সঙ্গে ওর প্রচণ্ড লদকা-লদকি আছে এবং যে কারণে রাজেনের বাবা সোনালিকে একবার গুম করিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও করেছিলেন, সেও মুছে গেছে মন থেকে ওর।

কলকাতার রাজেন ভাবত, ব্যাঙ্কের টাকা, কোম্পানির কাগজ, বাড়ি, ডেইমলার বা ক্যাডিলাক বা রোলস বা মার্সিডিস গাড়িই বুঝি ঐশ্বর্যর একমাত্র সংজ্ঞা। এমন আদিগন্ত আকাশ, এমন সুগন্ধি বাতাস, এমন পাখির স্বর, ফুলের শোভাও, যে কম বড় ঐশ্বর্য নয়, তা ও এখানে এসেই জেনেছে। এই দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলা, সরল, সোজা, উচ্চাশাহীন, লোভহীন মানুষগুলোর প্রতি ওর এক আশ্চর্য মমত্ববোধ এবং শ্রদ্ধাও জেগেছে।

এখানে এখনও মানুষের পরিচয় বিত্ত দিয়ে নয়। হৃদয়ের মাপ দিয়ে এখনও মানুষের পরিমাপ হয়। পয়সা ছাড়াও অন্য অনেক কিছুই যে আছে, যা নিয়ে মানুষ গর্ব করতে পারে, সে সম্বন্ধে এখন পুরোপুরিই নিঃসন্দেহ রাজেন।

বসবে নাকি একটু ওই গুঁড়িটার উপরে? তুমি দেখছি হাঁফিয়ে গেছ!

পুতন বলল, রাজেনকে।

রাজেন কথা না বলে, পথের পাশে ঝড়ে-পড়া একটা গাছের গুঁড়ির উপরে বসল।

পুতনও বসল পাশে।

হাঁফাচ্ছিল ঠিকই রাজেন, কিন্তু সেটা শুধুই চড়াই ওঠার জন্যে নয়।

দৌড় চলছিল বাইরে নয়, তার মনের মধ্যে। প্রচণ্ড দৌড়। ওর মূল থেকে, জন্মাবধি যে পরিবেশের মধ্যে ও বড় হয়ে উঠেছে সেই পরিবেশ থেকে ও দ্রুত দৌড়ে আসছিল ভিতরে ভিতরে এই নতুন অনাস্বাদিত পরিবেশ ও জীবনের দিকে।

মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় না কোনো মানুষই। কূপমণ্ডুকতাকেই সুখ বলে জেনে এসেছে তারা, যুগযুগ ধরে। সহজ সুখের, সম্পদের, পুরুষানুক্রমিকভাবে গড়ে-তোলা বিত্তর, প্রতিপত্তির, নিশ্চিন্তির, নির্ভরতার, একঘেয়ে, থিতু, পরিক্রমাহীন জীবনকেই সবচেয়ে বেশি প্রার্থনার বলে জেনে

এসেছিল রাজেন, জীবনের এতগুলো বছর, ওর পূর্বপুরুষদেরই মতন। আজ হঠাৎ স্বেচ্ছায় ছিন্নমূল হতে চাওয়াতে ওর জীবনের গোড়াতেই টান ধরেছে। জীবনের অনেক ছন্দোবদ্ধ ধ্যান-ধারণার অসারতা বা সার সম্বন্ধেও রাজেনের মনে গভীর সব প্রশ্ন জেগেছে। ওর মধ্যে যে এত গভীর ভাবনা ভাবার ক্ষমতা ছিল, সে সম্বন্ধে ওর কোনো ধারণা পর্যন্ত ছিল না আগে।

পুতন কুমারগঞ্জের ছেলে। ওও ওর মূল ছিঁড়ে কূপমণ্ডুকতার অন্ধকার ছেড়ে বেরবার জন্যে বদ্ধপরিকর। অথচ কত ভিন্ন ওদের দুজনের চাওয়া। ওর পাশে বসেও রাজেনের ভিতরে ভিতরে যে কী হচ্ছে, তা বুঝতে পর্যন্ত পারছে না ও।

জল খাবে নাকি?

পুতন শুধাল রাজেনকে।

রাজেনের মতি-গতি, চোখের ভাব বড় একটা ভালো লাগছিল না পুতনের। রাজেনের জন্যও চিন্তিত হয়ে উঠেছে।

মুখে কথা না বলে, চোখ দিয়ে রাজেন বলল, পরে।

পুতন বলল, প্ল্যানটা কী করলে রাজেন? সময় তো ফুরিয়ে আসছে। তুমি কি সাতবোশেখির মেলার রাতে এই জঙ্গলের মধ্যেই শিলিকে জোর করেই? সেদিন পূর্ণিমা। আলো থাকবে কিন্তু অনেক। বন-পাহাড় হাস্‌বে আলোয় আলোয়। আর একটা কথা। তোমাকে যে সুখী করতে পেরেছি, তুমি যে আমার উপরে সন্তুষ্ট, এ কথাটা কিন্তু চা বাগানে ফিরে ম্যানেজারবাবুকে ভালো করে বোল।

রাজেন পূর্ণদৃষ্টি মেলে পুতনের চোখে চাইল।

অনেকক্ষণ ধরে সেই নীরব দৃষ্টি পুতনের চোখের উপরে স্থির হয়ে রইল।

রাজেন মুখে বলল, নিশ্চয়।

পুতন আবারও বলল, বল, রাজেন প্ল্যানটা কী করলে বল?

পুতনের কথাতে এবারে বিরক্ত হল রাজেন। জিভে টাগরা ঠেকিয়ে একটা সংক্ষিপ্ত শব্দ করল। বিরক্তিসূচক। তারপরই চুপ করে গেল।

উপত্যকা থেকে একটা ময়ূর ডেকে উঠল। তারপরই ঝুপ্ ঝুপ্ শব্দ করে উড়ে এল ওপরে। কিছুটা এসেই, কী যেন একটা গাছে বসল, মস্ত লেজ ঝুলিয়ে। একটা ময়ূর চৈত্রমাসের পূর্ণচাঁদের ঠিক মধ্যিখানে বসেছে, গাছের ডালে, ক্যালেন্ডারের ছবিতে যেমন দেখা যায়।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না ও।

রাজেন মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে রইল সেদিকে। চিড়িয়াখানার আর মার্বেল প্যালেসে ছাড়া ময়ূর দেখেনি ও কখনো। তার উপরে সত্যিকারের জংলি ময়ূর। ভাবতেই পারছিল না যে, সত্যিই দেখছে। চাঁদের আলোয়, জঙ্গল পাহাড়ের সব কিছুর আলো-ছায়া, হাওয়ায় নড়ানড়ি করা পাতার হাতছানি, আলোছায়ার বুটিকাটা গালচে সবকিছুকেই এমন রূপ যে হয়, তা কি রাজেন জানত। আলোকঝারিতে না এলে, না এলে কুমারগঞ্জে। তথাকথিত শিক্ষাহীন, বি.এ. এম.এ ডিগ্রিহীন শিলির মতন মেয়েও যে হয় তাও কি এই নারীমাংসলোলুপ শহুরে রাজেন জানত? বড়ই রহস্যময় বলে মনে হয়।

অবাক হয়ে, চেয়ে রইল রাজেন। মুগ্ধ চোখে। ঠিক সেই সময়ই বনের গভীর থেকে করাত চেরার আওয়াজের মতন চিতাবাঘ ডেকে উঠল। সমস্ত বন-পাহাড় যেন চিরে চিরে গেল সেই ডাকে। সমস্ত গাছের কোটরে, নদী ও পাতার আর্দ্রতাবাহী অদৃশ্য রন্ধ্রে রন্ধ্রে সেই আওয়াজ ভরে গেল। ময়ূরটা ভয় পেয়ে ডাল ছেড়ে উড়ল আবার। ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্ করে বড় বড় ডানায় আওয়াজ তুলে। তারপর রাতের বনের গভীরে মিলিয়ে গেল। হঠাৎ ভেঙে-যাওয়া স্বপ্নর মতো।

পুতন বলল, চলো চলো, বাড়ি যাই। বড় বাঘের কাছে তেমন ভয় নেই। এই চিতাগুলোকে

ভরসা নেই। এও তোমার ভাগ্য। সারা জীবন বনে ঘুরেও অনেকের চিতার ডাক শোনা বা চিতাকে দেখার ভাগ্য হয় না। পরেশ কাকাকে বলতে হবে, চিতাটার কথা।

রাজেনের ওই জায়গা ছেড়ে ওঠার আদৌ ইচ্ছে ছিল না। ময়ূরেরই মতোও চিতা বাঘও ও শুধু চিড়িয়াখানাতেই দেখেছে। ওর কাছে ময়ূরও যা, চিতা বাঘও তা। আরও বিস্ময়ের জন্যে অপেক্ষা করতে রাজি ছিল ও।

কিন্তু চিতা যে কী জিনিস, তা পুতনের ভালো করেই জানা ছিল। ও যখন ছোট তখন তাদের সবচেয়ে ভালো গাই যুঁথীকে নিয়ে যায় এমনই এক চিতাতে, বর্ষার এক বিকেলে। আলোকঝারি পাহাড় আর গ্রামের মাঝের মাঠে চরছিল যুঁথী। তাছাড়া, কালকের হাটে শুনছিল যে, পর্বতজয়ের দিকে একটি মানুষখেকো চিতা এক মেচ-বুড়োকে নিয়ে গেছে। পুতন হঠাৎ উঠে পড়ে রাজেনের হাত ধরে বলল, চলো চলো আর এখানে থাকা ঠিক নয়।

চোখে ঘোর-লাগা, বিবশ মনের অনিচ্ছুক রাজেন বলল, চলো।

পাহাড় থেকে নামতে নামতে পুতন বলল, তুমি অনেকই বদলে গেছ রাজেন। জানলে!

হুঁ।

রাজেন বলল।

কিন্তু কেন?

কী জানি!

সত্যি অনেকই বদলে গেছ।

পুতনের কথার কোনো উত্তর দিল না রাজেন।

শিলিকে ভালো লাগেনি তোমার?

হুঁ।

একইভাবে বলল রাজেন।

তবে? তুমি চাও না তাহলে ওকে? নাকি, চাও?

হুঁ!

তুমি চাও ওকে?

পা থামিয়ে, মুখ ঘুরিয়ে রাজেনের মুখে চেয়ে শুধোল, পুতন।

রাজেন উত্তর দিল না কোনো।

মনে মনে বলল, চাওয়ার অনেক রকম আছে পুতন। তুমি সে সব বুঝবে না। এম-কম এ ফার্স্টক্লাস পেলেই মানুষ যে সবই জানবে বা বুঝবে, তার কোনো মানে নেই। আই-এ-এস, আই-পি-এস, সায়ান্টিস্ট, হলেও নয়। ওই সমস্ত বিদ্যা, ডিগ্রি, ওই সমস্ত অর্জন শুধু বাইরে থেকেই দেখা যায়। ডিগ্রির কাগজগুলো পাকিয়ে ঠেসে রাখা যায় আলমারিতে, নিজের গর্বের সঙ্গে; কিন্তু তার বাইরেও অনেক জানা থাকে, তা সেই কৃতীরাও যে জানবেনই, এমন কোনো মানে নেই। এই শিক্ষা, বাইরে থেকে দেখা যায় না, কোনো কলেজ বা ইউনিভার্সিটি দিতে পারে না এ। এমনকী যার মধ্যে এই শিক্ষার উন্মেষ হয়, সেও পূর্বমুহূর্তে জানতে পারে না যে, তার মধ্যে তা আছে বা এল। এই সব শিক্ষা জীবনের শিক্ষা, জীবনে চলতে চলতে পাথরের গায়ের শ্যাওলার মতো জন্মায় এ, জীবন থেকেই পাওয়া। যাকে ভালো বাঙ্লাতে বলে জীবনসঞ্জাত।

এসব বই পড়ে জানার নয়।

রাজেন এতদিন নারীঘটিত ব্যাপারের শারীরিক দিকের চরম করেছে বলেই হয়তো আজ ও বুঝতে পারছে যে, মেয়েরাও ওরই মতো মানুষই। নিছকই পুরুষের খেলার বা ভোগের সামগ্রী নয়। এবং

পুরুষের চরম আনন্দ বোধহয় কোনো ঈপ্সিত নারীর মন পাওয়ারই মধ্যে শরীর পাওয়ার মধ্যে আদৌ নয়।

বড়ই লজ্জা হয়েছে রাজেনের। এতদিন এ কথাটাই বুঝতে পারেনি?

ছিঃ। ছিঃ।

এখন শেষ বিকেল। বৈশাখের বিকেল। কালবৈশাখী আসতে পারে আজ। পশ্চিমের আকাশ সাজছে। যদি আসে, তবে কিছু আম গাছের মুকুল আর কিছু গুটি আম ঝরে যাবে। গেলে যাবে। এসব তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপারে আর কোনো ঔৎসুক্য নেই কিরণশশীর।

কিরণশশী, কুলোতে করে কিসমিস বাছছিলেন। হাঁসগুলো প্যাঁ-অ্যাক, প্যাঁ-অ্যাক করে হরিসভার পুকুর থেকে দিনভর গুগলি আর কুচো মাছ খেয়ে পেট ফুলিয়ে হেলতে-দুলতে উঠোন পেরিয়ে খোপের দিকে ফিরছিল।

ওরা এখুনি খোপে ঢুকবে না। কিছুক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে গা শুকিয়ে নেবে পড়ন্ত রোদে। ওদের গায়ে জল দাঁড়ায় না। যদিও তলপেট ও ভেতরের দিক ভেজা থাকে। তাছাড়া, সারাদিন জলে থাকায় হিম হয়ে যায় শরীর। কেউ কেউ এক পা তুলে অন্য পাটা পেটের মধ্যে গুঁজে গোল গোল চোখ, আধো বুজে কত কী ভাবে। হাঁসেরা কী ভাবে? কেউ কি জানে?

শিলি এসে এখুনি বসল কিরণশশীর সামনে। রান্নাঘরের দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে।

শিলি বলল, করতাছোটা কী বুড়ি?

পোলাউ রাঁধুম, তাই কিসমিস বাছতাছি।

লিচু গাছে পাখিরা শোর করছে।

এই দুই নারীই নিজের নিজের ভাবনাতে ডুবে রয়েছেন ও রয়েছে। অনুষঙ্গর কোনো প্রভাবই পড়ছে না কারও উপরেই। দূরে, নগেন সেনের বাড়ির খোনা মেয়েটি, পুকুরের দিকে মুখ তুলে হাঁসদের ডাকছে চৈঁ....চৈঁ....চৈঁ....চৈঁ, চৈঁ...। তার নাকিসুরের ডাক এই সন্ধের মুখের বিষণ্ণতা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

একটু পরেই সন্ধে হয়ে যাবে। নানারকম আওয়াজ। হাঁসেদের বাড়ি ফেরার ডাক ডাকছে সে, কুলোতে করে ধান নিয়ে, ফলসা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে। ওঁদের পুকুর থেকে বাড়িতে আসার রাস্তা ওই ফলসাতলা দিয়েই। ডাকছে, চৈঁ, চৈঁ, চৈঁ, চৈঁ, চৈঁ,...।

এই সব শব্দসমষ্টির ঝুমঝুমির মধ্যে বুঁদ হয়ে যায় শিলি।

মসজিদের আহ্বান ভেসে আসছে। মকবুল চাচা মগরীবের নামাজে বসেছেন। ওদের বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে আসার সময়ে একটু আগেই দেখে এসেছে শিলি।

খবদ্দার!

বলেই, হঠাৎ কে যেন চিৎকার করে উঠল। একেবারে উঠোনের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে।

দুজনেই চমকে উঠলেন ওঁরা। অলিমুদ্দির; চমকে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এ হাঁক। রমজান মিঞার ছোট ছাওয়াল কখন যে এসেছে, তা ওঁরা দেখেনইনি।

অলিমুদ্দি ঝুড়ি নামাল উঠোনে। ঝুড়ি নামিয়ে, গামছা দিয়ে মুখের ঘাম মুছে বলল, বড়ই মেহনত গ্যাছে আজ সারাটা দিন। বোঝলা দিদি।

ওর লাল-হওয়া মুখের দিকে চেয়ে শিলি বলল, হ। তাইত দ্যাখতাছি। জল খাবা নাকি এট্টু? তা মেহনত তোমার কোনদিন যায় না তাই কও দেহি।

তা দিদি যা কইছ। ওই তুমি যা এই মানুষের দুঃখ-কষ্ট বোঝলা। আর কেউই বোঝে না।

শিলি হাসল।

বলল, আমিই হইল্যাম গিয়া কুমারগঞ্জের "বুঝী" মা। কী কইস?

পানি? পাইলে তো খুবই ভালো হয়। পানি আনলা কই?

অলিমুদ্দি বলল।

কিরণশশী বলল, দিবিটা কীসে? জল?

ক্যান? আমি আইন্যা দিতাছি। রান্নাঘরে গ্লাস আছে তো না কি?

নমঃশুদ্দুর আর মোছলমানদের গ্লাস নাই।

ছিঃ। ছিঃ।

বলল, শিলি।

আলিমুদ্দির পরিশ্রমে লাল-হওয়া মুখ আরও লাল হয়ে যায়।

শিলি বলে, আমি এই আইতাছি। তুমি খাড়াও দেহি এক মিনিট আলিমুদ্দি।

বলেই আঁচল উড়িয়ে দৌড়ে গেল নিজেদের বাড়ির দিকে। এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই পেতলের রেকাবিতে ওর নিজের হাতে তৈরি কাঁচাগোল্লা আর গ্লাস নিয়ে ফিরে এল। কাঁচাগোল্লার রেকাবিটা আলিমুদ্দির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, ধরো।

আমি পানি আইন্যা দিতেছি তোমারে।

বলেই, কথা ঘোরাবার জন্যে বলল, মাছ পাইল্যা কি আজ, তাই কও। বুড়ি হক্কলরে দাওয়াত্ দিছে তো।

কথাটা বলেই, লজ্জা পেয়ে গেল।

আলিমুদ্দি, যে নিজে হাতে সারা দুপুর পোলো দিয়ে দিয়ে বৈশাখের খর রোদে, পুকুরে আর বিলে মাছ ধরে আনল কিরণশশীর নিমন্ত্রিতদের খাওয়ানোর জন্যে, সেই নিজে কোনোদিনও একটু জল খেতে পারবে না এ বাড়িতে? ওর সামনে, কিরণশশীর দাওয়াতের কথা না বললেই পারত।

ভাবল, শিলি।

আলিমুদ্দি জলের গ্লাসটা নিতে দ্বিধা করছিল।

শিলি বলল। না খাও তো আমার মাথাডা খাও। ছাত্তার চাচায় আমাগো রসুই ঘরে বইস্যা আমাগোর জন্যে মোরগা রান্ধে। বি. এ., এম.এ পাশ করি নাই বটে, কিন্তু অশিক্ষাও পাই নাই মা-বাপের কাছে। খাও। খাও।

কাঁচাগোল্লা খেয়ে ও যখন জল খাচ্ছে তখন কিরণশশী শিলিকে বললেন, ওই গ্লাসে যেন পুতনরে আবার জল দিস না, হে তগো বাড়ি গ্যালে।

শিলি বিরক্তির গলায় বলল, সে আমি বুঝবনে। তোমার ছাওয়ালে আর আলিমুদ্দিতে ফারাকটা কী? তোমার ছাওয়ালরেই বরং কইয়া দিও, সে য্যান আমাগো বাড়ি আর না যায়। আমি একই গ্যালাসে হক্কলেরে জল দিম্যু। খাইলে খাইবে, নাইলে যাইতে মানা কইর‍্যা দিও। তুমি মাছগুলান বুইঝ্যা লইয়া অরে ছাইড়্যা দ্যাও না ক্যান। সারাডাদিন খাওন-দাওন নাই। বেচারি বাড়ি যাইব না, না খাড়াইয়া খাড়াইয়া তোমার বক্তৃতা শুনব অনে?

খুব কথা শিখছসত দেহি।

হ। শিখছি। কথা কি তোমার পোলায় একাই শিখছে?

কিরণশশী বললেন, ভারী পীরিততো দেহি মোছলার পুতের লইগ্যা।

শিলির বড় লজ্জা হল।

তারপর বলবে না ভেবেও বলেই ফেলল, তোমাগো কপালে আরও অনেকই দুঃখ আছে বুড়ি। যারা মানুষেরে মানুষের সম্মান এহনেও দিতে শ্যাখে নাই, তারা নিজেরাই মানুষ হয় নাই। আমার বাবায় তো হেই কথাই কয়।

তর বাবা তো মহাপণ্ডিত। তার কথা থো এখন। দয়া কইর‍্যা মাছগুলান বুইঝ্যা লইয়া, আমার আয়নার সামনের সিন্দুরের কৌটার ভিতর এখখানা দশটাকার নোট আছে, অরে আইন্যা দে।

পাইছস কী কী রে মাছ?

কিরণশশী শুধোলেন, আলিমুদ্দিকে, একেবারে নৈর্ব্যক্তিক গলায়। যেন, চৌকাঠের সঙ্গে কথা বলছেন।

আপনেতো কুচামাছই কইছিলেন। তা পাই নাই। বাইন মাছ, অ্যাই দেখেন দুইডা, পেরায় সাপের মতো বড় হইবনে। আর এই বাইশখান কই পাইছি। খুবই বড়। মাগুর। একখানের ওজনই হইব গিয়া পেরায় তিনপোয়া।

আর? পোলো দিয়ো আর কী পামু? আমি তো আর নদীতে জাল ফেইল্যা মাছ ধরি না।

তাইলে, আমার চিতল পামু কোথ্বিকা?

মুণীন্দ্ররে কইয়েন।

কাল পারবা তো আনতে?

পারবো না ক্যান? রোজই তো ধরে দেহি, চার পাঁচটা কইর‍্যা। তবে, বেশি বড় হইব না। বড় চায়েন তো ধুবড়ি থিক্যা আনন লাগব। গরম পইড়্যা গেল গিয়া। খারাপ না হইয়া যায়।

শিলি, কিরণশশীর ঘর থেকে টাকাটা এনে আলিমুদ্দিকে দিল।

কিরণশশী বললেন, দুইটা টাকা ফেরত দিয়া যাবি। এই কয়ডা মাছের দাম দশ টাকা। তুই ডাকাইত হইয়া গেলি দেহি।

স্বল্পক্ষণ মুখ নীচু করে চুপ করে থেকে আলিমুদ্দি বলল, ঠিক আছে।

কাল দিয়া যামুআনে। এহনে তো নাই।

কাল দিলেই হইব।

আলিমুদ্দি ঝুড়ি তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছিল।

শিলি বলল, চল আমিও যাব।

এইত আইলি।

কিরণশশী বললেন।

নাঃ কাল আসুমানে।

সক্কাল কইর‍্যা আসস। আমি একা সব সামলাইতে পারুম না।

ক্যান, হোন্দলের মায়েতো আছেই।

তা হইলেও পারুম না।

তাইলে নিমন্ত্রণ করনের দরকারডা কী?

রুক্ষ গলায় বলল, শিলি।

কিরণশশী অবাক হয়ে তাকালেন শিলির দিকে। কিন্তু মুখে কিছু বললেন না।

শিলি বুঝল, কিরণশশীর মন খারাপ। তাই মেজাজও খারাপ। শিলির নিজের মেজাজও কিছু ভালো নয়। সব সময়ে অন্যায় বরদাস্ত হয় না। আলিমুদ্দির সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে শিলি বলল, ওই বুড়ির কথায় কিছু মনে করিস নাইতো তুই?

আরে নাঃ। মনে করনের কী আছে।

কিছু মনে করিস না। আজ বাদে কাল মইর‍্যা যাইব গিয়া। মানষেরে যারা এমন কইর‍্যা অপমান করে, তাদের পাপ লাগে। লাগেই!

ছাড়ান দাও দিদি। বুড়াবুড়িরা আর ক-দিন। নরেশকাকা, পরেশকাকায় তো এক্কেরে অন্য রকম মানুষ। সবাই কি সমান অইব। মোছলমানেরাও কি সবাই সমান? তুমি কও?

কথা ঘুরিয়ে, শিলি বলল, আমার বাজে বকনের সময় নাই।

তারপরই বলল, শোন। কাল দুপুরে আমাগো বাড়ি তর নিমন্ত্রণ। খাবি আইস্যা। আমাগো সাথে বইস্যা। আমি, তুই, বাবায় আর কাকায়। ছাত্তার কাকারে যদি পাওন যায় তো তারেও কয়্যা দিমু্য।

পাগল হইল্যা নাকি? দুপুরে ক্যামনে পারুম? সারাদিন মাছ না ধইরবার পারলে আম্মায় রান্ধে কী? আব্বার শরীরও তো ভালো নাই। বাতে এক্কেরেই মাইরা থুঁইছে। ঘর থিক্যা বাইরাইতেই পারে না। সারা দিন যা পাই, তাই বেইচ্যা বুইচ্যা চলে কোনোমতে। বুনটারে বিয়া দিতে গিয়া দুই হাজার টাকা কর্জ হইয়া গ্যাছে গিয়া। তাও তো দামাদ তারে দুইবেলা ঠেঙ্গাইতেছে। আবার নিকাহ করণের ইচ্ছা আর কী! তাও গদাইদায় সুদ লয় না। ওই কর্জর লইগ্যা কখনো তাগাদাও করে না। বলে, নাইই যদি পারস, তো দিবি না। আমার তো বুন নাই। না হয় তর বোনের বিয়াটা আমিই দিয়া দিছি। হইছেটা কী তায়?

একটু থেমে, আলিমুদ্দি বলল। সত্যই। গদাইদার মতো বড়লোক দ্যাশে আর নাই। মনখান তো না, যেন ব্রহ্মপুত্রই।

শিলি, আলিমুদ্দির পাশে হাঁটছিল। শেষ বিকেলের আলো পড়ে ওকে আরও সুন্দরী দেখাচ্ছিল। আলিমুদ্দি ভাবছিল, এমন একটি বউ পেলে ব্রহ্মপুত্রয় নৌকো ভাসিয়ে তাকে নিয়ে মাছ ধরে একেবারে বড়লোক হয়ে যেত। কিন্তু তাতো হবার নয়। এ জন্মে হবার নয়। শিলিকে দেখলেই ওর শরীরের রক্ত দৌড়াদৌড়ি করে। শিরা উপশিরা সব শক্ত হয়ে যায়।

মোড়ে এসে ধরা গলায় বলল, চলি দিদি।

তাইলে আইবি না কাল?

ক্যামনে আসুম দিদি? রাতে একদিন কইয়, অবশ্যই যামু্য। তুমি আদর কইর‍্যা খাওয়াইবা আর যামু্য না, তা কি হয়?

কাল রাতে তো এ বাড়ির নিমন্ত্রণ। আছা, দিন ঠিক কইর‍্যা কমু্য তরে আলিমুদ্দি। অবশ্যই আসিস য্যান।

আলিমুদ্দি বাঁশবনের আড়ালে হারিয়ে গেলে, হঠাৎই শিলির মনে হল, আলিমুদ্দি কোথায় যে থাকে, তাও ও জানে না। যদিও একই গ্রামে বাড়ি ওদের, তবুও ওদের বাড়ি কখনো চোখেও দেখেনি। তবে শুনেছে, যে বাড়ি ওই নামেই। আসলে ঝুপড়ি একটি। শীতকালে চরেই ঘর বানিয়ে থাকে আলিমুদ্দি। তরমুজ ফলায়, ধানও। এই করেই কোনোরকমে চলে। ওর চওড়া বুক। পাথরের মতন হাত পা, সরু কোমর, বাঁশির মতো নাক আর মাথাভরতি চুলে, ভারী ভালো দেখে ওকে শিলি। ওকে দেখলেই বুকের মধ্যে রক্ত ঝুনুক-ঝুনুক করে।

কিন্তু রক্তর-সঙ্গে নাচতে পারা তো যায় না। রক্ত যা বলে, তা শোনাও যায় না।

মানুষের জীবন বড়ই কষ্টের।

ভাবে, শিলি।

বাড়ি ফিরেই, গা ধুতে ঢোকে চান-ঘরে। সিঁদুরে আম গাছে বোল এসেছে। খুব তাড়াতাড়িই এসেছে এবারে। আজ কালবৈশাখী আর এলো না। মেঘ উড়ে গেছে দূরে। হাওয়া জোরে বইলেই আমের বোলের গন্ধ ভাসে আলতো হয়ে। শেষ বিকেলের রোদের সোনার আঙুল ছুঁয়েছে

গাছ-গাছালিকে এখন। একটি বসন্ত-বৌরি পাখি ডানা ঝট-পটিয়ে উড়ে যায় আম গাছের গভীর থেকে।

চান করতে করতে শিলি ভাবে যে, রাজেন ছেলেটি বেশ। কত কী জানে।

বাবা-কাকার সঙ্গে কত কী বিষয়ে আলোচনা করল সেদিন। কত জ্ঞান!

আর খুব ভদ্রও কিন্তু। দোষের মধ্যে করলুম, খেলুম, নুন, নংকা, নেবু, নুচি এইরকম অসভ্য ভাষায় কথা বলে এইই যা।

আর গান? সেদিন তার গানে সে শিলিকে একেবারেই মেরে রেখে গেছে। এরকম গান শিলি আগে কখনো শোনেনি। এমন ধরনের গানও নয়। গান যদি তেমন করে গাওয়া যায়, তবে সেই গায়ক বা গায়িকা তাৎক্ষণিক সম্রাট অথবা সম্রাজ্ঞীই হয়ে ওঠে। তাকে অদেয় তখন কারোই কিছু থাকে না।

একটি গান গেয়েছিল গত রাতে রাজেন। কালও এসেছিল রাতে। পুতন আসেনি। একাই এসেছিল। বাবা ও কাকা বাড়িতেই ছিলেন। কাল গেয়েছিল এই গানটি:

"ওগো কেমনে বলো না,
ভালো না বেসে থাকি গো।
পাগল করেছে মোরে
ওই দুটি আঁখি গো।
কী জানি কী গুণ করে
রেখেছে মন মজাইয়ে,
সাধ হয় সদা যেন,
বুকে করে রাখি গো।
ওগো কেমনে বলো না?"

গানটি যে শিলিকে উদ্দেশ্য করেই গাওয়া তা শিলির বুঝতে বাকি ছিল না। শিলির মনও সেদিন রাত থেকেই রাজেনকে বুকে করে রাখতেই চায়। কিন্তু এদেশের মেয়েদের তো বুকে করে রাখার অধিকার নেই; ক্ষমতাও নেই। বুকে থাকার জন্যেই তারা। রাজেনের বুকে থাকার অনেকই অসুবিধা। বৃদ্ধ বাবা, কাকা। কলকাতায় কার যেতে না ইচ্ছে করে? কোনোদিন তো যায়ওনি।

পুতনদা, কাকাকে বলেছে, রাজেনরা নাকি বনেদি বড়লোক। কলকাতায় যারা বড়লোক, তারা গদাইদের মতো গেঁয়ো বড়লোকদের দু হাজারবার কিনে যে-কোনো হাটে আবারও বেচে দিতে পারে নাকি। রাজেনদের অনেকগুলো গাড়ির মধ্যে একটি গাড়ি আছে 'রোলস'। সেই গাড়িটিরই যা দাম, তাতে গদাই আর গদাইর বাপের সব সম্পত্তি নিলামে চড়ানো যায়। রাজেনও বাবার এক ছেলে। তবে, ছেলের স্বভাব চরিত্রটি সুবিধের নয়।

শিলি, গায়ে সাবান দিতে দিতে ভাবছিল, ওর মা বলতেন, ছেলেদের চরিত্র কখনো নোংরা হয় না। অন্য মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক থাকলেই পুরুষ মানুষকে ছোট বলা যায় না। যদি সে ছোট মনের মানুষ হয়, তবেই শুধু ছোট বলা যায় তাকে।

ছোটমনের পুরুষমানুষের মতো ঘৃণিত জীব আর নেই।

চান সেরে গা মুছছিল যখন, তখন কাদের গলায় আওয়াজ পেল যেন বাইরে।

রাজেন আর পুতন? বুকটা ধক করে উঠল শিলির।

তারপরই বুঝল যে, শুধুই রাজেন।

তাড়াতাড়ি করে জামাকাপড় পরে ফেলল ও। রাজেনের সামনে অসুন্দর হয়ে যেতে চায় না।

নিজেই ভেবে অবাক হয়ে যাচ্ছিল যে, যে-মানুষটিকে দু চোখে দেখতে পারত না কদিন আগেই, সেই মানুষটিই এখন তার মনের মানুষ হয়ে উঠেছে। তার পাশে, পুতনদাকেও মনে ধরে না আর। এ কী শুধু গানেরই জন্যে? নাকি মানুষটি যে খারাপ, দুশ্চরিত্র এ সব শুনেছে বলেই, তার প্রতি এক বিশেষ আকর্ষণ বোধ করেছে ও। যে মানুষেরা নিজেদের সবসময়ই ভালো বলে প্রমাণ করতে চায়, আসলে তাদের মধ্যে বেশিরাই বোধহয় খারাপ। শিলির অভিজ্ঞতা তাইই বলে। ভালো মানুষ, বড় সহজে খারাপ হয়ে যেতে পারে, যেমন পুতনদা হয়েছে। কিন্তু যাকে খারাপ বলেই জানা আছে, তার আরও খারাপ হবার ভয় থাকে না কোনোই। বরং ভালো হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে। খারাপ যদি ভালো হয় তখন সে বোধহয় ভালোই থাকে বাকি জীবন। খারাপের উপর ভরসা করা চলে, ভালোর উপরে কখনোই নয়, কারণ, কোন মুহূর্তে যে সে খারাপ হবে, তা নিজেও আগের মুহূর্তে জানে না।

শিলির মা, একজনকে ভালোবাসতেন। আলিপুরদুয়ারে বাড়ি ছিল তাঁর। একবার মাত্র তিনি মাকে দেখতে এসেছিলেন কুমারগঞ্জে। নাম ছিল সুধীর। শিলি ডাকত সুধীরমামা বলে। দুদিন ছিলেন ওদের বাড়িতে।

বাবা সে দুদিন নানা অছিলাতে ইচ্ছে করেই বাড়ির বাইরে ছিলেন। সুধীরমামা চলে যাওয়ার পর মা বলেছিলেন, তোর বাবা মানুষটা বড় উদার রে শিলি। এমন পুরুষ, সব মেয়েরই শ্রদ্ধার পাত্র।

সুধীরমামা এঁচড়ের চপ খেতে ভালোবাসতেন বলে দুদিনই বিকেলে এঁচড়ের চপ করেছিলেন মা। মনে আছে শিলির।

একদিন আলিপুরদুয়ার থেকে খবর এল পোস্টকার্ডে যে, সুধীরমামা কুমারগঞ্জের দিকেই আসছিলেন শিলির মায়ের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। স্টেশনে নেমে, বাস ধরার আগেই রক্তবমি করে প্ল্যাটফর্মেই মারা যান। অচেনা মানুষের মৃতদেহ মর্গে নিয়ে যায় পুলিশ। কাটা-ছেঁড়া হয়। সাতদিন পরে সুধীরমামার ছোটভাই লোকমুখে খবর পেয়ে মর্গে পৌঁছে মৃতদেহ শনাক্ত করেন। সুধীরমামা তখন আর সুধীরমামা ছিলেন না। গলে, ফুলে, পচে সে নাকি এক বীভৎস ব্যাপার। ওইখানেই দাহ করে ফিরে যান তাঁর ভাই।

গিয়েই মাকে একখানা পোস্টকার্ড লেখেন।

সুধীরমামাও খুব মদ খেতেন। বিয়ে-থা করেননি। মামাবাড়ির আত্মীয়দের কানাঘুষোয় সে শুনেছে, মাকে ভালোবাসতেন বলেই তিনি বিয়ে করেননি। পুববাংলার একই গ্রামে বাড়ি ছিল ওঁদের। মায়ের নিজের নামে না ডেকে সুধীরমামা মাকে ডাকতেন "পারু" বলে। দেবদাসের পার্বতী।

জীবনের শেষটাতে অনেকই মিল ছিল দেবদাসের সঙ্গে।

শিলির মা বলতেন, তোর বাবা কাঠ-খোট্টা মানুষ। প্রেমের মতো গভীর ব্যাপার ওঁর জন্যে নয়। তবে, প্রত্যেক মানুষেরই প্রেমের প্রকাশ আলাদা আলাদা। সুধীরমামার মৃত্যুর পর বাবাই ওদের বাড়িতে এঁচড়ের চপ কোনোদিনও আর করতে দেননি। মাকে বলতেন, সুধীরবাবু খেতে অত ভালোবাসতেন। ও জিনিস আর নাইই বা করলে।

সুধীরমামাও কিন্তু দারুণ ভালো গান গাইতেন। যে দুদিন ছিলেন, গানে গানে মুখর করে রেখেছিলেন। মায়ের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলতেন। শিলির খুব অবাক লাগত তখন, ওই মাকে দেখে। মা যেন অন্য মা হয়ে গেছিলেন। এক অচেনা মানুষ।

সুধীরমামা চলে যাবার পর, মা বলেছিলেন একদিন শিলিকে ডেকে, দ্যাখ শিলি, প্রেমে যদি কোনোদিনও পড়িস কারও সঙ্গে, সত্যিকারের প্রেম রে, মোহ নয়, তবে তাকে কখনো বিয়ে করিস

না। বিয়েটা একটা অভ্যেস। অন্ধকার ঘর। আর প্রেম হচ্ছে আলোকিত বারান্দা। যেখানে পাখি ডাকে, ফুলের গন্ধ ভাসে।

শিলি শুধিয়েছিল, কী করে বুঝব মা, যে, প্রেমে পড়েছি?

মা হেসে, শিলির থুতনিতে হাত দিয়ে বলেছিলেন, বুঝতে ঠিকই পারবি।

প্রেম যেমন আনন্দর, তেমন বড় কষ্টেরও। প্রসব বেদনার চেয়েও অনেক বেশি কষ্ট প্রেমে। প্রেম এলে, ঠিক বুঝবি। যদিও শব্দ করে, জানান দিয়ে আসে না প্রেম।

তবে? মানুষে প্রেমে পড়ে কেন? অত যদি কষ্টই?

হেসেছিলেন মা।

বলেছিলেন, না-পড়ে পারে না বলেই পড়ে।

রাজেন বারান্দাতে বসেছিল। রাজেন একাই। পুতন বোধহয় পৌঁছে দিয়েই চলে গেছিল। যে-কোনো কারণেই হোক, পুতনদা কয়েকদিন হল এড়িয়ে যাচ্ছিল শিলিকে।

শিলি বলল, বসুন একটু। আসছি।

বলেই ভিতরে গিয়ে চুলটা ঠিক করে, চোখে কাজল দিয়ে এল।

বাবা আর কাকা একসঙ্গেই বেরিয়েছিলেন। গজেন কাকাদের ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়ার সালিশি হয়েছেন ওঁরা। রোজই একবার করে যাচ্ছেন কদিন হল।

আজকে মিটিয়ে দিয়ে আসবেন, এমনই কথা আছে।

শিলি এসে বসল, রাজেনের সামনে।

বলল, কী করলেন? সারাটা দিন?

কিছুই করলাম না। অথচ দিনটা চলে গেল। এই কথাই ভাবছিলাম। আমার মতো উদ্দেশ্যহীন লোকের দিনতো বটেই, জীবনও বোধহয় এমনি করেই চলে যাবে। চলে যাবার সময়ই শুধু জানতে পারব যে, চলে গেল।

তাই?

শিলি বলল।

আমি কালই ফিরে যাচ্ছি। চা-বাগানে।

শিলির বুকটা ধক্ করে উঠল। মনে হল যেন কোনো স্বপ্ন শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে গেল। প্রথমটা, কোনো কথাই বলতে পারল না শিলি। তারপর সামলে নিয়ে বলল, সাতবোশেখির মেলা দেখে যাবেন না। মেলার মুখেই চলে যাবেন?

যেতে যখন হবেই, তখন মায়া বাড়িয়ে আর লাভ কী?

মায়া? কীসের মায়া?

মুখ নামিয়ে বলল, শিলি।

এই! কুমারগঞ্জের মায়া। এখানের মানুষজনের মায়া।

ওঃ।

এখানের মানুষজনকে ভালো লাগল না বুঝি?

না। না। তার জন্যে নয়। হয়তো উলটোটাই। বেশি ভালো লাগলেও চলে যেতে হয়। চলে যাওয়াই ভালো।

একটু চুপ করে থেকে রাজেন বলল, তুমি, কলকাতায় কখনো যাওনি, না?

না।

কখনো কি যাবে?

আমরা গেঁয়ো লোক। তার উপরে কলকাতায় তো আমাদের আত্মীয়স্বজনও কেউই নেই। থাকার জায়গাই বা কোথায়? তাছাড়া বিনা কাজে বেড়িয়ে বেড়াই এমন সামর্থ্যও তো আমাদের নেই। বাবা কাকারও আমি ছাড়া কেউই নেই। ওঁদের কে দেখবে?

আমি আমার মাকে লিখেছি তোমার কথা।

আমার কথা? আমার কথা কী লিখেছেন?

এই! যা মনে হয়েছে।

কবে লিখেছেন?

যেদিন তোমাদের বাড়িতে খেয়ে গেলাম, সেদিনই রাতে। তোমার গান শোনার পর।

আমার কথা লেখার কীইই বা আছে। লেখাপড়া শিখিনি। কোনো গুণ নেই। আমি অতি সামান্য মেয়ে।

সেই কথাই লিখেছি। তোমার গানটা ভালো করে করা উচিত শিলি।

আমার কোনোই গুণ নেই। বড়লোকের বকা ছেলে বলেই সকলে আমাকে জানে। আমার দোষের শেষ নেই। কিন্তু গান আমি ভালোবাসি। এবং নিজের কথা অন্য কেউই এখানে বলার নেই বলেই বলছি; যে গান ব্যাপারটা আমি একটু-আধটু বুঝি। তুমি গান ভালো করে শিখলে, দেশের নামি গাইয়েদের একজন হতে পারো। ভগবান-দত্ত গলা তোমার। তুমি কি রিয়াজ করো কখনো?

রিয়াজ? জীবনে করিনি।

তবেই দ্যাখো। ঠিকই ধরেছি। কিছু গাইয়ে থাকেন, ঈশ্বর নিজেই তাঁদের অনেকখানি পথ এগিয়ে দিয়ে, অন্যদের হ্যান্ডিকাপ দিয়ে আসরে নামান তাঁদের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্যে।

হ্যান্ডিকাপ কী?

ও। সে তুমি বুঝবে না। ও ঘোড়দৌড়ের ব্যাপার। রেসের মাঠের টার্ম। আমি তো রেসের মাঠেও যাই। সব গুণই তো আছে।

কী হয়? সেই মাঠে?

হেসে ফেলল রাজেন, শিলির নিষ্পাপ অজ্ঞতায়।

বলল, সে তুমি যখন কলকাতায় যাবে, তখন জানবে। তোমাকে একদিন নিয়ে গিয়ে ঘোড়দৌড় দেখিয়ে আনব। তোমাদের এখানে যেমন আমার বিস্ময়ের অনেক কিছুই আছে, গঙ্গাধর নদী, রাঙামাটি, পর্বতজুয়ার, আলোকঝারি, আমার অদেখা সাতবোশেখির মেলা এবং তুমি, এই শিলি। তেমন, তোমারও বিস্ময়ের অনেক জিনিসই আছে কলকাতায়।

আমি কলকাতায় যাব কেন হঠাৎ? ঠিক বুঝলাম না।

আমার মা তোমাকে চিঠি লিখবেন, নেমন্তন্ন জানিয়ে। আর আমার বাবা লিখবেন তোমার বাবাকে। তুমি তোমার বাবার সঙ্গেই যাবে। পরেশকাকাকেও নিয়ে যেও। ওখানে কত বড় বড় বন্দুকের দোকান আছে। ওঁকে দেখাব। আমার ছোটমামারও খুব শিকারের শখ ছিল। ছিল কী, এখনও আছে। বিহারের হাজারীবাগ, উড়িষ্যার ঢেনকানল ইত্যাদি কত জায়গাতে শিকারে যান উনি, প্রতি শীতে। পরেশকাকাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন উনি।

কেন? আমাদের নেমন্তন্ন করবেন কেন, আপনার মা-বাবা?

আমার তোমাকে খুব ভালো লেগেছে বলে। মানে, তোমাদের সকলকেই।

তাই?

বলে, বড় বড় চোখ মেলে শিলি চেয়ে রইল, রাজেনের মুখের দিকে বিস্ময়ে।

ওর বুকের মধ্যে দারুণ এক উত্তেজনা বোধ করতে লাগল ও।

হঠাৎ রাজেন বলল, তোমার বিয়ে কবে? শিলি?

বড় কষ্ট হল রাজেনের কথা শুনে শিলির। একটু আগেই বুকে যে আনন্দর বোধ চিড়িক করে উঠেছিল, তাই হঠাৎ বেদনার বোধ হয়ে গেল।

সামলে নিয়ে বলল, আমার বিয়ে? কে বলেছে, আপনাকে?

অনেকের কাছেই তো শুনছি। তোমার বিয়েতে আমাকে নেমন্তন্ন করো কিন্তু। আর বিয়ের আগেই একবার কলকাতা বেড়িয়ে যেও। আমাদের নায়েবমশাইকে পাঠাবেন বাবা, তোমাদের নিয়ে যাবার জন্যে।

আমার বিয়ের কথা শুনেছেন, কিন্তু পাত্রটি কে?

বেশ মজা লাগছিল শিলির। মজার গলাতেই বলল।

পাত্র?

হ্যাঁ।

পাত্র দুজন আছেন বলে শুনেছি।

এবারে শিলি হেসে ফেলল।

বলল, ও তাহলে বিয়েটা পাকা হয়নি এখনও? তাছাড়া পাত্র একজন নয়, দুজন? একেবারে স্বয়ংবর সভা যে!

বোকা বনে গেল রাজেন।

বলল, হয়তো তাইই।

পাত্রই যখন ঠিক হয়নি এখনও, তবে তো বিয়ে নাও হতে পারে।

শিলি বলল।

তা নয়। শুনেছি, বিয়ে হবেই। এবং শিগগির।

পাত্র তাহলে দুজনের জায়গায় তো চারজনও হতে পারে। পাকাই যখন হয়নি।

এবারে হেসে ফেলল রাজেন। আনন্দে।

বলল, তাই?

তাইই! তবে আমার বাবা ছাড়া তো আমার কেউই নেই। বাবাকে ছাড়া কোথাও যেতে পারব না। আর পারব না বলেই, বোধহয় বাবা কাকা আমার জন্যে এখানেরই কোনো পাত্রর কথা ভাবছেন। আমার না আছে রূপ, না আছে কোনো গুণ। লেখাপড়াও শিখিনি বলার মতো। আমার বাবার টাকাও নেই। আমার যেমন যোগ্যতা, তেমন পাত্রই আমার জুটবে।

পুতনকে তোমার কেমন লাগে শিলি?

হঠাৎ বলল, রাজেন।

শিলি চুপ করে রইল।

কী? কিছু বলছো না যে?

সত্যি কথা বলব? আপনি কথাটা নিজের কাছেই রাখবেন তো?

নির্ভয়ে বলো।

খুবই ভালো লাগত। পাশাপাশি বাড়ি। তাছাড়া বড় হবার পর বেশি ছেলেদের সঙ্গে মেশার সুযোগ তো পাই না আমরা, এই গাঁয়ের মেয়েরা। তাই পুতনদাকেই দেখেছি ছোটবেলা থেকে। খুবই ভালো লাগত। পড়াশুনোতেও ভালো। আমাদের গর্ব। তার মায়েরও গর্ব। পুতনদার মাও আমাকে খুব ভালোবাসেন। কিন্তু এই পুতনদা মানে, যে পুতনদা আপনার সঙ্গে এবারে এল, তাকে আমার ভালো লাগেনি। অনেকই বদলে গেছে পুতনদা।

রাজেন বলল, ওকে আমিই বকিয়ে দিয়েছি। দোষ আমারই। ও সত্যিই ভালো ছেলে। আমার সংশ্রব ছাড়লেই ও আবার তোমার পুরানো পুতনদাই হয়ে যাবে।

জানি না। যাদের যে-কেউই এত সহজে নষ্ট করতে পারে, তাদের উপর ভরসা কি করা যায়? আসলে, পুতনদার মধ্যে নষ্ট হয়ে যাবার প্রবণতা ছিল নিশ্চয়ই। নিজে নষ্ট না হতে চাইলে, অন্যে কি নষ্ট করতে পারে কাউকে?

নিশ্চয়ই পারে শিলি। এই যেমন তুমি। এক রাজেন এখানে এসেছিল, তুমি তাকে আবার নষ্ট করে অন্য রাজেন করে দিলে।

একটু চুপ করে থেকে বলল, আসলে নষ্ট হবারও নানা রকম থাকে তো!

শিলি, আহত গলায় বলল, আমি? আমি আপনাকে নষ্ট করে দিলাম? কী বলছেন আপনি?

দিলেই তো। নষ্ট হওয়া মানে, সবসময় খারাপ হওয়া নয়। পুরনো যা, তা নষ্ট তো হলই। বদলে যাবারও তো আর এক নাম নষ্ট হওয়া! না, কি?

শিলি চুপ করে রইল। মুখ নামিয়ে।

কিছুক্ষণ পরে, নিজের আঙুলে আঁচলের কোণটি পাকাতে পাকাতে বলল, আমি; আমি....।

ওর দিকে চেয়ে খুব ভালো লাগছিল রাজেনের। কলকাতার কোনো মেয়ে এমন করে আঁচল আঙুলে পাকালে তাকে অভব্য-অসভ্য বলা হত। অথচ এই চাঁদ-ভাসি উঠোনের এক কোণের বারান্দায়, এই গ্রাম্য মেয়েটির আঙুলে আঁচল পাকানো দেখে রাজেনের মনে হল, এর চেয়ে বেশি ভদ্র, স্বাভাবিক অভ্যেস আর কিছুই হতে পারে না। সেখানে যা মানায়, যা রেওয়াজ।

একটু পরই পুতন ফিরে এল।

শিলি বুঝল ও চলে যায়নি, হয়তো কিছু কিনতে টিনতে গেছিল।

পুতন হাঁটিয়ে-আনা সাইকেলে, কির-র-র-র শব্দ তুলে উঠোনে ঢুকল।

বলল, হুইস্কি পেলাম না গুরু, রাম এনেছি।

রাজেন উঠল। বলল, এখানে নয়। শিলি বাড়িতে একা আছে। তাছাড়া শিলি পছন্দ করে না এসব।

একটু চুপ করে থেকে রাজেন বলল, তুমি মদ খাওয়া ছেড়ে দাও পুতন।

যাঃ বাবা। ভূতের মুখে রামনাম!

তাইই! ভূত যে ভগবান হয়ে ওঠে কখনো কখনো, তাও ত সত্যিই।

কী ব্যাপার?

কেন? ভূত ভগবান হতে পারে না?

অবাক হয়ে রাজেনের সঙ্গে চলে যেতে যেতে পুতন শিলিকে বলল, শিলি, তাহলে এই কথাই রইল। দেখা হবে সাতকোশেখির মেলায়।

রাজেন কিছুই বলল না পুতনকে, সেই কথার পিঠে। শিলিকেও নয়।

শিলি অবাক হল!

রাজেন বলল, চললাম শিলি। ভালো থেকো। খুশি থেকো, সবসময়ে।

হঠাৎ এই সব কথা? সময় কি চলে যাচ্ছে নাকি?

পুতন বলল।

তারপর বলল, এখান থেকে যেদিন যাবে, সেদিনই এইসব ফেয়ারওয়েলের কথা হবে এখন। অনেকই হবে। ফুল, মালা, চোখের জল।

রাজেন উত্তর দিল না।

শিলি, চ্যাগারের দরজা অবধি এল ওদের সঙ্গে। যাবার সময়ে রাজেন খুব কাছ থেকে শিলির মুখে তাকাল একবার।

তারপর আবারও বলল, মাঝে মাঝে গানের রিয়াজ করলে ক্ষতি কী? ভেবে দেখো।

তারপরই নীচু গলায় বলল, ভালো থেকো শিলি।

ভালোবেসে, কাউকে ভালো থাকতে বলার মধ্যেও যে এত লজ্জা, এত সুখ থাকতে পারে, তা রাজেনের জানা ছিল না।

ওরা দুজনে জ্যোৎস্নার মধ্যে বাঁশপাতা-ঝরা আলো-ছায়ার ডোরাকাটা শতরঞ্জি মাড়িয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। পুতন আর রাজেন। সাইকেলের চেনের কিরকির শব্দ হচ্ছিল। আমের বোল-এর আর কাঁঠালের মুচির গন্ধে ম'ম' করছিল চাঁদভাসি, কুমারগঞ্জ। কোকিল ডাকছিল, কাক-জ্যোৎস্নাকে দিন ভেবে। পাগলের মতো। কোকিলদের মধ্যেও পাগল থাকে। আর বউ-কথা-কও।

শিলির দুচোখের সামনে দিয়ে, যেন রাজেন নয় মায়ের প্রেমিক সুধীরমামাই জ্যোৎস্নায় ভেসে ভেসে চলে গেলেন।

মা চলে গেছেন। সুধীরমামাও গেছেন আরও আগে। মানুষ ঠিকই মরে যায় একদিন না একদিন, কিন্তু প্রেম থেকে যায় অন্যের মধ্যে। প্রেমিক প্রেমিকার রূপান্তর ঘটে মাত্র। প্রেমিক একই থাকে। দিদিমা, মা অথবা মেয়ের। জন্মে জন্মে তাদের চেহারা এবং নাম বদলায়। রকমের বদল বোধহয় না।

হঠাৎই কুচিন্তায় মন ভরে উঠল শিলির।

শিলির মন বলল, রাজেন আর কোনোদিনও ফিরে আসবে না এই কুমারগঞ্জে; শিলির কাছে। কে জানে? আসবে কি?

মনে এ কথা হতেই মনে মনে, সেই মনের মুখ চেপে ধরল ও।

ওরা দুজন বড় রাস্তায় পড়ে চাঁপার মাঠের দিকে যেতে লাগল। চাঁপার গন্ধে ম'ম' করে জায়গাটা। তাই খুবই পছন্দ করে পুতন। ওখানে বসেই মাল খাচ্ছে গত তিনদিন হল ওরা।

পুতন বলল, গুরু? কী হল তোমার? মনমরা দেখছি যে। আর কী? যে জন্যে আসা সেই কারণ তো সিদ্ধ হবে এবারে। কিছু বল গুরু!

গুরু তো ছিলে তুমিই? আমি আবার গুরু হলাম কবে থেকে।

রাজেন বলল।

তোমার নিজের গুণেই।

পুতন বলল।

হেসে ফেলল, রাজেন।

বলল, তাইই?

পুতন বলল, ভিলেজ-বিউটির নথ কবে খসাবে? কেস তো একেবারে তৈরি করেই ফেলেছ। ওকে নষ্ট করবে বলেই তো এখানে আসা তোমার। পারোও বাবা তুমি। শিকারি বাঘও তোমার মতো ধৈর্য রাখে না। অসীম ক্ষমতা তোমার। খুরে খুরে পেন্নাম।

হুঁ।

পথেই খাবে নাকি? খুলব পাঁইট?

অধৈর্য গলায় বলল, পুতন।

নাঃ। আমি খাব না।

রাজেন বলল, অন্যমনস্ক গলাতে।

সে কী? এ কী কথা? সন্ধেবেলা ওষুধ না খেলে শরীর ম্যাজম্যাজ করবে না? আমি তো খাবই। তুমিই আমাকে ধরিয়ে, এখন তুমিই...বাঃ।

এ সব না-খাওয়াই ভালো। পরে, এইই খায়।

যাঃ শালা। বলছ কী তুমি গুরু? যাকগে, কাল অবধি তো খাও। তারপর দেখা যাবে এখন। গুড়ি-গুড়ি বয় হওয়া যাবে।

আরে! সাতবোশেখির মেলার দিনেই তো ক্লাইম্যাক্স হবে। না খেলে, চলবে কেন? প্ল্যানটা কী করলে শুনি?

কীসের প্ল্যান?

বাঃ প্ল্যানটা যাতে নির্বিঘ্নে করতে পারো। তাইত তোমাকে একা পাঠালাম আগে। কীসের প্ল্যান আবার কী?

শিলিকে নষ্ট করার প্ল্যান।

ওঃ।

বল্লেই, চুপ করে গেল রাজেন।

মনে মনে বলল, এ কথা ঠিকই যে, ওকে নষ্ট করতেই এসেছিলাম। কিন্তু নিজেই নষ্ট হয়ে গেলাম। অথবা, কে বলতে পারে; অমৃত হয়ে গেলাম।

রাজেন, পুতনকে বলেনি যে, কাল ভোরের বাসেই ফিরে যাবে ও। অনেকই কাজ বাকি আছে। সময় বেশি নেই।

পুতন বলল, তুমি কথাবার্তা কইচো না যে!

বলল, একেবারেই কলকাতার লোকেদেরই মতন। ওই ভাষা পুরোপুরি রপ্ত করে ফেলে, পুতনের খুব গর্ব হয় আজকাল। কিছু মেকি মানুষ, মেকি-বাঙাল তাঁদের মাতৃভাষার ব্যাপার একধরনের হীনমন্যতাতে ভোগেন। পুতনও তাদেরই দলে। ব্যতিক্রম নয়। মেকিরাই তো এখন দলে ভারী সব জায়গাতে। তাদেরই রাজত্ব। অথচ একদিন পুতন ঘৃণা করত। আজ সে তাদেরই একজন।

তবুও রাজেন কথা বলল না।

কী গুরু? উত্তর দিচ্ছ না যে কথার?

রাজেন হাসল এবারে।

বলল, জানো পুতন আমি না মাইরী, আলোকঝারি হয়ে গেছি।

পুতনের প্রতি এক গভীর কৃতজ্ঞতা বোধ করছিল রাজেন।

সে আবার কী?

সত্যিই। আলোকঝারি।

তারপর বলল, আমি তোমার কাছে খুবই কৃতজ্ঞ যে তুমি আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিলে।

আরে এখনই কী! কালকে কম্মো ফতে হোক। তার পরে না! কেস যেমন তৈরি করেছ, তাতে তো জোর খাটাতেও হবে না দেখছি।

রাজেন হাসল।

মুখে কিছু বলল না।

হাসিটা, চাঁদের আলোতেও অদ্ভুত ঠেকল পুতনের।

মনে মনে বলল, অনেকই দিন জোর খাটিয়েই পেয়েছি মেয়েদের। গায়ের জোর, টাকার জোর, বুদ্ধির জোর। এবারে পাব জোর না-খাটিয়েই। হেরে যাবে এবারে। যে-সব জেতাকে, আমি জেনে এসেছিলাম, তারা যে সবই সস্তা জয়ের রঙ-করা হার, আত্মাবমাননাই একরকমের, তা আমি আজ জেনেছি। সসম্মানে জিতবে এবার।

কী হল গুরু। কতা কও। হলটা কী তোমার?

আর কথা? সত্যি পুতন। আমি নিজেই আলোকঝারি হয়ে গেছি তোমাদের দেশে এসে। সত্যিই!

কেন? আলোকঝারি কেন?

এত আলো, এত আনন্দ; আমার মধ্যে সত্যিই হাজারো ফোয়ারা খুলে গেছে। তা থেকে দিন রাত শুধু আলোই ঝরে। খুশিও! এও কি এক আলোকঝারি নয়? আমার মন? এই আমিকে কি আমি জানতাম?

পুতন ভাবছিল, একই মানুষের অনেকগুলো মানুষ থাকে বোধহয়। বোধহয় নয়; অবশ্যই থাকে।

রাজেনের মধ্যে থেকে এ কোন মক্কেল হঠাৎ বেরিয়ে এল মাল না খেয়েই, এমন হেঁয়ালি শুরু করল, কে জানে! কলকাতার মালেদের বোঝাই মুশকিল। কিরণশশীর ভাষাতে বলতে গেলে বলতে হয়, খিটক্যাল। কী খিটখ্যাল।

ভাবছিল পুতন।

দূরের আলোকঝারি পাহাড়টা চাঁদের আলোতে রুপোঝুরি হয়ে গেছিল। আর দুদিন পরেই পূর্ণিমা। পাহাড় থেকে নানা রাত পাখি আর নিশাচর জানোয়ারদের আওয়াজ ভেসে আসছে। ওদের চলে-যাওয়া দেখে এসে, শিলি বারান্দার খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে, আলোকঝারির দিকেই চেয়েছিল। আজ বিনুনি বেঁধেছিল ও। এক বিনুনি। বাঁ দিক দিয়ে ঘুরিয়ে, বুকের উপর ছেড়ে দিয়েছিল কালো, চিকন সাপের মতন। শ্বেতকরবী গুঁজেছিল বাঁ কানের পেছনের চুলে।

ভাবছিল শিলি, সুগন্ধি ঘোরের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে, স্বপ্নে সাঁতার দিয়ে, এক অচেনা স্বপ্নের দেশে ভেসে যাচ্ছিল ও।

আলোকঝারি থেকে উড়ে-আসা ময়নামারীর বিলের দিকে চলে যাওয়া, ঘাড়ে কেশর ঝোলানো সাদা হেরনরা কোয়াক কোয়াক কোয়াক করে ডাকতে ডাকতে উড়ে যেমন করে ভেসে যায়, তেমনই উড়ে যাচ্ছিল শিলি, নিঃশব্দে।

এই মুহূর্তে মাকে বড়ই মনে পড়ছিল ওর।

মা আজ পাশে থাকলে বড় ভালো হত। মা যে ওর মধ্যেই ছিলেন আর রাজেনের মধ্যে সুধীরমামা।

এ কথা মনে করেই রোমাঞ্চিত হচ্ছিল ও।

রাজেনকে ও মরতে দেবে না।

ঝাঁকি দর্শন

দ্বারিকদা ও বৌদিকে—

অনুজের প্রতি অশেষ প্রীতির সকৃতজ্ঞ স্বীকৃতিস্বরূপ

আমার নাম টিকলু।

জীবনে যারা সফল, আমি অনেকেরই মতো; তাদের দলের নই। পড়াশুনোয় আমি মাঝামাঝি ছিলাম। চাকরির বিজ্ঞাপন দেখে যে লক্ষ-লক্ষ লোক পে-অর্ডার ভরে, অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম জমা দিয়ে এ দরজা থেকে ও দরজায় ঘুরে বেড়িয়ে যৌবনের জীবনীশক্তির প্রায় সবটাই অলক্ষ্যে ও নিঃশেষে খরচ করে ফেলে আমি তাদেরই একজন। আমার স্টেট ব্যাঙ্কে চাকরি হয়নি, হয়নি ইনকাম ট্যাক্সে। সরকারি, আধা-সরকারি এমনকি বেসরকারি কোনো প্রতিষ্ঠানেও কোনো চাকরির মতো চাকরি আমার আজ অবধি হয়নি।

আমার বয়স প্রায় তিরিশ হতে চলল।

আমরা তিন ভাই এক বোন। দিদি বড়—জামাইবাবু কৃতী পুরুষ। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বড় চাকরি করেন তিনি, উর্দিপরা টুপি-চড়ানো ড্রাইভার তাঁর গাড়ি চালায়। দিদির একমাত্র কাজ শপিং করা। এবং দুজনেরই কাজ আমি যে একটা অপদার্থ, কুঁড়ে হতভাগা এ সম্বন্ধে আমাকে অবহিত করা।

আমার বড় দাদা প্রায় আমারই মতো কুঁড়ে। আমি যে কুঁড়ে এ কথা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু এই কুঁড়েমিটা কিছু করতে চেয়েও কিছুই করতে না পারার কারণে। অব্যবহৃত তানপুরার উপরে যেমন পরতে-পরতে ধুলো জমে, তেমনি করে পরতে-পরতে আমার অস্তিত্বর উপর কুঁড়েমি বসে গেছে। একদিন বা একশো বছরের চেষ্টাতেও সে ধুলো, সে আস্তরণ আর উঠবে না।

আমি যদি তানপুরা হতাম, তবে দোকানে দিয়ে আমার খোলনলচে বদলে, নতুন করে রঙ করে, মরচে-পড়া তার-টার সব বদলে নিলে আমি হয়তো আবার কোনো সুন্দর সুর-সোহাগী আঙুলে দারুণ বাজতাম। কিন্তু আমি যে একজন মানুষ। আমার খোলনলচে বদলাবার, নিজেকে নতুন করে রঙ বা বার্নিশ করার উপায় নেই কোনো।

বাবা অবস্থাপন্ন ছিলেন। ছেলেবেলায় বড়লোকির মধ্যে মানুষ হয়েছিলাম। কিন্তু বাবার মৃত্যুর পর আমরা গরিব। বাবার অন্য অনেক ব্যবসার মধ্যে একটা চা-এর দোকান ছিল, ভালো রাস্তায়, ভালো পাড়ায়; দাদা সেই দোকানে সকাল-বিকেল যায়—দুপুরে পড়ে পড়ে ঘুমোয়। দোকানদারিতে যে ব্যবহারের চাকচিক্য লাগে ও সদাসর্বদা জাগ্রত দৃষ্টির দরকার হয় আমার ঘুমকাতুরে দাদার তার কিছুই ছিল না।

আমার বউদি খুব ভালো। সুন্দরী, সুরুচিসম্পন্না; ভারী ভালো মেয়ে। আমার দাদার হাতে পড়ে বউদির বড়ই হেনস্থা। তার কোনো শখই এ জীবনে পূরণ হয়নি। হবেও না। আমার বউদির সঙ্গে আমার একটা বাবদে মিল ছিল। রুচির বাবদে। চরিত্রের নরম দিকটার বাবদে। ফলে, ভ্যাগাবন্ড আমি ও আমার বউদির মধ্যে কখন যে অনবধানে একটা সখ্যতা গড়ে উঠেছিল; একে অন্যের প্রতি সহানুভূতি, সমবেদনা সব মিলেমিশে কবে কখন কোন মুহূর্তে যে বউদিকে আমি এবং বউদি আমাকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম ও ভালোবেসেছিল তা আমরা কেউই বুঝতে পারিনি।

আমাদের পরিবারে আমার ছোটভাই একমাত্র তালেবর। সে বিদেশি কোম্পানিতে একটা মোটামুটি চাকরি করত, ছেলেবেলা থেকেই ফট্‌ফট্‌ করে ইংরিজি বলত, ইংরিজি গান গাইত। আমাদের পরিবারের সেই কর্তা ছিল বলতে গেলে।

আমার সঙ্গে বউদির সম্পর্কটা আত্মীয়স্বজন সকলেই জানতেন—কিন্তু বেচারি-বউদি ও হতভাগা-আমি জীবনের আর সমস্ত ক্ষেত্রে এমনই বঞ্চিত ছিলাম যে, আমাদের একে অন্যের কাছ থেকে এই সামান্য প্রাপ্তিতে কেউই আপত্তি করত না। দাদার মানসিকতায় ভালোবাসা, শখ, রুচি এই সমস্ত ব্যাপারগুলোই সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল। তাই আমাদের দুজনের সম্পর্ক নিয়ে মাথা ঘামাবার মতো মস্তিষ্ক ও হৃদয় কোনোটাই তার ছিল না। দিনে রাতে চোদ্দো ঘণ্টা ঘুম এবং খাওয়ার সময় খাওয়া পেলেই সে সুখী ছিল। জীবনে ডাল-ভাত বা শাড়ি-শায়া ছাড়াও যে বেঁচে থাকতে হলে একজন নারীর অন্য কিছুর প্রয়োজন হয়, প্রয়োজন থাকে; তা বোঝার মতো ক্ষমতা দাদার ছিল না।

মনে হয়, বোঝার ইচ্ছাও ছিল না।

বউদির ছেলে-পিলে হয়নি। ডাক্তাররা বলেছেন, হবেও না। তাই আমার উপরে বউদির মনের অপত্য স্নেহ ও প্রেম সমস্তই বড় নরমভাবে বর্ষিত হত। আমার জীবনে বউদিই একমাত্র আনন্দ ছিল।

যখনই মাঝে-মধ্যে এক মাস দু মাসের জন্যে কোনো একটা কাজ পেতাম—যে কাজকে 'অ্যান্ অ্যাপলজী ফর্ আ জব্' বলাই ভালো—সেই টাকা দিয়ে বউদিকে শাড়ি কিনে দিতাম। কোনো হুহু-হাওয়া গরমের সন্ধেয় হয়তো বউদির জন্যে এক প্যাকেট ধূপকাঠি বা একগোছা রজনীগন্ধা নিয়ে আসতাম।

আমার কাছ থেকে বউদির কোনো দাবি ছিল না, আশাও না। আমারও একটু সমবেদনা বা ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই পাওনা ছিল না বউদির কাছ থেকে। আমাদের সম্পর্কটা আশ্চর্য রকম পবিত্র ছিল, যদিও তা যে-কোনো মুহূর্তে অপবিত্র হতে পারত। হতে পারত, অথচ হয়নি বলেই যেন সেই সম্পর্কের একটা আলাদা দাম ছিল, মোহ ছিল আমাদের দুজনেরই কাছে।

শরীর বড় স্থূল। শরীর এসে পড়লেই বোধ হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভালোবাসার সূক্ষ্মতা মরে যায়। বউদির যে কিছু অদেয় ছিল আমাকে এমন নয়। কিন্তু সে-কথা দুজনেই মনে মনে জানতাম বলেই হয়তো কেউই তা পাওয়ার বা দেওয়ার জন্য তাড়াহুড়ো করিনি।

আমার তালেবর ছোট ভাইয়ের বিয়ে হল এক বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে। তার বিয়ের পরই আমার ভাদ্র-বউ, ভ্যাগাবন্ড ভাসুরঠাকুর ও তার বউদির মধ্যে এমন ভাবটা ভালো চোখে দেখল না। নানারকম কথা উঠতে লাগল। সেই থেকেই, নিজের ও বউদির দুজনের সম্মানের জন্যেই আমি কলকাতার বাইরে বাইরে কাটাতে লাগলাম। যে-কোনো একটা কাজ পেলেই তা নিয়ে কিছুদিন কাটিয়ে আসতাম বাইরে। কানা-ঘুষো থেকেও বাঁচতাম; আবার অনেক অনেক দিন পর, বাইরে থেকে ফিরে এসে, বউদির সঙ্গ, বউদিকে দেখতে পেয়ে খুব ভালোও লাগত।

পাটনায় কাটালাম কিছু দিন। শিলিগুড়ি, মাল, কৃষ্ণনগর—বাঁকুড়া, যে-কোনো কাজে যে-কেউ ডাকে অমনি চলে যেতাম, যে-কোনো মাইনেয়। এমনকি বেগার খাটতেও।

সবে বাঁকুড়া থেকে ফিরেছি দিনকয় হল, এমন সময় আমার মামাতো ভাই শশী একদিন এসে হাজির।

শশীর চেহারাটা খুব সুন্দর ছিল। আমার বড় মামা এক সময় কলকাতার এক শীর্ষস্থানীয় ক্লাবের হর্তাকর্তা ছিলেন, তারপর ফুটানির অনেক ফোটো ও বাড়ি মর্টগেজ রেখে তিনি মারা যান। শশী তার পিতৃবন্ধুদের ধরে সেই ক্লাবেই স্টুয়ার্ডের চাকুরি পায় সুন্দর চেহারার গুণে। আমরা দুজন একসঙ্গে পড়তাম। শশী আমাকে খুব পছন্দ করত—। ও সিরিয়াস্‌লি নানারকম চাকরির চেষ্টা করত আমার জন্যে।

শশী একদিন সকালে এসে বলল, তোর একটা দারুণ চাকরি ঠিক করেছি—তোকে আইডিয়ালি স্যুট করবে।

কীসের চাকরি?

সন্দিগ্ধ গলায় শুধোলাম আমি।

কারণ এর আগে অনেক চাকরি-চাকরি খেলা খেললাম, পঞ্চাশ-একশো টাকা মাইনেতেও—। কিন্তু হয় মাইনে কম, নয় মালিক মনোমতো নয়, নয়তো নিজের কুঁড়েমির জন্যে কোনো চাকরিও টেকাতে পারলাম না। আমার কুষ্ঠিতে কোথাও স্থির হয়ে বসা লেখা ছিল না।

আমি কিছু বলার আগেই শশী বলল, এমন মালিক পাবি না। একেবারে রাজা লোক। অংশুমান মিত্তিরকে কলকাতায় সবাই চেনে। সকলে ডাকে স্যার এ এম্।

স্যার মানে? নাইটেড নাকি? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

তারপর বললাম, বাহাত্তুরে বুড়ো বুঝি? পুরোনো স্যারেরা কি আজও আছেন? ভারতীয় গন্ডারের মতো তাঁরাও ত নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে।

শশী একটা সিগারেট এগিয়ে দিয়ে বলল, আরে না, না, 'স্যার' ঠাট্টা করে বলে লোকে। বয়স কত হবে? বড়জোর পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ। কিন্তু এমন সত্যি ঠাট্টা আর হয় না। ক্লাবে তো কত অ্যান্টিক হয়ে-যাওয়া রাজা-মহারাজা, রায়-সাহেব, রায়-বাহাদুর দেখি, কিন্তু এমন দিলদার লোক আর কখনও দেখিনি।

আমি বললাম, লোকে বলে, বড়মামাও এমনিই দিলদার ছিলেন।

শশী সিগারেটে একটা জোরে টান দিয়ে আমাকে তার চোখের চাবুক মেরে বলল, ছিলেন। কিন্তু দিল্-দারী করতে গিয়ে গুচ্ছের ছেলেমেয়েকে পথের ভিখিরি করে রেখে স্বর্গে যান তিনি। স্যার এ এম্-এর সঙ্গে আমার স্বর্গত পিতৃদেবের তফাত এইটুকুই।

আমি শুধোলাম, চাকরিটা কীসের?

শশী চোখে মুখে উৎসাহ ঝরিয়ে বলল, হাউসকীপিং—ম্যানেজারের।

অবাক হয়ে শুধোলাম, সেটা আবার কী?

মানে বুঝলি না? মানে ঘর-গেরস্থালি দেখাশোনার চাকরি।—কলকাতায় নয়, সাঁওতাল পরগনায়।

আমি তখনও ভাবছিলাম।

বললাম, অংশুমান মিত্তিরের স্ত্রী নেই?

থাকবেন না কেন?

জোরের সঙ্গে বলল শশী।

তারপর বলল, নিশ্চয়ই ওঁর ঘর-গেরস্থালির ব্যাপারটা এমনই কমপ্লিকেটেড্ যে, মেমসাহেবের পক্ষে একা সেটা ম্যানেজ করে ওঠা মুশকিল।

যাই-ই হোক আজ সন্ধে সাতটার সময় সাহেবের সঙ্গে তোর অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছি। তোকে সাড়ে ছ'টায় এসে নিয়ে যাব। আজ আমার অফ্-ডে। তৈরি হয়ে থাকিস কিন্তু।

এই অবধি বলে, সিগারেটটা শেষ করেই শশী বলল, এবার পালাই, নমিতার সঙ্গে দুপুরে সিনেমা যাব।

আমি হাসলাম। বললাম এবার শাঁখা-সিঁদুর লাগা—। কতদিন আর ছুপকে-ছুপকে চালাবি?

শশী বলল, শাঁখা-সিঁদুর লাগালেই তো থোড়-বড়ি খাড়া—খাড়া-বড়ি থোড়। যতদিন ছুপ্‌কে-ছুপ্‌কে চলে, ততদিনই তো মজা। আমি বাবা ছুপা-রুস্তমই থাকতে চাই—যে ক'দিন পারি।

২

শশী ঠিক কাঁটায়-কাঁটায় ওর স্কুটার নিয়ে এসে হাজির।

আমিও তৈরি ছিলাম। শশী স্যুট পরতে মানা করেছিল। বেঁচে গেলাম। ইন্টারভ্যুর জন্যে সেজকাকার কাছ থেকে চেয়ে-আনা, পুরোনো একটা স্যুট অল্‌টার-টল্‌টার করে নিয়ে ইস্ত্রি করিয়ে রাখতাম। কিন্তু এই পুরোনো স্যুটটাও বোধ হয় সেজকাকা ভালো মনে দেননি। এ স্যুট পরে গিয়ে একটা চাকরিও আমার এ পর্যন্ত হয়নি। তাই স্যুটটা পরতে হবে না জেনে আশ্বস্ত হলাম।

শশীর স্কুটার মে-ফেয়ারে একটা বিরাট মাল্‌টি-স্টোরিড বাড়ির সামনে গিয়ে থামল।

স্কুটারটা পার্ক করিয়ে, ঘড়ি দেখে নিল শশী একবার। একেবারে রাইট-অন্‌-টাইমে। তারপর লিফ্‌টের সামনে গিয়ে বোতাম টিপল।

লিফ্‌টটা নামতে-না-নামতে, আমাদের পাশ থেকে কে যেন বলে উঠলেন, একেবারে কাঁটায়-কাঁটায় এসেছ দেখছি।

পাশে তাকিয়েই চমকে উঠলাম আমি।

গ্রেগরী পেক্ কবে থেকে বাংলা শিখলেন?

অপলকে তাকিয়ে রইলাম—ভদ্রলোকের দিকে। হুবহু গ্রেগরী পেকের মতো দেখতে—এমনকি চুলটা পর্যন্ত—শুধু গায়ের রঙটা অতখানি ফর্সা নয়। সাড়ে ছ'ফুট লম্বা। এমন বাঙালি তো আগে দেখিনি।

ভদ্রলোককে দেখেই, শশী হাত জোড় করে নমস্কার করে নিল, এই আমার ভাই স্যার!

স্যার এ এম্ প্রতি নমস্কার করলেন আমার নমস্কারে।

ইতিমধ্যে লিফ্‌ট এসে গেল। লিফ্‌টে উঠে দশতলায় পৌঁছলাম।

দশতলায় পৌঁছে সাহেব নিজের ফ্ল্যাটের সামনে এসে বেল টিপলেন।

বেয়ারা এসে দরজা খুলল—পেছন-পেছন বাঘের মতো দেখতে একটা ফিকে-হলুদ অ্যালসেসিয়ান কুকুর।

টাইয়ের নট্‌টা ঢিলে করে কোটটা বেয়ারার হাতে দিয়ে সাহেব বললেন, বলো শশী।

শশী ও আমি দাঁড়িয়েছিলাম।

সাহেব বললেন, বোসো বোসো। কী খাবে বলো? গরম না ঠান্ডা?

শশী বলল, ঠান্ডা।

সাহেব বেয়ারাকে বললেন, বউ-রানিকে খবর দে, কোকাকোলা মিষ্টি সব নিয়ে আয়।

তারপর বউ-রানি আসার আগে সাহেব আমার দিকে চেয়ে বললেন, কাজটা কি শুনেছ তো?

ভদ্রলোকের আত্মবিশ্বাস আছে পুরোপুরি—বিধান রায়ের মতো—অচেনা লোককে তুমি বলতে একটুও আটকায় না এবং এমনভাবে তা বলেন যে, যাকে বলা হল তার কিছু মনে করারও থাকে না।

আমি বললাম, পুরোটা শুনিনি।

তবে শোনো।

বলেই, সাহেব বললেন, ঝোলে-ঝালে-অম্বলে সব কিছু করতে হবে। দরকার হলে মালও বইতে হবে। কখনও কখনও সারারাত কাজ করতে হবে। একসঙ্গে আটচল্লিশ ঘণ্টা নন্‌-স্টপও কাজ করতে হতে পারে যখন আমার গেস্ট-টেস্ট থাকবেন। যখন কাজ থাকবে না, তখন ঘুমোতে পারো। মানে নিয়ম-কানুন কিছু নেই। য্যায়সা কাজ ত্যায়সা ডিউটি। তোমাকে কতকগুলো দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া

হবে—কেউ খবরদারি করবে না তোমার উপর—এক বউ-রানি ছাড়া। নিজের দায়িত্ব বুঝে সব কাজ নিজের করতে হবে—নিজের ইনিসিয়েটিভে।

মাথা নাড়ছিলাম। আর মনে মনে ভাবছিলাম, কাজের ফিরিস্তি তো শুনছি, এখন মাইনের কথাটা শুনি। এরকম বড় বড় সাহেব আমি এ পর্যন্ত অনেক দেখেছি। কাজের বেলা "শোলে" আর মাইনের বেলা 'অ্যাড্-শর্টস্।'

আমার চোখের ভাষা হয়তো সাহেব বুঝে থাকবেন। ভদ্রলোককে দেখেই অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলে মনে হল।

সাহেব বললেন, পাঁচশো টাকা মাইনে পাবে—তার সঙ্গে খাওয়া পাবে, থাকার কোয়ার্টারস। মাসে তিনদিনের জন্যে কলকাতায় আসার ছুটি পাবে। ট্যাঁ-ফো করলে চলবে না, কোনো অজুহাত চলবে না। খাটতে পারবে কিনা ভালো করে চিন্তা করে নিযে জানিও। কাজের বেলা কোনো ফাঁকি বরদাস্ত করব না আমি।

খাওয়া-দাওয়া সমেত পাঁচশো টাকা আমার কাছে অনেক টাকা—কিন্তু আমি বাঙালির ছেলে—খাটুনিটা জোর হলে আমার একটু অসুবিধা। হালকা খাটুনি, ফাঁকি মারার সুযোগ বেশি অথচ মাইনে ভালো এমনি চাকরি হলে আমার পোষায় কিন্তু ভদ্রলোকের ব্যক্তিত্বটা এমনই ও মাইনের অঙ্কটা এতই লোভের যে, বার বার মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানানো ছাড়া তখন আমার আর কিছুই করণীয় রইল না।

এমন সময় বউ-রানি এলেন। বউ-রানির মতোই দেখতে। চাঁপাফুলের রঙ যেন ফুটে বেরুচ্ছে। মুখে একটি প্রশান্ত অথচ ভাবিত ভাব। খুব আস্তে কথা বলেন, আস্তে হাঁটেন, নরম করে তাকান। রানির মতোই নরম মোম-মোম। একটু মোটার দিকে চেহারা।

বউ-রানি আসতেই স্যার এ এম বললেন, এই যে ভ্রমর, তোমাকে যে ছেলেটির কথা বলেছিলাম, এই-ই সেই শশী—আর শশীর কাজিন্—হ্যাঁ, তোমার নাম কী যেন?

আমি বললাম, যবন-দমন দত্ত।

বড্ড বড় নাম। সাহেব বললেন।

তারপর বললেন, বাড়ির নাম কী?

টিকলু। বললাম আমি।

ফারসট্-ক্লাস। সাহেব বললেন।

তারপর বউ-রানির দিকে চেয়ে আমার সামনেই বললেন, পছন্দ ভ্রমর?

বউ-রানি মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানালেন।

সাহেব বললেন, চিন্তার কোনো কারণ নেই। ওখানে গিয়ে পৌঁছলেই কাজকর্ম—মানে জুতো-সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবই একে একে শিখে নেবে। আরও অনেক লোকজন আছেন। সব ঠিক হয়ে যাবে।

তারপর বললেন, ভালো করে কাজ করে আমরা বাঙালিরা যে কুঁড়ে ফাঁকিবাজ, এই অপবাদটা ঘুচাও তো দেখি সকলে মিলে।

আমি চুপ করে রইলাম।

তারপর কোকাকোলা আর মিষ্টি খেয়ে আমরা যখন উঠলাম, তখন সাহেব বললেন, আগামী শুক্রবার রাতে এখান থেকে রওনা হবে। রাত দশটা পনেরোতে গাড়ি। হাওড়া থেকে। আমিও ওই গাড়িতেই যাব। আর যা কথা হওয়ার তা ওখানেই হবে। তোমার টিকিট আমি শশীর হাতে দিয়ে দেব। মঙ্গল-বুধের মধ্যেই, ক্লাবে।

তারপর বললেন, ঠিক আছে?

হ্যাঁ স্যার।

নমস্কার করে বললাম আমি। তারপর বউ-রানিকে নমস্কার করলাম।

শশী বলল, চললাম স্যার।

এসো। বলেই, সাহেব ভিতরে চলে গেলেন জামা-কাপড় ছাড়তে।

লিফ্‌টে শশী বলল, কেমন বুঝলি?

কাজটা খুব ইন্টারেস্টিং বলে মনে হচ্ছে।

শশী বলল, তোর বস্‌কে আমি চিনি। তোর ঝামেলা বস্‌কে নিয়ে হবে না; হবে বউ-রানিকে নিয়ে।

আমি চমকে উঠে বললাম, কেন একথা বলছিস?

শশী বলল, একে রাজার মেয়ে, রাজার স্ত্রী, তার উপর কেমন মুডী-মুডী দেখলি না। ওঁর মন বুঝে চলতে পারলেই তোর চাকরি খায় কোন্ শালা। কিন্তু আমরা চাষাভুসো লোক : রাজা-রাজড়াদের মুড্ বোঝা মুশকিল।

দেখাই যাক। বললাম আমি।

শশী বলল, জয় সাঁইরাম।

ইদানীং শশী এবং মামাবাড়ির সকলে সাঁইবাবার খুব ভক্ত হয়ে উঠেছে। ওর চাকরিতে উন্নতি হয়েছে, নমিতার সঙ্গে প্রেম গাঢ় হয়েছে, ওদের বাড়িতে মাসিমার ঘরে সাঁইবাবার ফোটোর উপর বিভূতি জমেছে।

আমিও সঙ্গে সঙ্গে বললাম, জয় সাঁইরাম।

চাকরিটা এ যাত্রা টিঁকে গেলে সাঁইবাবার দয়াতেই টিকবে—ভাবলাম আমি।

৩

সবে পুব আকাশে আলোর রেখা ফুটেছে। চারদিক দেখা যায়। কিন্তু সূর্য ওঠেনি। এমন সময় মিথিলা এক্সপ্রেস ট্রেনটা স্টেশনটাতে ঢুকল।

থ্রি-টায়ারের উপর-তলা থেকে রবারের বালিশটা ফাঁসিয়ে নিয়ে, সুজনী সমেত সড়াৎ করে নেমে এলাম। তারপর সুটকেশের মধ্যে ফেঁসে-যাওয়া বালিশ ও সুজনী পুরে নিয়ে, সুটকেশটা হাতে নিয়ে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ালাম।

তাকিয়ে দেখি, ফারস্ট ক্লাসের সামনে গন্ধমাদন পর্বত নেমেছে। বিরাট-বিরাট চ্যাপটা করে ভাঁজ করে রাখা পিস্‌বোর্ডের প্যাকিং বক্স, টিউব লাইট, বাক্স, প্যাঁটরা, পোঁট্‌লা-পুঁটলি, সাহেব, মেমসাহেব এবং আরও একটি দম্পতি।

এমন মালিকের চাকরি করে আরাম। ভীড়ের মধ্যেও এ মালিক কখনও হারিয়ে যাবার নয়। লক্ষ লোকের মধ্যেও সাহেবের সাড়ে ছ-ফিট চেহারা সকলের মাথা ছাড়িয়ে থাকবে।

কুলির প্রসেশানের পিছনে-পিছনে ওভারব্রিজ পেরিয়ে গিয়ে দেখি একটা অ্যাম্বাসাডর গাড়ি, একটা স্কুটার-টেম্পো এবং টাঙ্গার সারি দাঁড়িয়ে।

সাহেব একজন রোগা-সোগা কালো-কালো ভদ্রলোককে ডাকছিলেন, ভজন, ভজন বলে। বোঝা গেল, সেই ভজনবাবু মালপত্র তদারকি করে সামলে-সুমলে নিয়ে আসবেন।

সাহেবরা আগেই চলে গেলেন গাড়িতে। যাওয়ার আগে ভজনবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়ে গেলেন সাহেব।

বললেন, এর নাম টিকলু। আপনার অ্যাসিসট্যান্ট।

স্কুটার-টেম্পো এবং টাঙ্গাবাহিনী আগে রওয়ানা করিয়ে দিয়ে শেষের টাঙ্গায় আমাকে নিয়ে ভজনবাবু উঠলেন।

টাঙ্গা ছাড়তেই বললেন, সামনের দিকে চোখ রাখবেন একটু—টাঙ্গাগুলো মাল ছড়াতে-ছড়াতে যাবে—প্রতিবার এমনই হয়। আর আমরা সেগুলো কুড়োতে কুড়োতে যাব—সেজন্যেই আমাদের টাঙ্গায় মাল বলতে আমরা শুধু দুজনই আছি।

বলেই, পকেট থেকে নস্যির ডিবে বের করে এক টিপ্ নস্যি নিলেন।

বললেন, বে-শাদি হয়েছে?

আজ্ঞে না।

তবে তো মুশকিলে ফেললেন। দেখবেন, পানুই-এর ক্যাজুয়ালটি হবেন না আবার।

আজ্ঞে?

আমি না বুঝতে পেরে শুধোলাম।

ভজনবাবু উত্তর দিলেন না।

টাঙ্গা একটা মিষ্টির দোকানের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল, ভজনবাবু বললেন, জিলিপি-সিঙ্গাড়া খাবেন। গরম-গরম ভাজছে।

বলেই, টাঙ্গা থেকে একলাফে নেমে গিয়ে এক ঠোঙা জিলিপি-সিঙ্গাড়া নিয়ে এলেন।

আমার সামনে ধরে বললেন, খান।

বললাম, মুখ ধুইনি।

ধমক দিয়ে ভজনবাবু বললেন, থামুন তো মশাই। জীবনে কখনও কি মুখ-না-ধুয়ে কিছু খাননি? যা-কিছু খেয়েছেন, সবই মুখ ধুয়ে? খান, খান, এমন স্বাদের জিলিপি-সিঙ্গাড়া হয় না আর।

ভজনবাবু আমার ইমিডিয়েট বস্। কিছু কথাবার্তা বলতে হয়—তাই-ই বললাম, আপনি কি এখানে অনেকদিন।

ইয়েস্। জন্মে থেকে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন ভজনবাবু।

আমি আবার শুধোলাম, পরিবার-টরিবার এখানেই?

ইয়েস্। ঝামেলা এড়াবার জন্যে আমি ডি-অ-এস্ বিয়ে করেছি।

মানে? জিলিপি-মুখে আমি বোকার মতো শুধোলাম।

ভজনবাবু বললেন, ইয়েস্, ডটার অব্ দ্য সয়েল। আমি সাঁওতাল মেয়ে বিয়ে করেছি। থার্ড ওয়াইফ। ফারস্ট ক্লাস আছি মশাই। আমার বিধবা মা আমার কাছে এসে রয়েছেন, আমার ওয়াইফ তাঁর যা সেবাযত্ন করছে তা দেখলে বামুনের মেয়ে ভিরমী খাবে।

বলেই, বললেন, আজকাল অবশ্য শহরের শিক্ষিত লোকেদের ঘরেই এসব উঠে গেছে বরং গ্রামের লোক, উপজাতিদের মধ্যে এখনও ভালোটুকু আছে।

আমি শুধোলাম, ছেলে-পেলে?

নান্। ভবিষ্যতে মে বী।

তারপর জিলিপি খেতে-খেতে শুধোলেন, আমাদের সাহেবকে কতদিন জানেন?

বললাম, পাঁচদিন আগে পাঁচ মিনিটের জন্যে প্রথম দেখা।

এ্যাই সেরেছে। বললেন, ভজনবাবু।

তারপর বললেন, কোথায় কাজ করতে এয়েছেন জানেন কি?

আজ্ঞে না। আমি বললাম।

তারপর ভয় পাওয়া গলায় বললাম, ভালো করিনি?

মোটেই না মশায়। পাগল হয়ে যাবেন, বে-থা করেননি, এখনও খাদ্য-খাদক ভূত-ভবিষ্যৎ আছে, পাগলের পাল্লায় পড়ে নির্ঘাৎ পাগল হয়ে যাবেন। এ তো একটা পাগলা গারদ। এই ভজন ভড় বলেই কোনোক্রমে টিঁকে রয়েছে এখানে।

ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, কেন, উনি কি পাগল নাকি?

—সার্টেন্‌লি ইয়েস্। কোনো সন্দেহই নেই তাতে। আমি যে এখনও পাগল হইনি, তার কারণ আমার বাবা পাগল ছিলেন। আমারও পাগল হওয়ার কথা ছিল। পাগলে-পাগলে কাটাকুটি হয়ে গিয়ে আমি বেঁচে গেছি। কিন্তু আপনার বাঁচার কোনোই চান্স নেই।

টাঙ্গাটা একটা লেভেল ক্রশিং পেরুল।

ভজনবাবু তারস্বরে চেঁচালেন, ওরে ও জংলী, সামান্ গীড়্ গিঁয়া।

সামনের টাঙ্গা থেকে একটা পুঁটলি গড়িয়ে রেল লাইনের উপর পড়েছিল। জংলী নামক একটি খোঁড়া ছেলে খুঁড়িয়ে নেমে সেটিকে উদ্ধার করে আবার যথাস্থানে রাখল।

রেল লাইনটা পেরুলে পর আমি বললাম, আচ্ছা! আমার কাজটা কী?

ভজনবাবু প্রচণ্ড শক্ পেলেন।

বললেন, কাজটা কি এখনও জানেন না? আজব লোক মশায় আপনি।

তারপর একটু থেমে বললেন, আপনি কি জানেন যে, সাহেবের একটি চিড়িয়াখানা আছে। তাতে নেই, এ হেন জানোয়ার, পাখি নেই। গ্রিনহাউস আছে—তাতে রকমারি গাছ-গাছালি। ডেয়ারি আছে, পোলট্রি আছে সে-পোলট্রিতে দিনে দু'হাজার ডিম হয়। সাহেবের নিজের বাড়ির মধ্যে আবার জাপানি-বাড়ি, হাওয়াইয়ান বাড়ি, কামাচ্ কাটকান্-বাড়ি, শান্তিনিকেতনী-বাড়ি আছে। গাছে-গাছে হ্যমক্ আছে, গাছে চড়ে জিরোবার জায়গা আছে, আফ্রিকায় চিতাবাঘেরা যেমন জিরোয়। ব্যাপার-স্যাপার দেখে আপনার জাম গাছে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে যেতে ইচ্ছা হবে। আর লোকজন? প্রায় জনা তিরিশ লোক কাজই করে এই কুরুক্ষেত্রে। তাও একটি চিড়িয়াখানা।

আমি রীতিমতো ঘাবড়ে গেলাম। হাউস-কীপিং ম্যানেজারের যে চিড়িয়াখানার ম্যানেজারি করতে হবে, তা ঘুণাক্ষরেও জানা যায়নি। এ আমার কী সর্বনাশ করল শশী!

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, তাহলে তো সর্বনাশ হল!

জিলিপির ঠোঙাটা সজোরে ছুঁড়ে ফেলে ভজনবাবু বললেন, ইয়েস্। সার্টেন্‌লি। এত বড় সর্বনাশ যেন কারোই না হয়।

কিছুক্ষণ বাদে টাঙ্গার প্রসেশন একটি বন্ধ লোহার গেটের সামনে এসে দাঁড়াল।

দেখলাম হিন্দীতে লেখা আছে "চিড়িয়াখানা শনিচ্চর ঔর এতোয়ার কি দিন্ বন্ধ রহেগী।"

ভজনবাবু টাঙ্গা থেকে লাফিয়ে নেমে চিৎকার করতে লাগলেন, রামস্বরূপ গেট খোলো; গেট খোলো।

লম্বা-চওড়া এক গুঁফো দারোয়ান এসে ঠেট্ হিন্দীতে শুধোলো, গেটপাস?

ভজনবাবু বললেন, তুম্‌হারী গুষ্টিনাশ্। সাহাব্‌কা সামান লে আয়া হ্যায়, হাম্‌কা শ্বশুরাল্ মে ঘুষতা হ্যায়? জল্‌দি খোল্ গেট।

আমি অবাক গলায় বললাম, গেট-পাস কীসের?

আরে গেট দিয়ে মোরগা, আণ্ডা, মায় গোরু-বাছুর অবধি হাওয়া হয়ে যাচ্ছিল, সাহেবের পেয়ারের লোকেরাই করছিল। তারপর একবার রাস্তার ষাঁড়েরা প্রসেসান করে ঢুকে পড়েছিল।

আমি অবাক হয়ে শুধোলাম, কেন?

ভজনবাবু বললেন, আরে এখানে লাল লাল বিলিতি মেম-সাহেব গোরু আছে কত্ত ডেয়ারিতে! তবে? বিপত্তি কী একটা? তাই সাহেব এই ব্যবস্থা করেছেন। যতবার ঢুকবে-বেরুবে ততবারই গেট্‌পাস। এ ব্যাটা দারোয়ান অবশ্য নতুন, এখনও ভজন ভড়ের স্ট্যাটাস্ সম্বন্ধে জ্ঞান হয়নি।

ব্যাপার-স্যাপার দেখে আমি তখুনি মনস্থির করে ফেললাম, এই যে ঢুকলাম, আর বেরুচ্ছি না।

গেট খুলতেই, সামান্ নামিয়ে নেওয়া হল। ভাড়া গাড়ির ভিতরে ঢোকা নিষেধ। গেটে দাঁড়িয়ে বুঝতে পেলাম যে, এ একটা যে-সে জায়গা নয়। লালমোরামের পথ চলে গেছে অনেক দূরে—ভিতরে। দু-পাশে কত যে গাছ, কত যে লতা, কত পাথরের মূর্তি, কাঠের কাজ, গাছে-গাছে বাতি ঝুলছে পথের দু'পাশে—সবুজ বাল্‌ব লাগানো আছে তাতে।

দূর থেকে বাড়িটা দেখা যাচ্ছে। সামনের দিকে রঙিন টাইল বসিয়ে ফ্রেস্‌কো করা হয়েছে—। বাড়ির মাথায় লাল খাপ্‌রার সুন্দর ডিজাইন। সৌন্দর্যবোধ ও সুরুচির ছাপ চারিদিকে পরিপুষ্ট।

চোখ জুড়িয়ে গেল।

আস্তে আস্তে ভিতরে এগিয়ে গেলাম।

বাড়ির কাছে আসতেই দেখি মেমসাহেব ইতিমধ্যেই একপাল দেহাতি ছেলে নিয়ে পাঠশালা বসিয়েছেন। গোলাকৃতি মারবেলের টেবিলে আমগাছের ছায়ায়—চতুর্দিকে বসার বেতের চেয়ার—তাতে নানারঙা গদি আঁটা।

মেমসাহেব বলছেন, বোলো, অ। বোলো আ। বোল্লো বাচ্চে।

পড়াশুনা এগোতে না এগোতেই দেখি বালতি করে একজন লোক গরম দুধ আর ডিমসেদ্ধ এনে ছেলেগুলোকে খাওয়াতে আরম্ভ করল।

তারা ডিমসেদ্ধ-ভরা মুখে গব্‌গবে গলায় বলতে লাগল, অ, আ। ডিমের হলুদ-কুসুম-লাগা দাঁত বের করে বলল, ই—ঈ।

এমন সময় সাহেবের গলা শোনা গেল।

বাড়ির সামনে ধাপে-ধাপে সিঁড়ি উঠে গেছে। ঝোলানো টবে-টবে অর্কিড ঝুলছে। তার সামনে মিউজিক্যাল টাইম। বাজনা। হাওয়ায় দোলাদুলি করে টুংটাং শব্দ হয়। সেই বাজনাগুলো সারি করে লাগানো আছে।

সাহেব বলছেন, মধ্যের অতগুলো বাজনা কোথায় গেল?

ভজনবাবু স্মার্টলি উত্তর দিলেন, চুরি হয়ে গেছে সাহেব।

সাহেব বললেন, নাইট-গার্ড কী করছিল?

ভজনবাবু বললেন, সে তো নিজেকেই নিজে ধমকে বেড়ায় সারারাত! চোরেরা তার ধমক শুনলে তো! তাছাড়া, চুরি নাইটে হয়নি স্যার, ডে-তে হয়েছে। কিন্তু চোর ধরা পড়েছে। রোহিণী বস্তির দুটো ছেলে। তাদের ধরে রামস্বরূপ গাছে বেঁধে রেখেছে। কালই বিকেলে ধরা পড়েছে।

সাহেব বললেন, কখন থেকে বেঁধে রেখেছে?

কাল বিকেল থেকে।

কী অন্যায়। কী অন্যায়। সাহেব বললেন।

তারপর বারান্দার সামনে একটা চেয়ারে বসে পড়ে বললেন, এখুনি তাদের নিয়ে এসো, দুধ খাওয়াও। আহা! বেচারিদের এমন করে কষ্ট দেয়?

সাহেবের গলার স্বরে চুরির দায়ে ধরা-পড়া বজ্রসেনের প্রতি শ্যামার যে দরদ, সেই দরদই যেন ঝরে পড়ল।

আমি স্থাণুর মতো দাঁড়িয়েছিলাম।

সাহেব ডাকলেন, মেহবুব্, মেহবুব্।

একটি অল্পবয়সি ছেলে আমার চেয়ে অনেক ভালো পোশাক পরে বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। ছেলেটি খুব স্মার্ট। পরে জেনেছিলাম, সাহেবের খাস্ বেয়ারা।

সাহেব বললেন, মেহবুব্, চোররা কোথায়? নিয়ে এসো।

পরক্ষণেই আমাকে বললেন, টিক্লু যাও তো ভাইডি, মেহবুবের সঙ্গে গিয়ে চোরদের নিয়ে এসো।

মেহবুবের পিছন-পিছন গিয়ে দেখি ইউক্যালিপটাস গাছের গুঁড়িতে বাঁধা দুটি বছর বারো-তেরোর ছেলে মাথা নুইয়ে আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় লেপ্টে আছে গাছের সঙ্গে।

দড়ি খুলে আমি ও মেহবুব্ যখন সাহেবের কাছে তাদের নিয়ে এলাম, তখন সাহেবের রাগ কে দেখে? চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করলেন উনি।

বললেন, এক্ষুনি এদের দুধ খাওয়াও।

তারপর মেমসাহেবকে বললেন, ভ্রমর, এদের একটু ওমলেট আর টোস্ট করে দিতে বলো রামকে।

মেমসাহেব সাহেবের মুখের দিকে একবার অপাঙ্গে চেয়ে, পড়ুয়াদের ছেড়ে উঠে গেলেন ভিতরে।

দুধ এবং খাবার খাইয়ে চোরদের গায়ে জোর করিয়ে নেওয়ার পর সাহেব বললেন, ভাই, কাজটা কি তোমরা ভালো করলে? চুরিই যদি করলে তো সবগুলো বাজনাই চুরি করলে না কেন? অর্ধেক নিয়ে গেলে,—তোমাদের বাড়িতেও ভালো বাজবে না, আমার বাড়িতেও তাই। তার চেয়ে বাকিগুলোও খুলে দিচ্ছি, নিয়ে যাও। নয়তো যেগুলো নিয়ে গেছ, সেগুলো ফেরত দিয়ে দাও আমাকে। বাজনা বাজা নিয়ে কথা—তোমাদের ঘরেই বাজুক, কী আমার ঘরেই বাজুক, ভালো করে বাজবে তো?

চোরেদের মধ্যে একটি ছেলে পায়ের নখ দিয়ে মাটি খুঁটতে-খুঁটতে বলল, বাজনা শোনার জন্যে আমরা চুরি করিনি—টাকার জন্যে করেছিলাম। গাঁয়ের এক দোকানে দশ টাকা দিয়ে ওগুলো বেচে দিয়েছি।

টাকা দিয়ে কী করলে?

খেলাম সাহেব। বাড়িতে বাবা-মায়ের বেমার। নোকরী-ধান্দা নেই। তাই চুরি করেছিলাম।

সাহেব ডাকলেন, ভজন।

ভজনবাবু এগিয়ে এলেন।

সাহেব বললেন, এক্ষুনি পনেরো টাকা দিয়ে কাউকে ওদের সঙ্গে পাঠাও। আমার বাজনাগুলো যার কাছে বিক্রি করেছে ওরা, তার কাছ থেকে আবার কিনে নিয়ে আসুক। আর এ ছেলে দুটোর কাজের দরকার—আজ থেকে এদের চাকরির বন্দোবস্ত করো।

চাকরি খালি নেই। ভজনবাবু বললেন।

খালি করো।

কাকে ছাড়াব?

আহা ছাড়াবে কেন?

তাহলে ওদের কোন কাজের জন্যে বহাল করব?

কোনো কাজ নেই?

না সাহেব।

তাহলে ওরা আমার লনে জল দেবে। গরম পড়ে গেল—এখন জল দেওয়ার লোকের দরকার। মালীরা ফুলগাছ দেখাশোনা করেই সময় পায় না—এরা লন দেখাশোনা করবে। দিনমজুর হিসেবে এরা আজ থেকে বহাল হল।

ভজনবাবু বললেন, আচ্ছা স্যার।

সাহেব এই বন্দোবস্ত করে, বাড়ির ভিতরে গেলেন।

ভজনবাবু বললেন, টিকলুবাবু, আপনি এদের সঙ্গে যান। নিজ কানে সব শুনলেন তো! এই নিন পনেরো টাকা।

বলেই, বুকপকেট থেকে পনেরো টাকা বের করে আমায় দিলেন।

তারপর গলা নামিয়ে বললেন, কেমন বুঝছেন? চোরের এমন শাস্তি কোথাও শুনেছেন, না পড়েছেন?

আমি জবাব না দিয়ে ছেলে দুটোকে নিয়ে চললাম।

এই হল আমার নতুন চাকরির প্রথম অফিসিয়াল অ্যাসাইনমেন্ট।

টাঁড় পেরিয়ে ধুলো ভরা রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে ছেলে দুটো বলল, নেহাতই পেটের দায়ে চুরি করেছি। নইলে এ পাগলা-সাহেবের বাড়ির কোনো জিনিস বাইরে পড়ে থাকলেও আমরা কেউ নিই না। পাগলা সাহেব মানুষ নয়; দেবতা।

মানুষ যে নন মনে মনে, আমারও তেমন একটা সন্দেহ হচ্ছিল। তবে ভূত-প্রেত না দেবতা সে বিষয়ে এখনও নিঃসংশয় নই।

ভাগ্যি ভালো, বাজনা যার কাছে বিক্রি করেছিল, সে পেতল ভেবে কিনেছিল। পনেরো টাকা পেয়ে সে খুশি হয়েই সেগুলো দিয়ে দিল।

ছেলে দুটোকে নিয়ে প্রায় ঘণ্টাখানেক পর ফিরে আসতেই দেখি সাহেব একটা লালরঙা স্যুট-প্যান্ট পরা বাঁদরের হাত ধরে বাড়ির সামনের বাগানে পায়চারি করছেন আর তার সঙ্গে অনর্গল গল্প করছেন।

আমি ব্যাপার দেখে থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

হঠাৎ সাহেব আমাকে দেখেই মেহবুবের উপর রেগে উঠে হুংকার দিয়ে বললেন, এ্যাই! টিকলুবাবুকে কোয়ার্টার দেখিয়ে দাও, নাস্তা-পানির বন্দোবস্ত করো।

তারপর আমাকে বললেন, যাও টিকলু, হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে-দেয়ে ঠিক ন'টার সময় এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে।

মেহবুবের সঙ্গে আমার কোয়ার্টারে যাওয়ার সময় পথে ভজনবাবুর সঙ্গে দেখা। একটা ছোট্ট টবে-লাগানো অর্কিডকে প্রেমিকার মতো বুকে আঁকড়ে ধরে কোথায় যেন চলেছেন।

ভজনবাবু বললেন, বুদ্ধুকে দেখেছেন?

কে বুদ্ধু?

আমি অবাক হয়ে শুধোলাম।

ওই যে বাঁদরটা। ওর বউয়ের নাম ছিল গোপা। গোপা মারা যাওয়ার পর বউয়ের শোকে ওর টি-বি হয়েছে। তাই সাহেব ওকে নিজে অত যত্ন করেন।

আমি বললাম, কিন্তু বাঁদরের গায়ে স্যুট কেন? এ কি সাহেবের শখ?

ভজনবাবু আমার দিকে এমন মুখ করে তাকালেন যেন আমি একেবারেই অর্বাচীন।

বললেন, কখনও কোনো বাঁদরকে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখেছেন? ওদের যন্ত্রপাতি তো সব মানুষের মতো। বড় অশ্লীল দেখায়। স্যুটটা শখে নয়, প্রয়োজনে। আমরা তো চিরদিন বাঁদরদের চার পায়ে বুকে হাঁটতেই দেখেছি—বাঁদর মানুষের হাতে-হাত রেখে হাঁটলে এইসব ডিফিকাল্টি হয়।

তারপর একটু থেমে বললেন, এখানে মেমসাহেব থাকেন, সাহেবের গেস্টদের মধ্যে কত মহিলা থাকেন—তাদের সামনে বাঁদরকে অমন বেলেল্লাপনা করে ঝুল্‌ঝুল্‌ করে ঘুরতে দেওয়া যায় না।

বাঁদরকে স্যুট পরাবার অকাট্য যুক্তিটা মানতেই হল।

মেহবুব্‌ আমার কোয়ার্টারে এনে আমাকে পৌঁছে দিল।

ছিমছাম, দুটো ঘর, বাড়ির সামনে পেঁপে গাছ কয়েকটা, চারধারে বড় বড় গাছ—নানারকম পাখি ডাকছে। বেশ পছন্দ হল কোয়ার্টার।

আমি বললাম, রান্না-বান্না করার জায়গা নেই?

মেহবুব্‌ বলল, সাহেব তো বলেছেন আপনি বাড়িতেই খাবেন চার বেলা। রাম বাবুর্চি আছে, অশোক আছে—সাহেব মেম-সাহেবদের জন্যে যা রান্না হয় আপনিও তাই-ই খাবেন। আমি বেয়ারা। সাহেবের খাস-বেয়ারা।

বুঝলাম, কমিশনারের পি-এর মতো মেহবুব্‌কেও একটু খাতিরে রাখতে হবে। নইলে এই পাগলা-সাহেবের কাছে কখন চাকরি নট্‌ হয়ে যায় কে জানে।

বাথরুমে গিয়ে, হাত-মুখ ধুয়ে, জামা-কাপড় ছেড়ে একটু জিরিয়ে নিচ্ছিলাম, রাতে ট্রেনে ভালো ঘুম হয়নি, এমন সময় একটা কালো-কোলো পনেরো-ষোলো বছরের ছেলে এসে ডাকল আমাকে। বলল, নাস্তা লাগা দিয়া।

তারপর বলল, রোজ সকালে আপনাকে এখানে বেড-টি দিয়ে যাব। সকাল ন'টায় বাড়িতে এসে বাবুর্চিখানায় নাস্তা করে নেবেন, দুটোয় দুপুরের খাওয়া, বিকেলে পাঁচটায় চা, রাত দশটায় রাতের খাওয়া।

তারপর বলল, চলুন।

আমি শুধোলাম, তোমার নাম কী?

আমার নাম অশোক।

বেশ মিষ্টি কাটা-কাটা চোখ-মুখ।

শুধোলাম, তুমি কি সাঁওতালি?

না। আমি বিহারি।

কী যেন বললে, তোমার নাম? অশোক?

না, আমার আসল নাম আসোয়া, রানিমা আমার নাম দিয়েছেন অশোক। এখানে সকলের নাম রানিমাই দিয়েছেন। আপনার নামও দেবেন।

মানে? আমার নাম আমার থাকবে না?

অশোক হাসল মিষ্টি করে। বলল, বোধহয় না। সাহেব ঠিকই আপনার নামেই ডাকবেন। কিন্তু মেমসাহেব আড়ালে অন্য নামে ডাকবেন।

আমি নার্ভাস হয়ে গিয়ে বললাম, ভজনবাবুর কী নাম?

দাঁড়কাক। অশোক বলল।

এ্যাঁ? আমি আতঙ্কিত গলায় বললাম।

আর আমার নামও দিয়ে ফেলেছেন নাকি?

অশোক হাসল। বলল, হ্যাঁ।

কী? কী? আমি উদ্‌গ্রীব গলায় শুধোলাম।

অশোক বলল, পাতিকাক।

কেন? পাতিকাক কেন?

দাঁড়কাকের অ্যাসিস্ট্যান্ট্ বলে। অশোক বলল।

আহা! বউদি আমার এমন হেনস্থা জানলে হয়তো আমাকে এক্ষুনি চাকরি ছেড়ে চলে আসতে বলত কলকাতায়। কিন্তু এসে-অবধি এই চিড়িয়াখানার ব্যাপার-স্যাপার এতই ইন্টারেস্টিং লাগছে যে, এই আমার তিরিশ বছরের জীবনে এই-ই প্রথমবার মনে হচ্ছে যে, চাকরিতে এবার আমার মন লেগেছে। আমি হলাম গিয়ে ভারসেটাইল্ জিনিয়াস্—কোনো একই কাজ কি আমার ভালো লাগে? এইরকম বিভিন্নমুখী কাজ তো আমারই জন্যে!

নাস্তা করা হলে সাহেব ডেকে পাঠালেন।

বললেন, চলো টিকলু, তোমাকে তোমার কাজের জায়গা ঘুরিয়ে দেখাই।

সাহেবের সঙ্গে যে দম্পতি এসেছিলেন, তাঁরা বাঙালি নন। কোথাকার মহারাজা আর মহারানি। ভদ্রমহিলা দেখতে পাঞ্জাবি-পাঞ্জাবি। ভদ্রলোককে সাহেব গ্রেগরী বলে ডাকছিলেন; আর ভদ্রমহিলাকে পম্পা।

গ্রেগরী সাহেব আমাদের সঙ্গে চললেন।

বললেন, লেট মি হ্যাভ আ স্ট্রল উইথ উ্য—।

সাহেব বললেন, কাম এলং।

প্রথমেই আমরা বাড়ির সামনেই একটা জায়গায় এলাম। ওই পাথুরে জমিতে ডিনামাইট দিয়ে পুকুর খোঁড়া হয়েছে ঘোড়ার খুরের আকৃতির। তার উপর হ্যাঙ্গিং ব্রিজ। অর্কিডে-অর্কিডে ও নানা লতা ও ঝোপে ছেয়ে রয়েছে জায়গাটা। সেই জায়গাটার উপরে, জলের উপরে বাঁশ দিয়ে তৈরি একটা জাপানি কায়দার বিরাট ঘর। কাঠের টুকরো রঙ করে দু পাশের পর্দা বানানো হয়েছে। বাঁশের গায়ে হলুদ রঙ করা। ঘরটাতে উঠতে হলে বাঁশের মজবুত সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়। ঘরের মধ্যে মোটা-মোটা ডানলপিলো মাইসোরিয়ান মিহি মাদুর দিয়ে ঢাকা। জাপানিজ্ কায়দায় বাঁশের মেঝে।

সাহেব বললেন, জাপানে এইরকম মেঝেকে বলে টাটামি-ফ্লোর। এটা হচ্ছে জাপানিজ টী-হাউস। তবে এখানে চা খাওয়া হয় না, আমার গেস্টরা দুপুরে বিয়ার খান। গরমের দিনে রাতে গল্প-টল্প করেন। হানি-মুনিং কাপ্‌ল্ এলে র'তে শোন।

দেখলাম, দুদিকে, বিশেষ করে, পশ্চিমের দিকে চিক্ ফেলা আছে। সুন্দর রঙ করা। যাতে পশ্চিমি লু' না ঢুকতে পারে ঘরে। দেওয়াল থেকে টেবলফ্যানও ঝুলছে দু-পাশে। আলোও আছে। কোনোকিছুরই ত্রুটি নেই।

সাহেব বললেন, এই ঘর ভালো করে যত্ন করে রাখবে। বাঁশের মিস্ত্রি এখানে আছে। পার্মামেন্ট স্টাফ। যখন যা মেরামতের দরকার তাকে দিয়ে করিয়ে নেবে। তার নাম নীলমোহন।

জাপানিজ টী-হাউসের পাশেই একটা ম্যাগনোলিয়া গ্ল্যান্ডিফোরা গাছের গুঁড়ির চারদিকে লাগানো সাদা রট্-আয়রনের গ্লাসটপের টেবল, রট্-আয়রনের চেয়ার। লেখাপড়া করার জন্যে।

বাগানের মাঝে মাঝেই গাছ-গাছালির তলায় নানান বসার জায়গা—নানা ধাঁচের, নানা মাপের, নানা রঙের। গাছে-গাছে হ্যামক্ ঝুলছে. হ্যামকের সঙ্গে বেঁধে-রাখা বালিশ, যাতে হাওয়ায় উড়ে না পড়ে যায়।

বাঁদিকে আরও কিছুদূর গিয়ে সাহেবের লাইব্রেরি তৈরি হচ্ছে। একটা বড় জামগাছের একটা ডালও না কেটে—তার নীচে দোতলা বাড়ি। ছাদটা পুরো কাচের। এখনও শেষ হয়নি।

সাহেব বললেন, কার্পেন্টার, রাজমিস্ত্রি সব এখানে পার্মানেন্ট স্টাফ—তুমি শুধু একটু দেখাশোনা করবে—ভজনবাবু একা সময় পান না সব দেখাশোনা করবার। তাছাড়া, চিড়িয়াখানাটা তাঁরই দায়িত্বে।

লাইব্রেরি ছাড়িয়ে আর একটু এগোলেই, বাঁদিকে নীল রঙা সুইমিং পুল। সুইমিং পুলের পাশেই

একটা মাটির ঘর। তার বারান্দায় বসে একজন দর্জি পা-মেসিন চালিয়ে ঝাঁই-ঝাঁই করে গদির নানারঙা নতুন কুশানের কভার সেলাই করে চলেছে। এবং ছিঁড়ে-যাওয়া কুশানেরও কভার মেরামতি করছে।

সাহেব বললেন, যখনি যে কুশান কভার ছিঁড়ে যাবে, একে বলবে, এ খুলে সেলাই করে দেবে। যেখানে নতুন বানাতে হবে তাও একেই বলবে। এর নাম হামিদ।

আরও একটু এগিয়ে গিয়ে একটা বিরাট গভীর কুঁয়ো। তার উপর লোহার জাল বিছানো। সেই কুঁয়োর উপরে বাঁশের সাঁকো। সেই সাঁকো বেয়ে গিয়ে একটা মাটির বাড়ি। সাঁওতালদের বাড়ির মতো দেখতে—কিন্তু দোতলা—মধ্যে স্যানিটারি বাথরুম-টাথরুম সব আছে। বাড়িটা একটা বড় তালগাছকে ঘিরে তৈরি করা হয়েছে। সিঁড়ি তৈরি হয়েছে কাঠের তক্তা দিয়ে তালগাছটিকে ঘিরে ঘিরে।

এক একটা জিনিস দেখছি, আর এই মানুষটার, আমার নতুন মালিকের শখ, রুচি, ক্ষমতা দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি। আমার সেজকাকা, যিনি ইন্টারভ্যুর জন্যে আমাকে অপয়া পুরোনো স্যুট দিয়েছিলেন, এবার অ্যামেরিকায় ডিজ্‌নীল্যান্ডে গেছিলেন—ফিরে এসে গল্প করেছিলেন যে, মানুষের পয়সা, বিজ্ঞান আর কল্পনা এবং পরিশ্রম একসঙ্গে মিললে যে কী অসাধ্যসাধন করা যায়, তা নাকি ডিজ্‌নীল্যান্ডে না গেলে অনুমান করাও মুশকিল। আমি কিন্তু আমার সাহেবের এই চিড়িয়াখানায় এসে ডিজ্‌নীল্যান্ডের আস্বাদ পেলাম। মানুষটার প্রতি ভক্তি আমার শতগুণে বেড়ে গেল।

হঠাৎ সাহেব আমার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, তুমি ভাবছ, আমার পয়সা আছে, তাই বাপ-ঠাকুরদার উপার্জন করা পয়সায় আমি ফুটানি করছি। তা কিন্তু নয়। পরে তোমাকে আমার ডেয়ারি, পোলট্রি, এগ্রিকালচারাল ফার্ম সব সময়মতো ঘুরে দেখাব। অত্যন্ত কমপিটেন্ট সব লোক নিয়ে পার্টনারশিপ করেছি তাঁদের সঙ্গে। তাঁরা প্রত্যেকে নিজের নিজের ক্ষেত্রে খুব দক্ষ ও কৃতী লোক। পুরো ব্যাপারটার সাকসেসের মূলে তাঁদের কন্ট্রিবিউশানই অনেকখানি। শতকরা ষাটভাগ প্রফিট তাঁরা পান—আমি পাই চল্লিশ ভাগ। ডেয়ারির আলাদা পার্টনার, পোলট্রির আলাদা পার্টনার, এগ্রিকালচারের আলাদা পার্টনার। আমি নিজে যদিও অ্যাকাউন্ট্যান্ট, তবু নিজের হিসাব আমি নিজে রাখি না তাতে ভুলভ্রান্তি হতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা মানুষ নিজের চিকিৎসা নিজে করলে বায়াস্‌ড্ হয়ে যায়। তাই কলকাতার এক প্রসিদ্ধ অডিটর ফার্ম থেকে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট্ এসে প্রতি উইক-এন্ডে আমার সমস্ত কিছুর অ্যাকাউন্টস্ চেক করে যান। উইক্‌লি ট্রায়াল-ব্যালান্স ও প্রফিট-অ্যান্ড-লস্ অ্যাকাউন্ট বানানো হয়। কোথায় কত লাভ হচ্ছে, কি হচ্ছে না, তা ধরা পড়ে। আমার পার্টনারেরা সকলেই দেড় দু'হাজার টাকা মাসে ড্রইং করেন প্রফিটের এগেইনস্টে।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, বুঝলে টিকলু, সবই নিজে খাব, অন্য কাউকে কিছু দেব না এবং সবই একাই করতে পারব এই ভুল ধারণার জন্যেই আমাদের কিছু হয় না।

আমি বললাম, স্যার, কতদিন আগে আপনি এসব আরম্ভ করেছিলেন?

স্যার এ এম বললেন, তুমি আমাকে অংশুদা বলেই ডেকো। স্যার স্যার কোরো না।

তারপর বললেন, আজ থেকে ন'বছর আগে আরম্ভ করেছিলাম। তখন আমার বয়স চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ।

কথাটা শুনে আমার থুথু ফেলে মরতে ইচ্ছা করল। মানে আজ আমার যে বয়স, প্রায় সে বয়সে এই মানুষটা একটা এতবড় প্রোজেক্ট ভিজুয়ালাইজ করে, ভেবে, নিজে হাতে সব করেছেন। বড়লোকের শখ হিসেবে নয়, অ্যামেচারিশ ভাবে নয়, একেবারে প্রফেশানাল কায়দায়। তার ফল: আজ অত লোকের চাকরি হয়েছে এখানে, এত কিছু উৎপাদন হচ্ছে, পাথুরে মাটিতে বছরে দুটো করে ফসল ফলছে।

সাহেব বললেন, তিনটে ক্রপ করার চেষ্টা করছি, কিন্তু মাটি তো নয় যেন পাথর; কিছুতেই করতে পারছি না। এই পুরো ব্যাপারটা আমি কো-অপারেটিভ বেসিসে ডেভালাপ করছি—সত্যিকারের কালেকটিভ প্রচেষ্টা—বুঝেছ টিকলু। আমি দেখিয়ে দেব যে, কাজ করার ইচ্ছা থাকলে করা যায়, অসুবিধা, পাথুরে মাটি, জলকষ্ট, এসব কোনো বাধাই নয়।

তারপর একটু থেমে বললেন, জানো ভাইডি, একবার ইস্রায়েলে গেছিলাম, দেখে এলাম ওরা মরুভূমিতে ফসল ফলাচ্ছে। আমাদের এত বড় দেশ, এত সুন্দর দেশ, আমরা সকলে মিলে যদি মাথা লাগাতাম, হাত লাগাতাম, তবে এদেশ নিয়ে আমরা কী-না করতে পারতাম।

আমার নতুন মালিকের কথা শুনতে শুনতে আমার ইচ্ছা করল তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করি। মনে মনে বললাম, শশী! তোর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। এখানে আমি বিনি-মায়নাতেও কাজ করতে পারি। আমার তিরিশ বছরের জীবনে আমি এমন একটা মানুষের মতো মানুষ দেখিনি। আমার বন্ধ্যা, অসফল ভ্যাগাবন্ড কালো মেঘাচ্ছন্ন জীবনে এই কাজই যেন প্রথম একটা রুপোলি আলোর রেখা। হঠাৎ করে এতদিন বাদে, যৌবন প্রায় শেষ করে এনে বুঝলাম যে, অন্য কেউই কারও জন্যে কিছু করতে পারে না। একজন মানুষ নিজে, সে যদি মানুষের মতো মানুষ হয়, তবে শুধু তার নিজের জন্যেই নয়, নিজের জন্যে করেও, আরও দশজনের বোঝা ও দায়িত্ব সে হাসিমুখে বইতে পারে। ভাবছিলাম, অনেক নোটবই পড়ে য়ুনিভার্সিটির পরীক্ষা পাশ করেছি, মরা পাঁঠার গায়ে করপোরেশানের ছাপের মতো য়ুনিভার্সিটির ছাপ পেয়ে ভেবেছি, কত কী-না শিখলাম, জানলাম। কেন জানিনা, আজ আমার হঠাৎ মনে হল, আজ যা শিখলাম, বুঝলাম, তেমন শেখা, বোঝা বা জানা এতদিনে কখনও জানিনি। আমার বুকের মধ্যে কী যেন একটা অপ্রকাশ্য, অনামা অনুপ্রেরণার অনুরণন শুনতে পেলাম, রক্তের মধ্যে তা নদীর ঢেউয়ের মতো হঠাৎ ছলাৎ-ছলাৎ করে বাজছিল।

সাহেব বললেন, ডেয়ারি, পোলট্রি বা চিড়িয়াখানা নিয়ে তোমার দায়িত্ব বা মাথাব্যথা নেই—তুমি শুধু আমার এই বাড়িঘরগুলো ঠিক করে রাখবে। অতিথিদের স্টেশানে গিয়ে রিসিভ্ করবে, স্টেশানে তুলে দিয়ে আসবে, কোনোরকম খাতির-যত্নর ত্রুটি না হয় দেখবে। হুইস্কি ফুরিয়ে গেলে, বিয়ার ফুরিয়ে গেলে আমাকে জানাবে। আমার স্টোর রুমের চাবি আজ থেকে তোমার হাতে। আমি নিজে থাকলে সব যেমনটি চলে, আমি এখানে না থাকলেও আমার অবর্তমানে সবকিছু ঠিক তেমনটিই চালিও। এই তোমার কাজ। তাছাড়া তোমার কাছে আমার কিছুই চাইবার নেই।

তারপর একটু থেমে বললেন, এ কাজ তোমার পছন্দ হয়েছে তো? আমাকে, বউ-রানিকে, পছন্দ হয়েছে তো? কারণ আমাদের পছন্দ না হলে, তুমি কাজ করে আনন্দ পাবে না।

আমি অনেকক্ষণ সাহেবের মুখের দিকে মুখ উঁচু করে চেয়ে রইলাম।

তারপর আস্তে বললাম, খু-উ-ব।

সব দেখানো হয়ে গেলে সাহেব আমাকে বউ-রানির জিম্মায় দিয়ে অফিসে চলে গেলেন। রীতিমতো অফিস আছে এখানে। টাইপিস্ট, অ্যাকাউন্ট্যান্ট, ক্লার্ক সব নিয়মমাফিক কাজ করছে। এখন সাহেব লাঞ্চ অবধি অফিসে বসেই কাজ করবেন। তারপর বিকেলে পোলট্রি, ডেয়ারি ও এগ্রিকাল্চারাল ফার্ম দেখতে বেরুবেন।

সাহেব চলে গেলেন।

বউ-রানি ছায়া ঢাকা বারান্দায় বসে কী যেন লেখাপড়া করছিলেন।

বললেন, প্রথম দিনই বেশি রোদ লাগিও না, আগুনে পুড়ে যাবে, লু'ও লাগতে পারে। চা খাবে নাকি এক কাপ?

আমি উত্তর দেওয়ার আগেই মেহবুব্ ট্রেতে বসিয়ে টি-পটে করে চা নিয়ে এল।

বউ-রানি নিজে হাতে চা বানিয়ে দিলেন।

চা খেতে খেতে বউ-রানি বললেন, চলো, চা খেয়ে নিয়ে ঘর-গেরস্থালি তোমাকে বুঝিয়ে দিই।

আমি বললাম, তার আগে আপনাকে বলি, আপনার দেওয়া নামটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে।

কী নাম?

বউ-রানি সন্দিগ্ধ চোখে তাকালেন।

আমি বললাম, পাতিকাক।

বউ-রানির যে ধরনের সেন্স্ অব হিউমার, তা বোঝা সাধারণ লোকের কর্ম নয়। নিজে অত্যন্ত রসিক হলে তবেই বউ-রানির ফল্গুধারার মতো অন্তঃসলিলা রসবোধের হদিস পাওয়া যায়।

এমন সময় ভিতর থেকে চান-টান সেরে সাহেবের গেস্ট—মহারানি এলেন। একটা ফিকে হলুদ-রঙা বেল-বট্স পরেছেন। ওপরে হালকা সবুজ পাঞ্জাবি। দারুণ ভালো ফিগার, খুব বুদ্ধিমতী, সুশ্রী চেহারা।

উঠে দাঁড়ালাম।

বউ-রানি হাসলেন না। গম্ভীর মুখে বললেন, বিশ্বাসঘাতককে খুঁজে বের করতে হবে।

বউ-রানি বললেন, পম্পা, চা খাবে এক কাপ?

নো, থ্যাঙ্ক য়্যু।

বলেই, চুল-ভরা কাঁধ ঝাঁকিয়ে মহারানিকে ধন্যবাদ জানালেন।

তারপর আমাকে বসতে বললেন।

ভদ্রমহিলা খুব ছট্ফটে স্বভাবের। একটু পরেই বললেন, হোয়ারস্ আওয়ার হাজব্যান্ডস্ গান? লেট মি গো অ্যান্ড হ্যাভ আ লুক্!

বলেই, মহারানি দুড়্দাড়্ করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গিয়ে বাগানে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

বউ-রানি অপলকে অপস্রিয়মাণ মহারানির দিকে চেয়ে রইলেন।

তারপর অস্ফুটে বললেন, খুনি।

মানে? আমি আঁতকে উঠে বললাম।

বউ-রানি বললেন, আমাকে একবার প্রায় খুনই করে ফেলেছিল একটু হলে।

আমি উত্তেজিত বোধ করলাম। রাজা-মহারাজাদেব ব্যাপার খুন-খারাবি হলেই হল আর কী? কিন্তু আর ঔৎসুক্য দেখানো ঠিক কিনা বুঝলাম না।

চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রেখে বউ-রানি নিজেই বললেন, তবে শোনো সে গল্প।

এমন সময় বউ-রানির পাঠশালার এক পোড়ো এসে অন্য পোড়োদের বিরুদ্ধে নালিশ জানাল—তারা তাকে মেরেছে, তার শ্লেট ভেঙে দিয়েছে, তার পেন্সিল কেড়ে নিয়েছে।

বউ-রানি মেহবুব্কে সরজমিনে তদন্ত করতে পাঠিয়ে বললেন, সে প্রায় বছর পাঁচেক আগেকার কথা। আমার দু ছেলে জানো তো? বড় ছেলের বয়স একুশ। সে লানডান স্কুল অফ ইকনমিক্সে পড়ে লানডানে—আর ছোট ছেলের বয়স, এগারো—সে পড়ে আজমীরের পাবলিক স্কুলে। আমার বড় ছেলে তখন পরীক্ষার পর এখানে এসে রয়েছে। তোমার দাদা তো তাকে একটা ঘোড়া কিনে দিয়েছেন। ঘোড়া সহিস সবই আছে। সে তো ঘোড়া দাপিয়ে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায় পাঁচ-দশ মাইল। এমনি সময়, গ্রেগরী আর পম্পা এল এখানে বেড়াতে।

তারপর একটু থেমে বললেন, দেখতেই পাচ্ছ আমার শরীরে মজ্জার চেয়ে মেদ একটু বেশি। বরাবরই বেশি। পম্পা গল্ফ্ খেলে, রাইডিং করে, ঘোড়া দেখে পম্পা তো খোঁড়া সাজল। দিনরাত

ঘোড়া চেপে বেড়ায়। দুদিন পর চলে যাবার সময় আমায় বিশেষ করে বলে গেল যে, তুমি রাইডিং করো, নির্ঘাৎ রোগা হয়ে যাবে। বুঝলে টিকলু......

আমি থামিয়ে দিয়ে বললাম, পাতিকাক।

বউ-রানি বললেন, ওই হল। পম্পা চলে যাবার পর আমি ছেলেকে বললাম, হ্যাঁরে, তোর ঘোড়াটা একটু দিবি? আমি রোগা হতাম!

ছেলে বলল, নিশ্চয়ই দেবো মা। ঘোড়া চড়ে দেখো। খুব সোজা চড়া। সহিস তোমাকে শিখিয়ে দেবে।

ইতিমধ্যে তোমার সাহেবের দুজন গেস্ট এসে হাজির। একটু যে নিরিবিলিতে ঘোড়া চাপব বা কিছু করব, তা এ-বাড়িতে হওয়ার উপায় নেই। একদিন সকালে সহিস তো ঘোড়াকে সাজিয়ে-টাজিয়ে এনে সিঁড়ির সামনে দাঁড় করাল। ভেবেছিলাম, সে-সময়ে গেস্টরা ঘরের ভেতর থাকবেন। সে-সময় তাঁরা চানও করতে পারতেন, ঘরে বসে দাড়িও কামাতে পারতেন, তা না, তাঁরা চেয়ার নিয়ে বারান্দায় বসলেন। বসে, দাঁড়িয়ে-থাকা ঘোড়াটির দিকে আগ্রহের চোখে চেয়ে রইলেন। কিন্তু, তখন আমি রোগা হব বলে বদ্ধপরিকর। ছোটবেলায় ঠাকুরের বাণী পড়েছিলুম, লজ্জা মান ভয়—তিন থাকতে নয়। অতএব ঘোড়ার সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। কিন্তু উঠি কী করে? ছেলে ও সহিস দুধারে দাঁড়িয়ে ছিল ঠায়। আমার ঘোড়ার প্রতি যত না মনোযোগ ছিল তাদের; আমার প্রতি মনোযোগ ছিল তার চেয়েও বেশি।

আমি বললুম ছেলেকে, একটা চেয়ার আনত বাবা, উঠি কী করে?

ছেলে একটা চেয়ার নিয়ে এল।

চেয়ারে উঠেও দেখি পা পাই না। তখন তাকে বললুম, একটা পিঁড়ে নিয়ে আয়। ছেলে দৌড়ে বাবুর্চিখানা থেকে পিঁড়ে নিয়ে এল।

সেই চেয়ারের উপর পিঁড়ে রেখে, অনেক কষ্টে তো ঘোড়ার উপর চেপে বসলাম।

কিন্তু আমি যেই তার পিঠে বসলাম, ঘোড়া সেই সটান বসে পড়ল। চার-পা মুড়ে।

ছেলে ও সহিস হাঁ-হাঁ করে উঠল।

পাছে আমি আমার পাখির মতো হালকা শরীরের কারণে লজ্জা পাই, তাই সহিস সঙ্গে সঙ্গে বলল, মেমসাব্ ইয়ে তো পাঁচ-পাঁচ মণ সওয়ারী ইতনি নান্‌সে .‥ লেতা, আপতো পাঁচ মণ নেহী হ্যায়, আপকো জরুর উঠানে শেকেগা। ভেবে দেখো, বারান্দায় বসা গেস্টদের সামনে কী হেনস্থা আমার!

তারপর সহিস সান্ত্বনা দিয়ে বলল, আপ জেরা লাগাম খিঁচিয়ে, ঘোড়া বিলকুল খাড়া হো যায়গা।

ঠাকুরের নাম স্মরণ করে যেই-না লাগাম টেনেছি, সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া উঠে তো দাঁড়াল, কিন্তু দাঁড়িয়েই ক্ষ্যামা দিল না। সামনের পা-দুটো সটান শূন্যে তুলে দিয়ে চিঁহি চিঁহি রবে প্রবল প্রতিবাদ করে পেছনের দু' পায়ে ভর করে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

তারপর? আমি উত্তেজিত হয়ে শুধোলাম।

বউ-রানি বললেন, তারপর আর কী? ঘোড়াও স্ট্রেট লাইন হয়ে গেল আর আমিও অত উঁচু ওয়েলার ঘোড়ার লেজ গড়িয়ে স্ট্রেট পপাতঃ ধরণীতলে।

ব্যাপারটা পুরো হৃদয়ঙ্গম করার আগেই বউ-রানি বললেন, বুঝেছো, শাড়ি পরেছিলুম আমি। এমন পড়া পড়লুম যে, কী বলব!

তারপর একটু থেমে বললেন, কিন্তু সেই মেদ, যে মেদ ঝরাবার জন্য ঘোড়ায় চড়তে গেছিলুম, সেই মেদই শেষ পর্যন্ত বাঁচাল আমায়। আমার শরীরে মেদ না থাকলে সেদিন আমার হাড়গোড় ভেঙে চুর্‌চুর্ হয়ে যেত।

একটু থেমে বউ-রানি বললেন, সেই রোগা হওয়ার প্রথম ও শেষ চেষ্টা।

এই গল্প শেষ হওয়ার পর আমার উপর গল্পের প্রতিক্রিয়া কী তা না দেখেই বউ-রানি বললেন, চলো, বাড়িটা তোমাকে ঘুরে দেখাই। আমি আর তোমার দাদার অনুপস্থিতিতে অনেক অতিথি যাবেন আসবেন, তাঁদের যেন কোনোরকম অসুবিধা না হয়।

একতলায় অনেকগুলো ঘর। দুটো এয়ার-কন্ডিশানড্। অন্যগুলোতে গুলমার্গ এয়ারকুলার লাগানো। নীচে দুটি বাথরুম। বাথরুমে ফ্লোর লেভেলের নীচে বাথ-টাব্-কমোড, মায় বিদে পর্যন্ত। আগে আমাদের দেশে বিদে তৈরি হত না। আজকাল হচ্ছে।

বাবুর্চিখানা। চাকর-বেয়ারাদের থাকার ঘর—দু-দুটো ফ্রিজ, স্টোর।

বউ-রানি স্টোর রুম খুলে দেখালেন, বিলিতী হুইস্কি, নানারকম দেশি-বিদেশি মদ, সিগার, সিগারেট ও আরও নানারকম জিনিস ভর্তি। ফ্রিজের মধ্যে চীজ, মাখন, ডিম, হ্যাম, সসেজ্—সেই হেন জিনিস নেই।

বউ-রানি আমাকে নিয়ে তারপর দোতলায় উঠলেন।

দোতলা থেকে বহুদূর অবধি দেখা যায়। বাড়ির সামনে দিয়ে মেইন লাইন। ক্ষণে ক্ষণে ট্রেন যাচ্ছে। রেল লাইনের ওপারে লাল মাটির খোয়াই চলে গেছে। মাঝে মাঝে সবুজের ছোপ, শালের চারা, ঝাঁটি জঙ্গল, মিলিয়ে গেছে দূরের ছায়াঘেরা সাঁওতালদের গ্রামে, তারপর টিগ্রীয়া পাহাড়। একটা নদী গেরুয়া শরীরে গরমের সকালে ন্যাতানো সাপের মতো পড়ে আছে।

বউ-রানি নাম বললেন নদীর; কুত্নীয়া।

ওই গ্রামগুলোর নাম কী? শুধোলাম আমি।

বউ-রানি বললেন, সুজানী। বড় গ্রামটা। তার চারপাশে ছড়ানো আছে কুক্রীবাগ, বদলাডি, বাবুডি সব টিগ্রীয়া পাহাড়ের কোলে-কোলে।

তারপর বললেন, জানো তো, ওইসব গ্রাম থেকে ছেলেমেয়েরা রোজ কাজ করতে আসে। ওই সুজানী গ্রামে একটা খুব সুন্দর মেয়ে আছে, সে এখানে কাজ করে। তার নাম পানুই।

পানুই নামটা শুনেই আমার বুকটা ধক্ করে উঠল।

স্টেশন থেকে আসবার সময় ভজনবাবু যেন কী বলেছিলেন? "বে-শাদি করেননি, পানুই-এর ক্যাজুয়ালটি না হয়ে যান।"

কথাটা মনে পড়ে এতক্ষণে তার মানে বুঝলাম।

মেমসাহেব বললেন, এই পানুইকে নিয়ে তোমার সাহেবের চিন্তা। এত লোকে মেয়েটার পেছনে লাগছে যে মেয়েটা খারাপ না হয়ে যায়। মেয়েটা নিজে পাজী—ত লোক কী করবে? তোমার সাহেব বর ঠিক করে লোক খাইয়ে শাড়ি-গয়না দিয়ে পানুই-এর বিয়ে দিলেন। কিন্তু হলে কী হয়—সে বরকে ছেড়ে চলে এল।

উপরেও অনেকগুলো বেডরুম—দুটি বারান্দা। মানে এই বাড়ির একতলা, দোতলা, জাপানি টি-হাউস, শান্তিনিকেতনী শ্যামলীর মতো মাটির বাড়ি, কামাচ্ কাট্কান, হাওয়াইয়ান সব মিলিয়ে এখানে একসঙ্গে একশো জন অতিথিও অনায়াসে থাকতে পারেন।

আমি বউ-রানিকে বললাম, সেকথা।

বউ-রানি বললেন, থাকতে পারে মানে? থাকেও অনেক সময়।

তারপর বললেন, তোমার চাকরিটা যত সহজ ভেবেছ তত সহজ নয়। তুমি এখানে তিষ্ঠোতে পারলে হয়। তোমার সাহেবের গেস্টদের তো দেখোনি। কতরকম চিজই যে আসে, এই চিড়িয়াখানার জন্তুরাও হার মানে তাদের কাছে।

আমার মনে হল, ইতিমধ্যেই যেন একটু পাগল-পাগল ভাব লাগছে। চাকরিটা টিকিয়ে রাখতে পারলে হয় শেষ পর্যন্ত।

৪

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে।

সাহেব তাঁর মহারাজা-মহারানি অতিথিদের নিয়ে লাইব্রেরির পাশের গাছতলার বসবার জায়গায় বসে, অফিসের কাজ শেষ করে এসে কোল্ড বিয়ার খেয়েছেন। পম্পা মেমসাহেব শ্যান্ডি।

বউ-রানি সাহেব ও সাহেবের অতিথিদের সচরাচর এড়িয়ে চলেন।

তারপর যখন ওঁরা খাবার ঘরে খেতে বসেছেন, আমি রংরুটের মতো দাঁড়িয়ে থেকেছি পাশে, ব্যাপার-স্যাপার দেখবার-বুঝবার জন্যে। কার কী লাগবে না লাগবে তদারকি করার জন্যে।

আজ আমার করার কিছু নেই। কারণ মাল্‌কিন ও মালিক উপস্থিত।

ফিজিক্স নিয়ে পড়াশুনা করে, কলেজ ম্যাগাজিনে বিস্তর কবিতাটবিতা লিখে শেষকালে খাওয়া-দাওয়ার তদারকির চাকরিতে বহাল হলাম বলে হঠাৎ একবার মনে বড় খোঁচা লাগল। পরক্ষণেই সাহেবের উজ্জ্বল দুটি বুদ্ধিদীপ্ত ও প্রতিভাময় চোখে চোখ পড়েই সব ভুলে গেলাম। সত্যিই মনে হল, এ আমার অনেক ভাগ্য যে এমন যোগাযোগ শশীর মাধ্যমে ঘটেছে।

অবাক লাগল বউ-রানির খাওয়া দেখে। বউ-রানি শুধু ছানা খাচ্ছেন একটু।

রাম বাবুর্চিকে কারণ শুধোলাম ফিস্‌ফিস করে। জানা গেল মেদবৃদ্ধির ভয়ে বউ-রানি আর কিছুই খান না।

খাওয়াদাওয়ার পর আমি বউ-রানিকে বললাম যে, আপনি যদি ছানা ছাড়া কিছুই না খান, তাহলে আমিও কিছুই খাব না। আপনি ভাত খেলেই আমি ভাত খাব। আপনি যা খাবেন আমিও তাই-ই খাব। এসব একেবারে ভুল ধারণা। রোগা-মোটা সব উত্তরাধিকারের ব্যাপার। কই সাহেব তো মোটা নন। কিন্তু আপনি মোটা। আমি চেষ্টা করেও মোটা হতে পারি না। যার যেরকম স্বাস্থ্য। খোদার উপর খোদ্‌কারী করে লাভ কী?

আবারও বললাম, আজ রাত থেকে দেখব বউ-রানি, আপনি যা খাবেন, আমিও তাই-ই খাব। আমার তাহলে চাকরি করতে এসে কিন্তু না খেয়ে থাকতে হবে।

বউ-রানি বললেন, এ কী অলুক্ষুণে কথা!

আমি বললাম, অত সব জানি না। যা বললাম, তাই-ই হবে।

প্রথম দিনই চাকরিতে বহাল হয়ে এমন মাতব্বরী ও মাল্‌কিনের ছানাগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করাটা ঠিক হল কী হল না ভেবে দেখলাম না একবারও। মাতব্বরীটা করে ফেলার পর মনে হল কাজটা ভালো করলাম না।

সাহেব বোধহয় রাম বাবুর্চি, অশোক ও মেহবুবের কাছে কানাঘুষায় পাতিকাক-বউ-রানি সংবাদটি শুনে থাকবেন। রাতে আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, তোমার হবে হে। তুমি বউ-রানিকে ছানা ছাড়াতে যদি পারো, তবে তোমার অনেক কিছু হবে।

সাহেবকে ঠিক বুঝতে পারছি না। কথাটা কী ভেবে বললেন ও কীভাবে আমার নেওয়া উচিত তা বোধগম্য হল না। তবে ঠিক করলাম এ ব্যাপার নিয়ে আর বাড়াবাড়ি করব না।

খাওয়া-দাওয়ার পর বারান্দায় বসে, বেতের তৈরি সাদা রঙ করা পা-রাখার জায়গায় পা-রেখে

সাহেব একটা সিগার খেলেন সকলের সঙ্গে গল্প করতে করতে। তারপর সকলে বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে ঘরে গেলে, নিজে উঠে চললেন লাইব্রেরির কাজ তদারক করতে। যাওয়ার সময় আমাকে বললেন, টিকলু, এবার খেয়ে নিয়ে বিশ্রাম নিয়ে নাও একটু। পাঁচটার সময় আবার চলে এসো।

তারপর বললেন, বউ-রানি ও মেহবুবের কাছ থেকে যা বোঝার সব বুঝে নিয়েছ তো?

মাথা নাড়লাম আমি।

বাবুর্চিখানারই এক কোণের একটা টেবলে আমাকে খেতে দিয়েছিল রাম বাবুর্চি। চমৎকার রান্না। বাড়িতে উড়ে ঠাকুর রাঁধে, মুসুরীব ডালে যেন তেলাপোকা-তেলাপোকা গন্ধ বেরোয়। আর রাম বাবুর্চি ভালো রেঁধেছে, সে যেন মনে হচ্ছে কী একটা অনাস্বাদিতপূর্ব পদ খাচ্ছি।

খেতে খেতে হঠাৎ সিগারেটের উগ্র গন্ধ নাকে এল।

চমকে তাকিয়ে দেখি, সাহেব এসে বাবুর্চিখানার দরজায় দাঁড়িয়েছেন।

এক পলক আমার থালার দিকে চেয়ে থেকে বললেন, মেহবুব্, টিকলুবাবুকে আর একটু মাংস দে। মাংস কি তোদের কম পড়েছে?

তারপর বললেন, তোদের জন্য রেখেছিস তো? দেখি হাঁড়ি।

বলেই, নিজেই সটান বাবুর্চিখানায় ঢুকে হাঁড়ি পরীক্ষা করে খুশি হয়ে বললেন, ঠিক আছে। এখন থেকে টিকলুবাবুই বাড়ির ম্যানেজার।

প্রথম-প্রথম ওঁকে একটু দেখিয়ে-শুনিয়ে দিবি—ওঁর কথা মেনে চলবি তোরা। কোনো ঝামেলা যেন না হয়।

তারপর বললেন, ভালো করে খাও। তুমি বড় রোগা টিকলু। স্বাস্থ্য ভালো করো। এখানের জল-হাওয়াও ভালো। খাও-দাও-খাটো—দেখবে দুদিনে চেহারা ফিরে যাবে।

বলেই, সাহেব চলে গেলেন আবার অফিসে। এরপর নাকি উনি এগ্রিকালচারাল ফার্মে যাবেন, একটা খুব বড় মজা-পুকুর নিয়েছেন লিজে, সেই পুকুর কাটা শুরু হবে শীগগির—তার তদারকি করে আসবেন একবার।

সব কাজই করে অন্যরা, সাহেব শুধু তদারকি করেন আর ডিসিশান নেন।

এতদিনে বোধগম্য হল কী করে টাটা কী বিড়লা কী আই-সি-আই কোম্পানি বাণিজ্য করে। সবই একটা লোক করলে কেউই জীবনে বড় হতে পারে না। না, খাটলেও না। ঠিকমতো লোক খুঁজে নিয়ে যার যার হাতে তার তার দাঁড় বুঝিয়ে দিয়ে নিজে হাল ধরে বসে থাকতে হয় শুধু। তবেই জীবনের জলে সাফল্যর নৌকা চলে তর্‌তর্ করে।

খাওয়া-দাওয়ার পর একটা সিগারেট ধরিয়ে বাবুর্চিখানার পেছনের পথ দিয়ে কোয়ার্টারে গিয়ে পৌঁছলাম। বারান্দায় একটা ইজিচেয়ার ছিল—তাতে পা-তুলে বসলাম। কেন—জানি না, এখানে এসে অবধি এই সমস্ত ব্যাপার-স্যাপার দেখে ভারী ভালো লাগছে। এ জীবনে আমরা কেউই যে ফালতু নই, ইচ্ছা থাকলে, কল্পনাশক্তি থাকলে এবং তা বাস্তবে রূপায়িত করার জেদ থাকলে আমরা সকলেই যে কিছু-না-কিছু করতে পারি জীবনে কম বেশি, এ কথাটা বোধহয় এখানে না এলে এমন করে বুঝতে পারতাম না।

সাহেব কলকাতায় এক বিরাট অফিসে পাঁচ হাজারী চাকরি করেন। শশীর কাছে শুনেছি অ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসেবে সাহেবের কলকাতার মহলে রীতিমতো নাম আছে। অতবড় দায়িত্বশীল কাজ করেও অবসর সময়ে এতবড় একটা দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার করা, শুধু তাই-ই নয়, এটা লাভজনকভাবে চালানো, এত লোক্‌কে চাকরি দিয়ে, প্রভাইড করে; যে-সে কথা নয়।

হু-হু করে হাওয়া আসছে টিগ্‌রীয়া পাহাড়ের দিক থেকে। হাওয়াটা যেন এক্সপ্রেস ট্রেনের সঙ্গে

পাল্লা দিয়ে বইছে। সঙ্গে বয়ে আনছে শুকনো পাতা, লাল ধুলো, খড়কুটো, পাহাড়ের, মহুয়ার, সাঁওতালি মেয়ের গায়ের গন্ধ। এই হাওয়ায় বসে থাকতে-থাকতে চোখ-মুখ শুকিয়ে ওঠে, ঠোঁট ফেটে যায়, কিন্তু কেমন নেশা-নেশা লাগে।

রাতে ভালো ঘুম হয়নি, ঘুম ঘুম পাচ্ছিল; কিন্তু তবুও এই নতুন চাকরি এবং আমার মালিকের আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব, এবং রুখু হাওয়াটা আমার ঘুম চুরি করে নিয়েছে। বুঝতে পারছি আমি, ভ্যাগাবন্ড ছেলেটা, যে রোজ দুপুরে কোলবালিশ জড়িয়ে ধরে তিন ঘণ্টা ঘুমোত কলকাতায়—সে আর কখনও দুপুরে ঘুমোব না।

আরেকটা সিগারেট শেষ করলাম, এমন সময় দেখি দূর থেকে ভজনবাবু আসছেন।

আমাকে দেখেই বললেন, কী মশাই? কেমন বুঝছেন?

ফারসট্ ক্লাশ। আমি বললাম।

তারপর শুধোলাম, এই দুপুরবেলায় কোথায় চললেন?

কোথায় আবার? আমার পুষ্যিদের দেখতে। এখন কার তেষ্টা পেল না পেল দেখতে হবে, জল খাওয়াতে হবে, এই গরমের দুপুরের কষ্ট কার কতটুকু কী করে কমানো যায়, তার তদ্‌বির তদারকি করতে হবে।

তারপর বললেন, আসবেন নাকি? চলুন আমার পুষ্যিদের দেখিয়ে আনি।

উঠে পড়ে বললাম, চলুন।

একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, খাবেন? বাজে সিগারেট।

নাঃ। ভজনবাবু বললেন। ভূষিমাল আমার চলে না। এসব বিষ। সন্ধেবেলা কাজকর্ম সেরে কুঁয়োর ঠান্ডা জলে চান করে এক বোতল মৃতসঞ্জীবনী সুরা পান করি।

আমি বললাম, সেটা কী? কবিরাজী ওষুধ? ডাবর কোম্পানির? না সাধনা ঔষধালয়ের?

ভজনবাবু বললেন, না না মশায় লি-অ-এস্।

অবাক হয়ে শুধোলাম, সেটা আবার কী?

লিকার অব্-দ্য-সয়েল। মহুয়া।

বলেই হাসলেন।

ভজনবাবুর সঙ্গে চিড়িয়াখানার দিকে হাঁটতে হাঁটতে বললাম, আপনারা সকলেই কি এখানে সেটল্ড্। ক'ভাই আপনারা?

উনি বললেন, না, না। আমি একাই এখানে সেটল্ড্ কী আনসেটল্ড্ যাই-ই বলুন। আমাদের দেশ জয়নগর-মজিলপুর। মোয়া খেয়েছেন? জয়নগরের মোয়া?

বললাম, নিশ্চয়ই।

সেই। আমি সেই মোয়ার দেশের লোক। আমরা তিন ভাই এক বোন। ভজন, পূজন, সাধন। বোনের নাম আরাধনা।

আমি বললাম, এ তো রবিঠাকুরের কবিতা।

উনি বললেন, আজ্ঞে।

তারপর বললেন, ওয়াইফের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে। ফ্যামিলি প্ল্যানিং কমপ্লিট করব তিন ছেলেমেয়ে দিয়ে। রবিঠাকুরের কবিতাও কমপ্লিট করে দেব। তিন ছেলের অথবা মেয়ের নাম রাখব; সমস্ত, থাক, এবং পড়ে।

আমি হেসে উঠলাম। বললাম, চমৎকার।

আঁজ্ঞে, ইয়েস্। বলেই, এক টিপ বড় নস্যি নিলেন।

ভজনবাবু বললেন, আমার সব কিছুই চমৎকার।

ভজনবাবুর সঙ্গে চিড়িয়াখানায় ঢুকলাম।

দুপাশে সারি সারি ঘর। তাতে নানারকম পাখি আর জানোয়ার। ভজনবাবু চেনাতে চেনাতে চললেন।

একটা সাঁওতালী মেয়ে পশু-পাখিদের জল দিচ্ছিল। ভজনবাবু ডাকলেন, ফুলমনি—।

ফুলমনি বলে মিষ্টি ছিপছিপে মেয়েটি বলল, কী বলছিস রে বাবু?

একটু বেশি করে জল দাও মা। তোমরা আমাদের পিয়াসী রাখো রাখো, বাঁদর পাখিদের বেলা তো একটু হাত খুলতে পারো।

ফুলমণি কথাটা বুঝল না, তবে বুঝল যে তাকে নিয়ে রসিকতা করা হচ্ছে।

বলল, ইয়ার্কি করিস কেনে রে সবসময়?

ভজনবাবু বললেন, এই বাবু নতুন। আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট।

পরক্ষণেই বললেন, গোরুর গাড়ির হেডলাইট।

আমি শুধোলাম, এতগুলো বাঁদর কেন?

ভজনবাবু বললেন, মানুষের মতো দেখতে হলেই যেমন মানুষ হয় না, বাঁদরের মতো দেখতে হলেই বাঁদর হয় না। বুঝেছেন মশায়। এই যে সামনে দেখছেন.........

আমি বললাম, ভজনদা, আর 'আপনি' চালাবেন না, 'তুমি' করেই বলুন।

বেশ। তথাস্তু—কিন্তু তোমার নামটা যেন কী?

টিকলু।

টিকলু কথার কোনো মানে আছে? না প্রপার নাউন?

প্র ।ার নাউন।

তবে তোমার একটা নাম দেওয়া যাবে।

ভালো। আমি বললাম, বউ-রানি ত ইতিমধ্যেই নাম দিয়েছেন পাতিকাক।

আমার নাম দাঁড়কাক। আমি জানি। ভজনদা বললেন।

জানেন?

আমি অবাক গলায় শুধোলাম।

তারপরেই ভজনদা আবার বললেন, এই যে সামনে দেখছ, এটা আফ্রিকান গিব্বন্—তার পাশের খাঁচায়—এটা উল্লুক—বাঁদর নয়।

আমি অবাক গলায় বললাম, ওঃ ওটা উল্লুক?

ভজনদা বললেন, ইয়েস্।

ডালহাউসি স্কোয়ারে চোখ খুলে চললে দেখবে অনেক উল্লুক প্যান্ট-হাওয়াই শার্ট পরে চলে যাচ্ছে।

তারপর বললেন, তার পাশের খাঁচায় দিশী বাঁদর।

পরক্ষণেই ভজনদা বললেন, এই বাঁদরটা ভারী অসভ্য। এমন করে দু'পা ফাঁক করে কোনো মহিলার বসা উচিত? এ শালীকেও একটা নাইটি বানিয়ে দিতে হবে সাহেবকে বলে! আচ্ছা তুমিই বল? যত লজ্জা কি মহিলাদেরই? আমরা ব্যাটাছেলেরা কি লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে বসে আছি?

তারপর বললেন, ওই দ্যাখো, তার ওপাশের ঘরে লায়ন-টেইলড্ বাঁদর, তার পাশের ঘরে স্টাম্পড্-টেইল বাঁদর। বাঁদরে-বাঁদরে একাকার।

পাখিরা যেদিকে আছে সেদিকে গিয়ে চোখ জুড়িয়ে গেল কতরকম রঙ-বেরঙের ম্যাকাও, প্যারাকিট্, ফোজেন্ট, ক্যানারী, বদ্রী, কাকাতুয়া যে তার ইয়ত্তা নেই।

ভজনদা বললেন, প্যারাকিট্ কতরকম হয় জানো?

নাঃ। আমি বললাম।

হয় আরও অনেকরকম। আমাদের কাছে আছে রোজেলা—এগুলো নানা রঙ হয়। রেড-রাম্প—এদের কোমরের কাছটা লাল। কালো ঠোঁট। ব্রুক্—দ্যাখো গা-টা খয়েরি, বুকের কাছটা লাল। আর ওই দ্যাখো কক্লেট্—এগুলো সাদাও হয়, ছাই রঙাও হয়—।

তারপর দম নিয়ে বললেন, এবার চলো ফেজেন্টস্ দেখাই। এগুলো সিয়ামীজ ফায়ার-ব্যাক্—গাটা কালো, পেছনটা লাল। মাদীগুলোর গায়ে খয়েরি ছিট্ ছিট্ হয়। আর ওই দ্যাখো সোনালি ফেজেন্টটা ওদের নাম গোল্ড ফেজেন্ট।

আমি বললাম, ওই কোণায় যে বিরাট বাদামি রঙা কাঠবিড়ালীটা শুয়ে আছে ওটা কি কাঠবিড়ালী?

হ্যাঁ, কাঠবিড়ালী। ওগুলো এর চেয়েও বড় হয়। এদের নাম হিমালয়ান্ স্কুইরেল। উড়িষ্যার গভীর জঙ্গলেও পাওয়া যায় শুনেছি।

কচ্ছপের খাঁচাটার সামনে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে আমি বললাম যে, এতবড় কচ্ছপ? এ তো কলকাতার চিড়িয়াখানাতেও দেখেছি বলে মনে হয় না।

ভজনদা বললেন, এদের বলে, সাউথ ইন্ডিয়ান লায়ন-টর্টয়েস। গায়ের উপর কেমন চৌকো চৌকো সন্দেশের ছাঁচের মতো ছাঁচ দেখেছ?

সবিস্ময়ে আমি বললাম, এই স-ব পশু-পাখির দায়িত্ব আপনার?

ইয়েস্। সব আমার।

শুধু কি তাই? কত যে কমপ্লিকেশান হয় তা কি বলব। এই তো গত সপ্তাহে ক্যানারীর ডিম হবে—ডিম আর বেরোয় না—সে কী গব্ব-যন্ত্রণা—ক্যানারীর যত না কষ্ট, সাহেবের কষ্ট যেন তার চেয়েও বেশি। যেন সাহেবই ছেলে বিয়োবেন এমন করে পেটে হাত দিয়ে আথালি-পাথালি ঘুরে বেড়াচ্ছেন সাহেব। এদিকে পাখিও কষ্টে মারা যায় আর কী! শেষে কলকাতায় ট্রাঙ্ককল হল। ভেট্ এল। ক্যানারীর সিজ্যারিয়ান্-সেকশন অপারেশন হল। তারপর ডিম বেরুল। সাহেব ঠান্ডা হলেন। তারপর বললেন, ঝামেলা কি কম! এই চিড়িয়াখানায় বেঁচে থাকাটাই একটা দারুণ ঝামেলা।

আমি বললাম, আপনি এতসব শিখলেন কী করে?

ইচ্ছা থাকলেই শেখা যায়। সাহেবের সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে দেখে-দেখে শিখলাম।

সাহেবই বা এসব শিখলেন কোথায়? তিনি তো অ্যাকাউন্‌টেন্ট।

ওঁর শখ ছিল, ইচ্ছা ছিল। শখ আর ইচ্ছা থাকলে কিনা শেখা যায়?

চিড়িয়াখানায় ঘুরে বেড়াতে-বেড়াতে কখন যে পাচটা বাজতে চলল খেয়ালই ছিল না।

ভজনদার কাছ থেকে ছুটি নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে এগোলাম।

বাড়ির কাছে পৌঁছেই দেখি, একটি সাঁওতালি মেয়ে পড়ন্ত রোদ্দুরে লন-ঝাঁট দিয়ে উড়ে-পড়া শুকনো পাতা, ফুল, ধুলো সব সরাচ্ছে।

মেয়েটি আমাকে দেখেনি। সে আমার দিকে পাশ ফিরে কোমর বেঁকিয়ে ঝাঁট দিচ্ছিল।

ভারী সুন্দর লাগছিল তার সেই ঝাঁট দেওয়ার ভঙ্গিটি। সুন্দর মরালী গ্রীবা, কাটা-কাটা নাক-মুখ, একটা রঙিন ছাপা শাড়ি পড়েছে. হলুদের মধ্যে লাল ফুল-ফুল, সঙ্গে হলুদ ব্লাউজ, মাথায় হলুদ ফুল গুঁজেছে, তার গায়েব চিকণ কালো রঙে সেই হলুদ-লালের যে কী বাহার খুলেছে তা কী বলব!

আমি বাড়ির কাছে যেতেই ও আমাকে দেখল।

দেখেই এমন করে আমার দিকে তাকাল যে, আমার প্রায় ভিরমি খাওয়ার অবস্থা হল। মনে

হল বুকের মধ্যে চাসনালার দুর্ঘটনা ঘটে গেল। হু-হু করে হৃদয়ে শ্বাসরোধকারী গ্যাসী-জল ঢুকতে লাগল চতুর্দিক থেকে।

আমি ওর দিকে আর না তাকিয়ে সোজা বাড়ির দিকে চললাম।

সাহেব সবে বুদ্ধুর হাত ধরে বেড়াতে বেরিয়েছেন।

সাড়ে ছ'ফিট লম্বা অতবড় সাহেবের পাশে বাঁদরটাকে লিলিপুটের দেশের লোক বলে মনে হচ্ছিল। সাহেবের হাঁটুরও অনেক নীচে ছিল বুদ্ধুর মাথা।

আমাকে দেখেই বললেন, শোনো টিকলু, একটু আগেই ট্রাঙ্ককল এসেছিল। বোম্বেতে আমার একটা কনফারেন্স আছে—কাল সকাল দশটা-পঁয়তাল্লিশের ফ্লাইটে আমায় বোম্বে যেতে হবে। তাই আমি আজ পাঞ্জাব মেলে চলে যাব রাত দুটোয়। পরশু সকালে মিথিলা এক্সপ্রেসে আমার কয়েকজন গেস্ট আসবেন। কলকাতা থেকে। পাঁচজন অ্যাডাল্ট, দুজন বাচ্চা। গোমীয়া থেকে একটি কাপ্‌ল্—তিনটি বাচ্চা। তাঁরা গাড়িতে আসবেন।

তারপর একটু থেমে বললেন, বউ-রানি অবশ্য থাকবেন। যাঁরা আসছেন, তাঁরা আমার বিশেষ বন্ধু। যত্ন-আত্তির ত্রুটি কোরো না কোনো। ভালোই হল, চাকরিতে বহাল হতে-না-হতেই ইন্ডিপেন্ডেন্ট্‌লি কাজ করার সুযোগ এল তোমার।

তারপর বললেন, প্রুভ ইয়োর ওয়ার্থ।

আমি মুখ নীচু করে ছিলাম।

বললাম, চেষ্টা করব।

তারপর বললাম, বুদ্ধুর ত' টি বি হয়েছে আর আপনি ওর সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠতা করছেন, আপনার কিছু হবে না তো?

সাহেব হাসলেন। বললেন, দূর, বাঁদরের টি বি আর মানুষের টি বি এক নয়। কিন্তু টি বি রোগটা অরিজিন্যালি গোরুর থেকে মানুষে এসেছিল। একথা জানো কি?

আমি মাথা নাড়লাম।

মনে মনে বললাম, বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি?

হঠাৎ গম্ভীর মুখে সাহেব বললেন, বুদ্ধুটা আর বেশিদিন বাঁচবে না। মনে হয় ও কিছুদিনের মধ্যেই মারা যাবে। তোমাকে বলে যাই, ও যদি আমার অনুপস্থিতিতে মারা যায়, তাহলে ওকে ওই লাইব্রেরির কাছে জামগাছের নীচে কবর দিও। ওর জন্যে চন্দনকাঠের কফিন তৈরি করা আছে। বাঁদরদের কি ধর্ম জানি না। তাই সাঁওতাল পুরোহিতকে বলে রেখেছি, সে এসে বুদ্ধুর লাস্ট রাইট্‌স্ পারফর্ম করবে।

ওকে কবর দেওয়ার পর থেকে, মালিকে বলবে কবরের উপরে সন্ধেবেলায় ধূপ আর উক্যালিপটাসের পাতা পুড়বে।

তারপর বললেন, আর শোনো, রোজ সকালে একছড়া পাকা কলা দেবে ওর কবরের উপরে।

মনে মনে ভাবলাম, আহা! সাহেবের বাঁদর হলেও এ জন্মের মতো বেঁচে যেতাম।

সাহেব বুদ্ধুর গাল টিপে আদর করে বললেন, এরকম পত্নী-প্রেম আমি মানুষের মধ্যেও দেখিনি। ওর স্ত্রী গোপা খুব সুন্দরী মহিলা ছিল এবং প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বসম্পন্না। প্রেমও ছিল দুজনের ভীষণ। গোপা মারা যেতেই বুদ্ধু খাওয়া-দাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিল—এই টি বি বাধাল স্রেফ না খেয়ে।

ওই জামগাছের নীচেই গোপারও কবর আছে। তার পাশেই যেন বুদ্ধুকে কবর দেওয়া হয়। অবশ্য ভজনকে এ সম্বন্ধে আগেই বলে রেখেছি। তোমাকেও বললাম।

সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছিলাম।

সাহেব বললেন, সব কটা বাড়ি ঠিকমতো ঝাড়পোছ হল কিনা দেখে এসো। টি-হাউসের ভিতরের ঘরের আলো জ্বলছে না। ইলেকট্রিসিয়ান আছেন আমার পার্মানেন্ট স্টাফ। তাঁকে খবর দিয়ে কাল সকালের মধ্যেই ওগুলো ঠিক করে দিও।

তারপর বললেন, আমার সঙ্গে থাকার দরকার নেই এখন তোমার। তুমি বউ-রানির কাছে যাও। উনি ছুটি দিলে তোমার ছুটি। প্রথম দিনেই বেশি খাটুনি করতে হবে না।

বউ-রানির কাছে গিয়ে হাজির হলাম। দেখলাম, বউ-রানি মেঝেতে বসে পান সাজছেন। পাশে একটা রুপোর হাঁস রাখা আছে। এক-একটা পান সাজছেন, আর সেই হাঁসের পেটে ঢোকাচ্ছেন। হাঁসের পেটে ডিমের বদলে পেট-ভর্তি পান হয়ে যাবার পর হাঁসের ডানা খুলে বউ-রানি গোলাপজল ছিটিয়ে দিয়ে হাঁসটাকে সটান ফ্রিজের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন।

এতক্ষণ এমন মনোযোগের সঙ্গে পান সাজছিলেন উনি যে আমার অস্তিত্ব টেরই পাননি।

হঠাৎ মুখ তুলে আমাকে দেখতে পেয়ে বললেন, কী চাও টিকলু!

বললাম, আমি কিছু চাই না। সাহেব বললেন, আপনার কাছে আসতে।

বউ-রানি বললেন, তোমার সাহেবের বাঁদর-পাখির উপর যেটুকু দরদ মানুষের উপরে, আমি—সুদ্ধ; তার ছিটেফোঁটাও নেই। জানো ত, তোমার সাহেবের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়নি।

মানে?

আমি অবাক হয়ে শুধোলাম।

মেমসাহেব বললেন, বিয়ের সময় নাপিত তোমার সাহেবকে মালাটা এগিয়ে দিতে গিয়ে ভুল করে সে নিজেই সেটা আমার গলায় পরিয়ে দিয়েছিল। যে আসল-বর সে কোথায় হারিয়ে গেল—আর সারা জীবন কাটল এই উন্মাদের সঙ্গে।

তারপর একটু থেমে বললেন, আজই তো তোমার প্রথম দিন—রাতেও তো ঘুম হয়নি। প্রথম দিনই কি তোমার সাহেব তোমার পরীক্ষা করেছেন?

তারপর বললেন, যাও এখন আর কী কাজ? রাতে খেয়ে নিয়ে কাল সকালে এসো।

আমি ছুটি পেয়ে বাড়ির হাতার মধ্যে একা-একা পায়চারী করে বেড়াতে লাগলাম। এত বড় কম্পাউন্ড যে বাড়ির মধ্যে ঘুরে বেড়ালেই পায়ে ব্যথা ধরে যায়।

এখন বেলাশেষের ম্লান রোদে টিগ্‌রীয়া পাহাড়টা ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। বেলা পড়ে এল, কিন্তু হাওয়ার বিরাম নেই। হাওযাটা যেন আরও জোর হয়েছে দুপুরের চেয়েও। এখন হাওয়াটা আগুনের মতো গরম। এখনও পাতা-ফুল উড়ে আসছে লাল ধুলোর সঙ্গে মাইলের পর মাইল দূর থেকে।

চিড়িয়াখানা থেকে ময়ুর ডাকছে, ম্যাকাও ডাকছে, সন্ধ্যার আগে সব পাখিরা ডাকাডাকি শুরু করেছে। উল্লুক, উক্-উক্-উক্-উক্ করে উঠল।

ধীরে ধীরে বেলা পড়ে আসতে লাগল। রাধাচূড়া গাছে-গাছে ফুল ছেয়ে আছে। চিড়িয়াখানার কোকিলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে জংলি কোকিল কৃষ্ণচূড়া গাছের মগডালে লালের মধ্যে তার কালো শরীর লুকিয়ে বসে গলা-ফুলিয়ে ডাকছে কুহু-কুহু-কুহু। আহা! এমন ডাক যে, আমার মতো বাউন্ডুলে, ছন্নছাড়া, একলা লোকের বুকের মধ্যেটাও উঁহু-উহু করে ওঠে।

কিছুক্ষণ পায়চারী করার পর আমার কোয়ার্টারে এলাম। কুজো থেকে গড়িয়ে ঠান্ডা জল খেলাম এক গ্লাস। বিকেলে চা খেয়েছি, আর এক কাপ চা হলে বড় ভালো হত! বউদি বাড়িতে আদরে-আদরে আমার মাথাটি খেয়েছে একেবারে।

বারান্দার ইজিচেয়ারে বসে সাত-পাঁচ ভাবছি, উক্যালিপট্যাস গাছের ডালের ফাঁক দিয়ে সবে দ্বাদশীর চাঁদ উঠেছে, এমন সময় মেহবুব্ হঠাৎ ট্রেতে করে চা এনে হাজির।

বলল, মেমসাহেব আপনার জন্যে পাঠিয়ে দিলেন।

দেখি ট্রের উপরে টি-পটে চা, সঙ্গে নোনতা মাঠ্‌রী।

বউ-রানিকে মনে মনে কি যে ধন্যবাদ দিলাম, তা আমিই জানি।

বউ-রানি যেন আমার মায়ের মতো, মনের কথা না বলতেই বুঝে ফেলেন।

চা খেতে খেতে অন্ধকার হয়ে এল। কাছেই কোথাও হাসনুহানা ফুটেছে। কী সুন্দর গন্ধ। হাওয়ার সঙ্গে ঝলক্ ঝলক্, মহুয়ার গন্ধও আসছে।

ইজিচেয়ারে বসে সেই অন্ধকারের হাওয়ার শব্দটা সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ বলে মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন কোন অচেনা সমুদ্রের পারে চাঁদ ওঠা বালিয়াড়িতে বসে আছি আমি। একা একা বসে হাওয়ার সঙ্গে চাঁদের সঙ্গে, ফুলের গন্ধের সঙ্গে, নিরুচ্চারে কত কী কথা বলছি।

এমন সময় হঠাৎ আমারই সমবয়সি একটি ছেলে কাঁকরের উপর চটিতে কির্‌কির্ শব্দ তুলে বারান্দায় এসে উঠল।

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম।

ভদ্রলোক বললেন, বসুন মশাই, বসুন। আমি কি আর সাহেব যে আমাকে এত সম্মান করতে হবে?

আমি তখনও দাঁড়িয়েই বললাম, আপনি?

ভদ্রলোক বারান্দার আলসেতে বসে পড়ে বললেন, আমার নাম নবীন রায়, আমি চিড়িয়াখানার গ্রিন-হাউসের দেখাশোনা করি।

তারপর বলল, গ্রিন-হাউস দেখেছেন?

আমি বললাম, না তো!

নবীনবাবু বললেন, ঠিক আছে, সব দেখবেন। তাড়া কীসের?

তারপরই বললেন, এখন ছুটি?

হ্যাঁ। আমি বললাম।

নবীনবাবু বললেন, চলুন একটু বেড়িয়ে আসি।

তারপরই বললেন, কাল থেকে শালার সাইকেলটার টায়ারটা পাথর লেগে চিরে রয়েছে—। চলুন হেঁটেই যাই।

কোথায়?

আরে চলুনই না!

নবীনবাবুর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে গেটে এলাম।

দারোয়ান আমাদের ছেড়ে দিল স্টাফ বলে।

দেখলাম, দারোয়ানের সঙ্গে নবীনবাবুর বেশ সদ্ভাব।

নবীনবাবু গেট পেরোতে-পেরোতে বললেন, কেয়া? লায়গা রামস্বরূপ।

লাইয়ে একঠো।

আমি শুধোলাম, কী?

নবীনবাবু হাসলেন। বললেন, মহুয়া।

বেশ অনেকক্ষণ জ্যোৎস্নালোকিত পথে ধুলো মাড়িয়ে, গাছ-গাছালির পাতায়-পাতায়, ঝরনা ঝরানো হাওয়ায় ভেসে চললাম আমরা। দুপাশে চন্দ্রালোকিত লাল মাটির ধু-ধু টাঁড়, খোওয়াই;

ক্বচিৎ শাল ও মহুয়া। পথের পাশের একটা বাড়িতে নাম-না-জানা লতায় ফুল ধরেছে। পথের সে জায়গাটা গন্ধে ম ম করছে।

বেশ অনেকক্ষণ হেঁটে যাওয়ার পর আমরা একটা জায়গায় এসে পৌঁছলাম।

দূর থেকেই মনে হল যে, এটা একটা ভাঁটিখানা।

নবীনবাবু চোখ নাচিয়ে শুধোলেন, চলে?

আমি বললাম, না, নবীনবাবু।

নবীনবাবু বললেন, সে কি মশায়? কলকাতার ছেলে এসব চলে না কীরকম?

লজ্জিত মুখে বললাম, চলে না মানে, কোনোদিনও চলেনি তাই।

ডোবালেন মশাই। নবীনবাবু বললেন।

তারপর স্বগতোক্তির মতো বললেন, সারাজীবন কি আমাকে ভজনদার সাগরেদ হয়েই কাটাতে হবে নাকি।

ভাঁটিখানায় আলো জ্বলছিল হারিকেনের। শালকাঠের খুঁটি দেওয়া মাটির বাড়ি, নিরিবিলি শাল গাছের নীচে। চারধারে শালপাতার দোনা-ছড়ানো-ছিটোনো ছিল। কিছু মেয়ে-পুরুষ ভাঁটিখানার সামনে ও ভিতরে, দাঁড়িয়ে-বসে ছিল। একটা অলস, মন্থর, পরিবেশে সমস্ত জায়গাটিতে।

আমি শুধোলাম, জায়গাটার নাম কী?

মিরিডি! নবীনবাবু বললেন।

বললাম, আচ্ছা এখানের বেশিরভাগ জায়গায় নামের শেষে এমন 'ডি' কেন? এই 'ডি'র কোনো মানে আছে?

নবীনবাবু হাসলেন। বললেন, 'ডি' হচ্ছে 'ডিহ্'। ডিহ্ হল সাঁওতালি ভাষায় বাড়ি বা গ্রাম।

এমন সময় ভাঁটিখানার ভেতর থেকে জড়ানো-গলায় কে যেন হঠাৎ বাংলায় গান গেয়ে উঠলেন,

"শ্যামা মা যে আমার কালো
কালো রূপে দিগম্বরী;
হৃদি পদ্ম করে যে আলো রে—
শ্যামা মা যে আমার কালো।"

নবীনবাবু খরগোসের মতো কান খাড়া করে শুনলেন এক মুহূর্ত, তারপরই বললেন, ভজনদা।

বলতে-না-বলতেই ভজনদা বাইরে বেরিয়ে এলেন, হাতে মহুয়ার বোতল নিয়ে।

আমাকে দেখেই বললেন, এ কী! হাউস-কীপিং ম্যানেজার হাউসের বাইরে কেন?

আমি উত্তর করার আগেই ভজনদা বললেন, আমিও আজ চলে এলুম। আজ সাহেব মনে বড় দুক্কু দিলেন। সেই দুক্কু ভোলার জন্যেই চলে এলুম।

নবীনবাবু গলা নীচু করে বললেন, মাল খাবে খাবে, তার জন্যে এত দুঃখের দোহাই কেন রে বাবা? মাল কি বাপের পয়সায় খাচ্ছ না শ্বশুরের পয়সায় খাচ্ছ?

আমি বললাম, আহা! বেচারা সত্যিই হয়তো দুঃখ পেয়েছেন কোনো কথায়।

নবীনবাবু বললেন, রাখুন ভজনদার দুঃখ। রোজই উনি দুঃখ পান। কোনোদিন সাহেব দেন, কোনোদিন মেমসাহেব দেন। কোনোদিন বাঁদর, কোনোদিন উল্লুক, কোনোদিন কচ্ছপ—ওঁর দুঃখ পেতেই হবে কারও-না-কারও কাছ থেকে সন্ধেবেলায়।

ভজনদা আমাদের ওভারহিয়ার করে বললেন, কীরে নব্‌নে, আমার সম্বন্ধে টিংকুকে কিছু বলছিস? এখন থেকেই মন বিগড়োচ্ছিস?

তারপরই আমার দিকে বোতলসুদ্ধ হাত তুলে বললেন, এই নব্‌নেটার সঙ্গে মিশো না হে টিংকু।

আমি বললাম, আমার নাম টিকলু!

ওই হল। আমি টিংকুই বলব।

কিন্তু ওই ছোঁড়ার সঙ্গে মিশলে আমি সাহেবকে বলে দেব।

আমি তখন সিরিয়াসলি ভাবছিলাম, কার সঙ্গে মিশব তা ঠিক করার সময় হয়েছে। যা সব স্যাম্পেল্ দেখছি, তাতে বোধহয় বুদ্ধুর সঙ্গে মেশাই সেফ্।

তারপরই নবীনবাবুর দিকে ফিরে বললেন, আজ এলি কেন বাপ? আজ যে তোর পানুই তুই আসার আগেই এক ব্যাটাকে সঙ্গে নিয়ে হেই উদোম টাঁড়ে চলে গেছে। পানুই কি তোর বাঁধা মাগ, না গোয়ালের গাই যে তোর খুঁটোয় দিনরাত শুয়ে-বসে জাবর কাটবে?

তারপর একটা হেঁচকি তুলে, গলায় ঢেউ খেলিয়ে বললেন, বন্‌কে চিঁড়িয়া, বন্‌মে গিয়া।

নবীনবাবু ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, ভজনদা আজ একদম তৈরি।

তারপর বললেন, নাঃ, আজ চলুন ফিরেই যাই। আজ যাত্রা অশুভ। পানুই নেই, তার উপরে ভজনদা একেবারে "হাই"।

আমি বললাম, "হাই" হলে কী করেন উনি?

নবীনবাবু বললেন, উনি কী করেন তার ঠিক কী? অনেক কিছুই করেন। কিন্তু আমার গুরু বলে দিয়েছেন—অন্যে "হাই" হলেই নিজে "লো" হয়ে যাবে। এর চেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ আর নেই।

ভজনদার খ্যানখেনে গলায় গান শুনতে পাচ্ছিলাম—

"এসো প্রিয়া হবে মোর রানি,
তোমার খোঁপায় পরাবো ফুল।
কানে ঝুম্‌কো তারার দুল।।"

ফিরে আসতে আসতে শুধোলাম, পানুইটি কে? যে চিড়িয়াখানায় কাজ করে, সেই মেয়েটি?

হ্যাঁ। নবীনবাবু বললেন।

তারপর বললেন, চালুপুরিয়া।

আমি শুধোলাম, কেন এ কথা বলছেন?

নবীনবাবু বললেন, কি বোঝাই জানি না। মানে, ঠাকুমারা যেমন করে নাতি-পুতি হ্যান্ডেল করে না, ও তেমনি করে অ্যাডাল্ট পুরুষ মানুষ হ্যান্ডেল করে। ঘুঘুর-সই, ঘুঘুর-সই খেলে—

"হাত ঘোরালে নাড়ু পাবে নইলে নাড়ু পাবে না" বলে, কেউ আবার বেশি কান্নাকাটি করলে দুদু খাইয়ে দেয়। এমন ছেলে-ভুলোনো পাড়াজুড়োনো ঘুম-পাড়ানো মাসী-পিসী আর হয় না।

হাওয়ার তেজটা আস্তে আস্তে কমছে। আমরা দুজন পাশাপাশি হাঁটছি। পথটার দুপাশে ছোট-ছোট ঝোপ-ঝাড়। এদিকে গাছপালা কম। জঙ্গল কেটে প্রায় শেষ করে এনেছে। মাঝে মাঝে দুটো একটা হরজাই গাছ—বেশিরভাগই ঝাঁটি-জঙ্গল। বাঁদিকে একটা পুরোনো ইঁটের পাঁজা। কখনও বোধহয় এখানে ইঁট বানানো হয়েছিল।

ইঁটের ভাঁটাটার পাশ দিয়ে যখন যাচ্ছি, হঠাৎ নবীনবাবু আমার হাত ধরে এক হ্যাঁচ্‌কা টান লাগালেন।

আমি একটা ঝটকায় পেছনে চলে এলাম।

চাঁদের আলোয় দেখলাম, আমার পায়ের সামনে দিয়ে একটা কালো মোটা দড়ি আস্তে আস্তে বাঁদিক থেকে ডানদিকে চলে যাচ্ছে।

হঠাৎ নবীনবাবু ক্ষেপে গেলেন। দৌড়ে, বাঁদিকে গিয়ে পাঁজা থেকে একটা ইঁট তুলে নিয়ে সেই

ধীরে অপস্রিয়মাণ দড়িটার পেছন-পেছন দৌড়ে গেলেন যখন, তখনই প্রথম বুঝলাম যে, ওটা একটা সাপ!

আমি স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। সাপ দেখলেই আমার গা ঘিনঘিন করে ওঠে। ছোটবেলা থেকে। শুধু সাপ, কেন? নরম তুলতুলে কোনো কিছু দেখলেই অমন হয়।

নবীনবাবু ততক্ষণে, পথ ছেড়ে মাঠে নেমে গেছেন। যে-সাপ কামড়ায়নি, ফোঁস করেনি, থুথু ছিটোয়নি, নির্বিবাদে পথ দিয়ে চলে গেছে কিছুই না করে—তাকে হঠাৎ তাড়া করে যাওয়ার কী দরকার বুঝলাম না।

একটু পর শক্ত মাটিতে ফটাং ফটাং করে ইঁটের আঘাতের শব্দ শুনে একটু সাহস সঞ্চয় করে এগিয়ে গেলাম ওদিকে।

সবিস্ময়ে দেখলাম, নবীনবাবু উবু হয়ে বসে ইঁটটা দিয়ে সাপটার মাথাটা বাড়ির পর বাড়ি মেরে একেবারে থেঁৎলে দিচ্ছেন।

সাপটা তখনও নড়ছিল।

মাথাটা ঘা মেরে মেরে একেবারে সম্পূর্ণ থেঁৎলে দেওয়ার পর নবীনবাবু প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে উঠলেন।

তারপর হঠাৎ সাপটার লেজ ধরে হাতে ঝুলিয়ে আমার দিকে আসতে লাগলেন।

আমি আতঙ্কিত গলায় শুধোলাম, বিষ আছে? বিষ নেই?

কে জানে?

তাচ্ছিল্যের গলায় নবীনবাবু বললেন।

তারপর বললেন, থাকতেও পারে না-ও থাকতে পারে। আসলে সাপেরা মেয়েদের মতো—। ছোবল না-মারার আগে সব সাপকেই নির্বিষ বলে মনে হয়।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, আপনার আত্মীয়স্বজন কাউকে কি সাপে কামড়িয়েছিল? সাপের উপর আপনার এরকম তীব্র আক্রোশ কেন?

নবীনবাবু সেই চাঁদের আলোয় লাল ধুলোয় ধূসরিত পথে অনেকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থাকলেন—যেন আমার মতো ইনকুইজিটিভ্ লোক এ জন্মে আর দ্বিতীয়টি দেখেননি।

তারপর বললেন, না তা নয়। তবে গুরুবাক্য আমি কখনও অমান্য করি না।

আমি উৎসুক হয়ে শুধোলাম, গুরুবাক্যটা কী?

নবীনবাবু বললেন, "দেকেচো কী মেরেচো!"

তারপর নিজেই আমাকে শুধোলেন, কি? বুঝলেন কিছু?

আমি বললাম, সাপ?

নবীনবাবু হাসলেন।

সেই চাঁদের আলোতেও তাঁর সাদা দাঁত ঝিক্‌ঝিক্ করে উঠল।

শুধু সাপ নয়। দেকেচো কী মেরেচো। ফণী—আর......।

আমি বললাম, থাক থাক। বলতে হবে না। বুঝেছি।

উনি আবার বললেন, আমার গুরু বলেছিলেন।

কথাটার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে এবং হৃদয়ঙ্গম করে সামলে নিতে আমার অনেকক্ষণ সময় লাগল।

ততক্ষণ নবীনবাবু মরা সাপটাকে ডান হাতে নিয়ে এগিয়ে গেছেন। সাপের লেজটা ধরে আছেন, থ্যাঁতলানো মাথাটা মাটিতে সড়সড় শব্দ করে ধুলোর উপরে লম্বা দাগ টেনে দিয়ে চলেছে।

সাপটা বেশ লম্বা আর বড় ছিল।

আমি তাড়াতাড়ি নবীনবাবুর বাঁদিকে চলে গেলাম, মরা সাপকেও বিশ্বাস নেই।

তারপর ওঁর পাশে হাঁটতে হাঁটতে বললাম, গুরুবাক্য তো মানলেন। ফণী তো মারলেন। কিন্তু গুরু কি মরা সাপ হাতে করে নিয়েও যেতে বলেছেন?

নবীনবাবু এবার হেসে ফেললেন।

বললেন, আমার ডান হাত আটকা। একটা সিগারেট ধরিয়ে আমার মুখে পুরে দিন তো?

আমি দাঁড়িয়ে পড়ে, হাওয়া আড়াল করে সিগারেট ধরালাম, তারপর সেই সিগারেট থেকে আরও একটা ধরিয়ে নিয়ে নবীনবাবুকে দিলাম।

নবীনবাবু এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে বাঁ হাতে সিগারেটটাকে মুখ থেকে নামিয়ে বললেন, সাপটি নিয়ে যাচ্ছি চুমকির জন্যে।

সে কে? অবাক হয়ে শুধোলাম আমি।

চুমকির সঙ্গে ভজনদা এখনও আলাপ করিয়ে দেননি? আশ্চর্য।

তারপরেই বললেন, চিড়িয়াখানার পরী, হুরী, সরি—ময়ূরী। সাহেবের গার্ল ফ্রেন্ড। চুমকি সাপ খেতে বড় ভালোবাসে। রোজ রোজ তো ফণী দেখা যায় না; অন্য কিছুও অবশ্য না। তবে যখন দেখা যায়, তখন আমি চুমকির জন্যে। আব............

আমি নবীনবাবুকে তাড়াতাড়ি থামিয়ে দিয়ে বললাম, আর আমি শুনতে চাই না।

নবীনবাবু দাঁড়িয়ে পড়ে আমার মুখের দিকে অপলকে চেয়ে থেকে বললেন, আপনি মশাই একটি মহা ন্যাকা লোক।

আমি ব্লাশ করলাম।

অস্ফুটে বললাম, যা বলেন।

৫

ভোর চারটেয় উঠলাম। তারপর তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিয়ে গেটে এলাম।

ট্রেনটা স্টেশনে পৌঁছয় সকাল পাঁচটার পর পরই। যে-ট্রেনে আমি সাহেবের সঙ্গে এসেছিলাম।

পাণ্ডে ড্রাইভার গাড়ি বের করে তৈরি হয়ে ছিল। যে স্কুটার-টেম্পো চালায়, সেও তার হলুদ-রঙা টেম্পো নিয়ে তৈরি।

যখন আমরা সাড়ে চারটের সময় বেরোলাম গেট খুলে, তখন পুবে সবে একটু লালের ছোপ লেগেছে। কোকিল ডাকছে, টিগ্‌রীয়ার টাঁড় থেকে, দূর কুক্‌রীবাগ গ্রামের দিক থেকে মুহুর্মুহু—কুহু-কুহু-কুহু করে।

ফুর-ফুর করে হাওয়া বইছে ভারী মিষ্টি। এই সাঁওতাল পরগনার বৈশাখী ভোরগুলো ভারী সুন্দর। 'বৈশাখের এই ভোরের হাওয়া' এই গানটা আমার কলকাতার বউদি ভারী ভালো গান।

হঠাৎই গাড়ির সামনের সিটের দরজায় বাঁ হাত রেখে বসে এই আধো-আলো আধো-অন্ধকারে বউদিকে ভীষণ মনে পড়তে লাগল। আমি কাঠখোট্টা মানুষ, ভাব-টাব কবিত্ব-টবিত্ব প্রকাশ করার ক্ষমতা আমার নেই—কিন্তু মাঝে মাঝে বুকের মধ্যে কত কি যে কুরকুর করে উঠে—নিজেকে কুরে কুরে খায়—। একবার ভালো লাগে, পরক্ষণেই দুঃখ লাগে—কারও কথা ভেবে ভীষণ খুশি খুশি লাগে—কাউকে ভালোবাসতে পেরে নিজের পিগ্‌মী সাইজের মনটা অনেক বড় হয়ে গেছে বলে মনে হয়।

বুঝি না। কেন এমন হয়। হয়তো সকলেরই হয়—যদি কেউ কখনও কাউকে ভালোবেসে থাকে। কিন্তু হয়।

ভালোবাসার মতো দাদ ভগবান যেন কাউকে না দেন। খালি চুলকোয়—আর চুলকোলেই চুলকোনি বেড়ে যায়। ঢোল কোম্পানির মলম আছে দাদের। কোনো কোম্পানি এই দারুণ দাদের মলম যে কেন বের করে না জানি না। এই জ্বালা, এই আরাম; এ আর সহ্য হয় না।

স্টেশনে পৌঁছে ওভারব্রিজ পেরিয়ে ওপাশের প্ল্যাটফর্মে গিয়ে দাঁড়ালাম। এমার্জেন্সির পর ট্রেনগুলো এমন টাইমে যাতায়াত আরম্ভ করেছে যে, প্রায়ই মনে হয় নিজের ঘড়ি খারাপ হয়ে গেছে। কাঁটায় কাঁটায় ভোর পাঁচটা ন-মিনিটে ধুঁয়ো উড়িয়ে মিথিলা এক্সপ্রেস এসে ঢুকল স্টেশনে।

ফারস্ট ক্লাশের সামনে জোড় হাতে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি—পবননন্দন যেমন করে রামচন্দ্রকে অভ্যর্থনা করেছিলেন, তেমন করে সাহেবের অতিথিদের আপ্যায়ন করার জন্যে।

আমার চাকরির সেকেন্ড স্পেসিফিক অ্যাসাইনমেন্ট।

ট্রেন থেকে যাঁরা নামলেন তাঁদের চেহারা ও হাবভাব মোটেই প্রকৃতিস্থ বলে মনে হল না। একজন লম্বা-চওড়া। চান্ডিলের বেগুনের মতো গায়ের রঙ, মাথা-মোটা, হুবহু কাৎলা মাছের মতো দেখতে—পায়জামা-পাঞ্জাবি পরা, পায়ে শুঁড়তোলা নাগরা জুতো। সারারাত বোধহয় পান চিবিয়েছিলেন—ঠোঁট দাঁত সব লালে লাল।

আরেকজন বেঁটে-খাটো, ছিপছিপে, কালো। থুত্নীতে একমুঠো ছাগলদাড়ি—তিনি পান খাননি, —কিন্তু তাঁর নীচের ঠোঁটটা এমনিতেই বুলবুলির পশ্চাৎদেশের মতো লাল।

আরেকজন যিনি, তাঁকেই একমাত্র ভদ্রলোকের মতো দেখতে— কাঁধে ঝুলোনো কালো চামড়ার একটি বাক্স। সঙ্গে দুজন মিষ্টি, নেকু নেকু মহিলা ও দুটি বাচ্চা দেখলাম। এঁরা কার-কার স্ত্রী বুঝলাম না।

সাহেবের অতিথিদের ওভারব্রিজ পেরিয়ে প্রশেসান করে এসকর্ট করে নিয়ে যেতে লাগলাম। এঁদের সঙ্গেও লটবহর কম নয়। কাৎলা মাছ ছাড়া আর দুজনের কাঁধেই ভেড়ার ঠ্যাং-এর মতো কী একটা করে চামড়ার যন্তর ঝুলছে। কোনো বাজনা-টাজনা হবে বোধহয়। বড়লোকদের কারবার—আমি কতটুকু আর জানি। তবে এটুকু বুঝলাম ভদ্রলোকদের দেখেশুনে যে চিড়িয়াখানায় আরও কিছু জন্তু-জানোয়ার তিন-চারদিনের জন্যে অতিথি হলেন।

সকলকে গাড়িতে তুলে দিলাম। লটবহর সব গাড়ির ক্যারিয়ারে, বুটে ও স্কুটার-টেম্পোতে এঁটে গেল।

স্টেশন থেকে বেরোতে বেরোতেই রোদ উঠল। সকাল থেকেই যা রোদের তাপ, কলকাতার মাখন-মাখন সুন্দরীরা যে কী গলান গলবেন দুপুরে তা ভেবেই আনন্দ হল।

পাণ্ডে আগে সাহেব মেমসাহেবদের নিয়ে চলে গেল। আমি স্কুটার-টেম্পোতে সাহেবের বন্ধুর ছোটমেয়ের হিসিকরা কাঁথার বান্ডিল, আধ-কামড় দেওয়া সন্দেশের বাক্স, কল-লাগানো গরম কাপড়-জড়ানো রুপোর জলের বোতল এসব সামলাতে সামলাতে পাথর-ছড়ানো পথে হিক্কা তুলতে তুলতে সামনের গাড়ির চাকায়-ওড়া কিলোখানেক ধুলো খেয়ে ব্রেকফাস্ট করে যখন চিড়িয়াখানায় এসে পৌঁছলাম, তখন দেখলাম আসর জমে গেছে।

মেমসাহেব নিজে আমগাছের নীচের গোল শ্বেতপাথরের টেবিলে চা ও খাবার নিয়ে বসে অতিথিদের আপ্যায়ন করছেন।

চা, নোনতা মাঠ্‌রী, রসকদম, চকোলেট, সন্দেশ ইত্যাদি দিয়ে সাহেবের অতিথিরা ব্রেকফাস্ট করছেন।

মুখের ধুলোগুলো নামাবার জন্যে আমি বাবুর্চিখানায় গিয়ে রামকে বলে এক গ্লাস চা নিয়ে তাড়াতাড়ি গিলে ফেললাম।

কাৎলা মাছ ভারী ইন্টারেস্টিং বলে মনে হল। ইতিমধ্যেই গান জুড়ে দিয়েছেন তিনি। রবীন্দ্রসংগীত। রবীন্দ্রনাথের গানের কথা এবং সুরের সঙ্গে সেই রবীন্দ্রসংগীতের কোনো মিল নেই। রবীন্দ্রনাথ ও দীনুঠাকুর যদি চিরদিন মেইন লাইনে গিয়ে থাকেন তো কাৎলা মাছ একেবারে বরাবর কর্ড লাইনে। গলার স্বরটা হাঁড়ির মধ্যে মুখ করে কথা বললে যেমন আওয়াজ হয়, অনেকটা তেমন।

ভাবলাম, চাকরি করতে হলে মানুষের কতরকম অত্যাচারই না সহ্য করতে হয়!

ইতিমধ্যে সেই ছাগল-দাড়ি ভদ্রলোক কাঁধের ভেড়ার ঠ্যাংটা খুলে ফেললেন।

ওমাঃ, বাজনা নয়; দেখি একটা বে-জোড় বন্দুক।

খুলে ফেলেই বন্দুকটা জোড়া লাগিয়ে ফেললেন—লক-স্টক ব্যারেল।

তাহলে সবগুলোই বন্দুক!

মেমসাহেব বললেন, টিকলু, এঁরা সব বিখ্যাত শিকারি। তুমি পাণ্ডের সঙ্গে এঁদের বিকেলে টিগ্‌রীয়া পাহাড়ের নীচে নিয়ে যাবে তিতির মারাবার জন্য। পাণ্ডে জানে, কোথায় তিতির থাকে বিকেলে।

আমি মাথা নাড়লাম।

একটু পরেই একটি নতুন কচি-কলা-পাতা রঙা অ্যামবাসাডর গাড়ি এসে উপস্থিত হল।

তা থেকে ফুটফুটে তিনটি বাচ্চা ও হেমামালিনী ও সিম্মিকে একসঙ্গে ব্রাহ্মীশাক দিয়ে হাঁড়িতে সেদ্ধ করলে যেরকম সৌন্দর্য হয় তেমনই সুন্দরী এক মহিলা বাঁ-দিকের দরজা দিয়ে নেমে ফিক করে হাসলেন। ডানদিকে দেড়খানি গজদন্ত।

তারপরে তাঁর স্বামী নামলেন।

একটা শেতল-পাটিকে গোল করে পাকিয়ে মাটিতে শুইয়ে তার উপর দিয়ে স্টিম-রোলার চালিয়ে দিলে যেমন চ্যাপ্টা, ফ্যাকাশে, লেস্থ-উইদাউট-ব্রেথ একটা ব্যাপার হয়, ভদ্রলোক ঠিক তেমন দেখতে। উনিও হাসলেন। হাসিটাও চ্যাপ্টা দেখালো। এবারে নরক গুলজার।

হঠাৎ মেমসাহেব বললেন, টিকলু, ডেয়ারি আর পোলট্রি থেকে ডিম আর দুধের রিকুইজিশান স্লিপ পাঠিয়ে ওগুলো আনিয়ে নাও। বাজারের লিস্ট আমি করে রেখেছি। পানটা লিখতে ভুলে গেছি। তুমি তিনশো পান আনবে।

ছাগল-দাড়ি আঁৎকে উঠে বললেন, তিনশো পান কে খাবে?

মেমসাহেব একটু হাসলেন। বললেন, এখানে অনেক ছাগলের সমাবেশ—ভাববেন না। দেখতে দেখতে সব পান উড়ে যাবে। আমি ভালো করে পান সাজি তারপর দেখবেন পান কোথায় থাকে।

কাৎলা মাছ সন্দেশ মুখে জবজবে গলায় বললেন, বাঃ বাঃ। আমি একাই আদ্ধেক খাব।

ভাবলাম বলি, রামছাগলে তাই-ই খায়।

আমি চলে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ মেমসাহেব ডেকে বললেন, শোনো আজ আমি এদের নিয়ে থাকব। তুমি ভাই আজ পাঠশালা চালাবে।

আমি মাথা নাড়লাম। আমার মুখটা কেমন দেখাল তা ওঁরাই বলতে পারতেন।

আমার কাজকর্ম শেষ হতে না হতেই, মেমসাহেব তলব করলেন। বললেন, পোড়োরা এসে গেছে, এইবার তুমি ওদের নিয়ে পড়ো।

চিড়িয়াখানা আর গ্রিন্‌ হাউসের মাঝামাঝি একটা বড় চাঁপা গাছের নীচে গোল সিমেন্টের বেদী। তার নীচে গোটা বারো সাত থেকে দশ বছরের বাচ্চা ছেলে জমায়েৎ হয়েছে। সকলেই প্যান্ট শার্ট পরে আছে; সব একরকম। সবুজ রঙের। বুঝলাম, মেমসাহেবেরই দান।

সংস্কৃততে আমি পনেরো পেয়েছিলাম—স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায়। ফলে ফেল করেছিলাম। আমি হিন্দী সিনেমা দেখে হিন্দী একটু বলতে শিখেছি কিন্তু পড়তে পারি না। ছেলেগুলোর সকলের হাতেই দেখলাম হিন্দী অ আ ক খ-র বই।

ছেলেবেলা থেকে একটা সাধ ছিল যে, শান্তিনিকেতনে বাংলার অধ্যাপক হব। আম্রকুঞ্জে, এমনই বৈশাখী ভোরের হাওয়ায় আমি ধুতি-পাঞ্জাবি পরে, কাঁধে পাট করে চাদর ঝুলিয়ে বসব—আমার সামনে গোল হয়ে বসে থাকবে একগুচ্ছ রজনীগন্ধার মতো সুন্দরী, সুরুচিসম্পন্না যুবতীরা, আর আমি তাদের "শেষের কবিতা" পড়াব।

কিন্তু কী অ্যান্টিক্লাইম্যাক্স! আজ সেই বৈশাখী ভোরেই আমি বসে আছি। ফুটন্ত জীবন্ত চাঁপারা নেই—বসে আছি একটা কেঠো কাঁঠালি চাঁপা গাছের নীচে—আর হাতে উলটো করে ধরা একটা হিন্দী বই।

আমি বললাম, বোলো বাচ্চে, অ।

ওরা বলল, ও।

বললাম, বোলো, আ।

ওরা বলল, ইয়া।

বুঝলাম, আমার চাকরিটা থাকবে না।

ইতিমধ্যে মেহবুবকে হন্তদন্ত হয়ে এদিকেই আসতে দেখা গেল।

মেহবুব্ এসে বলল, মেমসাহেব বলেছেন আপনাকে এক্ষুনি বাজার যেতে—আমিই পাঠশালা চালাব এখনকার মতো।

ছেলেগুলো ও মেহবুবের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিঃসংশয় হয়ে আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

বাজার থেকে ফিরতে বেলা হল। রামকে বাজারের জিম্মা ও মেমসাহেবকে পানের জিম্মা দিয়ে আমি চান-টান সারতে আমার কোয়ার্টারের দিকে এগোচ্ছি, এমন সময় ভজনদার সঙ্গে দেখা।

ভজনদা খুব ব্যস্তসমস্ত দেখা গেল।

বললাম, কী ব্যাপার?

আরে, ব্যাপার আবার কী? সাহেব-মেমসাহেবের আর কী? "উঠল বাই তো কটক যাই।" আজ তোমাকে এবং আমাকে ওঁদের তিতির মারতে নিয়ে যেতে হবে বিকেলে। কাল পূর্ণিমার রাতে সুজানী গ্রামে সাঁওতালী নাচের বন্দোবস্ত করতে হবে। কুকবীবাগ, বদলাডি ও সুজানী তিন গ্রামের মেয়ে-মদ্দ জড়ো করতে হবে সুজানীর বড় অশ্বত্থ গাছতলায়। তাদের জন্যে বিস্তর মহুয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে। সেখানে নাচ-গান হবে সারারাত।

তারপর বললেন, আরে অর্ডার দিলেই তো হল না, যে ইন্তেজাম করে, সেই বোঝে কী ঝকমারি!

আমি নার্ভাস হয়ে গিয়ে বললাম, বিকেলে তিতির বেরোবে তো ভজনদা? না বেরোলে?

ভজনদা চটে উঠে বললেন, তিতির কি আমার পুষ্যি, যে আমার কথায় উঠবে-বসবে? তাদের ইচ্ছে হলে বেরোবে, ইচ্ছে না হলে বেরোবে না।

যদি না বেরোয়, তাহলে সাহেবরা কী মারবেন?

ভজনদা রেগে গিয়ে বললেন, না বেরোলে আমরাই পেছন ফিরে দাঁড়াব। আমাদেরই মারবেন। আর কী করতে পারি?

তারপর একটু ঠান্ডা হয়ে বললেন, তুমি চললে কোথায়?

বললাম, চান করতে।

অ্যাই দ্যাখো! একী তোমার কলকাতা নাকি? চান করে নেবে সকাল-সকাল, জল তখন ঠান্ডা

থাকে। এখন চান করা-না করা সমান। একেবারে বিকেলে সাহেবদের তিতির-মিতির মারিয়ে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসে সন্ধের সময় চান করো। এখন চলো আমার সঙ্গে—পোলট্রিতে একটু কাজ আছে—ঘুরে আসি।

কাল এসে পর্যন্ত পোলট্রিটা দেখা হয়নি। ভাবলাম, ভজনদার সঙ্গে দেখে আসি।

অনেক দূর হেঁটে গেলাম রোদে। হঠাৎ দূর থেকে দূরাগত অদ্ভুত একটা আওয়াজ শুনতে পেলাম। আওয়াজটা একটা ঝিমধরা সম্মিলিত কাকলী। ওই গমগমে সমুদ্রের হালকা ঢেউ-ভাঙার আওয়াজের মতো আওয়াজ যে মুরগির আওয়াজ তা অনুমান করার ক্ষমতাও আমার ছিল না।

যতই এগোতে লাগলাম, ততই আওয়াজটা বাড়তে লাগল। একেবারে কাছে যেতে—ভজনদা আমায় কী বলছিলেন তা শুনতে পর্যন্ত পাচ্ছিলাম না।

পোলট্রির সামনে পৌঁছে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আধুনিকতম কায়দায় লাইটরুফ-এর ছাদ দেওয়া মুরগির লম্বা শেডের পর শেড। সমস্ত সাদা ধবধবে লেগ-হর্ন মুরগি! একটা শেডের কোণায় দাঁড়িয়ে দেখলাম, প্রায় কোয়ার্টার মাইল লম্বা মুরগির খাঁচাগুলোর নীচে লাগানো টিনের স্লিপে ডিম গড়িয়ে আসছে আর খাকি হাফপ্যান্ট ও শার্ট পরা তিনটে লোক ক্রমান্বয়ে সেই ডিম কুড়িয়ে নিয়ে চলেছে একটা ঝুড়ির মধ্যে।

ভজনদা আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, ওরা হচ্ছে কালেকটর।

দিনে কত ডিম হয়?

আমি বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে শুধোলাম।

ভজনদা বললেন, এখন গরমের সময়, এখন কম পাই আমরা—তা এখনও প্রায় পনেরো শো থেকে আঠেরো শো হয়। শীতকালে আড়াই থেকে তিন হাজার।

তি-ন-হা-জা-র-? আমি নাভি থেকে শ্বাস টেনে বললাম।

ভজনদা নন-চ্যালান্টলি বললেন, ইয়েস্।

হঠাৎ আমার খেয়াল হল যে, শেডের মধ্যে কেবলই মুরগি। মোরগ নেই একটাতেও।

ব্যাপারটা আমার পশু-পাখির প্রজননবিদ্যা সম্বন্ধে যেটুকু জ্ঞান ছিল, তাতে পরিষ্কার হল না। এই ম্যাজিকটা কী করে সম্ভব হচ্ছে আমার মাথায় ঢুকল না।

ভজনদাকে ভয়ে ভয়ে শুধোতেই উনি আমার দিকে বিস্ময়ের চোখে তাকালেন।

তারপরেই বললেন, ও সরি! তোমার তো বিয়ে-থা হয়নি।

তার পরমুহূর্তেই বললেন, বিয়ে না হলেই বা কী? মেয়েছেলেদের যেমন শীতের সকালে দাড়ি কামাবার কষ্ট ভগবান দেননি তেমন আবার অন্য কিছু কিছু কষ্ট এবং কমপ্লিকেশান ভগবান তাদের দিয়েছেন তা জানো তো? মানে যা পুরুষদের দেননি।

অস্বস্তিতে আমার কান লাল হল।

মুরগিগুলোর দিকে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বললেন, এই মুরগিগুলো মানুষের মেয়েদের চেয়ে অনেক স্বাধীন। এরা মোরগ ছাড়াই, অন্য কারও কোনো কষ্টকর ও ক্লান্তিকর সহযোগিতা ছাড়াই অবলীলায় মা হয়ে যায়। শশীকলা যেমন আকাশে ক্যালেন্ডারের তারিখ মতো বৃদ্ধি পায়, এরাও তেমনি ক্যালেন্ডারের তারিখ মতো ডিম দিয়ে যায় সাহেবকে। সবই সাহেবের কপাল!

তারপর হঠাৎ বলে উঠলেন ভজনদা, ব্যাপারটা কী ইন-হিউম্যান ভেবে দ্যাখো! এরা জীবনের একটা কী ভাইটাল আনন্দ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সাহেবকে ডিম জোগানোর জন্য। মাঝে মাঝে যখন আমার সাহেবের উপর রাগ হয়, তখন আমার খুব বিদ্রোহ করতে ইচ্ছে হয়।

আমি বললাম, কলকাতার কিড স্ট্রীটে একটা অর্গানাইজেশন আছে, তার নাম অ্যানিমাল লাভারস সোসাইটি। তাদের একটা বার্ড লাভিং উইং খুলতে বলে আপনার কেসটা সেখানে পুট-আপ করে দিলে মন্দ হয় না!

ভজনদা অবাক হয়ে বললেন, আছে নাকি? সত্যি!

তারপর ভজনদা, পোলট্রির যিনি ইনচার্জ—সাহেবের পার্টনার—মল্লিকবাবু তাঁর সঙ্গে কীসব কাজের কথাবার্তা বলার পর দূরে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, ওই যে দেখছ ওই শেডটা—ওইখানে এগলেয়িং বার্ডস নয়, টেবল-বার্ডস ডেভেলাপ করা হয়।

মানে? আমি শুধোলাম।

মানে, খাওয়ার মুরগি। মুরগির বেলায় মানুষের মেয়েদের নিয়ম খাটে না। এখানে যে রাঁধে, সে রাঁধেই; যে চুল বাঁধে সে তাই-ই বাঁধে। বুজেচো?

বুঝলাম। আমি বললাম।

একটা লোক ডিম কুড়োচ্ছিল এবং অন্য একটা লোক বালতি করে গুঁড়ো গুঁড়ো কি যেন খাবার এনে মগে করে করে সব ছোট ছোট খোপে দিচ্ছিল।

আমি শুধোলাম, এগুলো ওরা কী খাচ্ছে ভজনদা?

ভজনদা বললেন, একে বলে চিকেন-ফিড। আমরা এখানেই তৈরি করি।

কী দিয়ে তৈরি করেন?

আরে আমি কী ছাই করি! এসব মল্লিক সাহেবের কাজ। পণ্ডিত লোক—মুরগি সম্বন্ধে স্বয়ং ব্রহ্মার চেয়েও বেশি জ্ঞান রাখেন।

বললাম, কী দিয়ে চিকেন-ফিড বানানো হয়, একেবারেই জানেন না?

একটু একটু জানি। ভজনদা বললেন।

বললাম, সেই একটু একটুই বলুন শুনি।

ভজনদা বললেন, ভুট্টার গুঁড়ো, গমের গুঁড়ো, অয়েল রাইস ব্রাণ, বাদাম খোল, ফিশ মিল অর্থাৎ মাছের গুঁড়ো, অস্টার-শেল ক্রাশ, মানে শামুকের খোলের গুঁড়ো, ভিটামিন রুবী মিক্স, পোলট্রি মিনারাল সল্ট্ এই সব মিলিয়ে-টিলিয়ে চিকেন-ফিড্ তৈরি হয় আর কী।

আমি বললাম, এ তো এলাহী কাণ্ড।

ভজনদা বললেন, চার হাজার মুরগি পোষা এবং দিনে আড়াই হাজার ডিম পয়দা করা এবং তার থেকে ফায়দা করাও তো এলাহী কাণ্ড। আমার সাহেব নিজে যেমন সাড়ে ছ'ফুটি, সাহেবের কাণ্ড-মাণ্ডও সব এলাহী।

তারপর ভজনদা পোলট্রির পাশে একটা ছোট্ট পাকা দোতলা বাড়িতে নিয়ে এলেন। এই বাড়িতে পৌঁছবার আগেই চিঁউ চিঁউ শব্দ শুনতে পেলাম।

আমি অবাক হয়ে বললাম, এখানে কী?

ভজনদা বললেন, এখানে সব ডে-ওল্ড চিকস্ রাখা আছে। বোম্বের আরবার-এফারস্ ফার্মের মতো সাহেবেরও ইচ্ছে লেগহর্নের ডে-ওল্ডের চিকের ব্যবসা করার।

দেখলাম একটা কালো অ্যালসেশিয়ান্ কুকুর ঘুরে বেড়াচ্ছে বাড়িটাতে।

আমি শুধোলাম, কুকুরে মুরগির বাচ্চা খেয়ে ফেলে না?

ভজনদা বললেন, এর নাম কী জানো? এর নাম রেখেছেন সাহেব, বিবেক। যাত্রা দেখেছ কখনও? আধুনিক যাত্রা নয়, পুরোনো যাত্রা। যাত্রা-দলে একজন করে বিবেক থাকত। সে মাঝে-মাঝেই এসে একটা করে গান গেয়ে নায়ক-নায়িকার বিবেক জাগিয়ে দিয়ে চলে যেত। বিবেকই তো এই ডে-ওল্ড

চিকস্‌দের শেয়াল, ভাম, সাপ এদের হাত থেকে রক্ষা করে। রক্ষক কখনও ভক্ষক হয়? হয় হয়তো। কিন্তু হওয়া অনুচিত।

একটা বছর বারো-তেরোর সুন্দর ছেলে উলের ব্যাডমিন্টন বলের মতো গোল-গাল হলুদ-হলুদ বাচ্চাগুলোর দেখাশোনা করছিল। খাবার ও জল দিচ্ছিল।

সে ভজনদাকে আতঙ্কিত গলায় বলল, বাবু হিঁয়া বড়্‌কা বড়্‌কা বহত্‌ চুহা আয়া হ্যায়।

ভজনদা বললেন, বলিস কীরে? মল্লিক সাহেবকে খবর দিয়েছিস?

তারপর বললেন, আহা! খুব চিন্তার্‌ কথা। আমিও এক্ষুনি খবর দিচ্ছি।

তারপর তার দিকে ফিরে হঠাৎ বললেন, আরে ও ছোটুয়া, মুরগির বাচ্চা যদি বড়কা বড়কা ছুঁচোয় খেয়ে যায় তাহলে সাহেবের কিছু ক্ষতি হবে—কিন্তু মুরগি আবারও ডিম পাড়বে, ডিম ফুটে আবারও বাচ্চা হবে। কিন্তু তুই তো রাতে এখানেই শুয়ে থাকিস; খুব সাবধানে থাকিস।

ছোটুয়া অবাক হয়ে বলল, কাহে বাবু?

আমিও ভজনদার কথা শুনে অবাক হলাম। ছুঁচোয় তো আর মানুষ খাবে না। মুরগির বাচ্চা খেলেও খেতে পারে।

আমিই ভজনদাকে শুধোলাম, একথা কেন বলছেন ভজনদা?

ভজনদা বললেন, তুমি একেবারে বালখিল্য।

কেন? আমি বোকার মতো শুধোলাম।

ভজনদা গম্ভীর চিন্তান্বিত মুখে বললেন, ছুঁচোয় মানুষের শরীরের সবচেয়ে নরম জায়গা খেতে খুব ভালোবাসে।

ছোটুয়া আতঙ্কিত গলায় বলল, হামারা নাক খা লেগা?

ভজনবাবু বললেন, আরে হতভাগা! নাক গেলে না হয় সাহেব প্ল্যাস্টিক-সার্জারী করে তোর নাক গজিয়ে দেবেন। নাকের চেয়েও নরম জায়গা কি পুরুষের শরীরে নেই? হতভাগা! সে-জায়গা খেয়ে গেলে গেল—চিরদিনের মতোই গেল। পৃথিবীর কোনো দোকানেই স্পেয়ার-পার্টস পাওয়া যাবে না।

ছোটুয়া কথাটার তাৎপর্য ভালো করে হৃদয়ঙ্গম করার আগেই ভজনদা আমার দিকে ফিরে বললেন, টিংকু, তুমিও সাবধানে থেকো—বড়ই চিন্তার বিষয়।

ছোটুয়া অত্যন্ত উত্তেজিত ও বিচলিত হয়ে শুধোলো, তব্‌ বাবু ম্যায় কা করে?

ভজনদা একটু ভেবেই বললেন, তারের জাল দিয়ে একটা জাঙ্গিয়া বানিয়ে নে। আমাকে বললেন, তুমিও একটা বানিয়ে নিও।

তারপরই আমার কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা থেকে উত্তিষ্ঠিত হওয়ার আগেই বললেন, চলো চলো, অনেক বেলা হল। এবার যাওয়া যাক। তুমি তো আবার সাহেবদের খাওয়া-দাওয়ার দেখাশোনা করবে।

৬

তখনও বিকেলের রোদ ছিল। বেশ কড়া রোদ। ভজনদা সাহেবদের বলে রেখেছিলেন যে তিতিরের জায়গায় পৌঁছতে প্রায় কুড়ি মিনিট কী আধঘণ্টা লাগবে। অতএব বেলা থাকতে থাকতে না গেলে তিতির পাওয়া যাবে না।

আমি, ভজনদা, পাণ্ডে ড্রাইভার সব বাংলোর কাছে ঠা ঠা রোদে চারটের থেকে দাঁড়িয়ে আছি।

সাহেবের অতিথিদের সাড়াশব্দ নেই। পাণ্ডে নিজে শিকারি না হলে কী হয় তার উৎসাহ দেখলাম শিকারিদের চেয়েও বেশি। সে কেবলই বলছে, বড়ী দের হো রহা হ্যায়। ইতনা দের করনেসে চিড়িয়া মিলেগা নহী।

ভজনদা দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বললেন, তা আমাকে বলছিস কেন? সাহেবের মেহমানদের ঘুম ভাঙিয়ে কি চাকরিটা খাব?

একটা ঘর থেকে ফোঁ-ফোঁ, ফোঁ-ফোঁৎ করে নাক ডাকার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল।

ভজনদা আঙুল দিয়ে ঘরটা দেখিয়ে আমার দিকে চেয়ে চোখের ভুরুতে নীরব প্রশ্নবোধক চিহ্ন আঁকলেন।

বললেন, এ কোন্ জানোয়ার?

আমি বললাম, ওটা কাৎলা মাছের ঘর।

কাৎলা মাছ?

ভজনদা অবাক হয়ে শুধোলেন।

আমি বললাম, হ্যাঁ। একজন কাৎলা মাছ, একজন ছাগলদাড়ি, একজন শেতল পাটি এবং একজন মাত্র ভদ্রলোক। তিনি ফোটোগ্রাফার।

ভজনদা বললেন, কম্বিনেশনটা দারুণ। তার সঙ্গে দাঁড়কাক পাতিকাক। আজকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারলে হয়।

ঠায় আধঘণ্টা আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম সেখানে। চা পর্যন্ত খাইনি কেউ। কিন্তু বাড়ির মধ্যে যে কেউ জেগেছেন এমন লক্ষণ দেখলাম না কোনো। ওপাশের ঘর দুটো থেকে এয়ার-কন্ডিশনারের মৃদু ঝিরঝির শব্দ ভেসে আসছে শুধু।

প্রায় পৌনে পাঁচটা নাগাদ কাৎলা মাছ হেঁড়ে গলায় চিৎকার করলেন, মেহবুব্, চায়ে......।

ভজনদা বললেন, যাক্ তাও নড়াচড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

সাহেবরা প্রায় সোয়া-পাঁচটা নাগাদ বেরোলেন। তাদের পোশাক-আশাক দেখে আমরা থ'।

ছাগল-দাড়ি এসে অবধি একটা হাফ-প্যান্ট পরেছেন, যেটাকে হাফ-প্যান্ট না বলে সুইমিং ট্রাঙ্ক বলাই ভালো। কোনোক্রমে লজ্জা নিবারণ হয়। উপরে নীলরঙা ব্যাংলনের গেঞ্জি। কাৎলা মাছও এসে অবধি একটা লাল জিনের ফ্লেয়ার গলিয়ে নিয়েছেন, উপরে জিনের লাল শার্ট—দারুণ দেখাচ্ছে। শেতল পাটির পরনে খাকি প্যান্ট, সঙ্গে লাল মোজা, কালো জুতো, গায়ে খালীজ-ফেজেন্টের মতো ছিটছিট খয়েরি জামা। ফোটোগ্রাফার ভদ্রলোকের গায়ে হলুদ ব্যাংলনের গেঞ্জি—টেরিকটের কালো প্যান্ট। সকলের হাতেই গুপী-যন্তর। শুধু কাৎলা মাছের হাত খালি। সকলের চোখ-মুখই দুপুরে জাপানীজ টি-হাউসে বসে বিস্তর বিয়ার পানের পর চোব্য-চোষ্য খেয়ে ও ঘুমিয়ে, ফুলে উঠেছে।

সকলে একে একে গাড়িতে এসে উঠলেন। মেমসাহেবরা এসে তাঁদের আঙুল-নেড়ে সী-অফ্ করে গেলেন। কাৎলা মাছের বউ নেই। থাকার কোনো সম্ভাবনাও নেই বলে মনে হল। এরকম লোককে বিয়ে করে কোন মহিলা জীবনের উপর ট্রাকটর চষবেন?

সামনের সীটে পাণ্ডে, আমি, ভজনদা ও কাৎলা মাছ। পেছনে বাকি তিনজন। কাৎলা মাছ একাই অর্ধেক সীট জুড়ে বসেছেন। আমি, ভজনদা ও পাণ্ডে শুঁটকি মাছের মতো গায়ে গায়ে সেঁটে বসে আছি। পাণ্ডের শরীরটা প্রায় সীটের বাইরে। পশ্চাৎদেশের পাঁচশ গ্রাম মাংস কোনোক্রমে সীটে ঠেকিয়ে সে যে কী করে স্টীয়ারিং ঘোরাচ্ছে, গীয়ার চেঞ্জ করছে! সেই-ই জানে।

বাজারের কাছের ঘড়িঘরের পাশের রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে আমরা দুমকা রোডে পৌঁছলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফাঁকা জায়গায় এসে পড়লাম।

বেশ লাগছে—। গরম হলেও হু-হু শুকনো হাওয়া। মনের মধ্যের সব আর্দ্রতা শুষে নেয়।

যখন আমরা মেন লাইনের লেভেল-ক্রসিং পেরিয়ে টিগ্‌রীয়া পাহাড়ের কোলে এসে পৌঁছলাম তখন তিতিররা প্রত্যেকেই রাতের মতো শোবার বন্দোবস্ত করছে। আলো বিশেষ নেই-ই বলতে গেলে।

কিন্তু এখানের তিতিরদের মধ্যে আত্মহত্যাপ্রবণতা যে এমন বেশি আমার তা জানা ছিল না।

দুপাশে ঝাঁটি জঙ্গল—খোলা টাঁড়—লাল খোওয়াই—।

কাৎলা মাছ স্বগতোক্তি করলেন, খরগোশ, তিতির ও ক্যাজুয়াল লেপার্ডের আইডিয়াল জায়গা।

এমন সময় পাণ্ডে জোরে ব্রেক কষল।

দেখলাম বাঁদিকে পথের পাশেই একটা বড়্‌কা তিতির দাঁড়িয়ে পড়ে মুখ হাঁ-করে কাৎলা মাছকে দেখছে।

মুহূর্তের মধ্যে শেতলপাটি পেছন থেকে গাড়ির জানলা দিয়ে বন্দুকের নল বের করে দেগে দিলেন।

তিতিরটার চোখে কাৎলা মাছের ছবিটা ফিল্‌টারড হয়ে তার ব্রেনে পৌঁছবার আগেই তিতিরটা দু-ঠ্যাং উপরে তুলে উলটে গেল।

প্রায় নল ঠেকিয়েই মারা হয়েছিল। ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়নি এই-ই যথেষ্ট।

পাণ্ডে মুহূর্তের মধ্যে নেমে দৌড়ে গিয়ে তিতিরটা তুলে এনে বুটে রাখল।

গাড়ির মধ্যে কন্‌গ্রাচুলেশানস্‌, গুড শট্‌ ইত্যাদি শোনা গেল।

কাৎলা মাছ উত্তেজনায় ভুরুক্‌-ভুরুক্‌ করে পাইপ খেতে লাগলেন।

পাইপের মধ্যে এত নিকোটিন আর থুথু জমেছে যে, থেলো-হুঁকোর মতো আওয়াজ করছে পাইপটা। লোকটা থ্রোট বা টাঙ্‌ ক্যান্সার হয়ে মরল বলে, মরার আর দেরি নেই; মনে হল আমার।

আর একটু এগিয়ে যেতেই পথের ডানদিকের টাঁড় থেকে দুটো বড় তিতির ভর্‌র্‌র্‌ আওয়াজ করে উঠল।

উড়তেই দেখি, অর্ধ-নগ্ন ছাগল দাড়ি নেমে পড়ে বন্দুকের নল ঘুরিয়ে একবার এদিক আরেকবার ওদিক করে দুটো গুলি করলেন।

উড়ো পাখি দুটোই ঝুপ্‌ ঝুপ্‌ করে পড়ে গেল।

এবার আমারই তারিফ করতে ইচ্ছা হল। শিকারি বটে। ইচ্ছে হল, ছাগল-দাড়ির দাড়িতে চুমু খেয়ে দিই।

পরক্ষণেই ভাবলাম, আমার কপালে চুমু খাওয়ার এ ছাড়া আর কোন জায়গা জুটবে? একটা হীনমন্যতা আমাকে ছেয়ে ফেলল। নিজের বাসনার সুতো মনের লাটাইয়ে গুটিয়ে নিলাম।

পাণ্ডে গিয়ে পাখি দুটোকে আবারও নিয়ে এল।

এখন পরিবেশটা বড় মনোরম হয়ে এল। কুয়াশার মতো সদ্যোজাত নরম অন্ধকার। প্রসন্ন চাঁদটা ইতিমধ্যেই পাহাড়েব গা বেয়ে উঠেছে। পশ্চিমাকাশে সন্ধ্যাতারাটা নীল স্নিগ্ধ শান্ত শরীরে ফুটে উঠেছে।

আমি বাঙালির ছেলে। সাঁওতাল পরগনায় এই-ই প্রথম। ভারী ভালো লাগছে। দুমকার পথটা নরম সবুজ ঝাঁটি-জঙ্গলের আর পাহাড়ের মাঝ দিয়ে গিয়ে সামনেই একটা হঠাৎ বাঁক নিয়েছে। মাঝে মাঝে লাল মাটির খোওয়াই। পূর্ণিমার চাঁদ, সন্ধ্যাতারা, বনের সবুজ আর লাল এবং পিচ-ঢালা পথের কালো মিলে-মিশে একটা দারুণ সুন্দর কম্পোজিশনের সৃষ্টি হয়েছে।

এমন সময় বাঁদিকে প্রায় পঁচিশ-তিরিশ গজ দূরে একটা একলা দার্শনিক তিতিরকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। ভজনদার কাছে শুনেছিলাম যে তিতির সাধারণত দলে থাকে অথবা জোড়ায় থাকে।

মনে হল, এখানের তিতিরগুলোর দাম্পত্যজীবন বিশেষ সুখের নয়। নইলে এরা এমনভাবে এই আধো-অন্ধকারে গুলিখোর হবার অভিপ্রায়ে আত্মহত্যা করার জন্যে একা-একা দাঁড়িয়ে থাকবে কেন?

এবার ফোটোগ্রাফার ভদ্রলোক নামলেন। হাতে বন্দুক নিয়ে।

ভদ্রলোকের শিকারের প্রক্রিয়াটা অদ্ভুত লাগল। উনি গাড়ি থেকে বসেই গুলি করতে পারতেন, তিতিরটা কাছেই ছিল, কিন্তু তা না করে বন্দুকটা বাগিয়ে ধরেই তিনি তিতিরটার পেছনে দৌড় লাগালেন।

তিতিরটা প্রথমে এই চোর-চোর খেলাটা খেলতে চায়নি। অবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

যখন শিকারি তার পাঁচ হাতের মধ্যে দৌড়ে গেলেন, তখন বোধ হয় ওর মনে বেঁচে-থাকার ইচ্ছাটা হঠাৎ জাগরূক হয়ে উঠে থাকবে।

সেও এই অদ্ভুত শিকারির কারবার দেখে ঝেড়ে দৌড় লাগাল।

তিতিরের দৌড় দেখতে ভারী মজার। ওয়াল্ট্-ডিজনীর ছবির হাঁসের মতো দৌড়য় এরা।

তিতিরও দৌড়চ্ছে, হলুদ গেঞ্জিও দৌড়চ্ছেন। বন্দুকের কথা বেমালুম ভুলে গেছেন শিকারি। তাঁর মনে বন্দুকটা হঠাৎ লাঠি হয়ে গেছে বোধ হয়।

দেখতে দেখতে দু মিনিটের মধ্যে শিকারি ও শিকার আমাদের সকলের চোখের সামনে থেকে খোওয়াই-এর মধ্যে জঙ্গলের গভীরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কাৎলা-মাছ, শেতল-পাটি এবং ছাগল-দাড়িকে চিন্তিত দেখাচ্ছিল। চিন্তায় দাঁড়কাকের অবস্থা ঝোড়ো-কাকের মতো হয়ে গেল।

ভজনদা একেবারে গরম দুধে মুড়ির মতো চুপ্‌সে গেলেন। যদি সাহেবের একজন অতিথিকেও এখানে রেখে যেতে হয় তাহলে ভজনদাকেও চাকরি এখানে রেখে চিরদিনের মতো জয়নগর-মজিলপুরে গিয়ে মোয়া খেয়ে বাদবাকি জীবন কাটাতে হবে।

যখন দশ-পনেরো মিনিট হয়ে গেল তখন সাহেবরা সমস্বরে বামাপদ বামাপদ বলে চেঁচাতে লাগলেন। ওঁরা এমন সুরে ও পর্দায় বামাপদকে ডাকছিলেন যে, হঠাৎ আমার মনে হয় "বাল্মিকী প্রতিভা"র বাল্মিকী—"রাঙাপদ, পদযুগে প্রণমি হে বনদেবীদারা" গাইছেন। বামাপদ কথাটাকে হুবহু সেই গানের রাঙাপদ বলে মনে হচ্ছিল।

কিন্তু আসন্ন রাতের জঙ্গল থেকে, পাহাড় থেকে বামাপদর কোনো আওয়াজ শোনা গেল না।

সকলে চিন্তিত হয়ে উঠলেন। নীল ছাগল-দাড়ি ওইদিকে হলুদ-বামাপদকে খুঁজতে গেলেন।

এমন সময় গাড়ির একেবারে গায়ের পাশ থেকে কুঁই কুঁই আওয়াজ শোনা গেল।

আমরা তাকিয়ে দেখি, চারটে তিতির আর তাদের সঙ্গে একপাল একশোগ্রাম ওজনের সুনটুনি মুনটুনি বাচ্চা।

বিনা বাক্যব্যয়ে কাৎলা মাছ শেতল পাটির হাত থেকে বন্দুকটা ছিনিয়ে নিয়ে গদাম্ করে মা-বাচ্চাদের উপর কসাইয়ের মতো দেগে দিলেন। দুটো তিতির পড়ে গেল, দুটো উড়ে গেল; আর বাচ্চাগুলো মিনি লাট্টুর মতো চতুর্দিকে ছড়িয়ে গেল।

শেতলপাটি বললেন, পাকড়ো, পাকড়ো।

আদেশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি, ভজনদা আর পাণ্ডে বাচ্চাগুলোর পেছনে পেছনে দৌড়তে লাগলাম। এবং বারংবার বডি-থ্রো করতে লাগলাম। সে এক হাসির ব্যাপার। দৌড়তে গিয়ে ভজনদা পাথরে হোঁচট খেয়ে আছড়ে পড়লেন। কিন্তু পরক্ষণেই উঠে পড়ে আবার দৌড়লেন।

চাকরি রাখতে যে এমন সার্কাসও করতে হবে তা কোনোদিন ভাবিনি।

যখন আমরা তিনজন ফিরলাম, তখন ভজনদার বুক পকেটের উপর থেকে দুটো বাচ্চা উঁকি মারছিল আর আমার আর পাণ্ডের দু হাতের তেলোর মধ্যে আরও চারটে করে বাচ্চা।

ভজনদা হুংকার ছাড়লেন। খবরদার। সাহেব যদি জানতে পারেন যে, একটা বাচ্চাও মরে গেছে তো সর্বনাশ হবে। এদের যত্ন করে গাড়ির বুটের মধ্যে রাখো।

শেতলপাটি মৃদু ভর্ৎসনা করলেন। বললেন, বাচ্চা সুদ্ধু মারলে?

কাৎলা মাছ লাজুক মুখে বললেন, কী করব বলো? সংযম ব্যাপারটা যে আয়ত্ত হল না জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই।

ইতিমধ্যেই হলুদ-বামাপদ ও নীল ছাগল-দাড়ি এসে হাজির হলেন প্রায় অন্ধকার ফুঁড়ে।

ছাগল-দাড়ি শুধোলেন ভজনবাবুকে, ভজনবাবু এতটুকু-টুকু বাচ্চাদের বাঁচাবেন কী করে?

ভজনদা গর্বিত গলায় বললেন, তাহলে আর এতদিন চিড়িয়াখানার ম্যানেজারি কী করলাম।

কী খাওয়াবেন ওদের? শেতলপাটি প্রশ্ন করলেন।

ভজনদা উত্তর দিলেন, উঁই পোকা, পোস্ত দানা আর জল। দেখবেন, সবকটাকে ঠিক বাঁচিয়ে তুলব।

রাতে তিতির শিকার করে ফিরে আসার পর ছাগল-দাড়ি, শেতলপাটি ও ভদ্রলোকের মেমসাহেবরা মিলে লনে বসে গান-বাজনা করবেন বলে ঠিক করলেন। বউ-রানিও ছিলেন। কাৎলা মাছ যেন কোর্ট জেস্টার। আগের দিনের রাজরাজড়ার বিদূষকের মতো। যাই-ই হোক, সবসময় হেঁড়ে গলায় রসিকতা করে গান করে সকলকে আনন্দ দান করছেন তিনি। তিনি নিজে জানেন না যে, তাঁর চেহারাটাই এমন যে তাঁকে দেখলেই লোকের এমনিই হাসি আসে।

ভাগ্যিস জানেন না।

বউ-রানি বড় ভালো গান গাইলেন। ছেলেবেলায় উনি বেনারসে মানুষ হয়েছিলেন। গজল ও ঠুংরীর গায়কী। ডান হাতের পাঁচখানা আঙুল নাড়িয়ে তিনি যখন গজল গান তখন না-দেখে গহরজান বা মালক্কা-জান বাঈজীদের গায়কীর কথা মনে পড়ে যায়। পড়েছিলাম যে, গহরজান যখন পান খেয়ে পানের পিক গিলতেন তখন নাকি তাঁর ধবধবে ফর্সা গলা দিয়ে পানের পিকের রক্তিমাভাকে নামতে দেখা যেত। মেমসাহেব পান খেয়ে পিক গিললেও বোধ হয় তেমনই দেখা যায়। চাঁদের আলোয় বোঝা যাচ্ছিল না। ভাবলাম, একদিন দিনের আলোয় ভালো করে লক্ষ্য করতে হবে।

শেতলপাটি মেমসাহেব বললেন, আমি তবলা ছাড়া গাইতে পারি না।

অমনি বউ-রানি বললেন, টিকলু, লেডিকেনিকে ডাকো।

আমি না বুঝে বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম।

বউ-রানি বুঝতে পেরে বললেন, সরি। লালমোহনকে।

আমি আরও অবাক হয়ে বললাম, যিনি বাঁশের কাজ করেন?

নীলমোহনবাবু?

হ্যাঁ।

আমি আর সময় নষ্ট না করে নীলমোহনবাবুকে ডাকতে চললাম।

দাঁড়িয়ে পড়ে যে ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভাবব, তারও সময় নেই। চলতে চলতেই ভাবতে লাগলাম। কিন্তু ভেবেও বাঁশের মিস্ত্রির সঙ্গে তবলার কী সম্পর্ক বুঝতে পারলাম না।

নীলমোহনবাবু তাঁর কোয়ার্টার্সের সামনে একটা চৌপাইয়ের উপর লুঙ্গি পরে আসন-পিঁড়ি হয়ে উত্তরমুখো বসে ঠাকুরের নাম করছিলেন।

ওঁকে বললাম, আপনাকে বউ-রানি ডাকছেন।

উনি ঠাকুরের নাম থামিয়ে কিছুক্ষণ আমার দিকে স্থিরনেত্রে তাকিয়ে থাকলেন।

তারপর হঠাৎ বললেন, গান-বাজনার আসর বসেছে বুঝি?

আজ্ঞে। আমি বললাম।

নীলমোহনবাবু আমায় বললেন, একটু ভেতরে আসুন।

ওঁর কোয়ার্টার্সে ঢুকেই উনি একজোড়া পেতলের তবলা দেখিয়ে আমাকে বললেন, উঠিয়ে নিন।

আমি বাঁয়াটার কান ধরে তুললাম। উনি তবলাটার কান।

তারপরই পাশের ঘরের কাকে যেন ডাকলেন নীলমোহনবাবু, ছোটুয়া বলে।

ওঘরে গিয়ে দেখলাম, একটি বছর বারো-তেরোর ছেলে ভেক-কুম্ভস্য আসনে উবু হয়ে বসে দুহাত দিয়ে কাঁসার থালাতে আটা মাখছে—রুটি বানাবে বলে।

সে চমকে উঠে বলল, ক্যা হুয়া?

নীলমোহনবাবু বললেন, কুচ্ছু হুয়া নেই; আভি হোয়েগা।

তারপরই আমাকে হতবাক করে দিয়ে দারুণ হিন্দিতে বললেন, "তুমহারা বাঁশিটা লেকে আভ্‌ভি হামারা ল্যাজ্‌মে ল্যাজ্‌মে আও।"

ছোটুয়া তার দু'হাতের আঙুলের লেগে থাকা ভিজে আটাব দিকে তাকাল।

নীলমোহনবাবু বললেন, সময় নেহী হ্যায়, যেইসা হ্যায়, অইসাই আও।

তারপর আমরা শোভাযাত্রা করে লনের দিকে এগোতে লাগলাম।

নীলমোহনবাবু দৈর্ঘ্যে চার ফিট দশ ইঞ্চি, ব্যাসে তিন ফিট। গায়ের রঙ কুচকুচে কালো, তার উপর একটা খয়েরি-রঙা লুঙ্গি ও হাতকাটা গেঞ্জি পরেছেন। তাও খয়েরি। উনি আমার সামনে সামনে হেঁটে যাচ্ছিলেন।

মনে হল, বউ-রানি লেডিকেনি নামকরণটা নেহাত খারাপ করেননি।

পরক্ষণেই মনে হল, আমার চেহারাটাও কি তাহলে হুবহু পাতিকাকের মতো? আজই রাতে কোয়ার্টারে গিয়ে আয়নায় ভালো করে দেখতে হবে নিজেকে। আত্মদর্শন করতে হবে।

আমরা যখন গিয়ে পৌঁছলাম, তখন বউ-রানি বললেন, বাঃ, ছোটুয়াও এসেছ?

ছোটুয়ার হাতের ভিজে-আটা তখন পুরো শুকিয়ে গিয়ে হাত দিয়ে চষি বেরোচ্ছে। ইমিডিয়েট্‌লি চষি-পিঠে করা যায়।

ছোটুয়া আড়ষ্ট হাত তুলে সেলাম ঠুকে বলল, জী হাঁ মেমসাব।

বউ-রানি শেতলপাটির মেমসাহেবের দিকে তাকালেন। তাঁর নাম ততক্ষণে জানা গেল, লিচি।

পরে ওভার-হিয়ার করে জেনেছিলাম যে, তাঁদের বাড়ি নাকি মুজাফ্‌ফরপুরে। তাই তাঁর দিদিমা মুজাফ্‌ফরপুরের বিখ্যাত লিচুর নামে নাম রাখেন তাঁর। চেহারাটাও লিচু-লিচু। ভালো মানিয়েছে।

মেমসাহেব বললেন, লিচি, সোলো গাইবে না কোরাস?

লিচি লজ্জা লজ্জা গলায় বললেন না, সঙ্গে ছুপ্‌কি ও নিনির গাইতে হবে।

কাৎলা মাছ বিনা রিকোয়েস্টেই বললেন, আমিও গাইব।

কোন্ গান গাওয়া হবে, তাই আলোচনা করে প্রথমে দশ মিনিট কেটে গেল। ততক্ষণে ছোটুয়ার হাতের ভিজে আটা স্টিকিং-প্লাস্টারের মতো তার দুহাতে সেঁটে গেছে।

যখন গান ঠিক হল তখন দেখা গেল লিচি আর নিনি গানটা জানেন, কিন্তু ছুপকি ও কাৎলা মাছ জানেন না। তারপর অনেক ন্যাকামি, এমাঃ, তা হবে না, পারবো না ওরে বাবা রে'র পরে ওঁরা ঠিক করলেন যে, রবীন্দ্রসংগীতই গাইবেন—"পুরানো সেই দিনের কথা শুনবি যদি আয়।"

কাৎলা মাছ বললেন, দেবব্রত বিশ্বাস বড় ভালো গান, এই গানটা।

তারপরে আরও পাঁচ মিনিট গেল "রেডি গেট-সেট গো"-তে।

হঠাৎ আমার বউ-রানি ফোর-ফর্‌টি ইয়ার্ডস্ রেসের স্টার্টার-এর মতো পিস্তলের বিকল্পে পানের সেই রুপোর বটুয়া দিয়ে টেব্‌লে ফটাস করে আওয়াজ করে বললেন, স্টার্ট।

তারপর গান আরম্ভ হল।

লিচি ধরলেন বি-ফ্ল্যাটে, ছুপ্‌কি ও নিনি আরও খাদে আর কাৎলা মাছ বি-ফ্ল্যাটে শুরু করে মুহূর্তের মধ্যে ব্যালিস্টিক মিসিলের মতো চলে গেলেন হারমোনিয়ামের একেবারে শেষ দক্ষিণ প্রান্তে।

সে যে কী কোরাস কী বলব!

এদিকে লেডিকেনি লনের মধ্যে লুঙ্গি পরে হাঁটু-গেড়ে বসে পেতলের তবলায় উড়ন চাঁটি দিয়ে যেতে লাগলেন। এ তবলা-বাঁয়া বোধ হয় বাঁধতে-টাধতে হয় না সেজন্যেই পেতল দিয়ে চামড়া চিরতরে সীল করা আছে।

তবলাটা থেকে অনেকদিনের পুরোনো ব্রংকাইটিসের রুগি যেমন করে কাশে, তেমন একটা ঠং-ঠং আওয়াজ বেরুতে লাগল, আর বাঁয়া থেকে চ্যবনপ্রাশ আর ছাগলাদ্য মিশিয়ে খল-নোড়ায় মকরধ্বজ দিয়ে মারলে যেরকম ঢ্যাবঢেবে আওয়াজ হয় তেমন আওয়াজ।

ছোটুয়া কেষ্ট ঠাকুরের মতো বাঁ পায়ের মধ্যে ডান পাটা সড়াৎ করে ঢুকিয়ে দিয়ে এমন বিপজ্জনকভাবে দাঁড়িয়ে পড়ে বাঁশি তুলল ঠোঁটে যে, আমার মনে হল, এই ঝোড়ো হাওয়ায় যে-কোনো সময়ে ও ছাগল-দাড়ির ঘাড়ে পড়ে যেতে পারে।

ছোটুয়ার বাঁশিটা ও ওর দেশ হাজারীবাগ জেলা থেকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল চাকরিতে বহাল হওয়ার সময়। ওই বাঁশি ওর বাবা হাজারীবাগের জঙ্গলের মধ্যে বাজরার খেতে রাতে বুনো শুয়োর যাতে বাজরা না খায় সেজন্যে মাচার উপরে বসে বসে বাজাত।

যে-বাঁশির সুর ও স্বরের উদ্ভব হয়েছিল, দাঁতাল বুনো শুয়োরদের ভির্‌মি লাগানোর জন্যে সেই বাঁশি 'পুরানো সেই দিনের কথার' প্রতি কী করে জাস্টিস করবে?

এতক্ষণে গায়ক-গায়িকাদের মুড এসে গেছে। একেবারে হইহই ব্যাপার। উত্তেজনায় আমার পা থর্‌থর্ করে কাঁপতে লাগল। আমি আর সহ্য করতে না পেরে লনের মধ্যে বসে পড়লাম।

গায়ক-গায়িকার গলা বিভিন্ন স্কেলে, বিভিন্ন দিকে চলেছে কলকাতার দিকে মেইল, লোকাল, এক্সপ্রেস ট্রেন ও মালগাড়িতে। বাঁশি ছুটেছে টিগরীয়া পাহাড়ের দিকে। তবলা পরেশনাথ পাহাড়ে।

আমার যে কখনও এমন সুপারসনিক বিটোফেনিক অর্কেস্ট্রা শোনার সৌভাগ্য হবে, এ-কথা স্বপ্নেও ভাবিনি।

মনে মনে বললাম, পাগল ভালো করো মা।

৭

সাহেব আজ ভোরের ট্রেনে এলেন।

আমি আর পাণ্ডে ড্রাইভার, স্কুটার-টেম্পো সঙ্গে নিয়ে গেছিলাম।

এবারও সাহেবের সঙ্গে গন্ধমাদন পর্বত। প্রতিবারই চ্যাপটা করে ভাঁজ করা পিজবোর্ডের বাক্স নিয়ে আসেন আর যাবার সময় কুপে ভর্তি করে ডিম নিয়ে যান কলকাতায়। কলকাতায় দাম ভালো পাওয়া যায়—তাই যতটুকু পারেন কলকাতাতেই বিক্রি করেন—বাদবাকি লোক্যালি।

শহরের প্যাঁড়াওয়ালারা দুধ কেনেন সাহেবের ডেয়ারি থেকে। বাজারের হোল্-সেলাররা টেবল-বার্ডস ও ডিম কেনেন।

সাহেব নেমেই আমাকে বললেন, কেমন আছ গজেন?

আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম।

তারপর বললাম, ভালো।

আমার গেস্টরা সব ভালো মুডে? যত্ন-আত্তি করছ তো?

হ্যাঁ স্যার। কাল বিকেলে তিতির মেরেছেন। রাতে লনে গান-বাজনা হয়েছে। তারপর লোডশেডিং হয়েছিল বলে, বাইরের চাঁদের আলোয় লনে বসে ডিনার খেয়েছিলেন!

মেহবুব্ হুইস্কি-টুইস্কি সব দিয়েছিল তো? কোনো অসুবিধা হয়নি তো?

না স্যার।

তারপর ওভারব্রিজ পেরোতে পেরোতে বললেন, তোমার স্টকে কী কী কমে গেছে একটা লিস্ট করে দিও। বুঝলে গজেন।

বললাম, হ্যাঁ স্যার!

সাহেব একটু এগিয়ে যেতেই দেখি পাণ্ডে আমার পাশে এসে আমার মুখে চেয়ে মিটিমিটি হাসছে।

অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, কী ব্যাপার?

পাণ্ডে বলল, ব্যাপার কিছু না, সাহেব নাম ভুলে যান মাঝে মাঝে সকলেরই। তাই আপনাকে গজেন বললেন। দেখবেন, পরে আবার মনে পড়ে যাবে। আমাকেও মাঝে মাঝে দুখীরাম, খাণ্ডেলওয়াল, যোধ সিং এরকম নানা উল্টোপাল্টা নামে ডাকেন।

এ ক'দিনে চিড়িয়াখানার কাণ্ড-কারখানায় অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। এখন আর কিছুতেই অবাক লাগে না।

সাহেব বাড়ি ফিরতেই বাড়ির চেহারা পাল্টে গেল। বোধহয় সবসময়েই পাল্টে যায়।

সাহেব বললেন, ব্রেকফাস্টের পর তুমি আমার সঙ্গে হানিফ সাহেবের বাড়ি যাবে। আমার বন্ধুদের জন্যে একদিন বিরিয়ানি পোলাউ আর গুলহার কাবাবের আয়োজন করতে হবে। বউ-রানি আবার লোকটাকে দেখতে পারেন না। কিন্তু ভদ্রলোক ভাবী ভালো রান্না করেন, বড় শৌখীন লোক, বয়স হয়েছে বিস্তর, কিন্তু এভার ইয়াং।

বললাম, আচ্ছা স্যার।

গেস্টরা সবাই তখনও ঘুমোচ্ছিলেন। রাতে অবশ্য শুয়েছেন সকলে প্রায় দুটো নাগাদ। লনে সকলেই চাঁদের আলোয় ইজিচেয়ারে বসে ছিলেন। লনের সামনের বড় চাঁপা গাছটা থেকে ঝোড়ো হাওয়ায় চাঁপাফুল উড়ে উড়ে লনময় ছড়িয়ে পড়ছিল। চাঁপা ফুলের গন্ধ, মেমসাহেবদের গায়ের বিভিন্ন পারফ্যুমের গন্ধে মিলে-মিশে কেমন নেশা-নেশা লাগছিল।

ভাবছিলাম চাকরিটা টিকে গেলে, বউদিকে একবার আমার কোয়ার্টার্সে এনে দিনকতক রাখব। বউদির শখ ও রুচি আছে। এমন জায়গা বউদি দারুণ অ্যাপ্রিসিয়েট করবে। চাঁপাফুল বউদির দারুণ প্রিয়। কলকাতার রাস্তায় চাঁপাফুলওয়ালার কাছ থেকে কাঠিতে গোঁজা একটা-দুটো চাঁপাফুল কিনে দিয়েছি বউদিকে। বউদি চাঁপাফুল বালিশের নীচে নিয়ে ঘুমোতে ভালোবাসে। এত চাঁপাফুল, মানে চাঁপাফুলের গাল্‌চে-বিছানো আছে দেখলে কী যে করবেন জানি না।

সাহেবের ঘুম বড় কম। লোকটার এনার্জি দেখে অবাক হয়ে যাই। দিনে-রাতে বড়জোর চার-পাঁচ ঘণ্টা ঘুমোন।

সাহেব এসেই এক কাপ চা খেয়ে যে-জামাকাপড় পরে ট্রেনে এসেছিলেন, সেই বাথরুম স্লিপার, মোটা কাপড়ের পায়জামা পাঞ্জাবি পরে বেরিয়ে পড়লেন কাজকর্ম দেখাশোনা করতে। তা কম্পাউন্ডের মধ্যের ডেয়ারি, পোলট্রি, সামান্য চাষবাস দেখাশোনা করলেই প্রায় মাইল খানেকের চক্কর। তারপর

কম্পাউন্ডের বাইরে কো-অপারেটিভ বেসিসে যেসব জায়গায় চাষবাস হবে, পুকুর কাটা হবে, কর্মচারীদের কোয়ার্টার হবে সেই সব দেখাশোনা করলে তো দু মাইলের চক্কর।

চলে যাবার আগে সাহেব শুধোলেন, সাঁওতাল নাচের সব বন্দোবস্ত পাকা আছে তো? ভজনকে জিগ্যেস করেছিলে?

হ্যাঁ সাহেব। কাল দুপুর থেকে তো ভজনদা ওই ব্যাপার নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন।

সাহেব বললেন, ভজনকে বলে দিও যে, আমরা সাড়ে আটটা নাগাদ সুজানী গ্রামের অশ্বত্থ গাছতলায় গিয়ে পৌঁছব। তার আগেই যেন সব বন্দোবস্ত পাকা করে রাখে।

আচ্ছা স্যার। বললাম আমি।

ভিতরে ভিতরে আমারও কম উত্তেজনা হচ্ছিল না। ছেলেবেলা থেকে সাঁওতালি নাচ সম্বন্ধে পড়েছি, শুনেছি। জীবনে এই প্রথম আমিও তা দেখব। তাই বন্দোবস্তে যেন ত্রুটি না হয়, সেজন্যে ভজনদার পেছনে আমিও ছিনে-জোঁকের মতো লেগেছিলাম।

সাহেব চলে যেতেই ভজনদা এলেন।

বললেন সাহেব কই?

আমি বললাম, ডেয়ারির দিকে গেলেন।

বললেন, তুমি তো এসে অবধি ডেয়ারিতে একবারও গেলে না। খুব চাকরি করছ বাছা! চলো আমার সঙ্গে। তোমাকে গোরু ও ষাঁড় চেনাই।

আমি বললাম, এক্ষুনি সাহেবের গেস্টরা উঠে পড়বেন। কার কী প্রয়োজন হয়! এখন আমি যেতে পারব না।

ভজনদা বললেন, তা অবশ্য ঠিক।

তারপর বললেন, সাহেবের যেন প্রত্যেক উইক-এন্ডে গেস্ট না আসলে চলে না। এত বন্ধু যে সাহেবের কবে হল, কী করে হল, তাই-ই ভাবি। আসলে বুঝেছ টিংকু, বন্ধু-ফন্ধু কেউ নয়, সব স্যার এ এম-এর হোটেলে বডি-ফেলে দিব্যি খানা-পিনা করে চলে যায়। এমনিতেই গোদ নিয়ে বেঁচে আছি আমরা। তার উপর প্রতি সপ্তাহে-সপ্তাহে বিষ-ফোঁড়া।

পরক্ষণেই বললেন, আচ্ছা! চললুম তাহলে।

বললাম, আচ্ছা।

ভজনদা চিড়িয়াখানার দিকে চলে গেলেন।

দেখতে দেখতে সাহেবের গেস্টরা ঘুম ভেঙে উঠলেন। বারান্দায় চায়ের আসর বসল। বউ-রানি মুখ-টুখ ধুয়ে যখন বারান্দায় এলেন, তখন আমার সাময়িকভাবে ছুটি মিলল। আমিও বাবুর্চিখানায় গিয়ে আরও এক কাপ চা খেয়ে নিয়ে স্কুটার-টেম্পো চড়ে বাজারে বেরোলাম।

বাজার থেকে ফিরে এলাম ন'টার মধ্যে। এসে দেখি সাহেবও বারান্দায় বসে আছেন। সাহেবের গেস্টদের সব চান-টান হয়ে গেছে। লিচু একটা হলুদ লুঙ্গি পরেছেন। খাসা দেখাচ্ছে। চলমান এক-কাঁদি হলুদ সবরি-কলার মতো।

ব্রেকফাস্ট হয়েছে টিংকু? সাহেব শুধোলেন।

না স্যার। আমি বললাম।

শিগগিরী খেয়ে নাও। চলো, হানিফ সাহেবের বাড়ি যাব।

মেমসাহেবরা সমস্বরে বলে উঠলেন, আমরাও যাব।

চলো। সাহেব বললেন, প্রশ্রয়ের সুরে।

আমি তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট সেরে নিলাম। তারপর শেতল-পাটির গাড়ি ও আমাদের গাড়ি নিয়ে আমরা হানিফ-সাহেবের বাড়ি গেলাম।

বিরাট কম্পাউন্ড। গোলাপের চাষ করেন ভদ্রলোক। বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি। কিন্তু খুব শক্ত-সমর্থ ডাঁশা পেয়ারার মতো চেহারা।

গোলাপের চাষ সাহেবেরও কিছু আছে। নবীন রায় বলছিলেন।

আমরা যেতেই সাহেব সকলের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দিলেন হানিফ সাহেবের। বিরাট সিটিং রুমের একপাশে ফায়ার প্লেস, অন্যপাশে সেলার—আর একপাশে একটা দারুণ রাইটিং টেবল। টেবলটা দেখে বড় লোভ হল। আহা! আমার যদি এমন একটা টেবল থাকত, তবে আমিও হয়তো লেখক হতে পারতাম একদিন ওই টেবলে কাগজ-কলম নিয়ে কসরৎ করতে-করতে।

হানিফ সাহেব মেয়েদের কোকাকোলা, ছেলেদের রাম্ অফার করলেন।

শেতল-পাটি ও আমি মেয়েদের মতো কোকাকোলা খেলাম।

সাহেবরা রাম।

হানিফ সাহেবের গোলাপ বাগানে বাডিং করতে আসত একটি মেয়ে দূরের গ্রাম থেকে। হানিফ সাহেব তাকেই বাডিং করে দিলেন। শেষে বিয়ে করতে হল রীতিমতো ধর্মীয় অনুষ্ঠান-টনুষ্ঠান করে--আমার সাহেবের মধ্যস্থতায়। চারশো টাকা খরচ করে, শ্বশুরকে গোরু-বলদ, ধুতি এবং গাঁয়ের লোককে প্রচুর মহুয়া খাইয়ে। হানিফ সাহেবের বউও ভজনদার স্ত্রীর মতোই ডি অ-স্--ভার্সেটাইল বউ। সকালে বাগানে গোলাপের বাডিং করেন, দুপুরে রান্না-বান্না; বিকেলে বাগানে জল দেওয়া। রাতে তাঁকেই আবার হানিফ সাহেব বাডিং করেন। সিস্টেমটা সম্মানজনক, লিস্ট্ একসপেনসিভ ও অত্যন্ত কনভিনিয়েন্ট।

দেখে শুনে কাৎলা মাছ ক্ষেপে গেলেন যে, তিনিও এখানে একটা বাড়ি করে লাল গোলাপ ফুলের বাডিং ও অন্য ফুলের বাডিং একসঙ্গে চালু করে দেবেন।

কাৎলা মাছের মুখটার কোনো রাখ-ঢাক নেই।

সাহেব আনকমফর্টেবল ফিল করতে লাগলেন, যদিও কথাবার্তা সব ইংরিজিতেই হচ্ছিল কিন্তু পরদার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মিসেস হানিফ, কাৎলা মাছের চোখ-মুখের উত্তেজনা দেখে কিছুটা অনুমান করতে নিশ্চয়ই পারছিলেন।

বিরিয়ানি পোলাও রান্না হবে আগামীকাল রাতে -সঙ্গে গুল্‌হার কাবাব। কতজনের মতো হবে, কখন হবে, সব জেনে নিয়ে সাহেবের নির্দেশানুসারে হানিফ সাহেব আমাকে বুঝিয়ে দিলেন প্রস্তুতি পর্বে কী কী লাগবে। নধর এবং মাঝবয়সি খাসীর শরীরের কোন্ কোন্ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে কতখানি করে মাংস কিনতে হবে কাটিয়ে নিয়ে, কতখানি জাফ্‌রান, গরম মশলা, বড় নৈনিতাল আলু ইত্যাদি ইত্যাদি। গুল্‌হার কাবাবের মাংস সেদ্ধ করার জন্যে পেঁপে, ভাঙা কাপ-ডিস (ভাঙা কাপ-ডিসে নাকি তাড়াতাড়ি মাংস সেদ্ধ হয়) ইত্যাদিরও রিকুইজিশান্ দিলেন। লিস্টের শেষে লিখলেন—এক বোতল রাম্—।

এই ব্যাপারটা আমার জানা ছিল। মামাদের জমিদারিতে যখন যজ্ঞির ঠাকুর আসত—হয়তো পাঁচশো লোকের খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত হচ্ছে কোনো পালা-পার্বণে—তখন বাজারের লিস্টের শেষ আইটেমে থাকতো; "শরীর মেরামতী খাতে"-- দুই টাকা। অর্থাৎ যজ্ঞির ঠাকুরদের আফিং-এর খরচা।

সেইরকম এই হানিফ সাহেবও বডি রিপেয়ারিং-এর জন্য ওষুধের বন্দোবস্ত করে রাখলেন।

ভাবলাম, ষাট বছর বয়সেও এত বাডিং করলে শরীরের দোষ কী?

হানিফ সাহেবের কাছ থেকে আমরা যখন বাড়ি ফিরে এলাম, তখন বউ-রানিকে দেখা গেল না কোথাওই।

সাহেব শুধোতে, মেহবুব বলল, মেমসাহেব স্লিপিং ট্যাবলেট খেয়ে শুয়ে পড়েছেন আর আপনাকে এই চিঠিটা দিয়ে গেছেন।

ছাগল-দাড়ি মুখ কালো করে দাড়ি চুলকে বললেন, বেলা এগারোটায় স্লিপিং ট্যাবলেট খেয়ে শুয়ে পড়ার মানে? কী গো অংশুমান? শেষে কি তোমার বউ আত্মহত্যা-টত্যা করে আমাদের খুনের মামলায় জড়াবে?

সাহেব বললেন, ও কিছু না, ভ্রমরের যে রাগ হয়েছে এটা তার সিমটম। এ নিয়ে তোমরা মাথা ঘামিও না।

সাহেব বাইরের বারান্দাতেই মেমসাহেবের চিঠিটা অ্যাশট্রে চাপা দিয়ে রেখে দিয়েছিলেন, এক নজর চোখ বুলিয়ে।

টি-হাউসে ওঁরা সকলে মিলে বসলেন গিয়ে।

সাহেব বন্ধুদের বললেন, তোমরা গল্প-সল্প করো, ততক্ষণে আমি একটু কাজ সেরে আসি।

নিনি বললেন, আমি যাই ভ্রমর বউদিকে একটু দেখে আসি।

সাহেব বললেন, ওর দু-চারটে স্লিপিং পিলে আজকাল কিছু হয় না। ঠিক লাঞ্চ-টাইমে ঘুম ভেঙে যাবে। এখন ওকে বিরক্ত না করাই সেফ্ সকলের পক্ষে।

বলেই, সাহেব চলে গেলেন।

সাহেব চলে যেতেই ওই চিঠিতে মেমসাহেব কী এমন রাগের কথা লিখলেন জানতে বড় ইচ্ছে গেল। সাহেব আমাকে সকালেই বলেছিলেন যে, বউ-রানি হানিফকে পছন্দ করেন না।

আমি মেহবুবকে টি-হাউসের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে এবং ওঁদের খিদ্‌মদগারী করতে বলে বারান্দায় এসে চিঠিটা উঠিয়ে নিলাম।

চিঠিটা এত সংক্ষিপ্ত ও এমন সাংকেতিক ভাষায় লেখা যে তার মর্মোদ্ধার করা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল।

চিঠিটায় কোনো সম্বোধন অথবা লেখিকার নাম ছিল না। উপরে তারিখ ছিল শুধু, আর লেখা:

"মি: হানিফকে যখন ডেকেছ, তখন তুমিই সমস্ত রাত ধরে রান্না শিখবে। মীর্জা গালিবের প্রেমপত্রর ব্যবস্থা কর। আমার শরীর তখন খারাপ হবে। একশোবার কথা দিয়ে কথা রাখো না।

ঝাঁকিদর্শনে কথা হল না বলে, এতখানি কালি খরচ হল।"

কিছুই না-বুঝতে পেরে চিঠিটা যেমন অ্যাশট্রে চাপা দেওয়া ছিল তেমনই চাপা দিয়ে রেখে আমি কোয়ার্টারের দিকে এগোলাম।

আধাআধি গেছি, এমন সময় চিড়িয়াখানার দিক থেকে একটা প্রচণ্ড ও উত্তেজিত চিৎকার ভেসে এল। "হয়েছে; হয়েছে; হয়েছে রে, হয়েছে।"

কী হয়েছে, বুঝলাম না, কিন্তু প্রচণ্ড উত্তেজনাকর কিছু যে একটা হয়েছে তা বুঝলাম।

চিড়িয়াখানার দিকে দৌড়ে গেলাম।

প্রায় আমার পাশে পাশেই গ্রিন-হাউসের দরজা খুলে হঠাৎ বেরিয়ে নবীন রায়ও দৌড়ে চললেন ওদিকে।

গিয়ে দেখি, মুখে হঠাৎ গরম আলু পড়লে লোকে যেমন এক-ঠ্যাং-এ নাচে, তেমনি করে ভজনদা এক ঠ্যাং-এ লাফিয়ে লাফিয়ে নাচছেন আর চিৎকার করছেন, হয়েছে রে হয়েছে; অবশেষে হয়েছে।

নাচতে নাচতে হঠাৎই নবীনকে দেখতে পেয়েই ভজনদা আরও চেঁচিয়ে উঠে বললেন, নব্‌নে রে নব্‌নে; হয়েছে রে হয়েছে।

যাই হয়ে থাকুক, খারাপ কিছু যে হয়নি তা বুঝলাম।

কিন্তু কী হয়েছে সেটা এখন জানা দরকার।

হঠাৎ নবীনবাবু আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, টিকলুবাবু দৌড়ে যান অফিস ঘরে, সাহেবকে গিয়ে খবর দিন যে হয়েছে।

কী হয়েছে? আমি তাড়াতাড়ি শুধোলাম।

কিন্তু আমার কথার উত্তর কে দেবে?

দেখি, ভজনদা আর নবীন রায়ে জড়াজড়ি করে ঘুরে ঘুরে নাচছেন আর আরও জোরে চিৎকার করছেন, ওরে নব্‌নে হয়েছে, এতদিনে হয়েছে। আর নব্‌নেও সমান উল্লসিত হয়ে বলছেন, ধন্যি তুই ভজনদা, হয়েছে রে হয়েছে।

স্কুলের স্পোর্টস-এর পর এত জোরে আমি আর দৌড়ইনি।

দৌড়ে অফিস ঘরের দিকে যেতে যেতে দেখি সাহেবের গেস্টরাও সকলে পড়ি-কি-মরি করে চিড়িয়াখানার দিকে সেই চিৎকার শুনে দৌড়ে আসছেন।

লিচুর লুঙ্গি খুলে যায় আর কি!

এমন বিপজ্জনকভাবে তিনি দৌড়োচ্ছেন।

ছুটন্ত-আমি যখন বিপরীত দিকে ছুটন্ত-গেস্টদের ডেলিগেশান্‌কে মাঝপথে মিট করলাম, তখন কাৎলা মাছ হাঁফাতে হাঁফাতে দৌড়োতে দৌড়োতে শুধোলেন, কী হয়েছে?

আমি হাত তুলে বললাম, হয়েছে।

ওঁরা ঘাবড়ে গিয়ে জোরে দৌড়লেন।

ওঁদের ঘাবড়ে যেতে দেখে আমিও ঘাবড়ে গিয়ে আরও জোরে দৌড়লাম।

সাহেব টেবলে বসে একটা ফাইলের কাগজ দেখছিলেন।

আমাকে ওইভাবে দৌড়ে ঘরে ঢুকতে দেখেই সাহেব উদ্বেগে ভুরু কুঁচকে বললেন, কী হল গজেন?

আমি বললাম, স্যার হয়েছে।

বলেই, চিড়িয়াখানার দিকে আঙুল দিয়ে দেখালাম।

সাহেব এক লাফে উঠে দাঁড়ালেন। সেই হঠাৎ উঠে দাঁড়ানোতে হালকা অ্যালুমিনিয়ামের চেয়ারটা ফটাস করে উলটে গেল।

সাহেব তক্ষুনি দু-হাত উপরে তুলে তেড়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন অফিস থেকে—দৌড়তে দৌড়তে চেঁচিয়ে বললেন, আসছি, ভজন আসছি।

মনে হল, কাউকে জলে ডুবে যেতে দেখলে বা কারও বাড়ি ডাকাত পড়লে বন্ধুরা যেমনভাবে দৌড়ে যান, তেমনভাবেই যেন উনি দৌড়ে গেলেন।

আমিও পেছন পেছন। ভাবনা বেড়ে গেল।

কিন্তু আমার সাধ্য কী সাড়ে ছ'ফিট সাহেবের ক্যাঙ্গারুর মতো পায়ের সঙ্গে পাল্লা দিই আমি?

আমি আধ-রাস্তা যেতে-না-যেতেই দেখলাম সাহেব পৌঁছে গেছেন ভজনদার কাছে।

আমি যখন পৌঁছলাম, তখন দেখি সাহেব ভজনদার হাতে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন; আর ভজনদার দু'চোখে জল।

সমবেত জনমণ্ডলী নির্বাক, নিস্তব্ধ। ছাগল-দাড়ির দাড়ি উড়ছে না, কাৎলা মাছের মুখ আরও ফাঁক হয়েছে; শেতল-পাটি স্ট্যাচু হয়ে গেছেন।

আমি ফিস্‌ফিস্‌ করে ওঁদের বললাম, কী হয়েছে স্যার?

নিনি আমাকে আরও ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন, ময়ূরীর ডিম হয়েছে। চুমকির।

এরপর আর এক নতুন বিপত্তি হল।

দেখি, খাঁচার দরজা খুলে সাহেব চুমকির ঘরে ঢুকে পড়লেন।

চুমকি তার সদ্যোজাত ঐতিহাসিক ডিম্ব প্রসব করতে যা না উত্তেজনা বোধ করেছিল, প্রসবের পর প্রস্রবিনীর মতো ঘটনা-পরম্পরায় সে হতচকিত হয়ে খাঁচার এক কোনায় গিয়ে চুপ করে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়েছিল। যেন মহা-অন্যায় কিছু করে ফেলেছে। তার সামনে আড়াইশ' গ্রাম ওজনের ডিমটা খাঁচার মধ্যে খড়ের উপর লজ্জায় নীল হয়ে নট নড়ন-চড়ন নট-কিচ্ছু হয়ে পড়েছিল।

খাঁচাটা উচ্চতায় বড়জোর পাঁচ ফিট। সাড়ে ছ'ফিট সাহেব তার মধ্যে কুঁজো হয়ে ঢুকলেন। ঢুকেই বললেন, মা গো। বোস্ মা লক্ষ্মীটি।

শেতল-পাটি হাতের সিগারেটটা উত্তেজনায় ছুঁড়ে ফেলে বললেন ব্যাপারটা কী? এখন কী হবে?

ভজনদা এই অর্বাচীন প্রশ্নে বিরক্ত হয়ে বললেন, আপনারা এবার যান স্যার—এখানে ভীড় করলে বোধহয় চুমকি ডিমে তা দিতে বসবে না।

তারপর একটু থেমে বললেন, আপনারা বোধহয় জানেন না যে, ক্যাপ্টিভিটিতে ময়ূরের বাচ্চা করানো অত্যন্ত কঠিন। আমরা, আপনারা কো-অপারেট করলে, সেই অসাধ্যসাধন করতে পারি।

সাহেবও খাঁচার মধ্যে থেকে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, যাও হে, তোমরা গিয়ে বিয়ার খেয়ে চুমকির ডিম-হওয়া সেলিব্রেট করো।

আমরা ওখান থেকে চলে আসার সময় দেখলাম, চুমকি সুন্দরী গর্বিতা মেয়ের মতো এক-পা এক-পা করে খাঁচাটার চারপাশে ঘুরে ডিমটাকে প্রদক্ষিণ করছে আর সাহেব পেছনে পেছনে—অদ্ভুত ভঙ্গিমায় না-দাঁড়িয়ে, না-বসে তার পেছনে পেছন ঘুরতে ঘুরতে বলছেন, বোসো মা, মা আমার লক্ষ্মী সোনা, তা'য়ে বোসো মা।

সাহেবের বন্ধুরা আগেই চলে এলেন।

নবীনবাবুর সঙ্গে আমি ফিরছিলাম।

গ্রিন-হাউসের পাশে আসতেই নবীনবাবু বললেন, চলুন, আমার গ্রিন-হাউসটা আপনাকে দেখাই। এসে অবধি তা আপনার সময় হল না।

গ্রিন-হাউসের ভিতর ঢুকেই চোখ জুড়িয়ে গেল।

কত রকম যে গাছ আর ফুল আর অর্কিড। মধ্যে একটা জাপানীজ কায়দায় খোঁড়া পুকুরের মতো ছোট্ট পাথর-খোঁড়া জল। তার মধ্যে ফোয়ারা। চারপাশে হেঁটে বেড়াবার জায়গা। আর পথের পাশে পাশে গ্যালারির উপরে টবে সাজিয়ে-রাখা পাতা, অর্কিড, ফুল। গ্রিন-হাউসের ছাদ থেকেও অনেক অর্কিড ঝুলছে। সেই অর্কিডের মাটির টবগুলো সুন্দর রঙ-করা পাট দিয়ে তৈরি শিকে থেকে ঝুলছে। শিকেগুলোতে ফুল তোলা। ফুলগুলো আবার রঙ করা।

এমন একটিও তুচ্ছ জিনিস নেই, যাতে চিন্তা, কল্পনা ও সুরুচির ছাপ নেই। কত মাথা খাটিয়ে, কতদিনের পরিশ্রমে ও কত যত্নে যে এই গ্রিন-হাউসের প্রতিটি টুকরোকে গড়ে তোলা হয়েছে, তা ভেবেই আশ্চর্য হয়ে গেলাম আমি।

আমি স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে নবীনবাবুকে শুধোলাম, ওই যে নানারঙা সুন্দর লতাগুলো, ওগুলোর কী নাম?

কোনগুলো?

ওইগুলো, বলে আঙুল দিয়ে দেখালাম আমি।

নবীনবাবু বললেন, ওগুলো ফিলোডেন-ড্রন—। নানারকম হয় ওগুলো। বাই-কালার হয়, মনো-কালারও হয়। সবুজ। ডেকরেটিভ পাতাগুলো দেখছেন না লতার সঙ্গে। এইগুলোই বিশেষত্ব।

আমি শুধোলাম, ওই যে পানপাতার মতো বড় বড় পাতাওয়ালা লতা, ওগুলো কী?

নবীনবাবুর চোখে-মুখে গর্ব ঝরে পড়ছিল। এত কষ্ট করে, যত্ন করে এগুলো পরিচর্যা করেন, কেউ দেখে তারিফ করলে তবে না আনন্দ!

উনি বললেন, ওগুলোকে বলে অ্যান্থোরিয়াম্। ওরোকুইনাম্ও আছে। সাদা সাদা শিরা বের করা। ডেকরেটিভ।

আমি অবাক গলায় বললাম, এতো বিভিন্ন রকম কচুগাছ রেখেছেন কেন?

নবীনবাবু হাসলেন। বললেন, কচু তো মাটির তলায় হয়। কিন্তু তাদের পাতার বাহারের কি শেষ আছে? আমার এখানেই তো কত রকমের কচু আছে। যেমন দেখুন ওইটা।

আমি বললাম, কোন্টা।

ওই যে ওইটা, বলে বাঁদিকের কোণায় দেখালেন।

বললেন, ওগুলোকে বলে এলোকেশীয়া।

বললাম, বাঃ বেশ বাংলা এলোকেশী-এলোকেশী গন্ধ আছে তো নামটাতে।

নবীনবাবু বললেন, এলোকেশীয়ার মধ্যে আবাব নানারকম ভ্যারাইটি আছে। যেমন সান্ড্রিয়ানা—কালো, ওই দেখুন, তারপর মেটালিকা– একেবারে ব্রোঞ্জের রঙ সান্ড্রিয়ানার কালোর মধ্যে সাদা শিরা আছে।

হঠাৎ চোখ পড়ল ডানদিকে—ছোট ছোট পানপাতার মতো লতা।

আমি শুধোলাম, ওগুলো কী? পান গাছ কি?

নবীনবাবু হেসে বললেন, না ওগুলো এগ্লোনিয়া—ডোয়ার্ফ—পানপাতারই মতো; কিন্তু ডেকরেটিভ।

সব দেখেশুনে রীতিমতো উত্তেজিত বোধ করছিলাম।

নবীনবাবু বললেন, ওই যে ভেলভেটি বড় পাতাগুলোতে সাদা ফুল—নানারঙা পাতায় ছাওয়া—ওইগুলোর নাম বিগোনিয়া রেক্স।

আমি বললাম, কলাপাতার মতো পাতাগুলো কোন্ গাছের?

নবীনবাবু হাসলেন। বললেন ওগুলোকে বলে ডি··ওর্নবিচিয়া। কলাপাতার মতোই ছোট ছোট হয়—অনেক রকম পাতা হয় এদের। এদের মধ্যে একটা বিশেষ ভ্যারাইটির ডাঁটি হয়—তাদের রঙ সাদা। সাদা মানে, একেবারে মার্বল হোয়াইট।

হঠাৎ জলের পাশে একটা এগ্লোনিমা প্ল্যান্টের গায়ে চোখ পড়ল। দেখি একটা ছোট ব্যাঙ হাত-পা ছড়িয়ে তার উপর বসে আছে। গ্রিন-হাউসের উপরের ফাঁক-ফোঁক দিয়ে সূর্যের আলো এসে জলে পড়েছে। পড়ে, সেই আলো প্রতিফলিত হয়ে নানারঙা পাতা ও প্ল্যান্টের উপর, অর্কিডের উপর বিচ্ছুরিত হচ্ছে। সেই আলোর প্রতিফলনে, বিভিন্ন রঙে, জলের ঝিকিমিকিতে পুরো জায়গাটাকে একটা স্বর্গরাজ্য বলে মনে হচ্ছে।

এমন সময়ে হঠাৎ পেছনে গ্রিন-হাউসের দরজা খোলার আওয়াজ শোনা গেল। এবং তার সঙ্গে-সঙ্গে একসঙ্গে অনেক পুরুষ ও নারীকণ্ঠে হাউ লাভ্লি, হাউ সুইট্ ইত্যাদি আওয়াজ।

তাকিয়ে দেখলাম, সাহেবের অতিথিরা।

প্রত্যেকের হাতেই একাধিক ক্যামেরা। স্টিল ক্যামেরা; টেলিফোটো ওয়াইড অ্যাঙ্গেল্ লেন্স লাগানো স্টিল্ ক্যামেরা; মুভি ক্যামেরা—এইট্ মিলিমিটারের।

হঠাৎ ফোটোগ্রাফার বামাপদ ব্যাঙটাকে আবিষ্কার করল। তারপর বেচারা ব্যাঙটার যে কী হেনস্থা হল সে চোখে দেখা যায় না। কে যেন দৌড়ে গিয়ে চেয়ে-চিন্তে কোথা থেকে একটা আয়না জোগাড়

করে আনল। রোদের যেটুকু ফালি গ্রিন-হাউসের মধ্যে এসে পড়েছিল, সেই ফালিতে আয়না ধরে আলোর প্রতিফলন ফেলা হল ব্যাঙটার গায়ে। তিনি মাটিতে থেবড়ে-বসে সেই আয়নাটা ধরে ফোকাস করে থাকলেন। আর চতুর্দিকে ক্যামেরাম্যানরা কখনও শুয়ে, কখনও থেবড়ে বসে, কখনও দাঁড়িয়ে, কখনও হাঁটু গেড়ে বসে কির্-কির্, খুট্-খটাস্, ক্লিক্-ক্লিক্ করে ছবি তুলতে লাগলেন।

পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো কট্‌কটি ব্যাঙ এতবড় ইমপরটেনস্ পেয়েছে বলে মনে হল না আমার।

ভালো করে ফোটো তুলতে গিয়ে কাৎলা মাছ একটা ডিফিওন-বিচিয়ার উপরে হেলান দিয়ে ফেলেছিলেন একটু হলে।

সঙ্গে সঙ্গে নবীনবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, আমার গাছ; আমার গাছ।

ওঁর আর্তনাদ শুনে মনে হল কেউ জুতোসুদ্ধ ওঁর নাকই মাড়িয়ে দিয়েছে বুঝি।

ভাবছিলাম, ভালোবাসা, ডেডিকেশান্ এ সবই একটা অনুপ্রেরণার ব্যাপার। এই চিড়িয়াখানার প্রতিটি লোক সাহেবের সংস্পর্শে এসে এমনই অনুপ্রাণিত হয়েছেন যে সে নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। শুধু টাকার জন্যে কোনো কর্মচারী কখনও এমন করতে পারেন না। ময়ূরের বাচ্চা হলে পাথুরে ভজনদার চোখ-ফেটে আনন্দাশ্রু গড়ায়, নবীনবাবু সাপ মেরে সে সাপ দু'মাইল বয়ে আনেন চুমকি সাপ খেতে ভালোবাসে বলে, গ্রিন-হাউসের গাছ-পাতায় কেউ হাত ছোঁয়ালে মনে হয় কেউ নবীনবাবুর বিষফোঁড়ায় হাত ছোঁওয়াল।

সেই মুহূর্তে বুঝতে পারলাম যে, ভালোবাসা, অনুপ্রেরণা, সৎসঙ্গ, এই ব্যাপারগুলো নিশ্চয়ই খুব ছোঁয়াচে—নইলে সাহেবের কাছ থেকে একজন লোকের মধ্যে এ ব্যাপারগুলো এমনভাবে সংক্রমিত হত না।

৮

সন্ধে সাতটা সাড়ে সাতটা নাগাদ আমি আর ভজনদা, মেহবুবকে সঙ্গে নিয়ে, আইসবক্সে বরফ, সোডা, কোকাকোলা, ফান্টা এবং আলাদা করে হুইস্কি-টুইস্কি নিয়ে আমাদের গাড়িতে সুজানী গ্রামের দিকে রওয়ানা হলাম। অ্যাডভান্স টিম আমরা। গিয়ে সব ইন্তেজাম করে রাখব।

ফুট্‌ফুট্ করছিল জ্যোৎস্না। কুত্‌নীয়া নদীটার বালি চাঁদের আলোতে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল। কুত্‌নীয়া পেরিয়ে টাঁড়ের মধ্যে মধ্যে পায়েচলা সুঁড়িপথ লক্ষ্য করে পাণ্ডে গাড়ি চালাতে লাগল টিগ্‌রীয়া পাহাড়ের কোলের সুজানী গ্রামের উদ্দেশে।

পথে বড় বড় পাথরের চাঁই ছিল। গাড়ি চালাতে রীতিমতো কসরৎ করতে হচ্ছিল।

প্রায় আধঘন্টা লাগল পৌঁছতে। গাড়ি বেশিরভাগই সেকেন্ড কি থার্ড গীয়ারে যাচ্ছিল। দূর থেকে বিরাট অশ্বত্থগাছটা দেখা যাচ্ছিল। চাঁদের আলোয় তার পাতা ঝিলমিল করছিল হাওয়া লেগে। গাছের নীচে অনেক মেয়ে-পুরুষ জমা হয়েছে ইতিমধ্যেই দেখলাম। মাদলে ও কাঁসরে চাঁটি ও কাঠি পড়ছে এলোমেলো। দূর থেকেই তাদের দ্রিম্ দ্রিম্ আওয়াজ কানে আসছিল।

আমরা পৌঁছে গাড়ির বুট খুলে ফোল্ডিং ইজিচেয়ারগুলো নামালাম। চৌপাইও জোগাড় হল। আইস-বক্স নামিয়ে মেহবুবের জিম্মায় দেওয়া হল। আইস-বক্সে জলও ছিল। কোনো সাহেব সোডা দিয়ে হুইস্কি খাবেন, কেউ বা জল দিয়ে। অনুষ্ঠানের কোনো ত্রুটি নেই।

মানুদি, ফুলমণি, ও আরও অনেক মেয়ে, যারা চিড়িয়াখানায় কাজ করে সবাই সেজেগুজে এসেছে। তার মধ্যে পানুই-এর সাজ আজ দেখে কে? পানুই-এর চলায়, তাকানোতে, ইংরিজিতে যাকে আমরা ডিমেন্যুর বা গেইট বলি, তা এমন মাত্রায় ছিল যে তা বলার নয়।

আমার হৃদয়ে আবারও বিস্ফোরণ হল। চাসনালায় আবার দুর্ঘটনা।

আমরা নেমেই গাড়ি ছেড়ে দিলাম। সাহেবরা মেমসাহেবদের সঙ্গে নিয়ে আবার দু-গাড়ি বোঝাই হয়ে আসবেন নাচ দেখতে।

ভজনদা বললেন, আর্মিতে একটা কথা আছে জানো?

কী কথা? আমি শুধোলাম।

ওয়ার্মিং-আপ দ্যা ব্যারেলস্। অবশ্য কথাটা সাহেবদের। তাই বলছি, এসো ভায়া, আসল যাত্রা আরম্ভ হওয়ার আগেই আমরা একটু ওয়ার্মিং আপ করে নিই। এসো, একটু মহুয়া খাবে।

আমি বললাম, আমার ওসব চলে না দাদা। কখনও খাইনি।

ভজনদা বললেন, এই কখনও খাইনি, কখনও করিনি কথাগুলো আমি ঘেন্না করি। ফুলশয্যার রাতে কি খাটের বাজুতে পা-ঝুলিয়ে বসে বউকে বলবে লাল মুখ করে যে, কখনও....। সব জিনিসই কোনো না কোনোদিন আরম্ভ করতে হয়। সুনার দ্যা বেটার। বুজেচো।

আমি বললাম, আমাকে মাপ করুন দাদা।

ভজনবাবু বললেন, ঠিক আছে। তোমার শেয়ারটাও আমিই খাব।

তারপর বললেন, তোমাকে সঙ্গে না এনে নব্‌নেকে আনা উচিত ছিল। আজকে দুজনে মিলে চুমকির ডিম-হওয়াটা সেলিব্রেট করা যেত।

তারপর আবারও বললেন, সাহেব বেছে বেছে সব মেয়েছেলে মার্কা তোমার মতো ব্যাটাছেলে যে কোত্থেকে রিক্রুট করে আনেন, তা সাহেবই জানেন।

সাঁওতাল ছেলেরা ও মেয়েরা ততক্ষণে পুরোপুরি ওয়ার্মড্ হয়ে গেছে সূর্য ডোবার পর থেকে মহুয়া খেয়ে। ছেলেরা হাত ধরে একলাইনে দাঁড়িয়ে একটা গান গাইছিল। ওদের গানের সুরে ঘুম পেয়ে যায়—সুরে ভারী একটা মহুয়ার গন্ধ-ভরা মনোটোনী—সেটাই বুঝি ওদের গানের বিশেষত্ব।

ওরা যে গানটা গাইছিল এগিয়ে-পেছিয়ে সে গানের কথাগুলো এই রকম :

"আইলে না গলে পুতা
আইলে না গলে হো—
কঁহা পাব্‌লো হো পুতা
কানেকা সোনা বা
হামারা গোঙ্গো শাসুর্
যায়্‌সে না তৈসে হো—
হামারা গোঙ্গো শাসুর্
বোড়োরে বিলাত হো...." ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভজনদাকে বললাম, ভজনদা এই গানটার মানে কী?

ভজনদা বললেন, বিরক্ত করোনাত, সবে নেশাটা চড়েছে।

তারপর বললেন, আমি সাঁওতালী ভাষা জানিনা। কয়েকটা কথা ম্যানেজ করতে পারি এই পর্যন্ত।

আমি অবাক হয়ে বললাম সেকি? বউদি সাঁওতালী বলেন, আমি ভেবেছিলাম আপনি বুঝি জানেন।

তারপর অবাক হয়ে শুধোলাম, বউদির সঙ্গে তাহলে কথাবার্তা চালান কী করে?

ভজনদা বললেন, কথাবার্তা যা দু-একটা দরকার হয়, যেমন "এক গ্লাস জল দাও, আর একটু ভাত দাও" এসব শিখে নিয়েছি। এছাড়া কথার দরকার কী? বাদবাকি ত ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দা বডি — সারা পৃথিবীতে একই ভাষা চলে। বে-শাদি করো, তখন জানবে।

কিছুক্ষণ পর তিন-চার মাইল দূর থেকে ফাঁকা ফাঁকা চাঁদের আলো ছম্‌ছম্‌-করা টাঁড়ে দুটো হেডলাইটকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল।

গাড়িগুলো আসছে দেখে আমাদের মধ্যে এবং যারা নাচবে তাদের মধ্যেও সাজ-সাজ রব পড়ে গেল।

পাগলা সাহেব আসছে। পাগলা-সাহেবকে মান্যি-গণ্যি করে না এমন লোক এ তল্লাটে নেই।

সাহেব মেমসাহেবরা এসে পৌঁছতেই, চেয়ারে বসতে না বসতেই যার যার হুইস্কি, মেমসাহেবদের কোকাকোলা, ফান্টা, সব মেহবুব্ হাতে হাতে ধরিয়ে দিল।

এবার মেয়েরা হাতে-হাত রেখে ছেলেদের সামনে মুখোমুখি নাচতে আরম্ভ করল।

এবারে মেয়েরাই গাইতে লাগল। চার লাইনের গানটা—কিন্তু পরে দেখলাম দু'ঘণ্টা ধরে সেই একটাই গান গেয়ে চলল ওরা—অথচ ওই মনোটোনীর মধ্যেই, একঘেয়েমির মধ্যেই ওদের গানের পুরো মজাটা লুকোনো ছিল :

"রাজা চলে সড়কে সড়কে
রানি চলে বিন্ সড়কে—
রাজা হাতে সোনা ছাতা
টুকুরী জো উড়ে গে
রানি হাসে মনে মনে....."

এ গান বোঝার জন্যে ভজনদার হেল্পের দরকার হল না। নিজেই আন্দাজে আন্দাজে বুঝে নিলাম—রাজা পথে পথে চলেছেন, রানি পথ ছেড়ে চলেছেন—রাজার হাতে সোনার ছাতা—হাওয়ায় ছাতা উড়ে গেল। রানি দেখে হাসেন মনে মনে।

জানিনা, মানেটা ঠিক হল কিনা।

শেতল-পাটি হাতে একটি টেপ-রেকর্ডার নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর গানবাজনা, কথাবার্তা সব টেপ করে যাচ্ছেন।

যাত্রা জমল সাহেবরা সব চার-পাঁচটা করে হুইস্কি খাওয়ার পর।

আমার সাহেব—নীলকণ্ঠ—হুইস্কি খেলেও যা, না খেলেও তা—মহাস্থবির—কোনোই চাপল্য নেই—মাথা ঠান্ডা—চোখ সজাগ।

অন্য সাহেবরা যত হুইস্কি খান, ভজনবাবু তত মহুয়া।

পৌনে-এক ঘণ্টা পরে নরক গুলজার হল। মেমসাহেবরা সকলে মেয়েদের হাতে হাত দিয়ে নাচতে আরম্ভ করলেন।

সাহেব আর বউ-রানি ইজিচেয়ারে পাশাপাশি বসে অতিথিদের কাণ্ড দেখতে লাগলেন।

হঠাৎ কাৎলা মাছ ক্ষেপে উঠলেন। আসলে সকালে হানিফ সাহেবের বাড়িতেই ক্ষেপে ছিলেন। এখন গোটা পাঁচ-ছয় হুইস্কি পেটে পড়াতে লিচুকে বললেন, লিচু তুমি পছন্দ করো, এখুনি আমি আমার বউ ঠিক করব।

লিচু মেমসাহেবদের মধ্যে সবচেয়ে সরল আর স্পোর্টিং। তিনি বললেন, আপনি পছন্দ করুন, আমি আলাপ করিয়ে দিচ্ছি।

তারপর পানুইকে দেখিয়ে বললেন, ওই ত' বিউটি-কুইন।

কাৎলা মাছ বললেন, ও বড় বেশি সুন্দরী, তাই আনইনটারেস্টিং।

কাৎলা মাছের কথা শুনে ভক্তি হল আমার।

কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা গেল কাৎলা মাছও মেয়েদের হাত ধরে নাচছেন। সেকী নাচ! একদল

সুন্দরী মেয়ের মধ্যে একটা হিপোপটেমাসকে নীল জিনের ফ্লেয়ার আর লাল জিনের শার্ট পরিয়ে ছেড়ে দিলে যেমন দেখতে হয় তেমন আর কী!

কাৎলা মাছের ফুলমণি আর মানুদিকে পছন্দ হল। নিজেই গিয়ে দুজনকে বললেন, আমাকে বিয়ে করবি?

মানুদি স্ট্রেট মুখের উপর 'না' করে দিল।

বলল, তুই বড় মোটা আছিস।

ফুলমণিও একেবারে গর-রাজি। এমনকি নিমরাজিও নয়।

কাৎলা মাছ ওদের বললেন তোদের সসম্মানে বিয়ে করব, বউয়ের সম্মান দেব, গাই দেব—বলদ দেব, ছেলে হলে ছেলেকে নিজের সাকসেসর বলে স্বীকার করব।

ওরা সাকসেসর-টাকসেসর কখনও শোনেনি।

ঠোঁট উলটে বলল, কিছু লিব্বনা—তোকে বিয়া করবনারে বাবু।

কাৎলা মাছ ফ্রাস্ট্রেটেড্ হয়ে পড়লেন।

ছাগল-দাড়ি আর বামাপদ সমানে ফ্ল্যাশ-লাইট দিয়ে ছবি তুলে যাচ্ছিলেন।

এমন সময় মেয়েরা একটা নতুন গান ধরল।

তার প্রথম লাইনটা ছিল "কোলকাতা-হাবড়া" এইসব।

সেই গান শুরু হতেই ছাগল-দাড়ি হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই, গায়ে আসা-ইস্তক পরে থাকা নীল ব্যাংলনের গেঞ্জিটা খুলে ফেললেন। এমনিতেই ত নিম্নাঙ্গে যা পরেছিলেন তা না পরারই মতো। কেন খুললেন, বুঝলাম না।

হঠাৎ তাঁকে এমনভাবে বস্ত্র-হৃত দেখে কাৎলা মাছের সংগীত প্রতিভা—আট-দশটা হুইস্কির কল্যাণে প্রবলভাবে জাগরূক হল।

তিনি নাচ ছেড়ে গান ধরলেন চৌপাইতে বসে।

এতক্ষণে একটা কাজ করে ফেলেছিলেন কাৎলা মাছ—। ওদের সোজা দোলানী সুরের মেজাজটা ধরে ফেলেছিলেন। আসলে ওঁর উচিত ছিল এমন সব সিম্পল্ টিউনের "কোলকাতা-হাবড়ার" মতো গান শেখা। রবিঠাকুর দীনুঠাকুরের অকল্যাণে উনি কেন যে লাগেন উনিই জানেন।

তাই, যেই কাৎলা মাছের গান শুরু হল অমনি তিনজন মেমসাহেব কাৎলা মাছকে চৌপাই-এর দুপাশে বসে একদম চেপ্টে রাখলেন, পাছে আবারও উঠে গিয়ে কোনো বেলেল্লাপনা করেন।

ছাগল-দাড়ির ডাকনাম কপাল।

কাৎলা মাছ যে স্বভাব-কবি তা এতক্ষণে জানলাম। তিনি এখন ওদের গানের ও বাজনার সঙ্গে সঙ্গে ওই তালে ও লয়ে মিলিয়ে গান শুরু করলেন। স্বরচিত।

শেতল-পাটি টেপ বাগিয়ে ধরলেন সামনে।

কাৎলা মাছ টেনে টেনে গাইতে লাগলেন।

> "কপালবাবু কপালবাবু, তুমি বড় চালাক হয়েছ—ও-ও-ও-ও—
> চালাকেরও বাবা থাকে গ্ন—ও-ও-ও-ও।
> বাবারও বাবা থাকে গ্ন—ও-ও-ও-ও।
> ন্যাংটা হয়ে এসেছ, যেটুকু বা বাকি আছে—
> আমি খুলে লিব্ব গ্ন—ও-ও-ও-ও।"

যাত্রা পুরোপুরি জমে গেল।

এমনি স্বরচিত গান প্যারাগ্রাফের পর প্যারাগ্রাফ চলতে লাগল। ব্যাপারটাতে যারা গাইছিল, নাচছিল

তারা প্রথমটাতে হকচকিয়ে গেলেও পরে সকলেই মজা পেল। এমন মজা পেল যে, ওরা নাচ-গান থামিয়ে সব কাৎলা মাছের ও মেমসাহেবদের সামনে এসে জড়ো হল।

আমার ইচ্ছে হল বলি কাৎলা মাছকে, "বাহা, বাহা, বাহারে, ঘুরে ফিরে, ঘুরে ফিরে।" নেহাত চাকরি যাবার ভয়ে বলা গেল না।

হঠাৎই সকলের খেয়াল হল রাত বারোটা বাজে।

রসভঙ্গ ও সভাভঙ্গ করতে হল।

আসর ভঙ্গ হতেই কাৎলা মাছ দৌড়ে গিয়ে ফুলমণি আর পানুইকে জড়িয়ে ধরে গালে দু-দুটো করে চুমো দিয়ে দিলেন।

বললেন, কাল আসিস কেনে, শাড়ি দিবো তুদের।

আমি ভাবলাম, এবার তীর খেয়ে মরতে হবে।

ভজনদা নার্ভাস। পুরো গ্রামের লোকের চোখের সামনে এমন কাণ্ড।

সাহেবের চোখ দেখে মনে হল সাহেবও নার্ভাস।

ভজনদা তাড়াতাড়ি ওদের মধ্যে গিয়ে পড়ে বললেন, আরে সাহেবরা মজা করতে এসেছে—না হলে কেউ নিজের বউয়ের সামনে ওদের চুমু খায়—দেখছিস না বউগুলোও কেমন হাসছে।

এই অকাট্য যুক্তিতে সকলেই ব্যাপারটাকে স্পোর্টিংলি নিল। কোনো অঘটন ঘটল না শেষ পর্যন্ত। ঘটতে পারত! অবশ্য সাহেবরা যে নির্দোষ মজা করতেই এসেছেন ও তাঁরা সকলেই ওয়েল-মীনিং এ সম্বন্ধে সত্যিই ওদের কারও সন্দেহ থাকার কথা ছিল না।

যাই-ই হোক, যখন সমস্ত গুছিয়ে-গাছিয়ে সাহেবরা ও আমরা গাদাগাদি করে একই সঙ্গে গাড়িতে উঠলাম তখন রাত সাড়ে বারোটা বাজে।

এ আমার কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতা। এই চাঁদনী রাত, ঝাঁকড়া অশ্বত্থগাছ, চাঁদের আলোয় দেখা টিগ্‌রীয়া পাহাড়, সাঁওতালদের নাচ, গান, এই আশ্চর্য উন্মুক্ত নিষ্কলুষ পরিবেশ—এবং লাস্ট বাট নট দ্যা লিস্ট—কাৎলা মাছ—সব মিলিয়ে একটি অভিজ্ঞতার মতো অভিজ্ঞতা।

ফেরার পথে সারা রাস্তা শেতল-পাটি টেপ বাজাতে বাজাতে এলেন।

আমার মনে হল, কাৎলা মাছ এখানে এসে পর্যন্ত একমাত্র এই গানগুলিই সুরে গেয়েছেন।

চাঁদের আলোয় ভরা নিশুতি রাতে টাঁড়ের মধ্যে দিয়ে গাড়িতে আসতে আসতে—সাঁওতালদের নাচ ও গানের ও কাৎলা মাছের গানের টেপ বাজছিল। ভারী ভালো লাগছিল। সকলেই একেবারে খোলা মনে খুব হইচই করলেন।

ভজনদা ও আমার চাকরিটা রইল।

হুইস্কি বা মহুয়া কিছু না খেয়েও ওই পরিবেশের জন্যে আমারও নেশা নেশা, ঘোর ঘোর মনে হচ্ছিল।

বাড়ি পৌঁছলাম যখন সকলে, তখন রাত প্রায় একটা বাজে।

সাহেব বললেন, টিকলু, তোমায় কাল ভোরে স্টেশানে যেতে হবে। মিঃ রায় বলে এক ভদ্রলোক আসবেন। একটু ডেসক্রিপশান্ দিচ্ছি, যাতে চিনতে ভুল না হয়—বয়স ষাটের উপর—বেঁটে—পেট-মোটা—সাদা চুল—পরনে অলিভ গ্রিন মিলিটারির মতো পোশাক। দেখে মনে হবে রিটায়ার্ড জেনারাল। চিনতে ভুল কোরো না। ওঁকে রিসিভ করে নিয়ে আসবে। উনি এগ্রিকালচার, হর্টিকালচার, ডেয়ারি, পোলট্রি, ফিশারি, জন্তু-জানোয়ার ইত্যাদি সব বিষয়ে অথরিটি। খুব সম্ভব ওঁকে এখানে আমার অ্যাডভাইসার করে পার্মানেন্টলি রাখা হবে।

তারপর বললেন, দেখো, ওঁর কোনো কষ্ট না হয়। গাড়ি নিয়ে যেও। আমি উঠে তৈরি হয়ে থাকব ওঁর জন্য। তুমি সোজা আমার কাছে নিয়ে আসবে।

অতিথিদের খাওয়া-দাওয়ার তদারক করলাম। তাঁরা সবাই লনে চাঁদের আলোতে বসেই খেলেন। প্রত্যেকের সামনে মেহবুব আর অশোক ছোট ছোট টেবল লাগিয়ে দিল। সেদিন বাড়িতে রান্না হয়নি। বউ-রানির অর্ডারে শহর থেকে নান আর তন্দুরী চিকেন আনা হয়েছিল। সঙ্গে খাসির রেজালা।

ওঁদের খাওয়া হয়ে গেলে নিজের খাওয়া-দাওয়া শেষ করে কোয়ার্টারে গিয়ে শুতে শুতে রাত সোয়া-দুটো বাজল। বেশি হলে আড়াই ঘণ্টা ঘুমিয়েছিলাম সে রাতে।

অশোককে বলে রেখেছিলাম।

অশোক এসে দরজা ধাক্কা দিয়ে চা দিয়ে গেল। ঠিক সাড়ে চারটের সময়।

অশোক, মেহবুব ওরাও নিশ্চয়ই আড়াই ঘণ্টার বেশি কেউ ঘুমোয়নি। পাণ্ডেও তিন ঘণ্টা ঘুমিয়েছে বেশি হলে। কিন্তু তাতে কারও কোনো অনুযোগ অভিযোগ নেই। সকলেরই হাসি মুখ।

আমি যখন তৈরি হয়ে, পাণ্ডের পাশে সামনের সিটে পৌনে পাঁচটার সময় এসে বসলাম গাড়িতে, তখন আমার এনার্জি দেখে আমি নিজেই চমৎকৃত হয়ে যাচ্ছিলাম। এ ক'দিনেই সাহেবের পাল্লায় পড়ে কর্ত্ত বদলে গেছি। কলকাতায় দুপুরে তিন ঘণ্টা ও রাতে কম করে আট ঘণ্টা ঘুমোতাম, অথচ এখানে এত কম ঘুমিয়েও মেজাজ বা শরীর কিছুই খারাপ লাগছে না। আসলে আস্তে আস্তে বুঝতে শুরু করেছিলাম যে, পুরুষ কাজে থাকলেই বা কিছু একটা নিয়ে থাকলেই সবচেয়ে ভালো থাকে—নইলে তার জীবনীশক্তিতে ভাঙন ধরতে থাকে।

মিঃ রায় দৈর্ঘ্যে কম, প্রস্থে বেশি, কিন্তু খুব রাশভারী লোক। মনে হল খুব রাগীও। আমাকে মানুষ বলেই গণ্য করলেন না। গট্ গট্ করে ছোট ছোট পা বড় বড় করে ফেলে হেঁটে এসে গাড়িতে উঠলেন।

বাড়ি পৌঁছেই মিঃ রায়কে সাহেবের কাছে নিয়ে গেলাম।

সাহেব মার্বেলের গোল টেবলে মিঃ রায়ের জন্যে চা সাজিয়ে নিয়ে বসেছিলেন।

মিঃ রায় চা খেতে খেতেই আশে-পাশের সমস্ত গাছগুলোর কী কী ডেফিসিয়েন্সি তা বলে দিলেন। কোনটায় অর্গানিক ম্যানিওর দিতে হবে, কোনটায় ইনসেক্টিসাইডস স্প্রে করতে হবে; ইত্যাদি ইত্যাদি। এগ্রিকালচারের কথাবার্তাও হল সাহেবের ওঁর সঙ্গে। ভদ্রলোককে দেখে রীতিমতো চমৎকৃত হয়ে গেলাম। এমন সর্বজ্ঞ লোক আর দেখেছি বলে মনে হল না। একেবারে ইনস্ট্যান্ট্ কফির মতো ইনস্ট্যান্ট্ জিনিয়াস। সে কারণেই এ প্রতিভার মধ্যে কন্‌সিস্‌টেন্সি আছে কি নেই সে বিষয়ে সন্দেহ জাগছিল।

সাহেব আমাকে অর্ডার করলেন, ওঁর মালপত্র নিয়ে দোতলার সবচেয়ে ভালো ঘরটাতে ওঁকে সেটলড্ করে দিতে।

চা খেয়ে উনি বললেন, আমি তাহলে চান করে, পুজো সেরে আসি। পুজো না করে আমি কিছু খাই না। সংসারের সঙ্গে তো কোনো সংস্রব নেই—এখন আমি সন্ন্যাসী—বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেছি—নেহাত আপনি বললেন এত করে, তাই না এসে পারলাম না। আমি জীবনে অনেক ভোগ করেছি, টাকা-পয়সা, মানসম্মান কিছুরই মোহ নেই—এখনও শুধু কর্মের জন্যে—কর্মযোগে বিশ্বাস করি বলেই কাজ করি।

তারপরেই একটু থেমে বললেন, আপনার কথাটা ভেবে দেখলাম। আমার দু'হাজার হলেই চলবে মাসে। আর খাওয়া-দাওয়া অন দ্যা হাউস।

সাহেব বললেন, তা তো নিশ্চয়ই! এ তো আমার সৌভাগ্য। আপনার হেল্প যদি পাই তবে....।

মিঃ রায় বললেন, ডোন্ট উ ওয়ারী। আমি আজ থেকে আপনার লোক্যাল গার্জেন অ্যাপয়েন্ট করলাম নিজেকে।

কথাটা শুনে আমি একটু অবাক ও ভীতও হলাম। সাহেব কি হস্টেলে-থাকা নাবালক যে লোক্যাল গার্জেনের প্রয়োজন হল হঠাৎ।

আমি মিঃ রায়ের মালপত্র সব গুছিয়ে-গাছিয়ে দিয়ে, ওঁকে নিয়ে এলাম উপরে ঘর দেখিয়ে দেওয়ার জন্যে।

উনি বললেন, শোনো ছোকরা, আমার জন্যে কিছু ফল আর গরম দুধ, বেশি নয়; এই এক কেজি মতো; পাঠিয়ে দিও উপরে।

আমি বললাম, আচ্ছা স্যার।

কেন জানি না। ভদ্রলোককে আমার একেবারেই পছন্দ হল না। এই চিড়িয়াখানার পরিবেশে, সকলের এই আন্তরিক ঘরোয়া প্রায়-পারিবারিক সম্পর্কের পটভূমিতে এই লোকটা হঠাৎ হামবাগ্ ইমপস্টারের মতো এসেই যেন নিজেকে জাহির করার চেষ্টা করতে লাগল।

কিন্তু আমার ভালো লাগা না-লাগা দিয়ে আর কী হবে। সাহেব তাঁকে গুণী-জ্ঞানী জ্ঞান করেন তাহলেই হল।

নীচে নেমে দেখলাম অতিথিরা সকলেই উঠে গেছেন। বারান্দায় চায়ের আসর বসেছে। কাল রাতের টেপ্ বাজছে সকাল থেকে।

কাৎলা মাছ, ছাগল-দাড়ি, নিনি-ছুপকি সকলে বসে আছেন। একটু পর মেমসাহেবও এলেন।

এমন সময় দেখি ফুলমণি আর পানুই এসে বারান্দার সামনে দাঁড়িয়েছে।

সাহেব ওদের দেখতে পেয়েই বললেন, কী রে? কী চাই?

ফুলমণি লজ্জা পেয়ে মুখ ঘুরিয়ে বলল, উ বাবুটা বলেছিল শাড়ি দেবে।

কাৎলা মাছের মুখ হাঁ হয়ে গেল।

কাল রাতে নেশার ঝোঁকে যে ওদের শাড়ি দেবেন বলেছিলেন, সে কথা বোধহয় বেমালুম ভুলে গেছেন উনি।

ওদের দেখে তাড়াতাড়ি হিপ-পকেট থেকে মানি ব্যাগ বের করে কুড়ি কুড়ি চল্লিশ টাকা দিলেন ওদের।

পানুই বললে, এতে হবেক নাই।

মেমসাহেব বললেন, হবে রে বাবা, হবে।

ওরা চলে যেতেই কাৎলা মাছ বললেন, আগে যদি জানতাম এরকম গচ্চা যাবে, তবে ভালো করে জড়িয়ে ধরে ঠোঁটেই চুমু খেতাম। গালে চুমু খেয়ে—তাও এক সেকেন্ডের জন্যে—এতগুলো টাকা গচ্চা দেওয়া বড় বেশি একসপেনসিভ্ হয়ে গেল।

ছাগল-দাড়ি আমায় শুধোলেন, চল্লিশ টাকায় কতখানি পাঁঠার মাংস পাওয়া যায় এখানে?

আমি বললাম, তিন কেজি ছশো।

ছাগল-দাড়ি কাৎলা মাছকে বললেন, দ্যাখ্, টাকার কি ওয়েস্টেজ করলি তুই! সকলে মিলে খাসির রেজালা কি চাঁপ খাওয়া যেত।

মেমসাহেব বললেন, টিকলু, মেহবুবকে বলো আরও চা নিয়ে আসতে, আর তারপর তুমি বাজারে যাবে।

আরও চায়ের পরে আরও গল্প-গুজব করলেন ওঁরা, এমন সময় উপরের সিঁড়িতে থপ্-থপ্-থপ্ আওয়াজ হল কারও নামার।

মেমসাহেব সবে ঘুম থেকে উঠেছেন। সাহেবকে উদ্দেশ করে বললেন, তোমার কচ্ছপটা কি কাল উপরে ঘুমিয়েছিল?

সাহেব ঠোঁটে আঙুল দিয়ে শ-স্-স্-স্ করে বললেন, মিঃ রায় আসছেন!

মেমসাহেব ভুরু তুলে অবাক হয়ে বললেন, তিনি কে?

মেমসাহেব মিঃ রায় সম্বন্ধে জানতেন না।

মিঃ রায় টান-টান করে অলিভ-গ্রিন শিকারের পোশাক ও তার সঙ্গে লাল রঙা একটা যোধপুরী বুট পরে এসে দাঁড়ালেন বারান্দায়। আত্মপ্রত্যয় ঝরিয়ে বললেন, গুড মর্নিং টু ইউ অল।

সাহেব প্রথমে বউ-রানি ও পরে তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে ও মেম সাহেবদের সঙ্গে মিঃ রায়ের আলাপ করিয়ে দিয়ে তাঁর সম্বন্ধে বিস্তারিত বললেন।

তারপর বললেন যে, উনি খুব বড় শিকারিও। সুন্দরবনের উপর অথরিটি।

ছাগল-দাড়ি নিজে শিকারি বলে শিকারির চোখ দিয়ে মিঃ রায়কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখছিলেন।

হঠাৎ বউ-রানি মিঃ রায়কে বললেন, আচ্ছা মিঃ রায়, আপনি কি সব সময়ই শিকারের পোশাক পরে থাকেন?

মিঃ রায় আমার মুখের দিকে তাঁর মাংসল-পশ্চাৎদেশ সবেগে ঘুরিয়ে বউ-রানির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পা ফাঁক করে দুটো হাত কোমরের সমান্তরালে দু' পাশে ছড়িয়ে দিয়ে বললেন, কে জানে? কখন ডাক আসে?

বউ-রানি তাঁর অভিব্যক্তিহীন চোখে কিছুক্ষণ অপলকে মিঃ রায়ের হাসি-হাসি আত্মবিশ্বাসী মুখের দিকে চেয়ে রইলেন!

তারপর হঠাৎ, একেবারে হঠাৎই বললেন : কিছু মনে করবেন না মিঃ রায়, বাঘ মারার ডাক এলে কি পেন্টুলুনটা বদলাবার সময়ও পাবেন না?

কথাটাতে সকলে হো-হো করে হেসে উঠলেন।

মিঃ গদাধর রায় আলপিন-ফোটানো বেলুনের মতো চুপসে গেলেন।

সাহেব তাড়াতাড়ি সিচুয়েশন সেভ করার জন্য চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েই মিঃ রায়কে বললেন যে, চলুন চলুন রায়সাহেব, আমরা গিয়ে টি-হাউসে বসি। আমার বন্ধুরা এসেছে ছুটি কাটাতে—এখানে আড্ডা-গুলতানি হচ্ছে, এখানে আমাদের কাজ হবে না।

মিঃ রায় যেতে পেরে বেঁচে গেলেন।

সাহেব বললেন, মেহবুব্ রায়সাহেবের ব্রেকফাস্ট টি-হাউসে পাঠিয়ে দাও।

ওঁরা চলে যেতেই হাসির ফোয়ারা উঠল।

ছাগল-দাড়ি বললেন, বউদি, আপনার মতো ঠোঁটকাটা লোক দেখিনি। কথাটা বলতে আমিও চেয়েছিলাম, কিন্তু বলতে পারতাম না।

বউ-রানি বললেন, আপনাদের বন্ধু মানুষ চেনে না, এ ভদ্রলোক মোটেই ভালো লোক নন, কাজের তো ননই; তা আমি চেহারা দেখেই বুঝেছি। চ্যামপিয়ন মোসাহেব। ইনি এখানে থাকলে আমার চিড়িয়াখানার সোনার সংসারে আগুন লেগে যাবে।

একসঙ্গে বউ-রানিকে এতগুলো কথা বলতে কখনও শুনিনি। তাই অবাক হলাম শুনে।

এমন সময় লিচু বারান্দায় এলেন। তিনি এতক্ষণ বোধহয় হেয়ার ডু করছিলেন। মাথার উপরে একটা হিমালয়ান স্কুইরেলের বাসার মতো প্রকাণ্ড বাসা বানিয়ে এসে বসলেন।

ছাগল-দাড়ি বললেন, করেছ কী লিচু!

লিচু চোখ ঘুরিয়ে কটাক্ষ করলেন, স্বামীর বন্ধুকে, তারপর বউ-রানিকে বললেন, আচ্ছা বউদি,

আপনার এমন কেশবতী কন্যার মতো চুল, আপনি কেন মাঝে মাঝে হেয়ার ডু করেন না! আপনার মতো যদি আমার চুল থাকত!

বউ-রানি চায়ের পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে বললেন, একবার করেছিলাম ভাই, সেই প্রথম ও সেই শেষ সুন্দরী হওয়ার চেষ্টা।

সমবেত সকলে নড়েচড়ে বসলেন।

তিনি বললেন, বলুন বউদি, বলুন।

বউ-রানি আস্তে আস্তে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কাটাকাটা ডায়ালগে বলতে আরম্ভ করলেন।

ইতিমধ্যে আমি চট করে ভিতরে গিয়ে অশোককে আবারও চা আনতে বলে এলাম। সাহেব-মেমসাহেবদের এখন মুড এসেছে। মুড যাতে ঠিক থাকে, তার বন্দোবস্ত করাই তো আমার কাজ।

বউ-রানি সাহেবের বন্ধু ও বন্ধুর স্ত্রীদের বলছিলেন, তোমাদের বন্ধুর সঙ্গে দিল্লি গেছি। ওবেরয় ইন্টারকনটিনেনটালে উঠেছি। সঙ্গে আমার বড় ছেলে। তখন ওর বয়স এগারো বারো বছর।

স্বামী বললেন আজ সন্ধেয় কয়েকজনকে আসতে বলেছি—একটা ককটেল পার্টি দেব। আমাদের সুইটেই। তুমি যাওনা ভ্রমর, নীচের বিউটি-পারলার থেকে চুলটা বেঁধে এসো।

আমি বললাম, আমি ওসবের মধ্যেই নেই, তাছাড়া চিনিও না কোথায় কী আছে। কখনও করিনি ওসব!

স্বামী বললেন, তুমি ছেলেকে নিয়ে যাও, ও চিনিয়ে নিয়ে যাবে।

তারপর বললেন, যাওই না বাবা—জীবনে একদিন চুল বেঁধেই দেখো কেমন দেখায়।

পার্টি আরম্ভ হবার ঘণ্টা দুই আগে, অতএব ছেলের সঙ্গে গেলুম।

দুজন মেয়ে মিলে তো আমাকে নিয়ে পড়ল। আমরা যেমন করে চিংড়ি মাছের কাটলেট বানাবার সময় চিংড়ি মাছ থুরি, তেমন করে আমার চুল থুরছে তো থুরছেই—যতক্ষণ ধরে থুরল, ততক্ষণে আড়াই শো চিংড়ি মাছের কাটলেট বানিয়ে ভাজা হয়ে যেত।

ছেলের অত ধৈর্য ছিল না। সে আধ ঘণ্টা মতো বসে বলল, মা আমি চললুম, তুমি চুল বেঁধে এসো।

কিছুক্ষণ পর ঘুম পেয়ে গেল। আমি চোখ বুজে ফেললুম। আমি রক্ষণশীল ঘরের মেয়ে—নাপ্‌তেনি ও দাইয়েরা চিরদিন পিঁড়েতে বসিয়ে চুল বেঁধে দিয়েছে। এমন অদ্ভুত চেয়ারে বসে, হাসপাতালের নার্সের মতো পোশাকপরা মেয়েরা যে কী করবে আমাকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত তাই ভেবেই আমার আতঙ্ক হল।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, এদেরও উচিত এনেস্থেসিয়া দিয়ে নেওয়া চুল বাঁধার আগে।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না।

কে যেন আমার ঘাড়ে মিষ্টি করে নরম আঙুলে একটি চাঁটি মেরে ইংরিজিতে কীসব বলল।

আমি তাকিয়ে দেখি, আমি যে চেয়ারে ছিলুম, সেখানে নারদমুনি বসে আছে। ভয়ে আমার কেঁদে ফেলার অবস্থা।

যাই-ই হোক, গুচ্ছের টাকা দিয়ে তো সেখান থেকে বেরোলাম, কিন্তু এখন ঘরে যাব কী করে?

শেতলপাটি ইন্টারাপট্ করে বললেন যে, তা ঠিক ওবেরয় ইন্টারকন্টিনেন্টালে গেলে মনে হয় শহরই একটা ছোটোখাটো।

অশোক আবার চা নিয়ে এল।

লিচু বললেন, বলুন বউদি।

বউ-রানি বললেন, ঘরের নম্বর জানি না, কোন তলায় ঘর তা জানি না, ছেলে তো আমায় ফেলে চলে এল—। এখন আমি কী করি?

লাউঞ্জে দেখলাম, অনেক সাহেব-মেম বসে আছেন। আমিও তাদের পাশে বসে পড়ে কী করি তাই ভাবতে লাগলাম।

ওরা ড্যাবড্যাব করে আমার মাথার দিকে চাইতে লাগল।

সামনেই পাশাপাশি দুটো লিফট উঠছিল-নামছিল। অবশেষে সাহস সঞ্চয় করে নিয়ে আমি একটা বোতাম টিপে দিলুম। লিফটের দরজা খুলে গেল। আমি ঢুকতেই বন্ধ হয়ে গেল। বোতাম টিপলুম। লিফটটা সড়াৎ করে নীচে নেমে গেল।

দরজা খুলতেই দেখি, দুজন কালো শেরওয়ানীপরা মুসলমান লোক দৌড়ে এসে আমাব দুকানে আতর-দেওয়া তুলো গুঁজে দিয়ে কুর্নিশ করল।

আমি ভয় পেয়ে আবার দৌড়ে লিফটে ঢুকে গেলুম। আবার বোতাম টিপলুম।

দরজা খুলতেই দেখি সাহেব-মেমরা যেখানে বসেছিলেন, সেই তলাতেই আবার এসে পৌঁছলুম।

তখন আমার কী যে অবস্থা'

ছাগল-দাড়ি বাঁ হাতে দাড়ি চুলকে বললেন, শেষে স্বামীর কাছে পৌঁছলেন কী করে?

বউ-রানি বললেন, একে-তাকে জিগ্যেস করে-করে রিসেপসান না কী বলে, যেখানে অনেক ছেলেমেয়েরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নীচু গলায় গল্প করে, সেখানে গিয়ে শুধোলাম, এখানে কলকাতার এ এম মিত্তির কোন ঘরে উঠেছেন, কোন্ তলায়?

রিসেপসানের মেয়েগুলো এমনভাবে আমার দিকে তাকাল যেন আমি খারাপ মেয়ে-টেয়ে হব।

এদিকে বলতেও পারছি না যে, আমি তাঁর স্ত্রী। বললে তো আবার বোকা ভাববে।

ওরা বলল আমি কী চাই?

আমি বললুম, মিঃ মিত্তিরের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে আমার।

ওরা ঘর ও তলা বলে দিল।

কিন্তু আমি রিস্ক নিলুম না। বললুম, কাউকে সঙ্গে দিন।

একটি মেয়ে ঢঙি-ঢঙি গলায় "পে-এ-এ-এ-ং" বলে ডাকল।

হলুদ জামা পরা একটা বেয়ারা এসে আমায় যখন স্বামীর ঘরের সামনে পৌঁছে দিল, তখন পার্টি বেশ জমে গেছে।

দরজা খুলতেই, আমি ঢুকতেই ছেলে আবার আমাকে দেখে হাঁউ মাঁউ করে কাঁদতে শুরু করে দিল।

পার্টির সমস্ত লোক, সকলেই পাঞ্জাবি, আমার অচেনা; আমার দিকে অপলক তাকিয়ে রইল। ছেলে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, ও মাঃ, তোমার মাথায় ওটা কী? খুলে ফেল মা, এক্ষুনি খুলে ফেল—ওমা খুলে ফেল।

সব অপরিচিত পাঞ্জাবি ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলা, তাদের সামনে কী হেনস্থা!

স্বামী আমাকে চোখ দিয়ে ইশারা করলেন, বাথরুমে গিয়ে ওটাকে খুলে আসতে।

বাথরুমে ঢুকে তো খোলা আরম্ভ করলাম—কিন্তু যে-নারদ ঋষি তৈরি হতে এত সময় লাগল, তা কি অত সহজে খোলা যায়?

বেসিনের সামনে ঘাড় কুঁজো করে থেকে ঘাড়ে ব্যথা ধরে গেল। ওই ঠান্ডা এয়ারকন্ডিশানড ঘরে মাথায় জল লাগিয়ে লাগিয়ে সর্দি ধরে গেল। যখন নারদ ঋষিকে সম্পূর্ণ গলিয়ে মা-বাবার দেওয়া চুল নিয়ে বাথরুম থেকে ঘরে এলুম, তখন দেখলুম পার্টি শেষ।

ছেলে ততক্ষণে কেঁদে কেঁদে বেডরুমে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

আমার স্বামী আমাকে কাছে টেনে বললেন, ভ্রমর, তোমাকে আর কখনও হেয়ার-ডু করাতে বলব না।

বউ-রানি একটু চুপ করে থেকে বললেন, বললেই যেন আমি আবার করতাম!

ছাগল-দাড়ি বললেন, ওই শেরওয়ানী পরা লোক দুটোর কি কোনো মতলব ছিল?

শেতল-পাটি বললেন, আরে না না মোগল রেস্তোরাঁয় ঢুকলে ওরা ওইরকম করে কাস্টমারদের ট্রিট করে। ওটা একটা রিচুয়াল।

হঠাৎ সকলের খেয়াল হল বামাপদকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। লিচু, নিনি ও ছুপকি তিনজনেই এখানে। কাৎলা মাছ, ছাগল-দাড়ি শেতল-পাটিও, শুধু তিনিই অনুপস্থিত।

ছাগল-দাড়ি বাঁ হাতের তর্জনী ও মধ্যমার মধ্যে একটা জ্বলন্ত সিগারেট ধরে বাঁ হাতটা আমার নাকের কাছে তুলে ধরে অনুনয় করে বললেন দেখুন না টিকলুবাবু, বামাপদর ঘরে বামাপদ আছে কি না? থাকলে একটু ডেকে দিন।

ছাগল-দাড়ির কায়দাটা অদ্ভুত—লক্ষ্য করছিলাম, কাউকে কিছু অনুরোধ করতে হলেই, বক্সারের মতো খোলা বাঁ-হাতের কেলে-কেলে আঙুলওয়ালা পাতাটা সোজা যাকে অনুরোধ করা হচ্ছে তার নাকের সামনে চলে যাবে।

আমি উঠে যে ঘরে বামাপদর থাকার কথা, সে ঘরের সামনে গিয়ে শুধোলাম, আছেন নাকি স্যার।

ভিতর থেকে একটা অদ্ভুত হুম্-হাম্ শব্দ আসতে লাগল। এয়ারকন্ডিশনার বন্ধ; বাইরের দরজা ভেজানো।

এখানে এসে ইস্তক্ এমন এমন অভিজ্ঞতা হচ্ছে যে, এখন তার কোনো কিছুতেই আমি চমৎকৃত হই না। ভেজানো দরজার পাল্লায় কান লাগিয়ে মনে হল ঘরের মধ্যে একটা পালকি চলছে ঘুরে-ঘুরে। হুম্-হুমানি তুলে।

আবারও বললাম, স্যার আসব?

এবার উত্তর পাওয়া গেল। কিন্তু ভৌতিকভাবে।

বামাপদ ঝাঁকি দিয়ে বললেন, কাম্। তারপর, ইন। কিন্তু কাম্ কথাটা একেবারে দরজার কাছ থেকে এল আর ইন কথাটা, একটু পর; দূর থেকে। এবং দুটোই ঝাঁকি দিয়ে।

ভয়ে ভয়ে আস্তে করে দরজাটা ঠেলে ভিতরে ঢুকে দেখি বামাপদ নীল গেঞ্জির উপর নীল ফুল-হাতা সোয়েটার ও ছাগল-দাড়ির মতো একটা শর্টস পরে সারা ঘরে ব্যাঙের মতো লাফিয়ে বেড়াচ্ছেন—দু' কোমরে দু হাত দিয়ে। চোখ লাল, মুখ লাল, ঘরের মেঝে ঘামে ভিজে গেছে।

উনি আমাকে দেখেও থামলেন না।

আমি বললাম, আপনাকে ওঁরা ডাকছেন।

উনি তেমনই লম্ফ দিতে দিতে, ঝাঁকি দিয়ে বললেন, জগিং। ...শেষ। ...ফ্রগিং....। আরম্ভ....।

এটুকু বলতেই ঘরটা দুবার পরিক্রমা করে ফেললেন।

তারপর বললেন, যা.....। ....চ্ছি....।

আমি তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে বাইরে এলাম।

আমার ওঁকে দেখেই কপাল ঘেমে গেল, আর উনি না জানি কী ঘামান ঘেমেছেন।

আমি ফিরতেই ছাগল-দাড়ি শুধোলেন, কী করছে?

আমি বললাম, জগিং শেষ; ফ্রগিং আরম্ভ। বললেন যে, আসছেন।

বউ-রানি বললেন, টিকলু এবার বাজারে যাও। আজকে তো রাতে তোমাদের হানিফ সাহেব আসবেন বিরিয়ানি বানাতে।

আমি বললাম, হ্যাঁ, তার ফর্দ আমার পকেটে।

স্কুটার-টেম্পো নিয়ে আমি চলে গেলাম বাজারে।

বাজার থেকে ফিরে আসতে অনেক সময় নিল। হানিফ সাহেব খাসির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যেরকম বিবরণ দিয়ে বলেছিলেন, ডঃ নৃপেন দাসের মতো সার্জন হলেও তাঁরও অনেক সময় লাগত কাটা-কুটি করতে কালিজা, কবুরা, সিনা, রাং, প্রভৃতি জায়গা থেকে বিভিন্ন ওজনের রিকুইজিশান। রাং-এরও আবার ক্লাসিফিকেশান আছে, সামনাওয়ালা; পিছলাওয়ালা।

যাই-ই হোক, বাজার করে ফিরতেই ভজনদার সঙ্গে দেখা। গেটের কাছে।

ভজনদা বললেন, ভেরী বিজি?

আমি বললাম, না।

উনি বললেন, বাবুর্চিখানায় বাজারের জিম্মা দিয়েই চলে এসো। কেস গড়বড়। চিড়িয়াখানার একজিসটেন্টস্ নিয়ে ঝামেলা হয়ে গেছে।

তাড়াতাড়ি আমি ফিরে এলাম।

ভজনদা বললেন, মিস্টার রায়কে তুমিই নিয়ে এসেছ আপ্যায়ন করে?

আমি বললাম, সে তো শুধু স্টেশান থেকে! আসলে সাহেবই ওঁকে আনিয়েছেন।

তা তো আনিয়েছেন কিন্তু এসে অবধি উনি যা শুরু করেছেন তাতে পোলট্রির মল্লিক সাহেব ও ডেয়ারির ঘোষ সাহেব রীতিমতো ক্ষুণ্ণ। ডেয়ারিতে গিয়ে উনি বলেছেন সমস্ত গোরুর ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সী আছে। ষাঁড়গুলোকে আরও অনেক বীর্যবান হতে হবে যদি স্বাস্থ্যবান বাচ্চা পয়দা করতে হয়। পোলট্রিতে গিয়ে বলেছেন এর দেড়গুণ ডিম হওয়া উচিত। এখনও চিড়িয়াখানায় ও গ্রিন-হাউসে আসেননি। শুনলাম নাকি তিনি এগ্রিকালচারারিস্ট, বটানিস্ট, ডেয়ারি এক্সপার্ট, পোলট্রি এক্সপার্ট, জ্যুওলজিস্ট, বিজনেস ম্যানেজম্যান্ট এক্সপার্ট মানে, হোয়াট্ নট্?

তারপর একটু থেমে বললেন, ডেয়ারির ঘোষ সাহেব বলেছেন আসলে মিঃ রায় একটি বুল-শীট্।

মানে? আমি অবাক হয়ে শুধোলাম।

বুল-শীট মানে জানো না? ভজনদা অবাক হয়ে শুধোলেন।

তারপর বললেন, ষাঁড়ের গোবর।

তারপর আবার বললেন, আমি নব্‌নেকে বলে দিয়েছি, ওকে একটা লাউডগা সাপ এনে দেব, গ্রিন-হাউসের ডিফিওনবিচিয়ার গায়ে জড়িয়ে রেখে দেবে। যেই উনি গ্রিন-হাউসে ঢুকবেন তখন নব্‌নে বলবে, স্যার এই ডিফিওনবিচিয়াটা ভালো বাড়ছে না। তারপর যেই মিঃ রায় হাত বাড়িয়ে ডিফিওনবিচিয়া ধরতে যাবেন তখন সাপ দেবে কিট্‌ং করে। মাস্তানী বেরিয়ে যাবে। সাহেবের এ কী ভীমরতি হল।

আমি বললাম, সাহেবকে বলুন, আপনারা সবাই [illegible]লে।

ভজনদা আঁৎকে উঠলেন।

বললেন, মাথা খারাপ! সাহেবকে বলার সাহস নেই কারও। তবে ব্যাপারটা এমন সিরিয়াস টার্ন নেবে যে, ভাবা যায় না। ঘোষ সাহেব ও মল্লিক সাহেব দুজনেই আমাকে বলেছেন যে তাঁরা প্রফেশানালি অপমানিত বোধ করছেন—তাঁরা দুজনেই পার্টনারশিপ থেকে রেজিগনেশান্ দেবেন।

হাঁটতে-হাঁটতে আমরা ডেয়ারির কাছে গিয়ে পৌঁছলাম।

আমি বললাম, মেমসাহেব কিন্তু ওই ভদ্রলোককে একেবারেই পছন্দ করেননি। উনি বলেছেন যে, সাহেব মানুষ চেনেন না, ওই ভদ্রলোক নাকি মোসাহেবী ছাড়া আর কিছুই জানেন না।

সত্যি?

ভজনদা যেন হাতে চাঁদ পেলেন।

তারপর বললেন, তাহলে একটা বুদ্ধি করতে হবে।

আমি বললাম, কী বুদ্ধি?

ভজনদা বললেন, সাহেব আজই রাতে আবার কলকাতা যাচ্ছেন। পরশু ফিরবেন। কালকের মধ্যে ব্যাপারটার একটা ফয়সালা করতে হবে।

ঘোষ সাহেব মন খারাপ করে তাঁর কোয়ার্টারে চলে গেছিলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা হল না।

দেখলাম সারে সারে গোরু দাঁড়িয়ে। এখানেও এক দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার। আমি শুধোলাম, এগুলো কি সবই দিশী গোরু? দিশী গোরুর মতো তো দেখতে নয়?

ভজনদা বললেন, অনেকরকম গোরু আছে। এসো তোমাকে চিনিয়ে দিই। ওই দ্যাখো, ওইদিকে সব দিশী গোরু। আর তার পাশে পাঞ্জাবি গোরু—এদের নাম সহিওয়াল। গায়ের রঙ দেখছ মেশানো—কালো-সাদা, লাল-সাদা, ইত্যাদি। তার পাশে লাল বড় বড় গোরুগুলো দেখছ ওগুলোর নাম—রেড সিন্ধী। তার পাশে ক্রসড জার্সী; এগুলো ইংলিশ। আরও ইংলিশ গোরু আছে, চলো দেখাই। ওইগুলো হচ্ছে হলস্টাইন্ তাদের পাশে রেড ডেন। ওগুলো সব বিরাট বিরাট। কালো হয়, লাল হয়।

তারপর বললেন, দুধ কিন্তু সকলেরই সাদা।

আমি শুধোলাম, ওরা জাবনা করে খাচ্ছে কী?

আসলে জাবনা নয়—সারি করা গোরুর সামনে একেবারে সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো পারমানেন্ট সিসটেম।

ভজনদা বললেন, ক্যাটল-ফিড খাচ্ছে ওরা।

চিকেন-ফিডের মতো? আমি শুধোলাম।

ভজনদা বললেন, বাঃ, এই তো শিখে গেছ।

কী কী খায় গোরুরা?

ভজনদা বিরক্ত হয়ে বললেন, এই ক্যালকেসিয়ান সাহেব নিয়ে তো মহা মুশকিলে পড়লাম। গোরু কী খায় তাও জানো না? ধান গাছ চেনো তো?

তারপর নিজেই বললেন, চুণী, ভুষি, অড়হড় চুণী, জোয়ার চুণী. বাদাম-খোলা, শর্ষে-খোল, তিসি-খোল, খড়। গুড়ও খায় মাঝে মাঝে।

আমি বললাম, এতরকম তেলের খোল খায়, গোরুর দুধ তৈলাক্ত হয়ে যায় না?

ভজনদা আমার উৎসাহে ভাটা দিয়ে বললেন, গোরুর দুধও খাওনি নাকি? আর বিরক্ত কোরো না তো আমাকে—এখন আমার মেজাজ খারাপ।

তারপরে আমাকে নিয়ে ঘোষ সাহেবের কোয়ার্টারে গেলেন।

ঘোষ সাহেব পায়জামা পরে, তোয়ালে হাতে চান করতে যাচ্ছিলেন।

বললেন, কী ব্যাপার?

ভজনদা বললেন, একটা আশার আলো দেখতে পাওয়া গেছে ঘোষ সাহেব।

বিরক্তমুখে ঘোষ সাহেব বললেন, কী?

ভজনদা আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, টিকলু বলছিল যে, মেমসাহেব নাকি মিঃ রায়কে একেবারেই পছন্দ করেননি। আমার মনে হয় আজ সাহেব চলে গেলেই কাল ভোরে আমরা মেমসাহেবের কাছে সকলে একসঙ্গে ডিলিগশান নিয়ে যাব।

ভজনদা আমাকে নিয়ে ডেয়ারির দিকে যেতে যেতে বললেন, গজকচ্ছপ রায়কে টিট করতে পারলে মেমসাহেবই পারবেন।

ঘোষ সাহেবের কুঁচকোনো ভুরু সোজা হয়ে গেল।

বললেন, কথাটা মন্দ বলেনি ভজন।

তারপর বললেন, একটা বন্দোবস্ত করো। তুমিই ইনিসিয়েটিভ নাও।

ভজনদা বললেন, ঠিক আছে।

ভজনদা আর আমি অন্য দিক দিয়ে ফিরলাম। সেখানে গোলাপ বাগান, চাষ হচ্ছে গোলাপের। অনেকখানি জায়গা বেড়া দিয়ে ঘেরা। অনেক সাঁওতালি মেয়ে সেখানে বাডিং করছে আর নবীনবাবু তদারকী করছেন।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কতরকম গোলাপ?

হ্যাঁ। অনেক রকম।

নবীনবাবুকেও খুব পারটার্বড দেখলাম, তবুও আমাকে কিছু কিছু গোলাপ চিনিয়ে দিলেন। ব্ল্যাক প্রিন্স, ক্লিওপেট্রা—পিংক রঙা। সুপারস্টারও পিংক। ডাঃ ভ্যালোস—এগুলো বাই-কালার ডোরাকাটা—লালের উপর হলদের স্ট্রাইপসও হয়। গার্ডেন পার্টি—সাদা রঙা। তাছাড়া বহুরকম মিনিয়েচার গোলাপ—লাল, সাদা, চুন-হলুদ রঙা। বহু রকমের লতানো গোলাপ।

নবীনবাবু তখন অফ-মুড। উনি ভজনদার সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন। মুশকিল হচ্ছে যে মিঃ রায়, সাহেবের বাড়িতেই আছেন।

ভজনদা বললেন, টিকলু তুমি কাল ভোরে মেমসাহেবকে নিয়ে গ্রিন-হাউসে চলে আসবে—সাহেবের বন্ধুরা ওঠার আগেই। আমরা সকলে ওখানে জমায়েৎ হব ছ'টার সময়। তারপর দরজা বন্ধ করে কনফারেন্স হবে।

আমি বললাম, ঠিক আছে।

সে রাতে লনে খুব হৈ-হল্লা হল। হানিফ সাহেব জব্বর রেঁধেছিলেন বিরিয়ানি। বাবুর্চিখানা একবারে সরগরম। বিকেল থেকে গুলহার কাবাব বানানোর তোড়জোড়। তখন থেকেই বাবুর্চিখানাতে বসেই হানিফ সাহেব রাম খেতে শুরু করেছিলেন ওই গরমে। তাই যখন রান্না-বান্না শেষ করে উনি লক্ষ্ণৌ-এর কাজ করা চিকনের পাঞ্জাবি, কলিদার পায়জামা, ফুলতোলা নাগরা জুতো, বগলে খস্ আতর লাগিয়ে লনে এসে দাঁড়ালেন তখন শুধু মীর্জা গালিব নন, জীগর মোরাদাবাদী, জাফ্‌ফর এবং অন্যান্য তাবৎ উর্দু, ফার্সী, পুশতু, আরবী কবিদের ভূত ওঁর কাঁধে ভর করছিলেন। শায়েরের ফুলঝুরি ফুটছিল আর অতিথিরা মুখ-ভর্তি গুলহার কাবাব নিয়ে ক্রমান্বয়ে ওয়াহ, ওয়াহ করছিলেন।

বউ-রানি সাহেবকে চিঠিতে যেমনটি বলেছিলেন, তেমনই করলেন। তখন তাঁর শরীর খারাপ হল। তিনি বিরিয়ানি ছুঁলেন তো নাই-ই: দেখলেন পর্যন্ত না। এক বাটি জল-দেওয়া পান্তাভাতে একটা শুকনো-লঙ্কা পোড়া গুলে খেয়েদেয়ে তিনি শয্যা নিলেন।

সাহেব বহুবার ভ্রমর-ভ্রমর করলেন। কিন্তু কখন থামতে হবে তা সাহেব জানতেন। অনেক বছর যিনি ভ্রমরের সঙ্গে এক ঘরে কাটালেন, তিনি ভ্রমর কখন হুল ফোটাতে পারেন আর কখন পারে না, তা বিলক্ষণ জানতেন।

সেই রাতে শুধু দুজন হিরো। হানিফ সাহেব আর নবাগত সর্বজ্ঞ মিস্টার রায়। এমনকি তাদের বক্তৃতার চোটে খল-বলে কাৎলা মাছও ভাবনার পুকুরের নীচে গভীর পাঁকে মুখ লুকিয়ে রইলেন।

মিঃ রায় গণ্ডায় গণ্ডায় নরখাদক মেরেছেন, উনি লেডিকিলার; উনি কী নন? তাঁর নানারকম গল্প শুনে সকলের চোখ বড় বড়।

গোলমালের মধ্যে ভজনদা আমাকে উক্যালিপটাস্ গাছের তলায় ডেকে নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বললেন, শালা বড় কপচাচ্ছে। জানো না বাছা তোমারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে।

আমি বললাম, সে এখন পান্তাভাত খেয়ে ঘুমোচ্ছে। কাল বুঝবেন মিঃ রায়, কত ধানে কত চাল!

বউ-রানিকে আমি বলে রেখেছিলাম।

সকালে উঠেই ওঁর ভীষণ রাগ। ভজনদা ওঁর হাউস-হোল্ড স্টাফের দুজন লোককে নিয়ে গেছেন কী কাজে সাহেবের হুকুম। তাই মেমসাহেবের ঝোঁক উঠেছে, এক্ষুনি ওঁর চারজন লোক চাই। যেহেতু সাহেব ওঁকে না বলে ওঁর দুজন লোক নিয়েছেন, সুতরাং উনি এক্ষুনি সাহেবের অর্ডার সুপারসিড করে ডেয়ারি, পোলট্রি, চিড়িয়াখানার চারজন লোক চান।

এদিকে বউ-রানিই এখন মিঃ রায়ের হাত থেকে পুরো চিড়িয়াখানা বাঁচানোর একমাত্র উপায়।

আমি বললাম, ওঁরা তো সকলেই গ্রিন-হাউসে আসছেন; আপনি নিজেই ভজনদাকে বলবেন।

তখনও বাড়ির সকলেই ঘুমোচ্ছেন, খিদমদগাররা ছাড়া।

আমি বউ-রানিকে নিয়ে গ্রিন-হাউসের দরজা ঠেলে ঢুকলাম।

ঢুকতেই ওঁরা সকলে দাঁড়িয়ে উঠলেন।

প্রথমে আমি বউ-রানির অভিযোগের কথা বললাম।

সঙ্গে সঙ্গে চারজনের বদলে আটজন লোকের বন্দোবস্ত হয়ে গেল।

বউ-রানি ভজনদাকে বললেন যে, আপনাদের সাহেবকে বলে দেবেন যে, ভবিষ্যতে আমার পারমিশান ছাড়া একজনও লোক নিলে, আপনারা ওঁকে না জানিয়েই একজন লোকের বদলে আমাকে আটজন করে লোক দেবেন।

ভজনদা বললেন, বলব মেমসাহেব।

তারপর ওঁদের সকলের কথা চুপ করে আধঘণ্টা শুনলেন বউ-রানি।

তারপর বললেন, আপনাদের সাহেবের ভীমরতি ধরেছে। থাকগে, আপনারা আজ সকালে সন্ধেয় আমার এখানে খাবেন। তখন খাওয়া-দাওয়ার পর আমি যা বন্দোবস্ত করার করব।

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, টিকলু আমরা যখন খাওয়া-দাওয়ার পর লনে বসব, তখন তুমি অশোককে দিয়ে মিঃ রায়ের স্যুটকেশ গুছিয়ে হোলডঅল বাঁধিয়ে রেডি করে রাখতে বলবে। ছোটুয়া লন থেকে বাঁশি বাজালেই যেন অশোক আর মেহবুব ওঁর মালপত্র নিয়ে লনে নেমে আসে। পাণ্ডেকে বলে রাখবে, গাড়ি নিয়ে রাত ন'টার থেকে যেন বাড়ির কাছে থাকে। মিঃ রায়কে স্টেশনে পৌঁছাতে হবে।

তারপর ভজনদার দিকে ফিরে বললেন, ভজনবাবু, আপনি কাউকে স্টেশানে পাঠিয়ে মিঃ রায়ের জন্যে ট্রেনের টিকিট কাটিয়ে রাখবেন মিথিলা এক্সপ্রেসের।

তারপর আগেকার দিনের রাজা-রানিরা যেমন হাততালি দিয়ে সকলকে ডিসমিস্ করতেন, তেমন করে নরম হাতে হাততালি দিয়ে বললেন, আপনারা কাজে যান। এ ব্যাপারটা আমার উপরই ছেড়ে দিন। আপনাদের সাহেব কাল ভোরেই এসে যাবেন। সাহেব আসার আগে ওঁকে তাড়াতে না পারলে ঘোর অশান্তি হবে।

মিঃ ঘোষ বললেন, তা যা বলেছেন মিসেস মিত্র।

সেই সকালের পর থেকে সারাদিন বাড়ি, চিড়িয়াখানা, পোলট্রি, ডেয়ারি, গ্রিন-হাউস এবং অন্যান্য সব জায়গায় সকলেই আমরা যে যার কাজ করে যাচ্ছিলাম বটে, কিন্তু ভিতরে-ভিতরে দারুণ একটা টেনশান গড়ে উঠছিল। কখন দিন ফুরাবে, সন্ধে হবে এই ভরসায় আমরা ক্ষণ গুনছিলাম।

ভজনদার সঙ্গে দুপুরে একবার দেখা হল। খুব ব্যস্ত ছিলেন। উল্লুকটার কনস্টিপেশান হয়েছে। তার জন্য কী একটা ওষুধ বানিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

যেতে যেতে বললেন, উল্লুকের কী দোষ? এই লোকটা একদিনে আমারই কনস্টিপেশান করে ছেড়ে দিল।

পরিস্থিতি তুঙ্গে এল যখন বিকেলে তাঁর ইনসপেকশান ট্যুর শেষ করে এসে মিঃ রায় বউ-রানির হাতে একটা লিস্ট দিয়ে বললেন, মিসেস মিত্র, মিস্টার মিত্র কাল ভোরে এলেই এটা ওঁকে দেবেন।

আমি আর বউ-রানি শুধু ছিলাম। সাহেব-মেমসাহেবরা সব কাছেই এক মন্দির দেখতে গেছিলেন দু'গাড়ি বোঝাই করে ক্যামেরা-ট্যামেরা নিয়ে।

বউ-রানি লিস্টটা হাতে নিয়ে বললেন, এটা কীসের লিস্ট?

মিঃ রায় চীজ-স্ট্র চিবোতে চিবোতে বললেন, স্যাকিং-লিস্ট। কাকে কাকে ইমিডিয়েটলি স্যাক করতে হবে, তারই একটা লিস্ট তৈরি করে ফেললাম।

বউ-রানি ধীরে সুস্থে লিস্টটাতে চোখ বুলিয়ে বললেন, এতে দেখছি ঘোষ সাহেব, মল্লিক সাহেব, ভজনবাবু, নবীন সকলেরই নাম আছে। সকলকেই আপনি একসঙ্গে বরখাস্ত করলে এতবড় ব্যাপার চালাবে কে?

মিঃ রায় বললেন, আমি একাই চালাব। মিঃ মিত্রর অ্যাডমিনিস্ট্রেশান বড়ই টপ—হেভী হয়ে গেছে। এক্ষুনি ছাঁটাই না করলে উনি ডুবে যাবেন।

বউ-রানি বললেন, এতে একটা নাম ঢোকাতে আপনি ভুলে গেছেন!

কার নাম?

বলে, মিঃ রায় একবার বউ-রানির দিকে আর একবার আমার দিকে চাইলেন। ভাবলেন, আমার নামের কথাই বলছেন বুঝি তিনি।

বউ-রানি আস্তে বললেন, আমার নাম।

মিঃ রায় বললেন, কী যে বলেন! আপনি আমার মালিক, আমি সামান্য কর্মচারী—আপনাদের ভালোর জন্যেই যা কিছু করছি।

আমি ভাবলাম, বুড়ো লোকটার আত্মস মান জ্ঞান পর্যন্ত নেই। সত্যিই একটা আকাট মোসাহেব।

সন্ধে হওয়ার আগেই সাহেব-মেমসাহেবরা ফিরে এলেন। তখন আমি এক দৌড়ে গিয়ে ভজনদা, নবীনবাবুকে বললাম, স্যাকিং-লিস্টটার কথা।

ভজনবাবু বললেন, দাঁড়াও। শালা আজ এমনি না গেলে চ্যালাকাঠ মেরে তাড়াব।

সন্ধেবেলা লনে সকলে এসেছেন। ঘোষ সাহেব, মল্লিক সাহেব, ভজনদা, নবীনবাবু আর সাহেব-মেমসাহেবরা তো আছেনই।

কাৎলা মাছ ও ছুপকি ডুয়েট রবীন্দ্রসংগীত ধরল। লেডিকেনি বাবু ও ছোটুয়ার তবলা ও বাঁশি সহযোগে।

মিঃ রায় বললেন, এই দাড়িওয়ালা লোকটাই বাঙালি জাতের সর্বনাশ করল।

ছাগল-দাড়ি উদ্বেগের সঙ্গে তাকালেন।

কাৎলা মাছ বললেন, কোন্ দাড়িওয়ালা লোক?

মিঃ রায় বললেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এই কথাতে সমবেত সকলে মনে মনে খুব ক্ষুব্ধ হলেন।

শেতল-পাটি শুধোলেন, আপনি রবীন্দ্রনাথ পড়েছেন!

মিঃ রায় বললেন, না। আমি ট্র্যাশ পড়ি না।

তখন মনে হল, শুধু এখানের পার্টনার-কর্মচারীরাই নন, প্রতিটি লোকই এ লোকটা এখান থেকে বিদেয় হলে খুশি হন। একটা ধেড়ে, বুড়ো পরগাছা।

তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়ার পর সকলে আবার লনে গিয়ে জমা হল। তখন রাত সাড়ে ন'টা বেজেছে।

আমরা সকলেই ঘড়ি দেখছি। মিথিলা এক্সপ্রেস ছেড়ে যায় এগারোটায়। তখনও বউ-রানির মতলব বোঝা যাচ্ছে না।

সাহেব-মেমসাহেবরাও একটা দুর্যোগের আশঙ্কা করেছেন। এখানকার সকলের, এমনকি তাদের স্ত্রীদের মুখগুলোও থমথমে।

এমন সময় বউ-রানি পান-ভর্তি রুপোর হাঁসটা এনে রাখলেন। সবাইকে পান দিয়ে, নিজে দুটো পান মুখে দিয়ে বললেন, মিঃ রায়, আপনি আমার সামনে এসে বসুন। আপনার সঙ্গে কথা আছে কয়েকটা।

এতক্ষণ নির্লজ্জ ভদ্রলোক যাদের চাকরি খাওয়ার লিস্ট বানিয়েছেন তাঁদের সঙ্গেও কেমন হৃদ্যতার সঙ্গে গল্প করে যাচ্ছিলেন ও নিজের জ্ঞান ছড়াচ্ছিলেন, তা দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম।

মিঃ রায় ইমপরট্যানস্ পেয়ে খুশিতে রগরগে হয়ে উঠলেন।

বউ-রানির সামনে এসে চেয়ারে বসে বললেন, বলুন?

খাওয়ার পরই আমি অশোককে নিয়ে তাঁর ঘরে ঢুকে কাপড়-চোপড় বাক্সে ভরে, হোল্ডঅল বাঁধিয়ে রেখে এসেছিলাম।

বউ-রানি বললেন, আপনি তো ডেয়ারির গোরু সম্বন্ধে অথরিটি তাই না?

মিঃ রায় আবার দুটো হাত দুদিকে ছুঁড়ে বললেন, লোকে তো সেইরকমই জানে।

বউ-রানি পরক্ষণেই বললেন আপনাকে আমি কয়েকটা প্রশ্ন করব। তার জবাব দিতে পারা-না-পারার উপর আপনার এখানকার চাকরি নির্ভর করছে। যদি দিতে পারেন, তাহলে আপনি এখানে থাকবেন, যদি না পারেন, তাহলে আজই রাতের গাড়িতে আপনি কলকাতা চলে যাবেন।

মিঃ রায় এতজন লোকের সামনে এমন কথা শুনে ঘাবড়ে গেলেন।

হাসলেন। ব্যাপারটা লঘু করার জন্যে বললেন, আপনি খুব রসিকা মহিলা, কিন্তু আমি আপনার কথায় তো এখানে আসিনি, এসেছি মিস্টার মিত্রের কথায়। উনি প্রায় জোর করেই আমাকে এনেছেন।

তা ঠিক। বউ-রানি বললেন।

তারপর বললেন, আপনি ওঁর কথায় এসে থাকতে পারেন, কিন্তু যাবেন আমার কথায়। উনি যেমন জোর করে এনেছেন, প্রয়োজন হলে আমিও তেমনই জোর করেই আপনাকে ফেরত পাঠাব।

মিঃ রায় চমকে উঠলেন। বললেন, এসব কী ইনসাল্টিং কথা, এতজন অপরিচিত লোকের সামনে?

পরক্ষণেই বললেন, আমি শুতে যাচ্ছি—আই গো টু বেড আর্লি।

বউ-রানি বললেন, দাঁড়ান, একটু দাঁড়ান। শোবেন এখন। পুরো রাত তো পড়ে আছে।

তারপর বললেন, যা বলছিলাম, আপনি তো ডেয়ারির গোরুর উপর অথরিটি। এখন আমাকে বলুন দেখি, আপনাকে রাস্তার গোরু গুঁতোলে কী করবেন?

মানে?

মিঃ রায় প্রশ্নটার অভাবনীয়তায় একেবারে হকচকিয়ে গেলেন।

বউ-রানি বললেন, পাঁচ মিনিট সময় দিলাম। ভেবে বলুন।

মিঃ রায় মাথায় হাত দিয়ে পড়লেন। দেখতে দেখতে পাঁচ মিনিট হয়ে গেল।

বউ-রানি বললেন, পারলেন না।

তারপর ডেয়ারির পার্টনার ঘোষ সাহেবকে বললেন, মিস্টার ঘোষ, আপনি কী করতেন?

ঘোষ সাহেব সপ্রতিভভাবে বললেন, আমি হলে, মিসেস মিত্র, কাউকে বলতাম আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে।

চমৎকার। বললেন বউ-রানি।

তারপর আবার মিস্টার রায়কে বললেন, দ্বিতীয় প্রশ্ন মিঃ রায়—আপনি দেখে থাকবেন ডেয়ারিতে বড় বড় গোবরের চৌবাচ্চা আছে।

বলেই, থেমে গিয়ে আমাকে বললেন, টিকলু, একটু কাগজ পেন্সিল।

আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে এক দৌড়ে কাগজ পেন্সিল নিয়ে এলাম।

বউ-রানি বললেন, আমায় নয়, ওঁকে দাও।

চোখের কোণে দেখলাম, ভজনদা সত্যিই দাঁড়কাকের মতো গলা উঁচু করে ইজিচেয়ারে বসে মিঃ রায়কে দেখছেন।

বউ-রানি বললেন, গোবরের চৌবাচ্চাগুলোর সাইজ বারো ফিট বাই বারো ফিট বাই আট ফিট। সেই চৌবাচ্চার গোবর দিয়ে চার ইঞ্চি বাই দু ইঞ্চি বাই হাফ ইঞ্চি কতগুলো ঘুঁটে হবে? টেন পারসেন্ট হ্যান্ডলিং শর্টেজ।

তার পরেই, কাগজ পেন্সিল এগিয়ে দিয়ে বললেন, নিন্। কষে ফেলুন।

আজ্ঞে। বলে, মিঃ রায় প্রায় আঁতকে উঠলেন।

বউ-রানি বললেন, পাঁচ মিনিট সময়।

মিঃ রায় কাগজ পেন্সিল টেনে নিয়ে আঁকা কষা আরম্ভ করলেন, এমন সময় ছুপকি হাসি চাপতে না পেরে ফিক করে হেসে ফেললেন। হাসি বড় সংক্রামক। ছুপকির হাসি শুনে এদিকে ওদিকে অনেকেই হাসতে লাগলেন।

হঠাৎ নবীনবাবু হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলেন।

সবাই চোখ তুলে তাকালেন সেদিকে।

মিঃ রায় নবীনবাবুর দিকে চেয়ে বললেন, ভেরী ব্যাড ম্যানার্স।

তারপর বউ-রানিকে বললেন, আপনি আমাকে তাড়াতে চান, এখনিই তো তাড়ালে পারতেন। আমাকে এমন এমবারাস্ করছেন কেন? তাছাড়া এটা হাইলি ইমপ্রপার। আমাকে মিস্টার মিত্র খাতির করে এনেছেন।

বউ-রানি বললেন, সেজন্যেই মিসেস মিত্র খাতির করে তাড়াবেন।

মিঃ রায় বললেন, আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এমন সম্পর্ক...।

বউ-রানি বললেন, আপাতত আপনি গোবরের সঙ্গে ঘুঁটের সম্পর্কটা নির্ধারণ করে ফেলুন। দুমিনিট গ্রেস্ দেওয়া গেল।

রেগে উঠে মিস্টার রায় সত্যিই ক্যালকুলেশান করলেন। কিন্তু সময় পেরিয়ে গেল।

বউ-রানি ছাগল-দাড়িকে বললেন, কপালবাবু, আপনি তো অ্যাকাউন্ট্যান্ট—এই নিন কাগজ পেন্সিল। পাঁচ মিনিট সময়।

ছাগল-দাড়ি তিন মিনিট পর বললেন, চার লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার নশো চুরাশিটা ঘুঁটে হবে।

বউ-রানি বললেন, কারেক্ট।

তারপর মিঃ রায়ের দিকে ফিরে বললেন, পারলেন না।

তারপর আবার বললেন, এবার গাছ-গাছালি। আপনি তো এসবেও অথরিটি। আচ্ছা, বলুন তো মিস্টার রায়, পুরুষ পেঁপে গাছ ও মেয়ে পেঁপে গাছে তফাত কী?

কী যে বলেন?

মিঃ রায় হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন।

পাঁচ মিনিট সময়। বউ-রানি বললেন।

মিঃ রায় দু হাতে কপাল চেপে মুখ নীচু করে বসেছিলেন! মনে মনে সাহেব যে তাঁকে কার হাতে ছেড়ে দিয়ে গেলেন সে কথা ভাবছিলেন বোধহয়।

বউ-রানি বললেন, পাঁচ মিনিট পেরিয়ে গেল।

তারপর বললেন, নবীন—তুমি জানো?

নবীনবাবু কিন্ডারগার্টেন ক্লাসের ছেলেরা যেমন করে 'ইয়েস মিস' বলে হাত তুলে উঠে দাঁড়ায়, তেমনি করে হাত তুলে দাঁড়িয়ে রইলেন, পুরুষ পেঁপে গাছে খালি ফুল হয়, মেয়ে গাছেই শুধু ফল হয়। এই-ই তফাত।

বউ-রানি বললেন, গুড্।

মিঃ রায় মুখ নীচু করেই ছিলেন।

কিন্তু বউ-রানি তবুও বললেন যে, গোলাপ গাছও তো আপনি গুলে খেয়েছেন শুনলাম, বলুন তো ক্লিওপেট্রার স্বামী কে?

মিঃ রায় সোজা দাঁড়িয়ে উঠলেন।

মনে হল উনি দৌড়ে দোতলায় নিজের শোবার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করবেন।

বউ-রানি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, টিকলু।

আমি বললাম,, রেডি।

মেমসাহেব বললেন, ছোটুয়া।

অমনি ছোটুয়া তার সেই শুয়োর-ভয়-পাওয়ানো বাঁশিতে ফুঁ দিল।

সঙ্গে সঙ্গে অশোক ও মেহবুব রায় সাহেবের স্যুটকেশ ও হোলডল নিয়ে উপর থেকে নেমে এল দৌড়ে।

মিঃ রায় বললেন, একি, একি?

ওঁর কথা শেষ হবার আগেই পাণ্ডে গাড়িটাতে কোঁ-ও-ও-ও-ও করে ব্যাক করে এনে একেবারে লনের সামনে দাঁড় করাল।

আমি পকেট থেকে বের করে বললাম, এই আপনার টিকিট, আমি সঙ্গে যাব তুলে দিতে, মিথিলা এক্সপ্রেস। এগারোটা।

মিঃ রায় টলতে টলতে উঠলেন।

কোনোদিকে না তাকিয়ে সোজা গিয়ে গাড়ির পেছনের সিটে বসলেন।

মেহবুব মাল তুলে দিল বুটে।

আমি গিয়ে পাণ্ডের পাশে বসলাম।

বউ-রানি একা এগিয়ে এলেন গাড়ির কাছে।

তারপর জানালা দিয়ে মুখ ঢুকিয়ে বললেন, আরও একটি প্রশ্ন করছি আপনাকে—ট্রেনে ভাবতে ভাবতে যাবেন।

কী? কী? মিঃ রায় তুত্‌লে বললেন!

বউ-রানি বললেন, সীতা হরণের সঙ্গে দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণের তফাত কী?

পাণ্ডে অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিল।

গাড়ি এগিয়ে চলল।

আমি পেছনে তাকিয়ে দেখলাম, ভজনদার চিড়িয়াখানার সব ক'টা জানোয়ার লনের মধ্যে লাফাচ্ছে, উঠছে পড়ছে, ডিগবাজি খাচ্ছে, চিৎকার করছে, আর মাঝখানে বউ-রানি স্থির মর্মরমূর্তির মতো শান্ত হয়ে বসে—। গরম ঝোড়ো হাওয়ায় ঝুর্ ঝুর্ করে চাঁপাফুল ঝরছে তাঁর মাথায়।